TRE OF
DOLOGY
UDIES

By M.N. HEBBAR

ical studies have always placed Germany in a posi- pre-eminence. Further refinements continue to be at the score of universities scattered all over the Republic of Germany. But the distinction of provid- entre for unified interdisciplinary studies under one es to the South Asia Institute, created under the f the University of Heidelberg in 1962.

the phenomenon of cultural nationalism and that of territorial and secular nationalism. Both India and Germany provide good examples of it, with the difference that the latter is yet to reconcile the two. The Indian context also observes the affinity of organisations like the Jana Sangh and Hindu Mahasabha to the Shankaracharyas' teachings and interestingly, the influence of the latter on current politics.

WIDER RESEARCH

The Department of the History of Religion and Philosophy, concentrating on the religions and philosophies of India, has been attracting an increasing number of students. It is significant for its investigations into the function of Hindu tradition and its importance in the present phase of development in India. The multiplicity of aspects and implications of this tradition sometimes call for a broad research scheme aided by several disciplines. An illustration may be had in the study "The

Temple City Of Puri and Cult."

The temple cities of ceived special attention resentative role of Hindu occupying a strategic po of Bengal, they were suc ing Islamic penetration u tury, A.D., enabling her cultural identity. The stu the analysis of: the Jaga political power; religious tribal religions of Orissa cepts and legal structure ple complex; the influen aracharyas; and a socio of the conditions of Puri. example of a compreh scheme where "modern" torical" disciplines blen particularly against a ba Sociology, Ethnology, Political Science were us with developments in th ogy, History and Religio

NEW EXPER

The new experiment, c disciplines under the brella, proved fortuitou ment of Indology which strides under the heads Berger. The extent and matter that evoked the lars led to its classificat tions.

The first section, head and Dr. K.P. Aithal, is teaching the classical and Sanskrit along with

The linguistic variety ures of the modern regi India receive separate second section. Schola pick from the language (Dr. Aithal); Marathi (D Hindi (Dr. L. Lutze); Ur Tamil (Dr. A. Dhamoth (Dr. A. Dasgupta, a

agannatha

a have re-
o their rep-
ion in that,
in the Bay
ul in resist-
e 16th cen-
reserve her
compassed
na cult and
ry of Orissa;
itional con-
he Puri tem-
the Shank-
nomic study
was also an
ve research
well as "his-
effectively,
round where
nomics and
out of touch
elds of Indol-
listory.

ENT

oining several
tutional um-
r the depart-
e rather rapid
of Prof. Dr. H.
ge of subject
ation of scho-
nto three sec-

by Dr. H. Kopp
ly engaged in
uages of Pali
literature.
literary treas-
languages of
ention in the
can take their
ered: Kannada
. Sonthémeir);
Dr. M.H. Zaidi);
); and Bengali
ng professor).

EMOTE NSING

EY TO EARTH'S RES

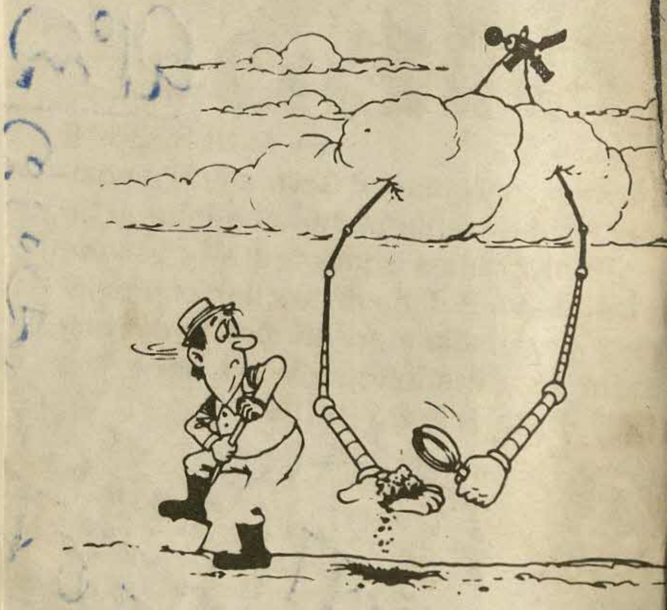

have decided to build one while several others are planned by the ESA and Germany.

The ESA is also preparing two earth sensing experiments for the first flight of the American Spacelab next year.

The Community's Joint Research Centre (JRC) at Ispra in Italy is carrying out research into remote sensing in collaboration with the American National Aeronautics and Space Administration (NASA). The JRC coordinates research carried out by 50 laboratories in the Community thus avoiding costly and time-wasting duplication of effort. The main priorities of this research are agriculture and sea pollution.

Another project is the AGRESTE, which was started in 197...

well as forecasts a...
vests.

Poplar and beech...
been surveyed, and...
ally being extended...
trees.

Yet another, the ...
volves measuring g...
areas with a semi-ari...
Ground humidity is...
growth and its mea...
forecasting harvest yi...

Finally, the EURASE...
at assessing the healt...
munity waters are bei...
how much chlorophyll...
is the basic element in...

1648 5153 S/E 163

বিষয়সূচী

॥ প্রথম খণ্ড ॥

* বিষয় *	* পৃষ্ঠা *
আধুনিক বিজ্ঞানের অপরিসীম বিস্ময়ঃ 'স্পুটনিক'	এক
ভারতের দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা বা 'নয়া পয়সা'	দশ
ভারতযুক্তরাষ্ট্রের ভাষাসংকট	ষোল
বিশ্বশান্তিপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের দান	আটাশ
পঞ্চশীল : শান্তিপূর্ণ-সহঅবস্থিতি	১
সর্বোদয়-পরিকল্পনা ও ভূদান-আন্দোলন	৮
ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	১৫
ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	২২
বাস্তুহারার পুনর্বাসনসমস্যা	৩১
সমাজউন্নয়ন-পরিকল্পনা	৩৬
পশ্চিমবঙ্গে জমিদারীপ্রথালোপ	৪৩
যুদ্ধ ও বিশ্বশান্তি	৪৯
বিজ্ঞান ও মানবসভ্যতা	৫৩
বিজ্ঞান কী চায় : জীবন, না, মৃত্যু	৫৭
অতীত ও বর্তমান বাংলাদেশ	৬১
বাংলাপল্লীর উন্নয়নসমস্যা	৬৫
বাঙালীর বেকারসমস্যা	৭০
বাঙালীর আর্থিক উন্নতির অন্তরায়	৭৫
বাঙালীর ভবিষ্যৎ	৭৯
বাঙালী মধ্যবিত্তের সংকট	৮৪
বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব	৯০
বাঙালী-সংস্কৃতির পরিচয়	৯৪
বাংলার সামাজিক উৎসব	৯৯
বাংলার লোকসাহিত্য	১০৩
একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী : নেতাজী সুভাষচন্দ্র	১০৮
ঋতুচক্র ও বাংলার পল্লীপ্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য	১১৩

Library stamp

* বিষয় *	* পৃষ্ঠা *
বাংলার কুটীরশিল্প	১২৩
বাংলার কৃষি ও কৃষক	১২৭
আমাদের নববর্ষের উৎসব	১৩২
আমার ছাত্রজীবনের একটুক্‌রো স্মৃতিকথা	১৩৭
আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা	১৪২
আমার কলেজ-জীবনের প্রথম দিনটি	১৪৭
যে-বাংলা বইখানি আমার খুব ভালো লাগে	১৫৫
সবাক চলচ্চিত্র : সমাজজীবনে ও জাতীয় জীবনে ইহার প্রভাব ...	১৬৫
বর্ষার দিনে কলকাতা	১৭১
হিমালয়-অভিযান : এভারেষ্টবিজয় *	১৭৫
বেতারবার্তা	১৮০
ধর্মঘট	১৮৩
সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা	১৮৭
স্বাধীন ভারতে ইংরেজি ভাষার স্থান	১৯১
স্বাধীন ভারতে সামরিক শিক্ষা	১৯৬
শিক্ষা ও আনন্দের ক্ষেত্রে দেশভ্রমণ	২০০
আমাদের শিক্ষাসংস্কার	২০
শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষা	২০
বৃত্তিশিক্ষা ও বৃত্তিনির্বাচন	২১
নারীশিক্ষা	২১
ওয়ার্ধা-শিক্ষাপরিকল্পনা	২২১
শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ	২২৫
ব্যবসায়-বাণিজ্যমূলক শিক্ষার মূল্য	২৩০
ভারতের জনসংখ্যাসমস্যা	২৩৫
ভারতীয় কৃষির অবনতির কারণ	২৩৯
ভারতীয় শিল্পের উন্নয়নসমস্যা	২৪৪
স্বাধীন ভারতে নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য	২৫০
ছাত্রসম্প্রদায় ও রাজনীতি	২৫৪

28.11.2008 13766

* অধ্যাপক পঞ্চানন চক্রবর্তী-রচিত

5153

* বিষয় *	* পৃষ্ঠা *
ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র	২৫৮
সাম্যবাদ	২৬৩
গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র	২৬৭
মাহাত্মা গান্ধী	২৭৩
মাহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব ও জীবনসাধনা	২৭৮
গ্রন্থের সাহচর্য	২৮২
প্রাচীন বাংলা সাহিত্য	২৮৬
আধুনিক বাংলা সাহিত্য	২৯১
সাহিত্যের প্রকৃতি	২৯৫
সাহিত্যের মূল্যবিচার	২৯৯
সাহিত্যে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ [সাহিত্যে নীতি]... ...	৩০৩
বাংলা উপন্যাস	৩০৯
বাংলা নাটক	৩১৪
বাংলা ছোটগল্প	৩১৯
বাংলা মহাকাব্য	৩২৩
সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা	৩২৭
সমাজ, জীবন ও সাহিত্য	৩৩৪
আমার প্রিয় বাঙালী গ্রন্থকার : বঙ্কিমচন্দ্র	৩৩৮
কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র	৩৪২
উপন্যাসশিল্পে বঙ্কিমচন্দ্র	৩৪৭
সাংকেতিক নাটক	৩৫২
বৈষ্ণবকবিতার ধর্মনীতিক ও দার্শনিক ভিত্তিভূমি	৩৫৯
শাক্তপদাবলীপাঠের ভূমিকা	৩৬৫
শ্যামাসংগীত ও রামপ্রসাদ	৩৭৬
রবীন্দ্রনাথের 'শেষসপ্তক'	৩৮৬
রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র'	৪০৩
'পূরবী'-কাব্যপাঠের ভূমিকা	৪১৮
'মহুয়া'-কাব্যপাঠের ভূমিকা	৪৩৯
কবি মোহিতলাল মজুমদার	৪৫১

* বিষয় *			* পৃষ্ঠা *
কবি জীবনানন্দ দাশ	...	...	৪৫৯
বৈষ্ণবপদাবলীপাঠের ভূমিকা	...	...	৪৬৬
বাংলা সমালোচনাসাহিত্য	...	...	৪৮২
কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	...	...	৪৯৫
জনপ্রিয় কবি নজরুলের কাব্যসার্থকতা-প্রসঙ্গে	...	...	৫০৩
নজরুলের কবিমানস	...	...	৫১১
কবি টমাস হার্ডি ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	...	...	৫২১
প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধসাহিত্য	...	...	৫৩৩
সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রসঙ্গে	...	...	৫৩৯
'বিচিত্র প্রবন্ধ'-পাঠের ভূমিকা	...	...	৫৪৮
'পুনশ্চ'-কাব্যপাঠের ভূমিকা	...	...	৫৫৮
'বলাকা'-কাব্যপাঠের ভূমিকা	...	...	৫৭০

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

[এক] অনুবাদ-অংশ ঃ

(ক) বি. এ বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হইতে সংকলিত—পৃষ্ঠা ঃ ১-১০
(খ) ইণ্টার বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হইতে সংকলিত—পৃষ্ঠা ঃ ১১-১৮
(গ) অনুশীলনী ঃ ইণ্টার বাংলা পরীক্ষার্থীর জন্য—পৃষ্ঠা ঃ ১৯-২৮
(ঘ) অনুশীলনী ঃ বি. এ বাংলা পরীক্ষার্থীর জন্য—পৃষ্ঠা ঃ ২৮-৩৫

[দুই] ভাবার্থলেখন, মর্মার্থপ্রকাশন ও ভাবসম্প্রসারণ ঃ

(ক) ইণ্টার বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হইতে সংকলিত—পৃষ্ঠা ঃ ৩৫-৮৩
(খ) বি-এ বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হইতে সংকলিত—পৃষ্ঠা ঃ ৮৩-১০৭
(গ) অনুশীলনী ঃ ইণ্টার বাংলা [মাতৃভাষা ও ঐচ্ছিক] ও বি. এ বাংলা [মাতৃভাষা ও অনার্স] প্রশ্নপত্র হইতে সংকলিত—পৃষ্ঠা ঃ ১০৮-১৩৭

[তিন] ব্যাকরণবিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঃ

বাংলাভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন যুগের ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য—বাংলাভাষার উপাদান ও শব্দভাণ্ডার ঃ তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দ, তৎসম শব্দ, অর্ধতৎসম শব্দ, দেশী শব্দ, বিদেশী শব্দ, মিশ্র শব্দ—বাংলা উচ্চারণ ও ধ্বনিপরিবর্তনের কতকগুলি বিশিষ্ট রীতি ঃ স্বরসংগতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি, য়-শ্রুতি, ব-শ্রুতি, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি, বর্ণবিপর্যয়, বর্ণসমীকরণ বা সমীভবন—শব্দস্থিত স্বরধ্বনিলোপ ও বর্ণবিলোপ ঃ স্বরাগম, লোক-ব্যুৎপত্তিজাত শব্দ, বিষমীভবন—পৃষ্ঠা ঃ ১৩৮-১৫০

বাংলা সাধুভাষা ও চলিত ভাষার রূপ—শব্দের অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগ ঃ যৌগিক শব্দ, রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ, যোগরূঢ় শব্দ—শব্দের অর্থপরিবর্তন ঃ অর্থের সংকোচন, অর্থের বিস্তার বা প্রসার, নূতন অর্থের আগম, অর্থের উন্নতি, অর্থের অবনতি— শব্দার্থ ঃ শব্দের অর্থদ্যোতনশক্তি ঃ বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ, ব্যঙ্গ্যার্থ—ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত, যুগ্মশব্দ—পৃষ্ঠা ঃ ১৫০-১৫৮

কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিৎ প্রত্যয়—পৃষ্ঠা ঃ ১৫৮-১৬২ ; ণত্ববিধি—ষত্ববিধি—সন্ধি-প্রকরণ—পৃষ্ঠা ঃ ১৬২-১৬৭ ; সমাস—পৃষ্ঠা ঃ ১৬৭-১৭৪ ; কারক ও বিভক্তি—পৃষ্ঠা ঃ ১৭৪-১৭৭ ; ক্রিয়ার কালভেদ—বাচ্যের রূপভেদ—পৃষ্ঠা ১৭৭-১৮০ ; অব্যয়—উপসর্গ—বাংলা উপসর্গ—পৃষ্ঠা ঃ ১৮০-১৮১ ; পদপরিবর্তন ঃ বিশেষ্য হইতে বিশেষণ, বিশেষণ হইতে বিশেষ্য, লিঙ্গপরিবর্তন—পৃষ্ঠা ঃ ১৮২-১৮৮

প্রায়-সমোচ্চারিত শব্দের অর্থের পার্থক্য—বিপরীতার্থক শব্দ—এককথায় প্রকাশ কর [বাক্‌সংহতি]—বিশিষ্টার্থক শব্দ ও বাক্যাংশের প্রয়োগ [বাংলা বাগ্‌ধারা]—কয়েকটি বিশিষ্টার্থক পদসমষ্টি—কতকগুলি ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট প্রয়োগ—কতকগুলি বিশেষ্যপদের বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ—কতকগুলি বিশেষণ পদের বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ—পৃষ্ঠা ঃ ১৮৮-২০৫

ব্যাকরণ-সম্পর্কিত কতকগুলি প্রয়োজনীয় সংজ্ঞার পরিচয় ঃ সমধাতুজ কর্ম বা ধাত্বর্থক কর্ম—প্রযোজক বা ণিজন্তক্রিয়া—বিধেয় বিশেষণ—নামধাতু—সকর্মক ধাতুর অকর্মকত্ব—অকর্মক ধাতুর সকর্মকত্ব—ব্যতিহার কর্তা—সাপেক্ষ সর্বনাম—কর্মপ্রবচনীয় বা অনুসর্গ—গতি—প্রাতিপদিক—ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া—নিত্য-সম্বন্ধীয় অব্যয়—নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি—সনন্তজাত শব্দ ও যঙন্তজাত শব্দ—ব্যঞ্জনবর্ণ-সম্পর্কিত কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের পরিচয়—অশুদ্ধি-সংশোধন—পৃষ্ঠা ঃ ২০৫—২১১

[চার] ব্যাকরণের প্রশ্নোত্তর :

(ক) ইণ্টার বাংলা প্রশ্নপত্র হইতে সংকলিত—পৃষ্ঠা : ২১২-২৪৪
(খ) বি-এ বাংলা প্রশ্নপত্র হইতে সংকলিত—পৃষ্ঠা : ২৪৫-২৬৫

[পাঁচ] বাংলা কবিতার ছন্দ :

ছন্দ বলিতে কী বুঝায়—ছন্দসম্পর্কিত কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের পরিচয় : অক্ষর, মাত্রা, যতি, ছেদ, পর্ব, পর্বাঙ্গ, চরণ, স্তবক, বল বা স্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাত, মিত্রাক্ষর, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, মিত্রাক্ষর-অমিতাক্ষর, ছন্দোবন্ধ : লঘু দ্বিপদী বা পয়ার, তরল পয়ার, মালঝাঁপ পয়ার, দীর্ঘ দ্বিপদী বা দীর্ঘ পয়ার বা মহাপয়ার, প্রবহমাণ পয়ার, লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু চৌপদী, একাবলী, দীর্ঘ একাবলী; চতুর্দশপদী কবিতা—পৃষ্ঠা : ২৬৬-২৯০

বাংলা ছন্দের তিনটি প্রকারভেদ : তানপ্রধান ছন্দ, ধ্বনিপ্রধান ছন্দ, স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ—বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান—পৃষ্ঠা : ২৯০-২৯৮

[ছয়] অলংকারপ্রকরণ :

'অলংকার' বলিতে কী বুঝায়—শব্দালংকার : ধ্বন্যুক্তি বা ধ্বনিবৃত্তি, অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি—অর্থালংকার : অর্থালংকারগুলির শ্রেণীবিভাগ—উপমা—উৎপ্রেক্ষা—রূপক— অতিশয়োক্তি— ব্যতিরেক—সন্দেহ — ভ্রান্তিমান—অপহ্নুতি — প্রতিবস্তূপমা — দৃষ্টান্ত — নিদর্শনা —সমাসোক্তি—স্বভাবোক্তি—অপ্রস্তুতপ্রশংসা—অর্থান্তরন্যাস—বিষম—ব্যাজস্তুতি—পৃষ্ঠা : ২৯৯-৩২৪

1648
1648

আধুনিক বিজ্ঞানের অপরিসীম বিস্ময় ঃ ‘স্পুট্‌নিক’

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—মানুষের সৃষ্টিশীল প্রতিভা ও নিত্য-নবনব আবিষ্কার—আধুনিক বিজ্ঞানের সৃষ্টি রকেট—মহাশূন্য-পরিক্রমার পরিকল্পনা—রাশিয়ার উৎক্ষিপ্ত প্রথম ও দ্বিতীয় স্প‌ুটনিক—আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের প্রেরিত নকল উপগ্রহ ঃ ‘আলফা ঃ ১৯৫৮’ ও তৃতীয় স্প‌ুট্‌নিক—বিজ্ঞানজগতের পরম বিস্ময় স্প‌ুট নিক—কীভাবে স্প‌ুট্‌নিক মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হল—স্প‌ুট্‌নিক-এর সাহায্যে অভূতপূর্ব গবেষণা—মহাজাগতিক রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি ও এক্‌স্‌-রশ্মি—কতকগুলি বাস্তব-সমস্যার সমাধান—মানুষ এক নবতর বৈজ্ঞানিক যুগে পা বাড়াল—মানুষ আজ জীবনমরণের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে—উপসংহার

প্রারম্ভিক ভূমিকা

বোধ করি, অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীর অভিধানে ‘অসম্ভব’ বলে কোনো শব্দ আর স্থান পাবে না। একথা বলার কারণ হল, যা একেবারে অভাবনীয়, যা সাধারণ মানুষের কল্পনারও অতীত, একালের কৌতূহলী বিজ্ঞানীরা তাকেও প্রত্যক্ষগম্য বাস্তব-সত্যে পরিণত করছেন। একে অসাধ্যসাধনই বলতে হবে। ধন্য বিজ্ঞানসাধকের অতন্দ্র সাধনা। তাঁদের সত্যসন্ধিৎসা যেমন অনবচ্ছিন্ন, মহাবিশ্বের দিকে দিকে তাঁদের নিত্যনতুন অভিযান তেমনি রোমাঞ্চকর ও চমকপ্রদ। সাম্প্রতিক কালের বিজ্ঞানীদল প্রকৃতির ওপর উড়িয়ে দিলেন দীপ্ততম বিজয়কেতন, পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর-একপ্রান্ত পর্যন্ত ঘোষিত হল সৃষ্টিধর্মী মানুষের জয়গৌরব।

মানুষের সৃষ্টিশীল প্রতিভা ও নবনব আবিষ্কার

মানবসন্তানের অন্তর্নিহিত সৃজনীপ্রতিভা পরম বিস্ময়াবহ। নতুন নতুন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যুগ থেকে যুগান্তরে সে এগিয়ে চলেছে। চলার পথে পথে তাকে সৃষ্টি করে করেই চলতে হয়—সহস্র বাধাবিপত্তির বেড়া ডিঙিয়ে। এককালে যে-মানুষ ছিল অরণ্যচারী, সভ্যতার আলোকশূন্য, সে আজ আকাশচুম্বী প্রাসাদের অধিবাসী, সুসভ্য সমাজের স্রষ্টা। সৃজনীধর্মের এই নিগূঢ় এষণাই একদা-নিঃসহায় মানুষকে দিয়েছে অনেক-কিছু। বিরূপ প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে চলতে চলতে অকস্মাৎ একদিন তার মনে হল, পাখির মতো তাকেও উড়তে হবে আকাশে। অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে তবে তার সাধ মিটল—তৈরী হল বিমান, নির্মিত হল হেলিকোপ্‌টার। কিন্তু এতসব পেয়েও তার আকাঙ্ক্ষা

তৃপ্ত হল না। এগুলির সাহায্যে দশবারো মাইলের বেশি ওপরে সে উঠতে পারল না। সে চাইল মহাশূন্যে পাড়ি দিতে, চাইল গ্রহান্তরে যেতে। মানুষ যে নিত্যকালের মহাপথিক, তার জীবনমন্ত্র—'হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনোখানে'। চলল অনির্বাণ গবেষণা। পৃথিবীর প্রবল মাধ্যাকর্ষণশক্তিকে প্রতিহত করে তবে তাকে ডানা বিস্তার করতে হবে মহাশূন্যে। এর উপায় কী? মানুষ তার দুরন্ত বাসনার ছেদ টানল না। সৃষ্টি হল রকেটের। সামান্য আতসবাজির কার্যক্রম আর গতিধারা লক্ষ্য করেই মানুষ আয়ত্ত করে নিলে রকেটনির্মাণের কৌশল—কেবলমাত্র তার আয়তন, আকার এবং জ্বালানী সে বদলে দিলে।

আধুনিক বিজ্ঞানের সৃষ্টি রকেট

রকেটের মধ্যে জ্বালানীকে অতিদ্রুত পুড়িয়ে প্রচণ্ড চাপের বায়বীয় পদার্থ তৈরী করা হয়। সরু নলের মধ্য দিয়ে সুতীব্র গতিতে তা যখন বেরিয়ে আসতে থাকে তখন এই নিষ্ক্রমণের বিপরীত দিকে প্রবল ধাক্কার সৃষ্টি হয়। রকেট এই ধাক্কায় আশ্চর্য গতিতে এগিয়ে চলে। একটা পর্যায়ে একে অনেকদূর ওপরে তোলার মধ্যে কতকগুলো ব্যবহারিক অসুবিধে রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা অধুনা বহুপর্যায় বা বহুপাল্লার [multi-stage] রকেট তৈরী করেছেন।

তবে রকেটের ধারণাটা মানুষের আজ নতুন নয়। নশ' বছর আগে চীন-দেশে খেলার জন্যে রকেট ব্যবহৃত হত। একশ' বছর আগে সমুদ্রে বিপথগামী জাহাজকে সংকেত দেবার জন্যে রকেটের ব্যবহার দেখা যায়। তবে বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই রকেট সম্পর্কে গবেষণা এবং তার উন্নতি হয়েছে প্রচুর। জার্মানী তরলীকৃত অক্সিজেন ও অ্যাল্‌কোহল দিয়ে ভি-২ রকেট তৈরী করেছিল। অতি-আধুনিককালে বিজ্ঞানীরা Vertical Gyro, Analogue Computer এবং Servo-system—এই তিনের সমন্বয় ঘটিয়ে রকেটের গতিপথ নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়েছেন।

মহাশূন্যে পরিক্রমার পরিকল্পনা

রকেট-নির্মাণের উপরি-উক্ত স্তরে পৌঁছে মানুষের মনে জাগল অনন্তবিস্তার শূন্যদেশে কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত করার কল্পনা। কল্পনার পর পরিকল্পনা। মহাশূন্যে এই উপগ্রহ ছাড়ার সাম্প্রতিক পরিকল্পনাটি একটি বিশেষ কার্যসূচীর অন্তর্গত। আমরা সকলেই জানি, বিগত ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবিজ্ঞান-বর্ষের [International Geo-physical Year] উদ্‌যাপন করা হয়েছে। সারা দুনিয়ার প্রায় পঞ্চাশটি দেশের বহু প্রখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ এই বিরাট

কর্মযজ্ঞে যোগদান করেছেন। এর উদ্দেশ্য হল পৃথিবী ও মহাশূন্য সম্পর্কে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করা। আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র থেকে পূর্বাহ্ণে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয় যে, আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ-বিজ্ঞানবর্ষ-উদ্‌যাপন উপলক্ষে তাঁরা মহাশূন্যে বহু রকেট ও কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করবেন। ভূপৃষ্ঠ হতে বৃহৎ রকেটপ্রেরণ, বেলুন হতে ক্ষুদ্রতর রকেটপ্রেরণ এবং রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহনিক্ষেপ—আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র এ তিনটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। প্রথম পরিকল্পনায় ভূপৃষ্ঠ হতে ৬০ মাইল পর্যন্ত আকাশের তথ্যাদি সংগৃহীত হবে। দ্বিতীয়টির সাহায্যে ২০০ মাইল ঊর্ধ্বাকাশের খবর, এবং তৃতীয় পরিকল্পনা অর্থাৎ নকল উপগ্রহের সাহায্যে মহাশূন্যের ঊর্ধ্বতর স্তরের খবরাখবর পাওয়া যাবে। এ ছাড়া, পূর্বোক্ত বিরাট কর্মসূচীর মধ্যে থাকবে আরো কতকগুলি বিষয়ে গবেষণা ; যেমন—সৌরতৎপরতা [Solar activity], মেরুজ্যোতি [Aurora], নভোরশ্মি, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি, চৌম্বকশক্তি [Geo-magnetism], মহাজাগতিক রশ্মি [Cosmic rays], হিমবিজ্ঞান, [Glaciology] সমুদ্রবিজ্ঞান [Oceanography], মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে পরিমাপ [Gravity measurement], ভূমিকম্পবিজ্ঞান [Seismology], ইত্যাদি।

আমেরিকা যখন প্রকাশ্যভাবে এইরূপে মহাশূন্যে নকল উপগ্রহ পাঠাবার ব্যবস্থা করছিল, তখন সোভিয়েট রাশিয়া ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর অকস্মাৎ দূরাকাশে তাদের প্রথম নকল উপগ্রহ [Sputnik No. I] পাঠিয়ে বিশ্ববাসীকে একেবারে স্তম্ভিত করে দিল। একটা বহুপর্যায় [Multi-stage] রকেটের মাথায় এই উপগ্রহটাকে বসানো হয়েছিল। নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছাবার পর উপগ্রহটি রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে আপন কক্ষপথে [উপবৃত্ত] পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে সুরু করল। একবার করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে তার সময় লেগেছিল মাত্র ৯৬ মিনিট। এ এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। ৫৬০ মাইল উচ্চতায়, ঘণ্টায় আঠারো হাজার মাইল বেগে, প্রায় দুমাস ধরে মানুষের গড়া এই উপগ্রহটি আমাদের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছিল। সোভিয়েট রাশিয়া মহাকাশযাত্রার কলম্বাস—পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত গ্রহান্তরে পাড়ি দেবার দুয়ার সে উন্মোচিত করেছে। মহাশূন্যে একবার যে-অভিযান সুরু হল তা আর থামবার নয়। বিশ্ববাসীর অপরিসীম বিস্ময়ের ঘোর কাটতে-না-কাটতে আবার ১৯৫৭ সালের ৩রা নভেম্বর রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা আরো বিপুলকায় এবং অধিকতর বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রপাতি-সমন্বিত নতুন একটি উপগ্রহ [Sputnik No. II] মহাকাশে

রাশিয়ার উৎক্ষিপ্ত প্রথম ও দ্বিতীয় স্পুট্‌নিক

উৎক্ষিপ্ত করলেন। বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। এবার তার মধ্যে ভর্তি করে দেওয়া হল একটা জীবন্ত কুকুরকে, নাম—লাইকা। জীবন্ত প্রাণীর উর্ধ্বাকাশ-পরিক্রমা! এরূপ একটি রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা ইতঃপূর্বে কোনো মানুষ কি ভাবতে পেরেছিল! ৯৪০ মাইল উর্ধ্বে, প্রতিবার ১০২ মিনিটে এই দ্বিতীয় 'স্পুটনিক'টি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে। মার্চ মাস পর্যন্ত তার গতিবেগ অক্ষুণ্ণ ছিল। তারপর এটি আয়ুশেষে পৃথিবীর বুকে প্রত্যাবর্তনের পথে ঘনতর বায়ুস্তরের সংঘর্ষে জ্বলে ছাই হয়ে গিয়েছে।

রাশিয়ার দ্বিতীয় 'স্পুট্‌নিক' আকাশপথে যাত্রা করবার পর গত ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে মার্কিন-আমেরিকা দূরাকাশে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ [Alpha : 1958] প্রেরণ করে। আমেরিকা দাবি করেছে, আকারে এটা রুশ 'স্পুটনিক'-এর চেয়ে ছোট হলেও, তদপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে। সম্প্রতি [১৫ই মে, ১৯৫৮] রাশিয়া তার তৃতীয় 'স্পুটনিক' কক্ষস্থ করেছে। এটি ১১৭৫ মাইল উর্ধ্বে, ১০৬ মিনিটে, পৃথিবী পরিক্রমা করছে। রাশিয়ার উৎক্ষিপ্ত তৃতীয় উপগ্রহটি আকারে সবচেয়ে বড়ো। দ্বিতীয় 'স্পুটনিক'-এর ওজন ছিল আধটন, তৃতীয়টির ওজন ১টন ৬৮৬ পাউণ্ড। এর একমাত্র যন্ত্রপাতির ওজনই নাকি ২১৩৩ পাউণ্ড। এই 'স্পুটনিক'টা যাতে উর্ধ্বতর বায়ুমণ্ডলে বিনষ্ট না হয়ে অক্ষত দেহে মাটির বুকে ফিরে আসতে পারে, তার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেই এর ওজন এত বেশি। এর আকৃতি অনেকটা মোচার ধরণের, এবং দৈর্ঘে প্রায় বার ফুট। প্রথম 'স্পুটনিক'-এর আকৃতি ছিল প্রায় গোলাকার, দ্বিতীয় 'স্পুটনিক'-এর কৌণিক দৈর্ঘ ৪·৯৫ মিটার। আমেরিকার তৈরী উপগ্রহটির আকৃতি অনেকটা কামানের গোলার মতো। প্রথম ও তৃতীয় 'স্পুটনিক'কে নিরক্ষবৃত্তের ৬৫° ডিগ্রিতে, আর দ্বিতীয় 'স্পুটনিক্'কে নিরক্ষবৃত্তের ৮৫° ডিগ্রিতে ছাড়া হয়েছে। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের প্রেরিত 'আল্‌ফা : ১৯৫৮' নিরক্ষবৃত্তের উভয় পার্শ্বে +৪০°, —৪০° ডিগ্রিতে পৃথিবীর চারদিকে পরিভ্রমণ করছে।

আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের প্রেরিত নকল উপগ্রহ : 'আল্‌ফা : ১৯৫৮' ও রাশিয়ার তৃতীয় স্পুট্‌নিক

উপগ্রহ-নিক্ষেপকারী রকেটগুলি জেটতাড়িত [jet-propelled]; তাদের এই প্রচণ্ড শক্তির উৎস কী, তা এ পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা যায়নি। নকল উপগ্রহকে পাঁচ হতে দশ মাইল ওপরে নিক্ষেপ করতে আণবিক শক্তির প্রয়োজন, পূর্বে এরূপ মনে করা গিয়েছিল। আমেরিকা নাকি দ্রবীভূত অক্সিজেন, নাইট্রিক এসিড, দ্রবীভূত হাইড্রোজেন ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থই

রকেটের শক্তির উপাদানহিসেবে ব্যবহার করেছে। বলা হয়েছে, রাশিয়াও তরল ইন্ধনই ব্যবহার করেছে। কিন্তু কী সে ইন্ধন, তা বলেনি।

রাশিয়ার এই 'স্পুটনিক'গুলো বিজ্ঞানজগতের এক পরম বিস্ময়, এবং এদের উর্ধ্বাকাশ-পরিক্রমা সমগ্র পৃথিবীতে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞান, কারিগরী বিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যার অত্যাশ্চর্য সমন্বয়ের ফলেই এগুলোকে নির্মাণ করা সম্ভবপর হয়েছে। এদের গাণিতিক ভিত্তি এবং ব্যবহারিক পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল। আমরা জানি, যদি কোনো বস্তু বৃত্তাকারে আবর্তন করে তখন বস্তুটির কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রবিমুখী শক্তি-দুটো সমান হয়। বিজ্ঞানীরা অনেক গণনা করে, ঠিক হিসাবমতো কোণে হিসাবমতো ধাক্কা দিয়ে, নির্দিষ্ট ওজনের রকেটটিকে মহাকাশের এমন একটা উর্ধ্বস্তরে পাঠিয়েছেন যেখানে উপগ্রহটির কেন্দ্রবিমুখী শক্তি [গতিবেগের জন্যে] তার কেন্দ্রাভিমুখী শক্তির [মাধ্যাকর্ষণের জন্যে] সমান, অর্থাৎ আকর্ষণ ও বিকর্ষণশক্তি সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। এর ফলেই উৎক্ষিপ্ত উপগ্রহ-গুলো পৃথিবীর চারদিকে অবিশ্রান্তভাবে ঘুরছে। হিসেব করে দেখা গিয়েছে, কোনো পদার্থকে ১২০০ মাইল আন্দাজ ওপরে উঠাতে পারলে এবং সেকেণ্ডে সাড়ে চার মাইল বেগে পদার্থটিকে ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালভাবে নিক্ষেপ করতে পারলে তা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতেই থাকবে, আর ফিরে আসবে না। অবশ্য যে-শক্তির সম্মুখক্ষেপণের ফলে এর গতিবেগ ঘণ্টায় সাড়ে চার মাইল হয়েছিল, তার হ্রাস হলে পদার্থটি ধীরে ধীরে ঘুরতে ঘুরতে আবার মাটির বুকে ফিরে আসবে।

বিজ্ঞানজগতের পরম বিস্ময় স্পুটনিক

রাশিয়ার 'স্পুটনিক' ও আমেরিকার 'আল্‌ফা'কে সাময়িক সাহিত্যে বলা হয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহ বা শিশুচাঁদ। পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ যেমন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে, 'স্পুটনিক'গুলোও তেমনি পৃথিবীকে বেষ্টন করে আবর্তিত হচ্ছে। তবে একটু পার্থক্য আছে। 'স্পুটনিক'গুলো কেবল সাময়িকভাবেই উপগ্রহ। কেন-না, কিছুকাল বাদেই এরা উল্কার মতো পৃথিবীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টায় পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু পৃথিবীর অকৃত্রিম উপগ্রহ চাঁদ অনন্তকাল ধরে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলেছে। মহাশূন্যে তার নিত্যকালের আবর্তন।

যতদূর মনে হয়, আধুনিকতম এই তৃতীয় 'স্পুটনিক'টিকে মহাব্যোমে উৎক্ষেপণের কাজ পূর্বের 'স্পুটনিক'-প্রেরণ-পদ্ধতি অনুসারেই হয়েছে। অর্থাৎ, তিনটি রকেটের সাহায্যে একে তার ভ্রমণকক্ষে উৎক্ষিপ্ত করা হয়েছে। প্রথম রকেটটি আর-দুটি রকেট ও উপগ্রহটিকে পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে প্রথম দুই আকাশস্তর

[ট্রপোস্ফিয়ার ও স্ট্রাটোস্ফিয়ার] খাড়াভাবে পার করে দিয়েছে। ওই পর্যন্ত গিয়ে এটি নিষ্ক্রিয় ও বিযুক্ত হয়ে নীচে পড়ে গিয়েছে। তারপর দ্বিতীয় রকেটটি সক্রিয় হয়ে উঠে উপগ্রহটিসহ [কৃত্রিম উপগ্রহ খাদমেশানো এলুমিনিয়াম দিয়ে তৈরী] তৃতীয় রকেটটিকে কোণা-কুণিভাবে আয়নোস্ফিয়ার-স্তরে তুলে দিয়ে, নিজে বিযুক্ত হয়ে, নীচের দিকে নেমে এসেছে। এর পর আরম্ভ হল তৃতীয় রকেটটির কাজ। উপগ্রহটিকে সে সজোরে সমান্তরাল গতিতে সম্মুখের কক্ষপথে নিক্ষেপ করে নিজে নিম্নাভিমুখী হয়েছে। রকেট-বিরহিত উপগ্রহটি কিন্তু প্রচণ্ড গতিতে ক্রমাগত পৃথিবী পরিক্রমা করছে।

কীভাবে স্পুটনিক মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হল

'স্পুট্‌নিক'-এর কক্ষপথ প্রথমে বৃত্তাকার থাকে না। প্রকৃতপক্ষে তা উপ-বৃত্তাকার বা হাঁসের ডিমের মতো। ওই কক্ষপথ একপ্রান্তে পৃথিবী হতে দূরতম, ও অপরপ্রান্তে নিকটতম। দূরতম প্রান্তকে 'অ্যাপজী' [Apogee] ও নিকটতম প্রান্তকে 'পেরিজী' [Perigee] বলে। তৃতীয় 'স্পুটনিক'টির দূরতম প্রান্ত পৃথিবী হতে ১১৭৫ মাইল, ও নিকটতম প্রান্ত ২৫০ মাইল। যেহেতু এই কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষের নিকটতম প্রান্ত বা 'পেরিজী' অপেক্ষাকৃত ঘনবায়ুমণ্ডলে অবস্থিত, সেহেতু প্রতিবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবার সময়, 'পেরিজী'তে বায়ুসংঘর্ষ ও প্রতিরোধশক্তি বেশি হওয়ায়, 'স্পুট্‌নিক'টির গতিবেগের প্রচণ্ডতা কমে আসতে বাধ্য। এভাবে ক্রমশ এর উপবৃত্তাকার কক্ষপথ বৃত্তাকার হয়ে যাবে। ঘনবায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষের তীব্রতা কমাবার উদ্দেশ্যেই তৃতীয় 'স্পুটনিক'টিকে মোচার মতো করে তৈরী করা হয়েছে। এবং আশা করা যাচ্ছে, এটি অক্ষত দেহে পৃথিবীতে ফিরে এসে আমাদের বহুতর অভিনব তথ্যসরবরাহ করবে।

স্পুট্‌নিক-এর কক্ষপথ

'স্পুটনিক' সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কথা হল, এর সাহায্যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব গবেষণা সম্ভবপর হবে। বায়ুমণ্ডলের সর্বাপেক্ষা ঊর্ধ্বের যে-স্তর [Exosphere] সেই স্তর সম্পর্কে কোনো পরীক্ষানিরীক্ষা অদ্যাবধি সম্ভবপর হয়নি। এখন সেই উপরকার স্তরের বায়ুর ঘনত্ব, উষ্ণতা, আর্দ্রতা ইত্যাদি বিষয়ে নানান তথ্য জানা যাবে। আমরা আরো জানতে পারব, সেই শত শত মাইল ওপরে মহাজাগতিক রশ্মির প্রখরতা কতখানি। বিজ্ঞানের ছাত্ররা জানেন, মহাজাগতিক রশ্মির প্রখরতা কোনো বিশেষ স্থানের অক্ষাংশের ওপর নির্ভর করে। নকল উপগ্রহগুলো নিরক্ষবৃত্তের একটা বিশেষ কোণ ধরে ঘুরছে বলে,

স্পুট্‌নিক-এর সাহায্যে অভূতপূর্ব গবেষণা

ওদের মধ্যে রক্ষিত যন্ত্রপাতির সহায়তায় অক্ষাংশের ওপর মহাজাগতিক রশ্মির প্রখরতার ফলাফলবিষয়ে [Latitude effect] অনেক সংবাদ আহৃত হবে।

মানুষ এখন গ্রহান্তরযাত্রার অভিলাষী হয়েছে। ওই যাত্রাপথে এই মহাজাগতিক রশ্মি একটা মস্তবড়ো অন্তরায়। কারণ, উক্ত রশ্মি জীবকোষগুলো নষ্ট করে ফেলে। মানুষের গ্রহান্তরযাত্রার সফলতা-বিফলতা অনেকখানি নির্ভর করে এই মহাজাগতিক রশ্মির ওপর। এর তীব্রতা মাপা হয় 'স্পুটনিক্'-এ রক্ষিত Counter-নামক এক বিশেষ ধরণের যন্ত্রের সাহায্যে। রাশিয়ার প্রেরিত কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যেই আমরা জানতে পারব সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি এবং

মহাজাগতিক রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি ও এক্‌স্-রশ্মি

এক্‌স্-রশ্মি সম্বন্ধে বহু খবরাখবর। সদ্যোক্ত অতিবেগুনী রশ্মি ও এক্‌স্-রশ্মিই আমাদের বায়ুমণ্ডলের আয়নিক স্তরের জন্মদাতা। আবার, এই আয়নিক বায়ুস্তর পৃথিবীর আবহাওয়াকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে। এবং আমাদের দূরপাল্লার বেতারবার্তাপ্রেরণের সফলতা-বিফলতার ক্ষেত্রে অনেকটা দায়ী বায়ুমণ্ডলের উক্ত আয়নিক স্তর। ভূপৃষ্ঠে বসে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি এবং এক্‌স্-রশ্মি সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয়। কেন-না, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এই রশ্মিগুলোকে একেবারে শোষণ করে নেয়। এদের সম্বন্ধে নানা তথ্য আহরণ করা হচ্ছে 'স্পুটনিক'-এ সংস্থাপিত Photo-Electronic Multiplier-নামক একপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যে। আবার, কৃত্রিম উপগ্রহে রক্ষিত বর্ণালী-বিশ্লেষণ-যন্ত্রদ্বারা জানা যাবে অপরাপর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর দেহের উপাদান। পৃথিবীর চৌম্বকশক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি এবং সৌরকণাবিচ্ছুরণ সম্পর্কেও 'স্পুটনিক' আমাদের বহুতর সংবাদ সরবরাহ করবে। তা ছাড়া, গোটা পৃথিবীর একটা নিখুঁত আলোকচিত্র 'স্পুটনিক'-এ সংযোজিত টেলিভিশিন-যন্ত্র মারফৎ আমাদের হস্তগত হবে। এর ফলে ভূপৃষ্ঠের গঠন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান পূর্বেকার চেয়ে অনেক বাড়বে।

মহাশূন্যে পরিভ্রমণের আরো কতকগুলো বাস্তব-সমস্যার সমাধান হবে এই নকল উপগ্রহের সাহায্যে। আমাদের শরীরের যন্ত্রপাতি বায়ুমণ্ডলের ও মাধ্যাকর্ষণের শক্তির মধ্যেই কাজ করতে অভ্যস্ত। কিন্তু মহাকাশে যাত্রার পথে ভূপৃষ্ঠের দুশ-তিনশ মাইল ওপরে বায়ুর চাপ অকিঞ্চিৎকর এবং মাধ্যাকর্ষণের শক্তিও

কতকগুলো বাস্তব সমস্যার সমাধান

সেখানে খুব কম। এরূপ অবস্থায় মানুষের শরীরের যন্ত্রপাতি কী রকম কাজ করবে তা জানা অত্যন্ত দরকার। এত উর্ধ্বে পৃথিবীর মহাঅভিকর্ষশক্তি স্বল্প বলেই সেখানে কিছু গলাধঃকরণ করাও মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

কারণ, মুখগহ্বর থেকে খাদ্যদ্রব্য আমাদের পাকস্থলীর দিকে যায় মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির ফলেই।

মহাকাশের ঊর্ধ্বস্তরে বাতাসের মধ্যে কোনো স্রোত নেই বলে মানুষের পক্ষে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়াও সম্ভবপর নয় সেখানে। কেন-না, প্রশ্বাসের সঙ্গে যে-অঙ্গারবাষ্প সে ত্যাগ করবে তা বাতাসের মধ্যে স্রোতের অভাবে একজায়গাতেই জমাট হয়ে থাকবে। মহাশূন্যে পরিভ্রমণের এসব অসুবিধা-বিদূরণের জন্যে বিজ্ঞানীরা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় আছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা দ্বিতীয় 'স্পুটনিক'-এ জীবন্ত প্রাণী লাইকাকে সহযাত্রীহিসেবে পাঠিয়েছিলেন। এই বায়ু-চাপহীন, মধ্যাকর্ষণশক্তিহীন মহাশূন্যে কুকুরটি কয়েকদিন কীভাবে বেঁচে ছিল তারও কিছু কিছু সংবাদ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। এরকম অবস্থার মধ্যে কুকুরটির [লাইকা] নাড়ীস্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাস, রক্তের চাপ এবং হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক ছবি [Electro Cardiograms] রুশবিজ্ঞানীদের হাতে এসেছে। বহু-ঊর্ধ্বের সেই বায়ুস্তরের নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং জীবদেহের ওপর সেই রহস্যময় জগতের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক খবর আমরা পেয়েছি নকল উপগ্রহের ভিতরকার স্বয়ংক্রিয় বেতারযন্ত্র মারফৎ [Radio-telemetering]।

মানুষ এক নবতর বৈজ্ঞানিক যুগে পা বাড়াল

সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা মহাকাশ জয় করল, গ্রহান্তরে পাড়ি দেওয়ার পথ নিঃসন্দেহে উন্মুক্ত করে দিল। কোটি কোটি মাইল দূরের গ্রহনক্ষত্রের দেশে মানুষের অভিযান এখন আর অলীক কল্পনার বস্তু নয়। নিকট-ভবিষ্যতে মানুষ হয়তো চাঁদের দেশে—মঙ্গলগ্রহের দেশে—গিয়ে পৌছাবে। অগ্নি-বাষ্প-বিদ্যুৎ-রেলগাড়ী-এরোপ্লেন ইত্যাদির আবিষ্কার যেমন বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক যুগ সৃষ্টি করেছে, তেমনি রাশিয়ার 'স্পুটনিক' নবতর একটি বৈজ্ঞানিক যুগের যবনিকা উত্তোলন করেছে। বিজ্ঞানের উদ্ভাবন-শক্তি কী অসাধ্যসাধন করতে পারে, সোভিয়েট রাশিয়া তা সমস্ত পৃথিবীকে দেখিয়েছে।

মানুষ আজ জীবনমরণের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে

আমরা আশা করব, বিজ্ঞানের এই অপূর্ব দান মানবকল্যাণেই নিয়োজিত হবে, নিয়োজিত হবে বিশ্বের বহুতর অজ্ঞাত-রহস্য-উদ্ঘাটনে। ইচ্ছা করলে মানুষ এর সাহায্যে অভাবনীয় ধ্বংসকার্য সমাধা করতে পারে। পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় এর সাহায্যে হাইড্রোজেন-বোমা ফেলা যায় আক্রমণকারীর নিজের দেশে বসেই। এরূপ আশঙ্কা সত্ত্বেও আমরা নিশ্চয়ই আশা করব, মানুষের রাজনীতিক দুর্বুদ্ধি তাকে আত্মবিলুপ্তির পথে নিয়ে যাবে না। বর্তমান রাশিয়ার

অগ্রনায়ক ক্রুশ্চেভ তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে একটা 'Sputnik Commonwealth' গড়ে তুলবার কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন : 'Competition in Sputniks is preferable to competition in lethal weapons'। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশ্ববাসীকে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে ক্রুশ্চেভ যে-ভাষণ দিয়েছেন, পৃথিবীর মানবদরদীমাত্রেই তা সমর্থন করবেন। মানুষ আজ জীবনমরণের সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে, বহু রাষ্ট্রকে জিগীষা ও জিঘাংসা উন্মত্তপ্রায় করে তুলেছে। মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন : 'বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পৃথিবীর নতুন অগ্রগতির ফলে যে-রকম আশার আলোক ফুটে উঠেছে, আবার সে-রকম নৈরাশ্যেরও কারণ রয়েছে। পৃথিবীকে বর্তমান অপেক্ষা খারাপ করে তোলা কিংবা আরো ভালো করা রাজনীতিবিদ্‌দের ওপরেই নির্ভর করে।' দার্শনিক রাসেলের এই উক্তি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

উপসংহার

পৃথিবীর মহাঅভিকর্ষশক্তির আকর্ষণ ছাড়িয়ে মানুষ শূন্যদেশে বারোশ মাইল ওপরে উঠতে পেরেছে। আর, হিংসাদ্বেষ, যুদ্ধবিগ্রহের শক্তিকে প্রতিরোধ করে মানুষ প্রেম-মৈত্রী ও শান্তির জগতে নিজেকে তুলে ধরতে পারবে না, এরূপ নৈরাশ্যবাদী আমরা নই। মানবসন্তানের শতসহস্র দুর্বলতা সত্ত্বেও আমরা বিস্মৃত হব না আর্যঋষিদের সেই বাণী : 'পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।' 'তাঁর [অর্থাৎ বিশ্বমানবের] এক-চতুর্থাংশ আছে জীবজগতে, তাঁর বৃহৎ অংশ ঊর্ধ্বে অমৃতরূপে।' এই বৃহৎ অংশের সাধনাই মানুষের মনুষ্যত্বের সাধনা। এটাকেই বলি মানবসত্য—মানুষের ধর্ম। 'সেইদিক রয়েছে তার অন্তরে, যেখান থেকে চিরকালের সকলের চিন্তাকে সে চিন্তিত করে, সকলের ইচ্ছাকে সে সফল করে, রূপদান করে সকলের আনন্দকে। যে-পরিমাণে তার গতি এর বিপরীত দিকে, বাহ্যিকতার দিকে, দেশকালগত সংকীর্ণ পার্থক্যের দিকে, মানবসত্য থেকে সেই-পরিমাণে সে ভ্রষ্ট—সভ্যতার অভিমান সত্ত্বেও সেই-পরিমাণে সে বর্বর।'

ভারতের দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা বা নয়া পয়সা

[**রচনার সংকেতসূত্র** ঃ প্রারম্ভিক ভূমিকা—ভারতরাষ্ট্রে নতুন মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন—নতুন মুদ্রার স্বরূপ—নতুন-মুদ্রাপ্রবর্তনের কারণসমূহ—এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত—দেশের আর্থিক ব্যবস্থা এবং ওজন ও পরিমাপের সঙ্গে মুদ্রার সম্পর্ক—নতুন মুদ্রাব্যবস্থার সমালোচনা ও এই ব্যবস্থার ফলাফল—উপসংহার]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

স্বাধীনতালাভের পর থেকে নানান্ ক্ষেত্রে—বিশেষ করে আর্থিক বা বৈষয়িক ব্যাপারে—ভারতের বৈপ্লবিক পদক্ষেপ আমরা লক্ষ্য করেছি। বৃহত্তর জাতীয় জীবনে উন্নতিবিধান করতে হলে যুগপ্রয়োজনকে উপেক্ষা করা চলে না। এজন্যে অগ্রগতির প্রতিবন্ধক পুরাতনকে বর্জন করতে হয়, নতুনকে জানাতে হয় সহজ স্বীকৃতি। তা না হলে পৃথিবীর রাষ্ট্রিক হাটে জাতির মূল্য কমে যায়; তার মানমর্যাদা হ্রাস পায়, উন্নতির পথগুলি ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে আসে। স্বাধীন ভারতবর্ষ যুগসচেতন বলেই যুগের দাবিকে সে স্বীকার করে নিয়েছে—বিবিধ সংস্কারমূলক কাজে হাত দিয়েছে। ভারতের মুদ্রাব্যবস্থার সংস্কার এর মধ্যে অন্যতম।

ভারতে নতুন মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন

১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে এদেশে দশমিক মুদ্রা চালু হল—ভারতের ভবিষ্যৎ আর্থিক বিবর্তনের দ্বার খুলে গেল। আমরা সকলেই জানি, দেশে স্বাধীনতা আসবার পর হতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গোড়াপত্তন-হিসেবে কয়েকটি বিশেষজ্ঞ কমিটি কাজ করে আসছে। এদের মধ্যে ওজন ও পরিমাপ-বিষয়ক কমিটির সুপারিশে ভারতসরকার দশমিক মুদ্রাব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন। এই নতুন ব্যবস্থা চালু করবার প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু বলেছেন, এর প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে আরম্ভ হয়ে গেল এক দূরপ্রসারী বিবর্তনের পালা। একে তিনি 'a silent and far-reaching revolution' বলে অভিনন্দিত করেছেন। তাঁর উক্তির অর্থ এই যে, দশমিক মুদ্রাপ্রবর্তনের সূত্র ধরে, জাতীয় সরকার ক্রমশ ওজন ও পরিমাপ-ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করে, ভারতকে কৃষি-ভারত হতে শিল্পোন্নত ভারতে রূপান্তরিত করবার ক্ষেত্রে সাহায্যদানে অদূর ভবিষ্যতে সক্ষম হবেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই মুদ্রাসংস্কার আমাদের প্রচলিত অর্থ-

ব্যবস্থা বা 'টাকা'র কোনো সংস্কার নয়। এর দ্বারা ভারতীয় টাকার আন্তর্জাতিক কিংবা আভ্যন্তরিক মূল্যমানে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হয়নি। কেবলমাত্র টাকার ভগ্নাংশ-হিসেবে আধুলি, সিকি, দুয়ানি, একআনি, ডবল পয়সা, পয়সা ও পাই পয়সা যা চালু ছিল, তার পরিবর্তনসাধন করে, দশমিক হারে খুচরা পয়সাকড়ির প্রবর্তন করা হয়েছে। খুচরা জিনিস কেনাবেচার ব্যাপারে এই খুচরা মুদ্রার ব্যবহার সর্বব্যাপী। তাই নতুন মুদ্রার প্রচলন দেশের সকলকেই নাড়া দিয়েছে, এবং একটি ক্ষুদ্র নয়া পয়সাকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন হাটে-বাজারে, ট্রামে-বাসে সর্বত্র তুমুল বিবাদ-বিতর্ক চলছে।

নতুন মুদ্রার স্বরূপ

নতুন সংস্কৃত মুদ্রার স্বরূপ কিন্তু খুবই সরল, কোনোপ্রকার জটিলতা এর মধ্যে নেই। যত গোলযোগ—পুরানো মুদ্রার হিসেবে এই নতুন মুদ্রার বিনিময়-হার কত হবে—তা নিয়ে। নতুন-চালু-করা মুদ্রার নাম দেওয়া হয়েছে 'নয়া পয়সা'। পুরাতন ধাতব-মুদ্রা-ব্যবস্থার সর্বনিম্ন ক্রম 'পয়সা' থেকে এর মূল্যগত পার্থক্য-নিরূপণের জন্যেই এরূপ নতুন নামকরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বলাই বাহুল্য, এই 'নয়া পয়সা'ও একদিন পুরানো হয়ে যাবে। 'নয়া' কথাটি একটি আপেক্ষিক [relative] শব্দ ছাড়া আর কী? আগে টাকা ১৬ আনা, ৬৪ পয়সা, ১৯২ পাই-এ বিভক্ত হত। এখন আর সেরূপ না হয়ে ১০০টি নয়া পয়সায় বিভক্ত হবে। অর্থাৎ, একশটি নয়া পয়সার মূল্য হবে একটি টাকার সমান। ব্রঞ্জের তৈরী নয়া পয়সা ছাড়া নিকেলের তৈরী দুই, পাঁচ, দশ, পঁচিশ ও পঞ্চাশ নয়া পয়সার সমান মূল্যের নতুন মুদ্রাও চালু হয়েছে বা শীঘ্রই হবে। সুতরাং নতুন মুদ্রাসমষ্টি নিম্নোক্তরূপ হবে :

১ টাকা = ২টি পঞ্চাশ নয়া পয়সার মুদ্রা
= ৪টি পঁচিশ নয়া পয়সার মুদ্রা
= ১০টি দশ নয়া পয়সার মুদ্রা
= ২০টি পাঁচ নয়া প.সার মুদ্রা
= ৫০টি দুই নয়া পয়সার মুদ্রা
= ১০০টি এক নয়া পয়সার মুদ্রা

এতাবৎকাল পুরাতন খুচরা মুদ্রা যা চালু ছিল, টাকার সঙ্গে তার মূল্যের সম্পর্ক ছিল এইরূপ :

১ টাকা = ২টি আধুলি
= ৪টি সিকি

১ টাকা = ৮টি দুয়ানি
= ১৬টি আনি
= ৩২টি ডবল পয়সা
= ৬৪টি পয়সা
= ১৯২টি পাই পয়সা

নতুন দশমিক মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলনে ভারতের সত্যিকার কী সুবিধে হবে না-হবে তা ভবিষ্যতে ভালো করে বোঝা যাবে। তবে কর্তৃপক্ষের নিঃসংশয় ধারণা, এতে আমাদের অনেক সুফললাভের নিশ্চিত সম্ভাবনা। কোনো খেয়ালখুশির বশে নয়, বর্তমানে দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতি ভালোভাবে বিবেচনা করেই তাঁরা মুদ্রানীতি-সংস্কারে হাত দিয়েছেন। এর পেছনে রয়েছে সুদীর্ঘকালের চিন্তা। এই চিন্তা পরাধীন ভারতবর্ষে বিদেশী শাসকের প্রতিকূলতায় বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনি, দেশে স্বাধীনতা আসার ফলেই এতকাল পরে তা সম্ভব হল। নতুন মুদ্রাব্যবস্থা-প্রবর্তনের কেন প্রয়োজন হল, এর উত্তরে ভারতসরকার বলেছেন, বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় পঞ্চাশটি শিল্পোন্নত দেশে দশমিক মুদ্রার প্রচলন রয়েছে। আমাদের মুদ্রাসংস্কারের ফলে আমরা এইসব উন্নত দেশগুলির এক-পঙ্‌ক্তিতে উঠব। দ্বিতীয়ত, আমরা দ্রুত শিল্পোন্নতির পথে যাচ্ছি। এখনই মুদ্রাসংস্কার না করলে পরে এ কাজ অতিশয় দুরূহ হয়ে পড়বে। উদাহরণস্বরূপ ইংলণ্ডের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ইংলণ্ড আধুনিক বিশ্বে শিল্পসমৃদ্ধ একটি দেশ। ফলে তার আর্থিক ব্যবস্থা জটিলতার এমন এক পর্যায়ে এসেছে, যেখানে এখন দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা চালু করা সত্যই কঠিন। জটিলতার জালে জড়িয়ে পড়লে প্রচলিত বিধিব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, দশমিক মুদ্রার প্রচলনে ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে হিসেবনিকেশ পূর্বের চেয়ে অনেকখানি সরল হল, তা এখন অধিকতর দ্রুত নিষ্পন্ন করা যাবে। টাকা-আনা-পাই ইত্যাদির জটিল ভগ্নাংশ গাণিতিক সমাধানকে কীরূপ দুরূহ করে তোলে, তা কারো অবিদিত নেই। চতুর্থত, পৃথিবীর বহু দেশে দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা বর্তমান। এ সকল দেশের মুদ্রাব্যবস্থার সঙ্গে মিল থাকলে আমাদের বহির্বাণিজ্যে টাকা-কড়ির লেনদেনের ক্ষেত্রে অসুবিধে অনেক কমে যাবে। সুতরাং আর্থিক ব্যাপারে এবং অপরবিধ নানা বিষয়ে যে-ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে সুবিধেজনক, কেন আমরা তাকে গ্রহণ করব না? তা ছাড়া, প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষই তো জগৎকে দশমিক পদ্ধতিতে সংখ্যাগণনা শিখিয়েছিল। এর ফলে গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে

নতুন মুদ্রাপ্রবর্তনের কারণসমূহ

গণনা ও গবেষণার পথ সুগম হয়ে উঠেছে। এহেন ভারতের পক্ষে তার নিজের আবিষ্কৃত গণনাপদ্ধতি নিজের মুদ্রাব্যবস্থায় প্রয়োগ করাই তো বাঞ্ছনীয়।

নতুন দশমিক মুদ্রা চালু হওয়ার প্রাক্কালে এ সম্বন্ধে খুব বেশি আলোচনা সাধারণের মধ্যে হয়নি। বিশেষজ্ঞগণ এর সপক্ষে মত দিয়েছিলেন,—এর বিপক্ষে বিশেষ কিছু শোনা যায় নি। গান্ধীজি জীবিতাবস্থায় দশমিক মুদ্রাপ্রবর্তনের সপক্ষেই ছিলেন। এ সম্পর্কে শ্রীনেহেরুর উচ্চসমর্থনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী দশমিক পদ্ধতি-প্রবর্তনের বিরোধী না হলেও, নয়া পয়সার বিপক্ষে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে পয়সা ঠিক রেখে, টাকার মূল্য বাড়িয়ে, একশ পয়সার সমান করাই সমীচীন ছিল। অবশ্য রাজাগোপালাচারীর প্রস্তাবের অর্থ টাকার মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি করা। এর ফলে আর্থনীতিক, বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দূরপ্রসারী ও অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। নয়া পয়সার প্রবর্তনে খুচরা মুদ্রাই পরিবর্তিত হয়েছে, টাকার মূল্য ঠিকই আছে। এইজন্য আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যে কোনো গোলমাল দেখা দেয়নি। কিন্তু সেজন্যেই নয়া পয়সার প্রবর্তন যে অবিসংবাদিতভাবে একটি উন্নতিমূলক সংস্কার—এ না হলে আমাদের আর্থিক উন্নতি সত্যিই ব্যাহত হত—তাও সম্পূর্ণ স্বীকার্য নয়।

এ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত

কোনো দেশের মুদ্রাব্যবস্থা হঠাৎ একদিনে নির্দিষ্ট হয় না। এ ক্রমশ আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে, এবং দেশের আর্থিক ব্যবস্থা, লেনদেন, কেনাবেচার সঙ্গে সংগতি রেখেই এ ব্যাপারটি নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং যে-মুদ্রাব্যবস্থা ভারতে বহুকাল থেকে চলে আসছে তা দেশের আর্থিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে তাল রেখেই গড়ে উঠেছে, একথা কাকেও বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয় না। এবং নতুন মুদ্রাব্যবস্থা চালু করবার সুষ্ঠু কারণ যদি কিছু থাকে তবে তা আমাদের পরিবর্তিত বা পরিবর্তমান আর্থিক ব্যবস্থার দরুনই করা হয়েছে, ধরে নিতে হবে। এ ব্যবস্থা চালু করবার প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু এ কথাই বলেছিলেন। তাঁর অভিমত, পুরাতন জটিল মুদ্রা ও ওজনপদ্ধতি নতুন ভারত গড়ে তোলার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। সুতরাং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তার সংস্কারসাধন করা আমাদের কর্তব্য, যাতে নির্বিঘ্নে আমরা সামাজিক ও আর্থিক জীবনে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারি : 'A cumbrous system of coinage and weights and measures is wasteful of time and energy

দেশের আর্থিক ব্যবস্থা এবং ওজন ও পরিমাপের সঙ্গে মুদ্রার সম্পর্ক

and delays work. As our social life becomes more advanced and complex these petty delays and wastes mount up and add to a great deal. Therefore, it has become necessary to make this change now rather than at a later stage.'

শ্রীনেহেরুর উপরি-উদ্ধৃত কথাগুলো হতে বুঝতে পারা যাচ্ছে, ভারত-সরকার যে দশমিক মুদ্রা চালু করলেন তার একটি বড়ো কারণ হল দেশে ওজন ও পরিমাপ-ব্যবস্থার সংস্কারসাধনের আশু প্রয়োজনীয়তা। আগে ছিল ১৬ আনায় 'টাকা' ও ১৬ ছটাকে 'সের'। শুধু যদি এইটুকু হত তাতে আর্থিক-শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন ভারত গড়ে তোলার ব্যাপারে হয়তো তেমন অসুবিধের প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু উক্ত 'সের' নিয়েই যত গোলমাল। দেশের বিভিন্ন অংশে এই 'সের' নামে এক হলেও আসলে বহুবিধ, এবং এক্ষেত্রে এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য এক অঞ্চলের মিল নেই। এ বিষয়ে পরিকল্পনা-কমিশনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "At present there is a great diversity in weights and measures used in different parts of the country. Not only do weights and measures differ from one area to another, but even in the same area units used for different commodities also differ, and an expression such as a 'ser' represents different weights at different places. Such a diversity in weights and measures used for the common transactions of daily life is a source of confusion and difficulty. Added to this lack of uniformity is the further disadvantage of the complexity of calculations involved in the use of the various 'systems' of weights and measures now prevailing which have grown haphazard and have not always been based on scientific principles." এইজন্যেই, দ্বিতীয় পরিকল্পনা কার্যকরী করবার সঙ্গে সঙ্গে দশমিক মুদ্রার প্রচলন করা হয়েছে, যাতে অল্প সময়ের মধ্যেই ওজন ও পরিমাপের মধ্যেও পরিবর্তনসাধন করে, মুদ্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, দশমিক ওজন ও পরিমাপ-ব্যবস্থা চালু করা যায়। পরিকল্পনা-কমিশনের ভাষায় বলতে গেলে : 'As a first step towards facilitating the adoption of the metric system [in weights and measures] it was decided to introduce the decimal system of coinage during the second plan period.' এতে অস্পষ্টতা কিছুই নেই।

কিন্তু দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা, এবং যে-ভাবে একে চালু করা হয়েছে,—এর কোনোটাই সমালোচনার অতীত নয়। যেমন বলা যেতে পারে যে, দশমিক মুদ্রার প্রবর্তন ছাড়া কি সমস্ত অব্যবস্থা দূর করে নতুন একটি ওজন ও পরিমাপ-ব্যবস্থা চালু করা যেত না ? অনেক শিল্পপ্রধান দেশে দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু অনেক দেশে তো এ ব্যবস্থা নেই। আবার, যে দেশগুলিতে রয়েছে তাদেরই বা বিশেষ কী সুবিধে হয়েছে ? প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি, আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা, ওজন ও পরিমাপ-বিভাগের অধিকর্তা ইংলণ্ডের দশমিক-মুদ্রা-কমিটির নিকট যে-অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তা কোনোক্রমেই দশমিক মুদ্রার অনুকূলে যায় না। আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রে বহুকাল যাবৎ দশমিক মুদ্রা প্রচলিত রয়েছে। সুতরাং সেই দেশের মুদ্রা-ওজনাদির অধিকর্তা যখন ইংলণ্ডে উক্ত মুদ্রাব্যবস্থা-প্রচলনের বিরুদ্ধে মত দিলেন তখন তা একেবারে উপেক্ষা করবার মতো নয়। ফলে ইংলণ্ডের দশমিক মুদ্রাকমিটি সিদ্ধান্ত করলেন যে, ইংলণ্ডে প্রচলিত শিলিং-এর যতই দোষ থাকুক-না-কেন, তা-ই ইংলণ্ডের পক্ষে ভালো, এবং নতুন দশমিক মুদ্রার অজানা দোষের সম্মুখীন হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না : 'It is better to put up with the evils that we have, than fly to others we know not of'—এই বিখ্যাত উক্তি উদ্ধৃত করে কমিটি ইংলণ্ডে দশমিক মুদ্রা চালু করার বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন।

নতুন মুদ্রাব্যবস্থার সমালোচনা ও এই ব্যবস্থার ফলাফল

যাক্ সে-কথা। দশমিক মুদ্রা ভালো এবং সুফলপ্রদ বলে ধরে নেওয়া হলেও, যে-ভাবে তা চালু করা হয়েছে তা ত্রুটিমুক্ত নয়। অবশ্য সরকার বলেছেন, তিন বৎসর পর্যন্ত নতুন মুদ্রার পাশাপাশি পুরানো মুদ্রার প্রচলন থাকবে। এ সময়ের মধ্যে পুরানো মুদ্রা বাজার থেকে তুলে নেওয়া হবে, তখন শুধু নয়া পয়সাই বাজারে চলবে। কিন্তু আমাদের ধারণা, বহুলক্ষ-গ্রামে-গড়া এই ভারতে আরো অনেক-তিন-বৎসর লাগবে পল্লীঅঞ্চলে পুরোপুরি নয়া পয়সা চালু করতে, বিশেষ করে, পুরাতন পয়সা উঠিয়ে নিতে। ফলে সরকারকে পুরাতন পয়সা উঠিয়ে নেবার শেষ তারিখ একাধিকবার বাড়িয়ে দিতে হবে। এই অন্তর্বর্তী কালটির মধ্যে এক্ষেত্রে বহু নিরীহ লোকের ক্ষতি ও ধূর্ত লোকের লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। এ ছাড়া, একআনা, দুয়ানা ইত্যাদির ঠিক ঠিক প্রতিমুদ্রা নয়া পয়সায় না থাকাতে বহুদিন যাবৎ নানা অসুবিধের সৃষ্টি হবে। পোস্টাপিস, স্ট্যাম্পবিভাগ, রাষ্ট্রীয় পরিবহন এ অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে ইতোমধ্যেই নিজেদের মাশুল ও ভাড়া বাড়িয়ে নিয়েছে। নয়া পয়সা প্রবর্তনের প্রথম ধাক্কায় জনসাধারণ বিস্তর অসুবিধে ভোগ করছে।

যাহোক, পুরানো বিধিব্যবস্থার স্থলে নতুনের পদসঞ্চার হলে প্রথম প্রথম কিছুটা অসুবিধে দেখা দেওয়াটা অস্বাভাবিক মোটেই নয়। আবার, একথাটাও সত্য যে, অভ্যস্ত হয়ে গেলে অসুবিধেবোধের উগ্রতাটাও কমে আসে। পুরাতন মুদ্রার তুলনায় এর ভাবী সুফলদানের মাত্রা ঠিক পরিমাপ করা না গেলেও, বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা একে মন্দও বলতে পারবেন না। সর্বশেষে বলা যায়, নতুন মুদ্রা যদি জাল করা শক্ত হয় তবে সেটাই একটা লাভের বিষয় হবে। স্বাধীন ভারতের নবপ্রবর্তিত মুদ্রাব্যবস্থা শুভফলপ্রসূ হোক, এ-ই আমাদের আন্তরিক কামনা।

উপসংহার

ভারতযুক্তরাষ্ট্রের ভাষাসংকট

[**রচনার সংকেতসূত্র :** প্রারম্ভিক ভূমিকা—বিচিত্র জাতি ও বিচিত্র ভাষার দেশ ভারতবর্ষ—এদেশে সংস্কৃত, ফার্সি ও ইংরেজি ভাষার চর্চা—ভারতে কী করে ভাষাসংকট দেখা দিল—ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাভাষীর সংখ্যা—সরকারী ভাষাকমিশন ও এই কমিশন-নিয়োগের উদ্দেশ্য—সরকারী ভাষা-কমিশনের মূল রিপোর্টের প্রতিবাদ—হিন্দীপ্রচারের বর্তমান পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য গণতন্ত্রবিরোধী—হিন্দীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ—ভাষাগত সমস্যাটির পরিচয়—ভাষার বিষয়ে বিভিন্ন দলের প্রস্তাব : ইংরেজির সমর্থন—একাধিক ভারতীয় ভাষাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হোক—কোনো কোনো মহলে সংস্কৃতের সমর্থন—আমাদের প্রস্তাব—উপসংহার]

যে-কোনো জাতির জীবনে ভাষা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। জাতীয় জীবনের সুষ্ঠু ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের সঙ্গে ভাষার প্রশ্নটি অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য, তার ধ্যানধারণা, ভাবনাচিন্তা, তার আশাআকাঙ্ক্ষা, আনন্দবেদনা—সমস্ত কিছুই এই ভাষার মাধ্যমেই স্থায়িত্ব লাভ করে কাল থেকে কালান্তরে উত্তীর্ণ হয়। জাতির অমরত্ব-বিধানের দিব্যরথ হল তার ভাষা। এতে আরোহণ করে পৃথিবীতে কত জাতি মৃত্যুর সীমা অতিক্রম করেছে, স্থানকালাতীত অক্ষয় মহিমার অধিকারী হয়েছে। এই কারণে সভ্য, সংস্কৃতিবান মানুষের ভাষা তার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, স্বভাষার প্রতি তার মমত্ববোধের অন্ত নেই।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

জাতির 'মর্মবিজড়িতমূল' এই যে ভাষা, সম্প্রতি ভারতযুক্তরাষ্ট্রে তাকে কেন্দ্র করে একটি বড়ো রকমের সংকট দেখা দিয়েছে। এ ঘটনাটি যেমন গুরুতর

তেমনি বেদনাদায়ক। কারণ, এতে স্বাধীন ভারতের রাজনীতিক আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, এবং সমস্যাটির সন্তোষজনক সমাধান না হলে ভারতীয় মহাজাতির ঐক্য ও সংহতি বিচলিত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। ভারতবর্ষে কত বিচিত্র জাতি, কত বিচিত্র ভাষা। অথচ এতখানি বিচিত্রতা সত্ত্বেও বহু-জাতির সমন্বয়ে গঠিত এই মহাজাতির ঐক্যে কখনো ফাটল ধরেনি, ঐতিহ্যসমৃদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা কদাপি তেমন ক্ষুণ্ণ হয়নি। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসম্পাদনের অদ্ভুত ক্ষমতা ভারতবর্ষ সমস্ত জগৎকে দেখিয়েছে। সমাজজীবনের সর্বস্তরে সে অনুসরণ করে এসেছে একটা উদার গণতান্ত্রিক নীতি, প্রমাণ—তার শত শত বৎসরের ইতিহাস। গায়ের জোরে সবকিছুকে একাকার করবার সাম্রাজ্যবাদী পন্থা কোনোকালেই ভারতবর্ষে অনুসৃত হয়নি। যদি হোতো, এক মহাজাতির অভ্যুত্থান এখানে আমরা দেখতাম না।

বিচিত্র জাতি ও বিচিত্র ভাষার দেশ ভারতবর্ষ

আর্যসংস্কৃতির দিনে সংস্কৃতভাষা সর্বভারতীয় ভাষার গৌরব অর্জন করেছিল। এর মাধ্যমেই ভারতবর্ষ তার রাষ্ট্রিক জীবনে ও সাংস্কৃতিক জীবনে সুষ্ঠুভাবে সমস্ত কাজ চালিয়ে এসেছে। অপর কোনো ভাষা একে তার উচ্চতর স্থান থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। মুসলমান-আমলে ফার্সিভাষা প্রাধান্য পেয়েছিল রাজভাষারূপে, কিন্তু ওই ভাষা আমাদের সংস্কৃতির বাহন ছিল না, মুষ্টিমেয় কয়েকজন লিখননবীশ, মুন্সী এই ভাষার সাহায্যে সরকারী আদানপ্রদানের কাজ চালাতো। উত্তরভারতে—মুসলমান-রাজশক্তির মূলকেন্দ্রে—সাধারণ মানুষ উক্ত রাজভাষাকে স্থানীয় হিন্দীভাষার সঙ্গে মিশিয়ে এক নতুন ভাষা গড়ে তুলেছিল আরবী হরফে। হিন্দী-ব্যাকরণের গঠনে আরবী-ফার্সি শব্দের গরিষ্ঠতা নিয়ে এই নতুন ভাষা উর্দু নাম নিয়ে আজো উত্তরপ্রদেশের উত্তরাংশের মুখের জবান হয়ে আছে। বিজয়ী পাঠান-মোগল তুর্কীর বংশধরদের মতোই, তাঁদের ভাষাও কালক্রমে ভারতীয় ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। মুসলমান-আমলও একদিন শেষ হল। তারপর ইংরাজের আগমন হল এদেশে। তারা ভারতবর্ষ শাসন করেছে, কিন্তু এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেনি। ইংরজেজাতির যান্ত্রিক বল ও বিজ্ঞানের ন্যায় ইংরেজি ভাষাও শক্তিশালী—বিচিত্র ঐশ্বর্যে মণ্ডিত। সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিদ্যার অতুল সম্পদ ইংরেজিতে আহৃত হয়েছে। এমন একটি সমুন্নত ভাষা দেড়শ বছর ধরে গোটা ভারতে ব্যাপকভাবে অনুশীলিত হয়েছে। ব্রিটিশযুগে ইংরেজি ভারতবর্ষের প্রশাসনিক ভাষা ছিল, শিক্ষার বাহন ছিল, কিন্তু

এদেশে সংস্কৃত, ফার্সি ও ইংরেজি ভাষার চর্চা

এর চেয়ে বড়ো কথা হল ইংরেজির বিপুল ঐশ্বর্য ভারতবাসীকে সম্মোহিত করে ফেলেছিল। তাই স্বেচ্ছায় সে এই ভাষার চর্চা করেছে—ইংরেজি ভাষার বাতায়নপথে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। শুধু কি তাই? এই ভাষা ভারতকে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করেছে, বিক্ষিপ্ত ভারতবাসীকে ঐক্যের বাঁধনে বেঁধেছে। ইংরেজি ভাষার সংস্পর্শে আসার ফলেই ভারতবাসীর বিশ্বনাগরিকতালাভ।

ইংরেজজাতি নিজের আদর্শ ও প্রয়োজনমতো সাম্রাজ্য গঠন করেছিল, এবং এদেশ ছেড়ে যাবার সময় বিস্তৃত সাম্রাজ্য হস্তান্তরিত করে গেছে। বিশাল সৌধমালা, বিচিত্র আমলাতন্ত্র, সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী ইত্যাদি বস্তুর সঙ্গে ইংরাজের ভাষাও আমরা একরূপ দান-হিসেবে গ্রহণ করেছি, এবং এগুলিকে ধীরে ধীরে শোধন করে ভারতীয় রূপ দেবার চেষ্টায় আছি। প্রত্যেক স্বাধীন দেশের জাতীয় পতাকা, জাতীয় ভাষা, জাতীয় সংগীত, নিজস্ব শীল-মোহর ইত্যাদি থাকে জাতির বিশিষ্ট ভাবাদর্শ ও জনজীবনের অফুরন্ত শক্তির উৎসরূপে। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ভারতেরও শাসনতন্ত্রে একটি জাতীয় ভাষার প্রয়োজন অনুভূত হল, এবং এরই পরিণামে স্বাধীনতালাভের পর নীতিগতভাবে অধিক সংখ্যক ভারতীয়ের ভাষা হিন্দীকেই সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি জানানো হল। সংবিধানসভাতে হিন্দী গৃহীত হল ৭২ বনাম ৭৩ ভোটে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তখন ইংরেজি ছাড়া সর্বভারতীয় ভাষারূপে অন্যকোনো ভাষাই প্রস্তুত ছিল না বলে, সাময়িকভাবে ইংরেজিকেই ভারতের সরকারী ভাষারূপে স্বীকার করে নিয়ে, সংবিধানে এদেশের প্রধান প্রধান ১৪টি ভাষাকে [সংস্কৃত ও উর্দু বাদ দিয়ে—হিন্দী, বাংলা, উড়িয়া, গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, আসামী, কাশ্মীরী, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম ও কানাড়ি] আঞ্চলিক ভাষারূপে গ্রহণ করা হল। মোটামুটি কাজ চালাবার মতো ব্যবস্থা হওয়ায় তখন ভাষাকে কেন্দ্র করে রাজ্যগত কোনো সংকট দেখা দেয়নি। কিন্তু সরকারী ভাষারূপে হিন্দীর পরিণতির পথ ধীরে ধীরে নানা সন্দেহ-সংশয়ে কণ্টকিত হয়ে উঠল। ফলে বিভিন্ন রাজ্যে যে-বিক্ষোভ দেখা দিল তা অভাবনীয়। এখন ভাষাগত প্রশ্নটি ভারতযুক্তরাষ্ট্রকে রাজনীতির রণক্ষেত্রের দিকে টানছে। একে দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। একভাষিক রাষ্ট্র হলে ভারতবর্ষে এরূপ সংকট দেখা দিত না।

ভারতে কী করে ভাষা-সংকট দেখা দিল

১৯৫১ সালের আদমসুমারীমতে ভারতের লোকসংখ্যা সাড়ে পঁয়ত্রিশ কোটির কাছাকাছি। এই জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দীকে স্বভাষা বলে গ্রহণ

করেছে প্রায় ১৫ কোটি মানুষ। অবশ্য এর মধ্যে প্রায় এক কোটি উর্দুভাষী, দুতিন কোটি হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, পাহাড়ীভাষীদেরও গণনা করা হয়েছে। উক্ত আদমসুমারী-অনুযায়ী অন্যান্য ভাষাভাষীর সংখ্যা এইপ্রকার: তেলেগু—প্রায় সাড়ে তিন কোটি; তামিল—আড়াই কোটির চেয়ে কিছু বেশি; বাংলা—[কেবল ভারত ইউনিয়নের] আড়াই কোটির সামান্য বেশি; গুজরাটী, কানাড়ি, মালয়ালম ও উড়িয়া প্রত্যেকটি—দেড় কোটি হতে এক কোটি; অসমিয়া—প্রায় আধ লাখ; ইংরেজি—পৌণে দুই লক্ষের মতো। এই হিসেবে আনুপাতিক বিচারে হিন্দীভাষীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, এবং সর্বভারতীয় যোগাযোগ ও আদানপ্রদানের ভাষার ক্ষেত্রে হিন্দীর দাবিই অগ্রগণ্য হওয়া উচিত, একথা বলা যেতে পারে।

ভারতের প্রধান প্রধান ভাষা ও ভাষাভাষীর সংখ্যা

কিন্তু হিন্দী ভাষাটির স্বরূপ বিচার্য। সাধারণত যাকে আমরা হিন্দী বলে জানি, তা অনেকগুলি ভাষার একটি সমন্বিত রূপ। উর্দু, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, গুজরাটী, মৈথিলী, মগহী ইত্যাদি নানাপ্রকার ভাষা এর মধ্যে স্বতন্ত্র মহিমা নিয়ে বিরাজমান। তা ছাড়া, মুখ্যত উত্তরভারতে 'বাজারিয়া হিন্দী' নামে একপ্রকার হিন্দী প্রচলিত আছে, আর আছে 'খড়ীবোলী' হিন্দী। কিন্তু ভারতরাষ্ট্রের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরা দেশের সরকারী ভাষারূপে যে-হিন্দীর প্রচলন করতে চাইছেন তা আলাদা জিনিস—ব্যাকরণের জটিলতায় ও শব্দের দুর্বোধ্যতায় এ একটি নতুন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

যা হোক, ইংরেজি ১৯৫৫ সালের জুন মাসে ভারতের সংবিধানের ৩৪৪ ধারা অনুসারে ভারতসরকার একটি সরকারী ভাষাকমিশন [Official Language Commission] গঠন করেন। ভারত-ইউনিয়নের সরকারী কার্যে হিন্দীর ক্রম-বর্ধমান ব্যবহার কীরূপ হবে, সরকারী উদ্দেশ্যে ইংরেজির প্রয়োগ কীভাবে সংকীর্ণ করা যায়, প্রধান বিচারালয়াদি [সুপ্রীম কোর্ট] স্থানের ভাষা কী হওয়া উচিত, ভারত-ইউনিয়নের কার্যে কোন্ আকারের সংখ্যালিপি ব্যবহৃত হবে, এবং ইংরেজির পরিবর্তে সরকারী ভাষারূপে হিন্দীর বিবর্তনের সময়-স্মরণী স্থির করা—এই পাঁচটি বিষয়ে সুপারিশ করার ভার ছিল উক্ত কমিশনের ওপর। বোম্বাই প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বি. জি. খেরকে সভাপতি করে, অন্য ২০ জন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে, মোট ২১ জনের কমিশন গঠিত হয়। প্রখ্যাত ভাষা-তত্ত্ববিদ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এই কমিশনের একমাত্র বাঙালী

সরকারী ভাষাকমিশন ও এই কমিশন-নিয়োগের উদ্দেশ্য

সদস্য। কমিশন প্রশ্নাবলী বিতরণ করে উত্তর সংগ্রহ করেন, এতে এক হাজারের বেশি উত্তর আসে। বিভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণ করে কমিশন বহুলোকের সাক্ষ্য নিয়েছেন, বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মতামত জেনেছেন। অতঃপর ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে কমিশনের সুপারিশ রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল করা হয়। এ সুপারিশ কিন্তু সর্বসম্মত হয়নি। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মাদ্রাজ রাজ্যসভার সদস্য ডক্টর সুব্বারায়ন কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে পৃথকভাবে নিজেদের মতামত জ্ঞাপন করেছেন।

সরকারী ভাষাকমিশনের সুপারিশ

মূল রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে, ১৯৬৫ সালের ২৫শে জানুয়ারীর পর থেকে পার্লামেন্টে ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে কেবল হিন্দী ব্যবহৃত হোক। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে ইংরেজিতে বক্তৃতা করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। কেন্দ্রীয় তথা বিভিন্ন রাজ্যের আইনপ্রণয়ন হিন্দীতে হওয়াই উচিত। হাইকোর্টের রায় ও নির্দেশ হিন্দী ভাষায় লিখিত হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। অহিন্দীভাষী সরকারী কর্মচারীদের হিন্দী পরীক্ষা দিতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও হিন্দীর একটা বড়ো স্থান থাকবে। অহিন্দীভাষী-অঞ্চলে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ মাতৃভাষা, ইংরেজি এবং হিন্দী শিখতে হবে। কিন্তু হিন্দীভাষী-অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের আর-একটি ভারতীয় ভাষা শিখবার প্রয়োজন নেই,—তারা ইচ্ছামতো সংস্কৃত কিংবা অন্য বিদেশী ভাষা শিখতে পারবে। এতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, হিন্দীভাষী-অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা অপর একটি দেশীয় ভাষাশিক্ষার চাপ হতে অব্যাহতি পাবে। অধিকন্তু, সরকারী চাকুরিতে নিয়োগ-পরীক্ষায় যেখানে অহিন্দীভাষীদের হিন্দী-পরীক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে, সেখানে হিন্দীভাষীদের কতকগুলি ঐচ্ছিক বিষয়ে মাত্র পরীক্ষা দিতে হবে। তা ছাড়া, পরীক্ষার সাধারণ ভাষা হবে হিন্দী—হিন্দী-ভাষীদের মাতৃভাষা। অবশ্য নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত অহিন্দীভাষীদের জন্যে ইংরেজি ভাষাই পরীক্ষার মাধ্যম বলে গৃহীত হতে পারে।

ভাষাকমিশনের মূল রিপোর্টের প্রতিবাদ

ডক্টর চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর সুব্বারায়ন তাঁদের স্বতন্ত্র প্রতিবেদনে হিন্দী ভাষাকে এইভাবে অহিন্দীভাষীদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তিসহকারে প্রতিবাদ করেছেন। সুনীতিকুমার দীর্ঘ-কাল হতে হিন্দী ভাষার অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তাড়াতাড়ি করে সমাজজীবনের সর্বত্র হিন্দীকে চালু করা তাঁর মতে অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হবে। তিনি বলেছেন, এতে ভারতের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হবার

1648 L/৩

BASIC TRAINING COLLEGE BANIPUR

সম্ভাবনা রয়েছে। অহিন্দীভাষীদের বৈষয়িক ও সাহিত্যিক গুরুতর ক্ষতি হবে। কারণ, যে-পদ্ধতিতে হিন্দীপ্রচলনের উগ্রমপ্রয়াস চলছে তা গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী—একে ভাষার সাম্রাজ্যবাদী নীতি বলা যেতে পারে। ডক্টর সুব্বারায়নের বক্তব্যও প্রায়-অনুরূপ।

বস্তুত, মনে রাখতে হবে যে, হিন্দীও ভারতের একটি আঞ্চলিক ভাষা, যদিও হিন্দীভাষীর সংখ্যা তুলনায় বেশি। এর ঐতিহ্যগত, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক তেমন কোনো গৌরবমর্যাদা নেই। আধুনিক রাষ্ট্রের ধ্যানধারণা প্রকাশ করার মতো ক্ষমতা এই ভাষাটি এখনো অর্জন করেনি, এবং হিন্দীর চেয়ে নানাদিকে অধিকতর পুষ্ট ভাষা ভারতে বিগ্যমান। সুতরাং হিন্দীকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা কিছুতেই বলা চলে না। কেউ কেউ হিন্দীকে ভারতবর্ষের 'জাতীয় ভাষা' বলতে সুরু করেছেন এবং এতে একপ্রকার আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন, এবং 'হিন্দ্-হিন্দী-হিন্দুত্ব'—এই শ্লোগান উচ্চারণ করে হিন্দীভাষার একাধিপত্যকে জয়যুক্ত করতে চাইছেন। এহেন উৎকট উৎসাহ জাতীয় ঐক্যকে যে কতখানি বিঘ্নিত করছে তা বোধ করি হিন্দীপ্রেমিকেরা এতটুকু উপলব্ধি করতে পারছেন না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক মনোভঙ্গিই সর্বদা বাঞ্ছনীয়।

এই মনোভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে বুঝতে পারা যাবে, জাতীয় জীবনের সর্ব-ব্যাপারে অবিলম্বে হিন্দী চালু করা হলে গোটা রাষ্ট্রে একটা বিপর্যয় দেখা দেবে। প্রথমত, অহিন্দীভাষী ছাত্রদের ভাষাশিক্ষার চাপ হিন্দীভাষী ছাত্রদের চেয়ে বেশি হবে। হিন্দীভাষী ছেলেমেয়েদের অন্য একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করবার আবশ্যিক বিধান না থাকলে এই চাপ থেকে অব্যাহতি পেয়ে তারা অপর একটি বিদেশী ভাষাই হোক বা অন্য কোনো জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয়ই হোক—শিক্ষাব্যাপারে অতিরিক্ত সুবিধা পাবে। দ্বিতীয়ত, সরকারী-চাকুরিপ্রাপ্তির ভাষা হিন্দী হলে অহিন্দীভাষী-অঞ্চলের পরীক্ষার্থীগণকে একটা অসম প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এর ফল কী হবে? ফল হবে, ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এইভাবে হিন্দীভাষীগণ একটি বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর—রাজার জাতির—সামিল হয়ে দাঁড়াবে। এতে কেউ হয়ে পড়বে কুলীন, বেশির ভাগ হবে অকুলীন। এও একরকমের জাতিভেদ ছাড়া আর-কিছু নয়। তৃতীয়ত, ভারতের রাজস্বের বিপুল পরিমাণ একটি অংশ যদি হিন্দীভাষাপ্রচারে ব্যয়িত হয় [সম্প্রতি যেরূপ হচ্ছে] তাহলে এদেশের অন্যান্য অঞ্চলের ভাষাগুলি স্বাভাবিকভাবেই সরকারী অর্থসাহায্য হতে বঞ্চিত হবে, এবং ফলে সমৃদ্ধতর আঞ্চলিক ভাষাগুলি উপেক্ষিত

হিন্দীপ্রচারের বর্তমান পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য গণতন্ত্রবিরোধী

হতে থাকবে। এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি তা সহজেই বুঝে নেবেন। ভাষাশিক্ষা স্বেচ্ছামূলক হওয়া এক কথা, আর তা বাধ্যতামূলক হওয়াটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। জাতীয় ঐক্যবিধানের বুলি আওড়িয়ে, বিপুল জনগণের ইচ্ছার প্রতি উপেক্ষা দেখিয়ে, জোর করে একটা ভাষাকে গোটা দেশের উপর চালিয়ে দিলে তার ফল কখনো শুভ হতে পারে না। মনোলোকে সাম্য ও ঐক্যের বোধ না জন্মালে আইনের বলে তা কখনো সিদ্ধ হবার নয়।

এসব কারণে অহিন্দীভাষীগণ হিন্দীভাষাকে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে অবিলম্বে চালু করার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারেনি—চতুর্দিক হতে ধ্বনিত হয়েছে প্রচণ্ড প্রতিবাদ। হিন্দীর প্রবর্তন [রাষ্ট্রভাষারূপে ও শিক্ষার মাধ্যমরূপে] অধুনা সর্বভারতীয় সমস্যারূপে জটিল আকার ধারণ করেছে। হিন্দীভাষাভাষী একদল শাসক গোষ্ঠি, বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার যাঁরা দখল করে রয়েছেন, তাঁরাই এর জন্যে দায়ী। এভাবে হিন্দীপ্রচলনের বিরুদ্ধে দক্ষিণভারতে একরূপ জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছে, এবং ওই বিস্ফোরণের স্ফুলিঙ্গ পূর্বভারতেও আত্মপ্রকাশ করেছে। সম্প্রতি চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী বলেছেন, হিন্দীভাষার সুষ্ঠু বিবর্তন ও স্বাভাবিকভাবে গ্রাহ্যতার পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ইংরেজি ভাষাই শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারী ভাষার স্থানে বহাল থাকুক। হিন্দীভাষা যদি অচিরে রাষ্ট্র, সমাজ ও শিক্ষার বৃহৎ স্তরগুলি দখল করে বসে তাহলে একদিকে ভারতের অপরাপর মাতৃভাষাগুলি দলিত হবে, অন্যদিকে শিক্ষা ও সরকারী-চাকুরিপ্রাপ্তি-বিষয়ে একদল নাগরিক বিশেষ সুযোগসুবিধা ভোগ করবে। এরূপ একটি অবস্থা কেবল বিচারবুদ্ধির দিক দিয়েই অসংগত নয়, ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারেরও বিরোধী।

হিন্দীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

অল্পদিন আগে রাজ্যপুনর্গঠনের ব্যাপারে ভারতসরকার সুবিবেচনা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেননি, এতে ভারতের বহু রাজ্যে বিক্ষোভ দেখা গিয়েছিল। আবার, ভাষার ব্যাপারেও এই শাসকবর্গ জনমতের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন। এ একটি গভীর উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাষার জটিল সমস্যাসমাধানের জন্যে সরকারকে খুব সাবধানে অগ্রসর হতে হবে, জনসাধারণকেও স্থির মস্তিষ্কে, শান্ত মনে, প্রশ্নটি বিচার করতে হবে। রাষ্ট্রগঠন কঠিন একটি কাজ, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চেয়ে কঠিন জাতীয়-ভাষা-গঠন। এক্ষেত্রে আমাদের শুভবুদ্ধি যেন বিচলিত না হয়।

আমরা যে-সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তা মোটামুটি এই : [১] কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে কোন্ ভাষায় কাজকর্ম চলবে ; [২] কেন্দ্রীয় সরকার ও

রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে কোন্ ভাষার মাধ্যমে আদানপ্রদান চলবে ; [৩] আন্তঃ-রাজ্য যোগাযোগ ও আদানপ্রদানের ভাষা কী হবে ; [৪] রাজ্যের অন্তর্গত হাইকোর্ট পর্যন্ত আদালতে কোন্ ভাষা ব্যবহৃত হবে এবং সুপ্রীম কোর্টেই বা কোন্ ভাষা গৃহীত হবে ; [৫] পার্লামেণ্ট ও রাজ্যের আইন-সভাগুলিতে কোন্ ভাষা ব্যবহার করা হবে ; [৬] শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহন হবে কোন্ ভাষা ; [৭] সর্ব-ভারতীয় চাকুরির জন্মে যে-পরীক্ষা গৃহীত হবে সেখানে কোন্ ভাষাকে আমরা মাধ্যমরূপে গ্রহণ করব ; [৮] বিভিন্ন রাজ্যের লোক পরস্পরের সঙ্গে কোন্ ভাষায় কথাবার্তা বলবে, কাজকারবার চালাবে ; [৯] আন্তর্জাতিক আদানপ্রদান ও কাজকারবারের ব্যাপারে ভারতবাসীর কোন্ বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করা উচিত। এতেই বোঝা যাবে, ভারত রাষ্ট্রের ভাষাগত প্রশ্নটি কতখানি জটিল।

ভাষাগত সমস্যাটির পরিচয়

কেউ কেউ প্রস্তাব করেছেন, হিন্দী ইংরেজির সমকক্ষ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত ইংরেজিকে ভারতের সরকারী ভাষা করা হোক। আবার, কেউ কেউ প্রশাসনিক ও শিক্ষাব্যাপারে ইংরেজিকে চিরস্থায়ী করে রাখবার পক্ষপাতী। তাঁদের প্রধান যুক্তি হল, ইংরেজি ভাষা এদেশে গত দেড়শ বছর ধরে চলে আসছে, মোটামুটিভাবে দেশবাসী এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। তা ছাড়া, ইংরেজি পৃথিবীতে সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী ভাষা এবং আন্তর্জাতিক ভাষাও বটে। কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় ইংরেজিকে চিরস্থায়ী করে রাখবার এই প্রস্তাব সমর্থন করতে পারেননি, কারণ এরূপ একটি প্রস্তাব কিছুতেই সমর্থিত হতে পারে না। যে-ভাষা রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষারূপে গৃহীত হবে তার সঙ্গে দেশের বহুসংখ্যক সাধারণ মানুষের পরিচয়ের প্রয়োজন। যে-ভাষার সঙ্গে মুষ্টিমেয় দেশবাসী পরিচিত, যার প্রকৃতি ভারতীয় ভাষার প্রকৃতি হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তা কখনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে চিরকালীন সরকারী ভাষাহিসেবে গ্রহণীয় হতে পারে না। কারণ, এখানে স্বাদেশিকতা ও জাতীয় আত্মসম্মানের প্রশ্ন জড়িত। অবশ্য ইংরেজির মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে অনেকেরই আপত্তি নেই। দেশীয় কোনো ভাষার সর্বভারতীয় ভাষারূপে গৃহীত হবার যথাযোগ্য শক্তিসামর্থ অর্জন করবার জন্যে আমাদিগকে কিছুকাল অপেক্ষা করতেই হবে। হিন্দী ভাষার সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে অনেকে স্থিতাবস্থা চেয়েছেন। বস্তুত, বর্তমান অবস্থায় নানাকারণে ইংরেজিকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু ভাষাসমস্যার স্থায়ী সমাধান এর মধ্যে কোথায় ?

ভাষার বিষয়ে বিভিন্ন মহলের প্রস্তাব : ইংরেজির সমর্থন

তাই কেউ কেউ সরকারী ভাষাব্যাপারে একাধিক ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করবার কথা বলেছেন। বর্তমান পৃথিবীতে দ্বিভাষিক-ত্রিভাষিক দেশও তো রয়েছে। ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রে যদি এরূপ ব্যবস্থা চলতে পারে, ভারতবর্ষে তা চলবে না কেন? এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, ভারতে বহু আঞ্চলিক ভাষা [সংস্কৃত ও উর্দু বাদে ১২টি ভাষা] রয়েছে। এদের সবগুলিকেই কি ভারত-ইউনিয়নের সরকারী-ভাষা-হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, ভারতরাষ্ট্রকে কয়েকটি ভাষা-অঞ্চলে বিভক্ত করা হোক। এরূপ অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত উন্নত ভাষা যেটি তাকে যদি ওই অঞ্চলভুক্ত ভাষায় প্রতিনিধিস্থানীয় বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে ভাষাসমস্যার মীমাংসা হতে পারে। এখানে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের প্রস্তাবটি স্মর্তব্য। তিনি বলেছেন, দেশের বর্তমান ভাষাসংকট হতে পরিত্রাণলাভের সুষ্ঠু উপায় হচ্ছে ভারতের চতুষ্প্রান্তের প্রতিনিধি-ভাষারূপে একই সঙ্গে কেন্দ্রে বাংলা, হিন্দী, তামিল ও মারাঠী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে অনুমোদন করা এবং সেই সঙ্গে কিয়ৎকাল ইংরেজিকে বহাল রাখা। এক্ষেত্রে প্রাদেশিকতা বর্জন করতে হবে, ভাষাগত বিদ্বেষভাব পোষণ করা চলবে না, জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি সকলের দৃষ্টি রাখতে হবে। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, হিন্দীভাষীরা সংখ্যায় বেশি বলে হিন্দীর গণ্ডী একটু প্রশস্ততর হলেও, এই ভাষাটিও একটি আঞ্চলিক ভাষা-মাত্র। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সরকারী কাজকর্মে বিবিধপ্রকার বিশৃঙ্খলাসৃষ্টির আশঙ্কাই বেশি।

আর-একটি প্রস্তাব : একাধিক ভারতীয় ভাষাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা দেওয়া হোক

পক্ষান্তরে, একদল চিন্তানায়ক সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা বা সরকারী ভাষারূপে প্রবর্তন করবার জন্যে আন্দোলন সুরু করেছেন। তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন, সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রাগ্ইসলাম যুগ পর্যন্ত সমৃদ্ধ সংস্কৃতই ছিল সর্বভারতের রাষ্ট্রভাষা। মুসলমান-আমলেও সংস্কৃতির ভাষা-হিসেবে ভারতের প্রায় সর্বত্রই এ ভাষাটির প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত নিঃসন্দেহে একটি ঐশ্বর্যবান ভাষা। এর ব্যাকরণকে কিছুটা সরল করে নিলে এর চর্চা ও প্রয়োগ সহজসাধ্য হয়ে উঠবে। সংস্কৃতের দাবী সম্পর্কে আরো জোরালো যুক্তি তাঁরা প্রদর্শন করেছেন। অধিকাংশ আধুনিক ভারতীয় ভাষার মূল উৎস সংস্কৃত। এসব ভাষা সংস্কৃত-প্রাকৃত শব্দের দ্বারা পুষ্ট। তা ছাড়া, ভারতবর্ষের বেশির ভাগ অধিবাসী এখনো তাদের সামাজিক নানা ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করেন সংস্কৃতের মাধ্যমে।

কোনো কোনো মহলে সংস্কৃত ভাষাকে সমর্থন

কাজেই একে সর্বভারতীয় ঐক্যের প্রতীক-হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে তেমন কোনো আপত্তি উঠতে পারে না। শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে যদি সংস্কৃতের অনুশীলন হয় তাহলে অল্পকালের মধ্যে এই ভাষাটির সঙ্গে সকলে পরিচিত হয়ে উঠবে। সংস্কৃতের সপক্ষে আরো দুএকটা কথা বলা যায়। পৃথিবীর প্রাচীন ভাষা ও আধুনিক ভাষার মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত ভাষা-হিসেবে সংস্কৃতের স্থান নিঃসংশয়ে সর্বোচ্চে। এর বিপুল শব্দভাণ্ডার ও ব্যাকরণের সৃজনীশক্তি শুধু যে মনের ভাবকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারে তা নয়, পারিভাষিক প্রয়োজনও অতি সহজে মিটাতে পারে। অধুনা যে-ভাষাসংকট দেখা দিয়েছে তা থেকে পরিত্রাণলাভের সূত্র এই সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই নিহিত রয়েছে, মনে হয়। হিন্দীর অপুষ্টতা ও একটি বিশেষ অঞ্চলের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা-প্রাপ্তির আশঙ্কা, ইংরেজি ভাষাকে আঁকড়ে থাকার মধ্যে জাতীয় জীবনের অবমাননা, একাধিক ভারতীয় ভাষানির্বাচনে নানা অসুবিধে—এসমস্ত জটিলতার সবকিছুই দূর হয় সংস্কৃতকে সরকারী ভাষার মর্যাদা দিলে।

কিন্তু সংস্কৃতের বিরুদ্ধবাদীর সংখ্যাও কম নয়। তাঁরা বলবেন, মৃত না-হোক, সংস্কৃত বহুকালের সুপ্ত একটি ভাষা—প্রায় একহাজার বছরের পুরানো। আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে এর চর্চা ধীরে ধীরে কমে এসে মুষ্টিমেয় পণ্ডিত-সমাজের সীমায় এসে ঠেকেছে। সেই নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে তা নিজের প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, ফলে তার পূর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটেনি। ইতোমধ্যে যুগ ও জীবনে দ্রুত রূপান্তর এসেছে, বাস্তব সংসার অতিশয় জটিল হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় সংস্কৃত আধুনিক পৃথিবীর সর্ববিধ প্রয়োজন মিটাতে পারবে না। এ ভাষা কোথায় পাবে উপযুক্ত শব্দসম্ভার, কোথায় এর প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্য? তাছাড়া, এরূপ একটি ব্যাকরণমুখী ভাষাশিক্ষার অসুবিধেও বিস্তর, এ অসুবিধে উত্তীর্ণ হওয়া নিশ্চয়ই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। আরো কথা হল, কেউ কেউ হয়তো সংস্কৃতকে তাদের আদিভাষারূপে মেনে নিতে চাইবে না। আবার, সংখ্যায় স্বল্প হলেও, ভারতীয় জনগণের একটি অংশ এই ভাষাটির মধ্যে হিন্দুয়ানীর স্পর্শ খুঁজে বার করবে। এসমস্ত মনস্তাত্ত্বিক ও বাস্তব অসুবিধের কারণে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন জয়যুক্ত হবে বলে মনে হয় না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই ভাষাসমস্যাটির সমাধান সহজে হবার নয়। আমাদের মতে, বর্তমানে কয়েক বৎসর স্থিতাবস্থাই চলতে থাকুক। কেন্দ্রে ইংরেজির সঙ্গে আঞ্চলিক ভিত্তিতে চার-পাঁচটি দেশীয় ভাষাকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করা হোক। এই অবসরে এগুলির মধ্যে যে-ভাষাটি সবচেয়ে পরিপুষ্ট

হয়ে উঠবে তাকেই ভবিষ্যতে কেন্দ্রে সরকারী ভাষাহিসেবে গ্রহণ করা হবে। আর, এসব ভাষার উন্নতির অবস্থা যদি একই প্রকার হয় তাহলে একাধিক ভাষা সরকারী ভাষার মর্যাদা পাবে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে, এবং আন্তঃরাজ্যের মধ্যে ইংরেজি ভাষা ও সেই-সেই রাজ্যের মাতৃভাষা অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে আদানপ্রদান চলতে পারে। রাজ্যের অন্তর্গতহাইকোর্ট পর্যন্ত আদালতের রায়, ডিক্রি ইত্যাদি আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত হোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষা ও সর্বপ্রকার পরীক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে হওয়া উচিত। এতে অবশ্য ইংরেজি ভাষার প্রসার কিছুটা সংকুচিত হবে, কিন্তু ইংরেজিকে উপেক্ষা করার কথা এটা নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষার স্থান দিতে হবে। তবে যারা স্নাতক হতে চায় তাদের মোটামুটি ইংরেজির জ্ঞান থাকলেই চলবে। ইংরেজি ভাষায় সকলেই সুপণ্ডিত হয়ে উঠবে, এরূপ আশা করাটা বাস্তববুদ্ধির পরিচায়ক নয়। ইংরেজির প্রভূত জ্ঞান যাদের অভিলষিত তারা নিজের উদ্যমেই এ ভাষাটির অনুশীলন করবে। সর্বভারতীয় সরকারী চাকুরির জন্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা-ব্যাপারে ইংরেজির সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃভাষার বিকল্প ব্যবস্থা থাকবে। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায়, আদালতে, আইনসভায় হিন্দীর বিকল্প ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে। আন্তর্জাতিক আদানপ্রদান ও যোগাযোগরক্ষা-ব্যাপারে ইংরেজিকে অবশ্যই মাধ্যম করতে হবে। বিদেশের জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রেও অতিসমৃদ্ধ ইংরেজি ভাষা অপরিহার্য। বিদেশী ভাষা বলে একে কিছুতেই বাদ দেওয়া চলবে না।

আমাদের প্রস্তাব

বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে কোনো ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার বাহন করবার পূর্বে তার উন্নয়নের প্রস্তুতির জন্যে কিছুটা সময় দিতে হবে। তাড়াহুড়া করে ইংরেজি-বিতাড়নের পক্ষপাতী আমরা নই। আবার, ব্রিটিশ-আমলের মতো ইংরেজির একাধিপত্যও কদাপি কাম্য হতে পারে না। কাজেই বর্তমানে একটা মধ্যপন্থা আমাদের খুঁজে নিতে হবে। ইংরেজির গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েই মাতৃভাষার হৃতগৌরব আমরা পুনরুদ্ধার করতে চাই। প্রথমে যত্নসহকারে আমরা মাতৃভাষা শিখব, তারপর ইংরেজি। আপাতত হিন্দীশিক্ষা স্বেচ্ছামূলক হোক। বর্তমান অবস্থায় বাধ্যতামূলকভাবে সকলের ওপর হিন্দীর গুরুভার চাপানোর কোনো প্রয়োজন নেই, সার্থকতাও নেই।

আসল কথা, অদূর ভবিষ্যতে ভারতরাষ্ট্রে মাতৃভাষা ও ইংরেজি এবং হিন্দীর স্থান কীরূপ হবে তা গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে—

একটা সিদ্ধান্তে আমাদের পৌছতেই হবে। কোনো বিশেষ ভাষার প্রতি বিদ্বেষ নয়, কোনো বিশেষ ভাষার প্রতি অন্ধমোহও নয়—জাতীয় জীবনের বৃহত্তর কল্যাণই সকলের কাম্য হওয়া উচিত। গায়ের জোরে কোনো ভাষাকে চালু করতে গেলে তাতে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হবে—হিন্দীপ্রচারের অত্যুৎসাহ এবং তজ্জনিত নানা রাজ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি এই সত্যটির প্রতিই অঙ্গুলিসংকেত করছে। বৈচিত্র্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে যে-ঐক্য গড়ে উঠবে তারই স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত। সুতরাং ভাষার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিহার করা হোক। এখানে আরো একটি কথা বলা যেতে পারে। ভাষাসমস্যার চেয়ে বহু গুরুতর সমস্যা চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে ধরেছে—অন্নবস্ত্রসমস্যা, শিক্ষার সমস্যা, বাসস্থানের সমস্যা, কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের সমস্যা, ইত্যাদি। আগে এসকল সমস্যার সমাধান হোক, জাতির মানসিক স্থৈর্য ফিরে আসুক, পুঞ্জীভূত দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাক—জনগণের চিত্তে শুভবোধের উদ্বোধন ঘটুক। তারপর সেই অগ্রগতির মুখে ভাষাসমস্যাটিরও একটা মীমাংসা হয়ে যাবে। বড়ো কাজ সাত-তাড়াতাড়িতে কখনো সুসম্পন্ন হয় না। হিন্দুস্থানীতে একটি কথা আছে—'জলদীকা কাম শয়তানকা'; ইংরেজিতে বলা হয়—'Haste is waste'। আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এই প্রবচন মনে রাখলে ভারতীয় মহাজাতির উপকার হবে, আর, ইদানীং যে-তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে তা-ও ধীরে ধীরে কমে আসবে। আমাদের সর্বশেষ কথা, ক্ষমতার অপপ্রয়োগ অত্যাচারের নামান্তর-মাত্র, এবং এর প্রতিক্রিয়া হবে অত্যন্ত ভয়াবহ ও শোচনীয়। ভারতরাষ্ট্রের পরিচালকগোষ্ঠী এ সত্যটি যদি মনে রাখেন, তা হলে সর্বৈব মঙ্গল।

উপসংহার

বিশ্বশান্তিপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের দান

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** ভারতীয় জীবনদৃষ্টির উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য—বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রনীতি ও তার অতীত ঐতিহ্য—সাম্প্রতিক পৃথিবীতে ভারতের নিরপেক্ষ নীতি—ভারতবর্ষের আচরণে ওই নীতির প্রভাব—ভারতের অনুসৃত রাষ্ট্রনীতির সুস্পষ্ট ঘোষণা—ভারতের বলিষ্ঠ আদর্শবাদ ও বাস্তব ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ—শান্তিরক্ষাপ্রচেষ্টায় ভারতের আন্তরিকতার প্রমাণ—উপসংহার]

ভারতীয় জীবনদৃষ্টির উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য

ভারতবর্ষের চিন্তাধারা ও জীবনচর্যার বিশিষ্টতা তাকে এমন একটি উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য দান করেছে যা কারো দৃষ্টি এড়াবার নয়। তার এই বিলক্ষণ স্বতন্ত্রতার মূলে রয়েছে তার যুগপ্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক অনবচ্ছিন্ন ধারা। কথাটিকে একটু ঘুরিয়ে বললে দাঁড়ায়—ভারতের সুদীর্ঘকালের ইতিহাস তার বিশিষ্ট মানসপ্রকৃতিরই বহিরঙ্গ অভিব্যক্তি। ভাবজীবনের দিক থেকে দেখলে পৃথিবীর অপরাপর দেশগুলির তুলনায় ভারতবর্ষকে কিছুটা অধ্যাত্মপ্রবণ বলা যেতে পারে। এই মানসপ্রবণতার স্বাতন্ত্র্য তাকে অন্তর্মুখী করে তুলেছে, ভোগসর্বস্ব স্থূল জৈব জীবনের ঊর্ধ্বচারী করেছে, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনায় দীক্ষা দিয়েছে। যে-জাতির ধ্যানধারণায় সবচেয়ে বড়ো কথা হল চিরন্তন 'মানবসত্য', সে-জাতির জীবনে জিগীষা ও জিঘাংসা স্থান পেতে পারে না, দস্যুতা ও লুণ্ঠনবৃত্তির প্রতি তার অভিরুচি থাকবার কথা নয়। তাই দেখি, পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন জাতি যখন অতিশয় স্থূল সুখস্বাচ্ছন্দ্যের তাড়নায় বাইরে নতুন নতুন দেশ-আবিষ্কারে ছুটেছে, পররাজ্য-আক্রমণ ও হিংস্র লুণ্ঠনকার্যে ব্যাপৃত হয়েছে, জাতিবৈষম্য-বর্ণবৈষম্য-ঘৃণা-বিদ্বেষের বিষবাষ্প ছড়িয়েছে দিকে দিকে, তখন ভারতের মনীষা আত্মপ্রকাশ করেছে সাহিত্যে-দর্শনে, আধ্যাত্মিক অনুশীলনে, সাম্য-মৈত্রী ও শান্তির বাণীতে। উচ্চতর জীবনদর্শন ভারতের জীবনাদর্শ ও সমস্ত ক্রিয়াকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ভারতীয় জীবনসাধনার চরম ফলশ্রুতি বিশ্বৈক্যানুভূতি। সাম্য, মৈত্রী, অহিংসা, পরের ধর্ম ও পরের বিশ্বাসের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা এবং সর্বোপরি শান্তির বাণীপ্রচার এই বিশ্বানুভূতির প্রকাশমাত্র। মহামানব বুদ্ধ হতে আরম্ভ করে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত সকল লোকগুরু, সকল লোকনেতাই প্রচার করে গেছেন অহিংসা, তিতিক্ষা, ত্যাগধর্ম, শান্তি ও মৈত্রীর বাণী। এ শিক্ষা বংশানুক্রমিকভাবে আমাদের রক্তের সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে। এই শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারের জন্যে ভারতবাসী সত্যিই

গৌরবান্বিত। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, হিন্দুবৌদ্ধযুগের আশ্চর্য সমৃদ্ধির কালে—নিঃসংশয়িত শক্তিমত্তার দিনেও—সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অভিযান ছাড়া ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদী-মনোভাবপ্রসূত সামরিক কোনো অভিযানে আত্মনিয়োগ করেনি।

বর্তমান ভারত অতীতের এই মহান ঐতিহ্যেরই ধারক ও বাহক। স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতেও এর প্রভাব অতিশয় স্পষ্ট। শান্তিকামী প্রজাতন্ত্রী ভারতবর্ষ আধুনিক বিশ্বের রাজনীতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করতে চলেছে। ভারতকে শান্তির সৈনিকমূর্তিতে দেখে গোটা দুনিয়া বিস্ময়সচকিত হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ অল্প কয়েক বৎসরের ঘটনামাত্র। কিন্তু এরই মধ্যে তার মানবতাদীপ্ত বিঘোষিত বাণী পৃথিবীর দূরদূরান্তরে পৌঁছে গেছে, তার অতুলন মর্যাদা অতিশয় প্রেক্ষণীয় বস্তু হয়ে উঠেছে।

বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রনীতি ও তার অতীত ঐতিহ্য

স্বাধীন হয়ে উঠবার পর থেকে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ভারত স্বাতন্ত্র্যোজ্জ্বল অভিনব এক নীতি অনুসরণ করে চলেছে। উনিশ-শ সাতচল্লিশের পরবর্তী সময়ের দিকে একবার দৃষ্টি ফেরানো যাক্। ভারত যখন বৃটিশের কবলমুক্ত হল তখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ধীরে ধীরে জটিল হয়ে উঠছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে-আমেরিকা ও রাশিয়া পরস্পর হাত মিলিয়ে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, যুদ্ধাবসানে সেই আমেরিকা-রাশিয়া দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল। উভয়ের রাজনীতিক আদর্শ ও বিশ্বাসে কোনো মিল নেই। কাজেই পরস্পর পরস্পরকে দেখতে আরম্ভ করল ভীতি ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে। কথা ছিল, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে তারা নিজেদের সেনাবাহিনী ভেঙে দেবে, অস্ত্রসম্ভার কমিয়ে ফেলবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, তারা চলেছে এর বিপরীত দিকে। এ দুটি দেশ সাংঘাতিক যুদ্ধাস্ত্রনির্মাণে মেতে উঠল, রণোন্মত্ততা তাদের পেয়ে বসল—সুরু হল ঠাণ্ডা লড়াই। যুদ্ধের উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, সম্মিলিত জাতিসংঘ [U. N. O.] একে প্রশমিত করতে সক্ষম হল না। এই স্নায়ুযুদ্ধের [cold war] প্রতিক্রিয়া কিন্তু দূরপ্রসারী, পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের কাছে এ যেন আতঙ্কপাণ্ডুর এক দুঃস্বপ্ন। এহেন প্রতপ্ত রাজনীতিক আবহাওয়ার মধ্যে অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত, সাম্য ও মৈত্রীর সাধক ভারতবর্ষ অবিচলিত রইল। সে ঘোষণা করল নিজের নিরপেক্ষ-নীতি। পৃথিবীর উক্ত বৃহৎ দুটি শক্তিকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিল—কোনো শিবিরে সে যোগদান করবে না। যুদ্ধের মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠা যাদের কাম্য, তাদের হাতে হাত মেলানো ভারতের পক্ষে কদাপি সম্ভব নয়। সংগ্রামের পক্ষে পদক্ষেপ করে আত্মভ্রষ্ট হতে চায় না সে।

ভারতের এই নিরপেক্ষ-নীতি [neutrality] পশ্চিমের রাজনীতি-বিশারদদের ভালো লাগল না, পৃথিবীর শক্তিস্পর্ধিত কয়েকটি জাতি ভারতবর্ষের মনোভঙ্গিকে সম্যকরূপে বুঝতে পারল না কিংবা বুঝতে চাইল না। তারা বলল, রাজনীতির ঘূর্ণীচক্রে আলোড়িত বর্তমান দুনিয়ায় নিঃসঙ্গতার পথ বেছে নিয়ে ভারতবর্ষ আত্মহত্যার পথটিই প্রশস্ত করে তুলছে। এর উত্তরে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, মহাত্মা গান্ধীর ভাবশিষ্য, শ্রীনেহেরু উচ্চকণ্ঠে বললেন : 'India has an individuality and soul, not of today but of the 2,000 years. We have a mind of our own and we have a soul and spirit of our own. Regardless of what we are, some may have misunderstanding of what India has been and is going to be in future. But India will pursue her own independent policy.' কথাগুলো গভীর তাৎপর্য-মণ্ডিত। ভারতবর্ষ উপলব্ধি করেছে, যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে নিরুদ্বেগ শান্তিই আজ সবচেয়ে কাম্য বস্তু। বিশেষ করে, যে-সব জাতি এই সবেমাত্র স্বাধীনতা অর্জন করেছে, অধুনা শান্তিপ্রতিষ্ঠার চিন্তা ছাড়া আর কোনো চিন্তাই তাদের মনে জাগতে পারে না, জাগাটা স্বাভাবিকও নয়। ভারত দরিদ্র দেশ, আর্থনীতিক ক্ষেত্রে সে দুর্বল, শিল্পের ক্ষেত্রে অনগ্রসর, বহুতর সমস্যা চারপাশ হতে তাকে ঘিরে রয়েছে। এরূপ অবস্থায়, শান্তি বিঘ্নিত হলে, যুদ্ধের উন্মাদনা-গ্রস্ত হলে, কোনো সমস্যারই সমাধান সে করতে পারবে না। তা ছাড়া, তার সামরিক শক্তি নিতান্ত স্বল্প, এবং মারণাস্ত্রনির্মাণের প্রতিযোগিতায় নামবার ইচ্ছাও তার নেই, উপকরণেরও একান্ত অভাব। সুতরাং কী নীতির দিক দিয়ে, কী বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে সর্বৈব যুদ্ধবর্জনই তার পক্ষে শ্রেয়। নিজের বলিষ্ঠ আদর্শবাদের প্রেরণাবশে এবং জাগতিক পরিবেশের দিকে তাকিয়ে ভারত শান্তি, অহিংসা ও অপরাপর জাতির বন্ধুত্বের পথই বেছে নিয়েছে।

সাম্প্রতিক পৃথিবীতে ভারতের নিরপেক্ষ-নীতি

ভারতীয় সংবিধানের রাষ্ট্রনীতি-সম্পর্কীয় নির্দেশক সূচনায় বলা হয়েছে যে, ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করতে চেষ্টা করবে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্মানজনক, ন্যায়ানুমোদিত সম্বন্ধ রক্ষা করে চলবে, আন্তর্জাতিক বিবাদ সালিশীর মাধ্যমে মীমাংসা করবার প্রয়াসী হবে। সংবিধানের এই সূচনায় ভারতের অনুসরণীয় পররাষ্ট্রনীতির সুস্পষ্ট ছায়াপাত হয়েছে। এই কারণে সামরিক জোটে সে যোগ দিতে পারে না, সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়ে যুদ্ধ-

ভারতবর্ষের আচরণে ওই নীতির প্রভাব

সজ্জায় সজ্জিত হওয়া তার আদর্শ ও নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। রণোন্মাদ পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠাকল্পে ভারত 'পঞ্চশীল'-নামে গঠনমূলক একটি কার্যসূচী বড়োছোট রাষ্ট্রগুলির সমক্ষে তুলে ধরেছে। একে সার্থক করে তুলবার জন্যে সে ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা রাষ্ট্রের সঙ্গে কথা কইছে, খ্যাতিমান রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে শান্তিস্থাপনের নতুন পথ সৃষ্টি করে চলেছে।

ভারতের অনুসৃত রাষ্ট্রনীতির সুস্পষ্ট ঘোষণা

যুদ্ধের প্রধান প্রধান কারণগুলো ভারত অভিনিবেশসহকারে বিশ্লেষণ করে দেখেছে। আর্থনীতিক সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণ, উপনিবেশ স্থাপন করে অনগ্রসর জাতিসমূহের ওপর আধিপত্যবিস্তার এবং সাম্রাজ্যবাদী পন্থায় তাদের শাসন, অপরের রাজনীতিক আদর্শ ও বিশ্বাস সম্পর্কে সহনশীলতার অভাব, জাতিবিদ্বেষ ও বর্ণবৈষম্য—যুদ্ধের মূলে এগুলিই তো সক্রিয় রয়েছে। স্বাধীনতালাভের পর ভারতবর্ষ যখন নিজের নিরপেক্ষতা ঘোষণা করল তখন সে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল, কী রাজনীতিক, কী আর্থনীতিক—কোনোপ্রকার শোষণই তার সমর্থনীয় নয়। স্বায়ত্তশাসনের সমর্থক সে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতির স্বাধীনতাই তার কাম্য। ঔপনিবেশিক শাসন ও সাম্রাজ্যবাদ কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না—এশিয়া ও আফ্রিকায় এরূপ শাসনের দিন শেষ হয়ে এসেছে, এ সত্যটি পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠী যথাসত্বর যেন বুঝে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ এও বলেছে, সমাজজীবনে ও রাষ্ট্রিক জীবনে বিভিন্ন মতবাদের প্রতিষ্ঠা মারাত্মক কিছুই নয়। মস্তবড়ো এই পৃথিবী, এখানে গণতন্ত্র [Democracy] ও সাম্যবাদের [Communism] পাশাপাশি স্থান হতে পারে। এদের শান্তিপূর্ণ-সহ-অবস্থিতিকে সম্ভব করে তোলার বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য। আর, এই শান্তিপূর্ণ-সহ-অবস্থিতি ভারতের প্রচারিত 'পঞ্চশীল'-এর অন্তর্ভুক্ত একটি নীতি। উপরি-উক্ত মনোভঙ্গির প্রেরণায় শ্রীনেহেরু বলেছেন: 'India does not propose to join any camp or alliance. But we wish to co-operate with all in the quest for peace and security and human brotherhood.' তারপর, 'পঞ্চশীল' সম্বন্ধে এবং ভারতের নিঃসঙ্গতার আশঙ্কা-প্রসঙ্গে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য হল: "We welcome association and friendship with all and the flow of thought and ideas of all kinds, but we reserve the right to choose our own path. That is the essence of 'Panchashil'." এই 'পঞ্চশীল'-কে অনেকে নিষ্ক্রিয়তার পথ বলে ভুল করেছে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে

নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ মনে করেছে। সকলের জেনে রাখা উচিত, নৈষ্কর্ম্য বা কূর্মবৃত্তি ভারতের ঐতিহ্যবিরোধী। এখন বুঝবার সময় এসেছে, ভারতবর্ষ কেবল শান্তির দূতমাত্র নয়, শান্তির শক্তিমান সৈনিকও সে। প্রদীপ্ত মানবতার আদর্শ যাকে প্রাণিত করেছে, দ্বন্দ্বকুটিল জগতের রণাঙ্গন থেকে তার অপসরণ কখনো সম্ভব হতে পারে না, বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর অনির্বাণ সেবার দিকেই তার সজাগ লক্ষ্য সন্নিবদ্ধ। ভারতের 'পঞ্চশীল' কিংবা নিরপেক্ষতা-নীতি যে কোনোরূপ নিষ্ক্রিয়তা নয়, এ সম্বন্ধে আমেরিকায় বক্তৃতাকালে শ্রীনেহেরু সর্বসাধারণকে জানিয়েছেন : 'Whether we want or not, we realise that we simply cannot exist in isolation. No country can, certainly we cannot. Our geography, our history, present events, all drag us into a wider picture.' ভারতের কর্মপন্থার মধ্যে যুদ্ধের ডঙ্কা-নিনাদ নেই, এবং বোধ করি এ কারণেই তার নিঃশব্দ অগ্রসরণ কারো কারো-বা চোখে পড়ছে না। এসব দৃষ্টিহারা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় : 'Peace hath her glories no less than war'।

ভারতের বলিষ্ঠ আদর্শবাদ ও বাস্তব ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ

উচ্চতর আদর্শের ফাঁকা বুলি আওড়িয়ে ভারতবর্ষ বিশ্বের সম্ভ্রম আকর্ষণ করতে চায়নি, তার কথায় ও কাজে এতটুকু ব্যবধান নেই। এর প্রমাণ—শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল তার পররাষ্ট্রনীতি। কোরিয়া, ইন্দোচীন, সুয়েজ-এলাকা—শান্তিপ্রতিষ্ঠার গুরু দায়িত্ব যেখানে ভারতের উপর ন্যস্ত হয়েছে সেখানেই ভারত সানন্দে তা গ্রহণ করেছে। এশিয়া ও আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভারতবর্ষ নীরব থাকতে পারেনি। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-অর্জনের ক্ষেত্রে ভারতের নীতির দান সামান্য নয়। অক্লান্ত চেষ্টায় ভারত ইন্দোচীন ও কোরিয়ায় রক্তক্ষরা যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছে। প্রজাতন্ত্রী সাম্যবাদী চীনসরকারকে স্বীকার করে নিতে ভারতবর্ষ এতটুকু দ্বিধান্বিত হয়নি। সম্মিলিত জাতিসংঘে চীনকে গ্রহণ করার জন্যে ভারত তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে। পৃথিবীর চারটি শক্তিমান রাষ্ট্রের অগ্রনায়কদের নিয়ে ১৯৫৫ সালে জেনেভায় যে-আলাপআলোচনা হল তাও ভারতের উদ্যমপ্রয়াসের ফল। ভারতবর্ষে ফরাসী উপনিবেশ কিছু কিছু ছিল। এসব উপনিবেশ ছাড়তে ভারত ফরাসীদের বাধ্য করেছে, কিন্তু এর জন্যে তাকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়নি। ভারতের বিশ্বশান্তিরক্ষার অগ্নি-পরীক্ষার স্থল হল গোয়া আর কাশ্মীর। সামরিক অভিযানের আশ্রয় নিয়ে এ দুটি স্থানকে ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত করে নেওয়া খুব কঠিন কাজ নয়। কিন্তু অজস্র

প্ররোচনা সত্বেও, নিজের আদর্শের দিকে তাকিয়ে, ভারতবর্ষ যুদ্ধের পথ বেছে নেয়নি। যুদ্ধের মাধ্যমে যে-জয় আসে তা বৃহত্তর যুদ্ধের বীজ রোপণ করে, এ সত্যটি ভারতের অজানা নয়। বর্তমান যুগে যে কোনো খণ্ড সংগ্রামের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বিশ্বসংগ্রামের ভয়ংকর দাবদাহে পরিণত হতে পারে, একথা কাকেও বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয় না। ভারতীয় সামরিক বাহিনীকেও মূলত দেশরক্ষা-বাহিনী বলা যেতে পারে। আক্রান্ত না হলে ভারত কদাচ পররাজ্য আক্রমণ করবে না, এ শুধু বার বার ঘোষণা করেই সে ক্ষান্ত হয়নি, গোয়া ও পাকিস্তান-ব্যাপারে তা বার বার প্রমাণও করেছে।

বিশ্বশান্তিপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসে ভারত শ্রান্তিহীন। এখানে উল্লেখনীয়, ভারতীয় রাষ্ট্রনায়কগণের বিভিন্ন রাষ্ট্রে শুভেচ্ছামূলক ভ্রমণ এবং বিদেশী রাষ্ট্র-প্রধানদের ভারতে সাদর আমন্ত্রণের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় বহু ভীতি, শঙ্কা ও সন্দেহের নিরসন হয়েছে। পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও বুঝাপড়ার ব্যাপারে এই ভ্রমণ, শুভেচ্ছামিশন সাংস্কৃতিক-দলপ্রেরণ ইত্যাদির উপযোগিতা যে কত, বিগত কয়েক বছরে তা পরিষ্কারভাবে বুঝা গিয়েছে। আরো স্মরণ করা যেতে পারে, সম্মিলিত জাতিসংঘে ভারতের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতকে বাদ দিয়ে অধুনা বিশ্বের কোনো বড়ো সমস্যারই সমাধান যে সম্ভব নয়, তার আর-একটি নিশ্চিত প্রমাণ, মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক সংকট, এবং প্রস্তাবিত শীর্ষসম্মেলনে ভারতকে গ্রহণ করার জন্যে আমেরিকা ও ব্রিটেনকে রাশিয়ার অনুরোধজ্ঞাপন। অল্পকালের মধ্যে ভারতবর্ষের সম্ভ্রমমর্যাদা কতখানি বেড়ে গিয়েছে, এইসব ঘটনা তার নির্ভুল পরিচায়ক। ভারতের প্রচারিত 'পঞ্চশীল'-এর মৌলিক ঘোষণা বান্দুং হতে আরম্ভ করে গোটা পৃথিবীতে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে, বহু রাষ্ট্র ওই নীতিকে অকুণ্ঠ সমর্থনও জানিয়েছে। ভারত ও নয়াচীনের প্রধানমন্ত্রীর যৌথ বিবৃতি, ভিয়েৎনাম ও ভারতের যুক্ত ঘোষণা, মার্শাল টিটো ও শ্রীনেহেরুর যৌথ বিবৃতি, মিশর ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি, রাশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন ও শ্রীনেহেরুর সম্মিলিত ঘোষণা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ভারতের শান্তি-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস সুপরিস্ফুট। ইতোমধ্যে কত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক শান্তিবাদী ভারতে পদার্পণ করেছেন, ভবিষ্যতে ভারতভূমিতে আরো কত রাষ্ট্রপ্রধানের শুভ-আগমন ঘটবে। নয়াদিল্লীকে বর্তমান পৃথিবীর সুরক্ষিত শান্তিদুর্গ বলা যেতে পারে। ইন্দোনেশিয়ার সোয়েকার্ণো, আলী সাস্ত্রাওমিদ্‌জোজো, মুহম্মদ হাত্তা, ব্রহ্মদেশের থাকিন নু, ইজিপ্টের কর্ণেল নাসের, চীনের চৌ-এন-লাই এবং শ্রীযুক্তা সান্-

শান্তিরক্ষাপ্রচেষ্টায় ভারতের আন্তরিকতার প্রমাণ

ইয়াংসেন, যুগোশ্লাভিয়ার মার্শাল টিটো, নেপাল ও আরবের রাজা, রাশিয়ার নিকোলাই বুলগানিন আর নিকিতা ক্রুশ্চেভ, জার্মানীর ডিমক্র্যাটিক রিপাব্লিকের ডক্টর ফ্রাঞ্জ ব্লুশার, ইরানের রাজা ও রাণী ভারতের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে নয়াদিল্লীতে এসেছেন, ভারতের সৌহার্দে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁরা ভারতের অনুসৃত নীতির উচ্চপ্রশংসা করেছেন, এবং অধুনা সারা বিশ্বে যে-সামরিক উত্তেজনা চলছে তার প্রশমনে ভারতবর্ষের আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখে তাঁরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারেননি।

উপসংহার

কী আভ্যন্তরীণ সৈন্যসজ্জায়, কী পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োগে, কী বিভিন্ন দেশে শুভেচ্ছাপ্রণোদিত ভ্রমণে, কী সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘে—সর্বত্র বিশ্বশান্তিরক্ষার জন্যে ভারত অতন্দ্রভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নিজের সুবিধে-অসুবিধের দিকে না তাকিয়ে, ভারত বিবদমান আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যবর্তী হয়ে, উভয়কে একটি শান্তিপূর্ণ সৌহার্দস্নিগ্ধ পরিমণ্ডলের মধ্যে আনবার চেষ্টা করছে। এ যে কত বড়ো কঠিন কাজ, তা সকলেরই বিদিত। তবু ভারত এই কঠিন দায়িত্ব এড়িয়ে যায়নি। ভারতবর্ষের এই শান্তিকামনা, তার মহিমাপ্রোজ্জ্বল এই শুভবোধ ভারতীয় ঐতিহ্যেরই আধুনিক অভিব্যক্তি। শান্তির এই সংগ্রামে ভারতের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। যেহেতু ভারতের আদর্শ সমুচ্চ, সেহেতু তার বিশ্বনেতৃত্ব সুনিশ্চিত। প্রাচীন ভারতের তপশ্চর্যালব্ধ পুরাতনী প্রজ্ঞা কখনো ব্যর্থ হবার নয়।

অহিংসাব্রতী সনাতন ভারতবর্ষের নীতি ও আদর্শ জয়যুক্ত হোক।

পঞ্চশীল ঃ শান্তিপূর্ণ-সহ-অবস্থিতি

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—আন্তর্জাতিক রাজনীতির কুটিল চক্রান্ত—ইয়োরোপ ও আফ্রিকার পরিস্থিতি—নবজাগ্রৎ এশিয়া—বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক চুক্তি—'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'—যুদ্ধ-উন্মাদ পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার উপায় ঃ 'পঞ্চশীল'—শ্রীনেহেরুর কল্পিত 'শান্তি-এলাকা'—'পঞ্চশীল'কে বহু রাষ্ট্রের সমর্থন—পঞ্চশীল ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতি—উপসংহার।]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

পঁচিশ বছরের ব্যবধানে সর্বনাশা দুটি বিশ্বযুদ্ধ, পৃথিবীর সভ্য মানুষের ইতিহাসে এ এক অভাবনীয় ঘটনা। দু-দুবার ধরণী রক্তস্নাত হল। যুদ্ধের অবসানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সকলে ভাবল—দুর্যোগের কালো মেঘ কেটে গেল বুঝি, এবার নিশ্চয়ই শান্তির উদার অভ্যুদয় হবে, স্বেদ ও শোণিত পৃথিবীকে আর পরিপ্লাবিত করবে না। কিন্তু বহু-আকাংক্ষিত শান্তি ফিরে এল কৈ, নিরুপদ্রবে ও নিরুদ্বেগে জীবনযাপন করবার উপযুক্ত পরিবেশ রচিত হল কৈ? প্রথম-মহাযুদ্ধ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিল, তা হল না—একনায়কতন্ত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটল কয়েকটি দেশে। তারপর, পঁচিশ বছর যেতে-না-যেতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু। এই যুদ্ধে ইতালী-জার্মানী-জাপান সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হল—একনায়কতন্ত্রের সমাধি রচিত হল। হিটলার-মুসোলিনী জগৎসমক্ষে দুঃস্বপ্নের মতো বিরাজমান ছিলেন, তাঁদের অস্তিত্বও আজ বিলুপ্ত। মিত্রশক্তির গৌরবদীপ্ত সাফল্যে সমস্ত পৃথিবী উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে-উল্লাস বিদ্যুৎবিকাশের মতো একান্ত ক্ষণকালের, তাকে অচিরে গ্রাস করে নিল ভাবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল আশংকার অমারাত্রির ঘনান্ধকার। যুদ্ধসমাপ্তির কিছুকাল পর থেকেই পুনর্বার যুদ্ধাতংক দেখা দিয়েছে, শান্তি-অভিলাষী মানবগোষ্ঠী একান্ত শংকাবিহ্বল হয়ে উঠেছে। অসহায় অবস্থায় পড়ে তারা ভাবছে, দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মানুষের কি মুক্তি নেই—দেখতে দেখতে সারা বিশ্ব যে ভয়াবহ প্রকাণ্ড এক বারুদখানায় পরিণত হতে চলেছে! যদি কখনো বিস্ফোরণ ঘটে তাহলে কী প্রলয়ংকর রূপ ধারণ করবে এর বহ্নিমান প্রকাশ! ভাবতে পারা যায় না। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মানবসভ্যতা যে-নিদারুণ সংকটের সম্মুখীন হয়েছে, মানুষের সুদীর্ঘকালের ইতিবৃত্তে তার তুলনা কেউ খুঁজে পাবে না। সভ্যতার বর্বরতার আত্মঘাতী এই ছিন্নমস্তা-মূর্তি সত্যই অকল্পিত।

পৃথিবী যুদ্ধক্লান্ত, কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি শক্তির দ্বন্দ্বে উন্মত্ত। বর্তমান বিশ্বের বহুতর দেশ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়ে দুটি সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হয়েছে। রণক্ষেত্রে এখন কোথাও তেমন বড়ো কোনো যুদ্ধ হচ্ছে না বটে, কিন্তু বিপজ্জনক স্নায়ুযুদ্ধ বা 'ঠাণ্ডা লড়াই' লেগেই রয়েছে। এর মূলগত কারণ হল ক্ষমতাবিস্তারের প্রচেষ্টা, জাতিতে জাতিতে অবিশ্বাস-সন্দেহ-বিদ্বেষ, রাষ্ট্রের কাঠামো-সম্পর্কিত মতবাদের সাংঘাতিক বিরোধ, সহনশীলতার অভাব। ফলে পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে, দিকে দিকে পূর্ণোদ্যমে সমরপ্রস্তুতি চলছে, একের পর এক ভয়ংকর মারণাস্ত্র-তৈরীর উন্মত্ত প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছে। শক্তিমান রাষ্ট্রগুলি আজ জীবনসাধনায় নয়, শবসাধনায় রত। আজিকার দ্বন্দ্ব গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের দ্বন্দ্ব নয়—ধনতন্ত্র ও সাম্যতন্ত্রের। একদিকে আমেরিকা, অন্যদিকে রাশিয়া, উভয়ের মধ্যে যে সংঘাত দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে, তার যদি অবসান না ঘটে তাহলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য। এই ভাবী যুদ্ধের ভয়াবহতা সাধারণ মানুষের কল্পনারও অতীত। পাঁচ-সাতটি হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটলে যুধ্যমান দেশে মনুষ্যজাতির চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না। এহেন পরমাণু-যুদ্ধের ভীষণতার কথা ভেবে বার্ট্রাণ্ড রাসেল, আইনস্টাইন প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত মনীষী উদাত্তকণ্ঠে যে-সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন, এখানে তা স্মর্তব্য : 'Here then is the problem which we present to you, stark and dreadful and inescapable : shall we put an end to the human race or shall mankind renounce war ?···We appeal as human beings : remember your humanity and forget the rest. If you can do so, the way lies open to a new paradise ; if you cannot, there is before you the risk of universal death.' পৃথিবীর প্রধান প্রধান শক্তিগুলি এ বিষয়ে এখনো সচেতন হয়ে উঠেছে বলে মনে হয় না। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিটি এক-নজরে দেখে নিলেই বুঝতে পারা যাবে, যে-দূষিত রাজনীতির আবর্তে পড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যুদ্ধোত্তর বর্তমান পৃথিবীতেও সেই একই-রূপ কুটিল রাজনৈতিক চক্রান্ত চলছে—যে-কোনো মুহূর্তে সাংঘাতিক লড়াই বেধে যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির কুটিল চক্রান্ত

ইয়োরোপে পরাজিত জার্মানী দ্বিধাবিভক্ত, বিচ্ছিন্ন জার্মানীকে ঐক্যবদ্ধ করার বিষয়ে রাশিয়া ও আমেরিকা অদ্যাবধি একমত হতে পারেনি। সেখানে উভয় শক্তিই নিজ নিজ প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে দৃঢ়সংকল্প। শোষিত নির্যাতিত আফ্রিকা দাসত্বের শৃংখলমোচন

ইয়োরোপে ও আফ্রিকার পরিস্থিতি

করবার জন্যে যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে। সেখানকার কেনিয়া, মরক্কো, আল্‌জেরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে রক্তাক্ত বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে, সংগে সংগে ক্ষমতালুব্ধ ইয়োরোপের শোষণবর্বরতাও চরমে পৌঁছেচে। দক্ষিণ-আফ্রিকায় স্বার্থান্ধ পশ্চিমী শাসকগোষ্ঠীর জঘন্য বর্ণবিদ্বেষ ভারতীয়দের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। শ্বেত-শোষণের বিরুদ্ধে আফ্রিকার দুর্মর বিক্ষোভ ও তার বিপুল গণচেতনা ঔপনিবেশিকদের রীতিমতো দুর্ভাবনাগ্রস্ত করে তুলেছে।

তারপর এশিয়ার নবজাগরণের কথা। ভারত, ব্রহ্ম, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা পেয়েছে। তারা ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির কূটনীতি ও অভিসন্ধিকে ছিন্ন-ভিন্ন করতে বদ্ধপরিকর। মাও-সে-তুং আমেরিকার তাঁবেদার চিয়াং কাইসেককে তাড়িয়ে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠন করেছেন। তাই ধনতন্ত্রী আমেরিকা চীনের প্রতি রক্তচক্ষু হয়ে উঠেছে, বিশ্বরাষ্ট্র-সংস্থায় আমেরিকা স্বাধীন চীনকে সদস্যরূপে গ্রহণ করতে অস্বীকৃত। এই অপমান চীনের বুকে নিদারুণ ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। ফরমোসাকে কেন্দ্র করে যে-কোনো সময়ে চীন ও আমেরিকার মধ্যে সংঘাত শুরু হতে পারে। ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি ঘটলেও সেখানে সাম্রাজ্যবাদের জুয়াখেলা শেষ হয়েছে, এমন কথা বলা চলে না। জাপান আবার মাথা তুলছে। ব্রহ্মদেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। পাকিস্তান ও আমেরিকার মধ্যে সামরিক চুক্তি কাশ্মীরসমস্যাকে অত্যন্ত জটিল করে তুলেছে। গোয়ার মাটিতে পর্তুগীজ শাসকেরা আগুন নিয়ে খেলা করছে, উপনিবেশের মোহান্ধতাবশে পর্তুগাল ভারতের আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে পদদলিত করতে এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত নয়। সুয়েজ খালকে নিয়ে এই সেদিন যে-ভয়াবহ কাণ্ড ঘটল, তার কথা কাহাকেও বোধ করি স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। রাষ্ট্রসংঘ ও আমেরিকার শুভবুদ্ধিকে এজন্য অশেষ ধন্যবাদ।

নবজাগ্রৎ এশিয়া

বিশ্বরাষ্ট্রসংস্থা যদিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মতবিরোধের জন্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর তা সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। এখানেও আমেরিকার সোভিয়েট-আতংকের শেষ নেই। বোধকরি, এজন্যেই বিশ্বরাষ্ট্রসংস্থার পাশ কাটিয়ে আমেরিকা যৌথ নিরাপত্তার [collective security] অজুহাতে 'ন্যাটো', 'মেডো', 'সিয়াটো', 'সিয়াডো', 'আঞ্জুস' ইত্যাদি যুদ্ধজোট গঠন করে চলেছে। রাশিয়াকে চতুষ্পার্শ্ব থেকে ঘেরাও করবার জন্যে—সোভিয়েটের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির ক্রমবিস্তারকে প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করছে। তা ছাড়া, আর্থনীতিক সাহায্যদানের

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক চুক্তি

নাম করে আমেরিকা কতকগুলি দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। আমেরিকার এই সামরিক চক্রান্ত রাশিয়ার কাছে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট। তাই রাশিয়াও চুপ করে বসে নেই, সে-ও ইয়োরোপের কয়েকটি দেশের সংগে মৈত্রীবদ্ধ হয়েছে। এখানে 'ওয়ারশ-চুক্তি'র কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এই চুক্তি উপরে বর্ণিত চুক্তিগুলির যেন প্রত্যুত্তর।

উপরে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যে-সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল তা থেকে বোঝা যায়, পৃথিবীর রাজনীতিক পরিবেশ শান্তির অনুকূল নয়, শক্তির প্রমত্ততা বড়ো বড়ো রাষ্ট্রগুলিকে যেন যুদ্ধোন্মাদ করে তুলেছে। আমেরিকা ও রাশিয়ার পরস্পর-বিরোধী নেতৃত্বের প্রভাবে প্রায় গোটা দুনিয়া দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ছে, দিকে দিকে অস্ত্রসম্ভার-বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা চলছে। এ-ও বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, যে-সব সদ্য-স্বাধীন জাতি মুক্তির স্বাদ পেয়েছে তারা ঔপনিবেশিকদের শোষণ ও উৎপীড়ন আর বরদাস্ত করবে না—এশিয়া ও আফ্রিকার অভ্যুত্থান এই সত্যটির প্রতি অংগুলি-সংকেত করছে। এদের স্বাধীনতা-অপহরণের চেষ্টা করা হলে নিশ্চয়ই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বেধে যাবে। পারস্পরিক সামরিক চুক্তি, নতুন নতুন মারণাস্ত্র-নির্মাণের সর্বনাশা প্রতিযোগিতা কেবল সন্দেহ-অবিশ্বাস-হিংসাকেই পরিপুষ্ট করে তুলছে, বিশ্বের শান্তিকে ব্যাহত করছে। বর্তমানের হিংসা-উন্মত্ত পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার সমস্যাটি যে কী গুরুতর এবং কতখানি জটিল, তা সহজেই অনুমেয়। এই আণবিক যুগে জগতের সমস্ত চিন্তাশীল মানুষকে যে-প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে তা হল : আমরা একসংগে মরতে চাই, না, একসংগে বাঁচতে চাই ? যুদ্ধের পথে পা বাড়ালে সকলের মৃত্যু অবধারিত সত্য, সর্ববিধ্বংসী আণবিক অস্ত্রের হাত থেকে রক্ষা কেউ পাবে না। সকলের সামগ্রিক এই শোচনীয় বিনাশ যদি আমাদের অভিপ্রেত না হয়, আমরা বাঁচতেই যদি চাই, তাহলে কোন্ পথে আমরা পদক্ষেপ করব ?

'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী'

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু এই পথের সন্ধান বিশ্ববাসীকে দিয়েছেন,মৃত্যুর উল্টোপথটি তিনি সকলকে চিনিয়েছেন। সহজ কথায়, বিশ্বশান্তি কী ভাবে রক্ষা করা যেতে পারে, নেহেরুজী তার উপায় নির্দেশ করেছেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'পঞ্চশীল'-এর প্রশস্ত পক্ষপুটে আশ্রয় নিলে বিশ্ববাসীর শোচনীয় বিনাশের আশংকা দূর হয়ে যাবে, সকলে সুখে-শান্তিতে একসংগে বেঁচে থাকতে পারবে। এই যে একসংগে বাঁচার চেষ্টা, তাকে সফল

যুদ্ধ-উন্মাদ পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার উপায় : 'পঞ্চশীল'

করে তুলতে হলে নতুন বোতলে পুরোনো মদ পরিবেশন করা চলবে না, 'যৌথ নিরাপত্তা'র দিকে না তাকিয়ে 'যৌথ শান্তি'র দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করতে হবে, কূটচক্রান্তের নীতি বর্জন করতে হবে, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার উপর দাঁড়াতে হবে। 'পঞ্চশীল'-এর প্রবক্তা শ্রীনেহেরু মানুষের সংগে মানুষের সম্পর্ক ও আচরণের কয়েকটি নতুন নীতি নির্ধারণ করেছেন, একে আন্তর্জাতিক আচরণ-নীতি বলা যেতে পারে। 'পঞ্চশীল'-এর পাঁচটি নীতি এই :

[১] পরস্পরের রাষ্ট্রিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌম অধিকারের প্রতি মর্যাদা-প্রদর্শন ;

[২] পরস্পরকে আক্রমণ থেকে বিরত থাকা ;

[৩] আর্থনীতিক, রাজনীতিক বা আদর্শগত কোনো কারণে অপরের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা ;

[৪] সমানাধিকার ও পারস্পরিক কল্যাণসাধন ; এবং

[৫] শান্তিপূর্ণ-সহ-অবস্থিতি।

গান্ধীজীর জীবনদর্শনের সংগে যাঁদের সামান্য পরিচয় রয়েছে তাঁরা বুঝতে পারবেন, উপরে-কথিত পঞ্চশীল গান্ধীদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নীতিপঞ্চকের মর্মকথা হল—লোভকে আমরা ঘৃণা করব, হিংসাকে আমরা বর্জন করে চলব, পরমত-বিষয়ে সকলে সহিষ্ণু হব, মানবতার অপমান কখনো করব না। বর্তমান বিশ্বে এ্যাটম্ ও হাইড্রোজেন বোমার একমাত্র উত্তর নেহেরুজীর নির্দেশিত, নয়া চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন্-লাই কর্তৃক প্রথম সমর্থিত পঞ্চশীল। দুই-শিবিরে-বিভক্ত সাম্প্রতিক পৃথিবীতে শ্রীনেহেরু একটি 'তৃতীয় এলাকা'র ['third area'] —তৃতীয় শিবিরের ['third bloc'] নয়—কল্পনা করেছেন, এবং তিনি এর নাম রেখেছেন—'শান্তি-এলাকা'। এই শান্তি-এলাকার পরিধিকে ক্রমশ বিস্তৃত করে তোলাই তাঁর মহৎ সংকল্প। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির আদর্শের সংগে পঞ্চশীলের নিগূঢ় সম্পর্কটি কারো দৃষ্টি এড়াবার নয়। ওই নীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্রীনেহেরু বলেছেন : 'আমরা সকল রাষ্ট্রের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। বিশ্বে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য শান্তির প্রতিষ্ঠা। আমরা চাই—জাতিগত বৈষম্যের লোপ হোক, পরাধীন মানুষেরা স্বাধীনতা অর্জন করুক।' উনিশ শ' চুয়ান্ন সালের এপ্রিল মাসে নেহেরুজী লোকসভায় যে-বক্তৃতা দেন তাতে উক্ত নীতি আরো সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে : 'এশিয়ায় বিশেষ কোনো স্থান অধিকারের অভিসন্ধি আমরা রাখি না, এশিয়াকে বিচ্ছিন্ন একটি অঞ্চলরূপে রাখারও পক্ষপাতী আমরা

শ্রীনেহেরুর কল্পিত 'শান্তি-এলাকা'

নই। আমরা শুধু চাই যে, আমরা এবং অপরেরা, বিশেষভাবে আমাদের প্রতিবেশীরা, একটা শান্তি-এলাকার সংগে যুক্ত থাকি এবং বিশ্বে উত্তেজনা ও যুদ্ধের সংগে সংস্রব এড়িয়ে চলি ও পক্ষাবলম্বন-বর্জনের নীতি অনুসরণ করি। আমাদের বিশ্বাস যে, এতেই আমাদের কল্যাণ হবে, এবং এর ফলে বিশ্বে সমরোত্তেজনা ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের মত্ততা হ্রাস পাবে এবং পরিণামে বিশ্বশান্তির পথ সুগম হয়ে উঠবে।' উক্ত ঘোষণার মধ্যে এতটুকু অস্পষ্টতা কোথাও নেই।

বর্তমানের যুদ্ধক্লান্ত পৃথিবীতে জনমত যে শান্তির অনুকূলে প্রবাহিত, কোটি কোটি মানুষ যে নিরুদ্বেগ শান্তির অভিলাষী, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতি যে অধিকাংশ মানুষেরই কাম্য, এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নেই। তা যদি না হত, তাহলে 'পঞ্চশীল' কথাটি এত অল্পকালের মধ্যে এশিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকার জনসাধারণের মুখে মুখে এমন করে ছড়িয়ে পড়ত না। ইতোমধ্যেই পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র পঞ্চশীলকে সমর্থন জানিয়েছে। এশিয়াভূমিতে চীন, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, লাওস; মধ্যপ্রাচ্যে মিশর, সৌদি আরব; ইয়োরোপে যুগোশ্লাভিয়া, সোভিয়েট রাশিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ এই নীতির সমর্থক। উনিশ শ' পঞ্চান্ন সালে বিশ্রুত বান্দুং সম্মেলনে পঞ্চশীল এশিয়া ও আফ্রিকার উনত্রিশটি জাতির অকুণ্ঠ অনুমোদন লাভ করেছে।

'পঞ্চশীল'-কে বহু রাষ্ট্রের সমর্থন

পঞ্চশীল-এর শেষ কথা শান্তিপূর্ণ-সহ-অবস্থিতি। এই নীতি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে স্বীকার করে নিয়েছে, বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিকে নিজে বাঁচার এবং অপরকে বাঁচতে দেওয়ার একতম পথ দেখিয়েছে। প্রকৃতির সংসারে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে যদি আমরা মেনে নিতে পারি, তাহলে মানবসংসারেও কেন তা পারব না? মানুষের রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্মে, আর্থনীতিক ব্যবস্থায়, রাজনীতিক মতবাদে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকাটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। তা সত্ত্বেও, যদি কোনো দুরভিসন্ধি না থাকে, তাহলে রাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক সহযোগিতার সূত্রে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে, সুখেতে শান্তিতে অবশ্যই পরস্পর পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে। আমরা যদি পরমতসহিষ্ণু হয়ে উঠি তাহলে দেখতে পাবো ধনতন্ত্র [Capitalism] ও সাম্যতন্ত্রের [Communism] সহ-অবস্থিতির পথে সকল বাধা অপসারিত হয়ে গিয়েছে। আপন আপন সুনির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে উভয়ে যদি আপন আপন কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখতে পারে, তবে সন্দেহ-

পঞ্চশীল ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতি

অবিশ্বাস-ভয়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, পৃথিবীর শান্তিও আর বিঘ্নিত হয় না। এই সত্যটি উপলব্ধি করে শ্রীনেহেরু বলেছেন ঃ 'The peaceful co-existence of Communism and Capitalism is not only possible but is only course to adopt. The alternative to co-existence is crushing an ideology or structure of Government that one does not like, which means war on a world scale.' কিছুকাল পূর্বে সোভিয়েট রাশিয়া বিনাদ্বিধায় স্বীকার করেছে সাম্যতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের সহ-অবস্থিতি অবশ্যই সম্ভব। এ সম্পর্কে আমেরিকার কণ্ঠ হতে কোনো সুস্পষ্ট ঘোষণা অদ্যাবধি শুনতে পাওয়া যায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ সহ-অবস্থিতির নীতিকে যদি স্বীকৃতি জানায়, তবে আমরা জোর গলায় বলতে পারি, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বে যুদ্ধের সম্ভাবনা আর দেখা দেবে না।

পৃথিবীর রাজনীতির আকাশ আজ দুর্যোগের কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। যুদ্ধের আতংক শান্তিকামী মানুষের চিত্তদেশকে নিরন্তর পীড়িত করছে—চারদিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ভয়-সন্দেহ-অবিশ্বাস-বিদ্বেষ-হিংসা—কুটিল কুশ্রীতা। এতে মানুষ দিশাহারা হয়ে পড়েছে, শান্তির পথ তারা খুঁজে পাচ্ছে না। চতুষ্পার্শ্বের এই ঘনান্ধকারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু বিভ্রান্ত মানুষের হাতে তুলে ধরেছেন 'পঞ্চশীল'-এর উজ্জ্বল দীপশিখা। ক্ষমতালোলুপ রাষ্ট্রগুলি তাকে যদি শক্তিস্পর্ধিতার প্রমত্ত ফুৎকারে নিবিয়ে না দেয় তাহলে পঞ্চশীলের শুভ্রস্নিগ্ধ আলো রণশ্রান্ত পৃথিবীকে পরমাশান্তির রাজ্যে পৌঁছিয়ে দেবে। পুরোনো কূটনীতির দিন চলে গেছে, এখন নতুন যুগে সকলকে নতুন কূটনীতির আশ্রয় নিতে হবে, তার নাম—'পঞ্চশীল'। 'শান্তিপূর্ণ-সহ-অবস্থিতি'-নীতিটিকে সমর্থন না করলে বর্তমান পৃথিবীতে রাষ্ট্রগুলির যে সমূহ বিপদ, এ সত্যটি উপলব্ধি করেই যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট টিটো বলেছেন ঃ 'I believe that the world would be saved from a new war catastrophe only if peaceful co-operation is established between States and peoples with different social system.' সর্বশেষে 'শান্তির দূত' শ্রীনেহেরুর সাবধানবাণী সকলকে এখানে স্মরণ করিয়ে দিই ঃ তরবারির সাহায্যে যারা বাঁচতে চাইবে, ওই তরবারিই তাদের মহানিপাতের অতল শূন্যতায় নিক্ষেপ করবে।

উপসংহার

সর্বোদয় পরিকল্পনা ও ভূদান-আন্দোলন

[**রচনার সংকেতসূত্র :** প্রারম্ভিক ভূমিকা—মহাত্মা গান্ধী ও সর্বোদয় সমাজ—সর্বোদয় পরিকল্পনায় গ্রামের প্রাধান্য—পরিকল্পনাটির অভিনবত্ব—বর্তমান পরিকল্পনার আর্থনীতিক পটভূমির স্বরূপ—ভূদান-আন্দোলন : এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য—ভূমিসংস্কারের নতুন পন্থা—ভূদান-আন্দোলনের অগ্রনায়ক—ভূদান-আন্দোলনের শুরু, স্বরূপ ও ক্রমবিস্তার—আচার্য বিনোবা ভাবের সংকল্প—এই আন্দোলনের বিরুদ্ধ-সমালোচনা—উক্ত সমালোচনার সমালোচনা—উপসংহার।]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী নতুন যুগের নতুন সমাজের নতুন মানুষের স্বপ্ন দেখেছিলেন—রামরাজ্যের স্বপ্ন। স্বাধীন ভারতবর্ষে এমন একটি সমাজ গড়ে উঠবে যেখানে কোনো শ্রেণীসংঘাত থাকবে না, জাতিভেদ বা বর্ণভেদ থাকবে না, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চনীচের মধ্যে বিভাগ থাকবে না, কোনোরূপ প্রতিযোগিতা থাকবে না, বৈষম্য থাকবে না। অর্থাৎ, এই নবতন মানবসমাজটি হবে সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত, আত্মঘাতী ভেদবিরহিত, হিংসা-অন্যায়-অবিচারের স্পর্শশূন্য। এর ভিত্তি হবে সমানাধিকার ও সহযোগিতা, একে অনুপ্রাণনা যোগাবে নিত্যকালের মানবসত্য—শুভ্রভাস ন্যায়ধর্ম, অহিংসা, মৈত্রী। প্রত্যেকটি মানুষ এতে আত্মবিকাশের সুযোগ পাবে, অর্থনীতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে, পূর্ণবিকশিত ব্যক্তিজীবন ও বলিষ্ঠ গোষ্ঠীজীবন পরস্পর পরস্পরের সংগে হাত মিলাবে। এক-কথায়, প্রত্যেকটি মানুষের সার্বিক কল্যাণই হবে এই সমাজের একান্ত কাম্য। এরূপ একটি সমাজেরই নাম 'সর্বোদয় সমাজ'। 'সর্বোদয়' কথাটির অর্থ—সকলের সর্বাংগীণ উন্নতি।

সর্বোদয় সমাজের আদর্শটি মহাত্মাজী মনে মনে কল্পনা করে গিয়েছিলেন। এর কাঠামোটি কিরূপ হবে, তার মোটামুটি একটা ইংগিতও তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই পর্যন্ত—আদর্শকে বাস্তব-রূপ দেওয়া মহাত্মাজীর পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। কারণ, জীবনের প্রায় শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন, তাঁর চিন্তা ও কর্মসাধনা রাজনীতিক ক্ষেত্রেই অনেকখানি সীমাবদ্ধ ছিল। সর্বোদয় পরিকল্পনা কিন্তু স্বরূপত সামাজিক ও আর্থনীতিক—রাজনীতির সংগে এর ঘনিষ্ঠ কোনো সম্পর্ক নেই। আকস্মিকভাবে গান্ধীজী মৃত্যুবরণ করলেন, নিজের কল্পিত সমাজের বাস্তব রূপায়ণটি তিনি দেখে যেতে

পারলেন না। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন শূন্যতায় বিলীন হল না, তাঁর প্রচারিত সর্বোদয়ের আদর্শ ব্যর্থ হল না—তাঁর অনুগামী দেশপ্রাণ কর্মীরা এক নতুন সমাজগঠনের কাজে নেমে পড়লেন। ১৯৫০ সালে সর্বোদয় সম্মেলনে একটি পরিকল্পনা গৃহীত হল এবং ওই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কার্যত সার্থক করে তুলবার জন্যে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হল—সর্বোদয়-সেবাসংঘ। এই সংঘের অঙ্গীকার, দেশে শান্তিসমৃদ্ধিপূর্ণ শ্রীমণ্ডিত হিংসাদ্বেষমুক্ত সর্বোদয় সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সর্বমানবের সর্বাংগীণ উন্নতিবিধানই সর্বোদয় আদর্শের লক্ষ্য। জনসাধারণের যথার্থ উন্নতিসাধন করতে হলে, সমাজজীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে গেলে, সর্বাগ্রে গ্রামগুলির দিকেই আমাদের তাকাতে হবে।

সর্বোদয় পরিকল্পনায় গ্রামেরই প্রাধান্য

কারণ, ভারতবর্ষের সমাজজীবন মুখ্যত গ্রামীণ এবং গ্রামগুলিই ভারতের প্রাণশক্তির সত্যিকার উৎস। তাই সর্বোদয় পরিকল্পনার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে এইসব গ্রাম, এগুলিই হবে সর্বোদয় সমাজের একক [unit], এখানেই এই আন্দোলনের কর্মীদলের সকল কর্মপ্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠবে। প্রত্যেকটি অঞ্চল স্বাবলম্বী, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বাহিরের শাসননিরপেক্ষ হবে, সমবায়ের সংহত শক্তির উপর ভর করে দাঁড়াবে, প্রীতিস্নিগ্ধ ও শুভবোধসঞ্জাত সহযোগিতাকে সকল ঋদ্ধির ও সিদ্ধির মূলমন্ত্র বলে জানবে।

আবার বলছি, সর্বোদয় পরিকল্পনায় গ্রামের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সকল বিষয়ে স্বাবলম্বী গ্রামগুলি জনসাধারণের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের সমস্ত খাদ্যসামগ্রী, বস্ত্র ইত্যাদি উৎপাদন করবে এবং গ্রামের

সর্বোদয় পরিকল্পনার অভিনবত্ব

সর্বোদয় সমাজ ওই উৎপাদিত বস্তু আবশ্যক-মতো স্থানীয় অধিবাসীদের হাতে তুলে দেবে। গ্রামের শাসনভার ন্যস্ত থাকবে পল্লীপঞ্চায়েতের উপর এবং সংগৃহীত রাজস্বের অন্তত পক্ষে অর্ধেক তাঁদের হাতেই থাকবে—শাসনকার্যের ব্যয়ভার তো কম নয়! শুভবুদ্ধির উদ্বোধন না হলে, মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটাতে না পারলে শোষণহীন, সরকারের শাসনহীন নতুন সমাজগঠন কখনো সম্ভবপর নয়। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে চাই উপযুক্ত শিক্ষাবিধি। যথার্থ শিক্ষাই কল্যাণবুদ্ধি ও মনুষ্যত্বের উদ্বোধক, প্রকৃত শিক্ষার আলোকেই মানুষ বৃহত্তর মংগলের পথটি চিনে নেয়। এহেতু সর্বোদয় পরিকল্পনায় সম্পূর্ণ নতুন একটি শিক্ষাপদ্ধতি স্থান পেয়েছে —'নঈ-তালিম' নামে তা পরিচিত। উক্ত শিক্ষাব্যবস্থা কেতাবী নয় অর্থাৎ পুঁথিঘেঁষা নয়—কারুশিল্পকেন্দ্রিক। এতে মাতৃভাষারই প্রাধান্য। 'নঈ-তালিম'

শিক্ষার্থীর সৃজনীশক্তিকে উদ্বোধিত করবে, তাকে স্বাবলম্বী করে তুলবে, দেশকে চিনতে শেখাবে, সেবাধর্মের প্রেরণা যোগাবে, মানবতার স্ফুরণ ঘটাবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সর্বোদয় পরিকল্পনার পটভূমিতে যে আর্থ-নীতিক আদর্শ রয়েছে তা গান্ধীজীর ব্যাখ্যাত অর্থনীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত। একে বিকেন্দ্রিক অর্থনীতি বলা যেতে পারে। এই অর্থনীতি উৎপাদনের ক্ষমতা মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে তুলে দিতে অস্বীকৃত। ক্ষমতা এভাবে কেন্দ্রীভূত হলে সমাজে শোষণ, বৈষম্য, দুর্নীতি দেখা দিতে বাধ্য। বিকেন্দ্রীকরণ-পদ্ধতির সাহায্যে কায়েমী স্বার্থের উৎকট আত্মপ্রকাশকে রোধ করা যায়, অবৈধ শোষণের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করা যায়, তখন সামাজিক দারিদ্র্য ঘুচানোর কাজটি সহজতর হয়ে ওঠে। বুঝতে কষ্ট হয় না, ধনতন্ত্রের শোষণ দূর করবার জন্যেই গান্ধীজী উৎপাদন-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ চেয়েছিলেন। সর্বোদয়-অর্থনীতি এই পদ্ধতিরই আশ্রয় নিয়েছে। সর্বোদয় পরিকল্পনায় কেন্দ্রীভূত ও বিকেন্দ্রীভূত শিল্প উভয়েই স্বীকৃত হয়েছে। তবে শেষোক্ত শিল্প নিয়ন্ত্রিত হবে স্বাধীন কর্পোরেশন দ্বারা, পুঁজির মালিকের দ্বারা নয়। মুষ্টিমেয় বিত্তবান মানুষের স্বেচ্ছাচারকে সমূলে উৎপাটিত করতে না পারলে সমাজে সাম্যনীতির প্রতিষ্ঠালাভ যে অসম্ভব, একথা কাকেও বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য এখানে মনে রাখতে হবে, সর্বোদয়-অর্থনীতি মূল আদর্শের দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক হলেও, এতে জোর-জবরদস্তির, বল-প্রয়োগের, হিংসাত্মক কার্যকলাপের স্থান নেই। সর্বোদয়-আদর্শের আবেদন মানুষের উচ্চতর নীতিবোধের কাছে, নৈতিক চেতনা উদ্বোধিত হলে মানুষ আপনা থেকে ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিহার করে সমষ্টিগত স্বার্থের দিকে তাকাবে। জন-সাধারণের কল্যাণাত্মিকা বুদ্ধির প্রেরণায়—সমবেত ইচ্ছায়—সমানাধিকারের ভিত্তিতে যে-সমাজ গড়ে উঠবে তা-ই সর্বোদয় সমাজ। এ সমাজ শ্রেণীহীন, শোষণমুক্ত, প্রীতি ও মৈত্রীর দ্বারা সঞ্জীবিত।

বর্তমান পরিকল্পনার আর্থনীতিক পটভূমির স্বরূপ

*　　*　　*

উপরে বর্ণিত সর্বোদয় পরিকল্পনার সংগে ভূদান-আন্দোলন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সর্বোদয়ের আদর্শটি সামাজিক বৈষম্য দূর করতে চায়, মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যের অবসান ঘটাতে চায়—যেহেতু সমান-অধিকারের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ সমাজগঠনই তার প্রধান লক্ষ্য। এরূপ সমাজসৃষ্টির পথে বহুতর সমস্যা সুতীক্ষ্ণ কণ্টকের মতো বিদ্যমান। তার মধ্যে ভূমিসংস্কার—ভূমির পুনর্বণ্টনসমস্যা—অন্যতম।

ভূদান-আন্দোলন : তাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

এ সমস্যাটিকে এড়িয়ে গিয়ে সামাজিক ও আর্থনীতিক, কোনোরূপ পরিবর্তনসাধনই সম্ভবপর নয়—বিশেষত ভারতবর্ষের মতো একটি দেশে। ভারতবর্ষ কৃষিকেন্দ্রিক, ভারতের অর্থনীতি নিঃসন্দেহে কৃষিভিত্তিক। গ্রামেগাঁথা এই দেশটির কোটি কোটি দরিদ্র মানুষের জীবিকা-অর্জনের একমাত্র উপায় হল কৃষি। সুতরাং বর্তমানে আমাদের প্রধান সমস্যা হল কী ভাবে কৃষিপ্রণালীকে উন্নত করে তোলা যায়, ফসলের উৎপাদন বাড়ানো যায়, চাষীর দারিদ্র্যমোচন করা যায়। এই গুরুতর কৃষিসমস্যা ভূমিসমস্যারই নামান্তর-মাত্র। এর সুষ্ঠু সমাধানের জন্য অচিরে ভূমিসংস্কার প্রয়োজন, ভূমির পুনর্বণ্টনের কাজে হাত লাগানো অত্যাবশ্যক। আমাদের ভূমিব্যবস্থা যে মোটেই সন্তোষজনক নয় এ সত্যটি সকলেরই বিদিত। কৃষি-উন্নয়ন—ভূমিসংস্কারের গোড়ার কথা হওয়া উচিত—মাটির সংগে যার সম্পর্ক নিবিড়তম তাকেই জমির মালিক বলে ঘোষণা করা; আমরা সকলে বিনাদ্বিধায় যেন স্বীকার করে নিতে পারি—লাঙল যার জমি তার—জমির মালিকানা কৃষকের। মাটির সংগে মানুষের যথার্থ সংযোগ ঘটাতে না পারলে এদেশের কৃষিব্যবস্থার উন্নতি সুদূরপরাহত।

ভূমিসংস্কারের নতুন পন্থা

দেশে মাঝে মাঝে কিছু কিছু ভূমিসংস্কার হয়েছে এবং সাম্প্রতিক কালে তৎসম্পর্কিত কয়েকটি আইনও লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু বহুবিধ আইন প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি চাষীর তেমন লক্ষণীয় কোনো উন্নতি সাধিত হয়নি। কৃষক-সম্প্রদায়ের প্রতি শুভেচ্ছাটুকুকেই আমরা যথেষ্ট বলে মনে করি না। এ সত্যটিও কার অজানা যে, আইন যে-অধিকার এক হাতে দেয় অন্যহাতে আবার সেই অধিকার সে কেড়ে নেয়? তা ছাড়া, আইন ন্যায়ের মর্যাদা সব সময় রক্ষা করে চলে না, দীন দুর্গত মানুষ কদাচিৎ আইনের সহায়তায় নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। সুতরাং সমস্ত দাবীদাওয়ার মীমাংসার ভার সরকারী বিধি-বিধানের উপর ছেড়ে দেওয়া সমীচীন বলে মনে হয় না। সেজন্যই বলতে হয়, যে-কোনো সংস্কারকে স্থায়ী ও সার্থক করে তুলতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনসাধারণের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন, বিবেকের জাগরণ, নৈতিক চেতনার উজ্জীবন। আইনের সাধিত সংস্কার মানুষের অন্তরকে তেমন স্পর্শ করে না, কল্যাণবুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলে না—যেহেতু তা একান্ত বাইরের জিনিস। মানুষ স্বেচ্ছায় যে-অধিকার ছাড়তে চায় না, যেখানে বিনা-প্রতিবাদে কারো ন্যায্য দাবী মেনে নিতে সে স্বীকৃত হয় না, রাষ্ট্রের প্রণীত আইন সেখানে তার রক্তচক্ষুর উদ্যত শাসন জানায়। আইনের পিছনে বলপ্রয়োগের হুম্‌কি রয়েছে বলেই তাকে লংঘন

করতে আমরা ভয় পাই। কিন্তু জাগ্রৎ বিবেকের প্রেরণায়, শুভবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্বেচ্ছায় যে-সংস্কারের কাজে আমরা হাত লাগাই তা দীর্ঘস্থায়ী ও ফলপ্রসূ না হয়ে পারে না।

জনসাধারণের এই শুভবোধ ও তাদের বিবেকচেতনার উপর আস্থা রেখেই সর্বোদয় সেবাসংঘ ভারতের ভূমিসংস্কারে হাত লাগিয়েছে,—'ভূদান-আন্দোলন' শুরু করেছে। এই আন্দোলনের অগ্রনায়ক হলেন আচার্য বিনোবা ভাবে।

ভূদান-আন্দোলনের অগ্রনায়ক

সত্য ও অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধীর অন্তরংগ সহচর তিনি। ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়াই তাঁর বড়ো কাজ। ভূমি তিনি সংগ্রহ করবেন, কিন্তু বলপ্রয়োগে নয়, হিংসাত্মক বিপ্লবের সাহায্যে নয়—মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে। অধ্যাত্মব্রতী ভারতবর্ষ বহুক্ষেত্রে অভিনব পন্থায় অসাধ্যসাধন করেছে, সমস্ত পৃথিবীকে বিস্মিত করে দিয়েছে। বিনোবাজী-ও এক অভিনব উপায়ে তাঁর আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। একে সত্যাগ্রহ বা রক্তপাতহীন শান্তিপূর্ণ বিপ্লব বলা যেতে পারে।

'ভূদানযজ্ঞ'-নামে পরিচিত এই আন্দোলন প্রথম শুরু হয় হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চলে—১৯৫১ সালে। সেখানে ভূমিহীন দরিদ্র চাষীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, সাম্যবাদীদলের কার্যকলাপ বিদ্রোহের রূপ ধারণ করল, ভূম্যধিকারীর কাছ থেকে ভূমি ছিনিয়ে নিয়ে নিঃস্ব কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হতে লাগল। চারদিকের সামাজিক আবহাওয়া ভীষণ দুর্যোগপূর্ণ, বিদ্রোহের সর্বনাশা আগুন জ্বলে উঠতে আরম্ভ করেছে। এমন এক অশান্ত পরিবেশে আচার্য বিনোবা ভূমিদান-আন্দোলন ['ভূদান-যজ্ঞ'] শুরু করলেন। যাঁরা ভূম্যধিকারী, প্রচুর জমির মালিক, তাঁদের কাছে তিনি গেলেন; আবেদন জানালেন মানবতার খাতিরে কিছু স্বার্থত্যাগ করতে—নিজেদের প্রয়োজনাতিরিক্ত জমির একটি অংশ তাঁরা যেন নিঃসম্বল সর্বরিক্ত কৃষকের হাতে তুলে দেন। এতে তাঁদের হয়তো সামান্য ক্ষতি হবে, কিন্তু অসংখ্য ক্ষুধার্ত মানুষ বাঁচবে,—দরিদ্রের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার মতো বড়ো ধর্ম আর কী? এভাবে বিনোবাজী ন্যায়নীতির বাণী, প্রেমের বাণী, মনুষ্যত্বের বাণী প্রচার করতে লাগলেন; উদ্দেশ্য—হৃদয়ের পরিবর্তন-সাধন করা, মানুষকে উচ্চতর মানবতাধর্মে দীক্ষিত করা এবং অহিংস প্রণালীতে ভূমির অসম-বণ্টন-জনিত সামাজিক বৈষম্য দূর করে সাম্যের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করা। ভূ-দানের 'দান' কথাটি লক্ষ্য করবার মতো। এখানে

ভূদান-আন্দোলনের শুরু, স্বরূপ ও ক্রমবিস্তার

'দান'এর প্রকৃত অর্থ—সমবিভাগ। আমাদের ভূমিব্যবস্থায় সমবিভাগের নীতি বাস্তবিক পক্ষে স্বীকৃত হয়নি বলেই সমাজে আজ এতখানি অন্যায়-অবিচার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—একদিকে সম্পদের অগাধ প্রাচুর্য ও অন্যদিকে অবিশ্বাস্য দারিদ্র্য পাশাপাশি বিরাজ করছে। হীন স্বার্থবুদ্ধি ও অপরিমিত লোভ গোটা সমাজকে আজ গ্লানিপংকিল করে তুলেছে। প্রকৃতির অকৃপণ দানকে ব্যক্তিগত ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করার জন্য অবিরাম সংঘাতে সমাজব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে। আচার্য বিনোবা তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য কি, তা বুঝাতে গিয়ে বলেছেন: 'In a just and equitable order of society land must belong to all. That is why we do not beg for gift but demand a share to which the poor are rightly entitled.' কথাগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এখানে বিনোবাজী সত্যই এক নতুন সমাজ-দর্শনের প্রবক্তা।

বিনোবাজী গান্ধীবাদে বিশ্বাসী, তাই তাঁর ভূমিসংস্কারের প্রণালী অহিংস। হিংস্র বিপ্লবের পথে তিনি পা বাড়াননি, পশ্চিমের বস্তুবাদী রক্তমুখী সাম্যতন্ত্রের সমর্থক তিনি নন। তাঁর সংকল্প, ন্যায়ধর্মকে পাথেয় করে সারা ভারতবর্ষে তিনি ঘুরে বেড়াবেন, মানুষকে স্বার্থত্যাগে প্রবুদ্ধ করবেন; ভূম্যধিকারীগণ স্বেচ্ছায় যে-জমি দান করবেন, তা বিলিয়ে দেবেন ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে। তাঁর বিশ্বাস, ১৯৫৭ সালের মধ্যে পাঁচ কোটি একর জমি তিনি সংগ্রহ করতে পারবেন। উক্ত পরিমাণ জমি যদি সংগৃহীত হয় তাহলে বিশাল ভারতের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি ভূমিহীন চাষীপরিবারকে কমপক্ষে পাঁচ একর করে জমি দান করা সম্ভব হবে। তাঁর উদাত্ত আহ্বান ইতোমধ্যেই গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁর মহৎ আদর্শের বাণী অনেকের হৃদয়ে সাড়া জাগিয়েছে। এ পর্যন্ত বহুলক্ষ একর জমি তাঁর হাতে এসেছে, কয়েক লক্ষ চাষীপরিবারের হাতে ওই জমি তিনি তুলে দিয়েছেন। বিভিন্ন রাজ্যসরকার বিনোবাজীর আন্দোলনকে সফল করে তুলবার জন্যে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর এই আন্দোলন যদি সফলতামণ্ডিত হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে গ্রামের ভূমি গ্রামেরই হবে, সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের তাতে সমান অধিকার থাকবে—এরূপ একটি আশা মনে মনে আমরা অবশ্যই পোষণ করতে পারি। তবে এ সত্যটিও মনে রাখতে হবে যে, ভূদান-আন্দোলন এখনো প্রাথমিক স্তরে রয়েছে, এর পরিধিকে বহু-বিস্তীর্ণ করে তুলতে হবে।

আচার্য বিনোবা ভাবের সংকল্প

ভূদানযজ্ঞের বিরুদ্ধ-সমালোচক যে না আছেন, এমন নয়। তাঁদের বক্তব্য,

বিনোবাজী যে-প্রণালীতে ভূমিসংস্কার করতে চাইছেন তা খুব ফলপ্রসূ হবে বলে তাঁরা মনে করেন না—রাষ্ট্রের প্রণীত আইনের সাহায্য ছাড়া ভূমিসমস্যার সত্যিকার সমাধান কিছুতেই হবে না। কারণ, বাধ্য করা না হলে ভূমির উপর অধিকার অনেকেই ছাড়তে চাইবে না, কায়েমী স্বার্থের কাছে নৈতিক আবেদন ব্যর্থ। তাঁরা আরো বলছেন, আজ পর্যন্ত আচার্য ভাবে যে-জমি সংগ্রহ করেছেন তা উৎপাদিকা-শক্তিহীন পড়ো জমি, চাষের অযোগ্য বলেই জমির মালিকরা সেগুলিকে দানে বিলিয়েছেন। তা ছাড়া, বিনোবাজীর জমিবণ্টন-বিষয়েও বিরূপ-সমালোচনা হয়েছে। কেউ কেউ এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, অসংখ্য চাষীপরিবারকে বিচ্ছিন্নভাবে জমি দেওয়ার জন্যে জোত ক্রমশই খণ্ডিত হয়ে পড়ছে—খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্রাকার জমি কৃষি-উন্নতির মস্ত বড়ো একটি প্রতিবন্ধক; সমবায়-কৃষিপ্রথা অথবা যৌথকৃষিপ্রথার ভিত্তিতে জমি বিলানো হলে ওই ক্ষতির সম্ভাবনা আর থাকত না।

এই আন্দোলনের বিরুদ্ধ-সমালোচনা

এরূপ সমালোচনাকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কিংবা অযৌক্তিক বলে আমরা উড়িয়ে দিতে চাই না। তবে এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, পড়ো জমিকেও চাষের উপযোগী করে তোলা সম্ভব, এবং এই আন্দোলন-সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো কথা হল মানুষের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্বার্থত্যাগ, সমাজ-সেবার উচ্চতর প্রবৃত্তির স্ফুরণ। দান-করা বস্তুর পরিমাণ আর গুণের দিকেই শুধু আমরা তাকাব, তার পেছনে যে মহতী প্রেরণা রয়েছে সেদিকে কি দৃষ্টিপাত করব না? বিনোবাজী এক অপরীক্ষিত নতুন পথে পা বাড়িয়েছেন, এই পথ আমাদের কোথায় নিয়ে গিয়ে পৌছায়, ধৈর্যসহকারে তা দেখতে হবে। তাঁর আন্দোলন এ সত্যটি কিছুটা প্রমাণিত করেছে যে, উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হলে মানুষ হীন স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে—অবিমিশ্র পশুত্বের দাস সে নয়। আচার্য বিনোবা মানুষের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি আস্থা হারাননি, ওই শক্তির প্রতি আমরাও আস্থাবান। জটিল ভূমিসমস্যার সমাধান এ পথে না-ও যদি হয় তাতে ক্ষতি কী? এই আন্দোলনের ফলে আমরা যদি সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি, সাম্যনীতির প্রতি আমাদের চিত্তে যদি শ্রদ্ধা জাগে এবং সেবাধর্মে কিছুটাও যদি আমরা প্রবুদ্ধ হই, তা-ও কি কম লাভ? বিনোবাজীকে নতুন পথের পথিকৃতের সম্মান আমাদের জানাতেই হবে।

উক্ত সমালোচনার সমালোচনা

ভূদান-আন্দোলন আমাদের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন এনে

দিয়েছে। তাই অধুনা আমরা সেবার মহৎ উদ্দেশ্যে সম্পত্তিদান, বুদ্ধিদান, শ্রমদান, প্রেমদান, জীবনদান ইত্যাদির কথাও ভাবতে পারছি।

উপসংহার

প্রকৃত মানুষ যদি হই, তাহলে আমরা নিজেদের বস্তুগত সম্পদ ও আন্তর সম্পদকে সংকীর্ণ ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখব না, সমাজের অপর দশজনের সংগে মিলে-মিশে তা ভোগ করব। ত্যাগশুদ্ধ ভোগই মানুষের যথার্থ ভোগ, সমাজকে বঞ্চিত করে যে ভোগ তা মানুষের নয়—পশুর। মহাত্মাজীর শিষ্য আচার্য বিনোবা ভাবে আমাদের সকলকে এই পশুধর্মের ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে চাচ্ছেন, এজন্য তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম।

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—পরিকল্পনা-কমিশন—পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্য—মূলধন সংগ্রহের সূত্র—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি—জমি ও কৃষক—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্প—ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটীরশিল্প—শিল্পশ্রমিকসমস্যা—পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থা—শিক্ষা—জনস্বাস্থ্য—পুনর্বাসন—খনিজ সম্পদ—সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনা—পরিকল্পনার বিরুদ্ধ-সমালোচনা—পরিকল্পনার অগ্রগতি—সরকারী প্রয়াস—উপসংহার।]

বর্তমান জগতে যে-কোনো রাষ্ট্রের রাজনীতিক স্বাধীনতা ও সক্রিয় সার্বভৌমত্ব নির্ভর করে উহার আর্থনীতিক সমৃদ্ধি ও বৈষয়িক উন্নতির উপর। এই কারণে প্রত্যেক স্বাধীন ও মর্যাদাসম্পন্ন দেশই আপনার আর্থিক ব্যবস্থার উন্নয়নে একান্ত যত্নশীল। উন্নয়নকার্য কিন্তু যথেচ্ছভাবে সম্পাদন করা যায় না, ইহার জন্য প্রয়োজন সুরচিত ও সুনিয়ন্ত্রিত একটি পরিকল্পনা।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

দেশের সর্বাংগীণ উন্নতিবিধায়ক এই পরিকল্পনাটি স্বল্পকালসাপেক্ষ হইলে ইহার দোষ-ত্রুটি সহজে সংশোধন করিতে পারা যায়, ফলে সফলতার পথ প্রশস্ত হইয়া উঠে। এজন্য পরিকল্পনা-কার্যচালনাকে সাধারণত পাঁচ বৎসরকাল পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট রাশিয়া সর্বজনবিদিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাহায্যে দেশের যে-প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছিল, বোধকরি সেই উজ্জ্বল আদর্শ সদ্য-স্বাধীন ভারতবর্ষকে পঞ্চবার্ষিকী একটি পরিকল্পনাগ্রহণে প্রেরণা যোগাইয়াছে। বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ ও অমেয় জনশক্তি লইয়া নবীন ভারত এক-একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপে

সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ ভবিষ্যতে পা বাড়াইবে—আলোচ্যমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তাহার প্রথম পদক্ষেপ।

পরিকল্পনা-কমিশন

পরিকল্পনা-কমিশনটি গঠিত হইয়াছিল ইংরেজি ১৯৫০ সালে। কলম্বো-পরিকল্পনার সহিত সম্বন্ধ ও সংযোগ নির্ধারণের জন্য ইহার কার্য কিছুকাল স্থগিত থাকে। তারপর উক্ত বৎসরের শেষদিক হইতে কমিশন পরিকল্পনার কাজ পুনরায় আরম্ভ করেন। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় পার্লামেন্টে বর্তমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি উপস্থিত করা হয় এবং যথাবিধি গৃহীত হয়।

পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্য

এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং সকল কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য বিবিধ কর্মের সুযোগ করিয়া দেওয়া। দেশের অসংখ্য লোক ও অজস্র সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহারে আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে, ভয়াবহ বেকারসমস্যা কমিয়া আসিবে, দেশবাসীর আয়ের অসাম্য দূর হইবে। কিন্তু কেবল সরকারী পরিচালকদের চেষ্টায় ইহা হওয়া সম্ভব নয়। দেশের জনসাধারণ যদি সক্রিয় সহায়তা না করে তাহা হইলে এই পরিকল্পনার সফলতা সুদূরপরাহত।

মূলধন-সংগ্রহের সূত্র

পরিকল্পনাটির বাস্তব রূপায়ণের জন্য বিপুল মূলধন প্রয়োজন। খসড়া-পরিকল্পনায় ইহার আনুমানিক ব্যয় ধরা হইয়াছিল প্রায় এক হাজার আট শত কোটি টাকা। কিন্তু চূড়ান্ত বা সংশোধিত পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে কিঞ্চিদধিক ২০৬৯ কোটি টাকা। এই টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য-সরকারের রাজস্ব-উদ্বৃত্ত হইতে সংগৃহীত হইবে ৫৬৮ কোটি টাকা, রেলসমূহের উদ্বৃত্ত হইতে ১৭০ কোটি টাকা, সরকারী ঋণসংগ্রহসূত্রে ১১৫ কোটি টাকা, দেশবাসীর সঞ্চয়াদি বাবদ ২৭০ কোটি টাকা, আমানত ইত্যাদি বিভিন্ন তহবিল হইতে ১৩৫ কোটি টাকা, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক আর কানাডা-অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি বৈদেশিক সূত্র হইতে ১৫৬ কোটি টাকা। অবশিষ্ট ৬৫৫ কোটি টাকার মধ্যে ২৯০ কোটি টাকা ঘাটতি তহবিল হইতে আনা হইবে। বাকী ৩৬৫ কোটি টাকা প্রয়োজন ও সুবিধামতো বৈদেশিক সূত্র হইতে অথবা আভ্যন্তরীণ কর স্থাপন করিয়া সংগ্রহ করা হইবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, বেকারসমস্যা সমাধানের জন্য কমিশন ৭৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। এরূপ দু-একটি কারণে পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দকৃত ২০৬৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ২২৪৪ কোটি টাকা হইয়াছে।

কৃষি, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে কি ভাবে উন্নয়নকার্য চলিবে, এইবার তাহার কিছুটা পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি

বর্তমানে ভারতবর্ষের একটা বিরাট সমস্যা হইতেছে খাদ্যসমস্যা। শস্যোৎপাদনের জমি ও চাষআবাদ করিবার লোকের অভাব এদেশে নাই। তথাপি খাদ্যবিষয়ে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করিতে পারি নাই। এদেশের বিপুল কৃষিসম্পদ-সম্ভাবনা সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও পরিচালনার অভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কৃষি, সমাজউন্নয়ন, সেচ, বিদ্যুৎশক্তি ইত্যাদি পরিকল্পনা পরস্পরের সহিত জড়িত। আলোচ্যমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ অনুসারে কৃষি ও সমাজউন্নয়ন-খাতে ৩৬০·৪৩ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ১৭·৪ শতাংশ ভাগ এবং সেচ ও বিদ্যুৎশক্তি খাতে ৫৬১·৪১ কোটি টাকা অর্থাৎ ২৭·৪ শতাংশ ভাগ ব্যয়িত হইবে।

জমি ও কৃষক

কৃষির উন্নতি করিতে হইলে জমির উন্নতিবিধান প্রয়োজন। ইহার জন্য দরকার বৈজ্ঞানিক সার, সেচকার্য ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। অন্যদিকে দরকার জমিগুলির বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান দূর করিয়া জমিকে যান্ত্রিক চাষের উপযুক্ত করিয়া তোলা। একসংগে অনেকখানি জমি না হইলে সমবায়-প্রথায় চাষকার্য চালানো সম্ভব নয়। এতদ্ভিন্ন উন্নত ধরণের বীজসরবরাহ এবং কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। সবচেয়ে বড়ো কথা হইল, ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন সাধিত না হইলে কৃষির যথোচিত উন্নতিবিধান সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না। কারণ, চাষের উন্নতি বহুলাংশে চাষীসম্প্রদায়ের উন্নতি ও কর্মশক্তির উপর নির্ভরশীল।

পরিকল্পনাতে এদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। দেশের সর্বত্রই ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। চাষীর হাতে যাহাতে টাকা যায় তদুদ্দেশ্যে স্বল্পমেয়াদী-দীর্ঘমেয়াদী নানা ধরণের ঋণদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। সার যাহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইতেছে সেচপরিকল্পনা। কমিশন সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করিয়াছেন সেচব্যবস্থার জন্য। ইহাতে বহুলক্ষ একর জমি সেচের সুবিধা পাইবে। ইহার অতিরিক্ত সুবিধা হইল বিদ্যুৎশক্তির সম্প্রসারণ। এতদ্ব্যতীত, কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বাজারের ব্যবস্থা করাও এই পরিকল্পনায় স্থান পাইয়াছে।

এদেশের কৃষিকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন উদ্বৃত্ত জনশক্তিকে [অর্থাৎ কৃষিকর্মকে অযথা আঁকড়াইয়া রহিয়াছে এরূপ বহুসংখ্যক অতিরিক্ত লোককে] শিল্প ও অন্যান্য কার্যক্ষেত্রে সরাইয়া আনা। এজন্য কৃষির সংগে সংগে দেশের শিল্পসম্প্রসারণের জন্যও পরিকল্পনা-কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন। শিল্পের উন্নতিবিধান করিতে না পারিলে বেকারসমস্যাও ঘুচিবার নয়। সরকারী নিয়ন্ত্রণের দিক হইতে শিল্পগুলিকে এইভাবে বিভক্ত করা যায় : অস্ত্রশস্ত্রনির্মাণ, আণবিক শক্তির উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ, রেলপথ ইত্যাদি ষোল আনা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। কয়লা, লৌহ ও ইস্পাতশিল্প, বিমানপোত ও জাহাজনির্মাণ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতারযন্ত্রপাতি-নির্মাণ, খনিজ তৈল উৎপাদন ইত্যাদি সরকার নিয়ন্ত্রণ করিবেন—এক্ষেত্রে বেসরকারী সহযোগিতাকে সরকার সাদরে আমন্ত্রণ জানাইবেন। বাকি সব শিল্প বেসরকারী দায়িত্বে পরিচালিত হইবে। পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন-খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে ১৭৩ কোটি ¾ লক্ষ টাকা। ইহা ছাড়া শিল্পসম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যে-মূলধনের প্রয়োজন হইবে তাহাতেও সরকার অংশ গ্রহণ করিবেন—৯৪ কোটি টাকা সরকার যোগাইবেন। বেসরকারী সাধারণ শিল্পোদ্যমকে সরকার যথাসম্ভব উৎসাহিত করিবেন। শিল্পসম্প্রসারণের অনুকূল পরিবেশ-রচনা-ব্যাপারে সরকার সাহায্য করিলে বেসরকারী শিল্পপ্রয়াস অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্প

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এবং কুটীরশিল্পের উন্নতির জন্যও পরিকল্পনায় ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গ্রামীণ শিল্পগুলির পুনর্গঠন ও উন্নতিবিধান-উদ্দেশ্যে এইরূপ সুপারিশ করা হইয়াছে : কুটীরশিল্পপণ্যের উৎপাদনব্যবস্থার সংরক্ষণ, বৃহৎ শিল্পজাত সামগ্রীর উপর কর ধার্যকরণ, বিবিধ কুটীরশিল্পে কাঁচামাল-সরবরাহ, এবং গবেষণা ও কারিগরী শিক্ষা দ্বারা ইহার সমৃদ্ধিসাধন। নিম্নলিখিত শিল্পগুলির জন্য বিস্তৃত কার্যসূচী প্রণয়ন করা হইয়াছে : [ক] গ্রামের তৈলশিল্প, [খ] সাবান নির্মাণ, [গ] ধানভানা, [ঘ] খেজুর ও তালগুড়, [ঙ] চর্মশিল্প, [চ] পশম-কম্বল, [ছ] হাতের তৈরী কাগজ, [জ] মক্ষিকাপালন, [ঝ] দিয়াশলাই-শিল্প। বর্তমান পরিকল্পনায় কুটীরশিল্পের উন্নতির জন্য পনর কোটি টাকা ব্যয় ধার্য হইয়াছে। পল্লীভারতের আর্থিক জীবনে কুটীরশিল্পের একটি বড়ো স্থান রহিয়াছে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটীর-শিল্প

শিল্পশ্রমিককে বাদ দিয়া শিল্পোন্নয়নের কথা ভাবা যায় না। কারণ, শিল্পের প্রাণকেন্দ্রে বিরাজমান রহিয়াছে শ্রমিকদল—যাহাদের উপর পণ্যোৎপাদন একান্ত-

ভাবে নির্ভরশীল। পরিকল্পনা-কমিশন শ্রমিকগণের মজুরী, কর্মকাল, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি মূল্যবান সুপারিশ করিয়াছেন। মালিক-শ্রমিক-সরকারের সম্পর্ক কি রকম হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধেও কমিশন সুনির্দিষ্ট মতামত দিয়াছেন। শ্রমিক-মালিক-বিরোধ আধুনিক যান্ত্রিক জীবনে একটি গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শিল্পশ্রমিকসমস্যা

দেশের বৈষয়িক সমৃদ্ধির সহিত ইহার পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পরিকল্পনায় এ বিষয়ে খুব গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। পরিবহন ও যোগাযোগ-খাতে ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে ৪৯৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে চারিশত কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে রেলপথ পুনর্গঠনের জন্য। মূল শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট ৫০ কোটি টাকার সুবিধাও বস্তুত এই ভাগেরই প্রাপ্য। রেলইঞ্জিনের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া প্রায় পনর কোটি টাকা ব্যয়ে চিত্তরঞ্জন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পথঘাট-নির্মাণ সম্বন্ধে স্থির করা হইয়াছে যে, যে-পথগুলি তৈয়ারীর কাজ আরম্ভ হইয়াছে সেগুলি শেষ করিতে হইবে, এবং পাঁচ বৎসরে প্রায় ১০০০ মাইল নতুন পথ নির্মাণ করিতে হইবে। জাহাজ-নির্মাণ, বিমান-চলাচল-ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্বন্ধে পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট সুপারিশ আছে। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের উন্নতিবিধানের জন্য ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে।

পরিবহন ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা

শিক্ষাউন্নয়ন-খাতে মোট ব্যয়িত হইবে ১৫৫.৬৬ কোটি টাকা। উচ্চশিক্ষা, বুনিয়াদি শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়কে ইহার আওতায় ফেলা হইয়াছে। কারিগরী শিক্ষা ও গবেষণাকার্যে উৎসাহ দেওয়া ছাড়াও গ্রন্থাগারাদি প্রতিষ্ঠা এবং নানা আনুষ্ঠানিক সাহিত্যিক-আন্দোলনের জন্যও কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন। জাতীয় জীবনে যুগোপযোগী শিক্ষার স্থান যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ কথাটি কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

শিক্ষা

জনস্বাস্থ্য-বিষয়েও পরিকল্পনায় কতকগুলি নির্দিষ্ট কার্যক্রমের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে জলসরবরাহ ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, ম্যালেরিয়া-নিয়ন্ত্রণ, পল্লীঅঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসকদল-গঠন, প্রসূতি ও শিশুকল্যাণ, স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা ও প্রচারকার্য, ঔষধাদিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রভৃতি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

জনস্বাস্থ্য

পুনর্বাসন-বিষয়টিও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। প্রথমে এই খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৮৫ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল। পরে ইহার পরিমাণ কিঞ্চিদধিক আরও বিশ কোটি টাকা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। গৃহনির্মাণ, বিশেষ করিয়া শিল্পাঞ্চলে, একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনায় ৪৮ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

পুনর্বাসন

ভারতের অমূল্য খনিজ সম্পদের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে অনুসন্ধান, খনিকার্য-পরিচালনা, খনিজগুলি দ্বারা প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈয়ারী ইত্যাদি বিষয়ে কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন।

খনিজ সম্পদ

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত একটি অন্যতম প্রধান বিষয় হইল সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনা। ইহার কাজ মুখ্যত গ্রামাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। প্রতিটি 'প্রজেক্ট' বা কেন্দ্রে ৪৫০ হইতে ৫০০ বর্গমাইল জুড়িয়া ৩০০ গ্রাম লইয়া কাজ হইবে। এইসব গ্রামের মোট জনসংখ্যা হইবে প্রায় দুই লক্ষ করিয়া, এবং চাষের আওতায় আসিবে প্রায় দেড় লক্ষ একর পরিমাণ জমি। উক্ত প্রতিটি কেন্দ্র আবার তিনটি 'ব্লক' বা উপকেন্দ্রে বিভক্ত হইবে। এ রকম প্রত্যেক উপকেন্দ্রের এলাকাধীন গ্রামের সংখ্যা হইবে একশত —লোকসংখ্যা আনুমানিক ৬০।৭০ হাজার। এ সব উপকেন্দ্রের অধীনে পাঁচটি করিয়া গ্রামের সমষ্টি এককভাবে কাজ করিবে। আলোচ্য পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে মোট প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার গ্রামে সমাজ উন্নয়নের কাজ হইবে।

সমাজ-উন্নয়ন-পরিকল্পনা

সমালোচকের চক্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দোষত্রুটির অন্ত নাই। ইঁহাদের বক্তব্য—দেশের সম্পদাদির হিসাব এখানে ভুলভাবে লওয়া হইয়াছে, সরকারের করনীতির কোনো ঠিক নাই, আর্থিক ব্যাপারে ও সংগঠন-বিষয়ে অতিমাত্রায় আশাবাদীর কথা বলা হইয়াছে, শিল্পের প্রতি সুবিচার করা হয় নাই, ইত্যাদি। কিন্তু ইহার গুণের দিক হইতে বিচার করিলে উপরি-উক্ত অভিযোগগুলিকে খুব বড়ো ত্রুটি বলিয়া মনে হইবে না। কারণ, এই পরিকল্পনা একদিকে যেমন সরকারের হাতে দেশের আর্থনীতিক পুনর্গঠনের বৃহত্তর দায়িত্ব তুলিয়া দিয়াছে, তেমনি কুটীরশিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির প্রসার-ব্যাপারে উৎসাহ দিয়া জনসাধারণের কর্মশক্তিকে উজ্জীবিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। মধ্যবিত্ত-বেকারসমস্যা-সমাধানের কিছুটা ইংগিতও ইহাতে মিলিবে। খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, বর্তমান পরিস্থিতিতে শিল্পের তুলনায় কৃষির প্রতি অধিক

পরিকল্পনার বিরুদ্ধ-সমালোচনা

1648

দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পরিকল্পনা-কমিশন খুব ভুল করেন নাই। কৃষির উন্নতিবিধান করিয়া খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াইতে পারিলে দেশের বিরাট খাদ্যসমস্যা অনেকখানি ঘুচিবে, বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানির জন্য সরকারকে প্রতি বৎসর বহু কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে না। ওই টাকা দিয়া শিল্পের জন্য যন্ত্রাদি আমদানি করা সহজ হইয়া উঠিবে। ইহা ছাড়াও বলা যায়, কৃষির উন্নতি হইলে কাঁচামাল উৎপাদনের পরিমাণ অবশ্যই বাড়িবে, ইহাতে শিল্পের নিশ্চয়ই উপকার সাধিত হইবে। তদুপরি সরকারের ঘোষিত বর্তমান শিল্পনীতিও বেসরকারী শিল্পপ্রয়াসকে নানাভাবে সাহায্য করিবে। দেশের সর্বাংগীণ উন্নতিমূলক এত বড়ো একটি পরিকল্পনা একেবারে ত্রুটিশূন্য হইবে, এমন আশা করা উচিত নয়। আমরা এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইতে পারি যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উক্ত দোষত্রুটিগুলি দূরীকরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইবে।

বাস্তব ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনার অগ্রগতি

ইতোমধ্যে পরিকল্পনা-অনুযায়ী কাজও কম অগ্রসর হয় নাই। আর্থিক ক্ষেত্রে একটা লক্ষণীয় উন্নতি এই যে, এতদ্বারা মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ হইয়াছে। কৃষির দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, মোটামুটি আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের অধিক ফলন হইয়াছে। কতকগুলি সেচব্যবস্থা চালু হওয়ায় নিঃসন্দেহে জমির উৎপাদিকা-শক্তি বাড়িয়াছে। ভারতসরকার সম্প্রতি খাদ্যনিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করিয়াছেন। সেচ এবং বিদ্যুৎসরবরাহ-কেন্দ্রসমূহের কাজও ভাল হইয়াছে। ইস্পাত, সিমেণ্ট, বস্ত্র ইত্যাদি কতকগুলি শিল্পপণ্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সরকারী উদ্যমের সাফল্য

সরকারী উদ্যমের মধ্যে নিম্নলিখিত শিল্পপ্রচেষ্টাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : [ক] সিন্ধ্রী-সারউৎপাদন কেন্দ্র, [খ] চিত্তরঞ্জন-ইঞ্জিননির্মাণ-কারখানা, [গ] হিন্দুস্থান জাহাজকোম্পানী। চিত্তরঞ্জন-কারখানায় এযাবৎ ১০০টি ইঞ্জিন নির্মিত হইয়াছে, হিন্দুস্থান জাহাজকোম্পানী দশখানা জাহাজ নির্মাণ করিয়াছেন।

পরিকল্পনাটিকে বাস্তবমুখী এবং সময়োপযোগী বলিতে হইবে। বিশেষ একটি রাজনীতিক দৃষ্টিভংগী লইয়া—বিশেষ করিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার আর্থনীতিক পুনর্গঠন-পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে—ইহাকে যাঁহারা বিচার করিতে বসেন, তাঁহাদের চোখে ইহার বহুতর ত্রুটি প্রকট হইয়া উঠে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, সব জিনিসেরই স্থানকাল রহিয়াছে, বস্তুকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যথার্থ দেখা নয়। রাশিয়ার সংগে বর্তমান ভারতবর্ষের পার্থক্যটি ভুলিলে চলিবে না। সে

28.11.2008
13766

যাহা হোক, ভারতের শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক বলিয়া, সরকারী উদ্যমপ্রচেষ্টার সহিত জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতার উপরও এই পরিকল্পনার সাফল্য অনেকখানি নির্ভরশীল। সরকারী কর্মচারীগণ যদি কেবলমাত্র চাকরি না করিয়া, জনকল্যাণবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া কর্তব্য সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করেন, এবং জনসাধারণ যদি সহায়তার জন্য আগাইয়া আসেন, তাহা হইলে ত্রুটিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এই পরিকল্পনা সফলতামণ্ডিত হইতে বাধ্য। দোষমুক্ত নয়, এ সত্যটি স্বীকার করিয়া লইয়াও বলা যায় যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সার্থকতর লক্ষ্যসীমায় অগ্রসর করিয়া দিবার বলিষ্ঠ ভূমিকা ইহা দ্বারা অবশ্যই রচিত হইয়াছে। জাতীয় জীবনের সার্বিক উন্নতির প্রশস্ত পথে প্রথম পদক্ষেপ বলিয়া ইহা অগ্রদূতের শ্রদ্ধা ও সম্মান পাইবে।

উপসংহার

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

[**রচনার সংকেতসূত্র :** বিদেশীশাসিত ভারতের হতশ্রী মূর্তি—এদেশে দারিদ্র্য ও প্রাচুর্যের অভাবনীয় একত্র সমাবেশ—আমাদের স্বাধীন মানুষ হয়ে উঠতে হবে—প্রাক্-স্বাধীনতাযুগে ভারতের আর্থনীতিক পরিকল্পনা—প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—প্রথম পরিকল্পনার কার্যকাল, লক্ষ্য ও ব্যয়বরাদ্দ—এর ফলাফল—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য—বরাদ্দকৃত টাকার ব্যয় ও বিনিয়োগের হিসাব—সরকারী অংশের অর্থসংগ্রহের উৎস—দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদনের লক্ষ্য—জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান কিরূপ বাড়বে—প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য—উপসংহার।]

অবশেষে ইংরেজ-জাতিকে বাধ্য হয়ে এদেশ ছেড়ে যেতে হল—প্রায় দু-শ বছর পরে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ হৃত স্বাধীনতা ফিরে পেল। বিদেশী শাসক ভারত ত্যাগ করল বটে, কিন্তু পিছনে রেখে গেল অসহনীয় দারিদ্র্যের হাহাকার, পুঞ্জীভূত হতাশ্বাস, অশিক্ষা-কুশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত কোটি কোটি জীবন্মৃত মানুষ, দেশজোড়া দীনতার আবর্জনা—মহাশ্মশানের ভগ্নস্তূপ। এ শুধু নয়, ব্রিটিশের চক্রান্তে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হল, দেশবিভাগের ফলে নতুন নতুন জটিল সমস্যার উদ্ভব হতে লাগল, শরণার্থীর প্লাবন দেখা দিল, চতুর্দিকে আত্মপ্রকাশ করল নিদারুণ বিপর্যয়। দেশের উপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার কথা

বিদেশীশাসিত ভারতের হতশ্রী মূর্তি

এখানে ছেড়েই দিলাম। দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার দরুণ কৃষিকেন্দ্রিক ভারত তার এতকালের কৃষিপ্রাধান্যও হারাল। স্বাধীনতা আমরা পেলাম, কিন্তু শ্বাসরোধকারী বহুতর সমস্যার চাপে পড়ে এই স্বাধীনতালাভের আনন্দ উপভোগ করার অবকাশ আমাদের মিলল না। যাদের সম্মুখে ঘোরতর দুর্দিন—নানা সমস্যার কুটিল ভ্রূকুটি —স্বাধীনতা পেলেও, নির্বাধ আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব।

কত বড়ো দেশ এই ভারতবর্ষ। অজস্র তার প্রাকৃতিক সম্পদ, বিপুল তার শ্রমশক্তি। অথচ ভারতবাসীর দারিদ্র্যের সীমা নেই। যেখানে এত প্রাচুর্য, কেন সেখানে এতখানি দৈন্যের লাঞ্ছনা? এক-কথায় প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এখানে এইটুকু বলা যায়, ইংরেজ-শাসকের দুঃশাসনে ও অবিরত নিষ্ঠুর শোষণে আমরা আজ এহেন শোচনীয় দারিদ্র্য বরণ করতে বাধ্য হয়েছি—পরাধীনতার অভিশাপেই আমাদের এতখানি দুর্গতি। প্রকৃতির প্রসন্নতা না থাকলে দেশকে সমৃদ্ধিশালী করে তোলা কঠিন, সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশের সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যই সবকিছু নয়। ওই সম্পদ আহরণ করে কাজে লাগাতে হবে, তার সুষ্ঠু ব্যবহারের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে, তাকে প্রয়োগ করার কৌশল শিখতে হবে; শ্রমশক্তির যথাযোগ্য ব্যবহারের দিকে এবং যেন উহার অপচয় না হয়, সেদিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করতে হবে—তবেই দেশ শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠবে। কিন্তু এতকাল আমরা পরাধীন ছিলাম বলে, উৎসাহ ও উদ্যম থাকা সত্ত্বেও, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকে কাজে লাগাতে পারিনি, আমাদের বিপুল শ্রমশক্তি অপচিত হয়েছে, কৃষি ও শিল্প অনুন্নত থেকে গেছে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে দেশ পিছনে পড়ে রয়েছে। ব্রিটিশ-শাসনের আমলে ভারতবর্ষ ছিল পুলিশি রাষ্ট্র, ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি ছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ শোষণের দিকে। এরূপ অবস্থায় আর্থিক ও আর্থনীতিক উন্নতির পথে পদক্ষেপ করা কী কঠিন, তা সহজেই অনুমেয়। এসব কারণে, পরিকল্পিত উন্নয়নপ্রচেষ্টার অভাবে, ভারতবর্ষের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বেড়ে গিয়েছে। ইংরেজরা যখন এদেশ ছেড়ে গেল তখন আমাদের কী অসহায় অবস্থা —কৃষি একরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত, কুটীরশিল্পগুলি বিধ্বস্ত, যন্ত্রশিল্প একান্ত অনগ্রসর, অভাবে-দৈন্যে-অশিক্ষায়-কুশিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড ভগ্ন। পরাধীনতার অভিশাপ কী ভয়ংকর!

এদেশে দারিদ্র্য ও প্রাচুর্যের অভাবনীয় একত্র সমাবেশ

যা হোক, স্বাধীনতা আমাদের করায়ত্ত হয়েছে, এখন আমাদের সর্বতোভাবে স্বাধীন মানুষ হয়ে উঠতে হবে। যদি আমরা আর্থনীতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন হয়ে

উঠতে না পারি তাহলে আমাদের রাজনীতিক স্বাধীনতা নিরর্থক। সত্যিকার স্বাধীন মানুষের গৌরব সেদিনই আমরা অর্জন করব যেদিন আমাদের আর্থিক জীবনে পরনির্ভরশীলতা থাকবে না, সমাজে সর্বনাশা দারিদ্র্যের পীড়ন থাকবে না, কর্মসংস্থানের অভাবে শ্রমশক্তির অপ্রয়োগজনিত অপচয় ঘটবে না, সকলে নিজ নিজ কর্মশক্তির প্রকাশ ও প্রয়োগের যথাযোগ্য সুযোগ-সুবিধা পাবে, দেশ থেকে নিরক্ষরতা মুছে যাবে, মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ উদ্বোধন ঘটবে, সমাজস্থ সর্বস্তরের নরনারীর জীবনমান উন্নত হয়ে উঠবে। মোটকথা, রাজনীতিক স্বাধীনতার ফলপ্রসূতার নিরিখ হল আর্থিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি। কিন্তু দেশের এরূপ উন্নতিবিধান সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এর জন্যে সুচিন্তিত ও সুরচিত আর্থনীতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন, এবং এরূপ পরিকল্পনার সাহায্যে দেশবাসীর দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সমাজতন্ত্রী রাশিয়া—পরিকল্পিত উন্নয়নপ্রচেষ্টা সেখানে অসাধ্যসাধন করেছে। পর পর কয়েকটি পরিকল্পনার সাহায্যে রাশিয়ায় কৃষি ও শিল্পের যে-উন্নতি সাধিত হয়েছে তা সত্যই বিস্ময়কর। প্রবল উৎসাহ ও প্রেরণা নিয়ে সেখানকার সরকার কাজে নেমেছে এবং অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে জাতীয় আয় বাড়িয়েছে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে।

আমাদের স্বাধীন মানুষ হয়ে উঠতে হবে

এরূপ পরিকল্পনার প্রয়োজন আমরা যে অনুভব করিনি এমন নয়। কিন্তু ইংরেজ শাসকের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি আমাদের সমস্ত উদ্যমপ্রচেষ্টাকে বারে বারে বানচাল করে দিয়েছে। প্রাক্-স্বাধীনতা-যুগে—১৯৩৮ সালে—তৎকালীন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে বলিষ্ঠ আর্থনীতিক পরিকল্পনা রচনার জন্যে একটি কমিটি গঠন করেন—জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি। এই সংস্থাটির উদ্যোগে শিল্পসংক্রান্ত বহু মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়। কিন্তু রাজনীতিক বাধা-বিপত্তির জন্যে উক্ত সংস্থার কাজ বেশিদূর এগোতে পারেনি। এর পর ১৯৪৪ সালে বিখ্যাত 'বোম্বাই পরিকল্পনা' প্রকাশিত হয়। নানাকারণে এ পরিকল্পনাটিও কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে শ্রীএম. এন. রায়ের রচিত 'পিপলস্ প্ল্যান', শ্রীআগারওয়ালের 'গান্ধীপ্ল্যান' ইত্যাদির নাম স্মরণ করা যেতে পারে। এসমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হয়ে না উঠলেও, এগুলি দেশের আর্থিক পুনর্গঠন বিষয়ে ভারতবাসীকে সচেতন করে তুলেছে, ভাবীকালের জাতীয় পরিকল্পনা রচনার অনেকখানি প্রেরণা যুগিয়েছে।

প্রাক্-স্বাধীনতাযুগে ভারতের আর্থনীতিক পরিকল্পনা

তারপর কঠোর সংগ্রামের পর ভারতবর্ষ স্বাধীন হল, বিদেশী শাসনের অভিশাপ ঘুচল। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পরও আমাদের জাতীয় সরকার বহুবিধ সমস্যার প্রতিকূলতার জন্যে প্রথম দু-তিন বছর পরিকল্পনা রচনার কাজে হাত দিতে পারেননি। একাজে তাঁরা নামলেন ১৯৫০ সালে। 'প্ল্যানিং কমিশন' নিযুক্ত হলেন, উদ্দেশ্য—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মারফৎ ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা। পরিকল্পনা-কমিশন প্রথম পরিকল্পনাটির একটি খসড়া পেশ করলেন ১৯৫১ সালে। তারপর যথোচিত আলোচিত ও সংশোধিত হয়ে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে উহা প্রকাশিত এবং গৃহীত হল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকাল ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশের অব্যবহৃত সম্পদ সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগিয়ে, উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নীত করাই হল এর প্রধান লক্ষ্য। প্রথম পরিকল্পনাটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনারই অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং আর্থিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। ওই দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা যদি কার্যকরী হয় তাহলে আশা করা যায় যে, আগামী সাতাশ বৎসরে [১৯৫০ সাল থেকে] এদেশের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হবে। ভারতে আর্থনীতিক উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে প্রথম পরিকল্পনাটিতে যে-কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন, সেচ্‌ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎশক্তি-উৎপাদন, শিল্পোন্নতি, সমাজসেবা, পুনর্বাসন ইত্যাদি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সমস্ত উন্নয়নপ্রচেষ্টার জন্য মোট ব্যয় নির্দিষ্ট হয়েছে ২৩৫৬ কোটি টাকা। কোন্ জিনিস কত পরিমাণ উৎপাদিত হবে তৎসম্পর্কে, অর্থাৎ জিনিস উৎপাদনের লক্ষ্য সম্পর্কে পরিকল্পনায় সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাধান্য লাভ করেছে কৃষি—শিল্পোন্নয়নের ওপর এতে তেমন জোর দেওয়া হয়নি। এই হিসাবে পরিকল্পনাটিকে কৃষিকেন্দ্রিক বা গ্রামকেন্দ্রিক বলা যায়। ওতে কৃষির ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার কারণগুলি আমরা যথাস্থানে বিশ্লেষণ করব।

প্রথম পরিকল্পনার কার্যকাল, লক্ষ্য ও ব্যয়বরাদ্দ

প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে। এর ফলাফল জানবার জন্যে সকলের মনে নিশ্চয়ই ঔৎসুক্য জাগবে। সরকারের প্রকাশিত হিসেব থেকে বোঝা যায়, পরিকল্পনাটি মোটামুটি ফলপ্রসূ হয়েছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিকল্পনায় নির্ধারিত উৎপাদনের লক্ষ্য বা 'plan target' আমরা অতিক্রম করেছি। কৃষিজাত দ্রব্য, খাদ্যশস্য, শিল্পদ্রব্য ইত্যাদির উৎপাদন-পরিমাণ আশানুরূপ বেড়েছে। জাতীয় আয় বেড়েছে শতকরা আঠার ভাগ এবং জনপ্রতি আয় শতকরা দশ ভাগ। তবে এ সত্যটিও স্বীকার করতে হবে, এই প্রথম-পাঁচসালা প্রচেষ্টা বেকারসমস্যার উল্লেখনীয় কোনো সমাধান করতে পারেনি। পাঁচ বছরে মাত্র পঁয়তাল্লিশ লক্ষ লোকের কাজের সংস্থান হয়েছে। সুতরাং দেশব্যাপী দারিদ্র্য যে থেকেই গিয়েছে, এর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এর ফলাফল

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হয়েছে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে; এবং ধারাবাহিকভাবেই দ্বিতীয় পরিকল্পনা চালু হবার কথা এপ্রিল মাস থেকে। ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পরিকল্পনা-কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সংশোধিত খসড়া প্রকাশ করেন এবং আরো তিনমাস পরে এর চূড়ান্ত রূপরেখা প্রকাশিত হয়। কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্যসরকারের বহু ব্যক্তি এবং দেশের বহু চিন্তাশীল ও জনকল্যাণকামী নায়কের অকুণ্ঠ পরিশ্রমের ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি রচিত হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা, ত্রুটিবিচ্যুতি, বাস্তব ক্ষেত্রে সুবিধা-অসুবিধা এবং ইহার সাফল্য ও ব্যর্থতা দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনাকালে অবশ্যই দিশারীর কাজ করেছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে পরিকল্পনা-কমিশন বলেছেন—জাতীয় আয় যথাসাধ্য বৃদ্ধি করে [শতকরা পঁচিশ ভাগ] জন-সাধারণের জীবনযাত্রার মান-উন্নয়ন, মূল ও ভারী শিল্পগুলির ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে দ্রুত শিল্পায়ন, যথাসম্ভব কর্মসংস্থানের সুযোগবৃদ্ধি, ধনসম্পদ ও আয়ের অসমতা হ্রাস করা ও আর্থনীতিক ক্ষমতার অপেক্ষাকৃত সুষম বণ্টনের দিকেই প্রস্তাবিত পরিকল্পনার দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আদর্শটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজগঠন অর্থাৎ উৎপাদনী ব্যবস্থার ধারা পরিবর্তন। প্রচলিত আর্থিক ও সামাজিক কাঠামোকে ঠিক রেখে যেখানে সুফল লাভের আশা কম, সেখানে সামাজিক ও আর্থনীতিক কাঠামোকে ভেঙে নতুন করে গড়ে তুলতে হয়। এ যদি করতে না পারা যায় তাহলে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও সম্পদের বণ্টনে অসাম্য থেকে যেতে বাধ্য। সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিগত লাভকে উন্নয়নের মাপকাঠিরূপে ধরা হয় না, গোটা

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য

সমাজের সামগ্রিক লাভকেই একমাত্র মাপকাঠি বলে গণ্য করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উল্লিখিত উদ্দেশ্যটি খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উন্নতিমূলক কাজের জন্যে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৭২০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারী অংশে ব্যয়িত হবে ৪৮০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী অংশে ব্যয়িত হবে ২৪০০ কোটি টাকা। প্রথমোক্ত ৪৮০০ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় করবেন ২৫৫৯ কোটি টাকা, বাকি টাকা ব্যয় করবেন বিভিন্ন রাজ্যসরকার। সরকারী হিসাবের বরাদ্দকৃত টাকা [৪৮০০ কোটি] কোন্ কোন্ খাতে বিনিয়োগ করা হবে তার একটা তালিকা নীচে দেওয়া হল। এই তালিকার সঙ্গে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে-যে খাতে যে-পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে, তারও হিসাব লিপিবদ্ধ হল। এতে দুটি পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা করার সুবিধে হবে :

বরাদ্দকৃত টাকার ব্যয় ও বিনিয়োগের হিসাব

	প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা	মোট [কোটি টাকার হিসাব]	শতাংশ	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মোট [কোটি টাকার হিসাব]	শতাংশ
[১]	কৃষি ও সমাজ-উন্নয়ন	৩৫৭	১৫·১	৫৬৮	১১·৮
[২]	সেচ ও বিদ্যুৎ-শক্তি	৬৬১	২৮·১	৯১৩	১৯·০
[৩]	শিল্প ও খনি	১৭৯	৭·৬	৮৯০	১৮·৫
[৪]	পরিবহন ও যোগাযোগ	৫৫৭	২৩·৬	১৩৮৫	২৮·৯
[৫]	সমাজসেবা	৫৩৩	২২·৬	৯৪৫	১৯·৭
[৬]	বিবিধ	৬৯	৩·০	৯৯	২·১
	মোট :	২৩৫৬	১০০	৪৮০০	১০০

'কৃষি ও সমাজ-উন্নয়ন' খাতের প্রধান কর্মসূচী হল—কৃষি, জাতীয় সম্প্রসারণ ও সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ, স্থানীয় উন্নয়ন, গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ ইত্যাদি। 'সেচ ও বিদ্যুৎশক্তি' খাতে প্রধান কর্মসূচী—সেচ, বিদ্যুৎশক্তি, বন্যানিয়ন্ত্রণ, গবেষণা ইত্যাদি। 'শিল্প ও খনি' খাতের প্রধান কর্মসূচী—বৃহৎ এবং মাঝারি শিল্প, খনিজ-

উন্নয়ন, গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প। 'পরিবহন ও যোগাযোগ' খাতের প্রধান কর্মসূচী—রেলপথ, রাস্তা, রাজপথ-পরিবহন, বন্দর, নৌ-চলাচল, অসামরিক বিমান-চলাচল, অপরাপর পরিবহন, ডাক ও তারবিভাগ, অন্যান্য যোগাযোগ, বেতার। 'সমাজসেবা' বা 'জনকল্যাণ' খাতের প্রধান কর্মসূচী—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ, অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ, শ্রমিক ও শ্রমিককল্যাণ, পুনর্বাসন, শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের নূতন পরিকল্পনা।

বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ২৪০০ কোটি টাকা—নিম্নলিখিতভাবে এ টাকা বিনিয়োগ করা হবে :

[১]	বড়ো শিল্প ও খনিজদ্রব্য উৎপাদন	৫৭৫ কোটি
[২]	কৃষি এবং গ্রাম্য ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৩০০ ,,
[৩]	চা, কফি প্রভৃতি শিল্প, বিদ্যুৎ, ও রেলপথ ব্যতীত অপরাপর যানবাহন	১২৫ ,,
[৪]	গৃহ ইত্যাদি নির্মাণকার্য	১০০০ ,,
[৫]	মজুত হিসাবে	৪০০ ,,
	মোট :	২৪০০ কোটি

বর্তমান পরিকল্পনাটিকে কার্যকরী করে তুলতে হলে বিভিন্ন রাজ্যসরকারকে মেয়াদী সময়ের মধ্যে মোট ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কি ভাবে সংগৃহীত হবে, পরিকল্পনা-কমিশন তা বলেছেন : বর্তমান কর থেকে ৩৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে, এবং নতুন কর বসিয়ে ও করের হার বাড়িয়ে অতিরিক্ত ৪৫০ কোটি টাকা উঠবে। দেশবাসীর থেকে ঋণ ও স্বল্পসঞ্চয় থেকে ১২০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে, এরূপ আশা করা যায়। রেলের লাভের অংশ ও প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে জমান টাকা থেকে উঠবে ৪০০ কোটি টাকা। বৈদেশিক সাহায্য থেকে ৮০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। নোট ছাপিয়ে সংগ্রহ করা যাবে ১২০০ কোটি টাকা। এখন বাকি থাকছে ৪০০ কোটি টাকা। এ টাকা-সংগ্রহের সূত্র স্থির হয়নি, পরে কোনো-না-কোনো উপায়ে তা সংগ্রহ করে খরচ মেটানো হবে।

সরকারী অংশের অর্থ-সংগ্রহের উৎস

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে কৃষি ও শিল্প-উৎপাদনের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছিল, তা আমরা দেখেছি। এখন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন প্রধান প্রধান জিনিসের উৎপাদনের লক্ষ্য সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, সংক্ষেপে তা উল্লেখ করব। পরিকল্পনা-কমিশন আশা করেন, ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায়

১৯৬০-৬১ সালে খাদ্যশস্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নতির হার হবে শতকরা ১৫ ভাগ, পাটের ক্ষেত্রে ২৫ ভাগ, তুলার ক্ষেত্রে ৩১ ভাগ, চায়ের ক্ষেত্রে ৯ ভাগ, তৈলবীজের ক্ষেত্রে ২৭ ভাগ, চিনির ক্ষেত্রে ২৯ ভাগ। ১৯৬০-৬১ সালে ইস্পাতের উৎপাদন দাঁড়াবে কিঞ্চিদধিক ৪০ লক্ষ টন। বর্তমানে ভারতে প্রতিবছর ৪৩ লক্ষ টন সিমেণ্ট ও ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টন কয়লা উৎপন্ন হচ্ছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে এই তুটি জিনিসের উৎপাদন বেড়ে গিয়ে যথাক্রমে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টন ও ৬ কোটি টন হবে। এখন আমাদের দেশে বছরে ১৭৫টি রেল-ইঞ্জিন নির্মিত হচ্ছে, প্রস্তাবিত পরিকল্পনার মেয়াদ-অন্তে বছরে ৪০০টি করে ইঞ্জিন তৈরী হবে। ওই সময়ে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের পরিমাণ এখনকার ৩৪ লক্ষ কিলোওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৯ লক্ষ কিলোওয়াট-এ গিয়ে দাঁড়াবে, এবং এলুমিনিয়াম উৎপাদিত হবে ২৫ হাজার টন। তা ছাড়া, রাসায়নিক সার, সালফিউরিক এসিড ইত্যাদির উৎপাদনও লক্ষণীয়-ভাবে বাড়বে। এতদ্ব্যতীত সমাজসেবা ইত্যাদি কার্যের পরিধি বিস্তৃত হবে, দেশে চিকিৎসক ও নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশের ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের শতকরা ৬৩ ভাগ ও ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের শতকরা ২২½ ভাগের শিক্ষাব্যবস্থা হবে। এই পরিকল্পনা-কালে সরকারের প্রচেষ্টায় ১০ লক্ষের মতো বাসগৃহ নির্মিত হবে, এরূপ আশা করা যায়। এ সময়ে ভারতে তিনটি নতুন ইস্পাত-কারখানা ও তিনটি নতুন সার-উৎপাদন-কারখানা গড়ে উঠবে। সিন্ধীর সার-উৎপাদন কারখানাটিকেও সম্প্রসারিত করা হবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদনের লক্ষ্য

এই প্রসঙ্গে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান সম্পর্কে তু-একটি কথা বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মেয়াদকালে বিভিন্ন উন্নয়ন-খাতে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করবেন সরকার। এর ফলে জাতীয় আয় ১৯৫৫-৫৬ সালের ১০৮০০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৬০-৬১ সালে ১৩৪৮০০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল ২৮১ টাকা, ১৯৬০-৬১ সালে তা বেড়ে গিয়ে ৩৩০ টাকায় দাঁড়াবে। অর্থাৎ মাথাপিছু আয় শতকরা ১৮ ভাগ বাড়বে—প্রথম পরিকল্পনার ফলে বেড়েছিল শতকরা ১১ ভাগ। সেচপরিকল্পনা, জমিসংস্কার, শিল্পসম্প্রসারণ, নানা কলকারখানাবৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি কর্মসংস্থান হবে—আনুমানিক এক কোটি লোক কাজ পাবে। এতে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হবে।

জাতীয় আয় ও কর্ম-সংস্থান কিরূপ বাড়বে

প্রথম পরিকল্পনা ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে যে লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে, সেদিকে এবার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, দ্বিতীয়টিতে অধিক জোর দেওয়া হয়েছে শিল্পের ওপর। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি যখন রচিত হয় তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও দেশবিভাগের দরুন সমগ্র ভারতে একটা ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ বেড়েছে, দেশের সর্বত্র খাদ্যাভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। খাদ্য কত বড়ো একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তা কাকেও বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে সচ্ছলতা বজায় না রাখলে অসন্তোষজনিত নিদারুণ বিপর্যয়ের সম্ভাবনা। এরূপ অবস্থায় প্রথম পরিকল্পনার রচয়িতাগণকে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনবৃদ্ধির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিনিবদ্ধ করতে হয়েছিল। তাছাড়া, শিল্প গড়ে তুলতে হলে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানী না করে উপায় নেই। সে-সময় খাদ্যশস্য আমদানী করতে গিয়ে এত টাকা খরচ হত যে তাতে বৈদেশিক মুদ্রাতহবিলে কিছুই আর থাকত না। যন্ত্রপাতি আমদানী করা তখনই সম্ভব যখন আমরা খাদ্যশস্যের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠব। এ সকল দিক বিবেচনা করেই প্রথম পরিকল্পনাকে কৃষিকেন্দ্রিক করা হল। তার ফল মোটামুটি ভালোই হয়েছে। এখন আমাদের খাদ্যাভাব ঘুচে গিয়েছে, কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বেড়েছে, বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানীর প্রয়োজন আর নেই। এতদ্ব্যতীত কাঁচা মালের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়াতে শিল্পেরও কিছুটা সুবিধে হয়েছে, আর কৃষিজ পণ্য কিছু কিছু এখন বিদেশে রপ্তানী করতে পারছি বলে আমাদের বিদেশী মুদ্রার সংস্থানও বাড়বার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সুতরাং বলা যেতে পারে, পাঁচ-ছয় বছর পূর্বেকার তুলনায় বর্তমানে দেশের আর্থনীতিক অবস্থা অনেকটা ভালো। এখন আমরা দেশে শিল্পসম্প্রসারণের দিকে মন দিতে পারি।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য

তাই পরিকল্পনা-কমিশন দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পোন্নয়নের ওপর খুব বেশি জোর দিয়েছেন। অবশ্য কৃষিব্যবস্থাকে একেবারে উপেক্ষা করা হয়নি। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায় যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাটিতে মৌলিক শিল্প ও যন্ত্রনির্মাণশিল্প সমধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। যন্ত্রপাতি তৈরী না হলে জিনিস তৈরী হয় না, ভোগ্যপণ্যশিল্পের উৎপাদন ব্যাহত হয়। এ কারণে আগে মৌলিক শিল্পগুলিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করানো প্রয়োজন। তাই এবার লোহা ও ইস্পাত, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ভারী রাসায়নিক নাইট্রোজেনাস সার ইত্যাদি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথম পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের মাত্র শতকরা

সাত ভাগ শিল্প ও খনিজ-খাতে বরাদ্দ করা হয়েছিল ; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের শতকরা ১৯ ভাগ শিল্প ও খনিজের উন্নতিবিধানের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। শিল্পসম্প্রসারণ ব্যতিরেকে-যে দেশের আর্থনীতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়, এ সত্যটি পরিকল্পনা-কমিশন বিস্মৃত হননি। কুটীরশিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসারের দিকেও তাঁদের দৃষ্টি সতত সজাগ রয়েছে। বেকারসমস্যা-সমাধানের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রশিল্পের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিরুদ্ধ-সমালোচনাও যেমন হয়েছে, তেমনি ইহা অনেকরই সমর্থন লাভ করেছে। কেউ কেউ উৎপাদনের লক্ষ্যগুলিকে অবাস্তব বলেছেন, অর্থ-সংগ্রহের ব্যবস্থা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, বেশি নোট ছাপিয়ে বাজারে চালু করলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, বিকেন্দ্রীকৃত গ্রামীণ অর্থনীতির বদলে এই পরিকল্পনা যান্ত্রিক ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে মনে করে এঁদের কেউ কেউ তেমন উৎসাহিত বোধ করছেন না। অনেকে বলেছেন, দেশের বেকারসমস্যা এতেও দূর হবে না। উক্ত বিরূপ-সমালোচনা যে একেবারে ভিত্তিহীন, এরূপ একটি কথা আমরা বলতে চাইনে। তবে বর্তমান পরিকল্পনা যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক, এর মধ্যে যে একটা বলিষ্ঠতা রয়েছে, সমাজতান্ত্রিক অর্থ-নীতির দিকে এর যে প্রবণতা আছে, তা অস্বীকার করলে চলবে না। জাতীয় পরিকল্পনার সমালোচনা করবার অধিকার সকলেরই রয়েছে, কিন্তু এই উদ্যমকে আমাদের সহযোগিতার দ্বারা কার্যকরী করে তুলতে হবে। জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া কোনো পরিকল্পনাই ফলপ্রসূ হতে পারে না। সরকারের কর্মতৎপরতা ও দক্ষতা এবং গণসহযোগিতার ওপরই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে।

বাস্তুহারার পুনর্বাসনসমস্যা

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—হিন্দুমুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ—সাম্প্রদায়িকতার শোচনীয় পরিণাম—হিন্দুদের অসহায় মনোভাব—ভারতবিভাগের ফলেই বাস্তুহারাসমস্যার উদ্ভব—বাস্তুহারাসমস্যার সমাধানকল্পে ভারতসরকারের প্রচেষ্টা—রাজ্যসরকারের অনুসৃত নীতি ও পরিকল্পনা তেমন সন্তোষজনক নয়—সুচিন্তিত পরিকল্পনার অভাব—কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব—সমস্যাটির গুরুত্ব—উপসংহার।]

বহুদিনের মুক্তিসংগ্রাম এবং বহু বৈঠকী রাজনীতিক আলাপ-আলোচনার পর ভারতবাসী তাহার সুচিরবাঞ্ছিত স্বাধীনতা লাভ করিল বটে, কিন্তু সেই

নবলব্ধ স্বাধীনতাকে কলংকিত করিল হিন্দুমুসলমানের আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িকতার তিক্ততা। ফলে এতকালের অখণ্ড ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল—সৃষ্টি হইল পাকিস্তান ডোমিনিয়ান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের। সাম্প্রদায়িকতা যে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার বিরোধী এ সত্যটি অনেকে উপলব্ধি করিলেও, ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগের প্রচেষ্টাকে তখন অবস্থাগতিকে প্রতিহত করা সম্ভব হয় নাই। অবশেষে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের কূটনীতিই জয়যুক্ত হইল। পাঞ্জাব আর বংগব্যবচ্ছেদ ভারতবিভাগেরই শোচনীয় পরিণতি। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির ফলে দেশে আজ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে জটিল আশ্রয়প্রার্থীসমস্যা বা বাস্তুহারাসমস্যা।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

ইংরেজ শাসকবর্গ ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইবার প্রাক্কালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাংগাহাংগামা সুরু হয়। তারপর প্রবল উত্তেজনার মধ্যে ভারতভূমি বিভক্ত হইয়া গেল। এরূপ অবস্থায় পাঞ্জাব ও বাংলাদেশকে আর অবিভক্ত রাখা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হইল না। সেদিন অনেকে হয়তো ভাবিয়াছিলেন, হিন্দুমুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ভারতবিভাগ হইলে সাম্প্রদায়িক কলহের অবসান ঘটিবে। কিন্তু সে ধারণা যে কতখানি ভুল তাহা প্রমাণিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না।

হিন্দুমুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ

পাঞ্জাব বিভক্ত হওয়ার সংগে সংগেই ঐ প্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলে সুরু হইল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের তাণ্ডব লীলা। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও দেখিতে দেখিতে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত প্রভাব ছড়াইয়া পড়িল। এই উন্মত্ত জিঘাংসার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল পূর্ব-পাঞ্জাবে ও দিল্লীতে। সেখানকার মুসলমানকে বিপর্যস্ত করিয়া হিন্দুরা প্রতিশোধ গ্রহণ করিল। এহেন ভয়ংকর দুর্যোগমুহূর্তে কোনো প্রকারে আত্মরক্ষা করিবার জন্য পশ্চিম-পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখরা পূর্ব-পাঞ্জাবে, এবং পূর্ব-পাঞ্জাবের মুসলমানরা পশ্চিম-পাঞ্জাবে চলিয়া আসিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পাকিস্তান ও ভারতসরকার নিরুপায় হইয়া লোকবিনিময়ের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। লক্ষ লক্ষ শিখ ও হিন্দু পশ্চিম-পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ত্যাগ করিল, অন্যদিকে কয়েক লক্ষ মুসলমান দিল্লী ও পূর্ব-পাঞ্জাব ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইল।

সাম্প্রদায়িকতার শোচনীয় পরিণাম

নানা কারণে, বিশেষ করিয়া আর্থনীতিক অনিশ্চয়তার জন্য, পশ্চিম-পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের হিন্দুগণ সেখানে আর বসবাস করা নিরাপদ মনে

করিল না। নিজেদের একান্ত অসহায় বুঝিয়া অশেষ দুর্ভাবনায় তাহারাও দলে দলে ভারতভূমিতে আসিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। সাম্প্রদায়িক বিপর্যয়হেতু বাস্তত্যাগের যে-সূচনা দেখা দিল পশ্চিম-পাকিস্তানে, তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিল পূর্ব-পাকিস্তান অঞ্চলে। পাকিস্তানরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই পূর্ববংগের হিন্দুগণ নিজেদের বহুকালের বাস্তভিটা ছাড়িয়া হাজারে হাজারে পশ্চিম-বংগে আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে। অনুমান করা যায়, এ পর্যন্ত এক কোটির মতো লোক পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া ভারতে আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছে। ভারত হইতে যে-সব মুসলমান পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা আনুমানিক তিরিশ হইতে পঁয়ত্রিশ লক্ষ। সুতরাং পাকিস্তানের তুলনায় ভারত আশ্রয়প্রার্থীসমস্যায় অধিকতর পীড়িত।

হিন্দুদের অসহায় মনোভাব

বাস্তহারাসমস্যা যে ভারতবিভাগের ফলেই উদ্ভূত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কংগ্রেস মুসলিম লীগের ধর্মভিত্তিক দেশবিভাগ-প্রস্তাব মানিয়া না লইলে আজ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, পূর্ব-পাঞ্জাব এবং পশ্চিমবংগ-সরকারকে শরণার্থীদের সমস্যা লইয়া এতখানি বিব্রত হইতে হইত না। রাজনীতিক, আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি কারণে নিজেকে বিপন্ন বোধ না করিলে মানুষ কখনও তাহার পিতৃপিতামহের বাস্তভিটা ফেলিয়া অনিশ্চিতের পথে পদক্ষেপ করে না। ইংরেজের কূটনীতির কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করিলাম, আনুষ্ঠানিক ধর্মকে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিলাম, অখণ্ড দেশের শিল্পবাণিজ্যের বিপুল সম্ভাবনাকে বিসর্জন দিলাম,—এতকিছু হারানোর মহামূল্যে পাইলাম অভিশাপগ্রস্ত স্বাধীনতা। ইহাতে হিন্দুমুসলমান কেহই লাভবান হয় নাই, উভয় সম্প্রদায়ই একরূপ আত্মহত্যা বরণ করিয়া লইয়াছে। দেশ দ্বিখণ্ডিত হইবার ফলে দুইটি রাষ্ট্রই যে শক্তিহীন হইয়া পড়িল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতবিভাগের ফলেই বাস্তহারাসমস্যার উদ্ভব

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়প্রার্থীসমস্যা বর্তমানে গুরুতর একটি সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্যা সমাধানের কিছুটা চেষ্টাও যে না করিয়াছেন—তাহা নয়। পশ্চিম-পাঞ্জাব হইতে আগত শরণার্থীদিগকে তাঁহারা কিছু-পরিমাণ আর্থিক সাহায্য দিয়াছেন। কয়েক লক্ষ মুসলমান ভারত ত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে—তাহাদের শূন্যস্থানে কিছু-সংখ্যক শরণাগতকে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাকী অংশের জন্য সরকার আশ্রয়-

বাস্তহারাসমস্যার সমাধানকল্পে ভারতসরকারের প্রচেষ্টা

শিবির নির্মাণ করিয়াছেন। যে-সব কৃষিজীবী বাস্তত্যাগ করিয়াছে তাহাদের অনেককে পূর্বপাঞ্জাব-সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার কৃষিসরঞ্জাম এবং শস্যবীজ ক্রয় করিবার নিমিত্ত ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে লোক অপসারণের দায়িত্ব ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র লইয়াছিলেন বলিয়া সেখানকার বাস্তহারাদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার অনেকখানি কর্তব্য পালন করিয়াছেন। শরণার্থীদের সাহায্য ও পুনর্বসতি-ব্যাপারে তাঁহারা একেবারে উদাসীন থাকিতে পারেন নাই।

রাজ্যসরকারের অনুসৃত নীতি ও পরিকল্পনা তেমন সন্তোষজনক নয়

কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থী সম্পর্কে রাজ্যসরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতি তেমন সন্তোষজনক নয়। পাঞ্জাবের লক্ষ লক্ষ উৎখাত হিন্দু ও শিখের জন্য সরকারী চাকুরীতে অগ্রাধিকার দান, বাসস্থান-নির্মাণ জীবিকানির্বাহের উপায় করিয়া দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যতখানি তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, ততখানি ব্যগ্রতা ও তৎপরতা পূর্বপাকিস্তানের উদ্বাস্তদের সম্পর্কে দেখা যায় না। সামান্য মুষ্টিভিক্ষা এবং কয়েকটি আশ্রয়শিবির নির্মাণের দ্বারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়প্রার্থীর গুরুতর সমস্যার সমাধান কখনও হইতে পারে না,—তাহাদের সকলের জন্য স্থায়ী বাসস্থানব্যবস্থা ও কর্মসংস্থান করিয়া দিতে হইবে।

সুচিন্তিত পরিকল্পনার অভাব

পশ্চিমবংগ-সরকার পূর্ব-পাকিস্তানের বাস্তত্যাগীদের জন্য অল্পকালীন কিংবা দীর্ঘকালীন সুচিন্তিত কোনো পরিকল্পনা আজও প্রস্তুত করেন নাই। সম্প্রতি পশ্চিমবংগ সরকার বাস্তহারার পুনর্বাসন-সম্পর্কিত একটা আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। আন্দামানেও কয়েক শত পরিবারকে বসতি স্থাপন করিবার জন্য পাঠানো হইয়াছে, ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে আশ্রয়শিবির নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে বাস্তহারাসমস্যার বাস্তব সমাধান কতখানি হইবে তাহাই ভাবিবার বিষয়। মাঝে মাঝে ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে এ সম্পর্কে চুক্তিও স্বাক্ষরিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কোনো কার্যকরী ফল পাওয়া যায় নাই। উভয় রাষ্ট্রে লোকবিনিময়ের ব্যবস্থাও সরকার সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। এরূপ একটা জটিল পরিস্থিতি সত্যই উদ্বেগজনক।

এই বাস্তহারাসমস্যার সমাধান করিবার প্রধান দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, রাজ্যসরকারের পক্ষে এরূপ প্রকাণ্ড একটা সমস্যার মীমাংসা করা সম্ভব নয়। সুতরাং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ইহার সমাধান হওয়া উচিত। কোনো বিশেষ

একটি রাজ্যে অন্যরাষ্ট্র হইতে আগত সমস্ত আশ্রয়প্রার্থীর স্থানসংকুলান হইতে পারে না।

নানাকারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়াই হতভাগ্য বাস্তত্যাগীগণ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়া ভিড় করিতেছে। তাহাদিগকে নিজেদের পরিত্যক্ত বাস্তভিটায় ফিরিয়া যাইবার উপদেশ দেওয়া বৃথা। পূর্ব-পাকিস্তানের আশ্রয়প্রার্থী সম্পর্কে বলা যায়, পশ্চিমবংগ-সরকার এইসব অসহায় নরনারীর জীবনমরণ সমস্যার গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; কিংবা পারিলেও রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হইবার কোনো সক্রিয় উদ্যম-উদ্যোগ প্রদর্শন করেন নাই। বাস্তহারাকে বাস্ত ও বৃত্তিদানের মুখ্য দায়িত্ব যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের, তথাপি ভারতসরকারকে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত করিবার দায়িত্ব যে পশ্চিমবাংলা-সরকারের, এ সত্যটি বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব

পাকিস্তান হইতে লক্ষ লক্ষ সহায়-সম্বলহীন মানুষ প্রতিদিন গ্রাম ও শহর ছাড়িয়া নিরুপায় অবস্থায় ভারতে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে। বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে ফিরিয়া যাওয়া তাহাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। সুতরাং একটি সুপরিকল্পিত পুনর্বাসন-পদ্ধতি অনুসারে এই সমস্যাটির সমাধান করিতে হইবে। বাস্তত্যাগীদের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিলে এই বিপুল বিপন্ন জনতা একটা ভয়াবহ বিপ্লব বাধাইয়া রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে পর্যন্ত সংকটাপন্ন করিয়া তুলিতে পারে। এইসব ছিন্নমূল উদ্বাস্তরা চায় স্থায়ী আশ্রয়, বৃত্তি, আর নাগরিক অধিকার। এতদুদ্দেশ্যে নূতন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন, নূতন নূতন শহর ও গ্রামপত্তনের প্রয়োজন। বিভিন্ন শ্রেণীর বাস্তত্যাগীকে তাহাদের নিজ নিজ বৃত্তি অনুযায়ী শহরে এবং গ্রামে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। তাহাদের জন্য নিরাপদ সমাজজীবন চাই, সুশিক্ষার ব্যবস্থা চাই, জীবিকার নিশ্চিত সংস্থান চাই।

সমস্যাটির গুরুত্ব

ভারতে অকর্ষিত জমির অভাব নাই—সেগুলিতে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করা হইলে, বিবিধ শিল্পের সম্প্রসারণ সাধিত হইলে বহুসংখ্যক লোকের জীবিকার্জনের পথ প্রশস্ত হইয়া উঠিবে। সমবায়পদ্ধতিতে কৃষিব্যবস্থা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান যদি গড়িয়া উঠে তবে আশ্রয়প্রার্থীর জটিল সমস্যার কিছুটা সমাধান হইতে পারে। কৃষিঋণ, শিল্পঋণ, কৃষি ও শিল্পের উপকরণ-সরবরাহ ইত্যাদির মধ্য দিয়া রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্বাসন-প্রচেষ্টাকে নিশ্চয়ই সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারেন। নানা জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপদানের মাধ্যমেও সরকার উদ্বাস্তদের জন্য নূতন জীবিকার

উপসংহার

পথ খুলিয়া দিতে পারেন। বাস্তুহারার দল যদি পুনর্বসতি ও জীবিকা অর্জনের সুযোগ লাভ করে, তাহা হইলে গলগ্রহ হওয়ার পরিবর্তে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহারা রাষ্ট্রের বিপুল শক্তির উৎস হইয়া উঠিবে। শরণার্থীদের এতবড়ো জটিল সমস্যার আশু-সমাধান অবশ্য সহজ-সাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু সুচিন্তিত পরিকল্পনা, সহানুভূতি ও দূরদৃষ্টির অভাব না ঘটিলে ধীরে ধীরে এই সমস্যা সহজ হইয়া আসিতে বাধ্য। আবার আমরা বলিতেছি, আশ্রয়প্রার্থীসমস্যা ভারত-বিভাগেরই অনিবার্য পরিণাম, এবং ইহার সমাধানের প্রধান দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের।

সর্বশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে, শরণার্থীর পুনর্বাসনের জন্য এ পর্যন্ত ভারত-সরকার প্রায় তিন-শ' কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থের বেশীর ভাগ ব্যয়িত হইয়াছে পশ্চিম-পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুগণের পুনর্বাসন-খাতে। পূর্ব-পাকিস্তান হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থিদের প্রতি ভারতসরকারের মনোভাব যে কিছুটা অনুদার, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে কি? সুখের বিষয়, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাস্তুহারার পুনর্বাসন-সমস্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনা

[**রচনার সংকেতসূত্র:** প্রারম্ভিক ভূমিকা—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও সমাজউন্নয়ন-পরিকল্পনা—পরিকল্পনার রূপরেখা : [ক] গ্রাম-একক—[খ] 'মণ্ডি' বা বাজারকেন্দ্র—[গ] উন্নয়ন ব্লক—পরিকল্পনাকেন্দ্র—মৌলিক ও মিশ্র পরিকল্পনা—পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম—পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় পরিচালনা—রাজ্যপরিচালক সংস্থা—অর্থের যোগান—পরিকল্পনা অনুসারে কাজকর্মের অগ্রগতি—পরবর্তী কার্যাবলী—জাতীয় সম্প্রসারণবিভাগ—বিরুদ্ধ-সমালোচনা—উক্ত সমালোচনা-বিশ্লেষণ—উপসংহার।]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী ভারতে 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন—সার্বজনীন প্রেমে উদ্বুদ্ধ, সত্যাশ্রয়ী, সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত, বিকেন্দ্রীকৃত রাজনীতিক ও আর্থনীতিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত এক সুন্দর বলিষ্ঠ গ্রাম্য-সমাজের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। মহাপ্রাণ গান্ধীজির সেই উজ্জ্বল স্বপ্ন তাঁহার উত্তরসাধক অনুগামীগণ কী ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, কোন্ দৃষ্টিকোণ হইতে পুনরবলোকন করিয়াছেন, এখানে তাহার বিচার না করিয়াও একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, গান্ধীজির

ভাবশিষ্যগণের মধ্যে যাঁহাদের হাতে ভারতের দায়িত্বপূর্ণ শাসনভার রহিয়াছে, তাঁহারা সমাজউন্নয়ন-পরিকল্পনার মধ্যেই জাতির চিরস্মরণীয় মহান অধিনায়কের সেই অচরিতার্থ স্বপ্নকল্পনাকে প্রত্যক্ষ বাস্তবে রূপায়িত করিয়া তুলিবার একটা পথ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। বোধ করি, এ কারণেই ভারতসরকার ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর—গান্ধীজির জন্মদিবসে—বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে আলোচ্য সমাজউন্নয়ন-পরিকল্পনার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করিয়াছেন।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও সমাজউন্নয়ন-পরিকল্পনা

দেশের বৈষয়িক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচিত হয়। কিন্তু কেবল এই পরিকল্পনার সহায়তায় পল্লীভারতের সর্বাংগীণ উন্নতিবিধান সম্ভবপর নয় বুঝিতে পারিয়াই ভারতসরকার সমাজউন্নয়ন-পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান, এখনও দেশের শতকরা তিন-চতুর্থাংশ লোক বাস করে গ্রামে, ইহাদের জীবিকা-অর্জনের প্রধান উপায় কৃষি। কাজেই সর্বতোভাবে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে না পারিলে যথার্থ বৈষয়িক উন্নতি কিছুতেই আশা করা যাইতে পারে না। এজন্য সমাজউন্নয়ন-পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অংগীভূত হইয়াছে। তবে এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার প্রধান দায়িত্ব সরকারের, কিন্তু সমাজউন্নয়ন-পরিকল্পনার সাফল্য প্রায় পনর আনাই নির্ভর করিতেছে জনসাধারণের সহযোগিতার উপর।

ভারতের গ্রামগুলির অবস্থা সত্যই শোচনীয়। এই গ্রামগুলিকে উন্নত করিয়া তুলিবার জন্যই সমাজউন্নয়ন-পরিকল্পনা রচিত। সুতরাং এই পরিকল্পনা যে স্বরূপত গ্রামকেন্দ্রিক, ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। বর্তমান

পরিকল্পনার রূপরেখা
[ক] গ্রাম-একক

পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতীয় পল্লীপুনর্গঠনের যে-ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে প্রতিটি গ্রাম-এককে [Village Unit] ১০০টি পরিবারে অনুমান ৫০০ শত জনের মতো অধিবাসী থাকিবে। পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য দুইটি পাতকূয়া বা নলকূপ কিংবা পুকুরের ব্যবস্থা থাকিবে। চাষযোগ্য জমির অর্ধেকের সেচব্যবস্থা থাকিবে এবং গ্রামের এক-তৃতীয়াংশ জায়গা গৃহনির্মাণ, গোচরভূমি, জ্বালানি কাঠের বন ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা রাখা হইবে। বড়ো রাস্তা থাকিবে উন্নয়নকেন্দ্রের প্রধান কার্যালয়ের সহিত সংযোগ রাখিবার জন্য। গ্রামে চাষী, কৃষিমজুর, কুটীরশিল্পী, কারিগর, গৃহনির্মাণশিল্পী, বণিক, পরিবহন-

কর্মী, দোকানদার, শিক্ষক, স্বাস্থ্যরক্ষাকর্মী, নাপিত, মুচি, প্রতিরক্ষাকর্মী ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তির পরিবার থাকিবে।

[খ] 'মণ্ডি' বা বাজারকেন্দ্র

জনসংখ্যা অনুসারে ১৫ হইতে ২৫টি গ্রাম লইয়া এক-একটি 'মণ্ডি' [Mandi] বা বাজারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা হইবে গ্রামগুলির প্রধান বাজার ও অন্যান্য কার্যের মুখ্য কেন্দ্র। এখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছোট চিকিৎসাকেন্দ্র, সম্প্রসারিত কৃষিব্যবস্থার প্রধান কার্যালয়, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ আপিস, পরিবহন-কর্মকেন্দ্র, প্রমোদঘর, পশুচিকিৎসালয় ও আদর্শ-গোলাঘর থাকিবে। অবশ্য অর্থাভাবের জন্য 'মণ্ডি'কেন্দ্র সম্প্রতি চালু করা হয় নাই।

[গ] উন্নয়ন-ব্লক

মণ্ডির উপর থাকিবে উন্নয়নমণ্ডল বা উন্নয়ন-ব্লক [Development Block]। চার-পাঁচটি 'মণ্ডি' লইয়া এক-একটি মণ্ডল গঠিত হইবে। কোনো একটি 'মণ্ডি'কেন্দ্রে এই মণ্ডলের প্রধান কার্যালয় বসিবে। ইহা হইবে শহর ও গ্রামের মাঝামাঝি ধরণের একটি কার্যস্থল।

[ঘ] পরিকল্পনাকেন্দ্র

তিনটি উন্নয়নমণ্ডল লইয়া গঠিত হইবে একটি পরিকল্পনাকেন্দ্র। এক-একটি কেন্দ্রে থাকিবে ৩০০ শত গ্রাম, কেন্দ্রের আয়তন হইবে ৪৫০ হইতে ৫০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা থাকিবে দেড় লক্ষ হইতে দুই লক্ষ, আর চাষের জমির পরিমাণ হইবে কমবেশী দেড় লক্ষ একর। এখানে বুনিয়াদি-শিক্ষকশিক্ষণকেন্দ্র, বিচারালয় ও সালিশি আদালত, ট্রাক্টর-সরবরাহকেন্দ্র, যন্ত্রনির্মাণকারখানা, হাসপাতাল, সমাজসেবক বা গ্রামসেবকদলের শিক্ষাকেন্দ্র, পশুপক্ষীপালনকেন্দ্র, কৃষিগবেষণা-কার্যালয় ও মৃত্তিকা-গবেষণাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

পরিকল্পনার দুইটি ভাগ : মৌলিক ও মিশ্র

সমাজউন্নয়ন-পরিকল্পনা আবার দুইভাগে বিভক্ত—মৌলিক ও মিশ্র। মৌলিক [Basic] ধরণের পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলির মুখ্য কাজ কৃষিজ উৎপাদনবৃদ্ধি। অবশ্য ইহার সংগে জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বাস্তুনির্মাণ প্রভৃতি কর্মসূচী থাকিবে। মিশ্র [Composite] পরিকল্পনার প্রধান কাজ হইল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতিসাধন ও কৃষিউন্নয়ন। বর্তমানে আমরা যে-সব সুখসুবিধা শহরে ভোগ করি, গ্রামেও তাহার ব্যবস্থা করা এই মিশ্র ধরণের পরিকল্পনার একটি বিশেষ অংগ। এতদ্ব্যতীত কর্মীদিগকে গ্রামোন্নয়নকার্য শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষাকেন্দ্রগঠনও এই পরিকল্পনার একটি বড়ো কর্তব্য।

আলোচ্যমান পরিকল্পনার কার্যাবলী—[ক] কৃষি, [খ] যোগাযোগ, [গ] শিক্ষা,

[ঘ] স্বাস্থ্য, [ঙ] ট্রেনিং, [চ] নিয়োগ, [ছ] গৃহনির্মাণ, [জ] সমাজকল্যাণ—এই আটটি মুখ্যভাগে বিভক্ত। উক্ত কাজগুলি নিম্নলিখিত ভাবে সম্পাদিত হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে : [ক] কৃষিসম্পর্কিত কাজ হইবে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য শস্যোৎপাদনবৃদ্ধি, এবং এই উদ্দেশ্যে পতিত জমি সংস্কার ও কর্ষণযোগ্য নতুন জমিসংগ্রহ, সেচব্যবস্থা, ভালো বীজ, সার ও আধুনিক চাষের যন্ত্রপাতি-সংগ্রহ, পশুচিকিৎসা, মাছের চাষ, সব্জীবাগান, পশুপ্রজনন ও পালনাদির ব্যবস্থা করা। [খ] যোগাযোগক্ষেত্রের কাজ হইল রাস্তানির্মাণ, পাকা রাস্তার সংখ্যাবৃদ্ধি ও পরিবহন তথা পশুবাহিত যানবাহন ইত্যাদির উন্নতি-সাধন করা। [গ] শিক্ষাব্যবস্থাতে আবশ্যিক অবৈতনিক শিক্ষাদানের এবং মধ্য ও উচ্চবিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার কথা আছে। সেই সংগে সমাজসেবামূলক শিক্ষাদানের ও গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের কথাও রহিয়াছে। [ঘ] পরিকল্পনা-রচয়িতাগণ জনস্বাস্থ্যের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রতিষেধক টীকার ব্যবস্থা, হাসপাতাল-প্রতিষ্ঠা, ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা এবং প্রসূতিকল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ে খুব বেশী নজর দেওয়া হইয়াছে। [ঙ] ট্রেনিং-ব্যবস্থায় কারিগর, শিক্ষক ও সমাজের অন্যান্য সমস্ত কর্মীকে যাবতীয় কাজ হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। [চ] আমাদের দেশের শতকরা ষাট জন লোক বেকার। এই পরিকল্পনায় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে, নানান্ ব্যবসায়ে এবং অন্যান্য গ্রামোন্নয়নকর্মে এইসব বেকার মানুষকে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে। [ছ] পরিকল্পনা-রচয়িতারা সুন্দর ও মজবুত নূতন নূতন গৃহনির্মাণের কথাও বলিয়াছেন। [জ] সমাজকল্যাণক্ষেত্রে গ্রামবাসিদের জন্য নানারূপ আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে। নিজ নিজ রুচি অনুসারে জনসাধারণ নৃত্য-গীত-যাত্রার আনন্দ উপভোগ করিবে, রেডিও শুনিবার সুযোগ পাইবে, বিচিত্র খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে।

পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলী

উপরে যে-বিষয়গুলি বর্ণিত হইল, এগুলি বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিলে, সরকার মনে করেন, গ্রামে শতকরা ৫০ ভাগ খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং লোকের আয় শতকরা ৩৫ ভাগ বাড়িয়া যাইবে।

এই পরিকল্পনার কর্মসূচী দুইটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ পরিচালনা করিবেন ফোর্ড-প্রতিষ্ঠানের [Ford Foundation] আর্থিক সহায়তায় ভারতসরকারের খাদ্য ও কৃষি-দপ্তর ; দ্বিতীয় অংশের পরিচালক সমাজউন্নয়নসংস্থা [Community Development Administration], —ভারত-মার্কিন-কারিগরী-

পরিকল্পনার পরিচালনা-ভার

সহযোগিতা-চুক্তি অনুসারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য করিবে। সমাজউন্নয়ন-পরিকল্পনার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে রাজ্যসরকারের উপর। তবে প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারকে সহায়তা করিবেন। অবশ্য পরিকল্পনার কাজ ঠিকমতো চলিতেছে কিনা তাহা তদারক করিবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। সে যাহা হোক, বর্তমান পরিকল্পনার নিয়ন্ত্রণক্ষমতা এইভাবে বণ্টন করা হইয়াছে :

সমাজউন্নয়ন সংস্থা

উপরে আমরা যে-সমাজউন্নয়নসংস্থার কথা বলিয়াছি, তাহাকে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি বা সমিতি বলা যাইতে পারে। ইহা সমাজউন্নয়ন-পরিচালক [Administrator] ও সমাজউন্নয়ন নিয়ন্ত্রকের [Director] অধীনে কাজ করিবে। এই নিয়ন্ত্রক হইবেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি। পরিকল্পনার পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রীয় কমিটির পরামর্শ শুনিয়া চলিবেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইবেন এই কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, এবং পরিকল্পনা-কমিশনের সদস্যবৃন্দ ও প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ও কারিগরী-শিক্ষানিপুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহার সভ্য হইবেন।

রাজ্য-উন্নয়ন কমিটি

রাজ্যগুলিতে একটি রাজ্যউন্নয়ন কমিটি [State Development Committee] থাকিবে। মুখ্যমন্ত্রী ইহার সভাপতি হইবেন, এবং প্রধান পরিচালক হইবেন উন্নয়ন-কমিশনার। এতদ্ব্যতীত উন্নয়নমন্ত্রী, কৃষি ও পূর্তমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ থাকিবেন। বিভিন্ন প্রধান বিভাগের কর্মসচিবদের লইয়া উপদেষ্টাকমিটি গঠিত হইবে। ইহা ছাড়া পরিকল্পনার প্রয়োগক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের স্থানীয় সদস্য, জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য প্রভাবশালী কর্মীদের লইয়া উপদেষ্টাসমিতি থাকিবে।

অর্থের যোগান

এই পরিকল্পনার জন্য যে-বিপুল অর্থের প্রয়োজন তাহা সরবরাহ করিবার উৎস হইল যুগপৎ দেশী ও আমেরিকান তহবিল। এই দুইটি তহবিল মিলিয়া অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৬৫ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া ফোর্ড-প্রতিষ্ঠানের অছিগণ ভারতকে দুই দফায় এক কোটির কিছু বেশী টাকা আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমাজউন্নয়ন-খাতে ৯০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে।

পরিকল্পনার অগ্রগতি

কিন্তু সমগ্র পরিকল্পনাটি এক সংগে গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের ২রা অক্টোবর কেবল ভারতের কিঞ্চিদধিক এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চলে [৫৫টি উন্নয়নকেন্দ্রে]

ইহার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম ছয়মাস কার্য অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। কারণ, প্রাথমিক নানা কাজের জন্য কর্মীদল যথার্থ উন্নয়নকার্যে হাত দিতে পারেন নাই। ইহার পর হইতে কাজগুলি সুনিশ্চিতভাবে অগ্রসর হইতেছে।

পূর্বে আমরা বলিয়াছি, সমাজউন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যক্রম দুইটি পৃথক অংশে বিভক্ত হইয়াছে। নিম্নে আমরা তাহার পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি :

ভারত-মার্কিন-কারিগরী-সহযোগিতা-তহবিল ও সমাজউন্নয়নসংস্থা কর্তৃক পরিচালিত			যৌথ প্রচেষ্টা	ফোর্ড-প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিদপ্তর দ্বারা পরিচালিত	
রাজ্যসমূহ	পরিকল্পনা-অঞ্চল	উন্নয়ন-ব্লক	শিক্ষাকেন্দ্র	পরিকল্পনা-অঞ্চল	শিক্ষাকেন্দ্রসহ উন্নয়ন-অঞ্চল
'ক' রাজ্য	৩২	১৬	১৬	৩	৪
'খ' রাজ্য	১১	২	৬	৪	১
'গ' রাজ্য	২	৮	৩	৩	—
মোট	৪৫	২৬	২৫	১০	৫

১৯৫২-৫৩ সালে যে-কাজ ৫৫টি উন্নয়নকেন্দ্রে ৮১টি ব্লকে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাদের সামগ্রিক আয়তন ২৬, ৯৫০ বর্গমাইল। মোট গ্রামসংখ্যা ১৮,৪৬৪ এবং গ্রামবাসিদের সংখ্যা প্রায় এক কোটি ৫২ লক্ষ। ১৯৫৩-৫৪ সালে আরও ৪৮টি ব্লক কার্যের প্রয়োগাধীনে আনা হইয়াছে, এবং ইহাদের অন্তর্ভুক্ত গ্রামের সংখ্যা চারি হাজার আট শত। পরিকল্পনা-কমিশন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শীঘ্রই বাকি সাতটি ব্লক খুলিয়া দিবেন।

পরবর্তী কার্যাবলী

ইহার সংগে পরিকল্পনা-কমিশন একটি জাতীয়-সম্প্রসারণ-বিভাগের [National Extension Service] গঠন অনুমোদন করিয়াছেন। ১৯৫৩ সালের ২রা অক্টোবর হইতে জাতীয়-সম্প্রসারণ-বিভাগ কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে, এই বিভাগের সরকারী কর্মচারিগণ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতেছেন। সমাজউন্নয়ন-পরিকল্পনার কর্মীগণকে প্রয়ো-

জাতীয়-সম্প্রসারণ-বিভাগ

জনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলি বর্তমানে পরিকল্পনার অন্যতম অংগ।

সমগ্র সমাজউন্নয়ন-পরিকল্পনাটির প্রতি বহু সমালোচক কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে আমেরিকার কাছে ভারতবাসীর মর্যাদা, এমন কি, ভারতকে বিক্রয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আবার, কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন, ইহা দ্বারা ভারতে শিল্পোন্নতি ব্যাহত হইবে। ইঁহাদের মতে, ভারতকে কৃষির উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখিবার জন্য ও আমেরিকায় উৎপাদিত শিল্পপণ্য ভারতে চালাইবার উদ্দেশ্যে ইহা আমেরিকার একটি কৌশল। আবার, কাহারো মতে কৃষির প্রধান সমস্যা জমি, কিন্তু জমি সম্বন্ধে কোনো কথা ইহাতে উল্লেখ করা হয় নাই।

পরিকল্পনার বিরুদ্ধ-সমালোচনা

এ রকমের বিরুদ্ধ-সমালোচনা অনেক আছে, এবং তাহার সবগুলিই যে অসার ও অযৌক্তিক, এমন নয়। তবে উক্ত সমালোচনা-বিষয়ে দু-একটি কথা বলা যাইতে পারে। ইহা সত্য যে, সমাজউন্নয়ন-পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে আমাদিগকে মার্কিন সাহায্যের উপর অনেকখানি নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু আমরা আমেরিকার অর্থ গ্রহণ করিতেছি ঋণ-হিসাবে। বিদেশী ঋণগ্রহণকে বিদেশীর কাছে আত্মবিক্রয় বলা যায় কি? যে-দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপন্ন হয় না, যে-দেশে শতকরা ৮০ জনেরও অধিক পল্লীর অধিবাসী এবং কৃষি যাহাদের প্রধান উপজীবিকা, সে-দেশে কৃষিউন্নয়নের প্রতি যত্নশীল হওয়া দোষজনক কিছুই নয়। কৃষিব্যবস্থা উন্নত না হইলে ভারতের আর্থিক অসচ্ছলতা কিছুতেই ঘুচিবে না—এমন কি, ব্যাপক শিল্পায়ন সত্ত্বেও। ভূমিব্যবস্থা পরিবর্তনবিষয়ে সরকার উদাসীন রহিয়াছেন, এমন কথা বলা চলে না। জমিদারীপ্রথা বর্তমানে দেশ হইতে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। সুতরাং জমির মালিকানা সম্পর্কে কোনো কথা সমাজউন্নয়ন-পরিকল্পনায় না থাকিলেও তজ্জন্য সরকারের প্রতি তেমন দোষারোপ করা চলে না।

সমালোচনা-বিশ্লেষণ

বস্তুত এই পরিকল্পনার আসল ত্রুটি হইল জনসাধারণের সমর্থন লইয়া। দেশবাসী বর্তমান পরিকল্পনাকে নিজেদের কাজ বলিয়া ঠিক আন্তরিক ভাবে যেন গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। অথচ সমাজউন্নয়ন-পরিকল্পনার সাফল্য প্রায় পনর আনা নির্ভর করে দেশবাসীগণের সক্রিয় সহযোগিতা ও সদিচ্ছার উপর। সরকারী কর্মচারীদের

আসল ত্রুটি

আমলাতন্ত্রী মনোভাব এক্ষেত্রে সুনিশ্চিত ব্যর্থতার কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। অবশ্য পরিকল্পনা-কমিশন তাহা বুঝিয়াই কর্মী তৈয়ারী করিবার জন্য অনেকগুলি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। কেবল সদিচ্ছা নয়,—নৈপুণ্য, অভিজ্ঞতা, ধৈর্য ইত্যাদি গুণ লইয়া কর্মীদল যদি এই পরিকল্পনা সার্থক করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হন, তবে হয়তো সমালোচকের বহু আশংকা দূরীভূত হইবে।

মনে রাখিতে হইবে, বর্তমানে ভারতের প্রধান সমস্যা হইতেছে বিপুল জনসংখ্যা ও ইহাদের কর্মসংস্থান। এই বিপুল জনশক্তিকে সুশৃংখলভাবে কর্মে নিযুক্ত করিতে পারিলে আমাদের ভবিষ্যৎ যে সুন্দর হইয়া গড়িয়া উঠিবে, সে-বিষয়ে কোনো সংশয় থাকিতে পারে না। এজন্য যুগপৎ কৃষি ও শিল্পের উন্নতি-বিধান আবশ্যক। আর, যেহেতু ভারতের লোক-

উপসংহার

সংখ্যার দশ ভাগের আট ভাগ গ্রামেরই অধিবাসী, সেহেতু আমাদের উন্নয়নপ্রচেষ্টা গ্রামকেন্দ্রিক হইতে বাধ্য। কৃষি, কুটীরশিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির নানাদিকে দৃষ্টি রাখিয়া একই সংগে কার্য আরম্ভ করিবার জন্য এমন একটি বিরাট পরিকল্পনার যে প্রয়োজন ছিল তাহা অবশ্যস্বীকার্য। ভারতসরকার সদ্‌বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াই এরূপ একটি সময়োচিত কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এখন ইহার ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করিয়া ইহাকে সফলতামণ্ডিত করিয়া তোলার দায়িত্ব অনেকখানি জনসাধারণের। আশা করি, এই দায়িত্ব-বিষয়ে দেশের জনগণ সচেতন হইয়া উঠিবেন, এবং তাহা হইলেই পল্লীভারতের সর্বাংগীণ উন্নতি আমাদের স্বপ্নকল্পনারই বস্তু হইয়া থাকিবে না—বাস্তব সত্যে পরিণত হইবে।

পশ্চিম বঙ্গে জমিদারীপ্রথালোপ

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—জমিদারীপ্রথা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন—ইহাতে জমিদারগণের ভাগ্য ফিরিল, কিন্তু দেশের অমংগল হইল—জমিদারীপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন—সাম্প্রতিক কালে সরকার কর্তৃক 'ভূমিরাজস্ব-কমিশন' নিয়োগ—১৯৫৩ সালে জমিদখল-আইনের প্রবর্তন—মধ্যস্বত্বভোগী কাহারা—কোন্ কোন্ জমি সরকার নিজ দখলে আনিবেন—জমি হস্তান্তর করার বিষয়ে সরকারী ঘোষণা—সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য—ক্ষতিপূরণের কথা—উপসংহার।]

মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'সাম্য' নামক প্রবন্ধের এক জায়গায় মন্তব্য করিয়াছেন ঃ 'এই পৃথিবীর ভূমিতে রাজার যে-অধিকার, ভিক্ষুকেরও সেই

অধিকার। ভূমি সকলেরই, কাহারও নিজস্ব নহে।' সর্বশোষণমুক্ত, দেশকাল-নিরপেক্ষ ভাবী সমাজব্যবস্থার যে গম্ভীর আহ্বানমন্ত্র এই উক্তির মধ্যে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী-উচ্ছেদ-আইন সেই শোষণ-মুক্তির দিকে যে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ত্রুটিবিচ্যুতিহীন নয়, নিখুঁত নয়, একথা যেমন সত্য,—আবার উচ্চ আদর্শের নির্ভুল পথে অগ্রগতির দিকে ইহা প্রথম প্রশংসনীয় প্রয়াস, তাহাও তেমন সত্য।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

যে-বৃদ্ধ জমিদারীপ্রথার শ্মশানভূমিতে দাঁড়াইয়া আজ আমরা নূতন ভূমিব্যবস্থার উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখিতেছি, তাহার সুদীর্ঘ ১৬০ বৎসরাধিক জীবৎকালের প্রভাব বাঙালীর আর্থনীতিক জীবনের বহু ভালোমন্দের সহিত মিশিয়া স্থায়ী ইতিহাসের উপাদান হইয়া রহিয়াছে। এই জমিদারীপ্রথার উদ্ভব, পরিপুষ্টি ও অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে বর্তমান ও ভবিষ্যতের মূল্যায়ন করিতে হইবে।

পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীকালের রাজনীতিক অনিশ্চয়তা, দেশময় ঘোর অরাজকতা, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর—এই বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে, মুখ্যত কোম্পানীর লাভের দিকে নজর রাখিয়াই, লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন। অবশ্য তিনি ইহাও মনে করিয়াছিলেন যে, এই ব্যবস্থায় জমিদার ও প্রজাসাধারণ সকলেরই উপকার হইবে। স্থির হইল, সেই সময়ে নির্ধারিত নির্দিষ্ট আয়ের $\frac{১০}{১১}$ অংশ রাজস্বহিসাবে কোম্পানী বা সরকার পাইবেন, আর বাকি $\frac{১}{১১}$ অংশ পাইবেন জমিদার। তখন জমির বার্ষিক মোট আয় ছিল চার কোটি টাকার মতো। এই টাকার উপরই ওই হিসাব হইয়াছিল। ইহার উপর যাহা-কিছু আয় বাড়িবে, তাহার সবটাই জমিদারের—উহাতে সরকারের কোনো অংশ থাকিবে না। শুধু নির্দিষ্ট তারিখে রাজস্ব পৌঁছাইয়া দিতে পারিলেই জমিদার নিষ্কণ্টক জমিদারী ভোগ করিতে পারিবেন।

জমিদারীপ্রথা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন

ফলে জমিদারগণ আয় বাড়াইবার দিকে দৃষ্টি দিলেন। প্রথম প্রথম গ্রামের তথা জনসাধারণের কিছুটা উপকার হইল। গ্রামগুলি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। জমিদার গ্রামেই থাকিতেন। তারপর নাগরিক জীবনের আকর্ষণে জমিদারগণ যখন শহরের দিকে ধাবিত হইলেন, গ্রাম তথা সাধারণের দুরদৃষ্ট দেখা দিল তখন হইতেই। জমি ও জমিদারী তখন হইল যেন অর্থদোহনের কপিলেশ্বরী গাভী। প্রজাসাধারণের অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হইয়া

ইহাতে জমিদারগণের ভাগ্য ফিরিল, কিন্তু দেশের অমংগল হইল

উঠিল। বাংলা দেশে জমিদারীর আয় বাড়িয়া দাঁড়াইল প্রায় পনর কোটি টাকার মতো, অর্থাৎ প্রথম দিকের বাৎসরিক আয়ের প্রায় চতুর্গুণ। সুতরাং এগার কোটি টাকার কাছাকাছি দাঁড়াইয়াছিল জমিদারদের নিজস্ব আয়—যাহার একটা পয়সাও সরকারী রাজস্বে যাইত না। ব্রিটিশ-ভারত-এলাকার মোট উনিশ ভাগ ভূমি চিরস্থায়ী ব্যবস্থার আওতায়। কাজেই, শুধু প্রজাদের যে অসুবিধা হইতেছিল, তাহা নয়—ব্রিটিশ সরকারও লোকসানটা বেশ অনুভব করিতেছিলেন।

এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে প্রজাদের অধিকার লইয়া দেশময় নানা ধরণের আন্দোলন হইয়াছে, এবং ইহার ফলে প্রজাদের অনুকূলে প্রজাস্বত্ব-সম্পর্কিত বিবিধ আইন প্রবর্তিত হইয়াছে। প্রথম এইজাতীয় আইন প্রবর্তিত হয় ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে। ইহার পর খ্রীস্টীয় ১৮৮৫, ১৯২৮, ১৯৩৮, ১৯৪১, ১৯৪৭ সালে প্রজাস্বত্ব-আইন নানাভাবে সংশোধিত হয়। তাহাতে প্রজাদের অনেক রকমের সুবিধা হইল বটে, কিন্তু জমির মালিকানাস্বত্ব তাহাদের হাতে আসিল না। আগে দখলীভুক্ত জমির গাছ কাটা বা তাহাতে কূপ খনন করার কোনো অধিকার প্রজাদের ছিল না। জমি তাহারা বিক্রয় করিতে পারিত না, বাকি খাজনার দায়ে জমিদার সহজেই জমি কাড়িয়া লইতে পারিতেন। উপরে কথিত আইন-প্রবর্তনের ফলে এসব অব্যবস্থার অনেকখানি সংশোধন হইল। কিন্তু জমির মালিক জমিদারই রহিয়া গেলেন। কাজেই, মূল-সমস্যা-সমাধানের অভাবে প্রজার অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল, কৃষির উৎপাদন কমিয়া গেল, দেশের খাদ্যাবস্থা অবনতির দিকে চলিল।

জমিদারীপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন

এইসব কারণে জমিদারীপ্রথার প্রশ্নটি সরকার আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করিলেন। এ সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য তদানীন্তন বাংলা-সরকার ১৯৩৮ সালে স্যর ফ্রান্সিস্ ফ্লাউডের নেতৃত্বে 'ভূমিরাজস্ব-কমিশন' নামে একটি কমিশন নিয়োগ করেন। ইহা 'ফ্লাউড কমিশন' নামেও প্রসিদ্ধ। জমিদার-প্রতিনিধিদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৪০ সালের রিপোর্টে কমিশন জমিদারীপ্রথার বিলোপসাধনের সপক্ষে নিজ মত প্রকাশ করেন। কমিশনের মতে সরকারের কর্তব্য —অধিকারভোগের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া সমানুপাতিক হারে খেসারতের ভিত্তিতে জমিদার ও সর্বস্তরের মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকার ক্রয় করিয়া লওয়া। ১৯৪৩ সালে হকমন্ত্রীসভা বাংলা দেশে জমিদারী-বিলোপের নীতি ঘোষণা করেন, এবং একটি ট্রাইবুনাল বসাইয়া খেসারতের হার-নির্ধারণের সিদ্ধান্ত করেন।

সাম্প্রতিক কালে সরকার কর্তৃক 'ভূমিরাজস্ব-কমিশন' নিয়োগ

উক্ত সূত্রানুসারেই জমিদারী-বিলোপের জন্য ১৫৯৩ সালের মে মাসে পশ্চিম বংগ বিধানসভায় 'জমিদখল-বিল'টি উপস্থাপিত হয়। ইহা ওই বৎসরই যথাক্রমে আইনসভা ও বিধানপরিষদে গৃহীত হইল, এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করিয়া অধুনা আইনে পরিণত হইয়াছে। এই আইনটি সাতটি পরিচ্ছেদে ও ৫৯টি ধারায় বিবৃত হইয়াছে। ইহা পরিকল্পিত নূতন ভূমিব্যবস্থার একাংশমাত্র। অর্থাৎ, এই আইনের মুখবন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা সরকার কেবল জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের নিকট হইতে জমি হাতে লইবেন। ভূমি কী ভাবে প্রজাদের মধ্যে বিতরিত হইবে, তাহার জন্য নূতন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন।

১৯৫৩ সালে জমি-দখল-আইনের প্রবর্তন

মধ্যস্বত্বভোগীদের দখলে যে-জমি রহিয়াছে উহাই সরকার হাতে লইবেন। সুতরাং মধ্যস্বত্বভোগী কাহারা, তাহা আগে জানিয়া লইতে হইবে। জমিদারের নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইয়া যে-সব খুদে জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি ভদ্রসন্তানগণ নিজেরা বা মজুর খাটাইয়া জমি চাষ না করিয়া ওই জমি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে পত্তনী দিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই বলা হইয়াছে মধ্যস্বত্বভোগী। কিন্তু এখানে উল্লেখনীয়, জমির একটি বড়ো অংশ রহিয়াছে জোতদারদের হাতে, এবং প্রচলিত আইনে রায়ত বলিয়া আখ্যাত হইলেও, আসলে ইঁহারা পত্তনীদার, অর্থাৎ জমি নিজেরা চাষ না করিয়া কৃষকদের হাতে দিয়া মধ্যস্বত্ব ভোগ করেন। সুতরাং রায়ত হইলেও, মধ্যস্বত্বভোগী বলিয়া ইঁহাদেরও আইনের আওতায় আনা হইয়াছে।

মধ্যস্বত্বভোগী কাহারা

এই আইনের দ্বারা সরকার সমস্ত জমি অধিকার করিতে পারিতেছেন না। কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকা, বাস্তুজমি, মিউনিসিপালিটি এলাকায় পাকা বাড়ী, চা-বাগান, কলকারখানার জমি, পঁচিশ একরের কম অকৃষি খাস জমি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষের ও সমবায় সমিতির জমি বর্তমান আইনের আওতায় পড়ে না। ইহা ছাড়া, মধ্যস্বত্বভোগীরা নিজেদের হাতে নিম্নলিখিত অধিকারগুলি রাখিতে পারিবেন: নিজের বসতবাটি, পাকাবাড়ীযুক্ত জমি, চাষের কাজে অব্যবহার্য খাস অধিকারভুক্ত পনর একর জমি [কিন্তু বসতবাটি-সমেত ইহার পরিমাণ কদাচ কুড়ি একরের বেশী হইবে না], খাস অধিকারে পঁচিশ একর পর্যন্ত চাষের জমি, মাছের চাষের পুকুর, ফলের বাগান, পশু ও পক্ষীপালন-ক্ষেত্র, দুগ্ধোৎপাদনাদির জন্য ব্যবহৃত জমি, সাধারণ কোনো অনুষ্ঠানের জন্য প্রদত্ত বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান কিংবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানাদির জন্য প্রদত্ত জমি। অবশ্য এইসব

কোন কোন্ জমি সরকার নিজ দখলে আনিবেন

জমি যদি উপযুক্ত কাজে না লাগাইয় ফেলিয়া রাখা হয়, তবে সরকার ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিয়া আপন অধিকারে আনিতে পারিবেন। আর, এই আইনের আওতায় যে-সব ভূমি পড়ে, তাহাদের সমস্ত স্বত্ব বাংলা ১৩৬২ সালের পয়লা বৈশাখের মধ্যে রাজ্যসরকারের হাতে আসিবে। [১৩৬২ সাল এখন অতিক্রান্ত]

জমি হস্তান্তরিত করার বিষয়ে সরকারী ঘোষণা

আলোচ্যমান আইনের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যদি কেহ—ভূমি-দখল বিলটি আলোচনার কালে—বিধিবদ্ধ হইবার পরে—কোনো রকম দলিলের মাধ্যমে জমি হস্তান্তরিত করে, তবে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। বলা হইয়াছে, ১৯৫৩ সালের ৫ই মে তারিখের পর আইন এড়াইবার উদ্দেশ্যে যে-সব সম্পত্তি হস্তান্তর করা হইয়াছে সেগুলি বাতিল হইবে। অবশ্য যে-সম্পত্তি দাতা ও গ্রহীতার প্রকৃত প্রয়োজনে হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহা আইনসংগত বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগীদের দখলে যে-পরিমাণ জমি থাকিবে বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার অধিক পরিমাণ দখলে রাখা বে-আইনী হইবে।

সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

রাজ্যসরকার মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রাপ্য বাকি খাজনা আদায় করিয়া দিবেন, এবং পারিশ্রমিক বাবদ আদায়ের অর্ধেক টাকা সরকার পাইবেন। আর, মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে সরকারের যে-বাকি খাজনা ও ট্যাক্স পাওনা আছে, তাহাও কাটিয়া রাখিবেন। এমন কি, ক্ষতিপূরণের টাকা হইতেও তাহা কাটিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ক্ষতিপূরণের কথা

সরকার কী ভাবে ক্ষতিপূরণ দিবেন, সে সম্বন্ধেও ব্যবস্থা হইয়াছে। এই টাকার কিছুটা অংশ নগদে এবং বাকিটা বার্ষিক শতকরা তিন টাকা সুদে ২০ বৎসরের মেয়াদী সরকারী ঋণপত্রে দেওয়া হইবে। জমিদখলজনিত ক্ষতিপূরণের হার বার্ষিক নীট আয়ের হিসাবে নিম্নোক্ত প্রকার হইবে বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ-সরকার স্থির করিয়াছেন:

প্রথম	৫০০ টাকার জন্য	নীট আয়ের ২০ গুণ
পরবর্তী	৫০০ টাকার জন্য	নীট আয়ের ১৮ গুণ
পরবর্তী	১,০০০ টাকার জন্য	নীট আয়ের ১৭ গুণ
পরবর্তী	২,০০০ টাকার জন্য	নীট আয়ের ১২ গুণ
পরবর্তী	১০,০০০ টাকার জন্য	নীট আয়ের ১০ গুণ
পরবর্তী	১৫,০০০ টাকার জন্য	নীট আয়ের ৬ গুণ
পরবর্তী	৮০,০-০ টাকার জন্য	নীট আয়ের ৩ গুণ
পরবর্তী	ঊর্ধ্ব সংখ্যক টাকার জন্য	নীট আয়ের ২ গুণ

জমির মালিককে নগদ টাকা দিবার হার নিম্নরূপ :

নীট আয়ের টাকার জন্য		শতকরা দেওয়া হইবে
প্রথম	২৫০	১০০ টাকা
পরবর্তী	২৫০	৫০ টাকা
পরবর্তী	৫০০	৪৫ টাকা
পরবর্তী	২,০০০	৪৫ টাকা
পরবর্তী	২,০০০	৩০ টাকা
পরবর্তী	২৫,০০০	২৫ টাকা
পরবর্তী	৭০,০০০	২০ টাকা
পরবর্তী	১,০০,০০০	১৫ টাকা
পরবর্তী	ঊর্ধ্ব সংখ্যার জন্য	১২ টাকা

পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই আইনটি ত্রুটিমুক্ত নয়। কারণ, কলিকাতাকে বাদ দেওয়া, চা-বাগানের বিরাট সম্পত্তিকে ইহার আওতার বাহিরে রাখাটা অনেকে কায়েমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকতা বলিয়া মনে করেন।

উপসংহার

ক্ষতিপূরণের কথাটাও অনেকে পুঁজিপতি ও মালিক-তোষণ বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহার বিপরীত সমালোচনাও আছে। সবকিছু মানিয়া লইলেও, ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, এই আইনটি পশ্চিম-বঙ্গের জনগণের বিচিত্র সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনের অরুণোদয়ের দিকে নিশ্চিত ইংগিত। ইহার দ্বিতীয়াংশে ভূমিবিতরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আরো দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার সহিত বিবেচিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

যুদ্ধ ও বিশ্বশান্তি

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** ভয়াবহ দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম—যুদ্ধের মূলীভূত কারণ—প্রথম যুদ্ধের অবসানে বিজয়ীপক্ষের ঘোষণা—মিত্রশক্তি নিজেদের ঘোষিত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই—যুদ্ধবিজয়ী সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির অসততা—এ যুগের আত্মঘাতী 'অতি-সাম্রাজ্যবাদ'—অস্ত্রের দ্বারা অস্ত্রকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব—বিশ্বশান্তি আসিবে কোন্ পথে—রাষ্ট্রসংঘের শান্তিস্থাপনপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার কারণ—উপসংহার।]

ভয়াবহ দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম

অবশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শ্মশান-প্রান্তরে বসিয়া আমরা শুনিলাম মিত্রশক্তির বিজয়বার্তা। এই যুদ্ধজয়ের মূল্য—অজস্র শোণিতপাত—অগণিত মানুষের আত্মবলি। এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের হাত হইতে পৃথিবী মুক্তিলাভ করিল। উনিশ-শ' উনচল্লিশ সালে জার্মানীর পোল্যাণ্ড-অভিযানের ভিতর দিয়া ইউরোপে সর্বাত্মক সংগ্রামবহ্নি জ্বলিয়া উঠে, উনিশ-শ' একচল্লিশ সালে জাপানের অতর্কিত পার্লহারবার-আক্রমণে সেই অগ্নিশিখা এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে। ইহার পরে সুদীর্ঘ ছয়টি বছরের ইতিহাস স্বেদ, অশ্রু ও শোণিতের লেখায় অংকিত।

জার্মানী, জাপান ও ইতালী—এই তিনটি অক্ষশক্তি আজ শুধু পরাজিত নয়, মিত্রশক্তির পদতলে অবলুণ্ঠিত। ইংলণ্ড যুদ্ধে জয়ী হইল বটে, কিন্তু ইহার জন্য তাহাকে দিতে হইয়াছে অপরিসীম মূল্য। ইংরেজ জাতি আজ হৃতসর্বস্ব—কেবল আমেরিকাই আজ বিজয়উল্লাসে উল্লসিত। আমরা দেখিলাম, পশুবল আর মানবসত্যের বিরোধী জিগীষা ও জিঘাংসার উপর সাম্রাজ্যের যে-ভিত্তি গড়িয়া উঠে, তাহা পশুশক্তিরই প্রচণ্ড অভিঘাতে একদিন তাসের ঘরের মতো ভাঙিয়া পড়িতে বাধ্য।

যুদ্ধের মূলীভূত কারণ

কেন এই যুদ্ধ? মানুষের দুর্নিবার লোভ, পৃথিবীর গণনাতীত মানুষকে নির্মম শোষণে সর্বরিক্ত করিবার সর্বনাশা আকাংক্ষা, উগ্র জাতীয়তাবশে উপনিবেশ স্থাপনের কুৎসিৎ ছলনা ও চাতুরী রহিয়াছে এই বিশ্ব-সংগ্রামের মূলে। সংগ্রামের আর্থনীতিক কারণের সংগে ইহার রাষ্ট্রনীতিক কারণগুলিও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জাতিতে জাতিতে নিষ্ঠুর সংঘাতের এই মূলীভূত কারণ-গুলি বিদূরিত করিতে পারিয়াছে কি? যুদ্ধের অবসান ঘটিল, কিন্তু বিশ্বের কোটি কোটি আর্ত মানবের আকাংক্ষিত শান্তির শুভ্র ছায়া কোথায়?

প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানী সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার কালে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছিলেন: 'পৃথিবী হইতে ভাবীযুদ্ধের কারণ আজ

দূরীভূত হইল।' ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর সুরে সুর মিলাইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট বলিয়াছিলেন : 'এই যুদ্ধের সংগেই সাম্রাজ্যিক শোষণ এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের সকল বীজ নষ্ট হইল।' কিন্তু তাঁহাদের বিঘোষিত সেই ভবিষ্যৎ-বাণী সত্য হয় নাই। কেন? ইহার উত্তর হইল, যুদ্ধের আর্থনীতিক কারণগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না ঘটিলে বিশ্বব্যাপী সংগ্রামের বিলুপ্তি কখনও ঘটিতে পারে না। সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার উদগ্র লালসা, উপনিবেশ স্থাপনের কুটিল চক্রান্ত, শোষণভিত্তিক পুঁজিবাদ, শিল্পে অনগ্রসর দেশে লাভজনক অর্থবিনিয়োগ প্রভৃতি যে-সব কারণে যুদ্ধ বাধে ভার্সাই-সন্ধি সেই কারণগুলির কোনও প্রতিকার করিতে পারে নাই। ঐ সন্ধির মূলেই ভাবীযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে বিজয়ীপক্ষের ঘোষণা

প্রথম মহাযুদ্ধ-অবসানের পর পৃথিবীর মানবসমাজ বিশ্বব্যাপী শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিল—কিন্তু সেই স্বপ্ন স্বপ্নই রহিয়া গেল। সামরিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ পঁচিশ বছরের ব্যবধানেই তাহার দানবীয় হিংস্রতাকে লইয়া পুনর্বার জগৎসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকেও আমরা শুনিয়াছি সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার কথা। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামও শেষ হইল, কিন্তু পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়া আসিল না—ফিরিয়া আসিবার কোনো লক্ষণ এখন পর্যন্ত দৃষ্ট হইতেছে না। মিত্রশক্তি বারবার ঘোষণা করিয়াছে, এই যুদ্ধ ন্যায় ও সত্যের জন্য, অত্যাচারীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। শত্রুর আঘাত হইতে মিত্রশক্তি অবশ্য আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু ন্যায়ধর্ম, সত্যধর্মের এতটুকু মর্যাদা তাহারা রক্ষা করিতে পারে নাই।

মিত্রশক্তি নিজেদের ঘোষিত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই

এই যুদ্ধ যদি দুর্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচারের পথ রুদ্ধ করিতে পারিত তবে মানুষের এত দুঃখলাঞ্ছনাকে আমরা সার্থক মনে করিতাম। কিন্তু যুদ্ধাবসানে নির্যাতিত মানবজাতি মুক্তিলাভ করিল কোথায়? জাপানের আত্মসমর্পণের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বলিয়াছেন : 'It is a victory of liberty over tyranny'। কিন্তু পৃথিবীর পরাধীন জাতি তাহাদের হৃত স্বাধীনতা কি ফিরিয়া পাইয়াছে? অত্যাচারীর উৎপীড়ন, ধনতান্ত্রিক চক্রান্ত আর সাম্রাজ্যবাদীর দম্ভ অদ্যাবধি পূর্বের মতোই বর্তমান রহিয়াছে। ইহার প্রমাণ—যুদ্ধকালীন সান্‌ফ্রান্‌সিসকো-সম্মেলনে উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা পাইবার দাবী যুদ্ধবিজয়ী

যুদ্ধবিজয়ী সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির অসততা

সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলি স্বীকার করিতে কুণ্ঠা জানাইয়াছে। ভার্সাই-সন্ধিসর্তের অন্তরালে যেমন গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিল ভাবী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ, তেমনি পট্‌স্‌ডাম-ঘোষণা আর অতলান্তিক চুক্তির মধ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে ভাবী তৃতীয় সার্বিক যুদ্ধের প্রলয়ংকর বিস্ফোরণের স্ফুলিংগ।

এ যুগের আত্মঘাতী 'অতি-সাম্রাজ্যবাদ'

আজ হয়তো ফ্যাসীবাদ, নাৎসীবাদ কিংবা জাপানের সামরিকবাদ আপাতদৃষ্টিতে পংগু হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের কি অবসান ঘটিয়াছে? জাপান ও জার্মানীকে হীনবল করিবার জন্য মিত্রশক্তি বদ্ধপরিকর, কিন্তু ব্রিটেন, আমেরিকা এবং রাশিয়া নিজ নিজ সামরিক শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছে। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি সংঘবদ্ধ হইয়া অস্ত্রবলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। কিন্তু এই 'অতি-সাম্রাজ্যবাদ' নিজের মধ্যেই লুকাইয়া রাখিয়াছে হিংসা ও ধ্বংসের বীজ। যে-দিন এই হিংসা ও প্রতিযোগিতার বীজ শাখাপ্রশাখায় আত্মবিস্তার করিবে, সেদিন কোন্ শক্তি সর্বনাশা সংগ্রামকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে?

অস্ত্রের সহায়তায় অস্ত্রকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব

আজিকার দিনের গোপন অস্ত্র আণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা—যাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, রাশিয়া ইত্যাদির একচেটিয়া সম্পত্তি বলিয়া ঘোষিত হইতেছে—কাল তাহা হয়তো অপরাপর রাষ্ট্রের কাছে গোপন থাকিবে না, হয়তো ইহা অপেক্ষা ভীষণতর কোনো মারণাস্ত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে আবিষ্কৃত হইবে। আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রের উদ্ভাবিত প্রচণ্ড শক্তিধর বোমাকে 'ইন্দ্রের বজ্র' আখ্যা দিয়া অনেকে হয়তো নিরাপত্তার হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রের বজ্রকে প্রতিরোধ করিবার শক্তিও আছে—বিষ্ণুর 'সুদর্শন-চক্র'। সুতরাং অবিশ্বাস, ঈর্ষা, ঘৃণা, প্রতিশোধপ্রবৃত্তির সাহায্যে যুদ্ধকে চিরকালের জন্য দমন করা যাইবে না। পরাজিত জাতিকে তাহার স্বাধিকার ফিরাইয়া না দিলে, মৈত্রী ও প্রীতির বন্ধনে তাহাকে বাঁধিতে না পারিলে, দুর্বলকে শোষণ করিবার প্রবৃত্তি সমূলে উৎপাটিত না করিলে, সাময়িক বিরতির পর আবার যুদ্ধের ভয়াবহ আত্মপ্রকাশ অবশ্যম্ভাবী।

বিশ্বশান্তির অভ্যুদয় হইবে কোন্ পথে? সর্বজাতির, সর্বমানবের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়া যদি বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি মানুষ-হিসাবে প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা স্বীকৃত হয়, ধনতন্ত্রের চিতাভস্মের উপর যদি সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, তবে হয়তো পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়া আসিবে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুঁজিপতির লাভালাভের প্রশ্নই বড় হইয়া দেখা দেয়। অতিরিক্ত লাভের মোহই

উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার দিকে তাহাদিগকে ক্রমাগত আকর্ষণ করিতে থাকে। কিন্তু পৃথিবী যতই বিপুল হোক, ইহার ব্যাপ্তি অসীম নয়। সেজন্য নূতন উপনিবেশ স্থাপন যখন আর সম্ভব হয় না, তখন প্রাচীন উপনিবেশগুলিকে করতলগত করিবার জন্য শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দেখা দেয় দারুণ সংঘর্ষ—ইহাকেই বলি আমরা সংগ্রাম। কিন্তু সমাজতন্ত্রী উৎপাদনব্যবস্থায় লাভের কোনো প্রশ্ন থাকে না—সুতরাং সেখানে পররাজ্য শোষণের স্থানও নাই। ভূমি ও মূলধনকে সমস্ত সমাজের সম্পত্তি করিয়া তুলিতে পারিলে আর্থনীতিক ও রাজনীতিক বৈষম্য ও অনাচারের হাত হইতে মানুষ রক্ষা পাইবে।

বিশ্বশান্তি আসিবে কোন্ পথে

সংগ্রামকে সংগ্রাম দ্বারা প্রতিরোধ করা যায় না—যুদ্ধের মূল কারণগুলিকে দূর করিতে পারিলেই তবে যুদ্ধের সম্ভাবনা বিদূরিত হইবে। বর্ণবৈষম্য ও বর্ণবিদ্বেষ, জাতিবৈর, সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক আধিপত্য পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া না গেলে যুদ্ধাবসানের কোনো আশা নাই। বৈদেশিক প্রভুত্ব কোনো দেশই বিনাপ্রতিবাদে মানিয়া লইতে চাহিবে না, এবং কাহারো স্বাধীনতার দাবীকেও কোনো রাষ্ট্র ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

বাদবিসম্বাদ চাপা দিয়া কিংবা জোড়াতালি দ্বারা কিছুকাল থামাইয়া রাখিতে পারিলেই আসল সমস্যার সমাধান হইবে না। ভিতরে ভিতরে অসন্তোষ বা অশান্তির বারুদ ধূমায়িত হইবার সুযোগ পাইলে তাহার ফলে একদিন বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী। রাষ্ট্রসংঘের শান্তিস্থাপনপ্রচেষ্টা এই কারণেই ব্যর্থ হইতেছে। অতলান্তিক চুক্তি এই কারণেই চুক্তিবহির্ভূত রাষ্ট্রের সন্দেহ ও প্রতিবাদ জাগাইয়াছে। আর্থনীতিক বনিয়াদেও যে-বৈষম্য আজ বিকট আকার ধারণ করিয়াছে, অবিলম্বে তাহারও সামঞ্জস্যবিধান করিতে হইবে। রাজনীতিক সাম্রাজ্যবাদ যদি আর্থনীতিক সাম্রাজ্যবাদের আসন অধিকার করে, কিংবা রাজনীতিক প্রভুত্বাবসানের যবনিকাপাতের পরেই যদি আর্থনীতিক প্রভুত্বপ্রসারের অভিনয় আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সে পটপরিবর্তন দ্বারা বিশ্বশান্তিপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না।

রাষ্ট্রসংঘের শান্তিস্থাপন-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার কারণ

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইগুলিই বর্তমান পৃথিবীর দুরারোগ্য ব্যাধি। যাঁহারা ঘোষণা করেন যে, আমাদের সংগ্রাম নৈতিক সংগ্রাম, 'তাঁহারাও যেমন বিশ্ববাসীকে প্রতারিত করেন—যাঁহারা অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া বলেন, আমাদের আবেদন শান্তি ও ঐক্যের আবেদন তাঁহারাও ক্ষুধার্তকে দুঃখের পথে

প্রলুব্ধ করেন। ধনদান নহে, মানদানও নহে—শক্তিদানই জগতের শ্রেষ্ঠ দান। কে কাহাকে কত শক্তিশালী করিবার সাহায্য করিতেছে, তাহার দ্বারাই তাহাদের আন্তরিকতা ও সততা প্রমাণিত হইবে।

উপসংহার

সংগ্রাম লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করিয়াছে, কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব মৃত্যুহীন; সেই অপরাজেয় মনুষ্যত্বের উদ্বোধনই মানুষকে যুদ্ধের হাত হইতে মুক্তি দিতে পারে। সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা, ক্ষমা, উচ্চতর জীবনাদর্শের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে বিশ্বশান্তির সোনার কাঠি। তাহারই যাদুস্পর্শে মানুষের হিংসাপ্রমত্ত চিত্তে আসিবে বিস্ময়কর পরিবর্তন। অস্ত্রবলে, পশুবলে পৃথিবীতে কোনদিনই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না—হইতে পারে না।

বিজ্ঞান ও মানবসভ্যতা

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—প্রকৃতি-মানবের সংগ্রামে সর্বশেষে মানুষই জয়ী হইয়াছে—বিজ্ঞানের অভিযান—বিজ্ঞানসাধনা ও মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ—বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার—পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান—চিকিৎসাবিজ্ঞান—বিজ্ঞান মানুষের জ্ঞানসাধনাকে বিশ্বমুখী করিয়া তুলিয়াছে—উপসংহার।]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

সৃষ্টির আদিম যুগে এ পৃথিবীতে সবচেয়ে অসহায় জীব ছিল মানুষ। যেদিন সে প্রথম চোখ মেলিয়া চাহিল, নিজের চতুষ্পার্শ্বে দেখিতে পাইল প্রকৃতির ভয়াল কুটিল রূপ—ভয়ংকরী প্রকৃতি বুঝি করাল মুখব্যাদান করিয়া সেদিন ভয়াতুর মানবশিশুকে গ্রাস করিতে উদ্যত। সেদিন মানুষের দেহে ছিল না কোনো আচ্ছাদন, ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য তাহার হাতের কাছে ছিল না এককণা আহার্য, হিংস্র শ্বাপদের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য ছিল না কোনোরূপ অস্ত্র, আত্মরক্ষা করিবার জন্য ছিল না এতটুকু নিরাপদ আশ্রয়। সে তখন সম্পূর্ণ নিঃসম্বল, একেবারে অসহায়। প্রতিকূলা নিসর্গপ্রকৃতির নিষ্ঠুর ভ্রূকুটি সেই আদিম যুগে মানুষকে নিশ্চয়ই শংকাবিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু পরম বিস্ময়ের ব্যাপার, নিদারুণ প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করিয়াও এই মর্তভূমির মানবশিশু আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, চারিদিকের ভীষণতার কাছে আত্মসমর্পণ সে করে নাই। এই অভাবনীয় ঘটনা কেমন করিয়া সম্ভব হইল? ইহার একটি মাত্র উত্তর—মানুষের শাণিত বুদ্ধি, অন্তর্নিহিত জ্ঞানশক্তি আর বিপুল সৃজনীপ্রতিভার বলে।

মানুষের যাত্রা শুরু হইয়াছে সেই কোন্ স্মরণাতীত কালে—ইহা অশ্রান্ত, অপ্রতিহত। মানবের এই সুদীর্ঘকালের যাত্রার ইতিহাস, তাহা উদ্ধত প্রকৃতির সহিত নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামেরই কাহিনী। প্রকৃতি মানুষকে কত ভয় দেখাইয়াছে, তাহার প্রতি-পদক্ষেপে দুর্লংঘ্য বাধার সৃষ্টি করিয়াছে; তথাপি পথচলায় সে বিরত হয় নাই, নিজের চলতাধর্মকে ক্ষণকালের জন্যও পরিহার করে নাই। প্রকৃতি-মানবের এই যে সংগ্রাম, এ সংগ্রামে অবশেষে মানবসন্তানেরই জয়বার্তা ঘোষিত হইয়াছে। মানুষ ধীরে ধীরে প্রকৃতির হাত হইতে কাড়িয়া লইল তাহার রহস্যভাণ্ডারের চাবি, জানিয়া লইতে লাগিল বিপুল-ব্যাপ্ত জড়বিশ্বের বিচিত্র তথ্য, সেগুলিকে গ্রথিত করিল কার্যকারণসূত্রে—নবজন্ম সূচিত হইল বিজ্ঞানের।

প্রকৃতি-মানবের সংগ্রামে সর্বশেষে মানুষ জয়ী হইয়াছে

বিজ্ঞানের জন্মলগ্নে রহিয়াছে মানুষের প্রয়োজনসাধনের তাগিদ। কিন্তু মানুষ শুধু প্রয়োজনের দাস নয়। প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করিয়া ক্রমশ সে পা বাড়াইয়াছে অপ্রয়োজনের উদার ক্ষেত্রে—সীমাহীন কৌতূহলের জগতে। জানার আনন্দ, প্রকৃতির রহস্য-আবরণ উন্মোচনের মহতী প্রেরণা মানুষকে আকর্ষণ করিয়াছে দুরধিগম্য অজানিতের দিকে। তাই বিজ্ঞানের অভিযান অশ্রান্ত, বিজ্ঞানীর সাধনা অতন্দ্র—বিজ্ঞানসাধকের দল মাতিয়া রহিয়াছে নিত্যনূতন উদ্ভাবনে। বিজ্ঞান আজ তাহার পদচিহ্ন অংকিত করিয়া দিয়াছে স্থলে-জলে-নভোদেশে—পরিদৃশ্যমান এই বিরাট বিশ্বজগতের সর্বত্র। দূরকে সে নিকট করিয়াছে, অদৃশ্যকে দৃশ্য করিয়া তুলিয়াছে—অজানাকে সম্পূর্ণ জানিয়া লইবে, ইহাই তাহার কঠিন পণ। আজ মানবসভ্যতার যে-অভ্রংলিহ সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার পিছনে বিজ্ঞানের দান অসামান্য। আধুনিক সভ্যতা ও বিজ্ঞান অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত।

বিজ্ঞানের অভিযান

সভ্যতার ক্রমবিবর্তনপথে অগ্রসর হইয়া বর্তমানে আমরা বিজ্ঞানসমৃদ্ধ যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমরা আজ আর সেই অনেক-শতাব্দী পূর্বেকার অরণ্যচারী ভ্রাম্যমাণ জীবন যাপন করি না। মানুষের মনে আজ আদিম যুগের সেই অসহায়তার ভাব নাই। বিজ্ঞান আমাদের অস্বাচ্ছন্দ্য, আমাদের দুর্বলতা অনেকখানি বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। সন্ধানী মানুষের চোখে আলোকশিখা জ্বালিবার কৌশলটি যেদিন ধরা পড়িল, যেদিন মানুষ আবিষ্কার করিল বাষ্পশক্তি, সেদিন সূচিত হইল বিজ্ঞানের জয়যাত্রার প্রথম অধ্যায়। বিশ্বচারী তমসার ঘন

বিজ্ঞানসাধনা ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ

আস্তরণকে মানুষ কৌশলে অপসারিত করিল, বাষ্পীয় শক্তিকে কাজে লাগাইয়া পৃথিবীর দূরত্ব সে ঘুচাইয়া দিল। জেম্‌স্ ওয়াট কর্তৃক স্টীমইঞ্জিনের উদ্ভাবন মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে একটি অবিস্মরণীয় দান। রেলস্টীমার উদ্ভাবিত হওয়ায় জলপথে-স্থলপথে মানুষের গতিবিধি নিরংকুশ হইয়া উঠিল—পৃথিবীর সর্বমানবের মিলনের ক্ষেত্রটি বাধামুক্ত হইল। বিজ্ঞানের অভিযান সুরু হইয়াছে কোন্ সুদূর অতীতে, কিন্তু উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে ইহার অগ্রগতি বিস্ময়কর।

বিদ্যুৎশক্তির আবিষ্কার মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও দূরদূরান্তে গতিবিধির ক্ষেত্রটি সহস্রগুণ প্রশস্ত করিয়া তুলিল। বৈদ্যুতিক বাতি, বৈদ্যুতিক পাখা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশনযন্ত্র প্রভৃতি বস্তু বিদ্যুৎতরংগের রহস্যময় শক্তির খেলাকে আশ্রয় করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তড়িৎতরংগের মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রান্তের সংবাদ মুহূর্তমধ্যে অপর প্রান্তে গিয়া পৌঁছাইতেছে। গৃহাভ্যন্তরে বসিয়া বসিয়া বর্তমানে আমরা অবলীলাক্রমে বহির্বিশ্বকে দেখিয়া লইতেছি—বড়ো পৃথিবী আমাদের কাছে আজ করতলে আমলকবৎ একটি বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। অধুনা মানুষের বহুবিধ দুরারোগ্য ব্যাধিকে দমন করিবার উদ্দেশ্যেও চিকিৎসাবিজ্ঞান বিদ্যুৎশক্তির সহায়তা গ্রহণ করিতেছে। শুধু তাহা নয়। বিজ্ঞানী তাহার বুদ্ধি খাটাইয়া মুক্তপক্ষ বিহংগের মতো কেমন সহজে আজ আকাশদেশে উড়িয়া বেড়াইতেছে ব্যোমযানের সাহায্যে। এরোপ্লেনে চড়িয়া শূন্যপথে আমরা এখন ঘণ্টায় তিনশত মাইল অতি সহজে উত্তীর্ণ হইতেছি।

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার

পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কার সত্যই বিস্ময়াবহ। অধ্যাপক রণ্টজেনের আবিষ্কৃত 'রঞ্জনরশ্মি' ও অধ্যাপক কুরী ও মাদাম কুরীর আবিষ্কৃত 'রেডিয়াম' বিজ্ঞানজগতে যুগান্তর আনিয়াছে। রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে শরীরের অদৃশ্য বস্তু দৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে, রেডিয়াম ক্যানসারের মতো ভয়ংকর ক্ষতের মারাত্মক বিষক্রিয়াকে অনেকটা প্রতিহত করিয়াছে। একালের আর-একটি যুগান্তকারী ঘটনা আণবিক শক্তির আবিষ্কার। একটি আণবিক বোমার ধ্বংসকারী শক্তি লক্ষ লক্ষ ডিনামাইটের শক্তির চেয়েও বেশী। ইহার ভীষণতা-দর্শনে মানুষ আজ ভীতিস্তম্ভিত—বিমূঢ়। কেবল ধ্বংসসাধনের কাজে প্রয়োগ না করিয়া, এই আণবিক শক্তিকে বিজ্ঞান যেদিন মানবকল্যাণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবে সেদিন মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে অত্যুজ্জ্বল এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইবে। 'র‍্যাডার বিম'-এর উদ্ভাবন এ যুগের বিশেষ একটি উল্লেখনীয় ঘটনা।

পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞান

বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইহার সাহায্যে ইংলণ্ড জার্মানীর প্রচণ্ড বিমানহানার হাত হইতে কিছুটা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

রসায়নবিজ্ঞান চিকিৎসাবিজ্ঞানের সহায়ক। চিকিৎসাবিজ্ঞানকে নানা-ভাবে সহায়তা করিয়া রসায়নবিজ্ঞান ব্যাধিগ্রস্ত মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হইতে ফিরাইয়া আনিতেছে। পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, ক্লোরোমাইসিটিন প্রভৃতি ঔষধ আবিষ্কৃত হওয়ায় এখন লক্ষ লক্ষ মানুষ বহুবিধ ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতেছে। পূর্বে ক্ষিপ্ত কুকুর-শৃগাল প্রভৃতির দংশনে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া কত মানুষ মারা যাইত, পাস্তরের ইনজেকশন আবিষ্কৃত হওয়ায় সেই ভয়ের হাত হইতে মানুষ আজ মুক্ত। একদিন বসন্ত-রোগ লোকালয়, গ্রামের পর গ্রাম, উৎসন্ন করিয়া দিয়াছে, জেনর-এর আবিষ্কৃত 'ভ্যাক্সিন' এই দুরন্ত রোগের প্রতিষেধক। অধুনা সর্পবিষকে বিজ্ঞানীরা ক্যানসার-রোগে প্রয়োগ করিতেছেন। অনুবীক্ষণ-যন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে আমরা নানারকমের সাংঘাতিক জীবাণুর সন্ধান পাইয়াছি। এ সব অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণের কাছে এখন মানুষ একান্ত অসহায়ভাবে আর আত্মসমর্পণ করিবে না।

চিকিৎসাবিজ্ঞান

মানবসভ্যতার বিকাশের গতি দ্রুততর করিয়াছে মুদ্রাযন্ত্র। এই যন্ত্রটি নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানের একটি বড়ো দান। ইহা মানুষের জ্ঞানসাধনাকে কতখানি যে বিশ্বমুখী করিয়া তুলিয়াছে, তাহা ভাষায় বলিয়া শেষ করা যায় না। সবাক চলচ্চিত্র, রেডিওফোন ইত্যাদির উদ্ভাবন মানুষকে আনন্দদান ও শিক্ষাপ্রচারের ক্ষেত্রে বিপ্লবসাধন করিয়াছে। দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের দূরযানী দৃষ্টি আকাশলোকের গোপন রহস্যের আচ্ছাদন উন্মুক্ত করিয়াছে।

বিজ্ঞান মানুষের জ্ঞান-সাধনাকে বিশ্বমুখী করিয়া তুলিয়াছে

বিজ্ঞান মানুষের নানা অভাব ঘুচাইয়াছে, মানুষকে আনন্দ দিয়াছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করিয়াছে, শক্তিমান করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের দান সংখ্যাতীত। আধুনিক যুগটিকে বিজ্ঞানপ্রভাবিত যান্ত্রিক যুগ বলিলে কিছুই ভুল বলা হয় না। বিজ্ঞানের শক্তিবলে একালের মানুষ সত্যই বিশ্বজয়ী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, বিজ্ঞানের যুগান্তকারী সকল আবিষ্কার মানবজাতির কল্যাণসাধনে প্রযুক্ত হয় নাই। বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কার একদিকে যেমন সভ্যতা-বিকাশে সহায়তা করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি সভ্য মানুষের যুগযুগান্তের কীর্তিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার উন্মত্ত প্রয়াসেরও সহায়ক হইয়াছে। পর-পর দুইটি বিশ্বসংগ্রামের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা আমাদের একথার সত্যতার প্রমাণ-পরিচয় বহন

উপসংহার

করিতেছে। অবশ্য ইহা বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীর দোষ নয়—দোষ হইতেছে লোভী মানুষের সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির, দোষ শক্তিস্পর্ধিত ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার। আত্মঘাতী জিগীষাকে, দানবীয় প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারকে মানুষ যেদিন দমন করিতে শিখিবে, যেদিন মানুষের চিত্তে জাগ্রৎ হইবে মহত্তর মানবতাবোধ, সেদিন সভ্যতার সংকট আর দেখা দিবে না। মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বধর্মের উপর আস্থা আমরা কখনো হারাইব না। তাহার চিত্তে অবশ্যই একদিন শুভবোধের উদ্বোধন হইবে, এবং এই শুভবোধই তাহাকে পরিচালিত করিবে বৃহত্তর সমাজকল্যাণের অভিমুখে। বিজ্ঞানসাধনাকে ধর্মসাধনার সহিত যুক্ত করিতে পারিলে বিজ্ঞানের অভিযান শুভংকর হইয়া উঠিবে,—পৃথিবীর অগণিত মানুষ আজ সেই মংগল-প্রভাতের প্রতীক্ষায় দিন কাটাইতেছে।

বিজ্ঞান কী চায়ঃ জীবন, না মৃত্যু

[**রচনার সংকেতসূত্রঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—আধুনিক যুদ্ধ ও বিজ্ঞান—একালের যুদ্ধ সম্পূর্ণ যান্ত্রিক—হিংসা কেবল হিংসাকেই সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে—বিজ্ঞান সভ্যতাকে কোন্ সর্বনাশের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—আজ কেন বিজ্ঞানের এই মৃত্যুর সাধনা—পুঁজিবাদী মানুষের বিকৃত ক্ষুধার ভয়াবহ পরিণাম—নাজী জার্মানী ও সামরিকবাদী জাপান—উদ্ধত পশুশক্তির পরাভব অবশ্যম্ভাবী—উপসংহার।]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

মানবসভ্যতার ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহের রক্তলেখা কতবার চিহ্নিত হইল। আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জৈব প্রেরণা মানুষকে বারংবার ঠেলিয়া দিয়াছে ভয়াল সংগ্রামের মুখে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আজিকার বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষে মানুষে কত পাশবিক হানাহানি আমরা দেখিলাম—দেখিলাম জিগীষা ও জিঘাংসার ছিন্নমস্তারূপ। কুরুক্ষেত্র, লংকা ও ট্রয়ের সংগ্রামকাহিনী কত কবির লেখায় অবিস্মরণীয় হইয়া আছে—থার্মপলি, হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ মানুষকে ভয়চকিত করিয়াছে। সেকালের মানুষ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচয় দিয়াছে নিজের বাহুবলের—বীরত্বের। রণনীতি তখনও মানবতা ও ধর্মবোধকে নির্লজ্জভাবে লংঘন করে নাই। সেদিন ছিল বিজ্ঞানের শৈশব।

কিন্তু আজিকার দিনের যুদ্ধবিগ্রহের এ কী ভয়ংকর রূপ! বিজ্ঞানের অগ্রগতির সংগে সংগে রণনীতি ও সমরকৌশল অভাবনীয়রূপে পরিবর্তিত হইয়া

গিয়াছে। আধুনিক যুগে ধর্মবোধ ও সত্যের স্থান নাই, বাহুবলের প্রয়োজন নাই, সমরক্ষেত্রের পরিধিও এখন সর্বব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রতিক কালের যুদ্ধ বাহুবলের নয়—অস্ত্রবলের। মানুষের বুদ্ধির সূক্ষ্মতা তাহার দৈহিক শক্তিকে আজ বহুদূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। আধুনিক সংগ্রাম যে এতখানি সর্বনাশা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে বিজ্ঞানের নিত্যনূতন মারণ-অস্ত্রের আবিষ্কার। তাই সমগ্র বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর দিকে বিমূঢ় বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। মানুষের মনে আজ বারংবার জাগিতেছে একটি-মাত্র প্রশ্ন : বিজ্ঞান কী চায়—সভ্যতার অগ্রগতি, না বিনাশ? জীবন, না মৃত্যু?

আধুনিক যুদ্ধ ও বিজ্ঞান

প্রথম মহাযুদ্ধেও মারণ-অস্ত্রের এমন ভয়াবহ আত্মপ্রকাশ দেখা যায় নাই। পরিখার অন্তরালে থাকিয়া সংগ্রাম পরিচালনা করা এবং দূরপাল্লার কামানে শত্রুকে বিপর্যস্ত করিয়া তোলাই ছিল সেই যুদ্ধের বিশিষ্ট রূপ। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে আবিষ্কৃত হইল ব্রিটিশ-ট্যাংক। ইহাতে যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইল, সূচিত হইল জার্মানীর পরাজয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ-অস্ত্র আরও ভয়ংকর, তাহার দানবীয় শক্তি শত সহস্র গুণ বেশী মারাত্মক। মাত্র দুইটি আণবিক বোমার প্রলয়ংকর বিস্ফোরণে অগণিত অধিবাসীসহ জাপানের দুইটি শিল্পসমৃদ্ধ নগরী মুহূর্তে পৃথিবীর বুক হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

একালের যুদ্ধ সম্পূর্ণ যান্ত্রিক

একদিকে আক্রমণ, অন্যদিকে আত্মরক্ষা—ফলে প্রতিদিন আরো উগ্র হইয়া উঠিতেছে বিজ্ঞানীর সন্ধানতৎপরতা। একটি মারাত্মক অস্ত্রকে প্রতিহত করিবার জন্য উদ্ভাবিত হইতেছে অন্য একটি ততোধিক মারাত্মক অস্ত্র। বোমারু বিমানের জন্য সৃষ্টি হইল বিমানধ্বংসী কামান, বিষবাষ্পকে প্রতিরোধ করিতে আসিল গ্যাসমুখোস, মাইনের পরিবর্তে আসিল মাইনঝাঁটানো অস্ত্র, গোলাবারুদের পরিবর্তে আসিল ফেরো-কংক্রিটের পাষাণগাঁথুনী, ট্যাংকের পরিবর্তে আসিল ট্যাংকধ্বংসী অস্ত্র, সাবমেরিণের টরপেডো-আক্রমণকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সৃষ্টি হইল 'ডেপ্‌থ চার্জ', শত্রুবিমানের অবস্থিতি জানিবার জন্য আবিষ্কৃত হইল 'র‍্যাডার-বীম্'। আবার, এ্যাটম বোমাকে প্রতিহত করিবার জন্য বিজ্ঞানীর লেবোরেটরীতে গবেষণা চলিতেছে বৈদ্যুতিক তরংগের। এখানেই শেষ নয়। সম্প্রতি ইয়োরোপীয় জাতিগুলি হাইড্রোজেন বোমার যে-ভয়ংকর পরীক্ষাকার্য চালাইতেছে, তাহার সংবাদ পৃথিবীর মানুষকে ভীতিবিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

হিংসা কেবল হিংসাকেই সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে

হিংসা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে হিংসাকে। ইহার সম্মুখে বিশ্বের নরনারী আজ যূপকাষ্ঠবদ্ধ মৃত্যুমুখী বলির পশুর মতো ভয়ার্ত—অসহায় মানুষের দুই চোখে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি। বিজ্ঞান মানবসভ্যতাকে কোথায় টানিয়া নিতেছে ?

সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিবার জন্যই কি বিজ্ঞানীর অতন্দ্র সাধনা ? কেবল যুদ্ধকে ভয়াবহ করিয়া তোলার জন্যই কি বিজ্ঞানের অভিযান ? যে-প্রকৃতির হাতে মানুষ ছিল ক্রীড়নক মাত্র, যে-প্রকৃতির প্রতিকূল শক্তির সংগে নিরন্তর মানুষকে সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইয়াছে, সেই প্রকৃতির দুর্জয় শক্তির উপর জয়ী হইবার প্রয়োজনে একদিন আরম্ভ হইয়াছিল বিজ্ঞানের সাধনা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দ মানুষের কল্যাণের জন্য ডুব দিয়াছিল রহস্যসমুদ্রে। সেই রহস্যের আবরণ উন্মোচন করিয়া মানুষের আশ্চর্য প্রতিভা আবিষ্কার করিয়াছে কত গোপন সম্পদ ও শক্তি। জলে, স্থলে, নভোদেশে—সর্বত্রই মানুষের আজ অপ্রতিহত অভিযান। বিজ্ঞান একদিন ভয়ংকরকে শুভংকর করিয়া তুলিয়াছিল—সত্য, সুন্দর ও মংগল ছিল বিজ্ঞানীর সাধনার মূলমন্ত্র। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামশীল মানুষের জীবনে যে-বিজ্ঞান শক্তি ও শান্তির বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিল, সে-বিজ্ঞানই আজ নূতন করিয়া সৃষ্টি করিতেছে মানুষের ধ্বংসের পথ। তবে কি বিশ্বশান্তি ও কল্যাণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দান ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে ?

বিজ্ঞান সভ্যতাকে কোন্ সর্বনাশের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে

বিজ্ঞানীর কাছে মানুষের ঋণ অপরিমেয়—বিজ্ঞানের কল্যাণপ্রসূ দান অবশ্য-স্বীকার্য। এখন প্রশ্ন, এ যুগের বিজ্ঞানীদল বিশ্বধ্বংসের কাজে আপনার শক্তি ও মনীষা নিয়োজিত করিল কেন ? জীবনসাধনার পরিবর্তে কেন তাহাদের এই মৃত্যুর সাধনা ? কোন্ শক্তির কাছে বিজ্ঞানী তাহার মহান্ আদর্শ, সমস্ত বিবেকবুদ্ধি বিক্রয় করিয়া জনকল্যাণের ক্ষেত্রে দেউলিয়া সাজিয়া বসিল ? মানবসভ্যতা যে আজ ধ্বংসোন্মুখ, ইহার জন্য কি বিজ্ঞানীরাই দায়ী, না অপর কোনো দানবীয় শক্তি ?

আজ কেন বিজ্ঞানের এই মৃত্যুর সাধনা

আধুনিক রাষ্ট্রধর্ম ও সমাজব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ইহার পিছনে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে মুষ্টিমেয় মানুষের সীমাহীন লোভ, পরজাতিকে শাসন ও শোষণের হিংস্র প্রবৃত্তি। এই পুঁজিবাদী মানবগোষ্ঠীর রক্তমুখী স্বার্থের কবলে পড়িয়া গোটা পৃথিবী আজ আর্ত ও নিপীড়িত। সেই স্বার্থান্ধ ধনিকশ্রেণীর কাছে জগতের বিজ্ঞানীরাও নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি-প্রতিভা বিকাইয়া দিয়াছে। রাষ্ট্রের স্বার্থই বর্তমানে মানবতার ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পুঁজিবাদী মানুষের বিকৃত ক্ষুধার ভয়াবহ পরিণাম

তাই আজ তথাকথিত সভ্য দেশগুলিতে দেখিতেছি, রাষ্ট্রের জন্যই মানুষের মূল্য—মানুষের সর্বাংগীণ কল্যাণবিধানের জন্য রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নয়। জীবনাদর্শের এই যে বিপর্যয়, আজ ইহারই জন্য সাম্রাজ্যবাদ ক্ষুধার্ত গরুড়ের মতো সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে, আর মানুষ দিন দিন নামিয়া আসিতেছে পশুত্বের স্তরে। আধুনিক রাষ্ট্রের এই অশুভ বুদ্ধির প্রভাবে আদর্শভ্রষ্ট হইয়া আজিকার বিজ্ঞানী বিশ্বে নরমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ইন্ধন যোগাইতে আগাইয়া আসিয়াছে।

নাৎসী জার্মানী ও
সামরিকবাদী জাপান

নাৎসী-জার্মানী ও সামরিকবাদী জাপানের দিকে একবার দৃষ্টি ফিরাইলে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। উগ্র জাতীয়তাবাদ এই দুইটি রাষ্ট্রের জনগণের দৃষ্টিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। যুদ্ধকালীন জার্মানীর প্রচারসচিব ডাঃ গোয়েবেল্‌স-এর মুখে আমরা শুনি : 'Intellectual activity is a danger to the building of character' এবং রোজেনবার্গের মুখে শুনি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আদর্শ হইবে—'not to teach objective science, but the militant, the warlike, the heroic'। সুতরাং হিটলারের তাঁবেদার বিজ্ঞানী-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে বিশ্বধ্বংসের ভয়াল অস্ত্র ব্যতীত মানবকল্যাণপ্রসূ কোনো আবিষ্কার কেমন করিয়া আমরা আশা করিতে পারি? অথচ এই জার্মানীই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একদিন পৃথিবীতে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। মানুষের জীবনাদর্শে যখন বিকৃতি ঘটে, তখন ওই বিকৃতি সমগ্র জাতিকে মহা-নিপাতের অভিমুখে টানিয়া লইয়া যায়।

জংগীবাদী জাপানও ইয়োরোপের দুষ্ট প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। জাপানের রাষ্ট্রনায়কগণ তাই বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করিয়াছে মারাত্মক সমর-অস্ত্রের উৎপাদনে। জাপানের বিজ্ঞানসাধকদল ওই আত্মঘাতী যুদ্ধোন্মাদনার কবল হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারে নাই। আধুনিক জার্মানী ও জাপান বর্তমান পৃথিবীর মানুষকে দেখাইল সভ্যতা ও বিজ্ঞানের ভয়াবহ বিকৃত রূপ। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভংগীও অনুরূপ।

উদ্ধত পশুশক্তির পরাভব
অবশ্যম্ভাবী

কিন্তু লোভীর বিকৃত ক্ষুধা ও উদ্ধত পশুশক্তি মানুষের আত্মিক শক্তিকে, মানবসত্যকে, ন্যায়ধর্মকে চিরকাল পংগু করিয়া রাখিতে পারিবে না। সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসীবাদ, নাৎসীবাদ এবং সামরিকবাদ একদিন-না-একদিন পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে—মানুষের শ্রেয়োবুদ্ধি ও মানবতাবোধের অমোঘ প্রভাবে একদিন সমাজতন্ত্র, সাম্য ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। সেইদিন রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বাধীন

চিন্তা ও শুভবোধের উদ্বোধন হইবে, এবং নূতন আদর্শপ্রবুদ্ধ বিজ্ঞানীদের চিত্তে জাগিবে মানবকল্যাণের প্রেরণা।

বিজ্ঞানীর সত্যতপস্যার উপর বিশ্বাস আজও আমরা হারাই নাই। জগদ্বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানবিদ্ হলডেন্-এর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা বলিব : 'We need science more than ever before, and we must think scientifically not only about weapons and health, but about politics and philosophy'। বর্তমানের অস্বাস্থ্যকর সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটুক, মানবকল্যাণকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হোক বিজ্ঞানসাধনা—ইহাই আমাদের অন্তরতম কামনা।

উপসংহার

অতীত ও বর্তমান বাংলা দেশ

[**রচনার সংকেতসূত্র :** অতীত বাংলার রূপরেখা—পল্লীবাংলার রূপশ্রীমণ্ডিত মূর্তি—বিগত যুগের আনন্দমুখর বাংলা দেশ—বাঙালী-জীবনে দ্রুত পটপরিবর্তন—বাংলার পূর্ব-শ্রী আজ অন্তর্হিত—বাঙালী আজ সর্বরিক্ত—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মহামন্বন্তরের প্রতিক্রিয়া—দুর্গত বাংলার ভয়াবহ রূপ—উপসংহার।]

অতীতের দিকে যখন দৃষ্টি প্রসারিত করি তখন চোখের উপর ভাসিয়া উঠে বাংলাভূমির একটি প্রশান্ত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল মূর্তি—বাংলার চতুর্দিকে বহিয়া যাইতেছে সৌন্দর্য, আনন্দ, স্বাস্থ্য, সচ্ছলতা, সম্পদ ও প্রাণের উচ্ছল প্রবাহ। দূরপ্রসারী মাঠে মাঠে সোনালী ধানের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে, কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছ শীতল পুকুরে-দীঘিতে বিস্তৃত আকাশের ঘননীল ছায়া প্রতিবিম্বিত হইতেছে, আম্রবীথিতলে অলস-মধ্যাহ্নে রাখালিয়া বাঁশীর চিত্তহারী সুর বাজিয়া উঠিতেছে, আর ঘনায়মান সন্ধ্যায় অগণিত দেবায়তনে বাজিতেছে কত কত কাঁসর-শংখ-ঘণ্টা।

অতীত বাংলার রূপরেখা

অতীত দিনের সেই বাংলা দেশ ছিল পল্লীবাংলা—অজস্র পল্লীর মধ্যেই ছিল তাহার প্রাণের উৎস। বর্তমানকালে যে-শহরগুলি স্ফীতকায় অজগরের মতো সমস্ত দেশকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেদিন ইহাদের দানবীয় অস্তিত্ব ছিল না। গ্রামগুলির অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে তখনো কৃত্রিমতা প্রবেশ করে নাই, আর্থিক জীবনে ভাঙন ধরে নাই—সেদিন পল্লীতে পল্লীতে স্বদেশীসমাজের রূপটি ছিল অবিকৃত। অতীতের সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীবাংলার

স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও সৌন্দর্যের নির্ভুল স্বাক্ষর বহন করিতেছে বাঙালীর সামাজিক উৎসবগুলি।

গ্রামের কৃষি, গ্রামের কুটীরশিল্প সেদিন বাঙালীকে আর্থিক ক্ষেত্রে সচ্ছল করিয়া তুলিয়াছিল—ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাঙালী তখনো পিছাইয়া পড়ে নাই। অতীত বাংলার দিকে তাকাইলে শিল্পসমৃদ্ধ এই দেশের চমৎকার একটি ছবি দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠেঃ গ্রামের প্রবেশপথের বাহিরে উচ্চভূমিতে বসিয়া কুম্ভকার তাহার চক্রে করসঞ্চালন দ্বারা নানাদ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে; গৃহগুলির পশ্চাতে গমনাগমন-পথে কয়খানি তাঁত চলিতেছে, সেগুলির সানা বৃক্ষে ঝুলানো আছে এবং নীল, লোহিত ও স্বর্ণসূত্রে যখন বস্ত্রবয়ন করা হইতেছে, তখন সূত্রের উপর বৃক্ষ হইতে ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে। পথে পিতলের ও তাম্রের পাত্রাদি প্রস্তুতকারীরা সশব্দে কাজ করিতেছে। ধনীর গৃহে অলিন্দে বসিয়া স্বর্ণকার ও মণিকার চারিদিকের ফল ও ফুল এবং বিকশিত-শতদল পুষ্করিণীর কূলে আম্রকুঞ্জ-মধ্যে অবস্থিত দেবায়তনের প্রাচীরে অংকিত চিত্র হইতে আদর্শ লইয়া নানারূপ অলংকার প্রস্তুত করিতেছে। এই যে ছবি, ইহা আজ আমাদের কাছে রাত্রির স্বপ্নের মতো মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অতীত বাংলার যথার্থ রূপটি ইহারই মধ্যে ফুটিয়া উঠে। সে-যুগের বাংলার চাষী ও বাংলার শিল্পীর প্রাত্যহিক জীবনে নাগরিকতার মারাত্মক স্পর্শ লাগিতে পারে নাই বলিয়া একদিকে অজস্র কর্মচাঞ্চল্য, অন্যদিকে অকূল শান্তি ও বিপুল বিরতির মধ্যে তাহাদের দিনগুলি স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইয়াছে।

পল্লীবাংলার শ্রীমণ্ডিত মূর্তি

সেই বিগত দিনের বাঙালীসমাজে লোকশিক্ষা, লোক-আনন্দের কোনোরূপ অভাব ছিল না। প্রত্যেক গ্রামে টোল ছিল, চতুষ্পাঠী ছিল, পাঠশালা ছিল, মক্তব ছিল, মাদ্রাসা ছিল—স্বল্পব্যয়ে সকলেই শিক্ষালাভ করিত। পাঁচালী, কবির গান, কথকতা, যাত্রা প্রভৃতির মধ্য দিয়াও দেশবাসী শিক্ষা এবং আনন্দ লাভ করিত। সে-যুগের লোকসাহিত্য কম উন্নত ছিল না। বাঙালীর ধর্মে, সমাজে, আর্থিক ক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে একটা সহযোগিতার ভাব ছিল, পরস্পরের মধ্যে আন্তর প্রীতির আদানপ্রদান হইত। পল্লীর গানে, পল্লীর নৃত্যে, পল্লীর বিবিধ ক্রীড়াকৌতুকে, পল্লীর মেলাগুলিতে যথার্থ আন্তরিকতা ও স্বাস্থ্যের লক্ষণ সর্বত্রই ফুটিয়া উঠিত। বিগত যুগে দেশের মানুষ সমস্ত জীবন ধরিয়া গ্রামের মধ্যেই বসবাস করিয়াছে। ধনীনির্ধন সকলেরই একান্ত সত্যবস্তু ছিল তাহাদের আপন

বিগত যুগের আনন্দমুখর বাংলাদেশ

আপন পল্লী। বাঙালীর যদি কোনো সভ্যতা ও সংস্কৃতি থাকে, তবে তাহাকে গ্রামীণ বলিয়াই আখ্যা দিতে হইবে।

বাংলা দেশের সেই এক ছবি। তারপর হইল দ্রুত পটপরিবর্তন। পশ্চিমের শিক্ষা, পশ্চিমের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, পশ্চিমের শিল্পবিপ্লব আমাদের জীবনে অভাবনীয় পরিবর্তন আনিয়া দিল। বিদেশী কল-কারখানাজাত পণ্যের প্রতিযোগিতার প্রবল বন্যার মুখে পড়িয়া বাংলার কুটীরশিল্প ভাসিয়া গেল, এবং তাহারই ফলে দেশের কৃষিজীবনে ভাঙন ধরিল, আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার ভিত্তি আমূল নড়িয়া উঠিল—সমস্ত পল্লীসমাজ কেন্দ্রচ্যুত হইয়া পড়িল। গ্রামের শিল্প-বিচ্যুত শ্রমিক নবপ্রতিষ্ঠিত শহরগুলিতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। চাষীর আর্থিক দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতা বাড়িয়া গেল। বিজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে দেশের সার্বজনীন শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইতে চলিল, নবপ্রবর্তিত ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া কতিপয় ভূমিবিত্তহীন বাঙালী সওদাগরী আপিসে চাকরির সন্ধানে ফিরিতে লাগিল—ইহারাই জন্ম দিল বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর। বাংলার শিল্প গেল, কৃষি গেল, ব্যবসায়-বাণিজ্য বিনষ্ট হইল—জাতীয় চরিত্রে দেখা দিল অবিশ্বাস্য দৈন্য ও আত্মনির্ভরশীলতার অভাব।

বাঙালীজীবনে দ্রুত পটপরিবর্তন

একদিন পল্লীগুলিই ছিল বাংলার প্রাণকেন্দ্র, আজ ইহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে নূতন নূতন কত শহর। একদিকে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া ধনী জমিদার ও শিক্ষিতসম্প্রদায় শহরে বাসা বাঁধিতেছে, অপরদিকে আমাদের পল্লীগুলি ক্রমশই জনবিরল হইয়া পড়িতেছে। বর্তমানে পল্লীতে যাহারা বাস করে তাহাদের শিক্ষা নাই, আনন্দ নাই, অর্থ নাই, স্বাস্থ্য নাই—তাহাদের সকল আশাভরসা বিনষ্ট হইয়াছে। অশিক্ষা ও কুশিক্ষা, ঘৃণ্য দলাদলি আর কুসংস্কার বাঙালীর গ্রাম্য-জীবনে ভয়াবহ অভিশাপ ডাকিয়া আনিতেছে। আবার, যাহারা নাগরিক জীবন যাপন করে, তাহাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে দারিদ্র্য ও অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার গ্লানি, কৃত্রিমতা, আত্মকেন্দ্রিক অসামাজিকতার ভাব ও উৎকেন্দ্রিকতা।

বাংলার পূর্বশ্রী আজ অন্তর্হিত

বাঙালীজাতির অতীতের লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য বর্তমানে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেদিন রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালীর প্রভূত খ্যাতি ছিল, কর্মে খ্যাতি ছিল—খ্যাতি ছিল বিশিষ্ট চিন্তা ও ভাবসাধনার ক্ষেত্রে। এ যুগে সেই সার্বিক প্রতিষ্ঠা আমাদের আর নাই। নানা দুঃখদৈন্য ও বেকারজীবনের অশেষ গ্লানি আমাদিগকে এখন প্রতিনিয়ত পীড়িত

বাঙালী আজ সর্বরিক্ত

করিতেছে। এই গ্লানিকে আরো মর্মান্তিক করিয়া তুলিয়াছে হিন্দু-মুসলমানের লজ্জাজনক আড়াআড়ি এবং উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুর মধ্যে বিচ্ছেদ। সাহিত্য এবং ভাষায় পর্যন্ত আজ সেই সাম্প্রদায়িকতার অসুন্দর ছায়াসম্পাত দেখা যাইতেছে।

উপরে বর্ণিত আর্থিক ও মানসিক দারিদ্র্যকে অবিরত পোষণ করিয়া যখন আমরা রিক্ততার শেষ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তখন সমগ্র বিশ্বে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তাহার সর্বনাশা রূপ পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিল দরিদ্র ভারতে। নানা কারণে বাংলাদেশেই এই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে বেশী। ইহার পর দেশে দেখা দিল ভয়াবহ মন্বন্তর—উনিশ শ' তেতাল্লিশ সালে। বাংলার পঁয়ত্রিশ লক্ষ অসহায় নরনারী একমুষ্টি অন্নের অভাবে প্রাণ হারাইল। যুদ্ধ শেষ হইবার সংগে সংগে দেশের উপর নামিয়া আসিল আরো ভয়ংকর অভিশাপ—বাংলাদেশ তথা সমস্ত ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়া গেল। বংগভূমির আর্থিক বনিয়াদ ইহার ফলে একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। বর্তমানে আমাদের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছে অভাবনীয় সংকট। আজ বাঙালীর অন্ন নাই, বস্ত্র নাই—সে উপবাসী, অর্ধ-উলংগ। অতীতের সোনার বাংলার সেই সম্পদসৌন্দর্য কে অপহরণ করিল? বাংলাজননী আজ হৃতসর্বস্বা, নগ্নিকা হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মহা-মন্বন্তরের প্রতিক্রিয়া

দিনের পর দিন বাঙালীর বেকারসমস্যা শোচনীয় রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বংগব্যবচ্ছেদের ফলে কাতারে কাতারে মানুষ সমাজজীবনের কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অজস্র অসহায় নারী পুরুষরূপী হিংস্র পশুর কবলে পড়িয়া আত্মসম্ভ্রম বিনষ্ট করিয়া বুভুক্ষার তাড়নায় দেহ বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। অন্যদিকে শত শত দরিদ্র চাষী অনিবার্য কারণে সামান্য জমিজমা বিক্রয় করিয়া দিয়া দিনমজুরে পরিণত হইয়াছে। চাষীর আজ জমি নাই, শ্রমিকের জন্য কোনো শিল্প নাই, মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের জন্য কোনো বৃত্তি নাই—বর্তমান বাংলার এ কী সর্বহারা রিক্ত মূর্তি! বাংলার সমাজজীবন আজ বিপর্যস্ত, সমগ্র বাংলা দেশ আজ বিধ্বস্ত। বাঙালীর স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িয়াছে, আনন্দ বিদূরিত হইয়াছে—তাহার সম্পদ অপহৃত, তাহার শিক্ষাব্যবস্থা পংগু হইয়া পড়িয়াছে।

দুর্গত বাংলার ভয়াবহ রূপ

বাঙালীর ব্যবসায়বিমুখতাও বর্তমানে তাহার সকল উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের শিল্প ও কৃষির অবস্থা শোচনীয়। সুতরাং মানুষের মতো

বাঁচিয়া থাকিবার কোনো পথই আমাদের আজ খোলা নাই। এই যে জটিল সংকট-সমস্যার মুখোমুখি আসিয়া আমরা দাঁড়াইয়াছি, আমাদিগকে আজ তাহা হইতে পরিত্রাণের পথনির্দেশ কে দিবে?

এই ভয়াবহ পরিস্থিতি বাঙালীর আত্মসম্বিৎ যদি ফিরাইয়া আনিতে পারে, নাগরিক জীবনের বিলাসমোহ ও স্বার্থান্ধ মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বাঙালী যদি নূতন ভাবে পল্লীবাংলাকে চিনিয়া লইতে পারে, অমেয় দুঃখের মূল্যে যদি সে আত্মশক্তি লাভ করিবার প্রেরণা পায়, তবেই তাহার বাঁচিবার আশা আছে। দুঃসহ বেদনার স্পর্শে বাঙালী আবার জাগিয়া উঠুক, পল্লীর সম্পদ ও অতীত ঐতিহ্যকে ফিরাইয়া আনুক,—ইহাই হয়তো তাহার ভাগ্যবিধাতার অভিপ্রায়। বাংলার ঐশ্বর্যময়ী মূর্তিখানি বর্তমানের সহস্র আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া আবার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, এ প্রত্যয়টুকু যেন আমরা হারাইয়া না ফেলি।

উপসংহার

বাংলা পল্লীর উন্নয়নসমস্যা

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** সূচনা—পল্লীই বাংলার প্রাণকেন্দ্র—বাংলা পল্লীর উন্নয়নসমস্যাটি সত্যই জটিল—পল্লী-উন্নয়নের জন্য চাই বলিষ্ঠ পরিকল্পনা—সর্বাগ্রে জনশিক্ষার প্রয়োজন—পল্লীর আকর্ষণ বাড়াইতে হইবে—লুপ্ত শিল্পের উদ্ধারসাধন ও কৃষি-উন্নয়ন—জনস্বাস্থ্যের উদ্ধারসাধন—পল্লীমেলার প্রবর্তন—স্বদেশীসমাজ-গঠন।]

বাঙালী তথা সমগ্র ভারতবাসীর জীবন পল্লীকেন্দ্রিক—আমাদের দেশ পল্লীপ্রাণ। এই পল্লীকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে এ দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। পশ্চিমের বস্তুতান্ত্রিকতার প্রভাবে আজ আমাদের দেশের স্থানে স্থানে বিভিন্ন শহর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে সত্য, কিন্তু অদ্যাবধি দেশের শতকরা নব্বই জন লোক বাস করে দূর-দূরান্তের পল্লীঅঞ্চলে। পঞ্চাশ বছর পূর্বেও গ্রামের সংগে আমাদের সংযোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল,—পল্লীর বুকে কান পাতিলে সমগ্র বাঙালী জাতির হৃৎস্পন্দন শোনা যাইত।

সূচনা

একদিন যে-গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালীর জীবনপ্রবাহ আবর্তিত হইয়াছে, বাঙালী আজ তাহাকেই সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতে বসিয়াছে। বাংলা-পল্লীর সৌম্য শান্তশ্রী আজ আর নাই। গ্রামের দেবায়তন, শিক্ষা-নিকেতন ভাঙিয়া পড়িয়াছে, উৎসব-আনন্দে মুখরিত লোকালয়গুলি ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতেছে, পথঘাট ঘন জংগলে আকীর্ণ হইয়া উঠিতেছে। বর্তমানে বাংলার পল্লী প্রায় জনশূন্য ও শ্রীহীন। সে-যুগের অভাবনীয় সম্পদ-প্রাচুর্য আজিকার দিনে আর দৃষ্ট হয় না—বাঙালীর কৃষি গিয়াছে, কুটীরশিল্প গিয়াছে, আর্থিক সচ্ছলতা গিয়াছে। বাংলার জনগণের মুখে আজ অভাব, দুঃখদৈন্য ও নিরানন্দের ছায়া গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছে। বলিয়াছি, দেশের শতকরা নব্বই জন লোক এখনো বাস করে গ্রামে। সুতরাং গ্রামের উন্নতিসাধন করিতে না পারিলে জাতীয় জীবনে যে কল্যাণ আসিবে না, এই সত্যটিই আজ আমাদিগকে বিশেষভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে।

পল্লীই বাংলার প্রাণকেন্দ্র

পল্লীর পুনর্গঠনসমস্যার সংগে আমাদের জীবনের বিবিধ সমস্যা জড়িত। নানা দিক হইতে আমাদিগকে এ সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। ব্যাধি, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার বাঙালীর জীবনকে একরূপ পংগু করিয়া দিয়াছে। শিক্ষিত ধনিসম্প্রদায় অধুনা গ্রামকে একেবারে বর্জন করিয়াছে। ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে বর্তমানে আমরা পল্লীকেন্দ্র হইতে বিচ্যুত। তাই একদিকে শহরগুলি ক্রমশ যতই স্ফীত হইয়া উঠিতেছে, অন্যদিকে গ্রামগুলি ততই দুর্দশার ঘন অন্ধকারে বিলীন হইয়া যাইতেছে।

বাংলা পল্লীর উন্নয়নসমস্যাটি সত্যই জটিল

প্রতিমুহূর্তে সরকারের উপর একান্ত নির্ভরশীল হইয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না—আত্মশক্তির উপর ভর করিয়াই আমাদিগকে পল্লীসংগঠন ও পল্লীর উন্নয়নকার্যে ব্রতী হইতে হইবে। জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, জনগণের আর্থিক অবস্থা যাহাতে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার জন্য প্রণালীবদ্ধভাবে ও সুষ্ঠু পরিকল্পনার সহায়তায় বাঙালীকে পল্লীর পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

পল্লীউন্নয়নের জন্য চাই বলিষ্ঠ পরিকল্পনা

প্রথমেই ধরা যাক জনশিক্ষার কথা। দেশবাসীর সংকীর্ণতা, কুসংস্কার, আত্মকেন্দ্রিক মনোবৃত্তি ইত্যাদির জন্য দায়ী অশিক্ষা ও কুশিক্ষা। ইংরেজী শিক্ষা প্রচারিত হইবার পূর্বে এদেশে সার্বজনীন লোকশিক্ষার পথটি মুক্ত ছিল। তদুপরি যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী

সর্বাগ্রে জনশিক্ষার প্রয়োজন

প্রভৃতির মধ্য দিয়াও জনসাধারণ শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ পাইত। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষাপ্রসারের সংগে সংগে দেশীয় শিক্ষার ধারাটি বিলুপ্ত হইয়াছে। দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যে-ধরনের শিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার প্রভাবে বাঙালী তাহার 'দেশদেখা' চোখটিকে হারাইতে বসিয়াছে।

অধিকাংশ দেশবাসী আজ শিক্ষার অভাবে সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া গ্রামের মধ্যে নিরানন্দ জীবন যাপন করিতেছে। এই লক্ষ লক্ষ পল্লীবাসীকে শিক্ষার আলো দিতে হইবে—তাহাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক ও অবৈতনিক করিতে হইবে। শুধু অল্পবয়স্ক শিশুর জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলে চলিবে না, দেশের বয়স্ক মানুষের জন্যও উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযানই হইবে আমাদের পল্লীউন্নয়নের প্রথম কথা।

পল্লীর আকর্ষণ বাড়াইতে হইবে

বর্তমানে 'গ্রামে ফিরিয়া যাও' আন্দোলনের কথা অনেকের মুখেই শোনা যাইতেছে। শিক্ষিতসম্প্রদায়কে গ্রামের প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইলে পল্লীর আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরাইয়া আনিতে হইবে। কোন্ আকর্ষণে তাহারা গ্রামে ফিরিবে? গ্রামে যদি অন্নের সংস্থান না থাকে, সেখানে যদি তাহারা তাহাদের মানসিক আনন্দের উপকরণ সংগ্রহ করিতে না পারে, তবে তাহাদিগকে আমরা কেমন করিয়া গ্রামে ফিরাইয়া আনিতে পারি? নিম্নমধ্যবিত্তসম্প্রদায় শহরের মুখে ধাবিত হয় অর্থের আকর্ষণে, ধনীরা শহরে বাসা বাঁধে আমোদ-প্রমোদের মোহে। আজিকার বাংলা-পল্লীতে জীবিকা অর্জনের সেই সুযোগ কোথায়, আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা কোথায়?

পল্লীর আর্থিক দুরবস্থা আমাদিগকে ঘুচাইতেই হইবে। ইহার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন, একদিকে বাংলার লুপ্ত কুটীরশিল্পের উদ্ধারসাধন, অন্যদিকে কৃষির উন্নয়ন। আমরা আজ পশ্চিমের আদর্শে দেশে বড় বড় কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিবার কত স্বপ্ন দেখিতেছি, কিন্তু প্রায়-বিলুপ্ত কুটীর-শিল্পের উজ্জীবনের কথাটি তেমন ভাবিতেছি না।

লুপ্তশিল্পের উদ্ধারসাধন

বস্ত্রশিল্পে একদিন আমরা বিস্ময়কর কুশলতা প্রদর্শন করিয়াছি,—তামা-পিতল-কাঁসা প্রভৃতি ধাতুর বাসনাদি প্রস্তুত করিবার ক্ষেত্রে আমাদের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল; ছুরি, কাঁচি, দা প্রভৃতি সামগ্রী সুন্দরভাবে প্রস্তুত করিত বাংলার গ্রাম্যশিল্পী; মাটির পুতুল, হাতীর দাঁতের শাঁখা, হাড়ের চিরুণী, বোতাম প্রভৃতি তৈরী করিয়া বাংলার পল্লীবাসী মানুষ তাহার জীবিকা উপার্জন করিয়াছে। আজও বাংলার

সর্বত্র এইসব সামগ্রীর বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু এখন বাহির হইতে আমদানী করিয়া আমরা এইগুলির প্রয়োজন মিটাইতেছি। এ সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ক্ষেত্রটি যদি আমরা নতুন করিয়া আবিষ্কার ও প্রসারিত করিতে পারি, তবে আমাদের জীবিকা অর্জনের পথটি অনেকখানি প্রশস্ত হইয়া উঠিবে।

কুটীরশিল্প-স্থাপনের জন্য অধিক টাকার প্রয়োজন হয় না। একক প্রচেষ্টায় এইরূপ শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হইলে সমবায়প্রথায় সহজেই ইহার প্রবর্তন করা যায়। কুটীরশিল্পের উদ্ধারসাধন হইলে এত এত মানুষকে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শহরে আসিয়া কৃত্রিম জীবন যাপন করিতে হয় না। ইহাতে শিক্ষিত বেকার যুবক গ্রামে থাকিয়া যেমন অর্থ উপার্জন করিতে পারিবে, অন্যদিকে গ্রামের সচ্ছলতা ও স্বাস্থ্য তাহারা অল্পায়াসে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে।

কৃষির দিকেও আমাদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে। বাংলার কৃষি খুবই অনুন্নত—এদেশের কৃষকের দারিদ্র্যের কথা সর্বত্র প্রবাদের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে আমাদের কৃষিকার্য সম্পাদিত হয় না। উন্নততর কৃষিপদ্ধতির প্রচলন না হইলে বাংলার দারিদ্র্য কখনো ঘুচিবে না। ঋণভারে কৃষকেরা জর্জরিত, ইহাদিগকে অতিলোভী স্বার্থান্ধ মহাজনের কবল হইতে রক্ষা করিতে হইবে—অল্প সুদে কৃষিঋণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষি-সমবায়-সমিতির প্রতিষ্ঠা হইলে কৃষকেরা নানাভাবে নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কৃষকের অশিক্ষা এবং দারিদ্র্যই এদেশের কৃষি-অবনতির মূল কারণ। কুটীরশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইলে কৃষকের দারিদ্র্য কিছুটা দূরীভূত হইবে। বৎসরের যে-কয়টি মাস তাহারা কর্মহীন অলস জীবন যাপন করে, সেই সময়ে নানা শিল্পকার্যে আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ লাভ করিলে তাহাদের একটা সহকারী আয়ের নতুন পথ খুলিয়া যায়।

বাংলার পল্লীবাসী আজ ভগ্নস্বাস্থ্য, খাদ্যাভাবে তাহাদের জীবনীশক্তি হ্রাস পাইতেছে, নানা ব্যাধির প্রকোপে পড়িয়া মরণের মুখে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। বাঙালীকে কর্মে উদ্যমশীল করিয়া তুলিতে হইলে তাহার হারাণো স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারসাধন করিতে হইবে। একদিন জমিদারগণ গ্রামেই বাস করিতেন, পুকুর-দীঘি খনন করাইতেন—গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব হইত না। আজ বাংলার পুকুর-দীঘি সব মজিয়া ভরাট হইয়া গিয়াছে, বিশুদ্ধ জলের অভাবে নানা রোগ সহজেই বিস্তার-লাভ করিতেছে। সমস্তগ্রামবাসীর সমবেত প্রচেষ্টায় যদি নলকূপ বসাইবার ব্যবস্থা করা যায়, পুষ্করিণী-দীঘিগুলির যদি সংস্কার সাধিত হয়, তবে ব্যাধির

জনস্বাস্থ্যের উদ্ধারসাধন

প্রকোপ অনেকটা কমিয়া আসিবে। গ্রামবাসীর উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য সরকারী সহায়তার বিশেষ আবশ্যক আছে।

পল্লীমেলার প্রবর্তন

এসেম্বলি-হলে, শহরের ময়দানে ময়দানে বক্তৃতা করিয়া আমরা প্রতিনিয়ত অযথা প্রভূত শক্তিক্ষয় করিতেছি, ইহাতে দরিদ্র পল্লীবাসীর বিশেষ কোনো উন্নতি সাধিত হইবে না। দেশের অগণিত জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইলে পল্লীমেলার পুনঃপ্রবর্তনই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পন্থা। গ্রাম্যমেলার নানারকমের উপকারিতা আছে। ইহার সহায়তায় একদিকে মানুষে মানুষে মিলনের পথটি সহজ হইয়া উঠিবে, আবার অন্যদিকে ইহার একটা অর্থকরী সুবিধাও আছে। স্বদেশী শিল্পের প্রদর্শনী খুলিয়া, নানা আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া, ইহা হইতে যে-অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহাতে কয়েকটি গ্রামের সংস্কারকার্য অন্তত কিছুটা অগ্রসর হইতে পারে। মেলার মাধ্যমে পল্লীবাসীগণ পরস্পরের সংগে সহজে ভাবের আদানপ্রদানও করিতে পারিবে, শিক্ষার আলোক পাইবে, তদুপরি লাভ করিবে অনাবিল আনন্দ।

স্বদেশীসমাজ-গঠন

পল্লীসংস্কার ও পল্লীর পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সরকারী অর্থসাহায্যের প্রয়োজন যে অত্যধিক, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সরকারের নিকট প্রতিমুহূর্তে বিশেষ কিছু সাহায্য পাওয়ার আশা আমরা করিতে পারি না। সুতরাং পল্লীসংগঠনের জন্য আমাদের প্রয়োজন বলিষ্ঠ স্বদেশীসমাজ গড়িয়া তোলা। আত্মনির্ভরশীলতা ও সংঘশক্তির সহায়তায় জাতীয় জীবনের উন্নতিকে আমরা অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিতে সমর্থ হইব। এক্ষেত্রে শিক্ষিতসম্প্রদায়কেই সকলের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে, তাহারাই হইবে জাতির সকল উন্নতির পথপ্রদর্শক—তাহাদের অক্লান্ত সাধনাই সৃষ্টি করিবে পল্লীবাসীর মধ্যে বলিষ্ঠ সমাজচেতনা। সমাজবোধ জাগ্রৎ করিতে পারিলেই আমাদের হীন দলাদলি ও মানসিক সংকীর্ণতা মুছিয়া যাইবে, ঐক্যের ভিত্তিতে কাজ করা সহজে হইবে। পল্লীর উন্নতি ব্যতীত বাঙালীর কোনো উন্নতিই যে সম্ভব নয়, একথা আমাদিগকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং এই পথেই রহিয়াছে জাতীয় জীবনের বহুমুখী সমস্যা-সমাধানের ইংগিত।

বাঙালীর বেকারসমস্যা

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** সূচনা—মধ্যবিত্ত বাঙালী—বাঙালী মধ্যবিত্তের অসহায় অবস্থা—বাঙালীর যুদ্ধোত্তর বেকারসমস্যা—বাঙালীকে চাকরির মোহ ত্যাগ করিতে হইবে—বেকারসমস্যার জটিলতা—আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির ব্যর্থতা—কৃষিব্যবস্থার উন্নতিবিধান করিতে হইবে—ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও কুটীরশিল্পের পুনরুদ্ধারসাধন—বৃত্তিশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার প্রবর্তন—পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের পরিকল্পনা—উপসংহার।]

সূচনা

বেকারসমস্যা এ যুগের বাঙালীর কাছে নতুন কিছুই নয়। যতই দিন যাইতেছে, তাহার আর্থিক সংকট ততই প্রবলতর হইয়া দেখা দিতেছে। বিগত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, বাঙালী ক্রমশই আর্থনীতিক অবনতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তাহার শিল্প নাই, ব্যবসায় নাই—এ দেশের কৃষিও একান্ত অনগ্রসর। যে-কুটীরশিল্প ও কৃষিকে অবলম্বন করিয়া বাঙালী তাহার আর্থিক জীবন অতিবাহিত করিত, নানাকারণে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইংরেজশাসন আমাদের কুটীরশিল্প ধ্বংস করিয়াছে—বিদেশের যন্ত্রোৎপাদিত পণ্যের প্রতিযোগিতার মুখে পড়িয়া এদেশের শিল্প দাঁড়াইতে পারে নাই। অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রভৃতি ভূমিপ্রথার সৃষ্টিহেতু বাংলার কৃষকসম্প্রদায়ের অবস্থা প্রতিদিন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ অবস্থায় আমাদের দেশে যদি নানারকমের শিল্প গড়িয়া উঠিত, আমরা যদি ব্যবসায়-বাণিজ্যে স্থান করিয়া লইতে পারিতাম, তবে কৃষির উপর একান্ত নির্ভরশীলতা অনেকটা কমিয়া যাইত। কিন্তু বাঙালীর ব্যবসায়বিমুখতা ইহার পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই কৃষক-বাঙালী শ্রমিক-বাঙালীতে পরিণত হইয়াছে, শ্রমিক-বাঙালী আজ বাধ্য হইয়াই নিঃস্ব বেকার শ্রমিকের জীবন যাপন করিতেছে।

মধ্যবিত্ত বাঙালী

বাংলাদেশে আরো একটি শ্রেণীর মানুষ আছে, ইহারা হইতেছে মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়। ইহাদের তেমন কোনো ভূসম্পত্তি নাই, স্থায়ী আয়ের কোনো ব্যবস্থা নাই—সরকারী দপ্তরে, সওদাগরী আপিসে চাকরিকেই একমাত্র পেশা করিয়া ইহারা জীবন অতিবাহিত করে। ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। কিছুটা ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া মাসান্তে নির্দিষ্ট বেতনের চাকরিতে আত্মনিয়োগ করাকেই বাংলার মধ্যবিত্তসম্প্রদায় নিজেদের চরম আকাংক্ষার বস্তু

বলিয়া জানে। আবার, ইহাদের মধ্যে অনেকে ডাক্তারী, ওকালতি প্রভৃতি উচ্চ-শিক্ষামূলক বৃত্তির ক্ষেত্রেও নামিয়া পড়িয়াছে।

বাঙালী মধ্যবিত্তের অসহায় অবস্থা

আপিসের চাকরি একদিন সুলভ ছিল, উচ্চতর পেশায় একসময় বর্তমানের মতো তেমন মারাত্মক প্রতিযোগিতা ছিল না। তাই বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণী অতীতের দিনে বেশ সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করিয়াছে। কিন্তু আজ যুগের পরিবর্তন হইয়াছে—সরকারী দপ্তরে, সওদাগরী আপিসে, বিবিধ পেশার ক্ষেত্রে অভাবনীয় প্রতিযোগিতা দেখা দিয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় যে মর্মান্তিক পরাজয়, উহার হাত হইতে আত্মরক্ষার কোনো পথ আজ তাহারা খুঁজিয়া পাইতেছে না। বর্তমানে বাঙালী জাতির মুখে একটা করুণ অসহায়তার ভাব ক্রমশই ফুটিয়া উঠিতেছে।

বাঙালীর যুদ্ধোত্তর বেকার-সমস্যা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমাদের বেকারসমস্যার কিছুটা নিরসন ঘটাইয়াছিল। দেশের সহস্র সহস্র বেকার যুবক, নিরক্ষর শ্রমিক সেনাবাহিনীতে, নানা কল-কারখানায়, আপিসে, সরকারী দপ্তরে কাজ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আজ যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে, আমাদের বেকারসমস্যা পুনর্বার তাহার ভয়াল রূপটি লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিগত পঞ্চাশের মন্বন্তরেও যে-মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত বাঙালী কোনো রকমে প্রাণটি বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল, যুদ্ধের পর তাহাদের অবস্থা শতগুণ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেশে ক্রমেই দুর্মূল্য হইয়া উঠিতেছে, তাহা সংগ্রহ করিবার মতো ক্রয়শক্তি বেকার শ্রমিক ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাই। তদুপরি বংগবিভাগের ভয়াবহ পরিণামহেতু আমাদের বেকারসমস্যার জটিলতা প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে—বেকার বাঙালীর সম্মুখে আসন্ন মৃত্যুর ছায়া আজ সুস্পষ্ট ও দীর্ঘতর।

বাঙালীকে চাকরির মোহ ত্যাগ করিতে হইবে

বাঙালীকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই বিরাট সমস্যার আশু-সমাধান করিতেই হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকার আমাদিগকে অবিরত নানা আর্থিক পরিকল্পনার কথা শুনাইতেছেন, কিন্তু তাহার কোনোটাই অদ্যাবধি বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। সুতরাং বর্তমানে সরকারের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হইয়া থাকিলে আমাদের চলিবে না। আজ আমাদিগকে পরমুখাপেক্ষিতার মনোভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে—আশ্রয় করিতে হইবে আত্মশক্তিকে, নিজেদের সংগঠনশক্তিকে। ইংরেজী শিক্ষালাভ করিয়া চাকরিজীবন অবলম্বনের সর্বনাশা

মোহ বাঙালীকে কাটাইয়া উঠিতে হইবে, শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি তাহাকে দৃষ্টি দিতে হইবে। একমাত্র এই পথেই রহিয়াছে বেকারসমস্যার ভীষণতা হইতে মুক্তিলাভের যথার্থ উপায়।

বেকার-সমস্যার জটিলতা

কর্মহীন শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিতসম্প্রদায় বাঙালীর বেকারসমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। তদুপরি রহিয়াছে বাংলার অগণিত কৃষকদল—যাহারা বৎসরের সামান্য কয়েকটি মাস মাত্র কৃষিকার্যে রত থাকে, বাকী কয়টি মাস অলস বেকারজীবন যাপন করে। অবশ্য এইসব কৃষকদের সমস্যা সাময়িক। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীর প্রশ্নই সর্বাপেক্ষা গুরুতর। তাহারা শ্রমশিল্পে ও কৃষিকার্যে অনভ্যস্ত—চাকরিকেই একমাত্র সম্বল বলিয়া জানে, অথচ কোথাও তাহাদের চাকরি আজ মিলিতেছে না।

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির ব্যর্থতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা আমাদের দেশে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, এতখানি উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াও শিক্ষিতসম্প্রদায় নিজেদের জীবিকা অর্জন করিতে পারিতেছে না। চাকরির দ্বারা বেকারসমস্যা সমাধানের সুযোগ যে অতি অল্প, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। অগণিত দেশবাসীর মধ্যে যদি মাত্র কয়েক সহস্র বাঙালী সরকারী আপিসে কিংবা অবাঙালীর ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানে চাকরি পায়, তাহাতে এত বড় সমস্যার সমাধান হইতে পারে কিরূপে? সেজন্য চাকরির নির্ঝঞ্ঝাট স্বর্ণদ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমাদিগকে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে।

কৃষিব্যবস্থার উন্নতিবিধান করিতে হইবে

কৃষি ও শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যকে কেন্দ্র করিয়া প্রত্যেকটি সমৃদ্ধ জাতির আর্থিক জীবন আবর্তিত হইতেছে। কিন্তু কৃষির প্রতি আমাদের দৃষ্টি নাই বলিলেও চলে, যদিও প্রাচীনকাল হইতে কৃষির জন্য বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে কেবল চাকরিকেই আমরা কল্পতরু ভাবিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু বিগত পঞ্চাশের ভয়াবহ মন্বন্তর আমাদের সকল মোহ ভাঙিয়া দিয়াছে। দেশের সোনার ধানের মূল্য চাকরিজীবীরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছে। কৃষির পুনর্গঠনের কথাটি তাই আজ নানামহলে আমরা বিশেষভাবে শুনিতে পাইতেছি। আমাদের প্রধান কাজ হইবে, বর্তমানে শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে কৃষির প্রতি মনোযোগী করিয়া তোলা—তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু জমি বণ্টন করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা। উপযুক্ত শিক্ষা ও উদ্যম থাকিলে

তাহারা সহজেই উন্নত ধরণের কৃষিকার্য চালাইতে পারিবে। আমাদের বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, এদেশের শতকরা পঁচাত্তর জন লোকের জীবিকার প্রধান উপায় হইল কৃষি। কৃষিশিক্ষার সংগে সংগে মৎস্য ও গুটিপোকার চাষ, হাঁস-মুরগী-পালন এবং দুগ্ধজাত নানাদ্রব্য উৎপাদনের শিক্ষা প্রচলন করা কর্তব্য। ইহার দ্বারা দেশের বহু বেকার লোকের কর্মহীনতা বিদূরিত হইতে পারে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও কুটীরশিল্পের পুনরুদ্ধার-সাধন

দেশে নানারকমের শিল্পপ্রসারের প্রতিও আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হইবে। প্রথমেই আমরা বলিতে পারি, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও কুটীরশিল্পের পুনরুদ্ধারসাধন করিতে পারিলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এবং সাময়িকভাবে বেকার কৃষকদের অর্থ উপার্জনের পথটি অনেকটা প্রশস্ত হইয়া উঠিবে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সুবিখ্যাত সাপ্রু-কমিটি মন্তব্য করিয়াছিলেন: 'Small scale industries should be encouraged so that it might absorb young men'। আমাদের শিক্ষায়তনে এইসব ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটীরশিল্প সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষার ধারা প্রবর্তন করিতে হইবে।

বৃত্তিশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার প্রবর্তন

ইয়োরোপের প্রত্যেকটি শিল্পোন্নত দেশে বৃত্তিশিক্ষা, বিশেষ করিয়া কারিগরী শিক্ষার জন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ দেখা যায়। আমাদের দেশেও শিল্পজাগরণ আনিতে হইলে সুনিপুণ কারিগর, তীক্ষ্ণধী পরিচালকবর্গ এবং শিল্প-গবেষণাকারীর প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাইতে হইলে পুঁথিগত শিক্ষার পাশে ছাত্রদিগকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোন্ ছাত্র কোন্ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিলে বাস্তবজীবনে সফলতা অর্জনে সমর্থ হইবে, তাহার নির্দেশদানের প্রধান দায়িত্ব আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির। যাঁহারা শিল্পে লোক নিযুক্ত করেন, বর্তমানে একটি নিয়োগকমিটি স্থাপন করিয়া তাঁহাদের সংগেও যোগাযোগ রক্ষা করা যাইতে পারে। দেশকে শিল্পের ক্ষেত্রে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নত করিতে হইলে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির আদর্শে শিক্ষাব্যবস্থার মোড়টিও বর্তমানে আমাদিগকে ঘুরাইয়া দিতে হইবে।

পশ্চিমবংগ সরকারের পরিকল্পনা

অবশ্য এই কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শুধু বৃত্তিশিক্ষা লাভ করিলেই বেকারসমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হইবে না। দেশে শিল্পের ক্ষেত্রটিকেও সংগে সংগে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সরকারকে এবং দেশীয় শিল্পপতিগণকে শিল্পপ্রসারের দিকে মনোযোগী হইতে হইবে। রাজ্যসরকার আর্থিক সহায়তার দ্বারা দেশীয়

শিল্পের উন্নয়নে প্রভূত সহায়তা করিতে পারেন। ক্রমবর্ধমান বেকারসমস্যার ভয়াবহতাবিষয়ে সম্প্রতি পশ্চিমবংগ-সরকার কিছুটা সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। ভারতীয় পরিকল্পনা-কমিশনের সুপারিশ অনুসারে এই সমস্যাটির সমাধানকল্পে "পশ্চিমবংগ-সরকার নিম্নলিখিত পরিকল্পনা কার্যকরী করার কথা বিবেচনা করিতেছেন :

[এক] গ্রামাঞ্চলে শিক্ষকতা ও সমাজসেবার জন্য সরকার আগামী তিন বৎসরে ত্রিশ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করিবেন ; [দুই] যে গৃহনির্মাণ-পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তাহাতে প্রায় সাড়ে পঁয়ত্রিশ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হইবে ; [তিন] ছোট ছোট শিল্প-উন্নয়নের এক পরিকল্পনা করা হইয়াছে। উহাতে বহু লোকের কর্মসংস্থান হইবে ; [চার] আসানসোলে কয়লাখনি-অঞ্চলে গ্যাস উৎপাদনের একটি পরিকল্পনা বিবেচনা করা হইতেছে ; [পাঁচ] কলিকাতায় ময়লা নিষ্কাশনের জন্য একটি নতুন পরিকল্পনা করা হইতেছে ; [ছয়] পতিত জমি উদ্ধারের পরিকল্পনায় সাত কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে ; [সাত] দামোদর-পরিকল্পনার কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে, উহা হইতে যে-অতিরিক্ত বিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে, তাহা হইতে গ্রামাঞ্চলে সস্তা দরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে ; [আট] গংগাবাঁধ-পরিকল্পনাও বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দেওয়া হইতেছে।" এগুলির সহায়তায় বেকারসমস্যার তীব্রতা নিশ্চয়ই কিছুটা হ্রাস পাইবে।

আমরা যদি আমাদের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে পরিবর্তন আনিতে পারি, সংঘ-শক্তিকে যদি জাগ্রৎ করিয়া তুলিতে পারি, দেশের নানা রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান যদি সুনিশ্চিত পরিকল্পনার দ্বারা দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারেন, তবে এই জটিল বেকারসমস্যার অনেকখানি সমাধান হইতে পারে।

উপসংহার

কর্মহীনতার জন্যই প্রতিদিন অপরিমেয় জন-শক্তির অপচয় ঘটিতেছে—এই অপচয় এবং তজ্জনিত বহু দুর্গতি হইতে জাতিকে বাঁচাইবার একটি পথ আমাদিগকে যে-কোনো প্রকারেই হোক আবিষ্কার করিতে হইবে। তবেই বাঙালী বাঁচিবে, নতুবা জীবনসংগ্রামে তাহার ধ্বংস অনিবার্য।

বাঙালীর আর্থিক উন্নতির অন্তরায়

[**রচনার সংকেতসূত্র:** বাঙালীর আর্থিক সংকট—ইহার কারণ বিশ্লেষণ—বাঙালীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সুফল ও কুফল—দেশে বৈষয়িক ও বাণিজ্যিক শিক্ষার অভাব—বাঙালীর আয়ের স্বল্পতা—তজ্জনিত স্বাস্থ্যহানি—ব্যবসায়ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতা—ব্যবসায়বাণিজ্যের ঝুঁকি বহনে অপ্রবৃত্তি—মূলধন ও শিল্পব্যাঙ্কের অভাব—কৃষি-অবনতির কারণ—বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অসুবিধা—আর্থিক কাঠামোর সংস্কার—উপসংহার।]

বাঙালীর আর্থিক সংকট: ইহার কারণ বিশ্লেষণ

বাঙালীর আর্থনীতিক জীবনে আজ প্রবল ভাঙন ধরিয়াছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বর্তমান শতাব্দী সুরু হইবার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত বাংলার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঙালীর উপরই ছিল, এবং বাংলা দেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী সারা বিশ্বে যে কেবল বাঙালীর বিশিষ্টতার পরিচয় দিত তাহা নয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যের মোটা লাভের অংশও ভোগ করিত বাঙালী ব্যবসায়িগণ। বর্তমানে সেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আজ বাঙালীর স্থান অধিকার করিয়াছে বৃটিশ শিল্পপতিগণ —মাড়োয়ারী ও ভাটিয়া বণিকগণ। বাংলার একচেটিয়া কারবারের অধিকারী হইয়া যাহারা বৎসরের পর বৎসর বাংলার বাহিরে কোটি কোটি টাকা পার করিয়া স্ফীত হইতেছে, তাহাদের প্রদত্ত চাকুরিই আজ আমাদের একমাত্র সম্বল। অতীতের অবস্থার সহিত বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা করিলে আমাদের অবনতি যে কী ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব। বাংলার আর্থিক অবস্থা একটু তলাইয়া দেখিলেই বাঙালীর উন্নতির অন্তরায়ের কারণগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

বাঙালীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য: ইহার সুফল ও কুফল

যে-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এককালে বাঙালীর উন্নতির প্রধান কারণ ছিল, উহাই আজ অবনতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কুটীরশিল্পে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি, যখন দেখি যে একজন শিল্পী কত সুন্দর পণ্য নিখুঁতভাবে নিজেই প্রস্তুত করিতেছে। ইহার জন্য অপরের সাহায্যের প্রয়োজন তো ছিলই না, বরং একক প্রচেষ্টাই এই কুটীরশিল্পজাত সামগ্রীর উৎকর্ষের বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু বর্তমান জগৎ যখন বহুলোৎপাদনের দিকে জোর দিল, তখন বাঙালীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-গুণটি আর্থনীতিক অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা হইয়া

দাঁড়াইল। বর্তমানে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও বাঙালী তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে পারিতেছে না। বিশ্বের প্রত্যেকটি জাতির আর্থনীতিক বনিয়াদ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে উপলব্ধি করা যাইবে যে, তাহার আর্থিক চক্র ঘুরিতেছে বহু ব্যক্তির মিলিত প্রচেষ্টায়। বর্তমানকালে যখন রাজনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া অর্থনীতি পর্যন্ত সমস্ত-কিছুরই উন্নতি নির্ভর করিতেছে জনসাধারণের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার উপর, তখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধকে আঁকড়াইয়া থাকিলে আমাদের আর্থিক কাঠামো যে শীঘ্রই ভাঙিয়া পড়িবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

আর্থনীতিক মতবাদের দ্রুত তথা বিপ্লবমূলক পরিবর্তনের চাপে পড়িয়া দিনের পর দিন নূতনভাবে বিশ্বের আর্থিক কাঠামোর সংস্কার হইতেছে। বর্তমানে পুরাতনকে সরাইয়া দিয়া নূতন উন্নত প্রণালীকে কাজে লাগাইবার দিকে একটি প্রচেষ্টা সকল ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী কিন্তু যুগের এই দ্রুত অগ্রগতির সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে না। সেজন্য দেখা যায়, একই প্রাচীন পদ্ধতিতে অদ্যাবধি তাহার কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় পরিচালিত হইতেছে। ইহার হেতু কী? আমরা বলিব, ইহার জন্য অনেকটা দায়ী আমাদের আর্থিক দুরবস্থা এবং শিল্পশিক্ষা ও বৈষয়িক শিক্ষার অভাব।

দেশে ব্যবসায়িক শিক্ষার অভাব

আমাদের আর্থনীতিক পরিস্থিতির সম্পর্কে আনিয়া দেশের শিক্ষাপ্রণালীর স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখি যে, বাংলার স্বার্থের সহিত বাঙালীর শিক্ষা-ব্যবস্থার কোনো সামঞ্জস্য নাই। বাস্তববিরোধী এই শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত থাকায় দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি শুধু কেরাণী উৎপাদনের কারখানায় পরিণত হইয়াছে। বাংলার শিক্ষাধারা বাঙালী শিক্ষার্থীকে কর্মক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে না, তাহাদের মনে কেবল শিক্ষার অভিমানের বিষ ছড়াইয়া দেশে বেকার-সমস্যার জাল বুনিতেছে। বাংলার শিক্ষাব্যবস্থায় যে ফাটল ধরিয়াছে, এই সত্যটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া ইহার পরিবর্তনবিষয়ে সকলেই আজ সতর্ক হইয়া উঠিয়াছেন।

আয়ের স্বল্পতার জন্য, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতি একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের দুর্গত জনসাধারণ ও কৃষকদের স্বাস্থ্যের অবস্থা এইরূপ হইয়াছে যে, তাহারা বৎসরের মধ্যে প্রায় সাত মাস রোগ ভোগ করে। ডাঃ এক্রয়েড্ [Dr. Akroid] ভারতবাসীর স্বাস্থ্যসম্বন্ধে হতাশ হইয়া বলিয়াছেন, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবই আমাদের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত অবনতির

প্রধান কারণ। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ভারতের প্রদেশগুলির অধিবাসীদের মধ্যে পাঞ্জাবীদের খাদ্যই উৎকৃষ্ট। পাঞ্জাবীদের প্রাত্যহিক খাদ্যতালিকার সহিত তুলনা করিলেই বাঙালীর দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ-স্বল্পতা সুস্পষ্টরূপে চোখে পড়ে। স্বাস্থ্যহীনতা আমাদের আর্থিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় এবং আর্থিক দুর্গতির অন্যতম প্রধান কারণ।

বাঙালীর স্বাস্থ্যহীনতা

গতানুগতিকতা বাঙালীর স্বভাবগত দোষ। কোনো একটি বিশেষ ব্যবসায়ে যদি কেহ লিপ্ত হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, উক্ত ব্যবসায় লাভজনক মনে করিয়া আরও অনেকে অনুরূপ ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এরূপ অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া বাঙালী নিজের ধ্বংস নিজেই ডাকিয়া আনিতেছে।

শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে বাংলার যে বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে, উহার দিকে মনোযোগী হইবার চেষ্টা বাঙালী কোনোদিন করে নাই। নির্দিষ্ট আয়ের একটি সুবিধা থাকায় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাঙালী-বাবুদের বেশ ভিড় জমিল, সমাজ ইহাদের দেখিল অতি সম্ভ্রমের চোখে। আপিসে কাজ করিয়া সমাজে যথেষ্ট খাতির-সম্ভ্রমের অধিকারী হওয়ায় লোকে আর শিল্পবাণিজ্যের ঝুঁকি বহন করিবার প্রয়াস পাইল না। ইহাতেই দেখা দিল বাঙালীর আর্থিক বিপর্যয়ের সূত্রপাত। এই সুযোগে বাংলায় চা, পাট, কয়লা প্রভৃতি অত্যন্ত লাভজনক শিল্পগুলির একচেটিয়া অধিকারী হইয়া বসিল অবাঙালী ব্যবসায়িগণ। ফলে, আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে-সকল শিল্প বাঙালীর জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে পারিত, সেই শিল্পগুলি প্রায় সবই ইংরেজ ও মাড়োয়ারীদের হাতে চলিয়া গিয়াছে—যে-কয়টি বাঙালীর হাতে আছে, তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ঝুঁকিগ্রহণে অপ্রবৃত্তি

শিল্পক্ষেত্রে বাঙালীর অসাফল্যের আর-একটা প্রধান কারণ মূলধনের অভাব। যাহাদের মূলধন আছে, ঝুঁকি থাকায়, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অর্থবিনিয়োগ করার চেয়ে তেজারতিতে টাকা খাটানোকেই তাহারা লাভজনক মনে করে। ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে এই, ব্যবসায়-বাণিজ্যে যাহারা উৎসাহী, মূলধনের অভাবে তাহারা হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। উপযুক্ত মূলধনের যোগানের অভাবেই বাঙালী যে নিজের শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারে নাই, একথা অবশ্যস্বীকার্য। সরকার

মূলধনের অভাব

কর্তৃক জমিদারী ক্রয় করিবার তোড়জোড় হওয়ায় ইহা আশা করা যায় যে, জমিদারগণ তাঁহাদের অর্থ ব্যবসায়িক ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে লাভজনক উপায়ে নিয়োগ করিতে পারিবে না বলিয়া শিল্পে মূলধনের অভাব কিছুটা দূর হইবে।

শিল্পব্যাঙ্কের অভাব

পাশ্চাত্ত্যের শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলির দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে, ওইসব দেশে শিল্পসংক্রান্ত অর্থের যোগান দেয় ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের প্রসার মোটেই আশানুরূপ হয় নাই বলিয়া বাংলা দেশে বরাবরই মূলধনের অভাব রহিয়া গিয়াছে। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে এদেশে ব্যাঙ্কের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মতো আমরা যদি শিল্পব্যাঙ্ক গড়িয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের সমস্যার তীব্রতা অনেকখানি কমিয়া আসিবে।

অনুন্নত কৃষিব্যবস্থা

বাংলার কৃষি একেবারেই অনুন্নত। এ দেশের কৃষকেরা এখনো মান্ধাতা-আমলের যন্ত্রপাতি লইয়া কৃষিকার্য চালাইতেছে। ফলে ফসল উৎপাদনের পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। কৃষকের শিক্ষার দৈন্য, মূলধনের অপ্রাচুর্য, কৃষি-সমবায়-সমিতির অভাব, উৎপন্ন ফসল বাজারজাত করিবার অসুবিধা প্রভৃতি নানাকিছু এ দেশের কৃষকের উন্নতির অন্তরায়। উপরন্তু ইহাও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, যে-সকল চাষী আদিম যুগের কৃষিপ্রণালী অনুসরণে কাজ করিয়া আসিতেছে, কৃষির ক্ষেত্রে তাহারা উন্নত প্রণালী প্রবর্তনের বিরোধী। এই অবাঞ্ছিত অবস্থার জন্য শুধু বাংলার কৃষক-সম্প্রদায়কেই দায়ী করিলে চলিবে না, পল্লীঅঞ্চলে যথোচিত শিক্ষাবিস্তারবিষয়ে সরকারের উদাসীন মনোভাব এবং চাষিদের অবিশ্বাস্য দারিদ্র্য ইহার জন্য অনেকটা দায়ী।

বৈদেশিক বাণিজ্যের অসুবিধা

বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য আজ নিয়ন্ত্রণ করিতেছে ইয়োরোপীয় বণিকগণ। কলিকাতার বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা পনেরো ভাগ মাত্র ভারতবাসীর হাতে। সুতরাং বাঙালীর হাতে যে কতটুকু, ইহা স্পষ্ট অনুমান করা যায়। বৈদেশিক বাণিজ্যে যে-পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন তাহার অধিকাংশই যোগান দিয়া থাকে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক। বাংলায় ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত কোনও এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক না থাকায় ইয়োরোপীয় এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি কেবল ইংরেজ-ব্যবসায়ীগণকেই তাহাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে সাহায্য করিয়া থাকে। ইহার ফলে কেবল গ্রেট-ব্রিটেনের সহিতই আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্য দেশের সহিত

বাণিজ্যপ্রসারের বহু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও গ্রেট-ব্রিটেনের বাণিজ্যের সহিত এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের উন্নতি নির্ভর করার দরুণ, অন্যান্য দেশে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য ভালভাবে শিকড় গাড়িতে পারে নাই।

উপসংহার

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাঙালীর স্বভাবগত দোষই কেবল বাঙালীর উন্নতির অন্তরায় নয়। বহুবিধ সমস্যা বাঙালীর জাতীয় জীবনকে প্রতিনিয়ত বিব্রত করিতেছে। ওইগুলির সুষ্ঠু সমাধান না হইলে এদেশের আর্থিক উন্নতি সুদূরপরাহত। বর্তমানে বাংলার আর্থিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের সময় আসিয়াছে। কী করিয়া, কোন্ পথে এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে, এ সম্বন্ধে একটা সুনিশ্চিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, গ্রামে কৃষকদের সংঘবদ্ধতা, মূলধনের যোগান, কৃষিশিক্ষাপ্রবর্তন, বাঙালীর চরিত্রগত দোষগুলির দূরীকরণ প্রভৃতির উপর বাঙালীর উন্নত গৌরবময় ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

বাঙালীর ভবিষ্যৎ

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** সূচনা—অতীত দিনের বাংলাদেশ—বাঙালীজীবনে কীভাবে ভাঙন ধরিল—বাঙালী তাহার দেশদেখা চোখ আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে—বাঙালীর অবনতির কারণ—যুগোপযোগী শিক্ষা ও জাতীয় সাহিত্যের অভাব—বাঙালীকে বাস্তব-সচেতন হইতে হইবে—উপসংহার।]

সূচনা

সমস্ত বাংলাদেশ আজ বিধ্বস্ত—সমগ্র বাঙালীজাতি আজ রিক্ততার শেষ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অনশন, অর্ধাশন, ব্যাধি, মৃত্যু এদেশের দুর্গত নরনারীর প্রাত্যহিক জীবনের নিত্য-সহচর। বাঙালীর মুখে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, চোখে নাই জীবনের দীপ্তি—তাহার চতুর্দিকে মহামরণের ছায়া ঘনায়মান। গোটা জাতির জীবনে যে একটা অবক্ষয় দেখা দিয়াছে, তাহার চিহ্ন আজ বেশ সুস্পষ্ট। তাই দেশের কল্যাণশ্রী অবলুপ্ত, প্রাণচাঞ্চল্য স্তিমিত। এমন অসহায়তা ও রিক্ততার ভাব বাঙালীর জীবনে কখনো দেখা যায় নাই। এই জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া মনে বার বার প্রশ্ন জাগে, বাঙালী কোন্ পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, বাঙালীর ভবিষ্যৎ কী।

অতীতের দিকে তাকাইলে দুই চোখে ফুটিয়া উঠে সোনার পল্লীবাংলার অপরূপ শ্রী। একটা সজীব শ্যামলতা ও প্রাণের অবারিত প্রাচুর্য গ্রামগুলিকে ছোট ছোট শান্তির নীড় করিয়া তুলিয়াছিল। সেইদিন বাঙালীর জীবনে ছিল অখণ্ড কর্মপ্রবাহ—চিন্তায়, ভাব-সাধনায়, জ্ঞানের সমুন্নতিতে বাঙালী লাভ করিয়াছিল অতুলনীয় বিশিষ্টতা। রাজনীতিতে বাঙালী পাইয়াছিল ভারতব্যাপী খ্যাতি, তাহার সমাজনীতিতে ছিল বিস্ময়কর সামঞ্জস্য, আর্থিক জীবনে ছিল একটা সহজ সম্পূর্ণতার ভাব। তাহার ধর্ম, তাহার শিক্ষাব্যবস্থা, তাহার সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান অতীতে সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। শৌর্যে, বীর্যে, কর্মক্ষমতায় কেহ তাহাকে পিছনে ফেলিয়া যাইতে পারে নাই। শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্য তখনও বাঙালীর হাতছাড়া হইয়া যায় নাই—কৃষক, শিল্পশ্রমিক, ব্যবসায়ী আপন আপন গ্রামখানিকে নিজের কর্মসাধনায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। সেইদিন দেশে সম্পদের অপ্রতুলতা ছিল না বলিয়া অভাব, দুঃখদারিদ্র্য, সর্বনাশা পরের দাসত্ব বাঙালীর জীবনে বিষক্ষত সৃষ্টি করিতে পারে নাই। আর্থিক ভারসাম্য এবং চরিত্রের দৃঢ়তাই জাতিকে উন্নতির পথে চালিত করে—অতীতের দিনে গ্রামকেন্দ্রিক বাঙালী-জীবনে এই দুইটি জিনিসের অপ্রাচুর্য কখনো দেখা যায় নাই। তাই সর্বাংগীণ উন্নতির পথে জাতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল।

অতীত দিনের বাংলা দেশ

যতদিন পর্যন্ত গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালীর জীবন আবর্তিত হইতেছিল, ততদিন সুখ-সমৃদ্ধি-সচ্ছলতার অভাব দেশে দেখা যায় নাই। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতা, ইয়োরোপের শিল্পবিপ্লবের তরংগ যেদিন বাংলার বুকে আঘাত হানিল, সেইদিন হইতে এ দেশের গ্রামীণ সভ্যতার মধ্যে ভাঙন ধরিল। বাংলার কুটীরশিল্পগুলি বিনষ্ট হইল, জমির উপর জনগণের অত্যধিক চাপ পড়িল, নানা কারণে কৃষির অবনতি ঘটিতে লাগিল। কর্মচ্যুত শিল্পশ্রমিক জীবিকার সন্ধানে শহরের অভিমুখে দলে দলে ছুটিয়া গেল। তদুপরি, দেশের উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যে যতই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রসারিত হইতে লাগিল ততই তাহারা বিজাতীয় শিক্ষা-বৈগুণ্যে গ্রামের প্রতি আকর্ষণ হারাইয়া ফেলিল। গ্রামের জমিদার, ধনিকশ্রেণী শহরের ভোগবিলাসের মোহে আপন আপন পল্লীকে বিস্মৃত হইল। শহরে আশ্রয় লইয়া বাঙালী স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিল না—ব্যবসায়-বাণিজ্যকে উপেক্ষা করিয়া চাকরি-জীবনকেই তাহারা একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া লইল। ফলে বাংলার গ্রামগুলি ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইল। বাঙালীর

বাঙালীজীবনে কী ভাবে ভাঙন ধরিল

সংস্কৃতি গেল, ঐতিহ্য গেল, আর্থিক ভারসাম্য বিনষ্ট হইল। এই বিপর্যয়ের রন্ধ্রপথেই বাঙালীর জাতীয় জীবনে সর্বনাশের শনি প্রবেশ করিল। পল্লীকে উপবাসী রাখিয়া নগরগুলি ফাঁপিয়া উঠিল সত্য, কিন্তু সেই স্ফীতি দেশের মানুষকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিল না। শিক্ষা ও আনন্দের অভাবে, শোচনীয় দারিদ্র্যের তাড়নায় উদার বাঙালীচিত্তে সংকীর্ণতা ও কুটিলতা আশ্রয় নিল। হীন দলাদলি, ক্ষুদ্র স্বার্থের সংঘাত, সাম্প্রদায়িক জীবনের অনৈক্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। এই ভাবে বাঙালীর ভাগ্যাকাশে দুর্দিনের মেঘ ঘনাইয়া আসিল—তাহার আর্থিক ও সামাজিক জীবন একরূপ বিধ্বস্ত হইল।

প্রাচীনতন্ত্রকে স্থানচ্যুত করিয়া দেশে নব্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু শিক্ষা-শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে-ভাঙন ধরিল, বিদেশী শাসনের নানামুখী বিরোধিতায় তাহার কোনো ক্ষতিপূরণ হইল না, বৃহত্তর সমাজ ক্রমেই অবনতির মুখে ছুটিয়া চলিল। বাঙালীর বর্তমানে যে অবস্থা, তাহার মধ্যে উজ্জ্বল ও উন্নত ভবিষ্যতের কোনো ইংগিত নাই। ভয়াল মৃত্যুর ছায়া জাতির জীবনে প্রতিদিন দীর্ঘতর হইয়া উঠিতেছে। নানা সমস্যা, নানা দুর্ভাবনা জাতির চিত্তকে আজ পীড়িত করিয়া তুলিতেছে। দেশের এত প্রাচুর্যের মধ্যেও যে আমাদের এত অভাব-দুঃখ-দারিদ্র্য, তাহার একমাত্র কারণ, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক পরাজয়ের জন্য বাঙালী তাহার স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তাটি হারাইয়া ফেলিয়াছে—তাহার দেশদেখা চোখ আর নাই। পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে রাষ্ট্রীয় সাধনার ক্ষেত্রে আমরা স্বদেশপ্রেমের বুলি উচ্চারণ করি, কিন্তু স্বদেশকে উপলব্ধি করিবার শক্তি হইতে আমরা আজ বঞ্চিত। আমাদের ভাণ্ডার যে একেবারে শূন্য, সে-কথা আমরা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি।

বাঙালী তাহার দেশদেখা চোখ আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাংলা যে নানাদিকে অনেকখানি পশ্চাতে পড়িয়া আছে, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। নিজ দেশেই বাঙালী প্রবাসীর মতো দিন যাপন করিতেছে। উন্নত কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য-শিল্প জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির প্রধান উপায়—ইহাদের উপরই গড়িয়া উঠে জাতির আর্থিক বনিয়াদ। কিন্তু আমাদের শিল্প নাই, ব্যবসায় নাই, বাণিজ্য নাই, বাংলার কৃষিও অবনত। এইগুলিকে বাদ দিয়া একমাত্র চাকরি অবলম্বন করিয়া আমরা কিরূপে ভবিষ্যতের উন্নতি ও কল্যাণ আশা করিতে পারি? সমগ্র জাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতে হইলে প্রয়োজন বিচিত্র রকমের শিক্ষা-

বাঙালীর অবনতির কারণ

ব্যবস্থার—এ দেশে আজ পর্যন্ত তাহার গোড়াপত্তন হইল না। পুঁথিগত বিদ্যার চাপে আমাদের বুদ্ধি পীড়িত, তাই স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে নাবালকত্ব বাঙালীর এখনো ঘুচিল না।

শিক্ষা ও প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে যে-বিচ্ছেদ আজ দেখা দিয়াছে, তাহা দূর করিতে না পারিলে আমাদের স্বাবলম্বনশক্তি ফিরিয়া আসিবে না—ভবিষ্যৎ আরও তমসাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে। আমাদের প্রয়োজন কৃষিশিক্ষার, প্রয়োজন শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য-শিক্ষার, প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণার—বাঙালী সে-দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছে কি? বৃত্তিশিক্ষা ও সার্বজনীন সাধারণ শিক্ষার পথটিকে যদি উন্মুক্ত ও প্রসারিত করা না যায়, তবে বাঙালীর আর্থিক পরাধীনতা ঘুচিবে না, মনের আকাশ হইতে ভেদবুদ্ধি, অনৈক্য ও দলাদলির কালোমেঘ কাটিয়া যাইবে না।

আজ শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যে জাতিভেদ, হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে বিরোধিতা, হিন্দুর নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অনৈক্য—সকলেরই মূলে রহিয়াছে যথার্থ শিক্ষার অভাব ও আর্থিক দৈন্যের গ্লানি। আমাদের আর্থিক জীবন যদি সচ্ছল হইয়া উঠে, আমরা যদি প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে বাঙালীর ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হইবে—দেশে ঐক্য ও সংহতি ফিরিয়া আসিবে, জাতির জীবনে রাজনীতিক চেতনা বিকশিত হইয়া উঠিবে, জাতীয়তা উদ্বোধনের পথটি প্রশস্ততর হইবে, এবং এই জাতীয়তাবোধের মধ্যেই রহিয়াছে বাঙালীর মুক্তির ইংগিত। জাতীয় ভাবের অভাবই আমাদের ভবিষ্যতের সকল উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশকে যদি আমরা যথার্থ ভালবাসিতে শিক্ষালাভ করি তাহা হইলে আমাদের অবান্তর চিন্তা, কর্মহীনতা ও কর্মবিমুখতার ভাব একমুহূর্তেই কাটিয়া যাইবে। হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, সে যে বাঙালী, এই কথাটি প্রত্যেকটি দেশবাসীকে স্মরণ রাখিতে হইবে—ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালীর যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে ও নিজস্ব একটা দান আছে, সেকথা আমাদের বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

যুগোপযোগী শিক্ষা ও জাতীয় ভাবের উদ্বোধন

ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে গভীর আত্মীয়তাবোধ জাগ্রৎ করিয়া তোলা, জাতীয় স্বার্থ, মংগল ও আদর্শের কথা চিন্তা করা শুধু দেশপ্রেমিক কর্মীরই একমাত্র কর্তব্য নয়—দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং দেশের সাহিত্যিকবৃন্দকেও এবিষয়ে সক্রিয় হইয়া উঠিতে হইবে। জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় সাহিত্য দেশকে যে-ভাবে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতে

জাতীয় সাহিত্যের অভাব

পারে, অন্য কিছুই তেমনটি পারে না। বিশেষ করিয়া সাহিত্যের মধ্যেই জাতির সকল চিন্তা ও কর্মসাধনার রূপটি প্রতিফলিত হইয়া উঠে—সাহিত্যই জাতিকে চলার পথের নির্দেশ দেয়। কিন্তু আমাদের দেশে এখনো জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের রসের দিকটা আজো আমরা অন্ধভাবে অনুকরণ করিয়া চলিয়াছি, কিন্তু তাহার শক্তির দিকটা আমাদের সাহিত্যে ফুটাইয়া তুলিতে পারি নাই। বাংলা দেশের সাহিত্যে, বাংলার পল্লী, বাংলার মানুষ, বাংলার দুঃখ, দৈন্য, অভাব, দারিদ্র্যের কথা অদ্যাবধি যথার্থ অভিব্যক্তি লাভ করে নাই। অন্যদিকে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান-অনুশীলন প্রভৃতি মানুষের বহুমুখী চিৎপ্রকর্ষের ধারাটি বাংলা সাহিত্যে এখনো প্রবাহিত হয় নাই। আমাদের বর্তমান সাহিত্যসাধনা শুধু রসেরই সাধনা। মনুষ্যত্ববোধ, দেশপ্রেম, জাতীয় ঋদ্ধি ও সিদ্ধির কথা সাহিত্যে যদি ফুটিয়া না উঠে, তবে জাতি সম্মুখে চলিবার শক্তি ও প্রেরণা লাভ করিবে কোথা হইতে ?

বাঙালীকে বাস্তব-সচেতন হইতে হইবে

বাস্তবচেতনা বাঙালী জাতির মধ্যে জাগ্রৎ করিয়া তুলিতে হইবে। যে যে গুণে অন্য জাতি বিরাট কর্মশক্তির অধিকারী হইয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, আমাদিগকেও সেইসব গুণের অধিকারী হইতে হইবে। বাঙালী হিন্দুমুসলমান সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় অখণ্ড জাতীয়তার ভিত্তিতে জীবনকে গড়িয়া তুলিবার আজ সময় আসিয়াছে। শিল্পে, বাণিজ্যে, ব্যবসায়ে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে আমরা যেন কাহারও পিছনে পড়িয়া না থাকি। আজ আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, কিন্তু উন্নত চিন্তা ও কর্মশক্তির অভাব না ঘটিলে আমরা অচিরেই স্বর্ণযুগের তোরণদ্বার উন্মোচিত করিতে সমর্থ হইব। বাঙালীর অতীতের দিনগুলি সত্যই ছিল গৌরবোজ্জ্বল—তাহার ভবিষ্যৎও গৌরবমণ্ডিত হইয়া উঠিবে। ইহার জন্য চাই সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি, বাস্তবভিত্তিক আর্থিক পরিকল্পনা এবং দেশাত্মবোধের জাগৃতি।

উপসংহার

জাতীয় জীবনের পুনর্জাগরণের বিরাট সমস্যা আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে। সেই সমস্যার আশু-সমাধান আমাদিগকে করিতেই হইবে। পল্লীকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের সকল কর্মধারা আবর্তিত হইয়া উঠুক। পল্লীর কৃষি, পল্লীর শ্রমবিভাগ, গ্রামীণ সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাদ দিয়া বাংলার সর্বাংগীণ উন্নতি কখনো সম্ভব হইবে না। কয়েকটি শহরের মধ্যেই বাংলা দেশকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, শহরের বাহিরেই পড়িয়া আছে বৃহত্তর বাংলাভূমি—ব্যাধি, মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, বন্যা তাহাকে প্রতিমুহূর্তে

বিধ্বস্ত করিয়া দিতেছে। মোহমুক্ত বাঙালী যদি আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, তবে মৃত্যুমুখী বাংলার হাহাকার দিকে দিকে আর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিবে না, বাংলার যুবশক্তিকে সহ্য করিতে হইবে না বেকারজীবনের জঘন্য গ্লানি। বাঙালী যেদিন তাহার দেশকে চিনিবে, আত্মশক্তিকে ফিরিয়া পাইবে, সেইদিন বাংলাজননীর মূর্তি ভিন্নরূপ ধারণ করিবে—আর বাংলার প্রাণচঞ্চল নরনারীর মুখে উচ্চারিত হইবে :

'আজ বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি
তুমি অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে,
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।'

বাঙালী মধ্যবিত্তের সংকট

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—মধ্যবিত্তশ্রেণীর পরিচয়– মধ্যবিত্তের স্তরবিভাগ—মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের উদ্ভব—দেশের উন্নতিতে মধ্য বত্তের দান—মধ্যবিত্তসমাজের কাছে জাতির ঋণ—মধ্যবিত্তের জীবনে সংকটের সুরু—মধ্যবিত্তশ্রেণীর চরম সংকট—এই সংকটের প্রতিকার কীভাবে হতে পারে।]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী আজ শূন্যপরিণাম ক্ষয়িষ্ণুতার মুখে। ভাগ্যের বিরূপতায় এই সম্প্রদায়ের অগণিত মানুষ বর্তমানে ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন। আমাদের সমাজব্যবস্থায় নিদারুণ ভাঙন ধরেছে, তার সুবিন্যস্ত কাঠামোটি দিনের পর দিন ভেঙে পড়ছে—যেদিকে তাকাই, দেখতে পাই এক অশুভ বিপর্যয়ের সংকেত। এই সর্বনাশা ভাঙনের আঘাত অধুনা সবচেয়ে মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে আমাদের সংখ্যাতীত মধ্যবিত্তের জীবনে। মুখে তাদের বিবর্ণ অসহায়তার মসীকৃষ্ণ ছায়া, সমগ্র চিত্তদেশ জুড়ে হতাশার ক্রমবর্ধমান অন্ধকার। মন্দভাগ্য মধ্যবিত্ত বাঙালীর অবস্থাটি আজ আশ্রয়চ্যুত স্রোতের শেওলার মতো, প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাত্যার মুখে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তৃণ-পুঞ্জের মতো। দু-তিন দশক পূর্বেও যারা একরূপ সমস্যামুক্ত থেকে নির্ভাবনায় দিনাতিপাত করতো, ভদ্রজীবনযাপনে তখনো যাদের প্রবল কোনো বাধার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়নি, তাদের অবস্থা আজ কী শোচনীয় হয়ে উঠেছে! একদিন যারা ছিল গোটা বাঙালী জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ, অধুনা তারা সাংঘাতিকরূপে

বিপর্যস্ত, অভাবনীয় আর্থিক অনটনের দুঃসহ পীড়নে ক্লিষ্ট, পীড়িত, মুমূর্ষু—পরম বেদনাদায়ক তাদের অসহায় মনোভাব। মধ্যবিত্তের জীবনসংকট আমাদের জাতীয় জীবনে আজ জটিলতম সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এখন দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই একটি প্রশ্ন : মধ্যবিত্তশ্রেণী যদি নিঃশেষ হয়ে গেল, তাহলে জাতির আর কী রইল ? প্রশ্নটি নিঃসন্দেহে গুরুতর।

সমাজে কাদের আমরা মধ্যবিত্ত বলি ? মধ্যবিত্তের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করা একটু কঠিন। কারণ, সমাজস্থ মানুষের এই শ্রেণীটির সীমারেখা সুচিহ্নিত নয়। তবে বাঙালীর সমাজবিন্যাস তথা সামাজিকের আর্থিক মূল্যমানের দিকে তাকিয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণীর সাধারণ একটা পরিচয় দেওয়া চলে। বর্তমানে ধনতন্ত্র-শাসিত মানবসমাজে আমরা দেখতে পাই একদিকে অগাধ ঐশ্বর্য—ভোগবিলাসের প্রাচুর্য, অন্যদিকে অবিশ্বাস্য দারিদ্র্য—প্রাণধারণের দুঃসহ গ্লানি ; কেউ প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনসম্পদের অধিকারী, কোনোরকমের পরিশ্রম তাদের করতে হয় না ; আবার, কেউ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত অবিশ্রান্ত খেটেও, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও, উদরান্নের সংস্থান করতে পারে না। প্রথমোক্ত ভাগ্যবান মানুষগুলি ধনিকশ্রেণীর অন্তর্ভূত, আর শেষোক্ত অদৃষ্টবিড়ম্বিত মানুষগুলি শ্রমিকমজুরের দলভুক্ত—তারা সর্বরিক্ত। এহেন প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের কারণ হল ধনবণ্টনের বৈষম্য, এরূপ অবিশ্বাস্য বিপরীতের পাশাপাশি অবস্থান একমাত্র ধনতান্ত্রিক সমাজেই সম্ভব। মধ্যবিত্ত নামে যারা পরিচিত, উপরি-কথিত সম্পদশালী ধনিকগোষ্ঠী ও নিঃসম্বল কৃষাণমজুরের মধ্যবর্তী একটি স্থানে তাঁদের অবস্থিতি। অমেয় ঐশ্বর্য তাঁদের নেই, আবার নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের পীড়নও পূর্বে কখনো তাঁদের সহ্য করতে হয়নি। তাঁরা পরশ্রমজীবী নন, পরিশ্রম তাঁরা করেন। তবে ওই পরিশ্রম ঠিক কায়িক নয়—মস্তিষ্কের, তাঁদের অধিকাংশই লেখনী-চালনার কাজে ব্যাপৃত।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর পরিচয়

মধ্যবিত্তের দুটি শ্রেণীবিভাগ—উচ্চমধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত। শিক্ষা-সংস্কৃতি, পেশা ও আর্থিক সচ্ছলতার তারতম্য মধ্যবিত্তসম্প্রদায়কে উচ্চকোটির ও নিম্নকোটির, এই দু-ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাবে, মধ্যবিত্তশ্রেণীর পরিধি খুব বিস্তৃত। একদিকে বড়ো বড়ো জমিদার [মনে রাখতে হবে, সম্প্রতি জমিদারীপ্রথা বিলুপ্ত হয়েছে], বড়ো বড়ো শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীবৃন্দ, অন্যদিকে ভূমিহীন চাষী, কলকারখানার দীনদরিদ্র মজদুর। এদের বাদ দিয়ে সমাজের অসংখ্য অগণিত যে মানুষ, মধ্যবিত্ত বলতে তাঁদেরই বুঝায়। আইনজীবী,

মধ্যবিত্তের স্তরবিভাগ

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বহুবিধ শিক্ষায়তনের অধ্যাপক-শিক্ষক, সাধারণ ব্যবসায়ী, দোকানদার ইত্যাদি সকলেই মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক পদমর্যাদা, মাথাপিছু আয়, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি বিষয়ে এঁদের মধ্যে যতই পার্থক্য থাক না কেন মানসিকতার দিক দিয়ে এঁদের সাধর্ম্যটুকু কারো দৃষ্টি এড়াবার নয়। স্বল্প-আয়-বিশিষ্ট হলেও এঁদের কাউকেই যেমন শ্রমিকমজুরের পর্যায়ে ফেলা চলবে না, তেমনি জমিদার ও বড়ো শিল্পপতির পঙ্‌ক্তিভুক্ত করা চলবে না। কারণ, মধ্যবিত্তের জীবিকা-অর্জনের পন্থা, শিক্ষাদীক্ষা, রুচি ও মানসিক গঠন লক্ষণীয়ভাবে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যের পিছনে দীর্ঘকালের একটি ঐতিহ্য রয়েছে। এখানে তার একটু আভাস দেওয়া প্রয়োজন।

আমাদের প্রাচীনকালের সমাজবিন্যাসে—সমাজ-অন্তর্গত মানুষের আর্থ-নীতিক শ্রেণীবিভাগে—'মধ্যবিত্ত' বলে কেউ ছিল না। তখন একদল মানুষকে আমরা ধনী বলে জানতাম, আর-একদল মানুষকে জানতাম দরিদ্র বলে।

মধ্যবিত্তের উদ্ভব

বাঙালীসমাজে মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে এদেশে ইংরেজ আগমনের পর। বস্তুত মধ্যবিত্ত বাঙালী ইংরেজ-বণিক ও ইংরেজ সরকারের সৃষ্টি। স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের আত্মসর্বস্ব শাসননীতি আমাদের কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে, নাগরিক সভ্যতার পত্তন করেছে। লর্ড কর্ণওআলিসের প্রবর্তিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-প্রথা বাংলার প্রাচীন ভূমিব্যবস্থাকে ওলটপালট করে দিয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজাবাহী লর্ড মেকলের শিক্ষাসংস্কার মানসিক ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটিয়ে গ্রাম্য-বাঙালী-সমাজের বৃহত্তর অংশকে শহরমুখী করে তুলেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারীতন্ত্রের সৃষ্টি হল, পশ্চিমের শিল্প-বিপ্লবের ফলে কৃষি-আশ্রয়ী ও কুটীরশিল্পাশ্রয়ী পুরাতন সমাজ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। আর, তার ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠল বাঙালী মধ্যবিত্তসমাজ। আমরা যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি বিমুখতার ভাব দেখালাম, তার জন্যে দায়ী জমিদারী প্রথা।

বাঙালী মধ্যবিত্তসমাজের এক অংশকে নানাভাবে জীবিকা জুগিয়েছে জমিদারীতন্ত্র, অপর একটি বড়ো অংশকে সুলভ সম্মান ও নিরাপদ আশ্রয়ের

দেশের উন্নতিতে মধ্যবিত্তের দান

প্রলোভন দেখিয়ে আকর্ষণ করেছে ইংরেজ কোম্পানীর দপ্তরখানায় মাসমাইনের চাকুরি। তারপর মধ্যবিত্তশ্রেণীর অনেকে ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করলেন, তাঁরা ডাক্তারী, ওকালতি, শিক্ষকতা ইত্যাদির দিকে ঝুঁকে পড়লেন। ধীরে ধীরে সমাজে মধ্যবিত্তের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হল। তাঁরা 'ভদ্রলোক'-এর সম্মানমর্যাদা

পেলেন, আস্তে আস্তে সামাজিক প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে উঠলেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা তাঁদের বুদ্ধিকে শাণিত উজ্জ্বল করে তুলল, বিবিধ জ্ঞানবিগ্যার দ্বার তাঁদের সম্মুখে উন্মোচিত করে ধরল। কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা বিচিত্র ভাবসাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন, সাহিত্য-শিল্প-দর্শন-রাজনীতি-অর্থনীতি-ইতিহাস-বিজ্ঞান-চর্চায় মন দিলেন। ফলে বাঙালীর গোটা সমাজজীবনে দেখতে দেখতে একটা বিপ্লব ঘটে গেল। জন্ম হল নতুন সংস্কৃতির, সৃষ্টি হল নতুন জীবনদর্শনের। শিক্ষার প্রতি মধ্যবিত্ত বাঙালীর যেন জন্মগত মানসপ্রবণতা, এই মধ্যবিত্তসমাজ নতুন যুগের —আধুনিক বাংলার—সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এই সত্যটি স্মরণ করেই একটু আগে তাঁদের আমরা সমগ্র জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ বলেছি। মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের মানুষগুলিই যে এতকাল পর্যন্ত দেশের প্রাণশক্তির প্রধান উৎস ছিল, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মধ্যবিত্তের কাছে জাতির ঋণ

গত দেড়শ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে কর্মসাধনা ও ভাবসাধনার যে-স্মরণীয় ইতিহাস গড়ে উঠেছে, তাকে মধ্যবিত্তের জীবনেতিহাস বললে বোধ করি খুব ভুল করা হয় না। কি ধর্মসংস্কার, কি সমাজসংস্কার, কি রাজনীতিক চেতনার স্ফুরণ, কি দেশাত্মবোধের উদ্বোধন, কি জাতীয় আন্দোলনের বিকাশ—সর্বক্ষেত্রেই মধ্যবিত্তের দান অসামান্য। যে-সকল শ্রেষ্ঠ বাঙালী আমাদের স্মৃতিলোকে নিজ নিজ প্রতিভার প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর মুদ্রিত করে গেছেন তাঁদের অধিকাংশই যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, এ কথা কাকেও স্মরণ করিয়ে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। নানাদিকে নানাভাবে জাতিকে তাঁরা বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, সর্বভারতের সম্মুখে বাঙালীর মর্যাদাকে তুলে ধরেছেন, জাতি হিসেবে বাঙালী যে বিশিষ্ট তার গৌরবদীপ্ত প্রমাণ রেখে গেছেন। তাঁদের কাছে জাতির ঋণ সামান্য নয়।

মধ্য বিত্তের জীবনে সংকটের সুরু

কিন্তু ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে এহেন বাঙালী মধ্যবিত্তের অবস্থা আজ কী দাঁড়িয়েছে! নিদারুণ সংকটের আবর্তে পড়ে মধ্যবিত্তসমাজ অধুনা বিপর্যস্ত। এককালে যাঁদের নিরুদ্বেগে দিন কাটতো, অবকাশের মুহূর্তগুলি যাঁদের বিবিধ জ্ঞানবিগ্যার অনুশীলনে অতিবাহিত হতো, তাঁদের চোখের সম্মুখে আজ বিরাজ করছে মহাশূন্যতা। অতীতে মধ্যবিত্তশ্রেণী এতখানি অসহায় বোধ কখনো করেননি। পৈতৃক জমিজমা তাঁদের অনেকেরই ছিল, অনেকে সরকারী চাকুরীর পক্ষপুটে থেকে নির্ভাবনায় দিনগুলি কাটাতেন। আবার, অনেকে ডাক্তারী, ওকালতি, শিক্ষকতা ইত্যাদি 'ভদ্রলোক'-এর পেশায় আত্মনিয়োগ করে জীবনযাত্রা

নির্বাহ করতেন। কিন্তু নানা প্রতিকূল শক্তির বিরোধিতায় ধীরে ধীরে তাঁরা পূর্বের সেই নিরাপদ আশ্রয় থেকে চ্যুত হতে লাগলেন, দুর্ভাগ্য ক্রমশই বেড়ে চললো। প্রথম-মহাযুদ্ধের পর থেকে তাঁদের অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে উঠলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মধ্যবিত্তশ্রেণীকে প্রায়-ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল। তাছাড়া, মধ্যবিত্তের অনেকেই পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রচণ্ড ধাক্কা সামলাতে পারেন নি, অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। পশ্চিমী যান্ত্রিকতা ও নাগরিক সভ্যতার দুষ্টপ্রভাবে আমাদের কুটীরশিল্প ও কৃষিবুনিয়াদ আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছিল, একান্নবর্তী পরিবারগুলি টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাচ্ছিল, এ সর্বনাশ আমরা রোধ করতে পারলাম না। ফলে মধ্যবিত্তসম্প্রদায় ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন। ইতোমধ্যে দেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলল, বেকার-জীবনের বিড়ম্বনা সুরু হল—শিল্প-ব্যবসায়-বাণিজ্যহীন দেশের দিকে দিকে দারিদ্র্যক্লিষ্ট মধ্যবিত্তের হাহাকার উঠল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া একান্ত শোচনীয়। জিনিসপত্রের দাম হুহু করে চারগুণ পাঁচগুণ বেড়ে যেতে লাগল, ফাঁপানো টাকায় বাজার ছেয়ে গেল, চোরাকারবারীর দল মাথা তুলল—নিম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণীর অস্তিত্ব মারাত্মকভাবে বিপন্ন হল।

মধ্যবিত্তজীবনের অসহনীয় দুর্গতি-লাঞ্ছনার ইতিকথা কিন্তু এখনো শেষ হয়নি। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে বাঙালী মধ্যবিত্তদের এমন একটি ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হল যার ফলে তাঁরা আজ ধ্বংসের পথে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমরা এখানে ভারতের স্বাধীনতালাভ ও অভিশপ্ত বঙ্গব্যবচ্ছেদ-ঘটনার কথা বলছি। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করল, কিন্তু বাংলাদেশের, বিশেষ করে পূর্ববাংলার, মধ্যবিত্তের সর্বনাশ হল। বাঙালী জাতির ইতিহাসে এতখানি সাংঘাতিক বিপর্যয় আগে কখনো ঘটেনি। মধ্যবিত্তশ্রেণীর নাড়ীর স্পন্দন গেলো দু-তিন দশক থেকে ক্রমেই ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল, বঙ্গবিভাগহেতু বর্তমানে তাঁদের নাভিশ্বাস দেখা দিয়েছে। পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্তসমাজ আজ মৃত্যুমুখী। সাতপুরুষের বাস্তুভিটা ছেড়ে, নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগ করে, সম্পূর্ণভাবে ছিন্নমূল হয়ে তাঁরা প্রতিদিন দলে দলে পশ্চিম-বাংলায় এসে ভিড় করছেন। কিন্তু কোথায় তাঁদের মাথা গুঁজবার স্থান, কোথায় ক্ষুধার অন্ন, কোথায় বা লজ্জা নিবারণের পরিচ্ছদ! বাস্তুহারা লক্ষ লক্ষ নরনারীর অবস্থা আজ যাযাবর বেদের মতো, পথের কুকুরের মতো তাঁরা যাপন করছেন গ্লানিপংকিলময় জীবন। যুদ্ধ মানুষকে আত্মসর্বস্ব ও লোভী করে তুলেছে, মানবতাকে

মধ্যবিত্তশ্রেণীর চরম সংকট

হত্যা করেছে, সমবেদনার কণ্ঠরোধ করেছে, মানুষের ঘুমন্ত পাশবিক বৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তুলেছে। এরূপ পরিস্থিতিতে পড়ে পূর্ববংগের সর্বস্বান্ত মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংকট ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। সারাদেশের বেকারসমস্যা, সরকারী-বেসরকারী আপিসে ক্রমাগত ছাঁটাই বাস্তুভিটাত্যাগী শিক্ষিত মধ্যবিত্তগণের সমস্যাকে জটিলতর করে তুলেছে। দেশে শ্রমিক-ধনিকের বিরোধ লেগেই আছে, তা মিটাতে গিয়ে সরকার হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন, অপরাপর সমস্যার দিকে মন দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। এসব কারণে মধ্যবিত্তের দুর্গতির শেষ নেই। আর কিছুকাল এভাবে কাটলে মধ্যবিত্তসমাজের অস্তিত্বও থাকবে না।

কিন্তু মধ্যবিত্তশ্রেণী যদি বিধ্বস্ত হয়ে যায় তাহলে দেশের কী অবস্থা হবে? এতে কি গোটা বাঙালীসমাজের অপমৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠবে না? সমাজের মেরুদণ্ডই যদি ভেঙে গেল তবে সমাজ মাথা তুলে দাঁড়াবে কেমন করে? মধ্যবিত্তেরা মরবে, কিন্তু মরবার আগে সমগ্র দেশটাকে একবার প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে যাবে,—হয়তো রাষ্ট্রে জ্বলে উঠবে বিদ্রোহ-বিপ্লবের রক্তবহ্নিশিখা। মধ্যবিত্তের বিক্ষোভ কী ভয়াল, পৃথিবীর ইতিহাসের পাঠকমাত্রেরই তা জানা আছে নিশ্চয়। বৃহত্তর সমাজের কল্যাণের কথা ভেবে বলছি, যে-কোনো উপায়েই হোক মধ্যবিত্তসমাজের ভাঙন রোধ করতে হবে, অবিলম্বে এইসব কেন্দ্রচ্যুত মানুষের দুঃসহ লাঞ্ছনার অবসান ঘটাতে হবে। এর জন্যে দেশের প্রত্যেকটি মানুষের উদ্যম-প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব অনেকখানি। রাজ্যসরকারকে সুচিন্তিত পরিকল্পনা রচনা করতে হবে, সর্বস্তরের মধ্যবিত্তের নিরাপদ আশ্রয় ও জীবিকার উপায় করে দিতে হবে। যারা নিঃসম্বল তাদের জন্য অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা চাই, স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা চাই, প্রয়োজনমতো আর্থিক সাহায্য চাই। সংগে সংগে মৃতপ্রায় গ্রামগুলির সংস্কারসাধন ও পুনর্বিন্যাস অত্যাবশ্যক। তাছাড়া, কৃষিপ্রথাকে উন্নত করা প্রয়োজন, কুটীরশিল্পের উজ্জীবন প্রয়োজন, বিবিধ শিল্পের সম্প্রসারণ প্রয়োজন, প্রয়োজন ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রটি প্রশস্ত করা। এতে বহু মধ্যবিত্তের জীবিকা-অর্জনের পথ খুলে যাবে, অবশ্যম্ভাবী বিনাশের হাত থেকে অনেকেই রক্ষা পাবে। অবশ্য যতখানি সম্ভব স্বাবলম্বী হয়ে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কেও কঠোর জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। হতাশার কাছে তাঁরা যেন আত্মসমর্পণ না করেন। আমাদের শেষ কথা, মধ্যবিত্তের সর্বনাশ সমগ্র জাতির সর্বনাশ—এই নিশ্চিত সত্যটি যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

এই সংকটের প্রতিকার কীভাবে হতে পারে

বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** বাঙালীর বিগত দিনের ইতিহাস গৌরবমণ্ডিত—বাঙালীর অতীত কীর্তি—জ্ঞানসাধনায় বাঙালী—ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে বাঙালী—বাঙালীর সাহিত্যসাধনা—বিজ্ঞানসাধনা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালী—চারুশিল্প ও কারুশিল্পের ক্ষেত্রে বাঙালীর দান—ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালী—বাঙালীর অতীত কীর্তি-স্মরণে দেশপ্রাণ বঙ্কিমের উক্তি।]

বাঙালীর বিগত দিনের ইতিহাস গৌরবমণ্ডিত

বাঙালী জাতি আজ অতীতভ্রষ্ট, আত্মবিস্মৃত। কিন্তু প্রদীপ্ত মনীষা, ভাবসাধনা ও কর্মসাধনার ক্ষেত্রে বাঙালী যে একদিন ভারতবর্ষে একটা গৌরবমণ্ডিত স্থান অধিকার করিয়াছিল—বংগভূমির অতীত ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। অতীতে বাঙালী জাতি তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে-কীর্তিস্তম্ভ রচনা করিয়াছিল, নিখিল ভারতবর্ষ অবনত মস্তকে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছে। রাজনীতিক ও আর্থনীতিক নানা ভাগ্যবিপর্যয়ে বর্তমানে আমরা আমাদের সেই অতীত গৌরব হারাইতে বসিয়াছি—নানাপ্রকার সংঘাতে বাঙালীর অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। কিন্তু আমরা যদি বিগত দিনের ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে আমাদের পুনরুজ্জীবনের মন্ত্রটিকে খুঁজিয়া লইতে পারি, তবে আমাদের হৃত গৌরব নিশ্চয়ই আবার ফিরিয়া পাইব—জগৎসভায় পুনর্বার আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিব।

বাঙালীর অতীত কীর্তি

জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, ধর্মে-দর্শনে, চারুকলায় ও কারুশিল্পে, শৌর্যে ও বীর্যে একদিন বাঙালীর মহিমা ছিল দূরবিস্তার। ভারতবর্ষের অতি সুপ্রাচীন গ্রন্থেও 'বংগ'-দেশের নাম চিহ্নিত হইয়া আছে। সেই প্রাচীনকালেই বাঙালীর বীরত্ব ও জ্ঞানগরিমার কথা দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বাংলার বীর-সন্তান কত দেশবিজয়ে বাহির হইয়াছে—ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া দূরবর্তী অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। রাজা ধর্মপাল, রাজা গণেশ, রাজা শশাংক এবং বিজয় সিংহের কীর্তিকাহিনী বাঙালীর বিস্ময়কর শৌর্যের পরিচয় বহন করিতেছে। মুসলমান-আমলে বাংলার বীরসন্তান চাঁদ-প্রতাপ-ঈশা খাঁ প্রভৃতি বারভূঁঞার দল যে অমিত পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাতে প্রবল-প্রতাপান্বিত দিল্লীশ্বরের সিংহাসন পর্যন্ত বারে বারে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিশযুগে

বাঙালী জাতি নানা কারণে হীনবীর্য হইয়া পড়িয়াছিল—সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল তাহার সমস্ত শক্তি। তথাপি পরাধীন ভারতকে স্বদেশমন্ত্র ও অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছে স্বাধীনতার পূজারী বাংলার তরুণদল—হাসিমুখে ফাঁসীর মঞ্চে তাহারা জীবনের জয়গান গাহিয়া গিয়াছে। এই সেইদিন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীরসন্তান সুভাষচন্দ্র তাঁহার আজাদ-হিন্দ-ফৌজ গঠন করিয়া সামরিক শক্তি ও সাহসিকতার যে-পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা অমর হইয়া থাকিবে।

জ্ঞানসাধনায় বাঙালী

জ্ঞানের চর্চায় এবং ভাবসাধনায় বাঙালী কোনো জাতি অপেক্ষা পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। প্রোজ্জ্বল মনীষা ও ক্ষুরধার বুদ্ধির জন্য বাঙালী জাতি সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। ভারতের বিশ্রুত নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন এই বাংলাদেশেরই একজন মানুষ—নাম শীলভদ্র। বাঙালী অতীশ দীপংকরের খ্যাতিও বিদ্বজ্জনসমাজে সুপ্রচারিত ছিল। বাংলার জ্ঞানসাধনাকে তিনিই বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন সুদূর তিব্বতে। 'দর্শনে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ, স্মৃতিতে রঘুনন্দন এবং তৎপরগামিগণ বাংলাভূমির গৌরবকে উজ্জ্বল ও মহীয়ান করিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতেও যুগমানব শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্মসাধনা ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের গভীর দর্শন-আলোচনা ভারতবর্ষকে বিস্মিত করিয়াছে।

ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে বাঙালী

ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেও বাঙালীর দান সামান্য নহে। বাংলার ধর্মাবতার শ্রীচৈতন্য সর্বভারতীয় বৈষ্ণবধর্মকে বাঙালীর হৃদয়রসে নিষিক্ত করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠা করিলেন—বাংলায় বহিয়া গেল প্রেমধর্মের দুকূলপ্লাবী বন্যা। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সাধনা ইউরোপের বহু মনীষীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। আবার, এই রামকৃষ্ণই ছিলেন ভারতের মর্মবাণীর প্রচারক যুগমানব বিবেকানন্দের দীক্ষাগুরু। অধ্যাত্মশক্তিতে প্রদীপ্ত বিবেকানন্দ শুধু বংগ-ভূমির গৌরব নন, তিনি সনাতন ভারতবর্ষেরই মরণবিজয়ী সন্তান। রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র-প্রমুখ ধর্মবীরের আবির্ভাবে বাংলাদেশ ধন্য হইয়াছে।

বাঙালীর সাহিত্যসাধনা

বাঙালীপ্রতিভার আশ্চর্য প্রকাশ ও বিকাশ দেখা যায় তাহার অত্যুজ্জ্বল সাহিত্যসাধনায়। আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের দরবারে গৌরবমণ্ডিত স্থানলাভ করিয়াছে। বাঙালী তাহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে-সুমহান ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পিছনে রহিয়াছে আমাদের সহস্র

বৎসরের সাহিত্যসাধনার ইতিহাস। বাংলার প্রাচীন কবি জয়দেব, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবি আপন আপন সৃষ্টিসম্ভারে বাংলার সাহিত্যভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রংগলাল, বিহারীলাল প্রমুখ কবি আধুনিক বংগসাহিত্যে নববাণীগংগার স্রোতোধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বাংলা সাহিত্যকে সহস্র বৎসরের পরমায়ু দান করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের মতো কথাশিল্পীকে লাভ করিয়া যে-কোনো জাতি আপনাকে ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে করিত।

বিজ্ঞানসাধনা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালী

বিজ্ঞানচর্চাতেও বাঙালী কম প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সত্যই বাঙালীর শ্লাঘার বস্তু। ডক্টর মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি প্রখ্যাতনামা বিজ্ঞানীর গবেষণা ও আলোচনায় বিশ্বের বিজ্ঞানভাণ্ডার নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালী সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র যে-রাষ্ট্রনীতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাঙালী জাতির মর্যাদা অনেকখানি বাড়াইয়া দিয়াছে। বাঙালীর সমুন্নত চিন্তাধারার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া মহামতি গোখেল বলিয়াছিলেন: 'What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow'। ভাবসাধনা ও উচ্চচিন্তার ক্ষেত্রে বাঙালী বহুবার ভারতবর্ষকে পথ প্রদর্শন করিয়াছে।

চারুশিল্প ও কারুশিল্পের ক্ষেত্রে বাঙালীর দান

চারুশিল্প এবং কারুকলার জগতেও বাঙালীর দান সামান্য নয়। চিত্রে ও ভাস্কর্যে বাঙালী যে-প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। প্রাচীন বাংলার শিল্পী ধীমান এবং বীটপালের খ্যাতি একদিন বহুদূর দেশ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাদের প্রবর্তিত শিল্পরীতি ভারতের বাহিরেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ অজন্তার গিরিগুহাগাত্রে বাঙালী শিল্পীর তুলিকার চিহ্ন আজ পর্যন্ত সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। আধুনিক যুগে ভারতীয় চিত্রশিল্পে পুনর্জাগরণ আনিয়াছেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসু। শিল্পের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতীয় নৃত্যশিল্পের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিয়াছেন বাঙালীসন্তান উদয়শংকর। এই সকল প্রতিভাবান বাঙালীর অজস্র দানে বাংলার সংস্কৃতি মহিমামণ্ডিত হইয়াছে। সহস্র বছরের সাধনায় বাঙালীর যে-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার নিদর্শন ভারতের

বাহিরে সিংহল, শ্যাম, কম্বোজ, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও অদ্যাবধি বিদ্যমান।

একদিন বাংলা দেশ অপরিমেয় ধনসম্পদে সমৃদ্ধিশালী ছিল—বাংলার বহির্বাণিজ্যের পরিধিও ছিল দেশদেশান্তরে বিস্তৃত। বাঙালী বণিকের পণ্য-বোঝাই ডিঙা নানাদেশে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। বাঙালীর তাঁতশিল্প, শঙ্খ ও হাতীর দাঁতের শিল্প, সূচীশিল্প পৃথিবীর নানাদেশের নরনারীর মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রাচীনকালের বাঙালী বাণিজ্যে অগ্রসর ছিল বলিয়া এদেশে চমৎকার নৌশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালী

জ্ঞানে কর্মে ধর্মে সাহিত্যে—এক কথায়, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বাঙালীর কর্মসাধনা ও ভাবসাধনার যে-পরিচয় মিলে, তাহা সত্যই বিস্ময়াবহ। বাঙালী একদিন তাহার যে-কীর্তিধ্বজা দিকে দিকে উড্ডীন করিয়াছিল, অতীত ঐতিহ্যের সেই পতাকা আজ অবনমিত। এরূপ একটি অবস্থা বাঙালীর দুর্ভাগ্যই সূচিত করে। বিগত দিনের বাঙালী জাতির কীর্তিকলাপ স্মরণ করিয়া দেশপ্রেমিক বঙ্কিম কমলাকান্তের 'একটি গীত' প্রবন্ধে বলিয়াছেন: 'আমাদের এই বংগদেশে সুখের স্মৃতি আছে, নিদর্শন কই? দেবপাল দেব, লক্ষ্মণ সেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ,—প্রয়াগ পর্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বরের নাম, গৌড়ী রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? সে গৌড় কই? আর্য-রাজধানীর চিহ্ন কই, আর্যের ইতিহাস কই, জীবনচরিত কই, কীর্তি কই, কীর্তিস্তম্ভ কই, সমরক্ষেত্র কই? সুখ গিয়াছে, সুখচিহ্নও গিয়াছে—চাহিব কোন দিকে?'

বাঙালীর অতীত কীর্তি-স্মরণে বঙ্কিমের উক্তি

বাঙালী যদি তাহার মানসিক জড়তাকে ভুলিতে পারে, বিলাসশয্যা ও আলস্য পরিত্যাগ করিতে পারে, আত্মকলহ বিস্মৃত হইয়া যদি সে আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া পায়, তাহা হইলে নবজাগ্রৎ জাতিহিসাবে আবার সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। আমাদের নূতন করিয়া আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য চাই অতন্দ্র সাধনা, অকুণ্ঠ স্বার্থবিসর্জন আর গভীর দেশপ্রেম—তবেই আমাদের হৃতগরিমা আমরা উদ্ধার করিতে পারিব।

বাঙালী-সংস্কৃতির পরিচয়

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** বাঙালী-সংস্কৃতি বলিতে কী বুঝায়—বাঙালী-সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ—বাঙালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস—ইহার তিনটি যুগ—ইসলামধর্ম ও বাঙালী-সংস্কৃতি—বর্তমানের বাঙালী-সংস্কৃতি—আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃতি ঃ প্রথম পর্যায়—দ্বিতীয় পর্যায়—তৃতীয় পর্যায়—চতুর্থ পর্যায়—বাংলার লোকসংস্কৃতি ও উচ্চতর সংস্কৃতির রূপ—উপসংহার]

প্রত্যেক ভাষায় এমন কয়েকটি বহুগুণব্যঞ্জক শব্দ আছে, এক কথায় যাহাদের সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ করা বস্তুত কঠিন—'সংস্কৃতি' কথাটি এই জাতেরই একটি শব্দ। ইহার ব্যাপক অর্থ হইল জাতির অন্তরংগ প্রতিভা ও চিৎপ্রকর্ষের বহিঃপ্রকাশ—মানসচর্চা, ভাবসাধনা ও কর্মসাধনার বাস্তব রূপায়ণ। সুতরাং 'সংস্কৃতি' বলিতে বুঝিতে হইবে কোনো বিশেষ জাতির মানসপ্রকৃতি, তাহার ঐতিহ্য, সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম-কর্ম এবং আরো নানাকিছু। জাতির সমগ্র প্রাণসত্তার প্রতিবিম্বনটি ধরা পড়ে তাহার সংস্কৃতিতে—বাঙালীর অন্তরতর জীবনের সামগ্রিক পরিচয়টি মিলিবে তাহার প্রবর্ধমান সংস্কৃতির মধ্যে। 'বাংলা দেশে বাংলাভাষী জনসমষ্টির মধ্যে, দেশের জলবায়ু ও তাহার আনুষংগিক ফলস্বরূপ এই দেশের উপযোগী জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া, এবং মুখ্যত প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভাবধারায় পুষ্ট হইয়া, বিগত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে-বাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহাই বাঙালী-সংস্কৃতি।'

বাঙালী-সংস্কৃতি বলিতে কী বুঝায়

অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভারতীয় আর্যের সংমিশ্রণে বাঙালী জাতির উদ্ভব। আদিম বাঙালী, রক্ত ও ভাষার দিক দিয়া যে অনার্য ছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। উত্তর-ভারতের গাংগেয় সভ্যতা ও আর্য-ভাষার প্রভাবে বাঙালীর নবজন্ম হয়। খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতক হইতেই প্রকৃতপক্ষে বাঙালী-সংস্কৃতির সূত্রপাত। মনে রাখিতে হইবে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়াই বাংলার সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে—বাঙালী-সংস্কৃতি বৃহত্তর ভারতীয় কৃষ্টির বিরোধী নয়। 'ভারত হইতেছে সাধারণ, বাংলা হইতেছে বিশেষ।…ভারতের সমস্ত প্রদেশসুলভ একটা সাধারণ ভারতীয়ত্ব আছে, বাংলাও তাহার অংশীদার।' ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিভিন্ন জাতি হইতে বাঙালীকে

বাঙালী-সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ

একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। আর্যপ্রভাবে আসিয়া বাংলা দেশ উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ঐতিহ্যকে সহজেই গ্রহণ করিয়াছে। বাঙালীর সহজাত অনার্যমনের উপর আর্যজাতির মানসপ্রকৃতির প্রভাবচিহ্ন যখন মুদ্রিত হইল, তখনই বাঙালীচরিত্রে লক্ষণীয় বিশিষ্টতা আত্মপ্রকাশ করিল। বাঙালী-সংস্কৃতির মূলে রহিয়াছে সর্বভারতীয় হিন্দুর চিৎপ্রকর্ষের ব্যাপক প্রভাব। তারপর ক্রমবিকাশের ধারাপথে অগ্রসরণকালে এ দেশের সংস্কৃতি ঐতিহাসিক কারণেই মুসলমান-সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছে। সুতরাং বাঙালী-সংস্কৃতির অন্তরংগ ইতিহাস হিন্দু, মুসলমান ও য়ুরোপীয় সংস্কৃতির মিশ্রণ, সংঘাত এবং সমন্বয়েরই ইতিকথা।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে মোটামুটি তিনটি যুগে বিভক্ত করা চলে : প্রাচীন যুগ—খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ; মধ্যযুগ—দ্বাদশ হইতে আঠারো শতক পর্যন্ত ; আধুনিক যুগ—আঠারো শতক হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত। প্রথম যুগের বাঙালী-সংস্কৃতির চেহারাটা পূর্বোক্ত বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ রূপ-প্রকাশ। মধ্যযুগে পাঠানমোগলের আমলে হিন্দু ও মুসলমান-সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়াছে, এবং বাঙালী-সংস্কৃতির সর্বোত্তম বিকাশ ঘটে বস্তুত মধ্যযুগেই। ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈনধর্মের সম্মিলিত প্রভাবে যে-সংস্কৃতি এ দেশের মাটিতে জন্মলাভ করিয়াছে, তুর্কীবিজয়ের পর রাজশক্তিপুষ্ট ইসলাম তাহাকে তেমন বিপর্যস্ত কিংবা পরিবর্তিত করিতে পারে নাই। মধ্যযুগে বাংলাদেশে শাসকজাতি ছিল মুসলমান। কিন্তু সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বাংলাভূমিতে বাস করার ফলে তাহারা বাঙালীত্ব অর্জন করিয়াছিল, এবং সহজেই স্থানীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিল। তদুপরি, বাঙালী মুসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুরক্তের প্রাধান্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং ইসলামধর্মী হইয়াও এই দেশের মুসলমানেরা হিন্দুসংস্কৃতিকে আপন হইতেই স্বীকৃতি জানাইয়াছে।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ইহার তিনটি যুগ

এস্থলে আরো একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। যে-ইসলামধর্ম বাংলায় প্রচারিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে কোরাণ-অনুসারী ইসলাম নয়। ইসলামের সূফী-মতই বাংলা দেশে প্রাধান্য লাভকরাহেতু হিন্দু-সংস্কৃতির সংগে মুসলিম-সংস্কৃতির সহযোগিতা সম্ভব হইয়াছিল। সূফীসাধনা ও বাঙালীর আধ্যাত্মিক সাধনার অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে বেশ লক্ষণীয় একটা মিল রহিয়াছে। মধ্যযুগের

ইসলামধর্ম ও বাঙালী-সংস্কৃতি

আলেম-মোল্লা-মৌলবী প্রভৃতি বিশিষ্ট মুসলমানেরা আরবী-ফার্সির চর্চা করিতেন বটে, কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতিকে এদেশে প্রচারিত করিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ কোনো আগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। মুসলমান-বিজেতারা কিছু কিছু নূতন ভাবধারা বাংলা দেশে আনিলেও কোনো উচ্চতর কৃষ্টি তাঁহারা সংগে লইয়া আসেন নাই। সেজন্য মুসলমানসংস্কৃতি হিন্দুসংস্কৃতিকে আপন প্রভাবে আচ্ছন্ন করে নাই। বাঙালীর উচ্চতর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানী প্রভাব খুব বেশী দৃষ্ট হইবে না—তবে বাংলার লোকসংস্কৃতি হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ সম্পত্তি।

ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আঠারো শতক হইতে বাঙালী-সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটিতে থাকে। বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের সংস্কৃতি ছিল দেশজ, আধুনিক যুগের সংস্কৃতি কিন্তু পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে দেশের মূলধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল গ্রাম্যজীবনকে কেন্দ্র করিয়া—বর্তমানের সংস্কৃতি ক্রমেই নগরকেন্দ্রিক হইয়া উঠিতেছে। বিজাতীয় শিক্ষা, বর্তমানের রাজনীতি ও অর্থনীতি এবং এ যুগের নানামুখী চিন্তাধারা বাঙালীর ভাবজীবনে ও কর্মসাধনায় বড়ো রকমের একটা পারবর্তন আনিয়া দিয়াছে। আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃতির একটা ঐতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার দুর্বলতাও কম নয়। তদুপরি অধুনা দেশে ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার ও হিন্দুমুসলমানের স্বার্থবিরোধ বাঙালী-সংস্কৃতিকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। যে-মধ্যবিত্তসম্প্রদায় দেশের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, তাহারাও অভাবনীয় ভাগ্যবিপর্যয়ে এখন ধ্বংসের মুখে ধাবমান। আমাদের জাতীয় জীবনে এতখানি সর্বনাশা সংকট ইহার পূর্বে কখনো দেখা যায় নাই।

বর্তমানের বাঙালী-সংস্কৃতি

বাঙালী-সংস্কৃতির আধুনিক যুগটিকে চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহার প্রথম পর্যায়ে বাঙালী চিন্তানায়কেরা সর্বপ্রথম য়ুরোপীয় চিত্তের সংস্পর্শে আসে। পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারায় প্রাচ্য জীবনকে পরিপুষ্ট করিয়া তোলাই ছিল তাহাদের সাধনা। য়ুরোপের ভাবচিন্তা প্রথম যুগের ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালীকে প্রভাবিত করিলেও তাঁহারা নির্বিচারে পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষা ও সভ্যতার সবকিছুকে গ্রহণ করেন নাই। ধর্ম ও সমাজসংস্কার ইত্যাদি ব্যাপারে চিন্তার সুস্থতা ও চিত্তের সজীবতা ওই যুগের রামমোহন প্রভৃতির সংস্কৃতি-আন্দোলনকে একটি লক্ষণীয় বিশিষ্টতা দান করিয়াছিল। রামমোহনের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব

আধুনিক বাঙালী-সংস্কৃতি : প্রথম পর্যায়

সর্বজনস্বীকৃত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সমন্বয়-বিষয়ে রামমোহন বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। তাঁহাকে আধুনিক যুগের প্রথম পর্যায়ের প্রতিভূ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পর্যায়

দ্বিতীয় পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করিল সর্বজনপরিচিত 'ইয়ং বেঙল-দল'। হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে দেশে এমন একদল ইংরেজী শিক্ষাভিমানী তরুণের আবির্ভাব ঘটিল, যাঁহাদের নিকট প্রাচ্য ভাব ও হিন্দুসংস্কৃতি ছিল সর্বৈব বর্জনীয়। স্বাধীন চিন্তার নামে তাঁহারা দেশজ সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তাঁহারা অন্ধভাবে অনুকরণ করিয়া চলিলেন। সেকালের পাশ্চাত্ত্যপন্থী তরুণচিত্তের উপর তাঁহারা কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

তৃতীয় পর্যায়

তৃতীয় পর্যায়ে য়ুরোপীয় ও ভারতীয় কৃষ্টির মধ্যে একটা সমন্বয়সাধনের প্রয়াস বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বঙ্কিম-ভূদেব-বিবেকানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রতীচীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে-উপাদান বাঙালীর জাতীয় জীবনের পক্ষে কল্যাণ-প্রদ, ওইগুলিকে আত্মসাৎ করিবার প্রচেষ্টায় এই সকল মনীষী ব্যাপৃত ছিলেন। বঙ্কিম-প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বাঙালীর জীবনদৃষ্টি ছিল উদার, অনুশীলনক্ষমতা ছিল অপরিসীম, দূরদর্শিতা ছিল ব্যাপক। তাই এই পর্বের ভাবসাধনা ও কর্মসাধনা বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে কম ফলপ্রসূ হয় নাই। জাতীয়তাবাদ এবং রাজনীতিক আন্দোলনও এ সময়ে আত্মপ্রকাশ করে। উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলা দেশে ধর্মান্দোলনের পুনরাবির্ভাবও লক্ষ্য করিবার মতো।

চতুর্থ পর্যায়

চতুর্থ পর্যায়ে, অর্থাৎ সাম্প্রতিক কালে বাঙালী-সংস্কৃতির সংকট একান্ত স্পষ্ট ও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রচণ্ড আঘাত বাঙালীর জাতীয় জীবনকে নানাদিকে পংগু করিয়া দিতেছে। আজ হিন্দুমুসলমানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে আত্মঘাতী বিরোধ—১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে বংগবিভাগ তাহারই চূড়ান্ত পরিণতি। রাজনীতিক ও আর্থনীতিক বিপর্যয় বর্তমানে আমাদের মানসিক ও নৈতিক শক্তিকে বিশেষ ভাবে দুর্বল করিয়া তুলিতেছে। এই প্রবল ভাঙনের অবসানে বাঙালীসংস্কৃতি কোন্ রূপ পরিগ্রহ করিবে, তাহার সুস্পষ্ট ইংগিত দেওয়া সম্ভব নয়। তবে একটা ঐতিহাসিক পরিবর্তন যে আসন্ন, সে বিষয়ে

কোনোই সন্দেহ নাই। এই পরিবর্তন হয়তো দেশের লোকসংস্কৃতির বৈপ্লবিক পুনরুজ্জীবন ঘটাইবে।

এইবার বাঙালীসংস্কৃতির বাস্তব রূপটির একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের অজস্রতা নিশ্চয়ই কাহারো দৃষ্টি এড়াইবে না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাঙালীসংস্কৃতি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—এই ক্ষেত্রে বাংলার সহিত অন্য কোনো প্রদেশের তুলনাই হয় না।

বাংলার লোকসংস্কৃতি ও উচ্চতর সংস্কৃতি

প্রত্যেক জাতির লোকসংস্কৃতি ও উচ্চতর সংস্কৃতি কতকগুলি বস্তু, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ও চিত্তভাবকে আশ্রয় করিয়াই বিশেষ রূপমূর্তি লাভ করে। বাঙালী-সংস্কৃতিও ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রথমেই ধরা যাক বাংলার বাস্তব সভ্যতা-মূলক সংস্কৃতির কথা—যেমন, পল্লীবাংলার খড়ের চালের কুটীর, বেত ও বাঁশের কাজ, নানাবিধ মৃৎশিল্প, বিচিত্র বস্ত্রশিল্প, নানারকমের ধাতব শিল্প, শাঁখের কাজ, হাতীর দাঁতের কাজ, বিচিত্র রকমের পট, দেয়ালে মৃৎপাত্রে ও চালচিত্র-অংকন, আলপনা, কাঁথাসেলাই, নৌশিল্প ইত্যাদি। তারপর আমরা দেশের অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করিতে পারি। যেমন, নানাবিধ ব্রত-পার্বণ ও উৎসব—পৌষপার্বণ, নবান্ন, অন্নপ্রাশন, ভাইফোঁটা, জামাইষষ্ঠী, বিবাহের স্ত্রীআচার, দুর্গাপূজা, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজা, দোল ও রাস-উৎসব ইত্যাদি ; ব্রতনৃত্য, আরতিনৃত্য প্রভৃতিকেও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

মানসিক, আধ্যাত্মিক ও কলাগত সংস্কৃতির পর্যায়ে পড়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগত অভিব্যক্তি—যেমন, বৈষ্ণব, শাক্ত, সহজিয়া ও বাউলের ধর্মীয় ভজন-পূজন-আরাধনা। নানা জাতের কাহিনী ও উপাখ্যান—ব্রতকথা, পুরাণবিষয়ক কথকতা, কালকেতু-ফুল্লরা, বেহুলা-লখীন্দর, রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কথা, ইত্যাদি; বিবিধ ধর্মকাব্য, ছড়া, বচন, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতির অনুবাদ, পূর্ববংগের পল্লীগীতিকা ; বিচিত্র রকমের আমোদপ্রমোদ—তর্জা-পাঁচালি-যাত্রা ইত্যাদি ; লোকসংগীতের মধ্যে কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, রামপ্রসাদী, জারি, সারি, ঝুমুর, টপ্পা, ঢপ্, খেমটা, খেউড়, হাফ্‌আখড়াই, ইত্যাদি।

বাংলার উচ্চতর সংস্কৃতির রূপ

উচ্চতর সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেশের বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠান, ধর্মনীতিক, সামাজিক ও রাজনীতিক আন্দোলন প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানসাধনা, গবেষণা ও আবিষ্কার, রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীতে বিশ্ববিদ্যার অনুশীলন বাঙালীর সংস্কৃতিচর্চাকে

বিশেষ গৌরবমর্যাদা দান করিয়াছে। মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্য হইতে আরম্ভ করিয়া উনিশ-বিশ শতকে শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত বহু মনীষীর অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার মূল্য অপরিসীম। ভারতবর্ষের রাজনীতিক চেতনার উদ্বোধনে বাঙালীর সাধনার দান অনেকখানি—সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, বিপিনচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি নেতার আবির্ভাবে ভারতের রাজনীতিক আন্দোলন লক্ষণীয় ব্যাপকতা ও গভীরতা লাভ করিয়াছে। বাঙালীসংস্কৃতির সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটিয়াছে বাংলার গৌরব-দীপ্ত সাহিত্যে। শ্রীচৈতন্যের ধর্মান্দোলন, মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-গিরিশচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-শরৎচন্দ্র-প্রমুখ সাহিত্যস্রষ্টার বাণীচর্যা বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। চিত্রাংকনশিল্পে বিস্ময়কর সৃজনীপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলাল-যামিনী রায় প্রভৃতি স্বনামধন্য বাঙালী শিল্পী। রবীন্দ্রনাথ আর উদয়শংকর সংগীত ও নৃত্যশিল্পের ক্ষেত্রে এক নূতন যুগের প্রবর্তন করিয়াছেন। অভিনয়পদ্ধতিতে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত।

উপসংহার

বাঙালীসংস্কৃতির এই যে পরিচয়, ইহা অতি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এই পরিচিতি হইতেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাঙালীর প্রতিভা ভারতীয় সভ্যতার ভাণ্ডারটিকে কম সমৃদ্ধ করে নাই। বাংলার উচ্চতর সংস্কৃতি পূর্ণাংগ রূপ লাভ করিয়াছে, এমন কথা অবশ্য আমরা বলিব না। বাঙালীর মধ্যে ভাবসাধনা, কর্মসাধনা ও জ্ঞানসাধনার ত্রুটি যদি দেখা না দেয় এবং বাঙালী জাতি যদি নিজের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির বলে বর্তমান সংকটমুহূর্ত উত্তীর্ণ হইতে পারে, তবে বাঙালীসংস্কৃতি অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই প্রবর্ধমান হইয়া উঠিবে। সাম্প্রতিক কালের এই সর্বনাশা বিপর্যয়ের দিনে আমরা যেন আত্মশক্তিতে বিশ্বাস না হারাই।

বাংলার সামাজিক উৎসব

[**রচনার সংকেতসূত্র :** বাঙালীর উৎসব কল্যাণশ্রীমণ্ডিত—বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব হইল শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা—দুর্গোৎসব ও বাঙালীর ভাবকল্পনা—শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা—শ্রীশ্রীকালীপূজা—শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা—ফাল্গুনের দোলউৎসব—আরও নানা উৎসব—বাঙালীর সামাজিক উৎসবের মর্মকথা।]

বাঙালীর সমাজজীবনে যে একদিন অফুরন্ত প্রাণধারা প্রবাহিত হইত, তাহার নির্ভুল প্রমাণ বাংলার উৎসবগুলি। ইহাদের মূলে রহিয়াছে সামাজিক

মানুষের গভীর একত্ববোধ ও পরস্পরের প্রতি নিবিড় আকর্ষণ। মানবতা, সহানুভূতি ও একপ্রাণতার স্নিগ্ধমধুর দীপ্তিতে এগুলি সমুজ্জ্বল। একদিন বাঙালীর বিত্ত ছিল, অর্থ ছিল, প্রাণশক্তি ছিল; সেই বিগত যুগের বাঙালী নিজের সম্পদপ্রাচুর্যকে শুধু আপন ভোগসুখ ও অহংসর্বস্বতার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। তাহারা সমাজের সর্বস্তরে অর্থ, বিত্ত ও প্রাণপ্রবাহকে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছে। বংশকৌলীন্য কিংবা জাতিকৌলীন্য হয়তো আমাদের সমাজে অতীতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু বিত্তকৌলীন্য পূর্বেকার দিনে কখনো বড় হইয়া উঠিতে পারে নাই। নানাবিধ সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়া, তথা অর্থ ও বিত্তের মধ্য দিয়া, বাঙালী তাহার অন্তরেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। উৎসবগুলির মধ্যেই বাঙালীর জাতীয় জীবনের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নানাভাবে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহারা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা দুঃখ, গ্লানি ও বেদনাকে মুছিয়া দিয়াছে—অন্তরে উদ্বোধিত করিয়াছে মংগলদীপ্ত সমাজ-চেতনা। এই উৎসবগুলিই বাঙালীকে চিত্তের সংকীর্ণতা ও মলিনতা হইতে মুক্তি দিয়াছে। আমাদের উৎসব শুভ, কল্যাণশ্রীমণ্ডিত।

বাঙালীর উৎসব কল্যাণশ্রীমণ্ডিত

বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব হইতেছে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা। প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে তাহেরপুরের হিন্দুরাজা কংসনারায়ণ এই বাংলাদেশে যে-মহাপূজার প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন তাহার প্রাণোন্মাদকারী আকর্ষণ আমাদের হৃদয় হইতে আজ পর্যন্ত এতটুকু মুছিয়া যায় নাই। জগৎমাতার এই পূজা হিন্দু-বাঙালী-সমাজের সকল স্তরের সকল মানুষের—ইহার ব্যাপকতা ও মর্মস্পর্শিতা সার্বজনীন। দুর্গাপূজার নামে বাঙালী আত্মহারা হইয়া উঠে, ইহা তাহার জীবনে আনে বিপুল প্রাণচাঞ্চল্য ও সজীবতার সাড়া—দেশের দিকে দিকে প্রবাহিত করিয়া দেয় নির্বাধ আনন্দস্রোত। এই মহাপূজার প্রাক্কালে শুধু বাঙালীর প্রাণ-জগতে নয়, প্রকৃতিজগতেও অমেয় আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যায়। শরতের সোনালি আকাশে, শিউলিঝরা আঙিনায়, শস্যশ্যামল মাঠে, জলে-স্থলে সর্বত্র প্রাণের প্রাচুর্য ও সম্পদের মহিমা হিল্লোলিত হইতে থাকে। প্রকৃতির নির্বাধ প্রসন্নতার পটভূমিকায় জগন্মাতার পূজা-আরাধনা কেমন যে প্রাণময় হইয়া ওঠে, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা অসম্ভব।

বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব :
১। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বাঙালীর আরাধ্যা দুর্গা হইলেন পুরাণের রক্তবীজবিনাশিনী মহামায়া—বিদ্যা, বিত্ত ও শক্তির মূর্ত প্রতীক। অন্যদিকে ইনি বাঙালীর মাতা, বাঙালীর

কন্যা। পুরাণকারের সমুচ্চ পরিকল্পনার সংগে বাঙালী মিশাইয়া দিয়াছে তাহার অপূর্ব ভাবকল্পনা। দুর্গা তাই হিমালয়ের কন্যা, শিবের গৃহিণী। বৎসরে মাত্র তিনটি দিনের জন্য তিনি পিতৃগৃহে আসেন, তাহার পর আবার চলিয়া যান স্বামীর আলয়ে। এক মূর্তিতে তিনি জগৎমাতা, মহাশক্তির আধার—আবার অন্য মূর্তিতে তিনি দেশমাতৃকা। আজ মন্দিরে মন্দিরে তাঁহারই প্রতিমা আমরা গড়িতেছি। অধ্যাত্মজীবন ও ভাবজীবনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে শ্রীশ্রীদুর্গার মূর্তিপরিকল্পনায়। দুর্গাপূজা বাঙালীর জাতীয় উৎসব।

দুর্গাপূজা ও বাঙালীর অপূর্ব ভাবকল্পনা

দুর্গাপূজা শেষ হইতে না হইতেই হিন্দুবাঙালী আবার মাতিয়া উঠে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজার আনন্দোৎসবে। মহালক্ষ্মী সম্পদবিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তাঁহার মূর্তিখানি ঘটে-পটে বাঙালী অংকিত করে। জ্যোৎস্না-স্নাত পূর্ণমাসী রাত্রিতে ধনীদরিদ্র সকলেই লক্ষ্মীদেবীকে তাহাদের আন্তরিক আহ্বান জানায়। লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা শুভ্র শুচিতার ভাব আছে—ইহার পূজারিণী হইতেছেন বাংলার পুরনারী। তাঁহাদের অন্তরতম কামনা আত্মীয়স্বজনের কল্যাণ, সমাজের সর্বাংগীণ মংগল ও স্বাচ্ছন্দ্য। বাংলার ঘরে ঘরে মহালক্ষ্মীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়—ইহাও সার্বজনীন।

২। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা

লক্ষ্মীপূজার পর আসে শ্রীশ্রীকালীপূজা—ইহা বাঙালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব, বিচিত্রসুন্দর ইহার অনুষ্ঠান। এই জড়বিশ্বের মর্মকেন্দ্রে যে-বিরাট শক্তি অদৃশ্য-ভাবে বিরাজমান, মহাকালী তাহারই আধ্যাত্মিক প্রতীক। মানুষের একদিকে জীবন, অন্যদিকে মৃত্যু—একদিকে সৃষ্টি, অন্যদিকে সংহারলীলা নিত্য প্রকটিত হইতেছে। সর্বভূতে যে-চেতনা শক্তিরূপে সংস্থিত, তাহার উপলব্ধির সাধনাই মহাকালীর পূজা। অমাবস্যার ঘনান্ধকার নিশীথিনীতে শক্তিস্বরূপিণী এই কালীমাতার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। নিসর্গলোকের গহন অন্ধকারকে আমরা অপসারিত করি সহস্র দীপাবলীর আলোকে। ঘরে ঘরে বালকবালিকার বাজিপোড়ানোর ধূম উৎসবটিকে সুন্দর করিয়া তোলে, দীপান্বিতার প্রোজ্জ্বল দীপ্তি অন্তরের সমস্ত কালিমা নিঃশেষে মুছিয়া দেয়। মহাকালীর পূজা কেবল যে মহানন্দের উৎস তাহা নয়, ইহা আমাদের অধ্যাত্মপিপাসাকেও নিবৃত্ত করে।

৩। শ্রীশ্রীকালীপূজা

বাঙালীর আর-একটি স্মরণীয় উৎসব শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা। সরস্বতী জ্ঞান-দায়িনী, বিদ্যার প্রতীক। মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে বাংলার বিদ্যার্থী তরুণ-তরুণী, বালকবালিকা মহাসমারোহে সরস্বতীকে বন্দনা করে। সকলের চিত্তে

জাগ্রৎ হইয়া উঠে একটা শুচিশুভ্র ভাব। যে-চৈতন্যময়ী শক্তিকে আমরা কালীর রূপমূর্তিতে আরাধনা করি, যে-অমূর্ত শক্তিকে আমরা মহালক্ষ্মীর প্রতিমার মধ্যে অনুভব করি, সেই আদ্যাশক্তিরই আর-একটি প্রকাশ দেখি বাগ্‌দেবীর অপূর্বসুন্দর বিগ্রহের মধ্যে। মাতৃপূজার মধ্যেই বাঙালীর ভাবজীবনের সকল বিশিষ্টতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

৪। শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা

ফাল্গুনের দোলযাত্রার উৎসবও কত সুন্দর, কত প্রাণোন্মাদকারী! এই দোললীলা বসন্তঋতুরই উৎসব। বসন্তের সমাগমে প্রকৃতির বুকে একটা নূতন প্রাণের সাড়া জাগে, তরুলতায়, পাতায়-পুষ্পে নব-জীবনের বিপুল বন্যা বহিয়া যায়। বিচিত্র রঙের খেলার মধ্য দিয়া মানুষ প্রকৃতিকে জানায় সাদর সম্ভাষণ—অন্তরের গভীরে উৎসারিত হয় আনন্দের নিঝ'র। এই ঋতু-উৎসবটির সংগে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে বৈষ্ণবের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বসন্ত-উৎসবের সহিত শ্রীকৃষ্ণলীলার যখন সংমিশ্রণ ঘটিল, তখন বসন্তলীলা দোললীলায় পরিণত হইল। দোল-উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য রঙের খেলা। রক্তিম আবিরে-কুম্‌কুমে মানুষের প্রাণসত্তাকে রঞ্জিত করিবার আনন্দই রহিয়াছে ইহার মূলে।

৫। দোল-উৎসব

বাঙালীর উৎসবের যেন অন্ত নাই। রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, নবান্ন-উৎসব আমাদের হৃদয়লোকে বিচিত্র অনুভূতি জাগাইয়া তোলে। শ্রাবণ মাসে পূর্ববংগের ঘরে ঘরে মনসাপূজার অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। পশ্চিমবংগে চৈত্র মাসের চড়কপূজা ও গাজন-উৎসব সকলেরই পরিচিত। মুসলমানসমাজে মহরম, ঈদ প্রভৃতি পর্বদিনে অভূত-পূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য জাগে। বৎসরের প্রায় প্রতিটি মাসেই বাংলাদেশে একটা-না-একটা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

৬। আরও নানা উৎসব

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালীর এই উৎসবগুলি বর্তমানে যেন স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। গোটা সমাজের আনন্দেই আমার আনন্দ, সমাজের কল্যাণেই আমার কল্যাণ—উৎসবগুলির অন্তর্নিহিত এই ভাবসত্যটি আজ আমরা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি। এইরূপ একটি অবস্থা আমাদের জাতীয় জীবনে শুচিশুভ্র মংগলাদর্শের অভাবই সূচিত করে। সমাজচেতনা বাঙালীর হৃদয় হইতে ধীরে ধীরে মুছিয়া যাইতেছে, সে যেন ক্রমেই স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়িতেছে। বাংলার উৎসবগুলি দেশবাসীকে শুধু আনন্দই দেয় না, ইহার মধ্যে

বাঙালীর উৎসবের মর্মকথা

লোকশিক্ষার আয়োজনও রহিয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, একলের উৎসবঅনুষ্ঠানে হৃদয়ের প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা বিত্ত ও সম্পদের গরিমা তথা মানুষের অহমিকাই যেন প্রবলরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। আমরা আজ সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চাহিতেছি, কিন্তু সমাজজীবনে যদি সকল মানুষের সমষ্টিগত কল্যাণ ও আনন্দের কথা বিস্মৃত হই, তবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিব কিরূপে? বাঙালীর উৎসবগুলির মধ্যেই রহিয়াছে সমাজতন্ত্রের বীজ, তাহাকে অংকুরিত করিয়া তোলাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

বাংলার লোকসাহিত্য

[**রচনার সংকেতসূত্র :** সূচনা—বাংলার লোকসাহিত্য বাঙালীর হৃদয়ভূমি হইতে উৎসারিত—শিক্ষা ও আনন্দদানের ক্ষেত্রে লোকসাহিত্য—বাংলার লোকসাহিত্যপ্রসংগে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—ছেলেভুলানো ছড়া—যাত্রা ও ব্রতকথা—আর এক জাতের ছড়া—কবিগান—পূর্ববংগগীতিকা, ময়মনসিংগীতিকা বা গাথাসাহিত্য—বাউলসংগীত—ডাক ও খনার বচন—উপসংহার।]

সূচনা

পল্লীবাংলার নিরক্ষর জনসাধারণের অনাড়ম্বর জীবনের আশাআকাংক্ষা, সুখদুঃখ, আনন্দবেদনা যে-সাহিত্যের মধ্যে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেই আমরা বলিয়া থাকি লোকসাহিত্য। প্রত্যেক জাতির সাহিত্যেই লোকসাহিত্য বা গ্রাম্যসাহিত্যের বিশেষ একটি স্থান আছে। অধুনা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসারের সংগে সংগে আমরা ভিন্নতর রুচির ও উচ্চস্তরের সার্বজনীন সাহিত্য রচনা করিতেছি সত্য, কিন্তু নিত্যকালের এই গ্রাম্যসাহিত্যকে আমরা কোনো মতেই অস্বীকার করিতে পারি না। আমাদের এই লোকসাহিত্যের মধ্যেই বাংলা জনপদের শত শত বৎসরের সুখদুঃখের রাগিণী নিঃশব্দ সুরে ধ্বনিত হইতেছে।

বাংলার লোকসাহিত্য বাঙালীর হৃদয়ভূমি হইতে উৎসারিত

প্রতীচীর শিক্ষাদীক্ষা ও একালের নাগরিক সভ্যতা বর্তমানে আমাদিগকে পল্লীজীবনের কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত করিয়া একটা কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে—গ্রামের সংগে আমাদের নাড়ীর যোগটি অধুনা ছিন্নপ্রায়। তাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বংগপল্লীর নিবিড় পরিচয়টি সর্বাংগীণ সমগ্রতায় তেমন আর রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে না। বাংলার লোক-

সাহিত্য কিন্তু একেবারে পল্লীর মৃত্তিকা হইতে উদ্ভূত—ইহার গায়ে এদেশের শ্যামল মাটির গন্ধটুকু ছড়ানো-জড়ানো রহিয়াছে। বাংলাপ্রকৃতির ফুল-ফল-লতা-পাতার মতোই আমাদের গ্রাম্যসাহিত্যও যেন একান্ত স্বাভাবিকভাবেই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতি আজও বাঁচিয়া আছে অজ্ঞ অশিক্ষিত জনপদবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে, তাহাদের ভাব ও ভাবনায়, কল্পনা ও চিন্তায়। পল্লীর নিরক্ষর মানুষের হৃদয়ভূমিতেই জন্মলাভ করিয়াছে অজস্র ছেলেভুলানো ছড়া, যাত্রা, পাঁচালী, ব্রতকথা, রূপকথা, গীতিকথা, কবিসংগীত, ভাটিয়ালী-জারি-মুর্শিদা ও বাউল গান, মাণিক পীরের গান, গোপীচন্দ্রের গান, ময়নামতীর গান, অপূর্বসুন্দর পল্লীগীতিকাগুলি এবং আরো কত কি। এই বিশাল সাহিত্য কে কখন রচনা করিয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস আমাদের জানা নাই। কিন্তু ইহা বাঙালীর অন্তর হইতে উৎসারিত হইয়া, পুরুষানুক্রমে বাঙালীর স্মৃতিপথ বাহিয়া, কাল হইতে কালান্তরে প্রসারিত হইয়াছে এবং বাঙালীর সার্বজনীন সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে।

লোকসাহিত্যের আছে দুইটি দিক—একটি আনন্দের, আর-একটি শিক্ষার। আনন্দের সংগে লোকশিক্ষার এমন অপূর্বসুন্দর সমন্বয় অন্যত্র দুর্লভ। অগণিত পল্লীবাসীর সুচিরকালের জীবনদর্শনের অভিজ্ঞতার প্রাচুর্যে, সুকোমল অনুভূতির প্রকাশে, সহজ উপলব্ধির বিচিত্রতায় আমাদের লোকসাহিত্য অতিশয় সমৃদ্ধ। তাই আনন্দবিতরণের সংগে সংগে এই সাহিত্য জনপদবাসীকে শিক্ষা ও জ্ঞানদানেও প্রভূত সহায়তা করিয়াছে। একদিন আমাদের লোকশিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম ছিল লোকসাহিত্য। সহজ ভাষায় রচিত বলিয়া জনচিত্তের উপর ইহার প্রভাব অসামান্য।

লোকশিক্ষা ও আনন্দদানের ক্ষেত্রে লোকসাহিত্য

অতীত দিনে দেশের জনসাধারণকে ব্যাপক আনন্দ দেওয়ার আয়োজন আমাদের সমাজ করিয়াছিল। যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা, কবিগান প্রভৃতির মধ্য দিয়া পল্লীর মানুষ শিক্ষা এবং আনন্দ উভয়ই লাভ করিত। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে লোকশিক্ষা ও জনগণের চিত্তবিনোদনের সকল সামগ্রী দেশ হইতে ধীরে ধীরে মুছিয়া যাইতেছে। লোকসাহিত্যের মাধ্যমে লোকশিক্ষার আলোচনা-প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি প্রবন্ধে লিখিতেছেন : এমনি কতকাল চলেছে দেশে, বরাবর রসের যোগে লোকে শুনেছে ধ্রুবপ্রহ্লাদের কথা, সীতার বনবাস, কর্ণের কবচদান, হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্বত্যাগ। দেশে তখন দুঃখ ছিল অনেক,

বাংলার লোকসাহিত্যপ্রসংগে রবীন্দ্রনাথের উক্তি

অবিচার ছিল, জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা ছিল পদে পদে। কিন্তু সেই সংগে এমন একটি শিক্ষার প্রবাহ ছিল, যাতে করে ভাগ্যের বিমুখতার মধ্যেও মানুষকে তার আন্তরিক সম্পদের অবারিত পথ দেখিয়েছে,—মানুষের যে-শ্রেষ্ঠতাকে অবস্থার হীনতা হেয় করতে পারে না, তার পরিচয়কে উজ্জ্বল করেছে। সেদিন দেশে এমন অনাদৃত অংশ ছিল না, যেখানে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-ধর্মব্যাখ্যা নানা প্রণালী বেয়ে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে না পড়ত। এমন কি, যে-সকল তত্ত্বজ্ঞান দর্শন-শাস্ত্রে কঠোর অধ্যবসায়ে আলোচিত, তারো সেচন চলেছিল সর্বক্ষণ এদেশের জনসাধারণের চিত্তভূমিতে।

লোকসাহিত্যের প্রকাশ বহুমুখী। যুগযুগান্তর ধরিয়া পল্লীবাসীর মনে এই সাহিত্যের গঠনকার্য চলিয়াছে। ইহাতে দূরপ্রসারী কবিকল্পনা নাই, বিচিত্র ছন্দের কারুকলা নাই। কিন্তু আছে প্রকাশভংগীর সরলতা, প্রাঞ্জলতা, আর পল্লীর মানুষের অনাবিল হৃদয়ানন্দের সুরঝংকার। 'গ্রামবাসীরা যে-জীবন প্রতিদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে, যে-কবি সেই জীবনকে ছন্দে-তালে বাজাইয়া তোলে, সে-কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে। পদ্মাচরের চক্রবাক-সংগীতের মতো তাহা নিখুঁত সুরতালের অপেক্ষা রাখে না।'

বাংলা লোকসাহিত্যের বাণীরূপ বিচিত্র। ছেলেভুলানো বিচিত্র ছড়াগুলি কোন্ সুদূর অতীতে কাহার দ্বারা রচিত হইয়াছে, তাহার কোনো স্থিরতা নাই।

ছেলেভুলানো ছড়া

যে-সকল কবি এইসব ছড়া গাঁথিয়াছেন, তাঁহারা কাব্যশাস্ত্রে ধরাবাঁধা পথে পদচারণা করেন নাই; কেবলমাত্র শিশুমনের নিরংকুশ কল্পনার আলোছায়ার খেলাকেই এই কবিদল গ্রাম্য ভাষায়, ভাঙাচোরা ছন্দে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এগুলিতে কোথাও রহিয়াছে ছবি, কোথাও বা কলভাষী সংগীত। শিশুদের মনে ভাবপারম্পর্যের ততটা প্রয়োজন নাই, যতটা প্রয়োজন আছে প্রত্যক্ষ চিত্রসম্পদ ও সংগীত-ঝংকারের। সেজন্য ছেলেভুলানো ছড়াগুলির মধ্যে 'অসংলগ্ন ছবি যেন পাখীর ঝাঁকের মতো উড়িয়া চলিয়াছে।' এই সমস্ত ছড়া শিশুদের জন্য যেন সরলপ্রাণ শিশুকবিরই সৃষ্টি।

রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-ভাগবতের বিচিত্র কাহিনী ছিল আমাদের প্রাচীন যাত্রাগুলির উপজীব্য। ইহাদের ভিতর দিয়া পল্লীর মানুষ অজস্র আনন্দলাভ করিত, চিরন্তন মানবধর্ম ও মানবসত্যের সহিত পরিচিত

যাত্রা ও ব্রতকথা

হইত। গ্রামের উন্মুক্ত প্রাংগণে ছোটবড়, ধনী-নির্ধন সকলেই একসংগে বসিয়া ভাববিহ্বল চিত্তে এই যাত্রাভিনয় দেখিত।

রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সতীশিরোমণি সীতার সতীধর্ম, হরিশ্চন্দ্রের সত্যধর্ম, কর্ণের বীরধর্ম, ধ্রুবপ্রহ্লাদের ভক্তিব্যাকুলতা, ভীষ্মদধীচির আত্মদান প্রভৃতি কাহিনী যখন অভিনীত হইত, তখন নিরক্ষর গ্রাম্যনরনারীর বিশ্বাসপ্রবণ হৃদয় অগাধ আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিত।

পল্লীগ্রামের অধিবাসীদের সরল জীবনযাত্রার ছবি আমরা দেখিতে পাই বিভিন্ন ব্রতকথার মধ্যে। ভাদুব্রত, মাঘমণ্ডল, তুষতুষলি, কুলকুলতী, থুয়া, লাউল, সেজুতি প্রভৃতি ব্রতগুলির ভিতর দিয়া বাংলার পুরনারীর মর্ত্যমমতার বিশ্বস্ত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্রতকথাগুলি মেয়েদের মধ্যেই প্রচলিত। মেয়েরা তাহাদের অনাগত জীবনের সুখদুঃখের ভারগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্রতগুলি পালন করে। তাহাদের বিচিত্র আশাআকাংক্ষা, ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের কর্মপন্থা প্রভৃতিই এই ব্রতগুলির প্রার্থনায় চমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। ব্রতকথা-জাতীয় কত বিচিত্রসুন্দর ছড়া বাংলা লোকসাহিত্যের অংগনে ঘাসের ফুলের মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

আর একজাতের ছড়া

আর-এক জাতের ছড়া আছে, উহাদের 'বিষয়কে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—হরগৌরী-বিষয়ক এবং কৃষ্ণরাধা-বিষয়ক। হরগৌরীবিষয়ে বাঙালীর ঘরের কথা এবং কৃষ্ণরাধাবিষয়ে বাঙালীর ভাবের কথা ব্যক্ত করিতেছে। একদিকে সামাজিক দাম্পত্যবন্ধন, আর-একদিকে সমাজবন্ধনের অতীত প্রেম।' হরগৌরীর একান্ত বাস্তব কাহিনীর পটভূমিকায় রচিত হইয়াছে আনন্দ ও কারুণ্যমধুর আগমনী গান ও বিজয়াসংগীত।

কবিওয়ালাদের গান

প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা কাব্যের সংযোগস্থলে দাঁড়াইয়া আছে কবিসংগীত। সখীসংবাদ, বিরহ, গোষ্ঠ, আগমনী প্রভৃতি নানা বিষয় লইয়া কবিওয়ালারা তাঁহাদের গান বাঁধিয়াছেন। ইঁহাদের আগমনী ও বিরহ-গানের তুলনা নাই। বাঙালীর অন্তরের বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত হইয়া এই গানগুলি অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে। বৎসরান্তে মাতা কন্যাকে দেখিতে চাহেন; তিনি স্বামীকে মিনতি করিয়া বলিতেছেন, কন্যাকে শ্বশুরালয় হইতে আনিতে—এই কথাই কত-না করুণতায় উক্ত গানগুলির মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে। 'উপস্থিত মতো সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার ভার লইয়া কবিদলের গান, ছন্দ এবং ভাষার বিশুদ্ধি ও নৈপুণ্য বিসর্জন দিয়া, কেবল সুলভ অনুপ্রাস ও ঝুটা অলংকার লইয়া, কাজ সারিয়া দিয়াছে—ভাবের কবিত্ব সম্বন্ধেও তাহার মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায় না। পূর্ববর্তী শাক্ত এবং বৈষ্ণবমহাজনদিগের ভাবগুলিকে অত্যন্ত তরল ও ফিকা করিয়া কবিগণ

শহরের শ্রোতাদিগকে সুলভ মূল্যে যোগাইয়াছেন। তাঁহাদের রচনায় যাহা সংযত ছিল, এখানে তাহা শিথিল এবং বিকীর্ণ; তাঁহাদের কুঞ্জবনে যাহা পুষ্প-আকারে প্রফুল্ল, এখানে তাহা বাসি ব্যঞ্জন আকারে সংমিশ্রিত।' কবিওয়ালাদের আগমনী ও বিজয়াসংগীতের পর সখীসংবাদের সূত্র অনুসরণ করিলে খেউড়, তর্জা, হাফআখড়াই প্রভৃতি গানের আবির্ভাব কিছুই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ববংগগীতিকাগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রত্যেকটি শাখা নানা লৌকিক ধর্ম ও উপধর্মের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। কিন্তু এই গীতিকাগুলি ধর্মের প্রভাব হইতে অনেকখানি মুক্ত। গীতিকাসাহিত্যকে আমরা নিঃসংশয়ে বাঙালীর ধর্ম-বন্ধনমুক্তি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার বাণীবিগ্রহ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। ইহার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই বাংলা দেশের নরনারীর বিচিত্র বাস্তব আলেখ্য—ইহাতে সমাজের মানুষের সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনা সহজ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। মানবীয় ভাবের আবেদন, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, নিপুণ শব্দযোজনা, অতি-সরল প্রকাশভংগী এবং সর্বোপরি স্বাভাবিকতার গুণে গীতিকাসাহিত্য বাঙালী পল্লীকবির অনবদ্য সৃষ্টি। সেকালের কাব্যরচনার সমস্ত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করিয়া গ্রাম্যকবিরা এই সাহিত্যের মধ্যে একটা নূতন কাব্যরীতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সে-যুগের সাহিত্যে জগৎ ও জীবনকে এমন সহজভাবে আর কোথাও স্বীকৃতি জানান হয় নাই।

পূর্ববংগগীতিকা

লোকসাহিত্যের অন্তর্গত বাউলসংগীতগুলি সহজ অনুভূতির সাবলীল প্রকাশে সত্যই সুন্দর। মধ্যযুগীয় মিষ্টিক সাধক এবং সুফীসম্প্রদায়ভুক্ত কবিদের রচনার সংগে ইহাদের তুলনা করা চলে। বাউল-সংগীত বাংলার হিন্দুমুসলমান সকল সম্প্রদায়েরই সাধারণ সম্পত্তি। বাউলসাধকদের উপাস্যের নাম সাঁই বা গুরু। ভাবের গূঢ়তা ও ব্যঞ্জনাশক্তিতে বাউল গান অতিশয় সমৃদ্ধ।

বাউলসংগীত

ভাটিয়ালী, মুর্শিদা, জারী প্রভৃতি গানও পল্লীবাংলার নিজস্ব সম্পদ। ইহাদের আশেপাশে জন্মলাভ করিয়াছে ডাক ও খনার বচন এবং প্রবাদ ও প্রবচনগুলি। সমাজজীবনের বিচিত্র অভিব্যক্তির সংগে ইহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা, মানবচরিত্রের বিচিত্রতা, ধর্মতত্ত্ব-কৃষিতত্ত্ব-খাদ্যতত্ত্ব প্রভৃতি নানান বিষয় ও ভাবের প্রাচুর্যহেতু এইগুলি আমাদের পরম আদরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।

ডাক ও খনার বচন

বাংলার লোকসাহিত্য বাঙালীর অন্তরতর প্রাণের সামগ্রী। খাঁটি বাংলার রূপ ও রস এই সাহিত্যের কথায়-সুরে-ছন্দে বাঁধা পড়িয়াছে। বাঙালীর ভাবানুভূতির সংগে ইহার সংযোগ অতিশয় নিবিড়। উচ্চস্তরের ভাবনা ও

উপসংহার

সমুন্নত কবিকল্পনা অবশ্য ইহার মধ্যে নাই। না থাকাতে একরকম ভালই হইয়াছে, যদি থাকিত তবে নিরক্ষর পল্লীর মানুষ ইহার রস-উপভোগ হইতে বঞ্চিত হইত। পল্লীকবি 'কল্পনার সংকীর্ণতা দ্বারা আপন প্রতিবেশীবর্গকে ঘনিষ্ঠ সূত্রে বাঁধিতে পারিয়াছে, এবং সেই কারণেই তাহার গানের মধ্যে কল্পনাপ্রিয় একক কবির নহে, পরন্তু সমস্ত জনপদের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।'

একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী ঃ নেতাজী সুভাষচন্দ্র

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** বাংলার বীরসন্তান সুভাষচন্দ্র—সুভাষের জন্মপরিচয় ও ছাত্র-জীবন—সিভিল সার্ভিসের মোহত্যাগ—প্রথম কারাবরণ—উপর্যুপরি কারাবরণ ও ইয়োরোপগমন—কংগ্রেসসভাপতি সুভাষচন্দ্র—সুভাষচন্দ্র ও ভারতীয় কংগ্রেস—গৃহ হইতে সুভাষের রহস্যময় অন্তর্ধান—আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র—সুভাষের প্রতিষ্ঠিত আজাদ-হিন্দ্-গভর্ণমেন্ট—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের প্রভাব—নেতাজীর মৃত্যু নাই।]

পরাধীন ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে বাংলার বিপ্লবী বীর সুভাষচন্দ্র পরম গৌরবমণ্ডিত এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিলেন। অগ্নি-অক্ষরে তিনি যে

বাংলার বীরসন্তান সুভাষচন্দ্র

আত্মজীবনকাহিনী রচনা করিয়া গিয়াছেন, শৌর্যে ও বীর্যের মহিমায় তাহা প্রদীপ্ত, আত্মত্যাগ ও কর্মসাধনার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল, অতুলনীয় দেশপ্রেমের গৌরবে মহীয়ান। স্বাধীনতাকামী বিক্ষুব্ধ ভারতের প্রাণসত্তা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মধ্যে যেন প্রমূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক শক্তির অজস্র মিথ্যা প্রচারণা তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও ভাস্বর প্রতিভাকে কলংকিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু দেশপ্রেমিক সুভাষ সে-প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার বীরত্বের খ্যাতি আজ ভারতের দিকে দিকে কীর্তিত হইতেছে—সেই খ্যাতি ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র এশিয়াখণ্ডে প্রসারিত হইয়াছে। শুধু তাহা নয়, নেতাজীর

অতুলনীয় কীর্তিকথা আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করিয়াছে। সেই কীর্তির উজ্জল গৌরবে আমরাও গৌরবান্বিত।

ইংরেজী ১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে উড়িষ্যার কটক জেলায় সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয়। চব্বিশপরগণার কোদালিয়া গ্রাম সুভাষচন্দ্রের পৈতৃক বাসভূমি। তাঁহার পিতার নাম জানকীনাথ বসু, মাতার নাম প্রভাবতী দেবী। কটকের র‍্যাভেন্শ কলেজিয়েট স্কুল হইতে তিনি ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং এই পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইহার পর সুভাষচন্দ্র কলিকাতায় চলিয়া আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইলেন। এইসময় তাঁহার অন্তরে সন্ন্যাসজীবনের আকাংক্ষা প্রবল হইয়া উঠে, এবং একদিন সকলের অগোচরে গৃহত্যাগ করিয়া তিনি ভারতের নানা তীর্থে উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে ফিরিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার বাসনা চরিতার্থ হইল না, তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালেই তাঁহার চিত্তে স্বাদেশিকতার অংকুরোদ্গম হয়। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইংরেজ অধ্যাপক ওটেন বাঙালী ছাত্রদের প্রতি অপমানজনক ব্যবহার করাতে সুভাষচন্দ্র সেই অপমানের প্রতিশোধগ্রহণমানসে ওটেনকে প্রহার করেন। ইহার ফলে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজ পরিত্যাগ করিতে হয়। ১৯১৭ সালে তিনি মহাপ্রাণ আশুতোষের সহায়তায় আবার স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হইলেন। ১৯১৯ সালে সুভাষচন্দ্র দর্শনশাস্ত্রে অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন।

সুভাষের জন্মপরিচয় ও ছাত্রজীবন

এম্. এ. অধ্যয়নকালেই ১৯১৯ সালে তিনি বিলাত যাত্রা করেন এবং ১৯২০ সালে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া আই-সি-এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্র কেম্ব্রিজ হইতে দর্শনে 'ট্রাইপস্' ডিগ্রী লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে যখন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, সে-সময় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দেশমাতৃকার বাণী সুভাষচন্দ্রের হৃদয়কে আলোড়িত করিল, তাঁহার অন্তরে স্বদেশপ্রেমের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এই দেশাত্মবোধের প্রেরণায় তিনি সিভিল সার্ভিসের মোহ পরিত্যাগ করিলেন—পরম ঘৃণাভরে আই-সি-এস্ পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। এ সময় হইতেই তাঁহার সংগ্রামবিক্ষুব্ধ রাজনীতিক জীবনের সূত্রপাত।

সিভিল সার্ভিসের মোহত্যাগ

১৯২১ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসে যোগদান

করিলেন। সমগ্র বাংলা দেশে তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রভাব বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার বীর্যদীপ্ত স্বাদেশিকতার নবীন প্রেরণা যুবচিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। সুভাষ দেশবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং চিত্তরঞ্জনের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কলেজে অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইলেন। ১৯২১ সালের শেষভাগে দেশবন্ধুর সংগে সুভাষ-চন্দ্র কারাবরণ করিতে বাধ্য হন। এইবার আরম্ভ হইল তাঁহার আপোষহীন স্বাধীনতাসংগ্রাম—আত্মত্যাগের দুর্গম পথে সুভাষচন্দ্রের যাত্রা সুরু হইল।

প্রথম কারাবরণ

১৯২৩ সালে সুভাষচন্দ্র বিখ্যাত 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯২৪ সালে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তার পদ লাভ করেন। সেই বৎসরই তাঁহাকে অন্তরীণ করা হইল। তিন বৎসরকাল কারাপ্রাচীরের অন্তরালে থাকার পর দেশবাসীর সুতীব্র আন্দোলনে সরকার তাঁহাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ১৯৩০ সালে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া যখন কারাবাস করিতেছিলেন, সেই সময়েই তিনি কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত হন। কিন্তু ইহার পর বৎসরই সুভাষ আবার কারারুদ্ধ হইলেন। উপর্যুপরি কারাবাসের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য বিশেষভাবে ভাঙিয়া পড়ে। ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য সরকার তাঁহাকে ইয়োরোপ যাইবার অনুমতি দিলে ১৯৩৩ সালে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটিল, ১৯৩৪ সালে তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর সুভাষ আবার ইয়োরোপ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় ১৯৩৬ সালে ভারতভূমিতে পদার্পণ করেন। পদার্পণের সংগে সংগেই কিন্তু তাঁহাকে অন্তরীণ করা হয়।

উপর্যুপরি কারাবরণ ও ইয়োরোপগমন

সুভাষচন্দ্রের জীবনকাহিনী অনবচ্ছিন্ন সংগ্রামেরই ইতিহাস—তাঁহার সমগ্র জীবন ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদীদের কূট চক্রান্তের বিরুদ্ধে আপোষহীন যুদ্ধের সুদীর্ঘ ইতিকথা। সেদিনের পরাধীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতাপূজারী সুভাষচন্দ্র ১৯৩৭ সালে মুক্তিলাভ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি হরিপুরা-কংগ্রেসের সভাপতির সম্মানিত পদ অলংকৃত করেন। ১৯৩৯ সালে সুভাষ ত্রিপুরী-কংগ্রেসের সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

কংগ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্র

নিজের স্বাধীন মতবাদের জন্য সুভাষ কংগ্রেসের যুক্তিহীন আনুগত্য স্বীকার করিলেন না। ইহার ফলে তিনি কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইলেন, এবং অল্পকালমধ্যেই 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করিলেন। কংগ্রেসের আপোষমূলক

মনোভাবকে বিদ্রোহী সুভাষ মানিয়া লইতে পারেন নাই। ১৯৪০ সালে রামগড়ে তিনি এক আপোষবিরোধী সম্মেলন আহ্বান করেন। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের বরাবরই একটা স্বকীয় স্বাধীন মতবাদ ছিল, এবং তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল বলিষ্ঠ—অনমনীয়।

সুভাষচন্দ্র ও ভারতীয় কংগ্রেস

১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে অকস্মাৎ সুভাষচন্দ্র তাঁহার কলিকাতার বাসভবন হইতে অন্তর্ধান করিলেন। বহুদিন দেশবাসী তাঁহার সম্পর্কে কিছু জানিতে পারিল না। পরে শোনা গেল, ছদ্মবেশে তিনি জাপানে গিয়া পৌছিয়াছেন এবং সেখান হইতে সিঙাপুর গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া মুক্তিসংগ্রামের সেনাদল গঠন করিতে। সুভাষের জীবনে ১৯৪১ সালের পরবর্তী ঘটনাবলী যেমন বিস্ময়কর, তেমনি রোমাঞ্চকর। কী ভাবে তিনি ভারত ত্যাগ করিয়া কাবুলে পৌছিলেন, কী ভাবে সেখান হইতে চক্রশক্তির দেশে পদার্পণ করিলেন, সেইসব কাহিনী গভীর রহস্যে আচ্ছন্ন ও পরম আশ্চর্যজনক। বিদেশে অবস্থান করিয়া ভারতের স্বাধীনতাযুদ্ধের যে-গৌরবমণ্ডিত ইতিহাস তিনি রচনা করিলেন, তাহা প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে দেশপ্রীতির জলন্ত অক্ষরে চিরকাল মুদ্রিত থাকিবে।

গৃহ হইতে সুভাষের রহস্যময় অন্তর্ধান

মালয়ে, ব্রহ্মদেশে, সিঙাপুরে ইংরেজ-রাজত্বের উচ্ছেদ ঘটিয়াছে, এইসব দেশ তখন জাপানের করতলগত। সুভাষ বুঝিলেন, ব্রিটিশ-রাজশক্তির নাগপাশ হইতে ভারতকে মুক্ত করিবার সুবর্ণসুযোগ আসিয়াছে। তখন এই বিপ্লবী বীর 'আজাদ-হিন্দ্-ফৌজ' গঠনে মাতিয়া উঠিলেন। সহস্র সহস্র ভারতীয় সেনা এই বাহিনীতে স্বেচ্ছায় যোগদান করিল—সুভাষচন্দ্র হইলেন সেই সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। দেশের অগণিত মুক্তিযোদ্ধা তাঁহাকে 'নেতাজী'-রূপে বরণ করিয়া লইল। ইহার পর সুরু হইল ভারতের মুক্তিসংগ্রামের দুঃসাহসিক অভিযান। ভারত-ব্রহ্ম-সীমান্তে, আরাকানে, টিড্ডিমে, কোহিমায়, ইম্ফলে আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের বীরপদধ্বনি মন্দ্রিত হইল, দুর্গম অরণ্যপ্রান্তর শতসহস্র বীর-সন্তানের বক্ষশোণিতে আর্দ্র হইয়া উঠিল। মণিপুরে আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের সেনাদল ভারতের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করিল।

আজাদ-হিন্দ্-ফৌজের সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র

ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করিবার সে কী এক অপূর্ব উন্মাদনা! সেই ধ্বংসযজ্ঞের ঋত্বিক ছিলেন এই বাংলাভূমিরই বীরসন্তান নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

সুভাষের কার্যকলাপকে মসীলিপ্ত করিতে ব্রিটিশশক্তি যথাসাধ্য চেষ্টা করিল—সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁহাকে অভিহিত করিতে চাহিল স্বদেশদ্রোহী 'কুইস্‌লিং' নামে। কিন্তু তাহাদের সমস্ত অপপ্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল, সমগ্র ভারত সুভাষচন্দ্রকে তাহার শ্রেষ্ঠ সন্তান বলিয়া অভিনন্দন জানাইল। তাঁহার প্রচারিত 'জয় হিন্দ্‌'-ধ্বনি ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতার বুকে জাগাইয়া তুলিল স্বাধীনতার দুর্বার স্পৃহা। সুভাষচন্দ্র 'আজাদ-হিন্দ্‌-গভর্ণমেণ্ট' প্রতিষ্ঠিত করিলেন—নয়টি স্বাধীন রাষ্ট্র উহাকে বিনাদ্বিধায় স্বীকৃতি জানাইল। বাংলার সন্তান স্বতন্ত্র গভর্ণমেণ্টের ভিত্তি রচনা করিয়া বাঙালীর সংগ্রামবিমুখতার অপবাদ ও গ্লানি চিরতরে মুছিয়া দিল।

সুভাষের প্রতিষ্ঠিত আজাদ-হিন্দ্‌-গভর্ণমেণ্ট

নেতাজীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মুহূর্তেই হিন্দুমুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট মনোভাব বিদূরিত হইল, তিনি বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের নবজন্ম দান করিলেন। আজাদ-হিন্দ্‌-ফৌজে এতটুকু সাম্প্রদায়িকতা ছিল না—হিন্দু ও মুসলমান তাহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছে। সুভাষের সংগঠনশক্তি ও ব্যক্তিত্ব চিরকালের জন্য প্রমাণিত করিল, শুধু হিন্দুরাই যে লাঞ্ছিত ভারতের স্বাধীনতা কামনা করিতেছে তাহা নয়, ভারতের মুস্লিম সন্তানও মুক্তির জন্য আত্মদান করিতে দ্বিধাবোধ করে না। সুভাষের নেতৃত্বেই ভারতের হিন্দুমুসলমান-সেনাদল দিল্লীর লালকেল্লায় বিজয়নিশান উড়াইতে, জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে সেদিন যেন উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের প্রভাব

সুমহান ঐক্যপ্রতিষ্ঠার অভূতপূর্ব সাফল্য, অতুলনীয় দেশপ্রেম, মহিমময় ত্যাগের আদর্শ, অসামান্য আত্মশক্তি ও দুর্জয় সাহস নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনকে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। 'স্বাধীন ভারত ঘোষণা, ভারতের বাহিরে স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠা এবং ভারতীয় জাতীয় বাহিনী সংগঠন জগতের ইতিহাসে কয়েকটি বিশেষ অধ্যায়। এই অধ্যায় যিনি রচনা করিয়াছেন, সেই নেতাজীর আসামান্য চিন্তাশীলতা ছিল, দূরদৃষ্টি এবং সাহস ছিল।' উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশ সালে জাপানী সংবাদে প্রচারিত হয়, বিমানদুর্ঘটনায় আহত হইয়া নেতাজী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই সংবাদ কিন্তু অনেকে বিশ্বাস করে না—আমাদের প্রাণের সুভাষচন্দ্র, আজাদ-হিন্দ্‌-ফৌজের 'নেতাজী' সুভাষচন্দ্র কখনো মরিতে পারেন না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষ মৃত্যুঞ্জয়তা অর্জন করিলেন।

নেতাজীর মৃত্যু নাই

ঋতুচক্র ও বাংলার পল্লীপ্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য

[**রচনার সংকেতসূত্র** ঃ প্রারম্ভিক ভূমিকা—ঋতুচক্রের আবর্তন ও পল্লীপ্রকৃতির বৈচিত্র্য—ছয়টি ঋতুর চক্রগতিতে আসাযাওয়া—গ্রীষ্মের দৃশ্যমূর্তি ঃ পল্লীপ্রকৃতির রূপ—গ্রীষ্মের ভাবমূর্তি—বর্ষাঋতুতে পল্লীপ্রকৃতির রূপ—কবি-ভাবুকের চিত্তে বর্ষার প্রভাব—বর্ষাঋতু ও বাঙালীর ব্যবহারিক জীবন—শরৎ-প্রকৃতির বহিরঙ্গ রূপ—শরতের আনন্দময় মূর্তি—অবকাশের ঋতু শরৎ—হেমন্তের দিনে বাংলার রূপশ্রী—হেমন্তের পরিণতি শীতে—মায়াবী বসন্ত—বসন্তের দ্বৈত প্রকাশ—উপসংহার।]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

প্রকৃতি যে কী আশ্চর্য সুন্দরী, কী মনোমদ ও নয়নাভিরাম তার রূপশোভা, কী অফুরন্ত তার লীলাবৈচিত্র্য—বাংলার পল্লীগ্রামের দিকে না তাকালে বোধ করি তা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করা যাবে না। বিভিন্ন ঋতুতে এদেশের পল্লীপ্রকৃতি বিভিন্ন রূপমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, অনুপম সৌন্দর্য আর অমেয় সম্পদের পসারা সকলের সম্মুখে উন্মোচিত করে ধরে। প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য-বিলসিত বাংলাভূমির এই যে রাজশ্রীমহিমা, এর তুলনা হয় না। ঋতুচক্রের সুচিহ্নিত আবর্তন, প্রকৃতির অকৃপণ আশীর্বাদ বাংলাকে অশেষ শোভার নিকেতন করে তুলেছে, বিচিত্র ফুল ও ফলের দেশে পরিণত করেছে। বাঙালীর মানসপ্রকৃতিতে, বাঙালীর অধ্যাত্মজীবনে, বাঙালীর সৌন্দর্যসাধনায়, তার কাব্যে-সাহিত্যে, তার উৎসবে পার্বণে চতুষ্পার্শ্বের এই নিসর্গপ্রকৃতির প্রভাব সামান্য নয়।

ঋতুচক্রের আবর্তন ও পল্লীপ্রকৃতির বৈচিত্র্য

বাংলার পল্লীপ্রকৃতিকে কবির ভাষায় ঋতুরঙ্গশালা বলা যেতে পারে। এখানে প্রতিনিয়ত চলেছে বিশ্বসৃষ্টির অধিদেবতা নটরাজের ছন্দোময় নৃত্যলীলা। পর্যায়ক্রমে ঋতুচক্রের আবর্তন বুঝি এই নৃত্যচ্ছন্দের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সূর্যকে কেন্দ্র করে একটা নির্দিষ্ট পথে পৃথিবীর যে অবিশ্রান্ত চলার গতি, তারই ফলে ঘটে ঋতুর প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ; আর, কবিদৃষ্টিসম্পন্ন কল্পনাপ্রবণ ভাবুকের দৃষ্টিতে এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে বিশ্বদেবতা নটরাজের পদক্ষেপের ছন্দ। তাই তো প্রকৃতিলোকে একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়, কোনোক্রমেই কদাপি পর্যায়ভঙ্গ হয় না—গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ, শরতের পর হেমন্ত, হেমন্তের পর শীত, শীতের পর বসন্ত—এর ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। লীলাময়ী প্রকৃতির আশীর্বাদপুষ্ট আমরা—বাঙালীরা—বিজ্ঞানবুদ্ধি আর ভাবুক কবির কল্পনাদৃষ্টিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছি, বৃত্তপথে পৃথিবীর চলার

ছন্দের সঙ্গে বিশ্বসৃষ্টির অধিদেবতার ছন্দিত পদচারণাকে যুক্ত করে দিয়ে ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির অশেষ বৈচিত্র্যকে নিবিড় উপভোগের সামগ্রী করে তুলেছি। বাংলার প্রকৃতিলোকের উদার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ছয়ঋতু ফিরে ফিরে এসে নৃত্য করে, নতুন নতুন পাত্র ভরে দিকে দিকে ঢেলে দেয় বর্ণময় সৌন্দর্যের ধারা। তাতে দুচোখ জুড়িয়ে যায়, সকল অন্তর তৃপ্তিতে পূর্ণ হয়, সমগ্র প্রাণসত্তা আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। ঋতুচক্রের আবর্তনকে প্রকৃতির বিচিত্র রূপপ্রকাশের এতখানি বৃহৎ পটভূমিকায় অন্য কোনো দেশের মানুষ দেখেছে কিনা, আমাদের জানা নেই।

বছরের বারোটি মাসকে ছয়টি ঋতুতে আমরা ভাগ করে নিয়েছি। এদের প্রত্যেকের আয়ুষ্কাল মোটামুটি দু-মাস। এরা পূর্ণতা আর রিক্ততার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছে। তাই দেখি প্রকৃতিসুন্দরীর ভাণ্ডার কখনো শূন্য ; কখনো ফুলে-ফলে, বর্ণে-গন্ধে, রূপে-রসে হাতের ডালা তার পূর্ণ। এই উভয়কে মিলিয়ে দেখাই ঋতুচক্রকে যথার্থভাবে দেখা, উভয়ের মিলনেই তার সম্পূর্ণ রূপ। বাংলার ষড়ঋতু পরস্পর গায়ে-গায়ে লাগা ; আস্তে আস্তে—অনেকটা লোকচক্ষুর অগোচরে—একের আবির্ভাব ও অপসরণ ; আবার, তেমনি অলক্ষ্যে পরবর্তী ঋতুর আগমন। যে যায়, অপরকে নিঃশব্দে ডাক দিয়েই সে বিদায় নেয়। এমনি করেই গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্তের চক্রগতিতে আসাযাওয়া—এদের একের চলার ছন্দ অন্যের চলার ছন্দের সঙ্গে চিরকালের জন্য বাঁধা।

ছয়টি ঋতুর চক্রগতিতে আসা-যাওয়া

প্রকৃতির রঙ্গশালায় প্রথম আবির্ভাব ঋতুপুরুষ গ্রীষ্মের। গ্রীষ্মঋতুর প্রতিনিধি বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ। দুইটি মূর্তিতে গ্রীষ্ম আমাদের কাছে প্রকাশিত—একটি তার বহিরঙ্গ দৃশ্যমূর্তি, অপরটি অন্তরঙ্গ ভাবমূর্তি। গ্রীষ্মের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান রূপটি রুক্ষ কঠোর বিশুষ্ক প্রচণ্ড। ঝাঁঝালো রৌদ্রের খরতাপে, প্রতপ্ত সূর্যের বহ্নিজ্বালায় সমস্ত পৃথিবী যেন পুড়ে যায়, চতুর্দিকে বিরাজ করতে থাকে একটা বিবর্ণ শুষ্কতা—পাণ্ডুরতা। নদী-খাল-বিল-জলাশয়গুলি চোখঝলসানো রোদে শুকিয়ে যায়, মাঠ-বাট-প্রান্তর তৃষাদীর্ণ হয়ে ওঠে, উত্তপ্ত বাতাস অগ্নিঢালা মরুভূমির ভীষণতার সংকেত বহন করে আনে, সমগ্র প্রাণীলোকের অস্তিত্ব মুমূর্ষু হয়ে পড়ে, যতদূর দৃষ্টি চলে সবকিছু নিদাঘের রুদ্রদহনে খাঁ-খাঁ করতে থাকে। এ সময়ে কেবল শহরগুলির নয়, পল্লীর অবস্থাও অসহনীয়। মধ্যাহ্নে পথচারীরা গাছের তলায় ছায়া খুঁজে বেড়ায়, পাখীর দল পাতার আড়ালে নীড়ে আশ্রয় লয়, গরু-মহিষগুলো পুকুর আর বিলের অবসিতপ্রায় জলে গা ডুবিয়ে থাকে, কীটপতঙ্গের

গ্রীষ্মের দৃশ্যমূর্তি : পল্লীপ্রকৃতির রূপ

দল ঝোপে-ঝাড়ে আত্মগোপন করে। বৃষ্টিহারা বৈশাখের দিনে জ্বালাময় দুপুরকে বিরাট একটি অগ্নিকুণ্ড বলে মনে হয়।

গ্রীষ্মের ভাবমূর্তি

এ যেন প্রকৃতিলোকে এক ভয়াল তাপসের রুদ্র-আবির্ভাব। প্রখর রৌদ্র বুঝি তার তপোবহ্নি, চোখে তার ভীষণ দীপ্তি, পিঙ্গল তার জটাজাল। বৎসরের পুরাতন আবর্জনাকে সে বুঝি কিছুতেই সইবে না, চতুষ্পার্শ্বের নিষ্প্রাণ অস্তিত্বের শেষ চিহ্নটুকুও রাখবে না; উষ্ণ নিশ্বাসে আর বহ্নিমান ছটায় পৃথিবীর সঞ্চিত ক্লেদগ্লানিকে মহাশূন্যতার দেশে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, পুড়িয়ে ছাই করে দেবে যা-কিছু জীর্ণ পুরাতনকে। এই রুদ্রসন্ন্যাসীর বাণী ত্যাগের বাণী, সে মানুষকে আহ্বান করে অন্তর্লোকের ধ্যাননির্জনতায়। এহেন ভয়াল তাপসের আহ্বানসংগীতে এদেশের শ্রেষ্ঠ কবি বলেছেন:

'এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপস নিশ্বাস বায়ে
মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক্।…
মুছে যাক্ সব গ্লানি, ঘুচে যাক্ জরা,
অগ্নিস্নানে দেহে প্রাণে শুচি হোক্ ধরা॥'

উপরের অনুচ্ছেদটিতে কবির চোখে গ্রীষ্মের ভাবমূর্তির একটুখানি আভাস দেওয়া গেল। আবার গ্রীষ্মকালীন বাস্তবের মধ্যে ফিরে আসা যাক্। বলেছি, গ্রীষ্মের দুপুর দুঃসহ। দ্বিপ্রহর গড়িয়ে যায়, ধীরে ধীরে বেলা পড়ে আসে। পড়ন্ত বেলায় মৃদু বাতাস বইতে থাকে। জীবলোক মুক্তি ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। উদার আকাশের নীচে খোলা মাঠে উন্মুক্ত বাতাসে ক্ষণকাল বেড়ালে শ্রান্তিক্লান্তি আর থাকে না, একটা সুখস্পর্শ অনুভূত হয়। গ্রীষ্মসন্ধ্যা সত্যই স্নিগ্ধতায় শান্তিময়ী। গ্রীষ্মঋতু ফুলের কাল নয়, ফুল ফোটাবার দায়িত্ব তার নয়—ফলের ডালা সাজাতেই তার আনন্দ। এ সময়টিতে আম-জাম-কাঁঠাল-আনারস-লিচু ইত্যাদি কত সুস্বাদু ও রসাল ফল বাঙালীর রসনা পরিতৃপ্ত করে।

বর্ষাঋতুতে পল্লীপ্রকৃতির রূপ

ধীরে ধীরে গ্রীষ্ম অপসৃত হয়, প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে পটপরিবর্তন ঘটে, সহসা শ্যামলী বর্ষার আবির্ভাব সকলকে চমকিত করে। 'শ্যাম গম্ভীর সরসা' বর্ষার আগমনে নিদাঘতপ্ত পল্লীর মূর্তিখানি মুহূর্তে এক অপূর্ব রমণীয়তায় ভরে উঠে। জলভরা পুঞ্জপুঞ্জ কালোমেঘে আকাশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঢেকে যায়,

মহাশূন্যের কোন্ গুহা হতে বাঁধনছেঁড়া বায়ু দুরন্ত বেগে ছুটে আসে, প্রবল ধারায় বর্ষণ শুরু হয়, শুষ্ক বিশীর্ণ মাঠপ্রান্তর, জলাশয়, নদীনালা উচ্ছ্বসিত প্লাবনে থর্থর্ করে কাঁপতে থাকে—মুছে যায় ধূলিপাণ্ডুর ধরণীর রুক্ষতা। মৃতপ্রায় পৃথিবীর বুকে অকস্মাৎ প্রাণচাঞ্চল্যের সাড়া জাগে। মাটির তলদেশ হতে তৃণাঙ্কুর মাথা তোলে, তরুলতায় পাতায়-পাতায় সবুজের ঢেউ খেলে যায়, বিচিত্র ফুলের বিকাশে —কদম-কেয়া-কামিনী-জুঁইয়ের আত্মপ্রকাশে—দিগ্‌দেশ আমোদিত হয়। নয়ন-বিমোহন সজল বর্ষার এই রূপশ্রী।

বর্ষাঋতুতে পল্লীবাংলার মূর্তিখানি প্রেক্ষণীয়। দিগন্তহারা জলছলছল মাঠে কচি ধানের গাছগুলি হাওয়ায় দুলছে, পাটের চাড়া জলের উপরে মাথা তুলে রয়েছে, খালে-নালায় কল্‌কল্ শব্দে স্রোত বয়ে যাচ্ছে, নদীতে পালতোলা নৌকা দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে, গাছে গাছে শ্যামলিমার সমারোহ, মেঘমেদুর আকাশে স্নিগ্ধ কান্তি, পুকুরপারে কদম-কেয়ার চিত্তহরা সুরভির অজস্রতা, সন্ধ্যার অন্ধকারে বাঁশবন আর আমবাগানের ধারে ডোবার মধ্য থেকে অবিশ্রান্ত ব্যাঙের ডাক, সবকিছু মিলে এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করে যাতে মানুষের অন্তর সাড়া না দিয়ে পারে না। বাঙালীচিত্তে এহেন বর্ষার প্রভাব অসামান্য, তার স্বাক্ষর চিহ্নিত হয়ে আছে বাংলা কাব্যে। বর্ষারাণীর কোমল রূপ দেখে তার আহ্বানে মুখর হয়ে বাঙালী কবি বলেছেন ঃ

কবি-ভাবুকের চিত্তে বর্ষার প্রভাব

'এসো শ্যামল সুন্দর,
আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা।'—

নিসর্গসংসারে বর্ষাকে দেখে কবিহৃদয়ের কেন এতখানি আনন্দ-উচ্ছলতা ? তার কারণ হল ঃ

'ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল-বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে।
উৎসবসভামাঝে শ্রাবণের বীণা বাজে
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে॥'

বর্ষার রূপ কিন্তু শুধু কোমলমধুর নয়, তার মধ্যে কঠোরতাও আছে, তার একটি রৌদ্রীমূর্তিও রয়েছে ঃ

'বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ়, তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতেরি জ্বালা॥'

*   *

'এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে।
সেই আগুনের কালো রূপ যে আমার চোখের পরে নাচে॥
ও তার শিখার জটা ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে ওই দিগন্তরে,
তার কালো আভার কাঁপন দেখ তালবনের ওই গাছে গাছে॥'

বিক্ষুব্ধ বর্ষার ভীষণ সৌন্দর্য দেখতেও এদেশের প্রকৃতিপ্রেমিক কবির কত-না আনন্দ :

'মন মোর হংসবলাকার পাখায় যায় উড়ে
ক্বচিত ক্বচিত চকিত তড়িত-আলোকে।
ঝঞ্জন মঞ্জীর বাজায় ঝঞ্ঝা রুদ্র-আনন্দে।
কল কল কল মন্দ্রে নির্ঝরিণী
ডাক দেয় প্রলয় আহ্বানে
বায়ু বহে পূর্ব সমুদ্র হতে
উচ্ছল ছলছল তটিনী তরঙ্গে
মন মোর ধায় তারি মত্ত প্রবাহে
তাল-তমাল-অরণ্যে—
ক্ষুব্ধ শাখার আন্দোলনে॥'

কোমলে-কঠোরে, ভৈরবে-মধুরে মিশ্রিত বর্ষার যে রূপ, তার সঙ্গে অপর কোনো ঋতুর তুলনা হয় না। এ হিসাবে বর্ষাঋতু অসাধারণ।

যেমন আমাদের ভাবজীবন, তেমনি ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গেও বর্ষার যোগ অতিশয় নিবিড়। এ সময়ে ধান রোপণ করা হয় বলে পরিমিত বর্ষণ অপেক্ষিত। বৃষ্টি না হলে চাষের কাজ চলে না। চাষ না হলে ধানের গুরুতর ক্ষতি হয়, সমগ্র দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়ে, তখন জনসাধারণের দুঃখকষ্টের সীমা থাকে না। কৃষিপ্রধান বাংলা বর্ষার প্রসন্নতা ও দাক্ষিণ্যের মুখাপেক্ষী। অনাবৃষ্টি যেমন পল্লীবাসীর নানা দুর্গতির কারণ, তেমনি অতিবৃষ্টি। অতিবর্ষণে প্লাবন ঘটায়। ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে, ধনপ্রাণ নষ্ট হয়— নদীমাতৃক দেশে প্রকৃতির এহেন বিরূপতা সত্যই ভয়ংকর। বর্ষাকালীন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাঝে মাঝে শহরের মানুষগুলিকেও অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। বর্ষাঋতু যেমন প্রাণদ, নয়নবিমোহন, আবার তেমনি মহা-অনর্থপাতের হেতু। রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, ঝুলন প্রভৃতি হিন্দুর কতকগুলি পার্বণ-উৎসব এই ঋতুতে অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ষাঋতু ও বাঙালীর ব্যবহারিক জীবন

বর্ষাসুন্দরী যখন যাই যাই করে, তখন বিশ্বপ্রকৃতির নাটমঞ্চের নেপথ্যে

শরৎলক্ষ্মীর আবির্ভাবের অদৃশ্য আয়োজন চলতে থাকে। নিঃশব্দ চরণে সে যে কখন এসে পড়ে, অনেক সময় তা উপলব্ধিই করা যায় না। শরৎ বর্ষারই সহজ স্বাভাবিক পরিণতি। শরতের বিশিষ্ট রূপশ্রী কারো দৃষ্টি এড়াবার নয়। শ্রাবণ শেষ হয়ে গেল, বর্ষণ ক্ষান্ত হল। আকাশের আঙিনায় জলভারনত কালো মেঘগুলিকে এখন আর দেখা যাবে না। এবার নীলাম্বরে জলহারা লঘুভার শুভ্র মেঘদলের স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণের শুরু, চারিদিকে মিষ্টি কাঁচা রোদের মধুময় স্পর্শ, মাঠে-মাঠে আলোছায়ার লুকোচুরি-খেলা, উঠানের ধারে নতুনফোটা শিউলি ফুলের উদাস গন্ধ, নদীতীরের কাশবনে গুচ্ছ-গুচ্ছ কাশফুলের আনন্দচঞ্চল দোলা, প্রভাতে শ্যামল তৃণে-পল্লবে শিশিরের আলিম্পন, তার উপর সোনালী রোদ্দুরের ঝিলিক, রাতের বেলা ধব্‌ধবে সাদা জ্যোৎস্নার স্বপ্নভরা স্নিগ্ধ কান্তি—কী অপূর্ব, কী মনোরম এই দৃশ্য!

শরৎপ্রকৃতির বহিরঙ্গ রূপ

শরৎকালকে দেখলে মনে হয়, সে যেন উদার অবকাশের ঋতু, প্রাণের তারে ছুটির রাগিণী বাজিয়ে তোলাই বুঝি তার প্রধান কাজ। বাংলার শরৎ-প্রকৃতি হাসিতে-খুশিতে নিরন্তর উচ্ছল। যেন তার কোনো বন্ধন নেই, কাজের তাড়া নেই, সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি থেকে বুঝি সে সম্পূর্ণ মুক্ত—নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে ঢেলে দেওয়াতেই বুঝি একমাত্র আনন্দ তার। শরৎ অনিরুদ্ধ প্রসন্নতার ঋতু। এতখানি প্রশান্ত সৌন্দর্য প্রকৃতিলোকে অন্য কোনো সময়ে দেখতে পাওয়া যায় না। এই আনন্দময় মূর্তি, শরৎলক্ষ্মীর এই অনুপম রূপশ্রী মনকে একেবারে উদাস করে দেয়, চিত্তকে সাংসারিক লাভক্ষতির হিসাবের উর্ধ্বে তুলে ধরে, পরিণাম-সম্পর্কে বিস্মৃতি জাগায়, সকল বিষয়বুদ্ধিকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যায়—অনন্ত অবকাশের রাজ্যে। শরতের অন্তর্লোকে এই যে অনাসক্তির সুরটি অহর্নিশ বেজে চলেছে, আমাদের কবি-রবীন্দ্র তাকে আশ্চর্যসুন্দর বাণীরূপ দান করেছেন। তাঁর 'শারদোৎসব' নাটকে সংসারবুদ্ধিতে পাকা লক্ষেশ্বরের মতো একজন মানুষও বলছেন: 'আশ্বিনের এ রোদ্দুর দেখলে আমার সুদ্ধ মাথা খারাপ করে দেয়, কিছুতে কাজে মন দিতে পারিনে।' ওই নাটকের মন্ত্রীর একটি উক্তির মধ্য দিয়ে শরৎপ্রকৃতির অন্তরতর স্বরূপটি চমৎকার ফুটে উঠেছে: 'হেমন্তের পাকা ধানেরই মূল্য আছে, ভাদ্রের কাঁচা ক্ষেতের আবার মূল্য কি?—একটুখানি হাসি, একটুখানি খুশি এই হলেই দেনাপাওনা চুকে যাবে।' কিন্তু মনে রাখতে হবে, শরতের এই হাসি-খুশিকে আপাতদৃষ্টিতে লঘু মনে হলেও, বস্তুত সে লঘু নয়—সবারই অলক্ষ্যে, অবকাশের ফাঁকে ফাঁকে শরৎলক্ষ্মী নিজের কর্তব্য করে যাচ্ছে, নিভৃত সাধনায়

শরতের আনন্দময় মূর্তি

পৃথিবীকে সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে তুলছে, গোপনে গোপনে ফল ফলাবার আয়োজনেই সে রত—শরতের ইঙ্গিত হেমন্তের সোনার ধানের সঞ্চয়ের দিকে। এ সত্যটি যে বুঝলে না, শরৎপ্রকৃতির স্বরূপটিকেও সে চিনলে না।

অবকাশের ঋতু শরৎ

একটু আগে বলা হয়েছে, শরৎকাল আনন্দময় অবকাশের ঋতু। তাই বুঝি এই ঋতুটিতেই বাঙালী তার শ্রেষ্ঠ পূজার—দুর্গাপূজার—অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে। একদিকে নিসর্গসংসারে সৌন্দর্য-আনন্দের নির্বাধ উৎসার, অন্যদিকে মানব-সংসারে আনন্দময়ী জগজ্জননীর পূজা-উৎসব, প্রাণ-চেতনার অভূতপূর্ব সাড়া। আকাশে-বাতাসে অফুরন্ত খুশির ঢেউ খেলে যায়, মন প্রজাপতির মতো কেবল চারদিকে উড়ে বেড়াতে চায়—হৃদয়ানন্দের আবেগে নিজেকে নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়ে নিঃসম্বল হয়ে ওঠার সুখও কি কম! শরৎকে নিঃসন্দেহে উৎসবের ঋতু বলা যেতে পারে। দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপূজা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া সবকিছুই শরতের দিনে অনুষ্ঠিত হয়। এই ঋতুটি অন্তর্হিত হলেও দীর্ঘকাল তার স্মৃতি আমরা ভুলতে পারি না, মনের কোণে তার উদাস রাগিণীর রেশটুকু থেকে যায়। ঋতুরাজ বসন্তও যেন শরতের কাছে হার মানে।

হেমন্তের দিনে বাংলার রূপশ্রী

শরতের পরিণতি হেমন্তে। হেমন্তের বহিরঙ্গ রূপটি প্রশান্ত পূর্ণতার, অন্তরঙ্গ ভাবমূর্তিটি বিষণ্ণ বৈরাগ্যের। মানবজীবনের প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে প্রকৃতি-জগতের হেমন্তঋতুর সাদৃশ্য রয়েছে। রূপসজ্জার দিকে হেমন্তলক্ষ্মীর কোনো দৃষ্টি নেই, নিরাভরণ সে। যে পূর্ণ, আপনাকে রিক্ত করে দিতে এতটুকু তার ভয় নেই। সে ফল চায় না—ফলাতে চায়, ফলতে চায়। পৃথিবীকে হেমন্তের শ্রেষ্ঠ দান সোনার ধান্য। এই ভূষণবিরল হেমন্তের দিকে তাকালে মনে হয়, আপনাকে ব্যক্ত করার কোনো প্রয়াস তার নেই, একটা পাতলা কুয়াশার আবরণ টেনে দিয়ে সে যেন নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতেই চায়। হেমন্তপ্রকৃতির এই বিশেষ রূপটি রবীন্দ্রনাথের হাতে চমৎকার ফুটেছে :

'হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা,
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা।
ধরার আঁচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে,
দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে।
আপন দানের আড়ালেতে রইলে কেন আসন পেতে,
আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন করে রাখা।'

ফুলের বাহার নেই, সৌন্দর্যের উচ্ছলতা নেই, অঙ্গসজ্জার প্রাচুর্য নেই, তথাপি হেমন্তের মহিমা অনস্বীকার্য। সে-মহিমা তার নিঃস্ব-করা দানে, আন্তর ঐশ্বর্যে। মমতাময়ী কল্যাণী নারীর সঙ্গেই হেমন্ত তুলনীয়।

হেমন্তের পর শীতের আগমন—শীত হেমন্তঋতুরই পরিণত রূপ। মানুষের বার্ধক্যের যেমন একটা লক্ষণীয় শ্রী রয়েছে, প্রকৃতিলোকে তেমনি শীতেরও। শীতের দিনে নিসর্গপ্রকৃতির মুখে দেখা যায় একটা শুষ্ক কাঠিন্যের ভাব। যেন সে রিক্ততার প্রতিচ্ছবি। তার তপস্বিনী-মূর্তিটিতে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও বৈরাগ্যের অঙ্গীকার সুচিহ্নিত। বৈশাখে প্রকৃতির ঋতুরঙ্গশালায় আমরা দেখি তাপস নটরাজের ভয়াল রুদ্ররূপ, শীতঋতুতে দেখি তার তপস্যানিরত প্রশান্ত মূর্তি—কোথাও চাঞ্চল্য নেই, বিক্ষোভ নেই, প্রগল্‌ভতা নেই। শীতকালীন প্রাকৃতিক দৃশ্যে এমন একটা পরিপূর্ণতার বিরলবর্ণ সুষমা চোখে পড়ে যে, দেখে মনে হয়, প্রকৃতির রহস্যময় গোপন অন্তঃপুরে কিসের একটা প্রস্তুতি চলছে, এবং এই প্রস্তুতি এক মহতী সিদ্ধির সূচক।

হেমন্তের পরিণতি শীতে

শীতপ্রকৃতি আপনার চতুর্দিকে একটা বৈরাগ্যধূসর পরিবেশ রচনা করে। তার দিকে তাকাও, দেখতে পাবে—ধীরে ধীরে গাছের পাতাগুলি বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, উত্তরে-হাওয়া ওই শুক্‌নো পাতাগুলিকে ঝরিয়ে দিচ্ছে, ডালপালা ক্রমেই রিক্ত হয়ে উঠছে; ধানকাটা মাঠে মাঠে কী প্রকাণ্ড শূন্যতা, চতুষ্পার্শ্বে বিপুল জড়তা। ঐশ্বর্যময়ী সুন্দরী প্রকৃতি কতখানি নিরাভরণা, কতখানি কৃপণা হয়ে উঠতে পারে, শীতঋতুর দিকে না তাকালে তা বুঝতে পারা যায় না। বুঝি এও নটরাজের রহস্যাচ্ছন্ন লীলার বিশেষ একটি প্রকাশ। নিসর্গের নাটমঞ্চে নটরাজ আপনার সাজ-খসাবার যে-লীলায় মেতে ওঠেন, তা দেখে 'চঞ্চলের লীলাসহচর' রবি-কবি ওই নটের গুরুকে লক্ষ্য করে বলছেন :

'এ কী মায়া, লুকাও কায়া জীর্ণ শীতের সাজে,
আমার সয় না প্রাণে কিছুতে সয় না যে॥
কৃপণ হয়ে হে মহারাজ, রইবে কি আজ
আপন ভুবনমাঝে॥'

কিন্তু শীতঋতুর এই নির্মম কৃপণতা, ভিন্ন ভাষায় শীতপ্রকৃতির তপস্যার এই প্রস্তুতি, নিরর্থক নয়। সে যে তাপের শুষ্ক আসন পাতল, উত্তরে-হাওয়ায় ভর করে চারদিকে শাসন জানাল, পাতার রঙ্‌ ঘুচাল, তরুলতাকে রিক্তপত্র করে তুলল, পৃথিবীর জীর্ণতাকে সরিয়ে দিল—এ-সমস্ত-কিছুই নতুন অতিথি নববসন্তের আগমনের পথটিকে পরিষ্কার বা সুগম করে তুলবার জন্যে। শীত ধরণীর নব-

যৌবনের দূত। সে বসন্তের আবির্ভাবের বার্তা বহন করে আনে, তার তপশ্চর্যার ফলসিদ্ধির মধ্যেই নিহিত রয়েছে বসন্তঋতুর জন্মের সকল সম্ভাবনা। মৃত্যুস্নানে শুচি হয়ে, বসন্তকে জন্ম দিয়ে শীতের অপসরণ।

মায়াবী বসন্ত

শীত যায়—বসন্ত এসে তার স্থান পূর্ণ করে। বসন্তের আগমনে সমগ্র প্রকৃতিলোকে সহসা এক অত্যাশ্চর্য রূপান্তর সাধিত হয়। বসন্ত এক ঐন্দ্রজালিক শক্তির অধিকারী, দক্ষিণা-বাতাস তার সহচর। ওই দখিন-হাওয়ার যাদুময় স্পর্শে নির্জীব পৃথিবী নতুন প্রাণচেতনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে, রিক্ত ডালপালায় কচি কিশলয়ের সমারোহ জাগে, কান পাতলে বাতাসে-ভেসে-আসা শ্রুতিবিনোদন মর্মরধ্বনি শোনা যায়, বৃক্ষান্তরাল থেকে অবিরল কুহুতান চিত্ত ব্যাকুল করে তোলে, চতুর্দিকে শুরু হয় উদ্দাম ক্ষ্যাপামির পালা। বসন্ত বিচিত্রসুন্দর ফুলের ঋতু। অশোক-পলাশ-শিমূল-দাড়িম্বের বনে যেন রক্তপ্রদীপ জ্বলতে থাকে, মাধবিকা দূরদূরান্তরে সুরভি ছড়ায়, ফাল্গুনের পুষ্পিত প্রলাপে অন্তর্দেশ প্রগল্‌ভ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—ঘুমভাঙা প্রকৃতি সকলকে ডাকে তার প্রাঙ্গণে—রূপসুন্দরের মহোৎসবে যোগ দিতে। নবীনতায়, প্রাণের উচ্ছলতায়, সৌন্দর্যের প্রাচুর্যে, সৃষ্টির অজস্র সম্ভাবনায় বসন্ত অতুলনীয়। সে মায়াবী, অপরূপ তার যাদু, নতুনের বাসন্তিক ছোঁয়ায় একমুহূর্তে শূন্যকে সে পূর্ণ করে দেয়—মাধুরীর বন্যায় যুগপৎ অন্তর্লোক আর বহির্লোককে পরিপ্লাবিত করে। একালে বসন্তোৎসব—দোলযাত্রা বা হোলী-খেলা—অর্থহীন নয়।

বসন্তের দ্বৈত প্রকাশ

একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে, বসন্তের দ্বৈতপ্রকাশ। নবফাল্গুনে প্রথমবসন্ত ও চৈত্রাবসানে শেষবসন্তের রূপ এক নয়। প্রথমবসন্ত অবন্ধন উদ্দাম, ফুলফোটাবার ক্ষ্যাপামি যেন তাকে পেয়ে বসে; উড়িয়ে দেবার, ছড়িয়ে দেবার মত্ততায় পরিণামের কথা একবারও সে ভাবে না। এহেন বে-হিসাবি বসন্ত চৈত্রশেষে নিজের উদ্দামতাকে যেন নিয়ন্ত্রিত করে, প্রৌঢ় পরিণতির শাসনকে স্বীকৃতি জানায়। প্রৌঢ়ত্বের সীমান্তবর্তী এই বসন্তকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

'প্রখর তাপে জরজর ফল ফলাবার শাসন ধরো,
হেলাফেলার পালা তোমার এই হোক ভঙ্গ।'

ফুল ফোটানোই বসন্তের একমাত্র কাজ নয়, ফুলকে ফলে পরিণতি দান করাতেই তার চরম সার্থকতা শেষবসন্ত অনেকটা নিরাসক্ত—এখন ফুলের বর্ণবিলাস নয়, ফলের আনন্দকেই সে পথের সঞ্চয় করে নিতে চায়। কবির

ভাষায়, চৈত্রান্তের বসন্ত 'ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে।' এই দুইটি রূপ মিলিয়েই বসন্তের সম্পূর্ণতা।

ঋতুচক্রের শেষ ঋতু বসন্ত। প্রকৃতিলোকে নবজীবনের মন্ত্রোচ্চারণ করে, ধরিত্রীর জড়ত্বের বন্ধন ঘুচিয়ে, সে চলে যায়। তার বিদায়কাল আসন্ন হয়ে উঠতেই বিশ্বপ্রকৃতির রঙ্গশালার নেপথ্যে গ্রীষ্মের আবির্ভাবের প্রস্তুতি চলতে থাকে। রৌদ্রের ক্রমবর্ধমান উত্তাপ ওই প্রস্তুতির প্রতি নিশ্চিত ইঙ্গিত।

বাংলা দেশে ষড়ঋতুর লীলাবৈচিত্র্য এত সুস্পষ্ট যে তা সকলেরই চোখে পড়ে। প্রকৃতি-উপভোগের সুযোগ আমাদের মতো অপর কারো রয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই বিচিত্ররূপা প্রকৃতির সংসর্গ থেকে আমরা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছি, যান্ত্রিক সভ্যতা আর শহুরে জীবন আমাদের উপর দুষ্টপ্রভাব বিস্তার করে চলেছে। একদিন আমাদের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কটি ছিল ভাইবোনের মতো, উভয়ে পরস্পরের কত নিকট-সান্নিধ্যে ছিলাম! সেই সংস্পর্শের গভীরতা আজ নেই। প্রকৃতিকে এখন আমরা দূর থেকে দেখি, তার বিষয়ে কদাচিৎ কৌতূহলী হয়ে উঠি, হয়তো ক্ষণকালের জন্য তার আতিথ্য গ্রহণ করি। কিন্তু প্রকৃতির অন্তঃপুরে প্রবেশ করবার চাবিকাঠি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তাই আমাদের জীবনটাও দিন দিন যান্ত্রিক হয়ে উঠছে, কৃত্রিমতায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে—শান্তি সৌন্দর্য ও অনাবিল আনন্দের নিকেতন হতে আজ আমরা একরূপ নির্বাসিত। এরূপ একটি অবস্থা কিন্তু দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। মানসিক অশান্তি-অস্থৈর্য-বিক্ষোভের হাত থেকে পরিত্রাণলাভ যদি আমাদের সত্যই কাম্য হয়, তাহলে পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে পুনর্বার সহজ যোগসূত্র রচনা করতে হবে, নাগরিক জীবনের মোহ কাটাতে হবে, জীবনকে জটিলতামুক্ত করতে হবে। শান্তিময়ী প্রকৃতিকে উপেক্ষা করলে সে-ও প্রতিশোধ নেবে—অভিশপ্ত নাগরিক সভ্যতা জাতীয় জীবনে বিষময় দুষ্টক্ষতের সৃষ্টি করবে, সকলকে ঠেলে দেবে শোচনীয় অপমৃত্যুর মুখে।

উপসংহার

বাংলার কুটীরশিল্প

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** বাংলার কুটীরশিল্পগুলি এক সময় বিস্ময়কর উন্নতিলাভ করিয়াছিল—বর্তমানে আমাদের কুটীরশিল্প লোপ পাইতে বসিয়াছে—কুটীরশিল্পের পুনরুদ্ধার ও উন্নতিবিধান একান্ত প্রয়োজন—যন্ত্রশিল্পের পাশে কুটীরশিল্পের স্থান করিয়া দিতে হইবে—উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে কুটীরশিল্পের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী—কুটীরশিল্পের উন্নতির প্রতিবন্ধকগুলি প্রথমে দূর করিতে হইবে—কুটীরশিল্পের উদ্ধারসাধন খুব দুরূহ নয়—কুটীরশিল্প বেকার মানুষের জীবিকা অর্জনের ও কৃষকগণের সহকারী আয়ের একটি বড় উপায়—উপসংহার।]

বাংলার কুটীরশিল্প একসময় বিস্ময়কর উন্নতিলাভ করিয়াছিল

বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের দেশ পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মতো ততখানি সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই। কিন্তু বাংলা তথা ভারতের কুটীরশিল্প একদিন সমগ্র জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। অর্ধশতাব্দী পূর্বেও আমদের গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ছিল অপূর্ব সামঞ্জস্য ও সহযোগিতা। বাংলার চাষী উৎপাদন করিত খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল, আর বিভিন্ন শ্রেণীর কারুশিল্পীরা তৈয়ার করিত বিচিত্র রকমের শিল্পপণ্য। তখন একের চাহিদা অপরে পূরণ করিত। সেদিন আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য আমাদিগকে বাহিরের দিকে উন্মুখ হইয়া তাকাইয়া থাকিতে হয় নাই। তখন পল্লীর স্বয়ংসম্পূর্ণতা, পল্লীবাসীর আত্মনির্ভরশীলতা ও জনগণের মধ্যে সহযোগিতা-মূলক শ্রমবিভাগ জনসাধারণের সকল অভাব পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সেদিন পল্লীর অর্থসমতা অক্ষুণ্ণ ছিল বলিয়া বাঙালীর আর্থিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতার ক্ষেত্রে কোনো অভাব দেখা যায় নাই। তন্তুবায়, সূত্রধর, কর্মকার, চর্মকার, শাঁখারী, কাঁসারী প্রভৃতি শ্রমশিল্পীরা প্রত্যেকেই জন্মগত ব্যবসায়কার্যে লিপ্ত থাকিত, এবং বহুকালের অভ্যাসের ফলে আপন আপন শিল্পকর্মে তাহারা আশ্চর্য নৈপুণ্য অর্জন করিত।

বর্তমানে আমাদের কুটীরশিল্প লোপ পাইতে বসিয়াছে

কিন্তু বাংলা ও ভারতের কুটীরশিল্পের সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলি অতীতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমাদের কুটীরশিল্প আজ মৃতপ্রায়। এগুলির বিলুপ্তির পিছনে বহুবিধ কারণ রহিয়াছে। আঠারো শতক হইতে পশ্চিমে শিল্পবিপ্লবের শুরু—উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এদেশে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিদেশ হইতে শিল্পজাত পণ্যের অবাধ আমদানী, ভারতে যন্ত্রদানবের আবির্ভাব এদেশের কুটীরশিল্পগুলিকে মারাত্মকভাবে আঘাত করে। বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে দেশীয় শিল্পগুলি প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিল না, পল্লীর শিল্পীরা

নিরুপায় হইয়া তাহাদের জন্মগত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল—তাহাদের জীবিকা অর্জনের পথ ধীরে ধীরে রুদ্ধ হইয়া আসিল। অভাবের তাড়নায় ক্রমশ তাহারা শহরে ভিড় জমাইতে লাগিল—গ্রামের অর্থসমতা নষ্ট হইয়া গেল। জনগণ পল্লীর কেন্দ্রচ্যুত হওয়ায় প্রকট হইয়া উঠিল অভাব, দারিদ্র্য আর বেকার-সমস্যা। তাঁতি, জোলা, ছুতোর, কুমোর, শাঁখারী, কাঁসারী ধ্বংসের মুখে আগাইয়া চলিল—বাংলার কুটীরশিল্প মরিতে বসিল।

কুটীরশিল্পের পুনরুদ্ধার ও উন্নতিবিধান একান্ত প্রয়োজন

এতদিন পর্যন্ত কুটীরশিল্পগুলির পুনরুদ্ধার ও উন্নতিবিধানের কোনরূপ উত্তম উদ্যোগ আমাদের মধ্যে দেখা যায় নাই। ব্যবসায়-বাণিজ্যের অভাবে, শিল্পের অভাবে বাঙালীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দেশীয় শিল্পগুলির উদ্ধারসাধনের ব্যগ্রতা আমাদের নাই বলিলেও চলে। একদিন বাংলার কৃষি জনসাধারণের অন্নসমস্যা মিটাইতে পারিত। কিন্তু দেশের শিল্পগুলি লোপ পাওয়াতে এবং লোকসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির জন্য জমির উপর বর্তমানে অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে। তাই কৃষি এখন আমাদের জীবিকাসমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছে না। বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের পাশে কুটীরশিল্পেরও যে স্থান হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত আধুনিক জাপান-জার্মানী প্রভৃতি দেশের ক্ষুদ্রাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি। বিগত যুদ্ধের সময় এদেশের কুটীরশিল্পগুলি আপন অস্তিত্বের সার্থকতা বিশেষভাবে প্রমাণিত করিয়াছে। যান্ত্রিক উৎপাদন যুদ্ধের সকল চাহিদা পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। অন্যদিকে যানবাহনের অভাবে আমদানি-রপ্তানির স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হইলে স্থানীয় কুটীরশিল্পজাত পণ্যই দেশবাসীর চাহিদা কথঞ্চিৎ পূরণ করিয়াছে।

যন্ত্রশিল্পের পাশে কুটীরশিল্পের স্থান করিয়া দিতে হইবে

দেশের আর্থিক অভাব ঘুচাইতে হইলে আমাদিগকে কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কুটীরশিল্পের উদ্ধার ও উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। কৃষি ও শিল্পের যদি উন্নতিসাধন করা যায়, তাহা হইলে পল্লীপ্রাণ বাংলার বুকে আবার জীবনের স্পন্দন দেখা দিবে, জাতির মুমূর্ষু অবস্থা কাটিয়া যাইবে। সর্বজনপরিচিত 'গ্রামে ফিরিয়া যাও' আন্দোলনকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে মৃত-প্রায় কুটীরশিল্পগুলির প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে কলকারখানাকে আমরা অস্বীকার করিতে পারিব না কিছুতেই। জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইলে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের সাহায্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে। কিন্তু শুধুমাত্র কলকারখানার সৃষ্টি, যান্ত্রিক উৎপাদন দেশের নিদারুণ বেকারসমস্যার

সমাধান করিতে পারিবে না। বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান শহরের মধ্যবিত্তসম্প্রদায়ের কিছুটা অভাব ঘুচাইতে পারিবে বটে, কিন্তু বৃহত্তর দরিদ্র জনসাধারণের জীবিকা অর্জনের পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিবার সামর্থ্য ইহাদের নাই। কেন-না, যন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শ্রমের প্রয়োজন কমিয়া আসে, ফলে শ্রমিকদল বৃত্তিহীন হইয়া পড়িতে বাধ্য। যান্ত্রিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমেরিকার স্থান জগতে অদ্বিতীয়, কিন্তু সেখানেও লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বেকার অবস্থায় রহিয়াছে। ভারতবর্ষে বিগত কয়েক বৎসরে যন্ত্রশিল্পের কিছুটা উন্নতি হইয়াছে, অথচ সেই অনুপাতে শ্রমিক কর্মে নিযুক্ত হয় নাই। উপরন্তু বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে বৃহৎশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটীরশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যা অপেক্ষা কম। সুতরাং ক্ষুদ্রাকার শিল্প এবং কুটীরশিল্পকে যদি উন্নত করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে আর্থিক দুর্দশার হাত হইতে আমরা কিছুটা মুক্তি পাইব।

উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে কুটীরশিল্পের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী

বাংলার অনেকগুলি কুটীরশিল্প বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে হস্তচালিত তাঁতশিল্প, রেশমী বস্ত্রশিল্প, হস্তনির্মিত কাগজশিল্প, ধাতুশিল্প, মৃৎশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, শাঁখাশিল্প, বোতাম ও চিরুণীশিল্প, ছুরি-কাঁচি-তালাচাবি ইত্যাদি শিল্প কোনোরকমে তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আছে। পুরাতন শিল্পগুলির উন্নতিবিধান এবং নূতন কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগসুবিধা যথেষ্ট পরিমাণে এখনও বিদ্যমান। সুতা, কাপড় ও চামড়া, ধাতু, কাষ্ঠ, কাগজ, মাটি, কাচ প্রভৃতি বিবিধ সামগ্রীর পণ্য অতি সহজেই উৎপাদন করা যায়। উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে এদেশে যে বিচিত্র রকমের শিল্পপণ্য তৈরী হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীনিকেতন ও খাদিপ্রতিষ্ঠান।

কুটীরশিল্পের উন্নতির প্রতিবন্ধকগুলি প্রথমে দূর করিতে হইবে

কুটীরশিল্পের উজ্জীবন ও উন্নয়নসাধন করিতে হইলে প্রথমে এ পথের বাধাগুলিকে অপসারিত করা প্রয়োজন। এ সব প্রতিবন্ধকের জন্যই আমাদের দেশীয় শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। অবিশ্বাস্য রকমের দুঃখদারিদ্র্যের মধ্য দিয়া বাংলার কুটীরশিল্পীরা দিন অতিপাত করে। আর্থিক অসচ্ছলতা ও উপযুক্ত শিক্ষার অভাব তাহাদের সকল উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। কুটীরশিল্প ক্ষুদ্রায়তন, ইহার জন্য অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয় না। স্বগৃহে অবস্থান করিয়াই শিল্পীরা বহুবিধ পণ্য সহজে প্রস্তুত করিতে পারে। কিন্তু সামান্য পুঁজি সংগ্রহের সামর্থ্যও তাহাদের নাই। সেজন্য ইহাদিগকে সর্বদাই

মহাজন ও ধূর্ত মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর শরণাপন্ন হইতে হয়। ইহার ফলে তাহাদের দারিদ্র্য বাড়িয়াই চলে। এইসব লোভী মানুষের অর্থসাহায্য ও দাদন ভিন্ন তাহারা কাঁচামাল সংগ্রহ করিতে পারে না—উৎপাদিত জিনিসগুলি ন্যায্য মূল্যে বাজারে বিক্রয় করিতে পারে না। মহাজন ও মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর চক্রান্তে পড়িয়া শিল্পীরা তাহাদের প্রাপ্য লভ্যাংশ হইতে সতত বঞ্চিত হইতেছে। শিল্পদ্রব্য-বিষয়ে ক্রেতার রুচির নিত্যপরিবর্তন ঘটিতেছে, কিন্তু কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে গবেষণা ও উপযুক্ত শিক্ষার অভাবহেতু গ্রাম্যশিল্পীরা শিক্ষিত ও আধুনিক রুচিসম্পন্ন মানুষের চাহিদা মিটাইতে সমর্থ হইতেছে না। এসব কারণে কুটীরশিল্পের প্রসার বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে।

কুটীরশিল্পের উদ্ধারসাধন খুব দুরূহ কাজ নয়

অথচ এই বাধাগুলি দুর্লঙ্ঘ্য নয়। শ্রমিকের অভাব এদেশে নাই, এক্ষেত্রে অধিক মূলধনেরও প্রয়োজন নাই। অভাব শুধু সংগঠনশক্তির, ব্যবসায়িক বুদ্ধির, আত্মপ্রত্যয়ের—সর্বোপরি অর্থসাহায্যের। সরকার যদি কুটীরশিল্পগুলির উজ্জীবনের প্রতি মনোযোগী হন এবং জনসাধারণ যদি এ বিষয়ে উৎসাহী ও উদ্যমশীল হয়, তবে অল্পকালের মধ্যেই বাংলার লুপ্ত কুটীরশিল্পের উদ্ধারসাধন সম্ভব হইয়া উঠিবে। সমবায়-সমিতি, কুটীরশিল্পব্যাঙ্ক, কুটীরশিল্পবোর্ড ইত্যাদি সংগতিসম্পন্ন ও সক্রিয় হইলে দেশীয় শিল্পগুলি অবশ্যই উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। এক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা ও অকুণ্ঠ আর্থিক সাহায্য একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কুটীরশিল্প বেকার মানুষের জীবিকা অর্জনের ও কৃষকগণের সহকারী আয়ের একটি বড় উপায়

আমাদের দেশে যন্ত্রশিল্পের যতই উন্নতি বা প্রসার হোক না কেন—যেমন বর্তমানে তেমনি ভবিষ্যতেও, কৃষিই দেশবাসীর জীবিকা উপার্জনের প্রধান সহায়রূপে বিদ্যমান থাকিবে। কিন্তু এদেশের কৃষক সমস্ত বছর ধরিয়া কৃষিকর্মে ব্যাপৃত থাকে না। যে-সময়টি অবসরের মধ্যে অতিবাহিত করে, সেই অবসরসময়ে তাহারা যদি কুটীরশিল্পে আত্মনিয়োগ করে, তবে তাহাদের একটি সহকারী আয়ের নূতন পথ খুলিয়া যায়। ইহার ফলে তাহাদের দারিদ্র্যও অনেকটা ঘুচিবে। বৈচিত্র্যাভিলাষী ও রুচিবোধসম্পন্ন মানুষের মধ্যে কুটীরশিল্পজাত সামগ্রীর চাহিদা সর্বদাই বিদ্যমান। কলকারখানায় অধিক পরিমাণে জিনিস উৎপাদিত হয় সত্য, কিন্তু তাহার মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব রহিয়াছে। যন্ত্রনির্মিত দ্রব্য মানুষের রুচি ও সৌন্দর্যপিপাসা সকল সময় মিটাইতে সমর্থ নয়।

শিল্প, কৃষি এবং ব্যবসায়বাণিজ্যই জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিবার প্রধান উপায়। সুতরাং শিল্পের ক্ষেত্রে কুটীরশিল্পের স্থান কিছুতেই উপেক্ষণীয় নয়। দেশে এখন বেকারসমস্যা উগ্ররূপে দেখা দিয়াছে। মধ্যবিত্তসম্প্রদায়, কৃষক ও কর্মচ্যুত শ্রমিককে আর্থিক দুর্গতির হাত হইতে শুধু বৃহৎ যন্ত্রশিল্পস্থাপনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে চলিবে না। পূর্বে আমরা দেখাইয়াছি, যন্ত্রশিল্প অধিক সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান করিতে পারে না—যন্ত্রশিল্পের অত্যধিক প্রসারে বেকারসমস্যা প্রবল হইয়া দেখা দেয়। যন্ত্রশিল্পস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কুটীরশিল্পগুলিতে উন্নত করিয়া তুলিবার সময় আসিয়াছে। এগুলির সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা হইলে আমাদের জাতীয় জীবনে অর্থসমতা ফিরিয়া আসিবে, আমাদের দারিদ্র্য ও অন্নবস্ত্রসমস্যার অন্তত কিছুটা সমাধান হইবে। যান্ত্রিক সভ্যতা ও নাগরিক জীবনের মোহ আমাদের দুঃখকষ্ট বহুল পরিমাণে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। এইবার বাঙালীকে পল্লীসংস্কৃতি ও গ্রামীণ অর্থনীতির দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। বাংলাদেশ গ্রামেগাঁথা। গ্রামগুলি বাঁচিলেই বাঙালী বাঁচিবে। গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের যে-নূতন আর্থিক জীবন গড়িয়া উঠিবে, তাহার প্রধান সহায় হইবে কৃষি ও কুটীরশিল্প। গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে কুটীরশিল্পের যে একটি বড়ো স্থান রহিয়াছে, সে কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

উপসংহার

বাংলার কৃষি ও কৃষক

[**রচনার সংকেতসূত্র :** বাঙালীর আর্থিক জীবনের প্রধান ভিত্তি কৃষি—বর্তমান যন্ত্রশিল্পের যুগেও আমাদের জীবন কৃষিনির্ভর—এদেশের কৃষকের শোচনীয় দারিদ্র্য—আমাদের কৃষি-অবনতির মূল কারণ—সুবিখ্যাত 'ফ্লাউড কমিশন'-এর সুপারিশ—আমাদের কৃষিউন্নয়নের প্রতিবন্ধক—কী ভাবে কৃষির উন্নতিবিধান সম্ভব—উপসংহার।]

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো বাংলাও একটি কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলাদেশের শতকরা প্রায় তিন-চতুর্থাংশ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। আমাদের আর্থিক জীবনের প্রধান ভিত্তি যে কৃষি, একথা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না। কৃষিব্যবস্থার উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে বাঙালীর আর্থনীতিক সচ্ছলতা ও দারিদ্র্য ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আমাদের

বাঙালীর আর্থিক জীবনের প্রধান ভিত্তি কৃষি

জাতীয় জীবনে একদিন আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল—গ্রামের অধিকাংশ লোক কৃষিকর্মে ব্যাপৃত থাকিলেও, জীবনযাত্রানির্বাহসমস্যা দেশবাসীকে তখন পীড়িত করিয়া তোলে নাই। ইহার কারণ, কৃষির উপর তখনও লোকসংখ্যার এতখানি প্রবল চাপ পড়ে নাই। সে-যুগে বাংলার শিল্পগুলিও ছিল উন্নত। কৃষিকার্যে ও শিল্পকর্মে গ্রামবাসী নিযুক্ত থাকিত, একের চাহিদা অন্যে পূরণ করিত। সেদিনকার অর্থসমতার মূলে ছিল সুন্দর একটি শ্রমবিভাগ। কিন্তু দেশে জনসংখ্যা যখন ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং বিদেশী যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পগুলি লোপ পাইতে বসিল, তখন জনসাধারণ অনন্যোপায় হইয়া জমিকেই একমাত্র আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিল। ইহার ফলে বাংলার আর্থিক বনিয়াদ ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল—চাষীসম্প্রদায় নিদারুণ আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হইল।

বর্তমান যন্ত্রশিল্পের যুগেও আমাদের জীবন কৃষিনির্ভর

বাংলার লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু দেশে জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে সেই অনুপাতে চাষের জমির পরিমাণ বাড়ে নাই। জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে যদি শিল্পপ্রসার ঘটিত, তবে কৃষির উপর এতখানি চাপ পড়িত না। কিন্তু অপরাপর দেশের তুলনায় শিল্পক্ষেত্রে এখনও আমরা নিতান্ত অনগ্রসর। সেজন্য কৃষিকেই আমরা জীবিকা-অর্জনের একতম উপায় বলিয়া জানিয়াছি। পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের দেশে বর্তমানে কৃষিনির্ভর মানুষের সংখ্যা শতকরা প্রায় পঁচাত্তর জন। আধুনিক যন্ত্রশিল্পের যুগে ভারতের মতো কৃষিকেন্দ্রিক দেশ পৃথিবীতে বিরলদৃষ্ট।

এদেশের কৃষকের শোচনীয় দারিদ্র্য

শুধু কৃষির উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়াই এ দেশের কৃষকের দারিদ্র্য এত বেশী—তাহার জীবনযাত্রার মান অবিশ্বাস্য রকমে নীচু। বাংলাদেশের চাষীর মাথাপিছু বার্ষিক আয় পঁয়তাল্লিশ টাকা, মাসিক তিনটাকা বার আনা মাত্র। ইহা হইতেই কৃষিজীবীর দুর্গত অবস্থা কিছুটা অনুমান করা যাইতে পারে। নিদারুণ দারিদ্র্যের জন্য তাহার দুইবেলা অন্ন জুটে না, রোগে তাহার ঔষধের ব্যবস্থা নাই, পথ্য নাই—ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করিয়া ধীরে ধীরে সে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়। অতিবৃষ্টি কিংবা অনাবৃষ্টির জন্য ফসল নষ্ট হইলে অথবা শস্যের ফলন আশানুরূপ না হইলে তাহার দুর্দশার সীমা থাকে না। তখন নিঃসম্বল চাষী মহাজনের দ্বারে উপস্থিত হয়, অত্যধিক সুদে টাকা কর্জ করে—নানা কারণে সেই ঋণ শোধ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। অবশেষে ঋণের দায়ে সে চাষের গরুলাঙল বিক্রী করিয়া দেয়—জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন

সামান্য জমিটুকু মহাজনের কাছে বন্ধক রাখিতে কিংবা বেচিয়া দিতে বাধ্য হয়। এইভাবেই বাংলার চাষী ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হইতেছে।

কৃষকের দারিদ্র্য ও কৃষির অবনতির মূলে অনেকগুলি কারণ রহিয়াছে। মান্ধাতা-আমলের চাষপ্রথা আমাদের কৃষি-উন্নয়নের সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক। পৃথিবীর বহু দেশে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া সেখানে কৃষিজাত ফসলের উৎপাদন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এদেশে কিন্তু এখনো সেই প্রাচীন যুগের লাঙল, কোদাল, মই, নিড়ানি, কাস্তে দ্বারা চাষের কাজ সম্পাদিত হইতেছে। ধান, পাট, আখ, তামাক, তিসি, গম, ছোলা প্রভৃতি আমাদের প্রধান কৃষিসম্পদ। এইসব ফসলের ফলন তুলনায় অন্যান্য দেশে অনেক বেশী। যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত চাষের আশানুরূপ উন্নতি সম্ভব হইতে পারে না। ট্রাক্টর, কম্বাইন প্রভৃতি যন্ত্রের ব্যাপক প্রয়োগের সহায়তায় আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ কৃষির ক্ষেত্রে অসাধ্য সাধন করিয়াছে।

আমাদের কৃষি-অবনতির মূল কারণ

বাংলাদেশের জমিগুলি খণ্ডখণ্ডভাবে অবস্থিত ও অসংবদ্ধভাবে ইতস্তত ছড়ান বলিয়া যন্ত্রের সাহায্যে চাষ করার পক্ষে বিস্তর অসুবিধা রহিয়াছে। ভূমিসংক্রান্ত আইনের জটিলতা আমাদের কৃষির উন্নতি ও প্রসারের বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি জমিদারিপ্রথার উচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কিন্তু সুদীর্ঘকাল ধরিয়া উক্ত প্রথা এদেশে বর্তমান ছিল। তাহার ফলে বাংলার কৃষককুল সর্বনাশের শেষপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অতীতের জমিদারিপ্রথার চিত্রটি এইরূপ: যাহারা জমি চাষ করে তাহারা জমির মালিক নয়—জমিদারই মালিক। অথচ জমিদারের সঙ্গে জমির সাক্ষাৎ কোনো সংস্রব নাই। জমিদার জমির উন্নতির কোনো চেষ্টাই করেন না, তাঁহাদের দৃষ্টি শুধু খাজনা-আদায়ের দিকে। জমিদার শহরে বাস করেন : তাঁহার নায়েব, গোমস্তা নানাভাবে গরীব প্রজার উপর অবর্ণনীয় পীড়ন চালাইয়া খাজনা আদায় করিয়া থাকে; আসল-খাজনার সঙ্গে বে-আইনীভাবে খাজনা আদায় করিতে তাহারা দ্বিধাগ্রস্ত হয় না—এই খাজনার নামই আবওয়াব। চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তপ্রথা প্রচলিত হওয়ায় এদেশে পত্তনিদার, দরপত্তনিদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যাও অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। একই জমির সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের স্বার্থ জড়িত হওয়ার ফলে জমির উন্নতিবিধান দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

সুবিখ্যাত 'ফ্লাউড কমিশন' চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত-প্রথা রদ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন, এবং জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের সমস্ত অধিকার সরকারকে ক্রয়

করিয়া লইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু স্বার্থান্ধ জমিদারশ্রেণী ও বিদেশী বণিকের চক্রান্তে উক্ত কমিশনের নির্দেশ এতকাল কার্যকরী হইয়া উঠে নাই। দীর্ঘকাল পরে বাংলা-সরকার বহুবৃদ্ধ জমিদারিপ্রথার উচ্ছেদসাধন করিয়াছেন। চাষীরা যদি জমির মালিকানাস্বত্ব পায় এবং সরকার যদি সুষ্ঠুভাবে জমির পুনর্বণ্টন-কর্তব্য সম্পাদন করেন, তাহা হইলে আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলার কৃষি ও কৃষকের অবস্থার মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসিবে।

সুবিখ্যাত 'ফ্লাউড কমিশন'-এর সুপারিশ

বাংলাদেশে নানা শ্রেণীর কৃষক বর্তমান—মালিক-চাষী, বর্গাদার বা ভাগচাষী, কৃষাণ, কৃষিমজুর সকলেই কৃষকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে একমাত্র মালিক-চাষী ব্যতীত অন্য কাহারও আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়। আমাদের কৃষি-ব্যবস্থা অবৈজ্ঞানিক, ইহা মোটেই লাভজনক নয়। একদিকে উত্তরাধিকারসূত্রে জমি ক্রমেই খণ্ডবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, অন্যদিকে ঋণের দায়ে জর্জরিত হইয়া কৃষক জোতজমা মহাজনের হাতে তুলিয়া দিতেছে। সুতরাং কৃষির অবনতি অনিবার্য। ইহার উপর লাগিয়া আছে অনাবৃষ্টি, বন্যা, কীটপতঙ্গের উপদ্রব। জলসেচনের অব্যবস্থাও উল্লেখনীয়। দরিদ্র চাষী ইহার কোনো প্রতিকারই করিতে পারে না। কৃষকের অভাবনীয় দারিদ্র্যই এদেশের কৃষি-অবনতির প্রধান কারণ। আমাদের চাষীশ্রেণী যে অত্যধিক ঋণগ্রস্ত, সে-সম্বন্ধে সন্দেহের এতটুকু অবকাশ নাই। এই ঋণভার হইতে কৃষককে যদি মুক্তি দিতে পারা না যায়, তবে কৃষির কোনো উন্নতিই সম্ভব নয়।

আমাদের কৃষি-উন্নয়নের প্রতিবন্ধক

উপযুক্ত জলসেচন ও সারের ব্যবস্থা না থাকিলে শস্যের ফলন আশানুরূপ হইতে পারে না। এদেশে এই দুইটি অতি-প্রয়োজনীয় বস্তুর বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। সারাটি ঋতু ধরিয়া প্রকৃতির দয়াদাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিলে চলে না। জমিদার ও জনসাধারণের উদাসীনতার জন্য দেশের পুকুরগুলি মজিয়া ভরাট হইয়া গিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে কূপ খনন করিয়া, নলকূপ বসাইয়া, খাল কাটিয়া জলসরবরাহের ব্যবস্থা যদি করা না হয়, তবে কৃষির উন্নতি সাধিত হইবে কীরূপে? একই জমিতে দীর্ঘকাল ধরিয়া শস্য ফলাইলে ভূমির উর্বরতাশক্তি আপনা হইতে কমিয়া আসে। এরূপ জমিকে উর্বর করিয়া তুলিতে হইলে উত্তম সারের আবশ্যক হইয়া পড়ে। দরিদ্র চাষী কিন্তু অর্থাভাবে সারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারে না, ফলে তাহার দারিদ্র্য কেবল বাড়িয়াই চলে।

দেশের শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য সবকিছুরই উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করে

কৃষিজাত সামগ্রীর উপর। সুতরাং আমরা যদি কৃষির উন্নতিবিধান না করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের আর্থিক অসচ্ছলতা কিছুতেই ঘুচিবে না। অনেকে বলিয়া থাকেন, অত্যধিক লোকসংখ্যাবৃদ্ধিই দেশবাসীর দারিদ্র্যের মূল কারণ। কিন্তু আমরা বলিব, এ ধারণা সত্য নয়। কৃষির উন্নতিবিধান করিয়া শস্যের ফলন যদি বৃদ্ধি করা যায়, অনাবাদি জমিগুলিতে যদি চাষের বন্দোবস্ত করা হয়, তবে সহজেই উদ্বৃত্ত লোকের অন্নসংস্থান হইতে পারে। কৃষির উন্নতিবিধানের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ভূমিসংক্রান্ত জটিল আইনগুলির সংস্কারসাধন। চাষীকে জমির মালিকীস্বত্ব ফিরাইয়া দিতে হইবে, খণ্ড খণ্ড জমিগুলিকে একত্রিত করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যন্ত্রপাতির সহায়তায় চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমবেতভাবে জমিচাষের ব্যবস্থা না হইলে শস্যের ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। গরীব চাষীকে মহাজনের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য কৃষিঋণসমিতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। মহাজনীপ্রথার আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়া চাষীকে ঋণদানের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষকসম্প্রদায়কে ঋণমুক্ত করার সমস্যাই আমাদের কৃষি-উন্নতির একটি প্রধান সমস্যা।

কী ভাবে কৃষির উন্নতি-বিধান সম্ভব

কৃষি ও শিল্প পরস্পরের অনুপূরক। দেশে যদি আমরা যথোপযুক্ত শিল্প-সম্প্রসারণ ঘটাইতে পারি তাহা হইলে জমির উপর অত্যধিক চাপ স্বাভাবিক ভাবেই কমিয়া আসিবে, অন্যদিকে জনসাধারণের আয়ের পথও প্রশস্ত হইবে। আয়ের নূতন পথ খুলিয়া গেলে আমাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হইতে বাধ্য। পৃথিবীর বহুদেশ উন্নত ধরণের কৃষিপ্রণালী অনুসরণ করিয়া শস্যের ফলন বহুগুণ বর্ধিত করিয়াছে। সেদিকে আমাদের দৃষ্টি নাই বলিলেই চলে। কৃষি-ব্যাপারে এখনও আমরা মধ্যযুগে বাস করিতেছি। বাংলাদেশে কৃষিসংক্রান্ত পরীক্ষাগার, পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকেন্দ্র ও কৃষিশিক্ষাবিদ্যালয়ের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। উপযুক্ত সার, ভাল বীজ এবং জলসেচনের সুব্যবস্থার অভাবে আমরা কৃষির উন্নতিসাধন করিতে পারিতেছি না। এইসব দিকে আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

উপসংহার

কৃষি ও কৃষকের উন্নতির পথে নানা প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সমস্ত প্রতিহত করিতেই হইবে। চাষীসম্প্রদায়ের উন্নতি-বিধানের ইচ্ছা সত্যই যদি আন্তরিক হয়, তবে সমস্ত প্রতিকূল শক্তিকে অবশ্যই আমরা পরাভূত করিতে পারিব—ইচ্ছা থাকিলে উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। সমগ্র দেশের ভাগ্য যে চাষীর ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত একথা আমরা এখনো উপলব্ধি

করিতে পারি নাই। বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান অঞ্চল। সুতরাং কৃষিব্যবস্থার অবনতি আমাদের পক্ষে মারাত্মক। বছরের পর বছর আমরা খাদ্যাভাবের মধ্য দিনাতিপাত করিতেছি। এই খাদ্যসংকট উত্তীর্ণ হইবার জন্য, শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল জোগাইবার জন্য, আর্থিক দুর্গতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমাদের সকলকে কৃষির প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে। দেশবাসী সকলকেই বুঝিয়া লইতে হইবে যে, কৃষি ও কৃষককে বাদ দিয়া জাতীয় জীবনে কোনো উন্নতিরই সম্ভাবনা নাই। চাষী যদি বাঁচে তবে সমগ্র বাংলা দেশ বাঁচিবে।

আমাদের নববর্ষের উৎসব

[**রচনার সংকেতসূত্র** : প্রারম্ভিক ভূমিকা—কতকগুলি বিশেষ উপলক্ষ আশ্রয় করিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়—এ রকম একটি উপলক্ষ পয়লা বৈশাখ—নূতন বৎসরের প্রথম দিনটির অপূর্বতা—প্রাচীনকালে এদেশে নববর্ষের উৎসব হইত অগ্রহায়ণ মাসে—বর্তমান কালে নববর্ষের উৎসব উদ্‌যাপিত হয় বৈশাখে—নববর্ষোৎসবের বিচিত্র অনুষ্ঠান—উৎসবের ধারার মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা—সেকাল ও একালের উৎসবের মধ্যে পার্থক্য—অতীতের আন্তরিকতাটুকু আমরা যেন হারাইয়া ফেলিতেছি—উপসংহার।]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

আনন্দের প্রতি আকর্ষণ প্রত্যেক মানুষেরই একটা সহজাত ধর্ম। আমরা যাহা কিছু করি, বলি ও ভাবি—সমস্তকিছুর মূলে অলক্ষ্যভাবে যে-প্রেরণাটি কাজ করে, এককথায় তাহা হইল আনন্দানুসন্ধান। এই আনন্দ আবার মানুষ নিজ নিজ প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য-অনুসারে একা ভোগ করিতে পারে, পরিবারের পাঁচ জনের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া উপভোগ করিতে পারে, সমাজের অপর দশজনের সঙ্গেও ভাগ করিয়া লইতে পারে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথে ক্ষণে ক্ষণে আমরা যে-আনন্দ আহরণ করি, তাহা আমাদের ব্যক্তিগত সম্পদ, প্রাত্যহিকতার ডালভাতে পুষ্ট ভরাপেটের আনন্দ—উৎসব তাহা নয়। নিজে বা দুই-একজন নির্দিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে ভালো একটা ছবি দেখিতে যাই, বা বিশেষ কোনো খেলা দর্শন করি, বা গঙ্গার চিত্তহারী শোভা দেখিয়া লই—সবই আনন্দের বস্তু, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার একটাকেও উৎসব বলিব না। আনন্দ যখন ব্যক্তিজীবনের বা সংকীর্ণ পারিবারিক জীবনের সীমা অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে, সর্বব্যাপী সাধারণের

অন্তরের শুচিস্পর্শে ধন্য হয়—তখনই তাহাকে উৎসব বলি। নিজের আনন্দ যখন বহুর সহিত মিলিত হইয়া একটি সার্বজনীন রূপ গ্রহণ করে, সেই আনন্দেরই নাম উৎসব। এই উৎসবানন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া বাঙালী প্রবন্ধকার বলেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: 'আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হোক, আমার শুভে সকলের শুভ হোক, আমি যাহা পাই তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি—এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ।' যথার্থ উৎসব মঙ্গল-জ্যোতিতে দীপ্যমান।

কতকগুলি বিশেষ উপলক্ষকে আশ্রয় করিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়

উৎসব এই কারণে একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। কতকগুলি বিশেষ উপলক্ষকে আশ্রয় করিয়া মানুষ বিচিত্র উৎসবের আয়োজন করে। পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, জাতীয়, রাষ্ট্রীয় ইত্যাদি যে-কোনো নিমিত্ত বা উপলক্ষকে কেন্দ্র করিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে পারে। আমি আমার একজন অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের জন্মদিন উদ্‌যাপন করিব বা নূতন গৃহ প্রতিষ্ঠা করিব—তাহা লইয়া দশজন বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশীকে ডাকিলাম,—একটি পারিবারিক উৎসব সম্পাদিত হইল। দুর্গাপূজা, রথযাত্রা, দোল—এগুলি ধর্মীয় উৎসব। স্বাধীনতাদিবসপালন প্রভৃতিকে রাষ্ট্রীয় উৎসব বলা যাইতে পারে। বর্তমানে রবীন্দ্রজয়ন্তী, বিজয়াসম্মেলন ইত্যাদি আমাদের জাতীয় উৎসবে পরিণত হইয়াছে। উপলক্ষ ও উদ্যোক্তাদের দিকে তাকাইয়া এই ভাবেই আমরা উৎসবের শ্রেণীবিভাগ করি। কিন্তু, একটু লক্ষ্য করিলে স্পষ্টত বোঝা যায়, যে-উৎসবের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের সংযোগ বেশী, উহাই নিমিত্তের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া জাতীয় উৎসবের মর্যাদা লাভ করে। নববর্ষের উৎসব এরূপ একটি জাতীয় উৎসব।

এ রকম একটি উপলক্ষ নববর্ষের প্রথম দিনটি

বৎসর মানুষের নিজের সৃষ্টি। অনাদ্যনন্ত অখণ্ড মহাকালকে আমরা নিজেদের বুদ্ধিমতো খণ্ডিত করিয়া সেকেণ্ড-মিনিট-ঘণ্টা-দিন-মাস-বৎসরে চিহ্নিত করিয়াছি। বছরের ফিতায় আমরা আমাদের আয়ুষ্কালের পরিমাপ করি। এই কারণে নূতন বৎসরের প্রারম্ভে অতীত ও অনাগতের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া আমরা নিজেকে একবার ভালো করিয়া দেখিবার প্রয়াস পাই। চতুষ্পার্শ্বের পরিচিত পৃথিবীই আমাদের জীবনপরিক্রমার পথে নানা আশাআকাঙ্ক্ষার বার্তাবহ হইয়া যেন নূতন রূপমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। পৃথিবীর সকল দেশের মানুষই নব-বর্ষের উৎসব করিয়া থাকে। তবে মনে রাখিতে হইবে, দেশভেদ ও জাতিভেদে বর্ষ-আরম্ভের বিভিন্নতার মতো, নববর্ষের উৎসব-অনুষ্ঠানের বহিরঙ্গ রূপটিও স্বতন্ত্র।

বছরের প্রথম দিনটি প্রতিদিনের মতোই একটি দিন। কিন্তু, তবু কোথায় যেন ইহার মধ্যে একটা অপূর্বতা রহিয়াছে। এই অপূর্বতার জন্যই ইহার স্বাতন্ত্র্য, এবং এ কারণে ইহা প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ঊর্ধ্বচারী একটি বিশেষ দিন—অপর দশদিন হইতে যেন একেবারে আলাদা। ধাবমান মহাকাল মাত্র এই একটি দিনের জন্য তাহার অশ্রান্ত গতিকে স্তব্ধীভূত করিয়া যেন স্থিতিশীল মূর্তিতে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। আমরা বিপুল সমারোহসহকারে এই নূতনকে অভ্যর্থনা জানাই—আশা ও আনন্দে, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমাদের হৃদয়দেশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

নূতন বৎসরের প্রথম দিনটির অপূর্বতা

"প্রাচীনকালে আমাদের দেশে বর্ষ আরম্ভ হইত অগ্রহায়ণ মাস হইতে। অগ্রহায়ণ মাসের নাম ছিল মার্গশীর্ষ মাস। জনসাধারণ কোনোকালেই অধিক শিক্ষিত ছিল না। তাহারা তখনও চন্দ্রসূর্যের গতি দেখিয়া বর্ষ গণনা করিতে শিখে নাই। তাই প্রাকৃতিক স্বভাবের লক্ষণ দেখিয়া তাহারা বর্ষ গণনা করিত। 'অগ্র' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, 'হায়ণ' অর্থাৎ ব্রীহি বা ধান জন্মায় যে-সময়—সেটা অগ্রহায়ণ। কৃষক ও খাতককে মহাজন কোন্ সময় ঋণ দিবেন, আর কোন্ সময় তাহারা সেই ঋণ পরিশোধ করিবে, প্রকৃতিগত একটা স্পষ্ট নির্দেশের দ্বারা তাহা বুঝান হইত। কিন্তু কালের গতি পরিবর্তনশীল। ক্রমে অগ্রহায়ণের পরিবর্তে বৈশাখ হইতে বর্ষগণনা শুরু হইল। হিন্দুদের নিকট বৈশাখমাস সর্বাপেক্ষা পুণ্যমাস। বিশাখা-নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমার নাম বৈশাখী। যে-মাসে এই বৈশাখী হয় তাহার নাম বৈশাখ।"

প্রাচীনকালে এদেশে নববর্ষের উৎসব হইত অগ্রহায়ণ মাসে

আমরা—বাঙালীরা—পয়লা বৈশাখেই নববর্ষের উৎসব উদ্‌যাপন করিয়া থাকি। এ দিনটিতে সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাই অতীতের ব্যর্থতার গ্লানি, অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করি পুরাতন বৎসরের দুঃখ-বেদনার যত ক্ষতচিহ্ন। নববর্ষের উজ্জ্বল নূতন প্রভাত আমাদের কাছে বহন করিয়া আনে উদার মুক্তির বাণী —হতাশার হাত হইতে মুক্তি, মানসিক দুর্বলতা-জড়তার হাত হইতে মুক্তি, চিত্তদৈন্যের হাত হইতে মুক্তি। আর, মুক্তিতেই তো মানুষের সত্যকার আনন্দ। এই হিসাবে নববর্ষ আনন্দের উৎস, শক্তির উৎস, নবতন প্রাণচেতনা-অনুভবের উৎস। এমন দিনটিকে সর্বান্তঃকরণে যে-না বরণ করিয়া লইতে পারে, সে বাস্তবিকই দীনাত্মা, জীবন তাহার বিড়ম্বিত। নববর্ষ আমাদের মস্ত বড়ো উৎসবের দিন।

বর্তমানকালে নববর্ষের উৎসব উদ্‌যাপিত হয় বৈশাখ মাসে

পল্লীঅঞ্চলে নববর্ষের শুরুতে মেলা বসে। শিশুরা খেলনা কিনিয়া আনে, নাগরদোলায় দোলে, বিচিত্র আনন্দানুষ্ঠানে মাতিয়া উঠে। বড়োরা সংবৎসরের জন্য মাটির বাসন, নানারকমের রবিশস্য, বেতের ও বাঁশের ডালা-কুলা, লোহার ও কাঠের নানা ব্যবহার্য উপকরণ সব কিনিয়া রাখে। চৈত্রমাসের শেষ দিনটিতে গাজন ও শিবের পূজা হয়। চড়কের উপসংহারও নববৎসরের একটি অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। কোনো কোনো অঞ্চলে শিবের গাজন ও গম্ভীরা-গান হইয়া থাকে।

নববর্ষের উৎসবে বিচিত্র অনুষ্ঠান

পয়লা বৈশাখে সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে ব্যবসায়ীদের 'হালখাতা'-উৎসব। বিচিত্রসুন্দর উপকরণে দোকানঘর সাজাইয়া গণেশপূজা ও আনুষঙ্গিক মঙ্গলানুষ্ঠানের মধ্য দিয়া এই উৎসব সম্পন্ন হয়। নিমন্ত্রিত খরিদ্দারগণ দোকানে আসিয়া বাকি মিটাইয়া দিয়া মিষ্টি খাইয়া ফিরিয়া যায়। ভিখারীভোজনে, নাচেগানে, আনন্দমুখরতায় সমগ্র পরিবেশটি মনোমদ হইয়া উঠে। এই নূতন বৎসরের পুণ্যদিনে গৃহস্থরাও বহুবিধ অনুষ্ঠান পালন করেন। সর্বত্রই সহজ অবারিত আন্তর প্রীতির বন্যা বহিয়া যায়—সকলের মুখেই প্রফুল্লতার ভাস্বর দীপ্তি।

অধুনা এই উৎসবের ধারা কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন শহরঅঞ্চলে ইহা অনেকটা রাষ্ট্রীয় উৎসবের ভঙ্গিতে সম্পন্ন হয়। ইংরেজী বৎসরের শুরুতে যেমন ফৌজের কুচকাওয়াজ হইয়া থাকে, তেমনি সামরিক কায়দায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ মার্চ করিয়া, রণবাদ্য বাজাইয়া শহর পরিক্রমণ করে, এবং ময়দানে বা অন্যকোনো নির্দিষ্ট জায়গায় জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানায়। রাজ্যপাল এই উৎসবে সরকারীভাবে যোগ দেওয়ায়, এবং পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের সক্রিয় উৎসাহে ইহা একটি নূতন মর্যাদা লাভ করিয়াছে। বেসরকারী বহু সঙ্ঘ প্রভাতফেরী বাহির করিয়া পথে পথে নূতন আশা-উদ্দীপনার বাণী গাহিয়া বেড়ায়, এবং মূলত জাতীয় পতাকা পুরোভাগে রাখিয়া এই নগরপরিক্রমা চলিতে থাকে।

উৎসবের ধারার মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা

একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, পল্লী ও শহর-অঞ্চলের—অতীত ও বর্তমান কালের—নববর্ষের উৎসবপদ্ধতিতে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা বেশ চোখে পড়ে। পূর্বে গ্রামাঞ্চলে এই উৎসব ছিল খানিকটা ধর্মীয় পূজা-অর্চনা-জাতীয় আচরণ ও খানিকটা সংবৎসরের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের একটা

সুযোগ। গ্রাম্যমেলার আনন্দ অতি সহজভাবে এই দুইটি বস্তুকে আড়াল করিয়া রাখিত। বর্তমানে শহরাঞ্চলে এই উৎসব জাতীয়তার ভাবধারা দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে। সৈন্য বা সামরিক শক্তি জাতীয় আশা-উদ্দীপনার প্রতীক বলিয়া, বিদেশী অনুকরণে ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় কুচকাওয়াজ ও জাতীয়-পতাকা-অভিবাদন ইহার অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিদগ্ধগোষ্ঠীর আহ্বানে ও পরিচালনায় সভার অনুষ্ঠান ইত্যাদি সাংস্কৃতিক প্রয়াসও দেখা দিয়াছে। পূজা-অর্চনা ও গৃহগত উৎসব হয়তো একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। কিন্তু ভোজ, প্রমোদভ্রমণ, নির্দিষ্ট বন্ধুদের লইয়া সমারোহ এখন লক্ষণীয় প্রাধান্য পাইতেছে।

সেকাল ও একালের উৎসবের মধ্যে পার্থক্য

কালচক্রের আবর্তনে সবকিছুরই পরিবর্তন হইয়া থাকে—পরিবর্তমানতাই জীবনের ধর্ম। কিন্তু, তবু মনে হইতেছে, উৎসবের মূলে যে-হৃদয়প্রীতির প্রাধান্য থাকে, যে-শুভ্রভাস আন্তরিকতা বিদ্যমান থাকে, বর্তমানে অনেক দিক দিয়া তাহা যেন কমিয়া আসিতেছে। আমাদের নানান্ উৎসবের মতো নববর্ষের উৎসবও যেন ধীরে ধীরে কৃত্রিমতাসর্বস্ব হইয়া উঠিতেছে। 'সমারোহ-সহকারে আমোদপ্রমোদ করায় আমাদের উৎসবকলা কিছুমাত্র চরিতার্থ হয় না। তাহার মধ্যে সর্বজনের আন্তরিক প্রসন্নতা ও শুভ ইচ্ছাটুকু না থাকিলে নয়'—নববর্ষের উৎসবের দিনে বলেন্দ্রনাথের এই কথাগুলি যেন আমরা বিস্মৃত না হই। অনুষ্ঠানের সঙ্গে আন্তরিকতার সংযোগ ঘটিলেই উৎসব সার্থক হইয়া উঠে।

অতীতের আন্তরিকতাটুকু আমরা যেন হারাইয়া ফেলিতেছি

আমাদের সকলকেই ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উৎসবের দিন সংসারের অন্যান্য দিন হইতে স্বতন্ত্র—প্রতিদিনের জীবন হইতে সরিয়া আসিয়া এই বিশেষ দিনটিকে বরণ করিতে হয়। নতুবা ইহার মধ্যে যে-নির্মল আনন্দের স্পর্শ রহিয়াছে, তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব। পয়লা বৈশাখ জীবনের পথে নূতন উদ্যমে যাত্রা শুরু করিবার দিন। ইহাকে সর্বপ্রকার আবিলতা হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে, অন্তত একটি দিনের জন্য সকলের সঙ্গে প্রাণের যোগে নিজেকে ধন্য করিয়া তুলিতে হইবে—তবেই মধুস্রাবী হইয়া উঠিবে আমাদের সর্বসাধারণের জীবন।

উপসংহার

আমার ছাত্রজীবনের এক টুক্‌রো স্মৃতিকথা

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—কৈশোরের মধুময় স্বপ্ন—'হায় রে রাজধানী' —কলেজে ঃ ভর্তির দিনে—অধ্যক্ষ-মহাশয়ের উপদেশ—কলেজে ভর্তি হলাম—দিন কাটতে লাগল—বৃহত্তর নবতন জীবনের অনুভূতি—স্কুলজীবন আর কলেজজীবন—মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশ্বের সংযোগ—বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে পরিচয়—বিচিত্র নতুন অভিজ্ঞতা—সব অভিজ্ঞতা সমান প্রীতিকর নয়—আত্মব্যাপ্তিই জীবনের মূলকথা—উপসংহার ।]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

আজ মনে পড়ছে অনেক কাল আগের সেই দিনটির কথা, যেদিন প্রবেশিকার গণ্ডী পার হয়ে প্রথম কলেজে এসে ঢুকলাম। মফঃস্বলের ছেলে আমি। বাংলাপল্লীর এক স্নিগ্ধমধুর পরিবেশে নিরুদ্বিগ্ন জীবন গড়ে উঠেছিল। শিক্ষার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা কোনো পার্থক্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল না। মাঠে-ঘাটে-বাটে কেবল ছুটোছুটি করতাম, খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম—নলেন রসের সন্ধানে নিশীথে চলত রোমাঞ্চকর অভিযান। সুপুরীবনের ছায়ায় আমাদের ছোট স্কুলবাড়িটি। তার চেহারায় কোনো আভিজাত্য ছিল না, স্বাতন্ত্র্যের কোনো ছাপ না। মাস্টারমশাইরা কেউ দাদা, কেউ-বা কাকার আসন অধিকার করে নিয়েছিলেন। তাঁদের শাসন ছিল, অনাবিল স্নেহও ছিল। প্রয়োজন হলে তাঁরা বেত মারতে জানতেন, আবার অসুখ হয়ে পড়লে তাঁরাই রাত জেগে সেবা করতে আসতেন।

কৈশোরের মধুময় স্বপ্ন

স্কুল থেকে বেরিয়ে কলকাতার কলেজে পড়তে আসব, কতদিন মনে মনে এ নিয়ে কত বিচিত্র স্বপ্নজালই-না বুনেছি! দূরযানী কল্পনার কত উত্তাল তরঙ্গ তখন মনটিকে আকুল করে তুলত, সে কথা ভাবলে হাসি পায়। তারপর প্রত্যাশিত সে-শুভদিনটিও এলো। কিন্তু চিরপরিচিত দেশের কোল থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে সেদিন দুই চোখ ভরে জল বেরিয়ে আসতে চাইল, বুকের ভিতর তীব্র ব্যথা বাজতে লাগল—স্নেহের একটা পরম বিশ্বাসবন্ধনকে ছিঁড়ে না জানি কোন্ অনিশ্চয়ের দূর দিগন্তে ঝাঁপ দিতে চলেছি। পিতামাতার আর মাস্টারমশাইদের সস্নেহ ও সাশ্রু আশীর্বাদ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বৃহত্তর জীবনের পথে।

এলাম কলকাতায়। ইঁট-পাথর-লোহায়-গড়া মহানগরীতে পা দিতে প্রথমেই মনে পড়ল কবিগুরুর সেই কাতর দীর্ঘশ্বাস : 'হায় রে রাজধানী পাষাণকায়া'। পল্লীর চোখজুড়ানো শ্যামশ্রী এখানে নেই—সেই সঙ্গে পল্লীর প্রাণও এখানকার যন্ত্রচক্রের নীচে পিষে বুঝি চুরমার্ হয়ে গেছে। মানুষে মানুষে এখানে বৈষয়িক সম্পর্ক, নিষ্প্রাণ সংস্রব। বিদ্যুতের আলো, জলের কল, বিপুল ঐশ্বর্য, ছায়াচিত্রের দীপান্বিতা সবই আছে, কিন্তু গ্রামের স্নিগ্ধসুন্দর যে অনাড়ম্বর জীবন, সে এখানে কোথায়?

'হায় রে রাজধানী'

শ্যামবাজারের ছোট একটি গলিতে কাকার বাসা। আশেপাশে, ডাইনে-বাঁয়ে, সম্মুখে-পশ্চাতে কত কত বাড়ী! এক ফালি আকাশ কোনোখানে উঁকি দেয় না, একঝলক মুক্ত বাতাস আসবার পথ নেই। মনে পড়ল, বাংলাভূমির এক দূর প্রান্তে অবস্থিত আমাদের গ্রামটি—যেখানে রয়েছে 'অবারিত মাঠ গগন-ললাট'। বাধামুক্ত আকাশের ডানামেলা পাখী যেন লোহার খাঁচায় বাঁধা পড়ল।

প্রথম দিন বিশ্রাম। পরের দিন ভর্তি করিয়ে দেবার জন্যে কাকামশাই আমায় কলেজে নিয়ে গেলেন। কলেজ। প্রথম-দৃষ্টিতে রোমাঞ্চ হল। বিশাল বাড়ি, অগুণতি ছাত্র গিজ্ গিজ্ করছে—একটা চাপা কোলাহল। ভিতরে ঢুকতেই আমার বুক যেন কাঁপতে লাগল। কোথায় এলাম—এ কি শিক্ষায়তন, না আমাদের গ্রামের সোমবার আর শুক্রবারের হাটের মতো বেচাকেনার ব্যাপার চলছে এখানে।

কলেজে : ভর্তির দিনে

কাকামশাই দেখা করতে নিয়ে গেলেন প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে। অধ্যক্ষের নীল-পর্দা-দেওয়া একটা রহস্যময় ঘর, বাইরে টুলে বেয়ারা বসে আছে। আমার সর্বাঙ্গে একটা আতঙ্ক জাগতে লাগল—মনে হতে লাগল, ওই রহস্যাচ্ছন্ন ঘরের মধ্যে বুঝি কী একটা বিভীষিকা লুকিয়ে আছে।

ঘরে ঢুকলাম। সাহেবী কেতার আপিস। মাথার ওপর বোঁবোঁ করে পাখা ঘুরছে। টেবিলের উপরে নীল-শেড্-দেওয়া ইলেকট্রিকের আলো। বেতের ঝুড়িভর্তি কাগজ, কত বিচিত্র ফাইল, নানা রঙের কাগজ চাপা—কলিং বেল। আর, একখানি দামী চেয়ারে বসে আছেন অধ্যক্ষ-মশায়। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁকে দেখে একটুও ভয় করল না। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ স্কটল্যাণ্ডের প্রৌঢ় একজন ভদ্রলোক, চোখে সুন্দর স্নেহমাখানো দৃষ্টি। প্রথম-দর্শনেই শ্রদ্ধায় মন ভরে গেল। দু'চার কথার পর আমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন : 'শুধু লেখাপড়া শেখাই যথেষ্ট নয়, মানুষ হতে হবে—তোমাদের কাছে এ-ই আমি চাই।'

অধ্যক্ষ-মহাশয়ের উপদেশবাণী

তাঁর সেই উপদেশবাণী আমার জীবনের মূলমন্ত্রের সন্ধান দিল।

কলেজে ভর্তি হলাম

কলেজে ভর্তি হলাম। বিরাট সেক্‌শন—প্রায় দু'শো জন ছাত্র। কয়েকজন সহপাঠিনীও রয়েছেন। বৈচিত্র্যময় বেশবাস, বিচিত্র সকলের কথাবার্তা। আমাদের গ্রামের ছেলেমেয়েদের চাইতে এরা কত আলাদা, যেন সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী। তাদের মাঝখানে জড়োসড়ো হয়ে অতীব সংকোচে বসে রইলাম, যেন কত অপরাধ করে ফেলেছি। অল্পক্ষণের মধ্যেই এলেন ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক, তাঁর পড়ানোর ভঙ্গি অভিনব—এ ধরণের ইংরেজী ভাষার সঙ্গে আমি যে একেবারে অপরিচিত! নির্বাক বিস্ময়ে কত কী ভাবতে লাগলাম। বুঝি, আলাদীনের মায়াপ্রদীপের স্পর্শে আলোকিত একটা স্বপ্নময় অদ্ভুত জগতে এসে পড়েছি।

দিন কাটতে লাগল

দিন কাটতে লাগল। আস্তে আস্তে সবকিছু সহজ হয়ে এল। একতলা সেই ছোট বাসাবাড়িতে এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছি, মনকে তা আর পীড়া দেয় না তেমন। মাঝে মাঝে উন্মুক্ত দিক্‌প্রান্তরের জন্যে প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে বটে, কিন্তু এখন যেন নাগরিকতার কিছুটা নেশা এসে গেছে। ছুটিতে গ্রামে যাই, কয়েকদিন পরেই অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করতে থাকে যাদুময়ী কলকাতা মহানগরী। এখন আর একে পাষাণ-কারাগার বলে মনে হয় না; বরং মনে হয়, কলকাতার গতিময় এই বিপুল জীবন-যাত্রার মধ্যে যেন চলমান বিশ্বসংসারের বৃহৎ হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছি।

বৃহত্তর নবতন জীবনের অনুভূতি

কলেজ এখন আমার কাছে একটা অপরিচিত রহস্যলোক আর নয়। এখানকার নতুন পরিবেশের সঙ্গে মনের পরিপূর্ণ মিলন ঘটে গেছে। জীবন যে কত বড়ো, কত যে ব্যাপ্ত, তার যে কতখানি বিপুল সম্ভাবনা, এখানে এসে তা উপলব্ধি করতে পেরেছি। গ্রামের স্কুলে পড়বার সময় জ্ঞানসমুদ্রের যে তরঙ্গগর্জন অস্পষ্টভাবে শুনতে পেতাম, আজ সেই মহাসাগরের বিশাল রূপটি অনেকটা যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরা এখানে আমাদের পাশে জেগে আছেন—তাঁদের হাতে জ্বলছে বিচিত্র বিদ্যার উজ্জ্বল দীপশিখা। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, শংকর থেকে সেক্‌সপীয়ার-মিল্‌টন, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই জ্ঞানের এই মহাতীর্থে আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ সঙ্গী। দেশবিদেশের বরণীয় আচার্যেরা তাঁদের বিবিধ ভাব ও ভাবনার স্পর্শমণির ছোঁয়া দিয়ে আমার অন্তরকে সমৃদ্ধ করে তুলছেন। আজ শুধু নিজের দেশ নয়, বড়ো পৃথিবীর সঙ্গে যেন আমার যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে।

কলেজজীবনের ফাঁকে ফাঁকে প্রায়ই মনে পড়ে পিছনে-ফেলে-আসা স্কুল-জীবনের কথা। বাইরের একটা সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রীশক্তি সেখানে জীবনকে বিশেষ একটা নির্দিষ্ট পথেই পরিচালিত করতে চেয়েছে—অনেক সময় তাকে অকরুণ বন্ধন বলেই মনে করেছি। যে-সব গ্রন্থ পাঠ্য ছিল, তখন তাদেরই একমাত্র সত্য বলে ভেবেছি; তার বাইরে যে পড়ে রয়েছে বিশাল জীবন ও অনন্তবিস্তার জ্ঞানের ক্ষেত্র, একথাটি সেদিন তেমন অনুভব করিনি। স্কুলের প্রাত্যহিক জীবনধারা একটা সংকীর্ণ পরিধির মধ্যেই নিয়ত আবর্তিত হয়েছে। আজ ওই প্রবাহের মধ্যে যে একটা বিশালতা এসেছে, কলেজে কিছুকাল কাটিয়ে তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করলাম। কলেজের নানা বিতর্কসভা, সুবিপুল গ্রন্থাগার, সাহিত্যসমিতি, শিল্পসমিতি প্রভৃতির সঙ্গে যখন মনের গভীর মিলন সংগঠিত হল তখন বুঝলাম, মানুষের জীবনের পরিধি কত বিস্তৃত, হৃদয়মন ও বুদ্ধির বিচিত্রতা কত-না বিস্ময়াবহ!

স্কুলজীবন আর কলেজজীবন

যতদিন স্কুলে ছিলাম ততদিন সমাজের পারিপার্শ্বিক গণ্ডীটিও বুঝি সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তখন এ সম্পর্কে তেমন সচেতন ছিলাম না। একই মানুষকে প্রতিদিন দেখেছি, প্রতিদিন চোখের সামনে ভেসে উঠেছে একই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি, তথাপি মনকে তারা কোনো রকমের পীড়া দেয়নি। কিন্তু মহানগরীর মাঝে এসে, কলেজের জ্ঞানৈশ্বর্যশালায় প্রবেশ করে প্রথম বুঝলাম, উচ্চতর বিদ্যানিকেতনের সঙ্গে অদৃশ্য নাড়ীর সংযোগ রয়েছে বিপুল বিশ্বের—কলেজের মর্মকেন্দ্রে যেন স্পন্দিত হচ্ছে দূরব্যাপ্ত প্রাণলোকের বিচিত্র ছন্দ। কেবল-মাত্র পুঁথির জগৎকে কেন্দ্র করে এখানকার বিদ্যা আবর্তিত হয় না, এখানে রয়েছে নিত্যনতুন পরিচিতি, নিত্যনতুন বিস্ময়।

মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশ্বের সংযোগ

তাই স্কুলের ক্ষুদ্র সীমানায় যখন দিন অতিবাহিত হয়েছে, তখন স্বাভাবিক কারণেই মনের জগতে, ভাবকল্পনার ক্ষেত্রে তেমন কোনো বৃহৎ আলোড়ন আসেনি। সেখানে ছিলাম যদি নিস্তরঙ্গ নদীতে, আজ এসে পড়েছি অজস্র-কল্লোলমুখর মহাসমুদ্রে। এর গতির মধ্যে রয়েছে একটা তীব্র বেগ, আর নিরন্তর পরিবর্তমানতার অপরূপ ভঙ্গি। সব রকমের পরিবর্তনই যে ভালো, সে কথা আমি বলছি না। কিন্তু পরিবর্তন ছাড়া যে বিচিত্রতার আস্বাদ পাওয়া যায় না, সে-কথাটি অবশ্যই স্বীকার্য। কলেজে এসে পরিচয় ঘটছে বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে,

বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে পরিচয়

এখানে প্রবেশ করে মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হচ্ছে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও সাহিত্যবোধের বীজ। আবার, এরই সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করছি একটা বিশেষ দায়িত্ব। ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপন্থার কত ইঙ্গিত মনের কোণে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। ক্রমেই বুঝতে পাচ্ছি, সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে, একটি সুনির্দিষ্ট পথে আমাকে অবিরত এগিয়ে যেতে হবে।

বিচিত্র নতুন অভিজ্ঞতা

কলেজে কত নতুন বন্ধুবান্ধব পেয়েছি, কত বিভিন্ন স্তরের তরুণপ্রাণের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তাদের সঙ্গে চিন্তার সংঘাত ঘটে, কত নতুন জিনিস জানতে পারি, বুঝতে পারি। এদের কারোর মধ্যে ভাবীকালের রাজনীতিক প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, কেউ-বা ভাবী বিজ্ঞানী, কেউ-বা ভবিষ্যতের শিল্পী, কেউ-বা অনাগত কালের সাহিত্যস্রষ্টা। এখানে আমার চারিদিকে যেন ভবিষ্যৎ-ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে উন্মেষিত হয়ে উঠছে।

সব অভিজ্ঞতা সমান প্রীতিকর নয়

অবশ্য সব অভিজ্ঞতাই সমান প্রীতিকর নয়। কেউ ভালোবেসেছে, কেউ প্রতারণা করেছে। কিন্তু সবকিছু মিলে কলেজজীবনকে আমার মূল্যবান সম্পদ বলেই মনে হয়। গ্রামের শান্ত স্কুলজীবনে সরলতা ছিল, আত্মতৃপ্তি ছিল—অকুণ্ঠ ভালোবাসা সেখানে অযাচিতভাবেই পেয়েছি। এখানেও সে-সব যে একেবারেই পাইনি, তা নয়। কিন্তু পল্লীর কোলে সেই দিনগুলি—তার সঙ্গে এর তুলনা হয় না।

আত্মব্যাপ্তিই জীবনের মূলকথা

তা না-ই হোক। নিছক আত্মতৃপ্তি বড়ো কথা নয়, আত্মব্যাপ্তিই জীবনের মূলকথা। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে-বিশাল মানবসংসারের বার্তা এখানে পেয়েছি, আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ তার ওপরে গড়ে উঠবে। এখান থেকে যে-জ্ঞান, যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম—আমার গ্রামখানিকে, আমার দেশটিকে উজ্জীবিত করে তুলবার পথে ওইগুলিই আমায় পাথেয় যোগাবে। পল্লী আর নগরের পারস্পরিক সহযোগিতাই ভাবী ভারতের মহিমা-উজ্জ্বল রাষ্ট্রীয় রূপ।

উপসংহার

প্রশ্ন উঠতে পারে, নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার সংকল্প কী। সংক্ষেপে তার উত্তর দেওয়া শক্ত। শুধু এইটুকু বলতে পারি, অধ্যক্ষমশাইয়ের সেই কথা-কয়টিকেই আমার ভাবী জীবনের মূলমন্ত্র করে নিয়েছি। শুধু বিদ্বান নয়—মানুষও হতে হবে। আর, মানুষ হয়ে বেদনাজর্জর দেশের গ্লানিকলঙ্ক মোচন করতে হবে, চতুষ্পার্শ্বের কুশ্রীতার নাগপাশ

ছিন্ন করে দেশকে অনাবিল মুক্তির সন্ধান দিতে হবে। আমি শিল্পী হই, বিজ্ঞানী হই, ব্যবসায়ী হই, বা শিক্ষাব্রতী হই, আমার একটি-মাত্র আদর্শ থাকবে,—আর সে আদর্শের কথা এদেশের একজন মহাপ্রাণ কবি বহুপূর্বেই উচ্চারণ করে গেছেন : 'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা, নহি তো মেষ,—দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।'

আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা

[এক ঝটিকাক্ষুব্ধ রাত্রির ভয়াবহ অভিজ্ঞতা]

[**রচনার সংকেতসূত্র :** প্রারম্ভিক ভূমিকা—পূর্বস্মৃতিরোমন্থন—দ্বীপপ্রকৃতির কোলে—বহুবিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—দুর্যোগের পূর্বাভাস—উন্মত্ত ঝটিকার আবির্ভাব—নিদারুণ বিপদের মুখে—পরের দিন সকালে—উপসংহার।]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

মানবজীবন অবিরল ঘটনাপ্রবাহে ভাসমান—বহুবিচিত্র ঘটনার ছোটবড়ো তরঙ্গাভিঘাতে মানুষের চেতনালোক প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আন্দোলিত-আলোড়িত হচ্ছে। বহির্লোকের ঘটনার আবর্ত যেখানে নেই সেখানে আমাদের প্রাণচেতনাও স্তিমিত। কিন্তু অনন্ত মুহূর্তের অন্তহীন ঘটনার সবগুলিকে আমরা স্মরণে রাখি না। অনেকগুলির ওপর বিস্মৃতির যবনিকা পড়ে, কতকগুলি মনের অবচেতন স্তরে আত্মগোপন করে ; আর, অতীতের দু-একটি বিশেষ ঘটনা আমাদের স্মৃতিলোকে এমন অক্ষয় পদচিহ্ন মুদ্রিত করে যায় যে, জীবনে তাদের আমরা কদাপি ভুলতে পারি না—তারা অবিস্মরণীয়। চিত্তের বিচিত্র অনুভূতিকে আশ্রয় করে তারা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে, ক্ষণে ক্ষণে জাগ্রৎ চেতনাকে ধাক্কা দিয়ে যায়, মুহূর্তে মৃত অতীত যেন প্রত্যক্ষগম্য বর্তমানের মতো একেবারে জীবন্ত হয়ে ওঠে। প্রত্যেক মানুষের চিত্তদেশে এরূপ স্মরণীয় ঘটনার স্বাক্ষর চিহ্নিত রয়েছে। তাদের কোনোটি আনন্দের, কোনোটি বেদনার, কোনোটি বা আতঙ্কের।

আমার জীবনের যে-স্মরণীয় ঘটনাটি এখানে আমি বাণীবদ্ধ করতে যাচ্ছি তা একান্ত ভয়াবহ। তার শঙ্কামিশ্র স্মৃতি এখনো আমাকে মাঝে মাঝে কেমন যেন বিহ্বল করে তোলে, সমস্ত চিত্তদেশ নিমেষে কম্পমান বিবর্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

সেই সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপ, সেই ঝঞ্ঝামথিত দুর্যোগময়ী রাত্রি, সেই রুদ্রপ্রকৃতির উন্মাদ নৃত্য, সেই আতঙ্কপাণ্ডুর অভিজ্ঞতা। এ সব মিলিয়ে যে অনুভূতি, তা ভুলবার নয়।

পূর্বস্মৃতিরোমন্থন

অনেকদিন পূর্বের ঘটনা। তখন কলকাতার কলেজে পড়ি। একবার পূজোর ছুটিতে দেশে—চাটগাঁয়—গেছি। ছুটির অর্ধেকটা নিজগ্রামে নানান্ আমোদপ্রমোদে কাটিয়ে দিলাম। তারপর হঠাৎ একদিন মনে ইচ্ছে জাগলো, ছুটির বাকি-কয়টা দিন গ্রামের বাইরে কাটাবো—বেশ কিছুটা দূরে; সঞ্চয় করবো অদেখা জায়গায় বেড়ানোর নতুন অভিজ্ঞতা। বিচিত্রের স্বাদ কে না পেতে চায়; বৈচিত্র্যজনিত আনন্দের আকর্ষণ, দূরের ডাক, কাকে না চঞ্চল করে তোলে? আমিও চঞ্চল হয়ে উঠলাম। স্থির করলাম, সমুদ্রপথ অতিক্রম করে কয়েক দিনের জন্যে এক নির্জন দ্বীপের অধিবাসী হব। আপনারা হয়তো জানেন, চাটগাঁর থেকে কিছুটা দূরে কয়েকটি দ্বীপ রয়েছে। তার মধ্যে কুতুবদিয়া একটি। ওখানে পৌছুতে খুব বেশী সময় লাগে না। চট্টগ্রামশহর থেকে মাত্র ছয়সাত ঘণ্টার পথ, স্টীমারের ভাড়াও অল্প। ছেলেবেলাকার দুজন প্রাণোচ্ছল বন্ধুকে নিয়ে একদিন কুতুবদিয়ায় গিয়ে পৌছালাম।

দ্বীপপ্রকৃতির কোলে

কুতুবদিয়া। অনন্তপ্রসারিত বঙ্গোপসাগরের বিশাল অঙ্কে মসীবিন্দুর মতো ছোট্ট একটি ভূখণ্ড। দ্বীপটি জনমানবশূন্য নয়, তবে দূরে দূরে স্বল্পলোকের বসতি। এখানে শিক্ষিত মানুষের অস্তিত্ব একরূপ নেই বললেই চলে। বাসিন্দাদের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর চাষী-মুসলমান আর জেলে এবং তাঁতি। প্রায় সকলেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট। কঠোর কায়িক পরিশ্রমে যে-দুপয়সা রোজগার করে তাতেই কোনোরকমে তাদের সংসার চলে। পাকাবাড়ি কাকে বলে, তা এরা জানে না। কাঁচামাটির অথবা বেড়ার ঘরই বেশি—খড়ের ছাউনি। কদাচিৎ টিনের ছাউনি চোখে পড়ে। একটি ইস্কুল আছে, আর আছে সরকারের খাসমহল বা কাছারি, এবং একটি পোষ্টাপিস ও থানা।

যে-বাড়িটিতে আমরা উঠলাম তা কাঁচামাটি দিয়ে তৈরী, উপরে টিনের আচ্ছাদন। চারদিকে অনেক দূর পর্যন্ত লোকজনের বসতি নেই, সম্মুখে অন্তহীন সমুদ্র দিক্‌চক্রবালে মিশে গেছে, সুনীল জলরাশি দিনরাত তরঙ্গায়িত হচ্ছে—ডাইনে-বাঁয়ে-পিছনে বালুর চর। কেবল আমাদের বাড়িটির পূবদিকে খানিকটা জায়গা জুড়ে বিরাজমান রয়েছে কতকগুলি আমগাছ, অনেকগুলো সুপুরি গাছ

আর একটি মস্তবড়ো বটগাছ। প্রকৃতির সংসার কতখানি নির্জন নিস্তব্ধ ও সুগম্ভীর হতে পারে, এখানে না এলে তা ঠিক উপলব্ধি করা যাবে না। এ স্থানটিতে শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত মানুষের সঙ্গ সুলভ নয়, আধুনিক জীবনযাত্রার উপযোগী উপকরণও এ জায়গায় মিলবে না। দিগন্তপ্রসারী নীল সমুদ্র, উদার আকাশ ও সাদা ঝক্‌ঝকে বহুবিস্তীর্ণ বালুচরই এখানে মানুষের সবচেয়ে বড়ো সঙ্গী। এখানকার আদিম প্রকৃতির প্রীতিস্নিগ্ধ আতিথ্য শহরবাসিদের কাছে লোভনীয়ই মনে হবে।

প্রকৃতিলালিত এহেন একটি বিরলবসতি দ্বীপে উন্মুক্ত আকাশ-বাতাস-সমুদ্রের সঙ্গে সহজ সখ্য পাতিয়ে আমরা তিনবন্ধুতে সপ্তাহখানেক খুব আনন্দে কাটালাম। ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো ভাবনামুক্ত মন নিয়ে সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াতে কী যে ভালো লাগতো তা ভাষায় প্রকাশ করা একরূপ অসম্ভব। সকালে উদয়লগ্নে পূর্বাকাশে সূর্যকে দুচোখ ভরে দেখে নিতাম। পশ্চিম-আকাশটিকে গলিত স্বর্ণে পরিপ্লাবিত করে দিয়ে সন্ধ্যার মুহূর্তে সূর্য দূর দিগন্তে মিলিয়ে যেতো, তাও নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখতাম। সবচেয়ে ভালো লাগতো শুক্লপক্ষের রাত্রিতে জ্যোৎস্নালোকিত জনশূন্য বালুচরটির দৃশ্য। জেলেরা সামুদ্রিক মৎস্য ধরে সেই চরে বিছিয়ে রাখতো। এক রকমের মাছ আছে, তাদের গায়ে প্রচুর পরিমাণে ফস্‌ফরাস, সেগুলো রাত্রিবেলা এক উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করতো। সমুদ্রবিহঙ্গ পাখার ঝাপটায় দশদিক সচকিত করে দল বেঁধে তীব্র গতিবেগে কোথায় চলে যেতো—দেখে মনটা উদাস হয়ে উঠতো। নৌকা ভাসিয়ে জেলেদের বিচিত্র রকমের মাছ-ধরা, সেও এক দেখবার জিনিস। নিসর্গসংসারের নিকটতম সান্নিধ্যে এসে পর্যাপ্ত অবকাশের মধ্যে নির্ভাবনায় ঘুরে বেড়ানোর কাজ নিয়ে সেই অশ্রান্তকলমন্দ্রিত ক্ষুদ্রপরিসর দ্বীপটিতে দিনগুলি বেশ কাটছিল। কিন্তু স্বপ্নালু, মাধুর্যমণ্ডিত, আনন্দচঞ্চল ওই মুহূর্তগুলির স্মৃতিকে শেষ পর্যন্ত মানস-পটে অক্ষয় রেখায় মুদ্রিত করে রাখতে পারলাম না। এক ভয়াল প্রাকৃতিক দুর্যোগের শঙ্কাতুর অনুভূতি একদিন অকস্মাৎ তাদের কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল। এখন সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথাই বলি।

বহুবিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

কার্তিক মাস। কালীপূজোর দু-একদিন পরে। যেদিনকার ঘটনার কথা বলতে যাচ্ছি সেদিন সকালবেলা থেকেই আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে টিপ্‌-টিপ্‌ করে কয়েকবার বৃষ্টিও হয়ে গেছে। সমস্ত প্রকৃতির মুখে কেমন একটা বিষণ্ণ গাম্ভীর্য। সূর্য মেঘে ঢাকা পড়েছে, এলোমেলো বাতাস বইছে। নিসর্গলোকের

প্রসন্নতা হতে সকলেই বঞ্চিত। ধীরে ধীরে বেলা গড়িয়ে গেল, বিকেল হয়ে এলো। বৃষ্টি ধরে গেছে। বালুচরে সামান্য কয়েকজন মানুষ আনাগোনা করছে। প্রকৃতির বিরূপতাকে উপেক্ষা করে সাহসী জেলের দল সমুদ্রবক্ষে কিন্তু নৌকা ভাসিয়েছে। মাছ তাদের ধরতেই হবে, না হলে পরের দিন তাদের অন্ন জুটবে না। আমরা তিনবন্ধু ঘর ছেড়ে সম্মুখে চরে এসে বসলাম। সমুদ্রে অনেকগুলি নৌকো ভাসমান, অনেক দূরে একখানি ছোট স্টীমারও চোখে পড়লো, চিমনির কালো ধুঁয়ো উড়িয়ে দ্রুতগতিতে চলে যাচ্ছে। সন্ধ্যাও ঘনিয়ে আসছে। প্রকৃতি অপ্রসন্ন বটে, কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে তেমন কোনো লক্ষণীয় অশান্ততার ভাব দেখা যায়নি।

দুর্যোগের পূর্বাভাস

কিন্তু ক্ষণপরেই সমস্ত প্রকৃতিলোকে সহসা এক অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। আকাশের এককোণে বহুদূর পর্যন্ত এক অস্বাভাবিক রক্তাভার বিচ্ছুরণ দেখা গেল। বাতাসের গতিবেগ তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠল, ঘনকৃষ্ণ পুঞ্জপুঞ্জ মেঘ নভোদেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম ঝড়ো হাওয়ার তীক্ষ্ণ এক-টানা শোঁশোঁ শব্দ—ক্ষুব্ধ ঝটিকার উন্মত্ত গর্জন। দেখতে দেখতে বাত্যাতাড়িত মহাসমুদ্র সংক্ষুব্ধ হয়ে এক প্রলয়ংকর মূর্তি ধারণ করল, লক্ষ লক্ষ ফেনিল তরঙ্গের রুদ্রনৃত্য শুরু হল। মনে হচ্ছিল, কে যেন একসঙ্গে কোটি কোটি শঙ্খের মুখে ফুৎকার হানছে। প্রমত্ত সমুদ্রের তরঙ্গগুলি যেন এক-একটি চলমান পর্বত, দানবীয় আক্রোশে ছুটে আসছে তটভূমির দিকে, আছড়িয়ে পড়ে বুঝি তারা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে মাটির পৃথিবীর সবকিছুকে। এতক্ষণ বর্ষণ ছিল না, তা-ও আরম্ভ হল। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎবহ্নি ঝলসিত হয়ে গোটা আকাশটাকে যেন বিদীর্ণ করে দিতে চাইল। ঊর্ধ্বে-নিম্নে, ডাইনে-বাঁয়ে, সম্মুখে-পশ্চাতে—যতদূর দৃষ্টি চলে দেখা যায় শুধু জমাটবাঁধা নীরন্ধ্র অন্ধকার, কানে আসে কেবল বাধাবন্ধহারা ঝড়ের হাহাধ্বনি, আর আতঙ্কবিহ্বল দ্বীপটির অশান্ত আর্তনাদ।

উন্মত্ত ঝটিকার আবির্ভাব

ঘরে এসে আমরা দরজার কপাট বন্ধ করে দিলাম। ঝড়ের দুরন্ত ঝাপটায় জানলাদুয়ার কেঁপে কেঁপে উঠছে, দুর্বার শক্তিতে এক বিপুলকায় দুর্ধর্ষ দানব বুঝি বাড়িটার ঝুঁটি ধরে নাড়া দিচ্ছে। বাড়ির পিছনের বটগাছ-আমগাছ-সুপুরিগাছ-গুলি শিকলিবাঁধা আহত অতিকায় পাখীর মতো কেবল ছটফট করছে। ঝটিকা-শিলাবৃষ্টি-বজ্রধ্বনির সমবেত রুদ্রসংগীত—এ কী ভীষণ দুর্যোগময়ী রাত্রি! আকাশ-

সমুদ্র-পৃথিবী অন্ধকারে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে প্রকাণ্ড মরণের করাল মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার তাড়নে প্রথমে আমাদের ঘরের জানালার কপাট খসে পড়ল, তারপর আর-একটি আচমকা ধাক্কায় মাথার উপরের টিনের ছাউনি হতে কয়েকখানি টিন চক্ষের নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হল। সাংঘাতিক বিপদ গণলাম। বাড়িতে আমরা তিনটি প্রাণী ও সেখানকার অধিবাসী একজন আধবয়সী ভৃত্য ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। ভৃত্যটি এ পর্যন্ত নানাকথা বলে আমাদের মনে সাহস যোগাচ্ছিল। হঠাৎ বাইরের চরের দিকে তাকিয়ে সে চিৎকার করে বলে উঠল: বেরিয়ে আসুন, বেরিয়ে আসুন, পুলিশথানার দিকে চলুন—একমুহূর্তও দেরি নয়। সীমাহীন শঙ্কায় আমাদের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, কী এক অজ্ঞাত ভয়ে সমস্ত শরীর থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে। যেদিকে সমুদ্রতীর তার বিপরীত দিকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম, ভৃত্যটিকে অনুসরণ করে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়িয়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম। মিনিট দশ-পনেরো পরে, বজ্র-বিদ্যুৎ-বৃষ্টিধারা কোনো কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করে, সিক্তদেহে থানার সম্মুখে এসে পৌঁছালাম। জায়গাটি অনেক উঁচু। সেখানে আমাদের মতো বিপদ্‌গ্রস্ত আরো অনেকগুলি মানুষ এসে জড়ো হয়েছে। থানার বড়বাবু সকলকে ঘরের প্রশস্ত বারান্দায় শান্তভাবে অবস্থান করতে বললেন। দূরে বাতিঘরে রক্তবর্ণ এক অদ্ভুত আলো জ্বলে উঠেছে—নিদারুণ বিপদের সংকেত। সমুদ্রে জলস্ফীতি, পর্বতাকার দু-তিনটি ঢেউ আসলেই চরটিকে—গোটা দ্বীপটিকে—একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আচম্বিতে পর্বতপ্রমাণ দুটি ঢেউয়ের প্রচণ্ড আবির্ভাব আমরা অনুভব করলাম, বিদ্যুতের শিখায় উন্মাদিনী সমুদ্রপ্রকৃতির তাণ্ডবনৃত্য পাংশু দৃষ্টিতে দেখে নিলাম। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চোখ বুজলাম। অকম্পিত চিত্তে সমুদ্রের ওই প্রলয়ংকর রূপ দেখবে এমন সাহস, মানসিক স্থৈর্য ও শক্তি কারো ছিল না।

নিদারুণ বিপদের মুখে

অনেকটা মূর্ছাহত অবস্থায় থানার বারান্দায় সমস্ত রাতটি কাটালাম। ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর হিম হয়ে গেছে। কখন সকাল হয়েছে জানতে পারিনি, সেই ভৃত্যের ডাকে চেতনা ফিরে এলো। তার মুখে শুনলাম, মাঝরাত্রেই ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হয়ে এসেছিল, বৃষ্টির প্রচণ্ডতাও কমে গিয়েছিল। কিন্তু ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের গোঙানি এখনও থামেনি। সূর্যের মুখ দেখা গেল, আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ক্ষণে ক্ষণে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। যা হোক, থানার আশ্রয় ছেড়ে সকালবেলা আমাদের পূর্বতন আশ্রয়ে ফিরে এলাম। ঘরের তিনটি দেয়াল খসে পড়েছে, একটিমাত্র দেয়াল কোনোরকমে দাঁড়িয়ে

পরের দিন সকালে

আছে। চরের দৃশ্যটি বীভৎস, অবর্ণনীয়। কত কত গোরু-মোষ-ছাগলের মৃতদেহ সেখানে পড়ে রয়েছে। জলের ধারে অনেকগুলি ভাঙা নৌকা ও জেলেদের শব ভেসে বেড়াচ্ছে। জেলেপাড়ার ছেলে-মেয়ে-পুরুষ-নারী বিপর্যস্ত চরটিতে উপস্থিত হয়েছে বাড়ি-না-ফেরা নিজেদের স্বামীপুত্রের সন্ধানে। কী অসহায় তাদের দৃষ্টি, কী মর্মচ্ছেদী তাদের বুকফাটা ক্রন্দন!

প্রকৃতি কতখানি নিষ্ঠুরা, কতখানি ভয়ংকরী হতে পারে এ ধারণা পূর্বে একেবারেই ছিল না। সেই করাল রাত্রিতে নিসর্গসংসারের অন্তরালস্থিত অন্ধ জড়শক্তির সর্ববিধ্বংসী ভীষণ রূপটি প্রত্যক্ষ করলাম।

উপসংহার

দুরবগাহ এই প্রকৃতির রহস্য। সে কখনো শান্তিময়ী—স্নেহশীলা জননীর মতো কোমলা, সুখদা, প্রাণদা; আবার, কখনো সে বিভীষিকা-ময়ী—দয়া নাই, মমতা নাই, নির্মমহৃদয়া। এই সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি মূর্তিতে আত্ম-প্রকাশ—'পাশাপাশি একঠাঁই দয়া আছে দয়া নাই'—এ কি দুই দেবতার লীলা-খেলা, না, একই দেবতার প্রাণলীলার দ্বৈত প্রকাশ, তা মানববুদ্ধির অগম্য।

সে যাক্। ঝড় থামল, সমুদ্র শান্ত হল, সোনালী রোদের ছোঁয়ায় পৃথিবীর মুখে আবার হাসি ফুটল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। সেই দিনটি অপরের আশ্রয়ে কাটিয়ে পরের দিন স্টীমারে চেপে চাটগাঁ-সদরের দিকে রওনা হলাম। বিপদ কাটলেও তার আতঙ্কটা কিন্তু মন থেকে মুছে ফেলতে পারিনি।

সে-কতকাল হল দ্বীপে বেড়াতে গিয়েছিলাম, কিন্তু এখনো মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগমুহূর্তে অতীতের সেই ঝটিকাক্ষুব্ধ রাত্রিটির ভয়াবহ অভিজ্ঞতার স্মৃতি মনে জাগে—তাকে কিছুতেই ভুলতে পারি না।

আমার কলেজ-জীবনের প্রথম দিনটি

[**রচনার সংকেতসূত্র**ঃ প্রারম্ভক ভূমিকা—মফস্বলের ছেলের স্বপ্ন—স্বপ্নের সাফল্য—কলেজ খোলার দিনটিতে বিচিত্র অনুভূতি—কলেজের প্রবেশপথে—ছাত্রদের প্রতি অধ্যক্ষ-মহাশয়ের সম্ভাষণ—ক্লাসরুমেঃ প্রথম ঘন্টা—ক্লাসরুমেঃ দ্বিতীয় ঘন্টা—তৃতীয় ঘন্টাঃ কৌতূহলী মন দিয়ে নানাকিছুর সঙ্গে পরিচয়সাধন—ক্লাসরুমেঃ চতুর্থ ঘন্টা—উপসংহার।]

একাদিক্রমে চার-চারটি বছর একই কলেজে কাটিয়ে দিলাম। আমার কলেজটি! নিবিড়তম পরিচয়সূত্রে তার সঙ্গে শতপাকে জড়িয়ে গেছি, এ মহাবিদ্যালয়ের প্রতিটি ধূলিবালিকেও যেন আমি চিনি। নিজের প্রতিটি

হৃৎস্পন্দনে আমার প্রিয় বিদ্যানিকেতনটির বিপুল স্পন্দন আমি নিরন্তর অনুভব করি। এখানে বহু সতীর্থের সঙ্গে অন্তরঙ্গ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে; বহু বিশিষ্ট অধ্যাপকের নিকট-সান্নিধ্যে এসেছি, তাঁদের মধুময় স্নেহস্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছি; বিচিত্র বিদ্যার আলোকে সাধ্যমতো অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করবার চেষ্টা করেছি, আর সঞ্চয় করেছি অনেক অভিজ্ঞতা—বৈচিত্র্য তার কম নয়। এখানে আমার কলেজ-জীবনের শুরু এবং এখানেই তা সমাপ্তির মুখে। আজ চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর নির্বাচনী পরীক্ষায় বসে কলেজে প্রথম দিনটির কথা স্মরণ করতে হচ্ছে—অতীত স্মৃতির রোমন্থন। অনেক-পিছনে-ফেলে-আসা দিনটিকে অবচেতনের মৌন থেকে চেতনলোকের মুখরতায় ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রায়-বিস্মৃতকে স্মৃতির পটে কতখানি উজ্জ্বল করে ধরতে পারবো, জানিনে। তবু চেষ্টা করবো।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

* * *

স্কুলজীবনটা কেটেছে একেবারে পাড়াগাঁয়ে, কলকাতা থেকে চারশ মাইল দূরে পূর্ববঙ্গের এক অখ্যাত পল্লীর নিভৃতিতে। নিজ গ্রামের স্কুলে আট বছর পড়া শেষ করে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলাম, পরীক্ষায় কৃতকার্য হলাম। প্রথম-বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে গেজেটে যাদের নাম উঁচুতে মুদ্রিত হয়েছে, সেখানে নিজের নামটি দেখে অশেষ আনন্দে এবং কিছুটা গর্বে মনটা ভরে উঠল। তারপর আমার উচ্চশিক্ষাগ্রহণ-বিষয়ে অনেক গবেষণা হলো, মফস্বল কলেজে পড়বার তেমন কোনো অসুবিধে ছিল না। কিন্তু বরাবরই আমার স্বপ্ন—কলকাতার কোনো একটি বড়ো কলেজে পড়বো। কলকাতায় পড়বার সুযোগটিকে পৃথিবীতে এক দুর্লভ বস্তু বলে মনে করে এসেছি। এই মহানগরী কী এক আশ্চর্য যাদুশক্তিতে আমাকে যেন তীব্রভাবে আকর্ষণ করতো। আমার শুভার্থী স্কুলের মাস্টারমশাইদের অনুরোধেই বোধ করি বাবা আমাকে কলকাতা পাঠাতে বেশি আপত্তি জানালেন না।

মফস্বলের ছেলের স্বপ্ন

মফস্বলের ছেলে। বিশাল নগরীতে এলাম। জুনের শেষাশেষি যথাসময়ে এক শুভদিনে কলেজে ভর্তি হলাম। ক্লাস আরম্ভ হতে এখনো সাত-আটদিন বাকী। এ কয়টা দিন কিছুতেই যেন কাটতে চায় না, দিনগুলিকে অত্যন্ত মন্থর মনে হতে লাগলো; ভাবতাম, তাদের চলার গতি কেন দ্রুততর হয় না। রোজ একবার করে কলেজে যেতাম, অগাধ ঔৎসুক্য নিয়ে নোটিশবোর্ডের দিকে তাকাতাম—দেখতে হবে, কোন্‌দিন থেকে ক্লাস সুরু হচ্ছে, রুটিন টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা।

স্বপ্নের সাফল্য

অবশেষে সেই বহুপ্রত্যাশিত দিনটি এলো। ফার্স্ট ইয়ার ক্লাস খুলছে সকাল সাড়ে দশটায়। সেদিনকার মনের অবস্থাটি আজো বেশ-কিছুটা স্মরণ করতে পারি, কিন্তু ভাষার মাধ্যমে তাকে যথাযথ প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। সে এক বিমিশ্র অনুভূতি। জীবনে এই প্রথম নতুন পথে পা বাড়াচ্ছি, এতকালের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। গ্রামের স্কুল থেকে একেবারে মহানগরীর মহাবিদ্যালয়ে—আনন্দ, কৌতূহল, কেমন একটা অজানা শঙ্কা ও উদ্বেগ, মনের অদ্ভুত একপ্রকার অস্বস্তি—সবকিছু জড়িতমিশ্রিত হয়ে আমাকে অস্থির চঞ্চল করে তুলল। আগে কখনো কলকাতায় আসিনি, নাগরিক চালচলন একেবারে অজ্ঞাত ; গায়ে এখনো পাড়াগাঁর গন্ধ, ভাষার ছাঁদ সম্পূর্ণ পূর্ববঙ্গীয়, পোশাক-পরিচ্ছদও তেমনি গ্রাম্য। অপরিচিত পরিবেশে গিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে কেমন করে কথা বলবো, অধ্যাপকমশাইরা কোনোকিছু জিজ্ঞাসা করলে কী তার উত্তর দেব, ওই উত্তর ইংরেজীতে দিতে হবে, না, বাংলায়, বিদেশী ভাষায় বক্তৃতা যদি বুঝতে না পারি তাহলে কী অবস্থাটি দাঁড়াবে—এ সমস্ত বিষয় ভাবতে ভাবতে অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো যথাসময়ে কলেজের সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম।

কলেজ খোলার দিনটিতে বিচিত্র অনুভূতি

কী প্রকাণ্ড দালান, কত উঁচুতে উঠে গেছে বড়ো বড়ো থামগুলি, কী প্রশস্ত সিঁড়ি, কী চওড়া বারান্দা! কলেজবিল্ডিং-এর বিশালতা ও গাম্ভীর্য আমাকে অভিভূত করে ফেলল। প্রবেশপথে ক্ষণকাল আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, বুকের ভেতরটা যেন কেঁপে উঠল। তারপর একবার এদিকওদিক তাকালাম। অসংখ্য ছাত্র গিজ্-গিজ্ করছে, অনেকেরই হাবভাবে একটা চাঞ্চল্যের প্রকাশ, যেন অকারণ ব্যস্ততা। একটিও চেনামুখ চোখে পড়ল না। তা কী করে হবে, এ-তো আমার গ্রামের ইস্কুলটি নয়! আজ যথার্থই উপলব্ধি করলাম : 'The old order changeth yielding place to new'।

কলেজের প্রবেশপথে

ঘুরানো সিঁড়ি দিয়ে অগণিত ছাত্র ওঠানামা করছে, আমি ধীরে ধীরে দেয়াল ঘেঁষে দোতলায় উঠে গেলাম। নোটিশবোর্ডে-টাঙানো রুটিনটি দেখে নিলাম, তাতে ক্লাসরুমের নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। ক্লাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, কয়েকজন বিদ্যার্থীর মুখে শুনলাম, আজ প্রথমদিন প্রিন্সিপ্যালমশাই নবাগত ছাত্রদের কিছু বলবেন। একটি প্রশস্ত ঘরে তাদের সঙ্গে প্রবেশ করলাম। দু-এক মিনিট পরে আমাদের অধ্যক্ষমশাই এলেন। আমরা সকলে উঠে দাঁড়ালাম,

ছাত্রদের প্রতি অধ্যক্ষ-মশাইয়ের সম্ভাষণ

তিনি চেয়ারে বসলে আমরাও বসলাম। তাঁর প্রসন্ন মুখ, সৌম্য মূর্তি, গৌর বর্ণ, পরণে খদ্দরের ধুতিপাঞ্জাবী। তাঁকে দেখামাত্রই শ্রদ্ধায় সকল মন ভরে উঠল। তিনি দুই চোখ বুজে প্রথমে উপনিষদের দু-একটি শ্লোক উদাত্ত সুরে আবৃত্তি করলেন। একটি শ্লোক—'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়, আবিরাবীর্ম-এধি'—এখনো আমি স্পষ্ট স্মরণ করতে পারি। একটা গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি হল। স্নেহসম্ভাষণ জানালেন তিনি, কলেজজীবনের গুরুদায়িত্ব আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারের পার্থক্য বুঝিয়ে দিলেন, ছাত্রজীবনে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা কতখানি প্রয়োজন, সংক্ষেপে ও প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে তা বোঝালেন। সর্বশেষে তিনি বললেন : ছাত্রসম্প্রদায়ই কলেজের গৌরব, ছাত্রসম্প্রদায় দেশের গৌরব—আমরা যেন সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি। আমরা সকলে পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জন করি, এ-ই তাঁর অন্তরতর কামনা। পরম শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যক্ষমশাইয়ের উপদেশ কদাপি ভুলবার নয়।

মনের অস্বস্তিকর ভাব এতক্ষণে অনেকখানি কেটে গেছে। এবার ক্লাসে। সিভিক্স-এর ক্লাস। প্রবেশ করে দেখি, রুমটি একেবারে ভর্তি হয়ে গেছে, পেছন দিকের একটি বেঞ্চে স্থান করে নিলাম। পৌরবিজ্ঞানের অধ্যাপক এলেন। অধ্যাপকবৃন্দের একটি বিশেষ মূর্তি মনে মনে কল্পনা করে নিয়েছিলাম—যেমন পাণ্ডিত্যের তেমনি গাম্ভীর্যের প্রতিমূর্তি তাঁরা; অনেকখানি দূরের মানুষ, তাঁদের ভাবভঙ্গি স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ আলাদা জগতের অধিবাসী। কিন্তু আমাদের পি. এস্.-এর মূর্তির সঙ্গে আমার সেই কল্পিত মূর্তির মিল কোথাও দেখলাম না। তাঁর চেহারায় তেমন ভারি গাম্ভীর্য নেই, সাজপোশাকে বিন্দুমাত্র পারিপাট্য নেই, মাথার চুলগুলো পর্যন্ত তিনি ভালো করে আঁচড়ে আসেননি, ওদিকে যেন তাঁর এতটুকু খেয়াল নেই। লক্ষ্য করলাম, তাঁর চোখে বুদ্ধির শাণিত দীপ্তি। নিজের আসনটিতে বসে, ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে একটুখানি হেসে রেজিস্টার-খাতাখানি খুলে রোল্‌কল করলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের নাম বলে যেতে লাগলেন। 'ইয়েস্ স্যর', 'প্রেজেণ্ট স্যর্', 'ইয়েস্ প্লিজ' ইত্যাদি ধ্বনি কানে কেমন নতুন শোনাতে লাগল। ইংরেজী বক্তৃতা বুঝতে পারব কিনা, এ বিষয়ে মনে একটা ভয় ছিল। সেই ভয়টিও দূর হলো। আস্তে আস্তে তিনি কথা বলে গেলেন, ভাষা একেবারেই সহজ, ছোট ছোট ইংরেজী বাক্য, কী সুন্দর উচ্চারণ! প্রথম দিনটিতে তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল পৌরবিজ্ঞানপাঠের প্রয়োজনীয়তা। চল্‌তি দুনিয়াতে এ শাস্ত্রটি এবং

ক্লাসরুমে : প্রথম ঘণ্টা

ইকনমিক্স-পলিটিক্স ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে যে বিস্তর অসুবিধা, তা যথাসাধ্য তিনি আমাদের বোঝালেন। মাঝে মাঝে তিনি ইংরেজীর পরিবর্তে বাংলায় কথা বললেন। কিন্তু অবাঙালী ছাত্ররা এতে আপত্তি জানাল। তখন তিনি বললেন, বাংলা দেশে যারা আসবে তাদের বাংলা শিখে নেওয়াটা বাঞ্ছনীয়। তারপর একটু হাসি, আবার ইংরেজী বক্তৃতা শুরু। খুব ভালো লাগল। মনের স্বাচ্ছন্দ্য প্রায় ফিরে পেলাম।

দ্বিতীয় ঘণ্টায় ইংরেজীর ক্লাস—পদ্যের। ইংরেজীর অধ্যাপক এস্. কে. বি. ক্লাসে এলেন। পরনে কোটপ্যাণ্ট, তাঁর চালচলনে একটা আভিজাত্যপূর্ণ গাম্ভীর্য লক্ষ্য করলাম। চেয়ারে বসলেনই না, দাঁড়িয়েই রোল্‌কল করলেন। চশমাটি মুছে আবার চোখে লাগালেন। পাশের দু'একজন ছাত্রের মুখে শুনলাম, ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক-হিসেবে সারা কলকাতায় তাঁর অশেষ খ্যাতি। শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। মনে পড়ছে,

ক্লাসরুমে : দ্বিতীয় ঘণ্টা

সেদিন তিনি আমাদের পড়াতে আরম্ভ করেছিলেন বিখ্যাত কবি ওয়াল্টার ডি. লা. মেয়ার-এর ছোট্ট একটি কবিতা। সামান্য কবিপরিচিতি দিয়ে কবিতাটির মূলবক্তব্য বলে গেলেন। তারপর কোন্ গুণে কাব্যকবিতা উৎকর্ষ লাভ করে তা সংক্ষেপে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কবিতা সম্পর্কে একটা নতুন দিক আমার কাছে উন্মোচিত হল। তাঁর মুখে এমন-সব কথা শুনলাম, স্কুলের শিক্ষকদের মুখে যা কখনো শুনিনি। ইংরেজীর অধ্যাপকের বলবার বিশেষ ভঙ্গি, বক্তৃতার ছন্দোময় বাণীবিন্যাস, সুন্দর আবৃত্তি আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করল। হয়তো সেদিন অনেককিছুই বুঝিনি, তথাপি তাঁর বক্তৃতা শুনে গভীর আনন্দ পেয়েছিলাম, তা আজ অবধি স্মরণ করতে পারি।

পরের ঘণ্টা। কোনো ক্লাস ছিল না রুটিনে। ইচ্ছে হলো, এ অবকাশে চারদিকে ঘুরে কলেজের সবকিছু একবার দেখে নিই। তিনতলায় উঠলাম। সেখানে প্রকাণ্ড লাইব্রেরীঘর। অসংখ্য আলমারি পর পর সাজানো, তাতে কত শত বিচিত্র বই। এত বই জীবনে কোনোদিন চোখে দেখিনি। অবাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলাম—কী বিশাল জ্ঞানসমুদ্র!

তৃতীয় ঘণ্টা : কৌতূহলী মন নিয়ে নানা কিছুর সঙ্গে পরিচয়সাধন

লম্বা এবং বড়ো অনেকগুলি টেবিল পাতা রয়েছে। বহু ছাত্র বেঞ্চিতে বসে, লম্বা টেবিলে বই রেখে নিঃশব্দে পড়ছে, কেউ-বা নোট করে নিচ্ছে। দেখে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো। আমি নিজে বই পড়তে খুব ভালোবাসি, কিন্তু গ্রামে থাকতে

তেমন ভালো বই পড়বার সুযোগ কখনো ঘটেনি। মনে মনে বললাম, এবার বই পড়ার সুযোগ ছাড়ব না। গ্রন্থাগারিকের কাছে গেলাম, তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের কখন বই দেওয়া হবে। উত্তর এলো, যথাসময়ে ক্লাসে নোটিশ পাঠানো হবে—বই দেওয়ার কার্ড এখনো প্রস্তুত হয়নি।

তিনতলায় লাইব্রেরী, ক্লাসরুমও রয়েছে সাত-আটটি। চারতলায় গেলাম। সেখানে সায়েন্সের ল্যাবোরেটরি—বিচিত্র যন্ত্র, বিচিত্র শিশিবোতল। দেখবার কৌতূহল হলো, কিন্তু ওখানে আমার প্রবেশ নিষেধ, আমি আর্টস্-এর ছাত্র। সবকিছু দেখা দু-চার মিনিটের। তারপর একেবারে নীচের তলায় নেমে এলাম। বড়ো একটি উঠোন পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে যে-ঘরটি, সেটি ছাত্রদের কমন-রুম। কয়েকজন করে মিলে এক-একটি দল গড়ে উঠেছে। টেবিলের উপর বাংলা-ইংরেজি নানারকমের পত্রিকা ছড়ানো রয়েছে। কেউ পাতা উল্টোচ্ছে, কেউ বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছে। রাজনীতির চর্চাও কানে এলো। এখানে অবাধ স্বাধীনতা, শাসন জানাবার কেউ নেই। খুশিমতো বিশ্রাম করা চলে, পত্রিকা পড়া চলে, ইচ্ছে করলে খেলায়ও যোগদান করা চলে—ক্যারম্, পিঙ্-পঙ্, টেবিল-টেনিস্ ইত্যাদি। পড়াশুনার সঙ্গে আমোদপ্রমোদ, যেন হাওয়াবদলের মতো। এই প্রথম আস্বাদ পেলাম স্বাধীন জীবনের। পরমুহূর্তে ভাবলাম, এর দায়িত্বও তো কম নয়।

তার পরের ঘণ্টা, অর্থাৎ চতুর্থ ঘণ্টাটি। এবার বাংলার ক্লাস। প্রথম দুটি ঘণ্টা ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা শুনেছি, এবার মাতৃভাষায় বক্তৃতা শুনবো। এটাও একটা কম স্বস্তি ও কম আনন্দের কথা নয়। অপরাপর ছাত্রদের মধ্যেও সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের একটি ভাব লক্ষ্য করলাম। ইংরেজী আমরা কতখানিই বা বুঝি! অনেক কথা কানে যায়, মনে প্রবেশ করে সামান্য। কিন্তু বাংলাভাষার সঙ্গে আজন্ম পরিচয়, সুতরাং মাস্টারমশাইদের কথা বুঝতে তেমন অসুবিধে হয় না। সিভিক্স ও ইংরেজীর অধ্যাপক—যাঁরা আগে পড়িয়ে গেলেন—তাঁরা প্রৌঢ়ত্বের সীমান্তবর্তী। বাংলার অধ্যাপক ক্লাসে প্রবেশ করলে দেখলাম তিনি তরুণ, বয়সে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের ওদিকে কিছুতেই যেতে পারে না। দূর থেকেই সজীব প্রাণের—একটা অনির্বাচ্য তারুণ্যের স্পর্শ পেলাম।

ক্লাসরুমে : চতুর্থ ঘণ্টা

যথারীতি রোল্‌কল্ শেষ হল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারটা একটুখানি পাশে সরিয়ে রাখলেন তিনি। ক্লাসের সমস্ত ছাত্রদের দিকে একবার দৃষ্টি প্রসারিত করে ধরলেন। কী উজ্জ্বল তাঁর চাওনি, চোখেমুখে অসাধারণ প্রতিভার

ছাপ। দেখেই তাঁকে কেমন যেন স্বতন্ত্র মনে হলো। অধ্যাপক আর. এন. জি-র মুখ থেকে এবার কথা বেরুলো। বললেন, আজ আমি তোমাদের একজন আধুনিক বাঙালী কবির কবিতা পড়াবো। এই কবির নাম তোমাদের সকলের জানা—নজরুল ইসলাম্। কবিতার নাম—'দারিদ্র্য'। আশা করি, তোমাদের সকলের ভালো লাগবে। বক্তৃতা আরম্ভ করলেন, নজরুলের ব্যক্তি-জীবন ও কবিজীবনের পরিচয় দিলেন, যে-যুগে তাঁর আবির্ভাব সেই যুগটির সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন ; সাহিত্যের সঙ্গে যুগের সম্পর্ক কী, তা বোঝালেন ; নজরুল এবং কয়েকজন সমসাময়িক আধুনিক কবির রচিত নানা কবিতার অংশ অনর্গল আবৃত্তি করে যেতে লাগলেন। একটুও থামতে হচ্ছে না, একটুও ভাবতে হচ্ছে না, তাঁর বক্তৃতাকে ঝর্ণার অনিরুদ্ধ স্রোতোধারা বলে মনে হলো, যেমন গতিশীল তেমনি তরঙ্গায়িত ও সংগীতমুখর। মাতৃভাষার উপর তাঁর আশ্চর্য দখল, ভাষাকে পোষাপাখীর মতো তিনি খেলাচ্ছেন—বাংলাভাষা কতখানি সুন্দর হতে পারে তা এই সর্বপ্রথম জানলাম।

দ্রুতগতিতে তিনি কথা বলে যাচ্ছিলেন, একটি ছাত্র মাঝখান থেকে উঠে বললে : একটু আস্তে স্যর্, বুঝতে পারছিনে। অধ্যাপক আর. এন. জি. হেসে উত্তর করলেন—'কবিতা বুঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে'। কথাগুলির তাৎপর্য সেদিন কিছুই বুঝিনি, পরে চারবছর ধরে তাঁর কাছে পড়ে ওই উক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছি। ইংরেজী-সাহিত্যের অধ্যাপকের বক্তৃতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল, আর বাংলাসাহিত্যের এই অধ্যাপকের বক্তৃতা আমাকে সঞ্জীবিত করল। সমস্ত ক্লাস একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেছে, সকলে নিশ্চল প্রজাপতির মতো নিঃশব্দে বসে রয়েছে, সকলেরই যেন সম্মোহিত একটা অবস্থা। চল্লিশ মিনিট কখন কী করে কেটে গেল বুঝতে পারিনি, বুঝতে পারলাম যখন ঢঙ্ করে ঘণ্টা বাজল। একটি সুন্দর স্বপ্ন ভেঙে গেল—অস্বস্তি বোধ করলাম, আরো অনেকক্ষণ পরে ঘণ্টা বাজলে বোধ করি আমরা সকলে খুশি হতাম। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে রসবোধের এমন বিস্ময়াবহ মিশ্রণ সত্যই দুর্লভ—বাংলার অধ্যাপকমশাইকে সশ্রদ্ধ চিত্তে মনে মনে প্রণাম জানালাম। আবার কোন্ দিন তাঁর ক্লাস পাব তা ভাবতে ভাবতে রুম্ থেকে বেরিয়ে এলাম।

ছুটির ঘণ্টা বাজল, সেদিন আর ক্লাস হল না। বাড়ীতে যখন ফিরলাম তখন মন হাল্কা, দুর্ভাবনার লেশমাত্র নেই। আমার কলেজকে অনেকখানি ভালোবেসে ফেললাম।

* * *

কলেজে প্রথম দিনটি। সুদীর্ঘ চারটিবছর পরে আজ তাকে স্মৃতির আলোকে দেখছি। প্রথমদিনের অভিজ্ঞতা অনেক ফিকে হয়ে এসেছে, তাকে উজ্জ্বল করে ফুটাতে পারলাম না। অপর-কোনো দিনের ঘটনা হলে হয়তো-বা উপরে বর্ণিত কথাগুলিও স্মরণে আনতে পারতাম না। প্রত্যেকটি দিনের কথা আমরা মনে রাখি না—কেবল কয়েকটি বিশেষ দিনই স্মরণীয়। কলেজজীবনের প্রথম দিনটিতে একটি কথা বারবার মনের কোণে উঁকি দিচ্ছিল—মহাবিদ্যালয়ে নিজের নবলব্ধ স্বাধীনতার কথা। ইস্কুলে চতুর্দিকে শাসনের রক্তচক্ষু, এখানে কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। ইচ্ছে করলে ক্লাসে আমি না যেতে পারি, লেক্‌চার শোনার বদলে কমনরুমে গিয়ে খেলতে পারি, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বসে গল্পগুজবে সময় কাটিয়ে দিতে পারি ; অথবা ক্লাসে গিয়ে অমনযোগী হলেও কেউ আমাকে একটি কথাও বলবে না। ক্ষণপরে ভাবলাম, একে তো স্বাধীনতা বলে না, এর নাম উচ্ছৃঙ্খলতা। যেখানে সত্যকার স্বাধীনতা সেখানে রয়েছে অনেক কর্তব্য, অনেক দায়িত্ব। উপলব্ধি করলাম, বাইরের কারো কাছে জবাবদিহি করতে না হলেও নিজের বিবেকবুদ্ধির কাছে একদিন সকলকেই জবাবদিহি করতে হয়—অনুশোচনার হাত থেকে মুক্তি কারো নেই। অঙ্গীকার করলাম, স্বাধীন জীবনের অপব্যবহার করবো না—ছাত্র-জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলব, মানুষ হব। নবতর ও মহত্তর জীবনের দুয়ার আমার কাছে খোলা, সেখানে প্রবেশ করবার সম্মানিত অধিকার আমি পেয়েছি, স্বেচ্ছায় সে-অধিকার থেকে নিজেকে বিচ্যুত করলে জীবনে ধিক্কার ছাড়া কিছুই আর মিলবে না।

উপসংহার

সেদিনের সেই অঙ্গীকার আজো প্রাণপণে রক্ষা করে চলছি। ছাত্রজীবনের গুরুতর দায়িত্ব কদাপি ভুলিনি, অধ্যাপকমশাইদের উপদেশনির্দেশ কখনো লঙ্ঘন করিনি। প্রথমদিনটিতে অধ্যক্ষমশাই বলেছিলেন, ছাত্রদলই কলেজের গৌরব, দেশের গৌরব,—তাঁর সেই মহতী বাণী এখনো আমার কাণে বাজছে।

যে-বাংলা বইখানি আমার খুব ভালো লাগে

[**রচনার সংকেতসূত্র :** প্রারম্ভিক ভূমিকা—আমার প্রিয় বইখানির নাম : 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'—অধুনা গ্রামীণ সংস্কৃতি ক্ষয়িষ্ণুতার মুখে—পল্লীগীতিকার স্বাদ অভিনব—পল্লীগাথার সাহিত্যিক সৌন্দর্য : কবির কঠোর সংযম—এগুলিতে দৃশ্যকাব্যসুলভ নাটকীয় গুণ—নাটকীয় সৌন্দর্যের দৃষ্টান্ত : মহুয়া-মলুয়া-চন্দ্রাবতী—গীতিকাসাহিত্যের লিরিক আবেদন—চরিত্রচিত্রণে কবির আশ্চর্য কুশলতা—মানবীয় রসের অপূর্ব উৎসার—ভাষা ও কবিত্বের সৌন্দর্য।]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

কোনো একটি বই পড়ে—ভালো লেগেছে, এই কথাটি বলা যতখানি সহজ, ভালো-লাগার হেতু নির্দেশ করা ততখানি সহজ নয়। ভালো-লাগা ব্যাপারটি যে ব্যক্তিগত রুচির দ্বারা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তথাপি এ সত্যটিও অনস্বীকার্য যে, ভালো বইয়ের মধ্যে এমন একটি অনির্বাচ্য গুণ রয়েছে যা সহৃদয় পাঠকচিত্তের উপর—অনুশীলিত মনের উপর—প্রভাব বিস্তার করবেই, তাকে সহজ স্বীকৃতি জানাতেই হবে। দেখতে পাই, মানুষের রুচি বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও উত্তম শিল্প-সৃষ্টির রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে রুচির ওই ভিন্নতা প্রায়শ তেমন কোনো বিরোধ বাধায় না; সাহিত্যের ভোজে বসে, কম হোক বেশি হোক, রসিকজনেরা আনন্দ আহরণ করে।

পড়ে অশেষ আনন্দ পেয়েছি—সত্যি আমার খুব ভালো লেগেছে—এরূপ একখানি বইয়ের নাম আমি উল্লেখ করব। এবং এও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে-বইখানি আমাকে আনন্দ দিয়েছে, অপর দশজন রসজ্ঞ পাঠককেও তা আনন্দ দেবে। বইখানি কেন আমার ভালো লেগেছে [আগেই বলেছি, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া একটু কঠিন] তা-ও আমি সাধ্যমতো বলতে চেষ্টা করব, তার যৌক্তিকতা সুধীজনেরই বিচার্য।

আমার প্রিয় বইখানির নাম : 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'

ভূমিকার পালা শেষ হল। এবার আমার প্রিয় বইখানির নাম বলি—'মৈমনসিংহ-গীতিকা' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদিত। পূর্ববঙ্গের কয়েকটি মনোজ্ঞ পল্লীগাথা এতে সংকলিত হয়েছে। এই গাথাগুলি বাংলার লোকসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। এতকাল গেঁয়ো মানুষের মুখে মুখে এগুলি প্রচলিত ছিল, আচার্য দীনেশচন্দ্রের অক্লান্ত উদ্যমে কতিপয় বৎসর পূর্বে এসব গীতিকা সংগৃহীত হয়ে ছাপার অক্ষরের মাধ্যমে দেশের শিক্ষিত-

সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছে। দীনেশচন্দ্র পল্লীবাংলার এক অমূল্য সাহিত্যসম্পদ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন, এজন্য তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ।

অধুনা বাংলার সমাজজীবনের সংহতি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে, পল্লীর সঙ্গে আমাদের যোগসূত্রটি ছিন্নপ্রায়। তাই এককালে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে-সব চিত্তহারী লোকগীতিকা আমরা শুনতে পেতাম, বর্তমানে তা আর শুনতে পাই না —নাগরিক সংস্কৃতি গ্রামীণ সংস্কৃতিকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছে। ফলে লোকসাহিত্যের ধারাটি উপেক্ষার মরুপ্রান্তরে ক্রমেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। শহুরে সভ্যতার আক্রমণ হতে আমরা আত্মরক্ষা করতে পারছি না, এ কম পরিতাপের কথা নয়। একালের গীতি নাগরিক গীতি, একালের সাহিত্য নাগরিক সাহিত্য। ছোটবড়ো শহরের বাইরে যে-বিশাল জনপদ পড়ে রয়েছে তার হৃৎস্পন্দন এ সাহিত্যে শ্রুতিগোচর হয় না, তাই প্রাণের পিপাসাও সম্পূর্ণ মিটে না। পল্লী ও নগর—পরস্পর কাছে থেকেও এরা কত দূরে! উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের কথাটি ভাবলে মন বেদনায় ভরে ওঠে।

অধুনা গ্রামীণ সংস্কৃতি ক্ষয়িষ্ণুতার মুখে

শহরবাসী হয়েও পল্লীকে আমি ভালোবাসি, আমার পূর্ববাংলার গ্রামাঞ্চলকে আমি ভুলতে পারি না। সেই গ্রামগুলির সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার পাশে নাগরিক জীবনের পরিবেশটি একান্তই কৃত্রিম বলে মনে হয়। এখানে চতুষ্পার্শ্বের কৃত্রিমতার চাপে প্রাণটা যখন হাঁপিয়ে ওঠে তখন অবসরক্ষণে চোখ বুজে আমি দুদণ্ড পল্লীর কথা ভাবি, পল্লীর বুকে স্বপ্নপ্রয়াণ করি, মনে কেমন একটা শান্তি পাই—স্নিগ্ধ সুখস্পর্শের শান্তি। বোধকরি আমার এই সহজাত পল্লীপ্রীতিই আমাকে পূর্ববাংলার গ্রাম্য গীতিকাগুলির এতখানি অনুরাগী করে তুলেছে। সত্যই, পূর্ববঙ্গগীতিকার আকর্ষণ আমার কাছে অত্যন্ত প্রবল। এমন কি, সাম্প্রতিক কালের বড়ো সাহিত্যশিল্পীর লেখা বই হাতের কাছে থাকতেও, সময় পেলে, আমি এই গীতিকাসাহিত্যের মধ্যে মনকে ডুবিয়ে দিই, অনাবিল আনন্দে স্নাত হই।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য বহুগুণান্বিত। বিচিত্র তার প্রসাধনকলা বা অলংকরণসজ্জা, তার কল্পনার পরিধি বিস্তৃত, জীবনজিজ্ঞাসা গভীর ও জটিল, মননের ঐশ্বর্যে সে দীপ্ত, তাঁর বাচনভঙ্গিতে চমকপ্রদ কত নৈপুণ্য, ভাষায় কত বর্ণাঢ্য শিল্পসুষমা! এ সাহিত্য যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের সকলেই শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত, তাঁরা আত্মসচেতন শিল্পী। একালের কাব্যকবিতা ইত্যাদির বিশেষ একটি স্বাদ ও সৌন্দর্য রয়েছে। আমি যে-গীতিকাসাহিত্যের কথা উল্লেখ করেছি, তার স্বাদ ও

সৌন্দর্য কিন্তু এর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উচ্চকোটির সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও প্রকাশ-ভঙ্গির সঙ্গে এসব লোকগীতিকার বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গির মিল কোথাও চোখে পড়ে না। এই গীতিকাগুলি পল্লীর নিরক্ষর কৃষককবির রচিত। শিল্পীহিসাবে কেউ তাঁরা আত্মসচেতন ছিলেন না, কবিখ্যাতি তাঁদের প্রলুব্ধ করেছে বলে মনে হয় না। তাঁরা কখনো উচ্চশিল্প-নৈপুণ্য অনুশীলন করেননি—হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতিকে লৌকিক ছন্দে আড়ম্বরহীন ভাষায় প্রকাশ করেছেন। পল্লীর নরনারীর অন্তরের যে-মাধুর্যের ধারাটি অনুত্তরঙ্গ স্রোতস্বিনীর মতো দুঃখদারিদ্র্যের উপলখণ্ডের ভিতর দিয়ে বয়ে চলছিল, পল্লীর মানবমানবীর কারুণ্যমিশ্র যে-মধুময় হৃদয়রহস্য সুর ও ছন্দের অপেক্ষা করছিল, সেই হৃদয়মাধুর্য, সেই হৃদয়রহস্যই এইসব কৃষককবিদের কবিতার প্রধান উপজীব্য। পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে পল্লীর মানুষকে একসূত্রে গেঁথে নিয়ে পল্লীর ভাষাতেই তাঁরা গান বেঁধেছেন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। শিল্পের চাতুর্য তাঁরা শেখেননি, তাই তাঁদের রচনায় এতটুকু কৃত্রিমতার স্পর্শ নেই। জননীর স্নেহাঞ্চলাশ্রয়ী শিশুর মুখের অস্ফুট কাকলি যে-কারণে আমাদের মনোহরণ করে, ঠিক সেই কারণে নিরক্ষর গ্রাম্যকবিদের রচিত গাথাগুলি আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র বিষয়বস্তুর মাধুর্য ও প্রকাশভগির সহজ সৌন্দর্য দৃষ্টি এড়াবার নয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হৃদয়ভাব ও ভাষার সঙ্গে বয়স্ক মানুষের হৃদয়ভাব ও ভাষার যে-পার্থক্য, উক্ত লোকগীতিকার সঙ্গে মধ্যযুগ ও বর্তমান যুগের উচ্চ-কোটির সাহিত্যের পার্থক্যটি তদ্রূপ। গীতিকাগুলি যেন গ্রাম্যপ্রকৃতির দান, এবং এখানেই তার লক্ষণীয় বিশিষ্টতা। যা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান, তাকে কি আমরা সহজে উপেক্ষা করতে পারি? পূর্ববাংলার 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' সাহিত্য-সৃষ্টি-হিসাবে উপেক্ষণীয় নয়।

পল্লীগীতিকার স্বাদ অভিনব

এই পল্লীগাথাগুলির সাহিত্যিক সৌন্দর্য লক্ষ্য করবার মতো। কাব্যবোধ যাঁদের রয়েছে তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন, এসব গীতিকার মাধ্যমে পল্লীকবিরা আমাদের একাধারে পরিবেশন করেছেন আখ্যানকাব্য, নাটক ও গীতিকবিতার রস। আখ্যানকাব্যের বিশেষত্ব তার কাহিনীর অবিচ্ছিন্ন গতি, ঘটনার সুসংবদ্ধ বিন্যাস। এখানে অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণার এতটুকু অবকাশ নেই, কোথাও থেমে কবির এদিক-ওদিক তাকাবার সময় নেই; কেননা, তাঁর আসল কাজ ঘটনাবর্ণনার সাহায্যে কাহিনীটিকে এগিয়ে দেওয়া। আখ্যান-কাব্যের লক্ষণীয় গুণ—বর্ণনার ভিতরে কঠোর একটা সংযম। এই সংযম

পল্লীগাথার সাহিত্যিক সৌন্দর্য: কবির কঠোর সংযম

সুস্পষ্ট চোখে পড়ে পল্লীগাথাগুলিতে। আপনারা অনেকেই মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে পরিচিত। সেখানে দেখবেন, কাহিনীর অবিচ্ছিন্ন গতির বিষয়ে কবিরা মোটেই সচেতন নন, সংযমশিক্ষা তাঁদের তেমন ছিল বলে মনে হয় না। তাই যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন মঙ্গলকাব্যের কবিদল সেখানে অবান্তর প্রসঙ্গের মধ্যে পদক্ষেপ করেছেন। এতে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, রসভঙ্গ হয়। অথচ নিরক্ষর কৃষককবিরা এ বিষয়ে কত সচেতন! তাঁদের বর্ণিত কাহিনীতে কোনো রকমের আকস্মিক উৎপাত নেই, গল্পাংশের স্বচ্ছন্দ গতি কোথাও ব্যাহত হয়নি—গল্প বলার কৌশলটি তাঁরা বেশ আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। আমি এখানে তিনটি-মাত্র গাথার নামোল্লেখ করছি—'মহুয়া', 'মলুয়া', 'চন্দ্রাবতী'। এই তিনটি পল্লীগাথায় আপনারা এমন কোনো ঘটনার বর্ণনা পাবেন না, যা পড়ে এতটুকু অবান্তর বলে মনে হবে। গল্পের স্রোত এখানে নির্ঝরিণীর মতো নির্বাধ গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। ঘটনার অখণ্ডতা, কাহিনীর নিটোল সমগ্রতা গীতিকাগুলির গৌরব বাড়িয়েছে।

এগুলিতে দৃশ্যকাব্যসুলভ নাটকীয় গুণ

তারপর গীতিকাসাহিত্যের নাটকীয় গুণ। 'এপিক'-জাতীয় রচনায় আমরা ঘটনাকে পাই বর্ণনার মাধ্যমে, কিন্তু নাটকে ঘটনাগুলিকে আমরা চোখের সম্মুখে জীবন্তভাবে দেখি—যেহেতু নাটক দৃশ্যকাব্য। নাটকের আরো একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ঘটনার আকস্মিকতার কথাই বলছি। যাকে নাটকীয় পরিস্থিতি বলা হয় তা অচিন্তিতপূর্ব, একেবারে আকস্মিক। ঘটনার কার্যকারণ-সম্পর্কের সূত্রটি হঠাৎ ছিন্ন হয়ে যায়, ঘটনা সহসা এমন একটা পরিণতিলাভ করে, একমুহূর্ত পূর্বেও যার কথা একবারও চিন্তা করিনি, কল্পনা করিনি। ঘটনাপ্রবাহের এই আকস্মিক গতিপরিবর্তন নাট্যসাহিত্যকে উপভোগের সামগ্রী করে তোলে। দৃশ্যকাব্যের উপরিউক্ত গুণ-দুইটি আলোচ্যমান লোকগীতিকার মধ্যে সুপরিস্ফুট।

নাটকীয় সৌন্দর্যের দৃষ্টান্ত : মহুয়া-মলুয়া-চন্দ্রাবতী

'মহুয়া' পালাটিতে ঘনায়মান সন্ধ্যার আধো-আলো আধো-অন্ধকারের কুহেলিকামণ্ডিত পরিবেশে জলের ঘাটে নদের চাঁদের সঙ্গে বেদের মেয়ে রূপসী মহুয়ার দেখা, উভয়ের কথাবার্তা, 'বাস্থার ছেড়ি'কে নদের ঠাকুরের প্রেমনিবেদন, কৃত্রিম রোষ বা ছলনাময় লজ্জার আশ্রয় নিয়ে মহুয়ার ওই প্রেমনিবেদনকে প্রত্যাখ্যান, তারপর উভয়ের পরস্পর নিকটতম সান্নিধ্যে আসা, হোমরা বাস্থার রোষ, নদের চাঁদকে হত্যা করবার জন্যে মহুয়ার হাতে বিষলক্ষ্যের ছুরি তুলে দেওয়া, প্রণয়াস্পদের বুকে ছুরি বসিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে তাকে নিয়ে বেদের মেয়ের

পলায়ন, অরণ্যপ্রদেশে নদীতীরে বণিকের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ, ওই সদাগরের নৌকায় দুজনের নতুন বিপদ, কৌশলে সদাগরের বিনাশসাধন, অতঃপর ভণ্ড সন্ন্যাসীর কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিয়ে উভয়ের পলায়ন, মিলনসুখে কিছুকাল দিনযাপন, অবশেষে বেদের দলের সেখানে উপস্থিতি এবং প্রেমিক-প্রেমিকার শোচনীয় মৃত্যু—প্রত্যেকটি ঘটনা নাটকীয় দৃশ্য হয়ে উঠেছে, এবং ঘটনাগুলির আকস্মিক পরিণতি আমাদের চিত্তকে মুগ্ধ করে।

'মলুয়া' এবং 'চন্দ্রাবতী' পালাদুটিতেও আমরা একই নাট্যসৌন্দর্য দেখতে পাই। জলের ঘাটে প্রস্ফুটযৌবনা মলুয়ার সঙ্গে চাঁদবিনোদের সাক্ষাৎ, তারপর উভয়ের তরুণ হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ, দু'জনের বিবাহমিলন, সুন্দরী মলুয়ার প্রতি দুষ্ট কাজির পাপদৃষ্টি, কাজির হাতে চাঁদবিনোদের অশেষ লাঞ্ছনা, পাঁচ ভাইয়ের সাহায্যে প্রতিশোধপরায়ণ কাজির হাত থেকে মলুয়া কর্তৃক স্বামীর উদ্ধারসাধন, দেওয়ান সাহেবের ঘরে মলুয়ার বন্দিনীজীবনযাপন, তিন মাস পরে সেই বন্দিনীজীবনের অবসান, স্বামীর ঘরে অভাগিনী মলুয়ার দাসীবৃত্তি, সর্পাঘাতে বিনোদের মৃত্যুআশঙ্কা, মলুয়া কর্তৃক স্বামীর প্রাণরক্ষা, স্বামীর হাতে মলুয়ার নারীত্বের চরম অবমাননা, সর্বশেষে নদীর জলে নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে অভিমানিনীর প্রাণত্যাগ—এ ঘটনাগুলিও পাঠকের চোখে একেবারে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। এখানেও ঘটনার বিষাদময় নাটকীয় পরিণতি চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করেছে।

'চন্দ্রাবতী' পালাটিতে চন্দ্রার ব্যর্থ প্রেমজীবনের কাহিনী বিয়োগান্ত দৃশ্য-কাব্যের দুর্লভ মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। চন্দ্রার সঙ্গে জয়চন্দ্রের প্রথমসাক্ষাৎ থেকে আরম্ভ করে এই গীতিকার শেষ দৃশ্যটি পর্যন্ত নাটকীয় সংঘাতে মুখর। পিতার শিবপূজার জন্য চন্দ্রা প্রতিদিন ফুল তুলতে যেত পুকুরের ধারে। সেই নির্জন পুকুরধারে একদিন জয়চন্দ্রের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল। ধীরে ধীরে অপরিচয়ের ব্যবধান দূর হয়ে উভয়ের জীবন প্রণয়ের সূত্রে বাঁধা পড়ল। দুজনের বিবাহমিলনে কোনো সামাজিক বাধা ছিল না। বিবাহের প্রস্তাব উঠল, চন্দ্রার পিতা তা সমর্থন করলেন। সুতরাং বিবাহ-অনুষ্ঠানের উদ্যোগ-আয়োজন শুরু হল। অকস্মাৎ ঘটনাধারা ভিন্নমুখে বইল। একদিন শোনা গেল, জয়চন্দ্র একজন মুসলমান-রমণীর প্রণয়াসক্ত হয়েছে। বিনামেঘে যেন বজ্রপাত হল—চন্দ্রার চিত্ত-বেদনার গভীরতা সহজেই অনুমেয়। হৃদয়টিকে পাষাণ করে নিয়ে এই ভাগ্য-বিড়ম্বিতা নারী বাকি জীবন শিবপূজায় কাটিয়ে দেওয়ার সংকল্প করল। নিজে কত বড়ো ভুল করেছে, জয়চন্দ্র তা অল্পকালের মধ্যেই বুঝতে পারল। অনুতাপের তাড়নায় একদিন সে চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করতে এল। চন্দ্রা কিন্তু মন্দিরের দ্বার

খুলল না, দেবালয়ের পাষাণদেবতার মতো তার হৃদয়টিও মর্মঘাতী বেদনায় বুঝি পাষাণে পরিণত হয়েছে। নিজের প্রার্থনা ব্যর্থ হলে পর জয়চন্দ্র মালতীর ফুল দিয়ে তার জীবনের শেষ কথা দেবালয়ের রুদ্ধদ্বারে লিখে রেখে গেল। সেইদিনই চন্দ্রা নদীর ঘাটে গিয়ে দেখতে পেল জয়চন্দ্রের মৃতদেহ জলে ভাসছে। দুটি জীবনের কী শোকাবহ পরিণতি! কেবল বর্ণনার মাধ্যমে নয়, কৃষককবি ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মাধ্যমে চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্রের অভিশপ্ত জীবনের অশ্রুসিক্ত কতকগুলি দৃশ্য উন্মোচিত করেছেন। তিনটি পালাই বিয়োগান্ত, ট্র্যাজেডির রসে অভিষিক্ত—পড়লে পাঠকের হৃদয় করুণাবিগলিত হয়, অন্তরের নিভৃত প্রদেশ হতে বেরিয়ে আসে অতি সকরুণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস।

গীতিকাসাহিত্যের লিরিক আবেদন

এবার আমরা গীতিকাগুলির বিস্ময়কর 'লিরিক' আবেদন সম্পর্কে দু-একটি কথা বলব। এই অপূর্ব লিরিকমাধুর্যের গুণেই এ সমস্ত গাথা যথার্থ কাব্য হয়ে উঠেছে। নরনারীর প্রেমানুভবকে পল্লীর প্রায়-নিরক্ষর কৃষককবিরা কী গভীর সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেছেন! প্রেম অন্ধ, সে কোনোপ্রকার শাসন মানে না, পার্বত্য নদীর মতো উদ্দাম বেগে ছুটে চলে, জগৎকে প্লাবিত করতে চায়। অশিক্ষিত হলেও পল্লীকবিরা মনস্তত্ত্ব খুব ভালো বুঝতেন, রহস্যময় প্রেমের স্বরূপটি তাঁরা চিনতেন। তাই এত সুন্দর করে তাঁরা নায়কনায়িকার মূক অন্তরবেদনার মুখে ভাষা দিতে পেরেছেন। প্রেমের ও জগতের অন্ধগতিকেই তাঁরা শুধু দেখে গেছেন, প্রেমজীবনের কোনো নৈতিক সমালোচনা করতে বসেননি। মানব-মানবীর সুখদুঃখ, হাসিকান্নার প্রতি তাঁদের যে সমবেদনা তার কোনো পরিমাপ হয় না। কবিচিত্তের এই অতলস্পর্শ সহানুভূতিই গীতিকাগুলির প্রতিটি ছত্রের ভিতর দিয়ে সংগীতমূর্ছনায় ফেটে পড়েছে—মানবজীবনে 'স্বপ্নের হাসি স্বপ্নের কাঁদন' দেখে পল্লীকবিরা নিঃশব্দে অশ্রুমোচন করেছেন।

চরিত্রচিত্রণে কবির আশ্চর্য কুশলতা

চরিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে এইসব কবি আশ্চর্য কুশলতা দেখিয়েছেন। এখানে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে, পুরুষচরিত্রগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। কিন্তু নারী-চরিত্রগুলি প্রেমের বীর্যে অশঙ্কিনী, প্রেমের বিপুল শক্তিতে শক্তিমতী। একনিষ্ঠ প্রেম নারীকে কতখানি মহীয়সী করে তোলে, প্রেমকে পাথেয় করে সে কী গর্বিত পদক্ষেপে সহস্র আঘাতসংঘাতের কাঁটার পথে এগিয়ে চলে, এবং প্রেমের তপস্যাবলে কীভাবে সতীত্ব ও নারীত্বকে বাঁচিয়ে রাখে, তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর গাথা-গুলির পাতায় পাতায় মুদ্রিত রয়েছে। কৃষককবিদের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব এই

যে, একই প্রেম তাঁদের রচনার উপজীব্য হলেও প্রত্যেকটি নায়িকাকে তাঁরা ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল করে তুলেছেন, নায়িকারা কোনো একটা বিশেষ শ্রেণীর নারীর প্রতিনিধি অর্থাৎ 'টাইপ' হয়ে ওঠেনি। 'মহুয়া', 'মলুয়া' ও 'চন্দ্রাবতী—তিনজনেই প্রেমিকা নায়িকা, অথচ তাদের চরিত্র স্বাতন্ত্র্যের দীপ্তিতে সমুদ্ভাসিত। বেদের পালিতা কন্যা মহুয়ার দুঃসাহসিক কার্যকলাপ আমাদের বিস্মিত করে, সে যেন বিষধরসর্পজড়িত একটি চন্দনতরু, যেন বজ্রগর্ভ বিদ্যুৎলতা—আরণ্য আদিমতা তার চরিত্রে সুপ্রকাশ। মলুয়া হিন্দুসমাজের একেবারে খাঁটি ভালো মেয়ে। সে বিপ্লব বাধাতে পারে না, বিদ্রোহ ঘোষণা করতে জানে না, সমস্ত অপমান-লজ্জা, দুঃখকষ্ট নীরবে সহ্য করে। তার নারীত্বের অবমাননা যখন অসহনীয় হয়ে উঠেছে তখন আত্মবিসর্জন করে সে সকল লাঞ্ছনার অবসান ঘটিয়েছে। চন্দ্রাবতী যেন শুভ্রভাস একটি শ্বেতপদ্ম, পবিত্র প্রেমের প্রতিমূর্তি সে। চন্দ্রার প্রেমানুভব আদ্যন্ত সংযম-শাসনে শাসিত। কোমলেকঠোরে তার চরিত্র অপূর্ব হয়ে উঠেছে। দুর্বিষহ বেদনার মুহূর্তেও সে নিজের চিত্তটিকে নিষ্কম্প দীপশিখার মতো প্রশান্ত স্থৈর্যে অবিচল রেখেছে—'না কান্দে না হাসে চন্দ্রা নাহি বলে বাণী, আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাষাণী'।

এই গীতিকাগুলির মতো এমন সুন্দর মানবীয় রসের কবিতা বাংলাসাহিত্যে খুব বেশী নেই, একথা যদি বলি, তাহলে বোধ করি খুব ভুল করা হয় না। প্রেমের সৌন্দর্য ও প্রেমের তপস্যার চিত্র পল্লীকবিদের হাতে কী চমৎকার ফুটেছে! নরনারীর প্রেমজীবনের রহস্যময় অন্তঃপুরে তাঁরা অবলীলায় প্রবেশ করেছেন, প্রেমকে লৌকিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখেও তাকে সমস্ত অশুচিতার ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। এসব লৌকিক প্রেমগীতিকায় অসুন্দরের এতটুকু স্পর্শ নেই, স্থূল বাসনার বিক্ষোভ নেই, সর্বত্র একটা স্নিগ্ধ শুচিতা ও শালীনতা বিরাজমান। বৈষ্ণবপদগুলিও প্রেমের কবিতা। কিন্তু সেই প্রেম অপ্রাকৃত, পার্থিব নরনারীর প্রণয়তৃষ্ণা পদাবলীর রসে মিটবার নয়—বৈষ্ণবের গান শুধু বৈকুণ্ঠের জন্যে। কিন্তু আলোচ্যমান গাথাগুলিতে যে-প্রণয়কথা বর্ণিত হয়েছে তা আমাদের এই বাস্তব-সংসারের চিরপরিচিত মানবমানবীর, মর্ত্যের আকৃতিই এগুলির মধ্য দিয়ে প্রতি-স্পন্দিত হয়েছে। তাই এইসব পল্লীগাথার আবেদন সার্বজনীন। গীতিকার ভাষা নিরাভরণ অথচ অপূর্ব্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত, প্রকাশভঙ্গি সরল অথচ ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ। এখানে প্রণয়-আলেখ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথচ স্থূলতার ঊর্ধ্বচারী। অশিক্ষিত হয়েও পল্লীকবিরা এমন চিত্তহারী প্রেমগাথা কী করে রচনা করলেন, তা-ই অবাক হয়ে ভাবি।

মানবীয় রসের অপূর্ব উৎসার

পল্লীগীতিকাগুলির ভাষা ও কবিত্বের সৌন্দর্য-মাধুর্যের সামান্য পরিচয় দিয়ে আমরা বর্তমান আলোচনা শেষ করব। অনলংকৃত বাক্যও যে কেমন সহজে চিত্তচমৎকার কাব্য হয়ে ওঠে, তা যদি কেউ দেখতে চান, তাহলে আমাদের অনুরোধ, তাঁরা যেন এইসব গীতিকার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেন—পল্লীকবির সহজ কবিত্বে তাঁরা অবশ্যই মুগ্ধ হবেন। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দৃশ্য ও বর্ণনা এখানে উদ্ধার করছি। আশাকরি, সহৃদয় পাঠক এগুলি থেকেই সমালোচ্য গীতিকাসাহিত্যের কাব্যোৎকর্ষবিষয়ে কিছুটা ধারণা করে নিতে পারবেন।

ভাষা ও কবিত্বের সৌন্দর্য

পালার নাম 'মহুয়া'। বেদেরা গ্রামে এসেছে, খেলা দেখাবে। নগুার ঠাকুর সেই খেলা দেখতে গিয়ে এই প্রথম মহুয়াকে দেখল। প্রথমদর্শনেই নদের চাঁদের হৃদয়ে অনুরাগের সঞ্চার হল। এই অনুরাগের বহিরঙ্গ প্রকাশটি কবির হাতে কী সুন্দর ফুটেছে :

'যখন নাকি বাগুার ছেড়ি বাঁশে মাইল লাড়া।
বস্যা আছিল্ নগুার ঠাকুর উঠ্যা অইল খাড়া॥
দড়ি বাইয়া উঠ্যা যখন বাঁশে বাজি করে।
নগুার ঠাকুর উঠ্যা কয় পইড়্যা বুঝি মরে॥'

—'পইড়্যা বুঝি মরে' কথাগুলি নদের চাঁদের পূর্বরাগরঞ্জিত হৃদয়টিকে সর্বসাধারণের কাছে একেবারে অনাবৃত করে ধরেছে। ওই আচরণ একজন নির্লিপ্ত দর্শকের নয়, নিঃসন্দেহে প্রেমিকের। তারপর, আসন্ন সন্ধ্যার নির্জনতায় জলের ঘাটে সুন্দরী মহুয়াকে নদের চাঁদ কীভাবে আত্মনিবেদন করছে, তার অনুপম চিত্রটি একবার দেখুন। ভীরু প্রণয়ী সংকোচকম্পিত কণ্ঠে বেদের মেয়ে মহুয়ার কাছে তার মাতাপিতার পরিচয় চাইলে মহুয়া বোধকরি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে :

'নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভসোদর ভাই।
স্রোতের হেওলা অইয়া ভাসিয়া বেড়াই॥'

মহুয়া স্রোতের শেওলাই বটে। তার কথা শুনে নগুার ঠাকুর হৃদয়াবেগ সংবরণ করতে পারল না, মনের গোপন কথাটি প্রকাশ করে ফেলল : 'তোমার মত নারী পাইলে আমি করি বিয়া।' বেদের মেয়ে হলেও মহুয়া চিরকালের নারী। সে মনে মনে ভাবল, নদের চাঁদের কাছে বুঝি তার হৃদয়ের দুর্বলতাটি প্রকাশ পেয়ে

গেল। পুরুষের কাছে এত সহজে ধরা দিতে হল, কী লজ্জার কথা! তাই কৃত্রিম রোষ দেখিয়ে বলল:

'লজ্জা নাই নিলাজ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্ধ্যা জলে ডুব্যা মর॥'

প্রেমার্তির সুতীব্র বেদনা যে-মানুষটি অহর্নিশ নিঃশব্দে সহ্য করছে তাকে মহুয়া বলছে মৃত্যু বরণ করতে! নদের চাঁদ মরবে, কিন্তু প্রকৃতির সংসারের নদীতে ডুবে নয়—মহুয়ার হৃদয়যমুনায় ডুব দিয়ে:

'কোথায় পাইবাম কলসী, কন্যা, কোথায় পাইবাম দড়ি।
তুমি হও গহিন গাঙ্, আমি ডুব্যা মরি॥'

প্রেমিকচিত্তের এই আশ্চর্যসুন্দর অভিব্যক্তির মধ্যে যে-কবিত্বসৌন্দর্য রয়েছে তার তুলনা হয় না। উপরের দুটি পঙ্‌ক্তি অবিস্মরণীয়।

'মলুয়া' পালাটির শেষ দৃশ্য অতিশয় করুণ। ভাগ্যবিড়ম্বিতা, সমাজলাঞ্ছিতা মলুয়ার শোচনীয় মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্ত। মাঝনদীতে গিয়ে সে আস্তে আস্তে নৌকাটি ডুবিয়ে দিচ্ছে, আত্মীয়স্বজন সকলে কাতরস্বরে তাকে আহ্বান করছে ফিরে আসবার জন্যে। কিন্তু মলুয়া সংসারে আর ফিরবে না, নারীত্বের অপমান তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। একে একে সকলকে প্রণাম জানিয়ে সে বিদায় নিল। তারপর:

'পূবেতে উঠিল ঝড় গর্জি উঠে দেওয়া।
এই সাগরের কূল নাই ঘাটে নাই খেওয়া॥
ডুবুক ডুবুক নাও আর বা কতদূর।
ডুইব্যা দেখি কতদূরে আছে পাতালপুর॥
পূবেতে গর্জিল দেওয়া ছুটল বিষম বাও।
কইবা গেল সুন্দর কন্যা মনপবনের নাও॥'

এহেন ট্র্যাজিডির চিত্র যে-কবি আঁকতে পারেন তাঁর কবিত্বশক্তি অস্বীকার করবে কে?

'চন্দ্রাবতী' পালাটি। জয়চন্দ্র মুসলমান-রমণীতে আসক্ত হয়েছে শুনে চন্দ্রা নিস্তব্ধ পাষাণমূর্তিতে পরিণত হল যেন। বাইরে সে কঠিন, কিন্তু সমস্ত অন্তর্দেশ তার নিদারুণ যন্ত্রণায় বুঝি খান্ খান্ হয়ে যাচ্ছে:

'রাত্রিকালে শরশয্যা বহে চক্ষের পানি।
বালিশ ভিজিয়া ভিজে নেতের বিছানি॥'

অসহ্য তার হৃদয়বেদনা। কত কথা চন্দ্রার মনে পড়ে। সেই অতর্কিত

পরিচয়, সেই অতর্কিত প্রেম, সেই মুগ্ধ আত্মনিবেদন, সেই বিচিত্রমধুর প্রেমস্বপ্ন—একমুহূর্তে সব কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! চন্দ্রা জীবনে আর ঘুমোতে পারবে না, চিরকালের জন্য তার ঘুম টুটে গেছে। শিবপূজায় মন দিলেও হতভাগ্য জয়চন্দ্রকে কি জীবনে সে ভুলতে পেরেছিল? অসম্ভব। চন্দ্রার হৃদয়ের শূন্যতার পরিমাপ করবে কে :

'শুধাইলে না কয় কথা মুখে নাহি হাসি।
এক রাত্রে ফুটা ফুল ঝইরা অইল বাসি॥'

এই চিত্রটি দেখে কার চোখে-না জল আসে, কার চিত্ত-না হাহাকারে শ্বসিত হয়ে ওঠে?

পূর্ববঙ্গের 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' বইখানি কেন আমার ভালো লাগে, উপরে তা আমি যথাসাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করেছি। এখন রসজ্ঞ পাঠকেরা বিচার করবেন আমার ভালো-লাগার হেতুনির্দেশ যুক্তিসহ কিনা।

সবাক চলচ্চিত্র : সমাজজীবনে ও জাতীয় জীবনে ইহার প্রভাব

[**রচনার সংকেতসূত্র :** এ যুগে চলচ্চিত্রের সর্বব্যাপ্ত প্রভাব—চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তার হেতুনির্দেশ—চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয়তাবিচার—চলচ্চিত্রের গুরুতর দায়িত্ব—নিকৃষ্ট চলচ্চিত্রের দূষিত প্রভাব—চলচ্চিত্র ও আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যহানি—চলচ্চিত্র ও সমাজকল্যাণ—শিক্ষাপ্রচার ও আনন্দপরিবেশনে চলচ্চিত্র—উপসংহার।]

আধুনিক বিজ্ঞানের বড়ো একটি দান সবাক চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রের সঙ্গে একালের নাগরিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ছোট-বড়ো শহরে যাঁরা বাস করেন তাঁদের সকলেই নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে অনুভব করে থাকবেন যে, চলচ্চিত্রপ্রতিষ্ঠান ক্রমশ সর্বস্তরের জনচিত্তের উপর কতখানি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। এক কথায় বলা যায়, এর আকর্ষণ দুর্বার। রঙ্গমঞ্চের আবেদনের জৌলুসও আজ চলচ্চিত্রের কাছে একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে আমাদের বাঙালীজীবনে দুর্গতিলাঞ্ছনার অন্ত নেই, আমরা দারিদ্র্যক্লিষ্ট। খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব দেশে দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে,

এ যুগে চলচ্চিত্রের সর্বব্যাপ্ত প্রভাব

জিনিসপত্রের দাম হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আপনি দুপুরে কিংবা সন্ধ্যায় একটি চলচ্চিত্রগৃহের সম্মুখে দাঁড়ান, দেখতে পাবেন, সেখানে জনারণ্যের সৃষ্টি হয়েছে; টিকিটঘর থেকে আরম্ভ করে ফুটপাথের বহুদূর পর্যন্ত কত কত মানুষ লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে—বালকের দল, কিশোরের দল, প্রৌঢ়ের দল, শ্রমিক-মজুর—বাদ কেউ নেই। যুদ্ধের দিনে রেশনের দোকানেও এত ভিড় আপনারা কখনো কেউ দেখেননি।

রাস্তায় হাঁটুন, দুপাশের দেয়ালগুলির দিকে তাকান, দেখবেন, কত বিচিত্র রকমের পোস্টার দেয়ালের গায়ে মারা রয়েছে—জনপ্রিয় চিত্রতারকাদের আকাঙ্ক্ষিত মুখচ্ছবি সেখানে প্রতিবিম্বিত। আপনার বাড়ীতে পুরাণো দৈনিক সংবাদপত্রের ফাইল যদি থাকে তাহলে বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাগুলো এক নজরে দেখে যান; নিশ্চয়ই আপনার চোখে পড়বে, চলচ্চিত্র-সম্পর্কিত মনোহর বিজ্ঞাপনের আয়তন দিনের পর দিন কীরূপ স্ফীত হয়ে উঠছে। শুধু সিনেমাজগৎকে নিয়েই আজকাল কতকগুলি চিত্তাকর্ষক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। ওইসব পত্রিকা দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে ঘুরছে, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে কত রকমের তর্কবিতর্ক চলছে—ট্রামে-বাসে-রেস্টুরেণ্টে-পার্কে। এতেই সহজে উপলব্ধি করা যায়, ছায়াচিত্রের আকর্ষণ অপ্রতিরোধনীয়। সবাক চলচ্চিত্র নাগরিক সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে বললে মোটেই অত্যুক্তি করা হয় না। সার্বজনীন এর আবেদন। সুতরাং ব্যক্তিগত রুচির কথা যাই হোক, গোটা সমাজমনের উপর বাণীমুখর পর্দার অসামান্য প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই।

চলচ্চিত্রের এই অসামান্য জনপ্রিয়তার কারণ নির্দেশ করা মোটেই কঠিন কিছু নয়। শহুরে মানুষের জীবন কিরূপ কর্মব্যস্ত, কতখানি যান্ত্রিক, তা কাকেও বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সবাই রুদ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে জীবিকার সন্ধানে। কাজের ঘূর্ণীপাকে পড়ে এখানে মানুষগুলি প্রতিমুহূর্তে আবর্তিত হচ্ছে, সমস্ত দিনের মধ্যে এতটুকু বিশ্রাম তাদের নেই। নিদারুণ কর্মব্যস্ততার পর তারা যখন বাড়ী ফেরে তখন তাদের সকল দেহমন শ্রান্ত ক্লান্ত—অবসাদগ্রস্ত। এরূপ অবস্থায় মন স্বভাবতই কিছুটা আনন্দ পেতে চায়, চিত্ত-বিনোদনের সামগ্রী খুঁজে ফেরে, আমোদপ্রমোদের অভিলাষী হয়ে ওঠে। চিত্তের সজীবতা-প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনতে হবে, অথচ অধিক অর্থব্যয় করার মতো সামর্থ্য অনেকেরই নেই। এমন একটি পরিস্থিতিতে অল্পখরচায় দু-দণ্ডের আনন্দ-আহরণের বাসনা নিয়ে স্বল্পবিত্ত মানুষগুলি ছোটে শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলির অভিমুখে।

চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তার হেতুনির্দেশ

অবশ্য শ্রান্তি-অপনোদনের জন্যই যে সকলে সিনেমা দেখতে যায় তা নয়। অভিনয়-নাচ-গান আর বহুবিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্যের সহজ একটা আকর্ষণও তো রয়েছে। ছায়াচিত্রে এ সমস্তকিছুই মেলে, এবং সামান্য অর্থব্যয়ে। তাছাড়া, বৃষ্টিবাদলার দিনে, কন্‌কনে ঠাণ্ডা ও শীতের সময়ে খেলার মাঠে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে, পার্কে, নদীতীরে আনন্দসঞ্চয়ের মানসে আশ্রয় নেওয়াটা তেমন নিরাপদ নয়। কিন্তু প্রেক্ষাগৃহে সকালে-দুপুরে-সন্ধ্যায়-রাত্রিতে—যে-কোনো সময়েই—দুই ঘণ্টা আড়াইঘণ্টাকাল নিশ্চিন্তে নিরাপদে কাটিয়ে দেওয়া যায়, এতটুকু অসুবিধে নেই। এসব কারণে বৈচিত্র্যপিপাসু আনন্দ-আকাঙ্ক্ষী শহরবাসী মানুষের পক্ষে পর্দার কদর আজ এতখানি বেড়ে গেছে, তাই প্রেক্ষাগৃহগুলিতে প্রতিদিন অজস্র মানুষের মিছিল। সকল বয়সের, সমাজের প্রত্যেকটি স্তরের মানুষকে আনন্দ যোগাতে পারে চলচ্চিত্র। সংবাদপত্র, রেডিও এবং ছায়াছবি—এগুলিকে বাদ দিলে নাগরিক জীবন যে অনেকখানি বিস্বাদ হয়ে পড়বে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বস্তুত নারীপুরুষ, বালকবৃদ্ধ, ধনীনির্ধননির্বিশেষে প্রভূত আনন্দপরিবেশনের ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের সঙ্গে অপর কোনো শিল্পের তুলনা হয় না। চোখের আর মনের তৃপ্তিসাধনের শক্তি এর অসাধারণ। কিন্তু এ সত্যটি ভুললে চলবে না যে, সিনেমার মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা শুধু চিত্তবিনোদনের জন্যে নয়। শিল্পের সৃষ্টি মুখ্যত আনন্দদান বা মনোরঞ্জনের জন্য হলেও, গৌণভাবে শিল্প সমাজকল্যাণবিষয়ে একেবারে উদাসীন থাকতে পারে না। আর্টের উপর কেবল আনন্দাভিলাষী কিংবা রসিকচিত্তের নয়, বৃহত্তর সমাজেরও একটা দাবী রয়েছে। শিল্পের কাছ থেকে মানুষের প্রথম পাওনা হলো আনন্দ, আর উপরিপাওনা হলো শিক্ষা—বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ। অভিনয়-নৃত্য-সংগীত-চিত্র ইত্যাদি একসময় এদেশে লোক-শিক্ষার বাহন ছিল। যাত্রা-পাঁচালী-কথকতা-কবিগান প্রভৃতির সঙ্গে পল্লীর মানুষমাত্রেই পরিচিত। পল্লীজীবন থেকে নানাকারণে আজ আমরা দূরে সরে আসতে বাধ্য হয়েছি, এখন সকলেই ভিড় করছি শহরে। সে-কারণে পূর্বতন লোকশিক্ষামূলক তথা আনন্দপরিবেশনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে এযুগে আমাদের পরিচয় একরূপ নেই বললেই চলে। বর্তমানে ওইসব প্রতিষ্ঠানের স্থান গ্রহণ করেছে রঙ্গমঞ্চ, রেডিও, সংবাদপত্র ইত্যাদি—বিশেষ করে সবাক চলচ্চিত্র। জনমতগঠনে, শিক্ষাপ্রচারে, জনসাধারণের রুচিনিয়ন্ত্রণে এ সকল প্রতিষ্ঠানের অশেষ ক্ষমতা। ব্যাপক প্রচারের জন্য শিক্ষিত মনের উপর সংবাদপত্রের প্রভাব

চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয়তা-বিচার

অসামান্য। কিন্তু একহিসাবে এই ক্ষেত্রে ছায়াচিত্রের প্রভাব ব্যাপকতর। তার কারণ হলো, ছায়াচিত্র আনন্দের মাধ্যমে প্রচারণার কাজে অগ্রসর হয়, আমোদ-প্রমোদের সহায়তায় মনকে সজোরে নাড়া দিয়ে দর্শকের দৃষ্টিকে বিশেষ কোনো শিক্ষণীয় বিষয়ের দিকে তুলে ধরে। অশিক্ষিতের কাছে সংবাদপত্র মূল্যহীন। কিন্তু নিরক্ষর মানুষও ছায়াচিত্র থেকে কিছু-না-কিছু শিক্ষার খোরাক পায়। সুতরাং চলচ্চিত্রের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতাবিচারে সমাজসেবার প্রশ্নটি অবান্তর মোটেই নয়।

চলচ্চিত্রের গুরুতর দায়িত্ব

সিনেমাকে যদি এ যুগের নাগরিক সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়, তাহলে বলবো, এর দায়িত্বও কম নয়। সার্থক শিল্প-হিসাবে একে সুন্দরের দাবী মানতে হবে—আর্টের মর্যাদা রক্ষা করে চলতে হবে; এবং জনকল্যাণের বাহনরূপে একে লোকশিক্ষার অন্যতম সহায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয়, এদেশের চলচ্চিত্রপ্রতিষ্ঠানের মালিকগণ এই সমস্ত ব্যাপারে একরূপ উদাসীন। সিনেমা তাঁদের কাছে শিল্পরূপে বিবেচিত নয়, সামাজিক দায়িত্বের কথা একবারও তাঁরা ভেবে দেখেন বলে মনে হয় না,—সিনেমার ব্যবসায়িক দিকটিই তাঁদের কাছে একমাত্র বিবেচ্য। চলচ্চিত্রকোম্পানী খুলে তাঁরা রাতারাতি লাখপতি হয়ে উঠতে চান, ব্যাঙ্কের অঙ্ক কী করে ফেঁপে উঠবে, কেবল সেদিকেই দৃষ্টি রাখেন। উক্ত মালিকগণের এহেন মনোভঙ্গির ফলে শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলি অধুনা সমাজজীবনে ও জাতীয় জীবনে ক্রমাগতই দুষ্টপ্রভাব বিস্তার করে চলেছে। সেখানে যে-সকল চিত্র সাধারণত প্রদর্শিত হয় তাতে সুস্থ সবল জীবনাদর্শের কোনো প্রতিবিম্ব নেই, মানুষের মহৎ বৃত্তিগুলির রূপায়ণ নেই, চারিত্রমহিমা নেই, বাস্তব জীবনের বিশ্বস্ত প্রতিফলন নেই, অভিনয়ে-নৃত্যে-সংগীতে নেই কোনো উচ্চতর শিল্পসুষমার প্রকাশ। বেশীর ভাগ চিত্রের অবলম্বন প্রেমকাহিনী, অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর ঘটনা কিংবা সমাজবিরোধী কার্যকলাপ। কিন্তু এসকল ঘটনা মহত্তর জীবনের প্রতি কোনো ইঙ্গিত বহন করে না, নিত্য-কালীন মানবসত্যের পরিচয় দেয় না—কেবল অসুস্থ মনোবিকার, হীনতম প্রকৃতির স্পর্ধিত বিদ্রোহ, ইন্দ্রিয়ের দস্যুতা, অসুন্দরের কদর্য মুখভঙ্গিমার দিকেই দর্শকের সকল মন ও দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।

মানবচিত্তের উপর এর প্রতিক্রিয়া সত্যই বিষময়। সিনেমাতে গিয়ে যে-অর্থ আমরা ব্যয় করি তার প্রতিদানে আমরা কী পাই? পাই নিজেদের পশু-প্রকৃতিগুলিকে জ্বালিয়ে তোলবার ইন্ধন, পাই বহুকালের কল্যাণপ্রদ সমাজ-

বন্ধনকে অস্বীকৃতি জানিয়ে তাকে ব্যক্তিগত খেয়ালখুশিতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করার অশুভ প্রেরণা, পাই কুশ্রীতার ক্লেদপঙ্কিল স্পর্শ। ফল কী দাঁড়াচ্ছে—প্রতিনিয়ত নিজেদের আমরা বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী করে ফেলছি, শুভংকর মনুষ্যত্বের উচ্চাদর্শ হতে স্খলিত হয়ে ধীরে ধীরে নৈতিক অধঃপতনের অন্ধগহ্বরে প্রবেশ করছি ; দিন দিন হারিয়ে ফেলছি সৌন্দর্যবোধ, সমাজবোধ, ধর্মবোধ, এতে বিকৃত হচ্ছে আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মানবধর্ম। আপনারা বলুন, যে-সব চিত্র প্রায়শই প্রেক্ষাগৃহে দেখে থাকেন, অশ্লীলতায়-ভরা যৌনআবেদন ও সস্তা দেশপ্রেমের বুলি ছাড়া অন্যকোনো আকাঙ্ক্ষিত বস্তু কি তা থেকে আহরণ করেন ? সত্যের মুখের দিকে যদি তাকান তাহলে আপনারা এ প্রশ্নের যে-উত্তর দেবেন তা নেতিবাচক হতে বাধ্য। আপনারা এরূপ সন্দেহ পোষণ করবেন না, আমরা নীতিবাগীশ। চলচ্চিত্র-রঙ্গমঞ্চকে নিশ্চয়ই আমরা নরক বলে মনে করি না—সত্যকার আর্টকে যে স্বাগত জানাতে পারে না, মানুষ নামের অযোগ্য সে। কিন্তু আর্টের গঙ্গাজল ছিটিয়ে অস্বাস্থ্যকর সমাজবিরোধিতা, অশ্লীলতা, নোঙ্‌রামি, ভাঁড়ামি আর বীভৎসতাকে নির্বিচারে গ্রহণ করতে রাজী আমরা নই। সুন্দরের বেদীতে কদর্যতার হুঙ্কারজনক উলঙ্গ-উদ্দাম নৃত্য একেবারে অসহ্য। কুরুচিপূর্ণ নিকৃষ্টশ্রেণীর চলচ্চিত্র মালিকদের অর্থাগমের পথ সুগম করে তুলছে, কিন্তু গোটা জাতীয় জীবনকে ঠেলে দিচ্ছে শোচনীয় অপমৃত্যুর দিকে।

নিকৃষ্ট ছায়াচিত্রের দূষিত প্রভাব

সিনেমা আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে কতখানি পঙ্গু করে দিচ্ছে তার একটুখানি ইঙ্গিত দিই। আজকালকার তরুণসম্প্রদায়ের দিকে লক্ষ্য করুন, অনেকেরই সাজপোষাক, চলনবোলন, ভাবভঙ্গি সিনেমাগন্ধী। এদের কাছে এই বিশাল পৃথিবীতে প্রেক্ষাগৃহগুলিই একতম সত্য বস্তু। এতকাল আমরা মহামানবকে, জাতীয় বীরকে, ইতিহাসের মহৎ চরিত্রকে, আন্তর ঐশ্বর্যে দীপ্যমান আদর্শ পুরুষকে, আনন্দলোক-বিরচনকারী শিল্পস্রষ্টাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি-পূজা নিবেদন করে এসেছি। কিন্তু এদের কাছে পূজা পায় একমাত্র চিত্রতারকাবৃন্দ—ছায়াচিত্র-জগতের বাইরে আর-কিছুরই যেন অস্তিত্ব নেই। সিনেমার কাহিনী, সিনেমার গান, সিনেমাবিষয়ক আলাপআলোচনা, তর্কবিতর্ক নিয়েই এরা মেতে রয়েছে। চলচ্চিত্রের নিপুণ অভিনেতা-অভিনেত্রীকে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা অবশ্যই আমরা দেব, যথাস্থানে তাঁদের সংবর্ধনা জানাব। এতে আপত্তির কিছুই নেই, বিপদেরও কোনো সংগত কারণ নেই। বিপদ সেখানে, যেখানে চিত্রতারকাবৃন্দের স্বপ্ন দেখা

চলচ্চিত্র ও আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যহানি

ছাড়া অন্যকিছু আমরা ভাবতে পারি না, চিন্তা করতে পারি না। এরূপ একটি অবস্থা আমাদের মানসিক দৈন্যের সূচক বলেই শোচনীয়। অসুস্থ মানসিকতা এ দেশের তরুণতরুণীর দলকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে? বাস্তব জীবনটা কি শুধু সিনেমার স্বপ্ন দিয়েই তৈরী? চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের খেলার মাঠে নামিয়ে তাদের হাতে ক্রিকেটের ব্যাট তুলে দিলেই তবে আমাদের আর্তত্রাণের তহবিল ভরবে, নতুবা ওই তহবিল শূন্য থাকবে—এরূপ একটি অবস্থা বা ঘটনা কি সুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক? এর আশু প্রতিকারের পথ চিন্তনীয়।

ইচ্ছা থাকলে—স্বার্থবুদ্ধির একটুখানি উর্ধ্বে নিজেদের তুলে ধরতে পারলে—দেশের প্রেক্ষাগৃহগুলিকে আবিলতামুক্ত আনন্দদানের ও নানামুখী-শিক্ষা-প্রচারের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত করা যায়। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে তাই করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এই বিপুল বিশ্বসংসারে মানুষের কতকিছু দেখবার জানবার শিখবার রয়েছে। স্কুলকলেজে বই পড়ে, শিক্ষকদের মুখে শুনে, আমরা কতটুকু জ্ঞান সঞ্চয় করি? আর, আমাদের দরিদ্র দেশের কয়জনই-বা শিক্ষালাভের সুযোগ পায়? বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল ধরে পাঠ নিয়েও যা আমরা শিখতে পারি না, উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র থেকে তা সহজেই শেখা যায়। পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করে মানবসংসার ও প্রকৃতিলোকের সর্ববিধ অভিজ্ঞতা অর্জন করা কোনো মানুষের পক্ষেই এক জীবনে সম্ভব নয়। কিন্তু চলচ্চিত্রের সাহায্যে বড়ো পৃথিবীকে আমরা হাতের মুঠোয় পেতে পারি, রুদ্ধদ্বার প্রেক্ষাগৃহের একটি চেয়ারে বসে দু-ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা সময়ের মধ্যে গোটা দুনিয়ার নানা বস্তু নানা দৃশ্যের উপর আমরা অবলীলায় চোখ বুলিয়ে যেতে পারি। এমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্চয় আর কোন্ উপায়ে সম্ভব? উত্তরমেরু আর দক্ষিণমেরু, দূরপ্রসারিত অগ্নিঢালা মরুপ্রান্তর, গহন অরণ্যানী, উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গ, অতলস্পর্শ সমুদ্র—জগৎসংসারের দূরদূরান্তকে আপন চোখে দেখে নিয়ে জীবনকে ধন্য করতে হলে চলচ্চিত্রের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। সার্থক চলচ্চিত্র দূরকে কাছে এনে দেবে, অদেখাকে চাক্ষুষ করাবে, অপরিচিতকে পরিচয়ের আলোকে উজ্জ্বল করে তুলবে, অজানাকে জানাবে। সবকিছুকে নিজের চোখে দেখে, জগতের অশ্রুত বাণীকে নিজের কানে শুনে আমরা কৃতকৃতার্থ হব। ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দিকে দিকে বিকীর্ণ অজস্র শিল্পসম্পদ, প্রকৃতির সৃষ্টি আর মানুষের অতন্দ্র সাধনার সৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ জীবন্ত প্রেক্ষণীয় করে তুলতে পারে একমাত্র সবাক চলচ্চিত্র। এর সম্ভাবনার সীমাপরিসীমা নেই।

চলচ্চিত্র ও সমাজকল্যাণ

শিক্ষার সঙ্গে আনন্দপরিবেশনের যোগসূত্র ঘটিয়েছে প্রগতিশীল দেশগুলির চলচ্চিত্র। অথচ আমরা কত পিছনে পড়ে রয়েছি! হাল্কা আমোদপ্রমোদ, ঠুনকো রঙ্গকৌতুক, সস্তা দেশাত্মবোধের পরিচিত বুলি, বাস্তবসম্পর্কবিরহিত পুঞ্জীভূত ক্লেদে আকীর্ণ প্রেমকাহিনী, অবিশ্বাস্য রোমাঞ্চকর ঘটনার চমক—এই তো আমাদের চলচ্চিত্রের পুঁজি। অচিরে এগুলির মোহ আমাদের কাটাতে হবে, রূঢ় বাস্তবের মধ্যে পদক্ষেপ করতে হবে, অহর্নিশ অবাস্তব স্বপ্নকল্পনার রঙিন ফানুস না উড়িয়ে চিত্রনির্মাতারা বহুসমস্যাকণ্টকিত সমাজজীবন ও জাতীয় জীবনের দিকে সকলেরই দৃষ্টি সংবদ্ধ করতে হবে। চলচ্চিত্রের দায়িত্ব অনেকখানি। যে-সকল ধনীমালিক ছায়াছবিকে শুধু লাভজনক ব্যবসায়রূপেই দেখতে অভ্যস্ত, রাষ্ট্রের কর্তব্য তাঁদের স্বার্থান্ধ দৃষ্টিকে সমাজমুখী করে তোলা। সরকারের সেন্সরবোর্ড কুরুচিপূর্ণ ছায়াচিত্রবিষয়ে খুব সাবধান এবং কঠোর মনোভাবাপন্ন হবেন,—পর্দায় প্রতিফলিত অশ্লীলতাকে সরকার যেন কখনই বরদাস্ত না করেন। সিনেমাশিল্পীগণকেও সমাজকল্যাণ-সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। অভিনয়-নৃত্য-সংগীতের মধ্য দিয়ে তাঁরা যদি জনসাধারণের রুচিবিকৃতি ঘটান, তাহলে জোর গলায় বলব—তাঁরা ক্ষমার অযোগ্য। ভালো বই পর্দায় দেখানো হলে দর্শকদের অভাব নিশ্চয় হবে না। চিত্রপরিচালকেরা জেনে রাখুন, উৎকৃষ্ট জীবনচিত্র দেখবার সুযোগ পেলে জনসাধারণ কখনো নিকৃষ্ট রসের দিকে ঝুঁকবে না। দেশের মানুষের বিকৃত রুচির জন্য তাঁরাই যে অনেকখানি দায়ী, এ সত্যটি উপলব্ধি করার সময় এসেছে। প্রত্যেকটি মানুষকে যদি তাঁরা হীন প্রবৃত্তির পরবশ মনে করেন তাহলে বলতে হবে, লোকমনস্তত্ত্বের বিষয়ে ধারণা তাঁদের একেবারেই নেই।

শিক্ষাপ্রসার ও আনন্দপরিবেশনে চলচ্চিত্র

মোটকথা, চলচ্চিত্রশিল্পকে সমাজকল্যাণের বাহন করে তুলতে হবে, জনচিত্তবিনোদন ও লোকশিক্ষাকে একসূত্রে গ্রথিত করতে হবে। সোভিয়েট রাশিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে একসঙ্গে এই দুইটি কাজ সুচারুরূপে সম্পাদিত হচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর দর্শকের জন্যে বিভিন্ন রকমের চিত্রপ্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে—স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীর জন্যে যে-ব্যবস্থা, শ্রমিকমজুরের জন্যে সে-ব্যবস্থা নয়। শিক্ষাপ্রচারের ক্ষেত্রে শিল্প কতখানি সহায়তা করতে পারে, উক্ত দেশগুলির দিকে তাকালে তা যথার্থ উপলব্ধি করা যাবে। এ বিষয়ে রাষ্ট্রের উদ্যমপ্রচেষ্টা থাকা চাই, রাষ্ট্র উদাসীন হলে জাতীয় জীবনের অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। সিনেমার প্রচারমূল্য সর্বজনস্বীকৃত, উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির লোকশিক্ষার সার্থক বাহন হতে কোনো বাধা

উপসংহার

নেই। চলচ্চিত্রশিল্পের প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করি, জনচিত্তের উপর এর প্রভাব কতখানি তাও খুব ভালো রকমে জানি। আমাদের আন্তরিক কামনা, চলচ্চিত্র সত্যকার জাতীয় শিল্পের গৌরবময় মর্যাদা লাভ করুক, আমাদের নরনারীর অন্তরে অনাবিল আনন্দের ধারা প্রবাহিত করে দিক, আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের অগণিত মানুষকে পরিচালিত করুক কল্যাণ মহত্তর জীবনের পথে।

বর্ষার দিনে কলকাতা

[রচনার সংকেতসূত্র। প্রারম্ভিক ভূমিকা—বর্ষার দিনে কলকাতার রাজপথের দৃশ্য—প্লাবন বর্ষণে যানবাহন ও পথচারীদের অবস্থা—বর্ষা কৌতুকময়ী—বর্ষণের পরও পরে এই কৌতুকের প্রতিক্রিয়া থাকে না—বর্ষার মাধুর্যের স্মৃতি—উপসংহার।]

বর্ষার যে একটি বিশেষ রূপসৌন্দর্য রয়েছে তা পল্লীগ্রামে যেমন উপলব্ধি ও উপভোগ করা যায়, তেমনি শহরে—বিশেষত কলকাতার মতো বড়ো শহরে—নয়। কলকাতায় দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত মাঠ কোথায়, আমবাগান-বাঁশবাগান কোথায়, কোথায় প্রকাণ্ড নদী, আর খাল-বিল-হাওর? অবাধপ্রসারিত আকাশই বা এখানে কোথায়? সমারোহময়কালের বর্ষার আবির্ভাবের

প্রারম্ভিক ভূমিকা

এখানেই তো উপযুক্ত পরিভূমি। সেখানে মাঠভরা-ঘাসের চিহ্ন নেই, বাতাসের স্পর্শে কদম-কেয়ার বিকশিত হবার অবকাশ নেই, ডাহুক-ডাহুকী-কেকের ডিজরার নেই, সেখানে 'রিমঝিম-টিপ-টাপ' মহারোলমা বর্ষার 'ঘন গৌরবে' আত্মপ্রকাশ কেমন করে সম্ভব হতে পারে। কলকাতা শহরের একফালি আকাশে পুঞ্জপুঞ্জ মেঘের সমারোহ ও প্রকীর্ণ বিদ্যুৎবহ্নির দ্যুতি-ব্যাপ্ত ঝলমল চোখে পড়ে না, মেঘমন্দ্র গম্ভীর ধ্বনি তেমন কানে প্রবেশ করে না; এখানে বড়োবাজারের নিক্কণ, অবাধ গাড়ীঘোড়ার আর তার সঙ্গে ডাহুক-ডাহুকী-ব্যাঙের ডাকের মোহময় ঐকতান শুনতে পাওয়ার সুযোগ তেমন ঘটে না। কলকাতার ইঁটপাথরের মধ্যে বন্দী থেকে কোনো কবি 'বর্ষামঙ্গল' লেখেছেন বলে মনে হয় না। বর্ষাপ্রকৃতি তার রূপরস, স্বরূপ ও সংগীতরূপ দিয়ে সম্পূর্ণ ধরা দেয় পল্লীর মানুষের কাছে, মহানগরীর কর্মরত অধিবাসীর কাছে নয়। গ্রামদেশের বর্ষার সঙ্গে কলকাতার বর্ষার পার্থক্য অনেকখানি।

তথাপি বলব, এ মহানগরীতে বর্ষার আবির্ভাব একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। এখানে ঋতুবৈচিত্র্যের কিছুটা সংবাদ নিয়ে আসে বর্ষা আর গ্রীষ্ম। অপরাপর ঋতুর—শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্তের—সত্যকার রূপটি পাষাণকায়া কলকাতার বুকে তেমন ফোটে না। শরতের সোনামাখা মিষ্টি রোদ, শিউলির সুরভি, কাশের বনে মৃদু বাতাসের দোলা, চারদিকে অজস্র খুশির ঢেউ; হেমন্তের ধানকাটা মাঠে সন্ধ্যার বিষণ্ণতা, জ্যোৎস্নরাতে পাতলা কুয়াশার অবগুণ্ঠনের তলে শরৎলক্ষ্মীর অশ্রুছলছল চোখ; শীতের নিরাভরণ তপস্বিনীমূর্তি, সাজ-খসাবার ও সকল আসক্তিমোচনের ইঙ্গিত; মায়াবী বসন্তের উদ্দাম ক্ষ্যাপামি, ফুলফোটাবার অশ্রান্ত উল্লাস, তরুলতার পুষ্পিত প্রলাপ, প্রকৃতিলোকে ও জীবলোকে নির্বাধ জীবন-চাঞ্চল্য—মহানগরী কলকাতায় এ সমস্ত-কিছুরই তো প্রবেশ নিষেধ। এখানে সহজ প্রবেশের পথ পায় শুধু বর্ষা ও গ্রীষ্ম। গ্রীষ্ম তার খরদহনে, বর্ষা তার মেঘান্ধকার ও প্রবল বর্ষণে নিজ নিজ অস্তিত্ব ঘোষণা করে। তাই বলছিলাম, নিসর্গসংসারের রূপবৈচিত্র্যের স্বাদ কলকাতা শহরে না মিললেও বর্ষাঋতুকে উপেক্ষা করা চলে না।

* * *

বর্ষার কলকাতা—কখনো উপভোগ্য, কখনো বিরক্তিকর। এই কর্মমুখর বিশাল শহরটিতে বর্ষাদিনের একটি দৃশ্য কল্পনা করুন। আকাশে মেঘ করেছে, নভোদেশে বেশ একটা থম্‌থমে ভাব দেখা যাচ্ছে। খানিক পরে একটু বাতাস বইতে আরম্ভ করল, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হল। এবার পথচারীর কথা ভাবুন।

বর্ষায় কলকাতায় রাস্তাঘাটের দৃশ্য

দেখতে পাবেন, সকলে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, প্রকৃতির বিরূপতাসম্পর্কে এতক্ষণ যারা অসতর্ক ছিল, এখন তাদের সতর্ক না হয়ে উপায় নেই। সকলের চলার বেগ দ্রুততর হল। কেউ রাস্তার গাড়ীবারান্দায় আশ্রয় নিচ্ছে, যাদের ছাতা রয়েছে তারা ওটা খুলে জোরে জোরে পা ফেলছে, কেউ ট্রামে-বাসে চাপবার জন্যে ব্যস্ত। 'রিক্সা—রিক্সা' বলে কেউ চীৎকার করছে, আর যাদের পকেট ভারি তারা চট্ করে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ছে। মুহূর্তমধ্যে সারা কলকাতার চেহারাটি যেন একেবারে বদলে যায়।

বৃষ্টি ধরে না, বর্ষণ প্রবলতর হয়ে আসে। দেখতে দেখতে কতকগুলি বিশেষ রাস্তায় জল জমে ওঠে। এরূপ অবস্থায় ছাতা, বর্ষাতি, 'ক্যাপ' সবকিছু নিরর্থক। জল বেড়েই চলে, ফুটপাথ ডুবে যায়। কোথাও হাঁটু পর্যন্ত, কোথাও কোমর পর্যন্ত

জল। বড়ো চওড়া রাস্তাগুলি তখন খরস্রোতা খালের রূপ ধারণ করে। অল্পক্ষণ পরে ট্রামের গতি স্তব্ধ হয়ে আসে, তারা এগুতে আর পারে না, একটার পর একটা সারিসারি দাঁড়িয়ে যায়। যাত্রীবোঝাই বাসগুলি প্রবল বর্ষণ আর জলস্রোতকে উপেক্ষা করে কিছুক্ষণ চলতে থাকে, চলার বেগে জলের বুকে বড়ো বড়ো ঢেউ জাগে। ওই ঢেউয়ের আঘাত গিয়ে লাগে দুপাশের দোকানগুলির দরজায়, কোনো কোনো পথচারী ঢেউয়ের ধাক্কা সামলাতে না পেরে কাৎ হয়ে পড়ে জলের মধ্যে, জামাকাপড়ের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে—দেখলে মায়া হয়। অশান্ত বেবিট্যাক্সি-গুলি শান্তভাবে যখন জলের মধ্যে প্রায়-অর্ধেক ডুবে থাকে, তখন তাদের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, দুষ্টু ছেলেকে কেউ অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার শাস্তি দিয়েছে বুঝি। কিন্তু কোমরজল ভেঙে রিক্সাওয়ালা ঠুংঠুং শব্দ করে এগিয়ে চলে—ডবল ভাড়ার লোভ সে সামলাতে পারে না।

প্রবল বর্ষণে যানবাহন ও পথচারীদের অবস্থা

চারদিকে জল থৈ-থৈ করছে। এ যেন শহুরে মানুষগুলিকে নিয়ে পিতামহী প্রকৃতির নিষ্ঠুর কৌতুক। পায়ের জুতো তখন হাতে ওঠে, কাপড় গুটোতে গুটোতে কখন যে হাঁটুর উপরে চলে আসে তা বোঝাই যায় না, পাৎলুন গুটিয়ে হাঁটবার অদ্ভুত ভঙ্গিটি দেখলে হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। মেয়েদের অবস্থা আরো করুণ। দামী শাড়ীতে কাদামাখা জল, শালীনতাবোধে শাড়ী গুটিয়ে নেবার অসুবিধে, দু'পায়ের সুন্দর স্যাণ্ডেল জলের তলায় নিমজ্জিত, কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগটি সম্পূর্ণ সিক্ত, ভেজা রুমাল দিয়ে ঘনঘন মাথার চুল মোছা—সে এক কারুণ্যমিশ্রিত কৌতুকজনক দৃশ্য।

বর্ষা কৌতুকময়ী

দুরন্ত ছেলেরা ভারি মজা পায়, খালি পায়ে তারা রাস্তায় নেমে এসে কোমরজলে সাঁতার কাটবার চেষ্টা করে। কেউ ভাঙা তক্তাপোষ অথবা খালি পিপে ভাসিয়ে দিয়ে তার উপর চেপে বসে ভারি আমোদ পায়। ছোটশিশুরা দরজা-জানালার ধারে স্রোতহীন বদ্ধজলে কাগজের নৌকো ভাসাতে ভালোবাসে। ইস্কুলে 'রেনি-ডে' হলে ছেলেরা দল বেঁধে ভিজতে ভিজতে বাড়ী ফেরে। কেউ-বা চলচ্চিত্রগৃহাভিমুখে অভিযান করে, টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে সিনেমা দেখে। বড়বাবুর বড়ো কথার ভয়ে কেরানীকুলের অনেকেই জলকাদা ভেঙে ঝড়ের কাকের মতো সিক্তদেহে আপিসের দিকে চলতে থাকে। তাদের মধ্যে যারা একটু বেপরোয়া তারা বাড়ীতে ফিরে দিবানিদ্রা উপভোগ করে। বাইরে না গেলে যাদের চলে তারা গল্পগুজবে, অথবা আধখোলা জানালার

সকলের কাছে বর্ষার প্রতিক্রিয়া সমান নয়

কাছে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে সময় কাটিয়ে দেয়। যাদের কবিমন তারা বৃষ্টির সুরে নিজেদের প্রাণের সুর মেলায়, বাদলা দিনের বাতাস তাদের হৃদয়ের উত্তাপকে স্তিমিত করতে পারে না। তবে একথাও সত্য যে, পাষাণপুরী কলকাতা 'অলকাস্বপ্ন' দেখার উপযুক্ত স্থান মোটেই নয়।

কলকাতা শহরে যেমন পাকাবাড়ীর প্রাচুর্য, তেমনি পুরাণো জীর্ণ বস্তি-বাড়ীরও অসদ্ভাব নেই। এসব ঘরে অসংখ্য দরিদ্র মানুষ বাস করে। ঘনবর্ষার দিনে এরাই সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়, এদের দুর্ভোগের সীমা থাকে না।

দরিদ্র মানুষের দুর্গতি

অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি হলে ছাদের ফুটো দিয়ে অবিরল জল পড়তে থাকে, জামাকাপড় বিছানাপত্র সব ভিজে যায়। বাইরের প্রবল জলস্রোত বিচিত্র রকমের আবর্জনা নিয়ে নীচু জায়গার ঘরগুলিতে ঢুকে পড়ে—তখন এক দুঃসহ কদর্য অবস্থার সৃষ্টি হয়। এরূপ অবস্থায় অন্যকোনো বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়া কিংবা রাস্তায় এসে দাঁড়ানো ছাড়া বস্তীবাসীদের গত্যন্তর থাকে না। শহরের বস্তিগুলি ধনতান্ত্রিক সমাজের কলঙ্কের পরিচয় বহন করে।

তবে কলকাতায় স্বল্পবৃষ্টি তেমন খারাপ লাগে না, বিশেষত রাতের বেলা। প্রচণ্ড উত্তাপে এখানকার মানুষগুলোর কী যে কষ্ট হয়, তা বর্ণনাতীত। বেশির ভাগ মানুষই তো গরীব, কয়জনের বাড়ীতেই-বা ইলেকট্রিক পাখা রয়েছে। আর, সূর্যের খরতাপে চারদিকের বাতাস যখন আগুনের মতো হয়ে ওঠে তখন ফ্যানের

উপসংহার

হাওয়া তো গায়েই লাগে না। দিনের বেলাটি কাজ-কর্মে কোনো রকমে কেটে যায়। কিন্তু দীর্ঘ রাতটি—কিছুতেই সে কাটতে চায় না। অসহ্য গরমে বিছানায় ছটপট করতে হয়, ঘুম চোখে আসে না, বদ্ধ ঘরে গুমোট হাওয়ার প্রকোপ একেবারে দুর্বিষহ। গ্রীষ্মের দিনে এরূপ অবস্থায় মানুষ আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, মেঘের আনাগোনা দেখলে তারা খুশিই হয়, ঠাণ্ডা বাতাসে ভর করে বৃষ্টি নামলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। রাত্রে একটুখানি ঘুমোতেও যদি না পারল তাহলে শহরের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত মানুষগুলি বাঁচে কী করে? তাই কলকাতাবাসীর জীবনে অল্পবৃষ্টি—ভিজে বাতাসের কিছুটা স্পর্শ—সুখেরই বলতে হবে। কদমকেয়ার গন্ধ হাওয়ায় ভেসে না-ই বা এলো, মন্দাক্রান্তা ছন্দে 'মেঘদূত'-আবৃত্তি সম্ভবপর না-ই বা হলো, তরুলতার শ্যামল সৌন্দর্যের সমারোহ চোখে না-ই বা পড়লো, সাতরঙা রামধনুর বিচিত্র বর্ণবিলাস না-ই বা দেখা গেল—গ্রীষ্মতপ্ত মহানগরীতে হালকা বর্ষণ যে সুখদায়ক, এ বিষয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ নেই।

হিমালয়-অভিযান ঃ এভারেষ্ট-বিজয়

[রচনার সংকেতসূত্র ঃ প্রারম্ভিক ভূমিকা—এভারেস্টের উচ্চতানির্ণয় ঃ রাধানাথ শিকদার—দেশদেশান্তরের দুঃসাহসী মানবসন্তানের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা—শুরু হইল হিমালয়-অভিযান—তৃতীয় অভিযান—চতুর্থ অভিযান—১৯৫১ সালের অভিযান—১৯৫৩ সালের অবিস্মরণীয় অভিযান—এভারেস্ট-অভিমুখে তেনজিং ও হিলারী—উপসংহার ।]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

যুগযুগান্তর হইতে পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয় বিশ্বের মানুষের এক চিরন্তন বিস্ময়ের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা বর্ণনা করিয়া পুরাণশাস্ত্রকার বলিয়াছেন—'সমুদ্রের উত্তরে হিমাদ্রির দক্ষিণে অবস্থিত যে-বর্ষ তাহারই নাম ভারতবর্ষ।' সিন্ধুগঙ্গার উপত্যকাভূমি আর্যাবর্ত এই হিমালয়েরই সৃষ্টি। ভারতীয়েরা কল্পনা করিয়াছেন পিতা হিমালয়, কন্যা গঙ্গা ; তাই ভারতীয় চিন্তাধারায় ও কবিকল্পনায় অভ্রংলিহ সমুচ্চ হিমাচল লাভ করিয়াছে এক মহিমাভাস্বর মূর্তি। হিমালয়ের তুষার-সমাবৃত দুর্গম শৃঙ্গগুলি স্মরণাতীত কাল হইতে ধর্মপ্রচারক, ভূতাত্ত্বিক, বিজ্ঞানী, অভিযাত্রিক ও কাব্যকারগণের অন্তরে এমন এক আকর্ষণের সৃষ্টি করিয়াছে যাহার প্রভাব দুরতিক্রমণীয়। এই দুর্বার আকর্ষণবশে ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অগ্রসর হইয়াছেন হিমাচলের দুর্গম শৃঙ্গে আরোহণের জন্য। আর, যাঁহারা হিমালয়ের প্রত্যক্ষ কোনো অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারেন নাই তাঁহারা স্বপ্নকল্পনার বিচিত্র বর্ণে আপনার মানসলোকে ইহার রহস্যময় মূর্তিটি আঁকিয়া লইয়াছেন। গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ, মানসসরোবর ও কৈলাস প্রভৃতি পুণ্যতীর্থক্ষেত্রে ভারতীয় সন্ন্যাসীদলের শঙ্কাহীন যাত্রা একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক মহিমায় মণ্ডিত, অপরদিকে তেমনি দুরধিগম্য এই নভোস্পর্শী পর্বতের দুর্নিবার আকর্ষণে পূর্ণ।

এভারেস্টের উচ্চতানির্ণয় : রাধানাথ শিকদার

এই আকর্ষণ ভারতীয়গণকে যেমন প্রভাবিত করিয়াছে, ঠিক তেমনি সমান-ভাবেই দূরদূরান্তের দুঃসাহসী বিদেশীর চিত্তকে নিঃশব্দ আহ্বান জানাইয়াছে। হিমালয়ের উত্তরপূর্ব অঞ্চলের ভূমিজরীপবিষয়ে তথ্য সংগ্রহকালে বাংলার হিন্দুকলেজের গণিতশাস্ত্রে মেধাবী ছাত্র রাধানাথ শিকদার সার্ভেয়র-জেনারেল স্যর জর্জ এভারেস্টের অধীনে 'গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া'র দপ্তরে সমীক্ষাবিভাগের কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি আপন কৃতিত্বের জোরে এই বিভাগের প্রধান 'কম্পিউটর'-এর পদে উন্নীত হন। ইংরেজি ১৮৫২

সালে এই প্রতিভাবান বাঙালী তাঁহার অকাট্য যুক্তিপ্রমাণের দ্বারা দেখাইলেন যে, হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উচ্চতা উনত্রিশ হাজার দুই ফুট। এই চূড়াটির তিব্বতী নাম ছিল 'চোমোলাংমা' অর্থাৎ জগজ্জননী। কিন্তু ভারতশাসক ইংরেজকর্তৃপক্ষ ইহার নূতন নামকরণকালে বাঙালী রাধানাথের কৃতিত্বের কথা স্মরণ করিলেন না—সমীক্ষাবিভাগের পূর্বতন অধ্যক্ষ জর্জ মণ্ট এভারেস্টের নাম স্মরণ করিয়া ইহাকে 'মণ্ট এভারেস্ট' নামে চিহ্নিত করিলেন। পরে সাধারণের মুখে মুখে 'মণ্ট এভারেস্ট' পরিবর্তিত হইল 'মাউণ্ট এভারেস্ট' নামে। ধীরে ধীরে পৃথিবীর চতুর্দিকে বিশ্বের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গের কথা ছড়াইয়া পড়িল—চঞ্চল হইয়া উঠিল অভিযাত্রীদলের চিত্ত।

দেশদেশান্তরের দুঃসাহস মানবসন্তানের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা

মানুষই কেবল বলিতে পারে—'যেমন করে ঝর্ণা নামে দুর্গম পর্বতে—নির্ভাবনায় ঝাঁপ দিয়ে পড় অজানিতের পথে'। দুঃসাহসিকতার প্রদীপ্ত অক্ষরেই মরণবিজয়ী মানুষের নিত্য-অগ্রসরমানতার উজ্জ্বল ইতিহাস লিখিত। তাহার চিত্তের অবিচল সংকল্প—অজানাকে জানিবে, দূরকে নিকট করিবে, দুর্গমের বুকে আঁকিয়া দিবে নিজের পদচিহ্ন। পৃথিবীর দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকে সে কোনোদিন মানে নাই, প্রকৃতির কুটিল ভ্রূকুটিকে সে ডরায় নাই, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াইয়া সে ভীতিবিহ্বলতা অনুভব করে নাই। সুদূর অজানিতের, অপরিচিতের রহস্যময়তা তাহাকে নিরন্তর অহ্বান জানাইয়াছে। এই আহ্বানে সাড়া দিয়া সে বলিয়াছে :

'তপতী কুমারী মরু চাহে আজ প্রথম পায়ের ধূলি,
অজানা নদীর উৎস ডাকিছে ঘোমটা আধেক খুলি ;
নিসঙ্গ গিরিচূড়া
তুহিন-তুষার-শয়নে আমারে স্মরিছে বিরহাতুরা।
উত্তরমেরু মোরে ডাকে ভাই, দক্ষিণমেরু টানে,
ঝটিকার মেঘ মোরে কটাক্ষ হানে।'

প্রকৃতির কোনোরূপ বাধা মানুষের আকাঙ্ক্ষা-উদ্যমকে প্রতিহত করিতে পারে নাই,—জলে-স্থলে-নভোদেশে তাহার গতি অপ্রতিহত। মৃত্যুর মূল্যে মানুষ মেরুপ্রদেশ জয় করিল। ইহার পরবর্তী সংকল্প দুরারোহ হিমালয়শৃঙ্গে অভিযান—এভারেস্টবিজয়।

বাহির হইয়া পড়িল অসম সাহসী অভিযাত্রীদল। ১৯১১ সালে সর্বপ্রথম এভারেস্ট-অভিযান শুরু হয়—ইহার নেতৃত্ব করিলেন কর্ণেল হাওয়ার্ড বেরি। এজন্য

ইংলণ্ডের 'রয়েল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটি'কে ধন্যবাদ। রুদ্র প্রকৃতির প্রতিকূলতায় কিন্তু এই অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইল না, কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পর্বতারোহিরা ফিরিয়া আসিলেন। ব্যর্থতা সফলতার সোপান। ইহাতে মানুষের অপরাজেয় আকাঙ্ক্ষা আরো উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। ১৯২২ সালে অপর একদল পর্বতারোহী দ্বিতীয় অভিযান শুরু করিলেন—জেনারেল ব্রুস্ ছিলেন ইঁহাদের নেতা। এই অভিযাত্রীদলের মধ্যে ম্যালোরি, নর্টন ও সোমারভেল-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা ২৭০০০ ফুট পর্যন্ত আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এক তুষারহ্রদে পড়িয়া সাতজন শেরপার আকস্মিক মৃত্যুহেতু দ্বিতীয় অভিযানও ব্যর্থ হইল।

শুরু হইল হিমালয়-অভিযান

তৃতীয় অভিযান আরম্ভ হইল ১৯২৪ সালে—জেনারেল ব্রুসের নেতৃত্বে। পূর্ববর্তী অভিযানের ম্যালোরি এবং নর্টনও এই দলের সঙ্গে ছিলেন। ইঁহারা ২৮০০০ হাজার ফুট পর্যন্ত অতিক্রম করিয়া অবশেষে ফিরিতে বাধ্য হইলেন। দৈহিক অসুস্থতা সুদক্ষ পর্বতারোহী সোমারভেল-এর অগ্রগতির পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইল, আর তুষারে প্রতিফলিত অত্যুজ্জ্বল সূর্যকিরণ নর্টন-এর দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়া দিল। এহেন মর্মান্তিক বিপর্যয় দেখিয়াও ম্যালোরি কিন্তু সাহস হারাইলেন না, তিনি আরো একশত ফুট উচ্চে আরোহণ করিলেন। তারপর কিন্তু ম্যালোরির কোনো সন্ধান মিলিল না—তিনি এবং তাঁহার সঙ্গী আরভিন নিখোঁজ হইয়া গেলেন। অনেকের ধারণা, রংবুক-তুষারহ্রদেই তাঁহারা সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছেন।

তৃতীয় অভিযান

চতুর্থ অভিযান হিউ রাটলেজের নেতৃত্বে ১৯৩৩ সালে পরিচালিত হইয়াছিল। এই দলের এরিক শিপটন ও ফ্রাঙ্ক স্মাইথির নাম উল্লেখনীয়। কিন্তু ইঁহারা ২৮১০০ ফুটের বেশী পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিতে পারেন নাই। ১৯৩৪ সালে মরিস উইলসন নামক এক ব্যক্তি একাকী এভারেস্টশৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা করেন এবং অবশেষে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার অল্পকাল পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধে, যুদ্ধের জন্য হিমালয়-অভিযান কিছুকালের জন্য বন্ধ থাকে।

চতুর্থ অভিযান

১৯৫১ সালের অভিযাত্রীদল হিমালয়ের পথঘাট, আবহাওয়া ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া ফিরিয়া আসেন। তাঁহাদের সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া 'সুইস ফাউণ্ডেশন ফর আলপাইন রিসার্চ' ১৯৫২ সালে এভারেস্ট-বিজয়-অভিযানে বাহির হইলেন। মোট এগার জন সদস্য। ইঁহাদের মধ্যে আটজন পর্বতারোহী ও তিনজন

১৯৫১ সালের অভিযান

বৈজ্ঞানিক ছিলেন। এই দলের নেতার নাম উইস ডুরাণ্ট। সুইস-অভিযাত্রীরা দক্ষিণ দিকের নতুন পথে অভিযান চালনা করিয়া ২৮,২১৫ ফুট পর্যন্ত আরোহণ করেন। সুইসদলের সহিত বর্তমানে বিশ্ববিখ্যাত তেনজিং শেরপা পর্বতারোহণ করিয়াছিলেন। ইনি সর্বপ্রথম সমুচ্চ এভারেস্টশৃঙ্গে উঠিয়াছিলেন বলিয়া নেপালের মহারাণা সম্মানসূচক 'নেপাল-প্রতাপবর্ধক' পদক ইঁহাকে দান করিয়াছিলেন।

তুষারশার্দূল তেনজিং

এই অভিযানের পর শারীরিক ও সাংসারিক নানা কারণে তিনি নিজেকে যখন বিড়ম্বিত মনে করিতেছিলেন তখন বিধাতার আশীর্বাদের ন্যায় তাঁহার কাছে অনুরোধ আসিল ১৯৫৩ সালের ব্রিটিশ অভিযাত্রীদলের নেতা কর্নেল হাণ্টের—হিমালয়-অভিযানে তাঁহার [হাণ্টের] সহযাত্রী হইবার জন্য। এই অনুরোধে তেনজিং সানন্দে সাড়া দিলেন, জানাইলেন—হাণ্টের সহযাত্রী হইতে তিনি সম্মত আছেন। সুইস আল-পাইন ক্লাব ও ব্রিটিশ রয়েল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটি যুগ্মভাবে এই অভিযাত্রীদল গঠন করেন। ইহার সদস্যসংখ্যা ছিল বারজন। অধিনায়ক হইলেন কর্নেল এইচ. সি. হাণ্ট। ২০ জন শেরপা, ৩৬২ জন মালবাহী শ্রমিক ও দশ হাজার পাউণ্ড মাল লইয়া অভিযান শুরু হয়।

১৯৫৩ সালের অবিস্মরণীয় অভিযান

১৯৫৩ সালের ১০ই মার্চ অভিযাত্রিগণ চিররহস্যাবৃত এভারেস্ট-গিরিশৃঙ্গের দিকে যাত্রা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা চলিয়াছেন চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করিয়া। ১৩০০০ হাজার ফুট উচ্চে নামচে বাজারে পৌছিয়া পর্বতারোহিগণ বিশ্রাম লইলেন। ইহার পর তাঁহাদের অগ্রসরণ কিন্তু পূর্বের মতো আনন্দপ্রদ হইল না—বিরূপ প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাদিগকে আগাইয়া যাইতে হইবে। ২১০০০ ফুট উচ্চে কর্নেল হাণ্ট প্রথম তাঁবু ফেলিলেন। ২৬শে মে আরোহীদল অষ্টম তাঁবুতে পৌছিলেন। চতুর্দিকে প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইল অবিশ্রান্ত তুষারপাত—অসহ্য ঠাণ্ডায় অভিযাত্রীরা জমিয়া যাইবার মতো হইলেন। পরের দিনও প্রকৃতির এই দুর্যোগময়তা সমান-ভাবে চলিল। তার পরের দিন প্রকৃতি কিছুটা শান্তভাব ধারণ করিল। সকলেই অসুস্থতা অনুভব করিতেছেন, দেহে-মনে নামিয়াছে ক্লান্তি—অবসাদ। এরূপ অবস্থার মধ্যেও তাঁহারা ২৭,৯০০ ফুট উচ্চে উঠিলেন। নবম তাঁবু হইতে গ্রেগরী, লোনে ও নিমা নীচের তাঁবুতে নামিয়া আসিলেন। রহিলেন কেবল হিলারী ও তেনজিং। ইঁহারা দুইজনে সারারাত ধরিয়া জুতা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী

স্টোভের আগুনে গরম করিলেন, এবং তিনঘণ্টা ধরিয়া অক্সিজেন লইয়া নিজেদের সুস্থ রাখিলেন।

ক্রমে ভোর হইয়া আসিল। প্রভাতে তুষারশার্দূল তেনজিং আর নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসী হিলারী আবার যাত্রা আরম্ভ করিলেন। তুষারস্তূপের উপর সিঁড়ি কাটিয়া কাটিয়া তাঁহারা অতি মন্থর গতিতে অগ্রসর হইলেন। কোথাও-বা টিকটিকির মতো হাঁটিয়া, কোথাও-বা কুঁজো হইয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিতে চলিতে দেখিলেন চূড়ার একধার চেপ্টা, অন্যধার খাড়াই—উঠিবার কোনো উপায় নাই। ক্ষণকালের জন্য তাঁহারা বিহ্বলতা অনুভব করিলেন। পরমুহূর্তেই তেনজিং-এর মুখ হইতে নির্গলিত হইল উল্লসিত ধ্বনি—'আমরা উঠিয়াছি, উঠিয়াছি।' হিলারী তেনজিংকে প্রশান্ত হাস্যে অভিনন্দন জানাইলেন। ১৯৫৩ সালের ২৯শে মে শেরপা তেনজিং পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশিখরে ভারত, নেপাল, ব্রিটেন ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের পতাকা বরফ-কাটা কুঠারে বাঁধিয়া তুলিয়া ধরিলেন। ১৮৫২ সালে বাঙালী রাধানাথ প্রথম এভারেস্টের উচ্চতা নির্ণয় করেন, আর ১৯৫৩ সালে বাংলার তথা ভারতের তেনজিং বিশ্বের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। তাঁহার একমাত্র সহযাত্রী নিউজিল্যাণ্ডের হিলারী।

এভারেস্ট-অভিমুখে তেনজিং ও হিলারী

এভারেস্ট-বিজয়-অভিযান সফলতামণ্ডিত হইল, মানুষের কাছে এতকাল পরে উদ্ধত গিরিচূড়া মস্তক অবনত করিল। পূর্ববর্তী অভিযাত্রিগণের দুঃখ-বিপদ-মৃত্যুবরণের মূল্যে আহৃত অভিজ্ঞতা তেনজিং ও হিলারীর যাত্রাপথের পাথেয় হইয়াছে, পূর্বগামীদের ব্যর্থতা ইঁহাদিগকে সফলতার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।

উপসংহার

এভারেস্ট-অভিযান পৃথিবীর মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই দুঃসাহসিক অভিযান প্রমাণ করিল, মানুষের মহতী আকাঙ্ক্ষার কাছে অজেয় বলিয়া কিছুই নাই—প্রকৃতির কোনো বাধার সম্মুখে সে পরাভব স্বীকার করিবে না। জয় হোক মানবমনের অমিত ইচ্ছাশক্তির, জয় হোক মানুষের অকম্পিত সংকল্পের।

বেতারবার্তা

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—দূরকে নিকট করিবার আকাঙ্ক্ষা হইতেই বেতারবার্তার সৃষ্টি—রেডিওর প্রেরকযন্ত্র ও গ্রাহকযন্ত্র—বেতারবার্তার বহুবিধ উপযোগিতা—সংস্কৃতি ও লোকশিক্ষাপ্রচারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীর বড়ো একটি দান রেডিও—জনকল্যাণসাধনের মাধ্যমহিসাবে রেডিও—বেতারবার্তাকে সর্বসাধারণের সম্পদ করিয়া তুলিতে হইবে—উপসংহার।]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

মানুষের জ্ঞানের পরিধি যতই প্রসারিত হইতেছে, বুদ্ধিশক্তি যতই বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, ততই তাহার চোখে ধরা পড়িতেছে রহস্যময়ী প্রকৃতির নানা গোপন তথ্য। যে-প্রকৃতির ভীষণতার কাছে মানুষ একদিন অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, সেই প্রকৃতিকেই আজ সে নিজের আয়ত্তে আনিয়া নানাকাজে লাগাইতেছে—মানুষের বুদ্ধির কাছে উদ্ধত নিসর্গপ্রকৃতিকে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। কৌতূহলী বিজ্ঞানী যেদিন বিদ্যুৎশক্তি আবিষ্কার করিল, যেদিন তাহার কাছে ধরা পড়িল ইথর আর ইলেক্‌ট্রনের গোপন রহস্য, সেদিন মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হইল—টেলিফোন-টেলিগ্রাফের উদ্ভাবনা এক পরমাশ্চর্য বস্তুরূপে জগৎকে চমৎকৃত করিল। ইহার পরেই বিস্ময়কর বেতারবার্তার সৃষ্টি।

দূরকে নিকট করিবার আকাংক্ষা হইতেই বেতার-বার্তার সৃষ্টি

টেলিগ্রাফ, টেলিফোনে আমরা দেখি, তারের সহায়তায় কথা ও শব্দ একস্থান হইতে দূরবর্তী অন্যস্থানে অতি সহজেই প্রেরিত হইতেছে। মানুষ ইহাতেও যেন তৃপ্ত থাকিতে পারিল না, সে চাহিল বিনাতারে জগতের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে মনের কথাকে প্রেরণ করিতে। দৈনন্দিন জীবনে পরস্পরের সঙ্গে যখন আমরা আলাপ-আলোচনা করি, তখন কোনো তারের সাহায্য আমাদিগকে লইতে হয় না। বিজ্ঞানী ভাবিল, অল্প-দূরত্বের মধ্যে যদি বিনাতারে পরস্পরের সহিত কথা বলা সম্ভব হয় তবে দূরদূরান্তরে অবস্থিত মানুষের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব হইবে না কেন? বিজ্ঞানীর দূরকে নিকট করিবার এই যে অশ্রান্ত প্রয়াস, ইহার ফলে একদিন আবিষ্কৃত হইল রেডিওফোন, আবিষ্কৃত হইল বেতারবার্তা। এখন মুহূর্তমধ্যে একদেশের সংবাদ অন্যদেশে প্রচারিত হইতেছে,—মানুষের কাছে পৃথিবীর দূরত্ব আজ একেবারে ঘুচিয়া

গিয়াছে। ইতালীয় বিজ্ঞানী মার্কনিকে আমরা রেডিও-র আবিষ্কারক বলিয়া জানি। কিন্তু এই বিস্ময়াবহ যন্ত্রটি তিনি একক প্রচেষ্টায় উদ্ভাবন করেন নাই, ইহার আবিষ্কারের পিছনে রহিয়াছে বহু বিজ্ঞানীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণা।

যাহাকে শব্দ বলা হয়, তাহা ইথরের কম্পনসমষ্টি ছাড়া আর-কিছু নয়। বেতারকেন্দ্রে মাইক্রোফোনের সাহায্যে যে-শব্দতরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহাকে প্রথমে বিদ্যুৎতরঙ্গে এবং বিদ্যুৎতরঙ্গ হইতে পরে ইথরতরঙ্গে পরিণত করা হয়। ইথরতরঙ্গে পরিণত হইয়া ইহা দিগ্‌দিগন্তে বিকীর্ণ হইতে থাকে। বেতারকেন্দ্রে যে-যন্ত্রটি থাকে তাহাকে বলা হয় প্রেরকযন্ত্র; অন্যদিকে যাহারা বেতারবার্তা শুনিতে চায় তাহাদেরও একটি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, উহার নাম গ্রাহকযন্ত্র। প্রেরকযন্ত্র হইতে উত্থিত ইথরতরঙ্গ গ্রাহকযন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'আকাশতারে' আসিয়া প্রতিহত হয়। সেই প্রতিহত তরঙ্গধ্বনিকে গ্রাহকযন্ত্রটি প্রথমে বিদ্যুৎতরঙ্গে রূপান্তরিত করিয়া পরে শব্দতরঙ্গে পরিণত করে। তখনই আমরা একস্থান হইতে প্রচারিত কথা, সংগীত ইত্যাদি অন্যস্থানে বসিয়া সহজ স্বাভাবিকভাবে শুনিতে পাই।

রেডিও-র প্রেরকযন্ত্র ও গ্রাহকযন্ত্র

বিজ্ঞানীদলের বিচিত্র আবিষ্কার মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিশ্বমুখী করিয়া তুলিয়াছে—বিশ্বমানবের কল্যাণের পথটি উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছে। রেডিও-যন্ত্রের আবিষ্কারের মধ্যেও রহিয়াছে মানবকল্যাণের অজস্র সম্ভাবনা। আনন্দ-দানে, শিক্ষাপ্রচারে, জ্ঞানবিতরণে রেডিও-র সীমাহীন উপযোগিতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। 'ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন' এবং 'আমেরিকান রেডিও ব্রডকাস্ট' লক্ষ লক্ষ মানুষকে আনন্দ, শিক্ষা ও জ্ঞান বিতরণ করিতেছে। ভারতবর্ষে কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে বেতারপ্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের দেশে বর্তমানে বহু ধনীর গৃহে, বড়ো বড়ো দোকানে রেডিওফোন দৃষ্ট হয়। আশা করা যায়, একদিন এমন একটি সময় আসিবে, যখন প্রত্যেক শহরে, গ্রামে গ্রামে, সাধারণ গৃহস্থঘরে পর্যন্ত বেতারযন্ত্রের অসদ্ভাব হইবে না।

বেতারবার্তার বহুবিধ উপযোগিতা

বেতারবার্তা সত্যই আধুনিক যুগের একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার। জগতের কোন্ একপ্রান্তে একজন মনীষী বক্তৃতা করিতেছেন, তাহা আমরা নিজের ঘরে বসিয়াই শুনিতে পাইতেছি। পৃথিবীর কোন্ দূরতম প্রান্তে একটি ঘটনা ঘটিল,—পরমুহূর্তে বেতারবার্তার সহোয্যে সেইসংবাদ জগতের অন্যপ্রান্তস্থিত মানুষের কাছে গিয়া পৌছিল। পৃথিবীর দূরত্ব ও মানুষে-মানুষে ব্যবধানটি যেন আজ একেবারে

ঘুচিয়া গিয়াছে, জগদ্বাসীর মানসমিলনক্ষেত্রটি সহজ ও প্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষে-মানুষে এই যে ঘনিষ্ঠ মিলনের ভাব, ইহাই তো আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে লক্ষণীয় বিশিষ্টতা। রেডিওফোন মানুষকে শুধু আনন্দবিতরণের মাধ্যম নয়, কেবলমাত্র সংগীত, অভিনয় ইত্যাদি শুনাইয়াই ইহার প্রয়োজন শেষ হইয়া যাইবে না—ইহা মানুষকে দিবে শিক্ষার আলো, তাহার দ্বারে পৌছাইয়া দিবে জ্ঞানের বার্তা। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ক নূতন নূতন ভাবধারা ও চিন্তাধারা জগতের মধ্যে নিরন্তর যে-আলোড়ন সৃষ্টি করিতেছে, তাহারও সঙ্গে সহজে প্রত্যেক মানুষের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটাইয়া দিতে পারে এই বেতারবার্তাবাহী যন্ত্রটি।

সংস্কৃতি ও লোকশিক্ষা-প্রচারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীর বড়ো একটি দান রেডিও

বর্তমানে উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষাপ্রচার ও নানাবিধ জনকল্যাণের ক্ষেত্রে খুব বড়ো দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে সেখানকার বেতারপ্রচারকেন্দ্রগুলি। অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়ে এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের মনের আনন্দ ও জ্ঞানবিতরণের ক্ষেত্রে বেতারকেন্দ্রের প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসার্হ। মানুষকে মানুষ করিয়া তোলা, তাহাকে পরিপূর্ণ জীবনের ইঙ্গিত দেওয়া পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির কর্তৃপক্ষ নিজেদের প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। ওই সকল দেশের বেতারবার্তার প্রচারআদর্শ যদি আমাদের দেশেও অনুসৃত হয়, তবে দেশের অগণিত অধিবাসী তাহাদের মনুষ্যত্ববিকাশের পথে অনেকখানি সহায়তা লাভ করিবে।

জনকল্যাণসাধনের মাধ্যম হিসাবে রেডিও

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় শিক্ষাব্যাপারে আমরা অবিশ্বাস্যভাবে পিছনে পড়িয়া আছি। অশিক্ষা ও কুশিক্ষা আমাদের মনের চারিদিকে অন্ধকারের প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছে। এদেশের সরকার ইচ্ছা করিলে বেতারবার্তার সাহায্যে অতি সহজে জনশিক্ষা সম্পর্কিত বিরাট দায়িত্ব পালন করিতে পারেন—কুসংস্কারে আচ্ছন্ন দেশবাসীর চিত্তদৈন্য দূর করিতে পারেন। লঘুপ্রকৃতির গীতবাদ্য, নীচু স্তরের অভিনয়কে প্রাধান্য না দিয়া, বেতারে যদি বিশিষ্ট মনীষীদের নানাবিষয়িনী বক্তৃতাপ্রচারের ব্যবস্থা করা হয়, সর্বস্তরের নরনারীর জন্য যদি প্রচারসূচী প্রস্তুত করা যায়, তবে অত্যল্পকাল-মধ্যেই জনসাধারণ অশিক্ষা ও কুশিক্ষার হাত হইতে মুক্তি পাইতে পারে। রেডিওকে শুধু শহরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না—গ্রামে গ্রামে যাহাতে সকলেই বেতারবার্তা শুনিবার সুযোগ পায়, সরকারকে তাহার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বেতারবার্তাকে সর্বসাধারণের সম্পদ করিয়া তুলিতে হইবে

বেতারবার্তা আজ মানুষের কত বিচিত্র প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে। সমুদ্রগামী স্টীমারে, আকাশচারী এরোপ্লেনে, দুর্গম স্থলপথ ও জলপথের যাত্রীদের সঙ্গে একটা করিয়া রেডিও-যন্ত্র থাকে। সংবাদপত্রের দৈনন্দিন খবর সরবরাহের জন্য বেতারবার্তা অবশ্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর আবিষ্কার একদিকে যেমন মানুষের বহুবিধ কল্যাণ-সাধন করিতেছে, অন্যদিকে মানুষকে নানাভাবে বিপথগামী করিয়াও তুলিতেছে। যুদ্ধকালীন পৃথিবীতে দেখা গিয়াছে, বেতারবার্তা মিথ্যাপ্রচারের দ্বারা দেশের জনগণকে নির্বিচারে সর্বনাশের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। এখনও দেখা যাইতেছে, বেতারবার্তা অজস্র মিথ্যা, অর্ধসত্য প্রচার করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত ও প্রবঞ্চিত করিতেছে। ইহা কিন্তু রাষ্ট্রের অমঙ্গলই ডাকিয়া আনিতেছে। এজন্য দায়ী হইল হীনস্বার্থ-প্রণোদিত মানুষের অশুভ বুদ্ধি। বেতারবার্তাপ্রচারের পিছনে যদি শুভবুদ্ধির প্রেরণা বর্তমান থাকে, তবে ইহা বিশ্বের জনকল্যাণের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিতে পারে। বেতারবার্তার এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎই আমরা কামনা করি।

উপসংহার

ধর্মঘট

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও শ্রেণীসংগ্রাম—শ্রমিকধর্মঘটের আত্মপ্রকাশ—যান্ত্রিক উৎপাদন ও শ্রমিকশোষণ—শ্রমিকের সঙ্ঘশক্তি ও ঐক্যচেতনার প্রয়োজনীয়তা—ধর্মঘট সংগ্রামী শ্রমিকের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র—ধর্মঘটের ক্ষতিকর দিক—উপসংহার।]

সম্প্রতি পৃথিবীতে পরস্পরবিরোধী দুইটি শ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—পুঁজিপতি ধনিকশ্রেণী ও সর্বহারা শ্রমিকগোষ্ঠী। এই শ্রেণীবিরোধ যতই জটিল রূপ ধারণ করিতেছে, সমাজে ততই একদিকে দেখা দিতেছে নিষ্ঠুর শোষণপ্রবৃত্তি, অন্যদিকে উগ্র হইয়া উঠিতেছে ভয়াবহ অসন্তোষ ও পুঞ্জীভূত বিদ্রোহের ভাব। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তির পরিধি দিন দিন প্রসারিত হইতেছে, প্রতিনিয়ত কত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবন হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সেই অনুপাতে মানুষ মানসিক শান্তি ও

প্রারম্ভিক ভূমিকা

স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হইতেছে না। তাই মনে হয়, বর্তমানের এই যান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যে কোথায় যেন একটা অভিশাপ লুকাইয়া রহিয়াছে।

আধুনিক যুগটিকে আমরা যন্ত্রযুগ-নামে চিহ্নিত করিতে পারি। এই যন্ত্রযুগে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই শ্রমিক ও কলকারখানার মালিকদের মধ্যে একটা অনভিপ্রেত সংঘর্ষের ভাব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করিয়াই বর্তমানে আর্থিক জগতের চাকা ঘুরিতেছে। মালিকগণ নিজেদের মূলধনে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেখানে শ্রমিকদের নিযুক্ত করে, এবং শ্রমিকের কঠোর শ্রমের সহায়তায় উৎপাদিত পণ্যাদি বিক্রয় করিয়া মোটা লাভের অংশ নিজেরাই ভোগ করিয়া থাকে। ফলে দেখা যায়, একদিকে মালিকসম্প্রদায়ের ঐশ্বর্য ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্যদিকে অগণিত শ্রমিকের দুঃখদারিদ্র্য ও আর্থিক অসচ্ছলতা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। শ্রমিকসম্প্রদায় ধনী মালিকের কাছে নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা জানায়, কিন্তু ধনিকরা সেদিকে সহজে কর্ণপাত করে না। ধনিকশ্রেণীর এই অবহেলাই শোষিত শ্রমিকগোষ্ঠীর মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়াছে আত্মশক্তি ও সঙ্ঘশক্তির চেতনা। এই নবপ্রবুদ্ধ সঙ্ঘশক্তিকে তাহারা আজ ধনিকের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। শ্রমিকের ন্যায্য দাবী যখন অবিরত উপেক্ষিত হইতে থাকে, তখন তাহারা সমবেতভাবে কলকারখানার মালিকের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং সকল অন্যায়-অবিচার-প্রতিরোধের শেষ অস্ত্র-হিসাবে কারখানায় নিজেদের কর্ম হইতে বিরত হয়। শ্রমিকদলের এই যে একযোগে কর্মবিরতি, ইহাকেই আমরা বলি ধর্মঘট।

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও শ্রেণীসংগ্রাম

ধর্মঘটের জন্মইতিহাস কিন্তু খুব বেশী দিনের নয়। সমাজের সহজ সরল আর্থিক ব্যবস্থায় পুঁজিতন্ত্র প্রবেশ করিবার পর হইতেই শ্রমিকধর্মঘটের শুরু। ইউরোপে শিল্পবিপ্লব আরম্ভ হইবার পর দেখা গেল, একদল ব্যক্তি নিজেদের পুঁজি খাটাইয়া অন্য ব্যক্তিদের উপর প্রভুত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এইসব পুঁজিপতি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরশিল্প বিনষ্ট হইল, বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইল এবং তাহাতে বহুলোৎপাদন শুরু হইল। ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা দেখা দিল। যে-সকল মালিকের পুঁজি অল্প, বাধ্য হইয়াই নিজেদের পরিচালিত কুটীরশিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প তুলিয়া দিয়া তাহারা বৃহৎ কারখানার আশ্রয় লইল জীবিকার্জনের জন্য। এভাবে

শ্রমিকধর্মঘটের আত্মপ্রকাশ

সমাজে ধীরে ধীরে পরস্পরবিরোধী দুইটি স্বার্থ দেখা দিল—শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীসংঘর্ষ আত্মপ্রকাশ করিল। পশ্চিমের শিল্পবিপ্লব এদেশের শিল্পের উপর যে-প্রভাব বিস্তার করিল, তাহা সামান্য নয়।

বড়ো বড়ো কলকারখানার ধনী মালিকগণ নিঃস্ব শ্রমিকের অসহায়তার সুযোগ লইয়া নানা অপকৌশলে তাহাদিগকে শোষণের জাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়া দিল—শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতি ধনিকরা বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন মনে করিল না। শ্রমিকগণকে অল্প বেতনে বেশী খাটাইয়া লইয়া আপনাদের পুঁজি বাড়াইয়া তোলাই হইল ধনিকশ্রেণীর প্রধান লক্ষ্য। এককভাবে সকল শ্রমিকই শক্তিহীন। কিন্তু যে-দিন তাহাদের মধ্যে জাগিল সঙ্ঘচেতনা, সেদিন তাহারা নিজেকে আর অসহায় বলিয়া মনে করিল না। তাহাদের ন্যায্য দাবী অস্বীকৃত হইলে শ্রমিকরা সমবেত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাইতে আরম্ভ করিল। এই প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল ধর্মঘটের মধ্য দিয়া। ধর্মঘট সর্বরিক্ত শ্রমিকের নিরস্ত্র সংগ্রাম। কিন্তু ইহার বিপুল শক্তি সশস্ত্র বিদ্রোহ অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয়। ভারতবর্ষে শ্রমিকধর্মঘটের ইতিহাসটিও পাশ্চাত্ত্যের কলকারখানায় শ্রমিক-ধর্মঘটের অনুরূপ।

যান্ত্রিক উৎপাদন ও শ্রমিকশোষণ

ধর্মঘটের সাফল্য নির্ভর করে শ্রমিকদের সঙ্ঘশক্তি ও ঐক্যচেতনার উপর। সঙ্ঘশক্তি ব্যতীত শক্তিশালী ধনিকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া শ্রমিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। ধনী মালিকসম্প্রদায় অর্থবলে বলীয়ান—ধনতন্ত্রের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রশক্তিও তাহাদের স্বার্থের অনুকূলে। এক-একটি কারখানায় বহু শ্রমিক কাজ করে। অন্যায়ের প্রতিবাদকল্পে যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাহারা ধর্মঘট না করে, তবে ওই ধর্মঘট ব্যর্থ হইতে বাধ্য। তাই শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য এবং কারখানার বিত্তশালী মালিকদের নিষ্ঠুরতার কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বর্তমানে শ্রমিকসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শ্রমিকসঙ্ঘের ক্রমবর্ধমান প্রভাবহেতু ধর্মঘট প্রায়ই সাফল্য অর্জন করিতেছে, এবং কলকারখানার মালিকগণ শ্রমিকের দাবী পূর্বের মতো তেমন আর উপেক্ষা করিতে পারিতেছে না।

শ্রমিকের সঙ্ঘশক্তি ও ঐক্যচেতনার প্রয়োজনীয়তা

ধর্মঘট যে শ্রমিকসম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কলকারাখানার মালিকদের উদ্ধত অবিচার, সামান্য বেতনের পরিবর্তে শ্রমিককে দিয়া অধিক পরিমাণ কাজ আদায় করিয়া লইবার হীন

মনোবৃত্তি শ্রমিকদলের জীবনযাত্রা সত্যই দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াছে। মালিকগণ যখন নিজেদের শোষণনীতি বজায় রাখিবার চেষ্টা করে ও শ্রমিকসম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিতে অনিচ্ছা জানায়, তখন আপনার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ধর্মঘটের আশ্রয় লওয়া ব্যতীত শ্রমিকদের অন্যকোনো উপায় থাকে না। ধর্মঘট আজ শুধু কলকারখানার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়, ইহা সমাজের নানা স্তরে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ধর্মঘট সংগ্রামী শ্রমিকের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র

অল্প সময়ের ব্যবধানে ধর্মঘটের অবাঞ্ছিত পুনরাবৃত্তি বর্তমান কালের যান্ত্রিক-সভ্যতা-কণ্টকিত সমাজের অসুস্থতারই পরিচয় বহন করে। ধর্মঘটের প্রয়োজন যে আছে, সে-কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অতি সামান্য কারণে ধর্মঘট করা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, ইহার ফলে সমাজজীবনে নানা রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি হয়। বিশেষত, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মঘট দেখা দিলে সমাজের সকল ক্ষেত্রেই ইহার বিষময় ফল অনুভূত হয়। ধর্মঘট সাফল্যমণ্ডিত না হইলে তাহাতে শ্রমিকরাই যে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা নয়, ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ থাকার ফলে জনসাধারণের ক্ষতিরও অন্ত থাকে না। অবিচার-অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য কোনো পথই যখন খোলা থাকিবে না, এক-মাত্র তখনই ধর্মঘটের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। ধর্মঘট যদি শৃঙ্খলাসহকারে ও শান্তভাবে পালন করা না হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রে ইহা হিংস্র বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। তখন শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার জন্য সরকার ধর্মঘটীদের উপর অস্ত্রবল প্রয়োগ করিতে বাধ্য হন। ফলে ধর্মঘটের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় এবং শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

ধর্মঘটের ক্ষতিকর দিক

ধর্মঘট যত অল্প হয় ততই সমাজের মঙ্গল। তবে একথাও সত্য যে, সরকার কিংবা ধনী মালিক বলপ্রয়োগ করিয়া কখনও ধর্মঘট বন্ধ করিতে পারিবে না। মূল কারণগুলি দূরীভূত না হইলে ইহার পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। কলকার-খানার পুঁজিপতি যদি তাহাদের মোটা লাভের কিছুটা অংশ দরিদ্র শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়, তাহারা যদি শ্রমিকদের স্বার্থ, স্বাস্থ্য ও দৈনন্দিন জীবনে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কিছুটা মনোযোগী হইয়া উঠে, তবে দুর্গত শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ আর ধূমায়িত হইয়া উঠিবে না। শ্রমিকদের কাজের সময় কমাইতে হইবে, জীবনধারণের উপযোগী বেতন তাহাদিগকে দিতে হইবে, তাহাদের জন্য স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ এবং শিক্ষা ও

উপসংহার

আনন্দের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিকদের স্বার্থের সঙ্গে ধনীর স্বার্থও যে অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত, এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। শ্রমিকগণ যদি অর্ধভুক্ত এবং অর্ধনগ্ন না থাকে, তবে তাহাদের অভিযোগ ও অসন্তোষ বিদূরিত হইবে। তখন তাহারা আর প্রতিবাদমূলক কোনো আন্দোলনের আশ্রয় লইবে না। শিল্প-মালিকের সহৃদয় মনোভাব এবং সরকারের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিই একমাত্র ধর্মঘটের অবসান ঘটাইতে পারে।

সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—আধুনিক সমাজজীবনে সংবাদপত্র একটি অপরিহার্য বস্তু—সংবাদপত্রের আবির্ভাব—সংবাদপত্রের দ্রুত ও ব্যাপক প্রচলন—সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তার হেতুনির্দেশ—জাতীয় জীবনে সংবাদপত্রের প্রভাব—সংবাদপত্রের ক্ষতিকর প্রভাব—সাংবাদিকের গুরুতর দায়িত্ব—সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আমাদের অনগ্রসরতা—উপসংহার।]

আধুনিক সমাজজীবনে সংবাদপত্রের প্রভাব ও প্রচলন যে কতখানি ব্যাপক তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। রেল-স্টীমার-বিমানপোত যেমন এ যুগের মানুষের কাছে পৃথিবীর দূরত্ব ঘুচাইয়া দিয়াছে, সংবাদপত্রও তেমনি জগতের দূরদূরান্তের মানুষকে একান্ত কাছের করিয়া তুলিয়াছে, অচেনা-অজানার সঙ্গে আমাদের নিকটতম পরিচয়ের যোগসূত্র রচনা করিয়াছে। পৃথিবীর একপ্রান্তে এই মুহূর্তে একটি ঘটনা ঘটিল, আর সংবাদপত্রের মাধ্যমে পরমুহূর্তেই ঘরে বসিয়া আমরা তাহার খবর পাইতেছি। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে, মানুষের বিচিত্র কার্যকলাপ ও চিন্তাধারার বাস্তব রূপায়ণকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া লইবার সুযোগসুবিধা কাহারো ঘটে না। কিন্তু প্রতিদিনকার সংবাদপত্রের উপর চোখ বুলাইলেই এসব অদেখা মানুষকে আমরা দেখিতে পাই, তাহাদের প্রাত্যহিক জীবনের কর্মধারার সহিত আমরা পরিচিত হই, বিশাল পৃথিবীর রূপটির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটে। সংবাদপত্র আজ বড়ো পৃথিবীর প্রতিবিম্ব নিজের বুকে চিহ্নিত করিয়া আমাদের ছোট ঘরে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। নিখিল জগতের সঙ্গে পরিচয়সাধনের আকাঙ্ক্ষা যাহার মধ্যে প্রবল তাহার পক্ষে সংবাদপত্র অপরিহার্য।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

বর্তমান যুগের সভ্য মানুষ সংবাদপত্রের অস্তিত্বহীনতার কথা কল্পনাও করিতে পারে না। কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন পৃথিবীর কোনো দেশেই সংবাদপত্র বলিয়া কোনো বস্তু ছিল না। তখন কাছের মানুষ ছিল অনেক দূরে, পৃথিবীর পরস্পর-সংলগ্ন দেশগুলি ছিল পরস্পর হইতে একরূপ বিচ্ছিন্ন। সেই অতীত দিনে যখন দু'একজন মানুষ দূরদেশ ভ্রমণ করিয়া আসিত, দেশের লোক তাহাদের নিকট অদেখা অপরিজ্ঞাত দেশের ঘটনা উৎকর্ণ হইয়া শুনিত—তখন এইভাবেই নিবৃত্ত হইত মানুষের অজানাকে জানিবার দুর্বার কৌতূহল। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশবিদেশে সংবাদসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তাও মানুষ উপলব্ধি করিল, এবং এই প্রয়োজনের তাগিদেই একদিন আবির্ভাব হইল সংবাদপত্রের।

আধুনিক সমাজজীবনে সংবাদপত্র একটি অপরিহার্য বস্তু

বহুশত বৎসর পূর্বে চীনদেশেই প্রথম সংবাদপত্রের প্রচলন হয়। মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভবও এই চীনদেশে। মানবসভ্যতার দ্রুত বিস্তারের ক্ষেত্রে চীনমহাদেশের এই দুইটি দান স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ভারতবর্ষে মোগলআমলে হস্তলিখিত সংবাদপত্রের প্রচলন ছিল, এবং তখন পর্যন্ত ইহার অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ ছিল রাজ্যশাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে—গণজীবনের সঙ্গে সংবাদপত্রের যোগ তখনও সংস্থাপিত হয় নাই। ইউরোপে সংবাদপত্রের প্রথম প্রচলন হয় ইতালীতে, তারপর জার্মানীতে এবং পরে ইংলণ্ডে। বাংলাদেশে সংবাদপত্রের প্রথম প্রচলন হয় ইংরাজআমলে। এজন্য বাংলাদেশ ইংরেজ-মিশনারীদের নিকট চিরকাল ঋণী থাকিবে।

সংবাদপত্রের আবির্ভাব

সংবাদপত্র আজ সমাজমানুষের দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য বস্তু বলিয়া স্বীকৃত। মুদ্রাযন্ত্রের বিস্ময়কর উন্নতি, সংবাদিকতার প্রতি শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অনুরাগ, গণতন্ত্রের ক্রমপ্রতিষ্ঠা সংবাদপত্রের ব্যাপক প্রচারকে ত্বরান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। বর্তমান লোকশিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হইল সংবাদপত্র, এবং জনমতগঠনে ইহার প্রভাব অপরিসীম। আধুনিক যান্ত্রিক যুগে মানুষের জীবনযাত্রা যতই জটিল হইয়া উঠিতেছে, সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা ততই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এতদ্ব্যতীত জনগণের মধ্যে রাজনীতিক ও সমাজমুখী চেতনার উদ্বোধন সংবাদপত্রের প্রচারকে আশ্চর্য গতিদান করিয়াছে।

সংবাদপত্রের দ্রুত ও ব্যাপক প্রচলন

আজিকার দিনে প্রভাতে ঘুম ভাঙিতে না ভাঙিতেই আমাদের হাতের কাছে চাই একখানি সংবাদপত্র। ইহার এতখানি জনপ্রিয়তার কারণ কী?

সংবাদপত্রে কেবল চল্‌তি দুনিয়ার কয়েকটি নির্দিষ্ট খবরই যে মুদ্রিত থাকে, তাহা নয়—রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, খেলাধূলা, বিচিত্র আমোদপ্রমোদ, জীবিকাউপার্জনের সন্ধান ইত্যাদি নানাকিছুই সংবাদপত্রে স্থানলাভ করিতেছে। সুতরাং সকল শ্রেণীর, সকল রুচির মানুষই সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। বাহিরের বড়ো পৃথিবীকে আমাদের হাতের মুঠোয় তুলিয়া ধরিবার ভার লইয়াছে এই সংবাদপত্র, ইহার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত অক্ষরগুলি যেন নিখিল বিশ্বের হৃৎস্পন্দনেরই প্রতীক।

সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তার হেতুনির্দেশ

জাতীয় জীবনে সংবাদপত্রের প্রভাব অনেকখানি। ইহা একদিকে বৃহত্তর পৃথিবীর বহুতর সংবাদ পরিবেশন করে, অন্যদিকে প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করে, ভাষ্য রচনা করে। ফলে, ইহার মাধ্যমে পাঠকপাঠিকা জাগতিক পরিবেশ ও অজস্র তথ্যের সঙ্গে যেমন পরিচিত হয়, তেমনি ইহার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত প্রতিদিনকার সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলি জনসাধারণের চিত্তে রাজনীতিক ও সমাজনীতিক চেতনার উদ্বোধন ঘটায়। এইভাবে জনমত গঠিত হয়, মানুষ বহির্বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠে, ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে বৃহত্তর রাষ্ট্রিক জীবন ও সমাজজীবনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া রাষ্ট্রের অনুসৃত নীতি ও বহুবিধ কর্মপন্থার পরিচয় লাভ করি, আবার সরকারের জনকল্যাণবিরোধী নীতির সমালোচনা করিবার সুযোগও পাই। সমাজের ও রাষ্ট্রের অন্যায়-অবিচারের যথার্থ প্রতিকার করিতে হইলে সংবাদপত্রের আশ্রয়গ্রহণ অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে।

জাতীয় জীবনে সংবাদপত্রের প্রভাব

গণতন্ত্রের সার্থক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংবাদপত্রের স্বাধীন অস্তিত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বর্তমান পৃথিবীতে রাজনীতির চর্চাই মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে; আবার, ইহার সঙ্গে সম্পৃক্ত রহিয়াছে অর্থনীতি। তাই আধুনিক যুগে প্রায় সকল সংবাদপত্রেরই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল রাজনীতি ও অর্থনীতি। সেজন্য রাজনীতিবিদ্, সরকার ও জনসাধারণ নিজ নিজ মতামতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সংবাদপত্রের উপর নির্ভরশীল। সংবাদপত্র জনসাধারণকে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি-বিষয়ক শিক্ষাদান করে এবং সমাজের নানা দুর্নীতি ও কুসংস্কার বিদূরিত করিয়া মানুষের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উন্নত করিয়া তুলিবার যথেষ্ট সহায়তা করে। জাতীয় জীবনগঠনে, জনসেবায়, লোকশিক্ষাপ্রচারে উন্নত শ্রেণীর সংবাদপত্রের দান অসামান্য। সংবাদপত্র আধুনিক সভ্যতার একটি। বড়ো অঙ্গ

দেখা যায়, পৃথিবীতে খুব কম বস্তুই মানুষের পক্ষে অবিমিশ্র কল্যাণকর। সংবাদপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখা যাইবে, ইহা জনগণের যেমন কল্যাণসাধন করিয়াছে, তেমনি ইহা দ্বারা সময় সময় মানুষের বহু অকল্যাণও সাধিত হইয়াছে। সংবাদপত্রের পরিচালকবর্গ জনসেবার মহৎ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া দলগত ও সম্প্রদায়গত স্বার্থসিদ্ধির মানসে যখন ইহাকে অস্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করে, তখন সমাজজীবনে ইহার প্রভাব মারাত্মক হইয়া উঠে। দেশে উগ্র সম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা, রাজনীতিক দলাদলি ও বিদ্বেষদুষ্ট মনোভাব, নানারকম কুৎসা ও মিথ্যা প্রচারের জন্য অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বজ্ঞানহীন সাংবাদপত্রই দায়ী। হীন স্বার্থসাধনের বশবর্তী হইয়া সাংবাদিক যখন ন্যায়ধর্ম, বিবেকবুদ্ধি ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া যায়, তখনই সংবাদপত্র জনসাধারণের অকল্যাণের আকর হইয়া উঠে।

সংবাদপত্রের ক্ষতিকর প্রভাব

সাংবাদিকের কর্তব্য হইল জনসাধারণকে সত্য ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করা। ইহার পরিবর্তে ক্ষুদ্রস্বার্থের প্রভাবে পড়িয়া যাঁহারা অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষকে মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত করিয়া তোলেন তাঁহারা সমাজের শত্রু—সংবাদপত্রসেবার যোগ্য তাঁহারা নন। সাংবাদিকের দায়িত্ব গুরুতর, তাঁহার কর্তব্য সত্যই কঠোর। তাঁহাকে হইতে হইবে যথার্থ জনসেবক, সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক, নিরপেক্ষ,—দলীয় সংকীর্ণ স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিতে না পারিলে সংবাদপত্র কখনো জনকল্যাণসাধন করিতে পারে না। পক্ষপাতহীন সংবাদপত্র দেশে আজো বিরলদৃষ্ট।

সাংবাদিকের দায়িত্ব

বৃত্তিহিসাবে সাংবাদিকতা আমাদের দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের দৃষ্টি এখন পর্যন্ত তেমন আকৃষ্ট করে নাই। উন্নত ধরণের সাংবাদিকতার জন্য যে বিশেষ ধরণের শিক্ষার প্রয়োজন, সে-ধারণা আমাদের অনেকেরই নাই। কোনো একটা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চডিগ্রীধারী হইলেই যথার্থ সাংবাদিক হওয়া যায় না। ইহার জন্য চাই পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান, সংবাদসরবরাহ ও পরিবেশন-বিষয়ে বিচক্ষণতা, ঘটনার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান-ব্যাপারে নিপুণতা ; চাই সত্যনিষ্ঠা, চিত্তস্থৈর্য, নির্ভীকতা এবং আরো নানাকিছু। সার্থক সাংবাদিকতা যে একটি উচ্চশ্রেণীর আর্ট এ কথাটি বিস্মৃত হইলে চলিবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাংবাদিকতা শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এই অত্যাবশ্যক শিক্ষণীয় বিষয়টি কিন্তু আমাদের দেশে এখনো উপেক্ষিতই রহিয়া গিয়াছে। জাগতিক পরিবেশের পটভূমিকায় প্রতি-

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আমাদের অনগ্রসরতা

দিনের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলিকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিতে গেলে যে কতখানি বিদ্যাবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির প্রয়োজন, তাহা সহজেই অনুমেয়। সংবাদসরবরাহ ও প্রকাশনার দায়িত্ব সত্যই গুরুতর।

উপসংহার

আদর্শ সাংবাদিককে যথার্থ জনসেবক হইতে হইবে, বৃহত্তর সমাজকল্যাণকে তুলিয়া ধরিতে হইবে দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে। দেশের জনগণকে রাজনীতিক ও সমাজনীতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা, জাতিকে ন্যায় ও সত্যের পথে পরিচালিত করা, জনসাধারণের মধ্যে নানাবিষয়িনী শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ করার মহৎ দায়িত্ব তাঁহাকে প্রসন্ন চিত্তে বহন করিতে হইবে। সংবাদপত্রসেবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সকলে যদি সচেতন হইয়া উঠি, তাহা হইলে সংবাদপত্রের স্বাস্থ্যকর প্রভাবে জনগণ যে অচিরেই আদর্শ নাগরিকের স্তরে উন্নীত হইবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

স্বাধীন ভারতে ইংরেজী ভাষার স্থান

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—সাম্রাজ্যবাদী মেকলে সাহেবের উদ্ধৃত উক্তি—ভারতে এককালে ইংরেজী ভাষার অভাবনীয় প্রতিপত্তি ছিল—ইংরেজীশিক্ষার বিপুল ব্যর্থতা—ইংরেজী শিক্ষার মারাত্মক প্রভাব—ইংরেজীশিক্ষার সুফলের দিক—ইংরেজী ভাষা গ্রহণীয়, না বর্জনীয়—ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর অভিমত—রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা কতখানি—দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজীকে আমরা কতখানি স্থান দিব—উপসংহার।]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

ব্রিটিশের প্রায় দুইশত বৎসরের শাসনশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষ বর্তমানে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ইংরেজ কর্তৃক ভারতবিজয় ভারতবাসীর পক্ষে একটি ফলিতার্থময় ঘটনা। রাজনীতিক পরাধীনতা জাতির জীবনে কত বড়ো অভিশাপ ডাকিয়া আনে, ব্রিটিশশাসিত ভারতের দিকে তাকাইলে তাহা যথার্থ উপলব্ধি করা যাইবে। ভারতবর্ষের সত্যকার পরাজয় সেইদিন সূচিত হইল, যে-দিন হইতে ইংরেজী ভাষা দেশের রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করিল—যে-দিন হইতে ইংরেজী ভাষা গৃহীত হইল ভারতের কোটি কোটি মানুষের শিক্ষার মাধ্যমরূপে। রাজনীতিক পরাধীনতা

মারাত্মক সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার চেয়ে অনেক বেশী মারাত্মক সাংস্কৃতিক পরাধীনতা।

স্বেচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক, ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রহণ করিয়া জাতীয় জীবনে সাংস্কৃতিক পরাভবকেই আমরা স্বাগত জানাইলাম। বিজয়ী জাতির ভাষা বিজিত জাতির জীবনকে কতখানি প্রভাবিত করে ও গ্লানিময় করিয়া তুলিতে পারে, তাহার নির্ভুল পরিচয় রহিয়াছে সাম্রাজ্যবাদী মেকলে সাহেবের এই উক্তিটির মধ্যে : 'We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern—a class of persons, Indian in blood and colour but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect'। ভারতবর্ষে ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার প্রচেষ্টা সার্থক হইলে পর মেকলে জয়গর্বে উল্লসিত হইয়া এই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সে যাহা হোক, ইংরেজী ভাষা যথাসময়ে রাষ্ট্রভাষার গৌরব-অর্জন করিল, শিক্ষার মাধ্যম-হিসাবে স্বীকৃত হইল, এবং ইহারই ফলে ব্রিটিশের আমলাতন্ত্র-পরিচালনা অনেকখানি বাধামুক্ত হইয়া উঠিল। ভারতবাসী বর্তমানে তাহার মাতৃভাষাকে যতখানি চিনে না, তাহার চেয়ে অনেক বেশী চিনে ও জানে ইংরেজী ভাষাটিকে। এরূপ একটি অবস্থা জাতীয় জীবনে কতখানি গ্লানিজনক, বর্তমানে তাহা আমরা কিছুটা অনুভব করিতে পারিতেছি।

সাম্রাজ্যবাদী মেকলে সাহেবের উদ্ধৃত উক্তি

ভারতবর্ষে একদিন বিজাতীয় ইংরেজী ভাষার প্রভূত আভিজাত্য ছিল, সুপ্রচুর সম্ভ্রমমর্যাদা ছিল। ইংরেজী না শিখিলে সে-সময় কেহ চাকরি পাইত না, ইহাকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে কোনো মানুষ দেশের লোকের কাছে সম্মান লাভ করিত না। সেদিন আমাদের কাছে ইংরেজী-শিক্ষা ছিল যেন কল্পতরু—দেশবাসীর উচ্চ আশাআকাঙ্ক্ষা ও বাস্তব জীবনে ফলসিদ্ধির নিয়ামক। আজ কিন্তু ইংরেজ জাতি ভারত ত্যাগ করিয়াছে, আমরা স্বাধীন মানুষের স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিয়াছি। এখন আমাদের প্রশ্ন হইতেছে, স্বাধীন ভারতে ইংরেজী ভাষার স্থান কতখানি?

ভারতে এককালে ইংরেজী ভাষার অভাবনীয় প্রতিপত্তি ছিল

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরেজী শিক্ষার সুফল ও কুফল—এই দুইটি দিকেরই যথার্থ বিচার করিতে হইবে। প্রথমে বলা যাইতে পারে, এই ভাষাটির একাধিপত্য ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনের উপর

যে অনেকখানি ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধের অবকাশ নাই। ইহা আমাদের জন্য বহন করিয়া আনিয়াছে নিদারুণ ব্যর্থতা। মানুষের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করিয়া তোলা, মানুষকে জাগতিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিয়া তাহাকে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার শক্তিসামর্থ্য দান করা, জনগণের চিত্তে জ্ঞানের আলোক বিকিরণ করিয়া জাতির জীবনকে বৃহত্তর কল্যাণের পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়াই হইল যথার্থ শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

ইংরেজী-শিক্ষার বিপুল ব্যর্থতা

কিন্তু সুদীর্ঘ কালের ইংরেজী শিক্ষা আমাদের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটায় নাই, মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করে নাই, জাতির চিৎপ্রকর্ষসাধন করে নাই, দেশবাসীর মানসিক শক্তিকে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে নাই, জনগণকে ব্যবহারিক জীবনে আত্মনির্ভরশীল হইবার মতো সামর্থ্য দান করে নাই। ইহা দেশের সার্বজনীন শিক্ষার প্রবাহকে রুদ্ধগতি করিয়াছে, আমাদের মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে—সর্বোপরি দেশের মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া জাতির সংহতিশক্তিকে একরূপ বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। ইংরেজীশিক্ষিত ও ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ, দেশে এই যে দুইটি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহা সাংঘাতিক রকমের জাতিভেদ। ইহারই রন্ধ্রপথে বহু অকল্যাণ, বহুবিধ গ্লানি প্রবেশ করিয়া জাতিকে সর্বনাশের পথে টানিয়া আনিয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার এই কুফলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন: 'Among the many evils of foreign rule this blighting imposition of a foreign language upon the youth of the country will be counted by history as one of the greatest. It has estranged them from the masses'। ইংরেজী শিক্ষা আমাদিগকে যতখানি মুগ্ধ করিয়াছে ততখানি সঞ্জীবিত করে নাই—এই অভ্রান্ত সত্যটি কে অস্বীকার করিবে?

ইংরেজী-শিক্ষার মারাত্মক প্রভাব

তবে ইংরেজীশিক্ষা-দ্বারা আমরা যে কিছুটা উপকৃত হইয়াছি, সে-কথাটি বিস্মৃত হইলে চলিবে না। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই আমরা য়ুরোপীয় চিত্তের, পাশ্চাত্ত্য মানসিকতার নিকট-সংস্পর্শে আসিয়াছি। য়ুরোপের সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-রাজনীতি-সমাজনীতির সহিত পরিচিত হওয়ার ফলে আমাদের মানসলোকে নবচেতনার জাগরণ ঘটিয়াছে, আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে, জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে অভিনবত্ব দেখা দিয়াছে—এককথায়, আমাদের

ইংরেজী-শিক্ষার সুফলের দিক

কিয়ৎপরিমাণ চিৎপ্রকর্ষ সাধিত হইয়াছে। দেশবাসীর সংকীর্ণ আচার-বিচার-সংস্কারের অচলায়তনকে বিধ্বস্ত করিল য়ুরোপীয় মনের প্রবল জঙ্গমশক্তি—ইহারই ফলে একদিন ভারতবর্ষে দেখা দিয়াছিল রেণেসাঁ বা পুনর্জাগরণ। য়ুরোপীয় চিত্তের সংঘাতপ্রভাবে ভারতবাসীর সমাজজীবনে ও রাজনীতিক জীবনে একটা নূতন প্রাণের সাড়া জাগিয়াছিল, য়ুরোপের নিকট হইতেই আমরা পাইয়াছিলাম দেশাত্মবোধের দীক্ষা। এইসব দিক হইতে বিচার করিলে ইংরেজী শিক্ষার দান সম্পূর্ণ অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ইংরেজী ভাষা গ্রহণীয়, না বর্জনীয়

দেড়শত বছরের অধিক কাল ধরিয়া যে-ভাষার অনুশীলন আমরা করিতেছি, আমাদের জাতীয় জীবনে তাহার প্রভাব যে গভীর ও দূরপ্রসারী হইবে তাহাতে বিস্মিত বোধ করিবার কিছুই নাই। স্বাধীনতালাভের পর হইতে ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের মনে নানা প্রশ্ন জাগিয়াছে। এই ভাষাটির বিষয়ে অনেকেরই মনে বিরূপ মনোভাব দেখা যাইতেছে। যেহেতু দেশে আজ ইংরেজশাসনের অবসান ঘটিয়াছে, সেহেতু এখন বাহির হইতে অন্য কেহ আমাদের উপর ইংরেজী ভাষাকে জোর করিয়া চাপাইয়া দিতে পারে না। বর্তমানে আমাদিগকেই সুচিন্তিতভাবে স্থির করিতে হইবে—ইহা গ্রহণীয়, না বর্জনীয়।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর অভিমত

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী পরলোকগত মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এ সম্বন্ধে যে-অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন, 'ইংরেজী ভাষা এতকাল ধরিয়া আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ও সরকারী কাজকর্ম-পরিচালনার ক্ষেত্রে যে-বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে উহা আর সেই স্থানটি দখল করিতে পারে না। ভারতীয় কোনো একটি ভাষাকেই ধীরে ধীরে তাহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কিন্তু সর্বক্ষেত্র হইতেই রাতারাতি যদি ইংরেজীকে নির্বাসিত করা হয়, তাহা হইলে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে অবশ্যই একটা বিপর্যয় দেখা দিবে'। শিক্ষামন্ত্রীর এই উক্তির যাথার্থ্য অনস্বীকার্য।

কালক্রমে হিন্দীভাষা যে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হইবে, সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই। তবে আন্তপ্রাদেশিক ক্ষেত্রে ভাবের সহজ আদান-প্রদান ও সরকারী কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য হিন্দীভাষাকে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে আমাদিগকে আরও দশপনর বৎসর ইংরেজী ভাষাকেই

রাষ্ট্রভাষার স্থানে অধিষ্ঠিত রাখিতে হইবে। এই কতিপয় বৎসরের মধ্যে হিন্দী যদি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিভাষাসম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, তাহা হইলে ইংরেজীকে বর্জন করিলে কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা আর থাকিবে না। এ গেল রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে ইংরেজীর প্রয়োজনীয়তার দিক।

রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা কতখানি

এখন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজীর কথাটি বিবেচ্য। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভারতের আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক ভাষাগুলিকেই মাধ্যমরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে না পারিলে শিক্ষা কখনই যথার্থ ফলপ্রসূ হইয়া উঠিতে পারে না। মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজীকে একটি সহায়ক ভাষারূপে [subsidiary language] গ্রহণ করা যাইতে পারে। উচ্চশিক্ষার ব্যাপারেও দেশীয় ভাষাকে উপযুক্ত পরিভাষার সাহায্যে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়া যাহাতে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করা যায়, আমাদিগকে সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহা যতদিন সম্ভবপর না হয়, ততদিন ইংরেজীই উচ্চ-শিক্ষার বাহন থাকিবে। মৌলানা আজাদ বলিয়াছিলেন, 'প্রচেষ্টার ত্রুটি না ঘটিলে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় একটি ভাষাকে [হিন্দীকে] আমরা এমন সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারিব, যাহা আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনায়াসেই ইংরেজীর স্থানটি দখল করিতে সমর্থ হইবে'। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজীকে আবশ্যিক শিক্ষণীয় ভাষারূপে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিবার প্রয়োজন আছে। তবে বর্তমানে পরীক্ষাপাশের ব্যাপারে ইহার উপর যতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয়, ভবিষ্যতে ততখানি না করিলে ক্ষতি নাই। ইংরেজী ভাষার প্রতি মোহান্ধতার ভাবটি আমাদিগকে কাটাইয়া উঠিতে হইবে, অন্যদিকে দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ-সাধনের দিকে সকলকে মনোযোগী হইতে হইবে।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরেজীকে আমরা কতখানি স্থান দিব

ভাষার সমস্যাটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি জটিল। ইহার সমাধানে খুবই সতর্কতার প্রয়োজন—অন্ধস্বাদেশিকতা আমাদের যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে যেন আচ্ছন্ন না করে। ইংরেজী ভাষাকে একেবারে বর্জন করিলে বিশ্ববিদ্যার দ্বার আমাদের নিকট রুদ্ধ হইয়া যাইবে। সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞান-সাধনার ফলসিদ্ধি এই ভাষাটিতেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে বৃহত্তর জগতের চিন্তা ও ভাবসাধনার সঙ্গে আমাদের চিত্তের যোগসূত্রটি ছিন্ন হইয়া যাইবে। এরূপ একটি অবস্থা জাতীয়

উপসংহার

জীবনে অগ্রগতির পক্ষে সত্যই ক্ষতিকর। একদিকে ইংরেজীর প্রতি অন্ধমোহ, অন্যদিকে ইহার বিরুদ্ধে অন্ধস্বাদেশিকতার মনোভাব—এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করিতে পারিলে ইংরেজী ভাষার অনুশীলনে আমরা যে যথার্থই উপকৃত হইতে পারিব তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

স্বাধীন ভারতে সামরিক শিক্ষা

[**রচনার সংকেতসূত্র :** প্রারম্ভিক ভূমিকা—বর্তমান জাগতিক পরিবেশ অহিংসানীতির অনুকূল নয়—আত্মরক্ষার জন্যও সংগ্রামপ্রস্তুতি প্রয়োজন—ভারতবাসীর শক্তিসাহস জগতের কোনও জাতি অপেক্ষা কম নয়—সামরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অত্যন্ত অনগ্রসর—সাম্প্রতিক যুদ্ধ সর্বাত্মক ও যান্ত্রিক—বিপুলায়তন ভারতবর্ষের জন্য বিশাল সেনাবাহিনী প্রয়োজন—শান্তির সময়েও সেনাবাহিনীর মূল্য উপেক্ষণীয় নয়—শত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার দায়িত্ব ভারতবাসীর—উপসংহার।]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

পৃথিবীর প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রেই জনগণকে সামরিক শিক্ষা দান করা জাতীয় শিক্ষারই একটা অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়। সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনোরূপ বিরুদ্ধ প্রশ্ন স্বাধীন দেশের জনসাধারণের মনে কখনও জাগিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। কিন্তু ভারতবাসীর ক্ষেত্রে সামরিক শিক্ষা এতকাল একটি প্রধান সমস্যার বিষয় ছিল। এরূপ অবস্থার জন্য দায়ী ভারতের সুদীর্ঘকালের রাজনীতিক পরাধীনতা। বিগত দেড়শত বৎসর পর্যন্ত ভারতের ভাগ্যবিধাতা ইংরেজজাতি ভারতবাসীকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। তাহাদের প্রতিনিয়তই একটা ভয় ছিল, যদি পরাধীন ভারতবাসী সামরিক শিক্ষায় পারদর্শী হইয়া উঠে, তবে সুযোগ পাইলেই তাহারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালাইবে। এই রকমের ভয় ও অবিশ্বাস আমাদের সামরিক শিক্ষালাভের অধিকারের বিপক্ষে বারবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্তমান জাগতিক পরিবেশ অহিংসানীতির অনুকূল নয়

অন্যদিকে, বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে অহিংসানীতি—যে-নীতি সংগ্রামকে প্রশ্রয় দিতে চায় না, হিংসাকে, হিংসার বিরুদ্ধে চায় না মাথা তুলিতে দিতে। অহিংসানীতির যাঁহারা প্রচারক, তাঁহারা বলেন, যুদ্ধ পশুশক্তিরই একটা অভিব্যক্তি, পশুবলকে পশুবল দিয়া জয় করা যায় না—ইহাকে জয় করিতে হইলে চাই প্রেম, প্রীতি ও আত্মিক সাধনালব্ধ শক্তি।

নীতি-হিসাবে অহিংসাকে অগ্রাহ্য করা যায় না—কয়েকজন বিশিষ্ট মানবের পক্ষে এই আত্মিক শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠাও অসম্ভব নহে। কিন্তু সমগ্র জাতিকে অধ্যাত্মসাধনমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা সম্ভব কিনা, এ কথাটি বিশেষভাবে বিবেচ্য। মানুষের সীমাহীন লোভ, প্রবল জিগীষা ও জিঘাংসার যতদিন পর্যন্ত না বিনাশ ঘটিবে ততদিন মানুষ সহিংস সংগ্রাম হইতে বিরত থাকিবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

অন্ততঃ পক্ষে আত্মরক্ষা করিবার জন্য হইলেও সংগ্রামপ্রস্তুতির প্রয়োজন রহিয়াছে। অহিংসানীতি যেখানে প্রবলের অত্যাচার-উৎপীড়ন রোধ করিতে পারে না, সেখানে হিংসানীতি বা যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। পৃথিবীতে মানুষের মতো বাঁচিবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। বর্তমান পৃথিবীতে নানা কারণে সংগ্রাম যখন অনিবার্য এবং অহিংসানীতিও যখন সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তখন মানুষকে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আধুনিকতম সংগ্রামকৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে। স্বাধীন-জাতি-হিসাবে যদি বাঁচিবার অধিকার আমাদের থাকে, তবে ভারতবাসীর সামরিক শক্তিলাভের দাবী কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। স্বাধীন ভারতের আত্মরক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্র নির্মাণ করিতে হইলে আমাদের সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যস্বীকার্য। ব্রিটিশজাতি আজ এদেশ ছাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু সুযোগ পাইলেই অপর কোনো জাতি ভারতকে আক্রমণ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না।

আত্মরক্ষার জন্যও সংগ্রাম-প্রস্তুতি প্রয়োজন

সামরিক শিক্ষা ভারতবাসীর পক্ষে নূতন কিছু নয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের আমলেই ভারতের জনগণ যুদ্ধবিদ্যা ও অস্ত্রব্যবহার ভুলিয়া গিয়াছে নানা বিধিনিষেধের ঘূর্ণাচক্রে পড়িয়া। ভারতবর্ষ নানা বৈদেশিক জাতির আক্রমণ বহুবার সহ্য করিয়াছে; বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য তখন আমাদিগকে ব্রিটিশের সাহায্য লইতে হয় নাই। অতীত ভারতের রাজপুত, শিখ ও মারাঠা জাতির শৌর্যবীর্য ও রণকুশলতার কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এখনও মুদ্রিত রহিয়াছে। বিগত দুইটি বিশ্বযুদ্ধে ভারতের বহু সেনা বিভিন্ন রণাঙ্গনে তাহাদের প্রশংসনীয় শক্তিসাহস ও রণকুশলতার পরিচয় দিয়াছে।

ভারতবাসীর শক্তিসাহস কোনো জাতি অপেক্ষা কম নয়

ভারতে সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা যে একেবারেই হয় নাই, আমরা সে কথা বলিব না। কিন্তু যে-ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দেরাদুন সমরবিদ্যালয়ে ভারতবাসীকে

কিছুটা সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু সেখানে মাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় সেনাদলে সকল প্রদেশের তরুণদের প্রবেশাধিকারও সমান নয়। ভারতবাসীদের মধ্যে সমরে পটু [Martial] ও সমরে অপটু [Non-martial] এই রকমের জাতিবিভাগ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। সাম্প্রতিক যুদ্ধে পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের সমরপটু সেনার পাশে তথাকথিত সমরে অপটু বাঙালী কিংবা মাদ্রাজী সেনা সমান কৃতিত্বই প্রদর্শন করিয়াছে। সুবিধা ও সুযোগ লাভ করিলে বাংলা, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের যুবকও যে যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ থাকিতে পারে না।

সামরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ অত্যন্ত অনগ্রসর

বিজ্ঞানের ক্রম-উন্নতি এবং প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের প্রকৃতিও প্রতি-নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। এ যুগের যুদ্ধ জলে-স্থলে-আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, বর্তমান যুদ্ধের ভীষণতা ও মারণশক্তি বিশ্ববাসীকে ভয়ার্ত স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছে। ভারতে যে-সামরিক শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহা আধুনিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী যাহাতে অধুনা আবিষ্কৃত অস্ত্রচালনায় নিপুণতা লাভ করিতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। পরিখাযুদ্ধের দিন আজ অতি-বাহিত হইয়া গিয়াছে, বর্তমানের যুদ্ধ অতিমাত্রায় যান্ত্রিক যুদ্ধে রূপান্তরিত হইয়াছে। সুতরাং এদেশে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যান্ত্রিক যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষার প্রণালী প্রবর্তন করিতে হইবে। সংগ্রামের আকৃতি ও প্রকৃতির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যদি সমান তালে চলিতে না পারি তবে সামরিক শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

সাম্প্রতিক যুদ্ধ সর্বাত্মক ও যান্ত্রিক

আয়তনে ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ—হাজার হাজার মাইলব্যাপী ইহার সীমান্তভাগ বিস্তৃত। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ভারতের সীমান্ত-ভাগের স্থানগুলি বিশেষভাবে সুরক্ষিত রাখা প্রয়োজন। ভারতের সমুদ্রতীর অনেক হাজার মাইল ব্যাপিয়া প্রসারিত। এদেশের উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত হইতে যে-কোনো মুহূর্তে বহিঃশত্রুর উপদ্রব আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই যে এতবড় একটি দেশ, ইহাকে রক্ষা করার দায়িত্ব ভারতবাসীর। সুতরাং তাহার জন্য চাই সুশিক্ষিত নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী

বিপুলায়তন ভারতবর্ষের জন্য বিশাল সেনাবাহিনী প্রয়োজন

এবং স্থলবাহিনী। ভারতবর্ষ রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও দেশরক্ষাবিষয়ক ব্যাপারে আজ যে-স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, সেই স্বাধীনতাকে সর্বপ্রকার বিপদ-মুক্ত করিবার জন্য চাই সামরিক বিদ্যায় নিপুণ অজস্র ভারতীয় সেনা। ভারত-বিভাগ সামরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে বহুগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আমাদের দূরবিস্তার একটি সীমান্ত রহিয়াছে, সেখানে কোনো প্রাকৃতিক বাধা নাই। দেশের শান্তি ও নিরাপত্তারক্ষার জন্য সেখানে বিশাল সৈন্যবাহিনী রাখিতে হইবে। এ সত্যটি ভুলিলে চলিবে না যে, বর্তমান পৃথিবী রণোন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

জিগীষা ও জিঘাংসাবৃত্তি মানুষের রক্তের সংস্কার। এইসব বৃত্তি সমূলে উৎপাটিত না হইলে পৃথিবী হইতে কখনও সংগ্রামের বিরতি ঘটিবে না। ভারতবাসীকেও সতত সেই সংগ্রাম ও আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

শান্তির সময়েও সেনাবাহিনীর মূল্য উপেক্ষণীয় নয়

শুধু সংগ্রামের জন্য নয়, শান্তির সময়েও সেনাদলের প্রয়োজন আছে। এ দেশে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর প্রাদুর্ভাব প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এরূপ দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের মুহূর্তে দেশে শান্তি, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা-রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর সাহায্যের প্রয়োজন আছে। সুগঠিত জাতীয় সেনা-বাহিনীর মূল্য শান্তির সময়েও উপেক্ষণীয় নয়।

স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতবাসীর দেশরক্ষার দায়িত্ব শতগুণ বাড়িয়া গেল। ইংরেজজাতি এদেশ পরিত্যাগ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতি সমগ্র দেশকে দুর্বল পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। আমাদের চতুর্দিকে

শত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার দায়িত্ব ভারতবাসীর

বিপদের কালো মেঘ আজ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। তদুপরি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধও অসম্ভব কিছুই নয়। এরূপ অবস্থায় স্বাধীন ভারতবর্ষ যদি সামরিক শক্তিতে শক্তিমান হইয়া না উঠে তাহা হইলে তাহার অস্তিত্বরক্ষা কঠিন হইয়া পড়িবে। প্রেম, মৈত্রী ও প্রীতির সদিচ্ছাপূর্ণ বাণী পররাজ্যলোভী মানুষের পশুমনোভাব বিদূরিত করিতে পারিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। তাই অস্ত্রকে অস্ত্রের দ্বারা, পশুবলকে মারণশক্তির দ্বারা প্রতিহত করিতে হইবে।

অগণিত ভারতবাসী স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়াই বিগত যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল এবং বৃটিশের পাশে দাঁড়াইয়া জীবন পণ করিয়া অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়াছিল। মিত্রপক্ষের যে যুদ্ধবিজয় হইল, তাহার পিছনে ভারতীয় সেনার দান সামান্য নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে ও যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে যে-সব ভারতীয় তরুণ সামরিক অভিজ্ঞতা লাভ

করিয়াছে, বর্তমানে তাহাদিগকে যদি আরও শিক্ষিত করিয়া তোলা যায়, তাহা হইলে ভারতের সামরিক বিভাগ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিবে।

ভারতবাসীকে ব্যাপকভাবে সামরিক শিক্ষায় পারদর্শী করিয়াতুলিতে হইলে সামরিক বিদ্যালয়ের ব্যাপক প্রসার একান্ত আবশ্যক। তা ছাড়া সমরে পটু এবং সমরে অপটু, এ রকম শ্রেণীবিভাগ অচিরেই তুলিয়া দিতে হইবে। প্রাদেশিকতার

উপসংহার

সংকীর্ণ মনোভাব এখনও যদি আমরা বর্জন করিতে না পারি তাহা হইলে দেশরক্ষাব্যাপারে ভারতবর্ষ বিপন্ন হইয়া পড়িবে। ভারতের নানাজায়গায় সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক প্রদেশের স্বাস্থ্যবান তরুণ যুবক এইসব বিদ্যালয়ে যাহাতে সহজে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি বটে, কিন্তু স্বাধীন মানুষের মনোভগি এখনও অর্জন করিতে পারি নাই। সেজন্য ভারতবাসীর চরিত্রে এখনও নানারকমের দুর্বলতা বিদ্যমান। দেশকে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিবার জন্য আমাদিগকে সকল রকমের চারিত্রিক দুর্বলতার উর্ধ্বে উঠিতে হইবে। দেশপ্রীতি, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণের অভাব না ঘটিলে ভারতবাসী অদূর ভবিষ্যতে সামরিক শক্তিতে নিশ্চয়ই দুর্বার ও দুর্জয় হইয়া উঠিতে পারিবে।

শিক্ষা ও আনন্দের ক্ষেত্রে দেশভ্রমণ

[**রচনার সংকেতসূত্র** ঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষা অসম্পূর্ণ—দেশভ্রমণ বিদ্যালয়প্রদত্ত শিক্ষাকে সম্পূর্ণতা দান করে—দেশভ্রমণে চিত্তের প্রসার ঘটে—দেশভ্রমণ আমাদের জীবনদৃষ্টিকে দূরযানী করিয়া তোলে—দেশভ্রমণ বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জনের সহায়ক—শুধু ব্যক্তিগত মানসউৎকর্ষসাধনের জন্য নয়—দেশের উন্নতিবিধানের জন্যও দেশভ্রমণ বাঞ্ছনীয়—দেশভ্রমণ আনন্দলাভেরও একটি বড়ো উৎস—উপসংহার।]

মানুষের সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া শিক্ষার ধারাটি প্রবাহিত। মানুষের আয়ুষ্কালের বিশেষ একটা সীমারেখার মধ্যে শিক্ষাকে আবদ্ধ করা যায় না। কিন্তু

বিদ্যালয়ের শিক্ষা অসম্পূর্ণ

কার্যত দেখা যায়, দেশের বিদ্যানিকেতনকে কেন্দ্র করিয়াই সাধারণ মানুষের শিক্ষাজীবন আবর্তিত হয়। আবার, বিদ্যার্থীরা সেখানে যে-শিক্ষা লাভ করে তাহা প্রধানত পুঁথিগত ও সংকীর্ণ, বাস্তবের সঙ্গে ওই শিক্ষার এবং অর্জিত জ্ঞানের প্রত্যক্ষ কোনো সংযোগ নাই। এজন্য শিক্ষা ও বিদ্যার মধ্যে সচরাচর দুস্তর একটা ব্যবধান

পরিলক্ষিত হয়। বাস্তব-সম্পর্ক-বিরহিত কোনো বিদ্যাই জীবনে যথার্থ ফলপ্রসূ হইয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং ইহাকে অসম্পূর্ণই বলিতে হইবে। পরোক্ষ জ্ঞানকে ফলপ্রদ করিয়া তুলিতে হইলে আমাদের আর-একটি জিনিসের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে—এই জিনিসটি হইল দেশভ্রমণ। পাশ্চাত্ত্য দেশে ভ্রমণকে শিক্ষারই একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে ধরিয়া লওয়া হয়। ইংলণ্ডে-আমেরিকায় শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসমাপনের পর দেশভ্রমণে বাহির হইয়া পড়ে। তাহাদের বিশ্বাস, দেশভ্রমণ না করিলে শিক্ষার সত্যতাই অনুভূত হয় না।

বহির্বিশ্বকে নিজের চোখে দেখিয়া যে-জ্ঞান আমরা আহরণ করিতে পারি, প্রাচীরবেষ্টিত স্কুলকলেজের মধ্যে তাহা অর্জন করা কখনও সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট একটা বয়স পর্যন্ত মাত্র বিশেষ একরকমের শিক্ষাই সেখানে দান করা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বৃহত্তর পৃথিবীকে দেখিবার সুযোগ-সুবিধা লাভ করে না। বিদ্যানিকেতনে আমরা ইতিহাস পড়ি, বিজ্ঞান পড়ি, ভূগোল পাঠ করি, এবং এই রকমের আরও নানাশাস্ত্র আমাদিগকে অধ্যয়ন করিতে হয়। কিন্তু পুঁথির পাতা হইতে যে-জ্ঞান ও ধারণা জন্মায় তাহা অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ। ইহাকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক দেশভ্রমণের সাহচর্য। ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোলের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়াইয়া আছে। বহির্ভ্রমণের প্রত্যক্ষতা ও দৃশ্যমানতার সাহায্যে উহারা যখন সত্যতর হইয়া উঠে, কেবল তখনই অধীত বিদ্যা চরিতার্থতা লাভ করে। বিচিত্র মানবসমাজ, বিচিত্র প্রাণী, বিচিত্র বস্তুপুঞ্জের কথা বইয়ের পাতায় মুদ্রিত থাকে। এগুলিকে আমরা চিন্তা দিয়া, বুদ্ধি দিয়া জানি মাত্র। কিন্তু বাহিরের জগতে পরিভ্রমণকালে এ সব বস্তুকে যখন আবার নানা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধি করি, তখন পূর্বের জানাটি কতখানি বাস্তব হইয়া উঠে! এজন্যই দেশভ্রমণ সর্বথা শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত।

দেশভ্রমণ শিক্ষাকে সম্পূর্ণতা দান করে

অন্যদিকে নিজের সীমিত গৃহের ক্ষুদ্র-পরিসরের মধ্যে দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকার ফলে আমাদের মন ও হৃদয় সংকুচিত হইয়া আসে—ইহাতে চিত্তের স্বাভাবিক প্রসারের গতিটি ব্যাহত হয়। প্রাত্যহিক জীবনের নানা সংকীর্ণতা ও গ্লানি তখন জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ক্ষুদ্র স্বার্থ, গ্লানিময় আত্মকেন্দ্রিকতা মানুষকে যখন ঘিরিয়া ধরে, তখন তাহার বৃহত্তর সত্তা মরিতে বসে, তখন মানুষের 'ছোট-আমি' তাহার 'বড়ো-আমি'কে অস্বীকার করে। এই রকমের একটি অবস্থা

দেশভ্রমণে চিত্তের প্রসার ঘটে

মানবের পক্ষে অপমৃত্যুর সমান। গ্রাম্যজীবনে আমরা যে নিরন্তর হানাহানি ও দলগত বিবাদ-বিসংবাদ দেখিতে পাই, তাহা এই মানসিক সংকীর্ণতারই জন্য। পল্লীর মানুষ দীর্ঘকাল ধরিয়া একটি জায়গায় আবদ্ধ হইয়া থাকে, কেবল নিজের গ্রামটিকেই তাহারা সত্য বলিয়া জানে—বহিঃপৃথিবীর বিপুল প্রাণস্পন্দনের ক্ষেত্র হইতে তাহারা একেবারে বিচ্ছিন্ন। তাহাদের মনের এই সংকীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতাকে বিদূরিত করিতে পারে বহির্বিশ্বে ভ্রমণলব্ধ শিক্ষা ও সজীব অভিজ্ঞতা।

দেশভ্রমণ আমাদের জীবন-দৃষ্টিকে দূরযানী করিয়া তোলে

পল্লীর মানুষ অন্তত একবারও যদি কিছুকালের জন্য দূরবর্তী দেশ দেখিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে নূতন দেশের নূতন শিক্ষা, নূতন সঙ্গ, নূতন আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা তাহার মনগড়া বিচারের ক্ষেত্রটিকে অবশ্যই উদার করিয়া তুলিবে। মানসিক উন্নতি ও জীবনদৃষ্টির প্রসারসাধনের জন্য মানুষের পক্ষে দেশভ্রমণ একান্ত অপরিহার্য। আমরা যতক্ষণ বদ্ধ ঘরে থাকি ততক্ষণ আমাদের ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র দুঃখ বড়ো হইয়া দেখা দেয়, সামান্য কারণেই আমরা নিজেকে পীড়িত ও ব্যথিত মনে করি। কিন্তু পৃথিবীর দূরবিস্তার প্রাণলোকের প্রেক্ষাপটে নিজেকে যখন আমরা দেখি, তখন সেই ক্ষুদ্রতা-তুচ্ছতা বিদূরিত হইয়া যায়। জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের বিচিত্রতাকে উপলব্ধি না করার মতো দুর্ভাগ্য মানুষের জীবনে আর কিছুই নয়। বৃহত্তর মানবসমাজের পটভূমিকায় আপনাকে উপলব্ধি করিতে না পারিলে মানুষের মাত্রাজ্ঞান জন্মায় না, মানুষে-মানুষে দূরত্বের আড়ালটি মুছিয়া যায় না। ইহার জন্য প্রয়োজন ভ্রমণের—বিদেশে না হোক, অন্তত স্বদেশভূমির নানা জায়গায়।

দেশভ্রমণ বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জনের সহায়ক

দেশবিদেশে ভ্রমণের ফলে শুধু যে আমাদের শিক্ষালাভ হয় তাহা নয়, ইহাতে আমরা বিচিত্র অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করিয়া থাকি। যে-মানুষ জাতির মুক্তিপথের প্রদর্শক হইবেন, যে-মানুষ দেশের জনগণকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিবেন, যিনি হইবেন জাতির শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ, তাঁহার পক্ষে বহির্বিশ্বভ্রমণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির সহিত বিশেষভাবে তাঁহাকে পরিচয়সাধন করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ, জওহরলাল, রাধাকৃষ্ণন্ প্রমুখ মনীষীদের বিদেশভ্রমণজনিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে দেশের মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে। দেশবিদেশে ভ্রমণের ফলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও আনন্দ সঞ্চয় করিয়াছেন,

তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কবির রচিত 'রাশিয়ার চিঠি', 'জাপানযাত্রীর ডায়েরী', 'পারশ্যভ্রমণ', 'পথের সঞ্চয়' প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থ হইতে।

ব্যবসায়-বাণিজ্য-শিল্প প্রভৃতিকে উন্নত করিতে গেলেও দেশের ব্যবসায়ীকে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিককে বিদেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে। এই সব ক্ষেত্রে শুধু দেশের চিরাচরিত প্রথাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে চলিবে না। বিভিন্ন দেশের অগ্রগতির সঙ্গে সমান পদক্ষেপে চলিতে না পারিলে দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতে পারে না। ইহার ফলে জাতির দারিদ্র্য বাড়িবে, জনগণের জীবনমান নীচু হইয়া যাইবে। এক্ষেত্রে বিদেশভ্রমণের সার্থকতা বর্তমানে আমরা কিছুটা যেন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। আজকাল বড়ো বড়ো ব্যবসায় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ধনী মালিকের অর্থসাহায্যে এদেশের অনেক শিক্ষিত যুবক ভারতের বাহিরে যাইবার সুযোগ লাভ করিতেছে।

শুধু ব্যক্তিগত মানসউৎকর্ষ-সাধনের জন্য নয়, দেশের উন্নতিবিধানের জন্যও দেশভ্রমণ বাঞ্ছনীয়

দেশভ্রমণ হইতে আমরা যে কেবল শিক্ষালাভ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি তাহা নয়, ইহার আরও একটি উপকারিতা আছে। তাহা হইল—আনন্দ। বছরের পর বছর ধরিয়া একই পরিবেষ্টনীর মধ্যে কালাতিপাত করার জন্য আমাদের হৃদয়মন নূতনত্বের অভাবে ক্লান্ত ও নিরানন্দ হইয়া উঠে। তখন ইহা চায় বাহিরের আলোবাতাস, বাহিরের রং, বাহিরের সুর। বাহিরকে জানিবার কৌতূহল, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতি সম্পর্কিত সীমাহীন জিজ্ঞাসা মানুষের মনে চিরজাগ্রৎ। প্রাত্যহিকতার পুনরাবৃত্তির মলিনতা হইতে হৃদয় আর মনকে মুক্তি দিতে হইলে আমাদিগকে বহিঃপৃথিবী-ভ্রমণের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু মানুষই মানুষকে সঙ্গ ও আনন্দ দান করে না, এই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতিও মানুষের চিরকালের সঙ্গী—মানুষকে ঘিরিয়া নিরন্তর চলিয়াছে নিসর্গলোকের আনন্দলীলা।

দেশভ্রমণ আনন্দলাভেরও একটি বড়ো উৎস

বিজ্ঞানের আবিষ্কারে দেশভ্রমণ বর্তমানে সহজ হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহার জন্য অধিক অর্থব্যয়েরও প্রয়োজন হয় না। এই সুযোগ আমাদের প্রত্যেকেরই গ্রহণ করা উচিত। কূপমণ্ডুকতা যেমন অভিপ্রেত নয়, তেমনি কেবল অর্থসঞ্চয়ই মানুষের জীবনের বড়ো কাম্য জিনিস নয়। মানুষ প্রকৃতির অবারিত প্রসন্ন সান্নিধ্য লাভ করুক, দেশে দেশে মানবকীর্তির স্বাক্ষরগুলিকে চিনিয়া লউক—তবেই দেখা দিবে তাহার জীবনের সার্থকতা। মানুষ যে কত বড়ো, তাহার শক্তি যে কী বিপুল, মরণশীল হইয়াও যে মানুষ মৃত্যুঞ্জয়, ভ্রমণ ব্যতীত একথার সত্যতা উপলব্ধি করা তাহার পক্ষে কখনও সম্ভব নয়।

উপসংহার

আমাদের শিক্ষাসংস্কার

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** ভূমিকা—শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য—শিক্ষাসংস্কারের গোড়ার কথা—গান্ধীপরিকল্পনা ও সার্জেন্ট-পরিকল্পনা—এদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা—দেশে বৃত্তিশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার অভাব—বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—নারীশিক্ষা—শিশুশিক্ষা—শিক্ষার মাধ্যম—দেশের উচ্চতর শিক্ষাপদ্ধতি—শিক্ষকের কথা—উপসংহার।]

সুশিক্ষিত ইংরেজ-জাতির শাসনাধীনে থাকিয়া বিগত দেড়শত বছরের মধ্যে আমরা যে-শিক্ষা অর্জন করিয়াছি, তাহার লাভক্ষতির হিসাবনিকাশের একটা উত্তম আজ আমাদের মধ্যে দেখা যাইতেছে। জাতীয় জীবনের জাগরণের ক্ষেত্রে ইহাকে নিশ্চয়ই আমরা শুভবুদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতে পারি।

ভূমিকা

সুদীর্ঘকালের স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিকে অপসারিত করিয়া আজ আমরা প্রকৃতই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে, ইংরেজী-শিক্ষা আমাদিগকে যতখানি মুগ্ধ করিয়াছে ততখানি সঞ্জীবিত করে নাই। করে নাই বলিয়াই এই শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের পক্ষে একটা বোঝার মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং বর্তমানে ইহা জাতির অগ্রগতিকে প্রতিপদে ব্যাহত করিতেছে। শিক্ষার নামে এত বড়ো বঞ্চনা ও নির্মম পরিহাস জগতের কোনও সভ্যদেশে দেখা যাইবে বলিয়া আমাদের ধারণা নাই।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইল মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করা, মানুষের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রৎ করিয়া তোলা, জাগতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের পরিচয়-সাধন করিয়া দেওয়া, ব্যষ্টিজীবন ও সমষ্টিজীবনের মধ্যে ঐক্যের সেতু গড়িয়া তুলিয়া সুশৃঙ্খল সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করা।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

কিন্তু ইংরেজের প্রদত্ত শিক্ষা আমাদিগকে মানুষ করিয়া তোলে নাই, আমাদের আত্মশক্তির বিকাশসাধন করে নাই, ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনের মধ্যে কোনও যোগসূত্র রচনা করিতে পারে নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া তথাকথিত শিক্ষালাভের পরও আমাদের শিক্ষায়তন ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে বিচ্ছেদজনিত শূন্যতা পূর্ণ হইয়া উঠিল না। এই শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের মনুষ্যত্ব, আমাদের মর্যাদাবোধ ও শুভবুদ্ধিকে সম্পূর্ণভাবে হত্যা করিয়াছে—স্বাধীন মানুষ, বলিষ্ঠ সমাজ, স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িবার সকল শক্তি পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। সুতরাং আমাদিগকে জাতীয় শিক্ষাপ্রবর্তনের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনা করিতে হইবে। শোচনীয় আর্থনীতিক পরাধীনতার হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে আমাদের

শিক্ষাধারার মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনিতে হইবে। স্বাধীন মানুষ, স্বাধীন রাষ্ট্র যদি গড়িতে হয়, তবে গণতান্ত্রিক শিক্ষার বুনিয়াদ রচনা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই।

আমাদের শিক্ষাসংস্কারের গোড়ার কথা হইবে সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারসাধন। দেশের প্রত্যেকটি মানুষ যাহাতে শিক্ষার আলোক পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা এখনও আমাদের দেশে হয় নাই। আমরা আজ গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখিতেছি—সেজন্য সর্বাগ্রে চাই গণশিক্ষার বিস্তার। তাহাকেই গণশিক্ষা বলিব, যেখানে সমাজের সর্বস্তরের, সকল বয়সের নরনারী ও শিশুর রহিয়াছে শিক্ষালাভের অধিকার। প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্কদের শিক্ষার কোনও উচ্চ আদর্শ আমাদের নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-সম্পর্কিত যে-আইন বাংলাদেশে প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা দেশের সর্বত্র অদ্যাবধি কার্যকরী হইয়া উঠে নাই। অধুনা আবশ্যিক শিক্ষার নানা পরিকল্পনার কথা আমরা শুনিতেছি।

আমাদের শিক্ষাসংস্কারের গোড়ার কথা

গান্ধীজী সাত হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সের বালকবালিকাদের জন্য সাত বৎসর পরিসরের আবশ্যিক বুনিয়াদি শিক্ষার কথা বলিয়াছিলেন। সার্জেন্ট-পরিকল্পনায় আবশ্যিক শিক্ষার পরিসর আট বৎসর—ছয় হইতে চৌদ্দ বছরের বালকবালিকারা এই শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ লাভ করিবে। এ সব পরিকল্পনা যদি কার্যকরী হইয়া উঠে, তবে আমাদের শিক্ষার অনশন কিছুটা বিদূরিত হইবে। যে-প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এখন দেশে প্রচলিত আছে, উহা দ্বারা বালক-বালিকারা যথার্থ শিক্ষালাভ করিতেছে না। বহুদিনের পুরাতন পরিত্যক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীগণকে আজও বিদ্যাচর্চা করিতে হইতেছে। ইহাতে আনন্দ নাই, শিশুমনস্তত্ত্বের স্থান নাই, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নাই; আছে শুধু শুষ্ক পুঁথির বোঝা ও শাসনদণ্ড। অল্পবয়সে পুঁথিতে মনসংযোগ করা অপেক্ষা হাতেকলমে কাজ করার মধ্য দিয়াই ছেলেমেয়েরা ফলপ্রসূ শিক্ষা লাভ করে। অগ্রসর দেশগুলিতে সেজন্য ইন্দ্রিয়মূলক শিক্ষা ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে ছোট ছোট বালকবালিকার জন্য। ফ্রোয়েবেল ও মন্টেসরি-পদ্ধতিতে এ রকমের শিক্ষাধারার একটি বিশিষ্ট অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

গান্ধীপরিকল্পনা ও সার্জেন্ট-পরিকল্পনা

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে মোটেই উন্নত নয়, এবং এ রকমের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে নিতান্ত স্বল্প। এতদ্ব্যতীত

এইসব প্রতিষ্ঠানে যে-শিক্ষার ধারা প্রবাহিত, তাহা আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। একটিমাত্র আদর্শে আমরা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পাইতেছি। পুঁথিগত মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য কলেজের অভিমুখে ধাবিত হওয়াই দেশের প্রত্যেক তরুণতরুণীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞান, সূক্ষ্ম-ভাবভিত্তিক সাহিত্য যে সকলের জন্য নয়, এ সত্যটি এখনও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। সেহেতু এদেশে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বৈচিত্র্যের এমন অভাব পরিলক্ষিত হয়।

এদেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা

বৃত্তিশিক্ষাদানের তেমন কোনোরূপ উদ্যোগ আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে পরিদৃষ্ট হয় না। কৃষি, শিল্প, কারিগরী ও ব্যবসায়ী শিক্ষার সুব্যবস্থা যদি না থাকে, তাহা হইলে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ জীবনে কোনোদিনই আত্ম-নির্ভরশীল হইয়া উঠিতে পারিবে না—ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রতি পদে তাহাদের আসিবে ব্যর্থতা এবং পরাজয়। জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করিবার শক্তিসামর্থ্য যাহাতে শিক্ষার্থীরা অর্জন করিতে পারে, তাহার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। বিদ্যালয় ত্যাগ করার পর তাহারা যাহাতে সমাজে প্রবেশ করিয়া স্বাধীন মানুষ বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে পারে, আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যায়তনে তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

দেশে বৃত্তিশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার অভাব

শিক্ষাকে অর্থকরী ও স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার জন্য গান্ধীজী তাঁহার ওয়ার্ধাপরিকল্পনায় শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। অবিশ্রান্ত কর্মপ্রবাহের ভিতর দিয়াই মানুষের জীবনের অগ্রসরণ। শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মের একটা বিশেষ স্থান আছে। অথচ শিক্ষাকে আমরা কর্মকেন্দ্রিক ও শিল্পমুখী না করিয়া পুস্তককেন্দ্রিক করিয়া তুলিয়াছি। ফলে আধুনিক শিক্ষা আমাদের কাছে একটা বোঝার মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যতদিন না হয়, ততদিন নানা দুর্ভোগ আমাদিগকে সহ্য করিতে হইবে—কেরাণীজীবনের দাসত্ব হইতে আমরা ততদিন পর্যন্ত কিছুতেই মুক্তিলাভ করিতে পারিব না।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

নারীশিক্ষার ব্যবস্থাও এদেশে নিতান্ত অসম্পূর্ণতার স্তরে রহিয়া গিয়াছে। সমাজে নারীর স্থাননির্দেশপূর্বক বিশেষ রকমের শিক্ষাপদ্ধতির গোড়াপত্তন এখনও

আমরা করিতে পারি নাই। অসংখ্য ত্রুটিতে পরিপূর্ণ পুরুষের শিক্ষার আদর্শই আমরা মেয়েদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছি। ইহাতে আমাদের সমাজ ও পারিবারিক জীবন কেন্দ্রচ্যুত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। বাহিরের জগতে পুরুষের

নারীশিক্ষা

সহিত আর্থিক প্রতিযোগিতা করিবার প্রবৃত্তি নারীসমাজে আজ প্রবলরূপে দেখা যাইতেছে—ইহাতে নারী এবং পুরুষ কাহারও কল্যাণ দেখা দিবে না। পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া নারীশিক্ষার আদর্শ গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহাদের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিবিধ বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কুটীরশিল্প-বিষয়ক শিক্ষালাভ করিলে মধ্যবিত্তসমাজের কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতা আসিতে পারে। বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে আমাদের সমাজে নারীর মন বহির্মুখী হইয়া পড়িয়াছে, উহাকে গৃহাভিমুখী করিয়া তুলিবার প্রেরণা সৃষ্টি করিতে হইবে। বহিঃক্ষেত্রে মেয়েদের কর্মজীবন নিতান্ত সীমাবদ্ধ। সেজন্যই নারীশিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনিবার প্রয়োজন আমরা অনুভব করিতেছি।

শিশুশিক্ষা

পাঁচবৎসরবয়স্ক ও তৎনিম্ন শিশুদের নার্সারী স্কুলে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এদেশে নাই বলিলেও চলে। পাশ্চাত্ত্যদেশে নার্সারী স্কুলের ব্যাপক প্রসার হইয়াছে বলিয়া সেখানে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা শিক্ষা-নিকেতনে স্বাস্থ্য ও আনন্দের ঝর্ণাধারা ছুটাইয়া চলিয়াছে। আনতশিরে, ম্লানমুখে ছয়সাত ঘণ্টা ধরিয়া পুঁথির মধ্যে মনোনিবেশ করিতে হয় আমাদের দেশের ছেলেমেয়েকে। ইহা নির্মমতার নামান্তর মাত্র, এবং এরূপ নির্মমতা তাহাদের পক্ষে দুর্বিষহ।

শিক্ষার মাধ্যম

এতদিন ইংরেজী ভাষাই ছিল আমাদের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার বাহন। মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বর্তমানে মাতৃভাষাকে আমরা শিক্ষার বাহনরূপে পাইয়াছি। মাতৃভাষার সাহায্য ভিন্ন কোনো শিক্ষাই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না—এতকাল পরে এই সত্যটির সন্ধান আমরা পাইয়াছি। কিন্তু কেবল মাধ্যমিক স্তরেই নয়, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও মাতৃভাষাকে মাধ্যম করিয়া তুলিতে হইবে, তবেই আমাদের শিক্ষা যথার্থ ফলপ্রসূ হইয়া উঠিবে।

দেশের উচ্চতর শিক্ষাপদ্ধতি

এদেশের উচ্চতর শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যেও নানা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ সংস্কৃতির আদানপ্রদানের ক্ষেত্রটিকে প্রশস্ত করিয়া তোলা। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শুধু বিদেশের জ্ঞানবিদ্যাই গ্রহণ করিতেছে, আপন দেশের জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার

বিশ্ববাসীর কাছে উন্মুক্ত করিয়া ধরিবার তেমন কোনও চেষ্টা করিতেছে না। দেশীয় সংস্কৃতি, স্বদেশের ঐতিহ্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। আমরা শুধু গ্রহণ করিতেই শিক্ষালাভ করিতেছি, অন্য দেশকে নিজের জিনিস দিবার উদ্যম ও প্রেরণা আমাদের মধ্য হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জাতীয় ভাবধারায় যাহাতে আমাদের জীবন পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, এবং অন্যদিকে বৈদেশিক উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া যাহাতে আমরা আহৃত বিদ্যার পরিচয় দিতে পারি, বিশ্ববিদ্যালয়কে তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

শিক্ষকের কথা

শিক্ষাসংস্কারের কথা বলিতে বসিয়া শিক্ষককে বাদ দিলে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এবং মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে যে-বেতন আমরা দিয়া থাকি, তাহা নিতান্তই তুচ্ছ। এ জন্যই বিদ্যালয়ে বর্তমানে উপযুক্ত শিক্ষকের এমন অভাব দেখা যাইতেছে। শিক্ষকের আর্থিক অবস্থা উন্নত না হইলে শিক্ষাব্যবস্থাও উন্নত হইবে না। জীবিকা অর্জনের দুশ্চিন্তা হইতে শিক্ষককে মুক্তি দিবার উপায় আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। শিক্ষককে বাদ দিয়া শিক্ষাসংস্কারের কোনো প্রস্তাবই উত্থাপিত হইতে পারে না।

উপসংহার

শিক্ষকের বেতনবৃদ্ধি করিতে হইলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা-দানের প্রতিষ্ঠান বাড়াইতে হইলে, শিক্ষাবাবদ আরও অধিক পরিমাণ অর্থ আমাদিগকে ব্যয় করিতে হইবে। সরকার যদি আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে অকৃপণ হস্তে সাহায্য করেন, এবং আমরাও যদি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে শিখি, তবে অর্থের অভাব অবশ্যই বিদূরিত হইবে। আমরা এখনও শিক্ষার জন্য আবদার করিতেছি মাত্র—যেদিন প্রকৃত গরজ অনুভব করিব, সেদিন নিশ্চয়ই শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থের অসচ্ছলতা দেখা যাইবে না। আমাদের মনোবৃত্তির পরিবর্তনের উপরই শিক্ষাসংস্কারের আকৃতি-প্রকৃতি এবং সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষা

[**রচনার সংকেতসূত্র** ঃ ইংরেজ কর্তৃক ভারতবিজয় একটি বিশেষ ফলিতার্থময় ঘটনা—জাতির চিত্তে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাব—সাম্রাজ্যবাদী মেকলের প্রচেষ্টা—বাঙালীচিত্তের অর্ধস্ফুট জাগরণ—ইংরেজীশিক্ষার ব্যর্থতা—বিদেশী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যর্থ হইতে বাধ্য—শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপুল অপচয়—মাতৃভাষার সঙ্গে জাতির প্রাণের যোগ—ইংরেজীশিক্ষার সুযোগ সকলে গ্রহণ করিতে অসমর্থ—মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিলে তাহার দৈন্য ঘুচিবে—উপসংহার ।]

ইংরেজ কর্তৃক ভারতবিজয় শুধু যে রাজনীতিক ঘটনা হিসাবেই বিশেষ একটি অর্থপূর্ণ ব্যাপার তাহা নয়, ইহার প্রভাব আমাদের জাতীয় জীবনে যেমন গভীর তেমনি ব্যাপক। ইংরেজচিত্তের সহিত সংস্পর্শের মধ্য দিয়া আমাদের মনে লাগিয়াছে পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারার ছোঁয়া—ইহারই ফলে আমাদের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আসিয়াছে আশ্চর্য রকমের একটা রূপান্তর। বণিকের মানদণ্ড একদিন এ দেশে শাসকের রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল! দেশশাসনের গুরুভারের সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্ব। ব্রিটিশের সেই দায়িত্ববোধের মূলে যে-প্রেরণা ছিল তাহা অনেকটা আত্মকেন্দ্রিক, সুতরাং সেই প্রেরণাকে বলা যায় স্বার্থগন্ধী। অর্থাৎ শিক্ষাপ্রচারের উদ্দেশ্য ছিল বিজিত জাতির মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করা নয়, তাহার লক্ষ্য ছিল আমলাতন্ত্ররূপ যন্ত্রটির সুষ্ঠু পরিচালনা। আমাদের রাজপুরুষদের ভাষা ছিল ইংরেজী। সুতরাং দেশীয় লোকের মধ্যে ইংরেজী-শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন দেখা দিল।

ইংরেজ কর্তৃক ভারতবিজয় একটি বিশেষ ফলিতার্থময় ঘটনা

ঊনিশ শতকের তৃতীয় দশকের দিকে ইংরেজীশিক্ষা ও সভ্যতার ধারা এ দেশে বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিতে থাকে। কিন্তু তাহার পূর্ব হইতেই আমরা পাশ্চাত্ত্য মানসিকতার সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। ইহার ফলে দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সভ্যতার পরস্পর পরিচয় ঘটিতে থাকে। ইউরোপীয় চিত্তের সংঘাতপ্রভাবে ভারতীয় সমাজজীবন ও জাতির চিত্তে একটা নবজাগরণের সাড়া জাগিয়াছিল। নানাকারণে বাঙালীর মানসলোকে ইহার প্রভাব গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গেল।

জাতির চিত্তে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাব

ইউরোপীয় শিক্ষাবিস্তারের সেই যুগসন্ধিক্ষণে শিক্ষার মাধ্যম লইয়া নানা মতভেদ দেখা দিল—শিক্ষার বাহন-হিসাবে কেহ চাহিল দেশীয় ভাষা, কেহ চাহিল

আর্যভাষা সংস্কৃত; আবার, কেহ চাহিল ইংরেজ-রাজপুরুষের ভাষা ইংরেজী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার ব্যাপারে মেকলে সাহেবের প্রচেষ্টাই সার্থক হইল। ভারতের রাজনীতিক স্বাধীনতা বিধ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও মেকলে সাহেব যেন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি চাহিলেন, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিজিত জাতিকে পরাভূত করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বিবর্জিত করিতে। মেকলের এই সর্বনাশা উদ্যমের তাৎপর্য সেদিন দেশবাসী উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

সাম্রাজ্যবাদী মেকলের প্রচেষ্টা

ইহার পর হইতে শিক্ষার বাহন-হিসাবে ইংরেজী ভাষা এ দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইল একটি নূতন ধারা। এইভাবে শিক্ষার রূপ বদলাইয়া গেল, ধীরে ধীরে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইল—ইউরোপীয় ভাবধারার প্রভাবে আমরা আচ্ছন্ন হইয়া গেলাম।

আমাদের জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যে একদিন হয়তো পাশ্চাত্ত্য চিত্তসংঘাতের প্রয়োজন ছিল। কারণ, আমরা বাস করিতেছিলাম সংকীর্ণ একটি জগতের মধ্যে। তাহার বাহিরে যে-বিরাট মানবসভ্যতার ধারা ইতিহাসের বিবর্তনপথে আবর্তিত হইতেছিল তাহা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার অগোচর ছিল। আমাদের সংস্কারদুষ্ট আচার ও অন্ধবিচারের অচলায়তনকে বিধ্বস্ত করিল ইউরোপীয় মনের জঙ্গম শক্তি। তাহার ফলে বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষে আসিয়াছিল 'রেনেসাঁ' বা পুনর্জাগরণ। কিন্তু তখনও আমাদের সুপ্তির ঘোর সম্পূর্ণ কাটে নাই, উজ্জীবন-মন্ত্র তখনও আমরা উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করিতে পারি নাই।

বাঙালীচিত্তের অর্ধস্ফুট জাগরণ

মনের ও প্রাণের আচ্ছন্ন অবস্থায় লাভক্ষতির হিসাবনিকাশ করা তখন সম্ভব ছিল না—ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার স্রোতে তখন অবাধে আমরা গা ভাসাইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু আজ আমরা সেই যুগপ্রভাব কাটাইয়া অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছি। এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি, ইংরেজী ভাষার ভিতর দিয়া যে-শিক্ষা আমরা লাভ করিয়াছি তাহা আমাদিগকে যতটুকু মুগ্ধ করিয়াছে ততটুকু সঞ্জীবিত করে নাই। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রচারের চেষ্টা যে ফলপ্রসূ হয় নাই—আমাদের জাতীয় জীবনে তাহা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে, তাহার প্রমাণ, একটি শতাব্দী চলিয়া গেল, তবু এই দুর্ভাগা দেশের শতকরা পনেরো জন লোকও নিজেদের শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিতে পারে না। জাতির যে-মুষ্টিমেয়

ইংরেজী-শিক্ষার ব্যর্থতা

ভগ্নাংশ ইংরেজী-শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহারাও সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে পারে নাই—জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে তাহারা পরগাছাতুল্য। দেশের জনসাধারণের বৃহত্তম অংশ অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় আমাদের জাতীয় জীবন আজ কলঙ্কিত।

এই শিক্ষা ব্যর্থ হইল কেন? তাহার প্রধান কারণ, আমরা অদ্যাবধি মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করিয়া তুলিতে পারি নাই। প্রকৃত বাহনের অভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সকল প্রচেষ্টা শূন্যতায় পর্যবসিত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি সভ্যদেশে জনসাধারণের মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন। কিন্তু ভারতবর্ষে বিজাতীয় একটি ভাষা দেশবাসীর মাতৃভাষাকে তাহার স্বস্থান ও স্বাধিকার হইতে দূরে ঠেলিয়া দিয়া শিক্ষাকেন্দ্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। রাজনীতিক কারণে একদিন ইংরেজী ভাষার যে-একটা বিশিষ্ট গৌরব ছিল, আমরা তথাকথিত শিক্ষিত-সম্প্রদায় এখনও উহাকে কাম্য ভাবিয়া আত্মতৃপ্তি অনুভব করিতেছি। ইংরেজী ভাষার প্রতি মোহের প্রভাব আজ পর্যন্ত আমরা কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই।

বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যর্থ হইতে বাধ্য

শিক্ষাসমস্যা এদেশে জটিল রূপ ধারণ করিয়াছে। নানা বাদবিসম্বাদের পর এতদিনে মাত্র মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই আমরা মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিয়া তুলিতে পারিয়াছি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার দ্বার এখনও রুদ্ধ। মাতৃভাষার মাধ্যম ব্যতীত যথার্থ শিক্ষাপ্রচার ও জ্ঞানবিস্তার যে বস্তুত অসম্ভব, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। শিক্ষার ক্ষেত্রে এতখানি মানসিক শক্তির শোচনীয় অপচয় শুধু আমাদের এই হতভাগ্য দেশেই সম্ভব। এই অপচয় কেবল মানসিক নয়,—আত্মিক, আর্থিক, এবং দৈহিক শক্তিরও বটে। এমন একদিন ছিল, যেদিন ইংরেজী শিখিয়া, পরীক্ষায় পাশ করিয়া, আমরা সরকারী দপ্তরখানায়, আপিসে চাকরি পাইতাম। আজ সেই সুবিধাও নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে। আমরা এখন পরীক্ষায় পাশ করি, কিন্তু বিদ্যার আলো পাই না, উদরান্নের সংস্থান করিতে পারি না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই যেখানে আমাদের লক্ষ্য, সেখানে পাঠ্যবিষয় আমরা গলাধঃকরণ করি মাত্র—তাহা হইতে আমরা শক্তি ও রস আহরণ করিতে পারি না। ভোজ্যবস্তুকে দেহের জারক-রসের প্রভাবে রক্তে পরিণত করিতে না পারিলে যেমন স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতে হয়, শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমাদের সেই অবস্থা দেখা দিয়াছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের বিপুল অপচয়

ভাষা শুধু ভাবের বাহন নয়—মাতৃভাষার ভিতর দিয়া জাতির প্রাণসত্তাটিও প্রকাশ এবং বিকাশ লাভ করে। যে-ভাষায় শৈশব হইতে আমরা ভাব-বিনিময় করি, যে-ভাষার সঙ্গে আমাদের আবাল্য পরিচয়, তাহাকে বাদ দিয়া বিজাতীয় ভাষাকে শিক্ষা ও জ্ঞান-প্রচারের বাহন করিলে শক্তির অপচয় সুনিশ্চিত। মাতৃভাষার প্রত্যেকটি শব্দের সঙ্গে আমাদের যেন নাড়ীর সংযোগ রহিয়াছে। সেই যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে আমাদের বুদ্ধি ও বোধশক্তি স্বাভাবিকভাবে পঙ্গু হইতে বাধ্য।

মাতৃভাষার সঙ্গে জাতির প্রাণের যোগ

পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শন প্রভৃতির প্রতি আমরা কটাক্ষপাত করিতেছি না। বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রসারের জন্য ভিন্ন জাতির জ্ঞানবিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু বিদেশী ভাবধারাকে গ্রহণ করিতে হইবে নিজ ভাষার ভিতর দিয়া—তখনই আহৃত বস্তু সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠিবে।

ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতে গেলে স্কুলকলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। কিন্তু আধুনিক বিদ্যাশিক্ষা-অর্জন-ব্যাপারে আর্থিক ব্যয়বাহুল্য কাহারও অবিদিত নয়। দরিদ্র দেশের কয়জন শিক্ষার্থী এত অর্থব্যয়ে এই উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ? এমন অনেক ছাত্র দেখা যায়, মাতৃভাষায় যাহাদের রহিয়াছে অদ্ভুত রকমের দখল, অথচ তাহারা ইংরেজী ভাষা সহজে আয়ত্ত করিতে পারে না। ইংরেজী ভাষার উপর অধিকারের অভাবজনিত অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারদেশ হইতে কি চিরকালই তাহাদের ফিরিয়া আসিতে হইবে?

ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ সকলে গ্রহণ করিতে অসমর্থ

তাই আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দেশপ্রেমিক মনীষীবৃন্দ মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে কাতরচিত্তে আবেদন জানাইয়াছিলেন। যে-শিক্ষা দেশের মানুষকে মানুষ করিয়া তুলে না, যে-শিক্ষা আমাদের অন্তর্মুখী মনকে ক্রমশ বহির্মুখী করিয়া তুলিতেছে, যে-শিক্ষার ফলে আমরা 'দেশদেখা চোখ' হারাইতেছি, সেই শিক্ষার আমূল সংস্কারসাধন করিতে না পারিলে আমাদের জাতীয় জীবনে কল্যাণ নাই। আমাদের শিক্ষাজীবনে ও ব্যবহারিক জীবনে, বিদ্যায় ও ব্যবহারে আনিতে হইবে সামঞ্জস্য—এই সামঞ্জস্য-বিধান করিতে পারে একমাত্র মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য।

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার বিরুদ্ধে অনেকে এইরূপ আপত্তি জানান যে, আমাদের ভাষা দুর্বল, ইহার শব্দসম্ভার পরিমিত, উচ্চচিন্তা ও বিচিত্র ভাবকে

ধারণ করিবার সামর্থ্য ইহার নাই। তা ছাড়া, আমাদের মাতৃভাষার ভাণ্ডারে নাকি জ্ঞানের সাহিত্যের একান্ত অভাব। এসব যুক্তি যে বালসুলভ তাহা সহজেই বুঝা যায়। 'টাকা জমাইবার আগে কোন্ বুদ্ধিমান মানুষ টাকার থলি প্রস্তুত করে?' উপরি-উক্ত যুক্তিতর্কের প্রত্যুত্তর আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় দিতে পারি: 'আমরা রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার জন্যে প্রাণপণ দুঃখস্বীকার করি, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ আমাদের জাগেনি বললে কম বলা হয়। শিক্ষাসরস্বতীকে শাড়ি পরালে আজও অনেক বাঙালী বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে।'

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিলে শিক্ষার দৈন্য ঘুচিবে

নানা পরাজয়ের গ্লানির হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে সাতসমুদ্র-তেরোনদীর ব্যবধান ঘুচাইতে হইলে, মাতৃভাষাকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার বাহন করিয়া তুলিতে হইবে। তবেই আমাদের চিন্তার দৈন্য, বুদ্ধিবৃত্তির নাবালকত্ব ঘুচিবে। যেদিন আমরা ইংরেজী ভাষার মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারিব, সেদিনই ভারতে আসিবে আবার একটি 'রেনেসাঁ'—পুনর্জাগরণ,—তাহার মধ্য দিয়াই আজিকার আত্মবিস্মৃত জাতি নিজের লুপ্ত সম্বিৎ ও স্বাতন্ত্র্য ফিরিয়া পাইবে।

উপসংহার

বৃত্তিশিক্ষা ও বৃত্তিনির্বাচন

[**রচনার সংকেতসূত্র:** প্রারম্ভিক ভূমিকা—পুঁথিগত শিক্ষা আমাদের বেকারসমস্যা বাড়াইতেছে—বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাবজনিত কুফল—উচ্চতর বৃত্তিশিক্ষা সকলের জন্য নয়—দেশে নিম্নতর বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে—বাঙালীর আর্থনীতিক পরাধীনতার মূল কারণ—মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা প্রয়োজন—উপসংহার।]

সমগ্র পৃথিবীতেই বর্তমানে একটা দ্রুত-পরিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হইতেছে। যান্ত্রিক সভ্যতা ও শিক্ষার বিস্তার এই পরিবর্তনকে আরও গতিশীল করিয়া তুলিয়াছে। সামাজিক, রাজনীতিক এবং আর্থনীতিক জীবনে আমরা যে আজ একটা বিরাট ওলটপালটের সম্মুখীন হইয়াছি, স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই এ কথার সত্যতা সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বিগত সার্বিক যুদ্ধ বাঙালী তথা ভারতবাসীর

প্রারম্ভিক ভূমিকা

জীবনে ডাকিয়া আনিয়াছে নানা বিপর্যয়। জাতির এই যে পরম সংকটময় পরিস্থিতি ও জগৎব্যাপী দ্রুত-পরিবর্তনপ্রবাহ, ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই বর্তমানে আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তনসাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি। শিক্ষাই জাতির আশাআকাঙ্ক্ষার নিয়ামক, শিক্ষা জাতিকে দেয় পথচলার নির্দেশ—সমগ্র জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কল্যাণ নির্ভর করে যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার উপর।

আমরা তাহাকেই বলি বৃত্তিশিক্ষা, যাহা শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবনক্ষেত্রে একটি বিশেষ পেশার উপযোগী করিয়া তোলে, জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে। এরকম শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার আমাদের দেশে কতখানি ঘটিয়াছে? ইংরেজী শিক্ষাবিধি প্রচলিত হইবার পর হইতে অদ্যাবধি আমরা লাভ করিতেছি কেবল পুঁথিগত শিক্ষা। এই শিক্ষা ও বিদ্যাকে বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা প্রয়োগ করিতে পারিতেছি না। ফলে আমাদের বেকারসমস্যা দিন দিন উগ্র হইয়া উঠিতেছে, দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে জাতির দুর্দশা আর দারিদ্র্য। অতএব শিক্ষার সামগ্রিক আদর্শই যে ক্ষুণ্ণ হইতেছে, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। শুধু উচ্চচিন্তা ও ভাবসর্বস্ব জীবন লইয়া কোনো জাতি সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না,—ভাবসাধনার সঙ্গে তাহার কর্মসাধনারও প্রয়োজন আছে।

পুঁথিগত শিক্ষা দেশের বেকারসমস্যা বাড়াইতেছে

দেড়শত বছর ধরিয়া বাস্তববিরোধী ইংরেজী-শিক্ষালাভ করার জন্যই আমরা আর্থিক দারিদ্র্যের কবলমুক্ত হইতে পারি নাই। এ দেশের ছাত্রছাত্রীরা প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, এবং সেখান হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে অন্ধভাবে ছুটিয়া চলে—ইহাদের সকলেরই লক্ষ্য উচ্চতর শিক্ষালাভ। কিন্তু শিক্ষাসমাপ্তির পর দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে তাহারা নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। অজস্র শিক্ষিত যুবকের মধ্যে মাত্র মুষ্টিমেয় ভগ্নাংশ সরকারী এবং সওদাগরী আপিসে স্বল্পবেতনে ঢুকিয়া পড়ে, আর বৃহত্তর অংশ লক্ষ্যহীন-ভাবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। কেতাবী শিক্ষার পাশে দেশের ছাত্রছাত্রীকে যদি বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান করা হইত তাহা হইলে জাতীয় জীবনে আজ এতখানি ব্যর্থতা আমরা লক্ষ্য করিতাম না—আমরা দেশের সম্পদ বাড়াইতে পারিতাম, দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা হইতে পরিত্রাণলাভ করিতাম। বৃত্তিশিক্ষার অভাবে এদেশের বিদ্যার্থীরা তাহাদের মানসপ্রবণতা অনুযায়ী বৃত্তিনির্বাচন করিতেও অসমর্থ।

বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাবজনিত কুফল

আমাদের দেশে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা যে আদৌ হয় নাই, একথা অবশ্য আমরা বলিতেছি না। ডাক্তারী, ওকালতী, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বৃত্তিশিক্ষা আমরা কিছুটা লাভ করিয়াছি। সাম্প্রতিক কালে কতিপয় কলেজে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কারিগরী প্রভৃতি বৃত্তিশিক্ষাদানের কিছুটা ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু দরিদ্র দেশের সকলের পক্ষে এই শিক্ষালাভ করা সহজ ও সুসাধ্য নয়। ইহা ছাড়াও বলা যায়, ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি পেশার ক্ষেত্রে বর্তমানে বেশ ভিড় জমিয়া গিয়াছে, দেখা দিয়াছে তীব্র প্রতিযোগিতা। এইসব পেশা জাতির সীমাহীন দারিদ্র্য ও জটিল বেকারসমস্যা ঘুচাইতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। সুতরাং দেশের ছেলেমেয়েরা যাহাতে স্বল্পব্যয়ে নানারকমের বৃত্তিশিক্ষা পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা আমাদিগকে করিতে হইবে।

উচ্চতর বৃত্তিশিক্ষা সকলের জন্য নয়

নিম্নতর বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে নাই বলিলেই চলে। এ দেশের জনসাধারণের বৃহত্তর অংশ কৃষিকে অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জন করে। কৃষিশিক্ষার সুবন্দোবস্তও আজ পর্যন্ত আমরা করিতে পারি নাই। যাহারা কৃষিকে অবলম্বন করিয়া আছে, বৎসরের অর্ধেক সময় তাহারা অলস জীবন অতিবাহিত করে। নানারকমের সহজসাধ্য শিল্পশিক্ষা ও কারিগরীশিক্ষার ব্যবস্থা যদি করা যায় তাহা হইলে দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জীবিকা অর্জনের পথটি সুগম হইয়া উঠে। বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িবার পথে আমাদের যে বিস্তর বাধা আছে, সেকথা অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু স্বল্পমূলধনে, সমবেত প্রচেষ্টায় আমরা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারি। কিন্তু তাহার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে। বহুবিধ কুটীরশিল্পশিক্ষার প্রচলন হইলে দেশের অধিকাংশ অল্পশিক্ষিত মানুষ তাহাতে আত্মনিয়োগ করিতে পারে।

দেশে নিম্নতর বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে

আর্থনীতিক পরাধীনতা বাঙালীর জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে। প্রাকৃতিক সম্পদে, জনশক্তিতে আমরা অন্যান্য দেশ হইতে পিছনে পড়িয়া নাই। কিন্তু এগুলির সুষ্ঠু প্রয়োগে ব্যবসায়-বাণিজ্য-শিল্প বাড়াইয়া তুলিবার কোনোরূপ উদ্যম-উদ্যোগ আমরা প্রকাশ করি নাই। ব্যবসায়ী শিক্ষা, বাণিজ্যশিক্ষা, শিল্প-শিক্ষালাভ করিলে আমাদের দারিদ্র্য ও পরমুখাপেক্ষিতার ভাব সহজেই ঘুচিতে পারে। তাই এ সব বৃত্তিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি। কয়েক বৎসর পূর্বে সুবিখ্যাত ‘এ্যাবট্-উড্ রিপোর্টে’-ও

বাঙালীর আর্থনীতিক পরাধীনতার মূল কারণ

শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমিক স্তরে ব্যাপক বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রচলনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ভারতসরকারের শিক্ষাবিষয়ক কেন্দ্রীয়-পরামর্শ-সমিতি এবং ইন্টার ইউনিভার্সিটি বোর্ড-ও এরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। গান্ধীজীরচিত 'ওয়ার্ধা-শিক্ষা-পরিকল্পনা'য় হাতেকলমে শিল্পশিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু এইসমস্ত নির্দেশ অনুযায়ী বাস্তবক্ষেত্রে এখনও শিক্ষার সংস্কার সাধিত হয় নাই।

মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা প্রয়োজন

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমিক স্তরে নানাপ্রকার বৃত্তিশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করা যায়। মাধ্যমিক শিক্ষাকে কলেজী শিক্ষার সোপান হিসাবে না দেখিয়া উহাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মস্বতন্ত্র করিয়া তোলা আবশ্যক। প্রতি বৎসর অগণিত ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। ইহাদের অনেকে এখানেই শিক্ষাজীবন হইতে বিদায় গ্রহণ করে। তাহারা যদি মাধ্যমিক স্তরে কিছুটা বৃত্তিশিক্ষা পায় তাহা হইলে স্কুল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া অনায়াসে আপন আপন রুচি ও মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী একটি বৃত্তি নির্বাচন করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠ ও স্বাবলম্বী হইতে পারে। উচ্চশিক্ষার উপযোগী মেধাবী ছাত্র সর্বদেশে সর্বকালেই বিরল। প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীর জন্য উচ্চতর সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন প্রভৃতি শিক্ষার দ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত থাকিবে। কিন্তু আমাদের দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাব রহিয়াছে বলিয়াই শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৃত্তিনির্বাচনের চেষ্টায় সর্বথা বিশেষ ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। ইহার ফলে ব্যক্তিজীবনে এবং সমাজজীবনে বহুবিধ ক্ষয়ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইতেছে, আমাদের জাতীয় চরিত্রে আত্মশক্তির পঙ্গুতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

উপসংহার

বর্তমানে আমাদের নানাবিধ বৃত্তিশিক্ষার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, এ সত্যটি দেশবাসীর মধ্যে নিশ্চয়ই কেহ অস্বীকার করিবেন না। ইহাতে দেশের ছেলেমেয়ে শিক্ষাঅন্তে সমাজজীবনে স্বাধীন মানুষ হইয়া উঠিবে, এবং অজস্র অর্থ ও শ্রমের পরিবর্তে তাহারা যে-কেতাবী শিক্ষালাভ করিতেছে, তাহার ব্যর্থতা হইতেও মুক্তিলাভ করিবে। অবশ্য একথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ছেলেমেয়েরা কেবলমাত্র বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ পাওয়া-মাত্রই দেশের বেকারসমস্যা ও দারিদ্র্য ঘুচিয়া যাইবে না। ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রটিকেও প্রসারিত করিয়া তুলিতে হইবে।

শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার এবং শিক্ষার স্বাজাত্যকরণ ব্যতীত জাতির সর্বাঙ্গীণ

কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি যে সুদূরপরাহত, একথাটি এতদিনেও কি আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আজ শিক্ষার এই বৈচিত্র্যহীনতা সম্পর্কে কিছুটা সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন—ইহা জাতীয় জীবনে কম আশা ও আনন্দের কথা নয়। স্বাধীন দেশে নূতন শিক্ষাধারা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করুক, ইহাই সকলের অন্তরতর কামনা।

নারীশিক্ষা

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রাচীন ও মধ্যযুগে নারীশিক্ষা—আধুনিক কালে নারীশিক্ষা—নারীশিক্ষাবিষয়ে আমাদের উপেক্ষা—নারীশিক্ষা-সম্পর্কিত আমাদের সমস্যা—নারীশিক্ষার প্রকৃতি কীরূপ হওয়া উচিত—প্রচলিত ইংরেজী-শিক্ষার বিপুল ব্যর্থতা—বাহিরে নারীর কর্মস্থল সংকীর্ণ—নারীশিক্ষার আমূল-সংস্কারসাধন করিতে হইবে—উপসংহার]

নারীশিক্ষা এদেশে প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত। বৈদিক যুগ হইতে আজিকার বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নারীশিক্ষার ধারাটি প্রবহমাণ। প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় নারীর একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। শিক্ষালাভের পথে তাহার বিশেষ কোনো বাধা ছিল না—পুরুষ তাহাকে সম্মান দিয়াছে, জ্ঞানচর্চার সুযোগ দিয়াছে, তাহার আত্মবিকাশের পথে তেমন বাধাসৃষ্টি হয় নাই। মনুর যুগে কিন্তু আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটে। তাঁহার রচিত নূতন বিধি প্রচারিত হওয়ার পর সমাজে নারীর স্থান অনেকখানি সংকীর্ণ হইয়া আসে, ফলে তাহাদের বিদ্যাচর্চার সুযোগ কমিয়া যায়। বৌদ্ধযুগে নারীশিক্ষার ধারাটি সংকীর্ণ হইলেও নানা মঠে শাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষুর পাশে বিদুষী ভিক্ষুণী বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। মুসলমানযুগে পর্দাপ্রথার জন্য বয়স্কা নারীরা গৃহের বাহিরে আসিয়া বিদ্যার্জনের সুযোগ পায় নাই। তবে অল্পবয়সের মুসলমান বালকবালিকা অনেক স্থানে সহশিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়াছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে নারীশিক্ষা

এদেশে ইংরেজী-শিক্ষা ও সভ্যতা প্রচারিত হইবার পর আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় ও জীবনাদর্শে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। নারীর জীবনধারার

মধ্যেও আসিয়াছে অনেক পরিবর্তন। আমাদের সমাজে নারীর গতিবিধির গণ্ডী এখন পূর্বাপেক্ষা প্রশস্ততর—যুগপ্রভাবকে সমাজপতিরা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অবশ্য নারীশিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা আজ দেশে দেখা যাইতেছে, একথা বলিলে ভুল হইবে। তবে তাহাদের শিক্ষালাভের বাধা যে অনেকখানি বিদূরিত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে এদেশে নারীশিক্ষা-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ইহার ফলে আধুনিক নারীশিক্ষার যে-বীজ অঙ্কুরিত হইল, আজ তাহা বৃক্ষের আকারে শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে।

আধুনিক কালে নারীশিক্ষা

পুরুষের মতো নারীরও যে শিক্ষালাভের অধিকার আছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য নারীপুরুষ উভয়েরই শিক্ষাব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। এই সহজ সত্যটির বিষয়ে আমরা তেমন সচেতন ছিলাম না বলিয়া এদেশের নারীজাতি বহুকাল ধরিয়া উপযুক্ত শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত ছিল। তাহারা পাঠশালায় প্রাথমিক স্তরের সামান্য শিক্ষালাভ করিবার যে-সুযোগ কোনো কোনো স্থলে পাইয়াছে, তাহা চিত্তবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। সেজন্য এ দেশের অধিকাংশ নারীই কুসংস্কার ও অজ্ঞানতাকে পাথেয় করিয়া জীবনের পথে যাত্রা সুরু করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাতে সমাজের কল্যাণ সাধিত হয় নাই—নারীর অজ্ঞানতা আমাদের পারিবারিক জীবনে অনেক দুষ্কৃতের সৃষ্টি করিয়াছে। পুরুষের কর্মক্ষেত্র বাহির-বিশ্বে, নারীর স্থান পরিবারের কেন্দ্রস্থলে। পরিবারের মধ্য-বিন্দুটির স্থিতিসাম্য যদি না থাকে, তবে জীবনে অকল্যাণ ও অশান্তি অনিবার্য। সুতরাং নারীশিক্ষার প্রচার ও প্রসার বাঞ্ছনীয়।

নারীশিক্ষা-বিষয়ে আমাদের উপেক্ষা

নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে আছে, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু বর্তমানে সমস্যা দাঁড়াইয়াছে মেয়েদের শিক্ষার বিস্তারসাধন ও প্রকৃতি লইয়া। প্রথমে দেশের নারীশিক্ষা-নিকেতনের কথাই ধরা যাক। গ্রামের পাঠশালায় এদেশের মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষার কিছুটা সুযোগ পাইয়া থাকে। কিন্তু সম্যক্‌রূপ চিত্তোন্মেষের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা মোটেই যথেষ্ট নয়। প্রাত্যহিক জীবনে চলার পথে যতটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন, অন্তত মাধ্যমিক স্তরাবধি শিক্ষা না পাইলে বালকবালিকারা তাহা অর্জন করিতে পারে না। অথচ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা

নারীশিক্ষা সম্পর্কিত আমাদের সমস্যা

এখনও বাংলাদেশে তেমন প্রসারলাভ করে নাই। ছেলেদের জন্য কিছুকিছু ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা নিতান্ত শোচনীয়।

আমাদের শহরগুলিতে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা গ্রাম অপেক্ষা কিছুটা ভাল। কিন্তু দরিদ্র দেশের কয়জন লোক ছেলেমেয়েকে শহরে পাঠাইয়া তাহাদের শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যয়ভার বহন করিতে সমর্থ? এ কারণে কত কত মেয়ে প্রতিদিন শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত হইতেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ নির্মমতা শুধু পরাধীন দেশেই সম্ভব। পল্লীগ্রামে মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাইতে হইলে সরকারী অর্থসাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। শহরাঞ্চলেও অধিকতর নারীশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা আছে।

নারীশিক্ষার প্রকৃতি কীরূপ হওয়া উচিত

আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা নারীশিক্ষার প্রকৃতি লইয়া। এদেশে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া নারী ও পুরুষের শিক্ষাপদ্ধতি একই পুরাতন ধারায় প্রবাহিত হইতেছে। প্রত্যেক দেশেই নারীর জীবনাদর্শের লক্ষণীয় বিশিষ্টতা রহিয়াছে। এই বিশিষ্টতাকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের জীবন আবর্তিত হইয়া থাকে। বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে নারীর বিশিষ্ট স্থান পরিবারের কেন্দ্রস্থলে। সন্তানসন্ততির রক্ষণাবেক্ষণ, গৃহের শৃঙ্খলা, আনন্দ, কল্যাণ সবকিছুই নারীর উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। নারীই এদেশে গৃহের কর্ত্রী, পরিবারে তাহার বিপুলা শক্তি অলক্ষ্যভাবে বিরাজ করে। পুরুষের কর্মজীবন বাহিরে প্রসারিত। এই ঘর এবং বাহিরকে লইয়াই আমাদের সামাজিক সুখশান্তির প্রাত্যহিক আবর্তনের ধারাটি ক্রিয়াশীল। নারী ও পুরুষের জীবনবিকাশের ক্ষেত্র বিভিন্ন বলিয়া উভয়ের শিক্ষাপদ্ধতির পার্থক্যের কথাটি আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। অথচ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নারী-পুরুষের শিক্ষাদর্শের মধ্যে কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। একই আদর্শে উভয়ের শিক্ষাপদ্ধতি বিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া বর্তমানে আমাদের সমাজে নানা অকল্যাণ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

প্রচলিত ইংরেজী শিক্ষার বিপুল ব্যর্থতা

দেড়শত বছরের ইংরেজী শিক্ষার হিসাব নিকাশ করিয়া আজ আমরা দেখিতেছি, ইহা এদেশের পুরুষের জীবনেও তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই, আমাদের আত্মশক্তি দান করে নাই, দেশকে চিনিতে শিখায় নাই —ইহা জাতির জীবনে দুরারোগ্য পক্ষাঘাত সৃষ্টি করিয়াছে। নারীদের সম্মুখেও যদি আমরা এই বিজাতীয় শিক্ষার আদর্শ তুলিয়া ধরি, তাহা হইলে পুরুষের মতো নারীদের জীবনও বিড়ম্বনায় ভরিয়া উঠিবে। সুতরাং এ সমস্যাটি সত্যই জটিল।

যে-শিক্ষাব্যবস্থা অধুনা দেশে প্রচলিত রহিয়াছে, উহাতে শিক্ষিত হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করা বর্তমানে নারীর পক্ষে নানা কারণে দুঃসাধ্য বলিয়াই মনে হয়। পুরুষের বেকারসমস্যা যেখানে এত ব্যাপক সেখানে নারীসম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতির পথটি খুঁজিয়া বাহির করা যে কঠিন, তাহা হয়তো অনেকে ভাবিয়া দেখেন না। বাহিরে নারীর কর্মস্থলটি কত সংকীর্ণ! শহরের কয়েকটি আপিসে ও মুষ্টিমেয় বিদ্যালয়ে অর্থোপার্জন-বিষয়ক ভাগবাঁটোয়ারা করিয়া সমাজে নারী আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিবে কিনা, সে কথাটিই আমাদের বিচার্য। যে-শিক্ষা আমাদের চরিত্র সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবে, যাহা আমাদিগকে আর্থিক সচ্ছলতা আনিয়া দিবে, আমাদের কুসংস্কার দূর করিবে, এবং সর্বোপরি মনুষ্যত্বের সন্ধান দিবে, সেরূপ শিক্ষাবিধিপ্রবর্তনের পথটি যাহাতে প্রশস্ত হয়, তাহার আশু ব্যবস্থা করিতে হইবে। জাতীয়-শিক্ষাপ্রবর্তনের ফলে পুরুষের আর্থিক অবস্থা উন্নততর হইলে আমাদের নারীসম্প্রদায় বাহিরের জগতে জীবিকার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আর্থিক দুরবস্থাই আমাদের সকল দুর্গতির মূল কারণ।

বাহিরে নারীর কর্মস্থল সংকীর্ণ

সমাজে নারীপুরুষ উভয়েরই স্থানটি নির্দেশ করিয়া লইতে হইবে দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারাটি অনুসরণ করিয়া। বাহিরের কর্মজগতে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা না করিয়া বাংলার পারিবারিক স্বাস্থ্য ও বাঙালীর জাতীয় আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার শিক্ষাটি নারীকে লাভ করিতে হইবে। সেজন্য আবশ্যক এদেশের নারীশিক্ষাপদ্ধতির আমূল-সংস্কারসাধন। আমাদিগকে নূতন করিয়া পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষাপদ্ধতির রূপান্তরসাধন করিতে হইবে, বিবিধ গৃহকেন্দ্রিক বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সূচীশিল্প, রন্ধনশিল্প, গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, শিশুমনস্তত্ত্ব, সাধারণ গণিত, ইংরেজী, বাংলা সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস এবং ইহার সঙ্গে কিছুটা সংগীত নারীদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সকল শিক্ষাবিদই আজ চিন্তা করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ও এ বিষয়ে অনেকটা সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন নারী ও পুরুষ সর্বদেশেই বিরল—উচ্চশিক্ষার পথটি তাহাদের জন্য অবশ্যই খোলা রাখিতে হইবে।

নারীশিক্ষার আমূল-সংস্কার-সাধন করিতে হইবে

উপযুক্ত কন্যা, উপযুক্ত পত্নী, উপযুক্ত মাতার সৃষ্টি করাই বর্তমানে প্রত্যেক অগ্রসর রাষ্ট্রে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এদেশের প্রচলিত

শিক্ষাপদ্ধতি নারীজাতির আত্মবিকাশের একান্ত পরিপন্থী। ইহাতে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। আদর্শহীন, লক্ষ্যহীন পথে চলিয়া জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিবার সময় আজ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শিক্ষার বিলাস আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে। আমাদিগকে যদি পরিপূর্ণরূপে বাঁচিতে শিখিতে হয়, তবে নারী ও পুরুষের উপযোগী শিক্ষার পথটি প্রসারিত করিয়া তুলিবার পন্থা খুঁজিয়া লইতে হইবে। তাহা যদি না হয় তবে আলেয়াকেই আমরা আলো বলিয়া ভুল করিব, এবং ইহাতেই ঘটিবে বাঙালীর অপমৃত্যু।

উপসংহার

ওয়ার্ধা-শিক্ষাপরিকল্পনা

[রচনার সংকেতসূত্র : জাতীয় জীবনে বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাব মারাত্মক—গান্ধীজির প্রণীত ওয়ার্ধা-শিক্ষাপরিকল্পনা—ওয়ার্ধা-শিক্ষাপরিকল্পনার স্বরূপ—মহাত্মার রচিত শিক্ষাপরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য—শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য—গান্ধীজির নূতন শিক্ষাপরিকল্পনার প্রেরণা—ওয়ার্ধা-শিক্ষাপরিকল্পনার বিরুদ্ধ-সমালোচনা—উপসংহার।]

আমাদের জাতীয় জীবনে শিক্ষার সমস্যাই আজ বড়ো হইয়া দেখা দিয়াছে। বিগত একশ বছরেরও উপর ধরিয়া যে-শিক্ষা আমরা পাইয়া আসিতেছি, উহার সঙ্গে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের ও বৃহত্তর আর্থিক জীবনের কোনো সংযোগ নাই। এ শিক্ষাবিধি আমাদিগকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলে নাই, আমাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশসাধন করে নাই, জাগতিক পরিবেশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটাইবার সহায়তা করে নাই। তাই স্বাধীন মানুষ হইয়া উঠিবার পরিবর্তে মসীজীবীর জীবনকেই আমরা সকলে একমাত্র সত্যবস্তু বলিয়া জানিয়াছি। দেশে আজ একদিকে অন্নবস্ত্রের অভাব, অন্যদিকে দেখা দিয়াছে শিক্ষার অনশন—আমাদের চতুর্দিকে বিরাজ করিতেছে ধূসর শূন্যতা। এই বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার অভাবে আমাদের জাতীয় জীবনে এতখানি দুর্দশা ও সংকট আজ এমন উগ্ররূপে দেখা দিয়াছে।

জাতীয় জীবনে বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাব মারাত্মক

দেশের শিক্ষাবিধির মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তনসাধনের প্রয়োজনীয়তা

কেহ কেহ যে উপলব্ধি করেন নাই, তাহা নয়। কিন্তু নানাকারণে এই শুভ ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত হইয়া উঠে নাই। আমাদের শিক্ষার ভিত্তিকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবার সক্রিয় প্রচেষ্টা দেখা গেল মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পনায়—১৯৩৭ সালে। ওয়ার্ধা-শিক্ষাপরিকল্পনার প্রেরণাতেই নবতন বুনিয়াদি শিক্ষার ভিত্তি রচিত হইল। এদেশের বিদ্যালয় এবং শিক্ষার আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে একটা মৌলিক পরিবর্তন আনিতে না পারিলে যে জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণ নাই, এ সত্যটি মহাত্মা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

গান্ধীজির প্রণীত ওয়ার্ধা-শিক্ষাপরিকল্পনা

আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যই আমাদের দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটিতেছে না। এই আর্থিক দারিদ্র্য যাহাতে জাতীয় শিক্ষাকে ব্যাহত করিতে না পারে তাহার জন্য গান্ধীজী তাঁহার পরিকল্পনায় শিক্ষার ব্যয়ভার-বহনের একটা নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি শিক্ষাকে করিতে চাহিলেন আত্মনির্ভরশীল, তাই তাঁহার নূতন পরিকল্পনাটি শিল্প-কেন্দ্রিক ও কর্মকেন্দ্রিক—কোনো একটা বিশেষ শিল্পকে কেন্দ্র করিয়াই এই শিক্ষার ধারা আবর্তিত হইবে। কৃষিশিল্প, তাঁতশিল্প, চরকা-শিল্প, কাষ্ঠশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার বিচিত্র আয়োজন গান্ধীজির শিক্ষা-পদ্ধতিতে স্থান লাভ করিয়াছে। নানা রকমের কারিগরী ও কুটীরশিল্পশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অঙ্ক, অর্থনীতি, রাজনীতি, চিত্র, সংগীত, ব্যায়াম ইত্যাদি এই নূতন শিক্ষাপরিকল্পনা হইতে বাদ পড়ে নাই।

ওয়ার্ধা-শিক্ষাপরিকল্পনার স্বরূপ

ইহা আয়ত্ত করিতে সময় লাগিবে সাত বৎসর। সাত হইতে চৌদ্দ বছরের বালকবালিকা সাত বছরের মধ্যে উক্ত সব বিষয় আয়ত্ত করিয়া লইবে। শিক্ষাথার স্থবিধার জন্য গান্ধীজি মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরেজী ভাষার মোহ আমাদিগকে অন্ধদৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। বিদেশী একটি ভাষা আমাদের শিক্ষার মাধ্যম বলিয়া শিক্ষণীয় বস্তুর আসল রূপটি আমরা সম্যক্‌ভাবে দেখিতে পাই না, তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের এত অপচয়। গান্ধীজী তাঁহার ওয়ার্ধা-শিক্ষাপরিকল্পনায় ইংরেজী ভাষাকে একেবারেই স্থান দেন নাই। ইংরেজী ভাষা আমাদের জাতীয় জীবনে নানা ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বলিয়াই হয়তো ইহার প্রতি তাঁহার মনোভাব বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

মহাত্মার রচিত শিক্ষাপরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য

জাতীয় শিক্ষাবিধি ব্যতীত জাতির জীবন গঠন করা সম্ভব নয়, আবার জাতীয় জীবন গঠিত না হইলে দেশে রাজনীতিক ও অর্থনীতিক পরিবর্তনসাধন একপ্রকার অসম্ভব। ব্যবহারিক জীবনের সম্পর্কচ্যুত পুঁথিগত বিদ্যার গুরুভারে আমাদের দেশের বালকবালিকার মননশক্তি প্রতিমুহূর্তে নিপীড়িত হইতেছে, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে। ব্যক্তিপুরুষের সম্যক্ বিকাশসাধন চিরাচরিত শিক্ষায় কখনো সম্ভব নয়। একটি বিশেষ ছাঁচে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে গড়িয়া তুলিতে গেলে তাহারা জীবন্ত মানুষ না হইয়া কলের পুতুল হইয়া উঠিতে বাধ্য। শিক্ষার্থীর মানসিক প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে তাহাদের স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশের পথটি রুদ্ধ হইয়া যায়। ওয়ার্ধা-শিক্ষাপরিকল্পনার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তাহার আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে সুযোগদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মানসিক শক্তির অপচয় যাহাতে না ঘটে তাহার দিকে মহাত্মা বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

মনুষ্যত্বের বিকাশসাধনের সহায়তা করা ও প্রাত্যহিক জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার কুশলতা-অর্জনের ক্ষমতা দান করাই শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য। অন্যদিকে, দেহ ও মনকে পূর্ণ গঠিত করিয়া তুলিয়া বৃহত্তর মানবসত্তাকে উপলব্ধি করার মধ্যেও একটা পরম আনন্দ নিহিত রহিয়াছে। মানুষ বিশেষ ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও যে সমগ্র বিশ্বের, এই সত্যটির উপলব্ধি আনিয়া দিতে পারে একমাত্র শিক্ষার আলো। সত্যকার মানুষ নিম্নতর পশুর মতো আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপন করিতে পারে না। হিংসা, দ্বেষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নিষ্ঠুর হানাহানি, পরকে শোষণ করিবার প্রবৃত্তি মানুষের যথার্থ ধর্ম নয়। ব্যক্তির মানবীয় সত্তার মূলে রহিয়াছে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা। তাই প্রেম, প্রীতি, সহমর্মিতা, স্বার্থত্যাগ, আত্মবিসর্জন প্রভৃতি উচ্চতর বৃত্তি কেবল মানুষের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। কিন্তু এইসব বৃত্তির সম্যক্ বিকাশের জন্য চাই বিশেষ রকমের শিক্ষাপদ্ধতি—চাই শিক্ষার মধ্য দিয়া মানবসত্যের প্রকাশ, চাই অহিংসামন্ত্রে দীক্ষা।

গান্ধীজী ছিলেন সত্য ও অহিংসার মূর্ত প্রতীক। তাঁহার পরিকল্পিত শিক্ষাপদ্ধতিও সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে গঠিত। নূতন যুগের মানুষের জন্য যাহাতে নূতন সমাজজীবন রচিত হইতে পারে, তাহার আয়োজন করিতে তিনি কৃপণতা প্রদর্শন করেন নাই। কর্মে এবং চিন্তায় সহযোগিতা ও মিলনকে গান্ধীজী শিক্ষার মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশের শিক্ষার্থীরা শিল্পশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে খেলাধূলা-আনন্দ-স্বাধীতার মধ্য দিয়া যাহাতে সহজ মানুষ হইয়া

উঠিতে পারে, এই নূতন শিক্ষাপরিকল্পনায় তাহার একটা সুন্দর পরিবেশ রচিত হইয়াছে। সাত হইতে চৌদ্দ বছরের বালকবালিকাকে মহাত্মা এমন ধারায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, যাহাতে ভারতবর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে নূতন জাতি নূতন সমাজ গঠন করিতে সমর্থ হয়। এই শিক্ষাবিধি আত্মশক্তি-আশ্রয়ী, স্বাবলম্বী, শিল্পধর্মী, মনুষ্যত্বের উদ্বোধক।

গান্ধীজির নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রেরণা

অনেক শিক্ষাসমালোচক গান্ধীজির রচিত এই পরিকল্পনাকে গ্রহণীয় বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের মতে, ইহাতে উচ্চতর জ্ঞানের শিক্ষা ও উচ্চতর শিল্পশিক্ষার অবকাশ নাই। সমালোচকের এরূপ বিরূপ মন্তব্যকে আমরা স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। বর্তমান সময়ে আমাদের সমস্যা জীবনযুদ্ধে বাঁচার সমস্যা—আমরা চাই অন্নবস্ত্র এবং সার্বজনীন শিক্ষার আলো। যেখানে বিরাজ করিতেছে দেশজোড়া অজ্ঞানের অন্ধকার, সেখানে অফুরন্ত আলোকবন্যার স্বপ্ন দেখা বাস্তববুদ্ধির পরিচায়ক নয়। ক্ষুদ্র মাটীর প্রদীপেও যদি অশিক্ষা ও কুশিক্ষার আঁধার কিছুটা দূরীভূত হয়, তবে তাহাকেই সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের দিকে দিকে সার্বজনীন শিক্ষার ধারাটি প্রবাহিত না হইলে উচ্চতর শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রসার কখনও ঘটিতে পারে না। তদুপরি ওয়ার্ধাপরিকল্পনা ও বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতির বর্তমান রূপটিই শিক্ষার ক্ষেত্রে শেষ কথা নয়। ইহার পূর্বে ও পরে রহিয়াছে প্রাক্‌বুনিয়াদি, উত্তর-বুনিয়াদি এবং প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাসমস্যা। 'রোম একদিনে তৈয়ারী হয় নাই'—শিক্ষার ক্ষেত্রেও যেন এই প্রবাদবাক্যটি আমরা বিস্মৃত না হই।

ওয়ার্ধা-শিক্ষাপরিকল্পার বিরুদ্ধ সমালোচনা

পাশ্চাত্ত্যের নাগরিক সভ্যতার মোহবশে আমরা ভারতবর্ষের গ্রামীণ সভ্যতাকে ভুলিতে বসিয়াছি। বর্তমান সময়ে আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে চিনিয়া লওয়া—ওয়ার্ধা-শিক্ষা-পরিকল্পনায় তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। সত্য, অহিংসা ও পারস্পরিক সহযোগিতার আদর্শে পুষ্ট এই শিক্ষাধারাটিকে যদি আমরা দেশের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও নানারকমের অভাবদৈন্যের হাত হইতে আমরা কিছুটা পরিত্রাণ পাইব। পরের অনুকরণ ও পরাশ্রয়ী মনোবৃত্তি লইয়া কোনো দেশ বৃহত্তর কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে না। রাজনীতিক ও আর্থনীতিক পরাধীনতার শৃঙ্খলপাশ হইতে জাতিকে মুক্ত করিতে হইলে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ

উপসংহার

সংস্কারসাধনের প্রয়োজন আছে। গান্ধীজী শিক্ষাসংস্কারের যে-নির্দেশ দিয়াছেন, তাহার কতটুকু গ্রহণীয় কতটুকু বর্জনীয় এদেশের শিক্ষাশাস্ত্রী ও জাতীয় নেতৃবৃন্দকে তাহা সুচিন্তিতভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে। যে-কোনো প্রকারেই হোক্ জাতিকে শিক্ষার অনশন হইতে, অন্নবস্ত্রের অভাব-দারিদ্র্যের গ্লানি হইতে মুক্তি দিতে হইবে।

শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** কাব্যশিল্পী ও জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ—কবিগুরুর চিন্তাধারার বহুমুখী প্রকাশ—বাংলার শিক্ষাসমস্যা ও রবীন্দ্রনাথ—ইংরেজী শিক্ষার ব্যর্থতা—আমাদের শিক্ষাবিধি জাতীয় কল্যাণের পরিপন্থী—ইংরেজী শিক্ষা আমাদের মানসিক শক্তির হ্রাস ঘটাইতেছে—মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন না করিবার কুফল—বিজাতীয় শিক্ষার ফলে আমরা দেশদেখা চোখ হারাইয়াছি—বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা পরান্নভোজী—কবিগুরুর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষানিকেতন—ভাবজীবনে ও কর্মজীবনে শিক্ষাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে।]

কাব্যশিল্পী ও জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের কথা যখন ভাবি তখন বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যাই। প্রতিভা তাঁহার সর্বতোমুখী—উহার প্রকাশ বহুরূপী। আমরা সকলেই জানি, রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয় সাহিত্যশিল্পী, তিনি রূপকার, বিশ্ববন্দিত কবি। কিন্তু এইমাত্রই কি রবীন্দ্রনাথের পরিচয়? পৃথিবীর বহু মনীষীর প্রতিভা কাব্যের ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের শিল্পসত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার অবিচ্ছেদ্য কোনো সংযোগ নাই। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই, জীবনে তিনি শুধু যে সার্থক শিল্পসৃষ্টি করিয়াছেন তাহা নয়, তাঁহার সমগ্র জীবনটাই ছিল একটা শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শন। জীবন ও শিল্পের এমন সুন্দর সমন্বয় আমরা জগতের অন্য কোনো শিল্পীর মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আপন জীবনটাকেও তিনি শিল্পের মতো করিয়া গড়িয়াছিলেন—তাঁহার সমগ্র সাধনা ও চিন্তা, সকল কর্মপ্রবাহের মধ্যে এই জীবনশিল্পীকেই আমরা দেখিয়াছি। যে অন্তর্লীন কবিপুরুষ রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনকে ক্রমোদ্ভিন্ন করিয়া তুলিয়াছিল, তাঁহার সুদীর্ঘ ব্যক্তিজীবনেও আমরা দেখিতে পাই সেই একই কবিপুরুষের আত্ম-প্রকাশের বিচিত্র লীলা।

কবিকে আমরা শুধু হৃদয়ানুভূতির অনিন্দ্যসুন্দর রূপায়ণের ক্ষেত্রে পাই নাই, তাঁহাকে আমরা পাইয়াছি চিন্তার নবনব-দ্বার-উন্মোচনের ক্ষেত্রেও। এ দেশের সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা কোনোকিছুই তাঁহার নানামুখী চিন্তার পরিধি হইতে বাদ পড়ে নাই। বাংলাদেশের মানুষকে রবীন্দ্রনাথ শুধু শিল্পরসপিপাসু হিসাবে দেখিতে চাহেন নাই—আমাদিগকে তিনি গোটা মানুষ হিসাবে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালী যেন পিছাইয়া না পড়ে, এই ভাবনা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল।

কবিগুরুর চিন্তাধারার বহুমুখী প্রকাশ

প্রকৃত শিক্ষাই মানুষকে 'মানুষ' করিয়া তোলে। এজন্য রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর শিক্ষাবিষয়ে গভীর চিন্তা করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যুগোপযোগী শিক্ষার, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞার আলোক না পাইলে বাঙালী ভবিষ্যতে মানুষ হইয়া উঠিতে পারিবে না। এই উপলব্ধি হইতেই বিগত পঞ্চাশ বছর ধরিয়া বাংলার শিক্ষাসমস্যা, শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে নানা লেখায় তিনি নিজের সুচিন্তিত মতামত জ্ঞাপন করিয়াছেন—এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে তাঁহার কাতর আবেদন পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। দেশকে তিনি কতখানি ভালোবাসিতেন, দেশের মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চিন্তা তাঁহার মনকে কতদূর অধিকার করিয়াছিল, তাঁহার শিক্ষাসম্পর্কিত লেখাগুলি পড়িলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলার শিক্ষাসমস্যা ও রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষা বলিতে আমরা বুঝি বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত শিক্ষা—যে-শিক্ষাধারা এদেশে নূতন প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে ইংরেজ-আমলে। কিন্তু ইংরেজ-আমলের পূর্বেও সার্বজনীন শিক্ষাবিধির প্রচলন আমাদের দেশে ছিল। প্রবাসিনী আধুনিকী শিক্ষার প্রভাবে আমাদের সনাতন শিক্ষার প্রবাহ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে রুদ্ধগতি হইয়া পড়িয়াছে—পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মরুভূমির মধ্যে দেশীয় শিক্ষার স্রোত বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। ইংরেজী-শিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনকে প্রতিমুহূর্তে যে-আত্মহত্যার পথে চালিত করিতেছে, এই অভ্রান্ত সত্যটা বর্তমানে কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারিলেও, তাহার প্রতিকারের বিশেষ কোনো চেষ্টা আমরা করি নাই। এ দেশের শিক্ষার বিকলাঙ্গ মূর্তিটি কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল।

ইংরেজী শিক্ষার ব্যর্থতা

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, এই আধুনিক শিক্ষাবিধির সঙ্গে আমাদের জীবনের সামঞ্জস্য সাধিত হয় নাই, আমাদের বিদ্যা ও ব্যবহারের মধ্যে সত্যকার

আমাদের শিক্ষাবিধি জাতীয় কল্যাণের পরিপন্থী

একটা দুর্ভেদ্য ব্যবধান রহিয়াছে। আমরা যে-শিক্ষায় নিজেদের শিক্ষিত করিয়া তুলি সেই শিক্ষা আমাদিগকে কেরাণীগিরি অথবা কোনো একটি ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র। স্কুল-কলেজের বাইরে যে-বিরাট দেশ পড়িয়া আছে, তাহার অস্তিত্বকে ভুলিলে চলিবে না। স্কুলকলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটি স্বাভাবিক যোগস্থাপন করিতে হইবে। অন্যদেশে সে-যোগ চেষ্টা করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। সে-সকল দেশে বিদ্যানিকেতন দেশেরই অচ্ছেদ্য একটি অঙ্গ—সমগ্র দেশের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি তাহাকে গঠিত করিয়া তুলে, সেজন্য দেশের সঙ্গে কোথায়ও তাহার বিচ্ছেদ নাই। আমাদের দেশের সঙ্গে আমাদের বিদ্যায়তনের এরূপ ভেদচিহ্নবিহীন সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হয় নাই।

ইংরেজী-শিক্ষা আমাদের মানসিক শক্তির হ্রাস ঘটাইতেছে

এই যে মানসিক-শক্তিহ্রাসকারী শিক্ষা, এ শিক্ষা আমাদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তিকে বাড়ায় না। আমরা প্রচুর সংগ্রহ করিতে শিখিয়াছি, কিন্তু অদ্যাবধি নির্মাণ করিতে শিখি নাই। আমাদের বুদ্ধি ও কল্পনার ক্ষেত্রে চিরকালীন নাবালকত্ব, শিক্ষাজীবন এবং ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে অসামঞ্জস্য ও বিচ্ছেদ একান্ত পরিস্ফুট। ইহার কারণ খুঁজিবার জন্য আমাদিগকে বেশীদূর যাইতে হয় না। এরূপ হইবার হেতু হইল, আমরা আমাদের শিক্ষার বাহনটি আজ পর্যন্ত পাই নাই। এই বাহনটির অভাবেই বাস্তবজীবনে আমরা পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছি, সমাজজীবনে পরস্পরের মধ্যে আমাদের প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ। সাম্প্রতিক যুগে জগতে এমন কোনো সভ্যদেশ নাই, যেখানে মাতৃভাষা তাহার শিক্ষার বাহন নহে। মাতৃভাষার ভিতর দিয়াই সে-সব দেশে শিক্ষাব্যবস্থা সার্বজনীন বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। অথচ মাতৃভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহন করিতে এখনও আমরা সংশয়মিশ্রিত অনিচ্ছা প্রকাশ করি।

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন না করিবার কুফল

পশ্চিমের শিক্ষায় যে-সব ভালো জিনিস আছে তাহার অনেকখানি আমাদের নোটবুকেই মাত্র নিবদ্ধ থাকে। সে কী চিন্তায়, কী ভাবে, কী কর্মে ফলিয়া উঠিতে চায় না। ইংরেজী ভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন বলিয়াই শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা এতখানি দীন। দেশে একদিকে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ, অন্যদিকে প্রবাসিনী বিদ্যাকেও আমরা সম্যক্ আয়ত্ত করিতে পারি নাই। ইহার মারাত্মক ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, দেশে আজ দুইটি সম্প্রদায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—ইংরেজীশিক্ষিত তথাকথিত সভ্য বাঙালী আর নিরক্ষর জন-

সাধারণ। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন : ইংরেজী শিখিয়া যাঁহারা বিশিষ্টতা পাইয়াছেন তাঁহাদের মনের মিল হয় না জনসাধারণের সঙ্গে। বর্তমানে দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এখানেই—শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা। ইহারই জন্য আজ আমাদের জাতীয় জীবনের সংহতি বিনষ্ট হইতেছে, এবং রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে তাহারই বিষময় ফল অধুনা প্রতিনিয়ত আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

বিজাতীয় শিক্ষার ফলে আমরা দেশদেখা চোখ হারাইয়াছি

এই বিজাতীয় শিক্ষার ফলেই আমরা দেশদেখা চোখ হারাইতে বসিয়াছি, গবাক্ষলণ্ঠনের আলোর মতো আমাদের দৃষ্টির লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত হইয়াছে শিক্ষিত-সমাজের দিকে। যেহেতু এই শিক্ষিতসম্প্রদায় বাস করেন শহরে, সেহেতু শহরটাকেই আমরা দেশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। তাই আমরা 'মুখে বলি ভারতমাতা, ভারতলক্ষ্মী, বঙ্গমাতা, আমার সোনার বাংলা দেশ—কিন্তু মাতা যে কোথায় প্রত্যক্ষ আছেন, তাহা কখনো স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই—লক্ষ্মী দূরে থাকুন, তাঁহার পেঁচকটিকে পর্যন্ত কখনো চোখে দেখি নাই। বঙ্গমাতা—ভারতমাতা—যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে করিয়া লইয়া তাহার পথ্যের জন্য শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন—এ দেখাই যথার্থ দেখা।'

বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা পরান্নভোজী

এত শিক্ষা লাভ করিয়াও আমরা বিদ্যালাভ করিতেছি না—সমগ্রভাবে মানুষ হইয়া উঠিতেছি না। জার্মানীতে, ফ্রান্সে, আমেরিকায়, ইংলণ্ডে, জাপানে যে-সকল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মূল উদ্দেশ্য সমগ্র দেশবাসীকে মানুষ করিয়া তোলা। দেশকে তাহারা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, দেশবাসীর চিত্তশক্তিকে, বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্‌ঘাটিত করিতেছে —সেইরূপ শিক্ষা এ দেশে কোথায়? সোভিয়েট রাশিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে অসাধ্যসাধন করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহা নিজ চোখে দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার 'রাশিয়ার চিঠি'র প্রতিছত্রে ভারতবর্ষে শিক্ষার অনশনের আক্ষেপ আছে। রাশিয়া অপেক্ষা বাংলা দেশ কিংবা ভারতের শক্তি যে কম, তাহা নয়। আসল কথা হইতেছে, শিক্ষার ক্ষুধা আমাদের এখনও জাগে নাই, তাই আমাদের উদ্যমের এতখানি অভাব। একদিন সমগ্র ভারতবর্ষ শিক্ষার ক্ষেত্রে আতিথ্যের আয়োজন করিয়াছিল। বৈদিক যুগের তপোবন, বৌদ্ধযুগের নালন্দা, বিক্রমশীলা, তক্ষশীলা দিকে দিকে শিক্ষার আলো বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছিল। এই সেদিনও বাংলার টোল-চৌপাড়ি

দেশের সনাতন শিক্ষাকে জীবিত রাখিয়াছিল। এই শিক্ষার ক্ষেত্রটিতেই আজ আমরা পরান্নভোজী। ইহার কারণ হইল, আমরা জাতীয় শিক্ষার ধারাটি হারাইয়া ফেলিয়াছি। আকৃতিতে-প্রকৃতিতে-নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় আধুনিক শিক্ষা বিজাতীয়। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে সবই আছে, কিন্তু দেশ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব-পশ্চিমের শিক্ষার মিলন আজও ঘটে নাই। এ মিলনসাধন করিতে পারে যে-বাংলাভাষা, যে-বাংলাসাহিত্য, তাহা এখনও গড়িয়া উঠে নাই। পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞানকে আজও বাঙালী কিংবা ভারতবাসী আত্মসাৎ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে আমাদের জ্ঞানসাধনার ফলসিদ্ধিও পশ্চিমকে আমরা দিতে পারি নাই। এই মিলনের অভাবেই পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত ও নির্জীব—আর ইহারই অভাবে পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।

শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে যে-চিন্তা কবির মনে জাগিয়াছিল, তাহাকে তিনি রূপ দিতে চাহিয়াছেন শান্তিনিকেতনের 'বিশ্বভারতী'তে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার আদর্শ রবীন্দ্রনাথের মনকে চিরদিনই নাড়া দিয়াছে। নিখিল চরাচরকে প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা পাওয়াকেই তিনি বড়ো পাওয়া বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এ জন্য নিজের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনে কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা কিংবা কেবল জ্ঞানের শিক্ষাকেই তিনি প্রধান স্থান দেন নাই—বোধের শিক্ষাকেও সেখানে বড়ো করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন—প্রকৃতির উদার পটভূমিকায় স্বতঃউচ্ছলিত আনন্দধারার মধ্যে তিনি শিক্ষার্থীর প্রাণপ্রবাহকে মুক্ত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। আত্মপ্রকাশের আনন্দে সিক্ত করিয়া শিক্ষাকে তিনি খেলার সামগ্রী করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। কেবল অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা, একথা তিনি মানিয়া লইতে পারেন নাই। শান্তিনিকেতনের শিক্ষাবিধিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি। তাই শান্তিনিকেতনের আশ্রম-প্রাঙ্গণে আমরা অধ্যয়নের পাশে দেখিয়াছি বিচিত্র উৎসব ও নৃত্যগীত। সেখানে ছাত্ররা শুধু বই মুখস্থ করিবে না, লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এই পন্থায় তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নয়—কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।

কবিগুরুর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষানিকেতন

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার ভিতর দিয়া ব্যক্তিপুরুষের যথার্থ বিকাশ দেখিতে চাহিয়াছিলেন, এবং সেই পূর্ণ-বিকশিত ব্যক্তিকে সমাজের সঙ্গে, জাতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য

বন্ধনে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি জীবন ও শিক্ষার প্রকৃত সমন্বয়সাধন চাহিয়াছিলেন, এবং বুঝিতে পারিয়াছিলেন, শিক্ষাব্যবস্থাকে আমাদের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে, তাহা না হইলে জাতির কল্যাণ নাই। কবিগুরুর শিক্ষার আদর্শ ছিল—জাতির সর্বাঙ্গীণ চিৎপ্রকর্ষ। এই চিৎপ্রকর্ষের কথাই আজ আমাদের সকলকে ভাবিতে হইবে, এবং শিক্ষাকে ভাবজীবন ও কর্মজীবনের মধ্য দিয়া সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। যে-শিক্ষা চিত্তের উন্মেষ ঘটায় না, দেশকে চেনায় না, জাতিকে চেনায় না—সেই শিক্ষাবিধি বিষবৎ পরিত্যাজ্য। মনে রাখিতে হইবে, শিক্ষার প্রধান কাজ মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশসাধন করা, মানুষকে বৃহত্তর কর্মজীবনে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলা, তাহাকে গোটা মানুষ হইয়া উঠিবার শক্তিদান করা। যে-শিক্ষা ইহা করিতে পারে না, উহাকে প্রহসন ছাড়া আর কী বলিব?

ভাবজীবন ও কর্মজীবনে শিক্ষাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে

ব্যবসায়-বাণিজ্যমূলক শিক্ষার মূল্য

[**রচনার সংকেতসূত্র** : প্রারম্ভিক ভূমিকা—শিক্ষার উপযোগিতা—আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যুগোপযোগী নয়—কেতাবী শিক্ষার ব্যর্থতা—জাতীয় জীবনের গ্লানি হইতে মুক্তিলাভের উপায়—বিশেষ বৃত্তির জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন—দেশে বাণিজ্যিক শিক্ষার আবশ্যকতা—ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রটি ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে—বাণিজ্যিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাবের পরিণাম—বাঙালী বর্তমানে কিছুটা বাস্তবসচেতন হইয়া উঠিয়াছে—আমরা স্বাধীন মানুষ হইতে চাই—বাণিজ্যশিক্ষা আমাদিগকে বিড়ম্বনামুক্ত করিবে—উপসংহার।]

আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় ভারতবর্ষকে যখন দেখি, তখন চোখে পড়ে এদেশের শোচনীয় আর্থনীতিক অসচ্ছলতা, দেশবাসীর অভাবনীয় দারিদ্র্য। বিপুল জনশক্তি ও অমেয় প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হইয়াও ভারত আজ পৃথিবীর শিল্পবাণিজ্যসমৃদ্ধ অন্যান্য দেশের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে অসমর্থ। ফলে ভারতবাসীর আর্থিক জীবনে নিদারুণ বিপর্যয় ঘটিতেছে, বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার অস্তিত্ব আজ বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

এ সত্যটি কাহারও অজানা নাই যে, যুগোপযোগী শিক্ষাই জাতির সকল আশাআকাঙ্ক্ষার নিয়ামক। ইহা জাতিকে দেয় পথচলার নির্দেশ—সমগ্র দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও সার্বিক কল্যাণ নির্ভর করে সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার উপর। শিক্ষার উপযোগিতা বিবিধ। ইহা একদিকে যেমন মানুষের অজ্ঞানতা ঘুচায়, তাহার সুপ্ত মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করে, অন্যদিকে তেমনি মানুষকে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার উপযোগী করিয়া তুলিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠালাভে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে।

শিক্ষার উপযোগিতা

কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এই লক্ষ্যমুখে আমাদিগকে কতখানি পরিচালিত করিয়াছে? আমরা শিক্ষাজীবনের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের কতখানি সমন্বয় ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছি? বিচার-বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, এ প্রশ্নের উত্তর একেবারেই নিরাশাব্যঞ্জক। দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের সকলেরই দৃষ্টি পুঁথিঘেঁষা বিদ্যার প্রতিই সন্নিবদ্ধ, ইহার সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোনো সংযোগ নাই। ফলে বর্তমানে আমরা আর্থিক জগতের ক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া আসিয়া ভাবজগতের অধিবাসী হইয়া উঠিয়াছি। চলতি দুনিয়ার কেনাবেচার হাটের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করিতে না পারিলে বর্তমান পৃথিবীতে কাহারও টিঁকিয়া থাকিবার যে উপায় নাই, ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারার জন্যই বাঙালীর আর্থিক দুর্গতি আজ চরমে পৌঁছিয়াছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে বাঙালী সকলেরই পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে, দেশে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে উৎকট বেকারসমস্যা, চতুর্দিকে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে নিদারুণ অন্নাভাব—বস্ত্রাভাব। বাঁচিয়া থাকিবার কৌশলই যদি না শিখিলাম, তবে আমাদের এ শিক্ষার মূল্য কী?

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যুগোপযোগী নয়

সুদীর্ঘকালের রাজনীতিক পরাধীনতা আমাদের আর্থনীতিক পরাধীনতাকে ডাকিয়া আনিয়াছে, ইহা যেমন সত্য, তেমনি ভাবসর্বস্ব বিজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা আমাদিগকে মসীজীবী দাসজাতিতে পরিণত করিয়াছে, ইহা ততোধিক সত্য। জাতির অবমাননাসূচক ও বেদনাদায়ক এই পরিস্থিতি হইতে পরিত্রাণলাভের পথ আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। আর্থিক ক্ষেত্রে দৈন্য সমগ্র জাতির মৃত্যুর পথই উন্মুক্ত করে মাত্র। আমাদের জনবলের অভাব নাই, শ্রমশক্তির অভাব নাই, কৃষিজ ও খনিজ সম্পদের অপ্রাচুর্য নাই। তথাপি দেশবাসীর দারিদ্র্য ঘুচিতেছে না,—এইরূপ একটা অবস্থা সত্যই শোচনীয়।

কেতাবী শিক্ষার ব্যর্থতা

এই ঘৃণ্য পরিবেশ হইতে মুক্তি পাইবার উপায়—দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য-মূলক শিক্ষার প্রবর্তন। শিক্ষাজীবনের সহিত ব্যবহারিক জীবনের, উচ্চতর জ্ঞান-সাধনার সহিত কর্মসাধনার যে-বিস্ময়কর সামঞ্জস্য পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে দেখিতে পাই, আমরাও যদি তাহা করিতে পারি, তবে আমাদের আর্থিক দুর্গতি ঘুচিতে বাধ্য। দেশের দারিদ্র্যমোচন করিতে হইলে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় লইয়া আমাদিগকে বাণিজ্যজগতে প্রবেশ করিতে হইবে। এত দুঃখলাঞ্ছনার মধ্যে থাকিয়াও যদি আমরা বুঝিতে না শিখি যে, বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান—তাহা হইলে লক্ষ্মীছাড়ার পুঞ্জীভূত গ্লানি লইয়াই আমাদিগকে দিনাতিপাত করিতে হইবে।

জাতীয় জীবনের গ্লানি হইতে পরিত্রাণলাভের উপায়

জীবনে যে-কোনো ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সাফল্যলাভের জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। বণিকবৃত্তি যে অবলম্বন করিবে তাহার জন্য চাই উপযুক্ত বাণিজ্যিক শিক্ষা—ব্যবসায়-বাণিজ্য-সংসারের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা। সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী কাহারও কাছে সাধিয়া ধরা দেন না, শিক্ষা ও সাধনার মূল্যেই তিনি লভ্য।

বিশেষ বৃত্তির জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন

এমন একদিন ছিল যখন আমরা পণ্যের বিনিময়ে পণ্য পাইতাম, এক সামগ্রীর বদলে আর-একটি সামগ্রী সংগ্রহ করিতাম। ইহা বাণিজ্যের শৈশব-যুগেরই কথা। কিন্তু সেই যুগটি এখন আমাদের কাছ হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে—সে-যুগ আর এ-যুগের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। কেনাবেচার ক্ষেত্রটি এখন দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত, আজিকার বাণিজ্য জগৎজোড়া। এইজন্যই ব্যবসায়-বাণিজ্যের আকৃতি ও প্রকৃতি বর্তমানে দিন দিন জটিল রূপ ধারণ করিতেছে। ইহার গতিপ্রকৃতির সম্যক্ ধারণা ব্যতীত কেহই এ ক্ষেত্রে যথার্থ সফলতা-অর্জনের আশা করিতে পারে না। সুতরাং ব্যবসায়-বাণিজ্যে সত্যই যাহারা সফলতাকামী, তাহাদের জন্য বাণিজ্যিক শিক্ষা অত্যাবশ্যক। বাণিজ্যনীতির মূল সূত্রের সহিত পরিচয়সাধন করিতে না পারিলে, বাণিজ্য-বিষয়ক তত্ত্ব ও তথ্য সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত করিতে না পারিলে এক্ষেত্রে বিপুল ব্যর্থতাই শুধু সার হইবে।

দেশে বাণিজ্যিক শিক্ষার আবশ্যকতা

পণ্য-উৎপাদন, পণ্যের কেনাবেচা লইয়াই ব্যবসায়-বাণিজ্যের কারবার। সুতরাং এক্ষেত্রে যাহারা পদক্ষেপ করিবে তাহাদিগকে দেশবিদেশের বাজার,

মুদ্রানীতি, অর্থনীতি ইত্যাদির সহিত কিছুটা পরিচিত হইতে হইবে; জানিয়া লইতে হইবে ব্যবসায়িক আইনকানুন, কোম্পানীর সংগঠন-পরিচালনপদ্ধতি, ব্যাঙ্কের লেনদেন-বিষয়ক কার্যকলাপ এবং আরও নানাকিছু। দেশে কত রকমের আর্থিক সমস্যা প্রতিনিয়ত আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কখনো পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়িতেছে, কখনো কমিতেছে; কখনো দেখা দিতেছে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে অসামঞ্জস্য, কখনো দেখিতেছি, ঘাটতি-বাড়তির মধ্যে সমতা রক্ষা করা সম্ভব হইতেছে না; কোনো দেশে কাঁচামালের প্রাচুর্য, কিন্তু তাহার শিল্পসম্পদের অভাব; আবার, কোনো দেশ শিল্পোন্নত অথচ উহাকে কাঁচামাল আমদানী করিতে হয় বাহির হইতে; পণ্যের আমদানী-রপ্তানীর মধ্যেও কত রকমের জটিলতা। বুঝা যাইতেছে—ব্যবসায়ে নামিব, বাণিজ্য করিব—শুধু এই সাধু সংকল্পটিই যথেষ্ট নয়, বাণিজ্যিক সফলতা বিশেষ রকমের জ্ঞানবুদ্ধির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। কেবল মূলধন থাকিলেই সাফল্য মিলে না, ইহার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন, অভিজ্ঞতার প্রয়োজন—বাণিজ্যের ব্যবহারিক ও তত্ত্বের দিক, উভয়ের সহিত পরিচয় থাকা প্রয়োজন। ইহাদের বাদ দিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যে নামিতে যাওয়া মূঢ়তামাত্র।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রটি ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে

এই বাণিজ্যশিক্ষা আমাদের নাই বলিলেই চলে। ইহার উপযোগিতা-বিষয়ে আমরা এতকাল অন্ধ ছিলাম বলিয়াই দেশে বাণিজ্যিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমন অভাব। শ্রমের মর্যাদা আমরা বুঝি না, সেজন্য সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমাদের প্রতি আজ এতখানি বিরূপ। নির্দিষ্ট আয়ের চাকুরীর মোহ, ভাবসর্বস্ব কেতাবী বিদ্যা আমাদের শ্রমবিমুখ করিয়া তুলিয়াছে। স্বাধীন ব্যবসায়ে নামিয়া জীবিকা উপার্জন করার চেয়ে কেরাণীগিরির দাসত্বকে আমরা বরণীয় বলিয়া মনে করি। পরপদলেহন করিতে করিতে দাসমনোভাব আমাদের একেবারে মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। তাই বাঙালীর আজ এহেন জাতিগত অধঃপতন।

বাণিজ্যিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাবের পরিণাম

অজস্র দুর্গতি-লাঞ্ছনার সুতীব্র আঘাত বাঙালীকে কিছুটা বাস্তবসচেতন করিয়া তুলিয়াছে। তাই বাঙালীসন্তান বর্তমানে ব্যবসায়-বাণিজ্যমূলক শিক্ষার মূল্য কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতেছে। বাণিজ্য দেশের সম্পদবৃদ্ধির একটি বড়ো উপায়। যে-দেশ ব্যবসায়-বাণিজ্যে অনগ্রসর, কমলার কৃপাদৃষ্টি তাহার উপর বর্ষিত হয় না। ফলে তাহার আর্থিক দৈন্য দিন দিন বাড়িয়া যায়। বহুমূল্য

বাঙালী বর্তমানে কিছুটা বাস্তবসচেতন হইয়া উঠিয়াছে

প্রাকৃতিক সম্পদ পরের হাতে নির্বিচারে তুলিয়া দিয়া বিদেশীর নিকট হইতে মূঢ়ের মতো আমরা তৈয়ারী মাল কিনিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করি। এই যে পরমুখাপেক্ষিতা, ব্যবসায়বিমুখতা, চাকুরিসর্বস্বতা—জাতির পক্ষে ইহা যে কত বড়ো বিড়ম্বনা, সে কথা কাহাকেও বুঝাইয়া বলার প্রয়োজন হয় না।

আমরা স্বাধীন মানুষ হইতে চাই

সমাজজীবনে সর্বতোভাবে স্বাধীন মানুষ হইয়া উঠিতে হইলে আমাদিগকে মসীজীবীর নিশ্চিন্ত জীবনের মোহ কাটাইতে হইবে, আরামপ্রিয়তা বর্জন করিতে হইবে, জগৎজোড়া বাণিজ্যের হাটে নিজের অধিকার স্থাপন করিতে হইবে। হাতের কাছে রত্নের খনি থাকা সত্ত্বেও আমাদের আজ হতশ্রী ভিখারীর অবস্থা। কাচের মূল্যে কাঞ্চন বিকাইয়া দিতে আমরা এতটুকু দ্বিধাবোধ করি না।

বাণিজ্যশিক্ষা আমাদিগকে বিড়ম্বনামুক্ত করিবে

জাতীয় জীবনের এই অসহনীয় দুর্গতি হইতে আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে বাণিজ্যশিক্ষা। দেশে এ জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রসার ঘটিলে তরুণ-সম্প্রদায়ের দৃষ্টির অস্বচ্ছতা দূর হইবে, তাহারা নিজের দেশকে চিনিবে, আত্মসম্বিত ফিরিয়া পাইবে। বুঝিবে —দেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার উপকরণের অভাব আমাদের নাই—অভাব শুধু বাণিজ্যমুখী মনোবৃত্তির, শ্রমের মর্যাদাবোধের, সাধু সংকল্পের, সর্বোপরি উপযুক্ত শিক্ষার।

উপসংহার

এতকাল ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল বলিয়া পরজাতির শোষণবৃত্তি প্রতিরোধ করিয়া দেশের দারিদ্র্য আমরা ঘুচাইতে পারি নাই। কিন্তু দেশ এখন স্বাধীন হইয়াছে, সুতরাং বহিঃশক্তির প্রতিকূল প্রভাব হইতে আমরা অনেকটা মুক্ত। দীর্ঘকালের মানসিক জড়তা কাটাইয়া উঠিয়া এক সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্তমানে আমাদিগকে দেশের আর্থনীতিক প্রগতির প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিতে হইবে। আর্থনীতিক স্বাধীনতা-ব্যতিরেকে রাজনীতিক স্বাধীনতা নিরর্থক। শিক্ষাব্যবস্থাকে যদি আমরা যুগোপযোগী করিয়া তুলিতে পারি, ব্যবসায় ও বাণিজ্যমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি দেশের সর্বত্র গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে আমাদের আর্থিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। নবতন শিক্ষাপরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে এই দুর্গত দেশের আর্থনীতিক পুনর্জীবনলাভের সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত।

ভারতের জনসংখ্যাসমস্যা

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—ম্যালথ্‌স্‌-এর প্রচারিত মতবাদ—লোক-সংখ্যাবৃদ্ধি পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে সমস্যারূপে দেখা দেয় নাই—ম্যালথ্‌সের মতবাদ ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—সত্যই কি ভারতে লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধি ঘটিয়াছে—জনসংখ্যাবৃদ্ধি একটি আপেক্ষিক তত্ত্ব—বিগত কয়েক বছরে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে জন্মহার বাড়িয়াছে—কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি জনসংখ্যাবৃদ্ধি অস্বীকার করিয়াছেন—বর্তমান সমস্যাটির প্রতিকার কোন্ পথে—উপসংহার।]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

ভারতের আর্থিক পরিস্থিতি দিনের পর দিন এমন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে যে, একজন সাধারণ মানুষের স্থূলদৃষ্টিতেও ইহার ভয়াবহ রূপটি সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। ভারতবাসীর অন্নবস্ত্রের অভাব মর্মান্তিক, তাহার জীবনযাত্রার মান অবিশ্বাস্য রকমে নীচু, জনসাধারণের জীবনীশক্তি দ্রুতগতিতে ক্ষয়িষ্ণুতার মুখে ধাবিত। একদিকে ভারতে দুঃসহ দারিদ্র্যের বোঝা বাড়িয়া চলিয়াছে, অন্যদিকে ক্রমাগত বর্ধিত হইতেছে ইহার জনসংখ্যা। ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ বলিয়া এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা আমাদের সমাজজীবনে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে—জীবিকাসংস্থানসমস্যা ও খাদ্যসমস্যা ইহার মধ্যে প্রধান। ভারতবাসীর জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায় হইল কৃষি—শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারত নিতান্ত অনগ্রসর। দেশে বর্তমানে যে-ভাবে জন্মহার বাড়িতেছে, সেই অনুপাতে আমাদের খাদ্যউৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে না। ফলে দেশ যেমন একদিকে দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, তেমনি অন্যদিকে দেশের খাদ্যপরিস্থিতি ক্রমশ সংকটাপন্ন হইয়া উঠিতেছে। আমাদের কৃষিব্যবস্থা অনুন্নত ও অবৈজ্ঞানিক, সেজন্য খাদ্যশস্যের ফলনের পরিমাণও খুব কম। এ সব কারণে অর্ধাশন, অনশন, ব্যাধি, মৃত্যু আমাদের নিত্যসহচর হইয়া উঠিয়াছে।

ম্যালথ্‌স্‌-এর প্রচারিত মতবাদ

সুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ম্যালথুস্ তাঁহার প্রচারিত জনসংখ্যাতত্ত্বে বলিতে চাহিয়াছেন, কোনো দেশের চরম দারিদ্র্য ও আর্থিক অসচ্ছলতার প্রধান কারণ হইল ইহার লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধি। মানুষ স্বভাবতই গুণোত্তর প্রগতিতে [Geometric progression] জন্মহার বৃদ্ধি করিয়া চলে, আর তাহার জীবিকাসংস্থান বাড়ে যোগোত্তর প্রগতিতে [Arithmetic progression]। সেহেতু প্রতি

পঁচিশ বছরে দেশের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে, এবং কালক্রমে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়, যখন দেশের লোকসংখ্যা উহার জীবিকাসংস্থানের সকল উপায়কে অনেক দূর অতিক্রম করিয়া যায়। তখন জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান একান্ত নিম্নস্তরে নামিয়া আসে—দেশে ব্যাপকভাবে দেখা দেয় দারিদ্র্য আর খাদ্যাভাব।

ইয়োরোপে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার ভারতবর্ষের চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। কিন্তু সেখানকার প্রায় প্রত্যেকটি দেশেই ম্যালথুস্-প্রচারিত এই তত্ত্ব আজ সত্যই মিথ্যা প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে। নূতন নূতন ভূমির আবিষ্কার ও বিস্ময়কর শিল্পবিপ্লব পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে দারিদ্র্য ও খাদ্যাভাব বহুল পরিমাণে বিদূরিত করিয়াছে। কিন্তু এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহে এই তত্ত্ব এখনও মিথ্যায় পর্যবসিত হয় নাই। ভারতবর্ষের দিকে তাকাইলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে, এখানে লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

লোকসংখ্যাবৃদ্ধি পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে সমস্যারূপে দেখা দেয় নাই

ইহার প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, পৃথিবীর সভ্যদেশসমূহের মধ্যে ভারতের মতো দরিদ্র দেশ খুবই বিরল। এতদ্ব্যতীত, জন্মহার ও মৃত্যুহার বোধ হয় ভারতবর্ষেই সর্বাপেক্ষা বেশী। ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের খাদ্যের পরিমাণ প্রত্যক্ষতই অপ্রতুল। ভারতের জনস্বাস্থ্যকমিশনের বিবৃতিতে বার বার বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব গুরুতরভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। শতকরা দশজন লোক অনশনের প্রান্তবর্তী হইয়া এদেশে দিনাতিপাত করে। প্রত্যেক বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক জীবনীশক্তি হারাইয়া নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। খাদ্যের অভাব এবং পুষ্টিহীনতাই যে এইরূপ শোচনীয় পরিস্থিতির প্রধান কারণ, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ইহা হইতে মনে হইবে, ভারতের জনসংখ্যা অতিরিক্ত রকমে বর্ধিত হইয়াছে, এবং ম্যালথুসের মতবাদ ভারতের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

ম্যালথুসের মতবাদ ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

কিন্তু সত্যই কি ভারতবর্ষ অতিরিক্ত জনসংখ্যায় ভারাক্রান্ত? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে নানাবিষয়ে বহুমুখী আলোচনার প্রয়োজন। ভারতবর্ষে লোকসংখ্যাবৃদ্ধি বস্তুত একটি সমস্যা কিনা, তাহা গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ না করিয়া অনেকে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, এই বিপুল জনসংখ্যাকে ধারণ করিবার শক্তি ভারতের নাই। ভারতবাসীকে অনশন,

অর্ধাশন, অকালমৃত্যু, ভয়াবহ দারিদ্র্য ইত্যাদির হাত হইতে মুক্ত করিতে হইলে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। এরকম একটি মত-প্রকাশের পিছনে একদেশদর্শিতার ভাবই পরিলক্ষিত হয়। কেন না, আমাদের দেশে জনসংখ্যার হার প্রকৃতই অতিরিক্ত কিনা, ইহার বিচারে শুধু অধিবাসীর আকারের দিকে তাকাইলে চলিবে না, দেশের আর্থিক সুযোগ-সম্ভাবনার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভারতের আবাদী জমির উর্বরতাশক্তি কম নয়। দেশের বিচিত্র জলবায়ু, বিস্তৃত বনভূমি, অগণিত নদনদী সবকিছুই চাষের অনুকূল। শিল্পায়নের জন্য যে-জনশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজন, আমাদের তাহারও অভাব নাই। অথচ আজ ভারতের দারিদ্র্য অভাবনীয়, খাদ্যাভাব ভারতবাসীকে তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেছে।

সত্যিই কি ভারতে লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধি ঘটিয়াছে

লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধি কথাটি একটি আপেক্ষিক শব্দ। জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ যদি বাড়াইতে পারা যায়, তাহা হইলে জনসংখ্যা ও খাদ্যপরিস্থিতির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে। অধ্যাপক ক্যানান ইহাকেই বলিয়াছেন 'Optimum population', অর্থাৎ বাঞ্ছনীয় জনসংখ্যা। বর্তমানে এই 'Optimum population'-এর স্তরটিকে যে আমরা অতিক্রম করিয়া গিয়াছি, একথা অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু তবু আমরা বলিতে চাই, জনসংখ্যাবৃদ্ধিই ভারতের দুঃখদারিদ্র্য, অভাব-অসচ্ছলতা, ব্যাধি-মৃত্যুর একমাত্র কারণ নয়—অন্য বহুবিধ কারণ ইহার পিছনে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে। দেশের খাদ্য-উৎপাদনের পরিমাণ বর্ধিত করিয়া শিল্পায়ন প্রভৃতির সহায়তায় লোকের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রটি বাড়াইবার যে-সুযোগসম্ভাবনা আমাদের আছে, কার্যত তাহা কাজে লাগাইবার সুপরিকল্পিত কোনো প্রচেষ্টা ভারতে অদ্যাপি দেখা যায় নাই।

জনসংখ্যাবৃদ্ধি একটি আপেক্ষিক তত্ত্ব

বিগত কয়েক বছরে শুধু ভারতবর্ষেই যে জন্মহার বাড়িয়াছে তাহা নয়, ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও জন্মহার লক্ষণীয়রূপে বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ড-আমেরিকায় রাষ্ট্রপরিকল্পিত আর্থিক ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতি তথাকার জীবিকাসংস্থানের পথ আশ্চর্যভাবে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। সত্যকার উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য ওইসব রাষ্ট্রে জনসংখ্যাসমস্যা কদাপি বড় হইয়া উঠে নাই। সর্বনাশা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেও সংগ্রামলিপ্ত ব্রিটেন

বিগত কয়েক বছরে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে জন্মহার বাড়িয়াছে

তাহার খাদ্যের পরিমাণ যুদ্ধ-পূর্বেকার শতকরা ৪২ ভাগ হইতে ৬০ ভাগে বাড়াইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। ভারতবর্ষের শতকরা ৭৫ জন লোক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমাদের কৃষি ক্রমাগতই অবনতির মুখে চলিয়াছে। এরূপ পরিস্থিতি যে শোচনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সে যাহা হোক, জনসংখ্যাবৃদ্ধি যে ভারতের পক্ষে অকল্যাণকর, একথা মানিয়া লইতে আমরা রাজী নই। কৃষির ফলন বর্ধিত করিয়া, শিল্পের প্রসার-সাধন করিয়া, ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিধি বাড়াইয়া তুলিয়া অবাধে এই ক্রমবর্ধমান জনগণের জীবিকার সংস্থান করা যাইতে পারে। ইহার জন্য চাই বলিষ্ঠ পরিকল্পনা। কয়েকজন খ্যাতনামা অর্থবিজ্ঞানী, এবং মহাত্মা গান্ধী, শ্রীজহরলাল নেহরু প্রমুখ দেশনেতারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দেশের কৃষির সম্যক্ উন্নতি সাধিত হইলে, যথোপযুক্ত শিল্পসম্প্রসারণ ঘটিলে, এদেশে বর্তমান জনসংখ্যার দুই গুণেরও অধিক মানুষের জীবিকার সংস্থান করা যায়।

কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধি অস্বীকার করিয়াছেন

সুতরাং বর্তমান লোকসংখ্যার দিকে তাকাইয়া আমাদের শঙ্কিত হইবার তেমন কোনো কারণ নাই। যে-দেশে শিশু, প্রসূতি ও মৃত্যুর হার ভয়াবহ, যে-দেশে হিন্দুর মধ্যে বিধবাবিবাহ একরূপ নিষিদ্ধ, যে-দেশে অধুনা আর্থিক কারণে তরুণতরুণীরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে অনিচ্ছুক, সেখানে ব্যাপক জন্মনিয়ন্ত্রণ লোকসমস্যা-সমাধানের প্রকৃষ্ট পন্থা হইতে পারে না। সুতরাং এদিকে অযথা মাথা না ঘামাইয়া, দেশের মানুষের জন্য সার্বজনীন কর্মসংস্থান কী ভাবে করা যাইতে পারে, কোন্ উপায়ে খাদ্যের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব, সেদিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করাই আমাদের সকলের প্রধান কর্তব্য।

বর্তমান সমস্যাটির প্রতিকার কোন্ পথে

আমাদিগকে আবাদী জমির পরিমাণ যথাসম্ভব বাড়াইতে হইবে, সেখানে আরও অধিক শস্য ফলাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু শুধুমাত্র কৃষিকে অবলম্বন করিয়া কোনো দেশ সর্বাঙ্গীণ আর্থনীতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। শিল্পোন্নয়ন ভিন্ন জাতীয় সম্পদ সহজে বাড়ানো সম্ভব নয়। আমাদের কাঁচামাল, শিল্পশ্রমিক, বিদ্যুৎশক্তি—কোনোকিছুরই অভাব নাই ; অভাব কেবল রাষ্ট্রের সক্রিয় সহায়তার, অভাব শুধু জনসাধারণের শিল্পমুখী মনোবৃত্তির। রাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতীত ব্যাপক শিল্পায়ন-পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া তোলা সত্যই অসম্ভব।

একটি কথা আমাদিগকে বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। দেশের ধনবণ্টনব্যবস্থা যদি সুষ্ঠু না হয়, তাহা হইলে সার্বজনীন আর্থিক সচ্ছলতা দেখা দিবে না। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় ধনীর হস্তগত হইতে বাধ্য। সুতরাং রাষ্ট্রকে দেখিতে হইবে, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের হাতে ওই সম্পদ যথাযথ পৌঁছাইতেছে কিনা। দেশের সম্পদে যদি সকলের অধিকার না জন্মায়, তবে দেশবাসীর দারিদ্র্য কখনো ঘুচিবার নয়। তাই উৎপাদনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ বণ্টনের সুব্যবস্থাকেও আর্থনীতিক পরিকল্পনায় একটি বড়ো স্থান দিতে হইবে। পরিকল্পনা-অনুযায়ী ভারতে কৃষি ও শিল্পউন্নয়নের কাজ আরম্ভ হইলে আমাদের জাতীয় আয় ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে, জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের কর্মসংস্থান হইবে, দেশের আর্থিক অসচ্ছলতা ঘুচিবে—তখন জনসংখ্যাসমস্যা আমাদিগকে আর তেমন উৎকণ্ঠাতুর করিয়া তুলিবে না। এই জনসংখ্যাসমস্যার বাস্তব সমাধানের উপরই নির্ভর করিবে ভারতের রাষ্ট্রকর্ণধারবৃন্দের কৃতিত্ব ও সফলতা। কেন না, দেশের প্রত্যেকটি মানুষের হাতে অন্নবস্ত্র তুলিয়া দেওয়াই রাষ্ট্রের প্রধানতম কর্তব্য।

উপসংহার

ভারতীয় কৃষির অবনতির কারণ

[**রচনার সংকেতসূত্র :** প্রারম্ভিক ভূমিকা—আমাদের কৃষি ক্রমেই অবনতির মুখে চলিয়াছে—ভারতীয় কৃষির অবনতির কারণ—কৃষিব্যবস্থা উন্নত করিয়া তুলিতে না পারিলে জাতীয় সংকট অনিবার্য—শস্যের অধিক ফলন উত্তম সার ও ভালো বীজের উপর নির্ভরশীল—যৌথ কৃষিব্যবস্থা ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার—ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন—সমবায়প্রথার প্রবর্তন—কৃষিউন্নয়ন-পরিকল্পনা—উপসংহার।]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া ভারতের আর্থনীতিক উন্নতি অনেকখানি নির্ভর করিতেছে কৃষির সুষ্ঠু পরিচালনা ও কৃষকের আর্থিক সচ্ছলতার উপর। ভারতীয় কৃষকসম্প্রদায়কে বহু প্রতিবন্ধকতার ভিতর দিয়া কাজ করিতে হয়। বর্তমান নিবন্ধে প্রথমে আমরা দেখিব কৃষকের অসুবিধাগুলি কী। তারপর, কী ভাবে কৃষির উন্নতি হইতে পারে, সে-বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। কৃষির উন্নতি বলিতে

কেবল শস্যউৎপাদনের বিভিন্ন স্তরের উন্নতি বুঝায় না—ইহা দ্বারা কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নও বুঝায়।

ভারতের লোকসংখ্যার শতকরা ৭৫ জন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভর করে। কিন্তু এদেশের কৃষিব্যবস্থার প্রতি রাষ্ট্র চিরকালই উদাসীন। সরকারী প্রচেষ্টার অভাবে নিরক্ষর দরিদ্র কৃষককে বছরের পর বছর ধরিয়া প্রাচীন পদ্ধতিতেই চাষের কাজ সমাধা করিতে হয়। ইহার ফলে আমাদের কৃষিব্যবস্থা দিনের পর দিন অবনতির মুখেই চলিয়াছে। অন্যদিকে, এই কৃষি-অবনতির সহিত দেশের দ্রুত-জনসংখ্যা-বৃদ্ধিজনিত একটি বিরাট সমস্যাও আসিয়া যোগ দিয়াছে। ভারতের লোকসংখ্যা প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। গ্রামের কুটীরশিল্পগুলি বিনষ্ট হওয়াতে এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ পড়িয়াছে জমির উপর। জমির তুলনায় লোকসংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। মাথাপিছু জমির স্বল্পতাই ভারতীয় চাষীর শোচনীয় দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

আমাদের কৃষি ক্রমেই অবনতির পথে চলিয়াছে

আমাদের কৃষি-উন্নতির প্রধান অন্তরায় হইতেছে, অল্পপরিমাণ যেটুকু জমি মাথাপিছু পড়ে, উহার খণ্ডবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান। এরূপ ছোট ছোট খণ্ডিত জমিতে লাভজনকভাবে কৃষির কাজ করা যায় না। জমির পরিমাণ অল্প বলিয়া উৎপাদিত ফসলের তুলনায় কৃষিকার্য ব্যয়বহুল হইয়া পড়ে। জমির উৎপাদিকাশক্তির হ্রাস ও কৃষকের মূলধনের অভাব এদেশের কৃষি-অবনতির আর-একটি বড়ো কারণ। বৎসরের পর বৎসর চাষ করার ফলে এবং জমিতে দীর্ঘকাল ধরিয়া সার না পড়ায় জমির উৎপাদনক্ষমতা একেবারেই কমিয়া যাইতেছে। কৃষির উন্নতির উপায়গুলি কৃষকদের বুঝাইয়া দিলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কৃষিব্যবস্থার উন্নতির তেমন কোনো সম্ভাবনা নাই। কারণ, ইহার জন্য যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, উহা যোগাইতে দেশের কৃষককুল সত্যই অসমর্থ।

ভারতীয় কৃষির অবনতির কারণ

উপরিউক্ত সমস্যাগুলির সহিত আমরা সকলেই পরিচিত। ইহাদের আশু-প্রতিকার না হইলে সমগ্র দেশবাসীকে গুরুতর আর্থনীতিক সংকটের সম্মুখীন হইতে হইবে। দেশের কৃষিব্যবস্থাকে কোন্ পদ্ধতিতে উন্নত করিয়া তোলা যায়, কী ভাবে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত ইহার সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে—ভবিষ্যতে ইহাই আমাদের আর্থনীতিক পরিকল্পনার মূল আলোচ্য বিষয়

হওয় উচিত। কৃষিব্যবস্থার উন্নতির প্রয়োজন শুধু জনসাধারণকে খাদ্যশস্য যোগান দিবার জন্য নয়, ইহা আবশ্যক ভারতের নব-পরিকল্পিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে কাঁচামাল যোগাইবার জন্যও বটে। কৃষিকে উপেক্ষা করিয়া দেশের খাদ্যসমস্যার প্রতিকার করা, আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন করা কিংবা জনগণের জীবনযাত্রার মান উঁচু করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না।

কৃষিব্যবস্থা উন্নত করিয়া তুলিতে না পারিলে জাতীয় সংকট অনিবার্য

জমির উৎপাদিকাশক্তি অনেকখানি নির্ভর করে উপযুক্ত সারপ্রয়োগের উপর। মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া কোন্ সার কত পরিমাণে দিলে কোন জমির কতখানি উন্নতি হইবে, ইহা কৃষকের জানা দরকার। ভালো বীজের উপরও শস্যোৎপাদন অনেকখানি নির্ভরশীল। কিন্তু ভালো বীজ সংগ্রহ করার পথে এদেশে অনেক বাধা। পাশ্চাত্ত্য দেশে একদল লোক আছে যাহাদের ব্যবসায় হইল বীজ সরবরাহ করা ও গবেষণার দ্বারা কৃষিকার্যে উন্নততর বীজ-প্রয়োগের চেষ্টা করা। বীজ-সরবরাহের সুব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই।

শস্যের অধিক ফলন উত্তম সার ও ভাল বীজের উপর নির্ভরশীল

বৈজ্ঞানিক উপায়ে যন্ত্রের দ্বারা কৃষিকার্য-সম্পাদনের প্রথা ভারতে এখনও প্রবর্তিত হয় নাই। খণ্ড খণ্ড জমিগুলিকে একত্রিত করিতে না পারিলে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে কৃষিকার্য সম্ভব হয় না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে প্রয়োজন যৌথকৃষিব্যবস্থা। ভারতে অনাবাদী যে-সব পতিত জমি আছে সেগুলিকে যাহাতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যসংস্থানের জন্য কাজে লাগান যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বিশাল দেশে নানারূপ জমি আছে এবং এখানকার জলহাওয়াও বিচিত্র। সুতরাং সকল জমিতে সকল প্রকার শস্য উৎপাদন করার পক্ষে অসুবিধা রহিয়াছে। এক রুশ বৈজ্ঞানিকের সুদীর্ঘকালের গবেষণার ফলে আজ রাশিয়ায় প্রতিকূল জলহাওয়ার মধ্যেও বিভিন্ন প্রকারের শস্য উৎপাদিত হইতেছে। এই প্রথাকে বলা হইয়া থাকে 'Vernalisation'। শস্যবীজকে 'ভার্ণালাইজ'-প্রথার মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া তাহার পর বপন করিলে নানা জাতীয় শস্য-উৎপাদন সহজ হইয়া পড়ে।

যৌথ কৃষিব্যবস্থা ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার

ভারতবর্ষের বর্তমান ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনসাধন করা একান্ত

প্রয়োজন। কৃষির মৌলিক উন্নতির দিকে এদেশে কাহারও কোনোরূপ দৃষ্টি নাই। জমিদার [বর্তমানে লুপ্ত] তাঁহার খাজনা সম্পূর্ণ বুঝিয়া পাইলে খুশী, সরকার রাজস্ব লইয়াই ক্ষান্ত হন। যাঁহারা কৃষির প্রকৃত উন্নতি কামনা করেন তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য হইল এই অবনতির হাত হইতে দেশের কৃষক ও কৃষিকে রক্ষা করা। বর্তমানে জমিদারীপ্রথার উচ্ছেদসাধন করিয়া সরকার জমিদারীক্রয়ের দিকে মনসংযোগ করিয়াছেন। ইহার কার্যকরিতার উপর ভারতের কৃষিউন্নতি অনেকটা নির্ভর করিতেছে।

ভূমিব্যস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন

কৃষির উন্নতির সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে সমবায়প্রথা-প্রবর্তন। কৃষিপণ্য-বিক্রয় সম্পর্কে কোনো সুব্যবস্থা না থাকায় ভারতীয় কৃষকেরা নিজেদের উৎপন্ন ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না। চাষীসম্প্রদায়ের সংঘবদ্ধহীনতার সুযোগ লইয়া সুচতুর দালালের দল তাহাদিগকে বরাবরই বঞ্চিত করিয়া আসিতেছে। সমবায়-সমিতি স্থাপন করিয়া তাহার মারফতে কৃষিজাত পণ্য ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে কৃষকের আর্থিক সচ্ছলতা বাড়িতে বাধ্য। ভারতে কৃষিউন্নতির পথে যে-সকল প্রতিবন্ধক রহিয়াছে তাহার অন্যতম হইল সেচব্যবস্থার অভাব। দেশে উপযুক্ত সেচব্যবস্থা না থাকাতে প্রতি বৎসর ভারতের কৃষককে নানা আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইতেছে। ভারতের বহু নদীতে বন্যার ফলে যে-জল নষ্ট হয়, উহা কৃষির ক্ষেত্রে সেচের জন্য প্রযুক্ত হইলে ফসল-উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে। সম্প্রতি ভারতসরকার সেচপরিকল্পনাবিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। সুতরাং নিকট-ভবিষ্যতে কিছুটা সুফল আশা করা যাইতে পারে।

সমবায়প্রথার প্রবর্তন

ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনসাধনের জন্য আমাদের জানিতে হইবে, জমির মালিক কে, কে কী সর্তে জমি চাষ করে, কৃষকের জমিচাষের যন্ত্রপাতি কী, জমিতে কী কী ফসল জন্মায়, উহার মূল্য কত। এ সকল তথ্য সংগৃহীত হইলে এদেশের কৃষি ও কৃষক উভয়ের দুর্দশার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে, এবং উহার আলোকেই রচনা করিতে হইবে কৃষিউন্নয়ন-পরিকল্পনা। কৃষকের অজ্ঞতা-দূরীকরণ, সেচকার্যের জন্য নদীসংস্কার, খালকূপ ইত্যাদি খনন, কৃষককে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানব্যবস্থা, চাষীকে উত্তম বীজধান-সরবরাহ, ভূমিব্যবস্থার সংস্কারসাধন, কৃষিগবেষণাগার-প্রতিষ্ঠা, উন্নত ধরণের গবাদি পশুপ্রজননব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় এই পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত হইবে।

কৃষিউন্নয়ন-পরিকল্পনা

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, বর্তমান দুনিয়ার সকল রাষ্ট্রই কৃষির উপর জোর দিয়াছে—কেবল যে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য তাহা নয়, নূতন নূতন শিল্পের জন্য কাঁচামালের যোগান দেওয়াও ইহার একটি প্রধান লক্ষ্য। কাঁচামাল-রপ্তানি ভারতের প্রধান ব্যবসায়।

উপসংহার

কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হইবে নির্বিচার রপ্তানী বন্ধ করিয়া দিয়া উৎপাদিত কাঁচামালের সহায়তায় দেশীয় শিল্পগুলিকে যথোচিত সাহায্য করা। আমরা যদি কৃষিকে উন্নত করিয়া তুলিতে না পারি, তবে একদিকে দেশের শিল্পগুলিকে বহির্ভারতীয় আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হইবে; অন্যদিকে কাঁচামাল কম উৎপাদিত হওয়ায় তাহাদের মূল্য চড়িয়া যাইবে, এবং তাহার সঙ্গে শিল্পদ্রব্যের মূল্য বাড়িবারও সম্ভাবনা দেখা দিবে। একটি সুরচিত বলিষ্ঠ পরিকল্পনা-দ্বারা কৃষিব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হইলে ভারতের আর্থিক অবস্থার মধ্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন আসিবে।

আমরা বিস্মৃত হইব না যে, ভারত কৃষিপ্রধান দেশ—এ দেশের তিন-চতুর্থাংশ লোক নানাভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষির উন্নতি হইলে আমাদের আর্থনীতিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া আসিতে বাধ্য। আবার, কৃষির উন্নতির সঙ্গে জড়িত দেশের বিবিধ শিল্পের ভবিষ্যৎ। দেশের কৃষি যদি প্রতিদিন অবনতির পথে চলে, ভারতের চাষীসম্প্রদায় যদি অনুন্নত কৃষিব্যবস্থার জন্য মরিতে বসে, তবে বুঝিতে হইবে ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে মহাসংকট ঘনাইয়া আসিতে আর বিলম্ব নাই।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির উপর যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এই পরিকল্পনা সার্থক হইয়া উঠিলে ভারতীয় কৃষি অবশ্যই পিছাইয়া থাকিবে না, এবং কৃষকসম্প্রদায়ের ভয়াবহ দারিদ্র্যও কিছুটা ঘুচিবে।

ভারতীয় শিল্পের উন্নয়নসমস্যা

[**রচনার সংকেতসূত্রঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—শিল্পবাণিজ্যে পিছাইয়া থাকাই ভারতবাসীর দারিদ্র্যের কারণ—কৃষির তুলনায় শিল্পবাণিজ্য অধিকতর লাভজনক—ভারতের শিল্পোন্নতির ইতিহাস গৌরবব্যঞ্জক নয়—প্রথম-মহাযুদ্ধ ও ভারতীয় শিল্প—শিল্পসংরক্ষণনীতি—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ভারতীয় শিল্প—জাতীয় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা—শিল্পব্যাঙ্কস্থাপন—পরিবহনব্যবস্থা উন্নত করিতে হইবে—বিদ্যুৎশক্তি—অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন দেশের দারিদ্র্য দূর করিতে পারিবে না—শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ও আঞ্চলিক বণ্টন—কুটীরশিল্প যন্ত্রশিল্পের অনুপূরক হইবে—উপসংহার।]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

ভারতবর্ষ সম্পদশালী বিশাল একটি দেশ। ইহার আছে কোটি কোটি একর চাষের উপযোগী জমি, সুদূরবিস্তৃত বনভূমি, অগণিত নদনদী, অজস্র খনিজ সম্পদ, আর প্রভূত শ্রমশক্তি। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ভারতবাসীর মতো দারিদ্র্যনিপীড়িত জাতি বর্তমানে পৃথিবীতে বিরলদৃষ্ট। ভারতের কৃষি অনুন্নত, শিল্প অনগ্রসর, ব্যবসায়-বাণিজ্য সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের জাতীয় আয় কত কম! আয়ের এই স্বল্পতার জন্য দেশবাসীর জীবন-যাত্রার মান অবিশ্বাস্য রকমে নীচু—দারিদ্র্য, অনশন, ব্যাধি, মৃত্যু সমগ্র জাতিকে ক্রমাগত ধ্বংসের মুখে আগাইয়া দিতেছে। ইতঃপূর্বে আমরা এরূপ সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন কখনো হই নাই।

শিল্প-বাণিজ্যে পিছাইয়া থাকাই ভারতবাসীর দারিদ্র্যের বড়ো কারণ

এদেশের জনসাধারণের শতকরা ৭৫ ভাগ লোক কৃষিকেই জীবিকার প্রধান অবলম্বন-হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। এই বিপুল সংখ্যক লোক কৃষিনির্ভর হওয়ার ফলে কৃষিআয় দিন দিন কমিয়া আসিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেছে দেশবাসীর দারিদ্র্য। ভূমি-আশ্রয়ী জনগণের একটি বড়ো অংশকে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে অপসারিত করিতে না পারিলে ভারতের আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা নাই, দরিদ্রজীবনযাপনের গ্লানি হইতে দেশবাসীর মুক্তিলাভের উপায় নাই। আথিক ক্ষেত্রে সচ্ছলতা আনিতে হইলে আমাদিগকে অবিলম্বে শিল্পবাণিজ্যের দিকে কর্মশক্তি পরিচালিত করিতে হইবে,—কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বৃত্তপথে পরিক্রমণই আর্থিক জগতে সচ্ছলতার নির্দেশক।

ক্রমবর্ধমান বিপুল লোকসংখ্যা আমাদের জীবিকানির্বাহ-সমস্যাকে প্রতিদিন জটিল করিয়া তুলিতেছে। যে-হারে ভারতে লোকসংখ্যা বাড়িতেছে, সে-হারে আমাদের খাদ্যোৎপাদন বাড়িতেছে না, সম্পদ বৃদ্ধি পাইতেছে না। জাতির আর্থিক উন্নতির নিয়ামক হইল শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষি। কৃষির তুলনায় শিল্প ও বাণিজ্য অধিকতর লাভজনক বলিয়া পাশ্চাত্যের উন্নতিকামী দেশগুলি আজ সেইদিকেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আমরা কিন্তু এখনও মধ্যযুগীয় অবনত কৃষিপ্রথাকে আশ্রয় করিয়াই দিনাতিপাত করিতেছি।

কৃষির তুলনায় শিল্প-বাণিজ্য অধিকতর লাভজনক

ভারতের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ দেশের শিল্পসম্প্রসারণের পক্ষে খুবই অনুকূল। অথচ ভারতবর্ষের শিল্পপ্রগতির ইতিহাস মোটেই গৌরবদীপ্ত নয়। কবে সেই আঠারো শতকের শেষদিকে বিদেশী যন্ত্র-শিল্পের প্রতিযোগিতায় আমাদের কুটীরশিল্পগুলি একে একে বিনষ্ট হইয়া গেল, আর উনিশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ ভারতে সবেমাত্র গোড়াপত্তন হইল যন্ত্রশিল্পের। মাঝখানে এই যে সুদীর্ঘকালের ব্যবধান, এ সময়টিতে ইংরেজ বণিকদল ইংলণ্ডের শিল্পজাত পণ্য ভারতবর্ষে চড়া দরে বিক্রয় করিয়াছে এবং ভারতের কাঁচামাল কিনিয়া স্বদেশে চালান দিয়াছে। শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের অনগ্রসরতার জন্যই বিদেশী কর্তৃক এভাবে দেশের সম্পদশোষণ সম্ভব হইয়াছে।

ভারতের শিল্পোন্নতির ইতিহাস গৌরবব্যঞ্জক নয়

উনিশ শতকের শেষাবধি একমাত্র তূলাশিল্প, পাটশিল্প, এবং কিছু কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিশ শতকের প্রথম দিকে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে দেশীয় শিল্প খানিকটা প্রসারলাভ করিয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতি অতিশয় মন্থর, সুতরাং সন্তোষজনক নয়। ইতোমধ্যে দেশে অবশ্য কয়লা, তেল, চা, বস্ত্র প্রভৃতি শিল্পের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কিন্তু একমাত্র বস্ত্রশিল্প ছাড়া অন্যান্য শিল্পগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে বিদেশী মূলধনে। তবে ১৯১১ সালে জামসেদপুরে ভারতীয় মূলধনে যে প্রকাণ্ড লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা আমাদের শিল্পইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা।

প্রথম-মহাযুদ্ধের সময় কতকগুলি পুরাতন শিল্পই প্রসারলাভ করিয়াছিল এবং লাভবান হইয়াছিল। সে সময় যে-সামান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল সেগুলি ১৯১৮ সালের পর বিদেশী শিল্পপ্রতিযোগিতার মুখে পড়িয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। ১৯১৭ সালে শিল্পকমিশনের কতকগুলি নির্দেশ ও সুপারিশ

ভারতে শিল্পপ্রসারের খুবই অনুকূল ছিল। কিন্তু ওই সুপারিশ তদানীন্তন ভারত-সরকার গ্রহণ করেন নাই। ১৯১৯ সালে যে-শাসনসংস্কার হয়, তাহাতে শিল্পোন্নয়নের দায়িত্বভার প্রাদেশিক সরকারের উপর অর্পিত হইয়াছিল। কিন্তু কোনো প্রাদেশিক সরকারের পক্ষেই শিল্পপ্রসারের ব্যাপক পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করিয়া তোলা যে সম্ভব নয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। অবাধ-বাণিজ্যনীতি এতকাল দেশীয় শিল্পের উন্নতির বিরোধিতা করিয়াছে। ১৯২১ সালের পর সরকার কর্তৃক যখন বিবেচনামূলক শিল্পসংরক্ষণনীতি [Discriminating protection] অনুসৃত হইল, প্রকৃতপক্ষে তখন হইতেই ভারতে সত্যকার শিল্পপ্রসার ঘটিতে থাকে। বস্ত্রশিল্প, চিনিশিল্প, কাগজশিল্প, লৌহ ও ইস্পাতশিল্প এসময় প্রসার লাভ করে।

প্রথম মহাযুদ্ধ ও ভারতীয় শিল্প : শিল্পসংরক্ষণনীতি

১৯৩৯ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধে এবং ভারতবর্ষ ইহাতে লিপ্ত হইয়া পড়ে, তখন শিল্পপণ্য-উৎপাদন-বিষয়ে ভারতের অসহায়তার রূপটি নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯১৮ হইতে ১৯৩৯ সালের মধ্যেও দেশে আমরা যথোপযুক্ত যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে পারি নাই বলিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে আমাদিগকে ভোগ্যপণ্য, রাসায়নিক দ্রব্য, কলকব্জা, কাগজপত্র, ঔষধ ইত্যাদি সামগ্রীর ব্যাপারে বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। যাহা হোক, বিগত যুদ্ধের সুযোগে দেশে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এত বড়ো দেশের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনের তুলনায় এই উন্নতিকে মোটেই সন্তোষজনক বলা চলে না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ভারতীয় শিল্প

শিল্পের উন্নয়ন ব্যাপারে আমাদিগকে নানাদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। মূলধনসরবরাহ, বৈদ্যুতিক শক্তির বিকাশ, উন্নত পরিবহনব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলি শিল্পসম্প্রসারণ-সমস্যার সঙ্গে জড়িত। বলিষ্ঠ জাতীয় পরিকল্পনার সহায়তায় এই সমস্যাটির সমাধান করা যাইতে পারে। জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ শিল্পসম্প্রসারণের কাজে কিছুটা সাহায্য করিবে। কিন্তু এই ব্যক্তিগত মূলধন দেশের বিরাট শিল্পপরিকল্পনার বাস্তব কার্যকরিতার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যানবাহন, বিদ্যুৎশক্তি-উৎপাদন ও বৃহদায়তন শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য বৎসরে যদি এক-শ' হইতে দেড়-শ' কোটি টাকা খরচ করিতে হয়, তাহা হইলেও ভারতের পুনর্গঠন ব্যাপারে প্রচুর বিদেশী মূলধনের প্রয়োজন হইবে। বৈদেশিক অর্থ আমদানীর

জাতীয় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

ক্ষেত্রে জাতীয় সরকারের খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন; এবং দেখিতে হইবে, ঐ বিদেশী ঋণের জন্য বার্ষিক নির্দিষ্ট সুদ ব্যতীত অপর কোনো সুযোগ-সুবিধা ঋণদানকারীদের যেন কখনও দেওয়া না হয়। দেশীয় শিল্পগুলিতে মূলধন-বিনিয়োগের সূত্রে আমাদের রাজনীতিক ও আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রটি যেন পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীর বিহারভূমি হইয়া না ওঠে।

জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে তথাকার সরকার শিল্পোন্নতির জন্য প্রভূত অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন, নবপ্রবর্তিত শিল্পের অংশ ক্রয় করেন এবং বিবিধ অত্যাবশ্যক শিল্পে মূলধন নিয়োগ করেন। সে-সব দেশে কুটীরশিল্পগুলিকেও সরকারী অর্থসাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে। শিল্পোন্নয়নের জন্য জার্মানী-জাপান-ইংলণ্ডে কতকগুলি বিশেষ রকমের ব্যাঙ্কব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই ব্যাঙ্কগুলি অল্পসুদে সেখানকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দান করিয়া থাকে। ভারতবর্ষেও এ জাতীয় শিল্পব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে। ব্যাঙ্কের উন্নতি না হইলে দেশের শিল্পোন্নতি ঘটিতে পারে না।

শিল্পব্যাঙ্কস্থাপন

যানবাহন চলাচলের সুব্যস্থার উপর শিল্পপ্রসার অনেকখানি নির্ভরশীল। আমরা দেখিয়াছি, ১৮৮০ সালে ভারতে রেলপথ নির্মিত হইবার পর সূতা, পাট, কয়লা প্রভৃতি শিল্প প্রসারলাভ করিতে থাকে। বর্তমানে ভারতে রেলপথের দৈর্ঘকে সহজেই দ্বিগুণ বর্ধিত করা যায়। পাকারাস্তার ব্যবস্থাও এদেশে উন্নত নয়। ভারতবর্ষে এখনও হাজার হাজার পল্লীগ্রাম রহিয়াছে যেখানে কোনো যানবাহন চলাচল করে না; ইহাদের সঙ্গে রেল, মোটর কিংবা গরুর গাড়ীর সম্পর্ক আজ পর্যন্ত স্থাপিত হয় নাই। রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি প্রভৃতি এদেশে নির্মিত হইলে আভ্যন্তরীণ চলাচলের মাশুলও কমিতে বাধ্য—ভারতে ইহাদের নির্মাণ সম্ভব। শিল্পের উন্নতিবিধানের জন্য রাষ্ট্রকে এদিকে দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে। অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নত হইতে হইলে দেশে জাহাজশিল্প প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। ভারতের উল্লেখযোগ্য পণ্যবাহী নৌবহর নাই। এখানে অবশ্য উল্লেখ করা যাইতে পারে, সম্প্রতি আমাদের দেশে মোটরগাড়ি-কারখানা ও রেলইঞ্জিন-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ, সে কথা কাহাকেও বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

পরিবহনব্যবস্থা উন্নত করিতে হইবে

বৈদ্যুতিক-শক্তি-বিকাশের প্রয়োজনীয়তা আমাদের খুব বেশী। কয়লা এবং জল হইতে বিদ্যুৎশক্তি আহরণের ব্যবস্থা একমাত্র রাষ্ট্রই করিতে পারে। মহীশূর,

বোম্বাই, মাদ্রাজ, কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে বিগত কয়েক বৎসরে জলীয় বৈদ্যুতিক শক্তির যথেষ্ট বিকাশ হইয়াছে। আসাম, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশেও বিদ্যুৎশক্তি-উৎপাদনের প্রভূত সুযোগ-সম্ভাবনা রহিয়াছে। অল্প-ব্যয়ে বিদ্যুৎশক্তি-সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইলে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ও কৃষিকার্যের জন্য কূপ হইতে জল উত্তোলন প্রভৃতি কার্য সহজ হইয়া উঠিবে। তখন অধিক ব্যয়ে তেলের ইঞ্জিন ব্যবহার করিতে হইবে না, অন্যদিকে এই শক্তির সহায়তায় ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদনও বাড়িয়া যাইবে।

বিদ্যুৎশক্তি

রাষ্ট্র যদি সত্যই দেশের দ্রুত শিল্পোন্নতি কামনা করে, তবে সুপরিচিত পরিকল্পনা অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের শিল্পসম্প্রসারণ-বিষয়ক আরও কতকগুলি সমস্যা রহিয়াছে। উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যে সমতা রক্ষিত না হইলে জনসাধারণের আর্থিক জীবনে সচ্ছলতা আসিতে পারে না। অসম ধনবণ্টনের ফলে ধনী মালিক অধিকতর ধনশালী হইয়া উঠে, আর দরিদ্র শিল্পশ্রমিক ক্রমাগত কঠোর দারিদ্র্যের সম্মুখীন হইতে থাকে। সুতরাং অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন জাতির দুঃখদুর্দশা সম্পূর্ণ বিদূরিত করিতে পারিবে না। কায়েমী স্বার্থ [Vested Interest] যাহাতে দরিদ্রের শোষণযন্ত্র হইতে না পারে, সে-বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। ধাতু, যন্ত্রপাতি, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভারী রসায়ন প্রভৃতি শিল্পকে—এক কথায়, মূল শিল্পগুলিকে [Key Industry] রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে হইবে। অবশ্য এসব শিল্পে ব্যক্তিগত মূলধনবিনিয়োগে কোনো বাধা থাকিবে না। জনকল্যাণ-মূলক শিল্পগুলির জাতীয়করণ আমরা সমর্থন করি। আমাদের মূল বক্তব্য হইল, শিল্পের ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসায় যেন সমাজবিরোধী হইয়া না উঠে। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও শিল্পের লভ্যাংশবিষয়ে রাষ্ট্রকে নূতন নূতন আইন প্রণয়ন করিতে হইবে।

অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন দেশের দারিদ্র্য দূর করিতে পারিবে না

খুবই বিবেচনা ও সতর্কতার সহিত শিল্পের এলাকা [Location of Industry] বাছিয়া লইতে হইবে। মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে শিল্পগুলি কেন্দ্রীভূত হইলে দেশের আর্থিক উন্নতি অসম হইতে বাধ্য। এজন্য আমরা শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ [Decentralisation] অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করি। শিল্পের আঞ্চলিক বণ্টন [Regional Distribution] যদি করা যায় তবে স্বাভাবিকভাবেই দেশের

শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ ও আঞ্চলিক বণ্টন

আর্থিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হইয়া উঠিবে। চালু শিল্পগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে শ্রমিক ও শ্রমিকসংঘের কতখানি অধিকার থাকিবে, রাষ্ট্রকে তাহারও একটা সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতে হইবে। ইহা করা হইলে আমাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি অবিরত ধর্মঘটের হাত হইতে মুক্তি পাইবে এবং ইহাতে জনসাধারণের অসুবিধাও দূর হইবে।

কুটীরশিল্প যন্ত্রশিল্পের অনুপূরক হইবে

এখানে কুটীরশিল্প সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলিবার আছে। বৃহদায়তন শিল্প ও কুটীরশিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান একান্ত প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন, যন্ত্রশিল্প কুটীরশিল্পকে ধ্বংস করিবে। কিন্তু এ ধারণা সত্য বলিয়া মনে হয় না। কুটীরশিল্প ও যন্ত্রশিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব দূর করিয়া সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। আমাদের ধারণা, এমন একটি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, যেখানে কুটীরশিল্পগুলি যন্ত্রশিল্পের অনুপূরক হিসাবেই কাজ চালাইয়া যাইবে। দেশের কুটীরশিল্পগুলিকে কিছুতেই অবহেলা করা চলিবে না। গ্রামীণ আর্থিক ব্যবস্থায় কুটীরশিল্পের স্থান খুব উঁচুতে, এবং ইহাদের বিলুপ্তি জনসাধারণের আর্থনীতিক জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে, একথা অবধারিত সত্য। কুটীরশিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য প্রাদেশিক সরকারের অর্থসাহায্য প্রয়োজন। এইসব শিল্প যাহাতে অল্পমূল্যে কাঁচামাল পায় এবং শ্রমিকরা যাহাতে শিল্পজাত পণ্য বাজারে উচিত মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে, সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

উপসংহার

বর্তমানে কৃষিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে-অগণিত লোক নিযুক্ত রহিয়াছে তাহাদিগকে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে বণ্টন করিয়া দিতে না পারিলে আমাদের জীবনযাত্রার মান উঁচু হইবে না, দেশের শোচনীয় দারিদ্র্য ঘুচিবে না। আমরা আশা করি, স্বাধীন ভারত-সরকার শিল্পসম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তাঁহাদের সকল শক্তি নিয়োগ করিবেন। সুখের বিষয়, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পখাতে বহু কোটি টাকা ব্যয় ধার্য হইয়াছে। ইহাতে ভারতীয় শিল্পের লক্ষণীয় উন্নতি ঘটিবে, এরূপ আশা পোষণ করা বোধ করি অন্যায় হইবে না।

স্বাধীন ভারতে নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

[**রচনার সংকেতসূত্র** : নাগরিক বলিতে কী বুঝায়—নাগরিক অধিকার—অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত—রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য—রাষ্ট্রকে সুপরিচালিত করিবার দায়িত্ব—নাগরিকের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য—সুনাগরিকের মহান আদর্শ—কী করিলে সুনাগরিক হওয়া যায়—বিভিন্ন রাজনীতিক দল ও গণতন্ত্র—দলগত সংকীর্ণতা সর্বথা পরিত্যাজ্য—জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা—ভারতীয় রাষ্ট্রের নাগরিকদের বিরাট দায়িত্ব ও বহুবিধ কর্তব্য—উপসংহার।]

'নাগরিক' কথার অর্থ

নাগরিক কথাটির সাধারণ অর্থ হইতেছে নগর-অধিবাসী। কিন্তু এই শব্দটির পারিভাষিক বিশেষ একটি অর্থ আছে। রাষ্ট্রের নানা ব্যবস্থায় যাহার অংশগ্রহণের অধিকার আছে, পৌরবিজ্ঞানে একমাত্র তাহাকেই নাগরিক বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই পৌর-অধিকার বা নাগরিক অধিকার প্রত্যেক সভ্যদেশের সামাজিক মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষিত শ্রেষ্ঠ একটি সম্পদ। পৌরঅধিকার হইতে বঞ্চিত মানুষের জীবন নানাভাবে বিড়ম্বিত। আমরা সভ্য মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া রাষ্ট্রপ্রদত্ত কতগুলি সুযোগসুবিধা ও অধিকার ভোগ করিয়া থাকি। এই সুযোগসুবিধাগুলি দেওয়া হয় নিরুদ্বেগ জীবনযাপনের জন্য, আমাদের আত্মবিকাশসাধনের জন্য। উক্ত অধিকারই পৌরঅধিকার—রাজ-নীতিক অধিকার। রাষ্ট্র আমাদিগকে জীবনরক্ষণের অধিকার দিয়াছে—সম্পত্তিভোগ, সংস্কৃতি ও ভাষা-সংরক্ষণের অধিকার দিয়াছে—ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, আপন আপন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিয়াছে—স্বাধীনভাবে কর্মসম্পাদন ও শিক্ষালাভের অধিকার দান করিয়াছে। এই সকল পৌরঅধিকার ছাড়া রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যেক নাগরিকের কতগুলি রাজনীতিক অধিকারও স্বীকৃত হইয়াছে। এইগুলি হইতেছে—ভোটাধিকার, সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার, সরকার কিংবা আইনসভার নিকট আবেদন বা আর্জি পেশ করিবার অধিকার। যে-রাষ্ট্র নাগরিকদের যত বেশী অধিকার স্বীকার করে, সেই রাষ্ট্রকেই আমরা তত প্রগতিশীল বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকি।

নাগরিক অধিকার ও নাগরিকের দায়িত্ব

এইবার আমাদের বুঝিতে হইবে, অধিকারসম্ভোগ, এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য-বোধ পরস্পর অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যেখানে অধিকার সেখানেই দায়িত্ব ও কর্তব্য, ইহাদের কোনো-একটিকে অন্যটি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা চলে না। রাষ্ট্র আমাকে অধিকার দিয়াছে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করার—অপর-সব নাগরিকের কর্তব্য হইতেছে আমার সেই অধিকার ক্ষুণ্ণ না করা। আবার, আমাকেও দেখিতে হইবে,

আমার কোনো কার্যকলাপে অন্যের ন্যায্য অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হইতেছে কিনা। এ গেল নাগরিকের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য। অন্যদিকে, রাষ্ট্রের প্রতিও প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য রহিয়াছে। রাষ্ট্র নাগরিকগণকে যে-সব অধিকার দিয়াছে, তাহার জন্য রাষ্ট্রকে নাগরিকদের কিছুটা মূল্য অবশ্যই দিতে হইবে। বিনামূল্যে, বিনা-কর্তব্য-সম্পাদনে ও বিনাদায়িত্বপালনে কোনো অধিকারই ভোগ করা যায় না।

প্রথমে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা যাক্। যে-রাষ্ট্র কর্তৃক আমাদের মৌলিক অধিকারগুলি স্বীকৃত হইয়াছে, উহার প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য স্বীকার করা আমাদের সকলের সর্বপ্রথম কর্তব্য। যে-রাষ্ট্রকে আমরা স্ব-ইচ্ছায় গড়িয়া তুলিয়াছি, সেই রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার কর্তব্য ও দায়িত্ব আমাদেরই। বিদেশীয় আক্রমণ হইতে আপন রাষ্ট্রকে প্রাণের বিনিময়ে হইলেও রক্ষা করিতে হইবে নাগরিককে। দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার জন্যই রাষ্ট্র আইন রচনা করে। সরকারপ্রণীত যে-আইন জন-কল্যাণের বিরোধী নয়, নত মস্তকে সে আইন প্রত্যেক নাগরিকের মানিয়া চলা উচিত। অবশ্য যে-আইন জনস্বার্থের বিরোধী তাহাকে বিধিসম্মতভাবে সর্ব-প্রকারে বাধা দিয়া সংশোধিত করিবার প্রচেষ্টা করিতে হইবে। শাসনযন্ত্র-পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক যে-কর ধার্য হয়, সকল নাগরিকের কর্তব্য হইতেছে, সেই কর যথাসময়ে প্রদান করা। নতুবা রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো শাসন-কার্যই সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হইতে পারে না।

রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব

ভোটদানের অধিকার সুসভ্য আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকগণের খুব বড়ো একটা অধিকার। বিচারযুক্তিসহ সকলের এই পরম বাঞ্ছিত অধিকারটিকে নির্বাচনকালে ব্যবহার করার দায়িত্ব সত্যই গুরুতর। ভোটদানের অধিকারী নাগরিকের কর্তব্য হইতেছে, যথার্থ গুণী ও উপযুক্ত নির্বাচনপ্রার্থীকে ভোট দেওয়া। ভোটাধিকার-ব্যবহারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। কেন-না, নাগরিকের ভোটের সহায়তায় যদি অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সরকার গঠিত হয়, তাহা হইলে শাসনকার্য ভালরূপে চলিতে পারে না—ইহাতে জনস্বার্থ পদে পদে ক্ষুণ্ণ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কেন্দ্রস্থলে থাকিবে জনসেবা, দেশসেবা ও রাষ্ট্রের সেবা। ভারতবর্ষ আজ বিদেশীর শাসনশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া তাহার চিরঅভীপ্সিত স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রকে সর্বপ্রকারে উন্নত করিয়া তুলিয়া দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের দায়িত্বভার বর্তমানে

আমাদের উপরই বর্তাইয়াছে। ব্রিটিশ-আমলে ভারতবাসী তাহার ন্যায্য পৌর-অধিকার ভোগ করিতে পারে নাই—বিদেশী শাসকের হাতে তাহার ব্যক্তি-স্বাধীনতা পদে পদে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বহুবিধ নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল বলিয়া ভারতের মানুষ এতকাল দুঃসহ গ্লানির মধ্য দিয়া দিন অতিপাত করিয়াছে। এখন রাষ্ট্রপরিচালনার সকল ভার পড়িয়াছে ভারতবাসীর উপর। সুতরাং বলিতে হইবে, রাষ্ট্রকে সুপরিচালিত করিবার দায়িত্ব আমরাই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছি। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র মানুষের গণতন্ত্রসম্মত সকল মৌলিক অধিকারকে সানন্দে স্বীকৃতি জানাইয়াছে। এই অধিকারগুলি যাহাতে রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষ নিরুপদ্রবে ভোগ করিতে পারে, ইহাদের সহায়তায় যাহাতে প্রত্যেক নাগরিক আত্মবিকাশসাধন করিতে পারে, সেদিকে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা কর্তব্য। নিজের অধিকার ও স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিব, পরের অধিকার ও স্বাধীনতাকে কখনো ক্ষুণ্ণ করিব না, ক্ষুদ্রস্বার্থ বিসর্জন দিয়া রাষ্ট্রের বৃহত্তর কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ করিব—এই প্রতিজ্ঞাই আজ প্রতিটি ভারতবাসী যেন অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করে।

রাষ্ট্রকে সুপরিচালিত করিতে হইবে

প্রত্যেক ভারতবাসীকে সুনাগরিকের মহান আদর্শের পথে চলিতে হইবে। ইহার জন্য চাই বিচারবুদ্ধির স্ফুরণ, আত্মকেন্দ্রিক মনোবৃত্তির দমন, অজ্ঞতা, উদ্যমহীনতা ও সংকীর্ণ দলাদলি বর্জন এবং আত্মবিকাশের সহায়ক শিক্ষার্জন। নাগরিকদের শিক্ষা ও বিচারবুদ্ধি যদি সদাজাগ্রৎ থাকে, তাহা হইলে সুনিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা সহজ হইয়া পড়ে—শাসনতন্ত্রের পরিচালনায় অযোগ্য ব্যক্তির স্থান হয় না। আত্মদমন করিতে না পারিলে, স্বার্থপরায়ণতা বিসর্জন দিতে শিক্ষা না করিলে রাষ্ট্রে সর্বসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণ কখনো আসিতে পারে না। সুনাগরিককে সর্বথা সর্বপ্রকার মানসিক জড়তা ও উদ্যম-হীনতা পরিহার করিতে হইবে, নিজের স্বাধীনতা সম্পর্কে সতত সতর্ক থাকিতে হইবে, রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। অপরে করিবে, এই কাজটি আমার না করিলেও চলে—এইরূপ মনোবৃত্তি নিজের তথা সমগ্র দেশের অকল্যাণ ডাকিয়া আনে। স্বাধীনতাস্পৃহার অভাব ঘটিলেই শাসনতন্ত্র পরিচালকগণ নাগরিকের অধিকারের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়েন, ফলে কখনো কখনো সরকার স্বৈরাচারী পর্যন্ত হইয়া উঠেন। আপনার কর্তব্যকর্মে নাগরিকের উদাসীনতাই ব্যক্তিস্বাধীনতার অপমৃত্যুর কারণ।

সুনাগরিকের মহান আদর্শ

রাজনীতিক দল না থাকিলে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না সত্য, কিন্তু দলীয় আদর্শের নামে সংকীর্ণ দলাদলি নাগরিকরা অবশ্যই বর্জন করিবে। আত্মকলহ জাতির অপঘাতমৃত্যুর হেতু হইয়া দাঁড়ায়। স্বার্থপরতা ও দলগত সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া চলা আমাদের প্রধান কর্তব্য। আমরা সর্বশক্তি লইয়া সমাজসেবা করিব, দেশসেবা করিব। তবে মনে রাখিতে হইবে, আমাদের দেশপ্রেম যেন উগ্ররূপ ধারণ করিয়া অপর দেশের স্বাধীনতাহরণে মাতিয়া না উঠে। প্রতিমুহূর্তে আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, আমরা শুধু ভারতের অধিবাসী নই, আমরা বিশ্বসমাজেরও অধিবাসী। তাই জাতীয়তাকে ক্রমশ আন্তর্জাতিকতার দিকে পরিচালিত করাই নাগরিকের একটি মহৎ আদর্শ হওয়া উচিত।

গণতন্ত্র ও বিভিন্ন রাজনীতিক দল

ভারতীয় রাষ্ট্রের নাগরিকদের সম্মুখে আজ বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্য রহিয়াছে। প্রায় দুইশত বৎসর ভারতবর্ষ শাসনের পর সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ জাতি বাধ্য হইয়া এদেশ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা পিছনে রাখিয়া গিয়াছে মহাশ্মশানের ভগ্নস্তূপ। অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অবিশ্বাস্য দুঃখদারিদ্র্যের গভীরে ভারতবাসী আজ নিমজ্জমান। হিন্দুমুসলমানের আত্মঘাতী কলহ দেশের সংহতিশক্তিকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্যবশত অখণ্ড ভারতবর্ষ আজ দ্বিধাবিভক্ত। মানুষের অপরিমিত লোভ আর স্বার্থান্ধতা কোটি কোটি মানুষকে আজ মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। এই যে ভয়াবহ প্রতিকূল পরিস্থিতি, ইহার বিরুদ্ধে ভারতের সকল নাগরিককে সংগ্রাম করিতে হইবে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দুঃখদারিদ্র্য বিদূরিত করিয়া ভারতকে জগতের শ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে। সেজন্য আমাদের প্রত্যেকের সুনাগরিকের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলা একান্ত কর্তব্য। এতদিনের সংগ্রামের পর যে-স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি, আমাদের অশুভ বুদ্ধি যেন তাহার শত্রু হইয়া না দাঁড়ায়। নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ পালন করিতে পারিলে আমরা স্বাধীন জাতির মহান গৌরব কখনও হারাইব না।

স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকের দায়িত্ব বিরাট

ছাত্রসম্প্রদায় ও রাজনীতি

[**রচনার সংকেতসূত্র** ঃ ছাত্রসমাজের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান-ব্যাপারের সপক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন মত—অতীত ও বর্তমান ভারতের সমাজজীবনের পটভূমিকা—সেকালের নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা—ছাত্রদের কাছে অধ্যয়ন তপস্যাস্বরূপ ছিল—সমাজজীবনের দ্রুত রূপান্তর—রাজনীতির ঝড়ো-হাওয়া ছাত্রদলকে স্পর্শ করিয়াছে—ছাত্রআন্দোলন ও রাজনৈতিক চেতনা—সমাজসেবা, জনসেবা, দেশসেবা—দেশের সেবাকার্য ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক কতখানি—ছাত্রজীবন জ্ঞানার্জন ও চরিত্রগঠনের প্রশস্ত সময়—রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্রসম্প্রদায় কীরূপ অংশ গ্রহণ করিবে—স্বাধীন ভারতে ছাত্রদলের দায়িত্ব—উপসংহার।]

ছাত্রদল রাজনীতিতে যোগ দিবে কিনা : বিভিন্ন মত

রাজনীতিচর্চা এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্রসমাজের সক্রিয় অংশ গ্রহণের ঔচিত্য-অনৌচিত্য-বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন মত পোষণ করেন। সত্যই বিষয়টির সপক্ষে ও বিপক্ষে নানাবিধ যুক্তিতর্কের অবতারণা করা চলে। একশ্রেণীর ব্যক্তি অভিমত প্রকাশ করেন, ছাত্রজীবন অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনেরই প্রশস্ত ক্ষেত্র—রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া ছাত্রদলের বিভ্রান্ত হওয়া সমর্থনযোগ্য নয়। আবার, আর-একদল চিন্তানায়ক বলেন, রাজনৈতিক চেতনা আজ রাষ্ট্রের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আর্থনীতিক প্রতিক্রিয়া সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সকল মানুষকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। বর্তমানের ছাত্রসম্প্রদায়ও সামাজিক মানুষ, সুতরাং রাজনীতিচর্চা হইতে তাহারা দূরে সরিয়া থাকিতে পারে না—আধুনিক জগতে কেবল গ্রন্থকীট হইয়া পড়িয়া থাকা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

অতীত ও বর্তমান ভারতের সমাজজীবন

অতীত দিনের ভারতবর্ষে ছাত্রদল অধ্যয়নকে কঠোর তপস্যারূপেই গ্রহণ করিয়াছিল। তখন সমাজে বিরাজ করিত নিরুপদ্রব শান্তি—সর্বগ্রাসী আর্থিক চিন্তা মানুষের জীবনকে বিব্রত করিয়া তুলিত না, দুষ্ট রাজনীতির আবর্তসংকুল প্রবাহ সমাজের স্তরে স্তরে মারাত্মক চোরাবালি সৃষ্টি করিত না। তাই সে-যুগে ছাত্রদের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জন বাধাগ্রস্ত ছিল না। গুরুগৃহে, বিদ্যানিকেতনে যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করার পর সেকালের ছাত্রদল অতি

সহজভাবেই সংসারজীবনে প্রবেশ করিয়া আপন আপন কর্তব্য নিশ্চিন্ত মনে পালন করিত। কিন্তু সেকাল আর একালের মধ্যে অনেক পার্থক্য। বর্তমানের সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাজনীতিক্ষেত্রে দ্রুত রূপান্তর সমাজিক মানুষকে সজোরে নাড়া দিতেছে—শ্রেণী-সংগ্রামের ঝড়োহাওয়ায় বর্তমানে দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিতেছে। সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যয়নের জন্য উৎসর্গাকৃত ছাত্রসম্প্রদায়ের মানসলোকেও তাই আজ এক নবতন প্রাণচেতনা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। সেজন্য বর্তমানের ছাত্রদল গ্রন্থের জগৎ হইতে ক্ষণে ক্ষণে বহির্জগতে তাহাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া ধরিতেছে। জীবনচেতনা যাহার আছে, যুগধর্মকে সে অস্বীকার করিতে পারে না।

একথা স্বীকার্য যে, ছাত্রসম্প্রদায় আজ দেশের বিভিন্ন রাজনীতিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানের ছাত্র-আন্দোলনকে বৃহত্তর রাজনীতিক ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা চলে না।

বর্তমান রাজনীতিক পরিস্থিতি ও ছাত্রসমাজ

যেখানে অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারীর স্পর্ধা মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, সেখানেই দেশের যুবশক্তি তাহার সকল শক্তিসামর্থ্য লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে জনসমাজের প্রতি কর্তব্যবোধহেতু—তাহারা নীরবে অনাচার-অত্যাচার বরদাস্ত করিতে পারিতেছে না। রাষ্ট্রের আর্থনীতিক আবহাওয়া এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনীতিক প্রতিক্রিয়াশীলতা এরূপ পরিস্থিতির জন্য যে কিছুটা দায়ী, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ' মন্ত্রটিকে এ যুগের ছাত্রদল অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে পারিতেছে না বলিয়া তাহাদের অভিভাবক, বহু শিক্ষাবিদ্ এবং দেশনেতা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন সত্য, কিন্তু এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য ছাত্রসম্প্রদায়ের উপর সকল দোষ চাপাইয়া দেওয়া কতখানি সমীচীন, তাহা সত্যই চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এই দ্রুত পটপরিবর্তনের যুগে ছাত্রদল যে রাজনীতির সম্পর্ক হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না, একথা স্বীকার করিয়া

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্রুত পটপরিবর্তন

লইয়াই ছাত্রসমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে আমাদের অভিমত এখানে ব্যক্ত করিতেছি। শুধু গ্রন্থের জগতে নিবদ্ধ থাকিয়া নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানার্জনই ছাত্রসম্প্রদায়ের একতম আদর্শ ও কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি না। ছাত্রদলকে সমাজের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে জীবন ও জগৎকে নূতন করিয়া যাচাই করিয়া লইবার

সামর্থ্য অর্জন করিতে হইবে ; সমাজসেবা, জনসেবা, দেশসেবায় তাহাদিগকে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এই সকল সেবাকার্যের সঙ্গে যে জটিল রাজনীতির একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে, তাহার সীমারেখাটিও ছাত্রদিগকে চিনিয়া লইতে হইবে। রাজনীতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলেই দেশের প্রতি সকল কর্তব্য শেষ হইয়া যায় না। রাষ্ট্রকে, দেশকে, সমাজব্যবস্থাকে উন্নত ও সর্বপ্রকার কলঙ্কমুক্ত করিয়া তুলিতে হইলে এমন সহস্র সহস্র মানুষের প্রয়োজন—যাহারা জ্ঞানে, চিন্তায়, বুদ্ধিতে, চরিত্রবলে যথার্থই শক্তিমান।

ছাত্রদলই দেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্যনির্মাতা

ভবিষ্যতের এই শক্তিমান মানুষ আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে বর্তমানের অগণিত শিক্ষার্থীর মধ্যেই। যে-দেশে রহিয়াছে অজস্র জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, চিন্তানায়ক, শিল্পী, সাহিত্যিক, কর্মী, সে-দেশকেই আমরা বলি উন্নত—অগ্রসর। আমাদের দৃষ্টিকেও সেদিকে প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে। জ্ঞানঅর্জন, চরিত্রগঠন, মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধন এবং দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিতির প্রশস্ত ক্ষেত্র হইল ছাত্রজীবন। এই অমূল্য ছাত্রজীবনকে উপেক্ষা করিয়া, ছাত্রধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া, রাজনীতির ঘূর্ণীপাকে প্রতিদিন আত্মনিমজ্জন করা যে বাঞ্ছনীয় নয়, নিবিষ্ট মনে একটু চিন্তা করিলেই ইহার সত্যতা ছাত্রসম্প্রদায় নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিবে। ছাত্রদের জীবনে রাজনীতিচর্চার স্থান আছে, কিন্তু রাজনীতিচর্চাকেই তাহারা যেন তাহাদের প্রধান কর্মকৃত্য বলিয়া মনে না করে। তাহারা আগে ছাত্র, পরে দেশসেবক—এই সত্যটি মনে রাখিলে, নানা বিশৃঙ্খলা ও উচ্ছৃঙ্খলতার হাত হইতে ছাত্রদল সহজেই মুক্ত হইতে পারিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

রাজনীতির ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করিতে হইলে দেশের আভ্যন্তরীণ গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসঞ্চয়ের প্রয়োজন আছে। লোকচরিত্র ও রাজনীতির অ, আ-শিক্ষাও লাভ করে নাই, এরূপ ছাত্র যদি রাজনীতিক আন্দোলনে নির্বিচারে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তাহা হইলে নিজের এবং দেশের কাহারও কল্যাণ সাধিত হয় না। সে-ক্ষেত্রে অমূল্য ছাত্রজীবনের অপচয়টাই শুধু বড়ো হইয়া উঠে, আর এই অপচয় জাতীয় জীবনে শোচনীয় ব্যর্থতাকেই ডাকিয়া আনে। শিক্ষা, সমাজ, বাস্তব জীবন ও রাষ্ট্রের সম্পর্কে বহুদর্শিতা লাভ না করিয়া রাজনীতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা আত্মহত্যারই সামিল।

ছাত্রদের চিত্ত সাধারণত ভাবাবেগপ্রবণ। অনেক স্বার্থান্বেষী দেশনেতা ছাত্রদলের এই ভাবপ্রবণতার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে আপন আপন দলগত

স্বার্থসিদ্ধির কাজে নিযুক্ত করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। ইহাতে দেশের রাজনীতি যেমন কলুষিত হইয়া উঠে, তেমনি ছাত্রেরাও উত্তেজনার মুহূর্তে তাহাদের উচ্চাদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হয়। বর্তমান কালের বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়গুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শিক্ষানিকেতনসমূহ আজ ধীরে ধীরে রাজনীতিক আন্দোলন ও সংকীর্ণ দলাদলির কেন্দ্র হইয়া উঠিতেছে। তুচ্ছ বিষয় লইয়া কথায় কথায় ধর্মঘটের আশ্রয় লওয়া ছাত্রদের যেন স্বভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, বিদ্যানুরাগ, শিক্ষাজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রসম্প্রদায় যে এখন নিতান্ত উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। দেশের এরূপ একটি অবস্থা কখনো বাঞ্ছনীয় নয়।

রাজনীতির ঝড়ো-হাওয়া ও ছাত্রসমাজ

বিদ্যানিকেতনে ছাত্রদের বিতর্কসভায় স্বদেশের ও বিদেশের রাজনীতিক অবস্থাবিষয়ে, জাতির বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা চলিতে পারে—সময়ে সময়ে শ্রদ্ধেয় ও খ্যাতিমান রাজনীতিবিদকে শিক্ষালয়ে আমন্ত্রণ জানাইয়া সারগর্ভ বক্তৃতার বন্দোবস্ত করাও যাইতে পারে। ইহাতে ছাত্রদের রাজনীতিক জ্ঞান বর্ধিত হয়, চিন্তার নানামুখী প্রসার সাধিত হয়, বক্তৃতা করিবার শক্তিসামর্থ্যও বাড়ে। জাতীয় জীবনে কোনো চরম মুহূর্ত না আসিলে, আমাদের মতে, ছাত্রদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করাই ভালো। ছাত্রশক্তি—যুবশক্তি—দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ। তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ উদ্বোধন ঘটিলে জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। বড়ো কাজ করিতে গেলে আগে তাহার অনুরূপ শক্তি অর্জন করা প্রয়োজন। সেইজন্যই তো কবিগুরু বলিয়াছেন: 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি'। পাঠ্যজীবনে ছাত্রসম্প্রদায়কে এই শক্তি—চরিত্রশক্তি, আত্মপ্রত্যয়শক্তি, জ্ঞানশক্তি, বিচারবুদ্ধির শক্তি—যথাসাধ্য অর্জন করিতে হইবে।

ছাত্রদল রাজনীতিতে কতখানি অংশ গ্রহণ করিবে

দেশ আজ স্বাধীন হইয়াছে, স্বাধীন ভারতে ছাত্রদলের দায়িত্ব ও কর্তব্য পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বাড়িয়া গেল। সর্ববিধ শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তাহারা মাতৃভূমির গৌরব বর্ধিত করিয়া তুলুক, ইহাই আমাদের অন্তরতর কামনা।

ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র

[রচনার সংকেতসূত্র : সমাজব্যবস্থার ক্রমপরিবর্তন—ধনতন্ত্রের পরিচয়—ধনতন্ত্রের ক্ষতিকর প্রভাব—ধনতন্ত্রের স্বরূপ—ধনতন্ত্রের দান—ধনতন্ত্রের অনিবার্য সংকট—সমাজতন্ত্রের পরিচয়—সমাজতন্ত্রের স্বরূপ—সমাজতন্ত্রী সমাজে উৎপাদন ও বণ্টন—সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—উপসংহার।]

॥ ১ ॥

ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র কথা-দুইটি একটা বিশেষ সময়ের বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থার নিরূপক। সেজন্য ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে হইলে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ইহাদিগকে দেখার প্রয়োজন আছে। সমাজতন্ত্র কিংবা ধনতন্ত্র, কোনোটাকেই মানুষ আপন হইতে সমাজের উপর আরোপ করে নাই। সামাজিক বিবর্তনের এক অবস্থাকে বলা হয় ধনতন্ত্র, এবং সেরূপ অন্য এক অবস্থাকে বলা হয় সমাজতন্ত্র।

সমাজব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন

সমাজে পরিবর্তন আসে সমাজেরই আভ্যন্তরীণ শক্তিনিচয়ের গতিপ্রভাবে, এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় সমাজ উন্নীত হয় ইহার স্বতঃবিকাশে। সমাজের এই অবস্থাগুলিই ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত হইয়াছে। সুতরাং ধনতন্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও স্বরূপলক্ষণ-নিরূপণ সম্ভব এই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উৎপত্তি, গতি ও পরিণতি-বিশ্লেষণ করিয়া। সেই রকম সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যাও নির্ভর করে সমাজতন্ত্রী সমাজের যথাযথ বিশ্লেষণের উপর।

প্রথমে আমরা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আলোচনা করিব। এই আলোচনার ভিতর দিয়া সমাজের রাষ্ট্রনীতিক ও সাংস্কৃতিক যে-চিত্র পাওয়া যাইবে, সেই সমগ্র রূপটিকেই ধনতন্ত্র-নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু সংকীর্ণভাবে বিচার করিলে ধনতন্ত্র শুধু একটি বিশেষ আর্থনীতিক ব্যবস্থাই নিরূপিত করে।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ইউরোপে রূপ পরিগ্রহ করে। ইহার পূর্বে সেখানে যে-সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল উহাকে সামন্ততন্ত্র আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বস্তু ছিল—

জমির উপর একটি বিশেষ শ্রেণীর একচেটিয়া অধিকার, রাজনীতি ও ধর্মীয় অনুশাসনের ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় মানুষগোষ্ঠীর একচ্ছত্র আধিপত্য। দেশের উৎপাদন, বণ্টন ও বাণিজ্য উপরি-উক্ত সম্প্রদায়ের লৌহশাসনের ফলে সুষ্ঠু বিকাশের পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এই লৌহপাশের ভিতর থাকিয়াও ধীরে ধীরে একটি নূতন শ্রেণী জন্ম নিল। প্রগতিশীল এই নবজাত শিল্পীসংঘের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফলে ধীরে ধীরে কয়েকটি বড়ো বড়ো দেশে সামন্তপ্রথার দুর্ভেদ্য দুর্গ ধূলিসাৎ হইয়া গেল। ফলে দেশের বাণিজ্য ও উৎপাদনে অবাধ অধিকার দেখা দিল, ভূমির উপর পূর্বের একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত হইল—অন্যদিকে দেখা দিল রাজনীতিক ক্ষমতার গণতান্ত্রিক প্রয়োগ। সামন্তপ্রথার আর্থনীতিক নানা বাধা দূর হওয়ার ফলে পুঁজির উদ্বৃত্ত দ্রুতবেগে বাড়িয়া চলিল। পুঁজির মালিক যাহারা তাহারা আর্থিক ক্ষেত্রটি দখল করিয়া নেওয়ার ফলে দেশের রাজনীতিক ক্ষমতাও তাহাদের আয়ত্তে আসিল। ধীরে ধীরে এই যে একটা নূতন সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হইল—ইহারই নাম ধনতন্ত্র।

ধনতন্ত্রের পরিচয়

ধনতন্ত্রের শুধু আর্থনীতিক দিকটা বিচার করিয়াও ইহার একটা সংজ্ঞা নিধারণ করা সম্ভব। ধনতন্ত্র হইতেছে সেই সমাজব্যবস্থা, যেখানে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি বা পুঁজির উপর রহিয়াছে ব্যক্তিগত অধিকার, এই উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রিত করে মালিকের ব্যক্তিগত লাভের হিসাব। সামন্তপ্রথার পূর্বেকার আর্থিক অনুশাসন দূরীভূত হইয়া যাওয়ার পর পুঁজির জয়যাত্রা সুরু হইয়াছিল, পুঁজির মালিক জমির মালিককে সর্ববিষয়ে পরাস্ত করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। ইহাতে ক্রমশ পুঁজির কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেশে ছোটছোট গৃহশিল্পের স্থানে বিরাট বিরাট কলকারখানা স্থাপিত হইল—কুটীরশিল্পীকে ধীরে ধীরে পথে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। ইহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কলকারখানায় দেখা দিল সহস্র সহস্র মজুর। সমাজব্যবস্থার এই পরিবর্তনধারাটির মধ্যে ধনতন্ত্রের মূল আর্থনীতিক সূত্রগুলি ধরা পড়ে।

ধনতন্ত্রের ক্ষতিকর প্রভাব

প্রথমত, ধনতন্ত্রে পুঁজির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকিবে, উহা যে-কোনো ভাবে পুঁজি নিয়োগ করিতে পারিবে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত মুনাফাই হইল পুঁজিনিয়োগের একমাত্র নিয়ামক। ধনতান্ত্রিক সমাজেউৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করে মুনাফার হিসাব, চাহিদার নয়। তৃতীয়ত, শ্রমিকশোষণের উপরই মুনাফার হার নির্ভর করে। কাজেই আর্থিক ক্ষেত্রে সমাজ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল, দেখা দিল দুইটি শ্রেণী—

ধনতন্ত্রের স্বরূপ

মালিক ও শ্রমিক। উৎপাদনের যন্ত্রপাতির উপর মালিকের একচ্ছত্র অধিকার, মালিক শ্রমিককে উৎপাদনযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয় তাহার কারখানায়। ফলে, দলে দলে মজুর শোষিত হয়, অন্যদিকে ধনিকশ্রেণীর লভ্যাংশও বিপুলভাবে বাড়িয়া যায়।

সামন্ততন্ত্রের পাশমুক্ত হইয়া ধনতন্ত্রের বিজয়রথ কয়েক দশক পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হইল। ধনতন্ত্রের সমাজকল্যাণপ্রসূ দান এ সময়েই দেখা যায়। শিল্পে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, ধর্মসংস্কারে, রাজনীতিক ক্ষেত্রে—সর্বত্রই একটা বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইল। আর্থিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, দেশের ঐশ্বর্য পুঁজিবাদীর প্রচেষ্টায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। কলকারখানা, রেললাইন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বিদ্যুৎ, স্টীমার, খনিজদ্রব্য-আহরণ, নানা বিস্ময়কর যন্ত্রের আবিষ্কার পুঁজিবাদীর প্রচেষ্টারই ফল। পূর্বতন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সহিত তুলনা করিলে এই একটি বিশেষ সময়ের ধনতান্ত্রিক সমাজকে প্রগতিশীল বলা যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যায়, দেশে একদিন ধনতন্ত্রের একটি বিকাশমুখী ঐতিহাসিক অধ্যায় ছিল।

ধনতন্ত্রের দান

কিন্তু ধনতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থাও ক্রমে বিপদের সম্মুখীন হইল। যে-আর্থিক ব্যবস্থার মূলভিত্তি মুনাফা, সেই ব্যবস্থা মুনাফার হারের হ্রাসবৃদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে বানচাল হইয়া যাইতে বাধ্য। কার্যত দেখা যায়, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজির ক্রমবর্ধমান হারের অবশ্যম্ভাবী ফল হইল মুনাফার বিলোপ ও ব্যবসায়-সংকট। এইজন্য নিশ্চিত বেকারসমস্যা ও দারিদ্র্য ধনতন্ত্রের সঙ্গে এক সময় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া পড়িতে বাধ্য।

ধনতন্ত্রের অনিবার্য সংকট

ধনতন্ত্রের ক্ষতিকর প্রকৃতি দেখা দিল ইহার দ্বিতীয় অধ্যায়ে—যখন ধনতান্ত্রিক বনিয়াদ আর্থিক সংকটের গভীর আবর্তের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইল। সেজন্য বর্তমানে ধনতন্ত্রের আর কোনো প্রগতিশীল দান পরিলক্ষিত হয় না। রাষ্ট্রে একনায়কত্ব, শিল্পে একচেটিয়া অধিকারবিস্তার, বাণিজ্যিক বিরোধ, বিজ্ঞানের কণ্ঠরোধ, সংস্কৃতির বর্বর রূপান্তর, স্বার্থবিস্তারের জন্য পুনঃপুনঃ সংগ্রাম ইত্যাদি ধনতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য বিশেষ উপায়রূপে দেখা দিয়াছে। এই কারণেই ধনতন্ত্র এখন ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার পরিপন্থী ও মানবসমাজের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

॥ ২ ॥

অপরদিকে, সমাজতন্ত্রকে বুঝিতে হইলে অনুরূপভাবে ইহার উৎপত্তি, গতি ও পরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ধনতন্ত্রকে যেমন সামন্তপ্রথার পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, সেইরূপ সমাজতন্ত্রকেও ধনতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে বিচার করাই বিজ্ঞানসম্মত। সামন্তপ্রথার মধ্যে যেমন নবজাত শিল্পীশ্রেণী প্রচলিত আইনকানুনের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছিল বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া, তেমনি ধনতন্ত্রের আবেষ্টনীতে জাত শ্রমিকশ্রেণীও আপন শ্রেণীস্বার্থের প্রেরণায় নূতন সমাজ, নূতন আর্থিক কাঠামো ও নূতন রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাস্থাপনে উদ্যোগী হইল রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়া।

সমাজতন্ত্রের পরিচয়

সমাজতান্ত্রিক সমাজে কতকগুলি বিশিষ্ট আর্থিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এরূপ সমাজে ভূমি, কলকারখানা, যানবাহন, খনিজদ্রব্য ইত্যাদি উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও বিবিধ সামগ্রীর উপর ব্যক্তিগত অধিকার বিলুপ্ত হইয়াছে। সেজন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রথম কর্তব্য—ব্যক্তিগত উৎপাদনের উপায়গুলিকে জাতীয় সম্পদে পরিণত করা। ব্যক্তিগত অধিকারলোপের সঙ্গেই দ্বিতীয় সূত্রটি আসিয়া পড়ে। তাহা হইল, দেশের সমস্ত সম্পদকে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদনে নিয়োগ। মুনাফার লোভে ব্যক্তি কিংবা সম্প্রদায় যেখানে নিজেদের মূলধন উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে পারে না, সেখানে উৎপাদন-ব্যাপারে দেশের সম্পদ নিয়োগ করার দায়িত্ব সমগ্র সমাজকেই গ্রহণ করিতে হয়। এজন্য কোন্ শিল্পে কত সম্পদ নিয়োজিত হইবে, এবং দেশের রক্ষাব্যবস্থার জন্য, জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য, ভবিষ্যৎ ধনোৎপাদন চালু রাখিবার ও উহার গতি বৃদ্ধি করিবার জন্য কীভাবে সমস্ত সম্পদকে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বণ্টন করা হইবে, তাহার সুচিন্তিত পরিকল্পনাও প্রয়োজন। সমগ্র সমাজের ব্যবহারের জন্য সমাজপরিকল্পিত উৎপাদনব্যবস্থারই নাম সমাজতন্ত্র।

সমাজতন্ত্রের স্বরূপ

সমাজের এই অবস্থায় প্রত্যেক মানুষকেই সাধ্যানুযায়ী সামাজিক উৎপাদনে সাহায্য করিতে হয়, এবং প্রত্যেকেই তাহাদের নিজ নিজ কর্ম ও সামর্থ্য অনুযায়ী পুরস্কৃত হয়। সমাজতন্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় বা সাম্যবাদী ব্যবস্থায় বণ্টনপ্রথার পরিবর্তন ঘটিবে বলিয়া সমাজতন্ত্রবাদিরা আশা করিয়া থাকেন। তখন প্রত্যেকেই আপন আপন প্রয়োজন অনুসারে উৎপাদিত সামগ্রী ভোগ করিতে পারিবে।

সমাজতন্ত্রী সমাজে উৎপাদন ও বণ্টন

সমাজতন্ত্রে শ্রমিকই রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করিয়া জনগণের কল্যাণে তাহা ব্যবহার করে। ইহাতে অর্থনীতি ও রাজনীতি উভয়ই ক্রমশ সমাজতন্ত্রী হইয়া উঠে।

রাশিয়ায় বিপ্লবের মধ্য দিয়া এই নূতন সমাজ জন্মলাভ করে। সমাজের ঐতিহাসিক পরিবর্তনধারা লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ধনতন্ত্রের মধ্যে যে-আত্মহত্যার বীজ নিহিত আছে, তাহারই ফলে একদিন তাহার মৃত্যু অনিবার্য হইয়া উঠে। দুঃখদারিদ্র্য, যুদ্ধবিগ্রহ ও ব্যবসায়-সংকটকে ধনতন্ত্রী সমাজ প্রতিরোধ করিতে পারে না। ইহার ফলে জনসাধারণ ও শ্রমিক-শ্রেণী ক্রমেই শোষিত হইয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়ে—শ্রমিকের মধ্যে দেখা দেয় প্রচণ্ড বিক্ষোভ। শ্রমিকরা যখন তাহাদের শক্তিকে সংহত করিয়া ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্র নিজেকে আর রক্ষা করিতে পারে না—ভাঙিয়া পড়ে। এভাবেই সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়।

সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি

সমাজতন্ত্রী সমাজে উৎপাদনযন্ত্রের উপর ব্যক্তিগত অধিকার না থাকায় এবং মুনাফার লোভে পণ্যউৎপাদন নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায়, সেখানে শ্রমিকের শোষণ নাই, দারিদ্র্য নাই, বেকারসমস্যা নাই, বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা নাই। এই সমাজ মানুষকে মানুষ-হিসাবে বাঁচিবার অধিকার দান করিয়াছে। শ্রেণীসংঘর্ষ ইহাতে বিলুপ্ত-প্রায়। একদিকে প্রাচুর্য, অন্যদিকে জনগণের দারুণ অভাব ধনতান্ত্রিক সমাজেরই বৈশিষ্ট্য। সমাজতন্ত্র আনিয়াছে এই দুইয়ের মধ্যে অভূতপূর্ব সামঞ্জস্য। ধনতন্ত্র এখন অবক্ষয়ের পথে। এই ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রের মধ্যে জন্মলাভ করিয়া সমাজতন্ত্র আজ জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইতেছে। মানবকল্যাণের মাপকাঠিতে বিচার করিলে দেখা যায়, এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই মানুষের সম্মুখে এক পরম উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইহার অগ্রগতির পথে এখনও রহিয়াছে নানা বাধাবিপত্তি। কিন্তু আমরা জানি, মানুষের প্রবুদ্ধ চেতনাকে কোনো শক্তিই চিরকালের জন্য প্রতিহত করিতে পারে না। অদূর ভবিষ্যতে এই সমাজের গণ্ডী বিপুল বিস্তৃতি লাভ করিবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

উপসংহার

সাম্যবাদ

[রচনার সংকেতসূত্র : ভূমিকা—সাম্যবাদী সমাজ সমাজতন্ত্রেরই পরিণত রূপ—সাম্যবাদের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন—সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন—সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের মধ্যে পার্থক্য—সাম্যবাদী সমাজের বন্টনব্যবস্থার সমালোচনা ও তাহার উত্তর—রাষ্ট্রহীন সমাজে মানুষ কি স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিবে না—রাষ্ট্রের অবর্তমানে সমাজদ্রোহীকে শাসন করিবে কে—সাম্যবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাব্য কার্যকলাপ—উপসংহার।]

ভূমিকা

ইংরেজী 'কম্যুনিজম্' শব্দটির দ্বারা যে-সামাজিক ব্যবস্থা নিরূপিত হয়, এখানে সেই অর্থেই 'সাম্যবাদ' কথাটি আমরা প্রয়োগ করিতেছি। সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার কোনও বাস্তব চিত্র বর্তমান পৃথিবীতে নাই। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক পণ্ডিত কার্ল মার্কস্ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে সামাজিক বিবর্তনকে বিশ্লেষণ করিয়া সাম্যবাদী সমাজের অবশ্যম্ভাবিতার ইঙ্গিত দিয়াছেন। মনীষী মার্কসের ব্যাখ্যা পরবর্তীকালের রুশবিপ্লবী লেনিনের লেখায় আরও স্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তিনিচয়ের পরস্পর সংঘাতজনিত যে গতি, তাহারই অনিবার্য পরিণতি ঘটিবে সাম্যবাদে—এই অভিমতই সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা প্রকাশ করিয়াছেন।

সাম্যবাদী সমাজ সমাজতন্ত্রেরই পরিণত রূপ

সাম্যবাদী সমাজ সমাজতন্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়। পরম শক্তিশালী সামন্ত-তন্ত্রকে [Feudalism] পরাভূত করিয়া একদিন ধনতন্ত্রের [Capitalism] প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ধনতন্ত্রও আবার কালক্রমে ক্ষয়িষ্ণুতার দিকে চলিল। এই ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্র হইতেই, শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া, বর্তমান পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র [Socialism] জন্মলাভ করে। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, শ্রমিক-শ্রেণী রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয় না। শ্রমিকরাষ্ট্র তাহার সকল শক্তি প্রয়োগ করে সমাজের আর্থিক বনিয়াদটিকে সমাজতন্ত্রমুখী করিয়া তুলিতে। সমাজতন্ত্রগঠনের পথে শ্রমিকরাষ্ট্র প্রধানতম অস্ত্র। পূর্বতন সমাজের সমস্ত শ্রেণীবৈষম্য যখন সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়, উৎপাদন ও বণ্টন যখন সম্পূর্ণভাবে জনগণের আয়ত্তে আসে, তখন আর রাষ্ট্রশক্তির কোনও প্রয়োজন থাকে না—শ্রেণীগত বিরোধের অবসানের

সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রও নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। শ্রমিকরাষ্ট্রের পরিচালনায় সমাজ আপন রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে, উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে পরবর্তী সাম্যবাদী সমাজের অনুকূল সমস্ত পন্থা অবলম্বন করে। এভাবে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া শ্রমিকরাষ্ট্র-পরিচালিত সমাজতন্ত্রী সমাজ উন্নততর স্তরে পৌঁছায়—এই বিশেষ অবস্থাটিই সমাজতন্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় বা সাম্যবাদ।

সাম্যবাদ অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের কোনও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয়। তবে অনাগত এই সমাজব্যবস্থার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি অনুমান করিয়া লওয়া যায়—রাষ্ট্রিক, আর্থিক এবং নৈতিক দিক হইতে এই সমাজকে বিশ্লেষণ করা চলে। রাষ্ট্রিক দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, সমগ্র পৃথিবী কিংবা পৃথিবীর বৃহৎ দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে সাম্যবাদী সমাজ বিকাশলাভ করিতে পারে না। যতদিন ধনিকরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত সমাজতন্ত্রী সমাজকে আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে হইবে, তাহার রাষ্ট্রীয় কাঠামো অক্ষত রাখিতে হইবে। পৃথিবীর বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলিতে সমাজতন্ত্রী সমাজের অভ্যুত্থান সাম্যবাদের প্রথম সোপান।

সাম্যবাদের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন

এই সোপান অতিক্রান্ত হইলে দেশে ক্রমশ রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটিবে, উৎপাদনের আশ্চর্য উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে—এক কথায়, সাম্যবাদী সমাজের অভ্যুত্থান হইবে। ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, রাষ্ট্রের মূলে রহিয়াছে শ্রেণীস্বার্থ। শ্রেণীস্বার্থের বিলুপ্তির পর রাষ্ট্রের অস্তিত্বরক্ষার কোনও প্রয়োজন থাকিবে না। অবশ্য উৎপাদন-বণ্টন ইত্যাদি পরিচালনার জন্য তখন যে-জিনিসটির প্রয়োজন হইবে, তাহা জনসংঘ। এই জনসংঘের প্রধান কাজ হইবে, সমাজের উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা। জনসংঘ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে মৌল তারতম্য বিদ্যমান। উৎপাদনসংঘের কাজ সর্বাংশে আর্থনীতিক, রাষ্ট্রের কাজ মূলত রাজনীতিক।

সাম্যবাদী সমাজে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন

আধুনিক রাষ্ট্রগুলির প্রধান কাজ—আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শাসিত শ্রেণীকে দমন করা ও সর্বপ্রকার বহিরাক্রমণ হইতে দেশকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা। কিন্তু সাম্যবাদী উৎপাদনসংঘগুলি শ্রেণীহীন সমাজে শুধু প্রাকৃতিক সম্পদকে জনকল্যাণে নিয়োগের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা লইয়া সুরচিত পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিবে। সাম্যবাদী পৃথিবীতে যুদ্ধ নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু সমাজ শ্রেণীহীন। সুতরাং সেখানে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কোনও সার্থকতা নাই।

পণ্ডিতেরা সমাজতন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে-বিভেদ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা মূলত বণ্টনপ্রথাপ্রসূত। প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যেকটি মানুষকে নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন-ব্যাপারে সহায়তা করিতে হইবে, এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কার্য অনুযায়ী পুরস্কৃত হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'ক্ষমতানুযায়ী কাজ' ও 'প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টন'—এই প্রথা প্রবর্তিত হইবে। আর্থিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, সাম্যবাদী সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় হইলে জনগণ সাধ্যমত সামাজিক উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করিবে এবং সকলেই তাহাদের প্রয়োজন-মতো ভোগ করিবার সামগ্রী পাইবে। বুঝা যাইতেছে, সাম্যবাদী সমাজের আবির্ভাবের পূর্বে উৎপাদনশক্তির বিশেষ উন্নতি প্রয়োজন। সমাজ-তান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা ক্রমোন্নতির সোপান বাহিয়া এমন এক অবস্থায় পৌছিবে যখন বণ্টনকে আর ব্যক্তিবিশেষের কার্যক্ষমতার ভিত্তিতে চালিত না করিয়া তাহার প্রয়োজনের ভিত্তিতেই পরিচালিত করা সম্ভব। এই সম্ভাবনা বাস্তব-রূপ পরিগ্রহ করিলেই সমাজতন্ত্র তাহার প্রাথমিক অবস্থা হইতে দ্বিতীয় অবস্থায় উত্তীর্ণ হইবে।

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের মধ্যে পার্থক্য

সাম্যবাদী সমাজের বণ্টনব্যবস্থা-সম্পর্কে এরূপ একটা সমালোচনা প্রায়ই শোনা যায়: কোনও ব্যক্তিবিশেষ যদি বলিয়া বসে যে, তাহার অনেক বাড়ী ও অনেক গাড়ীর প্রয়োজন, তাহা হইলে কী উপায় হইবে? প্রয়োজনকে মাপিবার তো কোনও মাপকাঠি নাই। এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, প্রত্যেক মানুষের চাহিদা সমাজের আশাআকাঙ্ক্ষা ও অবস্থা অনুযায়ী নিরূপিত হইয়া থাকে। ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষের চাহিদা পুঁজিস্বার্থ ও ব্যক্তিগত সম্পদস্বার্থের প্রেরণা-বশেই গড়িয়া উঠে। সাম্যবাদী সমাজে জনগণের চাহিদা নিয়ন্ত্রিত হইবে ওই সমাজব্যবস্থারই আদর্শপ্রেরণায়। ধনতন্ত্রী ও সাম্যবাদী সমাজ-অন্তর্ভূত মানুষের কামনাবাসনার মধ্যে পার্থক্য থাকিতে বাধ্য। সাম্যবাদী সমাজে সংঘবদ্ধ সমাজগঠনের আদর্শই প্রত্যেকটি নরনারীর জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করিবে। আসল কথা এই যে, মানুষের আজিকার দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-চাহিদা সমস্তই শত শত বৎসরের প্রতিযোগিতামূলক শ্রেণীবৈষম্য-প্রভাবিত সমাজব্যবস্থার ফল। এইরূপ সমাজ ভাঙিয়া চূরমার হইয়া যাইবে, নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিবে, অথচ মানুষ সেই আদিম মানুষটি থাকিয়া যাইবে—এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপ্রসূত।

সাম্যবাদী সমাজের বণ্টন-ব্যবস্থার সমালোচনা ও তাহার উত্তর

সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার আওতায় মানুষের নৈতিক উন্নতি ঘটিবে, কি অবনতি ঘটিবে, তাহার সম্বন্ধে বস্তুত আনুমানিক আলোচনাই সম্ভব। রাষ্ট্রহীন এই সমাজটিতে মানুষ কি স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিবে না? এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে, সমাজব্যবস্থার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চারিত্রিক তথা নৈতিক পরিবর্তন অবধারিত সত্য। উৎপাদন, বণ্টন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নততর অবস্থার ভিতর দিয়াই রূপ পরিগ্রহ করিবে সাম্যবাদী সমাজ। সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন, উক্ত প্রকার সামাজিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া মানুষের অপরাধপ্রবণতা কমিয়া আসিবে স্বাভাবিক কারণেই। সুতরাং রাষ্ট্রশক্তির বিলুপ্তির পর সমাজবিরোধী কোনও কাজ মানুষ করিবে কিনা, এ প্রশ্ন অবান্তর।

রাষ্ট্রহীন সমাজে মানুষ কি স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিবে না

অন্যদিকে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিরোধের অবসান ঘটাইবার জন্যও এখানে রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন থাকিবে না। বর্তমান সমাজেও দেখা যায়, কোনও মানুষ যদি কোনোরূপ সমাজবিরোধী কাজ করে, তাহা হইলে সমাজের অন্যসব মানুষ নিজেদের সম্মিলিত শক্তিতেই ওই ব্যক্তির অপরাধের শাস্তিবিধান করিতে অগ্রসর হয়। সাম্যবাদী সমাজে এই সামাজিক চেতনা আরও বহুগুণ বিকাশলাভ করিবে। সমাজদ্রোহী ব্যক্তি জনমতের দ্বারাই শাসিত হইবে। সমাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নৈতিক চরিত্রও নিঃসন্দেহে উন্নত হইয়া উঠিবে।

রাষ্ট্রের অবর্তমানে সমাজদ্রোহীকে শাসন করিবে কে

রাষ্ট্রের বিলুপ্তি, ক্ষমতানুযায়ী কাজ ও প্রয়োজন-মতো বণ্টন এবং সমাজব্যবস্থার উন্নতির সমান্তরাল রেখায় মানুষের নৈতিক উৎকর্ষই হইল সাম্যবাদী সমাজের বিশিষ্ট লক্ষণ। অনেকে মনে করেন, এই সমাজব্যবস্থা বিশেষ একটি স্তরে উত্তীর্ণ হইয়া ধীরে ধীরে স্থাণু হইয়া যাইবে—শ্রেণীহীন হওয়ার ফলে অন্তর্বিরোধের অবসানহেতু সমাজের অগ্রগতি স্তব্ধীভূত হইবে। এ রকম ধারণা অমূলক বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কারণ, সংঘবদ্ধ মানবগোষ্ঠী তখন বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গেই অবিরাম সংগ্রামে নিযুক্ত থাকিবে, সম্মিলিত মানবজাতি তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রকৃতির নূতন নূতন রহস্যদ্বার উন্মোচিত করিবে—তখন মানুষে মানুষে শ্রেণীবিরোধের অবসানের পর মানুষ ও প্রকৃতির বিরোধমূলক ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় সূচিত হইবে।

সাম্যবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাব্য কার্যকলাপ

উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের শক্তি আজ অনেকখানি বর্ধিত হইয়াছে। এই

উৎপাদনশক্তিকে যদি মানুষ জনগণের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত করিতে পারে, তাহা হইলে সাম্যবাদী সমাজের নবজন্ম অবশ্যম্ভাবী। সেদিন পৃথিবী হইতে মানুষের দানবীয় হিংস্রতা ও অমানুষিক বিরোধ লুপ্ত হইবে—সমাজে ফিরিয়া আসিবে যথার্থ শান্তি, শ্রী ও কল্যাণবুদ্ধি। আজিকার এই হিংসা-উন্মত্ত পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া আমরা ভাবীকালের সেই সাম্যবাদী সমাজের দিকে একান্ত উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি।

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** সূচনা—গণতন্ত্র বলিতে কী বুঝায়—একনায়কতন্ত্রের মূলনীতি—আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও জনসাধারণ—চার্চিলের ইংলণ্ড ও হিটলারের জার্মানী—হিটলার ও চার্চিল উভয়ই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র কিনা—গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে কোন্‌টা ভালো—প্রথম-মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার কারণ—পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের ত্রুটি—পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া—রাশিয়া ও জার্মানীর একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য—উপসংহার।]

সূচনা

বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে দেখা যায় কত রকমের রূপভেদ। রাষ্ট্রের সঙ্গে জাতির জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত বলিয়া রাষ্ট্র-সম্পর্কিত আলোচনার অন্ত নাই। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল গণতন্ত্র ও একনায়ক-তন্ত্র। আমরা ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়া লইতে কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিব।

গণতন্ত্র বলিতে কী বুঝায়

কোনও রাষ্ট্রের শাসনভার যদি জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং উহা তাহাদের স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে সেই রাষ্ট্র বা তাহার শাসনপ্রণালীকে আমরা গণতন্ত্র [Democracy] বলিয়া থাকি। আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনপ্রণয়নে সেখানকার প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার। সেখানকার প্রতিটি আইন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদলের ইচ্ছার বাস্তব প্রকাশ, এবং সেই আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি কর্মচারী জনসাধারণের নিকট দায়ী।

একনায়কতন্ত্রের [Dictatorship] মূলনীতি হইল একনিষ্ঠা—রাষ্ট্রের সর্বময় নেতার প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। একনায়কাধীন দেশের আইনগুলি ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাপ্রসূত, আর এই ব্যক্তিই দেশের সর্বময় নেতা বা ভাগ্যনিয়ন্তা। জনগণের সকল ভাগ্য এই একজনেরই উপর ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রের সমস্ত কর্মচারী তাঁহারই আদেশে পরিচালিত হয় এবং নিজ কর্তব্যপালনের জন্য তাঁহারই নিকট দায়ী থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র—এই দুইটি শাসনপ্রণালী পরস্পরবিরোধী, উহাদের মধ্যে যে বিরোধ তাহা বহু এবং একের মধ্যে বিরোধ।

একনায়কতন্ত্রের মূলনীতি

বর্তমান যুগে অতি অল্পসংখ্যক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই জনসাধারণের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব। বোধ হয়, একমাত্র সুইজারল্যাণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিটি পল্লী [Canton] ভিন্ন আধুনিক পৃথিবীতে কোথাও আদর্শ গণতন্ত্র নাই। সুতরাং অন্য সকল গণতন্ত্রই পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক। এ সকল গণতন্ত্রে সাধারণ নাগরিকগণ নিজেরা ভোট দিয়া অল্পসংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করে, এবং এই অল্পসংখ্যক প্রতিনিধিরাই দেশের প্রকৃত শাসনকার্যের ভার গ্রহণ করেন। একবার নির্বাচন শেষ হওয়ার পর হইতে দ্বিতীয়বার নির্বাচন পর্যন্ত উক্ত মুষ্টিমেয় প্রতিনিধিদলই জনসাধারণের ভাগ্যবিধাতা। সুতরাং সূক্ষ্মবিচার ছাড়িয়া যদি খাঁটি বাস্তবের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় তাহা হইলে এই ধরণের গণতন্ত্রকে একনায়কতন্ত্র বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও জনসাধারণ

উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে চার্চিলের মন্ত্রীত্বাধীন ইংলণ্ডকে হিটলারের নেতৃত্বাধীন জার্মানীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অধিকাংশ লোকেই ইহা স্বীকার করিবেন যে, চার্চিলের ইংলণ্ড গণতন্ত্র ও হিটলারের জার্মানী একনায়কতন্ত্র। কিন্তু ইংলণ্ডে চার্চিলের ক্ষমতা কি জার্মানীতে হিটলারের ক্ষমতা অপেক্ষা কোনো অংশে কম ছিল? যুদ্ধজয়ের জন্য চার্চিলের নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রীসভা বহু বিধিনিষেধের বোঝা ইংলণ্ডবাসীদের উপর চাপাইয়া দিয়াছিল—বৃটিশ পার্লামেণ্ট তাহাতে আপত্তি করে নাই। একাধিকবার পার্লামেণ্টের সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রশাসনব্যাপারে প্রশ্ন করিয়া চার্চিলের নিকট হইতে কোনও সদুত্তর না পাওয়া সত্ত্বেও চার্চিলের প্রভুত্ব যুদ্ধাবসান পর্যন্ত অক্ষুণ্ণই রহিয়া গিয়াছিল। জার্মানীতে

চার্চিলের ইংলণ্ড ও হিটলারের জার্মানী

হিটলার ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার সংগত কোনো কারণ নাই।

এই বিতর্কে হয়তো কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়া বলিবেন—হিটলার ছিলেন স্বেচ্ছাচারী, কিন্তু চার্চিলের পিছনে ইংলণ্ডের জনসাধারণের সমর্থন ছিল। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই এ আপত্তির অসারতা সম্পর্কে এতটুকু সন্দেহ থাকে না। কারণ, হিটলারও চার্চিলের মতো জনসাধারণের ভোটাধিক্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিরূপেই ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। ফ্যাসিস্ত ইতালীর নিয়ন্তা মুসোলিনী সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। অতএব দেখা যাইতেছে, বর্তমানকালে গণতান্ত্রিক ও একনায়কাধীন এই উভয় রাষ্ট্রের ভিত্তিই নির্বাচনের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয় স্থানেই আইনসভা বর্তমান এবং উভয় স্থলেই জনপ্রিয় নেতাদের নিয়ন্ত্রণে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। দুইয়ের মধ্যে একমাত্র উল্লেখ-যোগ্য পার্থক্য এই যে, একনায়কাধীন দেশে একটিমাত্র রাজনীতিক দল ছাড়া অপর দলের অস্তিত্ব আইনত গ্রাহ্য নহে। কিন্তু গণতন্ত্রে একাধিক রাজনীতিক দল গঠন করা নিষিদ্ধ নয়। উপরন্তু কোনো কোনো দেশে একাধিক দল না থাকিলে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়।

হিটলার ও চার্চিল উভয়ই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে গণতন্ত্র বলিয়া স্বীকার না করার মূলে এরূপ একটি বিশ্বাসই বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু নির্বাচনরীতি বা গণস্বার্থের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, বর্তমান রাশিয়ার শাসনপ্রণালী অপর যে-কোনো রাষ্ট্র অপেক্ষা গণতান্ত্রিক। কারণ, সেখানে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীপুরুষ প্রত্যেকেই নির্বাচনে অধিকারী এবং প্রত্যেক নাগরিকের কর্ম ও উদরান্ন-সংস্থানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। জনসাধারণের এতখানি বিস্তৃত রাষ্ট্রিক ও আর্থনীতিক অধিকার অপর কোনো দেশে নাই। কিন্তু রাশিয়ায় এক কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়া অপর কোনো রাজনীতিক দল গঠন করা বেআইনী বলিয়া, অনেকেই রাশিয়াকে গণতন্ত্র আখ্যা দিতে অস্বীকার করেন। আবার, কেহ কেহ রাশিয়ায় জনসাধারণের আর্থনীতিক ও রাজনীতিক অধিকার বিবেচনা করিয়া, উহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র—এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। রাশিয়ার নির্বাচনপ্রথার মধ্যেই গণতন্ত্রের মূলনীতি পূর্ণভাবে বিদ্যমান। যাহা হোক, পণ্ডিতদের মধ্যে যখন মতভেদ দেখা যায়, তখন সাধারণের পক্ষে গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে সুপরিস্ফুট সীমারেখা নির্দেশ করা সহজসাধ্য নয়।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র কিনা

এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিতে হইলে রাষ্ট্রের প্রকৃত আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, প্রত্যেক নাগরিককে তাহার প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের সুযোগসুবিধা দেওয়াই আদর্শ রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। যে-রাষ্ট্রে এই অধিকার যত অধিক বিস্তৃত, সে-রাষ্ট্র তত বেশী গণতান্ত্রিক। এইবার বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে, গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে সত্যই কোন্‌টা অধিক ভালো।

গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে কোন্‌টা ভালো

যদি কোনো দেশের অধিকাংশ অধিবাসী শিক্ষা ও সভ্যতার অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে জনসাধারণকে বিস্তৃত রাজনীতিক অধিকার দিলে রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা বেশী। বরং কোনও জনহিতৈষী, উচ্চশিক্ষিত ও কর্মক্ষম নেতার অধীনে থাকিলে সে দেশের জনসাধারণের অধিকতর মঙ্গল হওয়ার আশা আছে। সুতরাং কোনো কোনো ক্ষেত্রে গণতন্ত্র অপেক্ষা একনায়কতন্ত্র কল্যাণকর বলিয়া মনে হয়। এ রকমের যুক্তিকে একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না।

কিন্তু ইহার পিছনে কিছুটা গলদও রহিয়া গিয়াছে। প্রথমত, একাধারে 'উচ্চশিক্ষিত', 'কর্মক্ষম' ও 'জনহিতৈষী' নায়ক অত্যন্ত বিরল। দ্বিতীয়ত, ক্ষমতা পাইলে অনেক উচ্চশিক্ষিত ও কর্মক্ষম ব্যক্তিই সাধারণের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে—ইতিহাসে ইহার নজীরের অভাব নাই। তৃতীয়ত, নেতা যদি সত্য সত্যই জনহিতৈষী হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রধান কর্তব্য হইবে, তাঁহার অধীনস্থ জনসাধারণকে যতশীঘ্র সম্ভব কুসংস্কারমুক্ত করিয়া সভ্য ও শিক্ষিত করিয়া তোলা। তিনি যদি এই কর্তব্য-পালনে ত্রুটি না করেন, তাহা হইলে জনসাধারণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষা ও সভ্যতার উচ্চস্তরে পৌছিতে পারিবে—ইহার পর তাহারা নিজের হাতে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে। এরূপ অবস্থায় দেশের অধিনায়কের অন্যকোনো কাজ থাকিতে পারে না, এবং পরিণামে একনায়কতন্ত্রের স্থলে ধীরে ধীরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধ্য। সুতরাং আদর্শ একনায়কতন্ত্রের স্বাভাবিক পরিণতি হইল গণতন্ত্র।

কেহ কেহ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়া বলেন যে, ইহাতে গুণের আদর নাই—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মূর্খ, দরিদ্র, অপদার্থের দল সংখ্যার জোরে শাসন-কার্যের ভার গ্রহণ করে। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এই দোষ গণতন্ত্রের নয়—ইহার জন্য দায়ী জনসাধারণের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার। যুক্তির দিক দিয়া কিন্তু গণতন্ত্রই উচ্চতর-আসন-লাভের অধিকারী। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধাবসানের পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিলেও, গণতন্ত্রই যে ক্রমশ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে, ইহাই প্রতীয়মান হয়।

প্রথম-মহাযুদ্ধের পর অবশ্য ইহার কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। ওই যুদ্ধে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইংলণ্ড ও আমেরিকা জয়লাভ করিলেও, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে গণতন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি পায় নাই—ইটালীতে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। প্রথম-মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীতে একনায়কতন্ত্রের বিস্তৃতির প্রধান কারণ এই যে, ব্রিটেন ও আমেরিকার গণতন্ত্র প্রকৃত গণতন্ত্র ছিল না—আজও নয়। এ ধরণের গণতন্ত্রকে 'পুঁজিবাদী গণতন্ত্র' বলা যাইতে পারে। এরূপ গণতন্ত্রে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির অনুকূলে রাষ্ট্রশাসন পরিচালিত হয়, এবং জনসাধারণকে তাহাদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার কারণ

এরূপ গণতন্ত্রের প্রধান দোষ দুইটি। প্রথমত, ইহাতে নামমাত্র রাজনীতিক অধিকার দেওয়ার জন্য জনসাধারণের মধ্যে তাড়াতাড়ি শৃঙ্খলা আনা যায় না, এবং কোনো যুদ্ধবিগ্রহ ও আর্থিক সংকটের সময় কর্তৃপক্ষরা যথেষ্ট পরিমাণ সত্বর কাজ করিতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, ইহাতে জনসাধারণকে কিছুটা রাজনীতিক স্বাধীনতা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগকে পুঁজিবাদী কায়েমী স্বার্থের নিকট আর্থনীতিক দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে হয়। ইহার ফলে জনগণের রাজনীতিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে—গণতন্ত্র ও গণস্বাধীনতার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান থাকিয়া যায়।

পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের ত্রুটি

প্রথম-মহাযুদ্ধের পর জার্মানী ও ইটালীতে যে একনায়কত্বের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা এই পুঁজিতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রথমোক্ত ত্রুটির বিরুদ্ধে অভিযান। দারুণ অর্থসংকটের সময় পুঁজিবাদীর স্বার্থ বজায় রাখিয়া শৃঙ্খলার সহিত রাষ্ট্র-পরিচালনার একমাত্র উপায় হইল একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের সমগ্র জনসাধারণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা। কারণ, তাহা হইলে বেকারসমস্যার সাময়িক সমাধান হয় এবং যুদ্ধের উত্তেজনায় কৃষকমজুরদল কিছুকালের জন্য দৈনন্দিন জীবনের অভাব-অভিযোগের কথা ভুলিয়া মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদীদের নেতৃত্ব মানিয়া লয়। এইভাবেই ইউরোপে হিটলার ও মুসোলিনীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পরিণাম রক্তমুখী বীভৎস ধ্বংসলীলা—দ্বিতীয় বিশ্ব-

পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া

সংগ্রামই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ফাসিস্ত একনায়কতন্ত্র বাস্তবিকই গণতন্ত্রের শত্রু। কেন-না, পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে কিছুটা গণস্বাধীনতা থাকে, ইহাতে তাহাও কাড়িয়া লওয়া হয়।

রাশিয়া ও জার্মানীর একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

রাশিয়ায় যে-একনায়কতন্ত্র দৃষ্ট হয়, তাহা কিন্তু হিটলারী একনায়কত্বের ঠিক বিপরীত। ফাসিস্ত একনায়কত্বের মতো ইহা নিজেকে চিরস্থায়ী করিতে চাহে না। রাশিয়ার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেশের আভ্যন্তরীণ কারণে। যতদূর সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে কৃষকমজুরদের যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য এবং সেখানকার হৃতমান পুঁজিবাদীদের হীন উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য গণস্বার্থসেবী সুযোগ্য নেতার প্রয়োজন ছিল। তাই সোভিয়েট রাশিয়ার জনসাধারণ আপন হইতেই স্টালিনের নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াছিল। সে দেশের একনায়কত্ব পুঁজিপতির একনায়কত্ব নয়—উহা সর্বহারা-দলের একনায়কত্ব।

উপসংহার

আজ আশার কথা এই যে, পৃথিবীর বহু দেশে পুঁজিবাদীদের প্রতিপত্তি দুর্বল হইয়া আসিতেছে। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, মধ্য-ইয়োরোপে, সুদূর প্রাচ্যে সর্বত্রই গণস্বাধীনতাবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী জনগণের আপোষহীন সংগ্রাম শুরু হইয়াছে। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সাফল্য আজ আর কয়েকজনের স্বপ্নমাত্র নয়, সাধারণের দৈনন্দিন জীবন-ধারার মধ্যে তাহার রূপ ক্রমশই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ফাসিস্ত একনায়কতন্ত্র পশুশক্তি-দ্বারা মানবতাকে হত্যা করিতে চায়, আর যথার্থ গণতন্ত্র চায় মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং গণতন্ত্রের ব্যাপক প্রসারই যে সকলের কাম্য, একথা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

মহাত্মা গান্ধী

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** মহামানব গান্ধী ও বর্তমান ভারতবর্ষ—গান্ধীজির বাল্যজীবনকথা—মহাত্মাজির ব্যারিষ্টার-জীবন—আফ্রিকার নাটাল প্রদেশে মহাত্মা গান্ধী—প্রথম অহিংস সংগ্রাম—আফ্রিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন—জনসেবা ও দেশের গঠনমূলক কার্যে লিপ্ত গান্ধীজি—মহাত্মার প্রচারিত অসহযোগ আন্দোলন—'ডাণ্ডি' অভিযান—তিনটি দুরূহ কার্যে ব্রতী মহাত্মা—'ভারত ছাড়' আন্দোলন—সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার মহাশ্মশানে গান্ধীজি—হিংসার যূপকাষ্ঠে অহিংসার পূজারী মহাত্মার আত্মদান—গান্ধীজির জীবনাদর্শ মৃত্যুঞ্জয়।]

মহামানব গান্ধী ও ভারতবর্ষ

যুগে যুগে আমাদের মধ্যে এমন দুই-একজন মহামানব আবির্ভূত হন, যাঁহাদের ভিতর দিয়া সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও সাধনা মূর্ত হইয়া উঠে—তাঁহাদের মহৎ জীবনের আলোকবর্তিকা সকল মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের পথটি আলোকিত করিয়া তুলে। এইসকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ বিরাট বনস্পতির মতো—ইঁহারা জাতিকে নির্ভয় আশ্রয় দান করেন, স্নিগ্ধ ছায়া দান করেন, জাতীয় জীবনে প্রবাহিত করিয়া দেন নব-জীবনের স্রোতোধারা। মহামানব গান্ধী এইরকম একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। তাঁহার শুভ আবির্ভাবে পরাধীন ভারতের জন্মান্তর রূপান্তর ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক সাধনাকে মহাত্মাজি সফল করিয়া তুলিয়াছেন—সমগ্র দেশের প্রাণসত্তাকে তিনি উজ্জীবিত করিয়াছেন। তাঁহার সমুন্নত চরিত্রমহিমা, সুগভীর দেশপ্রেম ও অপরাজেয় আত্মশক্তির প্রেরণাবলে ভারতবাসী রাজভয়, মৃত্যুভয় সকল-কিছুরই উর্ধ্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার সামর্থ অর্জন করিয়াছে। আত্মপ্রকাশের শঙ্কাহীন অভিযানে তিনিই সমগ্র জাতিকে দিয়াছেন দীক্ষা।

গান্ধীজির বাল্যজীবনকথা

ইংরেজী ১৮৬৯ সালে গুজরাটের অন্তর্গত পোরবন্দর নামক স্থানে এক বণিকবংশে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম হয়। গান্ধীজির পিতা করমচাঁদ গান্ধী কাঁথিয়াবাড় রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। পোরবন্দরে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া গান্ধীজি রাজকোট বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। স্কুলজীবনে তিনি তেমন কোনো অসাধারণ মেধাশক্তির পরিচয় দেন নাই। শৈশবে-কৈশোরে তিনি ছিলেন ভীরু এবং লাজুক-প্রকৃতির বালক। রাজকোটে অধ্যয়নকালে গান্ধীজি কয়েকজন অসৎ-প্রকৃতি শিক্ষার্থীর সংস্পর্শে আসিয়া ধূমপান করিতে শিখেন ও

চুরিবিদ্যায় মনোযোগী হন। জৈনপরিবারে তাঁহার জন্ম হয়—সুতরাং মৎস্য-মাংস প্রভৃতি গ্রহণ ঐ পরিবারে নিষিদ্ধ ছিল। গান্ধীজি সঙ্গদোষে এই নিষিদ্ধ বস্তু আহারে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু সহজাত আন্তর শক্তির প্রেরণায় এইসব কদভ্যাসের প্রভাব তিনি ধীরে ধীরে কাটাইয়া উঠেন। অতি অল্পবয়সেই সত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ দেখা যায়। মাত্র তের বৎসর বয়সে কস্তুরীবাঈ-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার পর ব্যারিষ্টারী-শিক্ষালাভের জন্য গান্ধীজি বিলাতযাত্রা করেন, এবং ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯১ সালে ভারতে ফিরিয়া আসেন। যথাসময়ে বোম্বাই হাইকোর্টে তিনি ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হইলেন। এই সময় গান্ধীজি স্বনামধন্য দাদাভাই নৌরজী এবং গোপালকৃষ্ণ গোখেলের সংস্পর্শে আসেন। তাঁহার রাজনীতিক জীবনে এই দুইজন প্রখ্যাতনামা ব্যক্তির প্রভাব সামান্য নহে। ইঁহাদের নিকটেই তিনি জাতীয়তামন্ত্রে প্রথম দীক্ষাগ্রহণ করেন। ১৮৯৩ সালে ব্যারিষ্টার গান্ধীজি একটি মোকদ্দমা-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকায় গমন করেন। যে-সত্য ও অহিংসাকে মহাত্মাজী তাঁহার জীবনদর্শনের মূলমন্ত্র করিয়াছিলেন, দক্ষিণ-আফ্রিকায় অবস্থান-কালেই তিনি সেই সত্যধর্ম ও অহিংসায় ব্রতী হন।

মহাত্মাজীর ব্যারিষ্টার-জীবন

আফ্রিকার নাটালপ্রদেশে বহুসংখ্যক ভারতীয়ের বসবাস। সেই সময়ে নাটালের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা কৃষ্ণাঙ্গ ভারতবাসীর উপর নির্বিচারে অত্যাচার উৎপীড়ন চালাইয়া যাইত। ফলে সে-দেশের প্রবাসী ভারতীয়ের জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতবিরোধী নাটালসরকার আইনসভায় তখন এমন একটা বিল আনয়ন করিয়াছিল, যাহা ভারতীয়দের স্বার্থের নিতান্ত বিরোধী। নাটাল-প্রবাসী ভারতবাসীরা গান্ধীজির শরণাপন্ন হইলেন, এবং তাঁহাকে এই কুখ্যাত বিলের প্রতিবাদ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রবাসী ভারতবাসীর আত্মমর্যাদা ও রাজনীতিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। নাটাল-সরকারের বিরুদ্ধে এইবার স্বদেশপ্রেমিক ও মানবতার পূজারী মহাত্মাজীর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এই সংগ্রাম কিন্তু হিংসাত্মক নয়, অহিংস—ইহাকে বলা যায় অহিংস প্রতিরোধ, অর্থাৎ 'Passive Resistance'। সত্যকে জয়যুক্ত করিবার জন্য আত্মিক শক্তির বলে অত্যাচারীর সকল উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করিব, কিন্তু শত্রুকে আঘাত করিব না—ইহারই নাম সত্যাগ্রহ। এই সত্যাগ্রহরূপী অভিনব

নাটাল-এ মহাত্মাজীর অহিংস সংগ্রাম

অস্ত্রের দ্বারাই তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকার কঠিন সংগ্রামে জয়লাভ করিলেন—আত্মিক শক্তির কাছে হিংস্র পাশবিক শক্তির পরাজয় ঘটিল।

তারপর গান্ধীজির রাজনীতিক জীবনে পটপরিবর্তন হইল। সুদীর্ঘ একুশ বৎসর দক্ষিণ-আফ্রিকায় অবস্থানের পর ১৯১৪ সালে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তখনো মহাত্মা ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকার সংগ্রামবিজয়ী সত্যাগ্রহী বীর বলিয়া তাঁহার অসামান্য খ্যাতি সে সময় কিন্তু দেশের চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সময় মহাত্মাজি আমেদাবাদের সবরমতী-নদীতীরে সত্যাগ্রহ-আশ্রম স্থাপিত করিয়া জনসেবা ও গঠনমূলক কাজ আরম্ভ করেন। ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘোষিত হয়। তখন পর্যন্ত গান্ধীজী সম্পূর্ণ ব্রিটিশবিরোধী হইয়া উঠেন নাই। এই যুদ্ধে তিনি ভারতবাসীকে লইয়া ব্রিটেনকে যুদ্ধের বিপত্তিকালে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইলেন। ব্রিটিশসরকার তাঁহাকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন যে, যুদ্ধের অবসান ঘটিলে তাঁহারা ভারতবাসীকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দিবেন। ১৯১৯ সালে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল। কিন্তু ইংরেজসরকার পূর্ব-প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন না, উপরন্তু অতি-কুখ্যাত রাউলাট আইন প্রবর্তিত হইল। সমগ্র ভারত ইহাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

জনসেবা ও দেশের গঠনমূলক কর্মে লিপ্ত গান্ধীজী

১৯২০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে মহাত্মাজি ব্রিটিশের পশুশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য নিরস্ত্র ভারতবাসীর তরফ হইতে 'অসহযোগ আন্দোলন' প্রচার করিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার নেতৃত্ব নতমস্তকে স্বীকার করিল। অহিংসামন্ত্রের মতোই সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলন ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজির নবতন অবদান। তিনি দুর্বল ভারতবাসীর মানসিক জড়ত্ব বিদূরিত করিলেন, আত্মসম্মান এবং আত্মপ্রত্যয়কে জাগাইয়া তুলিলেন—আত্মপ্রকাশকে ভয়হীনতার পথে পরিচালিত করিলেন। ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আত্মঘাতী ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব দেখা দিলে মহাত্মাজি অনশনব্রত গ্রহণ করেন। যেখানে এবং যখনই জাতি তাহার সংকীর্ণ স্বার্থ ও দুষ্কৃতির দ্বারা রাষ্ট্রদেহে দুর্বলতার বিষ সঞ্চয় করিয়াছে, তখনই এই মহাপুরুষ নীলকণ্ঠের মতো সেই বিষ নিজে গ্রহণ করিয়া জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিষক্রিয়াকে প্রতিরোধ করিবার জন্য মহাত্মাজি ১৯৩২ সালে

মহাত্মার প্রচারিত অসহযোগ আন্দোলন

যারবেদা জেলেও অনশনব্রত ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহার ফলেই সুবিখ্যাত 'পুণাচুক্তি' স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অধ্যায়। এই সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 'পূর্ণ স্বরাজ' ঘোষণা করিয়া ইংরেজের রচিত আইন অমান্য করার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

গান্ধীজীর 'ডাণ্ডি' অভিযান

এই অবিস্মরণীয় আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইনেন গান্ধীজি। লবণ-আইন অমান্য করিবার সংকল্প লইয়া মহাত্মার ঐতিহাসিক 'ডাণ্ডি'-অভিযান শুরু হইল। ব্রিটিশের কঠোর দমননীতি দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ জাতির প্রাণ-সত্তাকে দ্বিগুণ উদ্দীপিত করিয়া তুলিল—গান্ধীজির অহিংস সংগ্রাম সমগ্র জগৎকে বিস্মিত করিল—পশুশক্তি পুনর্বার অধ্যাত্মশক্তির কাছে পরাজয় মানিল। ইহারই ফলে 'গান্ধী-আরউইন-চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-অর্জনকে ত্বরান্বিত করিয়া তুলিবার জন্য গান্ধীজি তিনটি দুরূহ কার্যে ব্রতী হইলেন—অস্পৃশ্যতাবর্জন, হিন্দুমুসলমানের মিলন ও কুটীরশিল্পস্থাপনের আদর্শকে তিনি সবকিছুর পুরোভাগে রাখিলেন। অস্পৃশ্যতা

তিনটি দুরূহ কার্যে ব্রতী মহাত্মা

যে হিন্দুর সমাজদেহকে দুর্বল পঙ্গু করিয়া দিতেছে, তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিলেন। ভেদবুদ্ধির অভিশাপে ভারতের রাষ্ট্রিক মুক্তিসাধনা বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে। অস্পৃশ্য অনুন্নতশ্রেণীকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি যে-আন্দোলন শুরু করেন উহা 'হরিজন-আন্দোলন' নামে খ্যাত। হিন্দু-মুসলমানকে, হিন্দুসমাজকে দ্বিধাবিভক্ত দেখার চেয়ে মৃত্যুবরণ করাকে তিনি শ্রেয় মনে করিয়াছিলেন।

মহাত্মাজির নেতৃত্বে ও প্রেরণায় ভারতবর্ষের রাজনীতির দ্রুত পটপরিবর্তন হইতে থাকে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও ক্রমশ জটিল হইয়া উঠে। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের দাবানল ভারতবর্ষের আকাশকে প্রলয়ংকর বহ্নিরাগে

'ভারত ছাড়' আন্দোলন

রক্তবর্ণ করিয়া তুলিল। ব্রিটিশরাজশক্তি জোর করিয়া ভারতকে যুদ্ধে অবতীর্ণ করাইল, কিন্তু এ দেশের স্বাধীনতার দাবীকে স্বীকৃতি জানাইল না। ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট মহাত্মাজী ব্রিটিশকে ভারত ছাড়িতে বলিলেন। ঐদিন কংগ্রেসের বোম্বাই-অধিবেশনে ভারতবর্ষের পূর্ণ-স্বাধীনতা ও এদেশ হইতে ব্রিটিশের অপসারণ দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। ফলে গান্ধীজি ও কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অন্যান্য

সদস্যবৃন্দ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন—ভারতবর্ষের দিকে দিকে সর্বনাশা বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মহাত্মাজি কারাবরণের প্রাক্কালে জাতিকে তাঁহার চরম বাণী ও অভয়মন্ত্র শুনাইয়া গিয়াছিলেন—'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।' একরূপ বাধ্য হইয়াই ব্রিটিশরাজশক্তি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু ইংরেজের রাজনৈতিক কূটকৌশলের ফলে অখণ্ড ভারত দ্বিধাবিভক্ত হইল।

ইহার পর ভারতের আকাশে ঘনাইয়া আসিল ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দুর্যোগ। স্বাধীনতালাভের পরও নবজাত দুইটি রাষ্ট্রের অধিবাসীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক মিলন সম্ভব হইয়া উঠিল না। ১৯৪৬ সালে তিনি ছুটিয়া গিয়াছিলেন নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক উন্নত্ততার মহাশ্মশানে। তারপর তিনি আসিলেন মহানগরী কলিকাতায়—ইহার পর আবার ছুটিয়া গেলেন দিল্লীতে। হিন্দুমুসলমানকে আত্মকলহে লিপ্ত দেখিয়া তিনি ব্যথিত চিত্তে বলিয়াছিলেন: 'আমি যে-স্বাধীন ভারতে বাস করি তাহাতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সকল ভারতবাসী প্রকৃত বন্ধুর মতো বাস করিবে। এই স্বপ্ন সফল করার কাজে আমি মৃত্যুবরণ করাও শ্রেয় মনে করি। গৃহযুদ্ধে ছিন্নভিন্ন ভারতবর্ষ দেখিবার জন্য আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাই না—তার আগে ভগবান যেন আমাকে মৃত্যু দেন।'

সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার মহাশ্মশানে গান্ধীজি

ইহার পর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে যাহা ঘটিল তাহা জাতির পক্ষে একান্ত কলঙ্কময় ও পরম বেদনাদায়ক। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরাইয়া আনিবার জন্য যে-প্রাণান্ত প্রয়াস মহাত্মাজী করিতেছিলেন, অনেকে তাহা বরদাস্ত করিতে পারিল না,—গান্ধীজির এই মহতী প্রচেষ্টায় তাহারা যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। অবশেষে ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী দিল্লীতে তিনি যখন প্রার্থনাসভায় প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন হিংসাউন্মত্ত অতিশয় নির্মম এক হিন্দুযুবক তাঁহার প্রতি রিভলভারের গুলি নিক্ষেপ করে, এবং সেই আঘাতে মহাপ্রাণ 'বাপুজী'র জীবন-অবসান ঘটে। যিনি চিরটি জীবন অহিংসার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আসিয়াছেন, সেই মানবপ্রেমিক মহাত্মার জীবন-প্রদীপ নিভাইয়া দিল রক্তমুখী হিংস্রতা!

হিংসার যূপকাষ্ঠে অহিংসার পূজারী মহাত্মার আত্মদান

মহাত্মার মরদেহের বিনাশ ঘটিয়াছে, কিন্তু তাঁহার জীবনবাণী মরণবিজয়ী। সত্য ও অহিংসার মৃত্যু নাই। ধর্ম অবিনশ্বর। গান্ধীজী মানবসত্য ও মানব-ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মহাত্মাজীর সাধনা সত্য,

প্রেম ও শুচিসুন্দর মৈত্রীর সাধনা। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়া তিনি শাশ্বত সত্যধর্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই—এমন কি, রাজনীতিক স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রেও নয়। স্বাধীনতালাভের জন্য পৃথিবীর বহু জাতি রক্তপঙ্কিল পিচ্ছিল পথে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা ও জাতির আত্ম-স্বাতন্ত্র্যকে গান্ধীজী অপহরণ এবং দস্যুবৃত্তি-দ্বারা সহজলভ্য করিয়া তুলিতে চাহেন নাই। অহিংসার পথেও যে স্বাধীনতা অর্জন করা যাইতে পারে, সমগ্র বিশ্বকে তিনি তাহারই ইঙ্গিত দিয়া গেলেন। তাঁহার অহিংস সংগ্রাম ধর্মযুদ্ধ। 'ধর্মযুদ্ধ বাইরে জেতবার জন্য নয়, হেরে গিয়েও জয় করবার জন্যে। অধর্মযুদ্ধে সবটা মরা, ধর্মযুদ্ধে মরার পরেও অবশিষ্ট থাকে—হার পেরিয়ে জিত, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত। যিনি এই কথাটা নিজের জীবনে উপলব্ধি করে স্বীকার করেছেন, তাঁর কথা শুনতে আমরা বাধ্য।'

গান্ধীজীর জীবনাদর্শ মরণবিজয়ী

মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব ও জীবনসাধনা

[**রচনার সংকেতসূত্র :** ভূমিকা—অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মহাত্মা—ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজির দান—মহাত্মার অহিংসাধর্ম—গান্ধীজি কিসের সাধনা করিয়াছিলেন—ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য মহাত্মাকে বিচলিত করিয়াছে—শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি গান্ধীজির উপদেশ—যান্ত্রিক উৎপাদন-বিষয়ে মহাত্মার অভিমত—'হরিজন'-আন্দোলন ও বুনিয়াদি-শিক্ষাপরিকল্পনা—জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—উপসংহার।]

সভ্যতার 'মৈত্রেয়ী'-রূপ পৃথিবী হইতে আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন হইতে চলিয়াছে। আজিকার দিনে সর্বত্রই আমরা দেখিতেছি স্বাধীনতার নামে নির্মম বর্বরতা, শাসন ও শৃঙ্খলার নামে নির্লজ্জ শোষণবৃত্তি, জাতীয়তা আর রাষ্ট্রের উন্নতিবিধানের নামে দস্যুতা—অবাধ পরস্বা-পহরণ। বিংশ শতাব্দীর এই দানবীয় উন্মত্ততার মাঝখানে ভারতের 'নগ্নফকির' গান্ধীজির জীবনসাধনা যেন সকলেরই এক বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

ভূমিকা

বিশ্ববাসীর মানসজগতে, ভারতের মর্মলোকে মহাত্মা গান্ধী যে-প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাহা অনির্বাচ্য। তিনি ছিলেন কোটি কোটি ভারতবাসীর প্রতিদ্বন্দ্বীহীন অধিনায়ক—ভারতবর্ষের হৃদয়ভূমিতে তাঁহার মৃত্যুঞ্জয় প্রতিষ্ঠা।

অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মহাত্মা

গান্ধীজি ভারতের স্বাধীনতাযজ্ঞের সর্বপ্রধান ঋত্বিক। মহাত্মার বিশাল ব্যক্তিত্ব আমাদের রাষ্ট্রনীতিক জীবনে বিপুল ক্ষমতাসঞ্চার করিয়াছে।

গান্ধীজির লোকোত্তর প্রতিভা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সহিত আমাদের পরিচয়সাধন করিতে হইবে, এবং ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁহার নূতন দান কী, তাহাও আমাদিগকে বুঝিয়া লইতে হইবে। নতুবা তাঁহার স্বাধীনতাসংগ্রামের স্বরূপটি আমরা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিব না। মহাত্মার সকল শক্তিরই উৎস ছিল সুগভীর মানবতাবোধ, শাশ্বত মানবধর্মের প্রতি আত্যন্তিক শ্রদ্ধা এবং অহিংসা।

ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজীর দান

পৃথিবীতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ রাজনীতিবিদের অভাব নাই ; তাঁহাদের কূটনীতি দেশের স্বাধীনতা আনে, তাঁহাদের কুটিল কৌশল ও ক্ষুরধার বুদ্ধি আসন্ন বিনাশের হাত হইতে হয়তো নিজেদের দেশকেও বাঁচায়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তাঁহাদের কাছে এত বড়ো যে, তাহার জন্য তাঁহারা অধর্ম, অসত্য, ছলনাচাতুরী এবং পাশবিক হিংস্রতাকেও আশ্রয় করিতে অনুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। কিন্তু গান্ধীজীর স্বাধীনতাসংগ্রাম অহিংস—তাঁহার যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ। স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার জন্য নিজে মরিব, তথাপি শত্রুর গায়ে অস্ত্রাঘাত করিব না, শত্রুকে হিংসা করিব না—মরিয়াও জয়ী হইব, এই রকমের একটি আদর্শ জগতের কোনও রাজনীতিবিদ্ মানবজাতির সম্মুখে অদ্যাবধি তুলিয়া ধরেন নাই।

পশুবলদৃপ্ত মানুষের ধারণা, জীবনযুদ্ধে অহিংসানীতি হীনবীর্য ভীরুর ধর্ম। কিন্তু মানবতাধর্মে দীক্ষিত ও অহিংসাঅস্ত্রে শক্তিমান শীর্ণকায় এই মানুষটি বলেন :

মহাত্মার অহিংসাধর্ম

'Non-violence is not passivity in any shape or form. Non-violence, as I understand it, is the most active force in the world. Its hidden depth sometimes stagger me, just as stagger my fellow-workers'। অস্ত্রবল ও প্রমত্ত হিংসা দ্বারা যে হিংস্রতাকে প্রতিরোধ করা যায় না, তার প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় রক্তলেখায় চিহ্নিত আছে। গান্ধীজির মতে এই উন্মত্ত হিংসার হাত হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিতে পারে একমাত্র অহিংসানীতি—উচ্চতর মানবধর্মের উপর যাহার নিত্যকালের প্রতিষ্ঠা।

গান্ধীজীর জীবনদর্শনের মূলে প্রেরণাসঞ্চার করিয়াছিল অধ্যাত্মশক্তি—একটা সমুচ্চ নীতি। রাজনীতিক সংগ্রামে তাঁহার প্রধান অস্ত্র ছিল সত্যাগ্রহ, অসহযোগ, বিদ্বেষবিরহিত অহিংসা। মহাত্মা গান্ধীর অকম্পিত বিশ্বাস ছিল, একমাত্র অহিংসার পথেই ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা আসিবে। ভারতের বিগত কয়েক বৎসরের রাজনীতিক ইতিহাস তাঁহার সেই বলিষ্ঠ বিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণ করিয়াছে। ধর্ম, ন্যায় ও নীতিবর্জিত বর্তমান বিশ্বের এই অবিশ্বাসের যুগে অনেকে হয়তো তাঁহার জীবনদর্শনকে অবাস্তব স্বপ্নবিলাস বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিবে। উড়াইয়া দিক। কিন্তু মহাত্মার এই মরণবিজয়ী বাণীটি অবিস্মরণীয়: 'Permanent truth can never be the outcome of untruth and violence'। পৃথিবীর স্বার্থান্ধ রাষ্ট্রগুলি যদি তাহাদের চিরাচরিত হিংসা ও অসত্যে প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করিতে না পারে, তবে তাহারা যে নিজের হাতেই আত্মহত্যার পথ উন্মুক্ত করিবে—নিজেদের শ্মশানশয্যা রচনা করিবে, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। গান্ধীজীর সাধনা ব্যাধিগ্রস্ত পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিবার সাধনা।

গান্ধীজি কিসের সাধনা করিয়াছিলেন

মহাত্মার অহিংসানীতি শুধু রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রেও এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে তিনি আমাদিগকে বারবার পরামর্শ দিয়াছেন। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ধনীদরিদ্রের বৈষম্য ও সংঘাত তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। পৃথিবীর সর্বহারা উৎপীড়িতের ক্রন্দন তাঁহার হৃদয়ের গভীরে প্রতিনিয়তই ধ্বনিত হইয়াছে। তিনি নিপীড়িত নিঃস্ব মানুষের মুক্তির নির্দেশ দিয়াছেন অহিংসার পথে। মার্কস্, এঙ্গেল্স, লেনিন-প্রমুখ মানবপ্রেমিক মনীষিগণও দরিদ্রের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন। কিন্তু গান্ধীজীর পথ তাঁহাদের পথ হইতে স্বতন্ত্র। ধনীদরিদ্রের বৈষম্য যে মানবকল্যাণের পরিপন্থী, একথা মহাত্মা স্বীকার করেন। কিন্তু ইহা তিনি স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না যে, বলপ্রয়োগে ধনীর সঞ্চিত ধন দরিদ্রের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেই মানুষে মানুষে সকল অসাম্য চিরদিনের জন্য পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। তাঁহার নিশ্চিত ধারণা, হিংস্র অস্ত্রপ্রয়োগে সাম্যের পথ কখনো মুক্ত হইবে না—সঙ্গিনের আঘাতে সকল মানুষকে সাম্যের জগতে টানিয়া আনা যায় না।

ধনীদরিদ্রের বৈষম্য মহাত্মাকে বিচলিত করিয়াছে

গান্ধীজির নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নূতন সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম দিয়াছে। শ্রমিককে তিনি উপদেশ দিয়াছেন নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধি করিতে—সেই

শক্তিকে জাগ্রৎ করিয়া তুলিবার সাধনা করিতে। শ্রমিক যেদিন বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের প্রভূত শ্রমকে ভিত্তি করিয়াই ধনীর ঐশ্বর্যপ্রাসাদ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইদিন নির্বিচার শোষণের পর্ব শেষ হইয়া আসিবে। শ্রমিকের চিত্তে আত্মশক্তি-বিষয়ে চেতনা-সঞ্চার করিয়া দিবার জন্য চাই শিক্ষার আলো। ধনী মালিকের অতিরিক্ত মুনাফার পথ বন্ধ করিবার জন্য, শ্রমিকের আর্থিক সচ্ছলতা আনিবার জন্য গান্ধীজি শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের ও ব্যাপক কুটীরশিল্পপ্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়াছেন।

শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি গান্ধীজির উপদেশ

বৃহদায়তন শিল্প ও যান্ত্রিক উৎপাদনের ক্ষতিকর দিকটির প্রতি গান্ধীজি আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যান্ত্রিক উৎপাদন বেকারসমস্যার সমাধান নয়—ইহাই মহাত্মার সুচিন্তিত অভিমত। যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে কুটীরশিল্পের ব্যাপক প্রসার হইলে বহু বেকার মানুষের জীবিকা উপার্জনের পথ প্রশস্ত হইয়া উঠিবে—এই সত্যটিও গান্ধীজি প্রমাণ করিয়াছেন। এজন্যই খাদি-উৎপাদন, সুতা-কাটা প্রভৃতিকে তিনি তাঁহার অর্থনীতিতে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছেন। গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি গড়িয়া উঠিলে তাহাই হইবে আমাদের পক্ষে কল্যাণকর—পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে নগরকে মধ্যবিন্দু করিয়া যদি ভারতের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক কাঠামো গড়িয়া উঠে, তবে তাহা মঙ্গলপ্রসূ হইবে না—ইহা ছিল গান্ধীজীর দৃঢ় বিশ্বাস।

যান্ত্রিক উৎপাদন-বিষয়ে মহাত্মার অভিমত

অস্পৃশ্যতা ও অবিশ্বাস্য নিরক্ষরতা যে আমাদের সকল উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া দিতেছে, মহাত্মা তাহা যথার্থই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এগুলিকে বিদূরিত করিবার মানসেই 'হরিজন'-আন্দোলন এবং বুনিয়াদী-শিক্ষাপরিকল্পনা-বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে মনসংযোগ করিয়াছিলেন। মানুষকে ঘৃণা করিয়া সমগ্র জাতির উপর আমরা নিদারুণ অভিশাপ ডাকিয়া আনিয়াছি—মানবতা এবং চিত্তের উদারতার উপরই আমাদিগকে জাতীয় সংহতির ভিত্তি রচনা করিতে হইবে। মনুষ্যত্বের অবমাননা করিয়া সার্থক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যে অসম্ভব, একথা কাহাকেও বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

'হরিজন'-আন্দোলন ও বুনিয়াদী-শিক্ষাপরিকল্পনা

কিন্তু সমস্তকিছুরই মূলে কাজ করিবে সুনিয়ন্ত্রিত জাতীয় শিক্ষা। দেশের সকল স্তরের সকল মানুষের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও আমরা করিতে পারি নাই। কেবল মুষ্টিমেয় বিত্তবান মানুষ ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া বিজাতীয় ভাবধারায়

পুষ্ট হইতেছে—জাতীয় জীবনের সঙ্গে প্রতিদিন ঘটিতেছে তাহাদের বিচ্ছেদ। ইহা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার শোচনীয় দৈন্যই সূচিত করিতেছে। বিজাতীয় কেতাবী শিক্ষার প্রতি গান্ধীজির একেবারেই আস্থা ছিল না। তিনি নিজের পরিকল্পিত বুনিয়াদীশিক্ষাকে করিতে চাহিয়াছিলেন শক্তিপ্রদ জাতীয় ভাবে প্রণোদিত—শিল্পকেন্দ্রিক ও বৃত্তিমূলক।

জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

ভারতের রাষ্ট্রিক, আর্থিক, সামাজিক প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গান্ধীজির চিন্তাধারা লক্ষণীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আপন আত্মিক শক্তিকে আশ্রয় করিয়া মহাত্মা অহিংসার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সত্য ও ধর্মকে একমুহূর্তের জন্যও তিনি বিস্মৃত হন নাই। বাস্তব রাজনীতির সঙ্গে উচ্চতর মানবধর্মকে যুক্ত করিয়া দিয়া স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যলাভের এক অভিনব পরীক্ষায় তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অহিংসানীতি ও ধর্মযুদ্ধ জগতের কতখানি কল্যাণসাধন করিয়াছে, ভাবীকালের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। এশিয়া-ইউরোপে গান্ধীজির সমকক্ষতা করিতে পারে এমন মানুষের নাম খুব বেশী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। গান্ধীজি শুধু ভারতের বিস্ময় নহেন, তিনি এ যুগের আসুরিক শক্তিস্পর্ধিত ব্যাধিগ্রস্ত সমস্ত পৃথিবীরই বিস্ময়।

উপসংহার

গ্রন্থের সাহচর্য

[রচনার সংকেতসূত্র : প্রারম্ভিক ভূমিকা—কেন মানুষ মানুষের সঙ্গ কামনা করে—নিসর্গপ্রকৃতিও মানুষের সঙ্গী—মানুষের আর-একটি সঙ্গী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ—গ্রন্থের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রহিয়াছে মানুষের অন্তরতম সত্তার পরিচয়—গ্রন্থ মানুষের বহুবিচিত্র প্রয়োজনসাধন করে—গ্রন্থপাঠ ব্যতীত চিৎপ্রকর্ষ অসম্ভব– গ্রন্থের জগতে সত্যকার প্রবেশ সহজ নয়—অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের মধ্যে সেতু রচনা করে গ্রন্থরাজি—উপসংহার।]

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই মানুষকে আমরা দেখিতেছি যৌথজীবনের পটভূমিকায়। যখন সভ্যতার আলো মানবসংসারে বিকীর্ণ হয় নাই, মানুষ যাপন করিয়াছে অরণ্যচারী ভ্রাম্যমাণ জীবন, তখনও সে চাহিয়াছে তাহারই মতো

অপর একটি মানুষের সঙ্গ। মানুষের প্রবর্তিত এই যে সমাজ, তাহার মূলেও রহিয়াছে উক্ত সহজাত যৌথবৃত্তির প্রেরণা। তাই দেখি, মানবসমাজের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস মানুষে মানুষে মিলনেরই ইতিহাস—পারস্পরিক সাহচর্য ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে মিলনাকাঙ্ক্ষা তাহার সভ্যতাকে দিয়াছে একটি বিশিষ্ট রূপ।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

সমাজজীবনের মধ্যেই বিকাশলাভ করে মানুষের দেহের ধর্ম, মনের ধর্ম ও হৃদয়ধর্ম। তাহার যতই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব থাক না কেন, সমষ্টিজীবনকে বাদ দিয়া তাহার ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ স্ফূরণ কখনও সম্ভব নয়। তাই একটি প্রাণ চায় আর-একটি প্রাণের সাড়া, একটি ভাব চায় আর-একটি ভাবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিধৃত হইয়া থাকিতে। সভ্য মানুষ সমাজহীন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে পারে না। যৌথবৃত্তির কেন্দ্রাভিসারী শক্তি তাহাকে অপর মানুষের দিকে আকর্ষণ করে।

কেন মানুষ মানুষের সঙ্গ কামনা করে

আবার, শুধু মানুষই মানুষকে সঙ্গ দান করে না। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতিকেও মানুষ লাভ করিয়াছে তাহার জীবনবিকাশের সাথীরূপে। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ-সৌন্দর্যের অভিব্যক্তিকে পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া আমরা প্রতিনিয়ত বরণ করিয়া লইতেছি নিজেদের হৃদয়মন্দিরে—অন্তরের অন্তস্তলে।

নিসর্গপ্রকৃতিও মানুষের সঙ্গী

তারপর মানুষের আর-একটি নবতন সঙ্গীর আবির্ভাব হইল গ্রন্থরচনার সেই পরম শুভলগ্নে। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার গ্রন্থপ্রচারের সম্ভাবনাকে দান করিল অজস্রতা। মুদ্রাযন্ত্র মানুষের এক আশ্চর্য কীর্তি। ইহার সহায়তায় দূরদূরান্তর, অতীত-বর্তমান, পূর্বপশ্চিম একই সূত্রে গ্রথিত হইল—ঘুচিয়া-মুছিয়া গেল দেশ আর কালের গণ্ডীর দুস্তর ব্যবধান। নিজের ঘরের মধ্যেই মানুষ পাইল তাহার আত্মার আত্মীয়কে, বিশ্বমানবের সাহচর্য ও সঙ্গলাভ করিল সে গ্রন্থের মাধ্যমে।

মানুষের আর-একটি সঙ্গী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ

মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প ও সাহিত্যসাধনার নির্বাক সাক্ষীরূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বিশ্বের মহামূল্য গ্রন্থরাজি। এগুলির ভিতর দিয়া মানুষ লাভ করিতেছে আপন অন্তরতম সত্তার পরিচয়। নির্জন অরণ্যে তুমি যাও—কোনও মানব তোমার সাথী হইবে না সেই অরণ্যপ্রদেশে। কিন্তু তোমার দুঃসহ নিঃসঙ্গতা মুছিয়া দিবে একটি বই। অকূল সমুদ্রের জনহীন একটি দ্বীপে হইল তোমার দ্বাদশ বৎসরের জন্য নির্বাসন, সেখানেও মানুষের মুখ

গ্রন্থের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রহিয়াছে মানুষের অন্তরতম সত্তার পরিচয়

দেখিতে পাইবে না তুমি একটি যুগ ধরিয়া। কিন্তু তাহাতেও তোমার চিত্তের কোনো গ্লানি কিংবা দুঃখ নাই, যদি সঙ্গে থাকে বই-এর একটি সেল্‌ফ। যদি হৃদয়ের গভীর বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশ চাও, তবে তোমার চাই বিশিষ্ট মানুষের লেখা বিশিষ্ট কয়েকখানা বই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সেক্সপীয়র, গ্যেটে, কিংবা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কিংবা শেলীর লেখা গ্রন্থকে সঙ্গী করিতে পারিলে মানুষের হৃদয়-মনের বহুতর অভাব ঘুচিয়া যায়। বিশ্বকে উপলব্ধি করিতে হইলে মানুষের বই-এর অবারিত সঙ্গ না হইলে চলে না।

গ্রন্থ মানুষের বহুবিচিত্র প্রয়োজন সাধনকরে

মানুষের নিরন্তর সঙ্গ আমরা কামনা করি এইজন্য যে, মানুষ মানুষের প্রয়োজন মিটায়, পরস্পরকে আনন্দ দেয়। একই কারণে গ্রন্থের সঙ্গও আমাদের কাম্য—সে-ও দেয় আনন্দ, আর সাধন করে নানা প্রয়োজন। আমাদের হৃদয়ানন্দে সৃষ্ট হইয়াছে শিল্পকলা ও সাহিত্য, প্রয়োজন-বোধে সৃষ্ট হইয়াছে বিজ্ঞান। আর, পরাজ্ঞান ও জগৎরহস্যের উৎসসন্ধানের ফলে পাইয়াছি আমরা প্রাচী ও প্রতীচীর দর্শনকে। কিন্তু আজিকার দিনে কোথায় আমরা পাইব হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো, গ্যেটে, সেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ? কোথায় পাইব মাদাম কুরী, ফ্যারাডে, মার্কনি, এডিসন, জগদীশচন্দ্রকে? এই বিংশ শতাব্দীতে কোথায় পাইব শংকর, প্ল্যাটো, এ্যারিস্টটলকে? যদি তোমার গৃহে থাকে একটি গ্রন্থাগার, তবে ইঁহাদের সকলেরই নিকট-সান্নিধ্য মিলিবে, সেখানে উপলব্ধি করিবে তুমি তাঁহাদের নিঃশব্দ উপস্থিতি। দেখিবে, প্রাচীন গ্রীস, মিশর, রোম, ভারতবর্ষ, মহাচীন পরস্পরের দিকে তাকাইয়া আছে নির্বাক দৃষ্টিতে। যদি তোমার অন্তরে থাকে সঙ্গপ্রিয়তার প্রেরণা, আর যদি থাকে তোমার অধ্যবসায়, তবে বই-এর পাতা তোমার চোখের সম্মুখে খুলিয়া ধরিবে রহস্যময় এক অপূর্বসুন্দর জগৎ।

গ্রন্থপাঠ ব্যতীত চিৎপ্রকর্ষ অসম্ভব

সুতরাং সভ্য মানুষের চাই গ্রন্থরাজির সঙ্গ। ইতিহাস, পুরাণ, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের বই মানুষকে দান করে কত আনন্দ, শিক্ষা ও জ্ঞান। অতীতের ঐতিহ্য, নানামুখী চিন্তার অনুশীলন ও বিচিত্র ভাবধারা গুহায়িত রহিয়াছে গ্রন্থরাজির মধ্যে। সেখানে আসিয়া মিশিয়াছে বিভিন্ন জাতির বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্যের স্রোতোধারা, সেই ধারায় অবগাহন করিয়াই ঘটে মানুষের চিৎপ্রকর্ষ। বিশ্বের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়ের ক্ষেত্রে গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই মনীষী কার্লাইল্ তাঁহার 'On the Choice of

Books' প্রবন্ধের একজায়গায় বলিয়াছেন : 'The true university of our days is a collection of books'।

বাস্তব জীবনে আমরা দেখি, মানুষের সঙ্গ মানুষকে নানাভাবে প্রভাবিত করে—বই-এর সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা বলা যায়। ভালো এবং খারাপ সঙ্গীর মতো, ভালো বই এবং খারাপ বইয়ের প্রভাব অনস্বীকার্য। ভালো বইকে গ্রহণ করিতে হইবে অনুসন্ধান করিয়া, যাচাই করিয়া, বাছাই করিয়া। ভালো গ্রন্থের রচয়িতা অতীতের ও দূরের সেই মনীষীরা—'Noble deads'—সহজে কিন্তু কথা বলেন না। তাঁহাদের মুখে ভাষা ফুটাইয়া তুলিতে হইলে চাই অশেষ ধৈর্য, অধ্যবসায় ও বিচক্ষণতা। ইহার জন্য মননশক্তি ও হৃদয়বৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে জাগ্রৎ রাখিতে হইবে। নতুবা বইয়ের জগতের গভীরতম প্রদেশ হইতে জ্ঞান ও আনন্দের সম্পদ আহরণ করা যাইবে না। ভূগর্ভের অন্ধজঠরে গুপ্ত রহিয়াছে কত সোনা, কিন্তু প্রকৃতি সহজে মানুষকে তাহা দান করে না—তাহার জন্য চাই শ্রম, উৎসাহ, মনের একাগ্রতা। তেমনি বই-এর পৃথিবী হইতেও আনন্দ এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে হইলে আমাদিগকে অধ্যবসায়ী হইতে হইবে।

গ্রন্থের জগতে সত্যকার প্রবেশ সহজ নয়

সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের উপাসক যে-সব কবি, জ্ঞানী, দার্শনিক, বিজ্ঞানীর দল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা লইয়া, হৃদয়ের দ্বার একেবারে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়া, গ্রন্থের রাজ্যে মানুষকে পদচারণ করিতে হইবে। তবে তাঁহারা আমাদিগকে সঙ্গ দান করিবেন, তবে আমাদের সঙ্গে ওইসব বিশ্ববন্দিত মনীষীরা কথা বলিবেন। একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাবনত চিত্তেই অতীতের মহামনীষীদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়সাধন করিতে হইবে।

উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মানুষকে দেয় অনাবিল আনন্দ। মানুষের উচ্চতর বৃত্তিগুলি চায় সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের আলো। জ্ঞানসাধনা ও শিল্পসাধনা মানুষকে প্রতিদিনের তুচ্ছতার সংসার হইতে তুলিয়া ধরিয়াছে এক উচ্চতর ভাবলোকে। আবার, মানুষের সভ্যতার কোনো একটি-মাত্র বিশিষ্ট যুগ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই অতীতের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করিতে হয় বর্তমানকে এবং বর্তমানের পটভূমিকায় গড়িয়া ওঠে অনাগত ভবিষ্যৎ। অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের মধ্যে সেতু রচনা করে যুগোত্তীর্ণ গ্রন্থরাজি। গ্রন্থের সাহচর্যের সূত্র ধরিয়া মানুষ অগ্রসর হইয়া চলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবর্তনপথে। আমাদের বৃহত্তর জীবনের যাত্রাপথের সবচেয়ে বড়ো সঙ্গী জগদ্বরেণ্য মনীষীদের রচিত মূল্যবান গ্রন্থ।

অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের মধ্যে সেতু রচনা করে গ্রন্থরাজি

বই-এর সঙ্গ তাই মানুষের এত কাম্য। কত মানুষের চলার পদচিহ্ন পড়িয়াছে পৃথিবীর বুকে—তাহার ছন্দকে ধরিয়া রাখিয়াছে বই। কত ভাষায় মানুষ কথা বলিয়াছে, সেই কথার সংগীতধ্বনি স্তম্ভিত হইয়া আছে বই-এর পৃষ্ঠায়। বিচিত্র মানুষের হৃৎস্পন্দন মর্মরিত হইতেছে গ্রন্থরাজির পাতায় পাতায়। মানুষ যখন একান্ত নিঃসঙ্গ, তখন তাহার সেই নিঃসঙ্গ একাকীত্বকে মুছিয়া দেয় গ্রন্থের সাহচর্য। মানুষ মানুষের সঙ্গী, প্রকৃতিও মানুষের সঙ্গী—কিন্তু মানুষের আরও একটি সঙ্গী উৎকৃষ্ট গ্রন্থরাজি। কে না ভালোবাসে এই গ্রন্থকে? যে বলে, গ্রন্থ ভালো লাগে না—মানুষ-নামের অযোগ্য সে, জীবন তাহার বিড়ম্বিত।

উপসংহার

প্রাচীন বাংলাসাহিত্য

[**রচনার সংকেতসূত্র :** প্রারম্ভিক ভূমিকা—প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে ধর্মীয় প্রভাব ও গদ্যরচনার অভাব—প্রাচীন বাঙালী কবিরা ধর্মের বেদীতলে আসিয়া ভিড় জমাইয়াছেন—আমাদের প্রাচীন সাহিত্য কোন্ কোন্ ধর্মের প্রভাব স্বীকার করিয়াছে—প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে শক্তিদেবতার প্রাধান্যের হেতু—ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যকীর্তন—অনুবাদশাখা—বৈষ্ণবগীতিকবিতা—বৈষ্ণবজীবনীসাহিত্য—পূর্ববঙ্গ-গীতিকা—শাক্তপদাবলী—ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ প্রমুখ সেকালের কবি—প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—উপসংহার।]

বাংলাভাষা ও বাংলাসাহিত্য বাঙালীজাতির বিশিষ্ট গৌরবময় সম্পদ। বাঙালীর জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিচিত্র চিন্তা ও ভাবসাধনা রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে এই সাহিত্যের মধ্যে। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বহু প্রতিভাশালী সাহিত্যশিল্পীর রচনাসম্ভারে বাংলাসাহিত্য আজ আশ্চর্যরূপে সমৃদ্ধ। আজিকার এই বাংলাসাহিত্যের পিছনে রহিয়াছে বাঙালীর সহস্র বছরের ভাবজীবনের ইতিহাস। উহাকে চিনিয়া লইতে না পারিলে, কেবলমাত্র বিশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন সাহিত্যপ্রবাহের ভিতর বাঙালীর অন্তরতর জীবনের সমগ্র রূপটি ধরা যাইবে না। এ কারণে প্রাচীন বাংলাসাহিত্য আলোচনার সার্থকতা রহিয়াছে।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে ধর্মীয় প্রভাব ও গদ্যরচনার অভাব

বাংলার প্রাচীন সাহিত্য ইউরোপীয় চিত্তের সংস্পর্শ ও সংঘাত হইতে মুক্ত। যে-কোনো দেশের পুরাতন যুগের সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান। ধর্মের ভাবটিই মানুষের মনে প্রথমে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, এবং উহা নানাভাবে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা যোগাইয়াছে। আবার, গদ্যরচনার অভাবও প্রায় সকল দেশের পুরাণো সাহিত্যের একটা সাধারণ লক্ষণ। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যেও এই দুইটি লক্ষণ কাহারো দৃষ্টি এড়াইবার নয়। আঠার শতকের পূর্বের যে বাংলাসাহিত্য তাহাতে গদ্যের ব্যবহার একরকম নাই বলিলেই চলে—উহা পদ্যে রচিত।

প্রাচীন বাঙালী কবিরা ধর্মের বেদীতলে আসিয়া ভিড় জমাইয়াছেন

বিভিন্ন ধর্ম ও উপধর্মকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের পুরাতন যুগের সাহিত্য-রূপটি অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। শৈবধর্ম, শাক্তধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সেকালের কবিদলকে প্রভাবিত করিয়াছিল। ধর্মের বেদীতলে এ সকল কবি সমবেত হইয়া ভক্তিবিগলিত চিত্তে দেবদেবীর প্রশস্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাহিরের রূপজগতের শোভাসৌন্দর্য, মানবের বাস্তব জীবনের আনন্দবেদনার আলোছায়া প্রাচীন কবিকে তেমন আকৃষ্ট করে নাই। তাই পুরাণকথা, মহাভারতের কাহিনী, দেবদেবীর অলৌকিক লীলাকে লইয়া পুরাতন বাংলাসাহিত্যের ভিত্তি রচিত হইয়াছে—রক্তমাংসের মানুষ চাপা পড়িয়া গিয়াছে ধর্মভাব ও ভক্তিপ্রবাহের নীচে।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্য কোন্ কোন্ ধর্মের প্রভাব স্বীকার করিয়াছে

বৌদ্ধসহজিয়াসম্প্রদায়ের কবিগণরচিত 'চর্যাপদ'ই বাংলাসাহিত্যের বিশিষ্ট প্রাচীনতম নিদর্শন। দশম-একাদশ শতাব্দী ইহার রচনাকাল। মনে হয়, বৌদ্ধধর্মাচার্যগণই বাংলাসাহিত্যের গোড়াপত্তন করেন। এযুগে হয়তো বৈষ্ণব আর শাক্তকবিরাও তাঁহাদের গান বাঁধিয়াছিলেন, কিন্তু উহার কোনো বাস্তব নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। দেশের ধর্মকলহের কাহিনীই প্রাচীন যুগের সাহিত্যে বিশেষভাবে বাণীবদ্ধ হইয়াছে। বোধ করি শৈবধর্মই প্রথমে বাংলার জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। নানা কাব্যের মধ্যে তাই শিবের কাহিনীই সবচেয়ে বেশী পরিদৃষ্ট হয়। 'ধান ভান্‌তে শিবের গীত' প্রবাদবাক্যটি লক্ষ্য করিলেও বুঝা যায়, একসময় বাংলাদেশে শৈবধর্ম খুব প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত নানাকারণে শৈবধর্ম জনগণের চিত্তে আপন প্রভাবচিহ্ন অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই—শক্তিদেবতার কাছে শিব পরাজিত হইয়াছে।

একদিন বাংলার সমাজজীবনে যে-অত্যাচার-অবিচার-বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল এবং তাহার ফলে বাঙালীজাতি যে-অসহায়তা অনুভব করিয়াছিল, তাহার হাত হইতে পরিত্রাণের পথ খুঁজিতে গিয়া তাহারা বিরাট সংযমের প্রতীক, সংসারের সুখ-দুঃখ-বেদনার প্রতি উদাসীন শিবের উপর বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারে নাই। সেজন্য সেদিন বাঙালী দুর্বলের সহায় একটি অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচারী শক্তির উপর নির্ভরশীল হইয়া তাহারই পূজায় আত্মনিয়োগ করিয়া মুক্তির উপায় খুঁজিয়াছিল। সংসারভোলা শিবের পরিবর্তে বাঙালী চণ্ডীদেবীকে, মনসাদেবীকেই অধিক ভক্তি করিয়াছে, আপন বলিয়া জানিয়াছে। চণ্ডী, মনসা, শীতলা ইত্যাদি নারীদেবতাকে লইয়া বাংলা-দেশে বিপুল সাহিত্য রচিত হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রচিত কাব্যখানি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে মঙ্গল-কাব্যগুলির অধিকাংশ রচিত হয়।

প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে শক্তিদেবতার প্রাধান্যের হেতু

প্রাচীন বাংলার জনপ্রিয় বীর লাউসেনের কীর্তিকথা অনেকগুলি কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যের সহিত রাঢ় দেশের বীরশ্রেষ্ঠ লাউসেনের কাহিনী বিজড়িত হইয়া যে-কাব্য রচিত হইয়াছে তাহা 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতকের কবি মাণিক গাঙ্গুলি ও ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল' প্রসিদ্ধ পুস্তক। রাজা মাণিকচাঁদের পুত্র গোপীচাঁদ এবং রাজপত্নী ময়নামতীকে অবলম্বন করিয়া ভবানীদাসের 'ময়নামতীর গান' ও দুর্লভ মল্লিকের 'গোবিন্দচন্দ্রগীত' কাব্যদুইটি রচিত হইয়াছে।

ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যকীর্তন

এ যুগে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া হিন্দুর ইতিহাস-পুরাণ ইত্যাদির প্রচারও সবিশেষ লক্ষণীয়। ইহারই ফলে বাঙলাসাহিত্যে সংস্কৃত কাব্যাদির অনুবাদের ধারাটি প্রবর্তিত হয়। কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ বাঙালীর জাতীয় জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাংলা-রামায়ণ-রচয়িতাদের মধ্যে কৃত্তিবাস প্রধানতম কবি। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণলীলা অবলম্বন করিয়া মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচনা করেন। পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীকৃত মহাভারতের অনুবাদ উল্লেখযোগ্য। এই অনুবাদকার্য ষোড়শ শতাব্দীতে সাধিত হইয়াছিল। সপ্তদশ শতকে কাশীরাম দাস মহাভারতের অনুবাদ করেন।

অনুবাদশাখা

মঙ্গলকাব্যে আমরা দেখিয়াছি স্বেচ্ছাচারী শক্তির লীলা, বৈষ্ণবসাহিত্যে

আমরা দেখিলাম সর্বজয়ী প্রেমের গীতিময় রূপায়ণ। বাংলাসাহিত্যে বহুকাল ধরিয়া ধর্ম-সংঘাত চলিয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণবধর্মই পরিণামে জয়লাভ করিয়াছে। শাক্তের শক্তি বলরূপিণী, বৈষ্ণবের শক্তি আনন্দময়ী ও প্রেমরূপিণী। মাধুর্যশক্তির কাছে ঐশ্বর্যশক্তির পরাজয় স্বাভাবিক। এই প্রেমধর্ম বাংলার সমাজজীবনে সাম্য ও মুক্তির বাণী বহন করিয়া আনিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেও বাংলাসাহিত্যকুঞ্জে আমরা বৈষ্ণবকবিতার কলগুঞ্জন শুনিয়াছি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মুখে। চণ্ডীদাস বাংলার প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ গীতিকবি।

বৈষ্ণবগীতিকবিতা

শ্রীচৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব ও প্রেমসাধনা বাঙালীর মনোজগতে আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করিল। উঁহার প্রেরণায় বাংলাসাহিত্যে যুগান্তর আসিল—সৃষ্টি হইল বিরাট বৈষ্ণবসাহিত্যের। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, রায়শেখর, নরোত্তমদাস বৈষ্ণবসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। বৈষ্ণব-সাধকের হাতেই বাংলাসাহিত্যে সর্বপ্রথম জীবনচরিত রচনার সূত্রপাত হয়। বৈষ্ণবকাব্যে দেবদেবীর অলৌকিক মাহাত্ম্য বর্ণিত হয় নাই—দেবতার বেনামীতে নিকষিত মানবীয় প্রেমের মহিমাই কীর্তিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবজীবনীসাহিত্য

মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণবগীতিকবিতার পাশে প্রাচীন সাহিত্যে আরও একটি কাব্যধারার অভিনব প্রকাশ দেখিতে পাই। আমরা পূর্ববঙ্গগীতিকার কথাই বলিতেছি। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাংলাদেশে লোকসাহিত্যের অপূর্ব অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল। পল্লীর মানুষের সুখদুঃখ, আনন্দবেদনার চিত্তচমৎকার প্রকাশ এই পূর্ববঙ্গগীতিকা। ইহাতে দেবতার মহিমাবন্দনা ও কীর্তিকথা নাই—আছে রক্তমাংসের নরনারীর চিরন্তনী হৃদয়বৃত্তির আকূতি। লৌকিক প্রেমজীবন এমন করিয়া ইতঃপূর্বে বাংলাসাহিত্যে আর কোথাও চিত্রিত হয় নাই। 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'চন্দ্রাবতী', 'আঁধাবধূ', 'ধোপার পাট', 'চৌধুরীর লড়াই' ইত্যাদি গাথা বাংলাসাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ।

পূর্ববঙ্গগীতিকা

বাংলামঙ্গলকাব্যগুলিতে শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী চণ্ডীর যে-রূপটি আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার মধ্যে ছিল একটা প্রবল প্রচণ্ডতার ভাব। এই চণ্ডীকে দূর হইতে ভয়াতুর চিত্তে কেবল ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করা যায় মাত্র। এজন্য চণ্ডীমঙ্গলকাব্যগুলি আমাদের হৃদয়ের রসপিপাসা পরিপূর্ণভাবে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। শাক্ত-পদাবলীর মধ্যে কিন্তু শক্তিদেবতার সেই অত্যুগ্র প্রবলতা নাই—এখানে প্রচণ্ড শক্তি কোমলতায় ও মাধুর্যে স্নিগ্ধমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। শাক্তপদাবলীর

শাক্তপদাবলী

'আগমনী' ও 'বিজয়া'-সংগীত স্নেহমমতার রসে অভিষিক্ত। গীতিকবিতার ক্ষেত্রে এই পদগুলি বৈষ্ণবপদাবলীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে। শাক্তপদাবলীর শ্রেষ্ঠ রচয়িতা হইতেছেন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাংলাসাহিত্যের যে-বহুমুখী বিকাশ দেখা যায়, নানাকারণে আঠার শতকে তাহার গতিবেগ স্তিমিত হইয়া আসে। এ সময়টিতে তাই উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্ট হইতে পারে নাই। এ যুগের সর্বোত্তম কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। তাঁহার রচিত 'অন্নদামঙ্গল' বাংলা সাহিত্যের একখানি সর্বজনপরিচিত কাব্যগ্রন্থ। ভক্ত-কবি রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক। আমাদের সাহিত্যে ভারতচন্দ্রই সর্বশেষ মঙ্গলকাব্যরচয়িতা। ভারতচন্দ্রীয় যুগের কবিরা পুরাতন ধারাটিকে অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন—কোনও নূতন কাব্যাদর্শ তাঁহারা প্রবর্তন করিতে সমর্থ হন নাই। কবিগান, পাঁচালী ইত্যাদি রচনা তখন জনগণের মনোরঞ্জন করিত। পুরাতনের অনুকরণের মধ্যেই আঠার শতকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ প্রমুখ কবি

প্রাচীন বাংলাসাহিত্য আলোচনা করিলে ইহার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। বিষয়বৈচিত্র্যের অভাব, একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি, ভাব ও রচনাভঙ্গীর ক্ষেত্রে গতানুগতিকতা, নানা ধর্ম ও উপধর্মের সংঘাত এবং কাব্যরচনায় ইহার প্রভাব আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের লক্ষণীয় বস্তু। একই চণ্ডীমঙ্গল, একই মনসামঙ্গল, একই ধর্মমঙ্গল-রচনায়, একই রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদে অজস্র কবির শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে। পরবর্তী কবি পূর্ববর্তীর ধারা অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন। এজন্য প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যের হাওয়া তেমন খেলিতে পারে নাই। বাঙালীর অদৃষ্টবাদ, দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তন প্রাচীন বাংলাসাহিত্যকে একটা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, নানা দেবদেবীর বর্ণনা মানুষকে আড়ালে সরাইয়া দিয়াছিল। সর্বত্রই অলৌকিকত্ব, দেবতার অহৈতুক উৎপাত—একমাত্র পূর্ববঙ্গগীতিকায় ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়।

প্রাচীন বাংলসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

সে যাহা হোক, প্রাচীন সাহিত্যকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। চণ্ডীদাস হইতে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত অসংখ্য বাঙালী কবি যে-বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে কাব্যশিল্পগত সৌন্দর্য আছে, রসের গভীরতা আছে, আছে অনুভূতির তীব্রতা। বৈষ্ণবগীতিকবিতাগুলি কেবল বাংলাসাহিত্যে নয়—পৃথিবীর সাহিত্যেও অপূর্ব

উপসংহার

সৃষ্টি। আধুনিক সাহিত্যের মধ্যেই হৃদয়ধর্মী বাঙালীর সাহিত্যসৃষ্টিপ্রতিভার সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাকে প্রাচীন সাহিত্যের ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি জানাইতে হইয়াছে। কোনো দেশেরই সাহিত্য একদিনে সৃষ্ট হয় না—তাহার পিছনে থাকে বহুযুগের ভাবসাধনার ইতিহাস। সেই ইতিহাসের ধারার সঙ্গে সংযোগরক্ষা করিয়াই নবতন সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করে। এই কারণেই প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না।

আধুনিক বাংলাসাহিত্য

[**রচনার সংকেতসূত্র :** প্রারম্ভিক ভূমিকা—আধুনিক বাংলাসাহিত্য ও পাশ্চাত্ত্য প্রভাব—প্রাচীন বাংলাসাহিত্য মানবিকতার স্পর্শবর্জিত—নূতন ভাবজগতের সহিত পরিচয়—বাংলাসাহিত্যে আধুনিকতা-বিষয়ে একটি কথা—বাস্তব জগৎ ও জীবন লইয়াই আধুনিক সাহিত্যের কারবার—আধুনিক বাংলাসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ—আধুনিক সাহিত্যস্রষ্টাদের বিচরণক্ষেত্র—অতি-আধুনিক বাংলাসাহিত্য—আধুনিক বাংলাসাহিত্যের বৈচিত্র্য—উপসংহার।]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

বাংলাসাহিত্যকে আমরা মোটামুটি দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছি—প্রাচীন ও আধুনিক। সাহিত্যের এই যে সুচিহ্নিত যুগবিভাগ, ইহা শুধু কালগত নয়, ভাবগতও বটে। আকৃতি ও প্রকৃতির দিক দিয়া আধুনিক বাংলাসাহিত্য প্রাচীন বাংলাসাহিত্য হইতে অনেকখানি বিভিন্ন। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের রূপ আর স্বরূপের পরিবর্তনও অনিবার্য। নূতন শিক্ষা ও সভ্যতা, নূতন অভিজ্ঞতা সামাজিক মানুষের ভাবলোকে আলোড়ন জাগায়, তাহার ফলে ঘটে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। সেই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর সুস্পষ্ট ছায়াপাত দেখি আমরা জাতির সাহিত্যে।

আধুনিক বাংলাসাহিত্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব

আমাদের আধুনিক সাহিত্যের গোড়াপত্তন হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সহিত পরিচয় ঘটিবার পর হইতেই বাঙালীর ভাবজীবনে একটা বিপ্লব দেখা দেয়। তখন চিন্তায়, ভাবে, ভাবনায়, রুচিতে যে-পরিবর্তন ঘটিল, তাহার ছায়া-সম্পাত দেখিলাম আমরা বাংলাসাহিত্যের মধ্যে। পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে বাংলাসাহিত্যের বহিরঙ্গ রূপটিই যে শুধু পরিবর্তিত হইল তাহা নয়, তাহার স্বরূপের মধ্যেও আসিল একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন।

দশম হইতে আঠার শতক পর্যন্ত আমাদের যে সাহিত্যসৃষ্টি, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে একটি বিশিষ্টতা সকলেরই চোখে পড়ে,—ধর্ম ও উপধর্মের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যেই সীমায়িত ছিল সেদিনকার কবিদের পরিক্রমা। সে-যুগের সাহিত্যে বিষয়বৈচিত্র্য ছিল না বলিলে খুব ভুল বলা হয় না। কল্পনাগত বিচিত্রতার সম্পর্কেও সেই একই কথা। চর্যাপদে, মঙ্গলকাব্যে, নাথসাহিত্যে অলৌকিকতা, পল্লবগ্রাহিতা, ধর্মের জয়গান ও দেবতার প্রশস্তিবন্দনা বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। দেবদেবীর মহিমাকীর্তন করিতে গিয়া ধূলার জগতের মানুষের সুখদুঃখের কথা সে-কালের বাঙালী কবিরা একরূপ বিস্মৃত হইয়াছেন,—অসংখ্য দেবতার আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে মানুষের জীবন।

প্রাচীন বাংলাসাহিত্য মানবিকতার স্পর্শবর্জিত

বৈষ্ণবগীতিকবিতার মধ্যে আমরা কবিকল্পনার কিছুটা বৈচিত্র্য দেখিতে পাই সত্য, কিন্তু সেখানেও কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই—ধর্মের গণ্ডীর মধ্যেই তাঁহাদের ভাবকল্পনা নিবদ্ধ রহিয়াছে। একমাত্র পূর্ববঙ্গগীতিকাগুলির মধ্যেই আমরা মানবীয় চরিত্রের বিকাশ দেখিতে পাই—সেখানে মানুষের সুখদুঃখ, আনন্দবেদনাই বিশেষরূপে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু এজন্য মনে প্রশ্ন জাগে, এই গীতিকাসাহিত্য কতখানি প্রাচীন। আমাদের ধারণা পূর্ববঙ্গগীতিকা আধুনিক কালেরই সৃষ্টি।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগ হইতেই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভিতর দিয়া নব-প্রবুদ্ধ বাঙালী বিশাল বিচিত্র এক ভাবজগতের সন্ধান পায়। সেখানে ধর্মীয় মনোভাব বড়ো হইয়া দেখা দেয় নাই—প্রকট হইয়া উঠিয়াছে মর্তমানুষের জীবন ও রূপরসময় জগৎ। উহার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের অর্গলিত মনের দুয়ার খুলিয়া গেল, ধীরে ধীরে মনের সংকীর্ণতা দূর হইল,—ঘটিল আমাদের চিত্তমুক্তি। এই নবজাগ্রৎ জীবনবোধের ফলে সাহিত্যের মধ্যে বাজিয়া উঠিল স্বতন্ত্র একটা সুর। এখানেই আধুনিক যুগের প্রারম্ভ, অন্যদিকে পুরাতন কাব্যধারার সমাপ্তি। সাহিত্যে মানুষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল—সত্য হইয়া উঠিল চতুষ্পার্শ্বের পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই পৃথিবী।

নূতন ভাবজগতের সহিত পরিচয়

আমাদের সাহিত্যে আধুনিকতার সুরটি যে একান্তভাবে ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষা ও সাহিত্যেরই প্রভাবজনিত, তাহা মনে করিলে অবশ্যই ভুল করা হইবে। কেন-না, ভারতচন্দ্রের কাব্যে ও তাঁহার পরবর্তী কবিওয়ালাদের যুগে রাধাকৃষ্ণের প্রেমসংগীতে, শ্যামাসংগীতে, আগমনী-গানে মানবিকতার সুরটি ধীরে ধীরে

বাজিয়া উঠিতেছিল। এ যুগের কবিরা ধর্মীয় মনোভাবের প্রভাব কাটাইয়া মানবীয়তার আদর্শটিকে সাহিত্যে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

বাংলাসাহিত্যে আধুনিকতা-বিষয়ে একটি কথা

ভারতচন্দ্রীয় যুগে বহিরঙ্গ রূপগত কোনো পরিবর্তন না আসিলেও, প্রকৃতির দিক দিয়া সাহিত্য যে বদলাইয়া যাইতেছিল, তাহা কৌতূহলী পাঠকের চোখে নিশ্চিত-ভাবে ধরা পড়ে। একথাও অনস্বীকার্য যে, পাশ্চাত্ত্য হাওয়ায় প্রভাবিত হওয়ার পূর্বে আমাদের সাহিত্যে মানবিকতার যে-আদর্শটি ছিল নীহারিকার মতো ছায়াময়, ইউরোপীয় ভাবচিন্তার সংস্পর্শে আসার ফলে তাহা প্রস্ফুট হইয়া উঠিল। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতি পাশ্চাত্ত্য মানসিকতার নির্ভুল স্বাক্ষর বহন করিতেছে। কাব্য-সাহিত্যে মধুসূদনের এবং কথাসাহিত্যে বঙ্কিমের প্রতিভাকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের সাহিত্যে এই আধুনিক যুগের প্রতিষ্ঠা হয়।

আধুনিক সাহিত্য বাঙালীর বাস্তব-রসপিপাসা চরিতার্থ করিল। মানুষের দুর্বলতা ও মহত্ত্ব, মানবজীবনের মহিমা ও মানবচরিত্রের দৈন্যের সহিত আমাদের

বাস্তব জগৎ ও জীবন লইয়াই আধুনিক সাহিত্যের কারবার

নূতন পরিচয় ঘটিল। একালের সাহিত্যের মাধ্যমেই আমরা লাভ করিলাম জাতীয়তার মন্ত্র, স্বাদেশিকতার অপূর্ব সঞ্জীবন স্পর্শ। আধুনিক বাংলাসাহিত্য মানুষের মর্যাদাকে, জীবনের বিচিত্রতাকে প্রেক্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। প্রাচীন যুগের সাহিত্যে জগৎ ও জীবনকে এমন করিয়া আমরা দেখিতে পাই নাই।

আমাদের এ যুগের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা পরম বিস্ময়ের বস্তু। গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে বিহারীলাল যে-কাব্যমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহারই

আধুনিক বাংলাসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক। বিহারীলালের ভাবসাধনাকে আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ আপনার লোকোত্তর বাণীরচন-প্রতিভাবলে বাংলাকাব্যকে আশ্চর্য সৌন্দর্য ও বিপুলা সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন—রবি-কবির কাব্যে জগৎ ও জীবন বিচিত্র ঐশ্বর্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন করিয়া রূপসৌন্দর্যের আরতি বাংলার আর কোন্ কবি করিয়াছেন? পঞ্চইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া কোন্ কবি এমন করিয়া জীবনের রহস্যসন্ধান করিয়াছেন? ভারতীয় ভাবসাধনা ও ইউরোপীয় রূপতন্ত্র আর কোন্ কবির কাব্যে এমন সহজসুন্দর সমন্বয় লাভ করিয়াছে? বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে আধুনিক।

মধুসূদন-বঙ্কিম হইতে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র হইতে অতি-আধুনিক সাহিত্যশিল্পীবৃন্দ—ইঁহাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বড়ো কম নয়। আমাদের শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নানান্ দিক ইঁহাদের রচনায় চিত্রিত হইয়াছে।

আধুনিক সাহিত্যস্রষ্টাদের বিচরণক্ষেত্র

বঙ্কিম ও তাঁহার সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের লেখায় সমাজের অভিজাতশ্রেণীর মানুষের চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে বেশী। প্রধানত জমিদারশ্রেণী, ভৌমিক শ্রেণীকে লইয়াই ছিল তাঁহাদের সাহিত্যের কারবার। রবীন্দ্রনাথের রচনায় উচ্চ-মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনকথা বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। মধ্যবিত্তজীবনের সুখদুঃখের কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম সাহিত্যে রূপদান করেন। শরৎচন্দ্র তাঁহারই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়াছেন—তিনি আরও একটু নীচে নামিয়া আসিয়াছেন, নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনকথাকেই তিনি মুখ্যত আশ্রয় করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত, সমাজের নির্যাতিত নরনারীর বেদনার ইতিহাস তাঁহার সাহিত্যেই প্রথম রূপ পরিগ্রহ করে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, তিনি বাংলাকথাসাহিত্যে একটা নূতন যুগের সৃষ্টি করিলেন।

অতিআধুনিক সাহিত্যস্রষ্টা যাঁহারা, তাঁহাদের আনাগোনার ক্ষেত্রটি আরও প্রশস্ত। জীবনের আনাচেকানাচে তাঁহাদের সন্ধানী দৃষ্টি প্রসারিত—সর্বহারা, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত জীবনের প্রতি ইঁহাদের মমত্ববোধের অভাব নাই। তাঁহারা

অতিআধুনিক বাংলা সাহিত্য

একেবারে জনগণের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছেন। কয়লা-খনির মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ শ্রমিক ও যাযাবরজীবনের ছন্দ ইঁহাদের রচনার পাতায় পাতায় স্পন্দিত হইতেছে। বর্তমানের যান্ত্রিকসভ্যতাসম্ভূত দুঃখদারিদ্র্য আমাদের জীবনে যে-জটিল সমস্যা আনিয়া দিয়াছে, তাহার নানাদিক অতিআধুনিক সাহিত্যিকের লেখায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বহুমুখী বাস্তব-জীবনালেখ্যের সার্থক রূপায়ণে ইঁহাদের সাহিত্যকর্ম বিচিত্রতা লাভ করিয়াছে।

এতক্ষণ আমরা আধুনিক সাহিত্যের প্রকৃতি অর্থাৎ অন্তরঙ্গ স্বরূপলক্ষণের কথাই বলিয়াছি। বহিরঙ্গ রূপ বা আকৃতির দিক দিয়াও এই সাহিত্য প্রাচীন যুগের সাহিত্য হইতে স্বতন্ত্র। প্রাচীন সাহিত্য প্রধানত ধর্মকথা ও দেবদেবীর

আধুনিক বাংলাসাহিত্যের বৈচিত্র্য

অলৌকিক আখ্যানবর্ণনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তা ছাড়া, প্রাচীন যুগের সাহিত্যের বাহন ছিল পদ্য। উনিশ শতকের প্রথম দিকে গদ্যের সৃষ্টি হইল, ইহার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাসাহিত্যের আকৃতিরও বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটিল—সৃষ্টি হইল উপন্যাস, গল্প, নাটক, প্রবন্ধের।

পদ্যের ক্ষেত্রেও নানারূপ বৈচিত্র্য দেখা গেল। পয়ার, লাচাড়ী, ত্রিপদী ইত্যাদি ছন্দের বন্ধন হইতে মধুসূদনই সর্বপ্রথম বাংলা-কবিতাকে মুক্তি দিলেন। অমিত্রাক্ষর-ছন্দের প্রবর্তন মধুসূদনের স্মরণীয় একটি কীর্তি। ইহাতে শুধু যে কাব্য-সাহিত্যেরই উন্নতি হইল তাহা নয়, বাংলা-নাটকরচনার ক্ষেত্রটিও অনেকখানি প্রশস্ত হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মহতী সৃজনীপ্রতিভার স্পর্শে বাংলাকাব্যে যুগান্তর আনিলেন, তিনি কত কত মিশ্রছন্দের আবিষ্কার করিলেন। সনেট এবং 'ওড্' জাতীয় কবিতা মধুসূদনই বাংলাভাষায় আমদানি করেন। অতিআধুনিক বাঙালী কবিদের হাতে বিষয়বস্তু ও ছন্দসম্পর্কিত আজ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে।

আধুনিক বাংলাসাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার স্পর্ধা রাখে। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রমুখ লেখক ইহাকে সুদীর্ঘ পরমায়ু দান করিয়াছেন।

উপসংহার

বাংলা ছোটগল্প, উপন্যাস, গীতিকবিতা বাঙালীর শ্লাঘার সামগ্রী। অল্পকালের মধ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালী যে-প্রতিভার খেলা দেখাইয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়াবহ। জীবনবোধের গভীরতায়, ভাব ও ভাবনার বিচিত্র রূপায়ণে বাংলাসাহিত্য আজ অতিশয় সমৃদ্ধ। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশংকর, বিভূতিভূষণের মতো সাহিত্যশিল্পী বা রূপদক্ষ যে-কোনো দেশেরই গৌরবের স্থল। এক অপরূপ বাণীজগৎসৃষ্টির মাধ্যমে বাঙালী জাতি আপনার অবিনশ্বরতা অর্জন করিয়াছে।

সাহিত্যের প্রকৃতি

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—মানবচিত্তে সাহিত্যের নিত্যকালীন আবেদন—সাহিত্যের স্বরূপনির্ধারণ করা বস্তুত কঠিন—আনন্দময় সত্তার অধিকারী মানুষ—সাহিত্য মানুষের ব্যক্তি-পুরুষের প্রকাশ—জাগতিক বস্তুকে আমরা নানাভাবে জানি—বুদ্ধির বিশ্লেষণে সাহিত্যের রসের সন্ধান মিলে না—কেবল অমূর্ত হৃদয়ভাব সাহিত্য নয়—উপসংহার।]

'সাহিত্য' কথাটি খুব ব্যাপক। একদিকে গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতা ইত্যাদি যেমন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, অন্যদিকে দর্শন-বিজ্ঞান-অর্থনীতি-সমাজনীতি প্রভৃতির বাণী-আশ্রিত রূপও এই 'সাহিত্য' শব্দটির

প্রারম্ভিক ভূমিকা

অন্তর্ভূত। এককথায়, মানুষের ভাব ও ভাবনা, চিন্তা ও জ্ঞান, বিচিত্র স্বপ্নকল্পনা আর অনুভূতির বাঙ্ময় মূর্তিটিই আমাদের কাছে সাহিত্য

নামে পরিচিত। এই অর্থে ইংরেজী 'লিটারেচর' কথাটি 'সাহিত্যে'র সমার্থ-বাচক। এই যে সাহিত্য, ইহার রহিয়াছে ভিন্নতর দুইটি রূপ। ইহাদের মধ্যে যে-অংশে রসসৃষ্টি মুখ্য, তাহাকে আমরা বলি সুকুমার সাহিত্য—যে-অংশে তত্ত্ব, তথ্য বা জ্ঞানের প্রচারণা প্রাধান্যলাভ করে, তাহাকে বলি জ্ঞানের সাহিত্য। ইংরেজী ভাষার 'Literature of Power' এবং 'Literature of Knowledge' কথাদুইটি বেশ অর্থদ্যোতক। জ্ঞানের সাহিত্যটি অতি স্পষ্ট, একটা সুনির্দিষ্ট অর্থকে প্রকাশ করিয়াই তাহার কাজ শেষ হইয়া যায়। তত্ত্ব, তথ্য, সত্য ও সিদ্ধান্তসম্বলিত সাহিত্যের এই অংশটির বিষয়ে তাই আমাদের মনে তেমন কোনো দুরূহ জিজ্ঞাসা জাগে নাই। কিন্তু সুকুমার সাহিত্য বলিতে যাহা আমরা বুঝি, তাহার রূপ, স্বরূপ ও মূল্যায়নকে কেন্দ্র করিয়া নানা যুগের সমালোচকের মনে জাগিয়াছে বহুতর জিজ্ঞাসা।

আমরা—একালের মানুষরা—যাহাকে বলিতেছি 'সাহিত্য', প্রাচীনেরা তাহাকেই বলিতেন 'কাব্য'। সমস্ত রসসৃষ্টিকে অর্থাৎ ভাবের রূপসৃষ্টিকে তাঁহারা 'কাব্য'-সংজ্ঞাটির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। একালে রসসিক্ত ছন্দিত বাণী-রচনাকেই বলা হয় কাব্য। প্রাচীনদের সাহিত্যবিচারশাস্ত্রটি আমাদের নিকট 'পোয়েটিক্স্' বা 'অলঙ্কারশাস্ত্র'-নামে পরিচিত। দুই ভাষার এই নামদুইটিও লক্ষ্য করিবার মতো। প্লেটো তাঁহার বিখ্যাত 'রিপাব্লিক' হইতে কবিকে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। বোধ করি, তিনি বুঝিয়াছিলেন, অবাস্তব জীবন ও জগৎ, ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য, অনিত্য বস্তুকে লইয়া নিখিল কবি-মানুষের কারবার—মিথ্যার বেসাতি করাই বুঝি কবির কাজ। সুতরাং তাঁহার 'রিপাব্লিকে' কবির স্থান হইল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, কবিমনীষীগণের ভাবসাধনার প্রতি দার্শনিকপ্রবর প্লেটোর নির্মমতা সত্ত্বেও বিভিন্ন যুগে সাহিত্যরস-রসিকের অভাব দেখা যায় নাই। এমন কি, প্রাচ্যের আলংকারিকেরা কাব্যরসের আস্বাদকে পরব্রহ্মের আস্বাদের তুল্য বলিয়াছেন।

মানবচিত্তে সাহিত্যের শাশ্বত আবেদন

সাহিত্যের রসসৌন্দর্য আমরা উপভোগ করি বটে, কিন্তু তাহার অন্তরঙ্গ স্বরূপ-নির্ধারণ করা তত সহজ নয়। পৃথিবীতে এমন কতকগুলি বস্তু আছে যাহাকে কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা-দ্বারা সম্পূর্ণ বুঝানো যায় না। সাহিত্যের জন্মকথাটি জানিতে পারিলে ইহার যথার্থ প্রকৃতিটি হয় তো আমরা কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারিব।

মানুষকে ঘিরিয়া রহিয়াছে একটি অখণ্ড জীবনপ্রবাহ আর বিচিত্রসুন্দর

নিসর্গসংসার। আমরা নিয়তই লাভ করিতেছি সমাজস্থ অগণন মানুষ ও বহিঃপ্রকৃতির সান্নিধ্য। প্রকৃতিকে আপনার কাজে লাগাইবার জন্য মানুষের বুদ্ধির কত খেলা। বুদ্ধির ক্ষেত্রটি সুবিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটিতেছে মানুষের জ্ঞানের প্রসার। সেই জ্ঞান সার্থক হইয়া উঠিতেছে প্রতিনিয়ত নূতন নূতন তথ্য ও তত্ত্বের আবিষ্কারে—মানুষ গড়িয়া তুলিতেছে দর্শন-বিজ্ঞানের বিশাল সৌধ। বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানবজীবনের রহস্য ধরা দিতেছে মানুষের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে। বুদ্ধির মাধ্যমে জগৎ ও জীবনকে জানা আজও শেষ হয় নাই।

সাহিত্যের স্বরূপনির্ধারণ করা বস্তুত কঠিন

কিন্তু অন্যান্য পশুর মতো মানুষ শুধু প্রাত্যহিক প্রয়োজনসীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। দেহপ্রীতি, আত্মরক্ষা, সমাজবন্ধনকে ছাড়াইয়া সে আরও অনেক উর্ধ্বে উঠিয়াছে—আবিষ্কার করিয়াছে আনন্দের স্বর্গলোক। মানবসংসার ও নিসর্গসংসারের সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের সম্পর্কটাই কিন্তু শেষ কথা নয়। জগৎ ও জীবনকে আমরা যেমন জানি বুদ্ধি দিয়া, আবার তেমনি হৃদয় দিয়াও গভীরভাবে উপলব্ধি করি। এই হৃদয়বৃত্তির ক্ষেত্রেই মানুষের আনন্দময় সত্তা প্রয়োজনের গণ্ডীটিকে অতিক্রম করিয়া বহির্বিশ্বকে পরম আত্মীয়রূপে আলিঙ্গন জানায়। বহির্জগৎ তখন আমাদের কাছে কেবল বাহিরের দুদণ্ডের অতিথিমাত্র নয়—আমাদের আত্মার নিকটতম আত্মীয়। জগতের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ, মানুষের হাসিকান্না, আনন্দবেদনা, সুখদুঃখ কত বিচিত্রভাবে আমাদের হৃদয়দুয়ারে আঘাত হানিতেছে। তাহাতে মানুষ সাড়া না দিয়া পারে না।

আনন্দময় সত্তার অধিকারী মানুষ

জগৎ ও জীবনের সান্নিধ্যে আসিয়া মানুষের মনে যে-বিচিত্র ভাবানুভূতি জাগে, সাহিত্য তাহারই রূপাশ্রিত বাণীবিগ্রহ। শুধু প্রয়োজনসাধনের সামগ্রীরূপেই বস্তুবিশ্ব আমাদের কাছে সত্য নয়—সে সত্য হইয়া উঠে তাহার অবারিত রূপসৌন্দর্যের আবেদনে। বস্তুকে জানাটা দর্শন ও বিজ্ঞানের লক্ষ্য, সাহিত্যে তাহা উপলক্ষ-মাত্র। বহির্বিশ্বের নানান্ বস্তুর মধ্য দিয়া সাহিত্যস্রষ্টা উপলব্ধি করেন নিজেকেই। এইদিক হইতে দেখিতে গেলে সাহিত্য মানুষের ব্যক্তিপুরুষের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি ছাড়া অন্যকিছু নয়। একটি ফুলের পরিচয় নানা মানুষের কাছে নানা রকমের। ধরা যাক্ একটি পদ্মের কথা। সাধারণ মানুষের কাছে সে শুধু সামান্য একটি ফুলমাত্র। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ বিজ্ঞানীর চোখে ফুলটির বিশিষ্ট পরিচয় অপেক্ষা উঁহার জাতিপরিচয়টিই বড়ো। কেন না, তাঁহার

সাহিত্য মানুষের ব্যক্তি-পুরুষের প্রকাশ

কাছে পদ্মটি কেবল 'ভিক্টোরিয়া রিজিয়া'। কবির কাছে ওই ফুলের পরিচয়টি ভিন্নতর। তাহার সুন্দরবোধ বলে, পদ্মটি মাত্র ফুলই নয়—'ফুলের রাণী'—'সূর্যের লীলাসঙ্গিনী'। আবার, একজন বেদান্তবাদী দার্শনিকের কাছে ফুলটি শুধু প্রতিভাসমাত্র—সত্তাহীন নিছক মায়া, সুতরাং উহার অস্তিত্ব মিথ্যা।

দেখা যাইতেছে, বস্তুকে আমরা নানাভাবে জানি—বুদ্ধিতে জানি, জ্ঞানে জানি, আর জানি হৃদয় দিয়া। কবির জানা হৃদয়বৃত্তি বা অনুভূতির, দার্শনিক-বিজ্ঞানীর জানা বুদ্ধি ও জ্ঞানের। কিন্তু জাগতিক বস্তুনিচয়ের 'intimate sense' বিজ্ঞান—এমন কি, দর্শনও দিতে পারে না—দিতে পারে কবি। বস্তুর রসস্বরূপের উপলব্ধির যথার্থ প্রকাশেই সাহিত্যের সার্থকতা। স্রষ্টার বিচিত্র হৃদয়ানুভূতির রঙে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে বলিয়াই জীবন ও জগৎ সাহিত্যলোকে এমন অপূর্বতা-অপরূপতা লাভ করে। তাই সাহিত্য লৌকিক জগতের অনুকৃতি নয়—ইহা অভিনব সৃষ্টি। বস্তুর কায়া আর কবিকল্পনার মায়া ইহাকে দান করে রসাভিষিক্ত একটা অনন্যতা—আনন্দরসের উচ্ছলনে ইহা নিত্য স্পন্দিত। এই রসসত্তাটিই সাহিত্যের অন্তরঙ্গ স্বরূপ।

জাগতিক বস্তুকে আমরা নানাভাবে জানি

কিন্তু সহজে ইহা পাঠকের চোখে ধরা পড়ে না। নানাজন তাই নানাভাবে সাহিত্যের রসপদার্থটিকে খুঁজিয়া ফিরে। কেউ খুঁজে অলংকারে, কেউ খুঁজে রীতিতে, কেউ খুঁজে বাচ্যে, কেউ-বা খুঁজে ব্যঞ্জনায়। কিন্তু সাহিত্যের বিশ্লিষ্ট অংশের মধ্যে বস্তু-অতিশায়ী অনির্বাচ্য রসের সন্ধান মিলিবে না—ইহা তো সমষ্টি নয়, ইহা অখণ্ড ঐক্য। রস আছে শব্দ-অলংকার-রীতি-বাচ্য-ব্যঞ্জনা ইহাদের সবকিছুকে জড়াইয়া ও সবকিছুকেই ছাড়াইয়া। সকল বিশ্লেষণের অতীত একটি পরম-ঐক্যের অনুরণনের মধ্যেই ইহার ধ্বনিটি ধরা পড়ে। 'সাহিত্য' কথাটির ধাতুগত অর্থটিতে এ রকম একটা ঐক্য বা মিলনের ভাব নিহিত রহিয়াছে। এই মিলন বা সহিতত্ব শুধু দূরের সঙ্গে কাছের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কিংবা বহু হৃদয়ের একত্র সংযোগে নয়; এই সহিতত্ব রহিয়াছে বাচ্য ও বাচকে, ভাব ও রূপে, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকে। বুদ্ধির বিশ্লেষণে সাহিত্যের তত্ত্ব গড়িয়া উঠে, কিন্তু রসের সন্ধান পাওয়া যায় না। রসবস্তুটি বহুতর সামগ্রীর সমীভবনসঞ্জাত আনন্দঘন অনুভব ভিন্ন আর-কিছুই নয়।

বুদ্ধির বিশ্লেষণে সাহিত্যের রসের সন্ধান মিলে না

আমরা বলিয়াছি, হৃদয়ের ভাবানুভূতি লইয়াই সাহিত্যের কারবার। কিন্তু আকারহীন অমূর্ত হৃদয়শায়ী ভাব সাহিত্য নয়—ভাবের রূপবিলসিত রসসিক্ত

ভাষামূর্তিটিই সাহিত্য। মানুষের হৃদয়ভাবের স্বভাবটিই প্রকাশধর্মী—রূপাশ্রয়ী। রূপকে অবলম্বন করিয়াই ভাব রসমণ্ডিত হইয়া উঠে। তাই ছন্দ-অলংকার-চিত্র-সংগীত ইত্যাদির সহায়তায় কায়াহীন ভাবকে রূপময় করিয়া তোলার এত প্রচেষ্টা, তাই সাহিত্যে বিশেষ কথার জন্য বিশেষ ভাষা। সাহিত্যের ভাবটি আবেগ-স্পন্দিত বলিয়া ইহার ভাষাটিও সাধারণত সুরঝংকৃত। কেবল বস্তুগত অর্থকে প্রকাশ করিয়াই শিল্পীর মনের কথাটি শেষ হইয়া যায় না—শেষের মধ্যেও যেন অশেষটি থাকিয়া যায়। এই যে ভাষাতীত অনির্বচনীয়তা, ইহারই জন্য সাহিত্যের কথা সুরকে আশ্রয় করিয়া মূর্ত হইয়া উঠিতে চায়। অর্থের দ্বারা সীমাবদ্ধ প্রতিদিনকার প্রয়োজনের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার এইখানেই প্রভেদ।

অমূর্ত হৃদয়ভাব সাহিত্য নয়

ভাব এবং রূপকে যেখানে অদ্বয়ভাবে পাই সেখানেই সাহিত্যসৃষ্টি সার্থক। ইহাদের একটিকে বাদ দিয়া অন্যটিকে পাওয়ার মধ্যে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে। দেহ আর প্রাণ পরস্পর জড়িত হইয়াই যেমন মানুষ, ভাব আর রূপের অভঙ্গ মিলনের ফলে তেমনি সাহিত্য—সাহিত্যকর্মে উভয়েরই মূল্য সমান। সাহিত্যে কতখানি ভাব থাকিবে, কতখানি থাকিবে কলাবিধি, তাহার সীমানির্দেশ করা যায় না। রূপদক্ষ বাহিরের কোনো নিয়মকেই মানিয়া চলে না। কেন-না, শিল্পীর মন চিরকালই স্বতন্ত্র—পরতন্ত্রের বশ্যতা সে কোনকালেই বরদাস্ত করে না। সাহিত্য সুন্দরবোধের অধিকারী আনন্দধর্মী মর্ত্যমানবের রূপশ্রীমণ্ডিত বাঙ্ময় বিগ্রহ—রসাত্মকতাই ইহার সত্যকার স্বরূপ বা প্রকৃতি।

উপসংহার

সাহিত্যের মূল্যবিচার

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রারম্ভিক-ভূমিকা—একালের মানুষ সাহিত্যে কেবলমাত্র রস-বস্তুটিকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চায় না—লৌকিক জীবন ও অলৌকিক রসের মধ্যে সত্যকার সম্পর্কটি কী—বস্তুগত সত্যকে রূপায়িত করাই কি সাহিত্যের কাজ—সাহিত্য ও সুন্দর—সমাজকল্যাণই কি সাহিত্যের বড়ো জিনিস—উপসংহার।]

আমাদের প্রাচীনেরা 'রস'কেই সাহিত্যশিল্পের আত্মা বা প্রাণবস্তু বলিয়া জানিয়াছিলেন। 'রসাত্মকং বাক্যং কাব্যম্'—তাঁহাদের এই বহুশ্রুত কথাটির

সহিত আমরা সকলেই পরিচিত। হৃদয়ভাবের রসমূর্তি সৃষ্টি করিয়া পাঠক-সাধারণকে আনন্দ দেওয়াই তাঁহারা সাহিত্যের লক্ষ্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। সাহিত্যে সমাজমঙ্গলের আদর্শের কথাও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন। কিন্তু আসলে সাহিত্য-সম্পর্কে উহা যে তাঁহাদের মনের কথা নয়, তাহা বুঝিয়া লইতে এতটুকু বেগ পাইতে হয় না। ভারতীয় একজন প্রাচীন আলংকারিক বা সাহিত্যের রসবেত্তা বলিয়াছেন—আনন্দনিস্যন্দী নাট্যের ফলও যাঁহারা ইতিহাস প্রভৃতির মতো সাংসারিক জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি-মাত্র বলেন, সেইসব অল্পবুদ্ধি সাধুদের নমস্কার—রসের আস্বাদ কী, তাহা তাঁহারা জানেন না। সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী চিত্তবৃত্তি-বিশেষ এই যে রস, ইহাকেই প্রাচীনেরা সাহিত্যসৃষ্টির চরম লক্ষ্যরূপে মানিয়া লইয়াছিলেন।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

কিন্তু আধুনিক যুগে আমরা শুধু এই রসটিকে আস্বাদন করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে চাই না। আমরা আধুনিকেরা বলিতেছি—'এহ বাহ্য, আগে কহ আর'। বস্তুবাদ ও সমাজচেতনা একালের মানুষের মনে নানাকারণে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তাই সাহিত্যের ভিতরেও আজ আমরা খুঁজিতেছি সমাজের হিতসাধন বা লোকমঙ্গল-আদর্শ। একারণে এ যুগের সাহিত্যশিল্পীর পক্ষে পাঠককে শুধু আনন্দপরিবেশন করিয়াই ছুটি পাইবার উপায় নাই, কল্যাণের পথে সমাজকে অগ্রসর করিয়া দিবার গুরু-দায়িত্বটিও আমরা তাঁহাদের উপর নির্বিচারে চাপাইয়া দিয়াছি। আবার, একালের বিজ্ঞানীদের প্রচারিত মতবাদ আমাদিগকে এমন বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে যে, সাহিত্যে বাস্তব সত্যকেও আজ আমরা নানাভাবে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। সুতরাং সাহিত্যকারকে মিটাইতে হইবে একদিকে সামাজিক দাবী, অন্যদিকে সত্য-সন্ধিৎসার দাবী। তবে কি সমাজের হিতসাধন ও বস্তুগত সত্যের প্রচারণাই সাহিত্যের লক্ষ্য?

একালের মানুষ সাহিত্যে শুধু রস-বস্তুটিকে লইয়াই সন্তুষ্ট নয়

লৌকিক ভাবের অলৌকিক রসমূর্তিকেই আমরা বলিয়াছি সাহিত্য। সুতরাং সাহিত্য কবিপ্রতিভার মায়াশক্তিতে সৃষ্ট আনন্দঘন একটি বস্তু। কিন্তু আধুনিক সমালোচকগোষ্ঠী বলিবেন: সাহিত্যরসটি লৌকিক না হইতে পারে, কিন্তু কবি বা সাহিত্যিক লৌকিক সমাজে বাস করেন—অর্থাৎ তিনি সামাজিক জীব। অতএব সমাজের ভালোমন্দকে তিনি উপেক্ষা করিবেন কী করিয়া? এইভাবে সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে আমরা অচ্ছেদ্য একটি সংযোগসূত্র খুঁজিতেছি।

লৌকিক জীবন ও অলৌকিক রসের মধ্যে সম্পর্কটি কী

সাহিত্যে সমাজ আছে, জীবন আছে, আছে জগৎ—এ কথা অবশ্যস্বীকার্য, এবং বস্তুনিরপেক্ষ রসসৃষ্টি যে সম্ভব নয়, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু গোলমাল বাধে তখন, যখন ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপটি আমরা ভুলিয়া যাই। সমাজকে সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত দেখি সাহিত্যেরই প্রয়োজনে—, নিছক সমাজকে রূপায়িত করিবার জন্যই যে সাহিত্যে সমাজের স্থান নয়, এ সত্যটি ভুলিলে চলিবে না। উপায়কে লক্ষ্য বলিয়া ধরিয়া লইলে এ রকম গোলযোগ ঘটিতে বাধ্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে—সাহিত্যের সঙ্গে সত্যের সম্পর্কটি কী? সত্যকে রূপ দেওয়াই কি সাহিত্যের কাজ? পূর্বে আমরা বলিয়াছি, বস্তুনিরপেক্ষ সাহিত্য বলিয়া কোনো জিনিস নাই। বস্তুকে সত্যদৃষ্টিতে দেখিতে হয় সাহিত্যিককে। কারণ, বস্তুর প্রতীতিকে লঙ্ঘন করিলে পাঠকের চিত্ত রসের উদ্রেক করা কঠিন হইয়া পড়ে। বস্তুহীন ভাব নিরালম্ব নিরাশ্রয়। অথচ ভাবকে রূপাশ্রিত, রসমণ্ডিত করিয়া তোলাই সাহিত্যের কর্তব্য। এজন্য বস্তুসত্যকে একেবারে উপেক্ষা করা সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি বলিব, সাহিত্য বাস্তবসত্যের বাহনমাত্র নয়। সত্যকে আবিষ্কার করা দর্শন ও বিজ্ঞানের কাজ। এজন্য প্রাকৃত সত্য ও সাহিত্যসত্যে অনেকখানি পার্থক্য রহিয়াছে। সাহিত্যে যদি কোনো সত্য থাকে, তবে তাহা বস্তুর রসরূপটিকে উপলব্ধি করারই সত্য। বস্তুবিশ্ব ও মানবজীবন হৃদয়ে যে-ভাবাবেগ সৃষ্টি করে, সাহিত্যে পাই তাহারই অভিব্যক্তি। জগৎ ও জীবনের যে-বিচিত্র রহস্য সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে অভিব্যক্ত হয়, তাহা বস্তুবিষয়ক তথ্য বা সত্যের কঙ্কালমাত্র নয়, তাহাকে বলিব বস্তুর রস-স্পন্দন। সাহিত্যস্রষ্টা সৌন্দর্য, আনন্দ বা রসের আবরণে সত্য অথবা মঙ্গল প্রচার করেন না—হৃদয়ানুভূতিকেই প্রকাশ করেন রূপময়ী ভাষায়, একটা বিশেষ বাণীভঙ্গিতে। এ কারণে সাহিত্য জীবন ও জগতের 'imitation' নয়, ইহাকে একরূপ 'revelation' বা 'vision' বলা যাইতে পারে।

বস্তুগত সত্যকে রূপায়িত করিয়া তোলাই কি সাহিত্যের কাজ

অনেকে বলিয়া থাকেন, সাহিত্য সুন্দরের প্রকাশ, অর্থাৎ সৌন্দর্যসৃষ্টিই ইহার লক্ষ্য। আমরা বলিতে চাই, সাহিত্য সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে না—আনন্দকে প্রকাশ করে সৌন্দর্যসৃষ্টির মাধ্যমে। যাহা আমাদিগকে যথার্থ আনন্দ দেয়, তাহাই সুন্দর। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাহিত্যে জীবন আছে, জগৎ আছে, বস্তু আছে, সত্য আছে, আর আছে সুন্দর। আবার, মানুষের সমাজটিও সাহিত্যে উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু জীবন ও

সাহিত্য ও সুন্দর

সমাজ-বিষয়ক কল্যাণচিন্তা হইতে সাহিত্য জন্মলাভ করে নাই। এ সব জিনিস সাহিত্যের উপাদান-মাত্র, লক্ষ্য নয়। সাহিত্যের লক্ষ্য হইল মানুষকে আনন্দ দেওয়া, পাঠকের কাছে জীবন ও জগৎসম্পর্কিত রসানুভূতির স্পন্দনটিকে তুলিয়া ধরা। তবে এ কথাও আমরা বলিব, জীবন ও জগতের সঙ্গে যে-সাহিত্য যত অধিক জড়িত, তাহার আকর্ষণ আর আবেদন ততই গভীর—স্থায়িত্বের দাবী তাহার অপেক্ষাকৃত বেশী। হৃদয়ে-হৃদয়ে সহিতত্বের দীর্ঘস্থায়ী সেতু সেই সাহিত্যই গড়িতে পারে বেশী, যে-সাহিত্যে বৃহত্তর জগৎ ও সমাজজীবনের ছায়াসম্পাত অধিকতর।

সমাজের উন্নতির কথা সাহিত্যে নাই-বা রহিল—ইহাতে যদি থাকে জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধির কথা, সেটাও তো মানুষের কম পাওয়া নয়। বোধ করি, সাহিত্যের এই দিকটার প্রতি লক্ষ্য করিয়া একজন সমালোচক বলিয়াছেন :

সমাজমঙ্গলের কথাই কি সাহিত্যের বড়ো জিনিস

'If the inventors of machinery have given mankind supplementary, extra-corporeal limbs, the poets have a far nobler gift for us, they have opened new windows in our souls'। সমাজ ও জীবনের কল্যাণসাধন করিবার, বস্তুর তথ্য ও সত্যকে আবিষ্কার করিবার মানুষ জগতে খুব কম নাই। কিন্তু সার্থক সাহিত্যস্রষ্টা, শিল্পী—আনন্দের পরিবেশনকারী মানুষ—খুব বেশী আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। মানবের বেদনাখিন্ন জীবনে তাঁহারা আনন্দধারা প্রবাহিত করিয়া দিন, এই কামনাটিই বোধ করি শুভবুদ্ধির লক্ষণ।

শিল্পীর ব্যক্তিপুরুষেরই একটি প্রকাশ হইল সাহিত্য, এবং এই প্রকাশের প্রেরণামূলে রহিয়াছে স্রষ্টার আনন্দবেদনার উপলব্ধি। 'অন্য-উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ সাহিত্যিক-আনন্দ কাম্য কিনা, তা যার মন কাম্য বলে জেনেছে, তার কাছেই কাম্য ; সে-বোধ যার মনে নেই, তার কাছে প্রমাণ করা যাবে না—মনের অনুভূতি ছাড়া তার অন্য প্রমাণ নেই।' সাহিত্যের নিগূঢ় প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে ইহার সত্যকার সম্পর্কটি কী, তাহা বুঝিয়া লইতে না পারিলে সাহিত্যবিচারে নানা গোলযোগ দেখা দিবারই সম্ভাবনা অধিক। সাহিত্যের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির প্রয়োজন খুব বেশী।

উপসংহার

সাহিত্যে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ

[সাহিত্যে নীতি]

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—সমাজকল্যাণ ও নীতিবোধ—সাহিত্যে সমাজনীতির স্থান কতখানি—সাহিত্যসত্য ও বাস্তবসত্য—সাহিত্যে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের দ্বন্দ্ব—আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ, ইহাদের কোনোটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়—সাহিত্যে সত্য সুন্দর ও মঙ্গল, কোনোটিকেই উপেক্ষা করা চলে না—বঙ্কিমসাহিত্যের বিরুদ্ধে আধুনিকের অভিযোগ—বাস্তববোধ সাহিত্যোৎকর্ষের একমাত্র মাপকাঠি নয়—স্তূপীকৃত বস্তুপুঞ্জকে কেহ সাহিত্য বলে না—নিছক বস্তুতন্ত্রবাদ বলিয়া সাহিত্যে কিছু নাই—শরৎসাহিত্যের বাস্তবতা কি নিছক বস্তুকেন্দ্রিক—মানুষের জীবনবোধ-সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনশীল—উপসংহার।]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ ও জীবনের যোগটি অবিচ্ছেদ্য। রসসাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য হয়তো আনন্দসৃষ্টি—কিন্তু ইহার উপাদান হইল সমাজঅন্তর্ভুক্ত সমাজশাসিত মানবজীবন। সুতরাং সাহিত্যশিল্পী সমাজ ও জীবনসম্পর্কিত নানা জিজ্ঞাসাকে এড়াইয়া চলিতে পারেন না। পাঠকের মনেও সাহিত্যের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জাগে, এবং ইহাদের সঙ্গে আসিয়া পড়ে সাহিত্যে শ্লীলঅশ্লীল, সুন্দর-অসুন্দর, সুনীতি ও দুর্নীতির বিচিত্র জিজ্ঞাসা। শিল্পের ক্ষেত্রে রসাস্বাদনজনিত আনন্দকেই একমাত্র ফলশ্রুতি বলিয়া গ্রহণ করিতে অনেক পাঠক দ্বিধাগ্রস্ত। তাই সাহিত্যকর্মে এই নীতির প্রশ্ন—মঙ্গল-আদর্শের প্রশ্নটি—আধুনিককালে খুব বড়ো হইয়া দেখা দিয়াছে।

সমাজকল্যাণ ও নীতিবোধ

সমাজপ্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মনে জাগিয়াছে নীতিবোধ। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণসাধন করিতে হইলে, সমষ্টির মঙ্গলবিধান করিতে হইলে প্রথমে প্রয়োজন ব্যষ্টির আত্মসংকোচন। ব্যষ্টির অহংবোধকে, তাহার স্বার্থবুদ্ধিকে কিছুটা সংকুচিত করিতে না পারিলে সামাজিক মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের পথটি প্রশস্ত হইয়া উঠে না। ব্যষ্টির নিরঙ্কুশ স্বার্থবুদ্ধি ও স্বেচ্ছাচারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই সমাজে সৃষ্টি হইয়াছে বহুতর বিধিনিষেধের। সমাজসত্তার পরিপুষ্টির জন্যই নীতিবোধের অনুশাসনকে মানুষ স্বীকৃতি জানাইয়াছে।

আর্টের ক্ষেত্রে—সাহিত্যসংসারে—এই সমাজনীতির স্থান কতখানি, ইহাই আমাদের বিবেচ্য। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে কিন্তু উক্ত নীতির প্রশ্নটি এককভাবে তেমন বড়ো হইয়া দেখা দেয় নাই। সাহিত্যশিল্পে সুন্দরের সাবলীল প্রকাশকে প্রাধান্য দিলেও প্রাচীনেরা সত্য, শিব ও সুন্দরের মধ্যে সর্বথা এবং সর্বদা একটা সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন—শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রেয়বোধকে তাঁহারা প্রেয়বোধ হইতে বিযুক্ত করিয়া দেখেন নাই। প্রাচীন সাহিত্যে তাই সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আদর্শ একবৃন্তে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে।

সাহিত্যে সমাজনীতির স্থান কতখানি

বস্তুত সুকুমার শিল্পের বিচারে স্থান ও কালভেদে পরিবর্তনশীল সামাজিক নীতির প্রশ্নটি একহিসাবে অবান্তর। কেন-না, যদিও সাহিত্যের মূলে রহিয়াছে সমাজ ও জীবন, তথাপি সাহিত্য ইহাদের প্রতিকৃতি বা অনুকৃতি নয়—সমাজ ও জীবনকে স্বীকার করিয়া লইয়াও সাহিত্য ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যায়। সেজন্য রূপে ও রসে ইহা সম্পূর্ণ একটা নূতন সৃষ্টি হইয়া উঠে। বাস্তব জগৎ ও সাহিত্যজগতের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। লৌকিক জগৎ শিল্পীর প্রতিভার যাদুস্পর্শে অলৌকিক হইয়া উঠে। সমাজপ্রভাবকে উপেক্ষা করিতে না পারিলেও, সাহিত্যে থাকে শিল্পীর রসসৃষ্টির প্রেরণা—ঠিক সমাজকল্যাণের তাগিদে ইহার সৃষ্টি নয়। সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি শিল্প স্বভাবধর্মেই স্বতন্ত্র। সামাজিক রীতিনীতি ও সামাজিক আদর্শের মাপকাঠিতে ইহাদের মূল্যাবধারণ করিতে চাহিলে নানা গোলযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিতে বাধ্য।

সাহিত্যের সত্য সংসারের তথাকথিত বাস্তব সত্য অপেক্ষা আরও ব্যাপক এবং নিগূঢ়—জীবনের খণ্ড বৃত্তাংশ এখানে মণ্ডলায়িত হইয়া উঠে। তাই সাহিত্যে আমরা পাই একটি পরিপূর্ণতার স্বাদ, জীবন এখানে সুগভীর অর্থপূর্ণ। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, সামাজিক রীতিনীতির আদর্শ ও সাহিত্যের শিল্পাদর্শ এক নয়। সাহিত্যের ধর্ম অতি-ব্যাপক মানবতাবোধের—রূপসৃষ্টি ও রসসৃষ্টি ইহার প্রধান লক্ষ্য। সাহিত্যের নীতি উদারতর, সমাজনীতি কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই কিছুটা সংকীর্ণ তথা পরিবর্তন-শীল। সমাজের প্রয়োজনবোধেই সুনীতির জন্ম। যে প্রয়োজনবোধে সামাজিক নীতির সৃষ্টি, সেই প্রয়োজনটুকু শেষ হইয়া গেলে বিশেষ কালের, বিশেষ দেশের, বিশেষ কোনো নীতির মধ্যেও আসে পরিবর্তন। তাই কালভেদে, দেশভেদে নীতির আদর্শটি পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তমান নীতির মাপকাঠিতে সাহিত্য-শিল্পকে যাচাই করিতে গেলে সাহিত্যের উদারতর নীতিটিকে ক্ষুণ্ণ করা হয়।

সাহিত্যসত্য ও বাস্তবসত্য

এখানে ইহাও উল্লেখনীয় যে, সত্যকার মহৎ সাহিত্য সুনীতিরও যেমন জয়গান গাহে না, তেমনি দুর্নীতি প্রচার করাও তাহার কাজ নয়। সমাজস্থ মানুষের চারিত্রিক মহত্ত্ব ও দুর্বলতা, হৃদয়ের বিচিত্র প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বসংঘাত, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আশ্রয় করিয়া একটা রূপলোক-বিরচনই ইহার যথার্থ লক্ষ্য।

কিন্তু গোলমাল এইখানেই যে, শিল্পসৃষ্টিকে আমরা সবসময় নিছক আর্ট বা শিল্পহিসাবে বিচার করি না। যখন ইহাকে সমাজের কাজে লাগাইতে চাই, ইহার মূল্যায়নকালে যখন সামাজিক আদর্শ, সমাজের কল্যাণকেই বড়ো করিয়া তুলি, তখন সাহিত্যে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়—তখনই দেখা দেয় নানা মতবাদ। আধুনিক কালে সাহিত্যে যে-দ্বন্দ্বটি বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের। ইহাদের গতি ভিন্নমুখী। আদর্শবাদপ্রসূত সাহিত্যে সামাজিক নীতিবোধ ও সমাজের ভালোমন্দের আদর্শ অনেকখানি স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। পক্ষান্তরে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় প্রচলিত সামাজিক নীতির বিরুদ্ধে একটা চাপা বিদ্রোহের সুর।

সাহিত্যে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের দ্বন্দ্ব

এখন আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে, এই দুইটি মতবাদের মধ্যে কোনো-একটিকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়া অন্যটিকে আমরা বাদ দিতে পারি না। কারণ, দুইটির মধ্যেই আংশিক সত্য নিহিত রহিয়াছে। আদর্শবাদী সাহিত্যকার গল্পে-উপন্যাসে সমাজমঙ্গলকে — সমাজনীতিকে — অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানাইতে চায়। এ পর্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ আমরা পাঠকসাধারণের কোনো মতবিরোধ নাই। কেন-না, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মহৎ সাহিত্য-শিল্পী কদাপি উচ্চতর নীতি-আদর্শ বা মঙ্গলবোধের বিরোধী নহেন—সুন্দরের সঙ্গে মানবসত্যের, জীবনের মূলনীতির কোনোরূপ বিরোধ থাকিতে পারে না। যাহা সুন্দর তাহাই মঙ্গল, আবার তাহাই সত্য।

আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ, ইহাদের কোনোটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়

কিন্তু সাহিত্যস্রষ্টা •শিল্পে সুন্দরকে উপেক্ষা করিয়া কেবল সমাজকল্যাণ প্রচার করিতে যখন বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন, তখনই তিনি শিল্পীহিসাবে আপন সীমারেখাটি লঙ্ঘন করিয়া যান। কারণ, এরূপ অবস্থায় শিল্পের দাবীকে বস্তুত অগ্রাহ্য করা হয়। কিন্তু শিল্পেরও যে একটি বিশেষ ধর্ম আছে, এ সত্যটি বিস্মৃত হইলে চলিবে না। রূপকার প্রচারক হইতে পারেন না, সেকথা আমরা বলিতেছি না। আমাদের বক্তব্য হইল, তিনি শুধুমাত্র প্রচারক

সাহিত্যে সত্য সুন্দর ও মঙ্গল—কোনোটিকেই উপেক্ষা করা চলে না

নহেন। সাহিত্যে কতখানি প্রচার থাকিবে, কতখানি সুন্দরের অভিব্যক্তি থাকিবে, তাহার সুস্পষ্ট কোনো সীমারেখা নির্দেশ করা যায় না। শিল্পীর মায়াবী সৃজনী-প্রতিভাই দুইয়ের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য স্থাপন করে। শিল্পীকে মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি প্রধানত স্রষ্টা—প্রচারক কিম্বা সমাজসংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া তাঁহার পক্ষে মোটেই বড়ো কথা নয়। দৃষ্টান্তের সাহায্য লইলে আমাদের বক্তব্যটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

বঙ্কিমসাহিত্যের বিরুদ্ধে আধুনিকের অভিযোগ

বঙ্কিমসাহিত্যের বিরুদ্ধে অতি-আধুনিকের যে অভিযোগ, তাহা বঙ্কিমের সমাজবোধ কিংবা নীতিজ্ঞানের জন্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্র অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যধর্মকে উপেক্ষা করিয়া সমাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার বিরুদ্ধে আমরা সাহিত্যধর্মচ্যুতির অভিযোগ আনিয়াছি। 'চন্দ্রশেখর', 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি উপন্যাসের স্থানে স্থানে বঙ্কিম মুখ্যত প্রচারধর্মী বা সমাজসংস্কারক হইয়া উঠিয়াছেন। ফলে, ঘটনাপ্রবাহ ও চরিত্রগুলির স্বাভাবিক বিকাশের গতি বাধাগ্রস্ত হইয়াছে, জীবন্ত মানুষ যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো হইয়া উঠিয়াছে। হৃদয়ধর্মের প্রতি বঙ্কিমের যে অশ্রদ্ধা ছিল তাহা নয়, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত নীতিজ্ঞান ও সামাজিক মঙ্গলচিন্তা তাঁহার শিল্পীমনটিকে অনেক সময় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

বাস্তববোধ সাহিত্যোৎকর্ষের একমাত্র মাপকাঠি নয়

অন্যদিকে, বস্তুতন্ত্রবাদী শিল্পী যখন সাহিত্যে রূপসৃষ্টি ও রসসৃষ্টিকে মুখ্য স্থান দিতে চাহেন, কিংবা বাস্তববোধের কথা বলেন, তখন আমরা তাঁহার কোনো বিরোধিতা করিব না। কেন-না, বস্তুকে অস্বীকার করিয়া, শিল্পায়ন ব্যাপারে রূপরসকে উপেক্ষা করিয়া কোনো সাহিত্যশিল্পী দাঁড়াইতেই পারে না। কিন্তু তাঁহারা যখন বলেন, সাহিত্যে রসই সর্বস্ব, নীতির সঙ্গে সাহিত্যের কোনোরূপ সম্পর্ক নাই, তখন আমরা তাঁহাদের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইব। বাস্তবতার নামে তাঁহারা যখন সাহিত্যে নগ্নতা, কুশ্রীতা, বীভৎসতাকে বড়ো করিয়া ধরিতে চাহেন, তখন মনটা যেন বিরূপ হইয়া উঠে। রসসৃষ্টির নামে এই রকমের উৎকেন্দ্রিকতা সাহিত্যে যে অবাঞ্ছিত, এই সত্যটি আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

সাহিত্যকর্ম শুধু স্তূপীকৃত বস্তুপুঞ্জ নয়—বস্তুবিশ্বের সবকিছুই সাহিত্যের উপাদান নয়। বাস্তবে যাহা বিশৃঙ্খল, অবিন্যস্ত, অসমঞ্জস—শিল্পীর প্রতিভার স্পর্শে সাহিত্যে তাহা সুসমঞ্জস সুবিন্যস্ত সুডৌল হইয়া উঠিয়া অপূর্ব সৌন্দর্যচ্ছটায় ঝলমল করিতে থাকে। এতদ্ভিন্ন, বৃহত্তর মানবকল্যাণের যাহা

পরিপন্থী, যে-নীতি মনুষ্যধর্মের বিরোধী, শিল্পী যত প্রতিভাশালী হউন না কেন, তাঁহার প্রতিভা সেই নীতিবিরোধী উপাদানপুঞ্জ লইয়া কখনই সার্থক সৌন্দর্যসৃষ্টি করিতে পারিবে না। কারণ, ইহাতে সত্যকার সৌন্দর্যপিপাসু, জীবনরসিক পাঠকের রসপিপাসু নিবৃত্ত হইবে না। নিরাবরণ বাস্তবকে, কদর্যতাকে ভিত্তি করিয়া কালজয়ী সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে আজ পর্যন্ত দেখা যায় নাই।

স্তূপীকৃত বস্তুপুঞ্জকে কেহ সাহিত্য বলে না

তবে, তথাকথিত সমাজবিরোধী প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হইলে, সমাজচ্যুত পতিত মানবমানবীর কথা থাকিলে, কিংবা যৌন-আবেদনের বর্ণনা থাকিলেই যে সাহিত্য দুর্নীতিপূর্ণ হইবে, ইহা আমরা কখনই বলিব না। কিন্তু শিল্পীর শিল্পকর্মে মানবজীবনের গভীরতর রহস্যের ছায়াপাত যদি না হয়, তাহাতে যদি মানবমনের উদার সুষমার ইঙ্গিতময়তা ফুটিয়া না উঠে, তবে রূপসৃষ্টি-হিসাবে তাহা ব্যর্থই বলিতে হইবে। একারণে বলা যাইতে পারে, সাহিত্যে বস্তু আছে, ব্যক্তি আছে, কিন্তু নিছক বাস্তববাদ বা ব্যক্তিতন্ত্র বলিয়া ইহাতে কিছু নাই। বস্তুবাদী সাহিত্যশিল্পী অনেক সময় বাস্তবের নামে কেবল যে উচ্চতর জীবননীতিকেই অস্বীকার করেন তাহা নহে—তাঁহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে সাহিত্যনীতি আর সাহিত্যধর্মকেও লঙ্ঘন করিয়া যান।

নিছক বস্তুতন্ত্রবাদ বলিয়া সাহিত্যে কিছু নাই

সাহিত্যে আমরা চিরন্তন মানবসত্য কিংবা মানবতাধর্মকে যে অগ্রাহ্য করিতে পারি না তাহার একটি আধুনিক দৃষ্টান্ত দিতেছি। বাংলাসাহিত্যে কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র 'রিয়ালিষ্ট' বা বস্তুতন্ত্রবাদী বলিয়া পরিচিত। ইহাও বলা যায়, বাস্তব রূপায়ণের জন্যই সাহিত্যসংসারে তাঁহার যত নিন্দা অথবা প্রশংসা। কিন্তু শরৎসাহিত্যের বাস্তবতা শুধুই কি বস্তুকেন্দ্রিক—মানবজীবনের কোনো গভীরতর সত্য কি উহার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয় নাই? শরৎচন্দ্রের রচিত সাহিত্যে নীতির প্রশ্নটি কি একেবারে অবান্তর? শরৎসাহিত্যের প্রতি আমরা অন্তরের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করি কিসের জন্য? মমতাহীন সমাজের চোখে যে-নারী ও পুরুষ অবাঞ্ছিত, সমাজ যাহাদের কোনদিনই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিল না, শরৎচন্দ্র সেইসব মানুষকেই তাঁহার সাহিত্যে স্থান দিয়াছেন। সমাজনীতির বিচারে হয়তো তাহারা পতি —মানুষ নামের অযোগ্য। কিন্তু সমাজনীতির উপরেও একটা নীতি আছে. হইতেছে উচ্চতর মানবতাবোধ। সেই নীতির বিচারেই তাহারা মানুষের ত দাবী করিতে পারে, এ কথাই কি শরৎচন্দ্র তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া আ

শরৎসাহিত্যের বাস্তবতা কি নিছক বস্তুকেন্দ্রিক

বুঝাইতে চাহেন নাই ? স্বরচিত সাহিত্যে সমাজকে তিনি অস্বীকার কখনো করেন নাই—কেবল উচ্চতর নীতির প্রেরণায় প্রচলিত সমাজনীতিবিষয়ে কতকগুলি প্রশ্ন তুলিয়াছেন। উদার মানবধর্মকে—মনুষ্যত্বের মূলনীতিকে—সর্বান্তঃকরণে ও ব্যাপক সহৃদয়তাবশে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বলিয়াই শরৎচন্দ্র বাস্তববাদী হইয়াও মহৎ শিল্পী হইতে পারিয়াছেন।

পক্ষান্তরে প্রাচীনেরা বঙ্কিমকে বরদাস্ত করিতে পারেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রকে তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না—তাঁহাদের বিচারে শরৎসাহিত্য দুর্নীতিপূর্ণ, অশ্লীলতায় দুষ্ট। অথচ আমাদের চোখে শরৎসাহিত্য অশ্লীল বলিয়া প্রতিভাত হয় না। কেন ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, শ্লীলতা-অশ্লীলতা সম্পর্কে প্রাচীনের যে দৃষ্টি, আমাদের সে-দৃষ্টি নয়। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনবোধ বা জীবনের মূল্যায়ন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিতেও একটা পরিবর্তন আসিয়াছে। বঙ্কিমের নীতিবোধ ও শরৎচন্দ্রের নীতিবোধের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য রহিয়াছে। যুগধর্মপ্রভাবিত সামাজিক প্রয়োজনে নীতির সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হয় বলিয়া জীবনের নবতন মূল্যায়নকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

জীবনবোধ-সম্পর্কিত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনশীল

সূক্ষ্মবিচারে, দেখা যায়, সমাজ ও জীবনের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া মহৎ সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। যুগোত্তীর্ণ সাহিত্যে 'সুন্দর'-এর সহিত উচ্চতর মানবধর্মের আদর্শটি জড়িত থাকিতে বাধ্য। এদিক হইতে দেখিতে গেলে আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের মধ্যে সত্যকার কোনো বিরোধ নাই। সুতরাং আদর্শবাদী সাহিত্যও যেমন সাহিত্য, বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যও তেমনি সাহিত্য। তবে আমাদের দেখিতে হইবে, শিল্পস্রষ্টা তাঁহার স্বধর্মকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন কিনা। সাহিত্যের নীতি সমাজনীতি হইতে আরও ব্যাপক, উদারতর। এই শাশ্বত জীবননীতিটিকে সাহিত্যিক অস্বীকার করিতে পারেন না। তাই বাস্তববাদী শরৎচন্দ্রের মুখেও আমরা শুনি: "যা অসুন্দর, যা immoral, যা অকল্যাণ, কিছুতেই তা আর্ট নয়, ধর্ম নয়। 'Art for Art's sake' কথাটা যদি সত্য হয় তাহলে কিছুতেই তা immoral বা অকল্যাণকর হতে পারে না। অকল্যাণকর এবং immoral হলে 'Art for Art's sake' কথাটা কিছুতেই সত্য নয়—শতসহস্র লোকে তুমুল শব্দ করে বললেও সত্য নয়,—মানবজাতির মধ্যে যে-বড়ো প্রাণটা আছে সে একে কোনোমতেই গ্রহণ করে না।" সাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠা ও আদর্শনিষ্ঠার বিচারে এই উক্তিটি সকলের প্রণিধানযোগ্য।

উপসংহার

বাংলা উপন্যাস

[**রচনার সংকেতসূত্র** ঃ সূচনা—বাঙালীর সাহিত্যজীবন ও পাশ্চাত্ত্য প্রভাব—বাংলা উপন্যাসরচনার সূত্রপাত—বাংলা উপন্যাস ও বঙ্কিমচন্দ্র—বঙ্কিমের অনুগামী রমেশচন্দ্র দত্ত—বঙ্কিমযুগের উপন্যাসলেখক—বাংলা উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথ—প্রভাতকুমার—কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র—দুইজন মহিলা লেখিকা—শরৎচন্দ্রের পরবর্তী বাঙালী ঔপন্যাসিক—সাম্প্রতিক কালের বাংলা উপন্যাস—কথাশিল্পী তারাশংকর—উপসংহার।]

সূচনা

বাংলা-উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাস দীর্ঘ দিনের নহে। প্রাচীন ভারতে কাব্য ও নাট্যধারার প্রশংসনীয় বিকাশ আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু উপন্যাস বলিতে যাহা বুঝায়, বিশাল এবং অতিশয় সমৃদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে তাহা নাই বলিলেই চলে। প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যে একতম উপন্যাস বোধ করি বাণভট্টবিরচিত 'কাদম্বরী'। কিন্তু ইহাও যথার্থ উপন্যাস নয়—কাহিনী-উপকাহিনীর জটিল জালবিস্তার মূল আখ্যানটিকে প্রায় দুরধিগম্য করিয়া তুলিয়াছে। নাটকে ও কাব্যে প্রাচীনদের যে-আশ্চর্য প্রতিভার প্রকাশ দেখিতে পাই, কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহা সেইরূপ বিস্ময়করভাবে নীরব।

বাঙালীর সাহিত্যজীবন ও পাশ্চাত্ত্য প্রভাব

পাশ্চাত্ত্যদেশে অষ্টাদশ শতক হইতে উপন্যাসের অপূর্ব সম্ভাবনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্বনামধন্য ফরাসী লেখক আলেকজাণ্ডার ডুমাকে আধুনিক উপন্যাসের স্রষ্টিকর্তা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে উপন্যাস-সাহিত্যের আবির্ভাবের মূলে রহিয়াছে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব। বৈদেশিক ভাবধারার সংযোগে আধুনিক বাঙালীর জীবনে যে-বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিল, তাহা শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্য সর্বক্ষেত্রেই সমভাবে পরিস্ফুট। ইহার জন্য অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর মিশনারীসম্প্রদায় ও তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট বিখ্যাত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজই সমধিক গৌরব দাবী করিতে পারে।

বাংলা উপন্যাস-রচনার সূত্রপাত

এই মিশনারীরাই প্রথম বাংলাগদ্যরচনার প্রবর্তন করেন, এবং তাঁহাদের উৎসাহে তৎকালীন মনীষীবৃন্দ বাংলাসাহিত্যের উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করেন। এই ধারাটিকে অনুসরণ করিয়াই সহজ স্বাভাবিক বাংলা-গদ্যের মান নির্ধারিত হয়, এবং কালক্রমে আমরা প্রথম যে-বাংলা উপন্যসখানি পাই তাহার নাম 'আলালের ঘরের দুলাল'। গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন তখনকার বিশিষ্ট সমাজসেবী প্যারিচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর। বইটি উদ্দেশ্যমূলক। বড়লোকের ছেলে কুসংসর্গে পড়িয়া

কীভাবে উচ্ছন্ন হইয়া যায়, এবং অপরপক্ষে সৎ-সংসর্গে থাকিলে জীবনে কীরূপ উন্নতি হইতে পারে, গ্রন্থখানির ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। রচনাভঙ্গির সরলতা ও সরসতার জন্য 'আলালের ঘরের দুলাল' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই সময়ের আর-একখানি উল্লেখযোগ্য সমাজচিত্র 'হুতোম প্যাচার নক্‌সা'। ইহাও ঠিক উপন্যাস নয়—সামাজিক কতকগুলি ব্যঙ্গাত্মক নক্‌সার সমষ্টিমাত্র। গ্রন্থকার কালীপ্রসন্ন সিংহ ইহাতে কথ্যভাষার প্রয়োগরীতি সম্পর্কে যে দুঃসাহসিক পরীক্ষা-কার্য করিয়াছিলেন, আধুনিক উপন্যাসের উপযুক্ত ভাষা-রচনার পক্ষে তাহা প্রভূত সহায়তা করিয়াছে।

বাংলা-উপন্যাস ও বঙ্কিমচন্দ্র

বাংলা-উপন্যাস সর্বপ্রথম নবপ্রাণ ও নবরূপ গ্রহণ করিয়া অভাবনীয় ঐশ্বর্যে আত্মপ্রকাশ করিল প্রতিভাধর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমৃতবর্ষী রচনায়। তাঁহার 'বঙ্গদর্শন' পত্র একাধারে যেমন বাংলা-সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নবযুগ প্রবর্তন করিল, অন্যদিকে উক্ত পত্রে ক্রমশ-প্রকাশ্য উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' বাঙালী পাঠকসমাজকে তেমনই বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিল। ভগীরথের ন্যায় কথাসাহিত্যের জাহ্নবীধারাকে কথাশিল্পী বঙ্কিম বাংলাদেশের সাহিত্যভূমিতে প্রবাহিত করাইলেন। বহুদিনের শুষ্ক নীরস বাংলাসাহিত্যভূমি সহসা উর্বর হইয়া ফলেপুষ্পে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। উপন্যাস-সাহিত্যের যাদুকর বঙ্কিম গ্রন্থের পর গ্রন্থ বাঙালী পাঠককে উপহার দিলেন। তাঁহার 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ', 'রাজসিংহ' প্রভৃতি জনপ্রিয় উপন্যাসাবলী বাংলা-কথাসাহিত্যকে শৈশব হইতে সহসা যৌবনে উত্তীর্ণ করিয়া দিল।

বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। তিনি মূলত রোম্যান্টিক এবং আদর্শবাদী হইলেও সামাজিক, ঐতিহাসিক, অর্ধ-ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং বিশুদ্ধ 'রোম্যান্স তাঁহার লেখনীমুখে বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্কট, লীটন প্রভৃতি ইংরেজ গ্রন্থকারদের প্রভাব তাঁহার রচনায় থাকিলেও, বঙ্কিমই প্রথম খাঁটি বাংলা-উপন্যাসের স্রষ্টা—এই দিক দিয়া তিনি অদ্যাবধি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া রহিয়াছেন।

বঙ্কিমের অনুগামী রমেশচন্দ্র দত্ত

বঙ্কিমের ধারাকে অবলম্বন করিয়া বাংলাসাহিত্যে কিছুদিন সক্ষম ও অক্ষম অনুকরণের পালা চলিতে থাকে। এই লেখকদলের মধ্যে সমধিক সাফল্য লাভ করেন রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়। তিনি ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস-রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার রচনাভঙ্গি কতকটা বঙ্কিমের দ্বারা প্রভাবিত হইলেও

'মহারাষ্ট্রজীবনপ্রভাত', 'রাজপুতজীবনসন্ধ্যা', 'মাধবীকঙ্কণ', 'সমাজ' ও 'সংসার' প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করিয়া তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন।

বঙ্কিমযুগের উপন্যাস-লেখক

এই সময়ে বা ইহার অব্যবহিত পরে সামাজিক উপন্যাস লিখিয়া যাঁহারা যশস্বী হন, তাঁহাদের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ বসু, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যোগেন্দ্রনাথের 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী', তারকনাথের 'স্বর্ণলতা', ত্রৈলোক্যনাথের রসাত্মক সাহিত্য 'কঙ্কাবতী' আজ পর্যন্ত সমাদৃত হইয়া থাকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়া যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার 'ছিন্নমুকুল', 'দীপনির্বাণ' প্রভৃতি গ্রন্থ সর্বজনপরিচিত। বাংলাসাহিত্যে তাঁহাকেই প্রথম-মহিলা ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব অর্পণ করা চলে।

বাংলা উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় বাংলাউপন্যাসে একটি বিস্ময়কর বিবর্তনের সূত্রপাত করিল। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি হইলেও তাঁহার রচিত কয়েকখানি উপন্যাস সমসাময়িক সাহিত্যক্ষেত্রে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার 'নৌকাডুবি' ও 'চোখের বালি' গতানুগতিক রোম্যান্সের মধ্যে একটি অপূর্বদৃষ্ট নবীন সম্ভাবনা আনিল। হৃদয়ধর্মের সহিত সমাজের সংঘাত ও মানবমনের পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তিগুলির অশ্রান্ত অন্তর্দ্বন্দ্বে জীবনে যে নিষ্ঠুর ট্র্যাজেডির সূত্রপাত ঘটিয়া থাকে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে ইহাই ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইলেন। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সমস্যা সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ ও তীব্র রূপধারণ করিল তাঁহার 'নষ্টনীড়ে', এবং এইরূপে বাংলাদেশে মনস্তত্ত্বমূলক কথাসাহিত্যের প্রবর্তন ঘটিল। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে', 'চোখের বালি', 'যোগাযোগ' প্রভৃতি উপন্যাস এই ধারারই অনুসারী। তবে 'শেষের কবিতা', 'মালঞ্চ', 'দুইবোন' প্রভৃতি উপন্যাস প্রধানত গীতিধর্মী।

প্রভাতকুমার

এই রবীন্দ্রযুগে লঘু কৌতুক এবং অনাবিল আনন্দরস পরিবেশন করিবার জন্য আর-একজন লেখক আবির্ভূত হইলেন, তিনি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রভাতকুমারের রচনায় একটি উপভোগ্য আন্তরিকতা আছে, এবং সেজন্য একসময়ে তাঁহার জনপ্রিয়তার সীমা ছিল না। ছোটগল্পে ও উপন্যাসে তাঁহার অনলস লেখনী সমভাবে মধুবর্ষণ করিয়াছে। প্রভাতকুমার বাংলার একজন লোককান্ত ঔপন্যাসিক।

মনস্তত্ত্বমূলক কথাসাহিত্যের যে-ধারা রবীন্দ্রনাথে প্রথম সম্ভাবিত হইয়াছিল, তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন বাংলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার শরৎচন্দ্র চট্টো-

পাধ্যায়। বাঙালী পাঠকের কাছে শরৎচন্দ্রের পরিচয় বিবৃত করা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই মনে করি। দেশের প্রতি অশেষ মমত্ববোধ, লাঞ্ছিত নিপীড়িত অপমানিতের জন্য সুগভীর বেদনাবোধ, অন্তরের শিল্পীসুলভ সদাচেতন স্পর্শকাতরতা তাঁহার রচনাকে আমাদের প্রাণের জিনিস করিয়া তুলিয়াছে। কোথায় আমাদের 'পল্লীসমাজে' পঙ্গু বিকারগ্রস্ত জীবনের বিষ ফেনাইয়া উঠিতেছে, কোথায় 'অরক্ষণীয়া' জ্ঞানদার চোখের জল সকলের দৃষ্টির অগোচরে নীরবে ঝরিতেছে, কোথায় বিরহী 'দেবদাস' তিলে তিলে ব্যর্থতায় অপমৃত্যু বরণ করিয়া লইতেছে, কোথায় 'সাবিত্রী'র ন্যায় হৃদয়বতী নারীকে আমরা চরিত্রহীনা বলিয়া সমাজ হইতে নির্বাসিত করিতেছি, এবং কোথায় 'নারায়ণী' ও 'বিন্দু'-র মাতৃস্নেহ স্বর্গের অমৃতপ্রবাহের ন্যায় পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সহস্রধারায় উৎসারিত হইতেছে—শরৎচন্দ্রের রচনায় তাহারই পরিচয় আমরা পাইয়াছি। এই অভিশপ্ত দেশের বেদনাতুর নারীসমাজের করুণ ব্যথার চিত্র শরৎচন্দ্র অপূর্ব ও জীবন্ত করিয়া আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। লীলা-চঞ্চল নদীপ্রবাহের মতো গতিশীল স্বতস্ফূর্ত ভাষা তাঁহার রচনাকে যেমন হৃদয়গ্রাহী তেমনই রসঘন করিয়াছে।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক-হিসাবে দুইজন মহিলালেখিকার নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। ইঁহারা হইতেছেন অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী। উনিশ শতকের ইংরেজী সাহিত্যে মহিলালেখিকা জেন অস্টেন, জর্জ এলিয়ট প্রভৃতির সঙ্গে ইঁহাদের তুলনা করা চলে। ইঁহাদের রচনায় বুদ্ধিবাদ বা মনোবিকলন অপেক্ষা হৃদয়াবেগের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই হৃদয়াবেগ রসসিক্ত ও মনোরম হইয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশে ইঁহাদের অনুরক্ত পাঠকের অভাব নাই।

দুইজন মহিলালেখিকা

অতঃপর উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অপেক্ষাকৃত আধুনিক ঔপন্যাসিকদের নাম স্মরণীয়। উপেন্দ্রনাথের 'রাজপথ' ও চারুচন্দ্রের 'মুক্তিস্নান', 'দোটানা' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা-উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। সীতাদেবী এবং শান্তাদেবীও কয়েকখানি ভালো বই রচনা করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া সীতাদেবীর 'পরভৃতিকা' ও 'বন্যা' প্রথমশ্রেণীর উপন্যাসের সম্মান লাভ করিতে পারে। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ও কিছুকিছু ভালো গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আধুনিক মহিলালেখিকাদের মধ্যে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের প্রায়-সমকালীন বাঙালী ঔপন্যাসিক

সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্যে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল ও বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ লেখকরাই অগ্রণী। মাণিকের 'পদ্মা-নদীর মাঝি', বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী', বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'নীলাঙ্গুরীয়', বনফুলের 'জঙ্গম' নানাদিক হইতে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মনোজ বসু দুইখানি রাজনীতিক উপন্যাস—'সৈনিক' ও 'ভুলি নাই'—লিখিয়া বাঙালী পাঠকের হৃদয় জয় করিয়াছেন। সরোজ রায়চৌধুরীর 'শতাব্দীর অভিশাপ'ও বিশেষত্বপূর্ণ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ', 'শিলালিপি', 'পদসঞ্চার' প্রভৃতি গ্রন্থ স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গির ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিমান।

সাম্প্রতিক কালের বাংলা উপন্যাস

কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে যিনি প্রতিভার বৈশিষ্ট্যে সর্বাধিক সমুজ্জ্বল ও কীর্তিমান তিনি হইতেছেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যে-সমাজচেতনার অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছিল, তারাশংকরের সাহিত্যে তাহা ফলেপুষ্পে বিকাশলাভ করিয়াছে। বাংলাদেশের জলমাটির সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবের ফলে তাঁহার সাহিত্যে আমরা অপূর্ব সমাজবোধের রূপায়ণ দেখিতে পাই। বর্তমান কালের রাজনীতির সমস্যার ঘাতপ্রতিঘাত, সর্বগ্রাসী মন্বন্তরের করালছায়া, নিপীড়ন ও অত্যাচারের ভিতর দিয়া জাতির যে-অমর প্রাণশক্তি বাংলার পল্লীতে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে, 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' প্রভৃতি উপন্যাসে তারাশংকর তাহারই বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার উপন্যাসসাহিত্য দ্রুতগতিতে ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইতেছে। স্বাভাবিক পূর্ণতার মধ্য দিয়া অদূর ভবিষ্যতে ইহা যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হইয়া উঠিবে, এ বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সংশয় নাই। উল্লিখিত সাহিত্যিকবৃন্দ ছাড়া আরও বহু নবীন সাহিত্যিকের মধ্যেও আমরা তাহার পূর্বাভাস পাইতেছি। অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা উপন্যাসের যে সমৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহা বিস্ময়কর বলিলে এতটুকু অত্যুক্তি হইবে না।

উপসংহার

বাংলা নাটক

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** বাংলা নাটক আধুনিক কালের সৃষ্টি—বাংলা নাটক ও পাশ্চাত্ত্য প্রভাব—বাংলাভাষার প্রথম সার্থক নাটক—মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভা—দীনবন্ধু মিত্র—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনোমোহন বসু—নাট্যকার গিরিশচন্দ্র—কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—আরও কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার—নাট্যসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ—একাঙ্ক নাটক—উপসংহার।]

বাংলা নাটক আধুনিক কালের সৃষ্টি

বাংলা-সাহিত্যে নাটক একান্তভাবে আধুনিক কালের সৃষ্টি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে কোনো সার্থক বাংলা নাটক রচিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। আমাদের দেশে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ও নাটক-সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব। ইহার পূর্বে যাত্রা, কথকতা, কবির গান, পাঁচালী প্রভৃতি জিনিসই জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিত। অনেকে মনে করিয়া থাকেন, সেকালের যাত্রা হইতেই বাংলা নাটকের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে—এরূপ ধারণা কিন্তু ভ্রমাত্মক। বলিতে গেলে, আধুনিক যাত্রাও একপ্রকার এ যুগের সৃষ্টি। বাংলাকাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা যে-প্রাচীনত্ব দাবী করিতে পারি, নাটক সম্পর্কে সেরূপ কোনো প্রাচীনত্বের দাবী আমরা করিতে পারি না।

বাংলা নাটক ও পাশ্চাত্ত্য প্রভাব

১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই বাংলাদেশে পাশ্চাত্ত্য হাওয়া বিশেষভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। ইয়োরোপীয় শিক্ষা ও সাহিত্য আমাদের মনের অভাবনীয় রূপান্তরসাধন করিল—ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর প্রাণে উদ্বোধিত করিল অভিনব রসপ্রেরণা। সেই রসপ্রেরণার ফলেই কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ধনীর গৃহে সখের নাট্যশালার সৃষ্টি হইল। ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর কর্তৃক 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর আরও কয়েকটি স্থানে রঙ্গমঞ্চের সূত্রপাত হইতে দেখা যায়। এইসব নাট্যশালায় সাধারণত ইংরেজী নাটকেরই অভিনয় হইত। কলিকাতায় শ্যামবাজারে নবীন বসুর বাড়ীতে যে-নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়, উহাতেই সর্বপ্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এদেশে সখের নাট্যশালার পূর্ণবিকাশ সাধিত হয়। এইসব নাট্যশালার মধ্যে 'বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার'-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই 'বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার'ই 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় প্রথম সাধারণ নাট্যশালার রূপ

পরিগ্রহ করে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নাটক রচনার ক্ষেত্রেও একটা নূতন প্রেরণা ও উদ্যম দেখা দেয়।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক আদর্শের সর্বপ্রথম নাটক কোন্‌টি, তাহার সম্পর্কে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। অনেকে বলেন, তারাচরণ শিক্‌দার প্রণীত 'ভদ্রার্জুন'ই আমাদের সাহিত্যে প্রথম নাটক। আবার, কেউ কেউ বলেন, স্বরূপের দিক দিয়া উক্ত গ্রন্থখানি যাত্রারই সগোত্র। সে যাহাই হোক, এক্ষেত্রে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'কেই আমরা বাংলাভাষার প্রথম সার্থক নাটক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। মধুসূদনের অভ্যুদয়ের পূর্বে রামনারায়ণের খ্যাতি বাংলাদেশে খুব বেশী ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রামনারায়ণের রচনায় উচ্চাঙ্গের নাট্য-কৌশল বিশেষ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু প্রহসনরচনায় তাঁহার কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক নাটক

আধুনিক বাংলানাটকের প্রকৃত গোড়াপত্তন হইয়াছিল মাইকেল মধুসূদনের হাতে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সব্যসাচী। আজ বাংলাসাহিত্যে মধুসূদন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিচিত, কিন্তু নাটক-রচনার মধ্য দিয়াই তিনি সর্বপ্রথম সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত মধুসূদন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, এবং এই রঙ্গমঞ্চটি তাঁহার নাট্যপ্রতিভাকে অনেকখানি পরিচালিত করিয়াছিল। যদিও ইংরেজী আদর্শেই তিনি নাটক-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি সংস্কৃতনাটকের রচনারীতিকে মধুসূদন একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী' আমাদের নাট্যসাহিত্যে নবযুগের সৃষ্টি করে। উক্ত 'কৃষ্ণকুমারী' বাংলাসাহিত্যের প্রথম ট্র্যাজেডি বা বিষাদান্ত নাটক—'শর্মিষ্ঠা' এবং 'পদ্মাবতী' পৌরাণিক নাটক। এই তিনটি নাটকে অভিনবত্ব থাকিলেও, ইহাদের মধ্যে প্রথমশ্রেণীর নাট্যপ্রতিভার স্পর্শ নাই। অবশ্য মধুসূদনের রচিত দুইটি প্রহসন—'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' সে-যুগের প্রশংসনীয় সৃষ্টি। বাস্তবধর্মী চরিত্রচিত্রণ ও ভাষার সুনিপুণ প্রয়োগে এই দুইখানি প্রহসন সর্বজনের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভা

মধুসূদনের পরেই নাট্যজগতে স্বনামধন্য দীনবন্ধু মিত্রের আবির্ভাব। বাংলা নাট্যসাহিত্যকে দীনবন্ধু অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ছিল সত্যকার নাট্যপ্রতিভা। বাঙালীর সমাজজীবনের সহিত দীনবন্ধুর পরিচয়টিও

ছিল নিবিড়। বাঙালীসমাজের বিচিত্র চরিত্র ও ঘটনা তাঁহার রচনায় সুন্দর বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রখর বাস্তব দৃষ্টি, দরদী প্রাণ ও শিল্পরচন-প্রতিভা ছিল বলিয়াই সাধারণ বাঙালীজীবনের পটভূমিকায় তিনি অনেকখানি সৃজনকুশলতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দীনবন্ধু মিত্র

দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' বাংলাদেশে একদিন অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। মানবতার প্রতি এতখানি শ্রদ্ধা সে যুগের অন্য কোনো সাহিত্যিক দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। দীনবন্ধুকে বাংলা বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ বলা যাইতে পারে। প্রহসনরচনার ক্ষেত্রেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার 'সধবার একাদশী', 'বিয়ে-পাগলা বুড়ো', 'জামাই বারিক', নবীন তপস্বিনী' প্রভৃতি নাটকে লক্ষণীয় বিশিষ্টতার ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাংলা-নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধুর পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনোমোহন বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'অশ্রুমতী', 'সরোজিনী', 'পুরুবিক্রম' প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। তাঁহাকে খুব উঁচুদরের শিল্পী বলা চলে না। 'অলীক প্রকাশে' তিনি যে-হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বেশ উপভোগ্য। তাঁহার নাটকে কোনো-কোনো জায়গায় গ্রীক নাটকের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনোমোহন বসু

মনোমোহন বসুর 'প্রণয়পরীক্ষা', 'রামাভিষেক', 'সতী' নাটক একসময়ে বেশ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। পৌরাণিক আবহাওয়ার মধ্যে তিনি আধুনিকতার ভঙ্গি আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু সর্বত্র তেমন সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই।

আমাদের রঙ্গমঞ্চ ও নাটকের ক্ষেত্রে একসময় গিরিশচন্দ্রের খ্যাতি ছিল অসামান্য। বাংলা-নাট্যশালার বহুমুখী উন্নতির মূলে গিরিশপ্রতিভার দান অবশ্য-স্বীকার্য। গিরিশচন্দ্র সর্বজনপরিচিত স্বনামধন্য নাট্যকার। সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক সকল রকমের নাটকই তিনি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার নাটকগুলি বাংলা-রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সহিত অজস্রবার অভিনীত হইয়াছে। গিরিশরচিত নাটকের সর্বপ্রধান গুণ উহাদের দৃশ্যমানতা। বাঙালীর সমাজজীবন, ধর্মজীবন, রাজনীতিক জীবন—এইসকল দিকগুলির সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। আমাদের বহুবিচিত্র জীবনালেখ্য তাঁহার নাটকে বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ নাটক প্রথমশ্রেণীর শিল্পোৎকর্ষলাভ করে নাই। মানব-

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র

চিত্তের ঘাতপ্রতিঘাত, বিরুদ্ধ-শক্তির ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া—এককথায় নাটকীয় দ্বন্দ্ব—এইসব নাটকে তেমন সুস্পষ্ট ও সংহত রসপরিণতি লাভ করে নাই। ধর্মপ্রবণতা ও ভক্তির আতিশয্য গিরিশচন্দ্রের রচিত নাটকের রসস্ফূরণকে অনেকখানি ব্যাহত করিয়াছে। বহির্ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকীয় চরিত্রগুলিকে ক্রমবিকাশমান করিয়া তোলার মধ্যেই নাট্যকারের সত্যকার প্রতিভা ধরা পড়ে। এই দিক দিয়া গিরিশচন্দ্র দর্শক ও পাঠককে খুব বেশী আশ্বস্ত করিতে পারেন নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভা ছিল উচ্চশ্রেণীর। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। শব্দপ্রয়োগ ও কবিত্বমণ্ডিত ভাষাবিন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে, এমন শিল্পী বাংলাসাহিত্যে খুব বেশী নাই। নাটকীয় দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন চরিত্রের মানসসংঘাত তাঁহার নাটকে সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিকতা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলির ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য অনেক সময় ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। নাটকে নাট্যকার থাকেন যবনিকার অন্তরালে—এখানে তাঁহার ব্যক্তিত্ব থাকে প্রচ্ছন্ন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল, কবিসুলভ গীতিপ্রবণতার জন্য, নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারেন নাই এবং এই কারণে তাঁহার নাটকের চরিত্রগুলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। আবার, তাঁহার অপূর্ব ভাষাদীপ্তি অনেক ক্ষেত্রে নাটকের ভূষণ না হইয়া দূষণ হইয়াছে। এই ত্রুটিগুলি না থাকিলে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলানাট্যসাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীর মর্যাদা লাভ করিতে পারিতেন।

কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অমৃতলাল বসু, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ নাট্যকার অনেকগুলি ভালো নাটক রচনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক-নাটক-রচনায় ক্ষীরোদপ্রসাদ সত্যই সিদ্ধহস্ত ছিলেন—তাঁহার 'আলমগীর', 'প্রতাপাদিত্য' এ স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। প্রহসনরচনায় অমৃতলাল বেশ প্রশংসনীয় নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে', 'তাজ্জব ব্যাপার', 'দ্বন্দ্বেমাতনম্', 'খাসদখল' প্রভৃতি প্রহসনগুলি সর্বজনের উপভোগ্য।

আরও কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার

রবীন্দ্রনাথের অসাধারণত্ব সর্বদিকেই। বাংলা-নাট্যসাহিত্যকেও তিনি নূতনভাবে সৃষ্টি করিয়া ইহাকে একটি চিত্তহারী রূপমূর্তি দান করিয়াছেন। কাব্যনাট্য, রূপকনাট্য, দ্বন্দ্বনাট্য—সর্বক্ষেত্রেই তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার ছাপটি সুস্পষ্ট। এদেশে তিনি সাংকেতিক নাটকের প্রথম স্রষ্টা। উঁচুদরের কমেডি-রচনাতেও তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। চিরাচরিত নাট্যরীতির আদর্শে তাঁহার নাটকগুলিকে বিচার করা

নাট্যসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ

অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। ঘটনা ও চরিত্রের সংঘাত অপেক্ষা বিশেষ তত্ত্ব বা idea-র অভিব্যক্তিই তাঁহার নাটকের বিশিষ্ট লক্ষণ। রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যে ঘটনার দৃশ্যমানতা অর্থাৎ দৃশ্যত্বলক্ষণ অপেক্ষা কাব্যলক্ষণই সমধিক পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটকের সাহিত্যরস অপূর্ব—এগুলি সব সময় অভিনয়ের অপেক্ষা রাখে না। এই নাটকগুলি তাঁহার কবিমনেরই গীতিসুরভিত প্রকাশ। 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন', 'চিরকুমার সভা', 'গোড়ায় গলদ', 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী,' 'রাজা', 'ফাল্গুনী', 'শারদোৎসব' প্রভৃতি নাটক কবিগুরুর নাট্য-প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

অতিআধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে মন্মথ রায়, শচীন্দ্র সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। অধুনা বাংলা সাহিত্যে একাঙ্ক নাটকেরও গোড়াপত্তন হইয়াছে। বাস্তবতার ভিত্তিতেই এই জাতীয় নাটকগুলি রচিত হইতেছে—ইহাদের মধ্যে যুগসমস্যার অনেকখানি প্রতিফলন দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

একাঙ্ক নাটক

উন্নত ধরণের সামাজিক নাটক বাংলাসাহিত্যে বেশী নাই বলিলে ভুল বলা হইবে না। নাটকের ক্ষেত্রে এখনো আমরা অনেকখানি পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি। বর্তমানে চলচ্চিত্রের আবির্ভাব রঙ্গমঞ্চগুলির স্বাভাবিক বিকাশকে প্রতিহতই করিতেছে। রঙ্গমঞ্চের অনুন্নত অবস্থা এবং আরও নানাকারণে বাংলা নাটকের ধারাটি অদ্যাবধি শীর্ণ রহিয়া গিয়াছে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি সৃষ্টির জন্য আমরা বিশ্বসাহিত্যে একটি উচ্চস্থান দাবী করিতে পারি, কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে সেই অধিকার এখনো আমরা অর্জন করিতে পারি নাই। বাংলা-নাট্যসাহিত্যের এই দারিদ্র্য আমাদের মনকে সত্যই পীড়িত করে।

উপসংহার

বাংলা ছোটগল্প

[**রচনার সংকেতসূত্র :** যন্ত্রযুগের বিবর্তন ও ছোটগল্প—আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসা ও ছোটগল্প—সার্থক ছোটগল্পের স্বরূপ—গোগোল, মোপাসা প্রমুখ ছোটগল্পলেখক—বাংলা ছোটগল্প আধুনিক কালের সৃষ্টি—রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রভাতকুমার প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী গল্পকার—অতি-আধুনিক বাংলা ছোটগল্প—উপসংহার।]

সূচনা

পৃথিবীর সাহিত্যে ছোটগল্পই বর্তমান কালে রচনাশৈলী ও আঙ্গিকের দিক দিয়া বিস্ময়কর সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সূক্ষ্ম জীবনবোধ, সংযত প্রকাশভঙ্গি ও ভাবের তীক্ষ্ণ একমুখিতা—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলি এ সমস্ত গুণেই সমৃদ্ধ। এই ছোটগল্পের জন্মেতিহাস অধিক দিনের নহে। উনিশ শতক হইতেই কথাসাহিত্যের এই নবীন রূপটি বিশ্বের সাহিত্যসংসারে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে।

যন্ত্রযুগের বিবর্তন ও ছোটগল্প

ছোটগল্পের বিকাশ যন্ত্রযুগের বিবর্তনের সঙ্গেই সাধিত হইয়াছে। যন্ত্রশিল্প ও যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের জীবনকে গতিময় করিয়াছে—তাহার অবিরাম অগ্রগামিতার সহিত ছোটগল্পও দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। মধ্যযুগীয় 'কাদম্বরী'র মতো তাহার আখ্যানের মধ্যে উপাখ্যান, কাহিনীর মধ্যে উপকাহিনী গাঁথিয়া চলিবার সুযোগ নাই। একটি বিশেষ ভাব অথবা বিশেষ একটি ঘটনাকে স্বল্প-আয়োজনে স্বল্প-আয়তনের মধ্যে ফুটাইয়া তোলাই তাহার লক্ষ্য—'to produce maximum effect with minimum materials'। রুডিয়ার্ড কিপলিং বলেন, আধুনিক ছোটগল্প ঠিক চোরালণ্ঠনের আলোর মতো—একটি বিশেষ বস্তুর উপরই সে তাহার সমগ্র আলোকপাত কেন্দ্রীভূত রাখিবে, অনাবশ্যক ঘটনা ও চরিত্রসন্নিবেশে কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিবে না।

আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসা ও ছোটগল্প

সমাজ, জীবন তথা সভ্যতা নিত্য নবনব রূপপ্রকাশের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। একালে যান্ত্রিকতার ক্রমবিস্তার, ফ্রয়েড-প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের আলোচনা এবং বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রচিন্তার সংঘাত—ইহারা সম্মিলিতভাবে মানবজীবনে নানা প্রশ্ন তুলিয়াছে, নানা সমস্যা উদ্ভাবিত করিয়াছে। তাই সাহিত্যকারকেও আজ রূপকথা, উপকথা, রাজা আর্থার ও শার্লামেনের নাইট-এরান্টদের কাল্পনিক বীরত্বকাহিনীর ক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া বাস্তব পৃথিবীতে নামিয়া আসিতে হইয়াছে। একালের সাহিত্যে জীবনদর্শন আছে—মানুষের

প্রাত্যহিক আশাআকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ, বিচিত্র সমস্যা ও জটিলতা, আনন্দ ও বেদনার রূপায়ণই সাম্প্রতিক কালের সাহিত্যিকদের লক্ষ্য। আধুনিক ছোটগল্পও সমাজ-সেবার এই মহৎ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু ছোটগল্প উপন্যাস নয়—উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণও নয়। উপন্যাসের বিস্তৃতি, জটিলতা, সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ ছোটগল্পে সম্ভব নয়। উপন্যাসের সঙ্গে ছোটগল্পের যে প্রভেদ, তাহা শুধু আকৃতিগত নয়—প্রকৃতিগতও বটে।

সার্থক ছোটগল্পের স্বরূপ

জীবনের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকেই ছোটগল্পে রূপ দেওয়া হয়, জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্ত ইহার মধ্যে বিশেষ একটি পরিবেশের মধ্য দিয়া গোচরীভূত হইয়া উঠে। নানা আভাসে, ইঙ্গিতে ইহা অতিশয় দ্রুতগতিতে রসপরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। উপন্যাসের স্পষ্টতা ইহাতে নাই—আছে সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনা। আমরা বলিতে পারি, 'স্বল্পতম পরিসরের মধ্যে গূঢ়তম সত্যের ব্যঞ্জনা'-ই ছোটগল্পের যথার্থ প্রাণবস্তু। সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে ইহার কলেবর সীমাবদ্ধ বলিয়া অনাবশ্যক ঘটনা, অনাবশ্যক চরিত্র ইহাতে বর্জনীয়। মানবজীবন ও মানবচরিত্রবিষয়ে দৃষ্টির মর্মভেদী তীক্ষ্নতা না থাকিলে ছোটগল্পরচনায় যথার্থ অধিকার অর্জন করা অসম্ভব। এ জন্য দেখা যায়, পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকই ছোটগল্প লিখিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন।

আধুনিক কালের গল্পলেখকদের মধ্যে যিনি কথাসাহিত্যে সর্বপ্রথম সমাজ-চেতনার সুর সঞ্চার করিয়াছেন, তিনি বিশ্রুত রুশ-কথাশিল্পী নিকোলাই গোগোল। 'ওভারকোট' গল্পটিতে একটি দুঃস্থ কেরাণীর বেদনাকাহিনী অবলম্বন করিয়া তিনি নিপীড়িত মানবের অপূর্ব একটি রূপকচিত্র আঁকিয়াছেন।

গোগোল, মোপাসা প্রমুখ ছোটগল্পলেখক

গল্পকারদের মধ্যে গোগোল চিরস্মরণীয়। তাঁহার সম্পর্কে জনৈক শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়াছেন, "All of us are born of Gogol's 'Overcoat"। ফ্রান্সের উনিশ শতকের গল্পলেখক গী-দ্য-মোপাসা-কে পৃথিবীর ছোটগল্প-রচয়িতাগণের বিস্তৃত ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া যায়। তাঁহার পরেই খ্যাতনামা রুশলেখক শেখভের স্থান। ইহা ছাড়া, ব্যলজাক্, ম্যাক্সিম গোর্কী, আলফাঁস দোদে, আলেকজান্দার কুপ্রিণ, ডি. এইচ. লরেন্স, এইচ. ই. বেট্‌স, পল্ হেসি, টিখোনভ্, ইউজিন সেরিকফ্, গলস্‌ওয়ার্দি, এ. বেনেট, মেসফিল্ড, আন্দ্রিভ, ব্রেটহার্ট প্রভৃতি লেখক পৃথিবীর গল্পভাণ্ডারকে লক্ষণীয়ভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

বাংলা-সাহিত্যে বর্তমানে ছোটগল্পরচনার যেন নূতন জোয়ার আসিয়াছে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে এই জাতীয় গল্পরচনার ইতিহাস খুব বেশী দিনের নহে।

বঙ্কিমের পূর্ববর্তী বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্পের ধাঁচটি কিছু কিছু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বর্তমান কালে ছোটগল্প বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সে জিনিসটি ওই সময়ে সৃষ্ট হয় নাই। বঙ্কিম বাংলা উপন্যাসের গোড়াপত্তন করেন এবং ইহাকে কিছুটা সম্পূর্ণতাও দান করেন। আবার, অন্যদিকে তিনি 'ইন্দিরা'র মতো উপন্যাসধর্মী বড়গল্পও রচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত ছোটজাতের গল্প তাঁহার একটিও নাই বলিলে বোধ করি তেমন ভুল বলা হয় না।

বাংলা ছোটগল্প অধুনিক কালের সৃষ্টি

পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রেরণায় এদেশে ছোটগল্প নবজন্মলাভ করিয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই সার্থক ছোটগল্প-রচনার ক্ষেত্রে প্রধান এবং প্রথম গৌরব দাবী করিতে পারেন। মানুষের চলিষ্ণু জীবনের ভগ্ন খণ্ডাংশের মধ্যে বৃহত্তর সত্তার রূপটিকে ধরিবার শিল্পটি রবীন্দ্রনাথই আমাদিগকে শিখাইয়াছেন। তাঁহার ছোটগল্পের যেমন ঐতিহাসিক মূল্য আছে, তেমনি রহিয়াছে সাহিত্যিক মূল্য। ছোটগল্পের অজস্র সম্পদে তিনি বাংলাসাহিত্যকে অপূর্ব সমৃদ্ধি দান করিয়াছেন। এইসব গল্পের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। তাঁহার 'মেঘ ও রৌদ্র', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা', 'পোষ্টমাষ্টার', 'কঙ্কাল', 'কাবুলিওয়ালা', 'অতিথি',. 'আপদ', প্রভৃতি গল্প আমাদের সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। পৃথিবীর যে-কোনো উচ্চশ্রেণীর গল্পের সঙ্গে ইহারা সমান আসন দাবী করিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ

উপন্যাস-রচনায় শরৎচন্দ্র একরূপ প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন, কিন্তু তাঁহার রচিত ছোটগল্পের সংখ্যা বেশী নয়। তথাপি যে-কয়টি ছোটগল্প তিনি রচনা করিয়াছেন, সেগুলির মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার ছাপটি বিশেষভাবে পরিস্ফুট। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি প্রধানত কাব্যধর্মী, উহার মধ্যে স্পন্দিত হইয়া উঠে মানুষের ভাবময় সত্তার ছন্দ। কবির লেখনীর যাদুময় স্পর্শে অনেক সময় বস্তু তাহার বস্তুত্ব হারাইয়া স্বপ্নলোকের সামগ্রী হইয়া উঠে—বস্তুর বাস্তবতাটি ধরাছোঁয়ার বাহিরে চলিয়া যায়। শরৎচন্দ্রের রচনা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখার তুলনায় অনেকটা বাস্তবধর্মী। মানবজীবনের বিচিত্র দ্বন্দ্ব শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পগুলিকে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। তবে আমাদের এ-কথাটি মনে রাখিতে হইবে, শরৎচন্দ্রের কয়েকটি গল্পে ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ততা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে ছোটগল্পের বিশিষ্টতাগুলি অনেক সময় ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। বড়ো উপন্যাসেই তাঁহার প্রতিভা খেলে বেশী—ছোটগল্প যেন তাঁহার প্রতিভার ঠিক উপযুক্ত বাহন নয়। 'সতী', 'মহেশ', 'মন্দির' প্রভৃতি গল্প শরৎপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

শরৎচন্দ্র

প্রভাতকুমার

বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচিত অনেক গল্পই একসময় জনসাধারণের প্রভূত সমাদর লাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাবধর্মিতা কিংবা শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিমুখী বাস্তবতা তাঁহার গল্পে দৃষ্ট না হইলেও, জীবনের লঘু দিকটিকে তিনি কৌতুকহাস্যে চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। উজ্জ্বল ও উচ্ছল হাসির দীপ্তি তাঁহার অধিকাংশ গল্পে প্রাণসঞ্চার করিয়াছে।

কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালী গল্পকার

রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের প্রদর্শিত পথে গল্প রচনা করিয়া বহু বাঙালী লেখক যশস্বী হইয়াছেন। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখক ইহাদের অন্যতম। তাঁহাদের অনলস সাহিত্যসাধনায় আমাদের ছোটগল্প অনেকখানি অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এইসব গল্পলেখকদের রচনায় বাংলার উচ্চমধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের চিত্রই সমধিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

অতি-আধুনিক বাংলা ছোটগল্প : উপসংহার

অতি-আধুনিক বাংলা গল্পলেখকদের রচনার ধারাটি পর পর দুইটি সংগ্রামোত্তর সমাজপরিবেষ্টনীর প্রভাবে পূর্বের ঐতিহ্য হইতে কিছুটা ভিন্নপথে প্রবাহিত হইতেছে। এ যুগের পৃথিবীতে আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আসিয়াছে নানা পরিবর্তন। জীবন ও জগৎকে নূতন দৃষ্টিতে যাচাই করিয়া লইতেই যেন আজ আমরা বদ্ধপরিকর। জীবনাদর্শের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের মধ্যেও আসিয়াছে অভাবনীয় রূপান্তর। অতি-আধুনিক গল্পলেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, সুবোধ ঘোষ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের রচনায় রূপ পাইয়াছে বাংলার সমাজজীবনের বিচিত্র দিক—নিম্নমধ্যবিত্ত, কুলিমজুর, পতিত অবমানিত মানুষ, বাংলার পল্লীচিত্র, বাংলার অতীত মহিমা ও নানা দুঃখগ্লানির ইতিহাস অতি-আধুনিক গল্পে স্থানলাভ করিয়াছে। হাসির গল্পে অদ্ভুত লিপিকৌশল দেখাইয়াছেন পরশুরাম। বর্তমানে আরও বহু লেখক প্রথমশ্রেণীর গল্প রচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইঁহাদের রচনার খ্যাতি শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতের বাহিরেও ব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহা আমাদের কেবল আনন্দের কথা নয়, শ্লাঘারও বস্তু।

বাংলা মহাকাব্য

[রচনার সংকেতসূত্র ঃ সূচনা—মহাকাব্যের স্বরূপ-বিশ্লেষণ—পাশ্চাত্ত্য এপিকের লক্ষণ—মহাকাব্যের বস্তুধর্মিতা ও উদাত্ততা—মহাকাব্যের রূপভেদ ঃ 'জাত' মহাকাব্য—'অনুকৃত' মহাকাব্য—প্রাচীন মহাকাব্যের সমুন্নতি ও বিশালতা—বাংলা মহাকাব্য আধুনিক কালের সৃষ্টি—মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র—মহাকাব্যের যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে।]

সূচনা

কবিতার আছে বিভিন্ন রকমের রূপ—মহাকাব্য সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ একটি রূপসৃষ্টি। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কবিপ্রতিভাকে আশ্রয় করিয়া মহাকাব্যের বিচিত্র অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। আধুনিক যুগে নানা কারণে এই শ্রেণীর কবিতাশিল্প আর গড়িয়া উঠিতেছে না সত্য, কিন্তু অতীতে জগতের বহু প্রতিভাশালী কবি মহাকাব্য রচনা করিয়া অবিস্মরণীয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ এবং ইউরোপ, উভয় দেশে একদিন স্বাভাবিক-ভাবেই মহাকাব্যের বিকাশ ঘটিয়াছিল। মহাকাব্যের রচয়িতা মহাকবির সংখ্যাও এই দুইটি দেশে খুব কম নয়।

মহাকাব্যের স্বরূপ-বিশ্লেষণ

ভারতীয় সংস্কৃত আলংকারিকেরা যাহাকে 'মহাকাব্য' নামে চিহ্নিত করিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্যদেশে তাহাকে বলা হয় 'এপিক'। বহিরঙ্গ লক্ষণের দিক দিয়া মহাকাব্য ও এপিক-এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা গেলেও, ইহাদের স্বরূপলক্ষণ-বিষয়ে ভারতীয় এবং ইউরোপীয় আলংকারিকদের মধ্যে বিশেষ মতানৈক্য দৃষ্ট হয় না। মহাকাব্যের প্রাচ্য সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, খুব বড়ো একটি ঘটনাবস্তুকে আশ্রয় করিয়া এজাতীয় কাব্যের শিল্পমূর্তিটি গড়িয়া উঠে। ইহার কাহিনীটি হইবে পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক—ইহার নায়ক হইবেন সদ্বংশজাত, উচ্চকুলসম্ভূত ও ধীরোদাত্ত-গুণান্বিত। ইহাতে শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্ত এই তিনটি রসের কোনও একটি প্রধান হইয়া বিরাজ করিবে—অন্য রসগুলি থাকিবে সঞ্চারীরূপে। মহাকাব্যের সর্গগুলি নাতিদীর্ঘ কিংবা নাতিহ্রস্ব হইবে না, এবং সর্গসংখ্যা অষ্টাধিক হইতে হইবে। ইহার বিশাল পটভূমিকা স্বর্গমর্ত্যপ্রসারী, আর ইহার মধ্যে থাকিবে বিচিত্র ছন্দে প্রকৃতিবর্ণনা, যুদ্ধবিগ্রহবর্ণনা, দেবদেবীর স্তুতিবন্দনা ও সাধারণের মঙ্গলকামনা। মহাকাব্যের ভাষা ও ছন্দে গাম্ভীর্য থাকিবে, ইহার সংলাপের মধ্যে থাকিবে নাটকীয় অভিব্যক্তি। নায়কের জয়ঘোষণার মধ্য দিয়া কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

পাশ্চাত্ত্য এপিকে-ও এই লক্ষণসমূহের অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিরাট ঘটনাকে উপজীব্য করিয়াই এপিক রচিত হইয়া থাকে। এপিকের ঘটনাবস্তুর পটভূমিকায় থাকিবে জাতীয় ইতিহাস কিংবা পৌরাণিক কাহিনী। মর্ত্যমানবের জীবনকথার সঙ্গে ইহাতে বর্ণিত হয় দেব-দানবের অতিলৌকিক লীলা। এপিকের নায়ক হইবেন শক্তিধর জাতীয় বীর—তাঁহার থাকিবে সমুচ্চ আদর্শ, তাঁহার জীবনটি হইবে মহিমাপ্রদীপ্ত। কাহিনীর অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা, সময়ের পারম্পর্য ও কাহিনীবর্ণনায় নাটকীয়তা পাশ্চাত্ত্য এপিকের বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহাতে চরিত্রসৃষ্টির প্রতিও কবির দৃষ্টি রাখিতে হয়। আবার মূল-কাহিনীর সঙ্গে শাখাকাহিনীর প্রয়োজনীয়তাও ইউরোপীয় মহাকাব্যে স্বীকৃত। এপিক রচিত হয় একটিমাত্র ছন্দে—যাহার প্রবাহের মধ্যে স্পন্দিত হইয়া উঠে উদাত্ত-গম্ভীর সংগীতধ্বনি। এপিক আদি মধ্য ও অন্ত-সমন্বিত কাহিনীর ছন্দিত রূপায়ণ। এ সম্পর্কে মনীষী এরিস্টটলের প্রদত্ত সংজ্ঞাটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য : 'As to that poetic imitation which is *narrative* in form and employs a *single metre,* the plot manifestly ought, as in a tragedy, to be constructed on *dramatic principles.* It should have for its subject a *single action, whole* and *complete,* with a beginning, a middle and an end'।

পাশ্চাত্ত্য এপিক-এর লক্ষণ

ভারতীয় মহাকাব্য ও পাশ্চাত্ত্য এপিকের স্বরূপপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায়, শ্রোতা অথবা পাঠককে গল্প শোনানই ইহাদের প্রধান লক্ষ্য। মহাকাব্য বস্তুনিষ্ঠ [objective] কবিতার অন্তর্ভুক্ত—ইহার আকৃতি বিশাল, ঘটনাবস্তু বিপুল, চরিত্রগুলির সমুন্নতি বিস্ময়কর ও ইহাতে মহাকবির কল্পনা দূরাভিসারী। কয়েকটি বিষয়ে বহিরঙ্গ রূপগত পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও 'এপিক' আর মহাকাব্যের মধ্যে স্বরূপলক্ষণগত তেমন কোনো পার্থক্য নাই। এ শ্রেণীর রচনার বস্তুধর্মিতা [objectivity] ও উদাত্ততা [sublimity] উভয় দেশেই স্বীকৃত।

মহাকাব্যের বস্তুধর্মিতা ও উদাত্ততা

মহাকাব্যের মধ্যেও আবার রূপভেদ দেখা যায়। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহাকাব্যের আকৃতি ও প্রকৃতিতে ঘটিয়াছে রূপান্তর। এজন্য সাধারণত আমরা দুই শ্রেণীর মহাকাব্য দেখিতে পাই। প্রথম শ্রেণীর মহাকাব্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, ওইগুলি কোনো বিশেষ একজন কবির

মহাকাব্যের রূপভেদ : 'জাত' মহাকাব্য

একলার সৃষ্টি নয়—উহাদের মধ্যে রহিয়াছে অজ্ঞাতনামা নানা কবির প্রতিভার স্বাক্ষর। বহু কবির রচিত বহু কাহিনী মূল বিষয়টির চতুর্দিকে শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। সর্বশেষ কবির সর্বগ্রাসী প্রতিভার স্পর্শে গল্পগুলি একত্র-সন্নিবদ্ধ হইয়া সুসমঞ্জস শিল্পমূর্তিতে অপূর্ব বিরাটত্ব লাভ করিয়াছে। এই শ্রেণীর মহা-কাব্যকেই বলা হয় 'জাত' মহাকাব্য, অর্থাৎ Primitive Epic, Authentic Epic বা Epic of Growth। ইহাদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয় সমগ্র জাতির জীবনাদর্শ ও জীবনদর্শন,—তাহার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'অডিসি', বাল্মীকির 'রামায়ণ', ব্যাসের 'মহাভারত' এই শ্রেণীর মহাকাব্য। ইহারা একাধারে কাব্য ও ইতিহাস।

'অনুকৃত' মহাকাব্য

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাকাব্যকে বলা হয় 'অনুকৃত' মহাকাব্য বা 'Imitative Epic'। এগুলিকে 'Literary Epic' নামেও অভিহিত করা হয়। ইহাদের আকৃতি প্রথম শ্রেণীর মহাকাব্যের মতো অতিকায় নয়, কিন্তু ঘটনাবস্তু সংহত ও সুসংবদ্ধ। তা ছাড়া, কলাচাতুর্যে এগুলি দীপ্তিমান। এই কাব্যগুলি অনেক পরের সৃষ্টি,—কিছুটা প্রাচীন 'জাত' মহাকাব্যের আদর্শ অবলম্বনে এগুলি রচিত। কবির বিশেষ মানসপ্রকৃতি, কবি যে-যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই যুগের আশাআকাঙ্ক্ষার কথাই ইহাদের মধ্যে রূপায়িত হয়। এই শ্রেণীর কাব্য কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল, ইহাদের শিল্পমূর্তির পিছনে প্রচ্ছন্ন থাকে কবির ব্যক্তিগত রুচি ও আদর্শের প্রভাব —'It is the product of individual genius working in an age of scholarship and literary culture on lines already laid down'। ইহাদের পাতায় পাতায় কবির নিপুণ হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাসের 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভব', মিল্টনের 'Paradise Lost', ভার্জিলের 'Aeneid', দান্তের 'Divine Comedia', ট্যাসোর 'Jerusalem Delivered', মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ', নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস', হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মহাকাব্য।

প্রাচীন মহাকাব্যের মধ্যে যে-বিস্তৃতি, নগ্নতা, স্পষ্টতা ও সরলতা আছে, আধুনিক মহাকাব্যে তাহা নাই। এ যুগের মহাকাব্যে চরিত্রের স্পষ্টতা হয়তো আছে, কিন্তু ভাষা ও বর্ণনভঙ্গির মধ্যে দেখা দিয়াছে সূক্ষ্মতা ও জটিলতা। নানা কারণে অতীতের অতিকায় মহাকাব্যগুলির মতো কাব্য রচনা করা বর্তমান কালে আর সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: 'ইহারা প্রাচীন কালের দেবদৈত্যের ন্যায় মহাকায় ছিল, ইহাদের জাতি এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।' রামেন্দ্রসুন্দর

ত্রিবেদী মহাশয় এই 'জাত' মহাকাব্যগুলি সম্পর্কে এক জায়গায় মন্তব্য করিয়াছেন : 'এ যুগের শিল্পী বিচিত্র কারুকার্যময় তাজমহল গড়িতে পারে, কিন্তু পিরামিড-রচনার যুগ বুঝি অতীত হইয়া গিয়াছে।' সমুন্নতি ও বিশালতায় প্রাচীন মহাকাব্যগুলি সত্যই পিরামিডের মতো।

প্রাচীন মহাকাব্যের সমুন্নতি ও বিশালতা

আমরা দেখিয়াছি, সংস্কৃত-সাহিত্যে মহাকাব্য রচিত হইয়াছে—ব্যাস, বাল্মীকি ও কালিদাস সংস্কৃত-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহাকবি। প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যে কিন্তু একখানিও মহাকাব্য নাই। মঙ্গলকাব্যগুলি মহাকাব্যজাতের নয়, ওইগুলি মিশ্রজাতের একটা রূপসৃষ্টি। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের এপিকগুলির প্রভাবেই অধুনা বাংলা মহাকাব্যের জন্ম। বাংলাভাষায় সর্বপ্রথম মহাকাব্য রচনা করেন প্রতিভাধর মধুসূদন দত্ত। মধুসূদনের পূর্বে রঙ্গলাল তাঁহার 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' রচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার কাব্যাদর্শ ছিল ইংরাজী সাহিত্যের 'মেট্রিক্যাল রোমান্স', 'ভার্স টেল' প্রভৃতি—বাংলায় যাহাকে বলা যায় 'কাহিনীকাব্য'। মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইংরেজ কবি মিল্টন, ইতালীয় কবি ভার্জিল, দান্তে, গ্রীককবি হোমার প্রভৃতির রচনার সঙ্গে তাঁহার নিবিড় পরিচয় ছিল। ইয়োরোপীয় কবিগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মধুসূদন মহাকাব্য রচনা করেন—'মেঘনাদবধ' তাঁহার কবিপ্রতিভার মহত্তম দান। মহাকাব্যের উপযোগী ছন্দটিকেও মধুসূদন নিজ প্রতিভাবলে আবিষ্কার করেন। তাঁহার প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠ বাহন। মধুসূদনের শিল্পাদর্শের মধ্যে ভারতীয় অপেক্ষা পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যের প্রভাবই অধিক পরিলক্ষিত হয়।

বাংলা মহাকাব্য আধুনিক কালের সৃষ্টি

মধুসূদনের কাব্যাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র মহাকাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার', নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' মহাকাব্যের গৌরব কিছুটা দাবী করিতে পারে। কাব্যের বিষয়বস্তু-নির্বাচনে হেম-নবীন উভয়েই বেশ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণিত ঘটনার মধ্যে বিশালতা ও উদাত্ততা [sublimity] আছে। কিন্তু একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, শুধুমাত্র পরিকল্পনার সমুন্নতি ও বিশালতার জন্যই মহাকাব্য শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে না—তাহার প্রকাশভঙ্গিতে, সামগ্রিক রূপায়ণেও চাই উৎকৃষ্ট শিল্পপ্রতিভার স্পর্শ। কাহিনীর বর্ণনায়, চরিত্রচিত্রণে, ভাব ও ভাষার প্রকাশে মহাকাব্যের মধ্যে এমন একটা সংযমসুষমা ও মহিমা থাকে, যাহার গুণে সমগ্র কাব্যটি রূপে-রসে

মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র

শতদল পদ্মের মতো বিকশিত হইয়া উঠে। কাব্য শুধুই ভাবমাত্র নহে—ইহা ভাবের রূপাশ্রিত, রসমণ্ডিত বাণীমূর্তি। 'বৃত্রসংহারে' দধীচির আত্মদানের মধ্যে ভাবগৌরব আছে, 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসে' আখ্যানবস্তুর সমুচ্চ মহিমা আছে, স্বদেশপ্রাণতা আছে, আছে আন্তরিক জাতীয়তাবোধ। কিন্তু এগুলির মধ্যে মহাকাব্যোচিত শিল্পকৌশল নাই, মহাকবির দুর্লভ সংযমসুষমা নাই, সমগ্রতার ঐকতান-সংগীত নাই। নবীনচন্দ্রের অহংমুখিতা, গীতিধর্মিতা ও রোম্যান্টিক কল্পনাভঙ্গি মহাকাব্যের ক্লাসিক আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। মধুসূদনের মতো উচ্চশ্রেণীর শিল্পরচনপ্রতিভা হেম-নবীনের কাহারও ছিল না। বাংলাসাহিত্যে একমাত্র মধুসূদনই পাশ্চাত্ত্য আদর্শের সার্থক মহাকাব্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ মহাকাব্য রচনা করিতে চেষ্টা করেন নাই। সর্বতোভাবে তিনি গীতিকবি। বাঙালীর প্রাণধর্ম গীতিকবিতার মধ্যেই অতি সহজভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বস্তুত মহাকাব্য বাঙালীর কবিপ্রতিভার যথার্থ বাহন নয়। তা ছাড়া, এযুগের সমাজজীবনগত জটিলতা ও সূক্ষ্ম মানসিক দ্বন্দ্ব মহাকাব্য-রচনার বিরোধী শক্তিরূপে দেখা দিয়াছে। এতদ্ব্যতীত গল্প ও উপন্যাসসাহিত্যের অভাবনীয় প্রসার ও অত্যুগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মহাকাব্যের ধারাটিকে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। এরূপ অবস্থায় এই জটিল যান্ত্রিক যুগে—দিনরাত্রির স্বল্প অবসরের মধ্যে—ছোটগল্প, উপন্যাস, গীতিকবিতা লইয়াই আমাদের রসপিপাসা নিবৃত্ত করিতে হইবে—মহাকাব্যের যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—সাম্প্রতিক বাঙালী কবির নবতন দৃষ্টিভঙ্গী—সাম্প্রতিক কাব্য ও মধ্যবিত্তজীবনের ক্ষয়িষ্ণুতা—উনিশ শ' তিরিশ সালের পরবর্তী বাংলা কবিতা—'অগ্রজের অটল বিশ্বাস' আজ বিচলিত—সাম্প্রতিক কবিতা সমাজমুখী—প্রেমেন্দ্র মিত্র—বুদ্ধদেব বসু—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—বিষ্ণু দে—সমর সেন—সুকান্ত ভট্টাচার্য—জীবনানন্দ দাশ—সুভাষ মুখোপাধ্যায়—অমিয় চক্রবর্তী—উপসংহার।]

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলাকাব্যে একটা বলিষ্ঠ ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও ইহার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরীতিকে অনুসরণ করিয়া বহুসংখ্যক

বাঙালী কবি কবিতার উদার প্রাঙ্গণে পদচারণ করিয়াছেন এবং কবিগুরুর প্রবর্তিত সেই ধারাটিকে যথাসাধ্য পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অনুবর্তীগণের কাব্যে প্রধানত রূপায়িত হইয়াছে ধনতান্ত্রিক সমাজের জীবনাদর্শে গঠিত একটা বিশেষ সংস্কৃতি ও ইহার প্রভাবে লালিত একটা বিশেষ মানসপ্রকৃতি। এই কাব্যধারার পটভূমিতে রহিয়াছে একটা স্নিগ্ধমধুর প্রশান্ত পরিবেশ। রবীন্দ্রানুসারী কবিগণ প্রেমজীবনের মাধুর্য ও বিচিত্ররূপা নিসর্গপ্রকৃতির সৌন্দর্যে বিহ্বল। চতুষ্পার্শ্বের জগৎ ও জীবনের বিবর্ণ ধূসরতা আর ক্লেদপঙ্কিল কুশ্রীতার দিকে ইঁহারা তেমন দৃষ্টিপাত করেন নাই।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

অতি-আধুনিক যুগে এ দেশে যে-কাব্যসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্টতার চিহ্ন পরিস্ফুট—রবীন্দ্রপ্রবর্তিত কাব্যরীতির ঐতিহ্যের সঙ্গে ইহার পার্থক্যটি কাহারও দৃষ্টি এড়াইবার নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যলোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেরও একটা সুর ইহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এই সাম্প্রতিক যুগের কবিরা বিগত দিনের রোম্যান্টিক স্বপ্নালুতাকে যেন স্বীকৃতি জানাইতে অনিচ্ছুক। অধুনা বাংলাকাব্যের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের ধারাটি সবিশেষ লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রপরবর্তী যুগের এইসব কবিদলকে আমরা যে সাম্প্রতিক বা অতি-আধুনিক নামে চিহ্নিত করিতেছি, তাহা শুধু তাঁহাদের রচনার বিশিষ্ট ভঙ্গির জন্য নয়, কবিতার শুধু আকৃতিগত পরিবর্তনের জন্য নয় তাঁহাদের আশ্রিত বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের জন্যও নয়। কারণ, কেবলমাত্র বিশিষ্টবাচন-ভঙ্গির জন্য কিংবা শুধু বিষয়বস্তুর নূতনত্বের জন্য সাহিত্যে কেউ আধুনিকতার দাবী করিতে পারেন না, যদি-না তাহার পিছনে থাকে বিশেষ একটি অভিনব মনোভঙ্গির প্রেরণা। সাম্প্রতিক যুগের কবিমানসকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই—ইহার রুচিতে, রসবোধে, সংস্কারে দেখা দিয়াছে প্রস্ফুট একটা স্বাতন্ত্র্য। এই স্বাতন্ত্র্যের মূলে বিরাজমান রহিয়াছে সমাজবিবর্তনের ঐতিহাসিক বাস্তব কারণ।

সাম্প্রতিক বাঙালী কবির নবতন দৃষ্টিভঙ্গি

এ যুগের কবিরা সামাজিক যে-পরিবেশের মধ্যে মানুষ, উহার চারিদিকে আজ ভাঙন ধরিয়াছে। মধ্যবিত্তজীবনের ক্ষয়িষ্ণুতার জন্য কবিশিল্পীর মনে দেখা দিয়াছে হতাশা ও নিরাশ্বাস—জনগণের চতুর্দিকে কুৎসিত মৃত্যুর মিছিল, তাহাদের ভবিষ্যৎ মানসিক-শক্তি-হ্রাসকারী অবসাদের অন্ধকারে সমাবৃত। সমাজ-জীবনের এই অবক্ষয় চিত্তের মধ্যে যে-ধূসরতার সৃষ্টি করিয়াছে, আজিকার

সাম্প্রতিক কাব্য ও মধ্যবিত্তজীবনের ক্ষয়িষ্ণুতা

দিনের কাব্যের মধ্যেও পড়িয়াছে তাহার মসীকৃষ্ণ ছায়া। তাই এ যুগের কবিরা হারাইয়া ফেলিয়াছেন স্বপ্নমেদুর রোম্যান্টিক দৃষ্টি, তাঁহারা ভুলিতে বসিয়াছেন প্রেমসৌন্দর্যের আরতিবন্দনা, তাঁহাদের চোখের সম্মুখে মানবসংসার আর প্রকৃতির সংসার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন। সাম্প্রতিক যুগের কাব্য ভাঙনেরই কাব্য—ইহার মধ্যে মেলে ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তমনের পরিচয়।

মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম-প্রমুখ রবীন্দ্র-সমকালীন কবিদের রচনায় যে-আধুনিকতার সুরটি বাজিয়া উঠে, অতি-আধুনিক যুগের মধ্যবিত্তশ্রেণীর কবিরা সেই ধারাটিকে আরও অগ্রসর করিয়া দিলেন। পূর্ববর্তীদের কাব্যে যেটা ছিল অস্পষ্ট, তাহা সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করিল সাম্প্রতিক কবির কাব্যসৃষ্টিতে। কাব্যের বহিরঙ্গ রূপ ও অন্তরঙ্গ প্রকৃতির পরিবর্তনের স্বাক্ষরচিহ্ন ধরা পড়ে বিশেষ করিয়া উনিশ শ' তিরিশ সালের পরবর্তী বাংলা কবিতায়। এই সময় হইতেই কাব্যে অতি-আধুনিকতার লক্ষণ প্রকট হইয়া উঠে—কবিতার মধ্যে ধ্বনিত হইল একটা ভাঙনের সুর, ইহাতে ছায়াপাত করিল একটা নূতন মানসপ্রকৃতি, দেখা দিল নূতন আঙ্গিক। পুরাতন ছন্দের স্থলে আবির্ভূত হইল নূতন গদ্যছন্দ, কবিতার প্রাঞ্জলতার স্থলে আসিল দুরূহতা ও অন্তর্মুখীনতা। এতকাল ভাবের দিকে যাহাকিছু ছিল স্বচ্ছ ও স্পষ্ট তাহা সরিয়া গেল জটিল প্রতীকিতার অন্তরালে। শুরু হইল সাম্প্রতিক কবির স্বগতোক্তি আর নেপথ্যভাষণ—এলোমেলো-ভাবে, কোমলতাবর্জিত ছন্দে।

উনিশ শ' তিরিশ সালের পরবর্তী বাংলা কবিতা

আধুনিক কবির কাব্যরচনার প্রেক্ষাপটে রহিয়াছে যে-ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তসমাজ ও গণজীবন, তাহার মধ্যে অবস্থান করিয়া এ যুগের কবিরা যদি আশা-আনন্দ-উদ্বেলিত হৃদয়ের সুকোমল সংগীত উচ্চারণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমাদের বিস্মিত হইবার কোনো কারণ নাই। 'অগ্রজের অটল বিশ্বাস' যদি তাঁহাদের না থাকে তবে তাহার জন্য দুঃখ করিয়াও কোনো লাভ নাই। চারিদিকের কুশ্রীতা, ধূসরতা ও মৃত্যুপাণ্ডু পরিবেশের মধ্যে এ যুগের কবিরা বর্ধিত। তাঁহাদের চোখের সম্মুখে সর্বক্ষণ তাই ভাসিয়া উঠে হতাশ্বাস ও মহামৃত্যুর ছবি :

'অগ্রজের অটল বিশ্বাস' আজ বিচলিত

'মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট,
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।'

সাম্প্রতিক কবির মন যে সমাজচেতন এবং তাঁহাদের কাব্যভাবনা যে

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মকেন্দ্রিক নয়—সমাজমুখী, এ সত্যটি আমাদের স্বীকার করিতে হইবে। এ কারণে রবীন্দ্রঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁহাদের কাব্যরীতির মিল অনেক ক্ষেত্রেই নাই। একটা অবিশ্বাস, সংশয় ও বিক্ষোভের সুর তাঁহাদের প্রায় সকলেরই রচনায় স্পন্দিত হইতেছে। জীবনের গদ্যময় স্তর একালের কবির বিচরণক্ষেত্র।

সাম্প্রতিক কবিতা সমাজমুখী

প্রেমেন্দ্র মিত্র আধুনিক যুগের একজন বিশেষ শক্তিমান কবি। সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যে তাঁহার কাব্যেই শ্রেণীসংঘাতের ছবি, মানবতার অপমানের কথাটি সর্বপ্রথম পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মানুষের দীনতা ও মানবাত্মার অবমাননায় কবির মন ব্যথিত ও পীড়িত। একটা কৃত্রিম বন্ধনের মধ্যে পড়িয়া মানুষের জীবন যে অভিশপ্ত হইয়া উঠিতেছে, সেই বন্ধন ঘুচাইবার জন্য কবির অন্তরে জাগিয়াছে ব্যাকুলতা। সাহিত্যে কামার, কুমোর, ছুতোর, মুটে-মজুরকে প্রেমেন্দ্র মিত্র সহজ প্রবেশ-অধিকার দিলেন, ইহাদের জীবনের দুঃখবেদনাকে তিনি নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিলেন। সমাজের অব্যবস্থায় এইসব মানুষের প্রাণধারণের গ্লানি যে কতখানি দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের জীবন যে কত বিকৃত, সে-কথাই তিনি আমাদের শুনাইলেন :

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে,
কাঁদে কোটি মা'র কোলে অন্নহীন ভগবান মোর।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যে আছে সমাজবাদী বাস্তবতার সুর। বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা'-র মধ্যে যে-বিদ্রোহ আমরা দেখিতে পাই তাহা ব্যক্তিগত। আধুনিক সমাজের কৃত্রিমতা হইতে তিনি মুক্তি পাইতে চাহেন—ভাগ্যের কারাগারে বন্দী মনকে চাহেন মুক্তি দিতে। তাঁহার কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে বিধাতার প্রতি একটা চাপা বিদ্রূপ। ভাঙনের মুখে মহৎ কিছুরই আশা তিনি করেন না—সৌন্দর্যের অবিনশ্বরতা, প্রেমের মহার্ঘতা ও মর্যাদা আজ যেন কবির চোখে সত্যই অর্থহীন।

বুদ্ধদেব বসু

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রমুখ কবির কাব্যেও ধরা পড়ে এ যুগের অবক্ষয়ের প্রভাবচিহ্ন। আশার বাণী, সুন্দরের জয়বার্তা তাঁহাদের রচনায় উচ্চারিত হয় না—বর্তমানের পঙ্গু সমাজ সেখানে ফেলিয়াছে দীর্ঘ কালোছায়া। কেন্দ্রচ্যুত জীবনের নৈরাশ্য-হাহাকার-কদর্যতা সাম্প্রতিক কবির সুন্দরের সকল স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহারা আজিকার দিনের মানুষের জীবনের কোনো অর্থ

সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, সমর সেন

খুঁজিয়া পান না—তাঁহাদের চোখের সম্মুখে আঁকা রহিয়াছে বিরাট এক জিজ্ঞাসার চিহ্ন। এইসব কবির কাব্যে কোথাও ফুটিয়াছে ব্যঙ্গের হাসি, কোথাও বিদ্রোহ, কোথাও বা নেতিবাদমূলক সন্দেহ।

বিষ্ণু দে-র কবিতায় বিগত দিনের সৌন্দর্যতন্ময় জীবন ও স্বপ্নমেদুর কল্পনার প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ দেখা যায়। একালের নৈরাশ্যপীড়িত জীবনের প্রতীক তাঁহার 'বেকার-বিহঙ্গ'। বর্তমান বেকার মানুষের জীবনে স্বপ্নের দেশ অপেক্ষা মরা শহরই অধিকতর সত্য ও বাস্তব। সাম্প্রতিক কবিরা যে শুধু হতাশারই গান বাঁধিয়াছেন তাহা নয়—নূতন যুগের স্বর্ণতোরণদ্বারও মাঝে মাঝে তাঁহাদের চোখে ভাসিয়া উঠিয়াছে। রুগ্ন, অসুস্থ সমাজের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহারা সুস্থ সবল জীবনের স্পন্দনটি মাঝে মাঝে অনুভব করেন।

বিষ্ণু দে

এ কালের অসুস্থতাবোধের লক্ষণ সবচেয়ে বেশী ধরা পড়ে সমর সেনের কবিতায়। সুতীব্র শ্লেষ ও তীক্ষ্ণ বাস্তবচেতনা লইয়া তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে আমরা অপূর্ব সম্ভাবনাময়তা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। বস্তুবাদী ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় প্রভাবিত নাগরিক জীবনের পটভূমিকায় রচিত হইয়াছে তাঁহার কবিতাগুলি। নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে তাঁহার বক্তব্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে:

সমর সেন

'তিলে তিলে মৃত্যু, রুদ্ধশ্বাস-মৃত্যু আমাদের প্রাণ,
দিকে দিকে আজ হানা দেয় বর্বর নগর,
আর সমস্ত ক্ষণ রক্তে জ্বলে
কতো শতাব্দীর শূন্য মরুভূমি।'

সমর সেনের কবিতায় আধুনিক কাব্যের ভঙ্গিটি অতিশয় পরিস্ফুট। অভিনব একটি ছন্দোভঙ্গির মাধ্যমে নিজের বক্তব্যকে তিনি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। গদ্যছন্দের মধ্য দিয়াও যে সার্থক কবিতা রচনা করা যায়, তাহার প্রমাণ তিনি দিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত অংশটিতে কবির প্রাণের আকূতি কী চমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে:

'অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘমদির মহুয়ার দেশ,
সমস্ত ক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।

আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়ার ফুল—
নামুক মহুয়ার গন্ধ।'

পরিতাপের বিষয়, সমর সেনের মতো এমন একজন সম্ভাবনাময় কবি কাব্যের জগৎ হইতে একরূপ বিদায় লইয়াছেন।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সুকান্ত ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখনীয়। ধনতান্ত্রিক সমাজের অসাম্য-অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি উচ্চকণ্ঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। সুকান্তের 'ছাড়পত্র' বাংলা কাব্যসাহিত্যের একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ। সমাজচেতনার এমন কাব্যসম্মত রূপায়ণ খুব কমই দেখা যায়। বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে সুকান্ত নিজের কবিসত্তাটির যথার্থ সংযোগ ঘটাইয়াছিলেন, কেবল ভঙ্গিসর্বস্ব রচনায় তিনি বাঙালী পাঠকসাধারণকে বিভ্রান্ত করিতে চাহেন নাই। সুকান্তর রাজনীতিক চেতনা ও কাব্যরচনা বুদ্ধিগত একটি ব্যাপার ছিল না। সংগ্রামশীল মনোভাব লইয়াও কাব্যসৃষ্টি কেমন সার্থক হইয়া উঠিতে পারে, সুকান্ত ভট্টাচার্যের লিখিত কবিতার মধ্যে তাহার উজ্জ্বল পরিচয় মিলিবে। এই তরুণ কবির নিকট হইতে আমরা অনেক-কিছু আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য তিনি অতি অল্পবয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। সুকান্তর দলীয় একজন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সুভাষের কবিশক্তি ও স্বকীয়তার দাবী অবশ্যস্বীকার্য। অধুনা যে-সমাজসচেতন কাব্য আমরা দেখিতে পাই তাহার উদ্বোধনমূলে সুভাষের শক্তিমত্তা সক্রিয় প্রেরণা যোগাইয়াছে। জীবনবোধের আন্তরিকতা সুভাষের রচনাকে কাব্যগুণান্বিত করিয়াছে, তাঁহার কবিতার আঙ্গিকের সৌন্দর্য চমৎকার।

সুকান্ত ভট্টাচার্য ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়

জীবনানন্দ দাশ অতি-আধুনিক যুগের খুব নামকরা একজন কবি। আমাদের সমাজের অবক্ষয়ের দিকটি তাঁহার কাব্যরচনায় কিন্তু বড়ো হইয়া দেখা দেয় নাই। তিনি অতিমাত্রায় রোম্যান্টিক। বর্তমান যুগে তাঁহাকে রবীন্দ্রঐতিহ্যের সর্বশেষ উত্তরাধিকারী বলা যাইতে পারে। জীবনানন্দ যে-জগতে বাস করেন তাহা রূপকথার, নিত্যকালের স্বপ্নলোকের অধিবাসী তিনি। কাব্যে তিনি যে-রসটি পরিবেশন করিয়াছেন তাহাকে নির্বিরোধ স্বপ্নরস বলা যাইতে পারে। বুদ্ধির তীক্ষ্ণ দীপ্তি নয়, কোনোরূপ প্রচারণা নয়, একালের জীবনজিজ্ঞাসাও নয়,—দূরযানী স্বপ্নাতুর অতৃপ্ত মনটিকে পাথেয় করিয়া কবি কালচিহ্নহীন ছায়াময় পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, অতীতের শত শত মূক শতাব্দী তাঁহার কাব্যে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। শান্তসুন্দর প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া, স্বপ্নের হাতে ধরা দিয়া কবি জীবনের রূঢ়তার আঘাত

জীবনানন্দ দাশ

হইতে মুক্তি পাইতে চাহিয়াছেন। তাই স্বপ্নলোকচারী এই কবির মুখে আমরা শুনিতে পাই :

'পৃথিবীর দিন আর রাতের আঘাতে
বেদনা পেত না তবে কেউ আর,
থাকিত না হৃদয়ের জরা—
সবাই স্বপ্নের হাতে দিত যদি ধরা।'

জীবনানন্দ—সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, সমর সেন ইত্যাদি কবিগণের সগোত্র নহেন, অথচ তিনি সাম্প্রতিক বাঙালী কবিগোষ্ঠীর অন্যতম। গোষ্ঠিগত পরিচয়ে জীবনানন্দের পরিচয় নয়, তাঁহাকে নিঃসন্দেহে অসাধারণ বলা যাইতে পারে। একালের বহু কবির রচনায় জীবনানন্দ দাশের কাব্যভাবনা ও কাব্যভঙ্গির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

সাম্প্রতিক কবিতার ক্ষেত্রে অমিয় চক্রবর্তী, অজিত দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, দীনেশ দাস, বিমল ঘোষ, গোলাম কুদ্দুস্, অরুণ মিত্র, রাম বসু, জগন্নাথ চক্রবর্তী, হরপ্রসাদ মিত্র প্রমুখ কবি শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহাদের কবিতা স্বকীয় ভাবকল্পনায় সুন্দর—দীপ্তিমান। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা একটু পূর্বে বলিয়াছি। তিনি কাব্যকে বীণারূপে ব্যবহার না করিয়া অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহাকে নিঃসংশয়ে জনগণের কবি বলা যাইতে পারে।

অমিয় চক্রবর্তী

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাও যেমন অভিনব, তেমনি চমকপ্রদ। কী বিষয়বস্তু কী প্রকাশভঙ্গি—উভয় দিক হইতেই তিনি আধুনিক। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল, মননশক্তি প্রখর। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে যে-পরীক্ষানিরীক্ষা তিনি চালাইয়াছেন তাহাতে দুঃসাহসের পরিচয় আছে। নতুন কাব্যরীতির প্রবর্তনবিষয়ে অমিয় চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য

কোনো বিশেষ একজন-মাত্র কবি এই সাম্প্রতিক যুগের প্রতিভূ নহেন। অনেক কবি মিলিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন এই নূতন কাব্যধারাকে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে শক্তিমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোনো কোনো কবির মধ্যে কিন্তু নূতনত্বের মোহজনিত অভিনবত্বের প্রতি প্রবল একটা ঝোঁক দেখা যায়—এরূপ মনোবৃত্তি কবিকর্ম ও কবিধর্মের শত্রু। অনেকে আবার কাব্যের ক্ষেত্রে দুরূহতার পক্ষপাতী। মনে রাখিতে হইবে, শুধুমাত্র পাণ্ডিত্যপ্রকাশের জন্যই দুরূহতা কাব্যে একেবারে অচল। সে যাহা হোক, অতি-আধুনিক কবিরা বাংলাকবিতার পরিধিকে যে প্রশস্ততর করিয়া তুলিয়াছেন, একথা অনস্বীকার্য। সাম্প্রতিক কবিদের কাহারও কাহারও রচনায়

উপসংহার

যে-অসুস্থতা ও রুগ্নতার লক্ষণ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যদি ইঁহারা কাটাইয়া উঠিতে পারেন, যদি কাব্যে সুস্থ সবল জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের কবিকর্ম বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী মর্যাদা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত হওয়াই তাঁহাদের পক্ষে বড়ো কথা নয়—তাঁহাদের নিকট আমরা চাই নূতন একটা বলিষ্ঠ ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা। তাঁহাদের কাব্যকে শুধু নেতিবাচক হইলে চলিবে না, ইহাকে হাঁ-ধর্মীও হইয়া উঠিতে হইবে—তবেই বাংলার সাম্প্রতিক কবিদলের কাব্যসাধনা যথার্থ সার্থকতা-মণ্ডিত হইয়া উঠিবে। মনে রাখা প্রয়োজন, উচ্চকণ্ঠে প্রচারণা নয়, মুদ্রাদোষযুক্ত ভঙ্গিসর্বস্বতা নয়, কৃত্রিম সংগ্রামী মনোভাব নয়—প্রগাঢ় জীবনবোধ, তজ্জনিত আবেগের তীব্রতা, কবিভাষার উপর যথার্থ অধিকার এবং শিল্পীসুলভ একনিষ্ঠ সাধনাই কাব্যের রূপলোকসৃষ্টির সহায়ক।

সমাজ, জীবন ও সাহিত্য

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—মানবজীবনে সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা—সামাজিক মানুষের জীবনই সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাভূমি—সাহিত্যে সমাজের ছায়াপাত হইতে বাধ্য—সাহিত্য-শিল্প বাস্তবের অনুলিপিমাত্র নয়—বাস্তব-সত্য ও সাহিত্যের সত্য এক হইতে পারে না—সাহিত্যের সত্য একহিসাবে বাস্তব-সত্য অপেক্ষা গভীরতর—সমাজ ও জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের নিগূঢ় সংযোগ—সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য—উপসংহার।]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

সমাজ, জীবন ও সাহিত্য—এই তিনটি বস্তু পরস্পর অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। মানুষকে কেন্দ্র করিয়াই সমাজ গড়িয়া উঠে, আর এই সমাজের মধ্যেই মানুষের ব্যক্তিসত্তাটি ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। এই যে সমাজ ও মানবজীবন, ইহাদের উভয়কে লইয়াই সাহিত্যের কারবার। বহু জীবনকে সমাজ বাহিরের দিক হইতে এক করে, আর সাহিত্য মানসিকভাবে বহু হৃদয়কে এক নিগূঢ় ঐক্যানুভূতির দ্বারা বাঁধিয়া দেয়। সাহিত্য আর-কিছুই নয়, ইহাকে আমরা মানবসমাজের 'মানসসমাজ' বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, মানবমৈত্রীর ক্ষেত্রে সমাজ অপেক্ষা সাহিত্য বহুগুণ অগ্রবর্তী। নানা দেশের নানা মানুষের মধ্যে আচার, ব্যবহার ও রীতিনীতিগত অজস্র তারতম্য রহিয়াছে। এইসব কারণে

সকল দেশের মানবসমাজ মিলিয়া-মিশিয়া অখণ্ড বিশ্বসমাজে পরিণত হইতে পারে নাই। কিন্তু মানুষের রচিত সাহিত্য মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো দেশগত, জাতিগত ও সমাজগত যাবতীয় কৃত্রিম ব্যবধানকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। যাহা মানুষের উপদেশ-বাক্যে হয় নাই, বিশ্বস্বস্তিপরিষদ যাহা করিতে পারে নাই, অথবা নোবেল-সমিতির শান্তিপুরস্কারবিতরণেও যাহা সার্থক হইয়া উঠে নাই, সাহিত্য অবলীলায় তাহা করিয়া ফেলিয়াছে।

মানবজীবনে সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা

আমরা বলিয়াছি, সামাজিক মানুষের জীবনের উপরই সাহিত্যের ভিত্তি-ভূমি রচিত। দেশ বা জাতির দিক হইতে মানুষে-মানুষে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, মৌলিকভাবে সমস্ত মানুষের হৃদয়বৃত্তি কিন্তু এক। দেশে দেশে মানুষ একই ভাবে ভালোবাসে, একই ভাবে আনন্দিত হয়, একই ভাবে বেদনায় অশ্রুমোচন করিয়া থাকে। হৃদয়ের ক্ষেত্রে মানুষের বর্ণভেদ নাই, ধর্মভেদ নাই, জাতিভেদ নাই—সহৃদয় মানুষ একে অন্যের সহিত স্বরূপত অভিন্ন। তাই ভারতবর্ষের কাব্যকার কালিদাসের রচনা পড়িয়া জার্মান-কবি গ্যেটে উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন, এবং বাঙালী কবি ইংলণ্ডের সেক্‌স্‌পিয়ারকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন: 'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি'। সাহিত্যের প্রাঙ্গণতলেই নিখিল মানবের যথার্থ মিলন—হৃদয়ে-হৃদয়ে মিলন। এই যে মানবহৃদয়, ইহা শুধু সর্বদেশেই এক নয়—সর্বকালেও এক। আমাদের দেহের রক্ত যেমন শত শতাব্দীর ব্যবধানেও নিজের বর্ণ পরিবর্তিত করিতে পারে নাই, আমাদের হৃদয়ের মৌলিক বৃত্তিগুলি সম্পর্কেও সেই একই কথা প্রযোজ্য।

সামাজিক মানুষের জীবনই সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাভূমি

সাহিত্য বিশেষ রকমের একটা আর্ট বা শিল্পসৃষ্টি। মানবজীবন ইহার উপাদান। মানুষের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, আনন্দবেদনা এবং বহুবিচিত্র বাসনা-কামনাকেই সাহিত্যশিল্পী তাঁহার রচনার মধ্যে রূপায়িত করিয়া তোলেন। সাহিত্যরচয়িতা যে-সমাজের মানুষ, তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যে সেই সমাজেরই ছায়াসম্পাত অনিবার্য, পারিপার্শ্বিক প্রভাবকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না। স্রষ্টার প্রতিভা যতই সার্বজনীন হোক না কেন, বিশেষ দেশ ও বিশেষ সমাজকে বাদ দিয়া সাহিত্যপ্রতিমা গড়িয়া তোলা কখনও সম্ভব নয়। কোনো শিল্পীই আপন দেশ ও যুগের বিশেষ গণ্ডীটিকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারেন না—বিশেষের উপরই দাঁড়াইয়া থাকে শিল্পনির্মিতির নির্বিশেষ বিশ্বজনীনতা।

সাহিত্যে সমাজের ছায়াপাত হইতে বাধ্য

সাহিত্যে জীবন আছে, সমাজ আছে, মানবচরিত্র আছে,—তথাপি সাহিত্য ইহাদের কাহারও অনুকরণ কিংবা প্রতিবিম্বমাত্র নয়। প্রকৃতির সংসার বিরাট, মানবজীবনও বিশাল। শিল্পী ইহাদের খণ্ড ভগ্নাংশকেই সাহিত্যে বাণীরূপ দান করেন। বাস্তবে যাহা আমরা দেখি, যথাযথভাবে সাহিত্যে তাহা প্রতিফলিত হয় না। কোনো শিল্পই বাস্তবের অনুলিপি নয়। যদি তাহাই হইত, তবে সংবাদপত্রের সঙ্গে সাহিত্যশিল্পের কোনো পার্থক্যই থাকিত না। প্রত্যেক সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির অন্তরালে থাকে স্রষ্টার বিশেষ প্রতিভা—তাঁহার মনের দৃষ্টি, বিশিষ্ট ভাবকল্পনা, হৃদয়ের রঙ্ ও প্রাণের সুর সেই সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত হইয়া যায়। সাহিত্যে বাস্তব অনেকটা রূপান্তরিত হইয়া ভিন্নতর মূর্তি গ্রহণ করে। 'জগতের উপরে বসিয়াছে মনের কারখানা, মনের উপর বসিয়াছে বিশ্বমনের কারখানা—সেই উপরের তলা হইতেই সাহিত্যের সৃষ্টি।' বাস্তবকে ভাঙিয়া-চুরিয়া লইয়াই সাহিত্যস্রষ্টা বাণীবিগ্রহ নির্মাণ করেন। দূরকে নিকটে আনিয়া, নিকটকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া, অদৃশ্যকে দৃশ্য করিয়া, দৃশ্যকে অদৃশ্য করিয়াই শিল্পের এ কাজটি সম্পাদিত হয়।

সাহিত্যশিল্প বাস্তবের অনুলিপিমাত্র নয়

অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন, সাহিত্যে বস্তু যদি এমনই রূপান্তরিত হইয়া যায়, তবে সাহিত্যের সত্য সত্যই নহে, ইহা মিথ্যারই নামান্তর। ইহার উত্তরে বলা যায়, এ রকম ধারণা করিবার সংগত কোনো কারণ নাই। কেন-না, বাস্তব সত্য ও সাহিত্যের সত্য কদাপি এক-বস্তু নয়। মানুষের লৌকিক জীবনে থাকে অনেক অসামঞ্জস্য, অনেক বিরোধ, অনেক অবাস্তবতা, অসংবদ্ধতা। সাহিত্যশিল্পী তাঁহার নিজস্ব ভাবকল্পনার সহায়তায় সেই অসামঞ্জস্য, বিরোধ, অসংলগ্নতাকে বিদূরিত করিয়া দিয়া মানবজীবনের যে-গূঢ় অর্থ প্রকাশ করেন, যে-রহস্যময়তা উন্মোচিত করেন, তাহাতেই সাহিত্যসত্য বাস্তব অপেক্ষা সত্যতর হইয়া উঠে। সাহিত্যের সত্য তথ্যগত নয়, ভাবগত,—এই সত্য সম্ভাব্য সত্য।

বাস্তব-সত্য ও সাহিত্যের সত্য এক হইতে পারে না

বাস্তব জীবনে ও জগতে যাহা শুধু তথ্যমাত্র, তত্ত্বমাত্র কিংবা শুধু ঘটনার কঙ্কালমাত্র, সাহিত্যিকের সৃজনীপ্রতিভা তাহাকেই রসাভিষিক্ত করিয়া গভীরতর সত্যের ব্যঞ্জনামণ্ডিত করিয়া তোলে। জগৎ ও জীবনের বিচিত্র রহস্য সাহিত্যশিল্পীর কল্পনার যাদুস্পর্শে প্রত্যক্ষ প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। পৃথিবীর অমর সাহিত্যপ্রতিভা জগৎ ও জীবন-সম্পর্কিত গভীর অনুভূতি বা 'Profound

সাহিত্যের সত্য এক হিসাবে বাস্তব-সত্য অপেক্ষা গভীরতর

experience'-এর উপরই দাঁড়াইয়া আছে—ম্যাথ্যু আর্নল্ড্-এর ভাষায় ইহাকে আমরা 'Criticism of life'-ও বলিতে পারি। সুতরাং সাহিত্যসৃষ্টিকে আমরা অবাস্তব স্বপ্নকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। শ্রেষ্ঠ কবি বা সাহিত্যিক জীবনের ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া শূন্যময় স্বপ্নজগতে আশ্রয় গ্রহণ করেন না—তাঁহারা কোথাও যদি 'পলায়ন' করেন, তবে তাহা জীবনেরই নিগূঢ় উপলব্ধির জগৎ : 'Art, however, offers us not only *escape from life but an escape into life* and the first escape is of importance only if it leads to the second'।

আমরা দেখিলাম, সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ ও জীবনের নিগূঢ় সংযোগ রহিয়াছে। সমাজের রূপান্তর ও মানুষের জীবনসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের মধ্যেও পরিবর্তন সূচিত হয়। বাংলা-সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও একথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে। বঙ্কিমযুগের সাহিত্যাদর্শ আর অতিআধুনিক কালের সাহিত্যাদর্শ এক নয়—এক হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ, বঙ্কিমের সমাজকে আমরা আজ বহুদূর পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি,—সমাজের প্রভাব সাহিত্যে থাকিতে বাধ্য। কিন্তু ইহাতে কাহারও যেন ধারণা না জন্মায় যে, সমাজকে প্রকাশ করাই বুঝি সাহিত্যিকের লক্ষ্য। কবি কিংবা সাহিত্যিক শুধু সামাজিক মানুষ নহেন, তাঁহারা শিল্পীও বটেন, শিল্পসৃষ্টিব্যাপারে শিল্পের বিশেষ ধর্মটিকেও তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া চলিতে হয়।

সমাজ ও জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সংযোগ

রূপসৃষ্টি ও রসসৃষ্টি করাই সাহিত্যিকের প্রধান লক্ষ্য—সমাজ ও জীবন সাহিত্যের উপলক্ষ বা উপাদান-মাত্র। সাহিত্যবিচারকালে আমাদের দেখিতে হইবে, সমাজ ও জীবনের বাস্তবতা সাহিত্যে সহজ স্থান-লাভ করিয়াছে, না, স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। ঐ জুড়িয়া-বসাটাই শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যভিচার। অবাস্তব ভাববিলাস সাহিত্যে প্রায়শই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা সাহিত্যশিল্পের দোষ নয়, সেই দোষ সাহিত্যস্রষ্টার নিম্নতর সৃজনীপ্রতিভার। সমাজ তথা জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে সচেতন না হইলে কোনো সাহিত্যশিল্পীই সার্থক স্রষ্টার গৌরবমর্যাদা দাবী করিতে পারেন না।

সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য

জীবনের দাবীই সমাজে প্রতিফলিত হয়, এবং সামাজিক মানুষ তাহাকে ফুটাইয়া তোলে সাহিত্যে। সাহিত্য প্রত্যক্ষভাবে সমাজমুখী হইবে, না, ব্যক্তিগত ভাবনাবাসনা লইয়া স্বপ্নবিহার করিবে, সে-বিষয়ে বিতর্ক চলিতে পারে। কিন্তু

জীবনকে ফাঁকি দিয়া যে কোনো মহৎ সাহিত্য রচিত হইতে পারে না, এ সম্বন্ধে সকলেই প্রায় একমত। 'জীবন মহাশিল্পী, সে যুগে যুগে দেশে-দেশান্তরে মানুষকে নানা বৈচিত্র্যে মূর্তিমান করে তুলছে।…… জীবনের এই সৃষ্টিকার্য যদি সাহিত্যে যথোচিত নৈপুণ্যের সঙ্গে আশ্রয় লাভ করতে পারে, তবেই তা অক্ষয় হয়ে থাকে।.. সাহিত্যে যেখানে জীবনের প্রভাব বিশেষ কালের সমস্ত কৃত্রিমতা অতিক্রম করে সজীব হয়ে ওঠে সেখানেই সাহিত্যের সত্যকার অমরাবতী।'

উপসংহার

আমার প্রিয় বাঙালী গ্রন্থকার : বঙ্কিমচন্দ্র

[**রচনার সংকেতসূত্র :** আমার প্রিয় গ্রন্থকার : বঙ্কিমচন্দ্র—বঙ্কিমের শুভ আবির্ভাব—বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'—বঙ্কিমের রচিত প্রথম ও দ্বিতীয় উপন্যাস—বঙ্কিমের অসামান্য শিল্পসিদ্ধি—সমালোচক বঙ্কিম—বঙ্কিমপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়—শুভ্র সংযত হাস্যরসের স্রষ্টা বঙ্কিম—হিন্দুসংস্কৃতির ব্যাখ্যাতা ও জাতীয়তামন্ত্রের উদ্গাতা বঙ্কিম—উপসংহার।]

বাংলা-কথাসাহিত্য আজ বিশ্বসাহিত্যে একটি বিশিষ্ট মর্যাদার আসন লাভ করিয়াছে। বঙ্গভারতীর বরপুত্রগণ তাঁহাদের অপূর্বসুন্দর রচনাসম্ভারে এই সাহিত্যকে প্রতিদিন সমৃদ্ধ করিতেছেন। বাঙালী বলিয়া, এবং বাংলাসাহিত্যের পাঠকহিসাবে পরিচয় দিতে, আমরা আজকাল বিশেষ একটা গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় গ্রন্থকার কে, তাহা হইলে এককথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। নানাবিষয়িনী রচনায় নানা লেখক আমার অন্তরে তাঁহাদের চিরন্তন আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথাপি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকেই আমি আমার প্রিয় গ্রন্থকার বলিয়া বিবেচনা করি। কেন করি, তাহার আলোচনা সহজ নয়। কেন-না, রুচি ও রসানুভূতি কার্যকারণ বিশ্লেষণ করিয়া চলে না—তাহা স্বতঃস্ফূর্ত। যুক্তি দিয়া ভালোমন্দের যথার্থ বিচারণা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুরূহ, ইহা একান্ত হৃদয়গত ও মানস-

আমার প্রিয় গ্রন্থকার : বঙ্কিমচন্দ্র

প্রবণতাগত ব্যাপার। অতএব যুক্তি বা বিশ্লেষণের অপেক্ষা না রাখিয়া আমার অন্তরের উপলব্ধির সাহায্যেই আমি বঙ্কিমকে বুঝিবার বা বুঝাইবার প্রয়াস পাইব।

বাংলা-সাহিত্যের অতীতের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি তখন দেখিতে পাই, গদ্যসাহিত্য বলিতে আমাদের বিশেষ কিছুই ছিল না—উপন্যাস তো দূরের কথা। ইংরেজ-মিশনারীরাই প্রকৃতপক্ষে দেশে গদ্যসাহিত্যের পত্তন করিলেন। নানা লেখকের প্রচেষ্টায় নিবন্ধসাহিত্য কিছু-কিছু রচিত হইল। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি লেখকেরা উপন্যাসরচনায় ব্রতী হইলেন—কিন্তু সে প্রচেষ্টা তেমন সার্থকতা অর্জন করিল না। এ সময় বঙ্গ-সাহিত্যের দিক্‌চক্রবালে নবোদিত সূর্যের কিরণপ্রভা বিকীর্ণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয় ঘটিল—বঙ্কিমের আবির্ভাব বাংলাসাহিত্যে যুগান্তরের সূচনা করিল। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছেন: 'বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল'।

বঙ্কিমের শুভ আবির্ভাব

প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যরূপে বঙ্কিম প্রথম সাহিত্যসংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন—কবি হইবার বাসনায়। কিন্তু কবিতা যে বঙ্কিমের মানস-ধর্মের অনুকূল ছিল না, তাহা তিনি অচিরাৎ উপলব্ধি করিলেন, এবং পরবর্তী সময়ে আপন প্রতিভার বাহন উপন্যাস-রচনায় হস্তক্ষেপ করিলেন। মধুসূদনের মতো প্রথম-বয়সে বঙ্কিমও ইংরেজীর মোহে বিভ্রান্ত হইয়া তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'Rajmohon's Wife' ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের মতোই তিনিও বুঝিলেন: 'কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমলকানন'—এবং মোহ-ভঙ্গের পর সেইযুগে অনাদৃতা অবমানিতা বাংলাভাষাকেই নিজের সার্থক লেখনীর বাহন করিয়া লইলেন। বঙ্কিমের সম্পাদিত মাসিকপত্র 'বঙ্গদর্শন' বাঙালী পাঠকসমাজকে চমকিত করিল। একটি বলিষ্ঠ লেখকগোষ্ঠী-সহযোগে যূথপতি বঙ্কিম এই পত্রে সাংবাদিকতার যে-ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন, আজও তাহা অননুকরণীয় হইয়া আছে। কিন্তু একমাত্র সাংবাদিকতারই নয়, জাতীয়তার তথা জাতীয় সাহিত্যের প্রথম অঙ্কুরও 'বঙ্গদর্শন'-এ আত্মপ্রকাশ করিল—আর, এই জাতীয়-সাহিত্যের কর্ণধার হইলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'

'বঙ্গদর্শন'-এর পাতায় তাঁহার উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' যে-নবীন ধারার সূচনা করিল, তাহা দেশবাসীকে অভাবনীয়রূপে বিস্মিত করিয়া তুলিল। ভাষার গম্ভীর

ছন্দোভঙ্গিমায়, বর্ণনার নিপুণ চাতুর্যে, ঐতিহাসিক ঘটনা ও রোম্যান্সের আশ্চর্য সমন্বয়ে 'দুর্গেশনন্দিনী' সেদিন এক অপূর্ব সৃষ্টি বলিয়া অভিনন্দিত হইল। ইহার পরে আসিল 'কপালকুণ্ডলা'। তরঙ্গমুখর নির্জন সমুদ্রতীরে আসন্ন সন্ধ্যার পটভূমিকায় বনদুহিতা কপালকুণ্ডলার যে-বাণীবিগ্রহ তিনি রচনা করিলেন, রোম্যান্সহিসাবে বিশ্বসাহিত্যেও তাহা অতুলনীয় বলিতে হইবে।

বঙ্কিমরচিত প্রথম ও দ্বিতীয় উপন্যাস

এই দুইটি উপন্যাসে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাব কিছু-কিছু থাকিলেও, বঙ্কিম ক্রমেই এই প্রভাব কাটাইয়া উঠিলেন—অসাধারণ প্রতিভাবলে সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি মৌলিক পথ তিনি আবিষ্কার করিয়া লইলেন। বঙ্কিমের স্মরণ-সুন্দর 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'মৃণালিনী', 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী', 'রজনী', 'ইন্দিরা' ও 'সীতারাম'—প্রভৃতি উপন্যাসাবলী বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদরূপে পরিগণিত হইল। আমাদের উপন্যাসসাহিত্যে সম্রাটের যে-মর্যাদা বঙ্কিম লাভ করিলেন, সেই ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আছেন। তাঁহার পরে বহু সাহিত্যরথী আসিয়াছেন, তাঁহারা বহু মনোরম ও মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমের ন্যায় কল্পনার বিশালতা ও রচনার শক্তিমত্তা যে তাঁহাদের অনেকেরই নাই, একথা বলিলে বোধকরি সত্যের অপলাপ ঘটিবে না।

বঙ্কিমের অসামান্য শিল্পসিদ্ধি

শুধু ঔপন্যাসিক-হিসাবে নয়, সমালোচক-হিসাবেও বঙ্কিম অদ্বিতীয়। তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'শ্রীকৃষ্ণচরিত্র', গীতা সম্পর্কিত আলোচনা এবং শ্লেষগর্ভ 'কমলাকান্তের দপ্তর' বাংলাসাহিত্যের এক-একটি স্বর্ণ-পীঠিকা। উপন্যাসের রূপকলা ও রসসৃষ্টির মধ্যে বঙ্কিমের যে লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয় মিলে, সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সেই প্রতিভারই পূর্ণ পরিচিতি বহন করিতেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সাহিত্যের 'সব্যসাচী' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।

সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিতে গেলে আমাদিগকে কয়েকটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। তিনি বাংলাগদ্যকে পূর্ণতা দিয়া ইহাতে সরসতা ও গতিশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন; গদ্যের একটি নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন; বিদ্যাসাগর ও প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনারীতির সমন্বয়-বিধান করিয়া আদর্শ বাংলাগদ্যভঙ্গি নিরূপিত করিয়াছেন; ঐতিহাসিক ও

বঙ্কিমপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়

পারিবারিক উপন্যাস রচনা করিয়া বঙ্কিম কথাসাহিত্যকে বহুদূর প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন। বস্তুত, প্রথম মৌলিক তথা সার্থক উপন্যাস রচনা করিয়া বঙ্কিম শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের ঔপন্যাসিকদের পথিকৃৎ হইলেন।

শুভ্র সংযত হাস্যরসের স্রষ্টা বঙ্কিম

বাংলাসাহিত্যে রুচি ও শুচিতা প্রথম প্রবর্তন করিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাচীন কথাসাহিত্যে 'কামিনীকুমার' বা 'নয়নতারা'-জাতীয় গ্রন্থে যে স্থূলভ ও বিকৃত আদিরসের প্রাবল্য ছিল, এবং টপ্পা ও খেউড়-গানের মধ্যে আমাদের যে-চারিত্রিক অবনতি প্রকটিত হইয়াছিল, বঙ্কিম তাহাকে মার্জিত ও পরিশোধিত করিলেন। তাঁহার পূর্বে এদেশের ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিরা বাংলাসাহিত্য পড়িতে ঘৃণা বোধ করিতেন। এইরূপ মনোবৃত্তি যে নিতান্ত অহৈতুক কিংবা অযৌক্তিক ছিল, একথাও অবশ্য বলা চলে না। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের রুচি-কলুষিত দেশে তিনি সাহিত্যিক 'সুন্দর'-এর বেদী রচনা করিলেন। কৌতুক বা হাস্যরস বলিতে যে-'গোপাল ভাঁড়'-জাতীয় ইতরতাই আমরা বুঝিতাম, তাহাকে তিনি অনাবিল রসমধুর করিয়া তুলিলেন।

হিন্দুসংস্কৃতির ব্যাখ্যাতা ও জাতীয়তামন্ত্রের উদ্গাতা বঙ্কিম

নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বলিষ্ঠ স্বাধীন বুদ্ধির সহায়তায় যথার্থ সমালোচনাসাহিত্যের সূত্রপাতও করিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। শুধু তাহাই নয়, বৈদেশিক শিক্ষার আলোকে তিনিই প্রথম হিন্দুধর্মের মর্মার্থ উদ্ঘাটিত করিবার প্রয়াস পাইলেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা আমাদের ধর্ম ও শাস্ত্রের তাৎপর্য না বুঝিয়া উহাদের যে অপব্যাখ্যা করিতেছিলেন, বিদ্যাভূয়িষ্ঠ বঙ্কিম উচ্চকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ ঘোষণা করিলেন। হিন্দুশাস্ত্রের গূঢ়ার্থ, হিন্দুর শ্রেষ্ঠ দেবতা শ্রীকৃষ্ণের তাৎপর্য প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিলেন—আমাদের ইতিবৃত্ত ও ঐতিহ্য নূতনভাবে ব্যাখ্যাত হইল। সর্বশেষে, জাতীয়তার মন্ত্রে বাঙালীকে বঙ্কিমই প্রথম উদ্বোধিত করিয়া তুলিলেন। তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া আমরা জানিলাম, আমাদের একটি গৌরবমণ্ডিত অতীত রহিয়াছে—বিগত দিনের বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসটি উপেক্ষণীয় নহে। দেশাত্মবোধের উজ্জ্বল শিখা তিনিই আমাদের চিত্তে জ্বালাইয়া তুলিলেন।

এইসব দিক হইতে বিচার করিলে বঙ্কিম অতুলনীয়। বস্তুত, বাংলা গদ্য-সাহিত্যে বঙ্কিম তুষারমৌলি উত্তুঙ্গ হিমাদ্রিশৃঙ্গের ন্যায় প্রদীপ্ত মহিমায় স্তব্ধ-গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হিমালয়নিঃসৃত সহস্র নির্ঝরিণীধারার মতোই

তাঁহার শতমুখিনী সাহিত্যস্রোতস্বিনী বাঙালীর হৃদয় পরিপ্লাবিত করিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের যে-বিভিন্ন দিকের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিচার। কিন্তু এই সর্বাঙ্গীণতার কথা বাদ দিয়াও বলা যায়, শুধু উপন্যাসসাহিত্যেই তিনি যে-বিস্ময়কর সৃজনীক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাই তাঁহাকে বাংলাসাহিত্যে অমর প্রতিষ্ঠা দান করিবে। ইতিহাসের বিস্মৃতিময় তামসলোকে কবিকল্পনার যে -বর্ণাঢ্য আলোকসম্পাত তিনি করিয়াছেন, নরনারীর হৃদয়রহস্য-উদ্‌ঘাটনে যে-অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, চরিত্রসৃষ্টিতে যে-বহুমুখিতা দেখাইয়াছেন, এবং মানবজীবনে সত্য-শিব-সুন্দরের যে-সমুচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মতো লোকোত্তর প্রতিভাবানের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাঁহার রচনা সর্বাংশে ত্রুটিমুক্ত নয়—আধুনিক যুগের পাঠকের কাছে তাঁহার আদর্শবাদ সর্বতোভাবে যে গৃহীত হইবে, ইহাও আমরা মনে করি না। তথাপি বলিব, বঙ্কিমের সমুদ্রতুল্য প্রতিভার বিপুলতার কাছে এই ত্রুটিবিচ্যুতি ও রুচিবিভিন্নতা একান্ত তুচ্ছ বলিয়াই প্রতিভাত হইবে।

উপসংহার

বাঙালীর হৃদয়রাজ্যের সম্রাট ও 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের উদ্গাতা, শিল্পী ও ঋষি বঙ্কিমকে এইসব কারণেই আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। আশাকরি, আমার রুচির এই পক্ষপাতিত্ব এবং আমার এই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত একেবারে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইবে না।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

[**রচনার সংকেতসূত্র :** সূচনা—বাংলা উপন্যাস ও বঙ্কিমচন্দ্র—বাংলা উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথ—উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন ধারার প্রবর্তক—রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তী হইয়াও শরৎচন্দ্র মৌলিক—বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের তুলনায় শরৎচন্দ্র অপেক্ষাকৃত বাস্তব—ব্যাথার কাব্যকার শরৎচন্দ্র—প্রচলিত সমাজনীতি সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের জিজ্ঞাসা—নারীচরিত্রচিত্রণে শরৎচন্দ্রের দক্ষতা—শরৎসাহিত্য ও তথাকথিত বাস্তববাদ—শরৎচন্দ্র একহিসাবে আদর্শবাদী—শরৎচন্দ্রের মৌলিকতা—উপসংহার।]

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রতিভা নানাদিক দিয়া অসাধারণ। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা শরৎসাহিত্যের বিশিষ্টতার দিকটির সঙ্গে কিছুটা পরিচয়সাধন করিতে

চেষ্টা করিব। শরৎচন্দ্রের পূর্বে বাংলাসাহিত্যে দু'টি অলোকসামান্য প্রতিভার অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইঁহাদের প্রতিভাদীপ্ত লেখনীস্পর্শে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে—আমরা বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কথাই বলিতেছি। শরৎপ্রতিভাকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর কিছুটা পরিচয় লওয়ার প্রয়োজন আছে।

সূচনা

প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা উপন্যাসের প্রথম স্রষ্টা। সত্যকার উপন্যাস বলিতে যাহা আমরা বুঝি, বঙ্কিমের পূর্বে তাহা ছিল না বলিলেই হয়। বঙ্কিম যে শুধু উপন্যাসসাহিত্যের প্রবর্তনই করিয়াছিলেন তাহা নয়, ইহাকে তিনি পরিণতি এবং সম্পূর্ণতাও দান করিয়াছেন অনেকখানি। ঘটনা-সংঘাতের মধ্য দিয়া বিচিত্র চরিত্রসৃষ্টি ও মানবজীবনের রহস্য-আবিষ্কারে বঙ্কিম আপনার প্রতিভাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। প্রধানত অভিজাতসম্প্রদায় ও সমাজের উচ্চস্তরের নরনারীই বঙ্কিমসাহিত্যের উপজীব্য। বঙ্কিমের প্রায় সবগুলি উপন্যাস রোম্যান্স-লক্ষণাক্রান্ত। অতিপ্রাকৃত পরিবেশ, অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ, স্বপ্নমধুর কল্পনা ও বলিষ্ঠ আদর্শবাদ বঙ্কিমের উপন্যাসকে একটি লক্ষণীয় বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। মানব-হৃদয়ের ঘাতপ্রতিঘাতের অতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বঙ্কিমের উপন্যাসে তেমন দেখা যায় না। তুলিকার দুই-একটা বড়ো আঁচড়ে মানবমনের শক্তিশালী প্রবৃত্তিনিচয়ের ছায়া-মূর্তিকেই বঙ্কিম কায়াদান করিয়াছেন। মনস্তত্ত্বের সুদীর্ঘ আলোচনা তাঁহার উপন্যাসে বিরল—সমাজের প্রচলিত নীতির আদর্শকেই তিনি মানিয়া লইয়াছেন।

বাংলা উপন্যাস ও বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমের পরেই সাহিত্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য কবিগুরুর ভাস্বর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। বঙ্কিম আপনার সাহিত্যে চিত্রিত করিয়াছিলেন অভিজাতসম্প্রদায়ের নরনারীকে। রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে আরও একধাপ নীচে নামিয়া আসিয়াছেন—বাংলার মধ্যবিত্তসমাজের নরনারীর সুখদুঃখ, আনন্দবেদনা, হাসিঅশ্রু তাঁহার রচনায় অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আপাততুচ্ছতা ও দীনতার অন্তরালে হৃদয়ের যে-বিচিত্র খেলা চলিতেছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কোনো একটা প্রচলিত আদর্শের মাপকাঠি দিয়া তিনি মানুষের হৃদয়-বৃত্তিকে বিচার করিতে বসেন নাই। বঙ্কিম যে-বাস্তবকে নানাকারণে স্বীকৃতি জানাইতে পারেন নাই, রবীন্দ্রনাথ নিজের রচনায় তাহাকে রূপ দিতে চাহিয়াছেন।

বাংলা উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথ

বঙ্কিমের মন ছিল কিছুটা সংস্কারমুক্ত, কিছুটা সংস্কারজড়িত। কিন্তু বঙ্কিমের তুলনায় রবীন্দ্রনাথকে প্রায়-সংস্কারমুক্ত বলিতে হইবে। জীবনের বাস্তবতাকে স্বীকার করিয়া লইয়া মানুষকে তিনি তাহার সর্বপ্রকার দুর্বলতাসমেত সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বাংলার কথাসাহিত্যে একটা নূতন যুগের প্রবর্তন করিলেন। বঙ্কিম অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের রচনায় বাস্তবতায় সুরটি বেশী বাজিয়াছে।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন ধারার প্রবর্তক

(কিন্তু রবীন্দ্রনাথও যে বিশুদ্ধ বাস্তবধর্মী, এমন কথা বলা চলে না। তাঁহার সমুচ্চ ভাবকল্পনা অনেক সময় বাস্তবকে অতিক্রম করিয়াছে,—মানুষের প্রাত্যহিক জীবনকথা তাঁহার লেখায় কাব্যের স্বপ্নলোকে উন্নীত হইয়াছে।) রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ইহা নূতন একপ্রকারের আদর্শবাদ—তিনিও যেন এক অভিনব অদৃষ্টপূর্ব রোম্যান্স রচনা করিয়াছেন। যাহা হউক, কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এক নূতন ধারার সূচনা করিলেন—নীতির ক্ষেত্রে পক্ষপাতশূন্যতায়, বাস্তবের সহজ স্বীকৃতিতে, সাহিত্যের পাতায় মানুষের প্রবৃত্তি ও হৃদয়দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে।

আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে-ধারার প্রবর্তন করিলেন, শরৎচন্দ্র তাহাকেই অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু নিজের সৃষ্ট সাহিত্যের

রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তী হইয়াও শরৎচন্দ্র মৌলিক

ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র যথার্থই মৌলিক। সাহিত্যে সমাজ-চিত্রণ-বিষয়ে তিনি আরও নিম্নে নামিয়া আসিলেন—প্রধানত নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীকে ঘিরিয়াই তাঁহার উপন্যাসের আখ্যানবস্তু বিবর্তিত হইয়াছে। শরৎসাহিত্য বাঙালীর বর্তমান সমাজ-সম্পর্কে একটি বিরাট জিজ্ঞাসা। মমতাহীন, ক্ষমাহীন সমাজের যে-নির্মম নিষ্পেষণে মানুষের আত্মা অনুক্ষণ পীড়িত হইতেছে, তাহারই মনোজ্ঞ চিত্র তিনি বাঙালী পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন।

শরৎচন্দ্র সমাজনীতিকে যে শুধু মানিয়া লইতে পারেন নাই তাহা নয়, এই প্রচলিত নীতি ও আদর্শের বিরুদ্ধে একটা চাপা বিদ্রোহের সুরও তাঁহার উপন্যাসে

বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের তুলনায় শরৎচন্দ্র অপেক্ষাকৃত বাস্তব

ধ্বনিত হইয়াছে। আদর্শবাদী বঙ্কিম যে-বাস্তবকে স্বীকার করিতে পারেন নাই, রবীন্দ্রনাথ যে-বাস্তবকে স্বীকার করিয়া লইয়াও তাহাকে অত্যুচ্চ ভাবকল্পনার রঙে রঞ্জিত করিয়া দুরারোহ স্বপ্নলোকে উন্নীত করিয়াছেন—শরৎচন্দ্র সেই বাস্তবকেই একান্ত বাস্তবরূপে আমাদের নয়নসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের রচনায় ব্যক্তির সুখদুঃখ অনেক সময় নির্বিশেষ ও নৈর্ব্যক্তিক হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের

রচনায় ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিসত্তাটি হারাইয়া ফেলে নাই। এই হিসাবে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা আরও বেশী বাস্তব।

শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট সাহিত্য নিপীড়িত মানবের জীবনবেদ, শরৎচন্দ্র বাঙালী-জীবনের ব্যথার কাব্যকার। সমাজশাসনে পীড়িত সাধারণ নরনারীর জীবনকাহিনী অবলম্বন করিয়া তিনি উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করিয়াছেন। শুধু যে তিনি আমাদের সমাজের বাহিরের মুখোসটিই একেবারে খুলিয়া ধরিয়াছেন তাহা নয়, সমাজের অন্ধতলদেশটিকে পর্যন্ত সর্বসাধারণের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মোচিত করিয়া দিয়াছেন।

ব্যথার কাব্যকার শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে যে-প্রশ্নটি বড়ো হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহা নীতির প্রশ্ন। সমাজের যে দুর্লঙ্ঘ্য অনুশাসনে নরনারীর জীবন এমনভাবে নিষ্পিষ্ট হইতেছে, তাহাতে আছে কোন্ মঙ্গলের আদর্শ? যে-সমাজব্যবস্থা মানুষের প্রাণশক্তিকে তিলে তিলে নিষ্পেষিত করিতেছে, সেই নিষ্ঠুর সমাজ-শক্তির স্বরূপ কী? নারীর সতীত্ব কোথায়—দেহে, না মনে? সতীত্ব বড়ো, না, নারীত্ব বড়ো? এই রকমের বহু জিজ্ঞাসা শরৎসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তিনি সমস্যার উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কোনো সমাধান দিতে চেষ্টা করেন নাই। সাহিত্যের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রকে আমরা সমাজসংস্কারক-হিসাবে পাই নাই, পাইয়াছি রূপকার-হিসাবে। তাই এ সকল প্রশ্নের মীমাংসার ভার তিনি পাঠকের উপর ছাড়িয়া দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।

প্রচলিত সমাজনীতি সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের জিজ্ঞাসা

নারীচরিত্রঅঙ্কনেই শরৎপ্রতিভা বেশী খেলিয়াছে। আমাদের সমাজে নারীর প্রতি আঘাত আসে নানাভাবে, তথাপি তাহারা মুখ বুজিয়া সব সহ্য করে। নিঃশব্দে সহ্য করে বটে, কিন্তু মর্মঘাতী ব্যথায় হৃদয় তাহাদের লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। বাঙালী নারীর এই যে বাণীহারা বেদনা, শরৎচন্দ্র তাহাকে ভাষা দিয়াছেন। নারীজীবনের মর্মান্তিক ব্যর্থতার সুতীব্র বাস্তব অনুভূতি তাঁহার সাহিত্যকে একটা অপূর্বতা দান করিয়াছে। নারীর মধ্যে তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন দুইটি সত্তা—একটি তাহার ব্যক্তিসত্তা, অপরটি তাহার সমাজসত্তা। আমাদের সমাজটি নারীজাতির মর্মলোকে কঠিন সংস্কারের রূপ পরিগ্রহ করিয়া গোপনে বাসা বাঁধিয়া আছে। এই যে নারীর অবচেতন প্রবৃত্তি ও সজ্ঞান সংস্কার, ইহাদের দ্বন্দ্বসংঘাত শরৎচন্দ্র অতি নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিগুলির মূলভিত্তি এইখানেই।

নারীচরিত্র-চিত্রণে শরৎচন্দ্রের দক্ষতা

শরৎচন্দ্র চতুষ্পার্শ্বের বাস্তবকে মর্যাদা দিয়াছেন—তাহাকে সাহিত্যে দৃশ্যমান

করিয়া তুলিয়াছেন। এই হিসাবে তাঁহাকে আমরা 'রিয়ালিষ্ট' বলিতে পারি। কিন্তু নগ্নতা, কুশ্রীতা, বে-আব্রুতার নামে বর্তমানে যে-বাস্তববাদ বা 'রিয়ালিজম্' সাহিত্যে কোথাও কোথাও চলিতেছে, সে-রকমের বস্তুতান্ত্রিকতা শরৎসাহিত্যে দেখা যায় না। তাঁহার শিল্পসৃষ্টি নগ্ন বাস্তবের অনুকৃতিমাত্র নয়—জীবনের ফটোগ্রাফ নয়। 'আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক্' কথাটি তিনি নিজেও স্বীকার করেন নাই। বাস্তব সত্যের মধ্য দিয়া তিনি সুন্দরকে ধরিতে চাহিয়াছেন—শুধু বাস্তবের জন্যই বাস্তবকে গ্রহণ করেন নাই। এ কথাটি বুঝিয়া লইতে না পারিলে আমরা শরৎসাহিত্যের প্রতি অবিচারই করিব।

শরৎসাহিত্য ও তথাকথিত বাস্তববাদ

আবার, একহিসাবে শরৎচন্দ্রকে আমরা 'আদর্শবাদী' বা 'আইডিয়ালিষ্ট'-ও বলিতে পারি। তথাকথিত বাস্তববাদী সাহিত্যে রূপায়িত হয় নগ্নতা ও অসুন্দরের দিকটি, বস্তুকে যথাযথভাবে চিত্রিত করিয়া সত্যকে আবিষ্কার করাই বস্তুতান্ত্রিক শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য। শরৎচন্দ্র কিন্তু বস্তুর যাথার্থ্যকে অনেক সময় লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্পর্শ-কাতর হৃদয় অনেক চরিত্রকে অযথা বড় করিয়া দেখিয়াছে। ভাবাবেগের তীব্রতা শরৎচন্দ্রের বস্তুতান্ত্রিকতাকে ভিন্নতর একপ্রকারের আদর্শবাদে রূপান্তরিত করিয়াছে।

শরৎচন্দ্র একহিসাবে আদর্শবাদী

কাহিনীবর্ণনায়, চরিত্রসৃষ্টিতে, প্রকাশভঙ্গিতে, ভাষায়—সর্বক্ষেত্রেই শরৎচন্দ্র মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রচনার ভাষা অতিশয় সহজ, ও প্রাঞ্জল, কিন্তু অপরের অননুকরণীয়। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাসমৃদ্ধ কাব্যিক ভঙ্গি তাঁহার বাণীরচনায় পরিদৃষ্ট হইবে না। কিন্তু ইহাতে ঋজুতা আছে, বলিষ্ঠতা আছে, আছে রসসংবেদনা। শরৎচন্দ্রের বাণীভঙ্গিটিকে আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালী সাহিত্যিক অনুকরণ করিতে পারেন নাই, ইহা তাঁহার একান্ত নিজস্ব। শিল্পী শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিসত্তার স্পর্শে উহা প্রাণবান —ইহাকেই বলে সাহিত্যের 'স্টাইল'।

শরৎচন্দ্রের মৌলিকতা

বাংলা-কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র অপরাজেয়। অদ্যাবধি অপর কোনো সাহিত্যকার বাঙালীর মর্মদ্বারটি এমন করিয়া উন্মোচিত করিয়া ধরিতে পারেন নাই। শরৎসাহিত্যে সাধারণ মানুষের সাধারণত্ব ও ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিসত্তা উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট। সেখানে ব্যক্তির দুঃখ বিশেষ একটি ব্যক্তিরই দুঃখ, ইহাতে নির্বিশেষ রসলোকে বিশেষের আত্মবিলোপ ঘটে নাই। এখানেই ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের আর্টের ধর্মের লক্ষণীয় পার্থক্য।

উপসংহার

উপন্যাসশিল্পে বঙ্কিমচন্দ্র

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** সূচনা—বাংলা উপন্যাস ও বঙ্কিমচন্দ্র—বাংলা উপন্যাসের নীহারিকা অবস্থা—খাঁটি বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা বঙ্কিম—বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির সাধারণ ধর্ম—বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস ও বঙ্কিমচন্দ্র—উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের বিশেষত্ব—বঙ্কিমের উপন্যাসে সূক্ষ্ম হৃদয়বিশ্লেষণ নাই—সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমের আদর্শবাদ—বঙ্কিমসাহিত্যে 'শিব'-আদর্শ—বঙ্কিমপ্রতিভার বিশালতা—বঙ্কিম-প্রতিভা সম্পর্কে সর্বশেষ কথা]

সূচনা

বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে কেবল একজন শ্রেষ্ঠ উপন্যাসশিল্পী তাহা নয়, প্রকৃতপক্ষে বাংলা-উপন্যাসের প্রথম সার্থক স্রষ্টাও বঙ্কিম। তাঁহার অপূর্ব-শিল্পরচনপ্রতিভা, বলিষ্ঠ সৌন্দর্যদৃষ্টি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি ও রসসৃষ্টির বিস্ময়কর ক্ষমতা বাংলা-উপন্যাসকে এক অভিনব প্রেক্ষণীয় শিল্পরূপ দান করিয়াছে। গল্প বা কাহিনী শোনার বাসনা মানুষের একটা সহজাত বৃত্তি। তাই প্রত্যেক জাতির রূপকথায়, পৌরাণিক আখ্যায়িকায় আমরা গল্পের প্রাচুর্য দেখি। বাংলাদেশেও এই জাতীয় কাহিনীর অভাব নাই। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাস, চাহার দরবেশ, হাতেমতাই, গোলেবকাওলি, কামিনীকুমার প্রভৃতি কাহিনী পাঠ করিয়া বাঙালী তাহার রসপিপাসা নিবৃত্ত করিয়াছে। সীতার বনবাস, শকুন্তলা, কাদম্বরী, পৌলবর্জিনী প্রভৃতি গ্রন্থেও গল্পরসের অভাব ছিল না। কিন্তু আধুনিক অর্থে যাহাকে আমরা উপন্যাস বলি, তাহার প্রথম পথিকৃৎ হইলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

বাংলা উপন্যাস ও বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমের পূর্বে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল—একটি হইতেছে প্রমথনাথ শর্মার 'নববাবুবিলাস', অপরটি প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'। আমরা যাহাকে 'উপন্যাস' বলি, ইংরেজীতে তাহাকে বলা হয় 'নভেল'। ইংরেজী সাহিত্যে নভেল বলিতে বুঝায় : "A study of manners founded on an observation of contemporary or recent life, in which the characters, the incidents and the intrigues are imaginary, and therefore 'new' to the reader, but are founded on lines running parallel with those of actual history"। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কট নভেলের সংজ্ঞানির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন : 'A novel is a fictitious

narrative, differing from the romance, because the events are accommodated to the ordinary train of human events, and the modern state of society'। এ হিসাবে অবশ্য 'নববাবুবিলাস' [১৮২৩] এবং 'আলালের ঘরের দুলাল'-কে [১৮৫৮] আমরা উপন্যাস-নামে অভিহিত করিতে পারি। কিন্তু উঁচুদরের উপন্যাসসাহিত্যে মানবমনের যে সীমাহীন রহস্য, মানবহৃদয়ের বিভিন্ন প্রবৃত্তির যে প্রচণ্ড ঘাতপ্রতিঘাত, জীবন-সম্পর্কিত যে-বিচিত্র জিজ্ঞাসা রূপায়িত হইয়া থাকে, এই দুইটি গ্রন্থে তাহার কিছুই আমরা দেখিতে পাই না।

বাংলা উপন্যাসের নীহারিকা-অবস্থা

উপন্যাস শুধু কাহিনীমাত্র নয়। ইহাতে থাকিবে অংশের সঙ্গে সমগ্রের, ঘটনার সঙ্গে চরিত্রগুলির একটি নিগূঢ় সংযোগ—শিল্পীর কেন্দ্রানুগ দৃষ্টি ইহাকে দেয় একটা সর্বাঙ্গীণ সুসমঞ্জস রূপ, ইহাতে আদ্যন্ত একটি ঐক্যের ধারা প্রবাহিত হয়। কিন্তু সূক্ষ্মবিচারে দেখা যাইবে, উপরি-উক্ত গ্রন্থ-দুইটিতে মানবহৃদয়ের নিগূঢ় কোনো রহস্যময়তা এবং কাহিনীর একমুখিতা নাই। শুধুমাত্র বাস্তবচিত্রণ, ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের সমবায়ে কখনো উৎকৃষ্ট উপন্যাস সৃষ্ট হইতে পারে না। সেজন্য আমরা বলিব, 'নববাবুবিলাস' ও 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা-উপন্যাসের নীহারিকা-অবস্থা-মাত্র।

খাঁটি বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা বঙ্কিম

বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম একটি বিশেষ রূপসৃষ্টি-হিসাবে উপন্যাসকে আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। বস্তুত বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'-ই প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস। উপন্যাসশিল্পের মধ্য দিয়াই বঙ্কিম নরনারীর হৃদয়রহস্য আমাদের সকলের নয়নসমক্ষে উদ্ঘাটিত করিলেন—কাহিনী-নির্মাণে, চরিত্রচিত্রণে, ভাষার অপূর্ব ভঙ্গিমার চমৎকারিত্বে তাঁহার উপন্যাস বাঙালীর হৃদয়মন একমুহূর্তেই জয় করিল। বঙ্কিমচন্দ্র যে বাংলা উপন্যাসকে নবজন্মদান করিলেন তাহা নয়, তাঁহার হাতেই উপন্যাসশিল্প লাভ করিয়াছে অনেকখানি পূর্ণতা। উপন্যাসের যে-ধারাটি তিনি প্রবর্তন করিলেন, তাহা রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের মধ্য দিয়া আধুনিক যুগ পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। যুগের পরিবর্তনহেতু হয় তো সে-ধারার মধ্যে নূতন উপাদান সংমিশ্রিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে রূপগত তেমন বিশেষ কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। বাংলা-উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের প্রভাব যেমন গভীর, তেমনি দূরপ্রসারী।

বঙ্কিম অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেগুলিকে বিভিন্ন

শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু তাঁহার সকল উপন্যাসের মধ্যেই একটি সাধারণ ধর্ম পরিলক্ষিত হয়—তাহা হইল রোম্যান্সপ্রবণতা। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিতে রোম্যান্টিক মনোভঙ্গির আত্মপ্রকাশ সকলেরই চোখে পড়িবে। তাঁহার রচিত আখ্যায়িকাগুলির অধিকাংশই রোম্যান্সধর্মী। 'রোম্যান্স' কথাটি একটি বিদেশী শব্দ। রোম্যান্সমূলক সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ হইতেছে কল্পনার অতিসমৃদ্ধি, অসাধারণ অপ্রাকৃত ঘটনার সন্নিবেশ, অতীত ও সুদূরের প্রতি স্বপ্নমধুর আকর্ষণ, মানব-জীবনের গীতিসুষমামণ্ডিত অনুভূতির ঐশ্বর্য, বাস্তবকে উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বপ্নের অমরাবতীতে পদচারণার বাসনা। প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতাক্ষুদ্রতা রোম্যান্সের ইন্দ্রজালস্পর্শে মায়াময় সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠে। বঙ্কিমের ঐতিহাসিক, সামাজিক বা পারিবারিক এবং দেশপ্রেমমূলক উপন্যাসগুলিতে ভাবাবেগ ও কল্পনার এই আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকা, চরিত্রসৃষ্টি, বাচনভঙ্গী সমস্তই অনন্যসাধারণ। কিন্তু এ কথাটি আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, কল্পনার ঐশ্বর্য তাঁহার উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করিলেও, বাস্তবের সঙ্গে তিনি একটি নিগূঢ় যোগাযোগরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন—সম্ভব ও অসম্ভব তাঁহার রচনায় একাকার হইয়া যায় নাই। উপন্যাসশিল্পী-হিসাবে এখানেই বঙ্কিমের প্রশংসনীয় কৃতিত্ব এবং নৈপুণ্য।

বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির সাধারণ ধর্ম

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের গোড়াপত্তন করিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র। ইতিহাসের রোম্যান্সকে তিনি পারিবারিক জীবনের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত এক্ষেত্রে বঙ্কিমের মন্ত্রশিষ্য। কিন্তু বঙ্কিম ইতিহাসের পটভূমিকায় মানবজীবনকে পরিস্থাপিত করিয়া যতখানি রসসৃষ্টি করিয়াছেন, রমেশচন্দ্র ততখানি পারেন নাই। এমন কি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও প্রথম যুগে ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছেন, কিন্তু এ জাতীয় উপন্যাসে তিনি বঙ্কিমের মতো সাফল্যঅর্জনে সমর্থ হন নাই। বঙ্কিমের পরবর্তীকালে বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারাটি ক্রমেই ক্ষীণতর হইয়া একরূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দ্বাদশ শতক হইতে আঠারো শতক পর্যন্ত বাংলা ও ভারতের ঐতিহাসিক কাহিনী বঙ্কিমের উপন্যাসে স্থানলাভ করিয়াছে।

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস ও বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমের উপন্যাসের সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে কাহিনীগঠনের অভিনবত্ব ও ভাবপ্রকাশের উপযোগী ভাষার মৌলিকত্ব। উপন্যাসের কায়া-নির্মাণে হয়তো তিনি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন, কিন্তু

জীবনের জটিলতাময় উত্থানপতনের যে-শোভাযাত্রা তাঁহার উপন্যাসে বাণীরূপ লাভ করিয়াছে, তাহা একান্তভাবে আমাদের সমাজ ও পরিবারের পটভূমিকায় বিধৃত। বাঙালীর জীবনসমস্যাই বঙ্কিমের উপন্যাসে অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে,—পাশ্চাত্ত্য সমাজনীতির কোনো সমস্যাকে মুখরোচক করিয়া বাঙালী পাঠকের নিকট তিনি তুলিয়া ধরেন নাই। বঙ্কিমের ভাষাটি তাঁহার মননশক্তি ও ভাবচিন্তার আধুনিকতা সপ্রমাণ করিতেছে। 'সাগরী' ভাষার মন্থর গতি ও 'আলালী' ভাষার চটুল চপলতাকে একটি মধ্যপথে পরিচালিত করিয়া তিনি ভাষাকে পরিবর্তনশীল, নমনীয়, গতিময় ও ধ্বনিব্যঞ্জনাপূর্ণ করিয়া তুলিলেন। ভাষার এই বিস্ময়কর নমনীয়তা বঙ্কিমের সাহিত্যকে অসামান্য গৌরব দান করিয়াছে।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের বিশেষত্ব

উপন্যাসে অঙ্কিত হয় মানবজীবনের কুটিল দ্বন্দ্ব ও রহস্যময়তা, উপন্যাস নরনারীর নিভৃত হৃদয়ের নানা বিরোধী প্রবৃত্তির সংঘাতে মুখর। বঙ্কিমের উপন্যাসে তীব্র ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাত সর্বক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু হৃদয়বৃত্তির যে সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ-বৈচিত্র্য আধুনিক যুগের উপন্যাসে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সেরূপ কোনো বিশ্লেষণ নাই। ক্ষুদ্র খুঁটিনাটিকে লইয়া তিনি বাক্যজাল বিস্তার করেন নাই, বৃহৎ তুলিকার স্পর্শে এক-একটি চিত্তবৃত্তিকে পাঠকের অন্তরে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উপন্যাসশিল্পে যে-অর্থে মনস্তত্ত্ববিদ, বঙ্কিম সে-অর্থে ততখানি মনস্তাত্ত্বিক নহেন। তাঁহার সৃজনীপ্রতিভার মধ্যে ছিল একটা বিশালতা—হৃদয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণের দিকে তিনি আপন প্রতিভাকে নিয়োজিত করেন নাই। তাঁহার রচিত সাহিত্যে এই আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণপদ্ধতির অভাবের জন্য ও রোম্যান্সধর্মিতার প্রাবল্যের জন্য অনেক সমালোচক তাঁহাকে বাস্তববিমুখ, আদর্শবাদী এবং মনস্তত্ত্ব-বিষয়ে অনিপুণ আখ্যা দিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক প্রতিভারই একটি বিশেষ ধর্ম আছে, এবং উহার প্রকাশ স্থান-কাল-পরিবেশের উপর অনেকখানি নির্ভর করে—এ সত্যটি বিস্মৃত হইলে সাহিত্যবিচারে নানা ভুলভ্রান্তি দেখা দিতে বাধ্য। উপন্যাসকার বঙ্কিমের বিচারেও আমরা এই ভুলত্রুটিরই পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

বঙ্কিমের উপন্যাসে সূক্ষ্ম হৃদয়বিশ্লেষণ নাই

পাপের প্রতি, যৌনজীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের প্রতি বঙ্কিমের একটা স্বাভাবিক বিমুখতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মূলপ্রেরণা

আসিয়াছে রমণীপ্রেম ও স্বদেশপ্রীতি হইতে। কিন্তু নরনারীর পরস্পর-আকর্ষণের যে-চিত্র তিনি উন্মোচিত করিয়াছেন, তাহাতে প্রেমানুভূতির বিবর্তনের প্রত্যেকটি স্তরের রূপরেখা মিলিবে না। উহার মধ্যে তিনি যথেষ্ট ফাঁক রাখিয়া গিয়াছেন, পাঠকের কল্পনার উপর তিনি অনেকখানি নির্ভর করিয়াছেন। এ-ক্ষেত্রেও বঙ্কিম তথাকথিত আদর্শবাদী, বস্তুতান্ত্রিক নহেন। নরনারীর প্রেমচিত্রণবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচিত সমাজগণ্ডীর মধ্যেই বিচরণ করিয়াছেন, হিন্দুসমাজের সংস্কারকে তিনি লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথে, বিশেষ করিয়া শরৎচন্দ্রে, সংস্কার-মুক্তির যে-ভাবটি দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রে তাহা মিলিবে না। সমাজবহির্ভূত প্রেমকে, মানুষের চিরন্তন রূপপিপাসা, সৌন্দর্যানুভূতি ও যৌনজীবনের প্রবল শক্তিকে তিনি অস্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু পরিণামে বঙ্কিম তাহাকে স্বভাবের পথে পরি-চালিত হইতে না দিয়া মঙ্গলের অভিমুখী করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও বঙ্কিম ছিলেন আদর্শবাদী। পারিবারিক ও দাম্পত্যজীবনে তিনি কোনোরূপ ব্যভিচার বরদাস্ত করিতে পারেন নাই, ভারতীয় ধর্মাদর্শকেই তিনি যতদূর সম্ভব অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমের আদর্শবাদ

সত্যের সঙ্গে তিনি সুন্দর ও মঙ্গলকে যুক্ত করিয়া দিয়া স্বভাবকে সংযম-শাসনে বাঁধিয়াছেন। সেজন্যই সমাজবিরোধী প্রেমে আবিষ্ট বঙ্কিমের নায়ক-নায়িকাকে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই আমরা দেখি হয়তো মোহমুক্ত, নয়তো অনুতাপ-অনুশোচনার সুতীব্র আঘাতে জর্জরিত। বঙ্কিমসাহিত্যে আইডিয়ালের কাছে রিয়াল পরাভূত হইয়াছে। ইহার ফলে দু-একটি ক্ষেত্রে বঙ্কিমের আর্টের ধর্ম যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বঙ্কিম স্বরচিত উপন্যাসের মধ্যে কোনো কোনো স্থানে শিল্পীর ভূমিকা পরিত্যাগ করিয়া লোকশিক্ষক ও প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই তাঁহার উপন্যাসে সমস্যার অবতারণার সঙ্গে সঙ্গে একটা সমাধানপ্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথে, শরৎচন্দ্রে সমস্যা আছে, কিন্তু সমাধানের তেমন কোনো প্রয়াস নাই—এ কাজটি হইতেছে সামাজিকের। এই হিসাবে বঙ্কিমের উপন্যাসশিল্প যে সর্বতোভাবে ত্রুটিমুক্ত নহে, এ-কথা বলাই বাহুল্য।

বঙ্কিমসাহিত্যে 'শিব'-আদর্শ

বঙ্কিমপ্রতিভার বিশালতাকে আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। বিশেষ করিয়া উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি যে অপূর্ব শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা

অসামান্য। বাহিরের জগৎকে হৃদয়রসে জারিত করিয়া লইয়া উহাকে তিনি যে-ভাবে সৌন্দর্যবিলসিত ও রসসঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা তাঁহার অসাধারণ শিল্পরচন-প্রতিভারই নিশ্চিত পরিচায়ক।

বঙ্কিমপ্রতিভার বিশালতা

বলিষ্ঠ জীবনাদর্শের রূপায়ণে বঙ্কিমের রচনা সমৃদ্ধ। বঙ্কিম অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ভাবুক হয়তো বাংলা-উপন্যাস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছেন; কিন্তু কল্পনার বিশালতায়, কথাশিল্পের সর্বাঙ্গসুন্দর ফলশ্রুতি-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এখনও অপরাজিত। বঙ্কিমের বিশিষ্ট রচনারীতির মধ্যেই তাঁহার ব্যক্তিত্বটি সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত; আবার, এই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িত তাঁহার মনুষ্যত্বসাধনার মাহাত্ম্য। সুদীপ্তব্যক্তিত্বের এই বিস্ময়কর স্ফুরণ তাঁহার স্টাইল বা বাণীরচন-ভঙ্গিটিকে অপূর্ব গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছে। উপন্যাসের সার্বিক বিচারে বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে অদ্যাবধি অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বঙ্কিমের রচিত সাহিত্য শুধু 'Good Art' নয়, উহা বিশ্বের দুর্লভ 'Great Art'-এর অন্তর্ভুক্ত—ইহাই বঙ্কিমপ্রতিভা সম্পর্কে আমাদের সর্বশেষ কথা।

বঙ্কিমপ্রতিভা সম্পর্কে সর্বশেষ কথা

সাংকেতিক নাটক

[**রচনার সংকেতসূত্র :** প্রারম্ভিক ভূমিকা—মানুষ সংকেতের আশ্রয় লয় কেন—মানবজীবনে রহস্যবোধ ও সাংকেতিক নাটক—সাংকেতিক নাটকের রূপ ও স্বরূপ—একটি তুলনা—সাংকেতিক নাটক লঘুভার—সাংকেতিক নাটকে অতিপ্রাকৃত-সমাবেশ—সাংকেতিক নাটক ও রূপক নাট্য—সাংকেতিক নাটকে পটভূমিরচনার গুরুত্ব—সাংকেতিক নাটকে আভ্যন্তর অর্থেরই মূল্য—সংকেত ও রূপকের পার্থক্য]

বিশ্বস্রষ্টার রহস্যময় নির্মাণশালায় মনুষ্য-নামধেয় জীবটিকে সৃষ্ট করিবার কালে পঞ্চভূতের কোনো-দুইটি 'ভূত'-কে বোধ করি তাহার মধ্যে একটু অধিক মাত্রায় সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফলে, পৃথিবীর আর-পাঁচটা প্রাণী যখন আহার-নিদ্রা-আরাম-বিলাসে আত্মতৃপ্ত, তখন মানুষ কল্পনালোকে নিত্য-দিগ্বিজয়ের একান্ত অভিলাষী, অনুভূতিলোকে নবমহাদেশের সৃজনসাধনায় ব্যাপৃত। পঞ্চভূতের মরুৎ আর ব্যোম গৃহগতকে অনিকেত, আসক্তকে উদাসীন, বদ্ধকে মুক্ত করিয়া দেয়। সে মুক্তি কোথায়?

প্রারম্ভিক ভূমিকা

এই পৃথিবীতে বুদ্ধির গৌরব মানুষ সংগতভাবেই করিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা আছে। বুদ্ধির অতীত বোধের প্রতিষ্ঠা তাই শ্রেষ্ঠ মানুষের জীবনে। সেই বোধি যখন জীবনে সমাসন্ন হয়, অপার্থিব অনুভূতির বন্যা যখন চিত্তে নামে, তাহার প্রকাশের ভাষা কী?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন না। ব্রহ্ম তো দূরের কথা, সাধারণভাবে উচ্চতর কোনো অনুভূতিকেই মানুষ প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারিল না। অথচ প্রকাশের বেদনা আছে। সুতরাং আসে ইংগিতের প্রশ্ন, সংকেতের কথা—আসে ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার বিবেচনা। যাহা রূপ ও রেখার সীমায় আবদ্ধ হইবার নয় তাহাকে আভাসিত করিতে মানুষের আপ্রাণ চেষ্টা। বিশেষ করিয়া অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। সাধারণ বোধকে বাণীবদ্ধ করা যদি-বা কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভব, অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে রূপদান করা যে সাধ্যের অতীত। তাই কাব্যের মাধ্যমে সুরে-ছন্দে-সংগীতে সেই সুরাতীত, ছন্দাতীতকে ছুঁইবার কতই চেষ্টা চলিয়াছে।

মানুষ সংকেতের আশ্রয় লয় কেন

কিন্তু যে-রহস্যবোধ মানবজীবনে পরম সত্য তাহার প্রকাশচেষ্টা কেবল কাব্যবদ্ধ থাকিবে কেন? কাব্যের আবেদন তো পরোক্ষ, তাহা শ্রব্য বা পাঠ্য। অথচ মানবজীবনের অতিসত্য ঐ রহস্যবোধকে প্রত্যক্ষ অনুভূতির গোচর করিবার প্রয়াস-প্রচেষ্টা থাকিবে না কেন? ফলে সৃষ্টি হইল অভিনব এক দৃশ্যকাব্যের, অর্থাৎ নাটকের—যে নাটক সাংকেতিক। নামেই প্রকাশ, সাংকেতিক নাটক একটা-কিছু সংকেত করে, যাহা নাটকীয় ভাববস্তু এবং ভাষার প্রত্যক্ষ অর্থের মধ্যে সীমায়িত নয়। 'অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারি ধারে' যে ভাষা, তাহার ঊর্ধ্বে অনর্থ অভীপ্সা প্রতিষ্ঠাই ইহার কাম্য। তাই সাংকেতিক নাটকে একটা বহিরঙ্গ অর্থ থাকে, আর একটা ব্যঞ্জিত অর্থ। নাট্যকার বিশেষ একটা বাহ্য ঘটনার আশ্রয়মাত্র গ্রহণ করেন, কিন্তু বাহ্যাতিরিক্ত সংকেতই তাঁহার লক্ষ্য। সাংকেতিক নাটক অনেকটা ছায়াশরীরী।

মানবজীবনে রহস্যবোধ ও সাংকেতিক নাটক

সম্পূর্ণ ছায়াশরীরী হইলে অবশ্য চলে না। সাহিত্যের একটা form আছে, সেটুকু বজায় রাখিতে হয়। তথাপি formlessnessই যেন এই প্রকার নাটকের form। লেখকের ইংগিতটিকে গোচর করিতে যতটুকু কাব্যশরীরের প্রয়োজন ততটুকু-মাত্র গ্রাহ্য। তাই সাংকেতিক নাটকের শরীর অতিশয় লঘুভার, স্পর্শকাতর, অস্পষ্ট এবং অনেক ক্ষেত্রে অসমঞ্জস। একহিসাবে সাংকেতিক নাটককে প্রতিপাদ্য ভাববস্তুর প্রতি একটা অঙ্গুলিনির্দেশ-মাত্র বলা চলে।

অথবা, সাংকেতিক নাটককে যদি একটা ক্ষীণ ধূপকাঠির সহিত তুলনা করি—যাহার প্রায় সবটুকুই দাহ্য, নিম্নের শীর্ণ কাঠিটুকু মাত্র আশ্রয়। সাংকেতিক নাটকে দৃশ্যের পর দৃশ্য আগাইয়া চলে, যতই অগ্রসর হয়, ততই সেই অতীন্দ্রিয়-ভাবসঞ্চার দর্শক-চিত্তকে অধিকার করে। ধূপ পুড়িয়া যায়, ধূপের সৌরভ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়। সর্বশেষে যে-অদগ্ধ কাঠিটি পড়িয়া থাকে তাহাই নাটকের বাস্তব অবলম্বন। কিংবা, সাংকেতিক নাটককে যদি বলি আকাশপ্রদীপ—শূন্যে দুলিয়া দুলিয়া, কাঁপিয়া কাঁপিয়া একটি ক্ষীণ সুকুমার আলোকশিখা আকাশের মহাশূন্যতার বুকে কোনো এক অব্যক্ত আকূতির শিহরণ রাখিয়া গেল। আকাশপ্রদীপ মাটির সহিত যুক্ত বংশখণ্ডের মাধ্যমে, সে-যোগ নিতান্তই স্থূল। কিন্তু আকাশের সহিত তাহার নিগূঢ় আত্মার সম্পর্ক। আবার, সাংকেতিক নাটককে যদি আতসবাজীর হাউই বলি। একদা তাহার সহিত এই পৃথিবীর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তাহার স্বল্পায়ু অস্তিত্বের সার্থকতা উৎসবরাত্রে আকাশপথে আলোকাভিসারে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষগম্য বস্তুর বন্ধন কাটাইয়া ভাবের রাজ্যে প্রয়াণ করাই সাংকেতিক নাটকের উদ্দেশ্য। সবশেষে এই শ্রেণীর নাটক সম্বন্ধে আর-একটি সাদৃশ্যকল্পনা মনে জাগিতেছে,—সাংকেতিক নাটক যেন নাটকের সংসারে পরমহংস। রোলাঁ মর্ত্যের যে-পরমহংসের বর্ণনা করিয়াছেন, ঠিক তেমনি এই কাব্যের পরমহংসও তথ্যের ধুলি-ঝড়-ঝঞ্ঝার ঊর্ধ্বে অচঞ্চল দুই শ্বেতপক্ষ প্রসারিত করিয়া ভাসিয়া বেড়ায়। পাখাদুটি গুটাইয়া এই পৃথিবীতে হয়ত ক্ষণেকের জন্য নামিয়া আসে, কিন্তু রূপের সাগরে নামিয়া অরূপের মধুপানই তাহার একমাত্র বিলাস। তাহার রক্তচক্ষুতে পরমের চরণকমলের আভা, তাহার শুভ্র পক্ষযুগলে স্বর্গলোকের জ্যোতির উদ্ভাসন, তাহার কৃষ্ণাভ কণ্ঠে নীলকৃষ্ণের রূপের ছোঁয়া, লীলায়িত গতিভঙ্গিতে অমরাবতীর আনন্দসংকেত।

সাংকেতিক নাটকের রূপ ও স্বরূপ

এই প্রসঙ্গে সাংকেতিক নাটকের কাব্যোদ্দেশ্য ও form-এর সহিত ভক্ত মানুষের আচরণের তুলনা করি। ভক্তের অধিষ্ঠান এই পৃথিবীতে, কিন্তু সে সর্বতোভাবে পার্থিব নয়। সাংসারিক কাজকর্ম কোনোমতে একহাতে চালাইয়া লয়, অন্যহাত ধরা থাকে ভক্তাধীশের শ্রীচরণে। অন্তিমে সংসার হইতে হাত সরাইয়া লইয়া দুই হাতেই তাহার ঈশ্বরের চরণ চাপিয়া ধরে। সাংকেতিক নাটকও তাই। প্রারম্ভে সে হয়তো একহাতে কাব্যশরীরের পরিচর্যা করিয়াছে, কিন্তু পরিণতিতে তাহার দুইটি হাতই ভাবশরীরের চরণধরা। সাংকেতিক নাটকের কথাশরীর

একটি তুলনা

এমনই বটে। কিন্তু ইহাকে 'স্বজিয়া' তোলার বিশিষ্ট একটি রীতি আছে। সে কেমন?

এই ধরণের নাটকে ঘটনা থাকে, কিন্তু ঘটনার ভার থাকে না। ঘটনা তখনই ভারস্বরূপ হয়, যখন তাহাকে বিশ্বাস করিতে ব্যস্ত হই—তাহাকে সর্বাংশে গ্রহণ করিবার আত্যন্তিক ব্যস্ততা অনুভব করি। ঘটনা যদি সমস্যা জাগায়, 'প্রব্লেম'-এর সৃষ্টি করে, তবেই তাহার গুরুত্বসৃষ্টি হয়। কিন্তু সাংকেতিক নাটকে ঘটনার গুরুত্ব ততখানি নয়, যতখানি ঘটনা-উত্তর তাৎপর্য। ভারশূন্যতার দিক দিয়া সাংকেতিক নাটক অনেকটা রূপকথার সহিত তুলনীয়। নানা অসম্ভব-অবিশ্বাস্য ব্যাপার রূপকথায় দ্বিধাহীন সরলতায় ঘটিয়া যায়। রূপকথা শুনিতে হইলে সংগতিবুদ্ধি চাপা দিয়া রাখিতে হয়। সাংকেতিক নাটকেও তাই। সামঞ্জস্য ও সংগতিবোধ সকল সময় সাংকেতিক নাটকে যে পূর্ণ তৃপ্তি পাইবে, এমন নয়। তবে রূপকথায় সংগতিহীনতার যে-পরিমাণ অতিরেক, সাংকেতিক নাটকে ততটা নয়, এবং পরিণতিতে সাংকেতিক নাটকে আপাত-অসামঞ্জস্য বৃহত্তর সামঞ্জস্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

সাংকেতিক নাটক লঘুভার

প্রশ্ন উঠিতে পারে, ঘটনার ভার নাই কেন? ভারযুক্ত হইলে কি চলিত না? বাস্তবিক চলিত না। সাংকেতিক নাটকে রূপকথার অনুরূপ অদ্ভুতের সমাবেশ ইচ্ছাকৃত। লৌকিক বস্তু মনকে বদ্ধ করে। বদ্ধ মনকে উধাও করিবার জন্যই অতিলৌকিকের আশ্রয়গ্রহণ। সাংকেতিক-নাটক-রচয়িতা তাই প্রথমেই অতিপ্রাকৃতের সমাবেশ ঘটাইয়া মানুষের বিচারচেতনায় আঘাত করেন। যুক্তিকে যেখানে সরাইয়া দেওয়া হয়, মন সেখানেই মুক্তি পায়। কেউ কেউ সেই কারণেই কি বাস্তব বুদ্ধি ও বিদ্যাকে বোধের পরিপন্থী বলিয়াছেন? সাংকেতিক নাটক 'রাজা'র মধ্যে এমন এক রাজাকে সৃষ্টি করা গেল যিনি দেশের রাজা হইয়াও কোনোদিন লোকলোচনে ধরা দিলেন না।

কেন লঘুভার

অতিপ্রাকৃত-সমাবেশের আরও একটি কারণ আছে। আমরা যখন কোনোকিছুকে নিজেদের সহিত একাত্ম করিয়া লই, তখনই মনের উপর বাঁধন পড়ে পরিচিতের—মন তাহাতে বদ্ধ হয়, নামিয়া আসে। আর, তাহা যদি করা না হয় তাহা হইলেই মনের স্বেচ্ছাবিহরণ সম্ভব। মহান্ প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি সাধক-চিত্তে সর্বাগ্রে ভাবসঞ্চার করে। নীলাচলের সমুদ্রে শ্রীচৈতন্য ঝাঁপাইয়া পড়িতেন, নিবিড় মেঘের কোলে বলাকাশ্রেণী দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম ভাবসমাধি

ঘটিয়াছিল। অপর-একটি উদাহরণ লওয়া চলে—রসজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ অধ্যাপক একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। এক বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর অশ্লীল চিত্র অঙ্কনের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, একেবারে নিরাবরণ নারীচিত্র অশ্লীল নয়। কখন তাহা অশ্লীল হয়? সেই নগ্ন নারীচিত্রের পায়ে একটি মোজা পরাইয়া তিনি দেখাইলেন, এখন এই ছবি অশ্লীল। প্রথম ক্ষেত্রে বিবসন নারীদেহ মনে কুৎসিত ভাবের সঞ্চার করে না, কারণ তাহার সহিত মানবচিত্তের একাত্মতা নাই তাহার অখণ্ড পবিত্রতার জন্য। কিন্তু পদাবরণীটুকু পরিচিত পৃথিবীর, তাহাতে কদর্যতার স্পর্শ আছে। উর্বশী কি অশ্লীল? 'অজ্ঞান' ঈভ কি অশ্লীল? দিগম্বর মহাদেব কি অশ্লীল? নয় কেন? পৃথিবীর নয়, তাই।

সাংকেতিক নাটকে
অতিপ্রাকৃত-সমাবেশ

সাংকেতিক নাটকে মানুষের পরিমিত জ্ঞানচেতনার মূলে অবিশ্বাস্য অসমঞ্জসের দ্বারা আঘাত করা হয় ঐ অপার্থিবের সুর অনুরণিত করিতে। এখন সাংকেতিক নাটকের স্বরূপলক্ষণ আমরা চিনিয়া লইব রূপক নাটকের সহিত তুলনা করিয়া।

নিঃসংশয়ে বলা যায়, রূপক নাটক ও সাংকেতিক নাটক এক নয়। 'রূপক' ও 'সাংকেতিক'—এই দুইটি শব্দের ইংরাজী প্রতিশব্দ যথাক্রমে Allegorical ও Symbolical। একটির মূলধর্ম প্রতিরূপ সৃষ্টি করিয়া ব্যাখ্যা করা, অন্যটির সংকেত করা। একটি explain করে, অন্যটি suggest করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা উদ্ধার করিতে গেলে—একটি বোঝায়, অপরটি বাজায়। Allegory বা রূপকের মূল কাজ যখন বোঝানো তখন তাহার মধ্যে অস্পষ্ট কিছু থাকিলে চলে না। রূপকের মধ্যে আপাতভাবে যে-অর্থধারা প্রবাহিত তাহা স্বকীয় ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কোনোপ্রকার দুর্বোধ্যতা তাহার মধ্যে নাই। কিন্তু এই বাহ্য অর্থের সমান্তরাল আর-একটি আভ্যন্তর অর্থ রূপকের পশ্চাতে বর্তমান থাকে। সেই আভ্যন্তর অর্থের অনুরূপ করিয়া বাহ্য কাব্যরূপ গড়িয়া তোলা হয়। সেই কারণে রূপকের মধ্যে বুদ্ধির প্রাধান্য, মননের প্রাচুর্য। পক্ষান্তরে সাংকেতিক রচনার প্রাণবস্তু সহজ স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতি।

সাংকেতিক নাটক
ও
রূপক নাট্য

রূপক বুদ্ধিগ্রাহ্য বলিয়া রূপকরচনায় সমান্তরাল যে-অন্যতর অর্থধারাটি বহমান থাকে, তাহা আবিষ্কার করিতে বিলম্ব হয় না। একবার যদি রচয়িতার যথার্থ উদ্দেশ্য অনুমান করা যায়, যে-তত্ত্বকে তিনি সাহিত্যরূপ দান করিতে চাহিতেছেন তাহার স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা জন্মে, তাহা হইলেই যেন আঙ্কিক উপায়ে বহিরঙ্গ

ঘটনাবলীর অন্তরালবর্তী তত্ত্বার্থ বাহির করা যায়। কারণ, 'আক্ষরিক'-ভাবে সেখানে বিশেষ একটি বস্তুকে স্মরণ করিয়া আর-একটি বস্তুর ব্যবহার করা হইয়াছে।

এই কারণেই দেহের লাবণ্যের মতো রূপক-এ বাহ্য অর্থ ও আভ্যন্তর অর্থের সংযোগ অবিচ্ছেদ্য নহে। অথচ সাংকেতিক রচনায় কাব্যদেহ অনিবার্যভাবে নিগূঢ় ভাবরসকে প্রকাশিত করে। সাংকেতিক রচনার মধ্যে suggestion-এর ভাব প্রবল। তাই লেখক suggestive আবহাওয়া অর্থাৎ ভাবাবহ সৃষ্টি করিয়া একটি বিশেষ সত্যের দ্যোতনাটুকু-মাত্র প্রকাশ করিতে চান। অর্থের চাবি লাগাইয়া সেখানে তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হয় না বলিয়া প্রত্যেকটি ঘটনার সর্বাঙ্গীণ তাৎপর্য সকল সময় অনুভব করিয়া ওঠা যায় না। সাংকেতিক রচনায় পটভূমিসৃষ্টিই আসল, সেই পটভূমিকায় স্থাপিত পাঠকচিত্ত কল্পনায় নির্বিরোধ সঞ্চরণের অবসর পায়। লেখকের উদ্দিষ্ট সংকেত অন্তরে ক্রমাগত অনুভব করিতে করিতে আমাদের অনুভবশক্তি এমন প্রখরতা ও স্বচ্ছতালাভ করে যে, লেখকের ঈপ্সিত [তদতিরিক্তও হইতে পারে] অধ্যাত্ম-তাৎপর্য বিদ্যুৎচমকের মতো অন্তরদেশে আলোর ঝিলিক দিয়া যায়। স্মরণ রাখিতে হইবে, বিদ্যুৎচমক বিজলীবাতি নয়। বিদ্যুৎকে যদি সাংকেতিক বলি, বিজলীবাতিকে বলিব রূপক। রূপক-রচনার উদাহরণ চাওয়া হইলে স্পেন্সারের 'Fairy Queene' বা বুনিয়েনের 'Pilgrim's Progress'-এর নাম করা চলে। স্পেন্সার যে-নাইটদের কার্যকলাপের বিবরণ দিয়াছেন, বাহ্য অর্থ হিসাবে তাহার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নাই, অথচ অন্য-একটি অর্থও সহজে আবিষ্কার করা চলে। 'Pilgrim's Progress'-এর পথযাত্রা—তাহা সাধারণ মানুষের জীবনপথপরিক্রমা হইতে পারে, আবার ভক্ত খ্রীষ্টানের মর্ত্য হইতে স্বর্গাভিসার হইলেও ক্ষতি নাই। সুইফট্ মানবজাতিকে নির্মম গালাগালি করিলেন রূপকের আবরণে। আবার, সত্যের তীব্রতা ঢাকিতে দান্তে রূপকের আশ্রয় লইলেন। 'ঈশপস্ ফেবল্‌স্'কে আমরা রূপককথা বলিতে পারি, সংস্কৃতে পঞ্চতন্ত্রও তাই।

সাংকেতিক নাটকে পটভূমি-রচনার গুরুত্ব

কিন্তু সাংকেতিক রচনায় বাহ্য অর্থের এই মূল্য নাই, অনেক সময়েই তাহাতে বাহ্য অর্থ অতিশয় দীন, অপ্রচুর। আভ্যন্তর ভাবের আলোকেই তাহা দীপ্যমান। বিদেশী সাহিত্যে মেটারলিঙ্কের 'Blue Bird', 'The Sightless', আমাদের বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর', 'রাজা' সাংকেতিক রচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মেটারলিঙ্কের 'The

সাংকেতিক নাটকে আভ্যন্তর অর্থেরই মূল্য

Sightless' নাটকের মূল পাত্রপাত্রী অন্ধ অথচ বাক্‌শক্তিসম্পন্ন কয়েকটি নরনারী, এবং তাহাদের চালক চক্ষুষ্মান অথচ নির্বাক একজন পুরোহিত। গল্পটির কাহিনী-মূল্য অতিঅল্প, সাংকেতিক মূল্যই প্রধান। তাহা হইল—নির্বাক নিয়তি অনিবার্য গতিতে অন্ধমানবশক্তিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। 'ডাকঘর'-এর মূল লক্ষ্য বদ্ধ-মানবাত্মার অচিনাভিসার, সুদূরতৃষ্ণার রূপাঙ্কন।

আরো কয়েকটি ঘরোয়া উদাহরণ লইলে রূপক ও সাংকেতিক রচনার পার্থক্য বোধগম্য হইবে। সমালোচকের উদাহরণ লইতেছি। বনের বাঘকে হিংস্রতার প্রতিমূর্তি যখন বলি তখন সেটি রূপক। দশপ্রহরণধারী দশভূজামূর্তি শক্তির symbol নয়, allegory। কিন্তু শালগ্রামশিলা symbol। এতটুকু একটি ছোট মসৃণ পাথর, অথচ তাহার সামনে মন্ত্রপাঠ হইতেছে—তুমি সহস্রশীর্ষ, সহস্রপাদ। 'অচক্ষু সর্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান, অপদ সর্বত্র গতাগতি' যিনি তিনি symbol ছাড়া আর-কিছু নন। কালীমূর্তি স্পষ্টত রূপক। তিনি সত্যই মহাকালের রূপ, যখন : 'কালীকরালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী। বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা। দ্বীপিচর্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা। অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনাভীষণা॥ নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিত দিঙমুখা', ইত্যাদি।

সংকেত ও রূপকের পার্থক্য

কালীমূর্তি এইরূপ কল্পনা অনুসরণ করিয়াই নির্মিত। সুতরাং তাহা রূপক। কিন্তু যখন শ্রীরামকৃষ্ণ উপমা দিলেন—'কালী কি কালো! দূরে তাই কালো, জানতে পারলে কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ, কাছে দেখো—কোনো রঙই নেই। সমুদ্রের জল দূর থেকে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখো—রঙ্ নেই।' এইদিক হইতে দেখিলে কালীমূর্তি symbol বই আর-কিছু নয়।*

[* অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু-রচিত]

বৈষ্ণবকবিতার ধর্মনীতিক ও দার্শনিক ভিত্তিভূমি

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—বৈষ্ণবকাব্য বাংলা গীতিকবিতার আদি-গঙ্গোত্রী—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণবসাহিত্য—বৈষ্ণবকবিতার উপজীব্য—বৈষ্ণবকবিতা, বৈষ্ণবধর্ম ও ভক্তিবাদ—ভক্তধর্মের স্বরূপ—শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ভক্তিবাদ—বৈষ্ণবভাবুকতার দার্শনিক ভিত্তি— বৈষ্ণব-দর্শনের মূলকথা—ঈশ্বরের দ্বিবিধ ভাব—বৈধিভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি—স্বকীয়া ও পরকীয়া রতি—পরকীয়ার লক্ষণ—বৈষ্ণবকবিতায় মধুর রতির স্ফূর্তি—উপসংহার।]

প্রারম্ভিক ভূমিকা

বৈষ্ণবকবিতা প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ভাবের রূপাশ্রিত বাণীমূর্তিকেই যদি সাহিত্য বলি, তবে বৈষ্ণবকবিতা যে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টি, সে বিষয়ে সংশয়প্রকাশের এতটুকু অবকাশ নেই। বৈষ্ণবযুগের পূর্বেও বাংলাভাষায় কাব্যকবিতার অভাব দেখা যায়নি—শাক্তসাহিত্য, শৈবসাহিত্য, নাথসাহিত্য কমবেশী আমাদের সকলেরই পরিচিত। কিন্তু ধর্মের মহিমাব্যাখ্যান ও কবিদের প্রচারধর্মিতার আতিশয্যহেতু উক্ত সাহিত্যের শিল্পরূপ তেমন রসমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে নি। বৈষ্ণবসাহিত্য যে ধর্মের সংস্রবমুক্ত, একথা বলছি না। কিন্তু বৈষ্ণবকবিরা সাম্প্রদায়িক প্রচার-উদ্দেশ্য অনেকটা বিস্মৃত হয়েই তাঁদের কাব্য রচনা করেছিলেন। বৈষ্ণবকবিদের রচনার মর্মস্থলে মনুষ্যহৃদয়ের এমন একটা রাগিণী ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, যার আবেদন সার্বজনীন ও নিত্যকালীন।

বৈষ্ণবকাব্য বাংলা গীতি-কবিতার আদিগঙ্গোত্রী

বস্তুত বাংলাসাহিত্যের সত্যকারের জাগরণ বৈষ্ণবযুগেই হয়েছিল। বৈষ্ণবগণ ধর্মকে শিল্পকলার রসান্তঃপুরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, আবার শিল্পকে ধর্মের চরণে গন্ধপুষ্পরূপে নিবেদন করেছেন। বৈষ্ণবপদাবলী ফলত জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার প্রেম-আনন্দ-সৌন্দর্যের লীলাবিভূতি-ধারণার একটা স্বপ্নানন্দী উচ্ছ্বাস—জীব-হৃদয়ের দিক্ হতে অচিন্ত্যের সাহজিক প্রেমের একটা স্বপ্নবিলাস। কবি ও ভক্তের, ধর্ম ও কবিতার এমন পরমাশ্চর্য সমন্বয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে খুব কমই চোখে পড়ে। বাংলা গীতিকবিতার আদিগঙ্গোত্রী হচ্ছে বৈষ্ণবপদাবলী—চণ্ডীদাস আর বিদ্যাপতি বাঙালীর প্রেমতত্ত্বের স্মরণীয় কবি।

চণ্ডীদাস-প্রমুখ প্রেমিক কবির যে-ভাবস্বপ্ন কাব্যের গোমুখীগুহায় অবরুদ্ধ হয়ে ছিল, প্রেমের সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব তাকে বাংলার সমতল ভূমিতে

সহস্রধারায় উৎসারিত করে দিল। তারপর কয়েক শত বৎসর ধরে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে গেল প্রেমসংগীতের অজস্র প্লাবন। এত আনন্দ, এতখানি রস-বিহ্বলতা বাংলাদেশে এর পূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি—প্রেমে, ভক্তিতে, বিশ্বাসে, হৃদয়াবেগের প্রাচুর্যে শ্রীচৈতন্য বাঙালীর অন্তর একেবারে জয় করে নিয়েছিলেন। একদিকে প্রেমিক ভাবুক, অন্যদিকে ভক্তকবি—এই দুইয়ের মণিকাঞ্চনসংযোগ হয়েছিল বলেই বাংলার বৈষ্ণবসাহিত্য এতখানি পরিস্ফূর্তি, এতখানি ব্যাপ্তিলাভ করেছিল।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণবসাহিত্য

পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার নিত্যবৃন্দাবনলীলাকে কেন্দ্র করেই বিপুল বৈষ্ণবপদাবলীসাহিত্য গড়ে উঠেছে। সৃষ্টির আদিম লগ্ন থেকে জীব আর ঈশ্বরের মধ্যে যে-লীলা চলেছে, বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ তারই রূপক-আবরণ। সংগীতের ভিতর দিয়ে রূপ ও রসের মাধ্যমে, বৈষ্ণবকবিরা অক্ষয় ভূমানন্দের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। বৈষ্ণবসাহিত্যের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের সংযোগ অবশ্যস্বীকার্য। তাই এ সাহিত্যের আলোচনা করতে গেলে ওই ধর্মের সহিত কিছুটা পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

বৈষ্ণবকবিতার উপজীব্য

ভক্তিবাদ নিয়েই বৈষ্ণবধর্ম। এই ভক্তিবাদ যে খুবই প্রাচীন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। আরণ্যক ও উপনিষদের উপাসনাকাণ্ডের উপর ভক্তিমার্গ সংস্থাপিত। তবে 'ভক্তি' শব্দটি যে খুব প্রাচীন তা নয়। গীতার পূর্বে স্পষ্টত ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে কোথাও উপদেশ করা হয়নি। ভক্তি গীতার একমাত্র আলোচ্য বিষয় না হলেও এ বস্তুটি গীতার বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতপক্ষে গীতাই ভক্তিশাস্ত্রের বেদ। ভারতে ভক্তিবাদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপধারণ করেছিল। মধ্যযুগের বৈষ্ণবধর্ম ভারতের দক্ষিণে উৎপন্ন হয়ে রামানুজ ও মধ্বাচার্য কর্তৃক পরিপুষ্ট হয়েছিল। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সময় এই বৈষ্ণবধর্ম নতুন আকারে নিরক্ষর জনসাধারণের হৃদয়ে সহজে প্রবেশলাভ করেছিল।

বৈষ্ণবকবিতা, বৈষ্ণবধর্ম ও ভক্তিবাদ

গীতায় জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভক্তিধর্ম প্রেমের ধর্ম—মানুষের ভূমানন্দপিপাসু হৃদয়দেশই হল এর প্রতিষ্ঠাভূমি। এ ধর্মে ভগবানের উপাসনার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য হল অন্তরের প্রেম। ভক্তিধর্মের 'ভক্তি' কী? ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরক্তি বা প্রেমই ভক্তি—'সা ভক্তি পরানুরক্তিরীশ্বরে'। জ্ঞানযোগী চায় পরাবিদ্যার

ভক্তিধর্মের স্বরূপ

দ্বারা মুক্তি, মোক্ষ, কৈবল্যলাভ করতে—বৈষ্ণবভক্তিবাদী চায় কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণসঙ্গ —তাঁদের সাধ্যসাধনতত্ত্বে মুক্তি বা মোক্ষের কোনও স্থান নেই।

বহুশত বৎসর পূর্বে দক্ষিণভারতে ভক্তিধর্মের চরম বিকাশ ঘটেছিল। যে-সব সাধু মহান্ত এই ভক্তিবাদ প্রচার করেছিলেন তাঁরা 'আলওয়ার' নামে প্রসিদ্ধি-লাভ করেছেন। ভগবানকে স্বামীরূপে উপাসনা করা আলওয়ারদের প্রচারিত ধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিশিষ্টতা হচ্ছে কান্তাভাবের ভজন—এতে 'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার'। অনেকেই মনে করেন, এই কান্তাভাবের সাধনমন্ত্র চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য থেকেই লাভ করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ভক্তিবাদ

মহাপ্রভুর মতে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য, তাঁর ধাম শ্রীবৃন্দাবন। সেই বৃন্দা-বনবাসিনীরা যে-মধুর ভাব নিয়ে তাঁকে ভজনা করেছিলেন, তা-ই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা। এই ধর্মের নিশ্চিত প্রমাণ শ্রীমদ্‌ভাগবত, এবং এর শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ হল প্রেম। প্রেমমার্গে ভজন, রাগানুগা ভক্তির প্রচার এবং প্রেমকে পুরুষার্থ বলে স্বীকৃতি ভক্তি-ধর্মের ক্ষেত্রে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের নূতন দান। অবশ্য দক্ষিণদেশের আলওয়ারদের প্রদর্শিত ভক্তিবাদ যে তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল সে-কথা অনস্বীকার্য। শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ভক্তিধর্মের সবচেয়ে বড়ো কথা হল, ভগবান প্রেমময়—তিনি রসস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ'—প্রেমের দ্বারাই ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের মিলন সংঘটিত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে প্রেম সাধন নয়, সাধ্য—End in itself।

বৈষ্ণবভাবুকতার দার্শনিক ভিত্তি

বৈষ্ণবভাবুকতার পিছনে যে-দার্শনিক মতবাদ রয়েছে, এখানে তার কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে। পূর্বে বলা হয়েছে, বৈষ্ণবধর্ম আর বৈষ্ণবকবিতার কেন্দ্রস্থলে রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা, এবং উভয়ের প্রেমলীলা সংঘটিত হয়েছে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামে। সুতরাং রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কে আমাদের কিছুটা ধারণা থাকা আবশ্যক। বৈষ্ণব-ধর্ম-দর্শন ও কাব্যের এই কৃষ্ণ কে, আর রাধাই বা কে? উভয়ের স্বরূপপ্রকৃতি কী?

বৈষ্ণবদের কাছে কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান—'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'। রাধিকা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 'হ্লাদিনী'-শক্তিরই প্রকাশ। সুতরাং তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণ অভেদাত্মা। ভগবান সচ্চিদানন্দ। তিনি প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেমের অনন্ত উৎস। উপনিষদে যিনি ব্রহ্ম, যোগীর নিকট যিনি পরমাত্মা, বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে তিনিই ভগবান। বৈষ্ণবভক্ত ঈশ্বরের আনন্দময় সত্তার উপাসক। ভগবান হতেই যে নিখিল বিশ্বের দিকে দিকে আনন্দধারা উৎসারিত হচ্ছে, উপনিষদের

ঋষিরাও একথা উচ্চারণ করেছেন : 'রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতী…এষ এব আনন্দায়তি'। ঋষিকবিদের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম পরমানন্দস্বরূপ।

আনন্দময় ঈশ্বর লীলারস-আস্বাদনের জন্যই দ্বিধাবিভক্ত হলেন—নিজেকে বহুতে পরিণত করলেন : 'স বৈ নৈব রেমে, তস্মাৎ একাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ—স অকাময়ত জায়া মে স্যাৎ'—সেই একমেবাদ্বৈত রমণ-ইচ্ছায় আপনাকে দ্বিধাবিভক্ত করে পতি ও পত্নীর রূপ পরিগ্রহ করলেন। বৈষ্ণবদের নিকট এই 'পতি'-ই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এবং এই 'পত্নী' হলেন পরাপ্রকৃতি শ্রীরাধিকা।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও বলা হয়েছে যে, শ্রীরাধা মূল প্রকৃতি-ঈশ্বরী, শ্রীকৃষ্ণের অর্ধাংশস্বরূপা—'মমার্ধাংশস্বরূপা ত্বং মূল প্রকৃতিরীশ্বরী'। এই তত্ত্বটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা—পরমাত্মা ও জীবাত্মার—মধ্যে স্বরূপত কোনো পার্থক্য নেই, এদের একক বাদ দিয়ে অপরের উপলব্ধি সম্ভব নয়। যেহেতু লীলারস আস্বাদনের জন্যই ঈশ্বর আপনাকে বহুতে বিভক্ত করেছেন, সেহেতু জীবকে নিয়েই তাঁর শাশ্বত আনন্দ, আর পরমাত্মাকে নিয়েই জীবাত্মার অফুরন্ত আনন্দের আস্বাদন।

বৈষ্ণবধর্ম ভক্তিধর্ম হলেও এর অন্তর্নিহিত দার্শনিক ভাবনার এমন কতকগুলি বিশিষ্টতা রয়েছে, যার জন্যে বৈষ্ণবের ভক্তিবাদ অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের ভক্তিবাদ হতে ভিন্নতর হয়েছে। এর প্রথম তত্ত্ব হল : 'ঈশ্বর পরম সম্পদ, পরমানন্দ'। এ আনন্দ জগতের সকল নরনারীর জন্যই সমানভাবে অপেক্ষা করে রয়েছে, এ আনন্দ বিলিয়ে দেবার জন্যে ভগবান একান্ত ব্যাকুল হয়ে রয়েছেন। কারণ, এ পথেই 'সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন'। দ্বিতীয় তত্ত্ব হচ্ছে : তিনি নরনারীর মর্মলোকে আপনাকে চিরপ্রকাশিত করে রেখেছেন, নরনারায়ণরূপে নিত্য-বিরাজিত রয়েছেন। তৃতীয় তত্ত্ব : জীবই যে কেবল সেই নিত্যানন্দকে নিত্য চাইছে তা নয়, ওই নিত্যানন্দও জীবকে ধরা দেবার জন্যে নিরন্তর ব্যাকুল। রসময় ঈশ্বর যখন প্রেমিক ঈশ্বর হলেন, তখন পৃথিবীর আনন্দপিপাসার্ত নরনারীর মুখশ্রী উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি আমাকে 'উদ্ধার' করে কৃতার্থ করবেন, তা নয়,—আমাকে নিয়েই যে তাঁর প্রেমানন্দলীলা, আমাকে ফেলে তাঁর তো চলে না। চতুর্থ তত্ত্ব : তিনি যে কেবল মানবের বিশিষ্ট আত্মবোধের নিভৃত দেবালয়ে আপনাকে প্রকাশ করেছেন তা নয়,—স্ত্রীরূপে, বন্ধুরূপে, পুত্ররূপে তিনি আমাদের প্রেম গ্রহণ করছেন এবং প্রেম বিলাচ্ছেন। পঞ্চম তত্ত্ব : ভগবান 'রসো বৈ সঃ—স এষ রসানাং

বৈষ্ণবদর্শনের মূলকথা

রসতমঃ'—তিনি রসঘন, আনন্দস্বরূপ। মানবের সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে, সকল মাধুর্যের মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে রসরূপেই প্রকাশ করছেন।

বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ বৈদান্তিকের নির্গুণ ব্রহ্ম নন, তিনি সবিশেষ ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর বা ভগবান। তাঁর ভাব দ্বিবিধ—ঐশ্বর্য ও মাধুর্য। একদিকে তিনি যেমন প্রতাপঘন,—অন্যদিকে তিনি প্রেমঘন। এ দুটি ভাবের মধ্যে বৈষ্ণবেরা ভগবানের মধুর-ভাবেরই সাধক। সমগ্র বৈষ্ণবকবিতার মধ্যে আমরা এই মধুর-ভাবের আত্যন্তিক অভিব্যক্তিই দেখতে পাই। বৈষ্ণবসাহিত্যের 'রসপঞ্চক' ঈশ্বরের মাধুর্য-ভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। মাধুর্যভাবে ভগবান আমাদের সখা, আমাদের পুত্র, আমাদের প্রাণপ্রিয়তম।

ঈশ্বরের দ্বিবিধ ভাব

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ঈশ্বরভক্তিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—বৈধি ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি। বিধিমার্গে-বেদমার্গে পদচারণ, শাস্ত্রের অনুজ্ঞাপালন, সমস্ত কর্ম শ্রীভগবানে অর্পণ হল বৈধিভক্তির লক্ষণ। বৈধি ভক্তি সমুদয় ধর্ম [Ritual] বর্জনের পথে অগ্রসর হয়ে —'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—'শুদ্ধা ভক্তি'তে পরিণত হয়। এই শুদ্ধা ভক্তিরই অপর নাম প্রেম বা রাগানুগা ভক্তি। বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রেম আর রাগানুগা ভক্তি সমার্থক শব্দ। এই শাস্ত্রে রাগানুগা ভক্তিকেই বলা হয় 'রতি'। রতি আবার পঞ্চবিধ—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।

বৈধি ভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি

রাগমার্গের ভক্তিই শ্রীচৈতন্য প্রচার করেছিলেন, এবং তাঁর প্রচারিত ধর্মই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম নামে পরিচিত হয়েছে। উপরে কথিত পঞ্চবিধ রতির মধ্যে তারতম্য রয়েছে। মধুর-রতিই শ্রেষ্ঠ। কান্তভাবে ভগবানের উপাসনাই হল মধুর-ভাবের লক্ষ্য। মধুর-রতিকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—স্বকীয়া ও পরকীয়া। মধুর-রসের উপাসনায় ভগবান 'কান্ত'—ভক্ত 'কান্তা'। ভগবানকে কান্তভাবে ভজনা করার রীতি এদেশে বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। স্বকীয়া আরাধনায় ভগবান ভক্তের পতি, আর পরকীয়া ভাবের সাধনায় তিনি ভক্তের উপপতি। বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করেছেন পরকীয়া ভাবের ভজন। তাঁরা বলেন, 'পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস'। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, লৌকিক জগতে এর স্থিতি নয়। কারণ—'ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস'।

স্বকীয়া ও পরকীয়া রতি

প্রশ্ন হতে পারে, বৈষ্ণবেরা পরকীয়া ভাবের উপাসনা করেন কেন? উত্তরে

বলা যায়—সহস্র বাধা, সহস্র নিষেধ আর প্রতিমুহূর্তে হারাবার আশঙ্কা যেখানে, সেখানেই কান্তকান্তাপ্রেমের চরম স্ফূর্তি। পরকীয়া নায়িকা কে, তাহার লক্ষণ কী? রূপগোস্বামী পরকীয়ার লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, যে-নারী অন্তরঙ্গ অনুরাগবশে ইহলোক-পরলোক উপেক্ষা করে পরপুরুষে আত্মসমর্পণ করে, যে বহিরঙ্গ বিবাহাদি লৌকিক ধর্মের অপেক্ষা রাখে না—সে-ই পরকীয়া। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বৃন্দাবনে একমাত্র পুরুষ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, আর সকলেই নারী। নিজেকে রমণীতে রূপান্তরিত না করলে ভক্তিধর্মে ভগবানের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

পরকীয়ার লক্ষণ

বৈষ্ণবকবিরা পরকীয়ারাগের প্রেক্ষাপটে শ্রীরাধার এক অপূর্ব মূর্তি অঙ্কিত করেছেন। কৃষ্ণের সঙ্গে রাধিকার পূর্বরাগে মধুর-রতির প্রথম প্রকাশ। তারপর রাধারানীর জীবনে হয়েছে বিচিত্র ভাবপর্যায়ের সূচনা। অনুরাগ, আক্ষেপানুরাগ, অভিসার, মিলন, মাথুর, ভাবসম্মেলন প্রভৃতি নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার সমাপ্তি। পূর্বরাগময়ী শ্রীরাধা বাঁশীর শব্দ শুনে যে-কৃষ্ণের চরণে নিজেকে সমর্পণ করেছেন, ভাবসম্মেলনে সেই অখিলরসামৃতমূর্তিকেই নিজের হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বৈষ্ণবকবিতায় মধুর-রতির স্ফূর্তি

'ভাবসম্মেলন' বস্তুতপক্ষে মহামিলন—'Becoming one with God—'Self-mergence in the principle of Love and Life'। এই ভাব-সম্মেলনের জগতে বিরহ নেই, বিচ্ছেদ নেই, রয়েছে নিত্যকালের মিলন। দ্বৈতবাদে যে-প্রেমলীলার সূচনা, অদ্বৈততত্ত্বেই তার সমাপ্তি। বৈষ্ণবের মতো আর কেউ ভগবানকে এমনভাবে নিজের আত্মার আত্মীয় করে নিতে পারে নি—বাঙালী-বৈষ্ণবকবির কাব্যে দেবতা আর প্রিয়তম একাকার হয়ে গিয়েছে।

উপসংহার

শাক্তপদাবলীপাঠের ভূমিকা

[**রচনার সংকেতসূত্র** ঃ প্রারম্ভিক ভূমিকা—শাক্তপদাবলীর জনপ্রিয়তা—বৈষ্ণবপদাবলী ও শাক্তপদাবলী—শাক্তসংগীতের বিষয়বস্তু ও রসরূপতা-বিচার—তত্ত্বপ্রধান হইলেও শাক্তপদাবলী জীবন-রসাশ্রিত গীতিকবিতা—শক্তিতত্ত্ব—সাধনতত্ত্ব—শাক্তপদাবলীর কবির সাধনা দিব্যভাবের সাধনা—দেহতত্ত্ব ও কুণ্ডলিনীযোগ—শাক্তপদাবলীর কবিসম্প্রদায়—রামপ্রসাদ—কমলাকান্ত—গোবিন্দ চৌধুরী—মহারাজ মহাতাবচাঁদ—দাশরথী রায়—মুকুন্দ দাস—উপসংহার]

শাক্তপদাবলী বাংলাসাহিত্যের মূল্যবান সামগ্রী। এই অপূর্ব গানগুলি এক অনির্বাচ্য ভাবানুভূতির উদ্বোধক, ভক্তিরসসঞ্চারক, অনাবিল-আনন্দদায়ক। বহুকাল ধরিয়া এই মহামূল্য ঐশ্বর্য অধ্যাত্মজীবনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল। আঠারো শতকের শক্তিসাধক কবিগণ আশ্চর্য সাধনশক্তিবলে 'হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে' ডুব দিয়া এই রত্ন আহরণ করিয়াছেন। সংগীতের দেশ এই বঙ্গভূমিতে ভক্তিরসাশ্রিত শাক্তপদাবলী এক নবতন আবিষ্কার।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

জন্মলগ্ন হইতে শাক্তপদাবলীর অশেষ জনপ্রিয়তা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেবলমাত্র সাধক নয়, তৎকালীন রাজামহারাজা, জমিদার, সমাজের অভিজাতশ্রেণী, সাধারণ মানুষ সকলেই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এমন কি, সেই অসুন্দর রুচিবিকৃতির যুগে কবিওয়ালা, টপ্পাগায়ক, পাঁচালিকার, যাত্রাওয়ালা জনসাধারণের রসপিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য শাক্তসংগীত গান করিতেন। উনিশ শতকের ইংরেজী শিক্ষা এদেশের বহুতর সংস্কারকে অন্ধ-কুসংস্কার বলিয়া গণ্য করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গল' এদেশে প্রচলিত যে-কোনো আচারকে কুৎসিত, যে-কোনোপ্রকার সাহিত্যকে গ্রাম্য বলিয়া নাসিকাকুঞ্চন করিয়াছেন। কিন্তু এহেন সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের যুগেও শাক্তগানগুলি জনপ্রিয়তা হারায় নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কবি ও নাট্যকার সাগ্রহে শক্তিবিষয়ক কবিতা ও গান রচনা করিয়াছেন। স্বাধীনতা-আন্দোলনের পটভূমিকায় শাক্তসংগীতের নব-রূপান্তর বাঙালীর জাতীয় জীবনে বিপুল প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছে। ক্ষীরোদ গাঙ্গুলীর 'না হইতে মা গো বোধন তোমার ভেঙেছে রাক্ষস মঙ্গলঘট', অথবা চারণকবি মুকুন্দদাসের 'জাগো গো জাগো গো জননী' এদেশের সংখ্যাতীত নর-নারীকে স্বদেশপ্রেমের পুণ্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে। অগ্নিযুগের কবিবিদ্রোহী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত এই জাতীয় গান রচনা করিয়াছেন।

শাক্তপদাবলীর জনপ্রিয়তা

শাক্তপদাবলীর এতখানি জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ, মুখ্যত ধর্মাশ্রয়ী হইলেও এই গানগুলি জীবনরসাশ্রিত গীতিকবিতা। শৃঙ্গার বা আদিরসের রূপায়ণহিসাবে বাংলাকাব্যসাহিত্যে বৈষ্ণবপদাবলীর তুলনা হয় না। কেবল শৃঙ্গার-রস কেন, সখ্য বাৎসল্য প্রভৃতি রসের প্রকাশহিসাবেও বৈষ্ণবকবিতাকে সত্যই অতুলনীয় বলা যাইতে পারে। বৈষ্ণবকাব্যের ললিতমধুর ভাষা, সংগীতস্পন্দিত ছন্দ ইহাকে সাহিত্যসংসারে চিরন্তের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সর্বোপরি, তত্ত্বকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, নিবিড় ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্য দিয়া, বৈষ্ণবকবিতা এমন একটি অনুপম সৌন্দর্যলোকে, কামস্পর্শবিরহিত অনাবিল প্রেমের রাজ্যে উঠিয়া গিয়াছে, যাহার আবেদন শুধু বিশেষ একটি ধর্মীয় গোষ্ঠি বা গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই—সর্বস্তরের সাধারণ্যে ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে।

বৈষ্ণবপদাবলী ও শাক্তপদাবলী

তুলনায় শাক্তসংগীতের আবেদন হয় তো এতখানি ব্যাপক নয়। শাক্তপদাবলীতে তত্ত্বের সুরটি উচ্চগ্রামে বাঁধা, সাধনতন্ত্রীয় ইংগিতগুলি অতিশয় সুস্পষ্ট —তত্ত্বকে গোপন রাখিয়া কেবল বিশুদ্ধ কাব্যসৃষ্টির প্রয়াসও ইহাতে নাই। শ্রুতিরঞ্জন ভাষার লালিত্য কিংবা বিচিত্র ছন্দোভঙ্গিমার অনুরণনও শাক্তসংগীতে তেমন অনুভূত হইবে না। তথাপি এসকল পদের আবেদন চিত্তস্পর্শী—যেহেতু মানবজীবনের বিশেষ একটি আকৃতি ইহাদের মধ্যে আন্তরিকতার সহিত বাণীবদ্ধ হইয়াছে। অধ্যাত্মজীবনের বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার সংবাদে, পারিবারিক আনন্দবেদনার কাব্যায়নে এই সংগীতগুলি নিঃসন্দেহে জীবনানুগ ও হৃদয়গ্রাহী। শাক্তপদকর্তাগণ নিজেদের অনুভূতির কথা বিবৃত করিতে গিয়া স্বপ্নকল্পনার জগতে পদচারণ করেন নাই, একান্ত বাস্তব পৃথিবীর হাসিঅশ্রু-আন্দোলিত জীবন, সমাজকেন্দ্রিত সংসার আর গৃহপ্রাঙ্গণ লইয়া তাঁহারা মানবীয় তথা পারমার্থিক আশা-আকাঙ্ক্ষার গান রচনা করিয়াছেন; পবিত্র ভাব ও ভক্তির স্পর্শ দিয়া তাঁহারা মানুষের ধূলিধূসর জীবনে অধ্যাত্মলোকের মণিদ্যুতি বিচ্ছুরিত করিয়াছেন।

শক্তিবিষয়ক গানগুলির বর্ণনীয় বিষয় মুখ্যত তিনটি—[১] ভগবতীর লীলা; [২] শক্তিতত্ত্ব; এবং [৩] শক্তিসাধনার তত্ত্ব। ভগবতীর লীলামূলক গান 'আগমনী' ও 'বিজয়া'। এগুলিতে পরমেশ্বরীর মানুষীলীলার কাহিনী বিধৃত। সে কোন্ আদিম যুগে পরাশক্তি ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন—আমি মা মেনকার কন্যা হইয়া হিমরাজগৃহে জন্ম লইব; সেই অঙ্গীকারবশে দক্ষজতনু ত্যাগ করিয়া তিনি হইলেন হিমরাজদুহিতা উমা, মা হইলেন মেনকা। মমতাময়ী

শাক্তসংগীতের বিষয়বস্তু ও রসরূপতা-বিচার

জননী ও কন্যাসন্তানকে আশ্রয় করিয়া যে-মধুমান বাৎসল্যের প্রকাশ ঘটিল, 'আগমনী' ও 'বিজয়া'-অধ্যায়ের গানগুলি সেই রসে আদ্যন্ত অভিষিক্ত। জননীর অগাধ স্নেহ ও বৎসলস্বভাবপ্রসূত উৎকণ্ঠা, পিতার ভালোবাসা আর প্রতিবাসীর নির্মল মমত্ববোধের স্পর্শে অধিকাংশ গান সঞ্জীবিত। স্নেহাতুর মাতৃহৃদয়ের নিপুণ বিশ্লেষণে, পারিবারিক চিত্রের উদ্ঘাটনে, সামাজিক রীতিনীতির উন্মোচনে শাক্তকবির রচিত 'আগমনী' ও 'বিজয়া'-গান বাঙালীর পরম-আস্বাদনীয় সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের চিত্র দেখিয়া কবিগণ জীবন-আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন। এই জীবনরসই শাক্তপদাবলীর সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ। মানুষ এখানে নিজ হৃদয়ের প্রতিবিম্বন দেখিয়া মুগ্ধ হয়।

'আগমনী' ও 'বিজয়া'-সংগীতের ভাবের দুয়ার অতিক্রম করিয়া শক্তিতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্বের রাজ্যে প্রবেশ করিলে কাব্যবোদ্ধা পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে—তত্ত্ব এখানে রসোত্তীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে কী? এখানে স্নেহাতুরা মায়ের ক্রন্দন নাই, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠধ্বনি নাই; আর্ত সন্তানের প্রতি অলক্ষ্যচারিণী মাতার স্নেহানুভবের অভিব্যক্তি আছে কিনা, তাহাতেও সংশয় রহিয়াছে। সাধনার এই উচ্চভূমিতে শক্তীশ্বরী 'উমা'ই জননী, সাধক হইলেন ভক্তদল বা কবিসন্তান। সন্তান কাঁদিয়া সারা হয়, মা সাড়া দেন না, ভাবলোকবিহারিণী হইয়া মূক ও বধিরের মতোই যেন তাঁহার রহস্যময় অবস্থান। সাধনমঞ্চে স্বগত ভাষণের ন্যায় ভক্তের সীমাহীন আর্তি, অশান্ত ক্রন্দন একটি সকরুণ মূর্ছনা সৃষ্টি করে। কিন্তু ব্যাকুল হৃদয়ের আর্তনাদে যে-বাণী স্ফূরিত হয় তাহা শিল্পসংগত কবিতা, না অবিমিশ্র তত্ত্ব?

শাক্তপদাবলী যে তত্ত্বপ্রধান ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। বৈষ্ণবপদকর্তার মতো 'লীলাশুক' হইয়া রাধাকৃষ্ণকুঞ্জলীলাদর্শন ও আস্বাদন অথবা কেবল উপাস্যের নামকীর্তন করা শক্তিসাধকের লক্ষ্য নয়। শাক্ততন্ত্র সাধনশাস্ত্র, বিশেষ প্রণালীতে পূজা, জপ ও যোগসাধন করাই শাক্তের উপাসনা। বাণীবিলাস নয়, সিদ্ধিলাভের জন্য ক্রিয়াই তাহার আচরণীয়। অবশ্য পূজাঅন্তে স্তবস্তুতি আছে। কিন্তু পূজার মন্ত্র, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, ন্যাস, মুদ্রা প্রভৃতির তুলনায় তাহা নিতান্তই গৌণ। ক্রিয়াযোগসারে কবিত্বের স্থান নাই। ভবের আসা পাশা যাঁহাদের খেলিতে হয়, সাধনরূপ গ্রাবুখেলায় যাঁহাদের মন, চতুর্দলে ফাঁদ পাতিয়া তারাপাখী ধরিবার কৌশল শিক্ষা করাই যাঁহাদের কাজ, তাঁহাদের কবিত্ব করিবার অবসর কোথায়? উপরন্তু জীবন যাঁহাদের পিষ্ট, বেগার খাটিয়া, কলুর বলদের মতো পাক খাইয়া, খাজনার দায়ে গারদে আটক থাকিয়া যাঁহাদের অনন্ত যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়,

তত্ত্বপ্রধান হইলেও শাক্তপদাবলী জীবনরসাশ্রিত গীতিকবিতা

সৌন্দর্যবিলসিত কল্পকুঞ্জ তাঁহাদের জন্য নয়। তাঁহারা বিপন্ন, আশ্রয়ভিখারী; মাতৃকৃপাপ্রার্থী—মাতৃক্রোড় ও মাতার চরণ তাঁহাদের শেষ আশ্রয়। কিন্তু এই তত্ত্ব, এই ক্রিয়াযোগ, এই বেদনাখিন্ন জীবনে মাতৃচরণে শরণ লইবার আকৃতির মধ্যেই শাক্তপদাবলীর কবিত্ব। রূঢ় বাস্তবের পটভূমিকা, অতিপরিচিত দৃশ্যাবলীর রূপক, প্রাত্যহিক জীবনের হাসিকান্না—সমস্তকিছু মিলিয়াই তত্ত্বসংবলিত এই ধর্মমূলক কবিতাগুলিকে রসমণ্ডিত করিয়াছে। ক্ষুদ্রায়তন পদগুলিতে কবিব্যক্তির হৃদয়ের উত্তাপ আমরা সর্বক্ষণ অনুভব করি। জননীর উদ্দেশ্যে কাতর সন্তানের আত্মগত ভাষণ, মাতার প্রতি সহস্র অনুযোগ-অভিযোগ, মায়ের উপর অবিচল নির্ভরশীলতা এসব কবিতায় চমৎকার বাণীমূর্তি লাভ করিয়াছে। ভক্তের সকল কথাই যেন অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে উৎসারিত। হৃদয়ের অকৃত্রিম আর্তি নিরলংকার ভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। শাক্তপদাবলীর অন্তর্নিহিত ভাবের আন্তরিকতা ও সহজ সরল প্রকাশভঙ্গি সত্যই চিত্তাকর্ষক। একজন সুধী সমালোচকের মতে: 'Its treatment of the facts of religious experience is not the less appealing, but all the more artistic, because it is so sincere and genuine, because it awakens a sense of conviction in ourselves. The temper is essentially that of a secular lyric.' [ডক্টর সুশীলকুমার দে]

শক্তির সাধক জগতের মূল পরম-কারণকে মাতৃরূপে কল্পনা করিয়াছেন। পুরুষ-কারণ-বাদিগণ যেখানে ইঁহাকে অব্যক্ত, নিরুপাধি, গুণাতীত, অচিন্ত্য ব্রহ্মরূপে কল্পনা করেন, এবং সেই ব্রহ্মকেই সৃষ্টির মূল, স্থিতির ধারক, প্রলয়ের অধিকর্তা বলিয়া জ্ঞান করেন, শক্তিসাধকেরা সেখানে ইঁহাকে জননীরূপে সন্দর্শন করেন। পরাপ্রকৃতিও তাঁহাদের মতে অব্যক্ত অচিন্ত্য। এই অবস্থায় তিনি নাম ও রূপের অতীত, কেবল নিত্য, চিৎস্বরূপা। আবার, এই নির্গুণ পরাপ্রকৃতি হইতেই সগুণাত্মক রূপজগতের সৃষ্টি: 'মহত্তত্ত্বাদিভূতান্তঃ ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ' [মহানির্বাণতন্ত্র]। তাই শাক্তপদাবলীর কবি বলেন:

শক্তিতত্ত্ব

'কে জানে মা তব তত্ত্ব, মহৎ-তত্ত্ব-প্রসবিনী,
মহতে ত্রিগুণ দিয়া নির্গুণা হলে আপনি।
তুমি চিৎ-অভিমুখী কার্যহেতু চিৎ-বিমুখী
চিদানন্দে পিছে রাখি চিন্তানন্দে উন্মাদিনী।'—রসিকচন্দ্র রায়

যিনি নির্বিকার হইয়াও সবিকারে এই রূপজগতের মধ্যে প্রকাশিত হন,

তিনিই আবার জীবদেহের মূলাধারে কুণ্ডলিনীশক্তিরূপে বিরাজ করেন। এই কুণ্ডলিনী সার্ধত্রিবলয়াকৃতি, ইনিই জীবের শ্বাসোচ্ছ্বাস, প্রাণশক্তি। আধার-কমলে ভুজঙ্গিনীর মতো তিনি সুপ্তা রহিয়াছেন। অদ্ভুত তাঁহার দীপ্তি। এই কুণ্ডলিনীই নাদশক্তি, অতি মধুর নাদ তুলিয়া তিনি শরীরযন্ত্রে লীলা করিয়া চলিয়াছেন :

'শরীর শারীরযন্ত্রে সুষুম্নাদি ত্রয়তন্ত্রে
গুণভেদ মহামন্ত্রে তিনগ্রাম-সঞ্চারিনী।'

—মহারাজ নন্দকুমার

নির্গুণ ব্রহ্মময়ী মা সগুণ হইয়া এই বিশ্বসংসারে লীলায় মাতিয়াছেন। সে-যেমন বিচিত্র তেমনি রহস্যসমাবৃত। তিনি কখনো পুরুষ সাজিতেছেন, কখনো প্রকৃতি হইতেছেন; কখনো দনুজদলনীরূপে মহিষমর্দিনী, চামুণ্ডা, বগলারূপে আবির্ভূত হইতেছেন; কখনো ষোড়শী বা ভুবনেশ্বরী-রূপ-ধারণ করিয়া জননীর ন্যায় বিশ্বপালন করিতেছেন; কখনো-বা 'কালভয়হারিণী'-মূর্তিতে ভক্তকে বরাভয় দান করিতেছেন। বিরাট বিশ্বে 'ইচ্ছাময়ী' 'লীলাময়ী' মহামায়ার কত খেলাই না চলিতেছে :

'রেখেছ নিখিল বিশ্ব আনন্দের বাজার সাজায়ে,
আবার আপনি খেল সে-বাজারে পুরুষ-প্রকৃতি হয়ে।...
আপনার মায়ায় আপনি তুমি যাতায়াত কর বারম্বার,
আবার নিজে বুঝ না নিজের মায়া, এমনি তোমার মায়ার বিকার।'

—গোবিন্দ চৌধুরী

এই মহামায়া অবিদ্যারূপে জীবকে মোহগ্রস্ত করিতেছেন 'তিনিই আবার বিদ্যারূপে জীবের মোহবন্ধ ছিন্ন করিতেছেন। আবার, তিনিই পরিতুষ্ট হইয়া জীবকে ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করিতেছেন :

'তয়ৈতৎ মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
সা যাচিতা বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি॥...
অবোধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥' —মার্কণ্ডেয় চণ্ডী

সাধক সাধনার মধ্য দিয়া এই শক্তির স্বরূপ বুঝিতে বা ইঁহাকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করেন। সাধারণ ভক্ত দেবীর বিবিধ মূর্তির পূজা ও ধ্যান করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করেন, মায়ের প্রসাদে ঐহিক ভুক্তি ও পারমার্থিক মুক্তি অর্জন করেন। কেহ কেহ আবার স্বভাবানুযায়ী বামাচারমতে শবসাধন, চিতাসাধন, পঞ্চ-মকার-সাধন করিয়া

সাধনতত্ত্ব

সিদ্ধিলাভে সচেষ্ট হন। আবার, কেহ অতি কঠিন যোগপন্থা-অবলম্বনে দেহস্থ কুণ্ডলিনীশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া ষট্‌চক্রভেদপূর্বক সহস্রারে পরমশিবের সহিত আপনার যোগসাধন করেন। এইগুলিই তান্ত্রিক সাধনা—পশুভাব, বীরভাব বা দিব্যভাবে সাধকগণ এই সাধনা করিয়া থাকেন।

উক্ত ভাবত্রয়ের মধ্যে পশুভাবের সাধনা—বেদাদি আচারক্রমে সংযম, অভ্যাস ও ভগবদ্ভক্তিলাভের সাধনা। নিয়মনিষ্ঠাপূর্বক দেবীর পূজা, নিত্যনৈমিত্তিক কর্মাদি সম্পাদন প্রভৃতি এইরূপ সাধনার অঙ্গ। বীরভাবের সাধনা আরো কঠিন এবং নিহিতার্থব্যঞ্জক। যাঁহারা মহাবলশালী, নির্ভীক, সবলহৃদয় তাঁহারাই এই সাধনার অধিকারী। স্থূল পঞ্চ-ম-কার [মদ্য-মাংস-মৎস্য-মুদ্রা ও মৈথুন] এই সাধনার অন্যতম অঙ্গ। উপযুক্ত অধিকারী ব্যতীত ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কেহ উপলব্ধি করিতে পারেন না। ইহার ফলে তান্ত্রিক-বামাচার-সাধনার প্রকৃত আদর্শ বুঝিতে না পারিয়া অনেকেই উহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকেন। বীরভাবের সাধন-সোপান অতিক্রম করিয়া দিব্যভাবে পৌছিতে হয়। দিব্যভাবের শক্তিসাধনা এক মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত, ইহা দিব্যগুণসম্পন্ন। তন্ত্রেও ইহার ভূয়সী প্রশংসা পরিদৃষ্ট হয়—'অতিসৌন্দর্যং দিব্যভাবম্' [রুদ্রযামল]। ইহাই ভাবত্রয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

শাক্তপদাবলীর কবির সাধনা দিব্যভাবের সাধনা

শাক্তপদাবলীতে যে শক্তিসাধনার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অতিসুন্দর দিব্যভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থূল ইন্দ্রিয়বিক্ষোভকে প্রশমিত করিয়া এক মহান ভাবের রাজ্যে সাধক উপস্থিত হন। এরূপ অবস্থায় সাধক জিতেন্দ্রিয়, বীর্যশালী, সুখেদুঃখে সমজ্ঞানী। তাঁহার চোখে ভেদাভেদ লুপ্ত হইয়া যায়, কাহারো প্রতি হিংসাবিদ্বেষ থাকে না। ধর্মাচরণের গূঢ়রহস্য উন্মোচিত হওয়ায় তিনি যথার্থই বুঝিতে পারেন, জাঁকজমকের পূজা নয়, ধাতু-পাষাণ-মাটির তৈরী প্রতিমার পূজা নয়, ঢাকের বাদ্যে, ডাকের গহনায় সাজাইয়া পূজা নয়—প্রকৃত পূজা নিভৃত হৃদয়ের ব্যাপার—মানসস্নান, মানসধ্যান, মানসপূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা। আনন্দমুদিত সাধকের কণ্ঠে তখন এই উপলব্ধির বাণী উচ্চারিত হয়ঃ

'মন তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে॥
জাঁকজমকে করলে পূজা অহংকার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তারে করবে পূজা জানবে না রে জগৎজনে॥
ধাতু-পাষাণ-মাটির মূর্তি কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা গড়ি বসাও হৃদিপদ্মাসনে।'

শাক্তপদাবলীর অন্তর্নিহিত সাধনতত্ত্বের কথা এই মহান দিব্যভাবের কথা। তাই প্রতি-মুহূর্তে কবি স্মরণ করাইয়া দেন, স্থূল মূর্তি মায়ের স্বরূপ নয়—'ওঙ্কার-মূরতি রে মন জান না কি উহারে ?' এখানে সাধকের দীক্ষা মনোদীক্ষা, সাধকের তীর্থস্নান মনত্রিবেণীর সংগমস্নান, পূজা মানসপূজা। বাহ্যপূজা ও অসংখ্য বিধিনিষেধের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইয়া দিব্যমন্ত্রী তখন মানসিক ধর্মানুভবের রাজ্যে প্রবেশ করেন। দেহই তখন তাঁহার সাধনীয়। তিনি তখন এই সত্যটি অনুভব করিতে থাকেন যে—'ত্রৈলোক্য যানি ভূতানি তানি সর্বাণি দেহতঃ' [শৈবসংহিতা]। শক্তি এই দেহভাণ্ডেই রহিয়াছেন, মানবের পরম সত্য এই দেহের অভ্যন্তরেই বিরাজ করিতেছে। শক্তিলাভ করিতে হইলে বাহিরে ঘুরিয়া মরিতে হইবে না, দেহেই তাহার সন্ধান মিলিবে :

'আপনারে আপনি দেয়, যেও না মন কারো ঘরে,
যা চাবে এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।'

—কমলাকান্ত

দেহকে সাধনীয় জ্ঞান করিয়া শক্তিসাধকগণ এই দেহযন্ত্রটিকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। দেখিয়াছেন, দেহস্থ বহুসংখ্যক নাড়ীর মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না—এই তিনটি নাড়ীই প্রধান। তন্মধ্যে আবার ইড়া-পিঙ্গলার মধ্যবর্তী সুষুম্নাই সাধকজনের প্রধান লক্ষ্য; এই সুষুম্না-নাড়ীতেই দেহের ষট্‌চক্র [মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখ্য ও আজ্ঞা] অবস্থিত। উক্ত ষটচক্রের উপরে ব্রহ্মরন্ধ্রে একটি সহস্রদল পদ্ম অধোমুখী হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই পদ্মেই পরম রমণীয় শিবপুরী। পরম শিব শবাকারে এখানে অবস্থান করিতেছেন। কুণ্ডলিনীশক্তি সার্ধত্রিবলয়াকারে নিদ্রিতাবস্থায় রহিয়াছেন মূলাধারে। এই সুষুপ্তা কুণ্ডলিনীকে উদ্বোধিত করিয়া ষট্‌চক্রের মধ্য দিয়া সহস্রারে পরম-শিবের সহিত যুক্ত করাই কুণ্ডলিনীযোগ। এই যোগক্রিয়াই দিব্যমন্ত্রীর সাধন। এহেন যোগের সিদ্ধিপ্রভাবে জীব প্রকৃতপক্ষে শিবের সহিত মিলিত হন—এ যোগানন্দের তুলনা নাই। তখন জীববুদ্ধি লোপ পায়, এক অনির্বচনীয় আনন্দানুভূতির মধ্যে সমস্ত-কিছু একাকার হইয়া যায়। শিব ও শক্তির মিলনসঞ্জাত এই আনন্দরূপ অমৃতকে শাক্তসাধকগণ বলেন 'সামরস্য', এই সামরস্য-আস্বাদনের অনুভূতি সীমাবদ্ধ ভাষায় প্রকাশের অতীত। সাধক শুধু আভাসে-ইংগিতে ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করেন :

দেহতত্ত্ব ও কুণ্ডলিনীযোগ

মজিল মনভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে।
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হৈল কামাদি কুসুম সকলে॥

চরণ কালো ভ্রমর কালো কালোয় কালো মিশে গেল।
দেখ, সুখদুঃখ সমান হোল আনন্দসাগর উথলে॥

—কমলাকান্ত

শাক্তপদনিচয়ে এই শক্তিতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব অতি সহজ সরল ভাষায়, অতি-পরিচিত দৃশ্যাবলীর রূপকের মাধ্যমে বাণীবদ্ধ হইয়াছে। এখানে উপাস্যা আনন্দময়ী জননী, উপাসক ভক্তসন্তান। লৌকিক বাৎসল্য ও প্রতিবাৎসল্য-রসের মধ্য দিয়া এই উপাসনা দিব্য ভক্তিরসের স্তরে উন্নীত হইয়াছে। শাক্তসাধনা শুষ্ক রসহীন জ্ঞানের সাধনা নয়, ভাবের সাধনা, রসের সাধনা—আনন্দ ইহার সাধ্য, আনন্দই ইহার সিদ্ধি। সকল তত্ত্ব ছাপাইয়া শাক্তপদাবলীর মধ্যে এই আনন্দানুভব গীতময় বাণীমূর্তি লাভ করিয়াছে। ইহাতে ভাব ও যোগের, তত্ত্ব ও রসের যুক্তবেণী রচিত হইয়াছে।

শাক্তপদাবলীর কবিদল

কত কত কবি শাক্তসংগীত রচনা করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রায় শতেক কবি এই গান রচনা করিয়া মায়ের চরণে ভক্তির নৈবেদ্য নিবেদন করিয়াছেন। সাধককবি রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, গোবিন্দ চৌধুরী, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, নন্দকিশোর, কবিওয়ালা হরু ঠাকুর, টপ্পাগায়ক নিধুবাবু, ইত্যাদি অনেকেই শক্তিবিষয়ক গানে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ সিদ্ধ সাধক, কেহ মুমুক্ষু, কেহ বদ্ধজীব, কেহ-বা কেবল কবি। এসকল কবির মধ্যে লোকবিশ্রুত শক্তিসাধক রামপ্রসাদের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখনীয়।

রামপ্রসাদ

তান্ত্রিক সাধনতত্ত্বের মহাভাবকে হৃদয়ের রঙে অনুরঞ্জিত করিয়া রামপ্রসাদই সর্বপ্রথম অতি গোপনীয় শাংকরী বিদ্যাকে ছন্দিত ভাষায় রূপদান করিয়াছেন। যে-তত্ত্ব গুরুমুখী ছিল, সংস্কৃতের জটিল বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, তাহাকে সাহসভরে রামপ্রসাদ বাংলাভাষায় সংগীতে প্রকাশ করিলেন। ভক্ত রামপ্রসাদের কৃতিত্ব এইখানেই। তাই তাঁহাকে বলা হয় 'শাক্তসংগীতের আদি-গঙ্গোত্রী'। পার্থিব লোকজীবনের মান-অভিমান মিশাইয়া, ভক্তিচন্দনের প্রলেপে তিনি যে-সংগীতগুলি রচনা করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই বলিলে অতিশয়োক্তি করা হয় না। মায়ের প্রতি তাঁহার যেমন 'টান', তেমনি জোর। মাকে তিনি সম্পূর্ণ জানিয়াছেন, তাঁহার স্বরূপ ধরিতে পারিয়াছেন। তাই রামপ্রসাদের শক্তি স্বতন্ত্র, ভাগবতী উপলব্ধির প্রকাশভঙ্গি স্বতন্ত্র। চিরাগত

পদ্ধতিতে মাতৃরূপে তিনি বন্দনাধ্যান করেন নাই, ওই রূপের বর্ণনা করেন নাই। জগজ্জননী রূপে ও স্বরূপে তাঁহার অন্তরলোকে যে-ভাবে মূর্তিধারণ করিয়াছেন তাহাকেই নিজস্ব ভাব ও বাণীর মাধ্যমে রূপায়িত করিয়াছেন :

'ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে,
গলিত চিকুর আসব-আবেশে।'

এহেন বিস্ময়াবহ মনোমোহিনী মাতৃমূর্তি মাটি দিয়া নির্মাণ করা সম্ভব নয়,—'মনোময় প্রতিমা' সাধকের মনের সৃষ্টি। তাই তো তিনি বলেন :

'মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে,
মা বেটি কি তেমন মেয়ে, মিছে ঘাটি মাটি নিয়ে।'

রামপ্রসাদের ভক্তিতে, সাধনপন্থায় সর্বত্রই আমরা লক্ষণীয় একটি স্বাতন্ত্র্য দেখিতে পাই। অন্তরঙ্গতা ইহার প্রধান বিশিষ্টতা। মাকে 'বেটি', 'সর্বনাশী' বলিতে তাঁহার মুখে বাধে নাই। কিন্তু যাঁহার উদ্দেশ্যে এই অপভাষণ তাঁহারই নামে কী অসীম আকুলতা :

'এমন দিন কি হবে তারা,
যবে তারা তারা তারা বলে
তারা বেয়ে পড়বে ধারা।'

একান্ত শরণাগতি হইতে রামপ্রসাদের শাক্তসংগীতের জন্ম। তাহার রঙ-ঢঙ একেবারে আলাদা। রামপ্রসাদের বিরচিত গানগুলি তাই 'প্রসাদী সংগীত', 'প্রসাদী সুর' নামেই বিশেষভাবে চিহ্নিত। এগুলি সত্যই শ্যামামায়ের প্রসাদ—মায়ের চরণে প্রদত্ত রক্তজবার মতোই হৃদয়শোণিতে রাঙা, শুনিবামাত্রই চিত্তে মহৎ ভাব ও বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। প্রসাদী সংগীত অনুকরণের অতীত।

রামপ্রসাদের পরেই উল্লেখনীয় কমলাকান্তের নাম। কমলাকান্তও একজন প্রকৃত ভক্তসাধক। ইনি বর্ধমানাধিপতি মহারাজ তেজচন্দ্রের পরম সম্মানিত গুরু—পঞ্চমুণ্ডির আসন করিয়া কঠিন কালীসাধনা করিতেন। কমলাকান্তের শাক্ত-সংগীতে একটি শিল্পীমানসের প্রতিবিম্বন দেখা যায়। তাঁহার রচনা কেবল সংগীত নয়, কবিতাও। শিল্পীসুলভ সংযম, শ্রুতিমধুর শব্দ-নির্বাচনের কৌশল কমলাকান্তের আয়ত্তে। রূপদক্ষের সৌন্দর্যবোধ তাঁহার পদাবলীতে একটা স্বতন্ত্র শিল্পসুষমা সঞ্চারিত করিয়াছে। কী সাধনতত্ত্বের কথায় কী মাতৃমূর্তিবর্ণনায়, কী 'আগমনী'-'বিজয়া'র গানে এই কাব্যকলা লক্ষণীয়। কমলাকান্তের 'মজিল মনভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে' অথবা

কমলাকান্ত

'শুক্‌না তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা ভাঙে পাছে' ইত্যাদি গানগুলি সত্যই অপূর্ব। কমলাকান্তকে শাক্তপদাবলীর 'গোবিন্দদাস' বলা যাইতে পারে।

গোবিন্দ চৌধুরী

সাধক-কবিগণের মধ্যে বগুড়া সেরপুরের গোবিন্দ চৌধুরীর কৃত গানগুলি আর-এক 'শিল্পশোভার সার'। বৈদগ্ধ্যকে কীভাবে কবিত্বে মণ্ডিত করা সম্ভব, এ কৌশলটি চৌধুরী মহাশয়ের বেশ জানা ছিল। আমাদের মনে হয়, গোবিন্দ চৌধুরীর :

'নাই আভরণ এমন কথা মুখে এনো না মা আর,
আমিই শুধু করতে পারি অলংকারের অহংকার।
এ জগৎ বটে মা আমার অলংকার সাজানো থাল,
প্রাতঃ-মধ্য-সায়ংকালে পরিয়ে দেন স্বয়ং কাল।
নিশাকালে বদলে পরায়
তাতে আলো-আঁধার দুইই দেখায়,
বল্‌, মা, ভবে কার বা আছে তেমন অলংকার।'

—শাক্তপদাবলীসাহিত্যের একটি অতি উৎকৃষ্ট পদ। গোবিন্দ চৌধুরীর গানে পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, আন্তরিকতা, অনুভূতির গভীরতা ও দিব্যভাবের দ্যোতনা সুপ্রস্ফুট। জগজ্জননীর 'বিশ্বরূপ' ও 'ওঁকার-মূরতি', প্রকৃতি ও পুরুষরূপে জগদম্বার সাকার ও নিরাকার লীলামাধুরী কবির নয়নসমক্ষে এক অলোকসুন্দর ভক্তিরাজ্যের দ্বার উন্মোচিত করিয়াছে।

মহারাজ মহাতাবচাঁদ

রাজামহারাজের মধ্যে অনেকেই শাক্তসংগীত রচনা করিয়াছেন। সংসার-বিমুখ মহারাজ রামকৃষ্ণ, ইতিহাসখ্যাত মহারাজ নন্দকুমার কয়েকটি সুন্দর শাক্তগানের রচয়িতা। বর্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাবচাঁদ তন্ত্রোক্ত বিভিন্ন মহাবিদ্যার ধ্যান কবিতার আকারে বাংলাভাষায় রূপায়িত করিয়াছেন। অনুবাদকবিতা-হিসাবে এগুলির মূল্য উপেক্ষণীয় নয়। মহাতাবচাঁদ কমলাকান্তের সংগীতাবলীর সংগ্রহগ্রন্থ মুদ্রিত করাইয়াছিলেন।

আরো কয়েকজন শাক্ত-সংগীতরচয়িতা

লোকসংগীতের পরিবেশকবৃন্দের মধ্যে রামবসু, দাশরথী রায়, রসিক রায়, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, কালী মির্জা ইত্যাদির শাক্তসংগীত উল্লেখযোগ্য। আবার, কবিওয়ালাদের মধ্যে কেহ কেহ কেবল 'আগমনী' ও 'বিজয়া'র গান রচনা করিয়াছেন। লীলার রাজ্য অতিক্রম করিয়া যোগের রাজ্যে উত্তীর্ণ হইবার কোনো প্রয়াস তাঁহারা পান নাই। তাঁহাদের অঙ্কিত পরিবারকেন্দ্রিক ক্ষুদ্রছোট চিত্রগুলি অনেকস্থলেই মনোজ্ঞ। এ সকল সংগীতকারের রচনায় গৃহস্থঘরের

আনন্দবেদনামিশ্রিত কলধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। দাশুরায়ের গানে মুমুক্ষু জীবের দীনতার গ্লানিরই প্রকাশ-আধিক্য ফুটিয়াছে :

'দোষ কারো নয় গো, মা,
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা'...

—গানটির মধ্যে আত্মধিক্কার ও শরণাগতির সুরটি অতিশয় স্পষ্ট।

শাক্তসংগীতের লক্ষণীয় বিশেষত্ব এই যে, এগুলির মধ্যে একটা সার্বজনীনতার ভাব বিদ্যমান। 'জননী' এ সকল গানের প্রধান অবলম্বন হওয়ায় এখানে বৈচিত্র্য-সৃষ্টির প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। শাক্তের কথিত 'জননী' কেবল জগজ্জননী নহেন, তিনি দেশমাতৃকাও হইতে পারেন। এই কারণে শাক্ত-সংগীতের সাধারণ পটভূমিকায় এদেশে স্বদেশীসংগীত, নারীজাতির জাগরণসংগীতও রচিত হইয়াছে। অশ্বিনীকুমার দত্ত, চারণকবি মুকুন্দদাস দেশপ্রেমমূলক শাক্তগান রচনা করিয়াছেন। মুকুন্দদাসের নিম্নোদ্ধৃত গানটি সর্বজনপরিচিত :

চারণকবি মুকুন্দদাস

'জাগো গো জাগো গো জননী,
তুই না জাগিলে শ্যামা, কেউ জাগিবে না গো,
তুই না নাচালে শ্যামা, নাচিবে না ধমনী।'

বৈষ্ণবপদাবলীর মতো শাক্তপদাবলীও বাংলাসাহিত্যের অতি মূল্যবান সম্পদ। উভয় শ্রেণীর পদাবলীই প্রচুর রচিত হইয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণবগানগুলির সংগ্রহ ও প্রচারের যতখানি চেষ্টা হইয়াছে, শাক্তসংগীতের ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ে ততখানি চেষ্টা হয় নাই। বাংলার গ্রামে গ্রামে বহু শাক্তসাধক ছিলেন, তাঁহারা অজস্র গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সংরক্ষণ-উদ্যমের অভাবে সেগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে সরিয়া যাইতেছে। ইহা আমাদের পক্ষে খুব গৌরবের কথা নহে, এ ক্ষতির পরিমাণও সামান্য নয়। সত্যকার সাহিত্যসেবীদের কর্তব্য, এগুলিকে যথাসাধ্য উদ্ধার করা। 'শক্তি'-র প্রসাদকে উপেক্ষা করিলে আমাদের অধ্যাত্মজীবন ও সাহিত্যজীবন অবশ্যই দুর্বল হইয়া পড়িবে। *

উপসংহার

[* অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর লিখিত।]

শ্যামাসংগীত ও রামপ্রসাদ

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** কীর্তন ও শ্যামাসংগীতের অমর প্রভাব—সাম্প্রতিক কালে পট-পরিবর্তন—কীর্তন-বাউল-শ্যামাসংগীত ইত্যাদিতে বাঙালীপ্রাণের পরিচয়---শ্যামাসংগীত ও তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ—সাহিত্যালোচনায় অতীত ও বর্তমান উভয়েই স্মর্তব্য—রামপ্রসাদের আবির্ভাবের পটভূমিবিচার—রামপ্রসাদের মাতৃভাবুকতা—ভক্তিপথের পথিক রামপ্রসাদ—নতুন ভক্তিমার্গে রামপ্রসাদের বিচরণের হেতু—শ্যামাসংগীতের ব্যাপক স্বীকৃতর একটি কারণ—রামপ্রসাদের অনুবর্তী শাক্তকবি—রামপ্রসাদ ও চণ্ডীদাস শ্যামাসংগীতের কাব্যোৎকর্ষ কতখানি—প্রসাদী সংগীতের রূপ ও ভঙ্গি—রামপ্রসাদের কাব্যকলা—উপসংহার।]

এককালে কীর্তনে ও শ্যামাসংগীতে বাঙালীর মনের ঐশ্বর্য শতধারায় উৎসারিত হয়েছিল। সেকাল থেকে আমরা বর্তমানে একালে এসে পড়েছি। এখন মোটামুটি রবীন্দ্রকাব্য ও রবীন্দ্রসংগীতের যুগ চলছে। নিসর্গপ্রেরণা থেকে এক অভিনব ভাবুকতায় বাঙালীর রসতৃষ্ণা চরিতার্থ হচ্ছে। কিন্তু ভুল বলা হল যেন।

কীর্তন ও শ্যামাসংগীতের অমর প্রভাব

রবীন্দ্রনাথ শহরবাসী ও শিক্ষিত বাঙালীর চিত্ত বিহ্বল করেছেন—গ্রামবাংলায় অনবদ্য রবীন্দ্রকাব্য অদ্যাবধি অপরিচিত। সেখানে এখনো চণ্ডীদাস-রামপ্রসাদ, দাশরথি-নীলকণ্ঠ ভগ্নকণ্ঠে ক্ষীণস্বরে একতারা নিয়ে গান করছেন। উচ্চতর সাহিত্যের রসধারায় বঞ্চিত গ্রামীণ বাংলার দুরবস্থা শোচনীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু খুব প্রাচীন কালের কথা নয়, দু'শতাব্দীর কিছু আগেও তার অন্তরের শ্রীহীনতা ছিল না। ভগ্নসমাজ হৃতস্বাস্থ্য পল্লীবাংলার জন্যে অনেকেই আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন।

আবার, খুব সম্প্রতি পট পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে। ভারতীয় জীবনের সঙ্গে বাঙালীর জীবনেও এক অভিনব চঞ্চলতা দেখা দিয়েছে। সংস্কৃতিতে না হোক, জীবনে আমরা বোধ হয় অবস্থান্তরে উত্তীর্ণ হতে চলেছি। আজ গ্রামের

সাম্প্রতিক কালে পটপরিবর্তন

পাশ দিয়ে বাঁধানো সড়ক শহরে চলে যাচ্ছে। লড়ি ছুটছে, বাস গর্জন করে চলেছে ধুলো উড়িয়ে; পাশেই নদীর বুকের ওপর কংক্রীটের বাঁধ ও প্রকাণ্ড সেতু বিস্ময় জাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; কোথাও নীরবতার মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করছে সিমেন্ট-ইস্পাত-চিনির কারখানা, ধান-গম-ভাঙা কল। পল্লীবাসী যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে, ভোট নিয়ে বচসা করছে, উৎসব মনে করে রবীন্দ্রজন্ম-অনুষ্ঠানে

যোগ দিচ্ছে, শিশুদের পাঠাচ্ছে বিদ্যালয়ে। পাড়াগাঁ এখন আর পূর্বেকার সেই সংস্কার-সংশয়-ভয়ে আচ্ছন্ন থাকছে না, অথচ শহরের জীবনের কাল্‌চারের ছোঁয়াচ লাগেনি—এমন এক অস্থির অবস্থার মধ্যে নতুন জীবনে সে পদক্ষেপ করতে আরম্ভ করেছে। অবশ্য শহরজীবন থেকে গ্রামজীবনে রূপান্তরের কাজ আঠার শতকের শেষ থেকেই শুরু হয়েছে, গ্রামীণ মানুষের পরিবর্তন হয়েছে ধীরে ধীরে। পরিশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অঙ্গারধূলিতে মসীলিপ্ত হয়েছে পল্লীবাসীর মন, মানুষ চিন্তাক্লিষ্ট হয়েছে, সারল্য হারিয়েছে। তাদের উদার সামাজিকতাবোধ লোপ পেয়েছে। তারপর এসেছে শরণাগতের ভিড়, তারপর সাম্প্রতিক দ্রুত-পরিবর্তন। এ পরিবর্তনের স্থায়ী ফল কীরূপ দাঁড়াবে তা আজ বলবার উপায় নেই। কিন্তু বিগত যুগ এবং সাম্প্রতিক পরিবর্তনের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রাচীন সাহিত্যসম্পদের জন্য অশ্রুপাত করতেই হয়।

অধুনাপূর্ব সাংগীতিকদের লোকপ্রিয়তা বিস্ময়কর। বাংলার সমাজজীবনের প্রায় সর্বস্তরেই কীর্তন-বাউল-শ্যামাসংগীতের প্রবেশাধিকার ও অনুশীলন ছিল। সুতরাং স্বীকার করতেই হয় যে, এই শ্রেণীর সংগীতের মধ্যে বাঙালীর বিশিষ্ট আশা ও আক্ষেপের দিকটি রূপায়িত হয়ে উঠেছিল; এবং বাঙালিত্ব বলে যদি কিছু থাকে, ওই শ্রেণীর রচনার মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। এমনো বলা অসঙ্গত হবে না যে, বাঙালীর জাতীয়তার সংস্কৃতিগত মূল উপাদান-গুলি প্রাচীন সাহিত্য ও সংগীতই বহন করে আসছে। ঈশ্বরগুপ্ত সম্বন্ধে আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর মানসপ্রকৃতির স্বাতন্ত্র্যের কথা উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিম একালের আধুনিক সাহিত্যে সেকালের প্রকৃতির পরিবর্তনও লক্ষ্য করতে ভোলেননি। এবং পাশ্চাত্ত্য সংস্পর্শজাত রূপান্তরের অমোঘতা ও কুশলতা লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছেন যে, প্রাচীনভাবের কবির প্রয়োজনও অধুনা লুপ্ত হয়ে পড়েছে। আধুনিকতার অগ্রদূতদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান সাহিত্যিকের এই মন্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধি করেও একথা অনায়াসে বলা যায় যে, একমাত্র সাম্প্রতিক কবিগোষ্ঠির কথা বাদ দিয়ে কাব্যে আধুনিকতার ধুরন্ধর রবীন্দ্রনাথের রচনাও প্রাচীন-বাঙালিত্ব-বর্জিত নয়। বরঞ্চ প্রাচীন বাংলার মানবিকতা ও অরূপসাধনার সঙ্গে উনিশ শতকের জীবনবিপ্লবের সমন্বয়স্থাপনের জন্যেই রবীন্দ্রকাব্য কালজয়ী হয়ে বেঁচে থাকবে। স্বরূপে নয়—দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনচিহ্নবহনেই রবীন্দ্রকাব্য আধুনিক এবং ঠিক এই কারণে তা অশিক্ষিত গ্রামবাসীর অবোধ্য। নতুবা সত্যেন্দ্রনাথের উল্লিখিত—'যে-ভাব উঠে প্রাণের মাঝে, তোমার গানে

কীর্তন-বাউল-শ্যামাসংগীত ইত্যাদিতে বাঙালীপ্রাণের পরিচয়

সে-ভাব আছে'—এর চেয়ে সার্থক প্রশস্তি রবীন্দ্রনাথের আর হতে পারে না। সম্প্রতি বাংলার হারানো প্রাচীন সম্পদগুলিকে পল্লীগাথা, লোকসংগীত ইত্যাদি নাম দিয়ে স্মরণ করার ফ্যাসান এসেছে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত 'সাংস্কৃতিক' বিশেষণযুক্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। একদিকে দেশীয় কাব্যধারার সঙ্গে সম্পর্কহীন সাম্প্রতিক কবিতার 'অয়মহং ভো'-ধ্বনি, অন্যদিকে প্রাচীন-অনুরাগীদের পুরাতনের অনুবৃত্তির নিষ্ফল প্রয়াস—এরই মধ্যে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর কলানুরাগের পরীক্ষা চলছে।

শ্যামাসংগীতগুলির আলোচনার সময় এই ধরণের রচনার প্রারম্ভকালের সামাজিক মনোবিপর্যয়ের কথা চিন্তা করতে হবে, এবং সেই সঙ্গে আমাদের মনোধর্মের স্বাতন্ত্র্যের দিকটির বিবেচনা করতে হবে। শ্যামাসংগীতে ভীত ও বিপর্যস্ত বাঙালীর আশ্রয় অবলম্বনের ইতিহাস রয়েছে। আঠার শতকে মোগলশাসনের অবসানকালে ভূমিব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল, সাধারণ প্রজারা মোগলরাজত্বের প্রারম্ভিক সময়ের মতোই হৃতসর্বস্ব ও নিঃস্ব হয়ে পড়ল, পক্ষান্তরে ভূম্যধিকারী ও তালুকদারেরা সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন। এমন অবস্থায় দুর্বিপাকগ্রস্ত মানুষের চিত্তে আপদনিবারিণী শক্তির প্রতি করুণাভয়চকিত আবেদনের প্রেরণা জাগা স্বাভাবিক। স্বর্গত আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে শ্যামাসংগীত রচনার এইরকম ইতিবৃত্তই লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে একটু বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিরও অবকাশ আছে।

শ্যামাসংগীত ও তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ

শ্যামাসংগীতের প্রেরণা ঠিক ভয় থেকে উৎপন্ন হয়নি। এর পিছনে ভক্তহৃদয়ের অকপট অনুরাগ বা অহৈতুক প্রীতির পরিচয়ও পরিস্ফুট। ভয়মিশ্রা ভক্তির লক্ষণ শ্যামাসংগীতে নেই, আছে পূর্বেকার মঙ্গলকাব্যগুলিতে। ওই মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভবের পশ্চাতে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক উপদ্রবের ভূমিকা স্পষ্টত উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু, যেহেতু আঠার শতকেও আর্থনীতিক ও সামাজিক অনিশ্চয়তা প্রকট হয়ে উঠেছিল, সেহেতু তাকেই প্রীতিরসসিক্ত শ্যামাবিষয়ক পদাবলী রচনার একমাত্র কারণ বললে ভুল করা হবে। অবশ্য শ্যামাসংগীতের প্রবর্তক রামপ্রসাদের রচনায় দুঃখবোধের ছায়া বিদ্যমান। 'আমি কি দুঃখেরে ডরাই', 'মা গো তারা, ও শংকরী' প্রভৃতি কয়েকটি পদে প্রত্যক্ষভাবে ও ব্যঞ্জনায় জীবনধারণের দুঃখের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু যে-কবি অনায়াসেই বলতে পারেন 'চাকি কেবল ফাঁকিমাত্র শ্যামা-মা মোর হেমের ঘড়া' এবং মাতার বাৎসল্যের জন্য কাতর কণ্ঠে আক্ষেপ করতে পারেন, তাঁর বাস্তব-দুঃখ-সচেতনতা কতকটা সংশয়ের বিষয়।

বস্তুত শ্যামাসংগীতের দুঃখ আধ্যাত্মিক—সর্ববিধ প্রাপ্তির মধ্যেও যে অপ্রাপ্তিজনিত বেদনা সর্বদা মনকে বিক্ষুব্ধ করে, তা-ই।

সাহিত্যালোচনায় অতীত ও বর্তমান উভয়েই স্মর্তব্য

সাহিত্যালোচনায় অনেক সময় আমরা এককোটিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উঠি এবং সাহিত্যবস্তুর প্রকৃতি ও প্রেরণা সম্পর্কে যৌক্তিক ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করতে চাই না। বিশেষত একালে যুগচেতনার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে গিয়ে, যুগোত্তীর্ণ জাতীয় ভাবধারার অনুবর্তনের পরিমাপ করতে ভুলে যাই। এই কারণে আমরা কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে পশ্চিমা ভাবের প্রতিনিধি বলে মনে করি এবং তাঁর পিতার ধর্মভাবুকতার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করি। অথচ রবীন্দ্রনাথ যে অতীন্দ্রিয় ভাবপ্রবণ প্রাচীন বাঙালীর বা ভারতীয়ের পরিবর্তিত আধুনিক প্রতিকৃতি অর্থাৎ উনিশ শতকের পাশ্চাত্ত্য-উদ্বোধিত জীবনবোধের সঙ্গে পূর্বপ্রচলিত অরূপভাবুকতার সমন্বয়সাধকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, একথা অনুধাবন করতে পারি না। মোট কথা এই সত্যে বিশ্বাস করতে হবে যে, বাস্তব দেশ ও কালের সঙ্গে কবিমানসের যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, তেমনি অতীতের সঙ্গেও, এবং এ দুয়ের কোনোটিই কারো চেয়ে কম প্রভাবশালী নয়।

রামপ্রসাদের আবির্ভাবের পটভূমিবিচার

রামপ্রসাদের আবির্ভাব ও প্রকাশ সম্পর্কে এই মন্তব্যের যথাতথ্য অবশ্য-স্বীকার্য হয়ে পড়ে। রামপ্রসাদ কেবল অষ্টাদশ শতকের ক্ষয়িত সমাজসাম্যের প্রতিরূপ নন, তিনি জয়দেব থেকে সমারব্ধ এবং শ্রীচৈতন্যে সম্পূর্ণ বাংলার ভাব-সংস্কৃতির তৎকালীন ধারক ও প্রসারকও বটেন। রাগাশ্রিত বৈষ্ণবভক্তি অপদেবতাভীতি-প্রভাবিত বাংলা দেশে বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল এবং আখ্যায়িকা-কাব্যের স্থানে গীতিকবিতাকেই রসভাবুকতার শ্রেষ্ঠ বাহনরূপে অঙ্গীকার করেছিল। বস্তুত রামানুজ ও রামানন্দ-প্রবর্তিত সাকার উপাসনারীতি এবং মর্মমুখী সুফিধর্ম ভারতীয় জনমানসে যে-স্থায়ী নতুনের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল তা মোটামুটি সমস্ত ভারতীয় সাহিত্যেরই দিকপরিবর্তন সূচিত করে এবং ভাষাকাব্য ও দেশী সংগীতের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। বাংলায় জয়দেব থেকে এই দেশীয়তার প্রবল প্রারম্ভ এবং নানা আকারে তা আজো চলেছে। উপাস্য দেবতাকে প্রণয়াস্পদরূপে কল্পনা করা এবং তদনুযায়ী তার সঙ্গে প্রেমসম্পর্ক স্থাপন করা—এ মনোভাব যেমন দেবতাকে তেমনি কাব্যকে মানবঅভিমুখী করে তুলেছিল। ফলত দেশব্যাপী আত্মভাবুকতার সাড়াও জেগেছিল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে রাগমার্গে বা আত্মপ্রীতিরসে সহজে ঈশ্বর-আরাধনার ভিত্তি স্থাপিত হওয়াতে যেমন ধর্মে অহৈতুক ভক্তিই ঈশ্বরদর্শনের

উদ্দেশ্য ও উপায়রূপে স্থিরীকৃত হল, তেমনি বাইরের দিক থেকে সাহিত্যেও কলাকৈবল্য প্রতিষ্ঠিত হল। ধর্মের সঙ্গে প্রেমের, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক-কল্পনাতেই বৈষ্ণবকাব্য অভ্যন্তরে ধর্মীয় সাহিত্য অথচ বাহিরে মানবীয় প্রেমকাব্য-রূপে শ্রেষ্ঠ স্থানলাভ করেছে। বস্তুত বৈষ্ণবপদাবলীতে যেমন যুগচিন্তা অতিক্রম করে অতিব্যাপক মানবীয় হৃদয়ভাবের আলোড়ন প্রকাশ পেয়েছে, শ্যামাসংগীতেও তাই। বৈষ্ণবসংগীতের বিশ্বজনীন আর্তি শ্যামাসংগীতেও অনায়াসে সংক্রমিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের দিকে এই ভাবপ্লাবন অবস্থাগতিকে মন্দীভূত হয়ে পড়েছিল। ভিন্ন আধারে এর পুনরুজ্জীবন ঘটালেন রামপ্রসাদ।

বৈষ্ণবীয় বাৎসল্যরসের দিকটি রামপ্রসাদের কল্পনায় বিপরীতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। রামপ্রসাদের পুত্র মাতার স্নেহলাভের জন্য অভিমানে-রোষে ক্ষুব্ধ-আক্ষেপে তার বাসগৃহ মুখর করে তুলেছে। রামপ্রসাদের এই বিপরীত বাৎসল্যকে কেউ কেউ দিব্যরস আখ্যায় অভিহিত করতে চান। কিন্তু নামে কোনো প্রয়োজন নেই, একে বিশিষ্ট মাতৃভাবুকতা বলে মনে রাখলেই চলবে। শ্যামাবিষয়ক পদাবলীর মুগ্ধ কোনো কোনো আধুনিক আলোচক এই মাতৃভাবুকতার পশ্চাতে বাঙালী পরিবারের মাতৃস্নেহ ও মাতৃভক্তির আলোক লক্ষ্য করেছেন। সে যাই হোক, ভক্তিই যে শ্যামাসংগীতের মূল উৎস এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। শ্যামা-সংগীতের প্রবর্তয়িতা রামপ্রসাদের বহু পদেই শ্যামাকে লাভ করার উপায় সম্বন্ধে ভক্তিভাবের উপর জোর দিয়ে কথা বলা হয়েছে। যেমন, একটি পদে তিনি শুষ্ক জ্ঞানীদের তিরস্কার করে বলছেন ঃ

রামপ্রসাদের মাতৃভাবুকতা

মন কি কর তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধরতে পারে॥

আর-একটি পদে তিনি বৈষ্ণবসাধকের মতোই মোক্ষবাঞ্ছা ও ধর্মাধর্মের বিচার পরিত্যাগ করে শ্যামাকেই সর্বস্বরূপে গ্রহণ করেছেন ঃ

প্রসাদ বলে ভুক্তি মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি।
আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি॥

একটি পদে স্পষ্টভাবেই তিনি বলছেন ঃ 'সাকারে সাযুজ্য হবে নির্গুণে কী গুণ বল না ?'

রামপ্রসাদ ভক্তিপথের একজন শ্রেষ্ঠ পথিক এবং ভক্তিধর্মের নবজন্মদাতা।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগ থেকেই বৈষ্ণবধর্ম সিদ্ধান্তসম্বল হয়ে পড়েছিল এবং বৈষ্ণব-পদাবলীসংগীত তার পূর্বেকার সাবলীলতা হারিয়ে ফেলেছিল। রামপ্রসাদ ধারাবাহিক রাধাকৃষ্ণলীলা পরিত্যাগ করে প্রত্যক্ষ ঈশ্বরোপাসনারীতি প্রবর্তিত করলেন এ বং বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমত থেকে ভিন্নপথে বিচরণ করে যেন মুক্ত ভাবধর্মেরই পুনরুজ্জীবন ঘটালেন। তাঁর এই অভিনব পদ্ধতি বাহ্যত বৈষ্ণবাচারবিরোধী হয়েও অভ্যন্তরে ভক্তিমতের সঙ্গে অভিন্ন ছিল। প্রসাদের কয়েকটি গানে শ্যাম ও শ্যামার অভেদ সম্পর্কে জোর দিয়ে বলা হয়েছে। তিনি একটি পদে বলছেন : 'কালী-কৃষ্ণ-শিব-রাম সকল আমার এলোকেশী।' শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে প্রচলিত তৎ-কালীন বিভিন্ন উপাসনাপদ্ধতির সমন্বয়ও রামপ্রসাদের প্রতিভার একটি বিশেষ দান। বহুভধর্মমতে বিভক্ত বাংলাদেশে রামপ্রসাদের সমন্বয়াত্মক ভাবাকুল বলিষ্ঠ বাণী তৎকালে মানুষকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করেছিল। উনিশ শতকের শেষভাগে ধর্মজগতে শ্রীরামকৃষ্ণ যা করতে চেষ্টিত হয়েছিলেন তার ভূমিকা রামপ্রসাদের সংগীতের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবল ভক্তিবাদী ও সমন্বয়বাদী ছিলেন এবং তাঁর ধর্মকথার মধ্যে রামপ্রসাদের পদাবলীব্যাখ্যান একটি বিশেষ অংশ অধিকার করে রয়েছে।

ভক্তিপথের পথিক রামপ্রসাদ

প্রশ্ন হতে পারে, রামপ্রসাদ ভক্তিভাবুকতার যে-নবজন্ম দিয়েছিলেন, তাতে তিনি রাধাকৃষ্ণলীলার ধারা পরিত্যাগ করলেন কেন? এর উত্তর সহজ। শক্তিসাধনার এবং তন্ত্রমতে সাধনার একটি ধারা বাংলাদেশে বৈষ্ণবভাবুকতার আরম্ভের পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল—যার বিরুদ্ধে বৈষ্ণবধর্মের প্রবল বিদ্রোহ। চর্যাপদের সহজ-সাধকদের কথাই ধরা যাক, অথবা নাথপন্থী যোগিদের কথাই ধরা যাক, এরা সকলেই অল্প-বিস্তর তন্ত্রমতপ্রভাবিত। মঙ্গলকাব্যগুলির মূলে যে-ধর্মীয় সাধনা বিদ্যমান ছিল তারও কিছু-পরিমাণে তন্ত্রাশ্রিত হওয়া আশ্চর্য নয়। অবনত বৌদ্ধযুগের তারা, মামকা, লোচনা প্রভৃতি দেবতার, তন্ত্রমতের শাঁখিনী, হাকিনী, ডামরী প্রভৃতি শক্তিসঙ্গিনীদের, এবং অদ্যাপি জীবিত পল্লীবাংলার বৃক্ষতলাশ্রিত জিনাসিনী, রংকিনী, মাদানা, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি অপদেবতার কথা অনেকেই হয়তো জানেন। তন্ত্রমতে শক্তিসাধনার একটি বড়ো সম্প্রদায় বরেন্দ্র, কামরূপ ও বঙ্গে বিদ্যমান ছিল। মঙ্গলদেবতার পূজা যখন বেশ প্রচলিত হয়ে পড়েছিল তখন লৌকিক [অনার্য] ও পৌরাণিক সম্মিলিত রীতি এদেশে বিস্তৃতিলাভ করেছিল। বৈষ্ণবীয় ভাবপ্লাবনে কিছুকালের জন্য সব একাকার হয়ে পড়লেও,

নতুন ভক্তিমার্গে রামপ্রসাদের বিচরণের হেতু

বেগ মন্দীভূত হলে কালিকা বা শ্যামারূপে শক্তি-আরাধনা পুনঃ আত্মপ্রকাশ করল। এই সময়কার রচনা হল কালিকামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল এবং রামপ্রসাদ প্রমুখ বহু শ্যামাসংগীত-রচয়িতার পদ। কিন্তু একালে শক্তিপূজায় তো পূর্বেকার লৌকিক, তান্ত্রিক ও পৌরাণিক রীতি অবিকৃতভাবে অনুসৃত হতে পারে না। কারণ, বৈষ্ণবীয় রাগাত্মিকা ভক্তি ইতোমধ্যে সমস্ত ধর্মসাধনাকেই অল্পবিস্তর ভাবাত্মক করে তুলেছে। শ্যামাসংগীত প্রধানভাবে এই ভক্তির আশ্রয়েই পুষ্ট হয়েছে। কিন্তু যেহেতু পূর্বতন ভক্তিসাধনা বৈরাগ্যভাবমিশ্রিত যোগাচার এবং তন্ত্রমতের উপরেই গড়ে উঠেছিল, সেইহেতু শ্যামাসংগীত-রচয়িতাদের ধারণায় বিবেক-বৈরাগ্য, যোগারোহণ, ষট্‌চক্র, কুলকুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ প্রভৃতি বিষয় ভক্তিবাদের সঙ্গে একাধারে স্থান লাভ করেছে। বৈষ্ণবপদাবলী থেকে শাক্ত-পদাবলীর এইখানে পার্থক্য, এবং এই বিভিন্ন সাধনপন্থার সমন্বয়ের রীতিটি শাক্তপদাবলীর বিশিষ্ট লক্ষণ। রামপ্রসাদের :

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুমূলে চারি ফল কুড়ায়ে খাবি।
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি জায়া নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।

অথবা,

ডুব দে রে মন কালী বলে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে॥

অথবা,

কালী কালী বল্ রসনা রে।
ষট্‌চক্ররথমধ্যে শ্যামা মা মোর বিরাজ করে॥

ইত্যাদি পদে যেমন তীর্থগমন, শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি নিন্দিত হয়েছে, তেমনি নামমাহাত্ম্যপ্রচার ও অনুরাগ-কীর্তনের সঙ্গে যোগমার্গ অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে নানা ধর্মমতের সমন্বয় এবং উপাস্য-উপাসকের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের উপর জোর দেওয়ার ফলে শ্যামাসংগীত বাংলাদেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে।

শ্যামাসংগীতের ব্যাপক স্বীকৃতির একটি কারণ

শ্যামাসংগীতের ব্যাপক স্বীকৃতির আর-একটি কারণ হল রামপ্রসাদী সুর। অবশ্য রামপ্রসাদের বিরচিত সব শ্যামাসংগীতেই এই সুর প্রযুক্ত হয়নি ; আর, রাম-প্রসাদের পরবর্তী অন্যান্য কবিদের রচনাতেও এই সুর কোথাও কোথাও প্রযুক্ত হলেও তেমন সার্থক হয়নি। রামপ্রসাদের অনেক গান রয়েছে যা রাগসংগীতের নানা সুরে বাঁধা। কিন্তু তাঁর জনপ্রিয় অনুরাগময় গীতগুলি প্রসাদী সুরেই রচিত।

প্রসাদ এই নতুন সুর কী ভাবে সৃজন করলেন তা বলা সহজ নয়। মনে হয়, রাগসংগীতে নিপুণ রামপ্রসাদ রাগানুগ ভজনসংগীতের কোনো একটি সুরবৈচিত্র্য গ্রহণ করে দেশীয় কাব্যাঙ্গ সংগীতের সঙ্গে তার মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। কীর্তন-সংগীতের মূলেও এরকম মিশ্রণ থাকা বিচিত্র নয়। সম্প্রতি আবার কীর্তনকে কতকটা রাগসংগীতের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। যাই হোক, ভজন-সংগীতের মতো রামপ্রসাদীতেও ভাব ও সুরের 'সাহিত্য' বা পরস্পর-প্রতিস্পর্ধী একান্ত মিলন এই সুরকে অমরত্ব দিয়েছে।

রামপ্রসাদের অনুবর্তী শাক্তকার

সাধক-কবি রামপ্রসাদের শ্যামাসংগীতের ধারা অনুসরণ করেছিলেন কমলাকান্ত, দাশরথি, নরচন্দ্র রায়, ফকিরচাঁদ, নবাই ময়রা, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, মহতবচাঁদ প্রভৃতি। এঁদের প্রত্যেকের রচনায় কিছু-না-কিছু নিজস্বতা আছে, বিশেষত কমলাকান্তের ভাবের প্রগাঢ়তা ও রচনাভঙ্গির সৌষ্ঠব লক্ষণীয়। কিন্তু এঁরা কেউ রামপ্রসাদের মতো জনপ্রিয়তার অধিকারী নন। রামপ্রসাদের মতো এঁদের গীতরচনাও অত বিচিত্র ও ব্যাপক নয়। রামপ্রসাদ মাতৃভাবব্যাকুলতাকে এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ দিয়েছেন এবং এর মধ্যে এত সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন যে, তাঁর প্রতিভা অন্য-সকলকে ছাড়িয়ে বহুদূরে চলে গেছে। রামপ্রসাদ-কমলাকান্তের পর শ্যামাসংগীত উদার অনুরাগের পন্থা ত্যাগ করে তত্ত্বমূলক ও কৃত্রিম হয়ে পড়ে। এই সময় লৌকিক প্রণয়সংগীত [টপ্পা] এবং কবিগান, আখড়াই ও ঢপকীর্তনে কলকাতাঅঞ্চল মেতে ওঠে।

রামপ্রসাদ ও চণ্ডীদাস

রামপ্রসাদের সঙ্গে কেউ কেউ চণ্ডীদাসের তুলনা করেছেন। এর মধ্যে আংশিক সত্য আছে। চণ্ডীদাসের সারল্যের সঙ্গে ব্যাকুলতার সংমিশ্রণ রামপ্রসাদেও লক্ষ্য করা যায়, এবং হয়তো বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রথমকবি না হলেও চণ্ডীদাসকে প্রারম্ভের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলা যায়। কিন্তু চণ্ডীদাসকে বাদ দিয়েও বিভিন্ন দিকে বৈষ্ণবসাহিত্যে কয়েকজন প্রথমশ্রেণীর কবি রয়েছেন, অথচ রামপ্রসাদকে বাদ দিলে শাক্তপদাবলীর বিশেষ কিছুই থাকে না।

শ্যামাসংগীতে তথা প্রাচীন অন্যান্য ধর্মীয় সংগীতগুলিতে অধ্যাত্মভাবুকতা রয়েছে বলে কাব্য নেই, এমন অপবাদ কেউ কেউ দিয়ে থাকেন। বিশেষত অর্বাচীন কোনো কোনো সম্প্রদায়ের অভিমতে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব সম্পর্কেই সংশয় দেখানো হয়েছে—প্রাচীন সাহিত্যের তো কথাই নেই। কিন্তু বিচার করে দেখলে মানুষের অধ্যাত্মভাবনা—সর্ববিধ পার্থিব প্রাপ্তির মধ্যেও

অপ্রাপ্তির বেদনা—যদি একটি স্থায়ী মনোভাব বলে পরিগণিত হয় [দ্বাদশ শতক থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত দীর্ঘ সাতশ' বছরের রচনায় যার প্রমাণ], তাহলে শ্যামাসংগীতে পরিব্যক্ত আর্তির সার্বজনীনতা সম্পর্কে তর্ক করা উচিত হবে না। যেমন, একটি পদে রয়েছে : 'আমার আসার আশা ভবে আসা আশা মাত্র হোলো'—এটি বিড়ম্বিতজীবন হতভাগ্যের দীর্ঘশ্বাস বলে একান্ত সহজেই আমাদের চিত্ত অধিকার করে বসে। কার্যকারণের মধ্যে মানুষ যখন নিজের দুর্বিপাকের সূত্র খুঁজে পায় না, তখন ঠিক নিম্নে বর্ণিত ভাষাতেই সে তার কাতরতা ব্যক্ত করতে চায় :

শ্যামাসংগীতের কাব্যোৎকর্ষ কতখানি

কে বুঝে মা তোমার লীলে।
তুমি কী নিলে কী ফিরিয়ে দিলে ॥
তুমি দিয়ে নিচ্ছ তুমি বাছ রাখ না সাঁঝসকালে।
তোমার বিষম কার্য অনিবার্য মাপাও যেমন যার কপালে ॥

অথবা, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি কারণের স্বরূপনির্ণয়ে অক্ষম হয়ে পরিশেষে নিম্নোক্তভাবেই নিজের উপর কটাক্ষপাত করে এবং আত্মসমর্পণে বাধ্য হয় :

প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধুতরণ।
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন্ ॥

ভাবের কথা ছেড়ে দিলেও, কীর্তন আর রামপ্রসাদী সুরে মন গলে না, বাঙালীসমাজে এমন মানুষ জন্ম নিয়েছে, একথা ভাবলেও কষ্ট হয়।

রামপ্রসাদের পদরচনার একটি সুপরিকল্পিত রূপ ও ভঙ্গি আছে। তাঁর পদের প্রথম কলিতে বা প্রথম দুই কলিতে মূল আবেগটি ব্যক্ত হয়। পরপর কয় কলিতে অর্থবৈচিত্র্যসহকারে সেই বিশিষ্ট আবেগটিকে পূর্ণরূপ দেওয়া হয় এবং উপসংহারে শেষ দুই কলিতে ভাষা ও অর্থের অধিকতর চমৎকারিত্বের সহযোগে সেই বিশিষ্ট ভাবাবেগের সমাপ্তিসাধন করা হয়। পদটি শেষ হলে যেন আর কিছু বক্তব্য থেকে যায় না, শ্রোতার মনও শমে এসে অখণ্ড ভাবরসে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। রামপ্রসাদের লেখা পদের প্রারম্ভের সঙ্গে চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রারম্ভাংশের প্রকার তুলনার যোগ্য। যেমন, চণ্ডীদাসের—'কে বা শুনাইল শ্যাম-নাম', 'রাধার কী হৈল অন্তরে ব্যথা', 'সই, কে বলে পিরীতি ভালো' প্রভৃতি। এর পরে দীর্ঘ পঙ্‌ক্তির দ্বারা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নবাক্যটির অর্থপূরণ করা হয়েছে। রামপ্রসাদের—'এমন দিন কি হবে তারা', 'কে জানে রে কালী কেমন', 'এবার আমি বুঝব

প্রসাদী সংগীতের রূপ ও ভঙ্গি

1648

হরে' প্রভৃতি প্রায় সমস্ত পদের এই ধারা। তথাপি বলতেই হয় যে, চণ্ডীদাসের পদের বাঁধুনি রামপ্রসাদের মতো এত আঁটসাট এবং আরম্ভ-সমাপ্তির সুপরিকল্পিত কৌশলে নিয়মিত নয়।

রামপ্রসাদ সহজ ভাষায় সহজ অনুভূতির কবি। কিন্তু তাই বলে তাঁর ভাবাভঙ্গি চাতুর্যহীন নয়। তিনি খুব সংযমের সঙ্গে অনুপ্রাস-শ্লেষ-উপমা-রূপক-বিরোধ প্রভৃতি অলংকারগুলি ব্যবহার করেছেন। সেগুলির প্রয়োগ খুবই অনায়াস এবং সেগুলি পদের ভাবকে উদ্দীপ্ত করতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। যেমন, 'প্রসাদ হাসিছে সরসে ভাষিছে', 'তারা আমার নিরাকারা', 'ও পদের মত পদ পাই তো সে-পদ লয়ে বিপদ সারি', 'খেয়ে গরল হয়নি মরণ, (শিব) ছল করে মুদেছে নয়ন,' 'সে যে ভাবলোকে পরম যোগী যোগ করে যুগযুগান্তরে', 'হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে', 'আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি', 'প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধুতরণ', 'সাকারে সাযুজ্য হবে নির্গুণে কি গুণ বল না' ইত্যাদি। পদাবলীর ঐশ্বর্যের যুগে অলংকারসমৃদ্ধ ব্রজবুলি-ভাষাপ্রয়োগে বাংলাভাষায় অপূর্ব সৌন্দর্যের সঞ্চার হয়েছিল। শ্যামা-সংগীতে সে সৌন্দর্যরচনার প্রয়োজন নেই—ভাব ও রূপকল্পনার অত বৈচিত্র্যেরও অবকাশ নেই। কিন্তু একথা বলা যায় যে, শ্যামাসংগীতে রচয়িতার অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়েছে। পদাবলীর মধুর ভাবাবেশ ঝঙ্কার-মুখরতায় শ্রান্ত হয়ে পরিশেষে বিরাম লাভ করলে শ্যামাসংগীতকে আশ্রয় করেই ঘরোয়া বাংলা ভাষার পুনরুজ্জীবন ঘটে। একালের নবভাষাশিল্পী ভারতচন্দ্র সংস্কৃতের বাগ্‌বৈদগ্ধ্য অর্পণ করেছিলেন লৌকিক বাংলাকে। ভাষার অলংকারিকতা, ঋজুতা ও তীক্ষ্ণতা বহুক্ষেত্রে ঘরোয়া তদ্ভব শব্দকে আশ্রয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে তাঁর রচনায়। প্রথমে বৈষ্ণবকবিরা, পরে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র খাঁটি বাংলার প্রকাশশক্তি আশ্চর্যরূপে বাড়িয়ে তুলেছিলেন। কয়েকটি বাংলা ক্রিয়াপদকে আশ্রয় করে রামপ্রসাদ তাঁর গীতভাবুকতাকে কী চমৎকার বাণীরূপ দান করেছেন তার উদাহরণ নিম্নের পদটিতে মিলবে :

রামপ্রসাদের কাব্যকলা

আর ভুলালে ভুলব না গো।
আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেলব দুলব না গো॥
বিষয়ে আসক্ত হয়ে বিষের কূপে উলব না গো।
সুখদুঃখ ভেবে সমান মনের আগুন তুলব না গো॥

ধনলোভে মত্ত হয়ে দ্বারে দ্বারে বুলব না গো।
আশাবায়ুগ্রস্ত হয়ে মনের কপাট খুলব না গো॥
মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে প্রেমের পাশে ঝুলব না গো।
প্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুলব না গো॥

শ্যামাসংগীতের মতন একই মনোভাবের রচনা আগমনী ও বিজয়ার গান এক সময় বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এগুলিও ষোল আনা কাব্য, এবং তদানীন্তন বাংলার সমাজের সঙ্গে এগুলির যোগ ছিল প্রত্যক্ষ। কালক্রমে কাব্যধর্মের পরিবর্তন ঘটেছে সত্য, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে—দেবতাকে মানুষ করে, বীজরূপা উগ্রা শক্তির সঙ্গে মাতা বা কন্যার সম্পর্কস্থাপন করে, কঠোরকে কোমলতায় আবৃত করে বাঙালী কবি মধ্যযুগের কাব্য ও সঙ্গীতে মানবিকতার চরমদৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন।*

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথের 'শেষসপ্তক'

[**রচনার সংকেতসূত্র :** প্রারম্ভিক ভূমিকা—রবীন্দ্রনাথের অনির্বাণ সৃজনীপ্রতিভা—'শেষসপ্তক' কবিগুরুর অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার কাব্যায়ন—কবিজীবনের বিভিন্ন পর্বে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্বরূপ—কবির আসক্তিশূন্য মনের নির্লিপ্ততা—কবির আত্মোপলব্ধি তথা আত্মমুক্তির আকাঙ্ক্ষা—মহাকাল-সন্ন্যাসীর কাছে কবির বৈরাগ্যমন্ত্রে দীক্ষা—কবির অনাবিল প্রজ্ঞাদৃষ্টি—নিজের কবিকীর্তি সম্পর্কে কবি আজ সম্পূর্ণ মোহমুক্ত—আনন্দতীর্থের যাত্রী রবীন্দ্রনাথ—সৌন্দর্যের সন্ন্যাসীকবি রবীন্দ্রনাথ—অগাধ মর্ত্যমমতাই রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের চরম সত্য—রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের মূলমন্ত্র—আত্মার রহস্যসন্ধানী রবীন্দ্রনাথ—কবির উপলব্ধ সত্য—মানবসত্তা মৃত্যুঞ্জয়—সত্তার অস্তিত্বের ধ্রুবত্ব-বিষয়ে কবি আজ নিঃসংশয়—কবির মৃত্যুদর্শনের স্বরূপ—'শেষসপ্তক' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রেমানুভূতি—কবি রবীন্দ্রের প্রেমানুভবের স্বরূপ—রহস্যময় সুদূরের প্রতি কবিচিত্তের আর্তি—ছন্দ ও সুরের মর্মরহস্য-উদ্‌ঘাটন—সৃষ্টির অস্তিত্ব ও মানুষের ব্যক্তিত্বের চেতনা—'শেষসপ্তক' কাব্যের ছন্দোরীতি—কবির বাস্তবচেতনা ও গদ্যছন্দ—ছোটছোট জন্মমৃত্যুর সীমানায় নানা রবীন্দ্রনাথের ছবি]

অথর্ববেদের ঋষিকবি বলিয়াছেন : 'পরি দ্যাবা পৃথিবী সদ্য আয়ম্ উপতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য'—'ঘুরলেন তিনি আকাশ-পৃথিবী, শেষকালে এসে দাঁড়ালেন প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।' শুভ্র পরিণত বার্ধক্যের প্রান্তদেশে দাঁড়াইয়া সত্যদর্শী স্থিতপ্রজ্ঞ কবি রবীন্দ্রনাথও উচ্চারণ করিলেন অনুরূপ কথা : 'দিন এগোলো। চলল জীবনযাত্রার রথ এ-পথে

প্রারম্ভিক ভূমিকা

[* অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস-রচিত]

ও-পথে।...আকাশে-পৃথিবীতে এ জন্মের ভ্রমণ হোলো সারা পথে-বিপথে, আজ এসে দাঁড়ালেম প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।'

বিশ্বজীবনের বহুবিচিত্র রূপপ্রকাশে, আপন অন্তরতম সত্তার গভীরে জ্যোতির্ময় সত্য ও অক্ষয় আনন্দের যে-অমৃতরূপ কবি রবীন্দ্র প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আমাদের আলোচ্য শেষসপ্তক গ্রন্থখানি সেই আনন্দময় সত্যের অমৃতরূপেরই কাব্য—জীবনরহস্যের নিগূঢ় ইংগিতে প্রোজ্জ্বল, ধ্যানদৃষ্টির তন্ময়তায় গম্ভীর, মানবসত্তার অপরাজেয় মহিমায় দীপ্তিমান, মর্ত্য-পৃথিবীর প্রতি অমেয় ভালোবাসার মাধুর্যে রমণীয়।

গ্রন্থখানি কবিগুরুর কাব্যজীবনের অন্তিম পর্বে রচিত। ইহার রচনাকাল উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ সাল—কবি তখন সত্তর বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু পরম বিস্ময়ের বিষয়, পরিপূর্ণ বার্ধক্যকবলিত রবীন্দ্রনাথের সৃজনীপ্রতিভা এখনো অপরিম্লান—নব নব ভাবচিন্তার রূপায়ণে কাব্যে ও শিল্পকলায় ইহার সাবলীল আত্মপ্রকাশ। বৃদ্ধ কবির চিত্ত তারুণ্যে এখনো সতেজ, কল্পনাদৃষ্টি স্বচ্ছ ও দূরপ্রসারী, মননশক্তি তীক্ষ্ণ, অনুভূতি প্রখর ও গভীর। এ-যুগে রবীন্দ্রনাথ শিল্পরচনক্ষমতার যে-পরিচয় দিলেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর। কবির প্রতিভা ধাপে ধাপে পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, এবং এই সহজ পরিণতির স্বাভাবিক অভিব্যক্তির চিহ্ন মুদ্রিত রহিয়াছে তাঁহার শেষ দশবৎসরের কাব্যে—'পরিশেষ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'শেষলেখা'য়। কবিগুরুর সার্থক গদ্যকবিতা এ-যুগেরই সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের অনির্বাণ সৃজনীপ্রতিভা

শেষসপ্তক রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার কাব্যায়ন। মহাবিশ্বজীবনের প্রেক্ষাপটে নিজেকে তুলিয়া ধরিয়া কবির আত্মসন্ধান ও আত্মদর্শনই শেষসপ্তক-এর মূলসুর। দার্শনিক কথাটি একটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই অর্থে দার্শনিক না হইলেও, দার্শনিকতা রবীন্দ্রকাব্যের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। উপনিষদের ঋষিকবিরা যে-অর্থে দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথকেও সেই অর্থে দার্শনিক বলিতে কোনো বাধা নাই। উপনিষদের চিন্তাধারার উত্তরাধিকার কবিগুরুকে আত্মজিজ্ঞাসার প্রেরণা জোগাইয়াছে, আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অধিকারী করিয়াছে। বোধকরি, সেজন্যই শেষজীবনের কাব্যগুলিতে এমন নির্ভুলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার মননশীল তত্ত্বজিজ্ঞাসু কবিমনের উজ্জ্বল পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ যতই বার্ধক্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন ততই তাঁহার চিত্তে জাগিয়াছে আপনার সত্যপরিচয়টিকে জানিবার জন্য অশেষ আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা। তাই কবি এখন আত্মবিশ্লেষণে

শেষসপ্তক কবিগুরুর অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার কাব্যায়ন

নিরত, দৃষ্টি তাঁহার আপন প্রাণসত্তার নিভৃতে প্রসারিত—আত্মার রহস্য-আবরণ উন্মোচনই এখন কবির কাম্য। নবতন মানসিক পটভূমি ও চলমান সংসারের নূতন পরিবেষ্টনীতে অবস্থান করিয়া কবিদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ জীবনসত্যের প্রগাঢ় উপলব্ধির যে-সম্পদ আহরণ করিয়াছেন, তাহার কিছুটা তিনি পাঠককে বিতরণ করিয়াছেন শেষসপ্তক-এর মাধ্যমে।

শেষসপ্তক গ্রন্থখানিকে আমরা রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-উপলব্ধির কাব্যসম্মত রূপায়ণ বলিয়াছি। এই প্রসঙ্গে এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এই-যে প্রথম পদচারণ করিলেন, তাহা নয়। পূর্ববর্তী নৈবেদ্য-খেয়া-গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির যুগেও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জগতে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বতন আধ্যাত্মিক অনুভূতির সঙ্গে বর্তমান অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার পার্থক্যটুকু সবিশেষ লক্ষণীয়।

কবিজীবনের বিভিন্ন পর্বে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্বরূপ

পূর্বতন অধ্যায়ে প্রকৃতির সংসার আর মানবসংসারের মধ্যে, আপনার অন্তরমন্দিরে কবি খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন অরূপসুন্দর লীলাচঞ্চল ঈশ্বরকে। ওই পর্বে তিনি অরূপসন্ধানী, অসীমের বার্তাবহ। এ-যুগে কিন্তু কবির আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার প্রকৃতি ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কবি এখন মানবসত্তার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য উৎসুক—আত্মার সত্যমূল্যনির্ধারণের প্রয়াসী।

সমালোচ্য গ্রন্থখানির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে যে-জিনিসটি সর্বপ্রথম সকলের চোখে পড়ে, তাহা হইল কবির আসক্তিশূন্য মনের নির্লিপ্ততা। কবি এখন সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, শান্তিনিকেতনের গেরুয়া প্রান্তরের সঙ্গে তিনি মিলাইয়া লইয়াছেন নিজের মনের সুরটি। এই অনাসক্ত বৈরাগী চিত্তের দৃষ্টি দিয়া কবি তাকাইতেছেন প্রকৃতির দিকে, জীবনের দিকে। বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষুদ্রতুচ্ছ, সামান্য সাধারণ বস্তু ও দৃশ্যপটের দিকে তাকাইয়া অনুভব করিতেছেন সীমাহীন বিস্ময়, অপার আনন্দ। মহাপথিক রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত চিরকালই একরূপ আসক্তিশূন্য। পরিপূর্ণ বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়া তাঁহার ওই চিত্ত সর্বপ্রকার আসক্তির হাত হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া লইয়াছে। এই নিস্পৃহতার চরম প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই তাঁহার অন্তিম পর্বের কাব্যগুলিতে। কবির মন নিরাসক্ত ও আবেগবর্জিত বটে, কিন্তু তাঁহার অনুভূতি প্রখর, ইহার তীব্রতা এতটুকু হ্রাস পায় নাই। তাই প্রকৃতির অতিসাধারণ দৃশ্যগুলি তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে মেলিয়া ধরে অন্তহীন বিস্ময়ের আনন্দপূর্ণ পসরা।

কবির আসক্তিশূন্য মনের নির্লিপ্ততা

রবীন্দ্রকাব্যের পাঠকমাত্রেই জানেন, নিসর্গপ্রকৃতির সহিত কবিচিত্তের যোগ কতখানি নিগূঢ়, কতখানি ব্যাপক। এই নিগূঢ় সংযোগের সূত্রে প্রকৃতির সহিত কবি নিজের একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন। মানসী-সোনার তরী-চিত্রার কাব্য-জীবনে কবি প্রকৃতির রূপলোকে আত্মনিমজ্জন করিয়াছেন প্রধানত সৌন্দর্যসম্ভোগের জন্য। এখন কিন্তু মোহময় সম্ভোগের পালা শেষ হইয়াছে—আজ কবি প্রকৃতির বুকে আশ্রয় হইয়াছেন আত্মোপলব্ধি তথা আত্মমুক্তির আকাঙ্ক্ষায়। যৌবনের অবসানকাল হইতে স্মৃতি-বিস্মৃতি, সুখদুঃখের বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত বাষ্পঘনিমা কবির চিত্তে যে-মোহাবেশের সৃষ্টি করিয়াছে, চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে যে-অস্পষ্টতার আবরণ, সেই মোহজড়িমাকে, সেই আবরণকে অপসারিত করিবার জন্য কবি নিসর্গঅবগাহন করিবেন, ডুব দিবেন চতুর্দিকের অস্তিত্বের ধারার গভীরে। নিসর্গপ্রকৃতির এই একান্ত সহজ প্রাণপ্রবাহের মধ্যে ডুব দিতে পারিলে তাঁহার মন 'ছায়ার বেড়ায় বদ্ধ দিনগুলো থেকে' বাহির হইয়া আসিবে 'শুভ্র আলোকের প্রাঞ্জলতায়'। জীবনের চঞ্চল বসন্তকে কবি আজ বহুদূর পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছেন, এখন তাঁহার মোহমুক্তি ঘটিয়াছে। সুতরাং স্বপ্নাবেশে জড়িত মন লইয়া সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি আর ডুব দিবেন না—নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সহজ দেখাই বর্তমানে তাঁহার কাম্য। নিজেকে তিনি মিলাইয়া লইবেন 'শস্যশেষ প্রান্তরের সুদূরবিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে'।

কবির আত্মোপলব্ধি তথা আত্মমুক্তির আকাঙ্ক্ষা

বিশ্বজীবনের নিত্যপ্রবহমাণ স্রোতোধারায় আপনার জীবনধারাকে মিলাইয়া দিয়া, জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ, হারানো ও প্রাপ্তির সকল দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হইয়া, কবি আত্মার নিবিরোধ আনন্দলোকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য পার্থিব আবিলতামুক্ত স্বচ্ছদৃষ্টিই কবির আজ আকাঙ্ক্ষিত। ইহার জন্য প্রয়োজন অকম্পিত চিত্তপ্রশান্তি, নির্মম নির্মল বৈরাগ্য। তাই কবি মহাকাল-সন্ন্যাসীর কাছে নিরাসক্তির মন্ত্রে দীক্ষা লইবার বাসনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিশ্বরঙ্গমঞ্চের অন্তরালে, সৃজন ও প্রলয়ের নেপথ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছেন উদাসীন মহাকাল। সেই নিরাসক্ত মহাকালের সন্ন্যাসীচিত্তের বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠুক কবির অন্তরবীণায়। নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া তিনি বিশ্বরহস্যের মধ্যে নিমগ্ন হইবেন—করিবেন আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মদর্শন, করিবেন চতুষ্পার্শ্বের প্রাণচঞ্চল বিপুল অস্তিত্বের সত্যমূল্য-নিরূপণ। গতিচ্ছন্দের সুতীব্র অনুভূতির

মহাকাল-সন্ন্যাসীর কাছে কবির বৈরাগ্যমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ

প্রেরণায় 'বলাকা'র যুগে কবি নিখিল সৃষ্টির মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন মহাকালের অবারণ চলার উন্মত্ত আবেগ, এবং কালপ্রবাহের সেই দুরন্ত চলার মত্ততার মধ্যে কবি সেদিন নিজেকেও ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। আজ অনাসক্ত বৃদ্ধ কবির চোখে গতির মত্ততাই একমাত্র সত্য বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে না—বিশ্বব্যাপী কালচক্রের কেন্দ্রস্থলে তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন সত্যের ভিন্নতর একটি রূপ—মহাকালের ধ্যানপ্রশান্ত গাম্ভীর্য।

কবির অনাবিল প্রজ্ঞাদৃষ্টি

এই মহাকাল-সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যের মন্ত্র কবিচিত্তকে উদ্বোধিত করিয়াছে, কবির দৃষ্টির মধ্যে আনিয়া দিয়াছে আশ্চর্য স্বচ্ছতা। মহাকালের ধাবমান প্রবাহের প্রেক্ষাপটে কবি স্থাপন করিলেন পার্থিব সৃষ্টি ও কীর্তিকে, বিশ্বের বিশালতার পটভূমিকায় স্থাপন করিলেন নিজেকে। কী দেখিলেন তিনি? দেখিলেন, নূতন কল্পে সৃষ্টির আরম্ভে অসীম আকাশে কত অযুত জ্যোতিষ্কমণ্ডলের আবির্ভাব ঘটিল, অব্যক্তের প্রচ্ছন্নতা হইতে তাহারা আত্মপ্রকাশ করিল ব্যক্তের বড়ো সীমায়। কিন্তু মহাকাশের ওই লক্ষকোটি নক্ষত্রপুঞ্জের পরিণাম কী? পরিণাম বিরাট শূন্যতা। অন্যদিকে ধরার ভূমিকায় মানবইতিহাসের রঙ্গভূমি, সেখানেও চলিতেছে নিত্য-ভাঙাগড়ার লীলা। স্মরণাতীত কাল হইতে আজ পর্যন্ত কত সভ্যতার জন্ম হইল, কত সভ্যতার ঘটিল বিলয়—মর্ত্যপৃথিবীতে কিছুই পাইল না চিরকালীন প্রতিষ্ঠা। এই উদয়বিলয়ের চক্রনৃত্য হইতে কবি উপলব্ধি করিলেন—কীর্তির মাধ্যমে মানুষের অমরতালাভের সকল আয়োজন নিরর্থক, অমরত্বের আশা নিষ্ফল। সুতরাং কবিও নিজের মনের কোণে অক্ষয় কীর্তির কোনো দুরাশা পোষণ করিবেন না,—মহাকালের পদপ্রান্তে নিঃশেষে সমর্পণ করিবেন আপনার সমস্ত পার্থিব সঞ্চয়কে।

নিজের কবিকীর্তি সম্পর্কে কবি আজ সম্পূর্ণ মোহমুক্ত

যে-মহাকালের নিকট কবি লইয়াছেন নিরাসক্তির দীক্ষা,—'আমার লতা-বিতানে বসে নমস্কার করি [সেই] মহাকালকে'। এই অনিত্য বস্তুবিশ্বে খ্যাতির অহংকার, নামের অহংকার মরীচিকার মতোই মিথ্যা মূঢ়তা-মাত্র। শুধু তাহা নয়, 'সকল অহংকারই বন্ধন'। 'নামের পূজার অর্ঘ্য ভাবীকালের খ্যাতি' যে 'ভোগশক্তিহীন নিরর্থকের কাছে উৎসর্গ-করা প্রেতের অন্ন', এই নিশ্চিত সত্যটি একদিন উপলব্ধি করিয়াছিলেন অজন্তাগুহার রূপদক্ষেরা—যাহারা প্রস্তরভিত্তিতে বিচিত্র রঙের রেখায় চিহ্নিত করিয়া গিয়াছেন আপনার হৃদয়ানুভূতির নিবিড় আনন্দকে। অজন্তার গুহাগাত্রে ওইসব অজ্ঞাতনামা রূপের তাপস মূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন নিজেদের সৌন্দর্যস্বপ্নকে। রূপসৃষ্টির আনন্দমুহূর্তে তাঁহারা

বিস্মৃত হইয়াছিলেন আপন আপন নাম। তাই তাঁহারা রাখিয়া যান নাই নিজের কোনো পরিচয়, নামকে করিয়াছেন সম্পূর্ণ উপেক্ষা। তাঁহাদের যুগোত্তীর্ণ শিল্পরচনার যথার্থ মূল্য প্রকাশের আনন্দে—'তার বেশী আর বাড়বে না একটুও নামের পিঠে চড়ে'। এই উপলব্ধি হইতেই মোহমুক্ত কবি পরম শ্রদ্ধাভরে প্রণাম জানাইয়াছেন অজন্তার অনামা রূপের তাপসদলকে, তাঁহাদের রচিত যুগান্তরের কীর্তিতে তিনি পাইয়াছেন 'নামের বন্ধন থেকে মুক্তির স্বাদ'। যদি ইহাই সত্য হয় যে, কবির কীর্তিক্লিষ্ট জীবনের অবসানের পর লক্ষ লক্ষ নামের ঠেলাঠেলির সঙ্গে : 'দৈবক্রমে চলতে থাকবে বেদনাহীন চেতনাহীন ছায়ামাত্রসার আমার নামটা', তবে 'ধিক্ থাক্ সেই কাঙাল কল্পনার মরীচিকায়। জীবনের অল্প কয়দিনে বিশ্বব্যাপী নামহীন আনন্দ দিক আমাকে নিরহংকার মুক্তি'।

যে-নামস্খালন পবিত্র অন্ধকারের মধ্যে ডুব দিয়া অজন্তাগুহার চিত্রীদল শিল্পসাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, কবি আজ সেই অন্ধকারেরই বন্দনা করিতেছেন।

কবি আজ আনন্দতীর্থের যাত্রী, তাঁহার বৈরাগী চিত্তে বাজিয়াছে চলার সুর—নিজেকে নিরাসক্ত সৃজনানন্দের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া তিনি সত্তার শুভ্রভাস আলোকতীর্থে উত্তীর্ণ হইতে চাহেন। বীতনাম সৃজনের ক্ষেত্রে তিনি বিশ্বস্রষ্টার সমানধর্মা। কবিচিত্ত আজ সম্পূর্ণ আসক্তিশূন্য নির্লিপ্ত নিস্পৃহ বলিয়াই মর্ত্যমাধুরী আস্বাদনের পথটি তাঁহার কাছে সর্বপ্রকার বাধাবিমুক্ত। চলা ও থামাকে, ভোগ ও সন্ন্যাসকে রবীন্দ্রনাথ যেমন কাব্যজীবনে, তেমনই ব্যক্তিজীবনে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। এই সমন্বয়ের মধ্যেই তাঁহার জীবনসাধনার পূর্ণতা। মোহমুক্ত মনোভঙ্গিই কবিকে অনিত্যের মধ্যে নিত্যবস্তুর সন্ধান দিয়াছে—বিশ্বের সৃষ্টিধারা ও নিজের জীবনধারাকে সম্যক্‌রূপে দেখিবার ও বুঝিয়া লইবার সুযোগ দিয়াছে।

আনন্দতীর্থের যাত্রী রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথকে আমরা সন্ন্যাসী-কবি বলিয়া আখ্যাত করিয়াছি। জীবনসায়াহ্নে উপনীত রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে এ-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু এ-কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, গোধুলিক্ষণের বৈরাগী মনোভাব তাঁহাকে জগৎ ও জীবনবিমুখ করিয়া তোলে নাই, মর্ত্যপ্রীতির সঙ্গে তাঁহার কোনোদিন বিচ্ছেদ ঘটে নাই। বরংচ কবির মহাপ্রয়াণের লগ্ন যতই আসন্ন হইয়াছে, ততই তিনি মর্ত্যের মাটির কাছাকাছি থাকিবার জন্য সমধিক ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সূক্ষ্ম প্রগাঢ় সৌন্দর্যানুভূতির, রসাবিষ্ট চিত্তের আনন্দচেতনার চমৎকার পরিপ্রকাশ দেখা

সৌন্দর্যের সন্ন্যাসীকবি রবীন্দ্রনাথ

যায় শেষসপ্তক-এর কতকগুলি কবিতায়। কবি কতভাবেই-না আমাদের সকলকে জানাইতে চাহিয়াছেন—যশখ্যাতি, নিন্দাস্তুতি, প্রয়োজনের সঞ্চয় সবকিছুই অনিত্য—একদিন মহাকালের হিমশীতল স্পর্শে ইহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু চতুর্দিকের এই নশ্বরতার মধ্যে তাঁহার মর্ত্যমমতার—কবিস্বপ্নধৃত আনন্দময় মুহূর্তগুলির—অস্তিত্বের সত্যতা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় : 'আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা মুহূর্তগুলিকে, তার সীমা কে বিচার করিবে ?'

রবীন্দ্রনাথ, শেষসপ্তক-এ, তাঁহার কবিজীবনের অন্তিম পর্বের কাব্যগুলিতে, এই কথাটি বিশেষভাবে আমাদের শুনাইতে চাহিয়াছেন যে, নিজের কবিকীর্তির প্রতি তিনি খুব বেশী আস্থা রাখেন না—একদিন উহার বিলুপ্তি অনিবার্য। তবে, তিনি যে প্রকৃতিকে ভালোবাসিয়াছিলেন, মানুষকে ভালোবাসিয়াছিলেন, এবং কাব্যসংগীতে সেই অগাধ মমতাকেই বাণীবদ্ধ করিয়াছেন, ইহাই হইল তাঁহার পার্থিব জীবনের চরম সত্য। এই ভালোবাসা তাঁহার অন্যতম কবিসত্তারই প্রকাশ। এই সত্তাটি কবির সত্য-আমি, নিত্য-আমি। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করিয়াছেন—কবিসত্তা আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ। কবির মধ্যে যাহাকিছু পার্থিব, দিনে দিনে তাহা বিনষ্ট হইবে, কিন্তু তাঁহার অমৃতস্বরূপ আনন্দঘন সত্তার বিনাশ নাই। দেশ-কালের সীমাকে, মৃত্যুকে, অতিক্রম করিয়া উহা অক্ষয় ধ্রুবত্বে টিকিয়া থাকিবে। দেহের সীমায় আবদ্ধ থাকিলেও তাঁহার কবিসত্তা অদেহী—মানুষের প্রতি প্রেমে, প্রকৃতির প্রতি সীমাহীন অনুরাগে এই অশরীরী সত্তার আনন্দস্ফূর্তিই সতত প্রকাশিত হইতেছে। যাহা আনন্দ তাহা মৃত্যুর অতীত, তাহাই যথার্থ সত্য।

অগাধ মর্ত্যমমতাই রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের চরম সত্য

কবি আপনার মধ্যে যে-অনির্বচনীয়ের সন্ধান পাইয়াছেন, সেই অনির্বচনীয়ের আর-একটি অভিব্যক্তি তিনি দেখিয়াছেন মানবের প্রেমে, প্রকৃতির অপরূপ শোভা-সৌন্দর্যে। পৃথিবীকে কবি দুইচোখ ভরিয়া দেখিয়াছেন, পৃথিবীকে চিরকাল ভালোবাসিয়াছেন, এই জগৎ-সংসারকে তাঁহার ভালো লাগিয়াছে—ইহাই রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের সবচেয়ে বড়ো কথা। কবির সুদীর্ঘ কাব্যজীবনের মূলমন্ত্রটি হইল—'ভালোবাসা'। এই মন্ত্রটির প্রতিধ্বনি তিনি শুনিতে পাইয়াছেন বিশ্বহৃদয়ের অন্তস্তলে। সৃষ্টির আদিম লগ্নে পৃথিবীর মর্মলোকে স্পন্দিত হইয়াছিল অন্তহীন ভালোবাসার বাণী। সমস্ত বিশ্ব জুড়িয়া নিত্যকাল ধরিয়া যে-স্রোতটি অনবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, তাহা আনন্দোদ্বেল প্রেমের। সীমাবদ্ধ দৈনন্দিন জীবনের কলকোলাহল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া প্রকৃতিলোকের

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের মূলমন্ত্র

অন্তঃপুরে দৃষ্টিকে প্রসারিত করিতে পারিলে বিশ্বহৃদয়ের অনাদি কালের সেই আনন্দমন্ত্র—'ভালোবাসি'-সংগীত—শুনিতে পাওয়া যায়। দূরের যাত্রী রবীন্দ্রনাথ গোধূলির ঘাটে বসিয়া বিশ্বলোকের সেই শাশ্বত বাণীটি শুনিয়া লইতে উৎসুক।

শেষসপ্তক রবীন্দ্রনাথের আত্মদর্শননিরত স্বচ্ছ কবিমনের সৃষ্টি। এখানে তিনি আত্মার রহস্যসন্ধানী, জগদ্‌ব্যাপারের নিগূঢ় তাৎপর্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াসী। নিজেকে নি শেষে জানিবেন এবং জানাইবেন, ইহাই কবির একান্ত ইচ্ছা। এই গ্রন্থখানিতে কবি-তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথের নির্ভুল পরিচয় সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত দেখিতে পাওয়া যাইবে। আত্মবিচারণার পথে অগ্রসর হইয়া কবি অনুভব করিতেছেন, অদৃশ্যলোকচারী মহাশিল্পী বিশাল বিশ্বজীবনের প্রেক্ষাপটে তাঁহার অন্তরতর যে-সত্তাটিকে বহুবিচিত্র কারুকলায় গড়িয়া তুলিতেছেন, যে-সত্তার গোপন ভাণ্ডারে দিনে দিনে সঞ্চিত হইয়াছে অজস্র রসসম্পদ, উহার রহস্য দুরবগাহ—সত্তার সামগ্রিক পরিচয়টি জানা কবির সাধ্যাতীত। অথচ কবি তাঁহার সত্য-তপস্যায় চাহিয়াছেন নিজের গোচরতাকে। তাই, এই বলিয়া তিনি আকূতি জানাইতেছেন—'কবে প্রকাশ হবে পূর্ণ, আপনি প্রত্যক্ষ হব আপনার আলোতে?' কিন্তু আজ তিনি ইহাই উপলব্ধি করিতেছেন যে, সমগ্র সত্তার রহস্য কোনোদিনই সম্পূর্ণরূপে তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে অনাবৃত হইবে না। জীবনরহস্যের কতটুকুই বা আমরা ধরিতে পারি? আমাদের ব্যক্ত জীবনের চারিদিকে বিরাজ করিতেছে 'অব্যক্তের বিরাট প্লাবন'। কবির আত্মসমীক্ষা ও আত্মবিবৃতিকে বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায়, সত্তার প্রকৃত স্বরূপটি ধরিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। কিন্তু আত্মার রহস্যে ডুব দিয়া বারেবারেই তাঁহাকে আক্ষেপের সুরে বলিতে হইয়াছে: 'এ যেন অগম্য গ্রহ আমার সত্তা, বাষ্প-আবরণে ফাঁক পড়েছে কোণে কোণে, দূরবীনের সন্ধান সেইটুকুতেই।...সেই অদৃশ্যের চঞ্চল লীলা কার কাছেই বা স্পষ্ট হোলো, ভাষার অঞ্জলিতে কে ধরতে পারে তাকে?'...

আত্মার রহস্যসন্ধানী রবীন্দ্রনাথ

তবে আত্মবিচারণার ক্ষেত্রে পাদচারণ করিয়া কবি এই সত্যটি অনুভব করিতেছেন যে, তিনি দেশকালের অতীত, বর্তমানের সীমিত পরিধি অতিক্রম করিয়া তাঁহার আত্মা ধাবিত হইতেছে অসীমতার পথে। দূরের পথিক তিনি, তিনি 'আলোর প্রেমিক'। চলার পথের বাঁকে বাঁকে তাঁহার বিস্মিত চোখের দৃষ্টির সম্মুখে ক্ষণে ক্ষণে ধরা পড়িতেছে চিরকালের রহস্য—সত্যের আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। বিশ্বসংসার যে-জ্যোতির্ময় মহাসত্তার প্রকাশ, কবির 'নিত্য আমি' তাহারই অংশ—আনন্দচৈতন্যে উদ্ভাসিত।

কবির উপলব্ধ সত্য

কেন আমরা নিজেদের জরাহীন মৃত্যুহীন অম্লান স্বরূপটিকে চিনিতে পারি না? উত্তরে কবি বলিতেছেন, ক্ষয়িষ্ণু ভঙ্গুর দেহের সঙ্গে, লৌকিক মনের সঙ্গে চিরন্তন সত্তাকে অভিন্নরূপে দেখি বলিয়াই আমরা জরাজীর্ণ দেহের মৃত্যুকে আরোপ করি সত্তার উপর। আমাদের যাত্রা অনেক কালের। বহু বিস্মৃত যুগের অনেক ক্ষুধা, অনেক তৃষ্ণা, অনেক স্থূল আসক্তি, অনেক সংস্কারের সঞ্চয় আমাদের দেহের রক্তের অণুপরমাণুর সহিত জড়িত-মিশ্রিত রহিয়াছে। ওই পার্থিব স্থূলতা আমাদের শুভ্রবাস আত্মার চারিদিকে রচনা করে মোহকুহেলিকার ঘন আস্তরণ, আচ্ছাদিত করে নির্লিপ্ত আত্মার জ্যোতির্ময়তাকে—দেহের প্রতি আমাদের আসক্তির অন্ত নাই।

পরম নিরাসক্তি ও প্রজ্ঞাদৃষ্টির সহায়তায় যখন আমরা দেহমনের বন্ধন হইতে আত্মাকে বিমুক্ত করিয়া লইতে সমর্থ হই, তখন অনুভব করি, আমাদের সত্তা জরামৃত্যুর ঊর্ধ্বচারী—তাহার ক্ষয় নাই, নাই কোনো দুঃখবেদনা। সে চির-জ্যোতির্ময় চৈতন্যস্বরূপ—সর্বগ্লানিমুক্ত শাশ্বত আনন্দলোকে তাহার প্রতিষ্ঠা। দেহের যত উঞ্ছবৃত্তি 'জন্মমরণের মাঝখানটাতে যে-আলবাঁধা ক্ষেতটুকু আছে, সেইখানে'—ভোগলোলুপতায় সে পঙ্কিল। নির্লিপ্ত আত্মার কিন্তু কোনো বন্ধন নাই, আসক্তি নাই, নাই সঞ্চয়ের কোনো গ্লানিভার।

কবির ধ্যানদৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে মানবসত্তার প্রকৃত স্বরূপ—সে প্রথমজাত অমৃত, সে নবীন, সে নিত্যকালের। 'বহু দেহমনের নানা পথের বাঁকে বাঁকে মৃত্যুর নানা খেয়া পার হয়ে' ঐ দূরের পথিক আসিয়া পৌঁছিয়াছে বর্তমানের ঘাটে। আবার সে যাত্রা করিবে অনাগতের অভিমুখে। কত জরা, কত ব্যাধি, কত বিনাশ যুগে যুগে তাহাকে কুক্ষিগত করিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় সত্তা বারে বারে সেই আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে।

মানবসত্তা মৃত্যুঞ্জয়

মহামরণের কুয়াশার মধ্য হইতে 'বারে বারে সে বেরিয়ে এল, প্রতিদিন ভোরবেলার আলোতে ধ্বনিত হল তার বাণী,—এই আমি প্রথমজাত অমৃত।' নিরাসক্ত জীবনদৃষ্টির আলোয় কবি আজ বুঝিতে পারিতেছেন, সত্য যেমন এই সংসারকে তাঁহার ভালো লাগা, তেমনি সত্য জীবনের সমস্ত স্থূল সঞ্চয়কে ধূলির হাতে উজাড় করিয়া দিয়া দূরের যাত্রাপথে অগ্রসর হইয়া চলা—ওপারের পথিকের কাছে এপারের পাথেয় মূল্যহীন। গোধূলির ঘাটে উত্তীর্ণ কবি ভালোমন্দের কোনো জঞ্জাল জমাইয়া রাখিবেন না, পিছনে ফেলিয়া যাইবেন না দীর্ঘনিশ্বাসের বাণীহারা মলিন একটা ছায়া। মাটির উপর আমাদের অধিকারের দাবী ক্ষণকালের। পৃথিবীর বুক হইতে শেষবিদায়ের মুহূর্তে সেই দাবীকে নিঃশেষে ছাড়িতে হইবে, অশুচি সঞ্চয়পাত্রটিকে খালি করিতে হইবে,

জঞ্জালের ভিক্ষামুষ্টিকে ফিরাইয়া দিতে হইবে ধুলায়। সুতরাং নিরাসক্ত কবি জীবনভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের দিকে আর্তচোখে আর ফিরিয়া তাকাইবেন না। কবি এখন কামনা করেন সর্বভারমুক্ত চিত্তের পরমা শান্তি।

শেষসপ্তক কাব্যগ্রন্থে যে-নূতন অনুভূতি ও যে-বলিষ্ঠ জীবনদর্শন বাণীবদ্ধ হইয়াছে, কবিচিত্তের আসক্তিশূন্যতাই তাহার মূলে। তবে এখানে একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার। মহাকালের বিপুল স্রোতোপ্রবাহে কবি নিজের পার্থিব জীবনের সকল সঞ্চয়ের ডালি বিনাকুণ্ঠায় ভাসাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু আপনার স্বপ্নময় অনুভূতির সঞ্চয়কে ওই স্রোতের মুখে ভাসাইয়া দিতে তিনি স্বীকৃত নহেন। লৌকিক জীবনের আর আর বস্তু মিথ্যা হইলেও, তাঁহার কবিসত্তার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত বিচিত্র অনুভবের মুহূর্তগুলি চিরন্তন সত্যেরই আলোকবর্তিকা—বিশ্বপ্রাণের স্পন্দনে সেগুলি স্পন্দিত। তাই তাহারা মৃত্যুর অতীত।

কবির স্বচ্ছগভীর দৃষ্টির সম্মুখে জীবনরহস্য, সৃষ্টিরহস্য আজ ক্ষণে ক্ষণে তাহার আবরণ উন্মোচন করিতেছে, ক্রমেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে অন্তর্গূঢ় সত্তার অনির্বাণ দীপ্তি। জীবনসত্তার অস্তিত্বের ধ্রুবত্ব সম্বন্ধে কবি আজ নিঃসংশয়। আকস্মিক চেতনার নিবিড়তায় দেহের সীমায় তিনি অনুভব করিতেছেন দেহাতীতের অনির্বচনীয় অস্তিত্ব। এই রহস্যময়তা যখন কবিকে বিস্মিত করে, তখন দেহের অতীতকে ধরিবার জন্য তাঁহার সকল প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে। মাটির তলায় যে-বীজ আত্ম-গোপন করিয়া থাকে, বাহিরের আলোবাতাসের মধ্যে উহার প্রাণের পূর্ণপ্রকাশ না ঘটিলেও তাহার অস্তিত্বটা তো অস্বীকার করা যায় না। তেমনি 'অঙ্গের বাঁধনে বাঁধা পড়া' কবির প্রাণসত্তা প্রত্যক্ষভাবে গোচরীভূত না হইলেও উহার ধ্রুবত্ব সংশয়াতীত।

সত্তার অস্তিত্বের ধ্রুবত্ব-বিষয়ে কবি আজ নিঃসংশয়

প্রাত্যহিক সহস্র তুচ্ছতা ও অর্থহীন কোলাহলের মধ্যে যখন নিজেদের ডুবাইয়া রাখি, তখন আমরা সত্তার অস্তিত্বটুকু ধরিতে পারি না। কিন্তু কোনো একটি দুর্লভ অবকাশের মুহূর্তে সংসারের আশু প্রয়োজনের কারাপ্রাচীর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া প্রকৃতির প্রশান্ত রহস্যময়তার মধ্যে যখন নিজেদের বিলীন করিয়া দিই, তখন সত্তার অস্তিত্বের বোধ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে,—আমরা শুনিতে পাই, "বিশ্বমর্মের নিত্যকালের সেই বাণী—'আমি আছি'।" অনির্বচনীয়ের উপলব্ধির জন্য চাই অসামান্যতার স্পর্শ।

চিত্তকে একেবারে নগ্ন করিয়া লইয়া সমস্তের প্রাণকেন্দ্রে নিজেকে মগ্ন করিতে না পারিলে জীবনসত্তার অস্তিত্বের বোধ আমাদের অগোচর থাকিয়া যায়। অস্তিত্বের

পূর্ণ মূল্য তখনই দিই, যখন আমরা অভ্যস্ত পরিচয়ের সকল গণ্ডী ভাঙিয়া বিদেশীর উৎসুক চোখে তাকাইয়া থাকি দূরপ্রসারিত বস্তুসংসারের বিচিত্র রূপলোকের দিকে—যখন আপনাকে দেখি আপনার বাইরে। এরূপভাবে দেখিতে জানিলেই আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয় চিরকালের রহস্য।

শুধু জীবনরহস্য, সৃষ্টিরহস্য নয়—মৃত্যুরহস্যও কবির চোখে আজ সুস্পষ্ট ধরা পড়িতেছে। সত্তর বৎসরোত্তীর্ণ কবি যেন মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াইয়া মহামরণের প্রকৃত স্বরূপটি চিনিয়া লইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন তাঁহার মৃত্যুদর্শনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। মৃত্যুর আলোকেই তিনি পাইয়াছেন জীবনের সত্য পরিচয়। জীবনপ্রেমিক কবির পক্ষে মৃত্যুভাবনা অনিবার্য। এতদিন কবি মৃত্যুকে দেখিয়াছেন দূর হইতে—আজ কবি নিজ ব্যক্তিজীবনের প্রাঙ্গণে শুনিতেছেন আসন্ন মরণের নিঃশব্দ পদধ্বনি। জীবন-মৃত্যুর মহাসঙ্গমস্থলে দাঁড়াইয়া কবি শুধু মৃত্যুররহস্যই উন্মোচন করিলেন না, উহার আলোকে অনন্তজীবনের রহস্যটিও তাঁহার ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হইল। মরণসমুদ্রে ডুব দিয়া কবি যে-মহার্ঘরত্ন লাভ করিলেন—তাহা সত্তার শাশ্বত অস্তিত্বে বিশ্বাস, আত্মার অবিনশ্বরতা-বিষয়ে অকম্পিত আস্থা। এই অবিচল বিশ্বাস একদিকে কবির চিত্তকে বিশ্বস্রষ্টার অভিমুখী করিয়া তুলিয়াছে, অন্যদিকে কবিকে টানিয়া আনিয়াছে একেবারে ধূলার পৃথিবীর কাছাকাছি—অগাধ মর্ত্যমমতা ও মানবপ্রেমের পুণ্যতীর্থে। সর্বভারমুক্ত, নিরাসক্ত কবির চিত্তমুকুরে সৃষ্টির রহস্যময়তা ও অপূর্ব মহিমা আজ যতখানি গভীর স্বচ্ছতায় ধরা পড়িতেছে, পূর্বতন কবিজীবনে ততখানি কখনও ধরা পড়ে নাই। দূরযানী প্রজ্ঞাদৃষ্টি কবিকে এখন ঋষির পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে।

কবির মৃত্যুদর্শনের স্বরূপ

অনাবিল প্রজ্ঞার আলোকে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে নানারূপে দেখিয়াছেন, মৃত্যুর তত্ত্বটি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। ফলে মৃত্যু তাঁহার কাছে সহজ হইয়া উঠিয়াছিল। মৃত্যুভীতি কবির একেবারেই ছিল না। জীবনকে কবি দেখিয়াছেন তাহার অন্তহীনতায়—জীবন রূপরূপান্তর, জন্মজন্মান্তরের সূত্রে গাঁথা। মৃত্যু জীবনের শেষ নয়, পরিপূর্ণতা। জীবনের এক-পর্যায়ের সমাপ্তি ও আর-এক পর্যায়ের সূচনার মাঝখানে মৃত্যু ক্ষণকালের বিরতি। কবির প্রজ্ঞাদীপ্ত উপলব্ধিতে এই সত্যটি ধরা পড়িয়াছে যে, মানবসত্তা মহাপ্রাণের অংশ বলিয়া তাহার ক্ষয় নাই, শেষ নাই—মৃত্যুর তোরণদ্বারের মধ্য দিয়া মরণবিজয়ী অব্যয় সত্তা নবতন জীবনের পথে নিত্যকাল অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তাই কবি নিজেকে কল্পনা করিয়াছেন

চিরঅগ্রসরমান পথিকরূপে, তাঁহার যাত্রাপথ অনন্ত। মৃত্যুর শূন্যতা কবি স্বীকার করেন না। অন্তিম পর্বের কাব্যগুলিতে রবীন্দ্রনাথ আত্মার মৃত্যুঞ্জয়তার কথাই বারংবার উদার কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন।

শেষসপ্তক-এর একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের এই মৃত্যুদর্শনের বাণী রস-স্পন্দিত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—কবিতাটিকে মৃত্যুপ্রশস্তি বলা যাইতে পারে। কবি নিজের হৃৎস্পন্দনে, রক্তের চঞ্চল প্রবাহে শুনিতে পাইয়াছেন মরণের মহাসংগীত। সেই সংগীতের মর্মার্থ কী ? 'বল্‌ছে সে—চলো, চলো—চলো বোঝা ফেল্‌তে ফেল্‌তে, চলো মরতে মরতে নিমেষে নিমেষে—আমারি বেগে।' জগৎ ও জীবনের অশ্রান্ত গতিকে অব্যাহত রাখে মৃত্যু। যাহাকিছু জীর্ণ পুরাতন, গ্লানিপঙ্কিল, তাহাকে ধ্বংস করিয়া মৃত্যু সৃষ্টিকে নবনব জীবনের ক্ষেত্রে চালাইয়া লইয়া যাইতেছে—মানবসত্তাকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে অমৃতলোকের পথে। মৃত্যুর সমুদ্রে অবগাহন করিয়া বিশ্বজীবন নিত্য শুচিসুন্দর হইয়া উঠিতেছে, লাভ করিতেছে অপূর্ব নবীনতা। অচঞ্চল বুভুক্ষু বর্তমান সমগ্র সৃষ্টিকে চায় গ্রাস করিতে। সেই প্রলয়ের হাত হইতে মৃত্যুই সৃষ্টিকে পরিত্রাণ করে, তাহাকে মুক্তি দেয় 'অন্তহীন নবনব অনাগতে'। মৃত্যু মহাশূন্যতা নয়, ধূসর মৃত্যুকে পার হইয়া অমৃত। মানবসত্তা এই প্রথমজাত অমৃত—মরণের স্পর্শে নিত্যনবায়মান।

শেষসপ্তক প্রধানত আত্মবিশ্লেষণ ও অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার কাব্য হইলেও গ্রন্থখানিতে কয়েকটি কবিতা রহিয়াছে যাহার মধ্যে কোনোরূপ তত্ত্বের স্পর্শ নাই। প্রেমানুভূতিমূলক কবিতাগুলি এই পর্যায়ের। নারীপ্রেম রবীন্দ্রনাথের কাব্যের একটি বড়ো প্রেরণা। প্রেমজীবনের অমেয় সৌন্দর্য ও রহস্যময়তাকে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্যসুন্দর বাণীমূর্তি দান করিয়াছেন। 'পূরবী'-'মহুয়া'র যুগেও নিখুঁত প্রেমের কবিতা লিখিয়া কবি আমাদের চিত্তে অপার বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছেন। শারীরিক জরার আক্রমণ রবীন্দ্রনাথের মনের যৌবনকে যে বিনষ্ট করিতে পারে নাই, তাহার অজস্র প্রমাণপরিচয় তাঁহার প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যে রচিত বহুতর কাব্য-কবিতায় সুস্পষ্ট চিহ্নিত আছে।

শেষসপ্তক কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রেমানুভব

শেষসপ্তক-এর কবি আজ বসিয়া আছেন গোধূলির ঘাটে, অস্তসিন্ধুপারে তাঁহার উদাসীন দৃষ্টি প্রসারিত। ধ্যানের এই প্রগাঢ় পরিপূর্ণতার মধ্যেও কবি অন্তরের গভীরে, ব্যক্তিত্বের নির্জনতায় ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করিতেছেন পিছনে-ফেলিয়া-আসা প্রেমজীবনের স্মৃতি-সৌরভ। এই সূক্ষ্ম সুকুমার প্রেমানুভূতির মৃদুকম্পনের স্পর্শ লাগিয়াছে শেষসপ্তক-এর কয়েকটি কবিতায়। প্রেমের উচ্ছলতা-উত্তেজনা-

উন্মাদনা নয়, বাঁধনহারা হৃদয়াবেগের অতিশায়ন নয়—নক্ষত্রোজ্জ্বল সন্ধ্যার মতো স্নিগ্ধশান্ত প্রেমানুভবের কতকগুলি অবিনশ্বর মুহূর্ত এই কবিতাগুলিতে অনির্বচনীয় মাধুর্য লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এগুলি ধ্যানাবিষ্ট চেতনার দ্বারা উপলব্ধি করিবার সামগ্রী,—দেহসীমার ঊর্ধ্বচারী আত্মার অবারিত কক্ষে ইহাদের শব্দহীন সঞ্চরণ। এগুলিতে ভাষণের প্রগল্‌ভতা নাই, শান্তসমাহিত চিত্তের সংযমে ইহারা শাসিত। এই পর্যায়ের প্রত্যেকটি কবিতা ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ, প্রেমের রহস্যময়তায় সুন্দর, অনুভূতির গভীরতায় চিত্তস্পর্শী।

কবি আমাদিগকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন, প্রেমের রহিয়াছে এক পরমাশ্চর্য শক্তি। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ-পরিচয়টিকে প্রেম যেমন করিয়া উদ্‌ঘাটিত করে, তেমনটি অন্যকিছু নয়। লৌকিক পরিচয়ের ছদ্মবেশ খসাইয়া প্রেম মানুষের ভিতরকার 'চির-অচেনাটি'কে বাহির করিয়া আনে। এ সংসারে মানুষকে আমরা কতটুকুই বা চিনি! প্রতিটি মানুষ নির্বাক অনতিক্রমণীয় রহস্যের আবরণে আচ্ছাদিত—'আপনি একাকী, সেখানে তার দোসর নাই।' মানুষ নিজেও যেমন নিজের নিঃশেষ পরিচয় জানিতে পারে না, তেমনি অন্যেরও নাগালের বাইরে সে। লৌকিক পরিচয় মানুষের সত্যতম পরিচয় নয়। নামের সীমায় আসল মানুষটিকে সামান্যই ধরা যায়। কিন্তু আমরা নিজের ও অপরের অন্তরতম পরিচয় পাই প্রেমের দিব্যালোকবিচ্ছুরণে। যখন কাহাকেও আমরা ভালোবাসি, সেই নিবিড় ভালোবাসার দক্ষিণা-বাতাসের স্পর্শে আমাদের সীমার আড়ালটি মুহূর্তেই অপসারিত হয়।

কবি রবীন্দ্রের প্রেমানুভবের স্বরূপ

আমাদের ভালোবাসার মানুষটি দেহাশ্রিত সীমিত রূপের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। তথাপি প্রেমের রহিয়াছে দেহাতিশায়ী সীমাহীন একটা ব্যাপ্তি। দেহের রূপের সীমায় যতক্ষণ নিজেকে অর্গলিত রাখি, ততক্ষণ আমরা ওই ব্যাপ্তির দিকটিকে চিনিতে পারি না। কিন্তু বিরহের মুহূর্তে আমরা সন্ধান পাই বিদেহী প্রেমসৌন্দর্যের অনির্বচনীয় নিঃসীমতার।

প্রেমানুভূতির স্বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত ক্ষণমুহূর্তগুলি কবির দৃষ্টিতে অবিনশ্বর, উহাদের প্রতিষ্ঠা অনন্ত স্মৃতির ভূমিকায়। মানুষ আপন অস্তিত্বের সত্যতম পরিচয় পায় নিবিড় ভালোবাসার মুহূর্তে, তাহার যথার্থ বাঁচিয়া থাকা ওই মুহূর্তগুলির মধ্যেই—'এই নিমেষটুকুর বাইরে আর-যা-কিছু সে গৌণ।' চতুর্দিকের মহামরণের মাঝখানে কেবল প্রেমের কণ্ঠেই ঘোষিত হয় অমরতার বাণী—'আমি আছি।' কালে কালে সবকিছুই সরিয়া যায় বিস্মরণের নেপথ্যে, থাকে শুধু নিবিড়

ভালোবাসার মুহূর্তগুলি, যাহা দেশকালে আবদ্ধ মানুষকে মনে করাইয়া দেয় তাহার সত্তার অসীমতার কথা।

যক্ষের প্রতি সম্বোধিত কবিতাটির মধ্য দিয়া কবি আসক্তির কালিমাশূন্য বিরহদীপ্ত প্রেমের প্রশস্তি উচ্চারণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমের ক্ষেত্রে দেহবাদের বিরোধিতা খুব স্পষ্ট হইয়া চোখে পড়ে। তিনি পরিপূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়াতীত ভালোবাসায় বিশ্বাসী। দেহগত প্রেমের মধ্যে কামনার কলুষ আছে, তাহাকে সৌন্দর্যসন্ধানী কবি স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। ইন্দ্রিয়ের দাবিতে, নিকটতম সান্নিধ্যের ক্লান্তিতে চিরসুন্দর প্রেম ব্যর্থ ও মিথ্যা হইয়া যায়। এইজন্য কবি মিলন অপেক্ষা বিরহকে কাম্য মনে করিয়াছেন, বাস্তব অপেক্ষা মানসিক অভিসারকেই প্রার্থনীয় বোধ করিয়াছেন। দেহকেন্দ্রিক মিলন 'যাকে চায় তাকে রুদ্ধ করেছে বন্ধনে, ভুলে যায় আসক্তি নষ্ট করে প্রেমকে, আগাছা যেমন ফসলকে মারে চেপে।'[১] দেহের স্থূল আলিঙ্গনের মধ্যে আমাদের প্রিয়জনকে আমরা সম্পূর্ণ পাই না। কেন-না, সেখানে রহিয়াছে মোহের আড়াল, ইন্দ্রিয়ের দস্যুতা। সেই স্থূল মিলনের ক্ষেত্র হইতে বহির্লোক তিরস্কৃত বলিয়া উহা সংকীর্ণ, উহাতে পরিপূর্ণতার স্বাদ নাই। তাই 'মেঘদূত'-এর যক্ষ যতদিন তাহার প্রিয়াকে আসক্তি দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছিল ততদিন তাহাকে পূর্ণ করিয়া পায় নাই। যক্ষ চিরবাঞ্ছিত প্রিয়তমাকে যথার্থ পাইল বিচ্ছেদের দুঃসহ বেদনার মধ্য দিয়া—যেদিন অপসারিত হইল সীমার সংকীর্ণতা, দূর হইল ভোগাসক্তির শেষ চিহ্নটুকু—যুগল উৎসবের নির্জনতা হইতে যেদিন সে বাহির হইয়া আসিল বিশ্বলোকের অবারিত মন্দিরপ্রাঙ্গণে।

রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় রহস্যময় দূরের প্রতি একটা সুগভীর আর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। দূরের মধ্যে তিনি দেখিতে পাইয়াছেন তাঁহার সুন্দরকে,—যে-সুন্দর স্পর্শের অগম্য, বস্তুর মধ্যে ধরা দিয়াও যাহা বস্তুর অতীত কিছু। কবির সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে দূরত্বের একটি অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে। অজ্ঞাত সুদূরের জন্য কবিচিত্তের এই যে ব্যাকুলতা, ইহা অসীমের জন্য সীমার বিরহ ছাড়া অন্যকিছু নয়। যে-মহাসত্তার প্রাণস্পন্দনধারা জগতের সমস্ত সুন্দর বস্তুর মধ্য দিয়া নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে—সীমার মধ্য দিয়া তাহার আত্মপ্রকাশ ঘটিলেও, সে চলিয়াছে সকল সীমাকে অতিক্রম করিয়া। এজন্য সুন্দর বস্তু, সুন্দর দৃশ্য, সুন্দর গান আমাদের মনকে অজ্ঞাত সুদূরের দিকে আকর্ষণ করে।

রহস্যময় দূরের প্রতি কবিচিত্তের আর্তি

এই গ্রন্থের দু-একটি কবিতায় কবি ছন্দ ও সুরের অর্থাৎ সংগীতের মর্মরহস্যের

উপর কথঞ্চিৎ আলোকপাত করিয়াছেন। মানুষের জ্ঞানের কথাকে প্রকাশ করিবার জন্যই অর্থময় ভাষার সৃষ্টি। ভাষা অর্থের সীমায় আবদ্ধ, সে যাহা বলে তাহা একান্ত সুস্পষ্ট—জ্ঞানের ভাষা অর্থের সীমা কখনো লঙ্ঘন করে না। কিন্তু মানুষ শুধু বুদ্ধিজীবী নয়, কেবল পাণ্ডিত্যই তাহার সর্বস্ব নয়। বুদ্ধির বাইরে বোধের এলাকাতেও মানুষের নিত্য-যাওয়াআসা। সুখদুঃখ, আনন্দবেদনার আন্দোলনে প্রতিটি মানবমানবীর চিত্তদেশ নিরন্তর আন্দোলিত হইতেছে। তাহার এই নিবিড় অনুভূতিকে, গতিস্পন্দিত হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করিবার জন্যই প্রয়োজন ছন্দ ও সুরের। কথাকে বহন করিয়া মানুষ কিছুদূর অগ্রসর হইতে পারে, নির্দিষ্ট একটা সীমার পর কথা কিন্তু অচল। তখন কথাকে ছাড়িয়া মানুষ খোঁজে ইঙ্গিত, খোঁজে ব্যঞ্জনা, খোঁজে ছন্দ আর সুর—ভাষা এস্থলে একেবারে নির্বাক। বুদ্ধির জগতের মানুষ বলে কথা, ভাবের জগতের মানুষ করে গান। এই গানের ছন্দের মধ্য দিয়াই সংসারের নরনারী বিশ্বনাচের ছন্দের সঙ্গে সুর মেলায়—'মানুষ কাব্য রচে বোবার বাণী।'

ছন্দ ও সুরের মর্মরহস্য-উদ্‌ঘাটন

আটাশ-সংখ্যক কবিতার মূল বক্তব্য হইল, নিখিল সৃষ্টির সার্থক অস্তিত্ব মানুষের ব্যক্তিত্বের চেতনার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। মানুষ যদি তাহার নিগূঢ় উপলব্ধির মধ্য দিয়া বস্তুবিশ্বের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের সংযোগস্থাপন না করিত, তাহা হইলে জগৎসংসারের সমস্ত রূপসৌন্দর্য মুহূর্তেই মিথ্যা হইয়া যাইত। বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের রচনা হইলেও তাহার যথার্থ সত্য নিহিত রহিয়াছে মানুষের নিবিড় অনুভূতির মধ্যে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে শুকতারার যে-সত্য তা তাহা আংশিক, অসম্পূর্ণ। বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত গ্রহটিকে সাধারণ মানুষ যেদিন তাহার হৃদয়ানুভূতির সহিত জড়াইয়া লইল, সেইদিনই শুকতারার পরিচয়ে অসম্পূর্ণতা দূর হইল—সার্থক হইয়া উঠিল তাহার অস্তিত্ব।

সৃষ্টির অস্তিত্ব ও মানুষের ব্যক্তিত্বের চেতনা

দু-একটি কবিতায় কবি তাঁহার কতকগুলি আনন্দচঞ্চল ক্ষণমুহূর্তকে বাণীরূপের বন্ধনে বাঁধিয়াছেন। এগুলিকে কবির অতীতস্মৃতিপরিক্রমা বলা যাইতে পারে। এগুলি মুহূর্তের আনন্দোচ্ছ্বাসের লীলাচপল ঊর্মি, কালের সর্ববিধ্বংসী স্রোত যাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই।

আলোচ্যমান 'শেষসপ্তক' গ্রন্থখানি গদ্যছন্দে রচিত অভিনব কাব্য। গদ্য-কবিতা রবীন্দ্রনাথের নূতন সৃষ্টি। এই জাতের কবিতার মাধ্যমে ভাষা ও ছন্দোরীতির ক্ষেত্রে যে-পরিবর্তন তিনি আনিয়াছেন, তাহা যুগান্তকারী বলিলে

অত্যুক্তি হইবে না। গদ্যকবিতার সৃষ্টি করিয়া রবীন্দ্রনাথ পদ্যের সীমারেখাটি অনেকখানি বাড়াইয়া দিয়াছেন। ছন্দের ঐন্দ্রজালিক রবীন্দ্রনাথ কাব্য রচনা করিতে বসিয়া, বিশুদ্ধ পদ্যরীতিকে পরিহার করিয়া, কেন গদ্যভূমিতে পদচারণায় অবতীর্ণ হইলেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। আমাদের মনে হয়, কতকটা বৈচিত্র্যসাধনের প্রয়াসী হইয়া, কতকটা কৌতূহলবশে, এবং কতকটা প্রয়োজনবোধেই কবিতায় তিনি গদ্যছন্দের আশ্রয় লইয়াছেন। 'পুনশ্চ'-এর যুগ হইতে দেখা যায়, কবির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পরিবর্তন আসিয়াছে, তাঁহার ভাবজগতে দেখা দিয়াছে অনুভূতির নূতনত্ব। এতদিন কবি ছিলেন নিজস্ব ভাবাদর্শ ও স্বপ্নকল্পনারাজ্যের অধিবাসী। এখন কিন্তু কবি নামিয়া আসিয়াছেন একেবারে মাটির পৃথিবীর বাস্তব বৈচিত্র্যের মধ্যে। বিষয়বস্তুর আভিজাত্য বর্তমানে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে না—ধূলার জগতের সামান্য সাধারণ বস্তু, অকিঞ্চিৎকর ঘটনার মধ্যে তিনি দেখিতেছেন অনির্বচনীয় সৌন্দর্যসুষমা, ধারণাতীত মাহাত্ম্য। অবহেলিত, উপেক্ষিত বাস্তবের মধ্যেও যে কত বিস্ময়, কত আনন্দ আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে, তাহা বুঝি এই প্রথম কবির চোখে ধরা পড়িল। সর্বব্যাপী সামান্যের স্পর্শলাভের জন্য কবি আকুলতা অনুভব করিলেন,—বাস্তব সংসার কবিকে যোগাইল কাব্যরচনার প্রেরণা। এখন সেইজন্যই বোধ করি কবি গদ্যছন্দকে করিলেন তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীর বাহন।

শেষসপ্তক কাব্যের ছন্দোরীতি

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতুচ্ছ বাস্তবকে লইয়াই এখন কবির কারবার। তাই তাঁহার কাব্যও বর্জন করিয়াছে ভাষার অলংকরণসজ্জা, ছন্দের ললিতমধুর ঝংকার—পদ্যরীতি আসিয়া পৌঁছিয়াছে গদ্যরীতির কাছাকাছি। কবি আশ্চর্য কুশলতার সহিত 'ভাষার গান আর ভাষার গৃহস্থালি'র মধ্যে সেতু রচনা করিলেন। গদ্যকাব্যে তিনি যে-ছন্দ প্রয়োগ করিলেন 'সেই ছন্দের আপস হয়ে গেল ভাষার স্থলে-জলে'। কবি আজ ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন 'ছন্দের সেই পুরাণো পেয়ালাখানা'। কেন? 'ছন্দের আভিজাত্যের সুশাসনে বাঁধা' পদ্যকবিতায় নাই আপন-খেয়ালে-ছুটিয়া-চলা ঝর্ণার 'দুরন্ত নাচের ছন্দ'। কবি আজ আর 'ফুলবাগানের ফুলগুলিকে তোড়ায়' বাঁধিবেন না, 'গাছের ফুলে-ডালে-পালায় সব মিলিয়ে' যাহা পাওয়া যায়, সেদিকেই তাঁহার ঝোঁক।

কবির বাস্তবচেতনা ও গদ্যছন্দ

এই যে বাস্তবের মধ্যে পদক্ষেপণের প্রয়াস, তাহার সঙ্গে সংগতি রহিয়াছে গদ্যের। 'পুনশ্চ'-এর যুগে কবি তাই কাব্যে গদ্যরীতিকে বরণ করিয়া লইলেন।

শেষসপ্তক-এও কবি 'পুনশ্চ'-এর গদ্যরীতিকে অনুসরণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ একদিন নামগোত্রহীন, আভিজাত্যের গরিমাশূন্য কোপাই নদীর গতিচ্ছন্দের মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহার গদ্যছন্দের সাদৃশ্য। আজ সেই অনভিজাত কোপাই-এর চতুষ্পার্শের অবজ্ঞাত বস্তুনিচয়ের মধ্যে দেখিতেছেন নব-আবিষ্কৃত গদ্যছন্দের ঐক্য।

কবি যে-উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া গদ্যছন্দে কবিতা-রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা কতখানি সার্থক হইয়াছে, বর্তমান নিবন্ধের স্বল্প আয়তনের মধ্যে তাহার আলোচনা সম্ভব নয়। তবে গদ্যকবিতায় ছন্দোশিল্পী রবীন্দ্রনাথ যে অসামান্য সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, সে সত্যটি অবিসংবাদিত।

ছোটছোট জন্মমৃত্যুর নানা সীমানায় রবীন্দ্রনাথের ছবি

শেষসপ্তক-এর তেতাল্লিশ-সংখ্যক কবিতাটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কবিতাটিতে কবি 'ছোট ছোট জন্মমৃত্যুর সীমানায় নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা' রচনা করিয়াছেন। ইহাতে মিলিবে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব-অতিক্রান্ত কবি রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র মূর্তির সুন্দর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই কবিতায় রবি-কবির অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে, তাঁহার কাব্যজীবনের স্বপ্নকল্পনা ও আদর্শের সুস্পষ্ট পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে :

> ব্যর্থ-চরিতার্থের জটিল সংমিশ্রণের মধ্য থেকে
> যে আমার মূর্তি
> তোমাদের শ্রদ্ধায়, তোমাদের ভালবাসায়,
> তোমাদের ক্ষমায় আজ প্রতিফলিত,
> তাকেই আমার পঁচিশে বৈশাখের
> শেষ বেলাকার পরিচয় বলে
> নিলেম স্বীকার করে।

পরিণত বার্ধক্যের এই মূর্তিটিই রবীন্দ্রনাথের 'মানসমূর্তি'। গুণমুগ্ধ ভক্তবৃন্দের সম্মুখে এই মূর্তিটি উপস্থাপিত করিবার পর কবিগুরু বলিলেন :

> দাও আমাকে ছুটি—
> জীবনের কালোসাদা সূত্রেগাঁথা
> সকল পরিচয়ের অন্তরালে,
> নির্জন নামহীন নিভৃতে ;

নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সংগীতের গভীরতায়।

হয়তো কবি মনে করিয়াছেন শেষসপ্তক-এ তাঁহার কাব্যজীবনের 'চরম সংগীত' ধ্বনিত হইয়াছে—ইহার পর তাঁহার সংগীতের পালা শেষ। বোধকরি সেজন্যই বার্ধক্যের সীমান্তবর্তী কবি বর্তমান গ্রন্থখানির নামকরণ করিয়াছেন—'শেষসপ্তক'।

রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র'

[**রচনার সংকেতসূত্র :** ছিন্নপত্র এক আশ্চর্য গ্রন্থ—রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য বিপুলায়তন—ছিন্নপত্র একখানি অতিশয় মূল্যবান গ্রন্থ—সত্যকার চিঠির গুণধর্ম—ছিন্নপত্রে ব্যক্তিগত রস কতখানি রয়েছে—রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা—রবীন্দ্রসাহিত্যপঠনে ছিন্নপত্র অপরিহার্য কেন—ছিন্নপত্র ও কবির পদ্মাবাসের জীবন—রবীন্দ্রসাহিত্যে পদ্মার প্রভাব—নিসর্গসংসার ও মানবসংসারের সঙ্গে কবির পরিচয়সাধন—কবির নিবিড়তম প্রকৃতি-অনুভব—গ্রন্থের শেষের দিকের চিঠিগুলোতে কবিমনোভাবের পরিবর্তন—ছিন্নপত্রে কবির বিবিধ মনোভাবের প্রতিবিম্বন—ছিন্নপত্রে হাস্যরসিক রবীন্দ্রনাথ—ছিন্নপত্রের সৌন্দর্যমহিমা ও ঐতিহাসিক মূল্য—উপসংহার।]

ছিন্নপত্র এক আশ্চর্য গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' এক আশ্চর্য গ্রন্থ। স্বাদে অপূর্ব, লিপিচাতুর্যে অতুলনীয়। কবির লিখিত যে-পত্রসাহিত্য এ পর্যন্ত আমাদের হাতে এসেছে, 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থখানিকে নিঃসংশয়ে তার মধ্যমণি বলা যেতে পারে। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', 'রাশিয়ার চিঠি', 'পথে ও পথের প্রান্তে', 'চিঠিপত্র' ইত্যাদি গ্রন্থ যাঁরা পড়েছেন সমালোচ্য গ্রন্থটির স্বাদের অপূর্বতা ও এর অন্তর্লীন সৌন্দর্য তাঁরাই সঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে 'ছিন্নপত্রে'র মূল্য অসাধারণ—কেবল সাহিত্যিক কারণে নয়, অপরবিধ কারণেও। সে-কথা পরে বলছি।

পৃথিবীতে খ্যাতনামা পত্রলেখক বলে যাঁরা পরিচিত, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের

একজন। সাহিত্যজীবন ও কর্মজীবনের সুদীর্ঘ অধ্যায়ে কবিকে অগণিত মানুষের সংস্রবে আসতে হয়েছিল, সামাজিক জীবনে লোকব্যবহারও যথাসাধ্য রক্ষা করতে হয়েছিল। ফলে যৌবনের প্রারম্ভ থেকে মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব-পর্যন্ত তাঁকে অবিরত চিঠিপত্র লিখতে হয়েছে—কাছের ও দূরের মানুষকে, আত্মীয় ও অনাত্মীয়কে, দেশে ও বিদেশে, বাংলায় ও ইংরেজীতে। জীবনে ষাট বছরেরও অধিককাল ধরে রবীন্দ্রনাথ যতসব চিঠিপত্র লিখেছেন তার একটি ভগ্নাংশমাত্র পাঠকের গোচরে এসেছে, বৃহত্তর অংশ এখনো অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। আমরা আশা করতে পারি, যথাকালে এগুলি সম্পাদিত হয়ে রবীন্দ্রপত্রধারাকে সম্পূর্ণতা দান করবে। উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার মধ্যে পত্ররচনাও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কবির পত্রাবলীর কতকগুলি পত্র তাঁর অনন্যসাধারণ কবিমানসের পরিচয় বহন করছে—'ছিন্নপত্র' এই শ্রেণীর সাহিত্যিক-পত্ররচনার অন্যতম।

রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য বিপুলায়তন

'ছিন্নপত্রে' প্রকাশিত চিঠিগুলি কবিবন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা। প্রকাশকালে এগুলিকে ছিন্ন করা হয়েছে। অচ্ছিন্ন বা অখণ্ড অবস্থায় এসব চিঠি কী আকারে ছিল তা জানবার উপায় নেই। কবি পত্রলিখনের পঁচিশ বছরেরও অধিক কাল পরে ব্যক্তিগত অংশগুলি বাদ দিয়ে এবং কিছু কিছু সংস্কারসাধন করে পত্রগুলিকে গ্রন্থাকারে ছাপাতে অনুমতি দিয়েছেন। ফলত 'ছিন্নপত্র'কে পত্রাংশের সংকলন বলা যেতে পারে। পত্রগুলির রচনাকাল ইংরেজী ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৫ সাল। কিন্তু প্রথম পাচ বছরে লেখা চিঠির সংখ্যা এতে অল্প। ১৮৯১-৯২ থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত লিখিত চিঠির সংখ্যাই বেশি, এবং এগুলি অতিশয় মূল্যবান রচনাও বটে।

ছিন্নপত্র একখানি অতিশয় মূল্যবান গ্রন্থ

রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন যে, ১৮৯১-৯২ থেকে ১৮৯৫-৯৬ পর্যন্ত পাঁচছয় বছর রবীন্দ্রপ্রতিভার বিকাশের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কবির চিত্তে বিশিষ্ট নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যব্যাকুলতা একালেই প্রকাশ ও পূর্ণতা লাভ করে। তাঁর অসাধারণ মর্ত্যপ্রীতি বা মৃত্তিকামমতার স্ফুরণও এসময়ে হয়েছিল। একই কালে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প-রচনায় উদ্বুদ্ধ হন এবং তাঁর ইন্দ্রজালশক্তিসম্পন্ন লেখনী একালে অনেকগুলি অনবদ্য ছোটগল্প সৃষ্টি করে। 'ছিন্নপত্রে'র পাতায় রোম্যান্টিক কবি-রবীন্দ্রের ওই সময়কার মনোভাবের স্বলিখিত বিবরণ রয়েছে। সুতরাং আলোচ্যমান গ্রন্থখানির মূল্যায়ন করতে হলে কবির এ সময়কার অন্তর্বিধ

সাহিত্যকর্মের সঙ্গে একে মিলিয়েও দেখতে হবে। 'ছিন্নপত্রে'র দ্বারা রবীন্দ্রনাথের একালের গল্প ও কাব্যসৃষ্টিকে বুঝতে হবে এবং কাব্যকথার দ্বারা ছিন্নপত্রে বিধৃত চিঠিগুলোর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে হবে। কবিমানসের গোপন অন্তরালে যে-বিস্ময়কর সৃষ্টিক্রিয়া চলতে থাকে তার স্বরূপ পাঠকেরা ধারণা করতে অক্ষম, তারা শুধু কবির কাব্যরূপ পরিণত ফলটিকেই দেখতে পায়। কিন্তু ঐ সঙ্গে যদি কবির মনোলোকের রহস্য এবং কবিচিত্তে ভাবের অঙ্কুরোদ্গমের পরিচয়ও কিছু লাভ করা যায় তাহলে পাঠকের পক্ষে তার চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে? রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই উপরি-পাওনার আনন্দ দান করেছেন ছিন্নপত্র বইখানির মাধ্যমে।

ছিন্নপত্র পত্রসংকলন। সুতরাং গ্রন্থটিতে সত্যিকার চিঠির গুণধর্ম কতখানি প্রকাশ পেয়েছে তা অবশ্যই আলোচনার যোগ্য। অনেকেই বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলো পড়ে আমরা যে-রস আস্বাদন করি, আসলে তা সাহিত্যের—খাঁটি জাতের চিঠির রস এগুলিতে নেই। 'চিঠির রস' বলতে বুঝতে হবে 'ব্যক্তিগত রস'। সত্যিকার চিঠিতে লেখক, এবং যার উদ্দেশ্যে ওই চিঠি লেখা, উভয়েরই প্রাণের উত্তাপ—ভাববিনিময়ের পরিচয়—সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত থাকে। একান্ত আত্মকেন্দ্রিক কোনো মননকল্পনা নয়, কোনোরূপ তত্ত্ব কিংবা বিধিবদ্ধ আলোচনা অথবা তর্কবিচার নয়, কোনো আদর্শমূলক চিন্তার প্রকাশ নয়, কোনো উপদেশদানও নয়—হালকা চালে আলাপ করে যাওয়া, লঘুপদভরে চারদিকের তথ্যের সংসারের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ, প্রাত্যহিক জীবনে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের সংবাদপরিবেশন করাই হল চিঠিলেখার আসল উদ্দেশ্য। যে-চিঠিতে লেখকের ব্যক্তিসত্তার স্পর্শ নেই, যে-চিঠিতে লেখক নিজের ব্যক্তিসীমাকে ছাড়িয়ে যান, যে-চিঠি রচয়িতার অন্তরের রসে ও রঙে সঞ্জীবিত ও অনুরঞ্জিত নয়—তার মধ্যে অপরবিধ যত গুণই থাক-না কেন, উত্তম চিঠি তাকে বলা চলবে না। ভালো চিঠিতে রচয়িতা ও গ্রহীতার মনের সংযোগসূত্রটি কদাপি ছিন্ন হয় না, তা আদ্যন্ত অব্যাহতই থাকে। অর্থাৎ, উৎকৃষ্ট পত্রসাহিত্যে যাঁকে চিঠি লেখা হচ্ছে তিনি শুধু নিষ্ক্রিয় গ্রহীতার ভূমিকা গ্রহণ করেন না, ওই চিঠির মধ্যে আমরা তাঁর অলক্ষ্য উপস্থিতিও অনুভব করি। এদিক থেকে দেখলে বলতে হয়, উত্তম চিঠি লেখক ও প্রাপক দু-জনেরই রচনা—এক্ষেত্রে গ্রহীতা উপলক্ষ্যমাত্র নন, আসল লক্ষ্য। চিঠি হল লেখার ভিতর দিয়ে একজন মানুষের সঙ্গে আর-একজন মানুষের নিভৃত আলাপন, উভয়ে যেন মুখোমুখী বসে রয়েছেন। এ

সত্যিকার চিঠির গুণধর্ম

জাতের চিঠিতে বক্তব্যটা বড়ো কথা নয়, বলে-যাওয়াটাই বড়ো। কবির নিজের ভাষায় বলতে গেলে :

"যারা ভালো চিঠি লেখে তারা মনের জানলার ধারে বসে লেখে—আলাপ করে যায়—তার কোনো ভার নেই, বেগও নেই, স্রোত আছে।……চল্‌তি ঘটনার 'পরে লেখকের বিশেষ অনুরাগ থাকা চাই, তাহলেই তার কথাগুলি পতঙ্গের মতো হাল্‌কা পাখা মেলে হাওয়ার উপর দিয়ে নেচে যায়। অত্যন্ত সহজ বলেই জিনিসটি সহজ নয়।…ভারহীন সহজের রসই হচ্ছে চিঠির রস। সেই রস পাওয়া এবং দেওয়া অল্পলোকের শক্তিতেই আছে। কথা বলবার জিনিস নেই অথচ কথা বলবার রস আছে, এমন ক্ষমতা কজন লোকের দেখা যায়। জলের স্রোত কেবল আপন গতির সংঘাতেই ধ্বনি জাগিয়ে তোলে, তার সেই সংঘাতের উপকরণ অতি সামান্য—তার নুড়ি, বালি, তার তটের বাঁকচোর, কিন্তু আসল জিনিসটা হচ্ছে তার ধারার চাঞ্চল্য। তেমনি যে-মানুষের মধ্যে প্রাণস্রোতের বেগ আছে সে-মানুষ হাসে, আলাপ করে, সে তার প্রাণের সহজ কল্লোল,—চারদিকের যে-কোনো কিছুতেই তার মনটা একটুমাত্র ঠেকে তাতেই তার ধ্বনি ওঠে। এই অতিমাত্র অর্থভারহীন ধ্বনিতে মন খুশি হয়—গাছের মর্মরধ্বনির মতো প্রাণআন্দোলনের এই সহজ কলরব।" [৩৭-সংখ্যক চিঠি : 'পথে ও পথের প্রান্তে']

উপরে যে-কথাগুলি বলা হল তা থেকে বোঝা যাবে—'ব্যক্তিগত রস', 'ভারহীন সহজের রস'ই হচ্ছে পত্রসাহিত্যের বিশিষ্ট গুণ। এখন জিজ্ঞাস্য, ছিন্নপত্রে এই গুণটি লক্ষ্য করা যায় কিনা। উত্তরে বলব, গ্রন্থখানিতে সন্নিবদ্ধ অনেকগুলো চিঠিতে ব্যক্তিমানুষ রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির সহজ প্রকাশ দেখতে পাই। এগুলি সাহিত্যকর্ম বা শিল্পকর্মহিসেবে নয়, সত্যিকারের 'ব্যক্তিগত' চিঠিহিসেবেই অনুধাবনীয় এবং উপভোগ্য। বন্ধু শ্রীশচন্দ্রকে লেখা অধিকাংশ চিঠিতে এবং ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে লেখা কয়েকখানি চিঠিতে কবি নিজের ব্যক্তিসীমাকে ছাড়িয়ে যাননি, আপনার কবিসত্তাটিকে প্রাধান্য দেননি, পত্ররচনার নামে স্বগতোক্তি করেননি বা সাহিত্যিক-প্রবন্ধ লেখেননি। এগুলিকে নিঃসন্দেহে খাঁটি চিঠির পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। ব্যক্তিগত অংশগুলি ছাঁটাই করা হলেও, ছিন্নপত্রের সবগুলি চিঠিকে সরকারী চিঠি মনে করার সঙ্গত কোনো হেতু নেই। 'ভানুসিংহের পত্র' এবং 'পথে ও পথের প্রান্তে'র তুলনায় ছিন্নপত্র অনেক বেশি 'ব্যক্তিগত'।

ছিন্নপত্রে ব্যক্তিগত রস কতখানি রয়েছে

রবীন্দ্রনাথ চিঠি লেখেন না, পত্রের নামে প্রবন্ধ লেখেন, সাধারণ্যে এরূপ একটা ধারণা প্রচলিত হওয়ার কারণ হল, বহুতর চিঠি পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্যেই তিনি লিখেছেন। আর, যেখানে এরূপ কোনো সজ্ঞান অভিপ্রায় নেই, সেখানেও তিনি জানতেন যে, যে-কোনো সময়ে তাঁর লেখা যে-কোনো চিঠি মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হতে পারে। জগৎজোড়া কবিখ্যাতিই অনেক ক্ষেত্রে তাঁর যথার্থ ব্যক্তিগত পত্র লেখনের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে, 'ছিন্নপত্র' রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজয়ী কবি হয়ে ওঠেন নি। তাই এ গ্রন্থে বিধৃত পত্রগুলিতে তিনি নিজেকে অনাবৃতভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন। তথাপি, দীর্ঘকাল পরে, কবির জীবদ্দশায়, পত্রগুলি যখন ছাপার অক্ষরে বার হল তখন বোধ করি সঙ্কোচবশেই কবি নিজের ব্যবহারিক জীবনের কথা, বন্ধুবান্ধবের পরিচয় ইত্যাদি অপসারিত করে সেগুলিকে ছিন্ন আকারেই পাঠক-সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করলেন। ফলে কবির ব্যক্তিসত্তা অনেকখানি চাপা পড়ল, তাকে ছাপিয়ে উঠল তাঁর কবিসত্তা—ব্যক্তিত্বের ভাবরূপটি। এতে একদিকে আমাদের ক্ষতি হল, অন্যদিকে আমরা লাভবান হলাম। ক্ষতি হল এ কারণে যে, ব্যক্তিমানুষটি আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন, তাঁর জীবনেতিহাস-রচনার উপকরণ হ্রাস পেল। লাভের দিকটি হল—যে-শিল্পীমানুষটি প্রাত্যহিক তথ্যপুঞ্জের আড়ালে প্রচ্ছন্ন ছিলেন, তথ্যভার অপসারিত হওয়ায় তাঁর প্রতিকৃতিটি আমাদের কাছে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল—কবি-রবীন্দ্রকে চিনে নেওয়ার কাজটি অধিকতর সহজ হল।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের কবিব্যক্তিত্ব বা রবীন্দ্র-কবিপুরুষের নিবিড়তম সান্নিধ্যে আসতে হলে, কবির জীবনদর্শন তথা কাব্যদর্শনের সঙ্গে পরিচয়সাধন করতে গেলে, রবীন্দ্রকবিমানসের অলিগলিতে অবাধে প্রবেশ করতে চাইলে, ছিন্নপত্রের দ্বারস্থ না হয়ে উপায় নেই। এই বইটির পাতা উল্টোলে পাঠক একেবারে কবির সাম্‌না-সাম্‌নি এসে দাঁড়াবেন, প্রত্যেকটি ছত্রের ভিতর দিয়ে কবির নির্ভুল কণ্ঠস্বর শুনতে পাবেন। এই পত্রগুলির মধ্যে কবি-রবীন্দ্রের একটি বিশেষ কালের কল্পলোক অতিশয় স্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। ছিন্নপত্র রবীন্দ্ররসিক এবং ঐতিহাসিক উভয়ের পক্ষেই অপরিহার্য একখানি গ্রন্থ। এ ধরণের চিঠিগুলোকে আমরা কবিমানসের দিনলিপি বলে মনে করতে পারি। এতে কবি তাঁর সৃষ্টিক্রিয়াশীল মনটিকে যেরূপ সহজে প্রকাশ করেছেন, এমনটি আর কুত্রাপি নয়।

রবীন্দ্রসাহিত্যপঠনে ছিন্নপত্র অপরিহার্য কেন

পৃথিবীর অপর-কোনো কবি নিজেকে এতখানি উদারভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন কিনা, আমাদের জানা নেই। কবির পত্রসাহিত্য তাঁর রচিত অন্যবিধ সাহিত্যের উজ্জ্বল ভাষ্য রচনা করেছে। এ কারণে রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠিপত্রকে —বিশেষ করে ছিন্নপত্রকে—তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের পরিপূরকরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ছিন্নপত্র ও কবির পদ্মাবাসের জীবন

সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি-ছিন্নপত্র ইত্যাদি গ্রন্থপ্রণয়নকালে রবীন্দ্রনাথের বাস প্রধানত পদ্মাতীরে। কবির পদ্মাবাসের জীবন—সে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। রবীন্দ্রসাহিত্যে পদ্মার প্রভাব কত ব্যাপক ও গভীর তা দু-এক কথায় বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়। ছিন্নপত্রের প্রথম দিকের কয়েকটি বাদ দিলে অধিকাংশ পত্রের পশ্চাতেই পদ্মাতীরের চতুষ্পার্শ্বের প্রাকৃতিক পটভূমি বিদ্যমান। এখানকার উন্মুক্ত নিসর্গসংসারের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে, দিগন্তবিস্তার নীলাকাশের তলে বসে এবং খরস্রোতা পদ্মার উপর দিয়ে তরীতে যাত্রাকালে কবি পরিদৃশ্যমান নিসর্গপ্রকৃতির সূক্ষ্ম বর্ণবৈচিত্র্যগুলি লক্ষ্য করেছিলেন, ধূলি-তৃণ-লতা-সমন্বিত মাটির পৃথিবীকে জন্মান্তরের আত্মীয়রূপে অনুভব করেছিলেন এবং এহেন প্রকৃতিপরিবেশের সঙ্গে একাত্ম গ্রাম্যমানুষগুলির প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করেছিলেন। পদ্মাতীরের প্রকৃতি-সৌহার্দ কবির কল্পনা ও অনুভূতিকে যে-ব্যাপ্তি ও ঐশ্বর্য দান করেছে, পৃথিবীর কোনো সাহিত্যে তার তুলনা পাওয়া যাবে কিনা, সন্দেহ।

রবীন্দ্রসাহিত্যে পদ্মার প্রভাব

কেবল রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট রোম্যান্টিক কল্পনার উন্মেষেই নয়, তার ওই কল্পনাভঙ্গির ক্রমপরিণামেও পদ্মার প্রভাব অসামান্য। চিত্রা-চৈতালির পরবর্তী বহু কাব্য ও সঙ্গীতে যখনই কবি মানবজীবনের গতিশীলতা ও সংস্কারমুক্তির দিকটি উপলব্ধি করেছেন তখন নদীবক্ষে তরীতে যাত্রার সময়কার বিভিন্ন দৃশ্য তাঁর কল্পনার প্রতীকচিহ্নরূপে অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে। ছিন্নপত্রে পদ্মা ও পদ্মাতীরের বিভিন্ন বিচিত্র রূপ এবং তার সঙ্গে কবিসৌহার্দের ব্যাপক সংমিশ্রণের সুবিস্তৃত পরিচয় চমৎকার বাণীবদ্ধ হয়েছে। শিলাইদহ, সাজাদপুর, কালিগ্রাম, পতিসর—ইছামতী-নাগর-গোরাই নদী—প্রভৃতি স্থানের প্রকৃতিলোকের সঙ্গে কবির সুনিবিড় অন্তরঙ্গতার কথা সমালোচ্য গ্রন্থের নানাপত্রে পরিস্ফুট। প্রকৃতি-সৌহার্দ সম্পর্কে এই বিশিষ্ট পত্ররচনাবলীর মাধ্যমে শুধু যে কবিই নিজের বহুবিচিত্র বাসনা নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এমন নয়,—সমস্ত পদ্মাতীরের

নিসর্গপ্রকৃতি কখনো হাস্যমুখে, কখনো বিষণ্ণভাবে, কখনো তার অর্থভরা বিপুল নীরবতা নিয়ে আমাদের সম্মুখে মূর্তি ধরে দেখা দিয়েছে। এ সব পত্রে প্রকৃতি তার প্রাণস্পন্দনের লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য নিয়ে জেগে উঠেছে। মূক প্রকৃতিকে এভাবে মুখর করে তোলার ফলে ছিন্নপত্র নিত্যকালের আস্বাদনীয় রোম্যান্টিক সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এহেন যে পদ্মা, কবি যখনই সুযোগ পেয়েছেন, আবেগকম্পিত কণ্ঠে তার কথা বলেছেন :

'বাংলা দেশের নদীতে-গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নূতনত্ব। আমি শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা মানিনি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি—বৈশাখের খররৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের ছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্যসঙ্গম চলছিল আমার জীবনে, অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছোচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।·· সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি, কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা—বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা' ['সোনার তরী'র ভূমিকা : রবীন্দ্ররচনাবলী]। এই সময়কার ফসল ভরা হয়েছিল একদিকে সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালিতে, অন্যদিকে ছিন্নপত্রে।

পদ্মাপ্রকৃতির সঙ্গে ছিন্নপত্রের যোগ অনবিচ্ছিন্ন। এই গ্রন্থের কত জায়গায় কবি পদ্মার প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা জানিয়েছেন। মানবীপ্রেয়সীকে মানুষ যেমন করে ভালোবাসে, পদ্মার প্রতি কবির ভালোবাসা ছিল অনেকটা তদ্রূপ—

নিসর্গসংসার ও মানবসংসারের সঙ্গে কবির পরিচয়সাধন

নদীকে রবীন্দ্রনাথ প্রায় ব্যক্তিরূপেই দেখেছিলেন। ছিন্নপত্রের অনেকগুলি চিঠি এই পদ্মার তীরে বসে লেখা। এই পদ্মাবাসের সময়েই রবীন্দ্রনাথ উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির অবারিত প্রসন্নতার সান্নিধ্যে এসেছিলেন। নিসর্গসংসার ও মানবসংসারের এতখানি নিকট-সংসর্গে এর পূর্বে কবি কখনো আসেননি। ছিন্নপত্র-সোনার তরী ইত্যাদি গ্রন্থগুলির পাতা উল্টোলে মনে হয়, পদ্মানদীর সঙ্গীতমুখর কলধ্বনি এবং নদীর উপরে ভাসমান উড়ন্ত মেঘের মায়ামধুরিমা দিয়েই ওইসব রচনা তৈরী হয়েছে। যেন পদ্মার বুকের বাণীই কবির বাণীকে এমন

উচ্ছ্বসিত এমন অনর্গল করে তুলেছে, যেন এই নটিনী পদ্মাই তাঁর লিখনের ছন্দে মিশিয়ে দিয়েছে আপনার অপরূপ নৃত্যভঙ্গিমা। বাংলার পল্লীপ্রকৃতির অজস্র সরস শ্যামলিমা ছিন্নপত্র-সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালির স্তরে স্তরে সঞ্চিত। চিত্রগৌরবে ও ধ্বনিলাবণ্যে ওইসব রচনা সত্যই অসাধারণ।

প্রকৃতির সংসার ও মানবসংসারকে কবি এমন নিবিড়ভাবে একসূত্রে গ্রথিত করতে পারতেন না, যদি-না তিনি পদ্মার আতিথ্য গ্রহণ করতেন। নিসর্গ-সৌন্দর্যের স্বপ্নলোক আর মর্ত্যজীবনের সুখদুঃখ, আনন্দবেদনার বহুবিচিত্র লীলা—উভয়েরই স্বচ্ছ প্রতিবিম্বন আমরা দেখতে পাই ছিন্নপত্রের পাতায়। মৃত্তিকার বুকে মানুষ বেঁধেছে তার ক্ষণকালের নীড়, সেই নীড়ের চতুষ্পার্শ্বে রূপময়ী প্রকৃতি ছড়িয়ে রেখেছে অফুরন্ত আনন্দ-সৌন্দর্যের পসরা—মানুষে-প্রকৃতিতে মিলে কী সুন্দর এই জীবন! চোখ দিয়ে দেখে নিতে পারলে, সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারলে, ওই জীবনের উৎসমূলে আনন্দের চিরন্তনী নির্ঝরিণীর সাক্ষাৎ মেলে—অনাবিল অক্ষয় শান্তির মধুময় স্পর্শ পাওয়া যায়। এর সন্ধান রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন পদ্মাবাসকালে, তার সুস্পষ্ট পরিচয় ছিন্নপত্র গ্রন্থখানিতে সোনার লেখায় চিহ্নিত রয়েছে।

কবির নিবিড়তম প্রকৃতি-অনুভব

একদিন নয় দু-দিন নয়, একমাস নয় দু-মাস নয়, এক বছর নয়, দু-বছর নয়—সুদীর্ঘ দশ-দশটি বছর রবীন্দ্রনাথ পদ্মার তীরে ও পদ্মার বুকে বোটে কাটিয়েছেন। এ সময়কার জীবনটি তাঁর কী সুন্দর! জীবনের সঙ্গে কাব্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। অন্নদাশঙ্কর যথার্থই বলেছেন—রবীন্দ্রনাথ 'জীবনশিল্পী'। জীবনটিকে কবি কাব্যের মতো করেই গড়ে তুলেছিলেন। এই যে কাব্য ও জীবনের একাঙ্গীকরণ, ছিন্নপত্র তারই নির্ভুল স্বাক্ষর বহন করছে। প্রতিদিনের তুচ্ছতার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে কবি নিজেকে সম্পূর্ণ প্রসারিত করে ধরেছেন আশ্চর্য-সুন্দরী প্রকৃতির দিকে। প্রকৃতির মর্মলোক থেকে আহরণ করছেন তিনি অমেয় আনন্দ, তার বিচিত্র রূপপ্রকাশ থেকে সংগ্রহ করছেন অন্তহীন সৌন্দর্য। পায়ের তলায় মাটির ধুলি, ঊর্ধ্বে নীলাকাশে সৌরমণ্ডল, ডাইনে-বাঁয়ে তরুলতার শ্যামল সমারোহ, বিপুল প্রাণস্রোতের শ্রুতঅশ্রুত কলধ্বনি। এদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কবি দুচোখ ভরে দেখে নিচ্ছেন মহাসৌন্দর্যের আনন্দনৃত্য,—যেমন প্রত্যক্ষ, প্রাণলীলায় তেমনি জীবন্ত। পদ্মাতীরের প্রকৃতিলোক কবির সৌন্দর্যসাধনাকে নিবিড় করে তুলেছে, আত্মোপলব্ধিকে গভীরতা দান করেছে, তাঁর জীবনদর্শনকে দিয়েছে বিশিষ্ট একটি রূপ। প্রকৃতির 'বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা'য় পাঠ নেবার

সুযোগ পেয়েছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ এত মহৎ কবি। ছিন্নপত্রের চিঠিগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের যে-রূপটি দেখি তা সৌন্দর্যসমুদ্রে নিমজ্জিত, আনন্দপারাবারে স্নাত, অগাধ শান্তির অতলান্ততায় সমাহিত ভাববিমুগ্ধ কবির। ধূ ধূ বালুচর, অনাবৃত আকাশ, নির্জন নদীতীর, দিগন্তপ্রসারী ক্ষেত আর মাঠ, ওপারের ছায়াঘন শ্যামশ্রী পল্লী, ধরণীর এক অজ্ঞাত সীমান্তের গ্রাম্যমানুষ, এসকল মানুষের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, এদের ছোটছোট সুখদুঃখের অস্ফুট গুঞ্জন—এইসব দৃশ্য কবি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করছেন, উপভোগ করছেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিত্ততন্ত্রীতে বেজে উঠছে বিচিত্র রাগিণী—ছিন্নপত্রে শুনতে পাই তার প্রতিস্পন্দন। আমাদের মধ্যে অনেকেই তো আমরা পদ্মাকে দেখেছি—প্রভাতে-মধ্যাহ্নে-সায়াহ্নে-নিশীথে। কিন্তু কবির মতো সমগ্র সত্তা দিয়ে পদ্মাতীরের সৌন্দর্য এমনভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি কী! বৃহৎ ও মহৎ আমাদের অন্তরদেশকে কবির মতো অতখানি আকর্ষণ করেছে কী:

'এই যে ছোট নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে এবং অনন্তধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতিরাত্রে শতসহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎসংসারে এ যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা, তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়। সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্বদিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে-এক প্রকাণ্ড পাতা উল্টে দিচ্ছে, সেই-বা কী আশ্চর্য লিখন! আর, এই ক্ষীণপরিসর নদী আর দিগন্তবিস্তৃত চর, আর ওই ছবির মতন পরপার, ধরণীর এই উপেক্ষিত একটি প্রান্তভাগ—এই-বা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা!'

[দশ]

পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে কবি প্রকৃতিকে অনুভব করছেন, প্রকৃতির রূপেরসে হৃদয়ের পাত্রটিকে কাণায় কাণায় ভরে তুলছেন; আর, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে জাগছে অগাধ বিস্ময়, প্রাণে নিঃসীম পুলকরোমাঞ্চ। নিসর্গলোকের এই অফুরন্ত সৌন্দর্য যে-মানুষ না দেখতে পেল তার মতো হতভাগ্য আর কে: 'এই সমস্ত রঙ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোকভূলোকের মাঝখানের সমস্ত শূন্য-পরিপূর্ণ-করা শান্তি এবং সৌন্দর্য, এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে! কত বড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা! আর, আমাদের ভিতরে তার সাড়া পাওয়াই যায় না! জগৎ থেকে এত তফাতেই বাস করি আমরা! লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছোয়, আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ

করতে পারে না—সে যেন আরো লক্ষ যোজন দূরে। রঙিন্ সকাল এবং রঙিন্ সন্ধ্যাগুলি দিগ্‌বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এক-একটি মাণিকের মতো সমুদ্রের জলে খসে পড়ে যাচ্ছে—আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না'। [তিপ্পান্ন]

কী ভালোবেসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এই প্রকৃতিকে, কী নিগূঢ় আত্মীয়তার সম্পর্ক পাতিয়েছিলেন এই বিচিত্ররূপা প্রকৃতির সঙ্গে ! রবীন্দ্রকাব্যে যে-সর্বানুভূতি বা বিশ্ববোধ আমরা দেখতে পাই তা বিশিষ্ট রূপগ্রহণ করেছে একালে, পদ্মাবাসের সময়ে। ছিন্নপত্রের অধিকাংশ চিঠিতে তিনি যে-সংবাদ জানিয়েছেন তা প্রধানত নিসর্গসংসারের—আকাশ-আলো-বাতাস, নদীর কলধ্বনি, চারদিকের তরু-লতা-পাতা, ঋতুতে ঋতুতে মাটির বুকে আর আকাশের গায়ে রূপ ও রঙের পরিবর্তন, সন্ধ্যাতারা আর ভোররাত্রির শুকতারা, জ্যোৎস্নার বিপ্লাবন, বর্ষার স্বপ্নালু সঙ্গীত, শরতের সোনালী রোদ, শীতের অলস দুপুর, গ্রীষ্মের প্রতপ্ত মধ্যাহ্ন, বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপ—এগুলির খবর জানাতে কবির কত-না আনন্দ ! প্রকৃতির সঙ্গে যেন তাঁর যুগযুগান্তরের জন্মজন্মান্তরের অচ্ছেদনীয় এক সম্পর্ক। প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিলে কবি যেন নিজেকে সম্পূর্ণ খুঁজে পান, 'বড়ো বেশি নিজের মত' হন। একখানা চিঠিতে তিনি লিখছেন : 'এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে আমার একটি মানসিক ঘর-কন্নার সম্পর্ক। জীবনের যে-গভীরতম অংশ সর্বদা মৌনী এবং সর্বদা গুপ্ত, সে-অংশটি আস্তে আস্তে বের হয়ে এসে এখানকার অনাবৃত সন্ধ্যা এবং অনাবৃত মধ্যাহ্নের মধ্যে নীরবে এবং নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে বেড়িয়েছে ; এখানকার দিনগুলো তার সেই অনেকদিনের পদচিহ্নের দ্বারা যেন অঙ্কিত'—[একশ বার]। কবির প্রকৃতি-অনুভব কতখানি নিবিড়, তা একবার লক্ষ্য করুন : 'আকাশব্যাপী স্নিগ্ধরাত্রি আমার রোমে রোমে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে উত্তাপ জুড়িয়ে দেয়—চোখ বুজে, কান পেতে, দেহ প্রসারিত করে প্রকৃতির একমাত্র জিনিসের মতো পড়ে থাকি, তার সহস্র সহচরী আমার সেবা করে। মনের কল্পনাও তার দুটি হস্তে থালা সাজিয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়, মৃদুমন্দ বাতাসের সঙ্গে তার কোমল অঙ্গুলির স্পর্শ আমার চুলের মধ্যে অনুভব করি।'—[একশ ষোল]

বাংলাদেশের প্রকৃতিকে এমন করে অপর-কোনো কবি ভালোবাসেননি, অন্যকোনো কবি প্রকৃতির সৌন্দর্যে এতখানি আত্মহারা হননি। প্রকৃতির বিরাট প্রাণের সঙ্গে নিজের সমগ্র চৈতন্যকে মিশিয়ে দিয়ে তিনি যে-বিশ্বাত্মীয়তা অনুভব করেছেন, যে-অপার আনন্দলোকে ও উদার শান্তিস্বর্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন, পৃথিবীর সাহিত্যে তার তুলনা নেই বললে এতটুকু অত্যুক্তি করা হয় না। বিশ্বের সঙ্গে কবির যোগ আনন্দের—প্রকৃতিপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ আনন্দতীর্থের যাত্রী।

ছিন্নপত্রের শেষের দিকের দু-একখানি চিঠিতে আমরা দেখতে পাই, কবি প্রকৃতির সংসার থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছেন, নিসর্গলোকের সৌন্দর্যমাধুর্য, নিরবচ্ছিন্ন শিল্পসাধনা তাঁর চিত্তকে যেন সম্পূর্ণ তৃপ্তিদান করছে না। কবির অন্তরে ক্রমশ যেন নতুন এক ব্যাকুলতা জাগছে—বড়ো জীবনে জেগে ওঠার ব্যাকুলতা। এবার প্রকৃতির সংসার থেকে মানবসংসারে প্রবেশ করার পালা শুরু হল—প্রেয়োস্বপ্নের সঙ্গে শ্রেয়োতপস্যার দ্বন্দ্ব দেখা দিল। তিনি এখন আঘাত-সংঘাতের মধ্যে নেমে আসতে চান, মানবকর্মশালার ডাক শুনতে পেয়ে আর স্থির থাকতে পারছেন না। যে-নতুন জীবনলাভের জন্যে কবির অন্তরের এই আর্তি, তার নাম মহাজীবন। নিজের অন্তরতর মানবসত্যই কবিকে আত্মকেন্দ্রিক সৌন্দর্যসাধনার জগৎ থেকে শ্রেয়োতপস্যার ক্ষেত্রে—জীবনের বৃহত্তর কর্মের ভূমিতে—পদক্ষেপ করবার প্রেরণা জুগিয়েছে। একশ উনচল্লিশ-সংখ্যক পত্রে কবি বলেছেন: 'কে আমাকে গভীর-গম্ভীরভাবে সমস্ত জিনিস দেখতে বলছে, কে আমাকে অতিনিবিষ্ট স্থির কর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সংগীত শুনতে প্রবৃত্ত করছে, বাইরের সঙ্গে আমার সমস্ত সূক্ষ্ম এবং প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে প্রতিদিন সজাগ সচেতন করে তুলছে। ·· কৃত্রিম জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলি একে একে উন্মুক্ত হয়ে যাক, মুগ্ধ সংস্কারের এক-একটি বন্ধন কঠিন বেদনার দ্বারা একান্ত ছিন্ন হোক, নিবিড় নিভৃত অন্তরতম সান্ত্বনার মধ্যে অন্তঃকরণের চিরসঞ্চিত উত্তাপ একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মুক্তিলাভ করুক এবং জগতের সঙ্গে সরল সহজ সম্বন্ধের মধ্যে অনায়াসে দাঁড়িয়ে যেন বলতে পারি—আমি ধন্য।' সহজে বুঝতে পারা যায়, এক নতুন সত্যের উপলব্ধি, এক নবজাগ্রৎ 'ধর্মবোধ' রোম্যান্টিক কবিকে ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক করে তুলছে।

গ্রন্থের শেষের দিকের চিঠিগুলোতে কবির মনোভাবের পরিবর্তন

ছিন্নপত্রে রবীন্দ্রনাথের গভীরতম কবিজীবনের 'পার্সোনাল খবর' আছে, সৌন্দর্যসাধনার সংবাদ আছে, আনন্দমন্ত্র-উচ্চারণ আছে, বিশ্বৈক্যানুভূতির প্রতিবিম্বন আছে, সাংসারিক সুখদুঃখের স্বরূপের বর্ণনা আছে, নারী ও পুরুষের সৌন্দর্যের পার্থক্যের কথা আছে, শিল্প ও কবিত্বের তত্ত্বালোচনা এবং অন্যবিধ গুরুগম্ভীর বিষয়েরও আলোচনা রয়েছে। একদিকে কবি যেমন 'সিরিয়াস্', আবার অন্যদিকে তিনি হাস্য-কৌতুক-ব্যঙ্গে একান্ত লঘুভার।

ছিন্নপত্রে কবির বিবিধ মনোভাবের প্রতিবিম্বন

রবীন্দ্রনাথ একজন বিশিষ্ট হাস্যরসিক। তাঁর স্বচ্ছ ও অপক্ষপাত দৃষ্টি সহজেই পারিপার্শ্বিক বিশ্বের অসঙ্গত বস্তুগুলিকে চিনে নিয়ে অন্তরে মুদ্রিত করে রেখেছে। বর্তমান পত্রসংকলন-গ্রন্থটিতে এরূপ হাস্যরসিকতার বহু পরিচয় নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত-

ভাবে ছড়ান রয়েছে। কয়েকটি স্থানের উল্লেখ করে আমরা এ পুস্তকের উপভোগ্য হাস্যরস উদ্ঘাটিত করে দেখাব। বন্ধু শ্রীশচন্দ্রের লেখা 'ফুলজানি' উপন্যাসের আলোচনাপ্রসঙ্গে বিদেশী সমালোচকদের কটাক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'এইরূপ নানা কারণে তিনি ঠিক করে রেখেছেন যে, পানিনি এমন একটি ঘোড়ার ডিম যা কোনো ঘোড়ায় পাড়েনি।' সাত-সংখ্যক চিঠিতে নিজের কোমরের বাত নিয়ে কবি আমাদের উচ্চকণ্ঠে হাসিয়েছেন : 'কবিরা যাই বলুন, আমি এবার টের পেয়েছি বাতের কাছে বিরহ লাগে না। কোমরে বাত হলে চন্দনপঙ্ক লেপন করলে দ্বিগুণ বেড়ে ওঠে, চন্দ্রমাশালিনী পূর্ণিমাযামিনী সান্ত্বনার কারণ না হয়ে যন্ত্রণার কারণ হয়, আর স্নিগ্ধ সমীরণকে বিভীষিকা বলে জ্ঞান হয়—অথচ, কালিদাস থেকে রাজকৃষ্ণ রায় পর্যন্ত কেউই বাতের উপর একছত্র কবিতা লেখেন নি।' এর পর দার্জিলিঙ্-যাত্রার মনোরম বর্ণনা : 'বাক্‌স দেখলে আমার দাঁতে দাঁত লাগে' ইত্যাদি; পদ্মাচরে মেয়েদের হারিয়ে-যাওয়া সম্পর্কে 'স্ত্রীস্বাধীনতার বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলুম'; স্থানীয় গ্রামের ছেলেদের মুখে স্কুলের টুলবেঞ্চির জন্যে শেখানো বক্তৃতা সম্পর্কে : 'আমি তার টুলবেঞ্চি না দিলে সে ক্ষুণ্ণ হত না, কিন্তু তার বক্তৃতা কেড়ে নিলে বোধ করি অসহ্য হত'; পোস্টমাস্টারের অদ্ভুত গল্প এবং দর্শনাভিলাষী ও সাহায্যপ্রত্যাশী স্কুলমাস্টারদের সম্পর্কে কবির অভিজ্ঞতা—'জিজ্ঞাসা করলুম, আপনাদের স্কুলে কজন ছাত্র? একজন বললেন, আশীজন; আরেকজন বললেন, না, একশো পঁচাত্তর জন। মনে করলুম, দুজনের মধ্যে খুব একটা তর্ক বেধে যাবে, কিন্তু দেখলুম, তৎক্ষণাৎ মতের ঐক্য হয়ে গেল।' তারপর উড়িষ্যার পথে পাল্কিতে করে যাত্রার অভিজ্ঞতা—এরকম প্রচুর হাস্যরসের বিচ্ছুরণে বহু পত্রই আলোকিত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

ছিন্নপত্রে হাস্যরসিক রবীন্দ্রনাথ

অজস্র কাব্যসৌন্দর্য ও চিত্ররূপময় বর্ণনা ছিন্নপত্রের অমূল্য সম্পদ। কবির বিস্ময়কর লিপিকৌশলে অধিকাংশ পত্র সর্বজনের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছে। গ্রন্থখানির স্থানে স্থানে কবিমনোভাবের রূপায়ণ এমন কৌশলময় যে তা কাব্যরসের ভ্রান্তি ঘটাতে পারে। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায় এগুলি—'অনেকটা পৈট্রির মতো শুনতে হবে।' কোথাও চমৎকার কল্পনা, কোথাও কবিত্বের মনোহারী স্পর্শ, কোথাও ভাষার আলংকারিক ভঙ্গি, কোথাও শব্দবিন্যাসের চারুত্ব, কোথাও নিবিড়তম অনুভূতির ছন্দোময় প্রকাশ এ পুস্তকের চিঠিগুলোকে গীতিকাব্যের সৌন্দর্যমহিমা দান করেছে। বাংলা চলিত ভাষার প্রকাশক্ষমতা কতখানি

ছিন্নপত্রের সৌন্দর্য-মহিমা ও ঐতিহাসিক মূল্য

ব্যাপক হতে পারে, এ ভাষা কত বিচিত্র ভাবানুভূতির বাহন হতে পারে, কী আশ্চর্য এর ব্যঞ্জনাশক্তি ও নমনীয়তা, তা যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে ছিন্নপত্রের কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টিয়ে যান - বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথের লেখনীর যাদু আপনাদের চমকিত পুলকিত করবে। দু-একটা বিশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধার করছি :

[ক] কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা ; মনে হয়, যেন একটি সোনার-চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে ; ধীরে ধীরে কত সহস্র গ্রাম-নদী-প্রান্তর-পর্বত-নগর-বনের উপর যুগযুগান্তকাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে মৌনমুখে শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে ! কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ ! [প. স.—১৫২]

[খ] একটা প্রকাণ্ড বিস্তারিত প্রাণহীনতার উপর যখন অস্পষ্ট চাঁদের আলো এসে পড়ে তখন যেন একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদশোকের ভাব মনে আসে ; যেন একটি মরুময় বৃহৎ গোরের উপরে একটি সাদা-কাপড়-পরা মেয়ে উপুড় হয়ে মুখ ঢেকে মূছিতপ্রায় নিস্তব্ধ পড়ে রয়েছে। [প. স.—৯৯]

[গ] মাথাটা জানলার উপর রেখে দিই, বাতাস প্রকৃতির স্নেহহস্তের মতো আস্তে আস্তে আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জল ছল্‌ছল্ শব্দ করে বয়ে যায়, জ্যোৎস্না ঝিক্‌মিক্ করতে থাকে, এবং অনেক সময়—'জলে নয়ন আপনি ভেসে যায়'। [প. স.—২৬]

[ঘ] বেশ ছোটো নদীর কলরবের মতো, ঘাটের মেয়েদের উচ্চহাসি মিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং ছোটোখাটো কথাবার্তার মতো ; বেশ নারকেল-পাতার ঝুর্‌ঝুর্ কাঁপুনি, আমবাগানের ঘনছায়া এবং সর্ষেখেতের গন্ধের মতো—বেশ সাদাসিধে অথচ সুন্দর এবং শান্তিময়, অনেকখানি আকাশ-আলো-নিস্তব্ধতা এবং করুণতায় পরিপূর্ণ। [প. স.—৪৪]

[ঙ] যখন সন্ধ্যার আলোক এবং সন্ধ্যার শান্তি উপর থেকে নামতে থাকে তখন সমস্ত অনবরুদ্ধ আকাশটি একটি নীলকান্তমণির পেয়ালার মতো আগাগোড়া পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে ; যখন স্তিমিত শান্ত নীরব মধ্যাহ্ন তার সমস্ত সোনার আঁচলটি বিছিয়ে দেয় তখন কোথাও সে বাধা পায় না—চেয়ে চেয়ে দেখবার এবং দেখে দেখে মনটা ভরে নেবার এমন জায়গা আর কোথায় আছে।

[প. স.—১২২]

[চ] জলের রহস্যগর্ভ থেকে একটি স্নানশুভ্র অলৌকিক জ্যোতিঃপ্রতিমা

উত্থিত হয়ে নীরব মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে; তার ডাঙার উপর কালোমেঘ স্ফীতকেশর সিংহের মত ভ্রূকুটি করে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে থাবা মেলে দিয়ে চুপ করে বসে আছে—সে যেন একটি সুন্দরী দিব্যশক্তির কাছে হার মেনেছে, কিন্তু এখনো পোষ মানেনি, দিগন্তের এক কোণে আপনার সমস্ত রাগ এবং অভিমান গুটিয়ে নিয়ে বসে আছে। [প. স.—১১১]

[ছ] গাঢ় নীল মেঘ দিগন্তের কাছে একেবারে থাকে থাকে ফুলে উঠেছে, একটা প্রকাণ্ড হিংস্র দৈত্যের রোষস্ফীত গোঁফ-জোড়াটার মতো। এই ঘন-নীলের ঠিক পাশেই দিগন্তের সবশেষে ছিন্নমেঘের ভিতর থেকে একটা টক্‌টকে রক্তবর্ণ আভা বেরোচ্ছে—একটা আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড অলৌকিক 'বাইসন' মোষ যেন খেপে উঠে রাঙা চোখদুটো পাকিয়ে ঘাড়ের নীলকেশরগুলো ফুলিয়ে বক্রভাবে মাথাটা নীচু করে দাঁড়িয়েছে, এখনই পৃথিবীকে শৃঙ্গাঘাত করতে আরম্ভ করে দেবে—। [প. স.—৫৯]

এইসব অংশের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করে কাকেও বোঝাবার প্রয়োজন নেই, রসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই এগুলির সাহিত্যিক উৎকর্ষ সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

পূর্বে আমরা বলেছি, সাময়িক বহু কবিতা এবং ছোটগল্প-রচনার ইতিবৃত্ত এই পত্রগুলির মধ্যে বিক্ষিপ্ত রয়েছে। কয়েকটি পত্রে কবির যে-সকল রচনার প্রেরণা ও উপকরণের পরিচয় চিহ্নিত আছে তার কতকগুলির উল্লেখ করা যাচ্ছে :

রচনা	পত্রসংখ্যা
'যেতে নাহি দিব' [সোনার তরী]	১৪, ১৯
'সুখ' [চিত্রা]	২২, ২৬, ৪৩
মর্ত্যপ্রীতিমূলক সনেটকল্প কবিতা [সোনার তরী]	৩৬
'সমুদ্রের প্রতি' [সোনার তরী]	৩৮, ৬৪, ৬৭
'বসুন্ধরা' [সোনার তরী]	৫৭
'অন্তর্যামী' [চিত্রা]	১০২
'শৈশবসন্ধ্যা' [সোনার তরী]	১০৮
'গানভঙ্গ' [সোনার তরী]	৬১
'পোস্টমাস্টার' [গল্প]	২১, ৬০
'ছুটি' [গল্প]	২৮

রচনা	পত্রসংখ্যা
'সমাপ্তি' [গল্প]	৩০
'ক্ষুধিত পাষাণ' [গল্প]	১১৯
'মেঘ ও রৌদ্র' [গল্প]	১০৬

এ ছাড়া 'চৈতালি'-'চিত্রা'র আরো কয়েকটি কবিতার ভাবের অঙ্কুর ছিন্নপত্রে দেখতে পাই।

ছিন্নপত্রের পত্রগুলো সাধারণ পত্ররচনা থেকে পৃথক। এ ধরণের পত্রলিখন বাংলাসাহিত্যে নেই, এর অনুরূপ রচনা মেলে ইংরেজি সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও পরবর্তী জীবনে এরূপ চিঠি লেখেননি। কবির স্বীকৃতি এইরূপ: 'যদি না মনে করো আমি অহংকার করছি তাহলে সত্য কথা বলি, অল্পবয়সে আমি চিঠি লিখতে পারতুম, যা-তা নিয়ে। মনের সেই হাল্‌কা চাল অনেক দিন থেকে চলে গেছে। এখন মনের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে বক্তব্য সংগ্রহ করে চলি, চিন্তা করতে করতে কথা কয়ে যাই—দাঁড় বেয়ে চলিনে, জাল ফেলে ধরি। উপরকার ঢেউয়ের সঙ্গে আমার কলমের গতির সামঞ্জস্য থাকে না। যাই হোক একে চিঠি বলে না। পৃথিবীতে চিঠিলেখায় যারা যশস্বী হয়েছে তাদের সংখ্যা অতি অল্প। যে-দুচারজনের কথা মনে পড়ে—তারা মেয়ে। আমি চিঠি-রচনায় নিজের কীর্তি প্রচার করব, এ আশা করিনে।'

[৩৭-সংখ্যক পত্র : 'পথে ও পথের প্রান্তে']

পরিশেষে একটি কথা। ছিন্নপত্র অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থের তালিকাভুক্ত হয়েছে। কিন্তু ছিন্নপত্র যে-শ্রেণীর রচনা তাতে পুস্তকখানিকে আবশ্যিক পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত করলে এর প্রতি সমাদর দেখানো হয়, এরূপ আমরা মনে করি না। এ বই প্রশান্ত নির্জনে উপভোগ্য, এবং সংগতভাবে ছাত্রছাত্রীদের অবসর-পাঠ্যরূপে নির্দেশিত হলেই এর প্রতি সুবিচার করা হত। গ্রন্থখানি এত অনায়াস ও স্বচ্ছন্দপ্রকাশ যে, টীকাটিপ্পনী ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের রূঢ় আলোকপাতে এর শান্ত মাধুর্য বিনষ্ট হবারই সম্ভাবনা। ছিন্নপত্র বুঝবার গ্রন্থ নয়—মুখস্থ করবারও নয়। বইটি পাঠ করে কবির সঙ্গে ও কবির দেখা নিসর্গপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়ের ভাবটিই অন্তরের নিভৃতে মুদ্রিত করে রাখবার যোগ্য।

উপসংহার

'পূরবী'-কাব্যপাঠের ভূমিকা

[**রচনার সংকেতসূত্র :** রবীন্দ্রনাথের বহুরূপী-মূর্তি—রবীন্দ্রকবিজীবনের বিচিত্র অধ্যায়—'পূরবী'-অধ্যায়—'-পূরবী'-র মিশ্র রাগিণী—কবির সায়াহ্নবোধ—একক সত্তার অন্বেষণ ও পৃথিবীপ্রীতি—'পূরবী' কাব্যে সহজ প্রীতিরস : নাম-কবিতা—'মাটির ডাক'—'তপোভঙ্গ' কবিতায় কবির কল্পনার বিষয়—বাল্য ও যৌবনের স্মৃতিরোমন্থন ও মানসীর অন্বেষণ—কবির কল্পিত 'লীলাসঙ্গিনী'-র স্বরূপ—'সাবিত্রী' ও 'আহ্বান' কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবসত্য—'সাবিত্রী'-র সঙ্গে 'আহ্বান'-এর পার্থক্য—'আহ্বান'-এ সম্বোধিতা নারীটির স্বরূপ—'বকুলবনের পাখি'—'ক্ষণিকা'—'লিপি'—'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত'—'আশা'—'পথিক'-অধ্যায়ের কয়েকটি কবিতা—'কঙ্কাল'—উপসংহার]

রবীন্দ্রনাথের পরিণামমুখী কবিপ্রতিভা বারে বারে আমাদের বিস্মিত ও চমকিত করেছে—অভাবনীয় অপ্রত্যাশিতের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটিয়েছে। তাঁর সুদীর্ঘ কাব্যজীবনে কত বিচিত্র অধ্যায়, কত বিভিন্ন ভাবচক্র। বহুরূপীর মতো কত-না বিচিত্র মূর্তিতে কবি আত্মপ্রকাশ করলেন পাঠকসাধারণের কাছে—বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে সকলে তাকাল তাঁর উজ্জ্বল অসাধারণ কবিমূর্তিটির দিকে। একই কবির জীবনে এত ঋতুপরিবর্তন এত রীতিপরিবর্তন আর কোথায় আমরা দেখেছি, কোথায় দেখেছি অফুরন্ত কবিত্বের এমন নির্বাধ উৎসার! রবীন্দ্র-কবি-প্রতিভা অসাধারণ, এর ঐশ্বর্যের কোনো পরিমাপ হয় না। তাঁর নিত্যসৃষ্টি-ক্রিয়াশীল মনের গোপন অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে চাইলে এক দুর্ভেদ্য রহস্যের প্রাকারে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসতে হয়। তিনি কেবলই বেশ বদল করে চলেছেন, ফিরে ফিরে নতুন মূর্তিতে দেখা দিয়েছেন, নতুন কণ্ঠে নতুন রাগিণী গেয়ে চলেছেন। আর, এই অসামান্য কলাবিদের দিকে মুগ্ধদৃষ্টিপাত করে আমরা বলেছি—'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণি'!

রবীন্দ্রনাথের বহুরূপী-মূর্তি

রবীন্দ্রকাব্যে চমকপ্রদ অভিনবত্বের—অপ্রত্যাশিতের—কথাই বলছিলাম। প্রেমসৌন্দর্যের ঝর্ণাধারায় স্নাত হয়ে সোনার কালিতে যে-কবি লিখলেন 'সোনার তরী'-'চিত্রা'-'চৈতালি' ইত্যাদির কবিতাগুলো, যে-কবি ডুব দিলেন প্রকৃতির রূপসাগরে, অবগাহন করলেন মানুষের স্নেহপ্রেমের নিতল সমুদ্রে—সেই কবি সুন্দরী পৃথিবীর যৌবনভরা বাহুপাশের বন্ধন এড়িয়ে দূরে, বহুদূরে, সরে গেলেন এক বাস্তবাতীত অতীন্দ্রিয় সত্তার অমোঘ আহ্বানে। পরিদৃশ্যমান রূপজগৎ মিথ্যা হয়ে গেল, মর্তমমতার চেয়ে অমর্তমাধুরীর আকর্ষণ প্রবলতর হল। কবি অরূপসুন্দরের দিকে 'খেয়া'র

রবীন্দ্রকবিজীবনের বিচিত্র অধ্যায়

পাড়ি জমালেন,'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি'র কূলে তরী ভিড়িয়ে 'অরূপ'-এর প্রেমে আত্মনিমজ্জন করলেন। পরম রসময় 'এক'-এর লীলায় মেতে একালে কবি পাঠককে যে-রস নিবেদন করলেন স্বরূপত তা আধ্যাত্মিক। এখন কবির বিহরণ ধ্যানলোকে—অপার্থিব এক কল্পলোকে। আমরা ভাবলাম, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপতান্ত্রিক সৌন্দর্যরসিক কবি অধ্যাত্মজগতে বুঝি নিজেকে হারিয়ে ফেললেন, 'এক'-এর প্রেমধ্যানে সমাধিত হয়ে মাটির পৃথিবীর সঙ্গে প্রাণের যোগসূত্রটি ছিন্ন করলেন বুঝি।

কিন্তু তা হবার নয়। 'বলাকা'র মধ্য দিয়ে আবার আমরা কবিকে এক নতুন রূপমূর্তিতে দেখতে পেলাম। তিনি যেন কার আদেশ শুনতে পেয়ে দেবতার মন্দিরের নিভৃতি থেকে বেরিয়ে এলেন, তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হল—'নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি'। দেবতার সম্মুখে যে-'গানের সুরের আসন' তিনি পেতেছিলেন সেই আসন ছেড়ে তাঁকে উঠে আসতে হল, কারণ—'এবার জীবন মাতল মরণবিহারে।' 'বলাকা'-পর্বে কবির কাব্যজীবনে এক নতুন পর্যায় শুরু হল, কবিকণ্ঠে উদ্গীত হল 'রুদ্রের ভৈরবগান'। শান্তিস্বর্গ থেকে তাঁর এই অপসরণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু 'বলাকা'য় কবির দৃষ্টি বাস্তবের দিকে নিবদ্ধ হলেও, এ যুগে জগৎ ও জীবনের যে-সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন তা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার বাইরে। এখানেও তাঁর দৃষ্টি আধ্যাত্মিকতায় অনুরঞ্জিত,—জাগতিক বস্তুর রূপরস-আস্বাদন নয়, সৃষ্টির স্বরূপ-উদ্ঘাটনেই কবি এখন নিরত। কবির মনোভাব এখন মহাপথিকের, পথের প্রেমেই তিনি মত্ত, কেবল 'অজানা হইতে অজানা'র দিকে চলাই বর্তমানে তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো সত্য বলে মনে হচ্ছে। 'বলাকা' চিরযাত্রী মানবাত্মার অনন্ত-পথযাত্রারই মহাসঙ্গীত, যে-মানবাত্মা নিত্যকাল ধরে উচ্চারণ করছে—'হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনোখানে'। 'বলাকা'য় কবি রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক-মনোভাবসম্পন্ন হয়ে উঠেছেন, প্রজ্ঞার দীপ জ্বেলে বিশ্বলোক পরিভ্রমণ করেছেন, অপূর্ব ছন্দের বাঁধনে বেঁধেছেন নিজের অলৌকিক অনুভূতিকে। এই কাব্যখানিতে এক বলিষ্ঠ জীবনবোধ সকলেই লক্ষ্য করবেন, কিন্তু তা বৈরাগ্যমূলক। তাই আসক্তিবিরহিত যাত্রী-কবির কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই : 'চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি ধরার বন্ধন হতে নিয়ে যাক হরি দিগন্তের পারে দিগন্তরে।'

'বলাকা'র-পর কবি দুখানি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন—'পলাতকা' ও 'শিশু ভোলানাথ'। এদুটি কাব্যেও অল্পবিস্তর 'বলাকা'-র ভাবচিন্তার প্রভাব দেখা যায়। 'পলাতকা'-য় বাস্তবের মধ্যেও বাস্তবাতীত এক রহস্যময় সত্তার পদসঞ্চার

শুনতে পাই আমরা, 'শিশু ভোলানাথ'-এ অনাসক্ত জীবনের প্রাণোচ্ছল চঞ্চলতা। বুঝতে কষ্ট হয় না, কবি এখনো 'বলাকা' কাব্যের ভাবমণ্ডল থেকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রান্ত হতে পারেননি।

'শিশু ভোলানাথ' লিখবার পর কবি অনেকদিন গীতিকবিতা-রচনায় হাত দেননি। রবীন্দ্ররসিকরা ভাবলে, কবির বাণীর-সঙ্গীত-রচন-প্রতিভা বুঝি ক্ষয়িষ্ণুতার মুখে, পূর্ববর্তী 'বলাকা'তেই বুঝি কবি তাঁর অন্তরঙ্গ ভাবজীবনের সবকথা চড়া সুরে নিঃশেষে বলে ফেলেছেন। কিন্তু বাণীসিদ্ধ পুরুষ রবীন্দ্রনাথের শেষকথা উচ্চারিত হতে এখনো যে অনেক দেরি, তা পাঠকসমাজ সত্যিই বুঝতে পারেনি। কবি তো নিজেই আমাদের শুনিয়েছেন—'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে'।

সহসা কবি-রবীন্দ্র আত্মপ্রকাশ করলেন 'পূরবী'-র মাধ্যমে। তাঁর কণ্ঠে উদাত্তগম্ভীর ললিতমধুর সুরে বেজে উঠল বেলাশেষের গান। অস্তগামী রবির স্বর্ণরশ্মিবিচ্ছুরণে আকাশ যেমন রঙে-রঙে রঙিন্ হয়ে ওঠে, বার্ধক্যে সমুপস্থিত কবির প্রতিভারশ্মির বিচ্ছুরণে তেমনি তাঁর কাব্যের নভোদেশ বিচিত্র বর্ণরাগে আলিম্পিত হল। অস্তাচলের ধারে এসে রবি-কবি পূর্বাচলের দিকে তাকালেন, অতীতের 'সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি'-কে গোধূলিক্ষণের আলোকে বিস্মৃতির তামসলোক থেকে উদ্ধার করতে চাইলেন। 'পূরবী'-তে কবির দৃষ্টি দুদিকে প্রসারিত—পশ্চাতে ও সম্মুখে। পশ্চাতে হারানো যৌবনের মধুময় সহস্র স্মৃতি, প্রকৃতি-উপভোগের অমেয় আনন্দ; সম্মুখে বৈতরণীকূলের ওপারের ঘনায়মান অন্ধকার, মরণের দূরশ্রুত অস্পষ্ট পদধ্বনি। ফিরে-পাওয়ার আনন্দ ও ছেড়ে-যাওয়ার বেদনা, এই মিশ্র অনুভূতির জন্যে কবিকণ্ঠনিঃসৃত পূরবী রাগিণীও বিমিশ্র হয়ে পড়েছে। তাই জীবনের 'শেষ বসন্ত'-এ 'যৌবনবেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি' নতুন করে পেয়ে তিনি একদিকে যেমন আশ্বস্ত হচ্ছেন, অন্যদিকে তেমনি 'দেখ না কি হায় বেলা চলে যায় সারা হয়ে এলো দিন' বলে কেমন যেন একটা বিষাদব্যাকুলতা অনুভব করছেন,—'মহেন্দ্রের তপোভঙ্গ দূত'-এর পক্ষেও বার্ধক্যের নিয়তিকে অস্বীকার করা অসম্ভব। এ কারণে প্রান্তরে পশুর 'কঙ্কাল' দেখে তাঁর মনে মৃত্যুভাবনা জাগে, নিশীথে 'পদধ্বনি' শুনতে পেয়ে তিনি কেমন যেন শঙ্কিত হয়ে ওঠেন, 'অপূর্বের পথে' যাত্রাকালে জীবন আর মরণের মধ্যে সংযোগের অলক্ষ্য একটি সূত্র সন্ধান করেন। বর্তমান কাব্যে কবিচিত্তের আসক্তি ও বৈরাগ্য রৌদ্রছায়ার লুকোচুরিখেলার সৃষ্টি করেছে,—ধূলির ধরণীতে দাঁড়িয়ে ললাটে

'পূরবী-অধ্যায়'

মুক্তির টিকা আঁকবার প্রয়াসটি সত্যিই মর্মস্পর্শী। তবে মনে রাখতে হবে, 'পূরবী'-তে কবি কোনো ঐশী সত্তার আশ্রয় লন নাই। এখন তিনি ধ্যানলোকে অবস্থান করছেন না, মাটির মায়ের কোলেরই কাছাকাছি বসে রয়েছেন। এদিক থেকে দেখতে গেলে 'পূরবী' প্রত্যাবর্তনের কাব্য—আকাশ থেকে নীড়ে, সমুদ্র থেকে তীরে প্রত্যাবর্তন। মানবজীবন, মানবহৃদয়, প্রকৃতির উদার সৌন্দর্যসুষমাই এখন তাঁর কবিতার বড়ো উপজীব্য। তবে, এই কাব্যে কবির যাত্রীমনোভাব প্রকাশ পেয়েছে বলে, 'অপূর্বের পথে দ্বার খোলা'-র কথা পরিব্যক্ত হয়েছে বলে, গ্রন্থখানিকে শুধু প্রত্যাবর্তনের কাব্য বলাটা সঙ্গত হবে না—এ গ্রন্থ এগিয়ে চলার কাব্যও বটে। বেলাশেষের 'পূরবী' বেলাশুরুর 'প্রভাতী'-র প্রতিও ইঙ্গিত করছে যেন।

'পূরবী'র মিশ্র রাগিণী

'পূরবী' কাব্যের সব কবিতাই ঠিক একসুরে বাঁধা বা একই মনোভাব নিয়ে লেখা নয়। এতে সুরবৈচিত্র্য আছে, ঠিক যেমন আছে আরো পরবর্তীকালের 'শেষ সপ্তক'-'বীথিকা'-'সানাই' প্রভৃতিতে। অথবা, বিপরীতভাবে বলা যায়, যেমন মোটামুটি একই মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে 'চৈতালি'-'নৈবেদ্য'-'ক্ষণিকা'-'কল্পনা', এমন কি পরবর্তী 'বলাকা'তেও। পূরবী কাব্যের কবিতাগুলিকে পৃথক দুই অধ্যায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম ষোলটি কবিতার নাম 'পূরবী'—দ্বিতীয় অংশের নাম 'পথিক', এতে ষাটেরও অধিক কবিতা রয়েছে। তেষট্টি বৎসর বয়সে কবি যখন পশ্চিমের যাত্রী [এ সময় কবি দক্ষিণ-আমেরিকা ও য়ুরোপে ভ্রমণ করছিলেন] তখন পূরবীর দ্বিতীয় ভাগের কবিতাগুলি রচনা করেন।

কবির সায়াহ্নবোধ

কাব্যের নাম দেখে স্বতঃই মনে হয়, কবির বয়ঃক্রমের সঙ্গে এর একটা সম্বন্ধ আছে। হয়তো এসময়ে কবি মনে করেছিলেন তাঁর জীবনের শেষমুহূর্ত না হোক, সায়াহ্ন সমাগত। তাই পূরবী রাগিণী তাঁর বীণায় বাজাতে চেয়েছিলেন। এ সময় কবি পীড়িতও হয়েছিলেন। অসুস্থ অবস্থা তাঁর সায়াহ্নবোধকে বাড়িয়ে তুলতেও সাহায্য করতে পারে। ফলে দেখা যায়, পূরবীর অনেকগুলি কবিতায় কবি পৃথিবীকে ছেড়ে চলে-যাওয়ার কথা বলেছেন। একটি কবিতায় তো স্পষ্ট মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অবশ্য পূরবী-রচনাকালে কবির যে 'প্রান্তিক'-এর মতো অবস্থা হয়েছিল তা নয়। তবে একটা প্রবল বিদায়বোধ যে তাঁকে পেয়ে বসেছিল এসম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কবির এই বিদায়বোধের প্রকাশ—যাত্রা, লীলা-সঙ্গিনী, বকুলবনের পাখি, শেষ অর্ঘ্য, খেলা, অপরিচিতা, তারা, শেষবসন্ত প্রভৃতি।

এগুলিতে কবির হারানো প্রীতি, ভুলে-যাওয়া স্মৃতি, হারানো মানুষ, প্রার্থিত বস্তুর অন্বেষণ প্রভৃতি প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু এ ছাড়া এমন কবিতা কয়েকটি রয়েছে যার মধ্য দিয়ে দৃষ্টবস্তুর অন্তরালবর্তী এবং দুর্লভ কোনো একক সত্তার অন্বেষণের সুর ধ্বনিত হয়েছে। সেখানে কবির বিরহিত মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। তা ছাড়া, তাঁর পৃথিবী-প্রীতি এবং ঋতুরঙ্গ-পর্যায়ের নবীনের আগমনের ও আনন্দলীলার কবিতাও কয়েকটি রয়েছে। শেষের গোষ্ঠির মধ্যে 'তপোভঙ্গ' অন্যতম। পূরবী গ্রন্থের কবিতাগুলির রচনাকাল লক্ষ্য করলে দেখা যায়, 'পথিক'-শ্রেণীর কবিতাবলী, যা পূরবীর মধ্যে সংখ্যায় অধিক—সেগুলি একঝোঁকে চার মাসের মধ্যে রচিত হয়েছিল [১৩৩১ আশ্বিন থেকে পৌষ]। এসব কবিতা তাঁর ভ্রমণশীল অবস্থায় লেখা। তার পূর্বেকার রচনাগুলি সম্পর্কে বহিরঙ্গ বিচার প্রয়োগ করলে তাতে এই ধরণের ঝোঁকের অভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৩৩০ সালের কয়েকটি কবিতা এবং তার পূর্বেকার দু'তিন বৎসরের কয়েকটি নিয়ে পূরবীর 'পূরবী'। তারও পূর্বে বহুদিন যাবত কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎকার হয়নি বললেই চলে। যাই হোক, পূরবীর সর্বত্রই হারানো দিনের জন্যে বেদনাময়তা ও আসন্ন নীড়ত্যাগের ব্যাকুলতা ও বিরহ প্রকাশ পেয়েছে, এমন চরম অভিমত আমরা প্রকাশ করতে চাইনে। তবে একথা ঠিক যে, বিচ্ছেদবেদনা এবং অন্বেষণ-প্রবৃত্তি পূরবীর একটি প্রধান রাগিণী এবং যে-কয়টি কবিতায় এই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি রচনাহিসেবে উত্তম, সন্দেহ নেই। দেখবার বিষয় এই যে, ইতঃপূর্বেকার প্রধানতম ও বলিষ্ঠতম রচনা 'বলাকা'র তেমন প্রভাব পূরবীর মধ্যে নেই। বরং পরবর্তী রচনা 'মহুয়া' ও ঋতুনাট্যগুলির মধ্যে আছে। পূরবীর এই ব্যতিক্রম যেমন বিস্মিত করে, তেমনি এর আদর্শমূলকতাহীন সহজ প্রীতিরস পাঠকের চিত্তে অপরিসীম আনন্দও সঞ্চারিত করে।

একক সত্তার অন্বেষণ ও পৃথিবীপ্রীতি

এই কাব্যের 'পূরবী'-অংশের আরম্ভের 'পূরবী'-নামক কবিতাটিতে কবির এই সহজ প্রীতিরস—যা মানবিক এবং যা পরিচিত পৃথিবীর হাসিকান্নার সঙ্গে বিজড়িত—তার স্বচ্ছন্দ এবং অকপট প্রকাশ ঘটেছে। সাধারণ মানুষের অন্তরের স্পর্শলাভের জন্যে কবিচিত্ত এখন ব্যাকুল, মানবের প্রাত্যহিক জীবনের কলধ্বনির সঙ্গে তিনি নিজের প্রাণের সঙ্গীত মিশিয়ে দিতে চান। এই পৃথিবীর প্রতি তাঁর যে একটা অচ্ছেদ্য নাড়ীর টান রয়েছে, এসত্যটি কবি আজ একান্ত নিবিড়ভাবে

'পূরবী' কাব্যে সহজ প্রীতিরস : নাম-কবিতা

অনুভব করছেন। জীবনের অপরাহ্ণবেলায় চারদিকের পরিচিত সংসারের দিকে তাকিয়ে কবি যে-মানবসুলভ অনুভূতিকে ছন্দোবদ্ধ করেছেন, সুরের আন্তরিকতার জন্যে তা সর্বজনের হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে ঃ

এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্যধরার ধুলো-মাটি-ফল-হাওয়া-জল-তৃণ-তরুর সনে।
এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের আশায়॥

এখনকার কবিমনোভাবের সঙ্গে 'ক্ষণিকা' কাব্যের ঠিক তুলনা করা চলত যদি-না অপরাহ্ণবেলার স্বাভাবিক মনোভাব আত্মীয়দের স্মৃতিচিন্তন কবির চিত্তে ব্যাপ্ত করে থাকত। কারণ, কবি ঠিক 'ক্ষণিকা'র মতোই নির্লিপ্ত চিত্ত নিয়ে বলতে পারছেন ঃ

এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।

পূরবী-অংশের তৃতীয় কবিতা 'মাটির ডাক'-এও মোটামুটি এই পার্থিব প্রাপ্তির আনন্দরসের কথা বলা হয়েছে। কবিতাটির মধ্যে আমরা কবির পৃথিবী-প্রীতি বা প্রকৃতিপ্রীতির নির্বাধ উচ্ছলন দেখতে পাই। যে-প্রকৃতির সঙ্গে কবির যোগ ছিল অতিশয় নিবিড়, সেই প্রকৃতিকে—শ্যামলা পৃথিবীকে—মাটির মা'কে উপেক্ষা করে এতকাল তিনি যেন কোন্ বেড়াঘেরা বিষম নির্বাসনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওই যান্ত্রিকতাময় জীবনের মধ্যে থেকে তাঁর প্রাণ কী এক শূন্যতায় হাহাকার করে উঠেছে। আজ হারানো মাটির মা'কে ফিরে পেয়ে, প্রকৃতির বুকে প্রত্যাবর্তন করে, কবি শান্তিসাগরে নিমজ্জিত হলেন। 'মাটির ডাকে' কবির উদাসীন আত্মা এখন ঘরের দিকে ফিরেছে, এবং কবি নিজের ভুল বুঝতে পারছেন—'কী ভুল ভুলেছিলেম আহা সবচেয়ে যে নিকট তাহা সুদূর হয়ে ছিল এতদিন।' পুনর্বার কবি নিকটকে কাছে পেলেন, প্রাণের অভাব মিটে গেল, জীবন পরিপূর্ণ আনন্দ-শান্তি-সার্থকতায় ভরে উঠল। কিন্তু কবির এ মনোভাব পরিবর্তিত হতেও বিলম্ব হয়নি। কারণ, বৎসরাধিককাল পরে লেখা 'যাত্রা' কবিতায় দেখছি, যাত্রার বা বিদায়ের প্রয়োজনে বৈরাগ্য ও আনন্দের মধ্য দিয়ে কবি চলেছেন মরণলোকের অভিমুখে। যাত্রার প্রাক্কালে কবির মনে এরূপ একটি প্রত্যয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সেখানে অর্থাৎ মরণের পারে এখানকার আনন্দের পুনরাবৃত্তি ঘটবে,

'মাটির ডাক'

তাঁর অসম্পূর্ণ আশা পূর্ণতা লাভ করবে। কিন্তু মর্তের বন্ধন ছিন্ন করার বেদনাও কি কম তীব্র, বার্ধক্যের নিয়তিকে হাসিমুখে স্বীকৃতি জানানো কি এত সহজ কথা! তথাপি কবি একটি তত্ত্বকে আশ্রয় করে জরার নিয়তিকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন, সায়াহ্নবোধের শূন্যতাকেও জয় করবার প্রয়াসী হয়েছেন। এই মনোভাবেরই শ্রেষ্ঠ কবিতা 'তপোভঙ্গ'।

'তপোভঙ্গ' কবির কল্পনার বিষয় হল—জরা ও যৌবন, জীবন ও মৃত্যু, প্রাপ্তি ও শূন্যতা – এর পর্যায়ক্রমে আবৃত্তি চলেছে, সৃষ্টির লীলায় এবং এই দ্বন্দ্বের পরিণামে আনন্দ এবং যৌবনের জয়লাভ ঘটছে। সুতরাং মৃত্যুভয় অকর্তব্য, শ্মশানবৈরাগ্য নিরর্থক, অতএব পরিত্যাজ্য। প্রকৃতির মধ্যে, ঋতুপর্যায়ে শীতের পর বসন্তের পুনরাগমনের দৃষ্টান্তে 'পূরবী'র কবি নিত্যনবীনের লীলারঙ্গ উপলব্ধি করেছেন, লীলারসবিহারী নটরাজকে দেখেছেন। কবির নটরাজ-ঋতুরঙ্গের এই বিশেষ সুর —নতুনের আগমনী। আবার, প্রকৃতির বুকে কবি যে-লীলা দেখেছেন, মানুষের প্রাণেও তার অনিবার্য প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন। কবি বলছেন : 'বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে-লীলা চলেছে, আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা।'

'তপোভঙ্গ' কবিতায় কবির কল্পনার বিষয়

'তপোভঙ্গ' এই মানুষের যৌবনের কাব্য—তপকে, বৈরাগ্যকে, মৃত্যুর ভয়ংকরতাকে অগ্রাহ্য করে প্রাণের মুক্তিকে বরণ করার কাব্য। মহাদেবের তপস্যা ও তপোভঙ্গের রূপকের মধ্য দিয়ে কবি তাঁর উপলব্ধ সত্যটিকে অতিশয় নৈপুণ্য-সহকারে ও মনোরমভাবে প্রকাশ করেছেন। কবি প্রকৃতির সাময়িক রিক্ততা, নিজ মনের সাময়িক দৈন্যের জন্যে তপস্বী মহাদেবকে প্রশ্ন করছেন :

অগীত সংগীতধার
অশ্রুর সঞ্চয়ভার
অযত্নে লুণ্ঠিত সে কি ভগ্নভাণ্ডে তোমার অঙ্গনে।
তোমার তাণ্ডবনৃত্যে চূর্ণ চূর্ণ হয়েছে সে ধূলি?

এবং স্বয়ং তার উত্তর দিয়েছেন এই বলে যে, এই রিক্ততা, এই সৌন্দর্য-বিলোপ চিরন্তনের নয়। সুন্দরকে আশ্চর্য রকমে সুন্দর করার জন্যেই, যৌবনকে অধিকতর আনন্দচঞ্চল করার জন্যেই, যোগিরাজ মহাদেবের এই কৃত্রিম তপস্যা। বুঝি একারণেই বিশ্বপ্রকৃতির কঠিন রুক্ষ অবস্থা, নিসর্গলোকে ভীষণ বিপর্যয় এবং ব্যক্তিগত জীবনে শূন্যতাবোধ, মৃত্যুশোক ও নানান্ বিপত্তি। কবি বলেছেন, তিনি তপস্বী মহাদেবের এই ছলনাকে ধরে ফেলেছেন :

হে শুষ্কবল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব—
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্মরণবেশে।

সুতরাং কবি আনন্দ-সত্যকেই দেখবেন, এবং সৌন্দর্যের বা যৌবনের জয় গাইবেন—কারণ, তিনি কবি। মহাদেবের তপস্যা ভেঙে দিয়ে তিনি যৌবনোচ্ছ্বাস নিয়ে আসবেন পৃথিবীতে, যেহেতু কবিরা তপোভঙ্গের জন্য মহেন্দ্রপ্রেরিত দূত :

ভগ্নতপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী—
আমি সেই কবি।

কবিতাটিতে বিশ্বদেবতা বা নটরাজের বিশ্বগত লীলাকে কবির ব্যক্তিগত জীবনেও দেখবার বাসনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। বার্ধক্যের দ্বারে সমাগত কবির চিত্তে সাময়িকভাবে যে-বিষণ্ণতাবোধ জেগেছিল, সেই বিষণ্ণতাকে তিনি আনন্দের মধ্যে বিলীন করে দিয়েছেন। 'তপোভঙ্গ' কবিতাটির মধ্যে আমরা কিছুটা যেন কবির আত্মজীবনবিবৃতি প্রত্যক্ষ করছি। যতই কবি যৌবনকে পিছনে ফেলে বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ততই যেন তিনি জগতের সৌন্দর্য-উপভোগের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছেন, ফলে কাব্যসৃষ্টির প্রেরণাও যেন স্তিমিত হয়ে আসছে। তবে কি তিনি ধ্যানী বা বৈরাগী হয়ে উঠলেন, পৃথিবীর রূপরসের স্পর্শে তাঁর চিত্ত কি পূর্বের মতো সাড়া আর দেবে না? কিন্তু পরমুহূর্তেই কবি উপলব্ধি করছেন, তাঁর এই সন্ন্যাসী-মনোভাব ক্ষণকালের। কী করে তিনি ধ্যানস্থ হয়ে থাকবেন, সমস্ত পৃথিবী জুড়েই যে এই সন্ন্যাসের বিরুদ্ধে মস্তবড়ো একটা চক্রান্ত চলছে—প্রেমসৌন্দর্যের কাছে বৈরাগীরও ধরা না দিয়ে উপায় নেই। মহাদেবও তো সুন্দরের হাতে পরাভব স্বীকার করেছিলেন—তপোমগ্নতায় নয়, তপোভঙ্গেই মহাদেবের যথার্থ পরিচয়। তা-ই যদি সত্যি হয়, যোগীশ্বর যদি উমাপতি হয়ে উঠতে পারেন, তবে কবিও নিশ্চয়ই প্রাণের শুষ্কতার মধ্যে পুনর্বার নবীনতা-সরসতাকে ফিরে পাবেন। আশ্চর্যসুন্দরী পৃথিবীর মায়ামূর্তিই কবির উমা, এই উমার সঙ্গে তাঁর মিলনলগ্ন বুঝি আসন্ন। কবিতাটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে, পুরাণকল্পিত শিব, কালিদাসের শিব, আর শিল্পিদের কল্পিত নটরাজকে পটভূমিতে রেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর লীলাসুন্দর বিশ্বদেবতার কল্পমূর্তি অঙ্কিত করেছেন।

এই কবিতায় যে- দার্শনিক তত্ত্বটি নিহিত রয়েছে তা হল সৎস্বরূপ বা মহেশ্বরের বুকে বিশ্বসৃষ্টির প্রকাশন ও সংকোচন। মহেশ্বর যখন ধ্যানস্থ হচ্ছেন তখন সমগ্র সৃষ্টি সংকুচিত হয়ে শূন্যতায় মিলিয়ে যাচ্ছে; আর, যখন তিনি তপোভঙ্গের পর চোখ খুলছেন তখন পুনর্বার অফুরন্ত রূপসৌন্দর্যে অনন্ত বৈচিত্র্যে সৃষ্টির শতদল বিকসিত হয়ে উঠছে। এখানে নটরাজের ছন্দোময় পদক্ষেপের শিল্পীজনোচিত কল্পনাটি স্মরণ করা যেতে পারে। পূরবীর 'তপোভঙ্গ' রূপে ও

রসে অনির্বচনীয়-সুন্দর একটি কবিতা ; আর, কবির একালের একটি বিশিষ্ট কল্পনাভঙ্গিকে প্রকাশ করছে বলে রবীন্দ্রনাথের একটি স্মরণীয় রচনা।

পূরবীতে এই নিত্যনতুনের লীলা সম্পর্কে অপর একটি কবিতা রয়েছে—'আগমনী'। শীতের মধ্যে বসন্তের আগমন—'বনের তলে নবীন এল, মনের তলে তোর।' এর পরেই আরম্ভ হয়েছে পুরানো দিনের স্মৃতিবিজড়িত মনোভাব এবং মর্ত্যত্যাগের কল্পনায় অনিবার্য বেদনাবিহ্বলতা। 'লীলাসঙ্গিনী', 'বেঠিক পথের পথিক' এবং 'বকুলবনের পাখি' একই সুরের এই তিনটি কবিতা দিয়ে পূরবী কাব্যের 'পূরবী'-অংশের ছেদ টানা হয়েছে। এদের মধ্যে 'লীলাসঙ্গিনী' রবীন্দ্রনাথের সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলির মধ্যে একটি, এবং চিত্রে ও সঙ্গীতে উত্তম কাব্যরসের আধার হয়েছে। 'বকুলবনের পাখি' ওইরকম নামকরা কবিতা না হলেও, রবীন্দ্রনাথের একালের বিরহবিষাদময় অন্বেষণপ্রবৃত্তির এবং যাত্রা-মনোভাবের পরিচয়ের বাহক একটি ভালো কবিতা। পরবর্তী 'পথিক'-অধ্যায়ে ভিন্ন জাতের কবিতার সঙ্গে এই শ্রেণীর বিষাদ-আনন্দ-মিশ্রিত কবিতাগুলিই দুই অধ্যায়ের সংযোগ রক্ষা করেছে।

বাল্য ও যৌবনের স্মৃতি-রোমন্থন ও মানসীর অন্বেষণ

মিশ্র পূরবী রাগিণীর মধ্যে এই বিদায়ের রাগে অনুরঞ্জিত কবিতাগুলির কাব্যরসের আশ্রয় যে-কবিমনোভাব, তার স্বরূপটি আমাদের সঠিক বুঝে নিতে হবে। ওই কবিতাগুলি নিছক বিষাদের নয়, এবং রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীপ্রীতির অনন্যসাধারণ কবি হলেও, একই সঙ্গে সানন্দে জীবনান্তরের যাত্রী বলে, বিষাদময়তা উৎসাহের মধ্যে মিলিত হয়েও গেছে। কিন্তু পূরবীতে কবি আশ্চর্যভাবে বাল্য ও যৌবনের স্মৃতিতে ফিরে গেছেন এবং তাঁর হারানো আনন্দের কণিকা অর্থাৎ তাঁর প্রকৃতিনির্ভর কাব্যানুভবের মধ্যবর্তিনী মানসীর অন্বেষণ করেছেন। একদিকে পশ্চাতের আকর্ষণ অন্যদিকে চলার উৎসাহ, এই দুই মনোভাবের দ্বন্দ্ব থেকেই পূরবীর গোধূলিকল্পনার কবিতাগুলি লেখা। 'লীলাসঙ্গিনী' এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কবিতা। কবি বিস্মরণের গোধূলি-আলোকে পুনরায় তাঁর সঙ্গে মিলনবাসনা জানিয়েছেন।

কবির কল্পিত 'লীলা-সঙ্গিনী'-র স্বরূপ

কিন্তু এই 'লীলাসঙ্গিনী' ঠিক কে? এই কবিতায় কবি যে-স্মৃতির উপর জোর দিয়ে এবং যে-অনুরাগের বিশেষত্ব নিয়ে বিদায়ক্ষণে পূর্বজীবনের দিকে তাকাচ্ছেন, তার স্বরূপ সম্বন্ধে ভুল ধারণা থাকলে, অথবা মোটামুটি রবীন্দ্রনাথের স্বভাবকে চিনতে ভুল করলে, তাঁর 'লীলাসঙ্গিনী'কেও বুঝতে ভুল হবে। এখানে লক্ষণীয় যে, লীলাসঙ্গিনী কবিকে কাজের পথে নিয়ে যাচ্ছেন না, দুরূহ দুর্গম জীবনের পথেও পরিচালিত করছেন না। বরং কাজ ভুলিয়ে দিচ্ছেন, নদীর কূলে

বনপথে অকারণে পরিভ্রমণ করাচ্ছেন। কখনো আমের নবমুকুলের মধ্য দিয়ে, কখনো বর্ষাশেষের সান্ধ্য মেঘচ্ছায়ায় তাঁর ইসারা ভেসে এসে কবিকে উদাসীন ও ব্যাকুল করে তুলছে। ঠিক এইসব কথাই কবি তাঁর পূর্বকাব্যজীবনে 'মানসী' ও 'সোনার তরী' অধ্যায়ে বলেছেন ; এবং যাঁর সম্পর্কে বলেছেন তিনি হলেন তাঁর মানসসুন্দরী —প্রকৃতিলীলারসবিহারিণী এবং কবির চিত্তে প্রকৃতিনির্ভর রোম্যান্টিক ভাবাবেশের জনয়িত্রী মানসী প্রিয়া। এই কবিতায়—'মনে আছে সে কি, সব কাজ, সখী, ভুলায়েছ বারে বারে' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি থেকে আরম্ভ করে 'অযাত্রা পথে যাত্রী যাহারা চলে নিষ্ফল আয়োজনে' পর্যন্ত অংশ রবীন্দ্রসাহিত্যের রসজ্ঞ পাঠকের মনে অবশ্যই 'মানসসুন্দরী'র নিম্নোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলি স্মরণ করিয়ে দেবে :

'মনে আছে কবে কোন্ ফুল্লযূথীবনে,
বহু বাল্যকালে, দেখা হত দুইজনে
আধচেনাশোনা? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কী খেলা খেলাতে
সখী, আসিতে হাসিয়া,—তরুণ প্রভাতে
নবীন বালিকামূর্তি, শুভ্রবস্ত্র পরি,
ঊষার কিরণধারে সদ্যস্নান করি
বিকচ কুসুমসম ফুল্ল মুখখানি
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে—নিয়ে যেতে টানি
উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে
শৈশবকর্তব্য হতে ভুলায়ে আমারে,
ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি,
দেখায়ে গোপনে পথ দিতে মুক্ত করি
পাঠশালাকারা হতে, কোথা গৃহকোণে
নিয়ে যেতে নির্জনেতে রহস্যভবনে ;
জনশূন্য গৃহছাদে আকাশের তলে।
কী করিতে খেলা ; কী বিচিত্র কথা বলে
ভুলাতে আমারে—।'

উপরে যে-মেয়েটিকে আমরা দেখলাম সেই মেয়েটিই কবির খেলার সঙ্গিনী—সে-জীবনে এবং এ জীবনেও। পূরবীতে তাঁর সঙ্গেই শেষখেলার অভিলাষ অর্থাৎ প্রকৃতিগত বিশুদ্ধ-আনন্দরস-আস্বাদনের অভিলাষ সহজেই বিদায়-

অনুভবের মধ্যে এসে পড়েছে। 'বকুলবনের পাখি'-ও এই 'লীলাসঙ্গিনী'কে লক্ষ্য করে লেখা। সেখানেও রয়েছে :

"শোনো, শোনো, ওগো বকুলবনের পাখি,
দূরে চলে এনু, বাজে তার বেদনা কি।
আষাঢ়ের মেঘ রহে না কি মোরে চাহি?
সেই নদী যায় সেই কলতান গাহি,
তাহার মাঝে কি আমার অভাব নাহি,
কিছু কি থাকে না বাকি?
বালক গিয়েছে হারায়ে, সে-কথা লয়ে
কোনো আঁখিজল যায় নি কোথাও বয়ে?'

এখানেও বিদায়কালে শেষবারের মতো রোম্যান্টিক সৌন্দর্যসুধা পান করার আগ্রহ কবি প্রকাশ করেছেন—'শেষের পেয়ালা ভরে দাও, হে আমার সুরের সুরার সাকী।'

এই নন্দনসংস্পর্শজাত 'মানসী'-কে 'জীবনদেবতা' বলে মনে করলে ভুল করা হবে। 'জীবনদেবতা' রবীন্দ্রনাথের ক্রমউদ্ভিন্নমান ব্যক্তিত্ব, তাঁর অন্তরস্থিত চালকশক্তি—যিনি কবির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও সম্পূর্ণ করছেন। লীলাসঙ্গিনী জীবনের শুধু খেলার, শুধু অপ্রয়োজনীয় আনন্দের সঙ্গে কবির মানসের মিলনসাধয়িত্রী। তিনি কাজের পথে, জীবনের কোনো আদর্শের পথে, কবিকে চালনা তো করেনই না, বরঞ্চ কাজ ভুলিয়ে দেন। তা ছাড়া, পূরবী কাব্যে 'চিত্রা' পর্বের জীবনদেবতাকে কবির স্মরণ করার প্রশ্নই ওঠে না। পূরবীতে কবি বিশ্বচেতনার সঙ্গে নিজের ব্যক্তিচেতনার সংযোগস্থাপন করতে চাচ্ছেন, ব্যক্তিচেতনাকে বিশ্বের অনন্ত প্রাণলীলার উদার ভূমিতে তুলে ধরতে প্রয়াস করছেন—বহির্বিশ্বের দিকেই তাঁর দৃষ্টি এখন প্রসারিত। এই বহির্জগৎই 'লীলাসঙ্গিনী'র বিচরণক্ষেত্র। এখানে সৃষ্টিক্রিয়াশীল কবিব্যক্তিত্ব ও 'লীলাসঙ্গিনী' স্পষ্টই পৃথক হয়ে পড়েছে। 'জীবনদেবতা' কিন্তু কবিব্যক্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। 'চিত্রা'-পর্যায়ে কবি নিজ জীবনের বিভিন্ন দিকের পরিবর্তন ও পূর্ণতাকে লক্ষ্য করে বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে লক্ষ্য করেছেন। তারপর এই পূর্ণতা-অনুভবের পরিস্থিতি কবিমানসে তেমন আর আসেনি। বস্তুত এই ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে অনুভব আমাদের মতো সাধারণ মানুষের চিত্তেও জাগতে পারে, কিন্তু আমরা কবি নই বলে তাকে ঐ রূপরস দিয়ে কল্পনা করতে ও প্রকাশ করতে পারিনে। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যবর্তিনী এক রহস্যময়ী সুন্দরী

সঙ্গিনীর কল্পনা করা রবীন্দ্রনাথের মতো কবির পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। এই দুটি কবিতার ['লীলাসঙ্গিনী' ও 'বকুলবনের পাখি'] ঠিক পঙ্‌ক্তি অনুসরণ করে লেখা 'পথিক'-অধ্যায়ের 'খেলা', 'অপরিচিতা', 'তারা', 'বিস্মরণ' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতা। এগুলিও বিদায়মনোভাবের বেদনামাধুরীতে আঁকা এবং এগুলির মধ্যেও কবির কল্পিত 'লীলাসঙ্গিনী'র অন্বেষণপ্রবৃত্তি পরিস্ফুট হয়েছে।

এই শ্রেণীর পুনশ্চ-মর্তাবিহ্বলতার কবিতাগুলোর মধ্যে কবির 'যাত্রা'র অনিবার্যতা এবং বন্ধনমুক্তির আনন্দের কথাও পরিব্যক্ত হয়েছে—বিশেষত কবি যখন জেনেছেন যে যৌবন এবং আনন্দ 'অশেষ'। তাই দেখি, 'লীলাসঙ্গিনী'-র উপসংহারে যে-আশার কথা উচ্চারিত হয়েছে :

'মালতীলতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে
তারায় তারায় তারি লুকোচুরি রাতে ?
সুর বেজেছিল যাহার পরশপাতে
নীরবে লভিব তারে ?'

সেই আশার উপর নির্ভর করে 'বকুলবনের পাখি'-তে বলা হয়েছে :

'শোনো, শোনো, ওগো বকুলবনের পাখি,
মুক্তির টিকা ললাটে দাও তো আঁকি।
যাবার বেলায় যাব না ছদ্মবেশে,
খ্যাতির মুকুট খসে যাক্ নিঃশেষে,
কর্মের এই বর্ম যাক্ না ফেঁসে,
কীর্তি যাক্ না ঢাকি।'

'রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়' গ্রন্থে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস ঠিকই লক্ষ্য করেছেন : "এই শ্রেণীর বেদনামাধুর্যের সঙ্গে যুক্ত 'খেলা' ও বহুশ্রুত 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতায় যে-নারীমূর্তি কল্পিত হয়েছেন তিনি তাঁর [কবি-রবীন্দ্রের] পূর্বেকার জীবনের বিদেশিনী বা মানসসুন্দরী। কবির কল্পনাঅনুসারে ইনি কবির সৌন্দর্যানুভূতি, সুদূরব্যাকুলতা ও অরূপের লীলার সঙ্গে তাঁর চিত্তের যোগসাধন করে এসেছেন। তাই ইনি লীলার সঙ্গিনীমাত্র। 'পূরবী'তে যাত্রার বেদনার সঙ্গে কবি যখন মর্তের বিশুদ্ধ আনন্দরস-আস্বাদনের জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছেন তখন স্বভাবতই লীলাসহচরী তাঁর মনকে আকর্ষণ করেছে। ইনি কবির ব্যক্তিগত বাস্তব জীবনের সংবাদ রাখেন না, অতীন্দ্রিয় কল্পনাগুলির পরিপুষ্টিতে সহায়তা করেন।...কবির অরূপব্যাকুলতার বিস্তৃত অধ্যায়টির মধ্যে গোপন থেকে,

'বলাকা'-র তীব্র জীবনবোধে প্রতিহত হয়ে, 'পূরবী'-র রসানুভূতির কালে ইনি স্বাভাবিকভাবেই কবির কাছে পূর্ব রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছেন।"

বিষয়বস্তু মোটামুটি এক হলেও 'সাবিত্রী' ও 'আহ্বান'—এই শ্রেণীর দুটি কবিতা স্বাদে অল্পবিস্তর পৃথক হয়ে পড়েছে। এর কারণ এ দুটি কবিতায় প্রকাশিত কবির আত্মদর্শনবাসনা। কবি এখানে শুধু গোপনচারিণীর প্রকৃতিই বর্ণনা করছেন না, তার স্পর্শে তাঁর চিত্তলোকে যে-আলোড়ন চলেছে, যে-সৌন্দর্যের প্রকাশ জাগছে, এবং তার প্রত্যক্ষতার অভাবে যে-বিরহবিকার উপস্থিত হচ্ছে, তার স্বরূপও বিবৃত করেছেন। ফলে কবিতাদুটিতে কিছুটা তত্ত্বময়তাও প্রকাশলাভ করেছে; যদিও বলা যায় যে, এ তত্ত্ব দার্শনিক তত্ত্ব নয়—কাব্যতত্ত্ব। যেমন, 'আহ্বান' কবিতায় কবি তাঁর চিত্তের জাগরণ, কল্পলোকের অর্গলমোচন এবং নিজের কাব্যরচনার কথা নিম্নলিখিতভাবে জানিয়েছেন :

'সাবিত্রী' ও 'আহ্বান' কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবসত্য

"তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি গান গেয়ে উঠি,—
'আছি, আমি আছি'।
সেই আপনার গানে লুপ্তির কুয়াশা ফেলে টুটি—
বাঁচি, আমি বাঁচি।
তুমি মোরে চাও যবে অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জ্বলে;
অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গলে আসে
নৃত্যকলরোলে।"

কবি কল্পনা করছেন, অমরাবতীর বাতায়নে কোন্ জ্যোতির্ময়ী গান করছেন এবং তাঁর সুরের ইসারায় মাটির পৃথিবীতে সৌন্দর্যের চাঞ্চল্য জাগছে, কবির চিত্তে রূপরসের বেদনা স্পন্দিত হচ্ছে। ফলত :

'ছন্দের বন্যায় মোর রক্ত নাচে সে-চুম্বন লেগে,
উন্মাদ সংগীত কোথা ভেসে যায় উদ্দাম আবেগে
আপনা-বিস্মৃত।'

লীলাসঙ্গিনী এবং মানসী, হারানো তারা এবং খেলার সাথী স্পষ্ট একটি বহির্জাগতিক সত্তারূপে দৃষ্ট হয়েছেন, এবং কবি তাঁর আহ্বানে উচ্চকিত হয়ে বর্ণগন্ধগীতের মধ্যে মানসঅভিসার করছেন বলে কল্পিত হয়েছে। পূর্বোক্ত কবিতাগুলির সঙ্গে এ দুটির ['সাবিত্রী' ও 'আহ্বান'] পার্থক্য হল এই যে, এখানে পূর্বপরিচয়ের কথা তেমন বলা হয়নি, বা বেদনামধুর স্মৃতির রোমন্থন করা হয়নি এবং

এগুলিতে বিদায়-মনোভাবেরও পরিচয় নেই। এখানে পৃথিবীপ্রীতি আছে, সৌন্দর্য-মুগ্ধতা আছে, কিন্তু তাকে ছাপিয়ে ওই সত্তাকে অন্বেষণের আগ্রহই প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দেখা যায়, কবি এই সময়ে লেখা কাব্যতত্ত্ববিচারেও বহির্জগতের একের এবং নিজ মনোজগতের একের কথা বলেছেন। যেমন: 'তারই প্রতিঘাতে স্পষ্ট করে তুলছে, আমি আছি, এই বোধ। আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ, অস্পষ্টতাতেই অবসাদ।···বাইরের সত্তার অভিঘাতে সেই হওয়ার বোধে বান ডেকে এলে মন সৃষ্টিলীলায় উদ্বেল হয়ে ওঠে।' [সাহিত্যের পথে]। 'আহ্বান' ও 'সাবিত্রী' কবিতায় কবি তাঁর যে-উপলব্ধির কথা কাব্যে প্রকাশ করেছেন, সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় তাকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করেছেন।

'সাবিত্রী'-র সঙ্গে 'আহ্বান' কবিতার আবার পার্থক্য এই যে, 'আহ্বান'-এ যাকে বহির্লোকবাসিনী, কল্যাণী, দূতীরূপে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে অনুসন্ধানের প্রয়াস করেছেন, তাকেই 'সাবিত্রী' কবিতায় সূর্যের মধ্যে দেখার চেষ্টা করেছেন।

'সাবিত্রী'-র সঙ্গে 'আহ্বান'-এর পার্থক্য

সূর্যের থেকেই পৃথিবীর সৃষ্টি—এই বৈজ্ঞানিক ধারণার বশেই হোক, অথবা উপনিষদের কথিত সূর্যের মধ্যে সত্যবস্তু লুক্কায়িত রয়েছে, এই ধারণার বশবর্তী হয়েই হোক, কবি সূর্যের মর্মলোকে এই রহস্যময় সত্তাকে দেখতে চেয়েছেন। উপনিষদের বাণীটি এই: 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তৎ তে পূষণ্ অপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥' কিন্তু কবি উপনিষদের উপলব্ধির উপর নির্ভর করেই কবিতাটি লিখেছেন, এমন মনে করা ভ্রমাত্মক হবে। কারণ উপনিষদের তত্ত্বগত সত্য এবং কবির উপলব্ধ সৌন্দর্যসত্য একবস্তু নয়। তবে অন্বেষণের রীতিতে কবিকে উপনিষদের রীতির উপর নির্ভর করতে হয়েছে হয়তো—উপলব্ধি তাঁর স্বকীয়।

এখানে 'পূরবী' কাব্যের সাধারণ পাঠককে একটি কথা বলে রাখছি—'আহ্বান' কবিতাটিতে সম্বোধিতা 'নারী' কবির 'চিত্রা'-পর্বের 'জীবনদেবতা' নয়।

'আহ্বান'-এ সম্বোধিতা নারীটির স্বরূপ

যে-অনন্ত প্রাণধারা সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে প্রবাহিত, যে-দুর্জ্ঞেয় প্রাণশক্তির স্পন্দন বিপুলা বিশ্বপ্রকৃতির বুকে বিচিত্র রূপ নিয়ে প্রতিনিয়ত অভিব্যক্ত হচ্ছে, মহা-সৌন্দর্যের প্লাবন সৃষ্টি করছে, সেই প্রাণপ্রবাহকে—মহাপ্রাণশক্তিকেই—কবি একটি সত্তারূপে দেখেছেন। এই বিশ্বসত্তাই কবির কল্পিত 'নারী'—'সে-নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার থাকিয়া থাকিয়া।' এই সত্তা বা প্রাণশক্তির সঙ্গে যখনই

কবিচিত্তের যোগসাধন হয় তখন কবি সৃষ্টিপ্রেরণা অনুভব করেন। কারণ, ওই প্রাণধারাই সকল সৃষ্টির উৎস, এবং কবির নিজের সত্তাটিও তো তারই একটা বিচ্ছিন্ন অংশমাত্র। এই উপলব্ধি থেকেই কবি 'সাবিত্রী' কবিতায় বলেছেন—'এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী'। বুঝতে পারা যায়, কবির কাব্যপ্রেরণা যখন স্তিমিত হয়ে এসেছে তখন তিনি সৃষ্টির ওই আদি-উৎসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নবতর সৃষ্টিকর্মে উদ্‌বুদ্ধ হতে চেয়েছেন। এখানে কবি সৃষ্টিপ্রেরণালাভের জন্য বাইরের দিকেই তাকাচ্ছেন, নিজের ব্যক্তিচেতনাকে বিশ্বচেতনার দিকে তুলে ধরছেন। এই যে বিশ্বসত্তা, এর সঙ্গে পূর্বে উপলব্ধ কবির 'জীবনদেবতা'র প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক নেই। অরূপসাধনার জগতে প্রবেশের সময় থেকে কবির জীবনদেবতা-অনুভূতি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, এবং তাকে নতুন করে উপলব্ধি করার প্রয়োজন জীবনে আর কখনো হয়নি। বস্তুত 'সাবিত্রী' ও 'আহ্বান' কবিতাদুইটির মধ্যে কবির সৃষ্টিপ্রেরণালাভের আকূতিই ধ্বনিত হয়েছে, এর জন্যে তিনি সৃষ্টির উৎস-মূলের সন্ধান করেছেন। এখানে আরো মনে রাখতে হবে, উপরি-উক্ত বাসনার সঙ্গে কবির মুক্তিলাভের বাসনাও জড়িত হয়ে পড়েছে—'সাবিত্রী' কবিতায় তার প্রমাণ রয়েছে ঃ

'তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা ;
মুহূর্তে সে-ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মুছে যায় সরে।
তেমনি সহজ হোক হাসিকান্না ভাবনাবেদনা—
না বাঁধুক মোরে।'

তারপর 'বকুলবনের পাখি'। কবিতাটি 'লীলাসঙ্গিনী'র কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুত ভিন্নতর চিত্রকল্পের মাধ্যমে—নতুন একটি প্রতীকের সাহায্যে—এ কবিতায় কবি তাঁর পূর্ববর্তী কাব্যজীবনের 'মানসসুন্দরী'কেই পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। 'বকুলবনের পাখি' বস্তুত বিচিত্ররূপা প্রকৃতির চিত্তহরা সৌন্দর্যসত্তারই প্রতীক,—কবির কল্পিত 'অসীম-নীলিমা-তিয়াসি বন্ধু'টিকে নিসর্গলোকের অবারিত সৌন্দর্যের দূত বলা যেতে পারে। 'পূরবী'র কবিচিত্তে হারানো প্রীতি, পুরানো স্মৃতি, মর্তের প্রেম-সৌন্দর্যের আনন্দরস-আস্বাদনের প্রতি অনুরাগ জন্মেছে। এই রসানুভূতির কালে কবি তাই স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর বিগত কৈশোর ও প্রথমযৌবনের লীলাসহচরাকে স্মরণ করেছেন। কবির ভালো লাগে না আর যান্ত্রিকতাময় কৃত্রিম জীবন, তাঁর কাছে এখন বুঝি দুর্বহ হয়ে উঠেছে খ্যাতি ও কীর্তির বোঝা।

'বকুলবনের পাখি'

এর মধ্যে জীবনের সহজমধুর বিশুদ্ধ আনন্দের উচ্ছলন কোথায়, কোথায় আত্ম-বিস্মৃত হয়ে সৌন্দর্যতন্ময়তার গভীরে ডুব দেওয়ার আনন্দ? কবি আবার সেই সহজ আনন্দ ও মাধুর্যময় জীবনের মধ্যে ফিরে যেতে চান, তাঁর চিত্তে জেগেছে পূর্বেকার সেই সহজ সুরে গান করার আকাঙ্ক্ষা। কোথায় গেল অতীতের সেই দিনগুলি, যখন: "সহজরসের ঝর্ণাধারার 'পরে গান ভাসাতেম সহজ সুখের ভরে।"

কবিতাটির মধ্যে কবির অগাধ মর্তানুরাগের সুস্পষ্ট প্রতিবিম্বন রয়েছে, পিছনে-ফেলিয়া-আসা দিনগুলোর জন্য বিচ্ছেদবেদনাও বেজে উঠেছে, এবং এর সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে তাঁর পথিকচিত্তের যাত্রীমনোভাব আর প্রকাণ্ড অনাসক্তি। তাই একদিকে তিনি বলছেন:

শোনো শোনো ওগো বকুলবনের পাখি,
দূরে চলে এনু, বাজে তার বেদনা কি।
আষাঢ়ের মেঘ রহে না কি মোরে চাহি,
সেই নদী যায় সেই কলতান গাহি,
তাহার মাঝে কি আমার অভাব নাহি—
কিছু কি থাকে না বাকি।
বালক গিয়েছে হারায়ে, সে কথা লয়ে
কোনো আঁখিজল যায়নি কোথাও বয়ে?

অন্যদিকে বলছেন:

শোনো শোনো ওগো বকুলবনের পাখি,
যাই যবে যেন কিছুই না যাই রাখি।
ফুলের মতন সাঁঝে পড়ি যেন ঝরে,
তারার মতন যাই যেন রাত-ভোরে,
হাওয়ার মতন বনের গন্ধ হরে
চলে যাই গান হাঁকি।
বেণু-পল্লব-মর্মর-রব-সনে
মিলাই যেন গো সোনার গোধূলিক্ষণে।

কবিজনোচিত পৃথিবীপ্রীতি এবং সাধকজনসুলভ বৈরাগ্য কবিতাটিতে টানা-পোড়েনের মতো জড়িত-মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে। 'বকুলবনের পাখি' 'পূরবী'-রচয়িতার কবিমানস-বিশ্লেষণের পক্ষে মস্তবড়ো সহায়ক।

বিশ্বজীবনের অন্তরালবর্তী এক রহস্যময় সত্তার কল্পিত নারীমূর্তি পূরবী

কাব্যের 'ক্ষণিকা'। সৌন্দর্যস্বরূপ এই সত্তা, ইহার চকিত স্পর্শের পরিণাম নিবিড় আনন্দানুভূতি। নিজ জীবনের কোন্ যুগান্তরে এই অপরূপা চঞ্চলচরণা নারীর সাক্ষাৎ কবি পেয়েছিলেন, এবং নিমজ্জিত হয়েছিলেন অতল অপার রসসাগরে।

'ক্ষণিকা'

তারপর সেই নারী আত্মগোপন করল, 'গোধূলিবেলার পান্থ' 'তার ভীরু দীপশিখা' নিয়ে 'দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল।' যেহেতু এই দর্শন চকিত সেহেতু 'ক্ষণিকার' সম্পূর্ণ পরিচয় কবি পেলেন না, কবিচিত্তে জেগে রইল চেনার অপূর্ণতার বেদনা।

'ক্ষণিকা'র সঙ্গে কবির সাক্ষাৎকার কোন্ যুগান্তরের ঘটনা। তারপর জীবনের পথে বহুদূর তিনি এগিয়ে এসেছেন। মনে করেছিলেন, এতদিনে এই রহস্যময়ী নারীটিকে তিনি ভুলে গিয়েছেন—জীবনে কত দিক্‌পরিবর্তন, কত পালাবদলই তো হলো, কিন্তু আজ পরিণত বার্ধক্যে 'পূরবী'-রাগিনী বাজাতে বসে কবি দেখতে পেলেন, যাকে তিনি বিস্মৃত হয়ে গিয়েছেন বলে মনে করেছিলেন, সে—

আমার গানের ছন্দ গোপনে করেছে অধিকার ;
দেখি তার অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্নে অশ্রুসরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি।

দূরে চলে গেলেও 'গোপনরঙ্গিনী' 'রসতরঙ্গিণী'কে ভোলা কি অত সহজ! সে যে কবির অন্তরতর সত্তার গোপন গভীরে বাসা বেঁধে রয়েছে। কবির মানস-চেতনার ধ্যানলোকে তার অদৃশ্য বিহরণ, কবির স্বপ্নেও গানে তার সতত সঞ্চরণ। কবি এখন বুঝতে পারছেন, ক্ষণকালের জন্য দেখা দিয়ে হারিয়ে গেলেও ওই সৌন্দর্যময়ী অপরূপা নারী তাঁর সঙ্গীতের নিত্যপ্রেরণাদাত্রী হয়ে রয়েছেন—তার চকিত-স্পর্শলাভের সুনিবিড় আনন্দ অবিস্মরণীয়। তাই প্রতিনিয়ত চলে সেই আনন্দস্মৃতিরোমন্থন :

তার সেই ত্রস্ত আঁখি সুনিবিড় তিমিরের তলে
যে-রহস্য নিয়ে চলে গেল, নিত্য তাই পলে পলে
মনে মনে করি যে লুণ্ঠন ;
চিরকাল স্বপ্নে মোর খুলি তার সে-অবগুণ্ঠন।

কে এই 'ক্ষণিকা'? কবি কাকে বলছেন 'আনন্দের হারানো কণিকা'? স্তব্ধ আকাশের নীল যবনিকার ওপারে কাকে তিনি সন্ধান করে ফিরছেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, বিশ্বপ্রকৃতির বহুবিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্যে যে-এক পরমাশ্চর্য সত্তার অপরূপ আভাস পেয়ে কবি ক্ষণে ক্ষণে চমকিত হয়ে উঠেছেন, যার আবির্ভাবে দ্যুলোক-ভূলোকে 'মহাসৌন্দর্যের আনন্দনৃত্য' চাক্ষুষ করেছেন, সেই

বিশ্বসত্তাকে জানবার আগ্রহই আজ তাঁকে এমন ব্যাকুল করে তুলেছে। কিন্তু মানবীয় চেতনা দিয়ে অমর্তচেতনাকে কতটুকুই বা ধরা যায়? এর কিঞ্চিৎ পরিচয় মেলে আভাসে-ইংগিতে। কিন্তু এতে যেন কবির তৃপ্তি নেই। তাই বিচ্ছেদের অনুভূতি নিয়ে কবি বলেন :

গেল না ছায়ার বাধা ; না-বোঝার প্রদোষ-আলোকে
স্বপ্নের চঞ্চল মূর্তি লাগায় আমার দীপ্ত চোখে
সংশয়মোহের নেশা ; সে-মূর্তি ফিরিছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধারে মেশা ; তবু সে অনন্ত দূরে আছে
মায়াচ্ছন্ন লোকে।
অচেনার মরীচিকা আকুলিছে ক্ষণিকার শোকে।

এই ছায়ার বাধা কখনো অপসারিত হবার নয়। 'ক্ষণিকা'র আবির্ভাব যেমন চকিত, তেমনি তার অন্তর্ধান। পূরবী কাব্যের 'শেষ', 'তারা', 'আহ্বান, 'শেষ-অর্ঘ্য' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে এই 'ক্ষণিকা'কে ধরবার আর্তিই প্রকাশ পেয়েছে। 'শেষ অর্ঘ্য' কবিতাটি এখানে স্মর্তব্য :

যে-তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যূষবেলায়
প্রথম শুনালো মোরে নিশান্তের বাণী
শান্তমুখে ; নিখিলের আনন্দমেলায়
স্নিগ্ধকণ্ঠে ডেকে নিয়ে এল ; দিল আনি
ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায়
প্রাণের প্রাঙ্গণে ; যে-সুন্দরী, যে-ক্ষণিকা
নিঃশব্দ চরণে আসি কম্পিত পরশে
চম্পক - অঙ্গুলি - পাতে তন্দ্রাযবনিকা
সহাস্যে সরায়ে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়ালো পরশমণি জ্যোতির কণিকা ;
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথম দুলায়ে দিল রূপের মণিকা ;
এ সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে।

এখানেও আমরা 'সুন্দরী' 'ক্ষণিকা'কে দেখতে পাচ্ছি, এখানেও সেই সন্ধানতৎপরতা, ওই সুন্দরীর সহিত বিচ্ছেদজনিত আক্ষেপ। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত কবি এ 'ক্ষণিকা'কে স্মরণ করেছেন। জীবনপ্রভাতে যার সঙ্গে লীলায়

মেতেছিলেন, জীবনসায়াহ্নেও তাকে তিনি নিবিড়ভাবে পেতে চেয়েছেন। তাকে না হলে কবির চলে না, কারণ সে যে তাঁর কাব্যসৃষ্টির পরম প্রেরণা।

'লিপি' প্রকৃতিভাবনামূলক উপভোগ্য একটি কবিতা। এই কবিতায় কবির রোম্যান্টিক কল্পনাভঙ্গি লক্ষ্য করবার মতো। 'লিপি'তে সর্বজনবিদিত বস্তুজগতের একটি তথ্য রোম্যান্টিক কল্পনার স্পর্শে রসমধুর কাব্যসত্যে রূপান্তরিত হয়েছে।

'লিপি'

সুন্দরী শ্যামলা ধরণী ও অনন্তজ্যোতির আধার সূর্যের মধ্যে প্রণয়-সম্পর্ক-কল্পনা এবং উভয়ের মধ্যে সৃষ্টির আদিম যুগ থেকে লিপির আদানপ্রদানের কল্পনাসঞ্জাত সৌকুমার্য কবিতাটিকে আস্বাদনীয় করে তুলেছে। প্রকৃতিভাবুক কবি কেমন কৌশলে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন! প্রকৃতি যে রবীন্দ্রনাথের বড়ো একটি কাব্যপ্রেরণা, 'লিপি' কবিতার শেষাংশে তার ইংগিত রয়েছে :

'তোমার মনের কথা আমারি মনের কথা টানে,
চাও মোর পানে।
চকিত ইংগিত তব, বসনপ্রান্তের ভঙ্গিখানি
অঙ্কিত করুক মোর বাণী।'

'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' কবিতাটিকে শোকগাথা বলা যেতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ কতখানি ভালোবাসতেন, এ কবিতায় তার স্বাক্ষর মুদ্রিত রয়েছে। কবিতাটির প্রথমাংশে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আভাসে বাণীবদ্ধ হয়েছে, শেষাংশে কবির আত্মগত ভাবনাই প্রাধান্যলাভ করেছে। সত্যেন্দ্রনাথ ইহলোক ছেড়ে যে-অমর্তলোকে চলে গেছেন, সেই অমর্তলোকের চেতনা কবিকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করে গিয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ যে-পরিণাম লাভ করেছেন, রবি-কবিও একদিন সেই পরিণাম লাভ করবেন। এই মর্তপৃথিবীতে সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের অনুজ ছিলেন, অমর্তলোকে রবীন্দ্রনাথ হবেন সত্যেন্দ্রনাথের অনুজ। সেখানে যখন দুজনের পুনর্বার সাক্ষাৎকার হবে তখন এই পৃথিবীর অগ্রজকে সেই পৃথিবীর অগ্রজ অবশ্যই চিনতে পারবেন। সর্বশেষে কবি বলেছেন, অমর্তলোকে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ মর্তজীবনের মমতা যেন সম্পূর্ণ পরিহার না করেন :

'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত'

'যেমনি অপূর্ব হোক-নাকো,
তবু আশা করি, যেন মনের একটি কোণে রাখো
ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে-ভয়ে দুঃখে-সুখে
বিজড়িত—'

কবি যতই অনাসক্তির সাধনা করুন, আসক্তিবিজড়িত মনের বন্ধন কাটানো যে কী কঠিন, এবং ওই বন্ধন ছিন্ন করতে গিয়ে কী মর্মান্তিক বেদনা তিনি অনুভব করেছেন, তার অনেকখানি পরিচয় 'পূরবী'র বহুতর কবিতায় মিলবে।

'আশা'

'আশা' কবিতাটি কবির পার্থিবপ্রীতিরই কথা। কবি এখন বড়ো কিছু হতে চান না কিংবা পেতে চান না—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর মানবীয় প্রেমের মাধুর্যটুকু পেলেই তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন। 'পূরবী'র কবির আশ্রয় প্রকৃতির সংসার আর প্রীতিভরা মানবসংসার। এই পৃথিবীর ছোট্ট একটি কোণে 'একটুকু বাসা' যদি তিনি পান, এবং তার সঙ্গে যদি লাভ করেন 'কিছু ভালোবাসা' তাহলে ওই ভালোবাসা দিয়েই তিনি 'দুদিনের কাঁদা আর হাসা'-কে ভরিয়ে তুলতে পারবেন। প্রেম এবং সৌন্দর্য, এবং এদের ধ্যানকে সংগীতে ফুটিয়ে তোলাই বর্তমানে কবির একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। আয়ুর সীমান্তের দিকে কবি যতই এগিয়ে যাচ্ছেন ততই তাঁর মনে হচ্ছে—'মধুময় পৃথিবীর ধূলি'।

'পথিক'-অধ্যায়ের কয়েকটি কবিতা

'পথিক'-অধ্যায়ের ভিন্নশ্রেণীর কয়েকটি কবিতা সম্পর্কে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন। 'পথিক'-এর শেষের দিকের কবিতাগুলি কবির বিচিত্র ভাবনার বাহন হয়েছে। এর মধ্যে ঝড়, অন্ধকার, সমুদ্র প্রভৃতিকে আশ্রয় করে কবিচিত্তের বৈরাগ্যমূলক চলার বাণী অথবা আন্তরিক প্রীতসম্পর্কের কথা উচ্চারিত হয়েছে। 'বিদেশি ফুল', 'অতিথি' ইত্যাদি কয়েকটি কবিতায় আতিথ্য-সৎকার-পরায়ণা বিদেশিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা হয়েছে। 'শেষবসন্ত' নামক কবিতাটি এই রকম কোনো ব্যক্তির স্পর্শবিজড়িত হলেও, ব্যক্তিসম্পর্ককে নিঃশেষে ত্যাগ করে একটি আশ্চর্যসুন্দর গীতিকবিতা হয়ে উঠেছে। এই কবিতাটির মধ্যেও কবির বিদায়কালীন পৃথিবী-অনুরাগের অপূর্ব স্বাক্ষর রয়েছে। এই কবিতার উপসংহারের পঙ্‌ক্তিগুলিতে কবির বেদনাময় মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে।

'স্বপ্ন' ও 'মুক্তি' কবিতায় কবি নিষ্প্রয়োজনের আনন্দ এবং স্বপ্ন-দেখাকেই পরম সত্যবস্তু বলে অভিহিত করেছেন। এর মধ্যে দার্শনিক চিন্তা এবং উচ্চ-ভাবাদর্শ থেকে মুক্ত বিশুদ্ধ কাব্যানন্দের প্রয়াসী কবির যথার্থ স্বরূপটিকে চিনে নিতে বিলম্ব হয় না। এই অধ্যায়ের একটি কবিতায় কবির প্রত্যক্ষ মৃত্যু-অভিজ্ঞতা ও যাত্রার সংকেত উপলব্ধির কথা প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটি ভাষাভঙ্গিতে এবং চিত্রনির্মাণের দিক থেকে খুবই স্মরণীয়। কবি যদিও পূর্বেকার যাত্রা ও গতির উপলব্ধিতে প্রত্যাবর্তন করে মরণভয়ের ঊর্ধ্বচারী হয়ে উঠতে চেয়েছেন, তবু

জন্মান্তরের যাত্রার মধ্যে কবির বিচ্ছেদকাতরতা এবং কিছুটা শঙ্কার অনুভূতিও কবিতাটিতে স্থান পেয়েছে ; এবং এই অজানা পথে যাত্রার স্বাভাবিক অনুভূতিই কবিতাটিকে অতিশয় সুন্দর করে তুলেছে। 'কঙ্কাল' কবিতাটিও মৃত্যুভাবনাশ্রয়ী। এখানেও কবি নিজের পার্থিব পরিণামের কথা ভেবে প্রথমে কিছুটা বিষণ্ণতা অনুভব করেছেন। কিন্তু ক্ষণপরেই এই প্রত্যয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে আশ্বস্ত অনুভব করছেন যে, তাঁর জৈবসত্তা মৃত্যুর শাসনের অধীন, কিন্তু তাঁর আত্মিক সত্তা মৃত্যুর শাসনাধীন নয়। যেখানে তিনি স্রষ্টা সেখানে মৃত্যুর প্রবেশ চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ—স্রষ্টার ভূমিকায় কবি মৃত্যুর চেয়ে বড়ো। মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর চরম কথা হল—'আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো এই শেষ-কথা বলে যাব আমি চলে।'

উপসংহার

পূরবীর উল্লেখযোগ্য অসংখ্য কবিতাতে কবির সহজ প্রীতির সঙ্গে সহজ বাক্‌শিল্পের অনুসরণ দেখা যায়। একমাত্র 'তপোভঙ্গ' কবিতাতে সংস্কৃতভাষা-সুলভ বচনচাতুর্য প্রয়োজনবোধেই কবিকে অবলম্বন করতে হয়েছে। তাতে কবিতাটিতে যে-সৌন্দর্য সঞ্চারিত হয়েছে একালের কোনো কবিতাতেই তা হয়নি। অথচ একথাও অস্বীকার্য নয় যে, সহজ ভাষাভঙ্গিতে চিত্রযোজিত হয়ে এবং সংযত অনুপ্রাসে বদ্ধ হয়েও 'শেষবসন্ত' কবিতাটিতে কম চমৎকারিত্ব পরিস্ফুট হয়নি। যেমন :

'বেণুবনচ্ছায়াসম সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে
মিলাইবে গোধূলির বাঁশরীর সর্বশেষ সুরে।'

মোটের উপর একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, পূরবী অতি সহজ কবিত্বের মায়াময় সহজ প্রকাশ।

'মহুয়া'-কাব্যপাঠের ভূমিকা

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** 'মহুয়া' এক আশ্চর্য কাব্যগ্রন্থ—'মহুয়া' সম্পূর্ণ আকস্মিক রচনা নয় —রবীন্দ্রনাথের প্রেমদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য—কবির প্রেমবাসনা মনের দ্বারা শাসিত—কবির আকাঙ্ক্ষিত প্রেম দেহকামনার ঊর্ধ্বচারী—রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কবিস্বভাব—প্রেমকাব্য-হিসেবে 'মহুয়া'-র অসাধারণত্ব—'উজ্জীবন'-কবিতাটি 'মহুয়া'-র প্রচ্ছন্ন ভূমিকা—শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথ—'মহুয়া'-র বীর্যদীপ্ত প্রেম—প্রেমের সংগ্রামী মূর্তি—রবীন্দ্রপ্রতিভা যুগধর্মী—রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার দিক্‌পরিবর্তন—প্রেমের আশ্চর্য শক্তি—'মহুয়া'-র পুরুষ ও নারীর প্রেমের প্রতীকচিহ্ন—'মহুয়া'-র চিত্রিত প্রেমের পৌরুষমহিমা—মানবজীবনে শান্তি ও সান্ত্বনার একমাত্র বস্তু প্রেম—'মহুয়া'-য় প্রসাধনকলার কবিতা—রূপকার রবীন্দ্রনাথের পরিচয়—বসন্ত-বিষয়ক কবিতা।]

'মহুয়া' এক আশ্চর্য কাব্যগ্রন্থ

'মহুয়া'-র প্রণয়কবিতাগুলি লিখে রবীন্দ্রনাথ আমাদের একরূপ হতবুদ্ধি করে ছেড়েছেন। ভাবতেও অবাক লাগে, সাতষট্টি বছর বয়সে কবি লিখেছেন 'মহুয়া' প্রেমকাব্যখানি। কবির চিত্তদেশে এ যেন অকাল-বসন্তের আবির্ভাব—পউষের পাতাঝরা বনে উচ্ছৃঙ্খল বাতাসের মাতামাতি, বালুপ্রান্তরে মূর্ছিত শীর্ণরেখা নদীর বুকে যেন হঠাৎ বিপুল প্লাবনের উচ্ছ্বাস! এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। যে-যৌবনকে কবি বহুদূর পিছনে ফেলে এসেছেন, সেই যৌবনকে বুঝি পুনর্বার তিনি ফিরে পেলেন শুভ্র পরিণত বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে। 'মহুয়া' রবীন্দ্র-কবিজীবনের আকালিক ফসল—যেমন অভিনব তেমনি চমকপ্রদ। গ্রন্থখানির মধ্য দিয়ে আমরা দেখে নিলাম রবীন্দ্রনাথের চিরযৌবনমূর্তি, যে-যৌবন জরার শাসনকে বারে বারে করেছে অস্বীকার। রবীন্দ্রনাথ সপ্রমাণ করলেন, কবির বয়স নেই। সুতরাং সাধারণের মতো বয়োধর্মের প্রভুত্ব তাঁর ওপর খাটে না। সত্যিকারের কবি যিনি তিনি বার্ধক্যেও পয়লা নম্বরের ছেলেমানুষী করতে পারেন, আবার যৌবনেও বৃদ্ধসুলভ গম্ভীর হতে পারেন; শীতের মধ্যেও বসন্তের জয়ঘোষণা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়—'প্রাণে যদি রয় গান অক্ষয়, সুর যদি রয় চিত্তে'। সংস্কৃতের সাবধানী সমালোচকরা এইজন্যেই বলে গিয়েছেন, কবিদের রচনা সম্পর্কে কার্যকারণের প্রশ্ন তুলোনা, তাঁদের কোনো জবাবদিহি করতে বলো না, তাঁরা নিরঙ্কুশ—কবিপ্রতিভা ও কবিকর্ম 'নিয়তিকৃতনিয়ম-রহিত'। 'মহুয়া'-র বিষয়ে আমাদের কবি বলছেন : 'শুধায়োনা কবে কোন্ গান কাহারে করিয়াছিনু দান'। কবির নিষেধ আমরা লঙ্ঘন করব না। শুধু একথাটি বলব, 'মহুয়া' কাব্যখানি থেকে বিচ্ছুরিত বার্ধক্যবিজয়ী যৌবনের 'হঠাৎ

আলোর ঝল্‌কানি' লেগে আমাদের 'চিত্ত ঝল্‌মল' করে উঠেছে, 'উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রনগুচ্ছ' দেখে আমরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেছি।

বোধ করি, নিজের বয়সের কথা ভেবে এবং বইখানি রচনার বহিরঙ্গ প্রেরণার দিকে তাকিয়েই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে 'মহুয়া' আকস্মিক। আমরাও একটু আগে একে 'আকালিক ফসল' বলেছি। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, 'মহুয়া' একেবারে আকস্মিক একটি রচনা নয়। এ কাব্যটি লিখবার বছর চারেক আগে কবির 'পূরবী' প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে আমরা দেখেছি, তিনি অনেকখানি ফিরে গেছেন যৌবনের দিনে, তাঁর কাব্যজীবনে এসেছে একটা 'শেষবসন্ত'। কবি স্মরণ করেছেন 'যৌবনবেদনারসে উচ্ছল দিনগুলি'কে, 'সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে' তাঁর প্রাণে বাঁশি বেজে উঠছে, তিনি সন্ধান পেয়েছেন 'জ্যোতির্ময় সুধা'-পাত্রটির। 'পূরবী'তেই কয়েকটি খাঁটি প্রেমের লিরিক লিখে কবি আমাদের চমৎকৃত করেছেন। ওই কাব্যগ্রন্থখানিতে যে-প্রেমানুভূতির উদ্বোধন হল তারই বিকাশ এবং পূর্ণপ্রকাশ আমরা দেখলাম 'মহুয়া'তে। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের ভাবজীবনের দিকে লক্ষ্য করলেও দেখতে পাওয়া যাবে যে, একই সময়ে তিনি লিখেছেন 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' ও 'নারীর মনুষ্যত্ব'-নামক প্রবন্ধ; লিখেছেন 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা' নামে উপন্যাস-দুইটি। এসব রচনার সঙ্গে 'মহুয়া'র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এখানে 'তপতী' নাটকের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। এ সময়ে নরনারীর প্রেম ও ভালোবাসা সম্বন্ধে তাঁর মনে নানাচিন্তা নানাপ্রশ্ন জেগেছিল। নারীপুরুষের প্রেমজীবনের বিচিত্র ভাবনা কবির মনে জাগিয়ে তুলল তাঁর হারানো যৌবনদিনের স্মৃতি, চিত্তের নিভৃতে বইতে সুরু করল প্রেমরসের ধারা। তারই কলধ্বনি আমরা শুনতে পেলাম কখনো উপন্যাসে, কখনো নাটকে, কখনো কাব্যধর্মী গদ্যে, কখনো গীতিকবিতায়— 'যোগাযোগ'-এ, 'শেষের কবিতা'-য়, 'তপতী'তে, আর 'মহুয়া'র লিরিকগুলোতে। এই কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে ভাবের যে-যোগ রয়েছে তা সবিশেষ লক্ষণীয়। 'যাত্রী'র সঙ্গে 'পূরবী'র যে-সম্পর্ক, 'শেষের কবিতা'র সঙ্গে 'মহুয়া'-র অনুরূপ সম্পর্ক। 'মহুয়া'র কবিতাগুলো পড়বার সময় রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠকের মনে নিশ্চয়ই অমিত-লাবণ্যের প্রণয়সম্পর্কের স্মৃতি উদিত হবে, কখনো-বা তাঁরা 'যোগাযোগ'-এর কুমুর কথাও স্মরণ করবেন, আর স্মরণ করবেন 'পূরবী'তে গ্রথিত কয়েকটি প্রেমসংগীত। তাই 'মহুয়া'কে একেবারে আকস্মিক রচনা বলে মনে হয় না। সে যাক্।

'মহুয়া' সম্পূর্ণ আকস্মিক রচনা নয়

মহুয়া প্রেমকাব্য। আধুনিক বাংলা প্রেমকবিতার ক্ষেত্রে সমালোচ্য গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথের একটি স্মরণীয় ও উল্লেখনীয় দান। এর মধ্যে কবির প্রেমানুভূতির যে-প্রকাশ ঘটেছে তার অভিনবত্ব সর্বজনস্বীকৃত। বীর্যদীপ্ত প্রেমের এমন শিল্পসংগত রূপায়ণ ইতঃপূর্বে আমরা কুত্রাপি দেখিনি। কবি নিজেও এজাতের কবিতা এর আগে কিংবা পরে কথনো লেখেননি। 'মহুয়া'য় প্রতিফলিত রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কল্পনার স্বরূপবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে কবির প্রেম-দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণভাবে দু-একটি কথা বলে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। জীবনের বিভিন্ন পর্বে রবীন্দ্রনাথ অজস্র প্রেমের কবিতা লিখেছেন, প্রেমের গান রচনা করেছেন। এসব কবিতা ও গানগুলি অনুধাবন করলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, সৌন্দর্যসাধনার মতো, প্রেমসাধনাও রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মানসধর্মী—সৌন্দর্যপিপাসাই তাঁর প্রণয়তৃষ্ণার জনয়িত্রী। রবীন্দ্রনাথ স্থূল প্রেমসম্ভোগের কবি নন। প্রেমকে তিনি নিবিড় সৌন্দর্যানুভূতির রসে অভিষিক্ত করে আর্টিস্টের মতো উপভোগ করেছেন। কবির প্রণয়মূলক কবিতাগুলোতে প্রেমের রতি ও সৌন্দর্যের আরতি একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। এ কারণে এই জাতের কবিতায় প্রখর পিপাসার তাপ আমরা ততখানি অনুভব করি না, যতখানি দেখতে পাই একটা স্নিগ্ধকোমল জ্যোতি। প্রণয়াভিলাষী হলেও কবি বরাবরই দেহবিমুখ, তাঁর মধ্যে দেহ সম্বন্ধে শুচিতা-বোধ অতিশয় তীক্ষ্ণ। প্রেমকে দেহধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে তিনি যেন অস্বীকৃত। দেহসংস্কারের মধ্যে একটি বন্ধনের ভাব রয়েছে। বন্ধনঅসহিষ্ণু বলে কবি তাকে কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারেননি। এ কারণে, যে-প্রেম হৃদয়াবেগের প্রবল উচ্ছ্বাসের আকর্ষণে প্রণয়িযুগলকে দেহের তটপ্রান্তে টেনে এনে আছড়িয়ে মারতে চায়, সেরূপ আত্মহারা প্রেম কবির আকাঙ্ক্ষিত নয়। তিনি দেহদীপশিখা জেলে প্রণয়াস্পদার মুখশ্রীর দিকে তাকাননি, তা দেখে নিতে চেয়েছেন মনের দীপবর্তিকার আলোকে। এরূপ প্রেমআস্বাদনেই যেন মুক্তিসুখের আত্যন্তিক উল্লাস।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য

য়ুরোপীয় রোম্যান্টিক প্রেমগাথায় প্রণয়তৃষ্ণাতুর দুজন নরনারীর বাসনাদীপ্ত হৃদয়ের যে-সুতীব্র আকূতি দেখতে পাই, রবীন্দ্রপ্রেমকাব্যে তার অভাবটুকু কারো দৃষ্টি এড়াবার নয়। কবির প্রেমবাসনা নিরন্তর মনের দ্বারা শাসিত বলেই তার প্রকাশ সংযত, তাঁর মানস-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত নিরাসক্তি বা বৈরাগ্যের গেরুয়ারঙে অনুরঞ্জিত। তাই আসঙ্গলিপ্সার বিক্ষোভ অপেক্ষা বিরহের আতপ্ত নিশ্বাসই তাঁর

কবির প্রেমবাসনা মনের দ্বারা শাসিত

কাছে অধিকতর কাম্য। মিলনসুখ নয়, বিরহানন্দেরই পক্ষপাতী তিনি। মিলনে প্রণয়ী-প্রণয়িনী একটা সংকীর্ণ সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, বিরহে কিন্তু প্রেমানুভব বিশ্বচারী হয়ে ওঠে—প্রাণের প্রতিমা ধ্যানের বস্তুতে পরিণত হয়। 'নিষ্ফল কামনা,' 'নিষ্ফল প্রয়াস', 'সুরদাসের প্রার্থনা', 'পুরুষের উক্তি', 'অপেক্ষা', 'বিরহানন্দ' প্রভৃতি প্রথমযুগের কবিতায় কবির আচরিত প্রেমধর্মের মূলমন্ত্র সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হয়েছে। পৃথিবীর কোনো প্রেমিক-কবি এমনভাবে দেহের নির্বাণ কামনা করেননি। বাস্তব ক্ষুধার প্রতি তাঁর বৈরাগ্য সুবিদিত। প্রেমানুভূতি কবির চিত্তে 'অনন্তের ক্ষুধা' জাগিয়েছে, দেহের অন্তরালে তিনি আত্মার 'রহস্য-শিখা'-র কমনীয় দ্যুতি দেখতে পেয়েছেন, প্রেমের 'দেহহীন জ্যোতি'-ই কবিকে সমধিক ব্যাকুল করেছে। আত্মা অসীম অনন্ত বলে দেহের ক্ষুদ্র সীমায় তাকে ধরতে যাওয়া বৃথা, 'সমগ্র মানব'কে পেতে চাওয়ার মতো বিড়ম্বনা আর-কিছু নয়। সেইজন্যে কবি বলেছেন : 'ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব'—'লও তার মধুর সৌরভ, দেখো তার সৌন্দর্যবিকাশ'—'ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী, চেয়ো না তাহারে'। অর্থাৎ, প্রেমের বিদেহী রসটাই আস্বাদনীয়, সৌন্দর্যটুকুই উপভোগ্য,—দেহের নিকটতম সান্নিধ্যে, 'মিলন-অনলে' তা মুহূর্তে কোন্ শূন্যতায় মিলিয়ে যায়।

বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষিত প্রেম দেহধর্মের ঊর্ধ্বচারী একটি বস্তু—স্থূল বাস্তব জীবনের নয়, তা মনোজগতেরই একটি মধুর উপলব্ধি-মাত্র।

কবির আকাঙ্ক্ষিত প্রেম দেহধর্মের ঊর্ধ্বচারী

সর্বসাধারণের প্রেমানুভূতির অভিজ্ঞতার সঙ্গে রবি-কবির প্রেমানুভবের বিলক্ষণ পার্থক্য রয়েছে। কবি 'নয়নের নীরে' 'বাসনাবহ্নি' নিভিয়ে দিয়ে 'বৃথা এ ক্রন্দন'-এর হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন। প্রেমপ্রতিমার বাস্তবাতীত মানসী-মূর্তিখানি দেখতেই কবির সুখ, 'মানসী'র যুগ থেকেই কবি 'বিরহের স্বর্গলোকে' 'কামনার মোক্ষধাম' খুঁজে ফিরেছেন। অতঃপর কবি ব্যক্তিমানুষের প্রেমকে সমগ্র সৃষ্টিধারার সঙ্গে মিলিত করে নিজের সীমাবদ্ধ জীবনে ওই প্রেমের অনন্ত-স্বরূপতা উপলব্ধি করেছেন। তাঁর বিশেষ ভাবদৃষ্টিতে সান্ত প্রেম 'অনন্ত' হয়ে উঠেছে। এই যে কথাগুলো বলা হল, তার আলোকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথকে আমরা প্রেমসৌন্দর্যের সন্ন্যাসী-কবি বলতে পারি। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি তাঁর প্রেমদৃষ্টিকেও আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজীর বা সংস্কৃতের কবিদের মতো ইন্দ্রিয়ানুভবময় রূপাসক্ত 'খাঁটি প্রেমের কবিতা' বেশি রচনা করেননি বা করতে পারেননি, এ তাঁর কাব্যের

অপবাদ নয়। তিনি একটি বিশিষ্ট কল্পনাপ্রবণতাময় কবিস্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তাঁর কল্পনায় শরীরী দেহমন ইন্দ্রিয় নিয়েও অপর একটি ভাবের অধীন হয়ে পড়েছে। মানুষের মধ্যে তিনি তাই জন্মান্তরীণ রহস্যের সন্ধান করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কবিস্বভাব

একমাত্র 'কড়ি ও কোমল' ছাড়া [এ কাব্যখানি মোটামুটি রবীন্দ্রস্বভাবের বাইরে বিদ্যমান] তাঁর প্রথমযৌবনের কবিতাগুলিতেও ইন্দ্রিয়ানুরক্তি তেমন প্রকট হয়ে উঠতে পারেনি। আবার, 'নৈবেদ্য'-পূর্ব কাব্যগুলিতে যে-ভাবাবেশ ও রোম্যান্টিক স্বপ্নবিলাস বর্তমান, তাও পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হয়েছে। নবজীবনভাবুকতার আবির্ভাবে কবির কল্পনার ভ্রমণপথ পরিবর্তিত হয়েছে—এই পরিবর্তনের চিহ্ন 'মহুয়া'য় অতিশয় স্পষ্ট।

প্রেমের নবীন অনুভূতির স্পর্শে 'মহুয়া' অসাধারণ। মানবপ্রণয়ের এমন উদাত্ত সংগীত বাংলা কাব্যসাহিত্যে এর পূর্বে আমরা কখনো শুনিনি। প্রেম সম্পর্কে কবির একটি বিশিষ্ট মনোভাব বা attitude কাব্যখানিতে প্রকাশ

প্রেমকাব্য-হিসেবে 'মহুয়া'র অসাধারণত্ব

পেয়েছে। আর, এ মনোভাব নতুন বলে এবং ভাষা ও ছন্দের মাধ্যমে চমৎকারভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে বলে এই কাব্যপাঠে আমরা বিস্ময়াবিষ্ট হই। মনে রাখতে হবে, কবির পূর্ববর্তী প্রেমকবিতার সঙ্গে বিষয়বস্তুর অভিন্নতা সত্বেও, দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্বের জন্যেই 'মহুয়া' কালজয়ী পাঠ্য কাব্য। এতে সন্নিবদ্ধ কবিতাগুলি পড়ে বেশ বুঝতে পারা যায়, স্থূল আসক্তি, ইন্দ্রিয়জ কামনাবাসনার জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে কবি উচ্চতর একটি ভাবলোকে উত্তীর্ণ হয়েছেন। 'মহুয়া'-পর্বে প্রেমকে কবি জৈববৃত্তিরূপে নয়, মৃত্যুঞ্জয় একটি শক্তিরূপে দেখেছেন, প্রেমশক্তির মহিমময়ী বাণী উচ্চারণ করেছেন—নারীকে আত্মার সঙ্গিনী বলে জেনেছেন। 'মহুয়া'র প্রেম বাস্তবভিত্তিক, পৌরুষ বা বীর্যের ওপর এর প্রতিষ্ঠা। এ প্রেম প্রণয়িযুগলের কাছে বন্ধন নয়, এ প্রণয় আত্মাকে মুক্তির পথে এগিয়ে দেয়, বৃহত্তর সংসারের সঙ্গে যুক্ত করে, চিত্তদেশ বিপুল বিশ্বাসে ভরে তোলে। এর শক্তিপ্রভাবে নরনারী বিচ্ছেদ, এমন কি, মৃত্যুকে পর্যন্ত হাসিমুখে বরণ করে নিতে পারে। এখানে দেহকেন্দ্রিত প্রেমের অনিবার্য নিষ্ফলতা নেই, আছে—'তুমি আছ, আমি আছি'—এই গভীর আত্মিক উপলব্ধির সুগম্ভীর মহিমা।

কাব্যখানির প্রারম্ভে 'উজ্জীবন'-নামে যে-কবিতাটি রয়েছে তাকে এ গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যে-দেহবাসনাসর্বস্ব বিলাসচঞ্চল প্রণয়দেবতাকে কালিদাস দেবরোষানলে ভস্মীভূত করেছিলেন সেই দগ্ধীভূত প্রেম-

দেবতাকে রবীন্দ্রনাথ 'মহুয়া'য় উজ্জীবিত করেছেন। মহাদেবের তৃতীয় নেত্রের কালান্তক বহ্নিস্পর্শে পুষ্পধন্বার সমস্ত কামনার কলুষ, লালসার মূঢ়তা নিঃশেষে মুছে গেল, এবার অনঙ্গ মদন তার জলদর্চি দীপ্তি নিয়ে 'বীরের তনু'তে শরীরী হয়ে উঠুক। 'মৃত্যু হতে'—'ভস্ম-অপমানশয্যা' ছেড়ে—অতনু জেগে উঠল; বীর্যবান পুরুষ, বীর্যবতী নারীর মধ্যে তার অধিষ্ঠান হল। এখন 'দুঃখে-সুখে বেদনায় বন্ধুর যে-পথ', বাস্তব জীবনের সেই দুর্গম পথে 'প্রেমের জয়রথ' চলতে থাকুক। এখানে 'তুচ্ছ লজ্জাত্রাস'-এর স্থান নেই, ভোগক্লিন্ন আত্মকেন্দ্রিকতার স্থান নেই। এই প্রেম তপশ্চর্যায় দীপ্যমান, জীবনমুখী সাধনায় মহৎ, কল্যাণের দীপ্তিতে উজ্জল—সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে এর মঙ্গলময় যোগ। 'উজ্জীবন' সংগীতটিতে অতনু প্রেমদেবতাকে লক্ষ্য করে কবি বলছেন :

'উজ্জীবন'-কবিতাটি 'মহুয়া'-র প্রচ্ছন্ন ভূমিকা

মৃত্যুঞ্জয় তব শিরে মৃত্যু দিলা হানি,
অমৃত সে-মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ
উন্মুক্ত করুক অগ্নি-উৎসের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক প্রখর,
বিচ্ছেদেরে করে দিক দুঃসহ সুন্দর।
মৃত্যু হতে জাগো, পুষ্পধনু—
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

প্রেমসাধক রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের শৈবমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাই 'মহুয়া'য় প্রেমের যে-আদর্শ চিত্রিত হয়েছে সর্বত্রই তার মধ্য দিয়ে বিকীর্ণ হচ্ছে একটা জলদর্চি-আভা। উমামহেশ্বরের মিলনচিত্রটিকে 'উজ্জীবন' কবিতার পটভূমিতে রেখে কবি মানবীয় প্রেমকে কঠোর তপস্যার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রেমের সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রেমের তপশ্চর্যার যোগে, কঠোরের সঙ্গে কোমল মিলিত হয়ে 'মহুয়া'র প্রেমকল্পনা অনির্বচনীয়-সুন্দর হয়ে উঠেছে। এতকাল আমরা জানতাম, প্রেম স্বপ্নের বস্তু এবং তা সংগোপনের বস্তুও; জানতাম, প্রেম মর্তের অমরাবতী, অমরাবতীর মন্দারসুগন্ধ; এ জগৎটিতে আধআলো আধছায়া, এ বস্তুটি 'আমরণ প্রাণের তিয়াস'—'লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়ে রাখলুঁ তব হিয়া জুড়ন না গেল'। কিন্তু 'মহুয়া' কাব্যখানিতে আমাদের কবি কী করলেন? 'আমরা দুজনা স্বর্গখেলনা গড়িব না ধরণীতে মুগ্ধললিত অশ্রুগলিত

শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথ

গীতে।' এ যে এতদিনের পরিচিত সংসারপলাতক প্রেমের মূলে কুঠারাঘাত করা হল। কোথায় সেই শঙ্কিত কম্পিতবক্ষ প্রণয়ীপ্রণয়াস্পদার 'বাসরমিলন-প্রতীক্ষা, কোথায় অপাঙ্গে কটাক্ষক্ষেপ, কোথায় চটুল চাটুবচন, পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরীজনিত বিহ্বলতা! অনুধাবন করুন, যে-কবি একদিন বলেছিলেন :

সমাজ-সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব;
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব।

অথবা :

হেথা বেণুমতীতীরে মোরা দুইজন
অভিনব স্বর্গলোক করিব সৃজন
এ নির্জন-বনচ্ছায়া-সাথে মিশাইয়া,
নিভৃত বিশ্রব্ধ মুগ্ধ দুইখানি হিয়া—
নিখিল-বিস্মৃত।

অথবা, যে-কবি বর্ষণঘন আষাঢ়সন্ধ্যায় বিমুগ্ধ প্রণয়ের বিনয়বচনে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত করতে পারেন : 'হে নিরুপমা, চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে করিয়ো ক্ষমা'—তিনিই আজ প্রণয়িযুগলকে প্রখর দিবালোকে রাজপথে দাঁড় করিয়ে বলছেন :

উড়াব উর্ধ্বে বিজয়-নিশান দুর্গম পথমাঝে
দুর্দম বেগে দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব,
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব—তুমি আছ, আমি আছি॥

'মহুয়া'-র বীর্যদীপ্ত প্রেম

প্রেমের এ কী অপরূপ শঙ্কাসংকোচহীন বিজয়-গৌরব-ঘোষণা! যে-প্রণয়ী প্রণয়ের মুহূর্তটিকে ধরে রাখতে চায় না, কালের যাত্রার ধ্বনির সঙ্গে প্রেমকে মিলিয়ে বিচার করে, মধুর শুশ্রূষার জন্যে দয়িতকে সেবাকক্ষে আহ্বান জানায় না, শান্তির নীড়রচনার স্বপ্ন দেখে না, বিচ্ছেদের দুঃসহ বেদনার দিনেও অকম্পিত ধৈর্যে কেবল দিন গোণে, তার প্রেমানুভবের বলিষ্ঠতা শ্রদ্ধার বস্তু—স্মরণের যোগ্য। আর, যে-নারী নিঃশঙ্ক চিত্তে সমস্ত বিপৎপাতকে অগ্রাহ্য করে, দেবতার কাছে প্রার্থনা জানায় না,

বরং শঙ্কিত পথিককে আশ্বাস দান করে এবং অসহ্য যৌবনবহ্নি মজ্জায় মজ্জায় ভরে রেখে দুর্গম পথ অতিক্রম করতে পারে, তার সাধনাও মহনীয়।

বস্তুত 'মহুয়া'য় রবীন্দ্রনাথ যা করেছেন তা অতিবড়ো আধুনিক কোনো কবি করতে পারতেন কিনা, সন্দেহ। তিনি প্রণয়ের গতানুগতিক বিলাসসজ্জা ছাড়িয়ে তাকে রণবেশে দুঃখদাহপূর্ণ ধূলিমলিন বর্তমান যুগে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই অপরিচিত বেশে প্রেম ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে প্রাণত্যাগ করবে কিনা, সে-বিষয়ে কবির এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি ভীরু প্রণয়ের বক্ষ সাহসের বর্মে আবৃত করেছেন, তর্জনীসংকেতে তাকে অপরিচিত বন্ধুর পথে দ্রুতবেগে চালিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের এই শক্তিমত্তা এবং যুগোচিত বাস্তবতার প্রতি তাঁর আগ্রহকে নমস্কার জানাতেই হয়। এই কবি সহসা আমাদের স্বপ্নবিলাসকেও রোম্যান্টিক যুগ থেকে সমস্যাসংকুল বাস্তব জীবনে এনে ফেলেছেন। আমরা পৌরাণিক প্রণয়আলাপনে মুগ্ধ-অবস্থায় ছিলাম, বাইরে প্রলয় ঘটলেও অন্তরে তাকে অস্বীকার করতে অভ্যস্ত ছিলাম। এ ক্ষেত্রে কবিই আমাদের বাস্তব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করলেন। একারণে মনে হয়, 'মহুয়া' গ্রন্থের ভূমিকায় কবি এ কাব্যের প্রারম্ভিক ফরমাশ সম্পর্কে যে দীর্ঘ জবাবদিহি করেছেন, তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। 'মহুয়া' ফরমাশি রচনা হলে কাব্যখানিতে এই উদ্ধত বিদ্রোহ থাকত না, কালোচিত অভিনবত্ব থাকত না—কবির পূর্বেকার সেই মর্তভাববিলাসেই এর সমাপ্তি ঘটত। বাসনাবিদ্ধ হৃদয়ের রক্তাঙ্কিত আর্তি নেই, রূপের জন্যে আসক্তি নেই, নিভৃত অন্তরালে ক্ষণিক স্বর্গ-রচনার প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই—এমন কলাহীন প্রণয়ের রীতি জয়দেব-চণ্ডীদাস-লালিত বাঙালীর কাছে উপস্থাপিত করতে কবি সংকুচিতই হতেন।

প্রেমের সংগ্রামী মূর্তি

'মহুয়া'য় রবীন্দ্রনাথ প্রধানত দাম্পত্যপ্রেমকেই স্বীকৃতি জানিয়েছেন, জীবনের সঙ্গে যুক্ত প্রেমকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এও একধরণের আদর্শকল্পনা বলা যেতে পারে। কিন্তু এ আদর্শ যুগোচিত। কোন্ কবি আদর্শশূন্য হতে পারেন? রবীন্দ্রপ্রতিভা একদিকে যেমন যুগাতিশায়ী, তেমনি অন্যদিকে যুগধর্মী। রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো সাম্প্রতিকের মতো মগ্নচৈতন্যের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেননি, দেহতত্ত্বের গান গাইতে বিমুখ হয়েছেন। কিন্তু বাস্তব-জীবনকে স্বীকার করেই তাঁর প্রণয়সাধনা। 'নৈবেদ্য'-পূর্ব প্রণয়কবিতার সঙ্গে 'মহুয়া'র পার্থক্যই কাব্যখানির যুগধর্মিতা সপ্রমাণ করে।

রবীন্দ্রপ্রতিভা যুগধর্মী

'চিত্রা'-কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় তাঁর কল্পনার দিক্‌পরি-

বর্তনের যে-প্রবল পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, নানাকারণে তা অনুসৃত ও রক্ষিত হতে পারেনি। সেকালে তা 'জীবনদেবতা'-নামক স্বীয় ব্যক্তিসত্তার উদ্বোধনে সহায়তা করেই ওই অনুভূতির মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। তারপর এক অপূর্ব প্রকৃতিভাবুককতার আশ্রয়ে কবি ধীরে ধীরে অরূপকল্পনায় নিমজ্জিত হলেন। 'এবার ফিরাও মোরে'-র বাস্তব চেতনা প্রসারিত হলে তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভিন্নভাবে পেতাম। যা হোক্, 'গীতাঞ্জলি' রচনার সময় থেকে কবি মানুষকে নতুনভাবে দেখতে লাগলেন, মানুষের মহিমা উপলব্ধি করলেন, এবং মৃত্যু ও জীবনসম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ধারণায় উপনীত হলেন, এমন দেখা যায়। এখন থেকে তিনি মৃত্যুকে রূপান্তর এবং মানুষকে পথের যাত্রীরূপেও দেখলেন। ক্রমে অনির্দেশ্য ভাবাত্মক জীবন থেকে বাস্তব জীবনের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করতেও কবির বিলম্ব ঘটল না। 'গীতালি'র পরবর্তী 'বলাকা'য় কবির ভাব থেকে বাস্তবে পদক্ষেপের স্বাভাবিক পরিণামটি চিহ্নিত রয়েছে। 'বলাকা'য় কবি যে-বাস্তব-জীবনবোধের ও চলার ধারণায় উপনীত হলেন, তা নানা আকারে পরবর্তী বহু কাব্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। 'মহুয়া'র পশ্চাতেও এই গতিময় জীবনবোধ—বাস্তব দুঃখবোধের—ভূমিকা রয়েছে। কবি এখানে প্রেমকে চলার সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন। 'বলাকা'র 'পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয়' ক্ষয় করার মনোভাব 'মহুয়া' কাব্যখানিতে 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি, আমরা দুজন চল্‌তি হাওয়ার পন্থী' প্রভৃতিতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। 'বলাকা'-র 'পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা আর চলিবে না'—'নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন নাই রে ঘরের লালনললিত যত্ন' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিতে সুললিত নবরূপ লাভ করেছে। এ ছাড়া:

রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার দিক্‌পরিবর্তন

'আমি তব জীবনের লক্ষ্য তো নহি,
ভুলিতে ভুলিতে যাবে হে চিরবিরহী—
তোমার যা দান তাহা রহিবে নবীন…'

অথবা:

'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও।
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন,
চক্রে-পিষ্ট আঁধারের বক্ষফাটা তারার ক্রন্দন॥'

অথবা :

শুনাও তাহারি জয়গান
যে-বীর্য বাহিরে ব্যর্থ, যে-ঐশ্বর্য ফিরে অবাঞ্ছিত—
চাটুলুব্ধ জনতায় যে-তপস্যা নির্মম লাঞ্ছিত'

প্রভৃতি বহু স্মরণীয় পঙ্‌ক্তি নির্ভুলভাবে 'বলাকা'র অশ্রান্ত পথপরিক্রমার দিকে অঙ্গুলিসংকেত করছে।

প্রেমের আশ্চর্য শক্তি

'মহুয়া'র প্রেম ভোগপঙ্কিল নয়, ত্যাগশুদ্ধ; আত্মকেন্দ্রিক নয়, বিশ্বমুখী; মধুর অবসর-বিনোদনের সামগ্রী নয়, আত্মার একটা আশ্চর্য শক্তি—যা প্রেমিক-প্রেমিকাকে প্রবুদ্ধ করে, সঞ্জীবিত করে, পৃথিবীর দুর্যোগময় পথে এগিয়ে চলবার শক্তি দান করে। এ কাব্যের প্রণয়ী বীর্যবান, প্রণয়াস্পদা বীর্যবতী, সবলা—'যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী, আমারে প্রেমের বীর্যে কর অশঙ্কিনী'—এই কথাই উচ্চারিত হয় এই 'সবলা' নারীর মুখে। এখানে পুরুষ নারীকে বলছে—'সেবাকক্ষে করি না আহ্বান'। নারীর প্রতি এ কাব্যের পুরুষের উক্তি হল :

'হে বাণীরূপিনী, বাণী জাগাও অভয়,
কুজ্ঝটিকা চিরসত্য নয়।
চিত্তের তুলুক ঊর্ধ্বে মহত্ত্বের পানে
উদাত্ত তোমার আত্মদানে।
হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী,
অবসাদ হতে লহো জিনি—
স্পর্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ,
হে সতী সুন্দরী, আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ॥'

'মহুয়া'-য় পুরুষ ও নারীর প্রেমের প্রতীকচিহ্ন

'মহুয়া' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ পুরুষের প্রেমের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেছেন কদম্ব-পুষ্পকে, আর নারীর প্রেমের প্রতীকরূপে কেতকী-কুসুমকে। পুরুষের প্রতীক্ষায় অবিচল ধৈর্য, ভয়াল দুর্যোগের দিনেও সে কদম্ব-ফুলের মতো প্রতীক্ষার বৃন্তকে আশ্রয় করে থাকে, স্বপ্ন দেখে দয়িতার—যেমন কদম্বপুষ্প দেখে সূর্যের। নারীর প্রেমের বহিরঙ্গে কাঁটার আঘাত, ভিতরে অমেয় সুরভি—ঠিক কেতকীর মতো। এ প্রেম :

'সহজ সাধনলব্ধ নহে সে মুগ্ধের নিবেদন—
অন্তরে ঐশ্বর্যরাশি, আচ্ছাদনে কঠোর বেদন।
নিষেধে নিরুদ্ধ যে-সম্মান—'

এবং এই প্রেম বীর্যদীপ্ত পুরুষকেই নারীর 'দান'। 'মহুয়া'য় চিত্রিত নারী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে : 'শ্লথপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা আমি কভু সহিব না'। 'মহুয়া'র প্রেম জোর করে অধিকারস্থাপনের অভিলাষী নয়, হীনবীর্যের কাঙালিপনা নেই এর মধ্যে। অনুযোগে-অভিযোগে নরনারী এখানে প্রেমকে অপমানিত করে না—'সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা' রক্ষা করেই চলে। এ প্রেমে যে-পৌরুষমহিমা রয়েছে, মুক্ত-প্রাণের যে-দীপ্তিচ্ছটা রয়েছে, বাংলাকাব্যে তার তুলনা কোথাও নেই। রবীন্দ্রনাথ নারীকে শুধু পুরুষের লীলাসঙ্গিনীরূপেই দেখেন নি, আত্মার সঙ্গিনী বলেও জেনেছেন; নারীর প্রেয়সী ও শ্রেয়সীমূর্তি—উভয়কেই দেখেছেন। নারীর ব্যক্তিত্বের, তার মনুষ্যত্বের, এমন মহতী স্বীকৃতি এদেশীয় কাব্য-কবিতায় আমরা পূর্বে কখনো দেখিনি। মহুয়ার নারী 'বীরহস্তে বরমাল্য' নেয়, 'মাথার গুণ্ঠন খুলে' দয়িতের উদ্দেশে বলে : 'মর্তে বা ত্রিদিবে একমাত্র তুমিই আমার।' ঈশ্বরের কাছে তার একতম প্রার্থনা : 'হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা, রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।'

'মহুয়া'য় চিত্রিত প্রেমের পৌরুষমহিমা

কবি মানবপ্রেমে বিপুল শক্তির প্রকাশ দেখেছেন, পৃথিবীর প্রাণশূন্য রিক্ততার মধ্যে প্রেমিকপ্রেমিকাকে দুটি শ্যামল তরুরূপে কল্পনা করেছেন; প্রেমকে মৃত্যুহীন বলে জেনেছেন, প্রেমে আত্মবিসর্জনের পথেই সহস্র শোকতাপজর্জর বেদনাক্লিষ্ট মানবজীবনে শান্তি ও সান্ত্বনা আসে, একথা দৃঢ় প্রত্যয়ে বলেছেন। কবির উচ্চারিত বাণী শুনুন :

মানবজীবনের শান্তি ও সান্ত্বনার একমাত্র বস্তু প্রেম

"প্রাণ দিয়ে যে ভরেছে বুক
সেই তার সুখ।
রয়েছে কঠোর দুঃখ রয়েছে বিচ্ছেদ,
তবু দিন পূর্ণ হবে, না রহিবে খেদ
যদি বল এই কথা—'আলো দিয়ে জ্বেলেছিনু আলো,
সব দিয়ে বেসেছিনু ভালো'।"

এগুলি হল কবির কথিত 'সাধনবেগ'-এর কবিতা। 'মহুয়া'য় রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় আর-এক শ্রেণীর রচনার কথা বলেছেন, এবং তার নাম দিয়েছেন 'প্রসাধন-কলা'র কবিতা। কবি বলছেন : 'আমি নিজে মহুয়ার মধ্যে দুটো দল দেখতে পাই। একটি হচ্ছে নিছক গীতিকাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গিতেই তার লীলা—তাতে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আর-একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান

নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধনবেগই মুখ্য। বলা বাহুল্য, কবিকথিত সাধনবেগ-সম্পর্কিত কবিতাগুলিই মহুয়ার আকর্ষণীয় কবিতা এবং রবীন্দ্রকাব্যে তথা বাংলা-সাহিত্যে ভাবে ও ভঙ্গিতে অ-পূর্বদৃষ্টও বটে। প্রসাধনের প্রকার সম্বন্ধে কবি বলছেন : 'চিত্তের নিভৃতলোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত হতে থাকে।......সেখানে অনির্বচনীয়ের অঙ্গ নানাছন্দ নানা ব্যঞ্জনা।' মোটামুটি 'নাম্নী'-শ্রেণীর কবিতাগুলি এবং 'অর্ঘ', 'সন্ধান', 'মায়া', 'বরণডালা', 'শুভযোগ,' 'বাপী' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে প্রেমের মায়ার ইন্দ্রজালরচনার দিকটি পরিস্ফুট করা হয়েছে। এদের কতকগুলি শুধু ভাষা ও ছন্দের এবং মধুর অলংকরণের কলাবিলাস-মাত্র। যাঁরা আধুনিক বাংলায় জয়দেবীয় বাণীচাতুর্য দেখতে চান ও উপভোগ করতে চান, এবং নারীপ্রকৃতির কাব্যময় বিচিত্র লীলাভঙ্গির পরিচয় পেতে চান, তাঁরা এই প্রসাধনজাতীয় কবিতা পাঠ করবেন। এগুলির মধ্যে কোনো-কোনোটি যে ফরমাশি কবিতা না হতে পারে, এমন নয়। কিন্তু মহাকবির কল্পনাশক্তি ও অপূর্ব বাণীরচন-কৌশল ফরমাশকে নিঃশেষে গোপন করে ফেলেছে। এই শ্রেণীর বৈদগ্ধ্যপূর্ণ কবিতা-রচনার একটা প্রয়োজন কবি বোধহয় অনুভব করেছিলেন। মনে হয়, মহুয়ার প্রেমের পরুষ-কঠোর অসহ্য উগ্ররূপের পরিপূরক দেওয়ার জন্যেই কবি এসব কবিতা লিখেছেন। কবির অভিপ্রায় তাঁর ভাষাতেই বলা যেতে পারে : 'যা ছিল কঠোর যাহা নিষ্ঠুর, তার সাথে কিছু মিলাই মধুর'।

'মহুয়ায়' প্রসাধনকলার কবিতা

প্রসাধনবৈচিত্র্যের কথা বলা হল। কিন্তু রূপকার রবীন্দ্রনাথের অভিনব পরিচয় তাঁর কথিত সাধনবেগের অর্থাৎ ওই আশ্চর্য প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যেই পাওয়া যাবে। প্রেমের পটভূমিকা বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে কাব্যে চিত্ররচনা-রীতিতেও পরিবর্তন এসেছে, ভাষাতেও প্রতীকদ্যোতকতাধর্মের আরোপ ঘটেছে। কয়েকটি অসাধারণ অংশ তুলে দিচ্ছি, এগুলিতে কবির বাণীচাতুর্যের অভিনবত্বের নিদর্শন মিলবে : 'যেন কোন্ দুর্দম বিপুল বিহঙ্গম গগনে মুহুর্মুহু পক্ষ ঝাড়ে', 'সাগরপারের পান্থপাখির ডানার ডাকে,' 'মনের কথার কুসুমকোরক খোঁজে', 'দুয়ারে এঁকেছি রক্তরেখায় পদ্ম-আসন', 'দাড়িম্ববন প্রচুর পরাগে হোক্ প্রগল্ভ রক্তিম রাগে', 'বুলায় বুকে ম্যাগ্নোলিয়া কৌতূহলী মুঠি', 'উন্মীলিত গুল্মোরের থোলো', 'তরুর তম্বুরা বাজে', 'রঙিন্ নিমেষ ধরার দুলাল', 'তখনো নির্ভীক নীপ গন্ধ দিল পাখির কুলায়ে' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের এই চিত্রভঙ্গি এবং বাক্প্রৌঢ়ি নতুন কাব্যে নতুনভাবে প্রযুক্ত হয়েছে।

রূপকার রবীন্দ্রনাথের পরিচয়

'মহুয়া'র প্রেমের উদ্বোধন করতে গিয়ে কবি যে-বসন্তকে আহ্বান করেছেন তা 'ঋতুরঙ্গ'শ্রেণীর রচনা, অথচ 'মহুয়া'র কঠোর প্রেমের উপযুক্ত ভূমিকা। কারণ, এ বসন্ত অযুত বৎসরের পুলকস্পর্শ বহন করে এনে নরনারীকে উন্মত্ত-অধীর করে তোলে না, তার স্থানে সবলে পুরাতনকে ভেঙে নতুনের প্রতিষ্ঠা করতে আসে; সুচির অভ্যাসের মূলে রূঢ় আঘাত হানে, প্রাচীন সঞ্চিত বস্তুকে তীব্র অবজ্ঞায় লাঞ্ছিত করে রিক্ততাকেই দুর্লভ বস্তুতে পরিণত করে। এহেন আদর্শ ও বাস্তবের মিশ্রণে এবং ভাবাভঙ্গির নবদিক্‌নিরূপণে 'মহুয়া' আজ পর্যন্ত অতুলনীয় কাব্যরূপে দাঁড়িয়ে আছে।

বসন্তবিষয়ক কবিতা

কবি মোহিতলাল মজুমদার

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—মোহিতলাল বাংলা কাব্যে একটি নূতন সুরের প্রবর্তক—দেহদেবতার পূজারী মোহিতলাল—হুইটম্যান ও মোহিতলাল—মোহিতলালের পূর্বকর্তী প্রেমবিষয়ক বাংলা-গীতিকবিতা—রবীন্দ্রনাথের প্রেমসাধনা—বাংলা-কাব্যসাহিত্যে দেহবিমুখতার প্রতিক্রিয়া—কবি মোহিতলালের জীবনবাদ—জীবনপ্রেমিক মোহিতলালের মর্ত্যমমতা—যৌবনের পুরোহিত মোহিতলাল—মোহিতলালের সংস্কারমুক্ত কবিদৃষ্টি—মোহিতলালের দৃষ্টিতে নারী—মোহিতলালের কবিকর্মের লক্ষণীয় বিশিষ্টতা—উপসংহার।]

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যসাহিত্যে স্বপনপসারী-বিস্মরণী-স্মরগরল-হেমন্তগোধূলি-র কবি মোহিতলালের স্থান অতি উচ্চে—বোধকরি সর্বোচ্চে। তাঁহার বিশিষ্ট কবিধর্ম ও কবিকর্ম তাঁহাকে একটি লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কিংবা সত্যেন্দ্রনাথের মতো মোহিতলাল ততখানি লোককান্ত কবি নহেন—তিনি যে-প্রকারের কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার রসাস্বাদনেও কতকগুলি প্রাথমিক বাধা রহিয়াছে। কিন্তু এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথের পর কিয়ৎপরিমাণে যতীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ ব্যতীত অন্য কোনো বাঙালী কবি আধুনিক বাংলাকাব্যে মোহিতলালের ন্যায় এতখানি রূপদৃষ্টি ও রূপসৃষ্টির পরিচয় দেন নাই। একান্ত জনবল্লভ না হইয়াও কাব্যসংসারে যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা যায়, কবি মোহিতলাল তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। বাঙালীর চিরাভ্যস্ত কাব্যসংস্কারের প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে না পারিলে মোহিতলালের কবিতার রসাস্বাদনে যে পদে পদে বাধা ঘটিবে, এ সত্যটি সর্বাগ্রে পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

বিগত পাঁচ-শ বছর ধরিয়া বাংলাকবিতার মধ্যে যে-সুরটি প্রবলভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, সে-সুর ভাববাদী বৈষ্ণবের। কিন্তু মোহিতলালের কাব্য-প্রেরণার মূলে রহিয়াছে বীরাচারী শাক্ততন্ত্রীয় ভাব—শাক্ত তান্ত্রিকের সেই পুরুষ-কণ্ঠের সঙ্গে, অঘোরপন্থী জীবনপ্রেমিকের হৃদয়-আকূতিও রূপসাধনার সঙ্গে বাঙালীর তেমন পরিচয় নাই। সবল সুস্থ দেহধর্ম ও প্রাণধর্মে অনুপ্রাণিত হইয়া, জগৎ ও জীবনকে বীর্যবানের মতো অমেয় কামনা লইয়া ভোগ করার আদর্শটি নানা-কারণে আমাদের সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যৌবনমন্ত্রের উদ্গাতা, প্রাণযজ্ঞের ঋত্বিক, রূপতান্ত্রিক মোহিতলালই বাংলাকাব্য-সাহিত্যে বলিষ্ঠ জীবনবাদ বা ভোগবাদকে রসাভিষিক্ত করিয়া প্রথম প্রতিষ্ঠাদান করিলেন। কবি মোহিতলাল দেহাত্মবাদী—জীবনাদর্শের দিক দিয়া তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি 'প্যাগান'। কবি পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া জীবনমন্দিরে দেহ-দেবতারই আরতিবন্দনা করিয়াছেন।

মোহিতলাল বাংলা কাব্যে একটি নূতন সুরের প্রবর্তক

এই মাটির পৃথিবীর মানুষের নশ্বর দেহকে কেন্দ্র করিয়াই মোহিতলাল এক অপূর্ব সৌন্দর্যলোক রচনা করিয়াছেন—মৃত্যুতাড়িত এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যেই লাভ করিয়াছেন অমৃতের অপরিমেয় আস্বাদ। 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং' বলিয়া যে-আত্মনিগ্রহবাদীর দল পাঞ্চভৌতিক দেহের বাসনাকামনাকে রুদ্ধকণ্ঠ করিয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছে, প্রেমকামনায় অনুরঞ্জিত এই বস্তুবিশ্ব যাহাদের নিকট একান্তই মায়াপ্রপঞ্চ-মাত্র, সেই জীবনবিমুখ মোক্ষকামী বেদান্তবাদীদের প্রতি প্রাণদীপ্ত প্রতিবাদে মোহিতলালের কবিতা সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

দেহদেবতার পূজারী মোহিতলাল

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই আমেরিকার বিদ্রোহী কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের কথা মনে পড়িয়া যায়। দেহের বৈদ্যুতিক অনুভূতির মধ্যে হুইটম্যান-ও জীবনের পরম সত্যকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন—দেহসম্বদ্ধ আত্মার তিনিও ভাষ্যকার: 'I am the poet of the Body and I am the poet of the Soul. The pleasures of heaven are with me and the pains of hell are with me. The first I graft and increase upon myself, The latter I translate into a new tongue'। কিন্তু সাদৃশ্য যতটুকুই থাক, হুইটম্যানের সহিত মোহিতলালের বৈসাদৃশ্য ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী, এবং এই বৈসাদৃশ্যটুকুই মোহিতলালের কবিতাকে হুইটম্যান অপেক্ষা সমৃদ্ধতর ও গভীরতর করিয়া তুলিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য মানসিকতায়

হুইটম্যান ও মোহিতলাল

মোহিতলালের প্রতিভাপরিমার্জিত হইলেও, তাঁহার মর্মতলে অন্তঃসলিলা ভারতীয় ভাবধারা ও বাঙালীর রক্তের সংস্কার বহিয়া গিয়াছে। হুইটম্যানের কবিতায় নির্ঝরের কলধ্বনি আছে, মোহিতলালের রচনা যেন গভীর সমুদ্রের তরঙ্গমন্দ্রে সতত মুখর।

মোহিতলালের পূর্ববর্তী প্রেমবিষয়ক বাংলা গীতিকবিতা

বাংলাকাব্যে দেহকেন্দ্রিক প্রেমের কবিতা দীর্ঘকাল হইতেই নির্বাসিত। সংস্কৃতকাব্যের ধারাপথে আসিয়া বাঙালী কবি 'পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্তী' শ্রীজয়দেব গোস্বামী যে-রাধাকৃষ্ণ-লীলা এই বাংলাদেশে সঞ্চারিত করিলেন, তাহাতে আধ্যাত্মিকতা যাহাই থাক, দৈহিকতাও কম ছিল না। কবি বিদ্যাপতি তাঁহার পদাঙ্কলেখা অনুসরণ করিলেন, অপেক্ষাকৃত গ্রাম্যরীতিতে বড়ু চণ্ডীদাস তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ দেহকেন্দ্রিক আদিরস কথঞ্চিৎ পরিবেশন করিয়া গেলেন। তাহার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া গৌড়বঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে হ্লাদিনীশক্তির আনন্দরস সন্ধান করিয়া ফিরিল —দেহপ্রতিষ্ঠিত প্রেম অতীন্দ্রিয়তা ও বৈরাগ্যবাদের গৈরিকের নিম্নে সংকোচে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

ইতোমধ্যে দেশে মুসলমানযুগ সমাপ্ত হইয়া আসিল, বাংলার রাজনীতিক ও সামাজিক জীবনে অনিশ্চয়তার দুর্যোগরাত্রি বহিয়া চলিল। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় যে-'বিদ্যাসুন্দর'-এর পালা চলিল তাহাতে 'বিদ্যা'-র পরিচয় থাকিলেও, 'সুন্দর'-এর সাক্ষাৎ মিলিল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনিশ্চিত সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে যে-কবিগান-খেউড়-আখড়াই-হাফ্ আখড়াই-এর জন্ম হইল, এবং আরো পরবর্তীকালে কালীকৃষ্ণ দাস প্রমুখ যে-সমস্ত লোকসাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটিতে লাগিল, তাঁহাদের রুচিহীন বিকৃত আদিরসের দুষ্টগন্ধে জাতীয় সাহিত্য আবিল হইয়া উঠিল।

তাহার পরে আসিল ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি। 'ইয়ং বেঙল'-দল যতই মদ্যপানকে সভ্যতা বলিয়া ঘোষণা করুন-না-কেন, সাহিত্যের দিক হইতে তাঁহারা যে একটি বিশেষ অর্থে 'পিউরিটান' ছিলেন তাহাতে সংশয়ের লেশমাত্র নাই। রাজা রামমোহনের ধর্মান্দোলন এই শুচিতাবোধকে আরো পরিমার্জিত করিয়া তুলিল, এবং সমগ্রভাবে বাংলাসাহিত্য দেহকামনার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নীতিবাদের পন্থাই অনুসরণ করিল। ইংরেজি সাহিত্যের 'উইচার্লি নভেল্‌স'-ও তাহার ব্রতভঙ্গ করিতে পারিল না। সর্বশেষে লোককান্ত শিল্পী ও আদর্শনিষ্ঠ সমালোচক বঙ্কিমে আসিয়া বাংলাসাহিত্য চরম পবিত্রতার রূপ

গ্রহণ করিল। মাইকেল তাঁহার মহাকাব্যে নবরসসৃষ্টির প্রয়োজনে আদিরসের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিলেন, কিন্তু হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রে তাহা বিন্দুমাত্রও পাওয়া গেল না।

ইহার পর বাংলাসাহিত্যের পূর্বাশায় রবীন্দ্রনাথ সমুদিত হইলেন। কাব্য-সাধনার স্থিরলক্ষ্যে সমাসীন হইবার পূর্বেই তাঁহার কণ্ঠ হইতে উৎসারিত হইল 'নিষ্ফল কামনা'-র সংগীত। মানুষের দেহকে রবীন্দ্রনাথ স্পর্শাতীত করিয়া তুলিলেন। যৌবনের প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নেই ধরণীর রূপসৌন্দর্যের এই সন্ন্যাসীকবির কণ্ঠে উচ্চারিত হইল :

রবীন্দ্রনাথের প্রেমচর্যা

'দেখো শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন, রূপ নাহি ধরা দেয় বৃথা সে প্রয়াস।' তরুণ বয়সে লিখিত সর্বজনপরিচিত 'মানসী'র যুগ হইতেই কবিগুরুর যে-অতীন্দ্রিয় প্রেমের অনুধ্যান আরম্ভ হইল, উত্তরকালে তাঁহার সমগ্র সাহিত্যেই তাহার প্রতিফলন আমরা দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথের প্রেমসিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করিলেই আমরা ইহার প্রমাণ পাইব—তাঁহার বিশ্রুত 'শেষের কবিতা'-য় এ-সম্পর্কে শেষ কথাই তিনি উচ্চারণ করিয়াছেন।

খেউড়-আখড়াই-হাফ্ আখড়াইয়ের আদিরস যেমন রুচিবান শিষ্টসমাজে একান্তভাবেই অপাঙ্‌ক্তেয়, তেমনি দেহকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া অতীন্দ্রিয় ভাবসম্মেলনকেই প্রেমের পূর্ণরূপ বলিয়া গ্রহণ করাও কোনো সাহিত্যের পক্ষে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ হইতে পারে না। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাদীপ্ত লেখনীর স্পর্শে দেহাতীত প্রেম সার্থক রসমূর্তি গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেহমিলনের মধ্য দিয়া যে-পূর্ণতর প্রেম নরনারীর ঘরে ঘরে 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি' রচনা করিয়া তোলে, তাহাকেই জীবনের বৃহত্তর সত্যরূপে গ্রহণ করাই বোধকরি শ্রেয়।

সুতরাং বাংলাসাহিত্যে ইহার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ১৩৩০ সালে আত্মপ্রকাশ করিল 'কল্লোল' মাসিক পত্রিকা, এবং অল্পকালের মধ্যেই উহা চতুর্দিকে নূতন ভাববন্যা বহাইয়া দিল। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সমাজদর্শন ও লরেন্সপ্রমুখ সাহিত্যিকগণের যৌনসংস্কারমুক্তির মন্ত্রবাণী 'কল্লোল'-এর গতিপথ নির্ধারিত করিল। এই পত্রের বিদ্রোহী লেখকগোষ্ঠীর অগ্রনায়ক হইলেন মোহিতলাল মজুমদার। জীবনবিমুখ জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ের-এর উদ্দেশে নিবেদিত তাঁহার 'পান্থ' কবিতা বাংলাসাহিত্যে একটি সুস্থ দেহবাদ ও বলিষ্ঠ জীবনপ্রেমের পুনঃপ্রবর্তন করিল। দেহকামনার বলিষ্ঠ গতিপথ পরিক্রমণ করিয়া মোহিতলাল

বাংলা কাব্যসাহিত্যে দেহ-বিমুখতার প্রতিক্রিয়া

জীবনের যে-অমৃততটে উত্তীর্ণ হইলেন, বাংলাসাহিত্যে অনন্য কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে তিনি তাহা অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন :

'সত্য শুধু কামনাই—মিথ্যা চির-মরণ-পিপাসা!
দেহহীন, স্নেহহীন, অশ্রুহীন বৈকুণ্ঠস্বপন!
যমদ্বারে বৈতরণী, সেথা নাই অমৃতের আশা—
ফিরে ফিরে আসি তাই, ধরা করে নিত্য নিমন্ত্রণ!
এই জন্মমালিকার—মৃত্যু সূচী, ডোর ভালোবাসা—
প্রকৃতি জোগায় ফুল, নারী গাঁথে করিয়া চয়ন,—
পুরুষ পরিয়া গলে, চেয়ে থাকে মুখে তার অতৃপ্ত-নয়ন!'

রবীন্দ্রনাথের প্রেমকল্পনা কেবল স্পর্শের দ্বারাই এই সংসারকে আস্বাদন করিয়া গেল, মোহিতলাল তাহা অপেক্ষা নিবিড়তর জীবনসান্নিধ্যে আসিলেন—উচ্চতটে দাঁড়াইয়া না থাকিয়া আনন্দকল্লোলিত উদ্বেল প্রাণগঙ্গার স্রোতে অবগাহন করিয়া লইলেন। কবির জীবনবাদের স্বাভাবিক পরিণতি দেহবাদ, এবং দেহবাদেরই সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রহিয়াছে তাঁহার প্রবল জীবনাসক্তির উদাত্ত সুরটি। দেহ সসীম, বস্তুবিশ্ব ক্ষণস্থায়ী—কিন্তু শক্তিমান মানুষের প্রাণের আকূতি যে নিঃসীম, কামনাবাসনা যে দুর্বার, তাহার হৃদয়পিপাসার যে অন্ত নাই! দুঃখের দার্শনিক শোপেনহাওয়েরের মতোই কবি সহজেই বুঝিতে পারেন, 'মৃত্যুর নাহিক শেষ, দুঃখময় জীবনের নাহি অবসান'। কিন্তু ইহাও তিনি যথার্থ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, এই ধূলার পৃথিবীতে কেবল মানুষেরই রহিয়াছে 'আনন্দের ক্ষণ-অধিকার'; তাই: 'প্রাণের খেলায় দুঃখেরে ডরে না কেহ, দুঃখে তবু হাসিছে সংসার।' কোটিজীব কল্লোলিত, বিচ্ছেদ-বেদনা-কণ্টকিত এই পৃথিবীর প্রতি জীবনপ্রেমিক কবির কী নিঃসীম মমতা! মর্তজগতের সহস্র দুঃখবেদনা কবির কণ্ঠে 'ব্যথার আরতি'-সংগীত হইয়া বাজিয়া ওঠে। বস্তুবিশ্বের ক্ষণস্থায়িত্বের অনুভূতিসঞ্জাত 'saddest thought' এক অপূর্বসুন্দর 'sweetest song'-এ রূপান্তরিত হইয়াছে মোহিতলালের কবিকণ্ঠে।

কবি মোহিতলালের জীবনবাদ

দুঃখময় মানবজীবনের আঘাতযন্ত্রণা হইতে কবি ত্রাণ কামনা করিলেন না, মোক্ষসন্ধানী হইয়া পুনর্জন্মের বিভীষিকাগ্রস্ত হইতে পারিলেন না—জন্মচক্রের অশ্রান্ত আবর্তনছন্দে নবনব রূপে মানবলোকে ফিরিয়া আসিবার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার স্বাক্ষরই তাঁহার কবিতায় তিনি বাণীবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। মর্তমাধুরীলুব্ধ, জীবনরসের রসিক এই কবির কণ্ঠে আমরা শুনি :

জীবনপ্রেমিক মোহিতলালের মর্ত্যমমতা

"জীবনের সুখদুঃখ বারবার ভুঞ্জিতে বাসনা—
অমৃত করে না লুব্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো।
যাতনার হাহারবে গান গাই,—তৃষার্ত রসনা
বলে, 'বন্ধু! উগ্র ওই সোমরস ঢালো, আরো ঢালো!'
তাই আমি রমণীর জায়ারূপ করি উপাসনা—
এই চোখে আরবার না নিবিতে গোধূলির আলো,
আমারি নূতন দেহে, ওগো সখি, জীবনের দীপখানি জ্বালো!"

প্রাণজাহ্নবীর কূলে দাঁড়াইয়া কবি কেবল শোপেনহাওয়ের নয়—বেদান্তবাদী শংকরের 'মোহমুদ্গর'কেও তীব্র ভাষায় ধিক্কার দিলেন। দেহের গৌরবে উদ্ভাসিত জীবনবন্দনাই যৌবনের পুরোহিত মোহিতলালের কাব্যের মূলসুর। কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা তাঁহাকে রিরংসাবাদী বলিয়া মনে করিবেন, তাঁহারা তাঁহার কবিতাকে একান্তভাবেই ভুল বুঝিবেন। কবি দুর্নিবার কামনার পারবশ্য স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ইন্দ্রিয়-লোলুপতার দাসত্ববন্ধন স্বীকার করেন নাই। 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন'-এর পরম গৌরবকেই মোহিতলাল তাঁহার উদাত্ত কাব্যচ্ছন্দে নিত্যকালের ভাষায় গ্রথিত করিয়াছেন। যে-উদার বলিষ্ঠ জীবনপ্রেম তাঁহার কাছে সংসারকে মধুসিক্ত করিয়া তুলিয়াছে, সেই সর্বাত্মক প্রেমানুভূতির দ্বারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রচনা ভঙ্গুর দেহকেই তিনি অপূর্ব মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন। যে-পাঠকের 'বাসনা' উচ্চগ্রামে বাঁধা নয়, দেহাত্মবাদী মোহিতলালের কাব্য পাঠ করিয়া তাঁহাদের রসপিপাসা সম্পূর্ণ চরিতার্থ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কবির দেহবস্তু কেবল সম্ভোগের উপচারমাত্রই নহে, তাহা 'সৃষ্টির উল্লাস'-এ পর্যবসিত হইয়াছে।

যৌবনের পুরোহিত মোহিতলাল

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে মার্জিতবুদ্ধি মোহিতলাল দেহকে দেখিলেন সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে। হুইটম্যানের মতো তিনিও প্রশ্ন করিলেন : 'Have you ever loved the body of a man, have you ever loved the body of a woman?' কিন্তু হুইটম্যান দেহ পর্যন্ত আসিয়াই থামিয়া গেলেন, আর মোহিতলাল 'নানা-বর্ণে-ছন্দে-ভরা' পৃথিবীর প্রেক্ষাপটের উপর উজ্জ্বলতম বর্ণৈশ্বর্যে ও দীপ্ততম ছন্দে দেহকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাই হুইটম্যানের দেহসর্বস্বতা সীমিত ও সংকীর্ণ—পক্ষান্তরে মোহিতলাল পূর্ণতায় উদ্ভাসিত। পাশ্চাত্ত্য মানস-ভঙ্গি কিছু-পরিমাণে আয়ত্ত করিলেও ভারতসন্তান মোহিতলাল স্বধর্ম ত্যাগ

মোহিতলালের সংস্কারমুক্ত কবিদৃষ্টি

করিতে পারেন নাই। দেহের মধ্য দিয়া তিনি বীরাচারী তান্ত্রিকের তপস্যা করিয়াছেন। তান্ত্রিকের সাধনায় নারীদেহ একটি উপচার সত্য, কিন্তু তাহার সাধনা মহত্তর সিদ্ধির অভিসারী। দেহাশ্রয়ী কবি গভীরতম আনন্দ-লোকের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছেন—সার্থকতর সৌন্দর্যের অমেয় আস্বাদনই তাঁহার একতম লক্ষ্য।

দেহকেন্দ্রিক আকুলতা কখনো কখনো তাঁহার মনে আশঙ্কারও ছায়াপাত করিয়াছে। কবিচিত্তে কখনো কখনো প্রশ্ন জাগিয়াছে, তিনিও কি অনাদ্যনন্ত কালের অগণিত কামলুব্ধের মতো লালসার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন? মার্কিন-কবি 'Viereck'-এর অনুভাবে ১৩৩২ সালের 'কল্লোল'-এ তাঁহার 'প্রেতপুরী'-শীর্ষক যে-কবিতাটি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে নারীদেহ সম্পর্কে যে-ক্ষুব্ধ হাহাকার তিনি তুলিয়াছেন, তাহা এই জিজ্ঞাসারই রূপভেদ :

'তবু মনে হয়,
এ সুন্দর স্বর্গখানি প্রেতের আলয়!
কামনা-অঙ্কুশ-ঘাতে যেই পুনঃ হইনু বিকল,
অমনি বাহুতে কারা পরায় শিকল!
তীব্র সুখশিহরণে ফুকারিয়া উঠি যবে মৃদু আর্তনাদে—
নীরব নিশীথে কারা হাহারবে উচ্চকণ্ঠে কাঁদে।'

এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে কেমন করিয়া? ইহার উত্তরও মোহিতলাল দিয়াছেন। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা 'নারীস্তোত্র'-এ ভারতীয় সাংখ্য-দর্শনের সিদ্ধান্ত অনুসারে মোহিতলাল 'সৃষ্টির মানসলক্ষ্মী কালস্রোতে কমল-আসনা' নারীর সৌন্দর্যকে সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, নারীর বিশ্ববিজয়িনী সত্তাকে নিঃসংশয়ে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সেই সঙ্গে কবি ইহাও জানিয়াছেন :

মোহিতলালের দৃষ্টিতে নারী

'প্রকৃতির প্রাণরূপা—স্বতঃস্ফূর্তা আহ্লাদিনী রতি,
স্বচ্ছন্দ স্বৈরিণী ও যে—নিত্য শুদ্ধা—নহে সতী, নহে সে অসতী।'

সুতরাং সৃষ্টির অমোঘ নিয়মেই চিরন্তন পুরুষ চিরন্তনী প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ইহাই বিশ্বনীতি, ইহাকে অস্বীকার করা মূঢ়তা। যে-নিয়মে পৃথিবীতে ঋতুচক্রের বিবর্তনছন্দে অবারিত প্রাণলীলা চলিয়াছে, সেই নিয়মের শাসনেই নারীর সৃষ্টিকামনার নিকটে পুরুষ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য। ইহা পাপও নয়, পুণ্যও নয়। ইহা হইতে বিমুখ হইলে স্বর্গের আশ্বাস নাই, ইহার কাছে পরাভূত হইলে অনন্ত-নরকবাসের ভীষণতম কল্পনাও অলীক। নারীকে

অস্বীকার করিয়া পুরুষের পলায়নী-মনোবৃত্তি-প্রকাশের কোনো পথই খোলা নাই —বধূর ছিন্ন দুকূলের টানে তাহাকে যে সংসারে আবার ফিরিয়া আসিতেই হইবে!

যোগীন্দ্র শংকর উমার বাহুপাশে ধরা দিয়া জীবনলীলায় সৃষ্টিধর্ম পালন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার যোগবিনষ্ট ঘটে নাই, সংসারের পুরুষেরও তাহাতে নিশ্চয়ই ব্রতচ্যুতি ঘটিবে না। বরং এই স্বভাবধর্মকে যাহারা উপেক্ষা করিবে, তাহারাই অনর্থক আত্মবঞ্চনায় নিজেদের পীড়িত করিয়া জীবনের অমৃতপাত্র হইতে বঞ্চিত হইবে।

দেহগত প্রেমের এই অপূর্বসুন্দর কাব্যসিদ্ধান্তের মধ্য দিয়াই রবীন্দ্রোত্তর যুগে শ্রেষ্ঠ কবির আসন লাভ করিয়াছেন দেহাত্মবাদী মোহিতলাল। মোহিতলালের কাব্যসাধনার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এই সংক্ষিপ্ত পরিধির মধ্যে সম্ভব নয়। কিন্তু উপরের কথাগুলি হইতেই কবির স্বকীয়তা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নিদর্শন মিলিবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে, বাংলাকাব্যে বুদ্ধিবাদের প্রথম প্রকাশ আমরা মোহিতলালের কবিতাতেই দেখিতে পাই— আধুনিক বাংলাকাব্যের তিনি অন্যতম স্রষ্টা। ভাব ও ভাবনা, বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি, প্রজ্ঞা ও সৌন্দর্যবোধ কবির কাব্যে যুক্তবেণী রচনা করিয়াছে।

মোহিতলালের কবিকর্মের লক্ষণীয় বিশিষ্টতা

মোহিতলালের কাব্যপ্রেরণা ও কবিকল্পনার বৈশিষ্ট্য যেমন লক্ষণীয়, তেমনি লক্ষণীয় তাঁহার বাণীবিগ্রহরচনার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা। ছন্দের উপর বিস্ময়কর অধিকার, উজ্জ্বল খরশান বাণীভঙ্গি এবং অদ্ভুত শব্দচয়নকৌশলে মোহিতলালের কবিতা যেমন প্রাণবন্ত, তেমনি গতিবান। কবিকল্পনার ক্ষেত্রে তিনি রোম্যাণ্টিক, কিন্তু ভাবের রূপায়ণক্ষেত্রে ক্লাসিক্যাল রীতির অনুসারী। হৃদয়ের দুর্বার আবেগকে কবি ক্লাসিক আর্টের সংযমশাসনে বাঁধিয়াছেন। তাঁহার বাক্‌সংযম অপূর্ব, তাঁহার সুররসিক শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দের ধ্বনি সম্পর্কে অভ্রান্ত। কবির প্রত্যেকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা [যেমন, নারীস্তোত্র, বুদ্ধ, মোহমুদ্গর, পান্থ, স্পর্শরসিক, যম ও নচিকেতা, পুরূরবা, ইত্যাদি] ক্লাসিক্যাল কাব্যকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। লিরিকের উদ্দাম ভাবাবেগ-প্রবাহ, এপিকের উদাত্ততা, নাটকের বস্তুলীনতা মোহিতলালের কাব্যে একবৃন্তে বিধৃত হইয়াছে। মোহিতলাল মজুমদার শুধু প্রথমশ্রেণীর কবি নহেন, তিনি প্রথমশ্রেণীর অনিন্দ্য একজন কাব্যশিল্পীও বটেন,—তাঁহার কবিতার শিল্পমূর্তি সত্যই অনবদ্য।

কবি যে-অপূর্ব ব্যঞ্জনাময়তার মধ্য দিয়া রূপকে সুরে ও সুরকে রূপে ধ্যান

করিয়াছেন, তাহার একমাত্র তুলনা মিলে রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যে। নাট্যরীতিতে রচিত তাঁহার 'নাদিরশাহের স্বপ্ন' একমাত্র রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গেই তুলিত হইতে পারে। সত্যসুন্দরের পূজারী কবি ঐতিহাসিক 'কালাপাহাড়'-এর নিষ্ঠুর নির্মম ধ্বংস-অভিযানের কল্পনাপ্রোজ্জ্বল যে-নবতর ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা সত্যই চমৎকার। 'বেদুঈন্', 'নাদির শাহের জাগরণ', 'নাদির শাহের শেষ', 'শেষশয্যায় নূরজাহান' প্রভৃতি বিখ্যাত রচনার মধ্য দিয়া মোহিতলাল আধুনিক বাংলাকবিতায় একটি নূতন ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন। এইসব রচনা কবির মৌলিক রূপসৃষ্টি। কিন্তু এতগুলির বিস্তৃত পরিচয়দান এই ক্ষুদ্রপরিসর নিবন্ধে সম্ভব নয়, তাঁহার কাব্যপাঠেই কবিতাগুলির পূর্ণ-রসাস্বাদ মিলিবে। মোহিতলালের কাব্যদর্শনের মূল তত্ত্বটিই শুধু [কবি কিন্তু তাত্ত্বিক নহেন] আমরা এখানে অতি-সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, এবং ইহা হইতেই এ-যুগের বাংলাসাহিত্যে তাঁহার যথার্থ আসনটি নির্ধারিত হইবে।

উপসংহার

কবি জীবনানন্দ দাশ

[**রচনার সংকেতসূত্র :** জীবনানন্দ দাশ বাংলাকাব্যে অনন্য—রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি—সমকালীনের মূল্যনিরূপণ দুরূহ কাজ—সাম্প্রতিক বাংলাকাব্যে জীবনানন্দের প্রভাব—জীবনানন্দের কাব্যের আঙ্গিক অননুসরণীয়—জীবনানন্দ আত্মবৃত্ত কবি— সহমর্মিতাসূত্রেই জীবনানন্দের কাব্য আস্বাদনীয়—জীবনানন্দ প্রকৃতির কবি—প্রান্তরচারী জীবনানন্দ—জীবনানন্দ অতিমাত্রায় রোম্যান্টিক—জীবনানন্দের কবিতার মর্মতত্ত্ব—রূঢ় বাস্তবতার ক্ষেত্র হইতে কবির অপসরণ—জীবনানন্দের কাব্যের উত্তরপর্ব।]

জীবনানন্দ বাংলাকাব্যে অনন্য—এই একটি ছাড়া কী আর বলা যায় তাঁর সম্পর্কে ? পর্যাপ্ত না হোক, তাঁর কবিতা নিয়ে কিছুকিছু আলোচনা পণ্ডিত আর বিদগ্ধজনেরা করেছেন। যতদূর জানি, ব্যক্তিগতভাবে কবি এসব আলোচনার কোনোটিকেই নিজের কাব্যের প্রামাণ্য ভাষ্য বলে মেনে নেন্‌নি। জীবনানন্দ 'নির্জন' বা 'নির্জনতম' কবি, তাঁর লেখা 'সিম্বলিক্' কিংবা 'সুর্-রিয়্যালিষ্ট'—এ সব নিয়ে যতই মতভেদ থাক, কবির বক্তব্য : এরা "প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য—কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো অধ্যায় সম্পর্কে খাটে—সমগ্র কাব্যের

জীবনানন্দ দাশ
বাংলা কাব্যে অনন্য

ব্যাখ্যা-হিসেবে নয়।" অতএব "কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমনের ব্যাপার, কাজেই পাঠক ও সমালোচকের উপলব্ধিতে এত তারতম্য।" [শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকা]

রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি

তা হলে জীবনানন্দের কাব্যব্যাখ্যানে সমালোচকের যত সংকটই ঘটুক, পাঠকের ভূমিকা নিরাপদ। রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, 'কবিতা বোঝাবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।' কথাটা নিয়ে তর্কের ঝড় উঠতে পারে। কিন্তু পাঠকহিসেবে আমার মনে হয়, এই উক্তিটি আধুনিক বাংলাকাব্যে জীবনানন্দ সম্পর্কে যতটা প্রযোজ্য, এমন আর কারো সম্বন্ধেই নয়।

সমকালীনের মূল্যনিরূপণ দুরূহ কাজ

সাহিত্যে জীবনানন্দের আসন কোথায় এ বিচার বর্তমানে সহজ নয়। যে-কোনো সমকালীনেরই মূল্যবিচার জটিল ব্যাপার—'সাতটি তারার তিমির' বা 'মহাপৃথিবী'র কবির ক্ষেত্রে তা জটিলতম। দীর্ঘদিন ধরে তা বিতর্কের বিষয় হয়ে থাকবে। কবির ইচ্ছে ছিল, একদা নিজ কাব্যের কুঞ্চিকা তিনি পাঠকের হাতে তুলে দেবেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যু সেই সুযোগ থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করল। আপাতত আমরা যারা পাঠক, তারা তাঁর কাব্য সম্পর্কে একটি কথাই বলতে পারি—তিনি অনন্য।

সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে জীবনানন্দের প্রভাব

লক্ষ্য করবার মতো, রবীন্দ্রোত্তর কালের বাংলাকাব্যে তাঁর মতো কেউই প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। এমন কি, যাঁরা সাম্যবাদী কবি, তীক্ষ্ণ স্পষ্টতায় যাঁরা কাব্যকে সর্বদা সজাগ করে রাখতে চান, তাঁদের অনেকের লেখায় জীবনানন্দের 'ইমেজিজম্' আর দূরান্বয়ী বাগ্‌ভঙ্গির ছায়া পড়েছে। অন্যদিকে তাঁর প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ শিষ্যও অনেক রয়েছেন। তথাপি জীবনানন্দ একান্ত ভাবে একক। তিনি অনুকৃত হয়েছেন, কিন্তু অনুসৃত হতে পারেন নি। তাঁর যে-হৃদয় 'হাওয়ার রাতে' 'নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে', যাকে মনে হল—'একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায় তারায় উড়িয়ে নিয়ে চললো একটা দুরন্ত শকুনের মতো'—সে-হৃদয়ের অনুসরণ সহজ নয়। কারো পক্ষেই তা সম্ভব বলে মনে হয় না।

বহিরঙ্গের দিক থেকে জীবনানন্দের একটা নিজস্ব আঙ্গিক আছে। সে-আঙ্গিক অসামান্য মৌলিক। এ-কথা বললে অন্যায় হয় না, তাঁর কাব্যবিচারের

[এবং আস্বাদনেরও] প্রচেষ্টা অনেক সময় এই বাইরের কাঠামোতে এসেই থমকে গেছে। তাঁর খ্যাতি-অখ্যাতি অনেকখানিই নিরূপিত হয়েছে এই বহিরঙ্গের ওপরে। জীবনানন্দের আঙ্গিককে আয়ত্ত করা তাঁর কাব্যপ্রবেশের প্রথম পাঠ।

জীবনানন্দের কাব্যের আঙ্গিক অনন্যুসরণীয়

সেই পাঠের পরে আসে তাঁর মন আর মননকে বোঝার পালা। এ কাজ আরো কঠিন। তার কারণ, বাংলাসাহিত্যে জীবনানন্দের কবিতা সবচেয়ে আত্মগত। বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রাথমিক প্রয়াসের পরে জীবনানন্দের মধ্যে এই ধারার প্রধানতম প্রকাশ। 'লিরিক' কবিতামাত্রই স্বগতোক্তি। তবু সাবধানী কবি মঞ্চের অভিনেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর শিল্পীসত্তাকে দ্বিধাবিভক্ত করেই রাখতে হয়। তন্ময় চিত্তে অভিনয় করার সময়েও তিনি তাঁর দর্শকদের ভুলতে পারেন না। কোন্ দৃশ্যে কোথায় হাততালি পাওয়া যাবে, অভিনেতা এ সম্বন্ধে যেমন অবহিত থাকেন, তেমনি কবিও জানেন, কোন্ কৌশলে তাঁর পাঠকের আবেগকে তিনি সহজেই আলোড়িত করতে পারেন। ভাষায়, ব্যঞ্জনায়, চিত্রকল্পনায় কোথায় তাঁর ঐন্দ্রজালিক কৃতি, সে-সম্পর্কেও তিনি সচেতন।

জীবনানন্দ আত্মবৃত্ত কবি

কিন্তু যিনি নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ, যাঁর কবিতা একান্তভাবে নিজের জন্যেই, তাঁর সঙ্গে ভাবসাযুজ্য স্বভাবতই আয়াসলভ্য। বোধের চাইতে সহমর্মিতার আশ্রয়ই সেখানে নির্ভরযোগ্য। জীবনানন্দের কবিতাকে আস্বাদন করতে গেলে [সবটা করা সম্ভব কিনা জানি না] এই সহমর্মিতাই একমাত্র পথ। বাংলাসাহিত্যে তিনি সবচেয়ে ব্যক্তিগত কবি। সুতরাং সমালোচকের মিতিবিদ্যা যতই উদ্‌ভ্রান্ত হোক, অন্তত পাঠক অন্তরযোজনার উপায়নে জীবনানন্দের কাছে অনেকখানি অগ্রসর হতে পারেন। কবিমাত্রকেই সমালোচকের চেয়ে পাঠকের ওপর বেশি নির্ভর করতে হয়—জীবনানন্দ সম্বন্ধে সেটা সর্বাধিক সত্য।

সহমর্মিতাসূত্রেই জীবনানন্দের কাব্য আস্বাদনীয়

জীবনানন্দ প্রকৃতির কবি। এই প্রকৃতি মহাপার্থিব। এর এক দিকে দেখতে পাই :

জীবনানন্দ প্রকৃতির কবি

'নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বারবার তীরটিরে
মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে,
বাতাসে ঝিঁঝিঁর গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে।'

এখানে অকৃত্রিম বাংলাদেশের অন্তরঙ্গ গন্ধস্পর্শ, আমাদের সহজ পরিচিতির নম্র নিবিড় নৈকট্য। আবার অন্যত্র দেখি :

'হাজার বছর খেলা করে তা'রা অন্ধকারে জোনাকির মতো :
চারিদিকে পিরামিড—কাফনের ঘ্রাণ ;
বালির উপরে জ্যোৎস্না—খেজুরছায়ারা ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো : এশিরিয়—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।'

বাংলাদেশের পাড়াগাঁর গা থেকে যেমন তিনি পান 'রূপশালী-ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ', অন্যদিকে 'বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন, উরের আরশি থেকে ক্ষেসে' তাঁর মানসনাবিকের যাত্রা চলে 'বৈশালির থেকে বায়ু—গেৎসিমানি-আলেকজান্দ্রিয়ার মোমের আলোকগুলো' পর্যন্ত।

জীবনানন্দের এই প্রকৃতিচারণার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর ভৌগোলিক জগতে কোথাও কোনো কালের ষতিচিহ্ন নেই। হাজার হাজার বছরের পুরানো অতীত আর মুহূর্তের অন্তরঙ্গ বর্তমান একটি অখণ্ড সময়ের বৃত্তে ধরা পড়েছে। তাই তাঁর কল্পনার স্বচ্ছন্দচর্যা সীমানাহীন সময়ের মধ্যে প্রসারিত।

এই কালহীন কালের প্রতীক-হিসেবে তিনি নিয়েছেন প্রান্তরকে—প্রধানত হেমন্তের প্রান্তরকে। কার্তিকের মৃদু-কুয়াশামাখা জ্যোৎস্নাভরা মাঠ তাঁর এই দূরাস্তীর্ণ কল্পনাকে চঞ্চল করে তুলেছে সবচেয়ে বেশি। 'সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের' একটি মানুষকে নিয়ে গেছে লাসকাটা ঘরে। যখন 'হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে' তখন অপেক্ষাতুর হৃদয় ভেবেছে—'হে নাবিক, জীবন অপরিমেয় বাকী।' কার্তিকের জ্যোৎস্নায় কয়েকটি মাঠেচরা ঘোড়া কবির মনকে আশ্চর্যভাবে সঞ্চারিত করেছে সময়হীন সময়ের প্রান্তরে :

প্রান্তরচারী জীবনানন্দ

'মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে,
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে।'

'এই সব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে' জীবনানন্দের মানসিক মুক্তি। রবীন্দ্রনাথকে যদি বর্ষা আর নদীর কবি বলা যায়, তাহলে জীবনানন্দ হেমন্ত আর প্রান্তরের কবি। মৃদু ধূমল জ্যোৎস্না, দিক্‌চিহ্ন হীন মাঠ এক অপূর্ব জাগরস্বপ্ন সৃষ্টি করে তাঁর মনে—এক বিচিত্র সুর্-রিয়্যালিজমের মধ্যে তাঁর কল্পনাকে মগ্ন করে।

এই কল্পনার অনুষঙ্গী 'বাঁশপাতা—মরা ঘাস—আকাশের তারা'। 'কার্তিক কি অঘ্রাণের রাত্রির দুপুরে' 'হলুদ পাতার ভিড়ে বসে' মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে' প্রহর জাগে পাখি। ইঁদুর আর পেঁচারা এই হেমন্তের জ্যোৎস্নাতেই তাদের শিকার খুঁজে বেড়ায়।

জীবনানন্দ অতিমাত্রায় রোম্যান্টিক

জীবনানন্দ রোম্যান্টিক কবি। এই রোম্যান্টিক মন হৈমন্তী চন্দ্রালোকের রহস্যে মিস্টিকের মতো সমাহিত। আর সে-রহস্যকে জানবার চাইতেও আস্বাদন করবার আনন্দ তাঁর নিবিড়তর। নির্জন নৈঃশব্দ্যের মধ্যে তাঁর অতর্ক অপ্রশ্ন আত্মলীনতা। হেমন্তের রাত্রে যখন 'বুনো হাঁস পাখা মেলে দেয় জলা মাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহ্বানে', তখন কবিরও সেই স্মৃতির জ্যোৎস্নায় সানন্দ অভিসার :

'মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ ;
উড়ুক উড়ুক তা'রা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক
কল্পনার হাঁস সব ; পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তা'রা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।'

এই হেমন্তজ্যোৎস্নাতেই 'বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা' কবির শঙ্খমালার আবির্ভাব। যে-বনলতা সেন জীবনে একবার—মাত্র একবারের জন্যেই—চকিত প্রেক্ষণে অন্তরকে উদ্ভাসিত করে, এ সেই ক্ষণচারিণী মনোলালিতা :

'চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার ;
স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র—কবেকার শঙ্খিনীমালার,
এ পৃথিবী একবার পায় তারে—পায়নাকো আর।'

জীবনানন্দের কবিতার মর্মতত্ত্ব

প্রধানত জীবনানন্দের সুর কেমন একটা বিষণ্ণতার আমেজমাখানো—রোম্যান্টিক অনুভাবনার মৃদুস্বাদী বেদনায় সিক্ত। নগ্ন-নিষ্ঠুর কর্মক্ষুব্ধ সংসার থেকে তাঁর স্বভাবতই অপসরণ। এক গভীরতর, নিবিড়তর সমাধান জীবনের কোথাও আছে, সমস্ত উন্মত জিজ্ঞাসা যেখানে তিমির, স্তব্ধ যেখানে কোনো এক বোধ—কোনো এক স্বাদ আছে—যা 'অগাধ—অগাধ'। সেই অগাধ স্বাদের সাধনাই স্বপ্নরসিক জীবনানন্দের কবিতার মর্মতত্ত্ব।

'যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংস ফলিয়াছে
নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,

যে-সব হৃদয়ে ফলিয়াছে—
সেই সব

দুঃসহ পরাভূত বিকৃতির মধ্যে কবি এই অগাধ গভীর স্বাদের সঞ্জীবন সন্ধান করেছেন। এই স্বাদ তাঁকে প্রকৃতিই দিতে পেরেছে কিছু-পরিমাণে। মেঠো পথ, ধানসিড়ি, হেমন্তের ধান, রোদের নরম রং শিশুর গালের মতো লাল, আইবুড়ো পাড়াগাঁর মেয়েদের নাচ—এই আদিম প্রাকৃতিক সারল্যে কবি যেন জীবনের জটিলতার গ্রন্থিমোচন করতে পেরেছেন :

'রোদ—অবরোধ-ক্লেশ—কোলাহল শুনিবার নাহিকো সময়,
জানিতে চাই না আর সম্রাট্ সেজেছে ভাঁড় কোন্‌খানে—
কোথায় নতুন ক'রে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয়;
আমার চোখের পাশে আনিও না সৈন্যদের মশালের আগুনের রং।'

তার চাইতে ভালো উদ্যমহীন, উৎসাহহীন আত্মলুপ্তি। হেমন্তের ক্ষেতে চৈতালি আলোয় কিংবা 'পেঁচার পাখার মতো অন্ধকারে' নিজের সমস্ত জাগরসত্তা নিঃশেষিত হোক :

'গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে।
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন—
জেগে থেকে ঘুমোবার সাধ ভালোবেসে।'

তবু সে-সাধ সহজে মেটার নয়। সেই অগাধ-গভীর স্বাদের সাধনা কী নির্মমভাবে বিঘ্নিত! দক্ষিণের হাওয়ায়, 'জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ'-মাখা চৈত্ররাত্রিতে, হরিণহরিণীর মিলনমুহূর্তে সাড়া দেয় শিকারীর বন্দুক। খাবার ডিশে মৃতহরিণের মাংসের ঘ্রাণ। জীবনের এই 'সিম্বলিক' ট্র্যাজেডি তাই তাঁকে বারবার ডেকেছে সেই ধানকাটা মাঠে—যেখানে একটি মানুষ নিবিড় নিদ্রিত শান্তিতে একান্ত :

'শান্তি তবু : গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।'

এই ক্লান্তি আর বেদনার পীড়নেই কবি খুঁজেছেন 'মস্ত বড়ো ময়দান—দেবদারুপামের নিবিড় মাথা—মাইলের পরে মাইল।' তিনি হৃদয়ে অনুভব করেছেন সেই দুপুরের বিশ্রান্ত বাতাসকে—যা 'খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে—গান গায়—গান গায়'। আশ্চর্য মৌলিক চিত্ররচনায়, ভাষার কোমল কারুশিল্পে জীবনানন্দ এক ঐন্দ্রজালিক বিরামলোক লাভ

করেছেন তাঁর কাব্যে। আমাদের ঘাতজর্জর দৈনন্দিনতায়, আমাদের রক্তঝরা প্রহরপরিক্রমায়, আমাদের অশান্ত মনের উগ্রতায় আর অবদমনে তাঁর কাব্য এক মাধুর্যস্নিগ্ধ মরূদ্যান, এক রাত্রির হ্রদে শীতল অবগাহন।

রূঢ় বাস্তবতার ক্ষেত্র হইতে কবির অপসরণ

বিরাট পৃথিবী চলেছে অনন্তকালের নিরবধি পথ দিয়ে, কত 'সুসা-নিনেভ-গ্রীক্-হিন্দু-ফিনিশীয় সভ্যতার সমাধিস্তূপ পার হয়ে, কত বিম্বিসার-আটিলার কীর্তি-অকীর্তির স্মৃতির ধূসর পাণ্ডুলিপি বহন করে।' কী ক্লান্ত, কী সুদুর্বহ এই পথচলা! তার চেয়ে সবকিছুর ওপর চিরবিরামের যতিপতন ঘটুক, আসুক অন্ধকার—যেখানে ভূগোলের রেখা-জটিলতা নিঃশেষে লুপ্ত, যেখানে কালের কল্লোল সীমাহীন সময়ের তমসা-সমুদ্রে নিলীন :

'গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত,
আমাকে কেন জাগাতে চাও ?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম-হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন।'

'ধানসিড়ি নদীর কিনারে' চিরনিদ্রার পৌষের রাত্রিই তবে আসন্ন হোক, আসুক তা হলে চিরকালের স্বপ্ননিবিড়তার সেই সঙ্গিনী :

'সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী– ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'

জীবনানন্দের কাব্যের উত্তরপর্বে আর-একটি সঞ্চারী সুর এসেছিল। যে-কোনো শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক্ কবির মতোই এই রক্তকলঙ্কিত কাল—যুদ্ধ আর মৃত্যুর প্রেতলীলা—তাঁকে জীবনের প্রেমে চকিত করে তুলেছিল। আত্মবৃত্ত কবি সহসা এক মহাপৃথিবীর মহত্তর প্রাণনায় উঠেছিলেন উদ্দীপ্ত হয়ে। তাঁর সুরে এসেছিল 'তিমিরহননের গান'—এসেছিল 'সূর্যতামসী'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জীবনানন্দের কবিতায় এক মহৎ স্বর্গের বাণী এনে দিয়েছিল। 'হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক' থেকে নিজের 'তিমিরবিলাসী' মনকে তিনি 'তিমিরবিনাশী' শক্তিতে চেয়েছিলেন প্রাণিত করতে। এই নবলব্ধ চৈতন্য তাঁকে উত্তীর্ণ করেছিল এক সুবিপুল বোধির মধ্যে। ইতিহাসের গতি আজো শেষ হয়নি, মানুষ বহু মত, বহু প্রজ্ঞা, বহু ধর্মনায়ক আর রাষ্ট্রনায়কের অনুগমন করে চলেছে কালকালান্ত ধরে। সে হয়তো অনেক পেয়েছে, তবু কি সব পাওয়া হয়েছে তার ? কোথাও কি দেখা দিয়েছে 'অনির্বচনীয় স্বপনের সফলতা—নবীনতা—শুভ্র মানবিকতার

জীবনানন্দের কাব্যের উত্তরপর্ব

ভোর'? কবি তার উত্তর পান নি। তবু সমস্ত দ্বন্দ্বসংঘর্ষের অবসানে, মানুষের সমস্ত পরীক্ষা আর পরিক্রমা শেষ হয়ে গেলে, এক নিবিড় পরিচয়ে, কোনো এক সর্বপ্লাবী আনন্দের মধ্যে জীবন আর কাল কি অবলীন হয়ে যাবে না? সেই প্রত্যাশিত আগামী-সম্ভবের অভিমুখে জীবনানন্দের এই বন্দনা মন্ত্রোচ্চারের মতোই অনুপম :

'নবনব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাস ভুবনে নবীন
হবে না কি মানবকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে।
সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি মানুষের বিষয় হৃদয় ;
জয় অস্তসূর্য জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।'*

বৈষ্ণবপদাবলীপাঠের ভূমিকা

[**রচনার সংকেতসূত্র :** প্রারম্ভিক ভূমিকা—বৈষ্ণবপদের ব্যাপক আবেদনের কারণ—বৈষ্ণবপদাবলী প্রেমের কাব্য—বৈষ্ণবমতে ভক্তির অপর নাম প্রেম—পদাবলীর বর্ণনীয় বিষয়—রাধাকৃষ্ণ-লীলা ও গৌরাঙ্গলীলা—রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব—গৌরাঙ্গতত্ত্ব—বৈষ্ণবধর্মের সাধ্যসাধন তত্ত্ব—পদাবলীর রসপ্রসঙ্গ—বৈষ্ণবপদকর্তা—বিদ্যাপতি—চণ্ডীদাস—জ্ঞানদাস—গোবিন্দদাস]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে সর্বোত্তম কবিকীর্তি বৈষ্ণবকবিতা। বিশ্বসাহিত্যের আসরেও এই প্রেমবিলসিত, গীতিঝংকৃত কবিতা শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিতে পারে। এমন কোমলকান্ত পদ, এমন শ্রুতিরঞ্জন গান, ভক্তের হৃদিরঞ্জন এমন সংগীত, এমন চিত্তবিমোহন প্রেমের কাব্য খুব বেশি চোখে পড়ে না। শত শত বৎসরের ব্যবধানেও এই বৈষ্ণবপদাবলীর কাব্যসৌন্দর্য বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নাই। সুদূর দ্বাদশ শতকে লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় জয়দেব গোস্বামীর কণ্ঠ হইতে পদাবলীর যে-মধুময় ঝংকার উঠিয়াছিল, অদ্যাপি তাহা তেমনি প্রাণময় তেমনি স্মরণসুন্দর হইয়া রহিয়াছে। শুধু তাই নয়, সেই সুরের সঞ্জীবনস্পর্শে সেকালের ও একালের

প্রারম্ভিক ভূমিকা

* অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত।

বাংলাসাহিত্য প্রাণিত ও সরস হইয়াছে। প্রাচীন বাংলার কবিকঙ্কণ, আলাওল, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিদল বৈষ্ণবপদাবলীর নিকট ঋণী; আধুনিক বাংলাসাহিত্যের যুগন্ধর কবি মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবকাব্যের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন: 'What gave me boldness when I was young was my acquaintance with the old Vaisnava poems of Bengal, full of the freedom of metre and courage of expression.' [The Religion of an Artist]

বৈষ্ণবপদের ব্যাপক আবেদনের কারণ

বৈষ্ণবপদাবলীর এতখানি ব্যাপ্তির হেতু কী? বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, প্রথম হইতেই এই পদসাহিত্য রাজশক্তির সমর্থন লাভ করিয়াছে। বাংলার সেনবংশীয় রাজারা বৈষ্ণব-আচারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; মুসলমান-রাজগণের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণবরসের রসিক ছিলেন; যেমন—'শাহ হুসন জগৎভূষণ সেহো এহি রস জানে'। ইহার চেয়েও বড়ো কথা, বহুশত বৎসর ধরিয়া বৈষ্ণবধর্ম বিপুল সংখ্যক লোকের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। একাধিক মহাপুরুষ ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন, একাধিক অবিস্মরণীয় প্রেমিক ভক্ত 'মেঘদরশন-মাত্র' অচেতন হইয়াছেন। সর্বোপরি বৈষ্ণবজগতে আবির্ভূত হইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার প্রেমবিহ্বল অলৌকিক ভাব, পদাবলীর রসাস্বাদন বৈষ্ণবকাব্যকে চিরত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মহাপ্রভুর পরে আসিয়াছেন 'দ্বিতীয় চৈতন্য' শ্রীনিবাস আচার্য, রসকীর্তনের প্রচারক নরোত্তম দাস ঠাকুর, খেতরীর মহামহোৎসবে পদকীর্তনের সে এক বিপুল সমারোহ—বাংলাদেশের নানাকেন্দ্রে কীর্তনগানের মোহময় আবেশ। এইভাবে বৈষ্ণবগীতিকাব্য বাঙালীর অধ্যাত্মজীবনের আকৃতি প্রকাশ করিয়া ভক্তজনের রসপিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে। ইহাও স্মর্তব্য যে, অগণিত পদকর্তার রচনাপ্রাচুর্যে পদরত্নভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু ইহা বৈষ্ণবপদসমৃদ্ধির একদিক—ইহার আরও কয়েকটি দিক আছে। বৈষ্ণবকবিতার সুমধুর লালিত্য, ভাষার অপূর্ব সৌরভ, মাত্রাছন্দের নাতিদ্রুত নাতিমন্থর সাবলীল গতিপ্রবাহ যে-কোনো শ্রোতার চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ। এতদ্ব্যতীত ইহাতে রহিয়াছে লৌকিক জীবনের বহুবিচিত্র সুরের অনুরণন। বৈষ্ণবপদাবলী আধ্যাত্মিক সংবেদনের জীবনরসাশ্রিত কারুকলামণ্ডিত বাণীমূর্তি। ভক্তিরস ও জীবনরসের অদ্বৈত সাযুজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বৈষ্ণবকবিতায়।

অবশ্য শ্রোতার মনে সংশয় ও প্রশ্ন জাগিলেও তাহারা বৈষ্ণবপদসংগ্রহের গ্রন্থকে ধর্মগ্রন্থের মর্যাদাই দান করিয়া আসিয়াছে; নতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে শাস্ত্রের দেশনা, ভক্তকবির অনুশাসন—ইহা লৌকিক কামনাবাসনার কাব্যায়ন নয়, ইহা ভক্ত-ভগবানের প্রেমলীলার বাণীবিগ্রহ—'শুদ্ধপ্রেমসুখসিন্ধু' [চৈতন্যচরিতামৃত]; ইহার শ্রবণে ঈশ্বরবিষয়ে নিষ্ঠা হয়, ['যা শ্রদ্ধা তৎপরো ভবেৎ'—ভাগবত], হরিশ্রবণের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রৎ হইলেই ইহা শ্রোতব্য :

'যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্॥'

—গীতগোবিন্দ

কিন্তু পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া একালের রসপিপাসুর জিজ্ঞাসা তুমুল হইয়া উঠিল। তাঁহাদের প্রশ্ন—'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?' এই যে এত প্রেমব্যাকুলতা, বিরহমিলন, মান-অভিমানের কথা, ইহা কি কেবল দেবতার ? ইহার মধ্যে তো মানবীয় কামনাবাসনার প্রতিবিম্বন সুস্পষ্ট, ইহা যে মানবজীবনের মধুময় সংগীত। বৈষ্ণবপদাবলী কি কেবল ধর্মগাথা, ইহা যে লৌকিক জীবনের প্রেমানুভবের মহাগীত। এইরূপে নব্যযুগের প্রেমভাবনায় বৈষ্ণবকবিতার প্রেমার্তি অন্যতর এক গভীর তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল, চিরকালের সংশয়মিশ্রিত প্রশ্ন বৈষ্ণবকাব্যের মোহময় আকর্ষণের বাহ্য কারণ আবিষ্কার করিল; সোচ্চার ঘোষণা শ্রুত হইল—পদাবলী প্রেমের কবিতা।

বৈষ্ণবপদাবলী প্রেমের কাব্য

বস্তুত বৈষ্ণবপদাবলী জীবনেরই কাব্য, মানবীয় প্রেমের সঙ্গীতস্পন্দিত কাহিনী। নরনারীর হৃদয়ের কতকগুলি চিরন্তন ভাবস্থির বৃত্তি ইহাতে নিত্য-কালের ভাষায় রূপায়িত হইয়াছে। সখার জন্য, সন্তানের জন্য, প্রিয়তমের জন্য মানুষের যে অকৃত্রিম অনাবিল অনুরাগ তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিত্রণে বৈষ্ণবপদাবলী পূর্ণ। ওই যে 'ভায়্যা ভায়্যা' বলিয়া 'আওত শ্রীদামচন্দ্র রখিয়া পাগড়ি মাথে'—কেন ?—গোচারণে যাইতে হইবে। শুধুই কি গোচারণ ? আরও কত খেলা ! সখার সহিত সখ্যের খেলা। তাহাতে ছোটবড়ো প্রভেদ নাই, সকলেই সমপ্রাণ ['সমপ্রাণঃ সখা মতঃ']। কৃষ্ণ খেলায় হারিয়া গিয়াছে, শ্রীদাম-সুদামাদি সখা সখ্যভাবে তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিতেছে; আবার, কৃষ্ণ চোখের একটু আড়ালে গেলেই সখারা কাঁদিয়া আকুল হইতেছে—'তোমা সভা না দেখিয়া আমা সভা প্রাণ ফাটি যায়' [জ্ঞানদাস]। এখানে মাতৃস্নেহও অসাধারণ।

যশোদা কৃষ্ণ বলিতে অজ্ঞান, কৃষ্ণকে গোষ্ঠে পাঠাইতেও তাঁহার দুইচোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। কৃষ্ণ যে 'পরাণের পরাণ নীলমনি'। আবার, ননীচোরা বলিয়া তাহাকে উদূখলে বন্ধন করিতেও মায়ের এতটুকু দ্বিধা নাই। এ যেন আমাদের চিরপরিচিত গৃহেরই 'স্নেহবিহ্বল করুণাছলছল'প্রেক্ষণীয় মাতৃমূর্তি—পুত্রস্নেহে একান্ত আত্মহারা, সতত আশঙ্কাব্যাকুল, অতিশয় মমতাতুর—পবিত্র বাৎসল্যের অনন্ত উৎস।

সখ্য-বাৎসল্য হইতেও বর্ণবৈচিত্র্যে রমণীয় রাধিকার প্রেমচ্ছবি। পার্থিব প্রেমাকাঙ্ক্ষার একটি নিখুঁত আলেখ্য অনুরাগময়ী শ্রীরাধিকা। কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন, গুণে হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে—'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মনভোর' [জ্ঞানদাস]। প্রেমের আকর্ষণে তাঁহার লাজলজ্জা কোথায় ভাসিয়া গেল, কুলশীলের সকল প্রশ্ন তুচ্ছ হইয়া গেল—রাধিকা 'কুলবতী-ধরম' বিসর্জন দিলেন। তাঁহার সমগ্র হৃদয় জুড়িয়া একটিমাত্র কামনা—'কেমনে পাইব সই তারে'। প্রিয়মিলনের পথে অনেক বাধা, বহুতর বিঘ্ন, কিন্তু রাধিকার ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই। অন্ধকার, ঝড়জল, বিদ্যুৎস্ফূরণ, বজ্রগর্জন, পথের ভুজঙ্গভয়—শ্রীরাধার কাছে ইহাদের অস্তিত্ব যেন মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। রাধাপ্রেম দুর্বার। প্রেমের জন্য জীবনকে তিনি উপেক্ষা করিতেছেন। এমন যাঁহার প্রণয়ব্যাকুলতা, বাঞ্ছিত বস্তু তাঁহার কাছে দুর্লভ নয়। রাধিকার গাঢ় তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইল মিলনে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারে সে-সম্ভোগ প্রাকৃত সম্ভোগ হইতে অভিন্ন। তারপর কত মান-অভিমান, প্রেমলীলার কত বিচিত্র প্রকাশ, কী অদ্ভুত প্রেমবৈচিত্ত্য! রাধারাণীর প্রেমজীবনের চরম মাধুর্য বিরহের পদাবলীতে। অসহনীয় দুঃখের কষ্টিপাথরে কঠিন পরীক্ষায় এই প্রেম উত্তীর্ণ হইয়াছে। প্রণয়াস্পদকে হারাইয়া সে কী মর্মচ্ছেদী আর্তনাদ—'পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা' [বিদ্যাপতি]। এ হাহাকারের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে ভাবসম্মিলনে। কৃষ্ণতন্ময় হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে চিরদিনের মতো। তাহাতে বিচ্ছেদ নাই, ক্রন্দন নাই, আছে কেবল নিভৃত মর্মলোকে চিরজাগ্রৎ প্রেম—'হৃদয়মন্দিরে কানু ঘুমাওল প্রেমপ্রহরী রহ জাগি'।

শ্রীরাধার এই যে প্রেম, ইহা মানুষেরই প্রেম দিয়া গড়া। পণ্ডিতপ্রবর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেন, 'Her love is human love raised to the n^{th} power ['God is love']—উক্তিটি একদিক হইতে অতি সত্য। মানবীয় প্রেম সম্পর্কে সাধারণ ধারণা এই যে, ইহা দেহকেন্দ্রিক, ইহাতে থাকে 'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা', ইহা সম্পূর্ণরূপে দেনাপাওনার অধীন। মানুষী প্রেমের দৈন্য আছে, ক্ষয় আছে, মৃত্যু আছে ['Love has its disease, death and decay'], ইহা

ঈর্ষাকাতর, স্বার্থান্বেষী, প্রবৃত্তিমুখী। কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন প্রেমও আছে যাহা প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে না, যাহা স্বার্থকে হেলায় তুচ্ছ করে—এমন কি, তাহা ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রও নয়। সে-প্রেম আত্মবিলোপী, তন্ময়। যেমন, 'Platonic love':

'The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow'—

এ প্রেম দেহকামনার ঊর্ধ্বচারী, জৈবিক সম্ভোগস্পৃহার অতীত; অথচ সুগভীর, সান্দ্র, সুবলিত। জীবন ও সাহিত্যে ইহা একেবারে দুর্লভ নয়। ভবভূতি যে 'ভদ্র প্রেম'-এর কথা বলিয়াছেন তাহা 'অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্বাসু অবস্থাসু যৎ'—যে-প্রেম ভালোবাসিয়াই তৃপ্ত, দুঃখেও যাহার উজ্জ্বল মহিমা। বিগত যুগের বাংলা কাব্যসাহিত্যেও এই প্রেমের উদাহরণ আছে—মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কাঞ্চনমালা, কাজলরেখা ত্যাগশুদ্ধ প্রেমের প্রতীক। তাঁহাদের প্রেমে স্বার্থএষণা নাই, ইন্দ্রিয়বিকার নাই; আছে প্রণয়াস্পদের প্রতি আসক্তিবিরহিত প্রগাঢ় অনুরাগময়তা, প্রেমের জন্য সর্বস্ব বিসর্জনের প্রদীপ্ত অঙ্গীকার। বাংলাদেশে এই প্রেমের শতদল বিকসিত হইয়াছে। ইহার আরেকখানি আশ্চর্যসুন্দর আলেখ্য বৈষ্ণবকবির কল্পিত শ্রীরাধা—তেমনই একনিষ্ঠ, স্বার্থলেশশূন্য, স্নেহসার-নির্মিত। পার্থক্য এই যে, বৈষ্ণবের রাধিকা 'প্রেমিকাশিরোমণি', তাঁহার প্রেম কোটিগুণিত পার্থিব প্রেম। আরও বলা যায়, বহিরঙ্গের দৃষ্টিতে যাহা মানবীয় প্রেমের রসসার, বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিতে তাহা ভক্তি বা প্রেমভক্তি।

বৈষ্ণবমতে ভক্তি ও প্রেম অভিন্ন। ভারতীয় ভক্তিশাস্ত্রই ইহার ভিত্তি। গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শাণ্ডিল্য ও নারদীয় ভক্তিসূত্রে পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে, ভক্তি ও প্রেম একাত্ম, যাহা ভক্তি তাহাই প্রেম—'সা তু অস্মিন পরম প্রেমরূপা' [নারদীয় ভক্তিসূত্র], 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে' [শাণ্ডিল্য সূত্র]—ঈশ্বরের প্রতি পরা প্রেমই ভক্তি। এই প্রেমের লক্ষণ কী? লক্ষণ এই: 'তদর্পিতাখিলাচরতা তদ্বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতেতি' [নারদীয় ভক্তিসূত্র]—তাঁহাতেই সর্বসমর্পণ, তাঁহার বিচ্ছেদে পরম ব্যাকুলতা। তিনিই আমার সর্বস্ব, আমার চিন্তাকর্ম, আমার দেহ-মন-প্রাণ, আমার সবকিছু তিনি—'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'—এই ভাব। এই তন্মনস্ক ভাব প্রেমের প্রধান লক্ষণ। দ্বিতীয় লক্ষণ—ব্যাকুলতা। যাহাকে ভালোবাসিয়াছি তাহাকেই চাই, অন্যকিছুই প্রার্থনীয় নয়, এমন কি, মুক্তি পর্যন্ত তুচ্ছ—শুধু তাহাকে লাভ করিবার জন্য নিঃসীম ব্যগ্রতা। মিলনেও ব্যাকুলতা, বিরহে উদগ্র উৎকণ্ঠা,

বৈষ্ণবমতে ভক্তির অপর নাম প্রেম

সে-উৎকণ্ঠার পরিমাপ হয় না। সে-তৃষ্ণা—প্রগাঢ় তৃষ্ণা, সে-আবিষ্টতা—চরম আবিষ্টতা। ইহাই প্রেম।

এরূপ প্রেম কি সম্ভব? সর্বস্ব কি কাহাকেও অর্পণ করা যায়? মুখে বলা চলে, 'সব দিয়াছি, আর কিছুই নাই'। কিন্তু সূক্ষ্ম অহং? তাহা কে ত্যাগ করিতে পারে? আর, প্রিয়জনের জন্য এমন তন্ময়তা ও ব্যাকুলতা? তাঁহার অদর্শনে 'ত্রুটির্যুগায়তে', তাঁহার বিন্দুমাত্র বিচ্ছেদে 'শূন্যায়িতং জগৎ সর্বম্'—ইহাও কি বাস্তব? এমন সর্বগ্রাসী লালসা-ব্যগ্রতার দৃষ্টান্ত সাহিত্যে কোথায়? প্রেমিক ভক্ত বলেন, উদার কণ্ঠে ঘোষণা করেন,'অস্ত্যেবম্ অস্ত্যেবম্'—আছে, আছে—'যথা ব্রজগোপিকানাম্' [নারদীয় ভক্তিসূত্র]—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপিনীদের প্রেম। তাহা 'স্বারসিকী' [স্বাভাবিক], স্বতঃস্ফূর্ত, অহৈতুকী। ব্রজগোপিকারা 'কৃষ্ণৈকপ্রাণা', 'তদর্থপ্রাণস্থান-তদীয়তা-সর্বতদ্ভাবা' [শাণ্ডিল্য সূত্র],পতিপুত্র-আত্মীয়-স্বজন সমস্তকিছুই তাহারা বিসর্জন দিয়াছে, এক প্রেমের নিকট সকল বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। এমন কি, কুলধর্মকে উপেক্ষা করিয়া তাহারা বলিয়াছে, 'পতিসুতাদিভিরার্তিদৈঃ কিম্', 'প্রেষ্ঠোভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা' [ভাগবত]। এই যেমন একান্ত আত্মসমর্পণ, তেমনি তাঁহার বিরহে মর্মান্তিক দুঃখ। কৃষ্ণের অদর্শনে করিভ্রষ্ট করিণীর ন্যায় পরিতাপিতা ব্রজাঙ্গনা, রাসরজনীর শারদ জ্যোৎস্না তাহাদের কাছে নিষ্প্রভ, চিত্তদেশ অন্ধকার, সকল জগৎ শূন্য। এরূপ অবস্থায় ব্রজ-নারীদের মুখে কেবল এক কথা—'আমাদের প্রিয়তম অচ্যুত কোথায়'?—ইহাই প্রেম, ইহাই রাগাত্মিকা ভক্তি:

'ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরামবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তি সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥'

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

বৈষ্ণবপদাবলী এই একান্ত আবিষ্ট, স্বতঃস্ফূর্ত, অহৈতুকী প্রেমের কবিতা, ভক্তির সামগীতি। রাধাকৃষ্ণলীলা এই প্রেমভক্তির লীলা, এবং ইহাই বৈষ্ণবগীতি-কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়।

পদাবলীর বর্ণনীয় বিষয়: রাধাকৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গলীলা

উপরে বলা হইয়াছে, প্রধানত রাধাকৃষ্ণলীলাকে লইয়াই বৈষ্ণবকাব্য। কিন্তু ষোড়শ শতক হইতে আরও একটি বিষয় ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে—তাহা গৌরাঙ্গলীলা। গৌরাঙ্গলীলার সহিত রাধাকৃষ্ণলীলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। একটির আস্বাদনে অপরটির আস্বাদন সহজ হইয়া উঠে। শুধু তাহা নয়, ভক্ত বৈষ্ণবপদকর্তাগণ অশেষ কৃতজ্ঞতার সুরে বলেন:

'গৌর নহিত কি যেন হইতে কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা জগতে জানিত কে॥'

—বাসুঘোষ

কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। গোপীপ্রেমের কাহিনী ও ইহার মাধুর্য ভাগবতে ও অন্যান্য পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে সত্য, এবং এই হৃদয়গ্রাহী প্রেমকথা লইয়া অসংখ্য চূর্ণ কবিতা আর কাব্যও রচিত হইয়াছে। বল্লবীগণের ঐকান্তিক প্রেমকাহিনী ভারতবর্ষের সর্বত্রই পরিচিত ছিল এবং এই প্রকারের প্রেমসাধনার কথাও অজ্ঞাত ছিল না। দক্ষিণ-ভারতের আলোয়ারসম্প্রদায় এই পথের পথিক ছিলেন। বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, রায় রামানন্দ প্রভৃতি ভক্ত ও কবিরা প্রেমের নিগূঢ় তাৎপর্য অবগত ছিলেন। তথাপি বলা চলে, ব্রজপ্রেমের স্বরূপ জনসাধারণের তেমন জানা ছিল না। গোপীপ্রেম, বিশেষত রাধাপ্রেমের সুনির্মল অতীন্দ্রিয় আকৃতি, ইহার সীমাহীন ব্যাকুলতা, প্রেম দ্বারা প্রেমময়ের আরাধনা এবং এই প্রেমের 'মহাভাব' অনর্পিতই ছিল। যেখানে 'ধর্মকর্ম করে সভে এই মাত্র জানে', যেখানে ভাগবতপাঠ হয় কিন্তু ভক্তির মর্ম ব্যাখ্যাত হয় না, সেখানে প্রেমের নিহিতার্থ যে প্রচ্ছন্ন থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কী? শুষ্ক পাণ্ডিত্যগর্বে স্ফীত, নীরস তর্কজালে সমাচ্ছন্ন দেশে—বাহ্য-অনুষ্ঠান-বাহুল্যে পীড়িত, ব্যভিচারে পঙ্কিল, বৌদ্ধনাস্তিক্যবাদে জর্জর, জ্ঞানবাদে বিশুষ্ক দেশে—শ্রীকৃষ্ণপদাব্জবাদই দুর্লভ; প্রেম—সে তো 'রহু বহুদূর'। চতুষ্পার্শ্বের এই গহন তমিস্রার মধ্যে চৈতন্যচন্দ্রের উদয় হইল। মুহূর্তে অন্ধকার সরিয়া গেল, প্রেমের প্লাবনে আচারসর্বস্বতার আবর্জনা কোথায় ভাসিয়া গেল! শ্রীচৈতন্য জ্ঞানের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিলেন ভক্তিকে, ভক্তিকে একাকার করিয়া দিলেন প্রেমের সহিত, নূতন করিয়া প্রকাশ করিলেন ব্রজলীলার মাধুর্য, উদ্ঘাটিত করিলেন 'সাধ্যশিরোমণি' রাধাপ্রেমের নিগূঢ় তাৎপর্য। যে-প্রেম ছিল পৌরাণিক জগতের বস্তু, যাহা ছিল কবিকল্পনার সামগ্রী, যাহার স্মৃতি ছিল, ছিল না কোনো অনুস্মৃতি—মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব নিজ জীবনে তাহার বাস্তব সত্যতা সপ্রমাণ করিয়া সেই প্রেমের গুণসীমা সর্বজনসমক্ষে প্রকাশ করিলেন। দ্বাপর যুগের কালিন্দীতীরের মহাপ্রেম, বৃন্দাবিপিনের প্রণয়মাধুরী শ্রীগৌরাঙ্গের মাধ্যমেই কলিযুগে পুনঃপ্রকট হইল। ভক্তকবিরা গৌরাঙ্গ সম্পর্কে গাহিলেন:

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।

—বিদগ্ধমাধব

তাই ব্রজলীলার রসসাগরে অবগাহনের জন্য প্রয়োজন গৌরাঙ্গলীলার আস্বাদন। গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী রাধাকৃষ্ণলীলাকথার উপোদ্‌ঘাত। ইহার কারণ আরও গভীর। সেই গভীর কারণ অনুধাবন করিতে হইলে গৌরাঙ্গতত্ত্বের মর্ম অবগত হইতে হইবে। রাধাকৃষ্ণলীলাতত্ত্বের সহিত সেই তত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। বৈষ্ণবকবিতার পূর্ণ রসাস্বাদন অবশ্যই তত্ত্বের উপর নির্ভর করে, নচেৎ ওই পদগুলিকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে, এবং বৈষ্ণবকাব্যে বর্ণিত কামগন্ধহীন প্রেমার্তিকে অনিরুদ্ধ অনঙ্গদেবতার উন্মত্ত কামরঙ্গ বলিয়াও ভ্রম জন্মিতে পারে।

রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব

'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্'—তিনি পূর্ণ এবং পরম তত্ত্ব। জ্ঞানবাদী বৈদান্তিকগণ এই তত্ত্বকে বলেন 'ব্রহ্ম', যোগিগণ বলেন 'পরমাত্মা'; আর, বৈষ্ণবের নিকট তাহা 'ভগবান' বলিয়া কীর্তিত। শ্রীকৃষ্ণ সেই ভগবান, 'ব্রহ্ম' তাঁহার 'তনুভা' [অঙ্গপ্রভা], 'আত্মা' তাঁহার 'অংশবিভব' [আংশিক বিভূতি]। কৃষ্ণই পরম-কারণ-কারণ, ষড়ৈশ্বর্যময়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ—'পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব' [চরিতামৃত]:

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥ —ব্রহ্মসংহিতা

তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই ['মত্তঃ পরতরং নান্যৎ'—গীতা]; তিনি অবতারী, অন্যান্য অবতার তাঁহার অংশ ['এতে চাংশকলা পুংসঃ'—ভাগবত], তিনি পূর্ণ ['পরিপূর্ণতয়া ভাতি তত্রৈব পুরুষোত্তমে'—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু]। তিনি চিরকিশোর, বিশ্ব ভরিয়া যুগে যুগে তিনি নানারূপে লীলা করিয়া চলিয়াছেন। বহুবিচিত্র রূপের প্রকাশ সত্ত্বেও তিনি এক। দুগ্ধের যেমন ধবলতা, অগ্নির যেমন দাহিকাশক্তি—তেমনই কৃষ্ণের শক্তি। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। এই শক্তির তিনটি মুখ্য ভেদ: [১] অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি; [২] বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ও [৩] তটস্থা জীবশক্তি। মায়াশক্তি জগৎকারণ, প্রপঞ্চসার তাহারই বিক্রিয়া। তাহাই জীবকে মোহগ্রস্ত করিতেছে, পরম প্রেমময় হইতে জীবকে দূরে সরাইয়া রাখিতেছে। জীবশক্তি তটস্থা অর্থাৎ অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গার মধ্যবর্তী। একদিকে সে মায়াচ্ছন্ন, বহির্মুখ—স্বরূপ হইতে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক; অপরদিকে সে চিৎকণ—মায়াকে অতিক্রম করার মতো শক্তিসম্পন্ন। ইহা 'অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব'। জীবশক্তির সম্ভাবনা অনন্ত। অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি বা স্বরূপশক্তি সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া সৎ চিৎ ও আনন্দভেদে ইহা তিনপ্রকার:

সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
—চৈতন্যচরিতামৃত

এই হ্লাদিনীর সার-অংশ 'মহাভাবস্বরূপা রাধাঠাকুরাণী'। ইনি কৃষ্ণময়ী, শ্রী ও সৌন্দর্যের সারভূতা ['সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তি সম্মোহিনী পরা'—গৌতমীয় তন্ত্র], গুণে বরীয়সী, প্রেমের পরাকাষ্ঠা ['মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী'—উজ্জ্বলনীলমণি]। ইনিই কান্তিমাধুর্যে কৃষ্ণকে নিরন্তর রসাস্বাদন করাইতেছেন। ইহাই গোলোকের নিত্যরাস। এই সান্দ্রতম আনন্দরাস হইতে যে-রসধারা উৎসারিত হইতেছে, সমগ্র সৃষ্টিতে তাহারই প্লাবন বহিয়া যাইতেছে। চিরানন্দধাম গোলোক, তাহাতে আনন্দময় কৃষ্ণ নিজ আনন্দাংশের [হ্লাদিনীশক্তি] সহিত আনন্দলীলায় বিভোর। সে এক অনন্ত মাধুরীর খেলা, সেখানে কেবল মধু আর মধু, সব মধুর মধুর। অতএব রাধাকৃষ্ণলীলা পরম-মধুরের নিজ মাধুরী-আস্বাদনেরই লীলা। কৃষ্ণ ও রাধার মধ্যে স্বরূপত কোনো ভেদ নাই :

রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥ —চরিতামৃত

রাধাকৃষ্ণ স্বরূপত এক হইলেও, লীলারস-আস্বাদনের জন্য দুই রূপে প্রকট হন। গোলোকের অখণ্ড এক মর্তবৃন্দাবনে রাধা ও কৃষ্ণ হইয়া প্রেমাস্বাদন করেন। অতএব এ লীলা কামরঙ্গ নয়, মহাপ্রেম-দ্বারা মহাপ্রেম কীভাবে আস্বাদন করা যায়, তাহারই দৃষ্টান্ত। দ্বাপরের 'বৃন্দাবিপিনমাধুরী' তাহারই প্রতীক। এখানে কৃষ্ণ চিরকিশোর, তারুণ্য ও কারুণ্যের আধার, কেবল প্রেমময়। আর, রাধিকা চিরকিশোরী—অনন্ত সৌন্দর্য ও মাধুর্যের উৎস। এখানকার সম্ভোগ অপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয়—এ যে সর্বান্তর্যামীর রসসম্ভোগ ['যোঽন্তশ্চরিত সোঽধ্যক্ষ এষ ক্রীড়নদেহভাক্'—ভাগবত]। ইহাই রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, বৃন্দাবনলীলার অন্তর্নিহিত মর্মকথা। বৈষ্ণবপদাবলীর রস-উৎসও এই তত্ত্ব।

গৌরাঙ্গতত্ত্বও এই মহাভাবের তত্ত্ব। প্রেমের অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ একই দেহে রাধা ও কৃষ্ণ ['অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর']। তিনিই সেই 'ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান স স্বয়ময়ম্'। যে-তত্ত্ব স্বরূপত এক, যাহা লীলা-প্রকাশের জন্য দ্বাপরে দ্বৈতভাবে প্রকট হইয়াছিল, চৈতন্যদেবে তাহাই আবার একাধারে সংযুক্ত হইয়াছে :

গৌরাঙ্গতত্ত্ব

'রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরস্মাদ্
একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতং তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥' —স্বরূপ গোস্বামী।

অতএব গৌরাঙ্গই কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গই রাধা—'সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি'। স্বকীয় প্রেমরসনির্যাস-আস্বাদন-মানসে, লোকে রাগমার্গ-ভক্তিপ্রচারের উদ্দেশ্যে, তিনি চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাই গৌরাঙ্গলীলার নিগূঢ় মর্ম। রাধাকৃষ্ণলীলার সহিত গৌরাঙ্গলীলার যোগসূত্রও এখানে।

বস্তুত গৌরাঙ্গদেবই রাধাকৃষ্ণলীলার মাধুরী প্রকাশ করিয়াছেন, ব্রজলীলা-আস্বাদনের দ্বার উন্মোচন করিয়াছেন; ভগবান যে অফুরন্ত মাধুর্যের উৎস, তিনি যে পরম প্রেমময়, তিনি যে প্রভু, সখা, সন্তান ও দয়িত—তাহা বুঝাইয়াছেন। শ্রুতিতে ও উপনিষদে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের যে-লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে ['রসো বৈ সঃ', 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি', 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ' ইত্যাদি], শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে যিনি মূর্তিমান প্রেমানন্দরূপে প্রকট হইয়াছেন ['পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথঃ'—ভাগবত], বিল্বমঙ্গলের ভাষায় যিনি 'মধুরং মধুরং মধুরম্' [কর্ণামৃত]—গৌরাঙ্গদেব সেই পূর্ণানন্দ মাধুর্যময় ভগবানের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন, এবং সেই পরম-প্রেমময়কে কীভাবে প্রেম-দ্বারা আস্বাদন করিতে হয়, রাধাভাবের মূর্তবিগ্রহরূপে তাহা দেখাইয়াছেন। নীলাচলের শ্রীচৈতন্য মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকার প্রত্যক্ষ পূর্ণমূর্তি। কী নিবিড় তাঁহার কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুলতা, কী প্রগাঢ় তাঁহার উৎকণ্ঠা, কৃষ্ণবিরহে কী সকরুণ আর্তনাদ! গম্ভীরার নিভৃত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সে-দিব্যোন্মাদ-অবস্থার কথা স্মরণ করিলে যে-কোনো মানুষের হৃদয় বিগলিত হয়। প্রেমের অনুভাব অশ্রু, কম্প, পুলকাদির উদ্দীপ্ত প্রকাশ। এই অধিরূঢ় মহাভাবই সাধ্যভক্তির শেষ সীমা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধ্যসাধনাতত্ত্ব গৌরাঙ্গদেবের জীবনেই উজ্জ্বলতমরূপে মূর্তিলাভ করিয়াছে। আমরা নিম্নে সেই অগাধ রসসিন্ধুর বিন্দুমাত্র আভাস দিতেছি।

গোদাবরীতীরে ভক্তপ্রবর রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের যে-কথোপকথন, তাহাতে বৈষ্ণবপ্রেম সাধনার সর্বশেষকথা উচ্চারিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবধর্মের সাধ্যসাধন তত্ত্ব

মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত—কৃষ্ণই পরমেশ্বর স্বয়ং ভগবান। তিনি অবতারী, 'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ', তিনি 'অখিলরসামৃত-মূর্তি', মাধুর্যের সার, সর্বসৌন্দর্যের আকর, পূর্ণতম আনন্দ। ব্রজধামে স্বীয় হ্লাদিনীশক্তির সহিত তিনি অবিরাম প্রেমলীলায়

মাতিয়া রহিয়াছেন। এই হ্লাদিনীর সার-অংশ শ্রীরাধিকা—'আনন্দচিন্ময়রস-প্রতিভাবিতা' :

'প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥' —চরিতামৃত

প্রাকৃত দৃষ্টিতে দুই পৃথক হইলেও স্বরূপত এক—'না সো রমণ ন হাম রমণী'—ইহাই প্রেমবিলাসবিবর্তের চরম ইংগিত।

রাধাকৃষ্ণের এই যে নিগূঢ় লীলা, ইহা দেবতাবৃন্দ, এমন কি কৃষ্ণের স্বকীয়া শক্তি লক্ষ্মী বা পুরমহিষী রুক্মিণী-আদিরও অজ্ঞাত। ইহা অতিশয় গুহ্য অথচ আনন্দঘন। ব্রজলীলার এই মাধুরী আস্বাদন করাই বৈষ্ণবসাধনার স্থিরবদ্ধ লক্ষ্য। জ্ঞানের পথে বা যোগমার্গে ইহার আস্বাদন হয় না, প্রেমের পথেই প্রেম আস্বাদ্য। এই প্রেমের অপর নাম ভক্তি, ইহাই মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। জ্ঞান ও যোগ এই ভক্তিলাভের উপায়মাত্র। ভগবান্ বলিতেছেন, 'ব্রহ্মভূত···মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্' [গীতা : ১৮।৫৪], 'যোগী···মৎসংস্থামধিগচ্ছতি' [গীতা : ৬।১৫]। অতএব জ্ঞান, কর্ম, যোগ—সেই ভক্তির পাদপীঠ। নারদীয় ভক্তিসূত্রে তাই উদার কণ্ঠে ঘোষণা করা হইয়াছে, 'ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী ভক্তিরেব গরীয়সী'।

ভক্তিরও আবার নানা স্তরভেদ রহিয়াছে—গৌণী ও মুখ্যা, বৈধী ও অবৈধী। স্বধর্মাচরণ, কৃষ্ণে কর্মার্পণ প্রভৃতি জ্ঞানমিশ্রা বৈধীভক্তি। জ্ঞানশূন্যা হইয়া তৎকথা-শ্রবণ, তৎকর্মসাধন—এইগুলিই প্রেমভক্তির প্রথম সোপান। 'কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা-মতিঃ' বা 'লৌল্য' [লোভ]—এ প্রেমের প্রধান লক্ষণ। ইহা দ্বারা ভক্ত নিরন্তর ভগবৎ প্রেমের আনন্দে বিভোর হইয়া থাকেন। প্রেমই মুখ্য ভক্তি, ইহাই সাধনীয়। ভক্তিসূত্রে তাই বলে, 'প্রেমৈব কার্যম্ প্রেমৈব কার্যম্' [নারদীয় সূত্র]।

ভগবৎ প্রেমের সাধারণ নাম রতি বা রাগ। ইহাই 'প্রীত্যঙ্কুর'। ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ 'অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা' [হরিভক্তিবিলাস]। এই নব প্রেমার উদয় যাঁহাতে হয় তাঁহার অন্তর্বাণী [চিত্তকথা] ও মুদ্রা [বাহিরের আচরণ] বুদ্ধির অগোচর। প্রেমের স্পর্শে ভক্ত 'মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবতি আত্মারামো ভবতি' [নারদীয় ভক্তিসূত্র]। এই প্রেম বহুকল্পদুর্লভ, অনন্যসাধারণ। ইহা ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পরিণত হয়। ইহাদের এক-একটির আস্বাদ উত্তরোত্তর মধুর। তাই মাধুর্য-ভজনেও অধিকারীভেদ আছে :

'অধিকারীভেদে রতি পঞ্চপ্রকার।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর আর॥' —চরিতামৃত

শান্ত-রতির শেষ সীমা প্রেম, ইহা ভক্তকে অহৈতুকী প্রেমের দ্বার পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয়। বস্তুত রাগমার্গের উপাসনার আরম্ভ দাস্য হইতে এবং ইহার চরম স্ফূর্তি মধুরে। রাধাভাব মাধুর্যের সার। কিন্তু সাধারণ জীবের পক্ষে সে-ভাবের ভজন সাধ্যাতীত। এমন কি, ব্রজধামের দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-নামধেয় স্বতঃস্ফূর্ত রাগের ভজনও সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। এই রাগে একমাত্র ব্রজবালাগণেরই অধিকার। তাঁহাদের ভক্তির নাম সাধ্যভক্তি। জীবের পক্ষে আচরণীয় সাধনভক্তি। বিধিমার্গে সাধন করিতে করিতে জন্মজন্মান্তরের সৌভাগ্য থাকিলে অহৈতুকী কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়; এবং ভক্ত তখন ব্রজগোপিদের দাস্য সখ্য বাৎসল্য-ভাব অবলম্বন করিয়া ['ব্রজলোকের কোনো ভাব লঞা'] রাগানুগ মার্গে কৃষ্ণের ভজন করিতে পারেন। ভাবযোগ্য দেহে রাধাকৃষ্ণের লীলাদর্শন অথবা রাধাকৃষ্ণকুঞ্জসেবার অধিকার লাভ করাই জীবের সাধ্য-সীমা। অর্থাৎ জীব 'লীলাশুক' বা 'লীলাসখী' পর্যন্ত হইতে পারেন। প্রেমিক ভক্ত ভগবানের মাধুর্যই আস্বাদন করিতে বাসনা করেন। তাঁহার মধুরলীলাই তিনি অনুধ্যান করিয়া থাকেন এবং সেই ঘনীভূত মাধুর্যরসে বিভোর হইয়া পড়েন। বৈষ্ণব-পদাবলীর পদকর্তাগণও এই রসের রসিক। তাই পদাবলী-কীর্তন ও তাহার রসাস্বাদনও সাধনারই অঙ্গ। ইহা দ্বারা ভক্তিরস ও কাব্যরসের যুগপৎ আস্বাদন হয়। বৈষ্ণবপদাবলী ভক্ত ও শিল্পী উভয়েরই রসতীর্থ।

বৈষ্ণবকাব্য বহুবিচিত্র রসের আকর। ইহার প্রত্যেকটি উপাদান সরস। তত্ত্বের দিক হইতে পরমতত্ত্ব কৃষ্ণ 'অখিলরসরাজ', তাঁহার স্বরূপশক্তি রাধা 'রসপ্রতিভাবিতা', উপাসনার উপকরণও রস। রসের মাধ্যমে রসাস্বাদন বৈষ্ণবধর্মের শেষ কথা। ইহাই আবার কাব্যরসেরও চরম কথা। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রী-গণের সাহিত্যমীমাংসার শেষকথা 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' [বিশ্বনাথ], 'কাব্য রস লয়ে' [ভারতচন্দ্র]। প্রেমিক ও ভক্তরসিক বৈষ্ণব এই সিদ্ধান্ত শিরোধার্য করিয়া রাধাকৃষ্ণলীলা তথা পদাবলী-আস্বাদনের রসশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। পদাবলী একদিকে ভক্তির নৈবেদ্য, অপর দিকে শ্রেষ্ঠ কাব্য। তাহার কারণ, ভক্তিই এখানে রসরূপতা লাভ করিয়াছে।

কাব্যের রসনিষ্পত্তি কী প্রকারে হয়? এ প্রসঙ্গে রসশাস্ত্রের আদিগুরু ভরতমুনি বলেন, 'বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ' [নাট্যশাস্ত্র]। প্রত্যেক মানুষ অসংখ্য চিত্তবৃত্তির অধীন। এই সংখ্যাতীত চিত্তবৃত্তির মধ্যে কয়েকটি চিরন্তন। তাহাদের উদয় নাই, ব্যয় নাই। ইহাদিগকে বলা হয় স্থায়ী ভাব। ইহাদের সংখ্যা আটটি কি নয়টি; যেমন—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ,

উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম। এই ভাবগুলিই উপযুক্ত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে আস্বাদ্যমান রসে রূপান্তরিত হয়। 'বিভাব' হইল চিত্তবৃত্তির নিমিত্ত-কারণ, আর অনুভাব চিত্তবৃত্তিজন্য শারীরিক ক্রিয়া; ব্যভিচারী ভাব স্থায়ী ভাবের বৈচিত্র্যসম্পাদক উদয়ব্যয়শীল অন্যান্য মনোভাব; যেমন— হর্ষ, নির্বেদ, ইত্যাদি। এই তিনের সংযোগে স্থায়ীভাব যথাক্রমে এইরূপ রসাভিব্যক্তি লাভ করে :

'শৃঙ্গার হাস্য করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানকাঃ।
বীভৎসোঽদ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্তস্তথামতঃ॥'

—সাহিত্যদর্পণ

এস্থলে 'শৃঙ্গার'-নামক যে-রসের উল্লেখ আছে তাহা 'রতি' ভাবের রসপরিণাম। আদৌ ইহা মানবীয় রতি বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে ['রতির্মনোঽনুকূলে অর্থে মনস প্রবণায়িতম্'], উহার সহিত ভক্তি বা দেববিষয়ক রতির অভিন্নতা স্বীকার করা হয় নাই। কিন্তু বৈষ্ণবরসবেত্তাগণ দেখিলেন, দেবাদিবিষয়ে রতিও মানবহৃদয়ের চিরন্তন ভাব। শুধু তাই নয়, ইহাকেই তাঁহারা একমাত্র স্থায়ী ভাব বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের মতবাদ অপরোক্ষ অনুভূতি ও সুদৃঢ় প্রত্যয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তাঁহারা ঘোষণা করিলেন,'ভক্তি রসরাট্'—ভক্তিই রসের রাজা।

কৃষ্ণভক্তিরসের স্থায়ী ভাব কৃষ্ণের প্রতি রতি বা প্রেম [রাগ]। দধি খণ্ড মরিচ ও কর্পূরের মিলনে যেমন অপূর্ব আস্বাদযুক্ত রসসৃষ্টি হয়, তেমনি প্রেমাদি স্থায়ী ভাব উপযুক্ত সামগ্রীর মিলনে চিত্তচমৎকার রসপরিণাম লাভ করে। এখানে কৃষ্ণই প্রধানত আলম্বন-বিভাব; তাঁহার অঙ্গলাবণ্য, নূপুরশিঞ্জন ও বংশীধ্বনি ইত্যাদি উদ্দীপন-বিভাব। এই সকল নিমিত্ত-কারণ যে-রতিরূপ স্থায়ী ভাবের উদ্বোধন করে, তাহার বহিঃপ্রকাশ হয় স্তম্ভাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের মধ্যে। অতএব এগুলি কৃষ্ণরতির অনুভাব, এবং নির্বেদ, হর্ষাদি ব্যভিচারী ভাব স্থায়ীকে পরিপুষ্ট করে। ইহাদের সংযোগে আস্বাদ্য রসনিষ্পত্তি হয়। এই রস পঞ্চবিধ :

'পঞ্চবিধ রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য।
মধুর নাম শৃঙ্গার সবাতে প্রাবল্য॥'

—চরিতামৃত

পঞ্চরসের মধ্যে মধুর বা উজ্জ্বল-রসই শ্রেষ্ঠ। কান্তকান্তাভাব-আশ্রয়ে ইহার উৎপত্তি। কিন্তু কান্তকান্তাভাবেরও 'তরতম' আছে। মধুরা-রতি—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা ভেদে তিনপ্রকার। সাধারণী রতিতে থাকে

'আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা', সমঞ্জসাতে থাকে শাস্ত্রাদি বিধিনিষেধের বন্ধন, কিন্তু সমর্থা-রতির একতম লক্ষ্য 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা', ইহা 'বেদবেদান্তপার', ইহা স্বতঃস্ফূর্ত। অলংকারশাস্ত্রিগণ বলেন, এই সমর্থা-রতি মণির মধ্যে 'কৌস্তুভমণি-সদৃশ'—গোবিন্দবল্লভা ব্রজবল্লবীগণের মধ্যেই এই প্রেমের দীপ্তিমান বিকাশ। আবার, তন্মধ্যে কৃষ্ণৈকপ্রাণা রাধিকাই সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি অধিরূঢ় মহাভাবের সারভূতা। তাঁহার প্রেমানুভবের তুলনা কোথায়? চণ্ডীদাস বলেন, 'এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি'। তিনি কৃষ্ণময়ী, অনুপাধি প্রেমের একক নিদর্শন। বৈষ্ণবপদাবলী এই রাধাভাবের রসোল্লাস, ইহা মধুর-রসের নিষ্কর্ষ।

রসিক বৈষ্ণব এই সর্বোত্তম মধুর-ভাবের চৌষট্টি প্রকার ভেদ লক্ষ্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ দুইটি প্রধান ভেদ। বিরহ ও মিলন, এই দুই লইয়াই প্রেমের স্ফূর্তি। ইহাদেরই পারিভাষিক নাম বিপ্রলম্ভ [বিরহ] ও সম্ভোগ [মিলন]। বৈষ্ণবপদাবলীতে সম্ভোগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা থাকিলেও, রসের চরম মাধুর্য প্রতিফলিত হইয়াছে বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের পদাবলীতে। রসিকের কাছে বিপ্রলম্ভের আস্বাদই মধুরতম ['সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহঃ']। বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারের চারিপ্রকার ভেদ—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। বিপ্রলম্ভেই অধিরূঢ় মহাভাব মোহনাখ্য অবস্থায় উন্নীত হয় এবং ইহার চরম মাধুর্য প্রকট হয় দিব্যোন্মাদ-স্তরে। পদাবলীসাহিত্যে কৃষ্ণসমর্পিতপ্রাণা শ্রীরাধার করুণ বিপ্রলম্ভের কাতরতা ও দিব্যোন্মাদ-অবস্থার আর্তির বর্ণনা যে-কোনো সহৃদয় শ্রোতার চিত্তদেশ অভিভূত করে। এইভাবে বৈষ্ণবকবিতায় সাধনরস ও কাব্যরসের অদ্বৈত সাযুজ্য ঘটিয়াছে। রাধাকৃষ্ণলীলাশ্রয়ী পদাবলীর কীর্তনগান একদিকে যেমন ভক্তিরসের উৎস, অপরদিকে তেমনই কাব্যরসের নির্ঝরিণী।

বৈষ্ণবপদকর্তা

অসংখ্য পদকর্তা বৈষ্ণবপদাবলী রচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের রাসমণ্ডল হইতে যে-'সমরস' উৎসারিত হইয়াছে, ভারতবর্ষের সর্বপ্রান্ত তাহার সঞ্জীবনধারায় অভিষিক্ত; 'গাহা সত্ত সঈ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'গীতগোবিন্দ' পর্যন্ত এই রসপ্রবাহে অভিস্নাত। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি এই লীলারস কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত' প্রেমঘন মূর্তি এই রসসাগর উন্মথিত করিয়া বাংলার পদাবলীসাহিত্যকে দিব্যপ্রেমবিলসিত করিয়া তুলিয়াছে। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসাদির মহাজনপদাবলী কান্তকান্তাপ্রেমের আশ্চর্যসুন্দর রূপায়ণে কাব্যরসিক ও ভক্তজনের পরম আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। অগণিত বৈষ্ণবমহাজনদের মধ্যে আমরা এখানে কয়েকজন কবির উল্লেখ মাত্র করিতেছি।

প্রথমে বিদ্যাপতি। মিথিলায় তাঁহার জন্ম। তিনি স্মার্ত, পণ্ডিত এবং প্রথমশ্রেণীর একজন কবি। তাঁহার লেখা অপূর্ব রাধাকৃষ্ণলীলাসংগীত যুগোত্তীর্ণ কাব্যের উজ্জ্বলতম মর্যাদা লাভ করিয়াছে। মৈথিল কবি হইলেও বাংলার বৈষ্ণবকাব্যজগতে বিদ্যাপতির প্রভাব অপরিসীম। মহাপ্রভু তাঁহার 'কী কহব রে সখি আনন্দ ওর' প্রভৃতি পদ সাগ্রহে আস্বাদন করিতেন। পরবর্তী বাঙালী বৈষ্ণবপদকর্তাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করিয়াছেন। এমন কি, কেহ কেহ 'বিদ্যাপতি' উপাধি পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাপতি শুধু কবি কহেন, তাঁহার পাণ্ডিত্যও অশেষ। তিনি যে অলংকারশাস্ত্রে পারদর্শী, ছন্দশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন এবং শব্দশাস্ত্রে অতিশয় নিপুণ, ইহার স্বাক্ষর তাঁহার কবিতায় সুস্পষ্ট। বিদ্যাপতির মণ্ডনকলানৈপুণ্য সর্বজনপরিজ্ঞাত। তাঁহার রচিত পদাবলীতে অধিকাংশ স্থলে রাধাপ্রেম 'সাধারণী'-রতির আকারে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। এখানে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণ করা যাইতে পারে : 'বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গি, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাপল্য'—উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। সম্ভোগই হউক, আর বিপ্রলম্ভই হউক, বিদ্যাপতির প্রেমচিত্রণে দেহকেন্দ্রিকতা লক্ষণীয়। মনে হয়, বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে অথবা প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রে শৃঙ্গারের যে-সব লক্ষণ সুনির্দিষ্ট আছে, বিদ্যাপতি নিজের রচনায় তাহা মানিয়া চলিয়াছেন। কবি অলংকারশাস্ত্রের মুখাপেক্ষী বলিয়া তাঁহার বেশির ভাগ পদে 'অনুপাধি' প্রেম যেন উপাধিবিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতির চিত্রিত রাধিকায় দেহচাঞ্চল্যেরই প্রাধান্য।

বিদ্যাপতি

অবশ্য বিরহ-পর্যায়ের পদাবলীতে এই দেহকামনার ঊর্ধ্বায়ন পরিলক্ষিত হয়। বিরহ-অধ্যায়ের রাধিকা 'বিপথে পড়ল যৈছে মালতিক মালা', তখন তাঁহার মুখে আত্মবিলোপী প্রেমের বাণী—'পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল করমে'; তখন তিনি একেবারে কৃষ্ণময়ী—'জীবক জীবন হাম ঐছে জানি'। কিন্তু প্রেমের এহেন গভীরতার চিত্রণ, নিগূঢ় হৃদয়ভাবের কথা বিদ্যাপতিতে বিরল। তবে প্রেমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈচিত্র্য-উদ্‌ঘাটনে তাঁহার তুলনা হয় না। রাধিকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায়, রাধার রূপশ্রীবর্ণনায়, সম্ভোগকৌশলশিক্ষার বর্ণনায় যে-নৈপুণ্য তিনি দেখাইয়াছেন তাহা অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অসাধারণ তাঁহার বাগ্‌বিভূতি। নিরভিমান ভক্তির বর্ণনাতেও সে-বিভূতির চিহ্ন পরিস্ফুট। কবির দীনতার মধ্যেও প্রকাশের ঐশ্বর্য, কাতর প্রার্থনাও সালংকার।

তারপর চণ্ডীদাসের কথা। চণ্ডীদাস সম্পর্কে যে-সমস্যা আছে তাহার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, প্রচলিত পদাবলীর চণ্ডীদাসকেই আমরা এ আলোচনার

বিষয়ীভূত করিতেছি। তিনি প্রেমের কবি, সেই প্রেম—যে-প্রেম ভালবাসিয়াই তৃপ্ত, যাহা প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে না, যাহা একান্তভাবে তন্ময় ও সতত ব্যাকুল। এ প্রেম হৃদয়ের তলদেশ হইতে উৎসারিত, ইহার আবেদনও হৃদয়ের কাছে। চণ্ডীদাসের রাধাপ্রেম মর্মস্পর্শী, দুঃখের কষ্টিপাথরে এ প্রেম কষিত হইয়াছে। তাই এই প্রেমসংগীতের প্রাণকেন্দ্রে অশ্রুসিক্ত বিপ্রলম্ভের সুর। পূর্বরাগ হইতেই দুঃখানুভবের শুরু—'রাধার কী হইল অন্তরে ব্যথা'; অনুরাগে এ প্রেম আরও বেদনাময়, দূর প্রবাসে ইহার বুকফাটা ক্রন্দন। অনুরাগময়ী শ্রীরাধিকা নিজে কাঁদিয়াছেন, পরকে কাঁদাইয়াছেন। চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের পদাবলীর তুলনা বিরল। প্রেম যে 'বিষামৃত', ইহা যে 'বক্রমধুর'—এ সত্যটি চণ্ডীদাসের মতো করিয়া আর কে বলিতে পারিয়াছেন? যে-'পিরীতি'তে অনন্ত দাহ ['পিরীতিপাবক পরশ করিয়া পুড়িছি এ নিশিদিন'], যাহা মরণের অধিক যন্ত্রণাদায়ক ['মরণ-অধিক হৈল কানুর পিরীতি'], যাহা 'তুষের অনল যেন'—তাহাই আবার 'এ তিন ভুবন সার' ['সকল সুখের এ তিন আখর তুলনা দিব যে কী?']। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে এই প্রেমের জয়গান, তিনি প্রেমমনস্তত্ত্বে সুনিপুণ শিল্পী। চৈতন্যদেব এই প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ, চণ্ডীদাসের কল্পিত রাধা শ্রীচৈতন্যে জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

চণ্ডীদাস

চৈতন্যপরবর্তী যুগে চণ্ডীদাসের ভাবানুসরণে পদরচনা করিয়াছেন কবি জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাসও ভাবের কবি এবং চণ্ডীদাসের সুরের সহিত তাঁহার সুর একতানে বাঁধা। পার্থক্য এই যে, চণ্ডীদাস নিজ জীবন হইতে প্রেমানুভূতি লাভ করিয়াছেন। জ্ঞানদাস তাহা লাভ করিয়াছেন চৈতন্যজীবনী হইতে। জ্ঞানদাসের রাধা চৈতন্যচরিতানুসারী, তাই প্রেমের নিবিড়তায় সেই মূর্তির মহিমাও কম নয়। চণ্ডীদাসের প্রেমগীতি সম্পর্কে যেমন বলা চলে, 'আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার'—জ্ঞানদাস সম্পর্কে সর্বাংশে এই উক্তি করা সম্ভব নয়। জ্ঞানদাসের পদাবলীর মর্মকেন্দ্রে তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়, প্রকাশে সংযত অলংকারপ্রয়োগের নিপুণতা বর্তমান। জ্ঞানদাসের শ্রেষ্ঠ পদগুলিতে ধ্বন্যাত্মক শব্দের ঝংকার ভাবের ব্যঞ্জনা-সৃষ্টিতে কম সহায়তা করেনি। রূপানুরাগ-বর্ণনায় জ্ঞানদাসের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। রিমিঝিমি বর্ষণমুখর রজনীতে শ্রীরাধার স্বপ্ননিকুঞ্জে রূপময় কৃষ্ণের আবির্ভাবদৃশ্যটি অতি সুন্দর, পরিবেশরচনার নৈপুণ্যও অসাধারণ, যেমন—'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন, রিমিঝিমি শবদে বরিষে'। চণ্ডীদাসের অনেক পদ জ্ঞানদাসের পদের সহিত মিলিয়া গিয়াছে।

জ্ঞানদাস

চৈতন্যোত্তর যুগের আর-একজন প্রখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দদাস। তিনি মৈথিলকবি বিদ্যাপতির উত্তরসাধক। গোবিন্দদাসের পদরচনায় বিদ্যাপতির প্রভাব তো আছেই, কোথাও আবার তিনি বিদ্যাপতির অসম্পূর্ণ পদ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তথাপি কবি গোবিন্দদাসের মৌলিকতা অনস্বীকার্য। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির মতোই কৃতি শিল্পী, উপরন্তু তিনি ভক্ত। চৈতন্যদেবের প্রেমের সাক্ষাৎ স্পর্শ না পাইলেও তিনি প্রেমরত্নে ধনী, তাঁহার পদাবলী প্রেমভক্তির স্পর্শে সমুজ্জল। কথিত আছে, প্রথমবয়সে গোবিন্দদাস ছিলেন শাক্ত। গোবিন্দদাসের পদে শাক্তের দার্ঢ্য, রাধিকায় যোগীসুলভ কঠিন তপশ্চর্যার নিদর্শন রহিয়াছে। অভিসারের পদরচনায় গোবিন্দদাস নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার তিমিরাভিসারের পদে, রসসম্ভোগের ব্যাকুলতায় শ্রীরাধার একনিষ্ঠ সর্বত্যাগী প্রেমের দৃঢ়তা চমৎকার ফুটিয়াছে। ভক্ত হইলেও গোবিন্দদাস সচেতন শিল্পী।

গোবিন্দদাস

এই চারিজন বিশিষ্ট কবি ছাড়া আরো অনেক পদকর্তা পদ রচনা করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণবকাব্যের পরিধি বহুবিস্তৃত, তাহার মাধুর্যও অশেষ। এই রত্নাকরের উপরিভাগের লহরী গণনা করা দুঃসাধ্য, লোকচক্ষুর অন্তরালে যাহা আছে, তাহা পরিমাপ করিবে কে ?*

বাংলা সমালোচনাসাহিত্য

[**রচনার সংকেতসূত্র** ঃ প্রারম্ভিক ভূমিকা—উৎস—ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব—বিদ্যাসাগর-রঙ্গলাল—রাজেন্দ্রলাল-কালীপ্রসন্ন-রাজনারায়ণ—মধুসূদনের পত্রাবলী—বঙ্কিমচন্দ্র—বঙ্কিমের সমালোচনা-পদ্ধতিপ্রসঙ্গে—রমেশচন্দ্র-রামগতি-হেমচন্দ্র—চন্দ্রনাথ বসু—এ যুগের আরো কয়েকজন সমালোচক—বঙ্কিমপ্রভাবিত সমালোচনা—রবীন্দ্রনাথ—শিবনাথ শাস্ত্রী-হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—রামেন্দ্রসুন্দর ও দ্বিজেন্দ্রলাল—এ পর্বের অপ্রধান সমালোচকগণ—অবনীন্দ্রনাথ-বলেন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী—আধুনিক বাংলা সমালোচনা—মার্ক্সবাদী মত]

বাংলা সমালোচনাসাহিত্যের সৃষ্টি উনিশ শতকে। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এদেশে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের—রসবাদ-ধ্বনিবাদের—বহুল প্রচার থাকলেও মধ্যযুগের বাংলাদেশে এর কোনো বিশিষ্ট রূপের

* অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী-রচিত।

পরিচয় মেলে না। তবে রূপসনাতনের সংস্কৃত-গ্রন্থাবলীতে এবং জীবগোস্বামীর রচনায় বৈষ্ণবদর্শন ও বৈষ্ণবসাধনার পরিপ্রেক্ষিতে রসবাদের নবতর ব্যাখ্যাই সেকালের একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। কিন্তু বাংলা সমালোচনাসাহিত্যের জন্ম এ উৎস থেকে নয়। বাংলা সমালোচনা আধুনিক যুগের সামগ্রী, উনিশ শতকেই এর আত্মপ্রকাশ। ইংরেজি সাহিত্য ও ইংরেজি সমালোচনার সঙ্গে এর সংযোগ প্রত্যক্ষ এবং নিগূঢ়। এদিক দিয়ে বাংলাভাষার সৌভাগ্য এই যে, এ যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার কাব্যিক মূল্যবিচারের উত্তমপ্রয়াস দেখা গিয়েছিল। বাংলা ভাষায় সত্যকার সমালোচনার উদ্ভব মধুসূদনের কাব্য-নাটক অবলম্বন করে 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ', 'রহস্যসন্দর্ভ', 'মিত্রপ্রকাশ', 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের পাতায়। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আরম্ভেরও আরম্ভ আছে। এরও পূর্ববর্তী যে-বহুতর প্রচেষ্টা বাংলা সমালোচনার জন্ম সম্ভাবিত করেছে তার কথঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

প্রারম্ভিক ভূমিকা

'সমাচারদর্পণ' প্রভৃতি পত্রিকায় ১৮২৪-২৫ সাল থেকেই পুস্তকসমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। অবশ্য এসব গ্রন্থসমালোচনাকে ঠিক সমালোচনা আখ্যা দেওয়া চলে না। এগুলি সংবাদের স্তর অতিক্রম করেনি; যেমন—এই পুস্তক অমুক অমুক স্থান হইতে প্রকাশিত। ইহা পাঠে মূর্খও সভাসদ্ হইতে পারিবেক, ইত্যাদি। এ সময় ১৮৩০ সালে 'লিটারারি গেজেট' নামক ইংরেজি পত্রিকায় কাশীপ্রসাদ ঘোষ বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরেজিতে এক পত্র লেখেন। 'সমাচারদর্পণ'-এর একটি সংখ্যায় সম্পাদকের মন্তব্যসহ পত্রটির অনুবাদ এ বছরই প্রকাশিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থগুলির একটি সংবাদাত্মক তালিকা ছাড়াও এতে রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ এবং ভারতচন্দ্র সম্পর্কে যে-সংক্ষিপ্ত মন্তব্য ছিল তাতে যথার্থ সমালোচনার পূর্বাভাস মেলে। কৃত্তিবাসকে শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় কবি বলে আখ্যাত করা এবং ভারতচন্দ্রের রচনাভঙ্গির প্রশংসা ও রুচির নিন্দা বহু পরবর্তী সমালোচকদের সিদ্ধান্তের প্রায় সমতুল্য।

উৎস

এসময়ে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিতদের কাছে বাঙালী ছাত্রদের ইংরেজি-শিক্ষা চলছিল হিন্দুকলেজে। রিচার্ডসন সাহেব ইংরেজি সাহিত্যে প্রখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, এবং সেক্সপীয়রের অধ্যাপনা যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিল সমসাময়িক বাংলাদেশে। এই শিক্ষা বাংলা সাহিত্যসমালোচনার ইতিহাসে বিশেষ মূল্যবান। কারণ, আমাদের সমালোচনাসাহিত্য ইংরেজিধারার

অনুসরণে—ওই ধারাকে আত্মসাৎ করেই—বর্ধিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংস্কৃত-রস-শাস্ত্রের নির্দেশ খুব বেশি প্রাধান্য লাভ করেনি। সম্প্রতি অবশ্য এ ধারার কিছুটা পুনরুজ্জীবন দেখা যাচ্ছে। ১৮৪৪ সালে 'বেঙল্ রিভিয়্' প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিত বাঙালী তরুণেরা [কচিৎ ইংরেজরাও] বাংলা সাহিত্য-বিষয়ে ইংরেজিতে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন।

ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব

১৮৫১ সালে স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বীটন সোসাইটিতে 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' নামে একটি বক্তৃতা দেন। বাংলাভাষায় এই রচনাই সর্বপ্রথম সাহিত্যসমালোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। বিদ্যাসাগর যেমন একদিকে প্রভূত পাণ্ডিত্যসহকারে, গবেষকের নিষ্ঠা নিয়ে, 'মেঘদূত'-'কুমারসম্ভব'-এর পাঠ নির্ণয় করেন, তেমনি অপরদিকে সাহিত্যিক-মূল্যমান-নিরূপণের যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বিদ্যাসাগর-মশায়ের অধিকতর প্রবণতা ইংরেজি সমালোচনার দৃষ্টিতে সংস্কৃত-সাহিত্যের মূল্যবিচারের দিকে। দৃশ্যকাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে বর্ণিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বহু বিভাগকে অস্বীকার করেছেন। মাঘের অতিভাষণ, নৈষধচরিতের সর্বাত্মক গুণহীনতা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য রসবত্তার নির্ভুল পরিচয় বহন করে। ১৮৫২ সালে হরচন্দ্র ঘোষ 'বেঙল্ রিভিয়্' পত্রিকায় ইংরেজিতে এক প্রবন্ধ লেখেন। বাংলা কবিতা সম্পর্কিত এই প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে অশ্লীল ও অপাঠ্য বলে প্রমাণ করতে চান। এর উত্তরে ১৮৫২ সালে বীটন সোসাইটিতে সুকবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরচিত এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধে খ্যাতনামা দুএকজন ইংরেজ কবির সঙ্গে ভারতচন্দ্রের তুলনা করে পূর্বোক্ত অপবাদ খণ্ডন করতে চেষ্টা করেন। এই বছরেই বাংলাভাষায় প্রথম মৌলিক নাটক রচিত হয়। 'ভদ্রার্জুন' নামক পৌরাণিক নাটকের রচয়িতা তারাচরণ শিকদার ভূমিকায় ইংরেজি ও সংস্কৃত-নাটকের এক তুলনামূলক আলোচনা করেন, এবং ইংরেজি নাটকের কলা-কৌশলই যে অনুসরণীয়, এই মত প্রকাশ করেন। তবে স্বীকার করতে হয়, তাঁর উক্ত আলোচনায় ইংরেজি ও সংস্কৃত-নাটকের বহিরঙ্গ-পরিক্রমাই ঘটেছে, নাট্য-সাহিত্যের রসান্তঃপুরে পদচারণা সম্ভব হয়নি। 'কীর্তিবিলাস'-নাটকের রচয়িতা যোগেন্দ্র গুপ্ত ইংরেজি নাটকের ট্র্যাজেডির সৌন্দর্য ও আস্বাদ্যমানতা নিয়ে আলোচনা করেন এবং বাংলা নাটকে এই ধারা অনুসরণীয় বলে মন্তব্য করেন।

বিদ্যাসাগর-রঙ্গলাল

১৮৫৯ সাল থেকে শ্রুতকীর্তি মধুসূদনের কাব্যগুলি প্রকাশিত হতে থাকে,

এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সমালোচনারও যথার্থ ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাঁর কাব্য-নাট্য-গুলো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যে-সমালোচনাগুলো প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'শর্মিষ্ঠা' সমালোচনা [১৮৬০] ও 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' সমালোচনা [১৮৬০]; কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মেঘনাধবধকাব্য' সমালোচনা [১৮৬১] এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' সমালোচনা [১৮৬০]। প্রথমোক্ত তিনটি 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-তে এবং শেষোক্তটি 'সোমপ্রকাশ'-এ ছাপা হয়েছিল। 'রহস্যসন্দর্ভ', 'মিত্রপ্রকাশ' ইত্যাদি তৎকালীন পত্রিকায়ও মধুসূদনের কাব্যাদির সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। এ সময়ে সাহিত্যসমালোচক-হিসেবে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের মতো রাজনারায়ণ বসুও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। মধুসূদন এক চিঠিতে তাঁকে য়ুরোপের বিখ্যাত সমালোচকদের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এই পর্বের সমালো-চনার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তিনটি—[এক] ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় সৌন্দর্যবিচারের চেষ্টা; [দুই] সামাজিক, ধর্মীয় এবং নৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যসত্যের অনুসন্ধান; [তিন] সংস্কৃতানুগ অলংকারাদি টুক্‌রো-টুক্‌রোভাবে খুঁজে বার করার প্রয়াস। তবে ধ্বনিবাদ বা রসবাদের প্রয়োগচেষ্টা বড়ো একটা দেখা যায় না। বলতে হয়, ব্যক্তিগত ভালোলাগা-মন্দলাগা-প্রকাশেই এদের সার্থকতার সীমা।

রাজেন্দ্রলাল, কালীপ্রসন্ন, রাজনারায়ণ

মধুসূদন বাংলা কিংবা ইংরেজিতে কোনো সমালোচনা লেখেননি। তবে তাঁর লেখা চিঠিগুলোতে এখানে-সেখানে নাটক কাব্য এবং দেশী-বিদেশী সাহিত্যকার-দের সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত মন্তব্য খুঁজে পাওয়া যায়। সাহিত্যসৌন্দর্য সম্পর্কে মধুসূদনের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল, বিদেশী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদের সঙ্গেও প্রত্যক্ষভাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। তবে এই ভেবে দুঃখ হয় যে, সুরসিক এবং সুপণ্ডিত হয়েও সমালোচনাসাহিত্যের ক্ষেত্রে কদাপি তিনি পদক্ষেপ করেননি। যদি করতেন, তাহলে বাংলা সমালোচনার অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ-হিসেবে যে তিনি স্বীকৃত হতেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মধুসূদনের পত্রাবলী

মনীষী বঙ্কিমের হাতে বাংলা সমালোচনাসাহিত্য একটা উজ্জ্বল বিশিষ্ট মূর্তি পরিগ্রহ করে, উচ্চতর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। 'বঙ্গদর্শন'-পত্রিকার প্রকাশ থেকেই সমালোচনার এই গুণগত পরিবর্তন লক্ষিত হতে থাকে। ১৮৭১ সালে তাঁর লেখা 'বেঙলি লিটারেচার' প্রবন্ধে তারই পূর্বাভাস। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন

ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ সমসাময়িক সাহিত্যস্রষ্টার প্রতিভার বিচারে প্রগাঢ় সাহিত্যবোধ ও সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় এবং সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনায় আপন রসদৃষ্টির গভীরতার নিশ্চিত প্রমাণ রেখে গেছেন। কেবল গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের বিচারকুশলতায় নয়, সাহিত্যসমালোচনার মূলসূত্রনির্ণয়েও তাঁর কৃতিত্ব মৌলিক এবং উচ্চপ্রশংসার যোগ্য। গীতিকাব্য সম্পর্কিত আলোচনায় নাটক ও উপন্যাসের সঙ্গে লিরিক কবিতার পার্থক্য-আবিষ্কারে তিনি যা বলেছেন, তা কেবল অ-পূর্বই নয়—অদ্যাপি প্রায় অনুত্তীর্ণ। তাঁর সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'উত্তরচরিত', 'দ্রৌপদী', [প্রথম প্রস্তাব], 'শকুন্তলা', 'ডেসডিমোনা ও মিরাণ্ডা', 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমের সমালোচনার নীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রধান সূত্র আলোচনার যোগ্য। [এক] পদ্ধতিহিসেবে বঙ্কিম Analytic বা বিশ্লেষণ-প্রণালীর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে তাজমহলের এক-এক টুকরো পাথরে সমাধিসৌধটির সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। সমগ্রের বোধেই এই সৌন্দর্য-উপলব্ধি সম্ভব। ঠিক তেমনি, এখানে একটি উপমা, ওখানে একটি অনুপ্রাস খুঁজে বের করাই সমালোচকের কাজ নয়। সমগ্রতার মধ্যেই কবির সৌন্দর্যসৃষ্টিকে আস্বাদন করতে হবে। এই Synthetic বা সাজ্যটিক পদ্ধতি বাংলা সমালোচনাসাহিত্যে এক প্রধান উত্তরাধিকার। [দুই] সাহিত্যের স্বরূপ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বঙ্কিমের মত এই যে, স্বভাবানুকারিতা এবং সৃষ্টিধর্মের সংযোগেই সাহিত্যের প্রাণ। প্রথমটির অভাবে সাহিত্য অলীক বস্তু হয়ে ওঠে ; দ্বিতীয়টির অভাবে প্রাণহীন, রসহীন হয়ে পড়ে। [তিন] সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বঙ্কিমের অভিমত সবিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। কারণ, সমসাময়িক বাংলা সমালোচনায় এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তুমুল হয়ে উঠেছিল। একদল সমালোচক সামাজিক নীতি ও সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষাই সাহিত্যের একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন। অন্যদল সৌন্দর্যসৃষ্টিকেই সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছেন। সৌন্দর্যসৃষ্টিই যে সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য, বঙ্কিম এ সম্বন্ধে দ্বিধাহীন ছিলেন। কিন্তু নীতিশিক্ষার প্রশ্নটিকে তিনি একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি। তবে নীতিশিক্ষাদান সাহিত্যের গৌণ উদ্দেশ্য, এবং এই উদ্দেশ্য তার প্রধান কর্তব্যের দ্বারাই ধীরে ও ক্রমে ক্রমে সাধিত হবে। পাঠকদের উপদেশ দিয়ে নীতিজ্ঞ করে তোলা তার উদ্দেশ্য নয়, সৌন্দর্য-

বঙ্কিমের সমালোচনাপদ্ধতি-প্রসঙ্গে

সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নীতি ও ধর্মবোধের প্রতি আসক্তি জন্মানোই তার প্রকৃত লক্ষ্য। সাহিত্যদর্পণকারের 'কান্তাসম্মত উপদেশ'-এর সঙ্গে এই মতের সামীপ্য লক্ষণীয়। [চার] সংস্কৃত-রসবাদ সম্বন্ধে বঙ্কিমের মন্তব্য প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে। রসবাদের সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে তিনি এই পদ্ধতির সাহিত্য-বিচার-পরিহারের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। ইংরেজি সমালোচনার প্রতি বঙ্কিমের অনুরাগ এই মন্তব্য থেকেও অনেকটা প্রমাণিত হবে।

এবার আমরা বঙ্কিম-সমসাময়িক কয়েকজন প্রধান সমালোচকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব। রমেশচন্দ্র দত্ত ইংরেজিতে 'Literature of Bengal' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এঁর রচিত সমালোচনাত্মক কতকগুলি বাংলা প্রবন্ধ সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে একদিকে যেমন সংস্কৃত কবি কালিদাস ও ভবভূতির আলোচনা আছে, অন্যদিকে আবার মধ্যযুগের বাঙালী কবি মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের তুলনামূলক আলোচনা আছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের প্রভাব সম্বন্ধে তিনি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। সমালোচকহিসেবে তেমন কোনো মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে না পারলেও ইউরোপীয় সাহিত্যের সুবিস্তৃত জ্ঞান এবং ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের গভীর অধ্যয়ন তিনি মোটামুটি কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' ১৮৭২-৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যের আনুপূর্বিক ইতিহাস-রচনার চেষ্টাহিসেবে এর নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। লেখকের গবেষণাপ্রবণতার পরিচয় এই গ্রন্থে সুপ্রচুর। তবে সংস্কৃত-রসশাস্ত্রের অত্যধিক প্রভাবে সমসাময়িক লেখকের রচনাবলীর গুণাগুণবিচারে বিভ্রাট ঘটেছে। 'মেঘনাদবধ'-কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকাহিসেবে হেমচন্দ্রের লিখিত সমালোচনাটি একদিক দিয়ে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। মধুসূদনের প্রবর্তিত ছন্দের বিচারে অমিত্রাক্ষর ছন্দের যা প্রধান গুণ অর্থাৎ যতিপাতের স্বাধীনতা, তাকেই তিনি দোষ বলে উল্লেখ করেছেন। এই ত্রুটি সংশোধন করতে গিয়ে তাঁর কাব্যে ছন্দের কী বিপর্যয় ঘটেছিল, বাংলা-সাহিত্যের পাঠকমাত্রেরই তা অবগত।

রমেশচন্দ্র, রামগতি, হেমচন্দ্র

বঙ্কিমপ্রভাবিত সমালোচকদের মধ্যে চন্দ্রনাথ বসু যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। এঁর 'শকুন্তলাতত্ত্ব' এবং 'বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের প্রকৃতি' নামে গ্রন্থদুইটি উল্লেখনীয়। সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় এঁর সমালোচনামূলক আরো কতকগুলি প্রবন্ধ ছড়িয়ে

চন্দ্রনাথ বসু

আছে। সাহিত্যসমালোচনায় তিনি সামাজিক নীতিশিক্ষার প্রয়োজনের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জাতীয় জীবনে কোনোরূপ অস্বাস্থ্যকর প্রভাব বিস্তার না করাই সাহিত্যের প্রধান কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন। নীতিগত এই গোঁড়ামির কথা ছেড়ে দিলে চন্দ্রনাথের যে সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টি ছিল তার প্রমাণ আছে।

এ যুগের আরো কয়েকজন সমালোচক

এখানে সমকালীন আরো কয়েকজন সমালোচকের কিছুকিছু প্রবন্ধের উল্লেখ করা প্রয়োজন ; যেমন—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাপতি', সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'যাত্রা-সমালোচনা', যোগীন্দ্রনাথ বিদ্যা-ভূষণের 'বিষবৃক্ষ,' 'পলাশীর যুদ্ধ', 'ভারতউদ্ধার', এবং রজনীকান্ত গুপ্তের 'প্রতিভা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা। এই সময়ের আর-একজন সমালোচক রামদাস সেন কিছুকিছু সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখে খ্যাতির অধিকারী হন। তাঁর সমালোচনা-প্রবন্ধগুলির মধ্যে কালিদাস, বাণভট্ট, হেমচন্দ্র সম্পর্কিত আলোচনা-গুলির নাম করা যেতে পারে।

বঙ্কিমপ্রভাবিত সমালোচনা

সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালের সমালোচকদের উপর বঙ্কিমের প্রভাব যে অনেকখানি তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বঙ্কিমের মতো সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ এঁদের অনেকেরই ছিল না। এ সময়ের সমালোচনা প্রধানত সংস্কৃত-কাব্যাদির মূল্যবিচারের চেষ্টা করেছে এবং বঙ্কিমের গ্রন্থাবলীকে আলোচনার অবলম্বনহিসেবে গ্রহণ করেছে। নীতি-হিসেবে সংস্কৃত-রসবাদের স্থূল বোধই অধিকাংশের মধ্যে কার্যকরী। তবে নাটক-উপন্যাস প্রভৃতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ-নির্ণয়ে ইংরেজি সমালোচনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ সময়ের সমালোচকেরা যে-প্রশ্নটি নিয়ে সর্বাধিক মাথা ঘামিয়েছেন তা হল সাহিত্য ও নীতির প্রশ্ন। অল্প কয়েকজনের কথা বাদ দিলে অধিকাংশ সমালোচকই নীতিশিক্ষাকেই সৌন্দর্যসৃষ্টির চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।

এর পরে আসে রবীন্দ্রনাথকৃত সমালোচনাসাহিত্যের কথা। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ' এই তিনটি গ্রন্থে সমালোচনার মূলনীতি ও কর্তব্য এবং সাহিত্যসৌন্দর্যের বিচিত্র দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে ভারতের সংস্কৃত কাব্যাদির সৌন্দর্য আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে বাংলার উনিশ শতকের কয়েকজন কবি-

সাহিত্যিকই আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হয়েছে। 'লোকসাহিত্যে' রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা যুগপৎ গবেষক এবং বিদগ্ধ রসিকের। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাপদ্ধতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল তার উজ্জ্বল সৃজনধর্ম। তিনি Synthetic তো বটেনই, মাঝে মাঝে creative-ও হয়ে ওঠেন। সমালোচ্য কাব্যকে গ্রহণ করে তার স্বরূপসৌন্দর্য-ব্যাখ্যানো সীমাবদ্ধ না থেকে, আপনার ভালোলাগা-মন্দলাগা আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনার বর্ণে তাকে অনুরঞ্জিত করে এক নবতর সৃষ্টির প্রতিই তাঁর প্রবণতা অধিক। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'মেঘদূত' এবং 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধ-দুটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মহাকবি কালিদাসের সৌন্দর্যসম্ভোগের কাব্য 'মেঘদূত' রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় চিরন্তন সৌন্দর্যবিরহের বাণীমূর্তি ধারণ করেছে। ঊর্মিলা, অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, পত্রলেখার ভূমিকা যে কাব্যগঠনের অনুরোধেই একান্ত সংকুচিত একথা স্বীকার করেও, 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে ইংগিতটুকুমাত্র গ্রহণ করে নতুন যুগের হৃদয়সংবেদনযুক্ত পরিপূর্ণ নারীমূর্তি-হিসেবে তাদের সৃষ্টি করে তুলেছেন। রবীন্দ্রসমালোচনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সমালোচ্য কাব্যের অন্তরলোকে প্রবেশ করে তার একত্বকে অনুধাবনের চেষ্টা করা। বাইরে থেকে অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত সংজ্ঞাকেই ধ্রুববচন বলে মনে না করে কাব্যের অন্তরসৌন্দর্যকে আবিষ্কার করাই রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য। তিনি 'রাজসিংহ', 'বিহারীলাল' প্রভৃতি প্রবন্ধে স্পষ্টই বলেছেন যে, পূর্ব থেকে কোনোকিছু প্রত্যাশা করে সেই প্রত্যাশার সঙ্গে কাব্যকে মিলিয়ে দেখার কাজটা সমালোচকের নয়।

রবীন্দ্রনাথ

মহাকালকে তিনি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিচারক বলে মনে করেন। কালের বিচারে যে-সাহিত্য উত্তীর্ণ তাকে বিচার করার চেষ্টা না করে পূজা করাই সমা-লোচকের কর্তব্য—এ-ই হোল রবীন্দ্রনাথের অভিমত। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের চিরন্তনত্বে বিশ্বাসী। যে-সাহিত্য সাময়িক দাবী মেটায়, সাহিত্যহিসেবে তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন। তাঁর মতে "অপ্রয়োজনের আনন্দসৃষ্টি'—'আলস্যের সহস্র সঞ্চয়'ই হল সাহিত্য। সাহিত্য যে কোনোদিন স্কুলমাস্টারী বা নীতিশিক্ষার দায়িত্ব নেয় নি, রবীন্দ্রনাথ একথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। জীববৃত্তির ঊর্ধ্বে যে মানবসত্তা, রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যের আবেদন সেখানেই। বিশ্বব্যাপী অনাদি অনন্ত এবং অশ্রুত এক সংগীতস্রোতে যাবতীয় পার্থিব ঘটনা ও রূপজগৎ ভাসমান। তারা 'ক্ষণিকে প্রকাশ', আবার 'ক্ষণিকে মিলায়'। কবি কানে শুনবেন রূপজগতের অন্তরালের সেই অশ্রুত সঙ্গীতধারা, তাকেই ফুটিয়ে তুলবেন আপনার ভাষায় ও ছন্দে। শ্রেণীচেতনার সঙ্গে

যুক্ত এই বিশ্বানুভূতিই রবীন্দ্রসমালোচনার মৌল দর্শন। তাঁর সৌন্দর্যদর্শনও এই বোধের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্যের ফলেই সাহিত্যের স্বরূপনির্ণয় করতে গিয়ে তিনি প্রায়ই গীতিকাব্যোচিত একটি সংজ্ঞায় গিয়ে পৌঁছেছেন। 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি কবিচিত্তের রঙ্, ভালোলাগা, মন্দলাগা, আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথাই মুখ্যত তুলে ধরেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সহৃদয়তা ও সাহিত্যবোধের গভীরতা Absolute vision বা নিরপেক্ষ-নিরাসক্ত দৃষ্টির সৃষ্টি-সৌন্দর্যকে অস্বীকার করতে পারে নি। তাই 'সাহিত্যের পথে'র কোনো কোনো প্রবন্ধে 'নিরাসক্ত মনই শ্রেষ্ঠ মন' বলে স্বীকারও করেছেন।

'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-প্রবন্ধে তিনি ইতিহাস-রসের যে নূতন চেতনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তথ্য ও সত্যের আলোচনায় শুষ্ক তথ্যোত্তীর্ণ কাব্যসত্যের যে-বোধকে পাঠকচিত্তে নিঃসংশয়িত প্রত্যয়ে পরিণত করেছেন, তা সমালোচনার পরিধি প্রসারিত করেছে। মহৎ সাহিত্যে সাহিত্যিকের জীবনজিজ্ঞাসার প্রকাশ খুঁজেছেন রবীন্দ্রনাথ। উচ্চতর সাহিত্য কেবল ভাব-ভাষার নিপুণ-বন্ধনজাত সৌন্দর্যসৃষ্টিই করে না, আরও গভীরে প্রবিষ্ট হয়ে জীবনের সত্যকে আবিষ্কার করে, ব্যাখ্যা করে, প্রকাশ করে—কিন্তু প্রচার করে না। 'শকুন্তলা', 'শকুন্তলা ও কুমারসম্ভব', 'বিহারীলাল' প্রভৃতি প্রবন্ধে কাব্যসৌন্দর্যবিচারকে জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে সার্থকভাবে যুক্ত করেছেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসমালোচনার পদ্ধতি হয়তো সর্বত্র অনুসরণযোগ্য নয়। কিন্তু সুতীব্র সাহিত্যিক-স্পর্শকাতরতা, সৌন্দর্যউপলব্ধির অন্তরতম প্রদেশে সহজে অবতরণের আশ্চর্য ক্ষমতা, সহজাত রসবোধ এবং বহুঅধ্যয়নজাত অনুশীলনের সম্মেলনে তিনি কাব্য বা কবির আলোচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভুল এবং সুগভীর। বাংলা সমালোচনায় তাই রবীন্দ্রনাথই প্রধানতম পুরুষ।

এবার রবীন্দ্রযুগের অপরাপর সমালোচকদের কথা।

এঁদের মধ্যে কয়েকজন বঙ্কিমপ্রভাবের যুগেই সমালোচনার কাজে ব্রতী হন, তবে এঁদের অধিকাংশ প্রবন্ধই রবীন্দ্রযুগে রচিত। শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধাবলীর মধ্যে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ আছে গুটি দুয়েক। 'ঋষিত্ব ও কবিত্ব' এবং 'কাব্য ও কবিত্ব' এই দুটি প্রবন্ধে তিনি কবিত্বের স্বরূপনির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। সাহিত্যের মূলনীতি নিয়ে যে-সামান্য কয়েকজন সমালোচক সে-যুগে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন, শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাই তাঁর স্থানটি একটু বিশিষ্ট। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রচনার সংখ্যা এবং উৎকর্ষ—উভয় দিক থেকেই,

বাংলা সমালোচনাসাহিত্যের একজন প্রধান পুরুষ। 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' নামে তাঁর একটি গ্রন্থ আছে। কতকগুলি গ্রন্থের ভূমিকা-রচনাকালেও সমালোচনায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। তা ছাড়া, তাঁর অন্তত ৫০টি সমালোচনা-প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। সম্প্রতি সুনীতিকুমার এদের গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ গবেষক এবং বঙ্গসাহিত্যের নব-জাগরণের আন্দোলনে অন্যতম পথপ্রদর্শক। তাঁর প্রবন্ধ-গুলিতে জ্ঞান, অধ্যয়ন এবং রসবোধের এক সুখী সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কৌতূহলের বিষয়েরও অভাব ছিল না। এককথায় বলা যেতে পারে, সাহিত্যের ভোজে তিনি ছিলেন সর্বভুক। কালিদাসের কাব্যনাটকাদির ধারাবাহিক আলোচনা করতে করতে রজনীকান্ত সেনের মতো কবির কাব্যসমালোচনায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। ভারতের প্রাচীন নাট্যসূত্র থেকে আধুনিক নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পর্যন্ত সর্বত্র তাঁর দৃষ্টি সমান প্রসারিত। সংস্কৃতমতে শিক্ষিত হয়েও ইংরেজি কাব্যের রসাস্বাদনে যে তাঁর বাধা হয় নি, এ ঘটনাই সবচেয়ে বিস্ময়কর। সাহিত্যবিচারে নীতির ভূমিকাকে প্রাধান্য না দিয়ে সৌন্দর্য-আলোচনাকে অবলম্বন করায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খাঁটি সমালোচকের গৌরব দাবী করতে পারেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

এই পর্বের অন্যতম প্রধান সমালোচক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়। এঁর 'সাহিত্যমঙ্গল' নামক গ্রন্থ এবং ৩০টির অধিক সমালোচনামূলক প্রবন্ধ আছে। এঁর উপর রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সমালোচনায় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মূলত Synthetic এবং কখনো কখনো Creative-ও বটেন। বিশেষ করে নাটক, গীতিকবিতা প্রভৃতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ এবং সমালোচনার বিভিন্ন প্রণালী নিয়ে তিনি যে-সমস্ত আলোচনা করেছেন, বাংলা সমালোচনায় তার স্থান গুরুত্বপূর্ণ। সৌন্দর্যজিজ্ঞাসায় তিনি প্রধানত য়ুরোপীয় ভাবপথের পথিক। বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক প্রবন্ধের খ্যাতিমান রচয়িতা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন বাংলা-সাহিত্যের একজন প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক। সমালোচনামূলক কয়েকটি প্রবন্ধও তিনি লিখেছেন। বিশেষ করে মহাকাব্যের লক্ষণ ও সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর দার্শনিক আলোচনা আজকের দিনেও পাঠকদের ভাবিয়ে তুলবে। দার্শনিকপ্রবর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সাহিত্য-সমালোচনায়ও দার্শনিক সৌন্দর্যতত্ত্বের বোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। সে-যুগের সমালোচনায় স্বাজাত্যভিমান বহু সময়েই সমালোচকের নিরপেক্ষতাকেও

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ও দ্বিজেন্দ্রলাল

আবৃত করত; তার প্রতিনিধিত্বমূলক রচনাহিসেবে দত্তমহাশয়ের 'কালিদাস ও সেক্‌সপিয়র' নামক প্রবন্ধটির উল্লেখ করা চলে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনেকগুলি সমালোচনামূলক রচনা আছে। তার মধ্যে 'কালিদাস ও ভবভূতি' নামক গ্রন্থটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে য়ুরোপীয় নাট্যতত্ত্বের দৃষ্টিতে প্রাচীন সংস্কৃত-নাটকের নাটকত্বের বিচার করা হয়েছে। বাংলাভাষায় সংস্কৃতসাহিত্যের আলোচনা কম বিস্তৃত নয়। এই গ্রন্থটি তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

এ পর্বের অপ্রধান সমালোচকগণ

সমালোচকহিসেবে প্রাধান্য অথবা মৌলিকতার দাবী না থাকলেও মাঝারি ধরনের শক্তির অধিকারী এ পর্বের কয়েকজন লেখকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কিত আলোচনা, নিত্যকৃষ্ণ বসুর 'সাহিত্যসেবকের ডায়েরী', সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মধুসূদন, নবীনচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র সম্পর্কিত আলোচনা, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রের কয়েকটি প্রবন্ধ, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের গুটি দুয়েক প্রবন্ধ ['সারস্বত-কুঞ্জ' গ্রন্থের অন্তর্গত], শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ' [তিনটি প্রস্তাব] প্রভৃতি। সখারাম গণেশ দেউস্কর একটু বিশিষ্ট। তিনিই প্রথম মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রদেশের সাহিত্য-সম্পর্কিত প্রবন্ধ রচনা করেন, বাংলাভাষায় অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের সমালোচনার সূত্রপাত করেন।

অবনীন্দ্রনাথ-বলেন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী

রবীন্দ্র-অনুজ সমালোচকদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী বিশিষ্টতায় সমুজ্জ্বল। অবনীন্দ্রনাথের 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী' শিল্পতত্ত্ব নিয়ে লেখা বাংলাসাহিত্যের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। আলোচনাগুলি মূলত 'শিল্প'-অবলম্বিত হলেও, সৌন্দর্যবোধ-বিশ্লেষণের ব্যাপারে যে-আলোচনা তিনি করেছেন, সাহিত্যসমালোচনায় তার দানও অস্বীকার করবার মতো নয়। তিনি নিজে একজন প্রথমশ্রেণীর সৌন্দর্যস্রষ্টা। তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে এখানে মিলেছে মনন ও অধ্যয়ন। এই অতিদুর্লভ গুণের সমন্বয় তাঁকে উচ্চস্তরের সমালোচকের ক্ষমতা দিয়েছে। স্বল্পায়ু বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা-গদ্যের একজন প্রধান শিল্পী। বাংলা-সমালোচনারও তিনি একজন মুখ্য পুরুষ। তাঁর 'চিত্র ও কাব্য' নামক গ্রন্থ সমসাময়িক রসিকদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। এ ছাড়াও বহুসমালোচনা-প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন। ওইগুলি মাসিকপত্র থেকে সম্প্রতি সংকলিত ও গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। তাঁর আলোচ্য বিষয় বহুবিচিত্র ও বহুবিস্তৃত—প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যনাটকাদির বিচার থেকে শুরু করে, মধ্যযুগের বাঙালী

কবিদের আলোচনা এবং বঙ্কিমবাবুর স্বষ্ট চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ, কখনো তুলনা-মূলক সমালোচনা, কখনো সাহিত্যতত্ত্বের মূলতত্ত্ব-নির্ণয়ের চেষ্টা। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের ধ্যানধারণার দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবান্বিত হলেও তাঁর মৌলিক দানও অস্বীকার্য নয়। বিশেষ করে 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী'-প্রতিভার আলোচনায় তিনি কালিদাসের সর্বস্বীকৃত কাব্যক্ষমতার সমালোচনা করেছেন। সমগ্রের চিত্র-অঙ্কনে কবির ব্যর্থতা এবং যে-কোনো বিষয়ের চিত্ররচনায় ইন্দ্রিয়ালুতা এবং লীলাবিলাসচাপল্যের দিকে প্রবণতার কথা উল্লেখ করে তিনি যে-সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা তখনকার পক্ষে অত্যন্ত চমকপ্রদ। মধ্যযুগের বাংলাদেশের কবিদের মধ্যে মুকুন্দরামের বাস্তবতা তাঁর কাছে ধিক্কৃত হয়েছে, কিন্তু বৈষ্ণবকবিদের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ। রবীন্দ্রপ্রভাবে লিরিক-প্রবণতার আধিক্যের ফলেই মুকুন্দরাম সম্বন্ধে এই বিচারবিভ্রাট ঘটেছে। বৈষ্ণব-কবিতার বিচারে কিন্তু তিনি আশ্চর্য মুক্তমনের পরিচয় দিয়েছেন, তার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সরিয়ে রেখে কেবলমাত্র সাহিত্যসৌন্দর্যকেই আলোচনার বিষয়ীভূত করেছেন। এর জন্যে 'ভারতী'-সম্পাদিকার সঙ্গে তাঁকে প্রত্যক্ষ বিতর্কে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। রচনাভঙ্গির সৌকুমার্যের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণত রবীন্দ্রপন্থী। সমালোচনাপদ্ধতির দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর উপরে সমধিক। রবীন্দ্রনাথের মতো Creative না হলেও তাঁর প্রবণতাও Synthetic সমালোচনার দিকেই।

প্রমথ চৌধুরী এ পর্বের একজন বিশিষ্ট গদ্যলেখক। তাঁর বাচনভঙ্গির মননশীল দীপ্তি, বক্র কটাক্ষ ও তীক্ষ্ণ কৌতুক আস্বাদ্য। সাহিত্যসমালোচক-হিসেবেও তাঁর খ্যাতি সর্বজনস্বীকৃত। 'সাহিত্যে খেলা,' 'বস্তুতন্ত্রতা কী বস্তু,' 'ভারতচন্দ্র','জয়দেব' প্রভৃতি প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনার রীতি ও পদ্ধতির পরিচয় মিলবে। তাঁকে এককথায় 'রূপায়ণবাদী' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ভাবের প্রকাশ নয়, ভাবের রূপনির্মিতিই সাহিত্যিকের কর্তব্য। অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি রূপে ধরা দেবে। সাহিত্যিকের প্রখর বস্তুজ্ঞানের উপরেই এই রূপনির্মাণ নির্ভরশীল। তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে অতন্দ্র নিষ্ঠা ও সাধনা। এ-ই হল প্রথম চৌধুরীর অভিমত। কোনো কবির রূপরচনাগত ও ভাষা-প্রকাশগত নৈপুণ্য তাঁর চিত্তগত অনুভূতিরই দেহরূপ। তাই ভারতচন্দ্রও তাঁর বিচারে কেবল প্রসাধনকলার কবি নন—জীবনজিজ্ঞাসুও।

কবি শশাঙ্কমোহন সেন বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে যে-নৈপুণ্য ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা খুব কম মেলে। তাঁর লেখা 'বঙ্গবাণী' ও 'বাণীমন্দির'

দুইখানি স্মরণীয় গ্রন্থ। অতি-আধুনিক বাংলা সমালোচনায় মোহিতলালের Synthetic-Creative পদ্ধতি উনিশ শতকের বাঙালী সাহিত্যকারের সৌন্দর্যরহস্য ও জীবনতৃষ্ণা আবিষ্কারে যেমন অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে, তেমনি শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের Analytic পদ্ধতি উপন্যাসসাহিত্যের গঠন ও চরিত্রবিচারে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচনে সার্থক হয়েছে। সাম্প্রতিক বাংলা সমালোচনায় জীবনদর্শনের চেয়ে রূপায়ণপারিপাট্য, চিত্রকল্পের ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যকে প্রাধান্য দেওয়ায় বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ অনেকে প্রমথ চৌধুরী-প্রদর্শিত পথ অনুসরণে সচেষ্ট। অপরপক্ষে, মার্কস্‌বাদী সমালোচকেরা ঐতিহাসিক পদ্ধতির প্রয়োগে সাহিত্যের নবতর মূল্যায়নের পক্ষপাতী। এ কালের সমালোচনামূলক বিতর্কের অধিকাংশই মার্কস্‌বাদ বনাম মার্কস্‌বাদ-বিরোধীদের মতবাদের বিভিন্নতার সংঘাত। মার্কস্‌বাদী সমালোচনার প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত হল—[এক] আর্থনীতিক-সামাজিক-রাজনীতিক পরিবেশ কবিচিত্ত ও তাঁর দৃষ্টিকে প্রভাবিত করে। [দুই] সাহিত্য সমাজদায়িত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। প্রগতিশীল শ্রেণীর ঐতিহাসিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করাই তার প্রধানতম কর্তব্য। সৌন্দর্যসৃষ্টি রূপকলা ইত্যাদি সেই কর্তব্যের উপায়-হিসেবেই বিচার্য। [তিন] এযুগ সচেতন বাস্তবতার যুগ, কোনো কোনো দেশের পক্ষে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার' যুগ। সাহিত্যকার আপন কল্পনার অতিরেককে একপাশে সরিয়ে রেখে ইতিহাসের গতিরেখাকে দেখবেন এবং রূপায়িত করবেন। এর মধ্যে প্রথমটি সমালোচনাসাহিত্যে একটা ব্যাপক দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। অন্য প্রত্যয়-দুটি প্রচারধর্ম এবং গোঁড়ামীকেই প্রশ্রয় দিয়েছে। মার্কস্‌বাদী বাঙালী-সাহিত্যসমালোচক-হিসেবে গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ লেখক খ্যাতি অর্জন করেছেন।

আধুনিক বাংলা সমালোচনা : মার্কস্‌বাদী মত

নানা পরীক্ষার বিচিত্র-পথ-পরিক্রমায়, বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ-প্রয়াসে, বিশেষত সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্কনির্ণয়ে বাংলা সমালোচনার এক শ বছরের ইতিহাস যে-ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে তা অগৌরবের মোটেই নয়।*

---

* অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত-রচিত

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপ্ত প্রভাব—রবীন্দ্রানুসরণের ব্যর্থতা—বৈষ্ণবভাবুকতার ঐতিহ্য—রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারার সূচনা—প্রমথ চৌধুরী-মোহিতলাল-নজরুল-—যতীন্দ্রনাথ—যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদী জীবনদর্শন ও তার উৎস—যুগপরিবেশ—কবির ব্যক্তিচেতনার বিশিষ্ট ভঙ্গি—রবীন্দ্রীয় কাব্যধারার বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়া—যতীন্দ্রনাথের জড়বাদী চেতনা—যতীন্দ্রনাথের কাব্য-ভাবনার বিবর্তন—কবির সুরপরিবর্তন সম্পর্কে সমালোচকের মতামত—জীবনসায়াহ্নে কবির সৌন্দর্য-পিপাসা ও প্রেমতৃষ্ণা—উপসংহার]

॥ এক ॥

প্রারম্ভিক ভূমিকা

যতীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য 'মরীচিকা'র প্রথম দিক্‌কার কবিতাগুলো ১৩১৭ সালে লেখা। বিশ শতকের প্রথম দশকে যতীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের যে-অভিনব জিজ্ঞাসা পাঠকদের চকিত করে তুলল, তার যথার্থ তাৎপর্য সমসাময়িক বাংলা-কাব্যের পরিবেশ-পরিচিতির মধ্যেই নিহিত। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তখন মধ্যগগনে। অনুজ কবিদের রচনায় চলছে কেবলই অনুসরণ। এ পর্বের খ্যাতনামা কবিদের মধ্যে করুণা-নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি রবীন্দ্রপ্রভাবের ছায়াতলে বিকশিত, এবং ওই ছত্রছায়া পরিহার করে স্বাধীন-স্বতন্ত্র পথে চলার ইচ্ছা বা চেষ্টা কারো কবিতায় লক্ষিত হয় না।

রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপ্ত প্রভাব

মহৎ প্রতিভার আকর্ষণ এড়িয়ে চলা প্রায়-অসম্ভব, বিশেষ করে স্বকীয় জীবনবোধের কোনো বিশিষ্টতা, দৃষ্টিভঙ্গির কোনো নিজত্ব যদি কবির আয়ত্তে না থাকে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের জীবনজিজ্ঞাসা যে একান্তভাবেই তাঁর ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাজাত, তাতে যে তাঁদের কোনো অধিকার নেই, এ পর্বের অনেক কবির কাছেই লিরিক কবিতার এই কেন্দ্রীয় প্রত্যয় অজ্ঞাত ছিল। রবীন্দ্রমনন ও অনুভবের সীমাহীন বিস্তৃতি ও নিতল গভীরতা যে তাঁদের আয়ত্তের অতীত, তার স্থূল, সরল তরল রূপই যে হবে তাদের অনুকরণে বাস্তব, এই বোধও বিলম্বিত ছিল।

কিন্তু সবচেয়ে বিপদ রবীন্দ্রনাথের বিবর্তনধর্ম নিয়ে। ভাবানুভূতিতে এবং রূপায়ণে আপন কেন্দ্রে অবিচল থেকেও যুগের পরিবর্তনকে আত্মস্থ করে নিয়ে-

ছিলেন তিনি। উনিশ শতকী বিশ্বাসের যোগ্যতম প্রতিনিধি হয়েও বিশ শতকের যন্ত্রণারও এক অংশকে তিনি কাব্যভাষা দিয়েছিলেন যে-আশ্চর্য নিপুণতায়, তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব। রবীন্দ্র-অনুকারীরা এই পরিবর্তনের বিদ্যুৎচমকে দিশাহারা, তাঁকে অনুসরণের চেষ্টা না করেই নিশ্চিন্ত। তাই বিশ শতকে জন্মগ্রহণ করেও উনিশ শতকী ধ্যানধারণার চারপাশেই তাঁরা আবর্তিত। সত্যেন্দ্রনাথে মূলত কবিপ্রাণতারই অভাব থাকায় এ আলোচনার অনেকটা আবার তাঁর সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়।

রবীন্দ্রানুসরণের ব্যর্থতা

রবীন্দ্রপ্রভাবেই এ যুগের কবিরা প্রকৃতির প্রতি, শহরের কোলাহলের বহুদূরে পল্লীর শান্ত পরিবেশের প্রতি নিজেদের আকর্ষণ স্পষ্টই প্রকাশ করেছেন। এ আকর্ষণ অনেকাংশে কৃত্রিম—রবীন্দ্রনাথ ও বিহারী-লালের প্রকৃতিপ্রেমের প্রতিবিম্বন মাত্র। নাগরিক জীবন ও যন্ত্রসভ্যতার প্রতি বিতৃষ্ণা এবং গ্রামপ্রকৃতির সারল্যের প্রতি আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত উপলব্ধিরই অংশ। প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর যুগযুগান্তর জন্মজন্মান্তরের নাড়ীচলাচলের সম্পর্ক। কিন্তু করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতির প্রকৃতিমূলক কবিতায় জীবনজিজ্ঞাসার কোনো অনিবার্য সুর বাজে নি। একটা 'কাব্যিক ফ্যাসান' অথবা প্রথানুগত রোমান্সপ্রীতিই চরিতার্থ হয়েছে তাঁদের রচনায়।

বৈষ্ণবভাবুকতার ঐতিহ্য

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছাড়াও বাংলার কাব্যঐতিহ্যের অন্যতর একটি প্রবাহ এঁদের কবিমনকে সর্বাধিক আচ্ছন্ন করেছে—বৈষ্ণবপদাবলীর রসধারা ও ভক্তি-বাদের প্রভাব। অবশ্য এঁরা চারজনই বৈষ্ণবধারায় সমভাবে প্রভাবিত ছিলেন, এমন মনে করার হেতু নেই। বৈষ্ণবকাব্যরসকে আপন বোধের বিশিষ্টতার মধ্যে জারিত করে নেওয়া ঐতিহ্য-আত্মীকরণ-হিসেবে গৃহীতব্য বলে মনে হতে পারত। কিন্তু নিজ ব্যক্তিত্বের আধারে ধৃত সেই জারকরসের স্বরূপবোধ প্রখর না হওয়ায় সে-ঘটনা এঁদের কবিতায় ঘটে নি।

উনিশ শতকের উপযোগী সত্য-শিব-সুন্দরের অনাবিল অক্ষত আদর্শই এঁদের কাব্যাদর্শ। বিশ শতকের জটিলতার ছায়াপাত যেমন ঘটেনি তাঁদের অনুভূতির রাজ্যে, তেমনি বৈচিত্র্য আনেনি তাঁদের কলাবিধিতে। তাই এঁরা রবীন্দ্র-অনুজ হয়েও রবীন্দ্রোত্তর নন। আধুনিক কালের, কিন্তু আধুনিক মনের নন।

কিন্তু এদের সমসাময়িক এবং কিছুটা-বা অনুজ কয়েকজন কবির কণ্ঠে রবীন্দ্রজীবনবোধের বহিঃস্থিত কাব্যভাবনার বিস্তার-সম্ভাবনার সুর ধ্বনিত। এঁদের

রবীন্দ্রসমালোচনায় আসলে ব্যঞ্জিত হল আপন স্বাতন্ত্র্যের বলিষ্ঠ দাবী। এঁদের কবিতায় রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারার নানা বিকাশের নিশ্চিত সূচনা। প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং কাজী নজরুল ইসলামে এই বিদ্রোহের সোচ্চার অগ্রনায়কত্ব।

রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারার সূচনা

প্রমথ চৌধুরী বাংলাকাব্যসংসারে স্বল্পপরিচিত, মুষ্টিমেয় কয়েকটি সনেটের রচয়িতা। কিন্তু এক বিপুল নবসম্ভাবনার পথিকৃৎ তিনি। বাংলা-কবিতায় প্রমথ চৌধুরী এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। মননের দীপ্তিবিচ্ছুরণে তিনি অনুভূতির দ্রুতির রাজ্যে বিপর্যয় আনেন, লঘু-চপল ব্যঙ্গকৌতুকে রোম্যান্টিক ভাবালুতার অতিবিস্তারের পক্ষচ্ছেদ করেন। হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে জ্ঞানকর্মের সংযুক্তির প্রয়োজনীয়তা তাঁর কবিতাপাঠে উপলব্ধ হয়। আর, রূপরচনায় কী অদ্ভুত নিষ্ঠা! তাঁর রচনায় শিথিলতার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি আর শব্দচিত্রে সংস্কৃত-লৌকিকের বিচিত্র আলিঙ্গন আধুনিক কবিতার রূপায়ণবৈশিষ্ট্যের পূর্বাভাস বয়ে আনে।

প্রমথ চৌধুরী

মোহিতলালের আঙ্গিকে ব্যক্তিত্বের বজ্রকঠিন লৌহকবচ। এ আবরণ কিংবা আভরণ উনিশ শতকের দৈত্যাকৃতি মহারথদেরই দান। কিন্তু ভাব-কল্পনায়, বিশেষ করে প্রেমসম্পর্কের নব-তাৎপর্য-আবিষ্কারে, তিনি রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতার দ্বারোদ্ঘাটনের এক অভিনব ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাঁর প্রাণদীপ্ত দেহবাদী চেতনা রবীন্দ্র-কল্পনার অশরীরী প্রেমানুভূতিকে অস্বীকার করল। তান্ত্রিক-সাধকোচিত ইন্দ্রিয়লোকের সম্পূর্ণ ও নিঃসংশয়িত অঙ্গীকারে সন্ন্যাস ও ত্যাগের আদর্শ পরিত্যক্ত এবং ধিক্‌কৃত হল। নজরুল সৌন্দর্যের স্বপ্ন থেকে রণাঙ্গনে স্বেচ্ছানির্বাসিত। লাঞ্ছিত মানবতার কল্যাণকামনায় তাঁর হাতের বীণা দুধারী তরবারিতে পরিণত। আর, যতীন্দ্রনাথ আপন রোমাণ্টিকতাবিরোধী দুঃখবাদী জীবনদৃষ্টিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ।

মোহিতলাল, নজরুল, যতীন্দ্রনাথ

॥ দুই ॥

যতীন্দ্রনাথের জীবনজিজ্ঞাসার কেন্দ্রে যে-বিশিষ্ট ভাবদৃষ্টি তার নাম দেওয়া হয়েছে দুঃখবাদ। কথাটির সত্যতা অনেকখানি স্বীকার্য। কারণ, কবির প্রকৃতি-চেতনা, রোমাণ্টিক সৌন্দর্যের বিরোধিতা, ঈশ্বরবোধের বিশিষ্ট প্রকাশ এবং মানবপ্রেম এই দুঃখবাদী দর্শনের ওপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের উৎসমূলে নানা কারণ

যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদী জীবনদর্শন ও তার উৎস

বিদ্যমান। এদের সকলের সক্রিয়তা হয়তো সমস্তরের নয়, কিন্তু এদের অন্যোন্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেই যে তাঁর মানসবৃত্তির গঠন, তাতে সন্দেহ নেই।

প্রথমেই আসে যুগপরিবেশের কথা। তখন সমসাময়িক য়ুরোপে এবং তার প্রভাবে বাংলাদেশেও জীবনসম্পর্কে পরিপূর্ণ আস্তিক্যবোধ এবং বিশ্বাস ক্ষয়িষ্ণুতার মুখে। বিশ শতক সর্বত্রই জিজ্ঞাসার এবং

যুগপরিবেশ

সংশয়ের যুগ। মঙ্গলবোধ ও শ্রেয়োতপস্যা, নিবিড় আধ্যাত্মিকতা, ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি, মানবতার জয়গান, সুন্দরের ধ্যান—উনিশ শতকের এই যে জীবনবোধ, তার ভিত্তিতে সুস্পষ্ট ফাটল ধরেছে। যতীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে এর প্রতিক্রিয়া সহজে লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু এই যুগপরিবেশেও যতীন্দ্রনাথ দুঃখবাদের কবি না-ও হতে পারতেন। কারণ, সমকালীন অন্যান্য কবিদের যুগচেতনা ঠিক তাঁদের কাব্যে এভাবে আত্ম-প্রকাশ করেনি। আসলে যতীন্দ্রনাথের ব্যক্তিচেতনার গভীরে জীবনকে দেখার এমন একটা ভঙ্গি দানা বেঁধেছিল, যাকে দার্শনিক

কবির ব্যক্তিচেতনার বিশিষ্ট ভঙ্গি

পরিভাষায় জড়বাদ-নামে চিহ্নিত করা যায়। মানুষের প্রত্যক্ষ জীবনসত্যকে সমস্তবোধ এবং চিন্তার নিয়ামক বলে মনে করেছিলেন তিনি। তাই যুগপরিবেশ এবং মানবজীবন ও আদর্শের বিপর্যয় তাঁর চিত্তকে এত গভীরভাবে নাড়া দিতে পেরেছিল। চেতনবাদী হলে যুগচিন্তার সংকটকে পরমহংসের মতো তিনি সহজেই অতিক্রম করতে পারতেন।

রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর অনুকারীদের বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়াও যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের উৎসমূলে ক্রিয়াশীল। দুঃখবাদ যতীন্দ্রনাথের কাব্যকল্পনায় একচ্ছত্র সম্রাট। এর এহেন প্রাধান্যের জন্য সদ্যোক্ত কারণটিকে

রবীন্দ্রীয় কাব্যধারার বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়া

অনেকাংশে দায়ী করা যেতে পারে। দুঃখবাদের এই সর্বব্যাপক মসীবর্ণে সমগ্র জীবনদৃষ্টিকে অনুলিপ্ত করা অথবা এর নঙর্থক উচ্চবাক্যে সৌন্দর্যরাজ্য ও আনন্দচেতনাকে সর্বতোভাবে অবহেলা করা সম্ভব হত না, যদি-না রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবাদ এবং অনুকারী কবিদের একই সুরের কৃত্রিম নিষ্প্রাণ পৌনঃপুনিকতা তাঁর সমগ্র অন্তরকে এমনি বিষিয়ে তুলত।

যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ এই তৃতীয় কারণটির অভাবে কীভাবে প্রকাশ পেত তা আজ বলা যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রচেতনার বিপরীত দেয়ালে অবিরত প্রতিহত হবার ফলেই তাঁর দুঃখবাদ যে এত উচ্চরোলে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

জীবনের নশ্বরতার বেদনাও যতীন্দ্রনাথকে দুঃখবাদী-দর্শনের অনুগামী করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের মতো মৃত্যুর স্রোতে ভাসমান জীবনের খণ্ডকে স্বীকার ও গ্রহণ করার মানসিকতা যতীন্দ্রনাথের ছিল না। তাই তাঁর কাব্যে দুঃখের হাহাকারই সর্বব্যাপক হয়ে উঠল।

যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ জড়বাদী চেতনা থেকেই উদ্ভূত, এবং সে-জড়বাদ যতটা দার্শনিক-জ্ঞানমার্গী, তার চেয়ে অনেক বেশি মানবতাভিত্তিক। মানুষের দুঃখবেদনা, উৎপীড়িত লাঞ্ছিত জীবনকেই কেন্দ্র করেছে এ দুঃখবাদ। যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ তাই জড়বাদী, এবং মানবপ্রীতি এর মূলে। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ একটা নঙর্থক ধারণা। রবীন্দ্রনাথের মতো দুঃখকে তিনি কোথাও তত্ত্বলোকের অস্ত্যর্থক মাহাত্ম্যে উন্নীত করেন নি। দুঃখের আগুনে পুড়ে সবকিছুকে ধ্বংস হতেই দেখেছেন তিনি, শুদ্ধতা বা সিদ্ধিকে অনুভব করেন নি। দুঃখের তপস্যায় যে-মহান সত্যলাভ, যতীন্দ্রনাথের কাছে তা বর্ণাঢ্য কথার অতিবিস্তার এবং পরিহর্তব্য ভাবালুতা-মাত্র।

যতীন্দ্রনাথের জড়বাদী চেতনা

তাঁর দুঃখবাদের সঙ্গে শোপেনহাওয়েরের দার্শনিক চিন্তার পার্থক্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। শোপেনহাওয়েরে নৈরাশ্যবাদী আত্মসমর্পণ আছে, যতীন্দ্রনাথে শব্দের তরবারি নিয়ে দুঃখের দেবতার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম। শোপেনহাওয়েরের দুঃখবাদী দর্শনের বাণী হল: 'Will is at once the main spring of the universe and essentially wicked'। যতীন্দ্রনাথ কিন্তু জাগতিক যাবতীয় দুঃখের মূলীভূত-কারণ-হিসেবে অন্ধ 'Will'-এর যথেচ্ছাচারকে মেনে নেন নি। জীবনের দুঃখময় ঘটনার অন্তরালে তিনি শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু এই ভগবানও যেন জড়-জগতেরই প্রতিফলন। তিনি দুঃখময়। আপন অন্তরের প্রচণ্ড দুঃখের বেদনায় তিনি আর্ত। আসলে যতীন্দ্রনাথের জড়বাদ একটা মিশ্র চেতনা। ভগবানের অস্তিত্বকে অভিযোগে-অনুযোগে আক্রমণ অথবা বিশিষ্ট রূপে তাঁর স্বীকৃতিতে এমন কিছু পার্থক্য নেই। আর, এ ঠিক জড়বাদী মনোধর্মের পরিচায়কও নয়, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের ভগবৎচেতনা জড়বাদীর জীবনবোধ থেকেই সমুদ্ভূত। তিনি জড়জীবনের দিক থেকে ভগবানকে দেখেছেন। কখনো ভগবানকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন, আবার কখনো তাঁকে দুঃখময় বলে ঘোষণা করেছেন, অর্থাৎ জড়জীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর স্বরূপ কবিচেতনায় ধরা পড়েছে।

দুঃখবাদী যতীন্দ্রনাথ ও শোপেনহাওয়ের

ভগবানের দিক থেকে বাস্তব জীবনকে দেখেননি তিনি, তার মূল্যনির্ধারণ করেননি। এখানেই যতীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন জড়বাদী নামে অভিহিত হবার যোগ্য।

যতীন্দ্রনাথের যে-নশ্বরতার ধারণা অথবা জীবনতৃষ্ণা তা একান্তই প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট সত্য—জ্ঞানবুদ্ধির আয়ত্তগম্য বিষয়। কিন্তু এই দুঃখাদের মূলে কোনো দুর্জ্ঞেয়তার চেতনা নেই। দুর্জ্ঞেয়তা, অসীমতা, রহস্যদ্যোতনা, ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মতা যতীন্দ্রনাথকে কদাপি আবিষ্ট করতে পারেনি। আর, পারেনি বলেই তিনি জড়বাদী এবং দুঃখবাদী এবং রোমান্টিকতা-বিরোধী।

॥ তিন ॥

যতীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ ছখানি। মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, সায়ম্, ত্রিযামা, নিশান্তিকা। কবির জীবনজিজ্ঞাসার যে-বিশিষ্ট স্বরূপটি বুঝবার চেষ্টা আমরা আগের অধ্যায়ে করেছি তা একটা অপরিবর্তনীয় প্রত্যয়মাত্র নয়। অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথের কাব্যবোধ এবং কবিকৃতি Static নয়, dynamic। এই পরিবর্তন ঠিক কাব্যে-কাব্যে ঘটে নি, কিংবা মূলগত অপরিবর্তনীয় বোধের চার-পাশের ভাবনিচয়ের মধ্যেই-মাত্র এ বিবর্তন আসেনি। এই বিবর্তন মূল-জিজ্ঞাসারই স্বরূপ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কবির প্রথম তিনটি কাব্যে ভাব ও ভাবনার কোনো পরিবর্তন নেই। কবিচিত্ত একই কেন্দ্রে আবর্তিত। 'সায়ম্'-এ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। 'ত্রিযামা' এবং 'নিশান্তিকা'য় এ পরিবর্তন সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত।

যতীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনার বিবর্তন

সমালোচকদের মধ্যে এ পরিবর্তনের পরিমাপ নিয়ে মতভেদ আছে। অনেকে একে পরিবর্তন বলে মানতে রাজী নন—পরিবর্তনের যে-সুর এখানে বেজেছে তা নাকি কবিচেতনার মূল ভিত্তিকে মোটেই স্পর্শ করেনি, রোমান্টিক সৌন্দর্যের বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহই কেবল স্তিমিত হয়েছে, কোনো মূলগত পরিবর্তন তাঁর কবিধাতুতে আসেনি। যুক্তিহিসেবে তাঁরা যতীন্দ্রনাথের 'সায়ম্', 'ত্রিযামা', 'নিশান্তিকা' থেকে এমন অনেক কবিতার সাক্ষ্য উল্লেখ করতে পারেন যেখানে 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া'র ভাবকেন্দ্রেরই অনুবর্তন চলেছে। কিন্তু বিতর্কে এমনও বহু কবিতার উদাহরণ নেয়া সম্ভব যেখানে এই পূর্বতন ভাবকেন্দ্রের সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ নিশ্চিতভাবে লক্ষ্য করা যায়। আর, মনে রাখা দরকার যে, কবির মন বইয়ের পাতা নয়—উল্টে গেলেই

কবির সুরপরিবর্তন সম্পর্কে সমালোচকের মতামত

যেখানে পূর্বপত্রের চিহ্নমাত্র মেলে না—অথবা জীর্ণবস্ত্র সংশয়হীন চিত্তে বদলে ফেলা। কবিমনের পরিবর্তনের বেলায় সেরূপ কিছু ঘটে না, ঘটা সম্ভবও নয়। নতুন বোধের আবির্ভাবে সেখানে পুরানো ভাবচিন্তা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না, নতুন সুরের আশেপাশে পুরানো সুরের গুঞ্জন কিছুকাল চলতে থাকে। যতীন্দ্রনাথের শেষ তিনখানা কাব্যে তাই দুই সুরেরই কবিতা আছে—[এক] যেখানে যতীন্দ্রনাথ পুরানো জীবনবোধেরই অনুসরণ করেছেন; এবং [দুই] যেখানে তাঁর কণ্ঠে নতুন সৌন্দর্যচেতনা ও প্রেমকামনা ধ্বনিত হয়েছে—ধিকৃত হয়েছে আপনার সমস্ত যৌবনব্যাপী মরুচারণা। প্রথম শ্রেণীর কবিতাগুলোতেও সাধারণভাবে কবির স্বরগ্রাম অনেকখানি খাদে নেমেছে, রূপনির্মাণের ক্ষেত্রে ধৈর্য এসেছে প্রায়ই, রোমান্টিকতার বিরুদ্ধাচরণের সঙ্গে সৌন্দর্যতৃষ্ণার মিশ্র রাগিণীর আলাপ সুরু হয়েছে মাঝে মাঝে। তাই যতীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের কেন্দ্রেই যে পরিবর্তন এসেছিল, এ সত্যে আমাদের সংশয় নেই।

দুঃখবাদী জীবনদৃষ্টি যতীন্দ্রনাথকে সৌন্দর্য প্রেম ও প্রকৃতির রাজ্য থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু মনে হয়, দুঃখবাদের মরুভূমিতে দীর্ঘকাল বিচরণ করতে করতে তাঁর দেহ উত্তপ্ত ও মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। যতীন্দ্রনাথ জীবনের যে-প্রগাঢ় তৃষ্ণা সমগ্র সত্তায় অনুভব করেছিলেন তার মধ্যে 'immortal longings'-এর তৃপ্তিহীন ব্যাপকতা ছিল। রবীন্দ্রানুজ কবিদের প্রেম-প্রকৃতি ও সৌন্দর্যদৃষ্টির কৃত্রিম সামান্যতায় তা নির্বাপিত হবার নয়। যৌবনের উদ্দাম প্রাখর্যে তিনি হৃদয়লোকের দুর্মর প্রেমপিপাসা ও যৌবনতৃষ্ণাকে অনুভব করতে পারেননি, আহতই করেছেন। বিশেষ করে তাঁর উচ্চকণ্ঠ নেতিঘোষণার পশ্চাতে নিজের কামনা চাপা পড়ে গিয়েছিল। বার্ধক্যের হেমন্তগোধূলিতে তিনি আপন দুঃখবাদী জীবনদর্শনের দীর্ঘকালীন সৃষ্টিকর্মের দিকে তাকিয়ে আপনি চমকে উঠলেন। এ কী দুঃখের মহামহোৎসবে তিনি মেতে উঠেছিলেন! রবীন্দ্রচেতনার তাললয়সমন্বিত আধমরা 'শিব'কে তিনি চাননি ঠিকই, কিন্তু দুঃখবাদের 'খ্যাপা অতিজীব'কে জাগিয়ে তুলেছেন দেখে নিজেকেই প্রশ্ন করলেন:

জীবনাসয়াহ্নে কবির সৌন্দর্যপিপাসা ও প্রেমতৃষ্ণা

নাচ ফরমাশ করেছিনু বলে
নেচেই চলবে ঠাকুর?
দেখবে না চেয়ে পায়ের তলায়
মানুষ কি মরা কুকুর।

যৌবনে প্রেমকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন যে-প্রবল জীবনতৃষ্ণায়, আজ অনুভব করলেন তার মধ্যেই আপন প্রেমের বিশিষ্ট অভিনব মূর্তিকে :

যে-হুতাশনের হুতাশে আমার শুকাইল যৌবন,
যে-পিপাসা মোর রূপ-কূপোদকে নহিল নির্বাপণ,
বৈশাখী তাপে তুলসীর ঝারি,—
যে-সিনান মোরে করে মরুচারী,
যে-দাবদাহনে বাহন করিয়া এ জীবন পোড়ালেম,—
আজ মনে হয় এ দগ্ধভালে সেই ছিল মোর প্রেম।

কাজেই এককালে যাকে ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, আজ তারই ব্যর্থ সন্ধানের আর্তি ফুটে উঠল কবির কণ্ঠে। সে-আর্তিতে মাঝে মাঝে 'রক্ত-করবী'র রাজার প্রচণ্ড হাহাকার শোনা গেল—তিল তিল করে যৌবনকে হত্যা করার ব্যথায় বিক্ষত চিত্তের হাহাকার : 'যৌবনবেচা জরা-বিনিময়ে জড়ত্ব করিয়াছি।' মরুচারী পথিক আকণ্ঠ তৃষ্ণা ও নিঃসীম ক্লান্তি নিয়ে আজ হেমন্ত-সন্ধ্যার মাঠের স্বপ্নের কোমলতায় খুশি হয়ে উঠতে চাইছেন, রজনীগন্ধার সান্ধ্য সৌরভ নিতে চাইছেন বুক ভরে।

অবশ্য 'ত্রিযামা'-'নিশান্তিকা'য় কবি আপন মরুদগ্ধ বিদ্রোহকেও এই প্রেম আর সৌন্দর্যের অচেতন অনুসন্ধান বলেই ব্যাখ্যা করে খুশি হতে চেয়েছেন। কিন্তু কবির অবচেতনার এই সত্য বাস্তব, না, 'ত্রিযামা'-'নিশান্তিকা'র আলোক-সম্পাত, তা বিবেচনার যোগ্য।

আসলে বার্ধক্যজনিত ক্লান্তিতে যতীন্দ্রনাথ এখন অনেকখানি স্তিমিত। তীব্র হাহাকারে ভেঙে পড়তে পড়তেও কোনো একটা অস্ত্যর্থক আশ্রয় তিনি লাভ করতে চান মনেপ্রাণে। 'শপথভঙ্গ', 'প্রত্যাবর্তন' প্রভৃতি কবিতায় সেই বোধকে তিনি আবিষ্কারও করেছেন। নিজে যে-হারানো যৌবনের জন্য কবির শোক, তার সন্ধান মিলল আপন পুত্রকন্যার তারুণ্যে ; আর, নিজের ব্যর্থ প্রেমকে যেন খুঁজে পেলেন আপন পত্নীর বার্ধক্যের বলিরেখায়। কিন্তু এ কেবলই আত্মসান্ত্বনা—একে আত্ম-প্রতারণাও বলা চলে।*

উপসংহার

* অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত-রচিত

জনপ্রিয় কবি নজরুলের কাব্যসার্থকতা-প্রসঙ্গে

[**রচনার সংকেতসূত্র :** প্রারম্ভিক ভূমিকা—কবিতার রাজ্যের সীমারেখা প্রায়শই আমরা মুছে দিই—নজরুল ইসলামের কাব্যের অনন্যতা—নজরুলকাব্যে চিন্তাভারমুক্ত প্রাণের অবারিত প্রকাশ—নজরুলের কবিতার আবেদন সর্বজনীন—সাহিত্যে প্রচার ও প্রকাশ—নজরুলের কবিতা মুখ্যত প্রচারধর্মী—নজরুলের কাব্য সম্পর্কে মূল প্রশ্ন—কবিকথিত 'আমার সুন্দর'—উপরি-উক্ত 'সুন্দর' কবির কাব্যে কতখানি প্রতিফলিত—কবির ব্যর্থ কামনার তৃষ্ণা—নজরুলের কাব্যধারায় বিবর্তনের অভাব]

॥ এক ॥

প্রারম্ভিক ভূমিকা

বাংলা কাব্যে নজরুলের আবির্ভাব বিস্ময়কর। তরুণ বাংলার প্রাণ কেড়ে নিলেন নজরুল মুহূর্তেই। তাঁর শাণিত বাণীর দীপ্তিতে অন্ধকার রাত্রির বুক যেন বিদীর্ণ হয়ে যেতে লাগল ; তাঁর বজ্রমন্ত্রে দিগন্ত কেঁপে উঠল—বন্ধদরজার আগল ভাঙ্‌ল বুঝি। এক আশ্চর্য উন্মাদনার প্লাবন উচ্ছ্বসিত হল প্রাণ থেকে প্রাণে। নিজেকে যেন হঠাৎ নতুন করে আবিষ্কার করল বাঙালীর চিত্ত। ললিত গীতের রাজ্য থেকে তেজোময় অগ্নিঝলসিত ধ্বনির রাজ্যে সে অকস্মাৎ উপনীত হল।

কবিতার রাজ্যের সীমারেখা প্রায়শই আমরা মুছে দিই

মানুষের মনে নানা প্রবণতার মিশ্রণ। এদের বর্ণে আর রেখায় পার্থক্য এত স্পষ্ট নয় যে, বিনা-আয়াসেই টেনে বিচ্ছিন্ন করা যাবে। তাই একটিতে টান পড়লে অনেকগুলো ব্যথিয়ে ওঠে, একটিতে টংকার দিলে অনেকগুলো ঝংকার তোলে। কিশোর-বয়সের বিচিত্র প্রবণতা পরিণত চিত্তে একের চারপাশে কেন্দ্রিত হয়। কিন্তু পরিণতচিত্ত মানুষ কজনাই-বা! বয়সে কৈশোর ঘুচলেও মনের বয়োপ্রাপ্তি আমাদের অনেকেরই ঘটে না। তাই ক্রোচের চার-নিষেধের উঁচু তর্জনিকে ভুলে যাই প্রায়শই। কবিতার রাজ্যের সীমারেখা মুছে দিই। রাজনীতিকে কবিতা বলে ভালোবাসি, ধর্মতত্ত্বকে রস বলে গ্রহণ করি, দর্শনকে সুন্দর বলে মেনে নিই। কারণ, সাহিত্যে সুন্দরের রাজকর কজন দিই আমরা! যারা দিতে চাই তাদের মনের আনুগত্য আশেপাশের নানারাজ্যে ছড়িয়ে থাকে। আমাদের প্রয়োজনের অতীত সৌন্দর্যের জগৎ যেমন সত্য, তেমনি সত্য রূঢ় বাস্তব প্রয়োজনের পৃথিবীও। চাকরি এবং বাজার করার পরেও যেমন কবিতার ডানায় আশ্রয় নিয়ে নীল আকাশের স্বপ্ন দেখি, আবার তেমনি স্বপ্ন থেকে জাগরণে চাকরি এবং বাজারকেই স্মরণ করি। সে যাক্।

কবিতার বোধে এবং অনুভূতিতে, বিচারে এবং বিশ্লেষণে নজরুল সম্বন্ধে

যে-রায়ই ঘোষণা করা হোক, নজরুলের উচ্চকণ্ঠ বক্তৃতার ভাষায় হৃদয় উল্লসিত হয়, কানে তালা লাগলেও চিত্তের বিস্তার ঘটে, অনেক প্রাজ্ঞ মনও হঠাৎ ভাবে এখুনি প্রাণটাই বুঝি দিয়ে দিতে পারি।

নজরুল ইসলামের জনপ্রিয়তা যে-কোনো কবির ঈর্ষার সামগ্রী।

নজরুলের আগেও অনেক কবি রাজনীতিকে তাঁদের কবিতার বিষয় করেছেন। 'বিদেশের ঠাকুর ফেলে স্বদেশের কুকুর' পূজো করার স্বাজাত্যভিমানী প্রলাপবাণী শুনেছি আমরা ঈশ্বরগুপ্তের মুখে, রঙ্গলালের রাজপুত-বীরদের 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' সংগীতে কবিকণ্ঠ উঠেছে উচ্চগ্রামে, হেমচন্দ্র কথনো মারাঠী যুবকের ছদ্মবেশে ইতিহাস মন্থন করে বক্তৃতায় আহ্বান জানিয়েছেন 'আর ঘুমায়ো না দেখচ ক্ষু মেলি' ; কিংবা 'খুব দেখালে মুখুজ্জের পো' বলে ব্যঙ্গজড়িত ধিক্কারবাণী উচ্চারণ করেছেন বিদেশীর পদলেহী হীনমনাদের বিরুদ্ধে। নজরুলের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সত্যেন্দ্রনাথেও স্বাদেশিক চিন্তা, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা এবং বিশ্বমানবতাবোধ ছন্দে সমর্পিত। কিন্তু নজরুল একক। পূর্বসূরীদের বুদ্ধিতে-যুক্তিতে, ইতিহাস-আলোচনায় হৃদয়ের স্পর্শ লাগেনি। তাঁদের কবিতার ভাষারূপে প্রাণের উত্তাপ নেই, আবেগের স্পন্দনে তাঁদের কণ্ঠ রুদ্ধ নন, আগ্নেয় উদ্গীরণে তাদের চেতনা ঝলসিত হয় নি। এখানেই অমেয় প্রাণশক্তির প্রতিমূর্তি নজরুলের অনন্যতা। যুগগত পরিবর্তনে নজরুলের রাজনীতিক চেতনা নিঃসন্দেহে স্পষ্টতর, আবেগ-অনুভূতির প্রাধান্যে, প্রচণ্ডতায় ও প্রাবল্যে তাঁর এতখানি জনপ্রিয়তা।

নজরুল ইসলামের কাব্যের অনন্যতা

নজরুলের রাজনীতিতে সংকীর্ণতা ছিল না, দলগত অনুদারতা ছিল না। মতের ও নীতির বিতর্কে, পন্থা ও প্রণালীর জটিলতায় তাঁর আস্থা নেই, প্রবণতাও নেই। সাম্প্রদায়িক কুটিল ভেদবুদ্ধি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, নারীপুরুষের অধিকারগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি খড়্গহস্ত। তাঁর মানবতা আন্তর্জাতিকতাবোধ থেকে ঘৃণিত বারাঙ্গনার দ্বারদেশ পর্যন্ত সমান অকুণ্ঠ। তিনি সাম্যকে আহ্বান করেন, কিন্তু ভগবানকে অস্বীকার করেন না। বাবুর অত্যাচারে কুলীকে লাঞ্ছিত হতে দেখে তাঁর সাম্যবাদ বাণীমুখর হয়ে ওঠে। তা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কিংবা মার্ক্সীয় অর্থনীতি ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অপেক্ষা রাখে না। মানবমনে আবেগ-অনুভূতির প্রবেশাধিকার প্রায়-বাধাহীন। সে গান গেয়ে দ্বার খোলায়। যুক্তিবুদ্ধি বা জ্ঞানচর্চার হাতে এত জোর কোথায়?

নজরুলকাব্যে চিন্তাভারমুক্ত প্রাণের অবারিত প্রকাশ

সূক্ষ্মচিন্তা ও মননে চোখঝলসানো দীপ্তির বিচ্ছুরণ থাকতে পারে, কিন্তু তার আবেদন বালবৃদ্ধবনিতায় গিয়ে পৌঁছায় না। নজরুলে জ্ঞানবুদ্ধির প্রচুর চাষের অভাবই প্রাণের ফলনে জনমন ভরে দিয়েছে।

নজরুলের ভাষার বীর্য মোহিতলালের মতো কঠিন পৌরুষের লৌহকবচে আবৃত নয়। তাই সেখানে পাঠকের অবারিত-দ্বার। তাঁর কবিতা যতীন্দ্রনাথের তটস্থ নৈরাশ্য ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে মরুভূমির মরুশ্বাসের অনুবর্তন করে না। তাই বাঙালীর চিত্ত এখানে শান্তি পায়। কারণ, আকাশে ঝড় উঠলেও এর মাটি শ্যামল, এখানে গঙ্গা আর পদ্মার পলিতে পলিতে কোমল পেলবতায় দ্বিধা নেই। নজরুলের বিদ্রোহ বাঙালীর মনোধর্মকে কবির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে না, অফুরন্ত প্রাণের যাদুভরা সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। তথাপি মনে প্রশ্ন জাগে, জনপ্রিয়তা ও কাব্যসার্থকতা কি সমার্থক? এই কারণগুলির একটিও কি কাব্য-উৎকর্ষের নিরিখ? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া একটু কঠিন বৈকি।

নজরুলের কবিতার আবেদন সর্বজনীন

॥ দুই ॥

রাজনীতি কখন কবিতা হয়ে ওঠে, প্রচার কখন প্রকাশ হয় সে-আলোচনায় তর্ক অনেক এবং এর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তও নেই। সাহিত্য রাজনীতিক, সামাজিক, ধর্মীয় কোনো প্রয়োজন বস্তুত সিদ্ধ করে কিনা, এ প্রশ্ন পুরানো হলেও আজকের দিনেও অচল নয়। নজরুলের কাব্যবিচারে এ প্রশ্ন খুবই প্রাসঙ্গিক।

কবি তাঁর বিষয়বস্তুহিসেবে দৃশ্যমান জগৎ এবং লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তী নিজের ব্যক্তিগত ভাবানুভূতি—যে-কোনোকিছুকেই অবলম্বন করতে পারেন। কাজেই রাজনীতিতে আপত্তি নেই, আপত্তি নেই ধর্মতত্ব কিংবা দার্শনিক প্রত্যয়েও। কিন্তু যে-রাজনীতি প্রচারপুস্তিকার সামগ্রী, সামগ্রী মঞ্চবক্তৃতার, যা সর্বসাধারণের তা নিয়ে কবিতা নয়। কবিতায় যে রাজনীতি তা একান্তভাবে কবির। সর্বসাধারণের রাজনীতিক বোধ ও স্বার্থের বিপরীত না হলেও, কবির বিশেষ ব্যক্তিচেতনার স্বাতন্ত্র্যে তা অনন্য। দ্বিতীয়ত, কবির চিন্তায় বা অনুভূতিতে abstraction-এর স্থান নেই। অমূর্ত তত্ত্ব কবির নয়, প্রমূর্ত ভাবই তাঁর সাধনার ধন। রূপাশ্রয়ী অনুভূতি তাঁর হৃদয়ে, তার বাণীধৃত প্রতিফলন তাঁর রচনায়। দুয়ে মিলে বলা যায়, প্রচার আর প্রচার থাকে না যদি কবির ব্যক্তিচেতনার স্বাতন্ত্র্য বিষয়বোধে যুক্ত হয়, আর ভাষারূপে সত্য হয়ে ওঠে। কিন্তু নজরুলের রাজনীতি-বিষয়ক কবিতায় এ লক্ষণ সুলভ নয়।

সাহিত্যে প্রচার ও প্রকাশ

অবশ্য স্বীকার করতেই হয়, তাঁর রাজনীতিচেতনা অকৃত্রিম। তাঁর অনুভূতি আন্তরিক, তার উদ্বোধনে ফাঁকি নেই, ফাঁকও নেই কোথাও। অভাব নেই হৃদয়াবেগের। কিন্তু তবু এরা ভিন্ন আসরের। দলীয় নেতার মঞ্চবক্তৃতায় ভাষার নৈপুণ্য থাকে, বাচনভঙ্গির মধ্যেও অনেক সময় ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, আবেগও অকৃত্রিম। বক্তার সমগ্র চিত্তের উদ্বেলতাও হয়তো সংশয়াতীত। তবু তা কবিতা নয়। কারণ, বক্তার ব্যক্তিত্ব মতবাদগত সাধারণ সূত্রের আবরণ বিদীর্ণ করে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত নয়। রূপরচনা যদি থাকেও, সে অবিচ্ছেদ্য নয় ভাবের সঙ্গে; আর, এ সম্পর্ক অদ্বয় নয় বলেই তারা প্রায়ই রূপক, না-হয় উপমা—রূপ নয়। নজরুলের 'চারণকবি'-খ্যাতি অন্য আসরের চিহ্নবাহী। নজরুলের কবিতায় যতটা উত্তেজনা, রূপচেতনা ততটা নেই। আবার, রূপ যেখানে ভাষাবদ্ধ সেখানেও তা প্রায়শ চিত্রকল্প হয়ে ওঠেনি। তাঁর রচনায় রূপ থেকে রূপকের ঝোঁক বেশি, চিত্রে উপমা-অলংকারের প্রাচুর্য, আর উপমায় অভিনবত্বের অভাব। 'সর্বহারা,' ফণিমনসা,' 'জিঞ্জির,' 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি কাব্যের বেশির ভাগ কবিতা সম্পর্কেই এই কথা। বক্তৃতা-বিবৃতিতে তারা আবেগ-উদ্বেল, আলোড়নে ঝঞ্ঝামত্ত, কিন্তু কাব্যরূপে স্খলিত। 'অগ্নিবীণা'-র কবিতায় রাজনীতিবোধে তেমন স্পষ্টতা আসেনি। 'কামালপাশা' প্রভৃতি কবিতায় সৈন্যবাহিনীর প্রাণদীপ্ত ছন্দিত অগ্রগতির একটা নতুন ধ্বনিবৈচিত্র্য এবং বীরত্বগাম্ভীর্যেই কবি মুগ্ধ।

নজরুলের কবিতা মুখ্যত প্রচারধর্মী

'বিদ্রোহী' কবিতায়ও শব্দাড়ম্বরে ও ভাবকল্পনার অসংযমে, পারিপাট্যহীন বাক্যযোজনায় রূপজগৎ প্রায় আচ্ছন্ন। তবে এ কবিতায় কবির জীবনদর্শনের গভীর জিজ্ঞাসার সুস্পষ্ট চিহ্ন আছে এমন মনে করা হয়। সে-সত্য অবশ্যই অনুসন্ধানযোগ্য।

॥ তিন ॥

'বিদ্রোহী' কবিতায় ভারতীয় দর্শনচিন্তার প্রভাব আছে বলে অনেকে মনে করেছেন। মোহমুক্ত সত্তা আজ আপন স্বরূপ উপলব্ধি করেছে :

'আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার
খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!'

এ স্বরূপ সমগ্র বিশ্বব্যাপ্ত, এমন কি, বিশ্বাতীতও। চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারার রহস্য সে ভেদ করে। কারণ সত্তার ওই বোধে :

'জগদীশ্বর-ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য।'

মোহিতলালের একটি প্রবন্ধই নাকি এ-কবিতার ভাবউৎস। কিন্তু মোহিতলালের

দার্শনিক জিজ্ঞাসা নজরুলের নয়। তাই দুএকটি পঙ্‌ক্তির ব্যঞ্জনা ছাড়া ঔপনিষদিক বোধিদৃষ্টি এ কবিতার ব্যাখ্যায় অপরিহার্য নয়। নজরুল আপন ব্যক্তিসত্তার সর্বজয়ী শক্তিকে অনুভব করেছেন। এই শক্তির আবেগে-মত্ততায় ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করার সুতীব্র কামনা মন্দ্রিত। যদি তাঁর এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরীও থাকে, গতি ও শব্দের প্রচণ্ডতায় তার সুর সমাচ্ছন্ন। তাই সামান্য কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতেই তাঁর সৃষ্টিসৌন্দর্যের স্বপ্ন সমাহিত।

নজরুলের কাব্য সম্পর্কে মূল প্রশ্ন

মূল প্রশ্ন এটা নয়—নজরুল উপনিষদের দার্শনিক সত্যের অনুরাগী ছিলেন কিনা। নজরুলের কোনো ব্যক্তিগত জীবনদর্শন তাঁর কাব্যকবিতায় প্রতিবিম্বিত কিনা, এটাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। অথবা, তিনি কি সত্যেন্দ্রনাথের মতো জীবনবোধহীন কবিতারচয়িতা ও ছন্দ-শব্দের পরীক্ষক মাত্র?

'দৈনিক নবযুগ'-পত্রিকায় একবার নজরুলের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, নাম—'আমার সুন্দর'। কবি লিখছেন, 'তখনো একথা ভাবতে পারিনি, এ লেখা আমার লেখা নয়, এ লেখা আমারি মাঝে আমার পরম বন্ধুর, আমারি সুন্দরের, আমারি আত্মবিজড়িত পরমাত্মীয়ের।' আপন জীবনের বিচিত্র আনন্দবেদনা, সাফল্যদুর্ভাগ্যের পেছনেও এই 'আমার সুন্দর'-এর অকম্পিত স্থিতি অনুভব করেছেন নজরুল। এই 'সুন্দর'ই একদিকে বেদান্ত-কোরাণের পথ ধরে কবি-চিত্তকে ঊর্ধ্বায়িত করতে লাগল: 'গোপনে পড়তে লাগলাম বেদান্ত, কোরাণ। আমার পৃথিবীর আকাশ যেন কোন্ বজ্রনাদ ও তড়িৎলেখার তলোয়ারে বিদীর্ণ হয়ে গেল। আমি যেন আরো ঊর্ধ্বে যেতে লাগলাম। দূর হতে দেখতে পেলাম অপরূপ স্বর্ণসুন্দর জ্যোতিঃ। এই আমার স্বর্ণজ্যোতিঃ সুন্দরকে প্রথম দেখলাম।' অন্যদিকে করাল-ভয়ংকর-শক্তি তাঁকে নীচের দিকে আকর্ষণ করল। ফিরে আসতে হল তাঁকে মাটির পৃথিবীর বুকে। পৃথিবীকে ভালোবেসে, নিসর্গ-সৌন্দর্যকে হৃদয়ে জড়িয়ে কবি বললেন: 'এই আমি প্রথম পুষ্পিত সুন্দরকে দেখলাম। এইরূপে চাঁদের আলো, সকালসন্ধ্যার অরুণকিরণ ঘনশ্যাম-সুন্দর বনানী, তরঙ্গহিল্লোলিত ঝর্ণা, তটিনী, কূলহারা নীলঘন সাগর, দশদিকবিহারী সমীরণ আমায় জড়িয়ে ধরল, আমার সাথে মধুর ভাষায় বন্ধুর মতো সখার মতো কথা কইল।' পৃথিবীকে ভালোবেসে, মানুষের বেদনাক্ষত জীবনে কল্যাণকামনায় অস্ত্র দাবী করলেন কবি: 'তবে দাও বন্ধু, দাও আমায় দুধারী তলোয়ার, দাও আমায় তোমার বিপ্লবের বিষাণ-শিঙা, দাও আমায় অসুরসংহারী ত্রিশূল-

কবিকথিত 'আমার সুন্দর'

ডম্বরুধ্বনি। দাও আমায় ঝঞ্ঝাজটিল জটা, দাও আমায় বাংলার সুন্দরবনের বাঘাম্বর ; দাও ললাটে প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা, দাও আমার জটাজুটে শিশু শশীর স্নিগ্ধ হাসি ; দাও আমায় তৃতীয় নয়ন, দাও সেই তৃতীয় নয়নে অসুরদানবসংহারী শক্তি।...'

কবি শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীতেই—এর ফুলে নদীতে পাখীর গানে, মানুষের প্রীতি ও প্রেমে উপলব্ধি করলেন তাঁর সুন্দরকে। সংকটমোচন হল, কবি-চিত্তের দ্বিধার হল অবসান।

এই হল কবির অন্তর্জীবনের অনুভূতিপরম্পরা। এর প্রেক্ষাপটে একদিকে তাঁর প্রকৃতি ও প্রেমমূলক কবিতা, অন্যদিকে রাজনীতিবিষয়ক কবিতার প্রায়-বিপরীত দুটি সূত্রকে হয়তো গ্রন্থিবদ্ধ করা যায়। অবশ্য কবিকথিত এই 'সুন্দর'-এর কল্পনায় রবীন্দ্রনাথের 'অন্তর্যামী'র কোনো প্রভাব আছে কিনা তা ভাববার বিষয়।

॥ চার ॥

কিন্তু উপরে-বর্ণিত কবির অন্তর্জীবনের এই চিত্র সম্পূর্ণ স্বীকার্য নয়। অন্তত নজরুলের কবিতায় এর যথাযথ প্রতিফলন নেই। সেই সর্বচেতনার অন্তরালের 'সুন্দর' বাচ্যে তো নয়, ব্যঞ্জনায়ও ধরা পড়েনি তাঁর কবিতায়। বিশেষ করে এ কথা মনে রাখার মতো যে, কবির জীবনদর্শন তাঁর গদ্যপ্রবন্ধে নয়—কবিতার ভাষা আর রূপরচনাতেই পাঠ করতে হবে। গদ্যপ্রবন্ধের সচেতন মতামতকে সাক্ষ্যহিসেবে আহ্বান করা যায় তখনই যখন তা কবিতার প্রত্যক্ষ প্রমাণকে যথার্থই দৃঢ়তর করে।

উপরি-উক্ত 'সুন্দর' কবির কাব্যে কতখানি প্রতিফলিত

নজরুলের অন্তরমথিত বিক্ষোভ ও যন্ত্রণার যে-সুর ভাষা পেয়েছে ওই প্রবন্ধে তার সত্যতা কবির কাব্যসৃষ্টিতে অবশ্য ধরা পড়েছে। কিন্তু পরিসমাপ্তিতে যে-সংকটমোচন ও চিত্তোদ্গতির কথা বলা হয়েছে, তার প্রতিফলন নজরুলের কবিতায় দেখতে পাওয়া যায় না।

নজরুল যে-পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন, যে-জীবন কামনা করেছেন, যে-সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন তা অতৃপ্ত তৃষ্ণাই থেকে গেছে। সেই তৃষ্ণাতুর আর্তনাদ তাঁর মানবতামূলক [রাজনীতিবিষয়ক] কবিতার উচ্চ-চীৎকারে ধ্বনিত হয়েছে। আর, মাঝে মাঝে ক্লান্ত বিষণ্ণ কবি 'ছায়ানট'-দোলনচাঁপা'রছোট ছোট কয়েকটি কবিতায় আপন অবসাদের কারুণ্য ঢেলে দিয়েছেন।

কবির ব্যর্থ কামনার তৃষ্ণা

কবির ব্যর্থ কামনার পিপাসা, সৌন্দর্যসাধনা ও কণ্টকক্ষত রক্তাক্ত বেদনার রূপময় প্রকাশে 'দারিদ্র্য'-কবিতাটি তাৎপর্যপূর্ণ। দুএকটি স্তবকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে

ইতিহাসবিবৃতির পথ ধরলেও, মূলত এ কবিতা নজরুলের অন্তরগভীরে আলোকপাত করে, এবং রচনাটি রূপায়ণেও সার্থক।

নজরুল যে-সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন তা চিরাচরিত। যতীন্দ্রনাথ যেমন সুন্দর বস্তুমাত্রকেই মেকি বলে অস্বীকার করে 'মরুমায়া'য় দিক্‌ভ্রান্ত হয়েছেন, 'মরুশিখা'-য় দগ্ধ হয়েছেন, নজরুলে তেমনটি নয়। যতীন্দ্রনাথে সৌন্দর্যচেতনাই মূলত বিপর্যস্ত। নজরুলে 'সৌন্দর্যে' আর্তি আছে কিন্তু অধিকার নেই, তৃষ্ণা আছে নিবৃত্তি নেই :

'বেদনা-হলুদ-বৃন্ত কামনা আমার
শেফালির মতো শুভ্র সুরভিবিথার
বিকশি উঠিতে চাহে, তুমি হে নির্মম,
দল বৃন্ত, ভাঙো শাখা কাঠুরিয়া-সম!
আশ্বিনের প্রভাতের মতো ছলছল
করে ওঠে সারা হিয়া, শিশিরসজল
টলটল ধরণীর মতো করুণায়!
তুমি রবি, তব তাপে শুকাইয়া যায়
করুণা-নীহার-বিন্দু! ম্লান হয়ে উঠি
ধরণীর ছায়াঞ্চলে! স্বপ্ন যায় টুটি
সুন্দরের, কল্যাণের! তরল গরল
কণ্ঠে ঢালি তুমি বল, 'অমৃতে কী ফল?'
জ্বালা নাই নেশা নাই নাই উন্মাদনা,—
রে দুর্বল, অমরার অমৃতসাধনা
এ দুঃখের পৃথিবীতে তোর ব্রত নহে!
তুই নাগ, জন্ম তোর বেদনার দহে।
কাঁটাকুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা,
দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টিকা!'
গাহি গান, গাঁথি মালা, কণ্ঠ করে জ্বালা,
দংশিল সর্বাঙ্গে মোর নাগ-নাগবালা!'

বিহারীলাল অতি সহজেই বলতে পেরেছিলেন, 'যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়'; রবীন্দ্রনাথ তো প্রথমাবধিই এই দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ। সৌন্দর্যলোক থেকে দৃষ্টিস্খলন তাঁর যদি কখনো ঘটে থাকে-তো তা অধ্যাত্মলোকের দিকে। অপরপক্ষে, মধুসূদন লক্ষ্মীসরস্বতীর দ্বন্দ্বে অবক্ষয়িত। নজরুলের কাছে এই অনশনক্লিষ্ট বিশ্বধরিত্রী যেন তাঁর 'কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার', অথবা, তাঁর মাতা বসুন্ধরা। তাঁর নিজের ভাষায় : 'আমার অন্ধত্ব ঘুচে গেল। আমি আমার পৃথ্বীমাতার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে, বাংলার দিকে, ভারতের দিকে চেয়ে দেখলাম,—দৈন্যে,

দারিদ্র্যে, অভাবে, অসুরের পীড়নে জর্জরিতা হয়ে গেছেন। তাঁর মুখেচোখে আনন্দ নেই, দেহে শক্তি নেই, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৈত্য-দানব-রাক্ষসের নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত।' তাই নিরঙ্কুশ সৌন্দর্যের ধ্যানে মগ্ন হতে পারেন না কবি। তাঁর হৃদয়দেশে

'কে বাজাবে বাঁশি ?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি ?
কোথা পাব পুষ্পাসব ?—ধুতুরাগেলাস
ভরিয়া করেছি পান নয়ননির্যাস !'

সৌন্দর্যের সব পিপাসা কণ্ঠে নিয়েই জ্বালা নেশা আর উন্মাদনার সংগীত রচনায় তাঁকে প্রবৃত্ত হতে হয়। উচ্চচীৎকারে আকাশকে বিদীর্ণ করে তিনি বিদ্রোহের তূর্য হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। এই তৃষ্ণাদগ্ধ কণ্ঠের গানে তাই কেবলই হাহাকার।

নজরুলের কাব্যধারায় কোনো বিবর্তন নেই। 'দারিদ্র্যে' প্রকাশিত দ্বন্দ্ব তাঁর চিরদিনের। মাঝেমাঝে যখন চিত্তবিক্ষোভ চরমে উঠেছে তখনই সংঘাতের খবর কবির মনের অন্তঃপুর থেকে কবিতার বহিরাঙ্গনে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই দ্বন্দ্বজাত কোনো স্পষ্টরেখ অগ্রগতির স্বাক্ষর নজরুলের কবিতায় লক্ষণীয় নয়। মাঝেমাঝে এই কণ্টকবিদ্ধ কবিপ্রাণ অভিযাত্রীদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপন মনের নিভৃত নির্জনে এসে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে তখন আদিগন্ত অবসাদ আর বিষণ্ণতা। নজরুলের কবিতার একপ্রান্তে তেজোদ্দীপ্ত গর্জনমুখরতা, অন্যপ্রান্তে ক্লান্ত-করুণ চিত্ররচনায় লঘু খেয়ালী কল্পনাশ্রয়ী মনমৌমাছির মেতে ওঠা। পৌষের ধানকাঁটা ক্ষেত তখন কবিকে ডাকে, সর্ষের ফুল যেন চোখে স্নেহস্পর্শ বুলায়, অকেজোর গানে অকারণে যোগ দিতে সাধ যায়। হলুদ অতসীর নাক-ছাবি আর নীল অপরাজিতার ডুরেপরা গ্রাম্যকিশোরী কিংবা বাতায়নপার্শ্বের গুবাকতরুর সারি কবিচিত্তকে আকর্ষণ করে। বিদ্রোহী কবি তখন বলেন :

নজরুলের কাব্যধারায় বিবর্তনের অভাব

হে মোর রাণি, তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।
আমার বিজয়কেতন লুটায় তোমার চরণতলে এসে।
আমার সমরজয়ী অমর তরবারি
দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হয়ে ওঠে ভারী,
এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি,
এই হার-মানা-হার পরাই তোমার কেশে॥

কিন্তু এই বিশ্রম্ভালাপ শেষ না হতেই আবার পথের ডাক শোনেন কবি নিজের অন্তরেই—'ডাকে পথ, হাঁকে যাত্রীরা কর বিদায়ের আয়োজন'—আবার সংগ্রাম-মুখর অভিযান শুরু হয় তাঁর কবিতায়। *

* অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত-রচিত

নজরুলের কবিমানস

[রচনার সংকেতসূত্র : প্রারম্ভিক ভূমিকা—কাব্যপাঠকালে কবিমানসের সঙ্গে পরিচয়-সাধনের প্রয়োজনীয়তা—কবিকৃতি ও যুগবাণী—নজরুলের পরিবেশ ও উত্তরাধিকার—রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বাল্যকৈশোর—লেটোনাচের কবি নজরুল—বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন—বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন—নজরুলের সৈনিকজীবন—নজরুলের কারাবরণ—কবির শিশুপুত্রের মৃত্যু—অসহযোগ-আন্দোলন ও খিলাফৎ-আন্দোলন—কবিবিদ্রোহী নজরুল—সাম্যের কবি নজরুল—গীতকার নজরুল—নজরুলকাব্যের বৈচিত্র্য—নজরুলের কবিকৃতির দোষগুণ—নজরুল ইস্‌লাম যুগের কবি]

॥ ১ ॥

প্রারম্ভিক ভূমিকা

তত্ত্ববিচারে স্রষ্টা ও সৃষ্টি অভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তারা বিভিন্ন। একের অনুসৃতিতে আরকে পাওয়া হয়ত যায়, কিন্তু তা অবান্তর ফলের মতো। অর্থাৎ, সৃষ্টিকে দেখে-চেখে যে আনন্দ তা স্বয়ংসম্পূর্ণ, তার সঙ্গে স্রষ্টার সম্বন্ধবোধের, ঐক্যবিচারের যে আনন্দ তা একজাতীয় নয়। একটি ভোগীর, শিল্পীর, কবির—অপরটি যোগীর, সাধকের, তাত্ত্বিকের। তা হলেও কিন্তু একান্তভাবে আলাদা করে দেখা যায় না এ দুটিকে—স্রষ্টাকে ও সৃষ্টিকে। একের সঙ্গে আর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এজন্যেই শিল্পীরা সাধক হয়ে পড়েন, কবিরা দার্শনিক। এর বিপরীতটাও দেখা যায়। কাজেই কাব্যজিজ্ঞাসা ও কবিজিজ্ঞাসা আলাদা হয়েও অনেকাংশে এক। আবার, এক হয়েও বহুলাংশে আলাদা।

কবিমানসের সঙ্গে পরিচয়-সাধনের প্রয়োজনীয়তা

কবিনিরপেক্ষ কাব্যপাঠ যে চলে না, বা তা থেকে রসাস্বাদন করা যায় না, একথা কেউ বলতে পারেন না। মেঘদূত-কাব্যপাঠে কালিদাসকে জানা অপরিহার্য নয়, কিংবা কবিকে না-জানা থাকলে কাব্যরস-আস্বাদনে কোনো বাধা আছে বলে মনে করি না। কবি সপ্তদশোত্তর শত শ্লোকের রঙে-রেখায় একটি বিশেষ স্থান ও কালের স্বপ্নচ্ছবি এমন নিপুণভাবে এঁকেছেন যে, রসিক পাঠকের মনোমুকুরে তা জীবন্ত হয়ে উঠতে দেরি লাগে না। মহাকাব্যগুলি সম্বন্ধেও একথা খাটে। তথাপি কাব্যরস একটি অবিমিশ্র রস নয়। নয় বলেই গোটা মানুষের চিত্ততলের অগুন্তি কৌতূহল, প্রশ্ন, সমস্যার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে আর-একটা মানুষের হৃদয়ের অনুরূপ কৌতূহলাদির যে উপভোগ—তা-ই এ ক্ষেত্রে রসোপভোগ। কবিচিত্তের ও পাঠক-চিত্তের জটিল আদানপ্রদানপদ্ধতির মাধ্যম হচ্ছে কাব্য। কাজেই সর্বদা প্রত্যক্ষ

না হলেও, কাব্যরসভোগের আড়ালে যে কবির সমগ্র মনটি থেকে যায় এবং কাব্যের বিচিত্র-রস-আস্বাদনের ব্যাপারে কবিমানস যে একটি স্থির সহায়ক, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষ করে বর্তমানকালের গ্রন্থিল ও ক্ষিপ্রগতিক লিরিক-জাতীয় কবিতার রসনিষ্কাষণে কবিমানস একটি অপরিহার্য যন্ত্র।

কবিকৃতি ও যুগবাণী

স্থানে ও কালে মানুষের বাস। মানুষ দেহে ও মনে, চিন্তা ও স্বপ্নে সর্বদাই বহন করে স্থানকালের বাণী—যুগবাণী। সাহিত্যও এইদিকের বিচারে স্থানকালের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না—একান্ত করে। কোন্ কবি জীবনের কোন্ দিকটা কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন এবং কীভাবে তাঁর চিত্তকে দোলায়িত করেছে দৈনন্দিন জীবনের নানা ঢেউ, তা বুঝতে হলে স্থানকালের ইতিহাসগত প্রেক্ষাপটে কবিমানসের সামগ্রিক বিচার দরকার। নজরুল সম্বন্ধেও তাই করা যাক।

॥ ২ ॥

বাংলা ১৩০৬ সালে [ইংরেজী ১৮৯৯ সালে] নজরুলের জন্ম। জন্মস্থান বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রাম। দুঃসহ দারিদ্র্যের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় জীবনের প্রথম-প্রভাত থেকেই। অর্থের অভাব যে কী বস্তু, এই অর্থগান্ধী সভ্যতার যুগে কবি তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই, দেখা যায়, তাঁর জীবনে আর্থিক চিন্তা কোনোদিন স্বীকৃতি পায়নি। তিনি ভেঙে ফেলতে চেষ্টা করেছেন অর্থবনিয়াদ বর্তমান সভ্যতার পাষাণপ্রাচীরকে।

নজরুলের পরিবেশ ও উত্তরাধিকার

এ জাতীয় দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে, প্রথম-জীবনে যে-সব লোক অশেষ দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করেন, উত্তর-জীবনে টাকার মুখ দেখলে তাঁরা হয়ে উঠেন অসম্ভব কৃপণ ও অর্থপিশাচ। টাকাকে তাঁরা জীবনের একমাত্র পরমার্থ বলে মনে করেন। পৃথিবীতে এ জাতীয় লোকই বেশি। নজরুলের ক্ষেত্রেও এটা হতে পারত। কিন্তু হল যে না তার একমাত্র কারণ, তিনি সমাজে অর্থ-বিত্তের প্রভাব দেখেছেন বটে কিন্তু তার কাছে হার মানেননি ; এটাকে বিকৃতি বলে মনে করেছেন, সমগ্র সমাজদেহের বিষব্রণ বলে জেনেছেন। বরংচ দারিদ্র্য তাঁকে অধিকতর আত্মসচেতন করেছে, মানুষের মূল্য সম্পর্কে নির্ভুল নির্দেশ দিয়েছে। দারিদ্র্য সম্বন্ধে পরবর্তী জীবনে তিনি প্রশস্তি রচনা করে বলেছেন—'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান।' এ প্রসঙ্গে একটা জিনিষ মনে হয়, ঠিক জানি না, তা এই যে—নজরুলের জীবনে যে-একটি নিরাসক্ত বৈরাগীর সাক্ষাৎ পাই, তার মধ্যে

কি জন্মাধিকারগত কোনো ধারাবাহিকতা আছে? নজরুলের পিতামাতার দিক দিয়ে কেউ কি স্ফী ছিলেন?

স্কুলে পড়া নজরুলের হয়নি। আর্থিক অভাব ছিল, কিন্তু তা একমাত্র কারণ নয়। কেন-না, নজরুলের মনের মধ্যে সংগুপ্ত রয়েছে একটা বেদুইন বিদ্রোহী, যে চলতে পারে না চিরাচরিত পাকা রাস্তার নির্ভুল নিঃশঙ্কতার মধ্যে। স্কুলে যাওয়া এবং স্কুল ছেড়ে-আসা নজরুলের জীবনে একটা স্বাভাবিক ঘটনা ছিল।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের কথা মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথও স্কুলে পড়তে পারেননি। ধাতে সয়নি তাঁরও। কিন্তু নজরুলের পরিবেশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যবধান আকাশ-পাতাল। কবিমানসগঠনে দুইজনের বাল্য ও কৈশোরের তুলনামূলক বিচার করলে কথাটা স্পষ্ট হবে। স্কুলমাষ্টারের কাছে রবীন্দ্রনাথ পড়েননি বটে, কিন্তু গৃহশিক্ষকরা তাঁর প্রতি কদাচ শিথিলপ্রযত্ন হননি।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বাল্যকৈশোর

কঠোর নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে 'দাসরাজতন্ত্রে' কেটেছে তাঁর শৈশব, বাল্য ও কৈশোর কেটেছে দাদাবৌদি ও পিতার প্রচুর স্নেহ ও মৃদু শাসনের আওতায়—প্রাচুর্যের মধ্যে ডুবে, ভেসে, সাঁতার কেটে। দুষ্টামি রবীন্দ্রনাথেরও ছিল, কিন্তু তা কখনো গৃহবাসী বা পুরবাসীদের কাছে উপদ্রব হয়ে ওঠেনি। নজরুলের ক্ষেত্রে এর বিপরীত অবস্থা। অর্থের অসচ্ছলতা, জীবনোপকরণের গ্রাম্যতা ও স্বল্পতা এবং সর্বোপরি উচ্ছৃঙ্খলতার অবাধ সুযোগ তাঁকে দুর্বার করেছিল, বেহিসাবী করে তুলেছিল। দুই কবির উত্তর-জীবনের চিত্তবিকাশের উৎসও বয়সের এই তুলনামূলক বিচারে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুনিয়ন্ত্রিত সচ্ছল সংসারব্যবস্থার মধ্যে ঋষিতুল্য পিতার স্নেহসান্নিধ্যে, কৃতবিদ্য ভ্রাতা ও চারুশীলা ভ্রাতৃজায়াদের সাহচর্যে কিশোর রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে উদ্ভিন্ন হয়েছে প্রশান্ত সৌন্দর্যানুভূতি, অতিমানসিক অনুসন্ধিৎসা, সুসমঞ্জস ভাবাবেগ। আর, অভাব-অনটন-পীড়িত গৃহে, নিরভিভাবক কিশোর-বয়সের অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতায় সহস্রবিধ গ্রাম্য-দুষ্টপনার মধ্যে নজরুলের কবিমানসে সূচিত হয়েছে অশান্ত উদ্দীপনা, প্রখর প্রণয়পিপাসা এবং চারদিকের বাধাকে বিধ্বস্ত করবার দুর্ধর্ষ প্রতিজ্ঞা।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানসমাজে লেটোনাচের প্রচলন দেখা যায়। যাত্রাগান ও কবির লড়াইয়ের মিশ্রিত সংস্করণ এই লেটোনাচ। বিভিন্ন দলে লড়াই হয়। গ্রাম্যকবিরাই পালাগান রচনা করে এবং যে-কবির রচনা সর্বোত্তম হয় তাকে গ্রামের ভাষায় বলে 'গোদাকবি'। নজরুলের চাচা ছিলেন একজন গোদাকবি। তাঁর উৎসাহে নজরুল বাল্যকাল থেকেই লেটোনাচে গীত ও পালা রচনা

করতেন। বার-তের বছর বয়সে নজরুল বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, গান ও পালা লিখে রীতিমতো অর্থোপার্জন করতেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকৈশোরে ঠাকুরবাড়ীতে দ্বিজেন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যে-সাহিত্যের, সংগীতের, নাটকের আসর বসত—রবীন্দ্রনাথের কবিমানস-গঠনে তার দান যে অসামান্য, কবিগুরু নিজেই তা স্বীকার করেছেন। নজরুলের কবিমানসবিকাশের ক্ষেত্রেও তেমনি লেটোনাচের প্রভাব কম নয়। উভয় কবির উত্তর-জীবনের রচনাতে দোষগুণ এবং তার প্রকাশধারার ক্ষীণরেখা এখানেও সুপরিস্ফুট। ঊনিশ শতকের শেষপাদের বাঙালীসংস্কৃতির ও সাহিত্যের সর্বোচ্চ স্তরের জলমাটিতে রবীন্দ্রনাথের কবিমানস অঙ্কুরিত। ফলে পরিমার্জিত প্রকাশের নিপুণ সৌন্দর্যরেখায় তাঁর রচনা হয়েছে ঝক্‌ঝকে, বুদ্ধিদীপ্ত, ভাবের সংযত গাম্ভীর্যে বিচিত্র। পক্ষান্তরে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পল্লীবাংলার ক্ষয়িষ্ণু শিথিলবন্ধন সমাজব্যবস্থার নিম্নস্তরের সাধারণ মনের প্রতিচ্ছায়া পড়েছে নজরুলের কবিমানসে, এনে দিয়েছে নজরুলের সাহিত্যে উদ্দাম ভাববন্যা, প্রাণের আকূতির প্রাধান্য এবং অপরিমার্জিত অজস্রতা। সতেজ ক্ষিপ্র প্রাণবত্তা, প্রত্যক্ষগম্য স্থূলতার তীব্র আবেগ, বিচিত্র শব্দযোজনা ও ভাবপ্রকাশের, বিশেষ করে, অনু-প্রাসের চমৎকারিত্ব—সবগুলিই মনে হয় লেটোনাচের কবির গুণ ও দোষ।

নজরুল একটি হিন্দুরমণীকে বিবাহ করেছেন। এ-জাতীয় বিবাহ নতুন কিছু নয়। কিন্তু নজরুল নিজেকে কোনো ধর্ম ও সম্প্রদায়ের গণ্ডী কেটে সীমাবদ্ধ করেননি। আর এটি, যেমন বহুক্ষেত্রে হয়, বিবাহোত্তর বা প্রাগাসন্ন পরিণয়ঘটনা নয়—নজরুলের সমগ্র জীবনের ঘটনা। নজরুলের দেহে সূফীরক্ত আছে কিনা, জানি না। কিন্তু এই অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মবিশেষনিরপেক্ষ মনগঠনে লেটোনাচ যে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা নিশ্চিত। বাংলাদেশের লোকসংগীত ও গ্রাম্যসংগীতের মধ্যে সর্বধর্মের একটি মিশ্রিত ও সমন্বয়ী রূপ দেখা যায়। গ্রাম্যগানে যেমন রামায়ণ-মহাভারত ও হিন্দুপুরাণের বিষয়বস্তুর আলোচনা আছে, তেমনি আছে মুসলমানী পুরাণ ও ধর্মের নানাবিষয় ও শাস্ত্রের কথা। নজরুলের উত্তর-জীবনের রচনাতে এই রূপটির ও হিন্দুমুসলমান-ধর্মপুরাণের যে-অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় তার উৎস নিহিত লেটোনাচের কবিটির মধ্যে। অবশ্য তাঁর স্বভাবসুলভ গুণও যে এর মূলে আছে তাও সহজে অনুমেয়।

লেটোনাচের কবি নজরুল

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সুরুতে নজরুল ছয় বছরের শিশু। অরন্ধন, বয়কট, রাখীবন্ধন নিয়ে বাংলাদেশে সেদিন যে-ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল তার

উত্তেজনা-উদ্দীপনা পরিমাপ করা আজ কঠিন। সমস্ত দেশটি যেন ভূকম্পনে কেঁপে উঠল থর্‌থর্‌ করে। কবিতায়-গানে-প্রবন্ধে সারা দেশে আগুন ছড়াতে লাগলেন রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, রামেন্দ্রসুন্দর, বিপিন পাল প্রভৃতি দেশনায়ক ও চিন্তা-নায়কগণ। শুধু যে শিক্ষিত ও সহরবাসীদের মধ্যে সীমিত রইল এ আন্দোলন তা নয়, অশিক্ষিত গ্রাম্যসাধারণের অঙ্গনে-অন্দরেও এর ডাক গিয়ে পৌছল। মুকুন্দদাস তাঁর অভিনব পদ্ধতির যাত্রায় স্বদেশী প্রচার করতে লাগলেন, গ্রাম্যকবিরাও চুপ করে থাকলেন না। কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ না দিতে পারলেও অনুমান করে বলা যায় যে, অন্যান্য গ্রাম্যসংগীত ও আমোদপ্রমোদের মতো লেটো-নাচের মধ্যেও বঙ্গভঙ্গের ও স্বদেশী-আন্দোলনের গান সেদিন আপন প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বভাবকবি নজরুল হয়তো বাল্যবয়সে তা শুনে থাকবেন বা গেয়ে থাকবেন।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী-আন্দোলন

তারপর ১৯০৮ সালের কথা। বোমার যুগ—ক্ষুদিরাম-কানাইলালের যুগ। আটনয় বছরের বালক তখন নজরুল। ডানপিটে এই বালকটির মন কীভাবে গ্রহণ করেছিল ক্ষুদিরাম-কানাইলালের ফাঁসির কথা—বারীণ প্রভৃতির দ্বীপান্তরের কাহিনী—তা আজ জানাতে পারেন একমাত্র কবি নিজে। 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'—ধরনের চাপা গানে সেদিন আমাদের সমস্ত পল্লীবাংলা শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। নজরুল তাতে কী করেছিলেন? বিপ্লবীদের রহস্যময় মৃত্যুমাতাল জীবন ও কার্যকলাপের কাহিনী শুনে নজরুলের তরুণ চিত্ত কি দুর্বার কল্পনাতে নেচে ওঠেনি? বিদ্রোহী কবি বলে সহসা যিনি বাংলাদেশে খ্যাত হলেন, বাংলার প্রথম বিপ্লবপ্রচেষ্টার দিনগুলোর রাঙা আলোতে কী রকম দেখিয়েছিল তাঁকে? এর বছর দশেক পরে নজরুল যখন হাবিলদার হয়ে ফিরে এলেন যুদ্ধ থেকে, তখন বারীনদা'র 'বিজলী' আপিসে তাঁর যাতায়াত ছিল, এবং এই বিপ্লবী বীরের সঙ্গে অন্তরঙ্গতাও যে খুব বেড়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'অগ্নিবীণা'-গ্রন্থখানিতে। নজরুলের প্রথম ও সেরা কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা'র উৎসর্গপত্রে লেখা রয়েছে: 'ভাঙা বাঙ্‌লার রাঙাযুগের আদিপুরোহিত সাগ্নিক বীর শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'।

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন

প্রথম-মহাযুদ্ধে নজরুল সৈনিকরূপে যোগদান করেন। তখন তাঁর বয়স আঠার-উনিশ বছর। তার আগে বারকয়েক স্কুলেও ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু পড়া আর হয়ে ওঠেনি। চলে গেলেন বেঙল্‌ রেজিমেণ্টের সঙ্গে করাচীতে।

এই অঞ্চলে কিছুকাল অবস্থান এবং আরব-ইরাণ-তুর্কীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় নজরুলের কবিমানসগঠনে বিশেষ অর্থবান হয়েছে। তাঁর রচিত কবিতার শব্দপ্রয়োগে, বিষয়নির্বাচনে এই জীবনটির দান অনেক। অথচ মুসলমান-সংস্কৃতির এত নিকটসান্নিধ্যে এসেও এতটুকু গোঁড়ামি তাঁকে স্পর্শ করেনি। তা ছাড়া, নবীন তুর্কী ও কামালপাশার অভ্যুত্থান তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে শাণিত করেছে—প্রাণে জুগিয়েছে দেশ ও জাতির জন্যে অফুরন্ত উত্তেজনা।

নজরুলের সৈনিকজীবন

যুদ্ধ থেকে নজরুল ফিরলেন হাবিলদার হয়ে। তাঁর পদোন্নতি হয়েছে দেখে অবাক লাগে। কারণ, নজরুলের চরিত্রের ধারাবাহিক বিচার করলে দেখা যাবে যে, সেখানে প্রথমশ্রেণীর সৈনিকের কোনো উপাদান ছিল না। নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলারক্ষা—এ দুটিই নজরুলের চরিত্রবিরোধী। জাত-বোহেমিয়ান কখনো ভালো ফৌজ হতে পারে বলে মনে হয় না। সৈনিক-জীবনের মধ্যে যে-গতি ও প্রাণচাঞ্চল্য এবং অনিশ্চিত বিপদের প্রগাঢ় সম্ভাবনা আছে, এসবই বোধ করি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল বেশী। সৈনিকজীবনের কোনো স্পষ্ট ছাপ তাঁর রচনাতে তেমন চোখে পড়ে না। তবে বহু গানে-সুরে-কবিতায় তিনি একটা যুদ্ধের আবহাওয়া এনে দিলেন বাংলাসাহিত্যে। রক্ত-টগবগানো গান এবং কবিতা, যোদ্ধার এমন সারল্য ও স্পষ্টতা নিয়ে, আর-কোনো বাঙালী কবির হাতে ফোটেনি।

বস্তুত বিপুল প্রাণশক্তি নজরুলের জীবনের বড়ো পরিচয়। এরই উল্লাসে তিনি কোথাও কদাচ স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারেননি, কৃপণ ও হিসেবী হতে পারেননি কখনো। যুদ্ধ থেকে ফিরে তিনি মেতে গেলেন স্বদেশী হাঙ্গামাতে। জেলে গেলেন। নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন তিনি। গানে-কবিতায় তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল বাংলাদেশের সর্বত্র। এই সময়টাই তাঁর চমকপ্রদ কবিজীবনের শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ—তাঁর বিদ্রোহী-জীবনের সবচেয়ে আত্মসচেতন ক্ষণও।

নজরুলের কারাবরণ

এর পর নজরুলের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল তাঁর চার বছরের শিশুপুত্র বুলবুলের মৃত্যু। অত্যন্ত অভিভূত হলেন শোকে নজরুল। শোক ভুলতে তিনি অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু হলেন, দীক্ষা নিয়ে রীতিমতো যোগচর্চা করতে লাগলেন। সাহিত্যিক-জীবনে এর মানসিক প্রতিক্রিয়া না হয়ে পারে না। শেষের জীবনে তাঁর গানের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিকতার সুর ফুটে উঠেছে। যদিও তা তখনো খুব স্পষ্ট তেমন নয়—তবু

কবির শিশুপুত্রের মৃত্যু

মনে হয়, নজরুল যদি সুস্থ হয়ে বসে, কেবল প্রকাশক ও গ্রামোফোন কোম্পানির চাহিদা মেটাবার চেষ্টা না করে, হিসেব করে লিখতেন, তবে তাঁর জিজ্ঞাসু তথা যোগীজীবনের ছাপ সুপরিস্ফুট হয়ে দেখা দিত। এ বিষয়ে আমরা এতটুকু সংশয়ান্বিত নই।

॥ ৩ ॥

নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' [প্রথম সংস্করণ] প্রকাশিত হল ইংরেজি ১৯২২ সালে। নজরুলের বয়স তখন তেইশ। অবশ্য কবিতাগুলো লেখা হয়েছিল পুস্তকাকারে প্রকাশের বছর-দুই-কাল পূর্বেই। এই একখানা বই-ই বিদ্রোহী কবি নজরুল ইস্‌লামের প্রতিভার ও প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বলতম অভিজ্ঞান। ইংরেজি ১৯২২। মাহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বিপুল অহিংস অসহযোগ-আন্দোলন তখন সুরু হয়েছে বিশাল ভারতবর্ষের দিকে দিকে। তার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে খিলাফৎ-আন্দোলন। এর পশ্চাৎপটে রয়েছে চতুর ইংরাজের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের বিষাক্ত স্মৃতি। দেশ তখন অহর্নিশ টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে তপ্ত কটাহের মতো—বিশেষ করে, শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী। নজরুলের কবিতা—'অগ্নিবীণা'—বেরুল এই সময়। সময়টি লক্ষ্য করবার মতো।

অসহযোগ-আন্দোলন
ও
খিলাফৎ-আন্দোলন

কবিতা-গান-উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধ-নাটক-স্বরলিপি নিয়ে নজরুল ইস্‌লাম বই লিখেছেন সংখ্যায় অনেকগুলো। কবিতা আছে নানান্ স্তরের। স্বদেশী কবিতা অর্থাৎ দেশাত্মবোধক ও রাজনীতিক কবিতা, প্রেমের কবিতা, নিসর্গমূলক কবিতা, কিশোরদের কবিতা। গানগুলিকেও—স্বদেশী, প্রেমের, হাসির ও আধ্যাত্মিক—মোটামুটি এই কয় ভাগে ভাগ করা চলে।* তাঁর গদ্যরচনা গদ্যধর্মী নয়—সংযমের কঠোরতায়, যুক্তির গাঢ় বন্ধনে প্রতিপাদ্য কথা কখনো ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে না, কাব্যের ভাবালুতায় অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। বস্তুত গদ্যরচনায় গল্পকার-নাট্যকার-হিসেবে নজরুলের বিচার হয় না। সেগুলোর মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতিভার ছাপও স্পষ্টরেখ নয়। নজরুল কবি,—কবিতা ও গানের মাধ্যমেই তাঁর যথার্থ পরিচিতি।

॥ ৪ ॥

নজরুলের সাধারণ ও লোকপ্রসিদ্ধ পরিচয় হল বিদ্রোহী কবি তিনি। তাঁর বিখ্যাত কবিতাগুলোর অন্যতম 'বিদ্রোহী'-র সঙ্গে নজরুলের অচ্ছেদ্য যোগাযোগ রয়েছে বলে তাঁকে বিদ্রোহী কবি বলা হয়। আবার, এমনও বলা

যেতে পারে যে, তাঁর কবিতাবলীর প্রধানতম সুর হল বিদ্রোহের—তাই তিনি বিদ্রোহী কবি। এইটেই যে অধিকতর যুক্তিসম্মত তাতে সন্দেহ নেই। বিদ্রোহী কে? যে-মানুষ 'চির-উন্নত-শির' অর্থাৎ কারো কাছে কোনো কারণেই যে নিজ মস্তক নত করে না; যে-সংগ্রামশীল চিত্তের কামনা দুর্বার, অপ্রতিহত; আর, শান্তি সম্বন্ধে যার কথা:

কবি-বিদ্রোহী নজরুল

'যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীমরণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।'

তা হলে মোটামুটি বিদ্রোহীর যে-চিত্র পাই তা রবীন্দ্রনাথের অবুঝ-সবুজের সমগোত্রীয়, যদিও রঙে-রসে কিছু কড়া ও উগ্র। প্রায় সমস্ত কবিতার মধ্যে এই যে হাঁক ছেড়ে ডাক দেওয়ার নিঃশঙ্ক ও নিঃসংকোচ স্পর্ধা, এর উৎস রয়েছে নজরুলের কবিমানসের গভীরে। বাল্যকালে নজরুলের দিন কেটেছে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে ও সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে। চরিত্রের অনমনীয় জিদের মধ্যে প্রাণবান যোদ্ধার বিদ্রোহী-রূপটি বালককাল থেকেই প্রচ্ছন্ন ছিল। যুদ্ধোত্তর কালে বাংলার বিপ্লবীদের সান্নিধ্য ও অন্তরঙ্গ সাহচর্যে পাগলা হাওয়ায় আগুনের মতো তা লেলিহান শিখাবিস্তার করে জ্বলে উঠেছে মাত্র।

রাজনীতিক কবিতাগুলোর মধ্যে তাঁর 'সর্বহারা' বইখানি ও সাম্যবাদমূলক কবিতাগুলো 'বিদ্রোহী'-কবিতাটির মতোই যুগপ্রভাবিত রচনা। রাজনীতিক ও সমাজনীতিক চেতনা উঁচুদরের কবিতা হয়ে ফুটে উঠেছে বাংলাতে খুব কম লেখকের রচনায়। যাঁরা রাজনীতিক কবিতা রচনা করেন, তাঁদের অধিকাংশের লেখার মধ্যে কাব্য নেই, আছে মতবাদপ্রচারের উৎকট শাব্দিক কসরৎ। আর, যাঁদের লেখায় কিছুটা কাব্য আছে, তাঁদের মধ্যেও সমাজচেতনা খেলো,—গাঢ় অনুভূতিসিক্ত নয়। তা ছাড়া, সাম্যবাদ বলতে নজরুল ইস্‌লাম শ্রেণীসংগ্রামপ্রসূত 'কম্যুনিজম্' বোঝেননি। শ্রেণীগত মানুষের কথাই নজরুল ভেবেছেন, এবং শ্রেণীহীন সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হোক—এ তাঁরও কামনা। কিন্তু তিনি গান গেয়েছেন সমষ্টিমানুষের—'মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান'। জাতি-ধর্ম-শ্রেণী-স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষ যে মানুষ তারই নির্দ্বন্দ্ব প্রতিষ্ঠা হল নজরুলের ঈপ্সিত সাম্যপ্রতিষ্ঠা। এখানেও 'বিদ্রোহী'-কবিতার মূল সুরটিই ধ্বনিত হয়েছে—উৎপীড়ক ও উৎপীড়িত, এই দুয়ের অবসানই কামনা করেছেন কবি।

সাম্যের কবি নজরুল

গান লিখেছেন নজরুল প্রচুর।' প্রচুর এবং নানা রসের। অধিকাংশই ফরমাইসি গান। গ্রামোফোন-কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন বলে তাঁকে এমনভাবে লিখতে হয়েছে। কাজেই কবির অধিকাংশ গান উঁচুদরের কাব্যরসে সিক্ত হয়নি। কিন্তু যে-গানগুলি তিনি নিজের খুশিমতো লিখেছেন তার মধ্যে অনেকগুলোই কাব্যগুণে অতিশয় সমৃদ্ধ। নজরুলের স্বদেশীগানের মধ্যে যেমন তাঁর চরিত্রের বিশিষ্টতার ছাপ আছে, তেমনি তাঁর প্রেমের গানগুলির মধ্যে আছে একটা অভিনব রসমাধুর্য। বাংলা গজলে নজরুলের দান অসামান্য।

গীতকার নজরুল

নজরুল ইস্‌লামের কবিতায়, বিশেষ করে প্রেমের কবিতার ছন্দে ও ভঙ্গিতে—কোথাও কোথাও ভাববস্তুতেও—রবীন্দ্রনাথ এবং সত্যেন দত্তের প্রভাব চোখে পড়ে। এটা খুবই স্বাভাবিক। ওই প্রভাব জোর করে ঢাকতে গেলে তাঁর কবিতা যে বিস্বাদ হত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু নজরুল কোথাও কোনো কবিকে ঠিক অনুকরণ করেননি। নিজের কাব্যধারায় যেখান থেকে যে-স্রোত এসে পড়েছে তাকে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন অকুণ্ঠ সারল্যে। এই তাঁর বিশিষ্টতা। গানের ক্ষেত্রে কিন্তু নজরুলের কবি-কৃতি নিজস্বতায় স্মরণীয়, ভাষা এবং ভঙ্গিও একান্তভাবে তাঁর নিজের তৈরী, বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন মনে আসে এই যে, বিদ্রোহী কবির মধ্যে এমন কী মানসিক পরিবর্তন ঘটল যে, তিনি সংগ্রামী অসি ছেড়ে বাঁশী ধরলেন, যুদ্ধের তূর্যবাদন ছেড়ে দিয়ে পলাতকা প্রিয়ার প্রেমস্মৃতির হার গাঁথতে বসে গেলেন চোখের জলের সূত্র দিয়ে? এর কোনো অস্পষ্ট ছাপ কি কবির চিত্তাকাশে কোথাও ছিল না—সজল মেঘের কোনো সুদূর ইঙ্গিত? আমাদের মনে হয়, যৌবনে জয়যাত্রার সময়ে নিজের যে-রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তার মধ্যেই সুপ্ত ছিল এর বীজ—'মোর এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর-হাতে রণতূর্য'। সুতরাং বলা যেতে পারে, যে-বাঁধনহারা যৌবনশক্তি তাঁকে 'বিদ্রোহী' করে তুলেছে, সেই একই শক্তি তাঁকে নারীরপ্রেমের দিকে সবলে আকর্ষণ করেছে। কাজেই শুধু রণতূর্য নয়, বাঁশের বাঁশরীও বিদ্রোহীরই হাতের যন্ত্র। মহাকালী বামহস্তে ধরেছেন খড়্গ ও নৃমুণ্ড, আবার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে দান করেন তিনি বরাভয়। পূর্ণতা এ দুটিকে নিয়েই।

নজরুলকাব্যে বৈচিত্র্য

॥ ৫ ॥

নজরুলের গান ও কবিতায় দোষগুণ দুই-ই আছে। তার বিচার-বিশ্লেষণ বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বাইরে। এখানে বিশেষ করে বক্তব্য এই যে, উক্ত

রচনার দোষ ও গুণ দুইই এসেছে প্রথমজীবনের লেটোনাচের কবির মনের স্রোতে ভেসে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, কবির লেখায় কোনো তত্ত্ব বা চিত্র বা সুর একটানা বয়ে যেতে পারেনি একটি কোনো বিশেষ ভাবের স্রোতোধারায়। মাঝখানে তা খণ্ডিত হয়ে গেছে ব্যভিচারী ভাবের বা অন্যকোনো ভাবের চকিত আত্মপ্রকাশে। সহসা যেন আর পথ পাওয়া যায় না, কবি কী বলতে চান, বোঝা কঠিন হয়ে ওঠে। এর কারণ এই যে, প্রথমজীবনে হাল্‌কা চিন্তা ও কথার লঘু সঞ্চরণের মধ্যে যে-শিক্ষা ও মন তৈরী হয়েছিল, পরবর্তী জীবনে তার প্রভাব থেকে তা মুক্ত হতে পারেনি। এইজন্যে নজরুলের গান ও কবিতায় যতটা প্রাণাবেগ ও ক্ষিপ্র গতি, ধ্বনিগাম্ভীর্য ও চাতুর্য আছে, তাঁর সমসাময়িক বহু কবির মধ্যে তা নেই। তা হলেও, একথা মানতেই হবে যে, নজরুলের অধিকাংশ রচনার মধ্যে গভীর রসানুভূতির স্পন্দন বাস্তবিকই কম। কারণ, নজরুল তেমন করে কোনোদিন সতর্ক হয়ে লেখেননি বা লেখা পরিমার্জিত করে প্রকাশের চেষ্টা করেননি। অশিক্ষিতপটু গ্রাম্যকবিদলের অপরিচ্ছন্ন সরস স্থূলতার মধ্যে যে-সহজ ও অকপট প্রাণশক্তি ক্রিয়া করে—তা ছিল তাঁর বরাবরই। এইটি একাধারে তাঁর কবিতার দোষ ও গুণ হয়েছে, সন্দেহ নেই, এবং এই দোষগুণ নিয়েই নজরুল নজরুল হয়েছেন।

নজরুলের কবিকৃতির দোষগুণ

নজরুল ইস্‌লাম নিজের ক্ষমতা ও কবিকর্ম সম্পর্কে অচেতন ছিলেন না। জীবনে একটা বড়ো-কিছু হবার চেষ্টা, বা মহৎ স্রষ্টা-কবির অমর আসনের জন্যে পরিশ্রম করেননি তিনি। যুগের দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে বিদ্রোহের সুরে গান বাঁধতেই তিনি এসেছেন, এবং তা-ই তাঁর কাছে যথেষ্ট মনে হয়েছে। 'বর্তমানের কবি আমি ভাই ভবিষ্যতের নই নবি'—এই কথা বলে তিনি সাহিত্যসংসারে অমরতার মূল্যবিচারক জহুরি-দলকে ক্ষান্ত করেছেন। যুগের উদ্ধত অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন তিনি, লাঞ্ছিত মানুষের সপক্ষে দাঁড়িয়েছেন কোমর বেঁধে। মানুষের প্রতি এই অতি-আত্যন্তিক ভালোবাসাই তাঁকে বিদ্রোহী করেছে, প্রেমিক করেছে—এবং আপনার শিল্পপ্রচেষ্টা সম্বন্ধেও একরূপ উদাসীন করে তুলেছে :

নজরুল ইস্‌লাম যুগের কবি

'বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষজ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।

রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,
তাই লিখে যাই এ রক্তলেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসেনাক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে,
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে !

পরোয়া করি না, বাঁচি বা না-বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
মাথার উপর জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস—
যেন লেখা হয় আমার রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ।'

নজরুলের কবিমানসবিশ্লেষণ এবং তাঁর কাব্যের মূল্যবিচারের ক্ষেত্রে এ কথাগুলি সর্বদা স্মর্তব্য। যুগোত্তীর্ণ কবি হয়তো তিনি নন, মহৎ কাব্যের স্রষ্টাও হয়তো তাঁকে বলা যায় না। কিন্তু একটি বিশেষ যুগ যে তাঁর কাব্যে অগ্নিক্ষরা অক্ষরে সুদীপ্ত বাণীমূর্তি লাভ করেছে, এটাও কম কথা নয়। এ ক্ষেত্রে নজরুল ইস্‌লাম বাংলাকাব্যসাহিত্যে অনন্য ব্যক্তিত্ব।*

কবি টমাস হার্ডি ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** টমাস হার্ডি ও যতীন্দ্রনাথের যুগপরিবেশ—হার্ডি ও যতীন্দ্রনাথের দুঃখভাবনা—এ দুজন কবির দুঃখবাদ-প্রসঙ্গে—যতীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব—যতীন্দ্রনাথ ও হার্ডির কবিসত্তায় মিল—যতীন্দ্রনাথের মানবিকতাবোধ—নিসর্গপ্রকৃতির প্রতি হার্ডি ও যতীন্দ্রনাথের মনোভঙ্গি]

হার্ডি ও যতীন্দ্রনাথ উভয়েই বাস্তুবিদ্যাবিৎ ছিলেন, আর উভয়ের কবিজীবন কেটেছিল মহানগরীর বাইরে। এমন কি, পল্লীজীবনের প্রতি দুজনেরই কমবেশি আন্তরিক মমতা ছিল, এমন কথা বলাও অসংগত হবে না। হার্ডির কবিজীবন শেষ হয়ে আসছে এমন সময় মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের আবির্ভাব।

দূরত্বের দিক দিয়ে সাতসমুদ্র তেরোনদীর ব্যবধান থাকলেও কখনো কখনো দুজন শিল্পীর মনোধর্মের সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। ঠিক উপকরণের ও বাক্যের সম্পূর্ণ মিলের কথা নয়, মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গির একটা একমুখীনতা—এর

* অধ্যাপক হরিপদ চক্রবর্তী-লিখিত

চেয়ে বেশি মিল এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যাশা করা সমীচীন নয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হার্ডির সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ হওয়ার সময় ইংলণ্ডের যে-রকম আর্থনীতিক, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত মানসিক অবস্থা, সেইরকম সংশয়াত্মিক ও বুদ্ধিসচেতন অবস্থা স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্যায় শেষ হবার পর বাংলায় ধীরে ধীরে প্রসার-লাভ করছিল। রোম্যান্টিক ও অরূপপথচারী কবি রবীন্দ্রের গীতালি-বলাকা-পর্যায়ে যে-জীবনবোধে উত্তরণ ঘটেছিল তার মূলে এদেশের সাধারণের জীবনসংঘাত-চেতনা, বণিকবৃত্ত ইংরাজের শোষণ সম্পর্কে ধারণা, কৃষকসমাজের দারিদ্র্য, যান্ত্রিক সভ্যতার বিস্তার, এবং বিজ্ঞানবোধের উন্মেষ হয় নি এমন জনসাধারণের জড়ত্ব ও কুসংস্কার-প্রবণতাগুলি কার্যকরী হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনবোধকে অরূপবোধের সঙ্গে যুক্ত করে মানুষকে এক অতি-উদার মুক্তির পথ দেখিয়ে-ছিলেন, যার সঙ্গে কতকটা ধর্মীয় মুক্তিরই তুলনা চলে। কিন্তু সেই সময়কার কবিকুল সকলেই যে রবীন্দ্রপথানুবর্তী ছিলেন, এমন নয়। হওয়া স্বাভাবিকও নয়। বরঞ্চ এমন কথা বলা চলে যে, খ্যাতিমান কবিদের মধ্যে সকলেই অল্পবিস্তর রবীন্দ্রভাষার অনুবর্তী যদিও-বা ছিলেন, ঠিক রবীন্দ্রস্বভাবের অনুবর্তন তাঁদের পক্ষে যুক্তিসংগত ও সম্ভবপর ছিল না। আর, ছিল না বলেই তাঁরা স্বকীয় কক্ষপথে আবর্তন করেছেন, এবং স্বভাবধর্মের দিক থেকে কতকটা স্বতন্ত্র হয়েই সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন। মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় প্রভৃতি অনেকেই বিংশ শতকের পরিবর্তিত যুগের মানুষ, অথচ স্বভাবসুলভ বৈচিত্র্য নিয়ে এঁরা বাংলা কবিতার জীবন ও স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য রক্ষা করেছেন।

টমাস হার্ডি ও যতীন্দ্র-নাথের যুগপরিবেশ

ভিক্টোরীয় যুগের শেষের দিকে, হার্ডির সাহিত্যজীবন আরম্ভের সময়, ইংলণ্ডে ভাব ও চিন্তার বৈচিত্র্য আরো বেশি ছিল। হার্ডি তাঁর বাল্যে ও কৈশোরে মানুষের কল্পনা ও ভাবনায় যে-স্থৈর্য ও তৃপ্তি দেখেছিলেন, যৌবনেই তার বিপর্যয় লক্ষ্য করেছিলেন নানা অভিমতের সংঘাতে। এর মধ্যে হার্ডি তাঁর নিজ স্বতন্ত্র অনুভব ও বুদ্ধির দীপ্তি নিয়ে ইংরাজী সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করলেন। তিনি নবাগত বিজ্ঞানের আলোকে নিসর্গ ও মানুষের প্রাণপ্রবাহ ও মনোলোক পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, অথচ যান্ত্রিক বণিকধর্মকে শ্রেয়স্কর বলে গ্রহণ করতে পারেননি। কর্ষণজীবী সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল নিবিড়, তাই তীব্র সহানুভূতির সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন—একদিকে নিষ্ঠুর প্রকৃতির আঘাতে, অন্যদিকে বাণিজ্যের কর্তৃত্বে এ-সমাজ দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ছে,

এর মানুষগুলি অসহায়ভাবে অনিবার্য পরিণামের মুখে আত্মবলি দিচ্ছে। কোনো একটা অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্তী হয়ে মানুষ জীবনসংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে এবং মরছে, এই অনুভবটি সম্ভবত হার্ডি তৎকালবিস্তৃত অভিব্যক্তির ধারণা থেকে পেয়েছিলেন ; আর, মানুষের মনোলোকের বিচিত্র জটিল কামনা ও অতৃপ্তির রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন কতকটা মনস্তত্ত্ববিকলনের ধারা থেকে, কতকটা প্রত্যক্ষ জীবনের ওপর নিজ অন্তর্দৃষ্টির এক্স-রে নিক্ষেপ করে। তাই তাঁর উপন্যাসে ও কবিতায় বার বার বিমূঢ় মানুষের নৈরাশ্যের ছবি ফুটে উঠেছে।

হার্ডির মতো যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তও দুঃখবাদী অ্যাখ্যা পেয়েছেন। আর, যতীন্দ্রনাথের দুঃখভাবনা ঘিরে রয়েছে, কোনো শ্রেণী ও সমাজের নিষ্পেষণ নয়, জৈব মানুষের স্বার্থময় জীবনধর্ম আর নির্মম কোনো প্রচ্ছন্ন শক্তি। যতীন্দ্রনাথের কবিতা দেখতে গেলে আমাদের উনিশ শতকের বিশ্বাস ও জীবন্মুক্তিবাদের প্রতিবাদরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে। মোটামুটি রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের জীবনচেতনার বাহক ; এবং নিসর্গপ্রীতি, আনন্দতন্ময়তা, অরূপনিষ্ঠা, দুঃখবরণ প্রভৃতি ভাবকে স্বপ্নে বিজড়িত করে দেশময় আশা ও বিশ্বাসের প্রবাহ বইয়েছিলেন তিনি। যতীন্দ্রনাথের চিত্তে এরই প্রবল প্রতিক্রিয়া জেগেছিল। বিশ্বে অপ্রত্যক্ষ কোনো কার্যকারণসূত্র রয়েছে, এ ভাবনাকে তিনি অস্বীকার করলেন ; নিসর্গ থেকে মানুষ মুক্তির প্রেরণা পেতে পারে, এ-ধারণাকে অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করলেন; মানুষের আষ্টেপৃষ্ঠে দুঃখের বন্ধন লক্ষ্য করে সুখের কল্পনা মরীচিকা বলে মনে করলেন। হার্ডির মতো যতীন্দ্রনাথের কাব্যেও জীবধর্মময় বিজ্ঞানচেতনা বিদ্যমান, আর রয়েছে সেই বাস্তব দৃষ্টি যা জীবনের 'Other side'-কে নির্ভুলভাবে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়াস করে। হার্ডি যেমন মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগের নির্লিপ্ততা ও প্রশান্তি থেকে যুদ্ধোত্তর বাস্তব চেতনার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন, যতীন্দ্রনাথও সেইরকম রবীন্দ্রকাব্যের স্বপ্নালুতা থেকে সাম্প্রতিক বাস্তবতায় উত্তরণের স্বাভাবিক সেতুনির্মাণ করেছেন। বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যে যতীন্দ্রনাথের এই কীর্তির তেমন অভিনন্দন আজো দেওয়া হয়নি, যেমন হয়নি তাঁর সমকালবর্তী রবীন্দ্রেতর কবিধুরন্ধরদের।

হার্ডি ও যতীন্দ্রনাথের দুঃখভাবনা

কিন্তু আমাদের এই আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে একটা কথায় আসতে হয়। তা হল এই যে, যতীন্দ্রনাথ ও হার্ডিকে যথার্থভাবে 'দুঃখবাদী' বলা চলতে পারে কিনা। দুঃখবাদ তো দার্শনিক মননসঞ্জাত অভিজ্ঞতা ও মতবাদ,—অনুভূতি আর কল্পনা-সম্বল কবিরা কি স্থায়ী কোনো মতবাদের পোষক হতে পারেন? কাব্যকলা তো মননজাত অভিমত কিংবা অনুশাসন নয়, জীবন ও জগৎকে বিশেষ একটা দৃষ্টিভঙ্গি

বা কবিস্বভাব-অনুযায়ী দেখার আগ্রহ মাত্র। এই আলোচনার বিষয়টি সাধারণ সাহিত্যালোচনার পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে বলা যেতে পারে, কাব্যবিচারে স্পষ্টত দুটি পৃথক শ্রেণীর মনীষী রয়েছেন। একশ্রেণীর সমালোচকের মতে, কবিরা যা বলেন তার মধ্যে বৃহত্তর সত্যের ইঙ্গিত দেওয়া থাকে, কবিদের প্রজ্ঞা একমুহূর্তে সত্যকে এমন আলোকিত করে দেখায় যা দার্শনিকেরা বা মহাপুরুষেরা কঠোর চিন্তা ও সাধনার দ্বারাই লাভ করতে পারেন। এঁদের ধারণায়—কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ। অন্যশ্রেণীর অভিমতে কবিদের সৃষ্টি কাব্যকলা বা বক্রোক্তি বিন্যাসচাতুর্য অথবা কল্পিত বস্তু ছাড়া জীবনসত্য কিছু নয়। তাঁদের স্বভাব-অনুসারেই কাব্যের বস্তু ও ভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। নতুবা সত্যদিদৃক্ষা নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন, প্রকাশ-ব্যাকুল কবিদের মধ্যে এমন মহাপুরুষ দুর্লভ। আমরা এই দুই কোটির কোনো একটি কোটির অভিমতই সম্পূর্ণ অনুসরণযোগ্য বলে বিবেচনা করতে চাই না। আমরা এমন মনে করি না যে, কাব্যকলার সম্মিলিত আস্বাদন না দিয়েই মহৎ কবিত্ব আমাদের তুরীয় সত্যলোকে নিয়ে যেতে সক্ষম। আবার, এমনও ভাবি না যে, শুধু কলাকৈবল্যেই কাব্যের তথা সাহিত্যিক রচনার পরিনির্বাণ। কারণ, আধুনিক জগতে যুগপরিবেশের সঙ্গে কবির ব্যক্তিমানসের যে দ্বন্দ্ব চলে তাতে যুগ-চেতনার ওপর কবির ব্যাখ্যানও একটা নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করে, আর সেই ব্যাখ্যাসহ জীবনরসের আস্বাদনই আমাদের কাছে চমৎকৃতিজনক বলে মনে হয়; শুধু কলাসৌন্দর্যে আমাদের জীবনধর্মী মন তো তৃপ্ত হয় না। আমরা যেমন কবিকে রাষ্ট্র ও সমাজের অনুশাসক বলতে রাজি নই, তেমনি আবার শুধু ইন্দ্রিয়ানুভূতির আশ্রিত বুদ্ধিত্যাগী সুররসিকও বলতে চাই না।

এ দুজন কবির দুঃখবাদপ্রসঙ্গে

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, 'Pessimist'-বিশেষণটির ওপর হার্ডি তীব্র বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছেন। নিজের শেষ কবিতার বই 'Late Lyrics and Earlier'-এর 'নিবেদন'-অংশে ঔপন্যাসিক-কবি তাঁর মনোভাবকে অভিমত বলে গ্রহণ করতে নিষেধ করে 'impressions' অথবা 'questionings' বলে নিতে বলেছেন। তাঁর কবিতা সম্বন্ধে তাঁর একজন প্রত্যক্ষবাদী বন্ধুর মন্তব্য ['This view of life is not mine'] এবং একজন সংস্কারসিদ্ধ রোম্যান্ ক্যাথলিক-সম্প্রদায়ের সমালোচকের বক্তব্য ['The dark gravity of his ideas'] উদ্ধার করে তিনি দেখিয়েছেন যে, দুই পরস্পরবিরোধী মতাবলম্বী যখন তাঁর কবিতার রসগ্রহণে একমত তখন তাঁদের অভিমত ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। আমরাও হার্ডিকে বা যতীন্দ্রনাথকে কোনো মতবাদের ধ্বজাধারীরূপে দেখতে চাই

না। কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে, তাঁদের রচনায় বঞ্চনা, ছলনা ও দুঃখের অস্তিত্বকে দেখার একটা আন্তরিক আগ্রহ রয়েছে। আর, ঠিক এইখানেই সাধারণের কাছে দুঃখবাদী অ্যাখ্যার পাত্র হয়েছেন তাঁরা।

মনে রাখতে হবে, হার্ডি ও যতীন্দ্রনাথের নৈরাশ্যসূচক মনোভাবের জন্যে তাঁদের ব্যক্তিজীবনের কাহিনী দায়ী নয়—দায়ী সমাজ ও তাঁদের স্বকীয় কবি-মানসের বৈশিষ্ট্য। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রবীন্দ্রপ্রভাব অতিক্রম করে প্রত্যক্ষ জগতের দিকে নিরাবরণ দৃষ্টিতে যে তাকাতে পেরেছিলেন, এই তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয়। তাঁর প্রত্যক্ষ ও তীক্ষ্ণ সমাজবোধই তাঁকে এই দুঃসাহকিতা এনে দিয়েছে—যা তাঁর সমকালীন কোনো কবির মধ্যেই দেখা যায় না, এমন কি, 'বিদ্রোহী'-খ্যাতিসম্পন্ন নজরুলের মধ্যেও না। আধুনিক বাংলা কাব্যে নৈরাশ্য-মনোভাবের কবির এমন সম্ভাবও ছিল না যা থেকে যতীন্দ্রনাথ এর উত্তরাধিকার পেয়ে থাকবেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, মধুসূদন একটিমাত্র উচ্চাঙ্গের লিরিক কবিতা লিখে ['আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়'] তাঁর অন্তর্জীবনের নৈরাশ্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু এ নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিক জীবনের কথা, সমাজের নয়। কবিবর হেমচন্দ্র কয়েকটি দুঃখী-মনোভাবের কবিতা লিখেছেন সত্য, কিন্তু তাঁর প্রেরণাও ব্যক্তিগত জীবনের দারিদ্র্য ও অন্ধতা। অক্ষয়কুমার বড়াল এককালে দুঃখবাদী বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন, সেখানে পত্নী-মৃত্যু তাঁর দুঃখানুভবের কারণ। কিন্তু আধুনিক বাংলায় যতীন্দ্রনাথের লেখনীতেই সর্বপ্রথম সমাজের নৈরাশ্য এবং সার্বজনীন লোকজীবনের প্রতি শ্লেষাত্মক তির্যক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেল। ইংরেজী সাহিত্যে হার্ডিও সেইরকম নতুন কবি, খ্রীষ্টধর্মে আস্থাবান মধ্য-ভিক্টোরীয় ধারণায় লালিত ব্যক্তির কাছে শঙ্কার বস্তু ; যেমন সন্দেহের বস্তু যতীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রভাবে পরিতৃপ্ত ও আবিষ্ট বাঙালীর কাছে। হার্ডি ইংলণ্ডের যুদ্ধোত্তর কবিদের মধ্যে নিজ সত্তা অর্পণ করেছেন, যেমন যতীন্দ্রনাথের নৈরাশ্যবোধ প্রসারলাভ করেছে একালের কয়েকজন কবির কাব্যভাবনায়।

যতীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব

যুগপরিবেশসাদৃশ্য ছাড়া যতীন্দ্রনাথ ও হার্ডির কবিসত্তায় মিল রয়েছে বহুলাংশে। উভয়েই কাব্যরচনায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে পুরোভাগে স্থান দিয়েছেন। হার্ডির এমন বহু কবিতা রয়েছে যা পড়লে মনে হয়, চোখে-দেখা অথবা স্বকর্ণে শোনা বাস্তব ঘটনার আশ্রয়ে সেগুলি লেখা। এ বিষয়ে অবশ্য ঔপন্যাসিক-কবির আয়োজন ছিল প্রচুর। আর, তাঁর উপন্যাস ও কাব্যের স্থান-কাল-পাত্রের

মধ্যেও বেশ ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়। কারো কারো মতে হার্ডি তাঁর উপন্যাসে যে-রকম চরিত্র ও ঘটনার বিন্যাস করেছেন, কবিতায় তারই প্রতিফলন ঘটেছে সূক্ষ্মভাবে। এজরা পৌণ্ড তো সোজাসুজি হার্ডির কবিসত্তাকে তাঁর উপন্যাসের ফলশ্রুতি বলে মন্তব্য করেছেন। যাই হোক, কল্পনা নয়, অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে রচিত বলেই মানুষের আঘাত, বেদনা ও নিপীড়নের দিকটি উভয়ের কবিতাতেই লক্ষণীয় প্রাধান্য পেয়েছে। যতীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের শেষের দিকে লেখা একটি কবিতায় এই মনোভাবের, সুতরাং বাংলা কাব্যের নূতন দৃষ্টিভঙ্গির, পোষকতা করতে গিয়ে বলেছেন :

যতীন্দ্রনাথ ও হার্ডির কবিসত্তায় মিল

আমার কবিতা তোমরা পড়নি কেহ,
পড়িলে কখনো বলিতে না মোরে কবি।
কবি যে হবে সে জেনো নিঃসন্দেহ
বাংলায় বসে ভাবে না সাহারা গোবি।

বস্তুত, জীবনের ও বিশ্ববিধানের এই বিপরীত দিক দেখার জন্যেই যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রযুগের একজন আশ্চর্য কবি। যতীন্দ্রনাথ হার্ডির মতো মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা-দুর্ঘটনা নিয়ে বেশি কবিতা লেখেননি। এ বিষয়ে যতীন্দ্রনাথের সম্বল ছিল স্বল্প। হার্ডির মতো বঞ্চিত ও ব্যর্থ প্রণয়কবিতার প্রাচুর্যও যতীন্দ্রনাথের ছিল না ; এবং ব্যালাড বা এলিজি-রচনায় যেমন প্রগাঢ় করুণরসের সৃষ্টি করেছেন হার্ডি, যতীন্দ্রনাথ ঠিক সে-পথে যাননি। তার চেয়ে সার্বজনীন ব্যর্থতা ও পরিতাপের দিকটিই প্রতীক ও রূপকের সাহায্যে পাঠকের মর্মে প্রবিষ্ট করাতে চেয়েছেন তিনি। হার্ডির ভাষাভঙ্গি সেখানে সরল, তীক্ষ্ণ, অথচ সুনির্বাচিত চিত্রকল্পের—শব্দচিত্র এবং রেখাচিত্র, দুইয়েরই—যোগে ব্যঞ্জনাময়।

কিন্তু আমরা হার্ডি ও যতীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের তুলনামূলক পরিমাপ করতে চাই না, বিস্তৃত আলোচনাও আমাদের অবকাশের বাইরে। আমরা শুধু দেখাতে চাই, জগৎ ও জীবনকে স্বভাবধর্মে গ্রহণের দিক থেকে এ দুই কবির সাদৃশ্য রয়েছে প্রচুর। যতীন্দ্রনাথের কাব্যে মানুষের দুঃখভোগের কারণ কিছুটা সমাজ, অনেকটা যান্ত্রিক বিশ্বনিয়ম। হার্ডি বিশ্ববিধানকে মানুষের সুখদুঃখে উদাসীন বলে মনে করেছেন। সুতরাং হার্ডি তাঁর উপন্যাসে বা কাব্যে খ্রীষ্টধর্মীয় ঈশ্বরের ধারণার প্রশ্রয় দেননি। যতীন্দ্রনাথও প্রচলিত ভক্তিবাদ ও ঈশ্বর-ভাবুকতাকে বাস্তবের আলোকে পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং এই মনোভাব পোষণ করেছেন যে, ঈশ্বরকল্পনা মূঢ় অপব্যয় ছাড়া কিছু নয়। বিশ্ববিধানের কর্তা

যদি কেউ থাকেনই, তিনিও অসম্পূর্ণ এবং নিষ্ঠুর। 'নবপন্থা'-নামক কবিতায় কবি বলছেন :

বন্ধু, এ কার পাপ ?
এত দোষ, ত্রুটি, এত অন্যায়, এত যে দুঃখ তাপ।
গগনে গগনে জীবনে জীবনে জ্বলিতেছে যত জ্বালা,
গাঁথা হয় কোন্ দিগ্‌বিজয়ীর নিষ্ঠুর জয়মালা।

সুতরাং তিনি সেই কল্পিত ঈশ্বরের দোষের কথাই কীর্তন করবেন, আর :

তিক্ত সত্যে চটে যান যদি ভক্তের ভগবান,
মোরে ছেড়ে তিনি বাকি সাধুদের করুন পরিত্রাণ।

হার্ডি যখন তাঁর গ্রামীণ মানুষদের ট্র্যাজেডিগুলো লিখছেন, তখনকার একটি লিপিতে তিনি বলছেন, আমি আজ পঞ্চাশ বছর ধরে ভগবানের খোঁজ করছি। আমার মনে হয়, তিনি থাকলে এতদিনে তাঁকে ধরা যেত। 'A Drizzling Easter Morning' কবিতায় খ্রীষ্টের পুনরাবির্ভাব-প্রসঙ্গ তুলে কবি বলছেন যে, তাঁর পুনরাবির্ভাব ঘটল, কিন্তু জগতের অবস্থা অপরিবর্তিতই রইল। মৃতেরা তাদের মুক্তির পথ চেয়ে চেয়ে হতাশই হবে, বোঝাই গাড়ি তেমনি পরিশ্রান্ত অবস্থায় পথ চলবে, আর ঘর্মাক্তকলেবর শ্রমিকেরা তাদের প্রার্থিত মৃত্যুর দিনটির প্রতীক্ষা করতে থাকবে। 'The sign-seeker' কবিতায় কল্পিত মহাপুরুষদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবন ও চিন্তার পার্থক্য দেখিয়ে কবি বলছেন, আশা ও বিশ্বাসে বুক বাঁধবার কোনো কথাই ওঠে না এদের ক্ষেত্রে :

Such scope is granted not to lives like mine······
I have lain in dead men's beds, have walked
The tombs of those with whom I have talked,
Called many a gone and goodly one to shape a sign,
And panted for response. But none replies ;
No warnings loomp, nor whisperings
To open out my limitings.···

যতীন্দ্রনাথের 'বন্ধু' সম্বোধনে লেখা কবিতাগুলোর মধ্যে বিশ্বনিয়ন্তা সম্বন্ধে হার্ডির সগোত্র ধারণার পরিচয় পুনঃ পুনঃ পাওয়া যাবে। যতীন্দ্রনাথ এসব ক্ষেত্রে

হার্ডির থেকেও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গপ্রবণ। যেমন, 'ঘুমের ঘোরে' কবিতাবলীর একাংশে বলা হচ্ছে :

তন্দ্রিত চোখে দেখিতেছি তব স্বরূপ খোলস ছাড়া—
দেবতা গড়িলে পাষাণে আর সে ঢালে না নিঝরধারা ;
চিতার বহ্নি যত বিধবার সিঁথার সিঁদুর চেটে
বিশ্বম্ভর, হে গণেশবর, যোগায় তোমারি পেটে !
গোরু-পোষানির প্রায়—
জননীর কোলে ছেলে বড়ো করে কে পুনঃ কাড়িছে হায় !
ব্যাপার দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া জ্ঞানী পরিহরে শোক,
দেঁতো হেসে বলে, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

'কাণ্ডারী' কবিতায় এইরকম বর্তমান মানুষের অসহনীয় দুঃখভোগ আর কাণ্ডারীর নির্মম উদাসীনতা সম্পর্কে ব্যঙ্গ করা হয়েছে :

যত শৌখিন জীবনতরীর তুমি চিরকাণ্ডারী ;
পারিবে, বন্ধু, চালাতে কি মোর জীবনগোরুর-গাড়ী ?
এমন গোরুর গাড়ী—
এঁটে বাঁধা টুটা পাঁজরা বন্ধু ভাড়াটিয়া ভারে ভারী।
আমার মতন যত মহাজন যে-পথে হইল গত,
ব্যথাভরে আঁকি চক্রনেমিতে দীর্ঘ গভীর ক্ষত,
সে অনাদি নিক ঠিক রেখে রেখে এ গাড়ী চালাতে হবে।
সহিয়া সঘন ঝাঁকানি চাকার করুণ আর্তরবে।......
নাই ঝড় জল, বর্ষাবাদল, ধূপ, ছায়া, রাত দিন,
পুরাতন পথে সনাতন যান চলিবে বিরামহীন।

হার্ডি আভাসে-ব্যঞ্জনায় কাহিনীর আড়ালে যে-কথা বলতে চেয়েছেন, যতীন্দ্রনাথ তা-ই স্পষ্টভাবে, অধিকতর নিঃসঙ্কোচে বলেছেন :

প্রেম বলে কিছু নাই।
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।

'সাগরতীরের পাখি' কবিতায় :

অনেক দেখিয়া অনেক ঠেকিয়া বুঝিয়াছে এরা কি রে,
এ পাখা বৃথাই, মুক্তি ত নাই, উড়ে বসা ফিরে ফিরে ?

মানুষের ব্যর্থ জীবনযাপনে কুটিলগতি কালের কর্তৃত্ব নিয়ে লেখা বহু সুন্দর কবিতা হার্ডির রয়েছে। যতীন্দ্রনাথেরও কয়েকটি কবিতায় কালচক্রে

ধাবমান মানুষের ব্যর্থ জীবনের আবর্তন অথবা রূপ ও যৌবনের অবাঞ্ছিত পরিবর্তনে হতাশার কথা রয়েছে। যেমন, 'পথের চাকরি' কবিতায় বারমাস্যার মতো করে তাঁর নিজের একঘেয়ে কর্মজীবনের দুঃখকর আবৃত্তির কারুণ্য ফুটিয়েছেন। 'বোঝা' কবিতায় স্পষ্টতই দম্পতীযুগলের কালবাহিত বঞ্চিত জীবনের পরিতাপ লিপিবদ্ধ করেছেন। 'ত্রিযামা' কাব্যের মা সম্পর্কে লেখা 'তোমার নয়নে অশীতি ঘনায় আমি ভেসে চলি ঘাটের টানে' কবিতাটিতে কালচক্রের প্রভাবই দেখানো হয়েছে। হার্ডির 'স্যাটায়ারস্ অব সারকামস্ট্যান্স' বা 'টাইমস্ লাফিং স্টকস্'-শ্রেণীর কতকগুলো মর্মান্তিক করুণ ঘটনা বা কাহিনীসম্বলিত কবিতা রয়েছে, কাব্যাংশে যেগুলি অনন্যসুলভ। বিশেষ এই যে, এগুলি ব্যক্তিমানুষেরই বঞ্চনা, ব্যর্থতা, অতৃপ্তি, বিচ্যুতির ছবি—সাধারণ সমাজসত্তার নয়। যতীন্দ্রনাথের এরকম ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং ব্যালাড-জাতীয় রচনার সংখ্যা নগণ্য। বাংলা কাব্যে কাহিনীমূলক কবিতা-রচনায় বরঞ্চ কুমুদরঞ্জন মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রমুখ দুএকজনের কৃতিত্বের কথা মনে পড়ে। যতীন্দ্রনাথ যুগপ্রতিনিধি-স্বরূপে ব্যক্তি-মানুষগুলোকে পৃথকভাবে গ্রহণ না করে সামাজিক ভাবটিকে মাত্র গ্রহণ করেছেন। তা ছাড়া, হার্ডির চিত্রাঙ্কনের মধ্যে যে-নির্লিপ্ততা ও সংযম লক্ষ্য করা যায়, যতীন্দ্রকাব্যে তা দুর্লভ। তবু একথা বলা বোধ হয় অসংগত হবে না যে, ভাবোচ্ছ্বাসের দ্বারা যুক্ত এবং মন্তব্য বা ময়্যাল-এর দ্বারা গ্রথিত হয়ে যতীন্দ্রনাথের বক্তব্য খুবই বলিষ্ঠতার সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। এ যেন হার্ডির ঐ বিশেষ বিশেষ কবিতাগুলোর সারমর্ম। যেমন, বলা যায়, 'চামড়ার কারখানা' কবিতায় রূপকচ্ছলে মানুষের বহিরাবরণের প্রসাধনের অন্তরালে যে-আদিম ক্ষুধা ও ব্যর্থ জীবনসংগ্রাম রয়েছে, তার কথা বলা হয়েছে :

> বৃষ্টি শিশিরে নয়নের নীরে নোনা মিঠা কষ জলে,
> দিনরাত শুধু কাঁচা চামড়ার শত প্রসাধন চলে।
> ব্যথার গুমটে এ ধরণী শুধু পচিয়া উঠিতে চায়,
> পবন তপনে কত রসায়ন লেপন করিছে তায়।
>
> *　　　*　　　*
>
> প্রেমের প্রলেপ ঘষিয়া ঘষিয়া চক্‌চকে করে রাখা,
> থেকে থেকে সেই আদিম গন্ধ তবুও পড়ে না ঢাকা।

এইরকম মানুষের বাইরের সভ্যতার ছদ্মবেশ ও অন্তরের হিংসাময় জীবযুদ্ধ লক্ষ্য করে যতীন্দ্রনাথ কয়েকটি ব্যঙ্গ ও করুণ-রসের ভালো কবিতা লিখেছেন। এগুলোর মধ্যে কবির বক্তব্য রূপকচিত্র ও সঙ্কেতে অপরূপতা লাভ করেছে।

বৌবাজারের-মোড়ে-কেনা 'কেতকী' কবির সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে। আর, তারই মধ্যে কবি গভীর ব্যথার ছবি দেখতে পেয়েছেন :

আধঘুমে চাহি দেখিনু চমকি—ঝুলিছে সর্বনাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায়ে ফাঁসি !
কসিয়া কোমর বাঁধা,
অলকগুচ্ছে আধঢাকা মুখ অস্বাভাবিক শাদা !

এই মনোভাব নিয়েই কবি খেজুরবাগানের নীরব ক্রন্দন শুনতে পেয়েছেন। আর, হাটের মধ্যে তরিতরকারি-ফলমূলের প্রাণদানের বেদনা অনুভব করেছেন। কবির তীব্র মানবীয় সহানুভূতি গাছপালা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তিনি দেখছেন,

যতীন্দ্রনাথের মানবিকতাবোধ

খেজুরগাছের ছাল ছাড়িয়ে মাথা চেঁছে কণ্ঠে নলী ঠুকে রস বের করা হচ্ছে, আর তা-ই নলেন গুড় হয়ে মানুষের তৃপ্তিসাধন করছে। বিশ্বে এই স্বার্থময় টিঁকে থাকার সংগ্রাম শুধু অভিব্যক্তিতত্ত্বের মধ্যে নয়, কবির কাব্যেও প্রকাশ পেল। আর, তা থেকে কবি করুণরসের আশ্রয়ে বিশ্বসত্যের আর-একটা দিক উদ্‌ঘাটিত করে দেখালেন—যে-শক্তি মানুষকে এই স্বার্থময় জীবনযাত্রায় প্রবৃত্ত করছে তা দয়াহীন, বিচারশূন্য এবং যান্ত্রিক। 'কবির কাব্য' লেখাটিতে যতীন্দ্রনাথ বিশ্বজোড়া সংগ্রামের দুর্বিপাক লক্ষ্য করেছেন এবং পরাজিতের ব্যর্থ হাহাকারে অশ্রুপাত করেছেন :

মেঘে মেঘে বাজে গুরু ক্রন্দন, বনে বনে শিখী নাচে,
বুক ফেটে তার ঝরে আঁখিজল, তৃষিত চাতক বাঁচে।
জ্বালিয়া জ্যোৎস্না-মরীচিকা বুকে মরুচন্দ্র সে জাগে,
পিয়াসী চকোর তাপিত পাপিয়া তারি পাশে সুধা মাগে।
মূক কাননের মনের আগুন ফুটিলে ফাগুনফুলে
দিকে দিকে দিকে রসিক ভ্রমর স্তবগুঞ্জন তুলে।...
এমনি, বন্ধু, ভুবনে ভুবনে চলিতেছে লুকোচুরি,
অন্তরতারে ব্যথার কাঁপন সুরের মোড়কে মুড়ি।...
তথাপি, বন্ধু, নিঠুর সত্য নিখুঁত পড়েনি ঢাকা,
ফুলে ফুলে বুঝি তোমারি দীর্ণ হৃদয়রক্ত মাখা।

নিসর্গপ্রীতি এবং নিসর্গকে আশ্রয় করার মধ্যে মানুষের মুক্তির আনন্দ

য়ুরোপে নবাগত রোম্যান্টিক ভাবপ্লাবনের কালে কল্পিত হয়েছিল। ইংরেজী সাহিত্যে ওয়ার্ডসওআর্থ এর পুরোধা কবি ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-বাণীতে প্রকৃতিসংস্পর্শজাত রসবিহ্বলতার চরমতা ঘোষিত হয়েছে। হার্ডি ও যতীন্দ্রনাথ এই মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করলেন। যতীন্দ্রনাথের কতক-গুলো কবিতা তো রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতিবাদরূপেই রচিত। হার্ডির উপন্যাসে ও কবিতায় পল্লীজীবন অবলম্বিত হয়েছে, সে আর-এক ভাবে। হার্ডির প্রকৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বহু কবি ও ঔপন্যাসিক থেকেই ঢের বেশি। বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্যের এমন বিস্তৃত বর্ণনা কম ঔপন্যাসিকের মধ্যে দেখা যায়। তা ছাড়া, তাঁর জীবজন্তু কীটপতঙ্গের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টান্তও কাব্যে-উপন্যাসে ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু এ কল্পনাজাত কৃত্রিম সহানুভূতি নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উৎপন্ন সচেতন বুদ্ধিমিশ্রা সহানুভূতি। আবার, হার্ডি দেখেছেন, পূর্বকল্পিত সৌন্দর্যরাজ্যে প্রয়াণ [যেমন কীট্‌স করেছিলেন] একালে হাস্যকর ও নিরর্থক। তিনি চন্দ্রালোকিত মধুযামিনীর মহিমায় আকৃষ্ট হতে পারেননি। তাঁর ধারণায় সে-আকর্ষণের দিন চলে গেছে। 'Shut out the moon' কবিতায় তিনি বলেছেন :

নিসর্গপ্রকৃতির প্রতি হার্ডি ও যতীন্দ্রনাথের মনোভঙ্গি

Close up the casement, draw the blind,
Shut out that stealing moon,
She wears too much the guise she wore
Befor our lutes were strewn
With years-deep dust, and names we read
On a white stone were hewn,…
Stay in ; to such sights we were drawn
When faded ones were fair…

হার্ডি নিসর্গের মধ্যে কেবল হৃদয়হীন উদাসীন শক্তির বিবেকশূন্য খেলাই লক্ষ্য করেননি, যতীন্দ্রনাথের মতো তরুলতা-কীটপতঙ্গের মধ্যে সংগ্রামের ছবি দেখেছেন। তাঁর 'Nature's Questioning' কবিতায় নিসর্গের মধ্যে নিয়তির চক্রান্তের ছবি ফুটে উঠেছে—আর 'ইন এ উড' কবিতায় তরুলতায় পারস্পরিক হিংসাদ্বেষ বর্ণিত হয়েছে। 'Nature's Questioning' কবিতায় অসম্পূর্ণ সৃষ্টির

পরিতাপের দিকটি বস্তুনিচয়ের মুখে ভাষা বসিয়ে কাতর প্রশ্নের মধ্য দিয়ে কবি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন :

Has some Vast Imbecility,
Mighty to build and blend,
But impotent to tend,
Framed us in just, and left us
now to hazardry ?
Or come we of an Automaton
Unconcious of our pains ?
Or are we live remains
Of Godhead dying downwards,
brain and eye now gone ?

'ইন এ উড' কবিতাটিতে ওয়ার্ডস্ওআর্থের কল্পনার বিপরীত মনোভাব লক্ষ্য করার বিষয় :

Heart-halt and spirit-lame,
City-opprest,
Unto this wood I came
As to a nest ;
……But having entered in,
Great growths and small
Show them to men akin—
Combatants all !
Sycamore shoulders oak,
Bines the slim sappling yoke,
Ivy-spun halters chope
Elms stout and tall,
Touches from ash, O wych,
Sting you like scorn !
You, too, brave hollies, twitch
Sidelong from thorn·· ···
Since then no grace I find,
Taught me of trees,······

এরই সঙ্গে অসম্পূর্ণ প্রকৃতি থেকে মানুষ বড়ো, হার্ডির এই ধারণা মনে রেখে, যতীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলো মিলিয়ে দেখতেই হয়ঃ

বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কিবা ;
মায়াবিনী নরে বিপথযাত্রী করিছে রাত্রিদিবা।
চটক বা চখা কী জানে প্রেমের ? বকে কি শিখাবে ধর্ম ?
সহজ স্বাধীন হিংস্র শ্বাপদ বুঝাবে জীবনমর্ম !
অরণ্য তবু জপিছে নিত্য ঠেলাঠেলি অবিরাম,
কুসুম-অলির অবাধ প্রণয়, উভয়ত কী আরাম !···
খাদ্যে-খাদকে বাদ্যে-বাদকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য,
ষড়্‌ঋতু-ছলে ষড়্‌রিপু খেলে কাম হতে মাৎসর্য !······
শুনহ মানুষ ভাই !
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই।

যতীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে পড়তে যেমন বার বার হার্ডির কথা মনে হয়েছে, তেমনি এই ধারণা হয়েছে যে, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্পর্কে ঢের বেশি আলোচনা-প্রত্যালোচনার আবশ্যকতা ছিল।*

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধসাহিত্য

[রচনার সংকেতসূত্র ঃ সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর বিশিষ্টতা—তাঁর অন্তর্জীবনের রূপরেখা—বীরবলী যুগ—তাঁর নাগরিকতা ও মননধর্ম—দর্শন তাঁর প্রিয় বিষয়—প্রমথ চৌধুরীর নিরাসক্ত দৃষ্টি—তাঁর রচনায় 'wit'-এর চমকপ্রদ লীলাখেলা—তাঁর রূপবাদ—তাঁর ভাষারীতি—প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যাদর্শ—স্টাইল—উপসংহার]

'সুন্দর'-এর আগমনে 'হীরামালিনী'-র ভাঙা মালঞ্চে যেমন ফুল ফুটেছিল, প্রমথ চৌধুরীর [বীরবল] কলমের ছোঁয়ায় তেমনি বাংলাসাহিত্যে অপূর্বসুন্দর ফুল ফুটেছে। আমাদের দেশের মাটিতে জল, মানুষের হৃদয় জলো—তাই

* অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস লিখিত

বৈষ্ণবপদাবলীর আমল থেকে আমরা হৃদয়রসে কদম ফোটাতে জানি। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভার বিচ্ছুরণে আমাদের সাহিত্যের অঙ্গনে যে-ফুল ফুটেছে তাকে বলতে পারি হীরার ফুল, আলোর ফুল। ভাবের চমকে-ঠমকে, উজ্জ্বল শাণিত ভাষার দ্যুতিতে-গতিতে বীরবলী সাহিত্য অপরূপ—অনন্যতায় অতিশয় দীপ্যমান। দেখেশুনে মনে হয়, এর জাতই আলাদা। মস্তিষ্কের মঞ্চচূড়ায় বুদ্ধির উত্তাপে যে-সাহিত্যভোজের ভিয়েন, তার স্বাদ ও সৌরভ নতুন বলে অনুভূত না হয়ে পারে না। নিঃসংশয়ে বলা যায়, সাহিত্যকার প্রমথ চৌধুরী আপন বিশিষ্টতায় আপনি সমুজ্জ্বল।

সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর বিশিষ্টতা

বীরবলের জীবন সাধারণ ছকে পরিচালিত হয়নি। তাঁর দেহে রূপ ছিল, মনে ছিল ঋদ্ধি। পারিবারিক আবহাওয়া আর সামাজিক পরিবেশ তাঁকে উদার ও সংস্কারমুক্ত মানুষরূপে বিকসিত হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। মানসিক খোলা হাওয়ায় বাস করেছেন বলে কোনো সংকীর্ণতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি ছিলেন রূপবাদী, ইন্দ্রিয়বাদী [sensuous]—তাঁর চোখের দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ-তীব্র। তাই বস্তুবোধের প্রত্যক্ষতায় প্রত্যয়কে দৃঢ়ভিত্তিক করতে পেরেছিলেন তিনি। আরো বলা যায়, প্রমথ চৌধুরী কর্মী ছিলেন না, দেশের কোনো আন্দোলনে তাঁকে পুরোভাগে দেখা যায়নি। তিনি নিভৃত গৃহকোণের মানুষ, সেখানে মানসিক তপশ্চর্যায় নিরত ছিলেন। 'লেখাপড়া মোর পেশা লেখাপড়া মোর নেশা কাজ আর খেলা'—একথা তাঁর নিজের মুখেই আমরা শুনেছি। হাস্যরসের ভক্ত, আর্ট ও আর্কিটেক্‌চারের পূজারী হয়ে তিনি ছেলেবেলা থেকে নিজের বিশিষ্ট শিল্পীমনটি গড়ে তুলেছেন। সংগীতের প্রতি তাঁর অনুরাগও উল্লেখযোগ্য। তবে তিনি পূরবী-ছন্দ পছন্দ করতেন না, কারণ পূরবীর করুণ সুর তাঁর হাস্যরসোচ্ছল মনের ঠিক অনুকূল ছিল না। কৃতী ছাত্র হয়েও তিনি কদাপি চাকুরি করতে চাননি, সাংসারিক উন্নতিবিষয়ে সচেতন হননি। আসল কথা, প্রমথ চৌধুরীর দ্বৈত জীবনের মধ্যে তাঁর ব্যবহারিক জীবনটা ছিল বাহ্য—মানসজীবনটাই ছিল মুখ্য। ভাব, চিন্তা ও সাহিত্যশিল্পীর জীবনটা ছিল তাঁর প্রকৃত জীবন।

অন্তরঙ্গ ভাবজীবনই প্রমথ চৌধুরীর প্রকৃত জীবন

কালগত বিচারে দেখা যায়, প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রযুগের সাহিত্যকার। কিন্তু সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষায় দেখলে তাঁকে কিছুতেই রবিচক্রের অন্তর্ভূত বলে মনে হয় না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, রবীন্দ্রনাথের সমকালীন মানুষ এবং

কবি রবীন্দ্রের অতি-নিকট আত্মীয় হয়েও তাঁর সম্ভবপর প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। অথচ রবীন্দ্রনাথের ভাবকল্পনা কমবেশি আচ্ছন্ন করেছিল সেইযুগের অন্যান্য সাহিত্যসাধককে। এহেন রবীন্দ্রযুগে আবির্ভূত হয়েও প্রমথ চৌধুরী নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর ভাষারীতি, রচনারীতি ও সাহিত্যাদর্শে অনুপ্রাণিত এক নব্যপন্থী লেখকগোষ্ঠি—'সবুজপত্রে'র দলও—গড়ে উঠেছিল। তাই বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে প্রমথ চৌধুরীর একটা উজ্জ্বল স্থান রয়েছে।

বীরবলী যুগ

প্রমথ চৌধুরী বস্তুত নাগরিক সাহিত্যিক—বিংশ শতাব্দীর নাগরিকতার ভাষ্যকার। তবে তাঁর এই নাগরিকতা মানবিকতারই [humanism] একটা অংশ-মাত্র, তার পরিপূরক বলা চলে। নগরের বাতায়নপাশে দাঁড়িয়ে রাজপথের আলোর মিছিলে মানবজীবন তিনি অধ্যয়ন করেছেন। সেই অধ্যয়নের ছাপ তাঁর সাহিত্যের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। সমগ্র সত্তার বহুবিচিত্র অনুভূতির মধ্যে নয়, মস্তিষ্কের মননের মধ্যে ধরা দিয়েছে বলে, মানুষের ভগ্নাংশমাত্র তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছে। তাই তাঁর সাহিত্যে মানুষ সম্বন্ধে হৃদয়ানুভূতির—প্রাণের উত্তাপের—অভাব, মননের দীপ্তিরই প্রাচুর্য। প্রমথ চৌধুরী মননধর্মী লেখক। তার পেছনে শুধু তাঁর জীবন-ধর্মই নেই, আছে যুগধর্মও। আজকের পৃথিবীর দিকে তাকালে মনে হয়, এটা বিজ্ঞান তথা বুদ্ধির যুগ—তাই যুগধর্মও বুদ্ধিপ্রসূত। যুগধর্মের প্রভাবে মানুষের জীবনও যেন ক্রমশ হৃদয়ধর্মবর্জিত আর বুদ্ধিবৃত্ত হয়ে উঠছে। বীরবল এই যুগগত বুদ্ধিবাদকে আপন সাহিত্যে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এই যুগধর্মের পূজারী ছিলেন বলেই তিনি ছিলেন নবীনতার অনুরাগী, সমস্তকিছু সবুজ ও সজীবের বড়ো একটি উৎসাহস্থল।

প্রমথ চৌধুরীর নাগরিকতা ও মননধর্ম

বীরবল দর্শনের ছাত্র—দর্শন তাঁর প্রিয় বিষয়। তাঁর দার্শনিক গুরু ছিলেন মনীষী বার্গসঁ। বার্গসঁ-এর সৃষ্টিশীল বিবর্তনবাদ [Creative Evolution] প্রমথ চৌধুরীর মন, চিন্তা ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। বার্গসঁ-র দর্শনে নিত্য-প্রবহমাণ গতি—eternal fluxই—একমাত্র সত্য; জগৎ-সংসার অনবচ্ছিন্ন পরিবর্তনপ্রবাহ ছাড়া কিছু নয়। যাকে আমরা বিবর্তন বলে থাকি তা এই অফুরন্ত পরিবর্তনধারার অশ্রান্ত গতিবেগকেই [movement of the flow] বোঝায়। এখন কথা হচ্ছে, এই পরিবর্তনপ্রবাহের উৎস কিছু আছে কী? বার্গসঁ বলেন, একটি প্রকাণ্ড অগ্নিপিণ্ড থেকে যেমন স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়, তেমনি একই কেন্দ্র

দর্শনের ছাত্র প্রমথ চৌধুরী

থেকে জগৎ, জীবন ও জড়পদার্থনিচয় ছিট্‌কে পড়ে। তিনি এই কেন্দ্রটিকে বলেছেন 'e'lan vital' বা প্রাণশক্তি। এই সৃষ্টিক্রিয়াশীল বিবর্তনবাদের দিক থেকেই বিশ্বসংসারকে—পৃথিবীকে ও মানুষকে—দেখেছেন প্রমথ চৌধুরী। তাই সাহিত্যে—বিশেষ করে প্রবন্ধসাহিত্যে—যা জীবনীশক্তির প্রতীক ও ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ, তাকেই তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই কারণেই তিনি রঙের মধ্যে সবুজকে, জীবনের ত্রিদশার মধ্যে যৌবনকে, ত্রিকালের মধ্যে বর্তমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

দর্শনের ছাত্র বলেই মানুষের মানসিক জড়তা, সংকট ও মুক্তি নিয়ে তিনি যতটা আলোচনা করেছেন, তার বাস্তব জীবন নিয়ে ততটা আলোচনা করেননি। তাঁর প্রবন্ধসাহিত্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাস্তব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে করতে সহসা তিনি মানসিক জগতে পরিক্রমা করতে সুরু করেছেন, এবং মানসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ওইসমস্ত বাস্তব সমস্যা সম্বন্ধে আলোকপাত করতে এগিয়ে এসেছেন। ফলে যে-সমস্যা বাস্তবধর্মী তার বিশ্লেষণ হয়ে পড়েছে চিন্তাধর্মী।

প্রমথ চৌধুরীর দার্শনিক বিশ্বাস তাঁকে গতানুগতিক বা প্রচলিত পদ্ধতিতে মানুষের বিচার ও মূল্যনিরূপণ করতে শেখায়নি। তিনি জীবনকে তলিয়ে বিচার করতে ভালোবাসতেন। তাই তাঁর সাহিত্যজগতে মানুষে মানুষে কোনো বিভেদ ধরা পড়ে না। একমাত্র মৌল মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কিছুর প্রতি তাঁর পক্ষপাত ছিল বলে মনে হয় না। এর কারণ নির্দেশ করা খুব সহজ। তিনি ছিলেন ভাবালুতাবিরহিত, নির্বিকার, মননশীল ও অতিমাত্রায় আত্মসচেতন। আসল কথা, বিশ্ববীক্ষায় তিনি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, এবং সেই অনাসক্তির জন্যেই তাঁর সাহিত্যের হাল ডাইনে-বাঁয়ের ঢেউয়ে দোলাদুলি করেনি। অন্যদিকে, তাঁর সাহিত্যে মননধর্মের প্রাধান্য অতিশয় লক্ষণীয়, এবং এও অতন্দ্র প্রহরীর মতো তাঁকে ভাবগত ফেনিল উচ্ছ্বাস থেকে সর্বদা ও সর্বথা রক্ষা করেছে।

প্রমথ চৌধুরীর নিরাসক্ত দৃষ্টি

মননধর্মের আলোচনাপ্রসঙ্গেই wit-এর কথা আসে। Wit হল সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধির চমকপ্রদ একটি খেলা, তার হঠাৎ-আলোর ঝল্‌কানিতে জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপটি ফুটে ওঠে না—তা অনেকটা বাগবৈদগ্ধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ-সাহিত্যে বুদ্ধির মনোমদ ক্রীড়াকৌশল লক্ষ্য করবার মতো—জীবনের অসঙ্গতি-আবিষ্কারে, তার নতুন মূল্যায়নে, যুগধর্মের স্বরূপ-বিশ্লেষণে, epigram ও paradox-রচনায় তার প্রমাণ আছে। বীরবলের লেখায় wit-এর বিদ্যুৎ-ঝলসন রয়েছে বলেই

প্রমথসাহিত্যে wit-এর খেলা

তা কুঞ্চিত ভ্রূ ও বঙ্কিম অধরের পেছনে চকিতে ফুটে ওঠে। 'বীরবলের হালখাতা', 'বীরবলের টিপ্পনী' ইত্যাদি গ্রন্থে তিনি বাঙালীর নিষ্ক্রিয়তা ও করুণরসপ্রিয়তা নিয়ে সমালোচনা করেছেন, করেছেন বিদ্রূপ। প্রবন্ধসাহিত্যে তাঁর wit-এর বাঁকা তলোয়ার যখন বাঙালীর জীবনকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার অসংগতির হাস্যোদ্দীপক চিত্র উন্মোচিত করেছে, তখনো তাঁর হৃদয় এতটুকু সংবেদনশীলতা নিয়ে এগিয়ে আসেনি। প্রমথ চৌধুরীর বড়ো অস্ত্র যুক্তিতর্ক-আশ্রয়ী ব্যঙ্গ। এইদিক থেকে শ-এর সঙ্গে তাঁর মিল রয়েছে। বলেছি, বীরবলী প্রবন্ধের বাকৃচাতুরী wit-এর আওতায় পড়ে। বস্তুত, ভাষার মারপ্যাঁচের মধ্যে দীপ্ত বুদ্ধির একটা উজ্জ্বল খেলা আছে, যার চমক পাঠকের মনকে বিমূঢ় করে দিয়ে যায়। পাঠকসম্প্রদায়ের অপ্রতিভ মনের সেই হকচকানির মধ্য দিয়ে একরকমের রসিকতা জমে ওঠে।

প্রমথ চৌধুরীর রূপবাদ

বীরবলের প্রবন্ধে দেখি, রূপ-শ্রী-সৌন্দর্যের জয়গানের সুযোগ যখনই এসেছে তখনই তিনি তা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে রূপদৃষ্টি ও রূপমুগ্ধতার চেয়ে রূপের প্রতিসরণই সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। তাঁর প্রখর মননবৃত্তি তাঁর গভীর রূপদৃষ্টির পথে বড়ো অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই রূপাবেশ চোখের বাইর-দেউড়ি পার হয়ে তাঁর হৃদয়ের অন্তঃপুরে অবলীলায় প্রবেশ করবার পথ পায়নি।

প্রমথ চৌধুরীর ভাষারীতি

ভাষার ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী যে-আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন তা ঐতিহাসিক মর্যাদা পেয়েছে। তাঁর মতে, যতদূর পারা যায়, যে-ভাষায় আমরা কথা বলি, সেই ভাষায় লেখা উচিত। আমাদের কথায় ও লেখায় ঐক্যরক্ষা করা সংগত বলেই তিনি মনে করতেন। কিন্তু তাঁর স্বকৃত প্রবন্ধের ভাষাও সাধারণ বাঙালীর মুখের ভাষার ঠিক অনুরূপ বলে মনে হয় না। তাঁর শব্দচয়ন, বাচনভঙ্গি, কথার মারপ্যাঁচ ও অলংকরণ—সব মিলে ভাষার এমন একটা রূপ দাঁড়িয়ে গেছে যা সাধারণের পক্ষে সুবোধ্য নয়, এবং সেই ভাষাকে কোনো স্থানের সাধারণ কথাবার্তার ভাষা বলে গ্রহণ করতেও মনে কুণ্ঠা জাগে। তবে তাঁর সাহিত্যের ধর্ম ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিচার করলে, তাঁর ভাষাকে সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলেই মনে হয়। ভাষা যাতে নিজ মনোভাবের সার্থক সূচক হতে পারে, সেজন্যেই তিনি কৃষ্ণনগরের মৌখিক ভাষাকে বিচিত্র কলাবিধির সাহায্যে নবতন রূপ দিয়েছিলেন।

প্রমথ চৌধুরী মনে করতেন, সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা মূলত মনে; তবে তাকে যুগানুগ বুদ্ধির স্পর্শে শানিয়ে নিতে হয়। মানুষের হৃদয়ের ধর্ম অনেকটা শাশ্বত,

কিন্তু মনের ধর্ম তা নয়। পুরনো চিন্তা ও ভাবের তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মনের খুশি নিয়েই সাহিত্যের কারবার হওয়া উচিত। তবে এই খুশির অর্থ যথেচ্ছাচার নয়, এও একটা বড়ো রকমের আর্ট, এও বিশেষসাধনার বস্তু—খেয়ালখুশিরও একটা নিজস্ব লজিক আছে। অর্থাৎ, সাহিত্যাদর্শে প্রমথ চৌধুরী ছিলেন মন্‌টেইনপন্থী, কিছুটা-বা চেস্টারটনপন্থী।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যাদর্শ

এবার বীরবলী প্রবন্ধসাহিত্যের শিল্পরূপ বা আঙ্গিক সম্পর্কে দুএকটি কথা বলব। তাঁর লেখার প্রধান আকর্ষণ স্টাইল। তাঁর রচনাবলী পড়লেই মনে হয়, সেখানে আর-কিছু না-থাক, মৌলিকতা রয়েছে। নতুন কিছু বলবার জন্যে যেমন তিনি উৎসুক, তেমনি নতুন ঢঙে বলবার চেষ্টাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো। তিনি জানতেন, যে-লেখার ভেতর অহং নেই সে-লেখা আর যাই-হোক, সাহিত্য নয়। প্রমথ চৌধুরীর চিন্তাধারার প্রণালী ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব। অতি-পরিচিত বিষয়কেও তিনি এমন যুক্তিশৃঙ্খলার [logical sequence] মাধ্যমে পরিবেশন করতেন যাতে পাঠকের কাছে তা নতুন বলে মনে হয়। তাঁর স্টাইলের অন্যতম রহস্য এইখানেই। বীরবলী প্রকাশভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য যেমন স্বকীয় চিন্তানুভূতির সঙ্গে জড়িত, তেমনি শব্দযোজনা, অলংকারচর্চা, ছন্দোরচনা, গঠনপ্রণালী ইত্যাদির মধ্যেও নিহিত। অলংকারের মধ্যে যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি ও বিরোধাভাস-প্রয়োগে প্রমথ চৌধুরীর নিপুণতা সবিশেষ লক্ষণীয়। Epigram ও Paradox-এর কুশলী ব্যবহারেও তাঁর মন আনন্দ পেত। এ সত্যটি তাঁর জানা ছিল যে, ধ্বনিহীন বাক্য আধমরা। তাই নিজের গদ্যরচনাকে ধ্বনিঝঙ্কৃত ছন্দোময় করে তুলতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেননি। প্রমথ চৌধুরীর রচনার গঠনপারিপাট্য অনবদ্য। তিনি এলোমেলো ঢিলেঢালা ভাষা দিয়ে ভাবের বাণীরূপটি ফুটিয়ে তোলার বিরোধী ছিলেন। গদ্যলেখায় ঝক্‌ঝকে ভষাশিল্পের, ক্ষুরধার লিপিনৈপুণ্যের ও নিরেট গঠনভঙ্গির পরিচয় দিতে তাঁর সমকক্ষ খুব বেশি নেই। বীরবলী প্রবন্ধের একটি তথাকথিত ত্রুটি—অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা। মূল বিষয়বস্তুর বহির্ভূত নানা কথার সমাবেশ তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত, এই ধরণের অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার মধ্যে মননধর্ম ও wit-এর চমকপ্রদ খেলা দেখানোর একটা সুযোগ তিনি দেখতে পেয়েছিলেন।

প্রমথ চৌধুরীর স্টাইল

পরিশেষে প্রশ্ন তোলা যায়, আধুনিক বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে প্রমথ চৌধুরীর স্থান কী? তাঁর চিন্তার মৌলিকতা, ভাষার উজ্জ্বল পরিচ্ছন্নতা, মতবাদের

উপযোগিতা, রসবিশ্লেষণের শক্তি ও সর্ববিষয়ব্যাপিনী মননশীলতার স্থায়ী মূল্য কতটা? অনেকে বলেন, যতই উজ্জ্বল হোক, রচনারীতির অভিনবত্বের দীপ্তি কালক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে, যদি-না তার পেছনে থাকে চিরকালীন মূল্যের সত্যানুভূতি। প্রমথ চৌধুরীর সৃষ্ট সাহিত্যে এই সত্যানুভূতি কতখানি আছে তার ওপরই তাঁর লেখার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আর শাশ্বত মূল্য নির্ভর করছে।*

উপসংহার

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রসঙ্গে

[**রচনার সংকেতসূত্র :** প্রারম্ভিক ভূমিকা—সত্যেন্দ্রনাথের রচনার প্রাচুর্য—সত্যেন্দ্রকাব্য-জিজ্ঞাসা—সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দনির্মাণকুশলতা ও ইহার কাব্যগত সার্থকতাবিচার—ছন্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের প্রবণতাটি লক্ষণীয়—সত্যেন্দ্রনাথের শিশুসুলভ কল্পনাবিলাস—তাঁর রচনায় সূক্ষ্ম কল্পনার দৈন্য—সত্যেন্দ্রনাথকে রিয়ালিষ্ট শিল্পীও বলা চলে না—তাঁর কবিতায় তথ্য ও তত্ত্বের অকাব্যিক সমাবেশ—কবির আদর্শবাদ ও মতবাদপ্রচারের চেষ্টা—তরল কল্পনার রাজ্যে কবির পরিক্রমা—অনুবাদকর্মে কবি কতখানি সার্থক—রূপায়ণে কবির বৈশিষ্ট্য—উপসংহার]

॥ ১ ॥

রবীন্দ্র-অনুজ বাঙালী কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ এককালে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বহুবিচিত্র কবিতার রচয়িতা তিনি—ভাষা, ছন্দ ও শব্দ প্রয়োগের উজ্জ্বল অভিনবত্বে তৎকালীন পাঠকদের কিছুটা চমকেও দিয়েছিলেন। ছন্দের যাদুকর, অপ্রতিদ্বন্দ্বী শব্দশিল্পী-হিসেবে তাঁকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দনও জানিয়েছেন সেকালের বিস্তর কাব্যরসিক সমালোচক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাঁর এই ভক্তশিষ্যের অকালমৃত্যুর অব্যবহিত পরে লেখা এক বিখ্যাত কবিতায় বলেছেন :

প্রারম্ভিক ভূমিকা

'তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী-'পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।
সে-তন্ত্র হয়েছে বাঁধা; আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে।'

[* ডক্টর জীবেন্দ্র সিংহ রায়-রচিত। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা তাঁর 'প্রমথ চৌধুরী'—দ্বিতীয় সংস্করণ—গ্রন্থে দ্রষ্টব্য]

১৯০০ সাল থেকে শুরু করে আমৃত্যু অর্থাৎ ১৯২২ সাল পর্যন্ত অজস্র কবিতা তিনি লিখেছেন এবং অনুবাদ ও করেছেন প্রচুর। 'সবিতা', 'সন্ধিক্ষণ', 'বেণু ও বীণা', 'হোমশিখা', 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু', 'ফুলের ফসল', 'কুহু ও কেকা', 'তুলির লিখন', 'মণিমঞ্জুষা', 'অভ্রআবীর', 'হসন্তিকা,' 'বেলাশেষের গান', 'বিদায়-আরতি' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে সেই কবিতাগুলো গ্রথিত হয়েছে। ছন্দিত বাণী-রচনার এই প্রাচুর্যের দিকে তাকিয়ে সংশয়াতীতভাবে বলা চলে—কবির কাব্যলক্ষ্মী অকৃপণা ছিলেন না। মাত্র চল্লিশ বছরের জীবনে এর চেয়ে অধিকতর সম্পদে মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করার উদাহণ সাহিত্যে খুব বেশি নেই। কাজেই বঙ্গভারতীর তন্ত্রী যদি কাব্যসাহিত্যে এই রচনাপ্রাচুর্যেরই প্রতীক হয় তবে সত্যেন্দ্রনাথের হাতে তাতে একটি তন্ত্র বাঁধা হয়েছে, এমন বলাও যেতে পারে। কিন্তু ভারতীদেবীর হাতের বীণায় সৌন্দর্যের রাগিণী ছাড়া অন্যকিছু বাজে না এরকমই শোনা যায়। নিছক প্রাচুর্যের সেখানে দাম নেই, ইতিহাসের বিচারও নাকি সে-পর্যন্ত পৌঁছোয় না। তাই রবীন্দ্রনাথের উচ্চারিত 'একটি অপূর্ব তন্ত্রী' বাঁধার কথাটির প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এ যুগের সমালোচকরা। তাঁদের বক্তব্য, এতে পরম স্নেহাস্পদ অনুজের প্রতি যতটা আন্তর প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে, রসজ্ঞ সমালোচকের সিদ্ধান্ত নাকি থেকে গেছে সেই পরিমাণেই অনুচ্চারিত।

সত্যেন্দ্রনাথের রচনার প্রাচুর্য

পাঠযোগ্য ভালো কবিতা সত্যেন্দ্রনাথ অনেক লিখেছেন, এসব রচনার শব্দনির্বাচনে ও অঙ্গসজ্জায়—সাধারণভাবে এদের ছন্দোনির্মাণ ও বাচনভঙ্গিতে একটা প্রেক্ষণীয় পারিপাট্য অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য, এই পারিপাট্য বা প্রসাধনকলার দক্ষতা, এই স্বচ্ছন্দ সচেতন পরিচ্ছন্নতা কাব্যাত্মার সঙ্গে কতখানি জড়িত। অর্থাৎ, একি কেবলই বহিরঙ্গসর্বস্ব কারুকর্ম [craft], না কবিতার চারুশিল্পের [fine art] পর্যায়ে উন্নীত। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরেই শেষ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের কবিকৃতির সার্থকতার পরিমাপ। তবে একথা আগে থেকেই বলা যায় যে, রবীন্দ্র-অনুকারীদের মধ্যে কবিতার কায়া-নির্মিতি-ঘটিত যে-শিথিলতা সর্বব্যাপক ছিল, শিল্পী সত্যেন্দ্রনাথ অনেকদিন পর্যন্তই ছিলেন তার একক ব্যতিক্রম। ভাবের বিষয় বলেই কাব্য সতর্ক-সচেতন কলাবিধি অর্থাৎ গঠনকৌশলের অপেক্ষা রাখে না, এই অভিমত তিনি কদাপি শ্রদ্ধেয় বলে মনে করেননি। অন্তত এই একটি দিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথ সে-যুগটিকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত অতি-আধুনিক কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

সত্যেন্দ্রকাব্যজিজ্ঞাসা

॥ ২ ॥

সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দের ঐন্দ্রজালিক বলে যে-খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তা তাঁর কবিকর্মের রসোত্তীর্ণতার কতটা পরিচয় বহন করে? ছন্দ-শব্দ-চিত্র-সংগীত-ভাববস্তু, এ সমস্তকিছুর প্রাণদীপ্ত সমন্বয়েই—কেবল সমন্বয়েই নয়, একাত্ম এবং অচ্ছেদ্য সম্বন্ধেই—সত্যকার রসাপ্লুত কবিতার জন্ম। এসব বিচিত্র উপকরণের স্বতঃস্ফূর্ত সমবায়-সম্বন্ধ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে শুধু ছন্দোনির্মাণের কৌশলই যদি প্রধান হয়ে ওঠে তবে কাব্য-সার্থকতা-বিষয়ে ন্যায়সংগতভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় ছন্দের পরীক্ষা চলেছে বিচিত্র-পথে। সংস্কৃত কাব্যের নানা ছন্দ—যেমন রুচিরা, মালিনী, মন্দাক্রান্তা, পঞ্চচামর, শার্দ্দুলবিক্রীড়িত প্রভৃতি—বাংলা কাব্যে তিনি আমদানি করেছেন। কিন্তু সংস্কৃত ও বাংলা ছন্দের মধ্যে মূল্যগত যে-পার্থক্য রয়েছে, তার প্রতি কবি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন, এমন মনে হয় না। 'যক্ষের নিবেদন' প্রভৃতি দুএকটি কবিতায় সংস্কৃতানুগামিতা কিছুটা সাফল্যের ফল ফলিয়েছে। তবে এতে ছন্দসম্পর্কিত বিশেষ কোনো নতুন ধারাসৃষ্টির সার্থকতা আসে নি। কারণ, সংস্কৃতের উচ্চারণরীতি বাংলার ধাতে সয় না।

সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দনির্মাণ-কুশলতা ও ইহার কাব্যগত সার্থকতাবিচার

কবিশিল্পী মধুসূদনের ছন্দোপরীক্ষা ও অমিতাক্ষরের আবিষ্ক্রিয়ার সঙ্গে এর পার্থক্যটি অনুধাবনযোগ্য। অমিতাক্ষর ছন্দের উজ্জ্বল দর্পণটিতে মধুসূদনের অন্তরতর প্রাণসত্তার স্বচ্ছ প্রতিফলন ঘটেছে—নিজচিত্তবিবিক্ত একটি পরীক্ষা-মাত্র তা নয়। কবির জীবনজিজ্ঞাসা এবং কাব্যবোধ এই ছন্দের শরীর আশ্রয় করে প্রাণের মতোই জড়িয়ে রয়েছে। পক্ষান্তরে ছন্দের বিস্তৃত ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের বিবিধ পরীক্ষা স্বরূপতই ভিন্ন। তাতে ল্যাবোরেটরীর উৎসাহী ছাত্রের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার পরিচয় ফুটেছে—প্রাণগত উৎকণ্ঠার বিশেষ কোনো স্পর্শ তাতে লাগেনি। আবার, পর্বে পর্বে রবীন্দ্রকাব্যে ছন্দোজিজ্ঞাসার যে-আশ্চর্য বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, সত্যেন্দ্রনাথের বহুবিচিত্র পরীক্ষার মধ্যেও তার সামীপ্য নেই। কারণ, রবীন্দ্রনাথের ছন্দবিবর্তন তাঁর নিগূঢ় কবিপুরুষের তথা তাঁর সমগ্র কাব্যধারার বিবর্তনের সূত্রেই সার্থক।

তারপর ঐতিহাসিক বিচারের পরিপ্রেক্ষিত আনা যেতে পারে। এ বিচারে দেখা যাবে, বাংলা ছন্দের ভবিষ্যৎকে স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত বিশিষ্ট কোনো দানের দ্বারা প্রভাবিত করতে পারেননি সত্যেন্দ্রনাথ। আমাদের কাব্য-সাহিত্যে ছন্দের ইতিহাসে মধুসূদনের অমিতাক্ষর, রবীন্দ্রনাথের মুক্তক কিংবা

আরো পরবর্তীকালের গদ্যছন্দ বাংলা কবিতার ভবিষ্যতের পথনির্মাণে যে-গতি ও শক্তি সঞ্চারিত করেছে,ছন্দসম্পর্কিত এমন কোনো গৌরবের অধিকারী নন তিনি।

এস্থলে উল্লেখ্য, জানা পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যেও একটি বিশেষ জাতের ছন্দের দিকে তাঁর প্রবণতা দৃষ্টি এড়াবার নয়। তাঁর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দোরচনায়। এর লঘুচপল লীলালাস্য, এবং শিশুপ্রিয় কবিতারচনায় এর উপযোগিতা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। এই বিশেষ একটি ঢঙের ছন্দের প্রতি কবির অত্যধিক ঝোঁকের ফলে তাঁর বহু গুরুগম্ভীর বিষয়ের এবং গভীর রসের কবিতাও শেষ পর্যন্ত চমৎকৃতিজনক শিল্পনির্মিতর স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। আমাদের মনে হয়, সতেন্দ্রনাথের একপ্রকার শিশুসুলভ মনোভঙ্গিই এর জন্যে অনেকটা দায়ী। অনৌচিত্যদোষ ঘটালেও, ছন্দোগত লঘুচাপল্যের হাত থেকে কবির যেন পরিত্রাণ ছিল না। ছন্দপ্রয়োগ থেকেই কাব্যকারের মনোলোকের চেহারাটির কিছুটা আঁচ করা যায়। স্বরবৃত্তের আবর্তে সত্যেন্দ্রনাথের পুনঃ পুনঃ পরিক্রমা তাঁর মননকল্পনা ও অনুভূতির গভীরতার অভাবই সূচিত করে।

ছন্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথের প্রবণতাটি লক্ষণীয়

॥ ৩ ॥

শিশুসুলভ কল্পনাবিলাস সত্যেন্দ্রনাথের প্রায় প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। কবিকল্পনার দূরবিস্তার, গভীরতা ও বলিষ্ঠতা, যাকে আমরা 'Imagination' বলি,—খেয়ালী কল্পনা বা 'Fancy' থেকে তা বিলক্ষণ পৃথক। তরল কল্পনাবিলাসে জীবনের উপরতলার বর্ণালীর বর্ণসম্পাত ঘটতে পারে, কিন্তু ওতে গহন হৃদয়লোকের ছায়াপাতের সম্ভাবনা খুবই কম। 'Imagination'-এ সুদূরাভিসারী কবিচিত্তের ক্লান্তিহীন পক্ষবিস্তার থাকে, অথচ মাটির সঙ্গে আর সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার সেতুবন্ধনে এতটুকু বাধা নেই। 'Fancy'-তে শিশুমনেরই তৃপ্তির আয়োজন, যাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমারেখা এখনো সুচিহ্নিত হয়ে যায়নি। পরিণত বয়সের পাঠকচিত্তের অপরিণত স্তরগুলিতে কিছু কৌতুক কিছু কৌতূহল এরা সৃষ্টি করতে পারে না এমন নয়। তবে বিশুদ্ধ সাহিত্যানুভূতির সঙ্গে তার সম্পর্ক কতটা তা-ই চিন্তনীয়।

সত্যেন্দ্রনাথের শিশুসুলভ কল্পনাবিলাস

প্রশ্নটাকে অন্যদিক থেকেও বিচার করা যেতে পারে। সাধারণভাবে সত্যেন্দ্রনাথে সূক্ষ্ম কল্পনার দৈন্য লক্ষিত হবে। এই দৃশ্যমান প্রত্যক্ষ জগৎ এবং

সুস্পষ্ট চিন্তাই তাঁর চিত্তকে আকর্ষণ করেছে। চারপাশের পৃথিবীতে, আরো ঘনিষ্ঠভাবে আপন দেশে এবং কালে, যে-ঘটনা প্রাধান্য পেয়েছে, যে-সাময়িকতার আলোড়নে জনচিত্ত সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, তাকে শব্দে সমর্পিত ছন্দিত ভাষায় রূপদানে অধিক উৎসাহ দেখিয়েছেন কবি। কিংবা কোনো বস্তু বা নিসর্গসংসারের কোনো দৃশ্য যদি প্রেক্ষণীয় বলে মনে হয়েছে তাঁর কাছে তবে তার যে-রূপ বাণীবিন্যাসে ধরা পড়বার তাকেই লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। কবির ভাবদৃষ্টিতে-দেখার তেমন স্মরণীয় কোনো বিশেষত্ব, প্রাণচাঞ্চল্যের কোনো তরঙ্গ, হৃদ্‌গত কোনো উৎকণ্ঠা যেমন সে-বস্তুকে চিত্তময় করে তুলতে পারেনি, তেমনি দূরযানী কল্পনার পাখায় চাপিয়ে তাকে অনন্তপ্রসারিত দিগন্তের অভিসারে পাঠাতে পারেনি।

তাঁর রচনায় সূক্ষ্ম কল্পনার দৈন্য

কাব্যভাবনারও বিচিত্র ধারা। কোথাও তা বস্তু-অতিশায়ী ইন্দ্রিয়াতীত রহস্যলোকযাত্রী, কোথাও আবার বাস্তবের কেন্দ্রেই আবর্তিত—কিছু বর্ণপাতে সমৃদ্ধমাত্র, বস্তুরূপ আর চিত্তভাবের সংযোগে অভিনব। সত্যেন্দ্রনাথে এ উভয়েরই অনুপস্থিতি।

তাই বলে এ কাব্যরূপকে রিয়ালিষ্ট শিল্পীর নিরাসক্ত [detached] মনের দান বলেও গ্রহণ করা চলে না। কারণ, রিয়ালিষ্ট শিল্পীর মধ্যেও যে-একপ্রকার তন্ময়তা দেখা যায় তার অভাব এখানে অতিশয় প্রকট। মানসপ্রবণতা যেমনই হোক, ধ্যানতন্ময় হতে না পারলে আর্টের সৃষ্টিই সম্ভব নয়। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় যথার্থ কবিকল্পনা [Imagination] নেই, লঘুতরল কল্পনাবিলাস বা সুলভ কাল্পনিকতা [Fancy] আছে। আর আছে কতকগুলো বিচিত্র প্রবণতা, যাতে তাঁর একান্ত ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য—কবি-ব্যক্তির নয়—অত্যন্ত পরিস্ফুট। বলা বাহুল্য, এই প্রবণতাগুলোর সঙ্গে কাব্যধর্মের অচ্ছেদ্য কোনো সম্পর্ক নেই।

সত্যেন্দ্রনাথকে রিয়ালিষ্ট শিল্পীও বলা চলে না

॥ ৪ ॥

সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানের নিষ্ঠাবান একজন সাধক ছিলেন। পিতামহের যোগ্য পৌত্রহিসেবে এ দিক থেকে তিনি আমাদের শ্রদ্ধা দাবি করতে পারেন। জ্ঞানের ও চিন্তার যে-বহুবিচিত্র আয়োজন তাঁর বুদ্ধি ও মননকে প্রসারিত করেছিল তার কিছু পরিচয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত তাঁর নামাঙ্কিত গ্রন্থাগারের তালিকায় পাওয়া যাবে। সামাজিক ও রাজনীতিবিষয়ক বহু তত্ত্ব, ইতিহাস ও ভূগোলের

তাঁর কবিতায় তথ্য ও তত্ত্বের অকাব্যিক সমাবেশ

নানান্ তথ্য তাঁর অধিগত ছিল। অধ্যয়নে তাঁর ছাত্রের প্রগাঢ় নিষ্ঠা এবং সংকলনে তাঁর গবেষকের বিস্ময়কর অনুসন্ধিৎসা। কিন্তু এ সত্যটিও রসবেত্তার বিদিত যে, জ্ঞানবিজ্ঞান, তথ্য ও তত্ত্বের প্রতি কোনো পক্ষপাত সৎকাব্যের নেই। এরা উপকরণ-হিসেবে গৃহীত হতে পারে, এদের বহু-অনুশীলন কবির মনোরাজ্যকে একটা আস্বাদযোগ্য বুদ্ধির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথে চিত্তগত সেই ধাতুর অভাব, যার সংযোগে তথ্যাদি আত্মস্থ হয়। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন বাইরের জগৎকে ভিতরের জগতে পরিণত করা, তার জন্যে যে-সহজাত শক্তির প্রয়োজন, সত্যেন্দ্রনাথে তা কদাচিৎ চোখে পড়ে। প্রায়-সমসাময়িক সাহিত্যকার প্রমথ চৌধুরীর সনেটে আহৃত জ্ঞান ও অধ্যয়নের প্রাচুর্য যেমন একটা বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতার সৃষ্টি করেছিল, সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। তথ্য তত্ত্ব ইত্যাদি বস্তু তাই সেখানে ভারের সৃষ্টি করেছে, আস্বাদনীয় রসের উদ্বর্তনে সার্থক হয়ে ওঠেনি। একারণে তাঁর 'জাতির পাঁতি' কবিতায় জাত্যভিমানে শতধা খণ্ডিত মানবসমাজের রূপহীন সুদীর্ঘ তালিকা সংকলিত, 'তাজ' কবিতায় নিষ্প্রাণ মণিমুক্তাহীরকাদির অক্লান্ত বর্ণনায় পাঠকরা শ্রান্ত। মনীষীদের জীবনী নিয়ে লেখা কবিতাগুলোতে প্রায়শই বিচিত্র ঘটনাপুঞ্জের শিথিলবদ্ধ গ্রন্থন—জীবনব্যাখ্যানের বিশিষ্ট প্রত্যয়ে প্রাণিত তারা নয়। তাঁর দেশাত্মবোধ এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বমূলক কবিতায় ভূগোল ও ইতিহাসের বিচিত্র নামের তালিকা প্রাধান্য পেয়েছে। তথ্যপুঞ্জের এই রূপহীন, সৌন্দর্যবিরহিত এবং অনুভূতির স্পর্শশূন্য উপস্থাপনা কাব্যসম্মত নয়। খণ্ডকবিতায় বা গীতিধর্মী রচনায় এদের অনুপ্রবেশের আধিক্য কবিমনের বহুঅধ্যয়নের সংবাদের শিশুজনোচিত প্রগলভ প্রকাশ বলেই অনেক সময় মনে হয়।

কবির আদর্শবাদ ও মতবাদ-প্রচারের চেষ্টা

একদিকে তথ্যের প্রাচুর্য অন্যদিকে রাজনীতিক-সামাজিক ইত্যাদি মতবাদ-প্রচারের উচ্চকণ্ঠ চেষ্টা। মতবাদের দিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথের প্রগতিশীল ভূমিকা অবশ্যই শ্রদ্ধেয়। এ জাতীয় কবিতাগুলোর মধ্যে তিনটি সুর লক্ষণীয়। প্রথম, বিশ্বমানবতা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা—বিশ্বমানবতার আদর্শলঙ্ঘনকারীদের প্রতি বিতৃষ্ণারও এই একই উৎস। দুই, পরাধীন ভারতের মুক্তিকামনা, ভারতীয় তথা বাঙালী-মনীষীদের সমুচ্চ জীবনসাধনার গৌরবে উচ্ছ্বাসপ্রকাশ। তিন, ভারতের নানা সংকীর্ণ সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ। বিষয়হিসেবে এরা কাব্যের রাজ্যে অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। কিন্তু এই সমুদয় বস্তু কবিচিত্তের সংযোগে বিশিষ্ট রূপ পেলে তবেই ভাবের বিষয় হয়ে উঠতে পারে। কবিব্যক্তিত্বের

সংস্পর্শহীন রাজনীতিক, সামাজিক ইত্যাদি বক্তৃতাবিবৃতি জ্ঞানরাজ্যেই প্রবেশপথ পেতে পারে, প্রকৃত কাব্যসংসারে নয়। দ্বিতীয়ত, এ সকল বিষয়ের বাণীবিন্যাস আবার মনোজ্ঞ চিত্রকল্পের [poetic images] মাধ্যমে সত্য হয়ে ওঠা চাই। সত্যেন্দ্রনাথে এ সব বস্তু কোথাও সাধারণ জ্ঞানগম্য তত্ত্বহিসেবে, কোথাও-বা মঞ্চবক্তৃতার আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বাইরের ঘটনা কবিচিত্তকে আলোড়িত করে সংবেদনার আর্তি জাগাতে পারে নি। নজরুলের এ জাতীয় কবিতায় অনুভূতির যে-প্রবলতা, আবেগের যে-তীব্রতা, সর্বপ্লাবী বিদ্রোহের চিত্তোদ্বেলকারী যে-আহ্বান পাঠকচিত্তকে সবলে আকর্ষণ করে, সত্যেন্দ্রনাথে তার চিহ্নমাত্র নেই। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় অনুভূতির উত্তাপের স্থানে যুক্তির ক্রম আছে, ভাবাবেগস্পন্দনের স্থান দখল করেছে নিরুদ্বেগ তথ্যগত উদাহরণের যোজনা। উচ্চাঙ্গের কাব্যরূপ পাওয়া তো দূরের কথা, সত্যেন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলো আমাদের মর্মলোকে এতটুকু কম্পন জাগায় না।

তরল কল্পনার রাজ্যে কবির পরিক্রমা

প্রেমের কবিতা তিনি লেখেননি। তাঁর কবিস্বভাবের যে-পরিচয় দিয়েছি, প্রেমকল্পনার মদির স্বপ্ন, বাসনার মাদকতা সেখানে প্রাপ্তব্য নয়। জর্দাপরী, বিদ্যুৎপর্ণা কিশোরী তাই রূপকথারাজ্যের সীমাস্পর্শী তরল কল্পনার ভূমিতে পরিক্রমা করেছে—প্রেমানুভবের সৌন্দর্যস্বর্গে উন্নীত হতে পারেনি। নিসর্গপ্রকৃতির প্রতি মনোভঙ্গিতেও তাঁর কোনো নিজত্ব নেই। তবে রবীন্দ্রনাথের ভাবকল্পনা-অনুসরণে দুচারটি সার্থক কবিতা তিনি লিখেছেন। যক্ষের নিবেদন বা গ্রীষ্মের সুর বা কাশবন রবীন্দ্রকাব্যভাবনাকে কিছুটা প্রকাশ করার জন্যে সার্থকতার স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। চম্পা, জবা, আকন্দ, আফিমের ফুল ইত্যাদি কবিতার কথঞ্চিৎ সাফল্যের পেছনে সৌন্দর্যের প্রচলিত কোমল-পেলব ধারণার বিরুদ্ধাচরণের একটি ইঙ্গিত যেন ধরা পড়ে। কিন্তু পরবর্তীদের কাব্যে কোনো বিশেষ ধারাসৃষ্টিতে এ ইঙ্গিতের অনুবর্তন নেই।

॥ ৫ ॥

অনুবাদকর্মে কবি কতখানি সার্থক

কবিতার অনুবাদক-হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথের খ্যাতি একাল পর্যন্ত প্রসারিত। তবে উত্তম কবিতার পূর্ণ আস্বাদবহনকারী অনুবাদ আদৌ সম্ভব কিনা, এই তাত্ত্বিক আলোচনার মীমাংসা প্রয়োজন। কবিতার ভাব ও ভাষারূপের মধ্যে সম্পর্কটি একেবারে অচ্ছেদ্য। শব্দের ব্যঞ্জনা ভাষার নিজস্ব প্রাণশক্তির ওপর নির্ভর করে। কাজেই কবিতা ভাষান্তরিত হলে অর্থের বোধ যদি-বা জন্মায়, শব্দের

ওই ব্যঞ্জনাধর্মটিকে যে অনেকখানি হারাতে হয় তাতে সন্দেহ নেই। কবিতার প্রতিটি শব্দকে তাই সাহিত্যশাস্ত্রবিদেরা অপরিবর্তনীয় বলে মনে করেন, বলেন—'Unique Word'।

তবু কবিতার অনুবাদ হয়েছে, হচ্ছে। অনেকখানি রস মাঝপথে মারা গেলেও ভিন্ন ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠক কিছু রসের আস্বাদ পেতেও পারে। তাই অনুবাদের সীমাবদ্ধ এই সার্থকতারও কতকগুলো সূত্র খোঁজা যেতে পারে। প্রথম, যাঁর কবিতা অনুবাদ করা হবে তাঁর সৌন্দর্যদৃষ্টি, জীবনজিজ্ঞাসা ও রূপনির্মাণকলার কোনো-না-কোনো দিকের সঙ্গে অনুবাদক আপন সামীপ্য উপলব্ধি করবেন। দ্বিতীয়, অনুবাদকও অবশ্যই কবি হবেন। গদ্যরচনার অনুবাদক অনেকেই হতে পারেন, কিন্তু কবিতার অনুবাদক একমাত্র কবিই।

সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে প্রথম সূত্র যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে একথা বলা চলে। বিশিষ্ট কোনো জীবনজিজ্ঞাসা সত্যেন্দ্রনাথের ছিল না, তাঁর রচনায় নিগূঢ় সৌন্দর্য-বোধের অভাব রয়েছে। মনে হয়, এই অভাবই তাঁকে অথর্ববেদ আর প্রাচীন চীনা কবিতা থেকে শুরু করে সুইনবার্ন এবং হুইটম্যান, ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং শেলি, হাফেজ এবং বদলেয়র—দেশ-কাল ও মেজাজের দূরতম কোটিস্থিত বিচিত্র বিভিন্ন রাজ্যে অনুবাদের ক্ষেত্রে উৎসসন্ধানের অভিযান করিয়েছে। কবিস্বভাব এবং কাব্যরূপের এত বিচিত্রতাকে আত্মসাৎ করে নিয়ে অনুবাদে সার্থক করে তোলার ক্ষমতা খুব উঁচুদরের কবিরও থাকে না, সত্যেন্দ্রনাথ তো দূরের কথা। বোধ করি, তাঁর ব্যাপক অধ্যয়ন ও কাব্যপরিচিতি-প্রদর্শনই যেন এখানে একটা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। খাঁটি কাব্যপ্রেরণার উৎস থেকে এদের জন্ম নয়।

॥ ৬ ॥

রূপায়ণে সত্যেন্দ্রনাথের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য শব্দচিত্র-অঙ্কনে। এ শব্দচিত্র সর্বত্র চিত্রকল্প বা poetic images হয়ে উঠেছে কিনা, সে-সম্বন্ধে বিতর্ক চলতে পারে। কবিচিত্তের স্বপ্নকল্পনার মায়াময় স্পর্শের কিছুটা অভাব এতে আছে। তবে বিচ্ছিন্ন চিত্রহিসেবে এদের আস্বাদ্যমানতায় সংশয়প্রকাশ করা চলে না। মালার্মে কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে যে-ইন্দ্রিয়বিপর্যয়ের কথা বলেছেন, এখানে তার কিঞ্চিৎ নিদর্শন মিলতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের শ্রবণ-ইন্দ্রিয় বোধ করি তাঁর মনের সর্বাধিক সমর্থনপুষ্ট। শোনা ও দেখার ব্যাপারকে কতকগুলো সুনির্বাচিত শব্দ ও ধ্বনিতরঙ্গের মাধ্যমে রূপায়িত করে বর্ণবিলসিত, সুরময় চিত্রের আভাস জাগিয়ে

তোলা তাঁর পক্ষে প্রায় অনায়াসসাধ্য ছিল। কোনো কোনো কবিতায় কেবল এরই আকর্ষণে এক ধরণের উপভোগ্য রস তিনি সৃষ্টি করেছেন। 'পাল্কীর গান', 'দূরের পাল্লা' প্রভৃতি কবিতার নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। পাল্কীবেহারা আর দাঁড়িদের শ্রম, গতি, আলস্য ও উল্লাস, আর ক্লান্তি ও হতাশা যেন চিত্রে-সুরে-সংগীতে জীবন্ত করে ধরে রেখেছেন কবি। কাব্যের চূড়ান্ত বিচারে এদের উত্তীর্ণ হবার অনেক বাধা থাকলেও, মোটামুটি বিচারে এরা স্বীকৃতি পাবে।

রূপায়ণে কবির বৈশিষ্ট্য

সত্যেন্দ্রকাব্যের দুর্বলতার দিকেই একটু বেশি ঝোঁক দেওয়া হল যেন। তাঁর রচনায় সূক্ষ্ম কবিকল্পনার অপ্রতুলতা, ধ্যানতন্ময়তার অভাব, ভাষাকে আশ্রয় করে ভাষার অতীত তীরে উত্তরণে তাঁর ক্ষমতাদৈন্য ইত্যাদির দিকেই আমরা পাঠকগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। তথাপি এও স্বীকার করতে হয়, নানান্ ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথ অদ্যাপি স্মরণীয়। তাঁর মতো অতন্দ্র সাধনা ও অকম্পিত নিষ্ঠা নিয়ে খুব কম বাঙালীকবিই কাব্যভারতীর অর্চনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে শিথিলপ্রযত্ন কখনো তিনি হননি। কবিতারাণীর চরণে তিনি যে-মঞ্জীর পরিয়েছিলেন তার শ্রুতিবিনোদন সংগীতধ্বনি আমাদের এখনো আবিষ্ট করে তোলে। সবচেয়ে ভালো লাগে তাঁর খাঁটি বাঙালীত্ব, বলিষ্ঠ আদর্শবাদ, মানবতার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ, দেশাত্মবোধের আগ্নেয় ঔজ্জ্বল্য, অন্যায়ের প্রতি সুতীব্র ঘৃণা, সর্বমানবের সাম্যের স্বীকৃতি। তাঁর রূপমুগ্ধ কৌতূহলী দৃষ্টি, স্বপ্নলুতাজনিত সহজ সরল আনন্দ, অসাধারণ চিত্রণনৈপুণ্য সত্যিই প্রশংসার বস্তু।*

উপসংহার

* অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত-লিখিত

'বিচিত্র প্রবন্ধ'-পাঠের ভূমিকা

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** মুখবন্ধ—সমালোচ্য গ্রন্থখানির নামকরণ—'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর রীতি-বৈচিত্র্য—প্রবন্ধসাহিত্যের বিচিত্রতা—'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর লেখাগুলি কোন্ জাতের রচনা—রবীন্দ্রসাহিত্যে মননশীলতা ও কাব্যকলার যৌগপদ্য—'বাজে কথা', 'পনেরো-আনা', 'নববর্ষা', 'কেকাধ্বনি', 'বসন্তযাপন' প্রভৃতি কয়েকটি রচনার কেন্দ্রগত ভাবসত্য—'আষাঢ়', 'শরৎ' ও 'পাগল'—স্বগত প্রবন্ধের বিশেষত্ব ও 'বিচিত্র প্রবন্ধ'—গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের বাহক—উপসংহার]

মুখবন্ধ

রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ'। গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়—এতে ছোটবড়ো কুড়িটি রচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু এর বিষয়ে আমাদের আলোচনাটি হবে অতিশয় ক্ষুদ্রকায়, খুব সংক্ষেপে বইটির সম্বন্ধে দুচারটি কথা বলব। এ হবে 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-পাঠের ছোট্ট একটি ভূমিকা—তার বেশি কিছু নয়। মুখবন্ধ এই পর্যন্ত।

সমালোচ্য গ্রন্থখানির নামকরণ

'বিচিত্র প্রবন্ধ' তিনটি সংস্করণের মধ্য দিয়ে প্রভূত রূপান্তর লাভ করে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে। বর্তমান আকারে বইখানি প্রধানত কবির সাহিত্য ও জীবন-উপলব্ধি-বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এতে যথার্থই বিচিত্র বিষয় সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধের সমাবেশ করা হয়েছিল। সেদিক হতেই এর 'বিচিত্র প্রবন্ধ' নামকরণ। প্রচলিত তৃতীয় সংস্করণে পূর্বেকার অর্থ ধরে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' নামকরণের ততখানি সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, আপাতদৃষ্টিতে বিষয়বস্তুর নানাত্ব থাকলেও রচনাগুলি ভাবের দিক দিয়ে একটা অন্তরঙ্গ ঐক্যে বিধৃত। এদের বিষয় ও ভঙ্গিগত মিল কারো দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়। কিন্তু প্রবন্ধগুলোর বিষয়বস্তু নয়, এদের রূপরীতির প্রতি লক্ষ্য করলে ভিন্ন দিক হতে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' নামের একটা সংগতি খুঁজে পাওয়া যায়।

'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর রীতিবৈচিত্র্য

'বিচিত্র প্রবন্ধে'র লেখাগুলো যথার্থই বাংলা সাহিত্যে বিচিত্র বা অভিনব রীতির প্রবন্ধ। এতে গুরুতর বিষয়কে লঘু ভঙ্গির মধ্য দিয়ে সরস করে বিবৃত করা হয়েছে। সুতরাং এর রচনবৈচিত্র্য অবশ্যস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের পূর্বলিখিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে এই রীতি-বৈচিত্র্যের তেমন সন্ধান পাওয়া যায় না। একমাত্র তাঁর পত্রাবলীতে এই লঘুভঙ্গির স্বাদ কতকটা মেলে। বাংলাসাহিত্যেও আলোচ্যমান গ্রন্থখানিকে নতুন বলতে হবে। এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' ও

'লোকরহস্যে' সরস লঘুভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছিল। কিন্তু ওই রচনাগুলিকে ঠিক বিষয়বস্তু-অবলম্বনে লেখা প্রবন্ধ বলা যায় না। একটা আখ্যা-মাত্র অবলম্বন করে তার সূত্রে মানসিক বিচিত্র চিন্তার প্রকাশ দপ্তরে ও লোকরহস্যে দেখা যায়। তা ছাড়া, ওইগুলি প্রচুর হাস্যরস ও ব্যঙ্গের সহযোগে গঠিত। বঙ্কিমের পর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশায়ের বহু প্রবন্ধে সরসতার পরিচয় সুলভ হলেও তা প্রবন্ধের স্থানবিশেষেই আবদ্ধ—সমগ্র রচনা কিন্তু লঘুরীতিতে দীপ্যমান হয়ে ওঠেনি। কবিগুরুর 'বিচিত্র প্রবন্ধ'ই প্রবন্ধ-নামধেয় অথচ লঘু রীতির এই ধরণের রচনা যাকে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বলা যেতে পারে।

প্রবন্ধসাহিত্যের বিচিত্রতা

এক হিসেবে প্রবন্ধমাত্রই ব্যক্তিগত মনোভাবের বাহক। য়ুরোপীয় সাহিত্যে যাঁকে প্রবন্ধ-নামক বিশেষ শ্রেণীর রচনার জন্মদাতা বলা যায় সেই ফরাসী লেখক বিখ্যাত মনটেইন ব্যক্তিগত প্রবন্ধ-রচনাতেই উৎসাহিত হয়েছিলেন। ইংরাজি সাহিত্যে ল্যামের রচনায় এরূপ ব্যক্তিমানসের উপাদান প্রচুর। কিন্তু কার্লাইল-এমার্সন প্রমুখ প্রবন্ধকারদের রচনা অপেক্ষাকৃত বিষয়-নির্ভর। যাঁরা যথার্থ সাহিত্যিক তাঁরাই ব্যক্তিগত প্রবন্ধে যশের অধিকারী হতে পারেন, এবং তাঁদের সে-রচনাগুলো সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের একটি বিভাগবিশেষের মধ্যে পরিগণিত হতে পারে। নতুবা যুক্তিনির্ভর, তথ্যবহুল, বিষয়সমৃদ্ধ রচনাগুলো 'প্রবন্ধ'-মাত্র—সাহিত্য নয়, এবং ওইসব লেখা দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি প্রভৃতি যে-কোনো একটি শ্রেণীর মধ্যে স্থানলাভের যোগ্য। ফরাসী ও ইংরাজি সাহিত্যে আর-এক শ্রেণীর রচনা দেখা যায় যেগুলো ঠিক প্রবন্ধ-আকারে গ্রথিত নয়, বাঁধাধরা কোনো বিষয়বস্তু নিয়েও লিখিত নয়। বিষয়ভারহীন, কখনো তরল, কখনো গম্ভীর, কখনো হাস্যময়, কখনো কাল্পনিক এই রচনাগুলোকে 'Belles Letters' নাম দেওয়া হয়ে থাকে। অধুনা এই শ্রেণীর রচনাকে বাংলা সাহিত্যে রম্যরচনা নাম দেওয়া হচ্ছে। ঠিক Belles Letters নাম না দেওয়া গেলেও বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তে বিষয়হীনতা ও লঘুতার বহু পরিচয় রয়েছে, 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' এবং ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পঞ্চানন্দী ঢঙের রচনাতেও এই লঘু রীতির সাহিত্যগৌরব প্রচুর।

'বিচিত্র প্রবন্ধে'র রচনাগুলোকে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টত রসপ্রধান প্রবন্ধের শ্রেণীতে ফেলতে চেয়েছেন। ভূমিকা-বাক্যে তিনি বলেছেন: 'ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তুগৌরবে নয়, রচনারসসম্ভোগে।' কিন্তু 'বিচিত্র প্রবন্ধ' পুরাপুরি Belles Letters-জাতীয় সাহিত্যিক খেলা নয়। আবার,

মননপ্রধান, যুক্তিনির্ভর, আলোচনামূলক প্রবন্ধসমষ্টিও এ নয়। বইয়ের গোড়ার দিকের 'সরোজিনীপ্রয়াণ', 'পথপ্রান্তে', 'ছোটোনাগপুর', 'রুদ্ধগৃহ' প্রভৃতি লেখায় যদিচ বিষয়বস্তু সামান্য এবং কবিসুলভ মনের স্বগত গুঞ্জরণই প্রধান, পরবর্তী লেখাগুলোতে রচনার বিষয় খুব সামান্য অংশ গ্রহণ করেনি—'পরনিন্দা', 'মন্দির', 'রঙ্গমঞ্চ', 'ছবির অঙ্গ', 'সোনার কাঠি' প্রভৃতিই তার প্রমাণ। এগুলোর মধ্যে কবির স্বভাবসুলভ লঘুরীতি ও কবিত্বময়তা রচনাকে বস্তুভার ও মননকঠোরতা হতে রক্ষা করেছে মাত্র। 'নববর্ষা', 'কেকাধ্বনি' ও 'বাজে কথা' প্রবন্ধে লেখকের বক্তব্য গুরুতর—চমৎকার ভঙ্গি ও কবিত্বের মাধ্যমে তা বিবৃত হয়েছে—এই পর্যন্ত। আবার, 'পাগল', 'আষাঢ়' ও 'শরৎ' প্রায় পুরাপুরি কবিত্বময় রচনা। এদের মধ্যে অনুভূতি ও কল্পনার বর্ণসম্পাত ঘটেছে, ভাষাভঙ্গিতেও আবেগময়তা প্রকট। বাক্য ছন্দোবদ্ধ হলে 'পাগল'-জাতীয় রচনা কবিতার পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পারত। সুতরাং সমস্ত 'বিচিত্র প্রবন্ধ'কে যদি রচনার কোনো-একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতেই হয় তা হলে একে ব্যাপকভাবে স্বগত প্রবন্ধরচনা বলে গণ্য করাই শ্রেয়।

'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর লেখাগুলি কোন্ জাতের রচনা

রবীন্দ্রনাথ যে শুধু মহৎ কবি ছিলেন তা-ই নয়, মননশীল চিন্তানায়কও ছিলেন তিনি। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, রাজনীতি, ধর্মনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য চিন্তা তাঁর বিভিন্ন গদ্যরচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একাধারে কবি ও মনীষী ছিলেন বলেই মননময় গুরুতর বিষয়ে নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করতে গিয়ে সাহিত্যিক রমণীয়তার আকর্ষণ কখনো তিনি ত্যাগ করতে পারেননি; আবার, রমণীয় বিষয় গদ্যে উপস্থাপিত করতে গিয়ে উচ্চতর মননের কথা অনায়াসেই সন্নিবেশিত করেছেন। এ দুয়ের বিজাতীয়ত্ব রচনাকালে তিনি প্রায়শ বিস্মৃত হয়েছেন। 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র কয়েকটি রচনা এইরূপে বিষয়সমৃদ্ধ হয়েছে, ভাবমাত্রের বাহক হয়নি।

রবীন্দ্রসাহিত্যে মননশীলতা ও কাব্যকলার যৌগপদ্য

'বাজে কথা' প্রবন্ধটির বক্তব্য অনুসরণ করে তার আলোকেই রবীন্দ্রনাথ অপর প্রবন্ধগুলোকে লক্ষ্য করতে বলেছেন। 'বাজে কথা'য় লেখকের বক্তব্য হল—উত্তম সাহিত্য নির্দিষ্ট কোনো অর্থ বহন করে না, ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক কোনো প্রয়োজনও সাধন করে না। দৃষ্টান্তের জন্যে রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত 'মেঘদূত' কাব্যের উল্লেখ করেছেন। কালিদাসের 'মেঘদূত' অতিশয় উত্তম একটি কাব্য, কিন্তু কোনো নীতি-উপদেশ এর নেই। লেখকের এই কথাগুলো সবিশেষ

প্রণিধানযোগ্য—'সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলি কোনো বিশেষ কথা বলিবার স্পর্ধা রাখে না। সংস্কৃত সাহিত্যে মেঘদূত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাহা ধর্মের কথা নহে, কর্মের কথা নহে, পুরাণ নহে, ইতিহাস নহে। যে-অবস্থায় মানুষের চেতন-অচেতনের বিচার লোপ পাইয়া যায় ইহা সেই অবস্থার প্রলাপ। ইহাকে যদি কেহ বদরীফল মনে করিয়া পেট ভরাইবার আশ্বাসে তুলিয়া লন তবে তখনি ফেলিয়া দিবেন। ইহাতে প্রয়োজনের কথা কিছুই নাই। ইহা নিটোল মুক্তা, এবং ইহাতে বিরহীর বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তচিহ্ন কিছু লাগিয়াছে; কিন্তু সেটুকু মুছিয়া ফেলিলেও ইহার মূল্য কমিবে না। ইহার কোনো উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই এ কাব্যখানি এমন স্বচ্ছ, এমন উজ্জ্বল। ইহা একটি মায়াতরী, কল্পনার হাওয়ায় ইহার সজল-মেঘ-নির্মিত পাল ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং একটি বিরহীর হৃদয়ের কামনা বহন করিয়া ইহা অবারিত বেগে একটি অপরূপ নিরুদ্দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে—আর কোনো বোঝা ইহাতে নাই।'

'বাজে কথা', 'পনেরো-আনা', 'নববর্ষা', 'বসন্তযাপন', 'কেকাধ্বনি' প্রভৃতি কয়েকটি রচনার মর্মসত্য

এরূপ সাংসারিক প্রয়োজন ও সাহিত্যিক অপ্রয়োজনের প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে 'পনেরো আনা' প্রবন্ধেও তুলেছেন এবং মানুষের সাংসারিক ব্যর্থতাকেই ব্যর্থতা বলে গ্রহণ করতে চাননি। রচনাটিতে লেখক বলছেন: 'জীবন বৃথা গেল। বৃথা যাইতে দাও। অধিকাংশ জীবনই বৃথা যাইবার জন্য হইয়াছে। এই পনেরো-আনা অনাবশ্যক জীবনই বিধাতার ঐশ্বর্য সপ্রমাণ করিতেছে। তাঁহার জীবনভাণ্ডারে যে দৈন্য নাই, ব্যর্থপ্রাণ আমরাই তার অগণ্য সাক্ষী। আমাদের অফুরান অজস্রতা, আমাদের অহেতুক বাহুল্য দেখিয়া বিধাতার মহিমা স্মরণ করো। বাঁশি যেমন আপন শূন্যতার ভিতর দিয়া সংগীত প্রচার করে, আমরা সংসারের পনেরো-আনা আমাদের ব্যর্থতার দ্বারা বিধাতার গৌরব ঘোষণা করিতেছি।...সকল ঘাস ধান হয় না। পৃথিবীতে ঘাসই প্রায় সমস্ত, ধান অল্পই। কিন্তু ঘাস যেন আপনার স্বাভাবিক নিষ্ফলতা লইয়া বিলাপ না করে; সে যেন স্মরণ করে যে, পৃথিবীর শুষ্ক ধূলিকে সে শ্যামলতার দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছে, রৌদ্রতাপকে সে চিরপ্রসন্ন স্নিগ্ধতার দ্বারা কোমল করিয়া লইতেছে।' জৈব সত্তার প্রয়োজনসাধনকে, শুধু কাজের কথা, কাজের কাজকেই রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের একতম লক্ষ্য বলে মেনে নিতে পারেননি। এ কারণে বাজে কথা, বাজে কাজ, তথাকথিত অনাবশ্যকের প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শন সহজ রসের সাধক কবিশিল্পী রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই 'বসন্তযাপন'-রচনাটিতে সাংসারিক

কর্মব্যস্ততার ঘূর্ণীচক্রে আবর্তিত মানুষের দিকে তাকিয়ে কবি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন : 'হায় রে সমাজদাঁড়ের পাখি, আকাশের নীল আজ বিরহিনীর চোখদুটির মতো স্বপ্নাবিষ্ট, পাতার সবুজ আজ তরুণীর কপোলের মতো নবীন, বসন্তের বাতাস আজ মিলনের আগ্রহের মতো চঞ্চল ; তবু তোর পাখাদুটা আজ বন্ধ, তবু তোর পায়ে আজ কর্মের শিকল ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিতেছে—এই কি মানবজন্ম !'

'বাজে কথা' রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ প্রবন্ধের বাঁধা রাস্তা দিয়ে চলেননি সত্য, এবং বররুচি-লিখিত 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং' বাক্যের সারমর্ম যদিও অনুধাবন করেছেন, তথাপি প্রবন্ধের মধ্যে বহুবিতর্কিত সাহিত্যা-লোচনার সার কথাটিই নিবেদন করতে চেয়েছেন—'বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়' অথবা, সাহিত্যরসেই সাহিত্যের সার্থকতা। 'বাজে কথা'র ন্যায় 'নববর্ষা' ও 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধ-দুটির অভ্যন্তরেও সাহিত্যসমালোচনার তত্ত্ব নিহিত রয়েছে দেখতে পাই। 'নববর্ষা'য় কবি 'মেঘদূত' কাব্যের আলোচনা করেছেন এবং পরিশেষে সাহিত্যসমালোচনামূলক তত্ত্বটি এইভাবে আমাদের গোচর করেছেন : 'সকল কবির কাব্যেরই গূঢ় অভ্যন্তরে এই পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে। সকল বড়ো কাব্যই আমাদিগকে বৃহতের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভৃতের দিকে নির্দেশ করে।···যে-কবির তান আছে কিন্তু কোথাও সম নাই, যাহার মধ্যে কেবল উদ্যম আছে আশ্বাস নাই, তাহার কবিত্ব উচ্চকাব্যশ্রেণীতে স্থায়ী হইতে পারে না।' অর্থাৎ, উত্তম সাহিত্যসৃষ্টির নিয়মই হল এই যে, তার আরম্ভ ও পরিণাম একটি স্পষ্টরেখ সাহিত্যিক অভিপ্রায়ের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে। ঘটনা ও চরিত্রের সংঘাতে নাটক আরম্ভ হল, কিন্তু মাঝপথে যেখানে সংঘাত উচ্চতর হয়েছে ও একটা পরিণামের মুখে চরিত্রগুলিকে নিয়ে যাচ্ছে [রবীন্দ্রনাথের অভিমতে এই পরিণাম শান্তি ও মিলনময়] সেই সময় অকস্মাৎ মাঝপথে একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি করলে তা দর্শক বা পাঠকের প্রত্যাশায় আঘাত দেবে। যা হোক, 'নববর্ষা'য় যে কবি শুধু বর্ষার অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক পরিবেশবর্ণনায় বা স্বীয় গীতিকাব্যোচিত মনোভাববর্ণনাতেই তাঁর লেখনী ব্যয় করেননি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এরূপ ক্ষেত্রে প্রবন্ধটির মধ্যে লেখকের বক্তব্য উপেক্ষা করে বচনের রমণীয়তার স্বাদগ্রহণ কিছুতেই সম্ভব হয় না। এবং তিনি বিশেষ কোনো বক্তব্য উপস্থাপিত করতে চাননি, তা আপনা হতেই এসে পড়েছে—এরূপ অনুভব করতেও বাধা হয়। 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধে তো স্পষ্টতই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তরল ও মনোগ্রাহ্য গভীর সৌন্দর্যের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে,

আর সমস্ত প্রবন্ধ ব্যাপ্ত করে লেখকের সমালোচনাই প্রকাশ পেয়েছে। রচনাকরের বক্তব্য যুক্তিনির্ভর এবং দৃষ্টান্তবহুল। এরূপ ক্ষেত্রেও লেখক লঘুরীতিতে স্বকীয়ভাবে গুরুতর সাহিত্যিক সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। 'সাহিত্য'-নামক আলোচনাগ্রন্থে 'সৌন্দর্যবোধ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে-উপদেশ দিতে চেয়েছেন তা-ই একটু ভিন্নরীতিতে 'কেকাধ্বনি' প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং এই আলোচনাগুলোকে একেবারে 'বাজে কথা' বলে উড়িয়ে দেব এমন সাধ্য কোথায় ?

'আষাঢ়', 'শরৎ' ও 'পাগল' প্রবন্ধের পটভূমি নিসর্গসংসার। ঋতুর কবি রবীন্দ্রনাথের নিসর্গপর্যবেক্ষণের বিশেষত্ব এই রচনাগুলোতে ফুটে উঠেছে। কিন্তু 'পাগল'-এর আরম্ভে নিসর্গ থাকলেও তাতে কবির কল্পলোকের উপলব্ধির কথাই বিশেষভাবে প্রকাশলাভ করেছে। আর, এই উপলব্ধিটিও সামান্য নয়,—

'আষাঢ়', 'শরৎ' ও 'পাগল'

নিসর্গরসিক রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় যে-কল্পনামূলক উপলব্ধি দেখা যায়, এ হল তার সারমর্ম। তিনি লক্ষ্য করেছেন, 'আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ংকর তাহার জ্বলজ্জটাকলাপ লইয়া দেখা দেয়। সেই ভয়ংকর প্রকৃতির মধ্যে অপ্রত্যাশিত উৎপাত, মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ-আকারে জাগিয়া উঠে।' কবি প্রকৃতিলোকে সহসা পটপরিবর্তনের এই রীতি দেখে তার মধ্যে নবীনের আগমনের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন এবং তার নিকট আত্ম-সমর্পণের কথা বলেছেন। তাঁর মতে এই নতুনের আবির্ভাব সাংসারিক জীবনের ক্ষেত্রে বিপদ্জনক হতে পারে, কিন্তু তা চিত্তকে অপূর্ব আনন্দরসে আপ্লুত করে। এই অপ্রত্যাশিত নবীন সুখের ও আরামের জীবন হতে মানুষকে ছিনিয়ে নেয় এবং সর্বস্ব-হারানোর মধ্য দিয়ে এক অনাস্বাদিতপূর্ব মুক্তির আনন্দ নিয়ে আসে। প্রাবন্ধিক-কবি বলছেন : 'আমাদের এই খেপা দেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে, তাহা নহে ; সৃষ্টির মধ্যে ইহার পাগলামি অহরহ লাগিয়াই আছে, আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহ জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যদান করিতেছে। যখন পরিচয় পাই তখনই রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।' এ-ই হল 'পাগল' প্রবন্ধে কবির উপলব্ধ সত্য—কাল্পনিক সত্য। একে অবলম্বন করে তত্ত্বকথায় স্বচ্ছন্দে চলে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু প্রবন্ধটি তত্ত্বকথা নয়। সমস্ত 'পাগল'-রচনাটি কবির ব্যক্তিহৃদয়ের স্পর্শে সমুজ্জ্বল, স্বকীয়তায় অনন্য। রচনাভঙ্গির মধ্যেও এই আবেগময় স্বকীয়তা বর্তমান—'নৃত্য

করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটি যোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসংগীতের তাল না কাটিয়া যায়।'

'পাগল'-রচনাটি শুধু 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র মধ্যেই নয়, সমগ্রভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে তাঁর একটি অতিপ্রিয় ও অতিমাত্রায় স্বকীয় ভাবনার বাহক। কাব্যরচনায় পূর্বজীবনে 'কল্পনা' কাব্যের 'বর্ষশেষ' বা 'খেয়া' কাব্যের 'আগমন' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে এবং 'গীতাঞ্জলি'-পর্বে বিভিন্ন নিসর্গ-উপলব্ধির মধ্যে ['গীতাঞ্জলি'র বহু নিসর্গসংগীত, 'রাজা', 'অচলায়তন' ও 'ডাকঘর' প্রভৃতি নাটকে] অরূপের দুর্যোগময় ও দুঃখময় আগমন যা কবি লক্ষ্য করেছেন, তা-ই পরবর্তী কাব্যজীবনে ঋতুনাট্যগুলিতে 'নটরাজ'-কল্পনায় পূর্ণরূপ লাভ করেছে। এই অরূপ বা নটরাজ নিসর্গলীলারসবিহারী হলেও, কেবল শান্তকোমল পরিবেশের মধ্যেই এর সঞ্চরণ নয়। শীতের রিক্ততায়, বর্ষার দুর্যোগেও এর আগমন ঘটছে। ব্যক্তিক জীবনের দুঃসহ ব্যথাবেদনা, সমাজজীবনের নানা দুর্বিপাকের মধ্যে ইনি নিশ্চিতভাবে আসছেন। সাধারণ মানুষ, যারা জীবনের মধ্যে আরাম চায়, যারা বৈষয়িক প্রাপ্য থেকে এতটুকু বঞ্চিত হতে চায় না, তারা এই ভয়ংকরকে অভ্যর্থনা করতে অক্ষম। একে তারা অকল্যাণ, উপদ্রব এবং পাপ বলেই মনে করে। কিন্তু বস্তুত অনন্তের মধ্যে তো কোনো পাপপুণ্য, মঙ্গল-অমঙ্গল নেই। নানাত্বের দৃষ্টি আমাদের বৈষয়িক জীবনের, এই সংসারযাত্রার প্রয়োজনকলুষিত অপূর্ণ দৃষ্টি। তাই পূর্ণ যখন দেখা দেন তিনি আমাদের এই সংকীর্ণতার ওপরেই বজ্রনিক্ষেপ করেন। তখন অনেক সুখের সংসার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়, অনেক পুরাতন প্রাপ্তি ও প্রয়োজন ধূলিতলে লুণ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মহৎকবিসুলভ প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে সৃষ্টির মধ্যবর্তী অরূপ একের পদক্ষেপচিহ্ন এইভাবে ধরা পড়েছে। বস্তুত, এটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ একটি উপলব্ধি, আর তত্ত্বাকারে কবি তাঁর 'আত্মপরিচয়' পুস্তিকায় এ সম্বন্ধে আলোচনাও করেছেন। 'বিচিত্র প্রবন্ধে' ঠিক আলোচনা নয়, কবি নিজ উপলব্ধিকেই যথাসম্ভব প্রকাশ করতে চেয়েছেন গল্পাকারে।

উত্তম স্বগত প্রবন্ধের বিশেষত্ব এই যে, তাতে বিষয় থাকে, কিন্তু বিষয়ের ভার থাকে না; তদুপরি, লেখকের মনের দুর্লভ স্পর্শ পাঠকের অতিরিক্ত প্রাপ্য। একদিকে চিন্তার কঠোরতা হতে মুক্তি ও লঘু হাস্যময়তার অন্তরালে ভাবুকের মনের স্পর্শলাভ, অন্যদিকে বিষয়বস্তুর সঙ্গে পাঠকসমাজের হৃদয়ের সম্বন্ধ-স্থাপন—একসঙ্গে এতগুলো প্রাপ্য সাধারণ প্রবন্ধের মধ্যে প্রায়শই ঘটে না। এতে

লেখক ও পাঠক উভয়েরই লাভ, যেহেতু লেখক তাঁর উপলব্ধিকে অনায়াসে মুক্তিদান করতে পারেন, আর পাঠক এরূপ রচনা পুনঃ পুনঃ পাঠ করেও ক্লান্ত হয়ে পড়েন না। এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই যে, রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে ঘরোয়া ভঙ্গিতে নিজ অন্তরকে অবারিত করে দিয়েছেন। এই প্রবন্ধগুলোতে কবিগুরু সাহিত্যের বিচারক নন, উন্নত কল্পনাশীল কবিও নন, আমাদেরই মতো সাংসারিক সুখদুঃখ দ্বিধাসংশয়ে পূর্ণ মানুষ। সেই মানুষটির কত সহজ পরিচয় 'নানা কথা', 'রুদ্ধগৃহ', 'পথপ্রান্তে' প্রভৃতি কয়টি রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। স্নেহ-প্রেম-বেদনাময় সহজ অন্তঃকরণের মানুষ রবীন্দ্রনাথও এইভাবে আমাদের অত্যন্ত কাছে এসেছেন। 'রুদ্ধগৃহ'-রচনাটির একস্থানে কবি তাঁর বিষণ্ণতার পরিচয় এইভাবে দিয়েছেন : 'ছেলেরা যে একদিন এই ঘরের মধ্যে খেলা করিত, সেই কোলাহলময় দিন এই গৃহের নিশীথিনীর মধ্যে পড়িয়া আজ কাঁদিতেছে। এই গৃহের মধ্যে যে-সকল স্নেহপ্রেমের লীলা হইয়া গেছে সেই স্নেহপ্রেমের উপর সহসা কপাট পড়িয়া গেছে, এই নিস্তব্ধ গৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি তাহাদের ক্রন্দন শুনিতেছি।' 'পথপ্রান্তে' লেখক কত সহজে মাতৃহৃদয় ও বাৎসল্যের ওপর মমত্বপূর্ণ নিজ মন্তব্য বিস্তার করেছেন : 'ঐ দেখো, কাঁচ ছেলেটিকে বুকে করিয়া মা সংসারের পথে চলিয়াছে। ঐ ছেলেটির উপরে মাকে কে বাঁধিয়াছে। ঐ ছেলেটিকে দিয়া মাকে কে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। প্রেমের প্রভাবে পথের কাঁটা মায়ের পায়ের তলে কেমন ফুল হইয়া উঠিতেছে। ছেলেটিকে মায়ের কোলে দিয়া পথকে গৃহের মতো মধুর করিয়াছে কে। কিন্তু হায়, মা ভুল বোঝে কেন। মা কেন মনে করে, এই ছেলেটির মধ্যেই তাহার অনন্তের অবসান।' আবার, 'নানা কথা'য় লেখকের চিন্তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্য দিয়ে আশ্চর্য সারল্যে পরিস্ফুট হতে চেয়েছে। ভাবনা আছে কিন্তু ভার নেই, বুদ্ধি আছে কিন্তু তার তীব্র প্রখরতা নেই—সমস্ত রচনাকার্য কেমন সহজে ও নিঃশেষে সম্পন্ন হচ্ছে : 'ব্যাপ্ত হলে যা অন্ধকার, সংহত হলে তা আলোক ; আরো সংহত হলে তা অগ্নি। সংহতিই প্রাণ। সংহত হলেই তেজ, প্রাণ, আকার, ব্যক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।' লেখকের এইসকল উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করবার প্রয়োজন নেই। আত্মপ্রকাশশীল ভাবুক কীভাবে নিজ অন্তরকে জানাচ্ছেন তা অনুধাবন করতে পারলেই তাঁর প্রতি সুবিচার হবে।

স্বগত প্রবন্ধের বিশেষত্ব ও 'বিচিত্র প্রবন্ধ'

'বিচিত্র প্রবন্ধ'-গ্রন্থখানিতে, কোথাও স্পষ্টভাবে কোথাও অস্পষ্ট আকারে, রবীন্দ্রজীবনদর্শনের ছায়াপাত হয়েছে। এই হিসেবেও বইটির স্বতন্ত্র একটি মূল্য

রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমকল্পনা, তাঁর গতিতত্ত্ব ও আনন্দবাদ, তাঁর বিশিষ্ট প্রকৃতিতান্ত্রিকতা, তাঁর মৃত্যুভাবনা, তাঁর প্রেয়োস্বপ্ন ও শ্রেয়োতপস্যার কথা এই বইয়ের এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে 'রুদ্ধগৃহ' ও 'পথপ্রান্তে' রচনা-দুটি বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। অকস্মাৎ এক প্রিয়জনের মর্মান্তিক মৃত্যু ও তজ্জনিত সুতীব্র শোক-বেদনা একদা রবীন্দ্রনাথকে অতিশয় বিচলিত করেছিল, মহাশূন্যতার নিতল গহ্বরে তিনি নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের ছায়াপাত হয়েছে

কবিগুরুর জীবনে এই যে নিদারুণ আধ্যাত্মিক সংকট, এই সংকট তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন শ্রেয়োতপস্যার জোরে, নিজের মধ্যে নিরাসক্ত পথিক-মনোভাবের স্ফুরণ ঘটিয়ে—মানবাত্মার অনন্ত পথযাত্রার সংগীত উচ্চারণ করে। পরিপূর্ণ জীবনের সাধনা কবিগুরুকে আসক্তিমোচনে শক্তি জুগিয়েছে, বৈরাগ্যের গেরুয়া-রঙে তাঁর চিত্তদেশকে অনুরঞ্জিত করেছে, তাঁর 'ব্যক্তি-আমি'কে 'বিশ্ব-আমি'র দিকে অনবরত এগিয়ে নিয়ে গেছে। এ কারণে তাঁর প্রেমানুভব ধীরে ধীরে অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠেছে, আসক্তির বন্ধন কাটাতে বেশি সময় তাঁর লাগেনি।

রবীন্দ্রনাথের ভাবদৃষ্টিতে প্রেম জৈব সত্তার কোনো বুভুক্ষা নয়, আত্মিক সত্তারই দিব্য একটি পিপাসা। এই পিপাসা মানুষকে কোনো বিশেষ ব্যক্তির সংকীর্ণ সীমায় বাঁধে না, চতুষ্পার্শ্বের বড়ো পৃথিবীর সঙ্গে তার আত্মার যোগসাধন করে। যে-প্রেম ব্যক্তিতে কেন্দ্রিত হয়ে বৃহত্তর বিশ্বকে বিস্মৃত হয়, 'যে-প্রেম সমুখপানে চলিতে চালাতে নাহি জানে', আসক্তিবিজড়িত সেই প্রেম কবিগুরুর অভিলষিত নয়—পথের ধুলায় তিনি তার স্থাননির্দেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে যুক্ত করেছেন অশ্রান্ত চলার গতির সঙ্গে, পথের আনন্দের সঙ্গে—হৃদয়ের 'রুদ্ধগৃহে' সীমিত করে তার সমাধি রচনা করতে তিনি চাননি। তাই তো হৃদয়গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অবলীলায় 'পথপ্রান্তে' এসে দাঁড়াতে তিনি সক্ষম হলেন, অকম্পিত কণ্ঠে বলতে পারলেন : 'পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়। এই প্রবাহেই জগতের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। কণামাত্রের যাতায়াত বন্ধ হইলে জগতের সামঞ্জস্য ভঙ্গ হয়। জীবন যেমন আসে, জীবন তেমনি যায়। মৃত্যুও যেমন আসে মৃত্যুও তেমনি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কর কেন? হৃদয়টাকে পাষাণ করিয়া সেই পাষাণের মধ্যে তাহাকে সমাহিত করিয়া রাখ কেন? তাহা কেবল অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া উঠে। ছাড়িয়া দাও, তাহাকে যাইতে দাও—জীবন-

কবির প্রেমদর্শন

মৃত্যুর প্রবাহ রোধ করিয়ো না। হৃদয়ের দুই দ্বারই সমান খুলিয়া রাখো। প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করিবে, প্রস্থানের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করিবে।' এতে বুঝতে পারা যায়, রবীন্দ্রনাথের প্রেম বৈরাগ্যেরই নামান্তর মাত্র।

আর, একারণেই, ঘর নয়—পথকেই তিনি সত্যতর বলে জেনেছেন, জীবন ও মৃত্যুর উমামহেশ্বরমূর্তি দেখতে পেয়েছেন, অন্তহীন পথচলার আন্তর প্রেরণার মধ্যে এক আনন্দময় সত্তার উদার প্রেমের আহ্বান শুনেছেন। মানবসত্তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এক মহাপথিককেই যেন প্রত্যক্ষ করেছেন—'আমরা তো পথিক হইয়াই জন্মিয়াছি।' কবির প্রেমের বাসা পথের ধারেই ; পথ আগলায় না সে, দূরপ্রসারিত সম্মুখের দিকেই চলার সংকেত করে। এই প্রেমের উপমা নৌকার গুণ—'নৌকার গুণ যেমন নৌকাকে বাঁধিয়া লইয়া যায়, যথার্থ প্রেম তেমনি কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিয়া দেয় না, কিন্তু বাঁধিয়া লইয়া যায়। প্রেমের বন্ধনের টানে আর-সমস্ত বন্ধন ছিঁড়িয়া যায়, বৃহৎ প্রেমের প্রভাবে ক্ষুদ্র প্রেমের সূত্রসকল টুটিয়া যায়। জগৎ তাই চলিতেছে, নহিলে আপনার ভারে আপনি অচল হইয়া পড়িত।' আসল কথা হল, প্রেমে প্রাণের জাগরণ ঘটে, তখন ব্যক্তিপ্রাণ বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় মানুষ বিশ্বের প্রাণলীলার মাঝখানে নিজের প্রাণকেও লীলায়িত দেখে। সেখানে মোহ নেই, জৈব জীবনের স্থূল আসক্তি নেই, ভোগের আবিলতা নেই,—রয়েছে অশেষ আনন্দের অবারিত মুক্তির স্বাদ। জীবনের এই গতিতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, প্রেমে মুক্তির আস্বাদন, ইত্যাদির কথা পরবর্তীকালে রচিত 'বলাকা'-'পূরবী'-'মহুয়া'-'বনবাণী' প্রভৃতি কাব্যে চমৎকার রূপায়িত হয়েছে।

কবির পথিক-মনোভাব ও গতিবাদ

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদর্শনও উক্ত গতিবাদের সঙ্গে জড়িত। জীবনের প্রবহমাণতাকে অব্যাহত রাখার জন্যেই মৃত্যুর প্রয়োজন, মৃত্যু যদি না থাকত তা হলে জীবন জড়ত্ব লাভ করে স্থবির হয়ে পড়ত। 'মরণের কিঙ্কিণী' বাজিয়ে জীবনের 'দুরন্ত নির্ঝরিণী' ছুটে চলেছে, মৃত্যুস্নানেই জীবন বার বার শুচি হয়ে উঠছে। শীতের দিনের মরা পাতা যদি শাখা আঁকড়ে পড়ে থাকত তাহলে বসন্তের দিনে কিশলয়ের আবির্ভাব হত কী করে? মৃত্যু আমাদের প্রিয়বস্তুকে হরণ করে বটে, কিন্তু আবার নতুন-কিছুও আমাদের দিয়ে যায়—নতুন করে পেতে চাইলে হারাতেও হয়। জগৎসংসারে এভাবে হরণ-পূরণের খেলা চলছে। রবীন্দ্রনাথের গতিবাদ, প্রাণতত্ত্ব আর মৃত্যুভাবনা একসূত্রে গ্রথিত, এবং এগুলিই

কবির মৃত্যুভাবনা ও নিসর্গদৃষ্টি

রবীন্দ্রদর্শনের বড়ো কথা। এ প্রসঙ্গে কবিগুরুর নিসর্গদৃষ্টিও উল্লেখ্য। প্রকৃতি-লোকের কাছ থেকেই তিনি শিখে নিয়েছেন আসক্তিমোচনের মন্ত্র, নিসর্গলীলারস-বিহারী নটরাজ তাঁকে দিয়েছে মুক্তির দীক্ষা। এই নটরাজকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন: 'নৃত্যের তালে তালে, হে নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্ধ হে।' এ সমস্তকিছু মিলেই রবীন্দ্রজীবনদর্শনকে সম্পূর্ণতা দান করেছে। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থখানির পাতায় এদের স্বাক্ষর মুদ্রিত রয়েছে।

উপসংহার

সাহিত্যরসিক পাঠক এ বই-এ একটি অভিনব স্বাদ পাবেন। আমাদের সাহিত্যে এ জাতের গ্রন্থ চোখে পড়ে কৈ? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়েও এরূপ লেখা খুব বেশি বেরুয়নি। কবির বিচিত্র ভাবনা, ভাবস্থ মনের গীতময় প্রকাশ, গভীর অনুভূতি, আবেগের স্পন্দন, সূক্ষ্ম মননশীলতা, অপরূপ প্রকাশভঙ্গি, বাচনকলার রম্যতা, ভাষার লিরিক মূর্ছনা, ইত্যাদি বস্তু একে চিত্তচমৎকার করে তুলেছে। এর রসসিক্ত বচন অবলীলায় আমাদের হৃদয় হরণ করে। আমরা অবাক হয়ে ভাবি, কাব্য-সংসারের রাজপুত্র রবীন্দ্রনাথ যাদুতে-ভরা এই সোনার কাঠি কোথায় পেলেন! আমাদের প্রাণরূপিণী ঘুমন্ত রাজকন্যা এর স্পর্শ পেয়ে মুহূর্তে নড়ে উঠে, সৌন্দর্যের পালঙ্কে বসে অজস্র আনন্দে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হতে থাকে।

'পুনশ্চ'-কাব্যপাঠের ভূমিকা

[রচনার সংকেতসূত্র: প্রারম্ভিক ভূমিকা—'পুনশ্চ' কাব্যে কবির নতুন কথা ও নতুন বাণীভঙ্গি—কবির নবপ্রবর্তিত গদ্যছন্দ—কাব্যে প্রযুক্ত গদ্যছন্দের প্রসঙ্গে—গদ্যছন্দ সম্পর্কে কবির মন্তব্য—ভাবকল্পনার ক্ষেত্রে 'পুনশ্চ'-র অনন্যতা—বাস্তবরসপিপাসু কবির মানবীয় সহানুভূতি ও চিত্রকর্মনৈপুণ্য—কতকগুলি কবিতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—মানবতার সাধক কবির অস্পৃশ্যতার প্রতিবাদ—কবির বিশিষ্ট ভাবপ্রেরণাময় কয়েকটি কবিতা—উপসংহার]

'পুনশ্চ' রবীন্দ্রনাথের একাত্তর-বাহাত্তর বছর বয়সে—পরিণত বার্ধক্যে রচিত কাব্য। বাংলা ১৩৩৯ সালের—মোটামুটি এক বছরের—কবিতা নিয়ে 'পুনশ্চ'। একক কবিতা বা কাব্যগ্রন্থের নামকরণ যে সবসময় কোনো পরিপূর্ণ অর্থ বহন করবে, এমন নয়। কিন্তু 'পুনশ্চ' নামটির মধ্যে আমরা রবীন্দ্রকাব্যধারার

একটি গভীর সংকেত পাঠ করেছি। রবীন্দ্রকাব্যের একটি বৃহৎ অধ্যায় 'মহুয়া'-য় এসে শেষ হয়েছে। তারপর 'পরিশেষ' যেন কবির অভিমতে শেষের দুচার কথা। কিন্তু কবি যেমনটি মনে করেছিলেন তা তো হবার নয়। তিনি সমাপ্তির কথা ঠিক করে রাখলেও তাঁর প্রকাশব্যাকুল অন্তরতম কবিপুরুষ তাঁকে থামতে দেয়নি, সে নতুন পথে নতুন ভঙ্গিতে লেখনী চালনা করবার জন্যে কবিকে সর্বদাই প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে। এই সক্রিয় কবিসত্তার উদ্দেশ্যেই বহুকাল পূর্বে কবি লিখেছিলেন :

প্রারম্ভিক ভূমিকা

আমি যাহাকিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।...
নূতন ছন্দে অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন রাগিণী বেজে ওঠে তায়
নূতন বেদনাভরে।

সুতরাং 'পরিশেষে'ও শেষ হল না। কবি আরম্ভ করলেন 'পুনশ্চ'—যেমন চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে নতুন কথা বলতে হয়। 'পুনশ্চ'-তে সেই নতুন কথা আছে, আর আছে নতুন ভঙ্গিতে কথা বলা—যে-ভঙ্গি পূর্বে কবি অবলম্বন করেননি, করতে চাইলেও তার পূর্ণতম রূপটি প্রকাশশিল্পীর কাছে তখনো অজ্ঞাত ছিল। এখন হতে কবিতার বাহন হল গদ্যছন্দ। এরপর বহুদিন পর্যন্ত কেবল গদ্যছন্দকেই কবি কবিতার উত্তম বাহনরূপে বরণ করেছেন, শেষের দিকে মিলযুক্ত কবিতায় প্রত্যাবর্তন করলেও গদ্যছন্দকে কবি অবহেলা করেননি। অন্তিমেও একে স্বীকৃতি দান করেছেন।

'পুনশ্চ' কাব্যে কবির নতুন কথা ও নতুন বাণীভঙ্গি

'নূতন কাল' কবিতায় কবি তাঁর এই কাব্যের উপকরণ ও রীতির নতুনত্ব সম্পর্কে স্পষ্টভাবেই নির্দেশ দিয়েছেন :

তাই ফিরে আসতে হল আর একবার।
দিনের শেষে নতুন পালা আবার করেছি শুরু
তোমারি মুখ চেয়ে,
ভালোবাসার দোহাই মেনে।

কবি বলতে চান যে, বহুদিন পূর্বে একদা যে-বাণীর সম্বল নিয়ে তিনি বার হয়েছিলেন তাতে সমকালীন সকলকে তিনি তৃপ্তি দিয়েছেন। পথ চলতে চলতে পরিশেষে দেখলেন, কখন পুরাতন কাল শেষ হয়ে নতুন আরম্ভ হয়েছে।

একে অবহেলা করার সাধ্য তাঁর নেই, তাই নতুন ভঙ্গিতে নতুন কথা আরম্ভ করেছেন একালের দাবী মিটাতে। একালের বাণীর অলংকারে কবি তাঁর নিজবাণীকে সাজিয়ে প্রকাশ করলেন। দুএকমাস আগে লেখা 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'আগন্তুক' কবিতাটিতেও কবির এই একই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে।

বস্তুত 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'আগন্তুক', 'সাথী', 'অরতী' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতার মধ্যে কবির গদ্যছন্দে কবিতা রচনার প্রথম প্রয়াস দেখা যায়। এই প্রয়াসই 'পুনশ্চ'-তে স্থায়ী রূপ লাভ করেছে। 'নাটক'-নামক কবিতায় কবি তাঁর এই নব-অবলম্বিত রীতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন, দেখতে পাই :

কবির নবপ্রবর্তিত গদ্যছন্দ

গদ্য হল সমুদ্র,
সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি।
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে,
কলকল্লোলে।

গদ্য এল অনেক পরে।
বাঁধা-ছন্দের বাইরে জমাল আসর।
সুশ্রী কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এল
ঠেলাঠেলি ক'রে।

* * *

বাইরে থেকে এ জাগিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গিতে।

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র কবিতায় এবং বহু গদ্যপ্রবন্ধে গদ্যকবিতা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব জ্ঞাপন করেছেন। বাংলা কবিতায় কবিগুরুপ্রদর্শিত এই নতুন আঙ্গিক তখন অনেক বিস্ময়, অনেক জিজ্ঞাসা ও সমালোচনার আবির্ভাব ঘটিয়েছিল। আজ রবীন্দ্রোত্তর যুগে এ-ই বাংলা কবিতার অন্যতম বাহন হয়েছে। মার্কিন কবি Walt Whitman ইংরাজি Prose Verse-এর অন্যতম প্রধান লেখক এবং পথপ্রদর্শকও বটেন। ইনি রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধ সমসাময়িক। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি এঁর

নিকট হতেই গদ্যকবিতা-রচনার প্রেরণা লাভ করেছিলেন এবং এক্ষেত্রে অনায়াসেই আশ্চর্যরকমের সাফল্য দেখিয়ে গেছেন। বাংলা ভাষার যাবতীয় রূপ ও ভঙ্গি যাঁর করতলগত তিনি যে সার্থক গদ্যছন্দের স্রষ্টা হবেন এতে বৈচিত্র্য কী ?

ইংরাজি গদ্যছন্দের ভিত্তি হল 'rhythm'। 'Rhythm' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ না থাকায় এবং 'ছন্দ' শব্দটি বিশেষ রূপকল্পের ওপর নির্ভরশীল 'metre' শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হওয়ায়, আমরা সুবিধার জন্যে 'rhythm'-কে ভাবছন্দ এবং 'metre'-কে রূপছন্দ নামে অভিহিত করছি। ভাবছন্দের ওপর এতকাল রূপছন্দের পূর্ণ অধিকার ছিল। অথচ একথা সত্য যে, চিত্ত যখন ভাবোদ্বেল হয়ে ওঠে তখন সহজেই যে-ছন্দোময় বাক্য নির্গত হয় তা-ই সমস্ত কবিতার প্রাণ। তারপর তাকে একটি প্যাটার্ন-অনুযায়ী যতি ও পর্বের দ্বারা বিভক্ত চরণে বিন্যস্ত করে ও মিলযুক্ত করে প্রকাশ করলে বাইরের দিক হতে সৌন্দর্যসৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু কোনো কোনো স্থলে কবিতার ভাবসম্পদের যে হানি না ঘটে এমন নয়। অথচ বিশেষ রূপকল্প হতে মুক্ত হয়ে গদ্যছন্দ সহজেই মনোভাবের স্বাধীন বাহক হতে পারে। বাংলা গদ্যের বাক্যে স্বাধীন যতিবিভাগ আছে। ওই যতি কেবল বাক্যগত অর্থের অধীন। বাগ্‌বিন্যাসে যখন ভাবের রঙ্‌ এসে লাগে তখন এই যতি আপনা হতেই একটি সমঞ্জস আকার লাভ করতে চায়, বলতে পারি ভাবছন্দের সৃষ্টি হয়েছে। এইরূপে উন্নত বাংলা গদ্যের অনেক অংশ কাব্যধর্মী, তাতে ভাবছন্দের স্পর্শ থাকে। অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল দিয়ে, সমাক্ষর চরণে ও সমরূপের যতিতে বিভক্ত করে পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি অসংখ্য রীতির বাংলা ছন্দোরূপ প্রচলিত। মধুসূদনই সর্বপ্রথম পয়ারের চরণবন্ধনরীতি হতে কাব্যকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি চরণের শেষের ছেদ বা ভাবসমাপ্তির অবশ্য-করণীয়তা মানলেন না এবং সেই সঙ্গে অন্ত্যানুপ্রাসও তুলে দিলেন। এতে ছন্দের বন্ধন হতে কবিতা কতকটা মুক্ত হল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন হল না। কারণ, চতুর্দশ অক্ষরে চরণসমাপ্তি এবং প্রতি চরণে অষ্টমাক্ষর ও চতুর্দশ অক্ষরের পর যতির নিয়ম—যা পয়ারের ভিত্তি তা থেকেই গেল। একমাত্র গদ্যছন্দেই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেখা গিয়েছে। গদ্যছন্দই বাংলায় সত্যকার মুক্তবন্ধ ছন্দ। এখানে যতিপাত ও চরণবিন্যাস সম্পূর্ণভাবে কবির অন্তরের ভাবরসের অধীন।

কাব্যে প্রযুক্ত গদ্যছন্দের প্রসঙ্গে

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দ-প্রবর্তনের প্রথমাবস্থায় এই মুক্তির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। 'পরিশেষ' কাব্যের 'আগন্তুক', 'সাথী', 'অব্রতী' প্রভৃতি কবিতায় কবি পয়ারের আট ও ছয়মাত্রার পর যতিপতনই অনুসরণ করেছেন,

আট ও ছয় মাত্রায় বিভক্ত পর্বের রূপকল্পে মিলহীন পয়ার লিখেছেন। কিন্তু অতি শীঘ্রই যে কবি গদ্যকবিতায় স্বাধীনতার রূপটি উপলব্ধি করেছেন তার প্রমাণ 'পুনশ্চ'। গদ্যছন্দে যতিপতন নির্দিষ্ট কোনো প্যাটার্ন বা রূপকল্পের ওপর নির্ভরশীল নয়। বাক্যের ভাবের ওপরই যতিবিভাগ নির্ভর করে এবং সম ও বিষম মাত্রার ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, এমন কি, ১১, ১২, ১৩ মাত্রার পর্বও পরস্পর সংলগ্ন থাকে ; আর, এগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে বাক্যের অন্তর্গত ভাবছন্দ। ভাবছন্দ এখানে হার্মনির কাজ করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নব-উদ্ভাবিত গদ্যছন্দ সম্পর্কে একটি চিঠিতে সরস মন্তব্য করেছেন : "সপ্তপদীর বা চতুর্দশপদীর পদক্ষেপটা প্রতিদিন মানায় না। তাই বলে প্রাত্যহিক পদক্ষেপটা অস্থানে পড়ে বিপদ্জনক হবে এমন আশঙ্কা করিনে।...যে-সংসারটা প্রতিদিনের অথচ সেই প্রতিদিনকেই লক্ষ্মীশ্রী চিরন্তন করে তুলছে, যাকে চিরন্তনের পরিচয় দেবার জন্যে বিশেষ বৈঠকখানায় অলংকৃত আয়োজন করতে হয় না তাকে কাব্যশ্রীতেই গণ্য করি। অথচ চেহারায় সে গদ্যের মতো হতে পারে। তার মধ্যে বেসুর আছে, প্রতিবাদ আছে, নানাপ্রকার বিমিশ্রতা আছে, সেইজন্যেই চারিত্র্যশক্তি আছে।...এমন মেয়ে দেখা যায়, যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনাছন্দের ছন্দ আছে। কবিরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা খুঁজে বেড়ায়। সে-মেয়ের চলনটাই কাব্য, তাতে নাচের তাল নাই-বা লাগল, তার সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে।... এই গেল আমার 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের কৈফিয়ত।" কবি অন্যত্র ছন্দ সম্পর্কে আলোচনায় বলছেন :

গদ্যছন্দ সম্পর্কে কবির মন্তব্য

"ছন্দটাই যে ঐকান্তিকভাবে কাব্য তা নয়। কাব্যের মূল কথাটা আছে রসে, ছন্দটা এই রসের পরিচয় দেয়।...আজ গদ্যকাব্যের উপরে প্রমাণের ভার পড়েছে যে, গদ্যেও কাব্যের সঞ্চরণ অসাধ্য নয়। অশ্বারোহী সৈন্যও সৈন্য, আবার পদাতিক সৈন্যও সৈন্য—কোন্‌খানে তাদের মূলগত মিল ? যেখানে লড়াই করে জেতাই তাদের উভয়ের সাধনার লক্ষ্য। কাব্যের লক্ষ্য হৃদয় জয় করা—পদ্যের ঘোড়ায় চড়েই হোক, আর গদ্যে পা চালিয়েই হোক। সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সক্ষমতার দ্বারাই তাকে বিচার করতে হবে। হার হলেই হার, তা সে ঘোড়ায় চড়েই হোক, আর পায়ে হেঁটেই হোক।...গদ্যই হোক, পদ্যই হোক, রসরচনা-মাত্রেরই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দবোধের চর্চা বাঁধানিয়মের পথে চলতে পারে। কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণ-

বোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলংকারশাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখেন না যে, যেহেতু গদ্য সহজ, সেই কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়।...কথা উঠতে পারে, গদ্যকাব্য কী? আমি বলব, কী ও কেমন জানি না; জানি যে, এর কাব্যরস এমন একটা জিনিস যা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবার নয়। যা আমাকে বচনাতীতের আস্বাদ দেয় তা গদ্য বা পদ্য-রূপেই আসুক, তাকে কাব্য বলে গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হব না।"

দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে বইখানির গদ্যচ্ছন্দের ওপরেই জোর দিয়েছেন বেশি। কিন্তু 'পুনশ্চর' অপরাপর বিষয়েও অনন্যতা বর্তমান। তা হল, [১] বাস্তবনির্ভর রসের প্রাধান্য, [২] মানবীয়তা, [৩] চিত্র ও কাহিনীর অপূর্ব মিশ্রণ। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়া কবির পূর্বতন নিসর্গপ্রীতি, রোম্যান্টিক অনুভূতির পরিচয়ও 'পুনশ্চ' কাব্যে নানাস্থানে রয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ওই বস্তুগুলো বর্ণনার সংযম ও চিত্রধর্ম হতে বিচ্যুত হয়নি। কাব্যের প্রথম দিকে কয়েকটি কবিতা রয়েছে যেগুলিতে কবির নিসর্গপ্রীতি ও রোম্যান্টিক স্মৃতির জগতে বিচরণের চিহ্ন পরিস্ফুট। এগুলিতে আবার কল্পনার মায়াঞ্জনস্পর্শ যেমন স্বল্পমাত্র লেগেছে, তেমনি রয়েছে চিত্রাঙ্কন-নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয়। নিসর্গের প্রিয় চিত্রগুলি কবি একের পর এক উন্মোচিত করে চলেছেন, কোনো বর্ণসম্পাতের দ্বারা তাকে কৃত্রিম করে তুলেননি, অথবা বিশেষ কোনো কাল্পনিক উপলব্ধির দ্বারা কবিতাগুলিকে কবিমানসের নিগূঢ় ব্যাখ্যারূপে উপস্থাপিত করেননি। কোথাও পদ্মাতীরের সজীব শ্যামলিমা, কোথাও কোপাই-নদীর শীর্ণ পাণ্ডুরতা, কোথাও বীরভূমির রাঙামাটির গৈরিক সমারোহ কবির চিত্তে আসক্তিবিরহিত নিসর্গরসানুভূতির সঞ্চার করেছে। এরই সঙ্গে উপসংহারের দিকে কবির আত্মকথায় রোম্যান্টিক ভাবুকতার পরিচয়ও বিন্যস্ত হয়েছে। কবির একালের নিসর্গপ্রীতি কতকটা 'ছিন্নপত্র' ও 'চৈতালি'র নিসর্গ-অনুরাগের সমধর্মী—'সোনারতরী'-'চিত্রা'র কবিমানসের সুদূরসঞ্চরণ, অথবা সৌন্দর্য-উপলব্ধির তত্ত্ব এখানে তাঁকে কবিতা-রচনায় প্রেরণা দেয়নি। 'কোপাই' কবিতার শেষাংশ উদ্ধার করে কবির চিত্রধর্মী বাস্তব দৃষ্টি ও নিরাসক্ত নিসর্গ-উপভোগের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে:

ভাবকল্পনার ক্ষেত্রে 'পুনশ্চ'-র অনন্যতা

তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক-হাতে সাঁওতাল ছেলে;
পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি
আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে;

হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে ;
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা,
আর মাসিক তিনটাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।

গদ্যচ্ছন্দ শুধু গদ্যকেই কবিতার রাজ্যে অধিকার দেয়নি, সেই সঙ্গে সাধারণ কথোপকথনের তুচ্ছ ভাষাকেও। 'বাসা' কবিতায় ময়ূরাক্ষীতীরে কাল্পনিক বাসা বাঁধার স্বপ্ন কবি দেখেছেন। কবিতাটির শেষে কবির পূর্বেকার রোম্যান্টিক নিসর্গপ্রীতি স্পষ্ট, যদিও ভাষা আর প্রকাশরীতিতে আধুনিকতার ছাপ রয়েছে :

আমার মন বসবে না আর কোথাও,
সবকিছু থেকে ছুটি নিয়ে
চলে যেতে চায় উদাস প্রাণ
ময়ূরাক্ষী-নদীর ধারে।

'পুকুরধারে' কবিতাটি পড়তে পড়তে 'চৈতালি' ও 'ক্ষণিকা' কাব্য আমাদের মনে পড়ে যায়। কবিতাটির শেষে 'ক্ষণিকা' কাব্যের 'কল্যাণী'র ছবি ফুটে উঠেছে, পল্লীর নিসর্গচিত্র মায়াময়ী নারীর রূপ-পরিগ্রহ করেছে :

সে আঙিনাতে আসন বিছিয়ে দেয়,
সে আঁচল দিয়ে ধুলো দেয় মুছিয়ে ;
সে আমকাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় জল তুলে আনে,
তখন দোয়েল ডাকে শজনের ডালে,
ফিঙে লেজ দুলিয়ে বেড়ায় খেজুরের ঝোপে।

রোম্যাণ্টিক কবিচিত্তের স্বভাবই এই যে, তা পুরাতন স্মৃতির রাজ্যে পরিভ্রমণ করায়। এইরূপ স্মৃতিবিস্মৃতি নিয়ে লেখা কাজভোলানো সুরের কবিতা দুএকটিও এই পর্যায়ের। 'সুন্দর' কবিতায় এরূপ রসাবেশের পরিচয় পাচ্ছি। 'ছায়ায় আলোয় গাঁথা অবকাশের নেশায় মন্থর আষাঢ়ের দিন' কবির মনে অনির্বচনীয় রোম্যান্টিক সুরের স্পর্শ এনে দিয়েছে, কবি শুনছেন :

এ আকাশবীণায় গৌড়-সারঙের আলাপ,
সে-আলাপ আসছে সর্বকালের নেপথ্য হতে।

'পুনশ্চ'-র দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা চতুষ্পার্শ্বের পরিচিত সংসারের মানুষকে নিয়ে। অবহেলিত মানুষ, তুচ্ছ মানুষ অথবা ঘটনাচক্রে বিড়ম্বিত মানুষের

কাহিনী এই শ্রেণীর কবিতার বিষয়। কল্পিত কাহিনী, তার সঙ্গে স্থানে স্থানে চিত্রের যোজনা রয়েছে। আর, উপসংহারে প্রকাশ পেয়েছে ঘটনার চমকে উচ্ছলিত করুণ রস—যেমন, শেষ চিঠি, ক্যামেলিয়া, সাধারণ মেয়ে, একজন লোক, বাঁশি প্রভৃতি। কয়েকটিতে রবীন্দ্রনাথের মানবীয় সহানুভূতি শিশুর অন্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছে। শিক্ষকশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের শিশুর প্রতি সহমর্মিতার কয়েকটি চিত্র রয়েছে ছোটগল্পগুলিতে,—'পুনশ্চ'তে কাব্যাকারে তারই পুনরাবৃত্তি দেখছি। 'ছেলেটা' ও 'অপরাধী' এই শ্রেণীর। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিতে ঘটনা ও বুদ্ধির বিস্ময়কে অতিক্রম করে প্রায়শ হৃদয়ভাবই প্রধান স্থান গ্রহণ করেছে। তবু 'পুনশ্চ'-র কাহিনীর আধারে লেখা কবিতাগুলো ছোটগল্পের কাব্যরূপ নয়। এদের লিরিক আবেদন আরো স্পষ্ট, আরো গভীরতর। কাহিনীকে মাত্র অবলম্বন করে, চরিত্রের পরিচয় ঘটনা অপেক্ষা বিবৃতির ওপর নির্ভরশীল রেখে, ব্যঞ্জনায় একটি ভাবোদ্বেল পরিণামের দিকে কবি আমাদের নিয়ে গিয়েছেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে হলেও, ছোটগল্পে ঘটনা ও অঘটনের বিশেষ স্থান আছে। কাহিনী-অবলম্বনে রচিত এই কবিতাগুলিতে ঘটনা অপেক্ষা চরিত্রের অভ্যন্তরভাগেই কবি আমাদের আকর্ষণ করেছেন। 'অপরাধী' ঠিক কাহিনীনির্ভর নয়, চরিত্রবিশ্লেষণমূলক। শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের শিশুমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা এর ভিত্তি। ভালোমন্দের অতীত যে মানুষ, বাইরের ব্যবহারের দিক হতে তার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় না—এই ব্যাপক মানবীয়তাও কবিতাটির মধ্যে সক্রিয়। 'আমি ওকে দেখি কাছের থেকে, মানুষ বলে, ভালোমন্দ পেরিয়ে'—এই সহজ সত্যদৃষ্টি এই শ্রেণীর সমস্ত কবিতাগুলির মূলে রয়েছে। 'ছেলেটা'-য় কবির এই সহানুভূতি আরো প্রখর। 'সহযাত্রী' কবিতায় বেখাপ্পা অসংগত প্রকৃতির মানুষের ওপর কবির সহানুভূতি। এরূপ ব্যক্তি যে অন্তরালে নাম-করা মানবদরদী হতে পারেন, তার আভাস দিয়ে কবিতাটি সমাপ্ত করেছেন কবি। মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ একালে চিত্রশিল্পেও মনোনিবেশ করেছিলেন। বাইরের বিসদৃশের মধ্যে গোপন অন্তরের মানুষটিকে কবি ও চিত্রকর রেখা ও রঙের সামঞ্জস্যের সূত্রে ধরতে চেয়েছেন। ফলত, এই শ্রেণীর কবিতাগুলিতেও সেই চিত্রকর্মনৈপুণ্য ফুটে উঠেছে।

বাস্তবরসপিপাসু কবির মানবীয় সহানুভূতি ও চিত্রকর্মনৈপুণ্য

'ক্যামেলিয়া' বহুল পরিমাণে ঘটনানির্ভর, বর্ণনায় অকারণ বিস্ময় সৃষ্টি করার প্রয়াস কোথাও নেই। কবিতার শেষে ছোটগল্পের মতো ঘটনার চমক, আবার

কাব্যরসেরও ইঙ্গিতময়তা। 'ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি' করুণরসাত্মক কাহিনীর আধারে রচিত কাব্য, লে ছোটগল্পই, সংক্ষিপ্ত ও সংযত বর্ণনায় কিন্তু যথার্থ কবিতা। 'শেষ চিঠি' বোধ হয় এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ একটি রচনা। এতে কাব্যরসের আয়োজনই প্রচুর, কাহিনী কাব্যকে তার স্থান ছেড়ে দিয়েছে। ঘটনা-কয়েকটিও অপরিসীম করুণ কাব্যরসকে স্ফূর্তি দেওয়ার জন্যেই যেন সৃষ্ট হয়েছে। 'বাঁশি' কবিতায় কবি সদাগরের অফিসের কনিষ্ঠ কেরাণীর মনের অন্তরতম কোণে আমাদের প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। 'চিত্রা', 'চৈতালি' রচনার কালে কবির বাস্তব মানবপ্রীতির এইরূপ সহজ পরিচয় কোনো কোনো স্থানে আমরা দেখেছি। 'পুনশ্চ' কাব্যে এই সহজ মানবীয়তার উদ্বোধন দেখে এবং কবির শেষের রচনাগুলিতে এর ব্যাপ্তি লক্ষ্য করে আমরা রবীন্দ্রকাব্যের একটি প্রধান ধারা সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। 'বাঁশি' কবিতার সঙ্গে 'চিত্রা' কাব্যের 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটি মিলিয়ে পাঠ করলে ভালো হয়। এইখানে কবি কেরাণী-জীবনের ভূমিকা করে সাধারণভাবে মানবপ্রেমের মহিমা বর্ণনা করেছেন। একটি বাস্তব চিত্র উপস্থাপিত করে তুচ্ছের মধ্যেও চিরন্তন ও অসাধারণকে দেখবার প্রয়াস করেছেন। কবিতাটির শেষের :

কতকগুলি কবিতার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য

হঠাৎ খবর পাই মনে
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরাণীর কোনো ভেদ নেই।

প্রভৃতি পঙ্‌ক্তির সঙ্গে 'চিত্রা'র :

সেথা আমি জ্যোতিষ্মান্
অক্ষয় যৌবনময় দেবতা-সমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী ; সেথা মোর সভাসদ্
রবিচন্দ্রতারা, পরি নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে তারা নব নব গান
নব-অর্থভরা।

ইত্যাদি চরণের ভাবগত ঐক্য তুলনার যোগ্য, যদিও বাস্তব-পারবেশের মাঝখানে স্থাপিত হরিপদকেরাণীর সঙ্গেই আমাদের আত্মীয়তা বেশি অনুভূত হয়।

'পুনশ্চ'র-তৃতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলি কবিহৃদয়ের বিশেষ একটি ভাবপ্রেরণা হতে সঞ্জাত। উপরিলিখিত মানবীয়তারই বিশেষ গভীর পরিচয় অস্পৃশ্যতার প্রতিবাদরূপে কয়েকটি পুরাতন কাহিনীকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়েছে। অস্পৃশ্যতা-নিবারণ-কল্পে গান্ধীজীর হরিজন-আন্দোলন এসকল কবিতার বহিঃপ্রেরণা। কবিতাগুলির মধ্যে যেমন কাহিনীর আকর্ষণ রয়েছে, তেমনি রয়েছে চিত্রসৌন্দর্য, আর পরিশেষে পীড়িত মানবের মুক্তির কথা—কারুণ্য ও প্রশান্তিতে পূর্ণ। মন্দিরের মধ্যে স্বার্থমগ্ন পূজারীর পূজা মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিরুদ্ধ বস্তু ঃ

মানবতার সাধক কবির অস্পৃশ্যতার প্রতিবাদ

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক পড়ে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সঙ্গোপনে,
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।

এই হল রবীন্দ্রনাথের চিরন্তন ধর্মোপলব্ধি। যেখানে অধম দীন মানুষের বাস সেখানেই দেবতা রয়েছেন, এটা তাঁর 'গীতাঞ্জলি'-রচনাকালের উপলব্ধি। সুতরাং পূর্ব হতেই রবীন্দ্রনাথ অস্পৃশ্যতার ঘোরতর বিরোধী। 'অচলায়তন' নাটকে কবি পূর্বেই কুসংস্কারকে তীব্রতম আঘাত দিয়ে পরাভূত করেছেন। এখানে পুনর্বার রবীন্দ্রনাথের সেই পূর্বতন ধারণার প্রকাশ ঘটেছে—আরো স্পষ্টভাবে, কাহিনীর আকর্ষণের মাধ্যমে। এ সম্পর্কে প্রথম কবিতা 'শুচি' রামানন্দের কাহিনী নিয়ে। রামানন্দ ও শিষ্য কবীরের মিলন ও মানবতার জয়ে কবিতাটি সমাপ্ত। দ্বিতীয় কবিতা 'রঙরেজিনী'তেও অস্পৃশ্যতার পরাজয় দেখানো হয়েছে। 'মুক্তি' কবিতাটির সঙ্গে 'এবার ফিরাও মোরে' বা 'মালিনী' নাটিকার অন্তর্লীন ভাববস্তু তুলনীয়। স্বার্থমগ্ন অবরুদ্ধ জীবন দীন। অহংকার ও আভিজাত্যের বেষ্টন হতে মুক্তির নামই মুক্তি। 'প্রেমের সোনা', 'স্নান সমাপন' কবিতাও একই ভাবের। এগুলোর মধ্যে 'প্রথম পূজা' কবিতাটি কিছু বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে। এতে ছোট-গল্পের মতোই কাহিনীর কিছু প্রাধান্য রয়েছে, আর স্থানে স্থানে বর্ণনার মধ্য দিয়ে চিত্রগত সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। ঘটনার দিক হতে ট্র্যাজেডি, ভাবের দিক হতে শান্তরস এই কবিতার ফলশ্রুতি। এই কবিতাটিতেই প্রথম অতিদীর্ঘ চরণবিন্যাসের পরিচয় পাওয়া গেল।

'পুনশ্চ'-র কবিতাগুলির শেষ বিভাগটি হল বিশিষ্ট ভাবপ্রেরণাময় ও সাংকেতিকতাধর্মী কয়েকটি কবিতা। যেমন—'চিররূপের বাণী', 'শিশুতীর্থ' ও 'শাপমোচন'। 'চিররূপের বাণী' কবিতাটি 'রূপবাণী' বাক্‌চিত্রের দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষ্যে রচিত হয়। এতে দেহমুক্ত শুদ্ধ রূপ এবং দেহমুক্ত শুদ্ধ বাণীর মহিমাকীর্তন করা হয়েছে। কবিতাটির মূলে রয়েছে সৌন্দর্যচেতনা সম্পর্কে কবির বিশুদ্ধতার ধারণা। 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি পূর্বেকার লেখা 'The Child'-নামক তাঁর ইংরেজি রচনার ভাববিস্তার। যীশুখি্স্টকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করে শিশু-জন্মের মহিমার দিকটি এতে কীর্তিত হয়েছে। আসলে পশুশক্তির ওপর চিরন্তন মানবসত্য—মানুষের ধর্মের জয়ঘোষণা এই কবিতাটির মর্মমূলে। নিত্যকালের মানবপ্রেমিক শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করল মানবীমাতার ক্রোড়ে। কবিতাটিতে যাত্রী মানুষের যাত্রাপথের অপূর্ব সাংকেতিকতাময় বর্ণনা দেওয়া হয়েছে :

কবির বিশিষ্ট ভাবপ্রেরণাময় কয়েকটি কবিতা

যাত্রীরা চারিদিক থেকে বেরিয়ে পড়ল
সমুদ্র পেরিয়ে, পর্বত ডিঙিয়ে, পথহীন প্রান্তর উত্তীর্ণ হয়ে—
এল নীলনদীর দেশ থেকে,
প্রাকাররক্ষিত নগরের সিংহদ্বার দিয়ে,
লতাজালজটিল অরণ্যে পথ কেটে।
কেউ আসে পায়ে হেঁটে, কেউ উটে, কেড ঘোড়ায়, কেউ হাতিতে,
কেউ রথে, চীনাংশুকের পাতাকা উড়িয়ে।
নানা ধর্মের পূজারি চলল ধূপ জ্বালিয়ে, মন্ত্র পড়ে।
রাজা চলল ; অনুচরদের বর্শাফলক রৌদ্রে দীপ্যমান,
ভেরী বাজে গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।
ভিক্ষু আসে ছিন্ন কন্থা পরে,
আর রাজ-অমাত্যের দল স্বর্ণলাঞ্ছনখচিত উজ্জ্বল বেশে।
জ্ঞানগরিমা ও বয়সের ভারে মন্থর অধ্যাপককে ঠেলে দিয়ে চলে
চটুলগতি বিদ্যার্থী যুবক।

মেয়েরা চলেছে কলহাস্যে—কত মাতা, কুমারী, কত বধূ—
থালায় তাদের শ্বেতচন্দন, ঝারিতে গন্ধসলিল।
বেশ্যাও চলেছে সেই সঙ্গে—তীক্ষ্ণ তাদের কণ্ঠস্বর,
অতি প্রকট তাদের প্রসাধন।

চলেছে পঙ্গু, খঞ্জ, অন্ধ আতুর,
আর সাধুবেশী ধর্মব্যবসায়ী
দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা।
সার্থকতা!
স্পষ্ট করে কিছু বলে না—কেবল নিজের লোভকে
মহৎ নাম ও বৃহৎ মূল্য দিয়ে ওই শব্দটার ব্যাখ্যা করে,
আর শান্তিশঙ্কাহীন অনন্ত সুযোগ ও আপন মলিন
ক্লিন্ন দেহমাংসের অক্লান্ত লোলুপতা দিয়ে কল্পস্বর্গ রচনা করে।

রচনাটির বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি নৃত্য ও মূকাভিনয়ের পটভূমিকা-হিসেবে রচিত হয়েছিল। এর কথিকা-অংশ আবৃত্ত হবে এবং সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে গানের সঙ্গে মূকাভিনয় চলতে থাকবে, এ-ই ছিল এই রচনার উদ্দেশ্য। 'শাপ-মোচন'ও এইরূপ একটি নৃত্যাভিনয়যোগ্য কথিকা। পূর্বেকার 'রাজা' নাটকের বিষয়বস্তু 'শাপমোচন' কথিকার ভিত্তি। আন্তর রূপের কাছে বাহ্যরূপের পরাজয় সাংকেতিকতার মাধ্যমে প্রকাশ করাই ছিল কবির উদ্দেশ্য। এই রচনাটি সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার বলছেন: "রবীন্দ্রনাথ যেমন সংগীতকে ওস্তাদ-বৈয়াকরণের হাত হইতে মুক্তি দিয়া রসজ্ঞের কাছে আনিয়াছেন, তেমনি নৃত্যকেও করিবার চেষ্টা করিতেছেন। 'শাপমোচন' ইহার প্রথম চেষ্টা। একটি আখ্যায়িকাকে লইয়া তাহাকে নৃত্যে-গীতে ভরিয়া তোলা যায় কিনা, কবি তাহারই পরীক্ষা করিতেছেন। নাট্যে কথাবার্তা নাই, অভিনয় মূক, কেবল গানে ও ভঙ্গিতে ভাবের প্রকাশ হইতেছে।" নবতর পরীক্ষানিরীক্ষায় হস্তক্ষেপে কবিগুরুর ক্লান্তি ছিল না।

উপসংহার

দেখা গেল, 'পুনশ্চ' কাব্যে বিষয়বস্তু ও ভাব অপেক্ষা ভঙ্গির নতুনত্বই যেন সমধিক। যে-মহাকবি যৌবনে ও প্রৌঢ়বয়সে কাব্যে অজস্র রীতির ও ছন্দোভঙ্গির প্রবর্তন করেছেন, তিনি বার্ধক্যে নতুন করে চিত্রকলায় হাত দিলেন, এবং কাহিনীর অবলম্বনে ও গদ্যরীতির প্রবর্তনে কীরূপ সার্থকতা অর্জন করলেন তা বিস্ময়ের বিষয়। 'পুনশ্চ' বইখানি এই বিস্ময়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্যের ভূমিকারূপে বিরাজ করছে।

'বলাকা'-কাব্যপাঠের ভূমিকা

[**রচনার সংকেতসূত্র ঃ** প্রারম্ভিক ভূমিকা—দুর্বোধ্য কাব্যহিসেবে একদা 'বলাকা'-র অখ্যাতি—'বলাকা'-র বিশিষ্ট কাব্যরীতি—'বলাকা'-র প্রেক্ষণীয় ভাষাভঙ্গি—'বলাকা' কাব্যে কবির নতুন উপলব্ধি—বিশ্বের গতি-অনুভবে 'বলাকা' অতিমাত্রায় বিশিষ্ট—জাতীয় জীবনের বহুতর গ্লানির বিষয়ে কবির দৃষ্টিক্ষেপ—'বলাকা' কাব্যে ফরাসী দার্শনিক বের্গস'-র প্রভাবপ্রসঙ্গে—'বলাকা-'র কবির বাস্তবজীবনদর্শন—এই কাব্যের দুএকটি কবিতা সম্পর্কে—উপসংহার]

॥ এক ॥

প্রারম্ভিক ভূমিকা

কবিগুরুর রাশীকৃত সংগীতের ফসল যখন ঘরে উঠল 'গীতাঞ্জলি'-'গীতিমাল্য'-'গীতালি' প্রভৃতির সুরের তরণীতে, তখন সাধারণের প্রত্যাশা ছিল কবি কথা-বিলাসী ও সুরশিল্পী-হিসেবেই পরিচিত থাকবেন। ভ্রম দূর হল 'বলাকা'-র পক্ষধ্বনি শুনে। এ তো জলের কোমল কলধ্বনি বা মাটির নরম স্পর্শ নয়। এ রীতিমতো কড়া গন্থে মননের নভোলোক সৃজন করা। এর মধ্যে কঠোর খুব স্পষ্ট, কোমল কোথায় তা সহজে ধরা যাচ্ছে না। 'বলাকা'-র কাব্যরূপ আর কাব্যবস্তু দুই-ই সাধারণের কাছে বিস্ময় বহন করে আনল, তা যে-পরিমাণে অভিভূত করল সে-পরিমাণে রসের আনন্দতীর্থে উত্তীর্ণ করে দিল না।

দুর্বোধ্য কাব্যহিসেবে একদা 'বলাকা'-র অখ্যাতি

বস্তুত, 'বলাকা' শিক্ষিত সাধারণের কাছেও দুর্বোধ্য কাব্যহিসেবে অখ্যাতি পেয়েছিল; আর, 'গীতাঞ্জলি'র পর থেকে 'গীতালি' পর্যন্ত যাবতীয় গীত ও নাট্যরচনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে 'বলাকা'র ভূমিকা যে রচনা করা হচ্ছিল সে-বিষয়ে শ্রোতারা ছিলেন উদাসীন। ফলে 'গীতালি'র সুর আর 'বলাকা'র ধ্বনি যে এক, 'ফাল্গুনী' ও 'বলাকা'র মধ্যে যে তুলনার তুলাদণ্ড রাখা যেতে পারে—এ তাঁরা চিন্তা করার অবকাশও পাননি। 'বলাকা' দুর্বোধ্য এ কথা কি ঠিক? কাব্য কি কখনো দুর্বোধ্য হয়? একদিক থেকে রবীন্দ্রকাব্যই তো দুর্বোধ্য—'সোনার তরী' দুর্বোধ্য, 'চিত্রা' দুর্বোধ্য, 'জীবনদেবতা' দুর্বোধ্য, আরও কত কী দুর্বোধ্য! আসল কথা এই যে, গীতিকবিতার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট অর্থ অনুসন্ধান করলে তা জটিল হতে বাধ্য। অথচ আমরা রবীন্দ্রকাব্য-বিচারণায় গোড়ার থেকে ঠিক তা-ই করে আসছি। এককালে যখন আখ্যানকাব্যের যুগ ছিল তখন কাব্যের কোনো-

না-কোনো অংশ নির্দিষ্ট একটা অর্থ বহন করত নিশ্চয়ই। কিন্তু কাব্যকবিতা যখন কাহিনী ও বস্তুর বাঁধা সড়ক ছেড়ে কবিমানসের অন্তঃপুরশায়িনী হল তখন তার স্পষ্ট অর্থ রইল কোথায়? তখন অর্ধেক অর্থপূর্ণ, বাকি অর্ধেক নিরর্থক, আর, অর্থে-নিরর্থে মিলে একটা অধরা মায়া—যা অর্থপ্রত্যাশী বৈষয়িকদের মনে নানা অনর্থের জন্ম দিয়েছে। তাই 'সোনার তরী'র বিদেশিনী মেয়েকে অনিবার্য মায়ারূপে থাকতে দেওয়া হয়নি—সাকার ব্রহ্ম, নিরাকার ব্রহ্ম, মহাকাল প্রভৃতির গোটা এবং প্রকাণ্ড অর্থের মধ্যে নিমজ্জিত করে দেওয়া হয়েছে। কবিগুরুর কল্পিত 'জীবনদেবতা' থেকে জীবন ছিনিয়ে নিয়ে, তার পঞ্চত্ব ঘটিয়ে, ব্রহ্মের সঙ্গে লীন করে দেওয়া হয়েছে। অথচ সুরসিকমাত্রেই অনুভব করবেন, এই জীবনদেবতা তাঁর নিজ অন্তরেরও কল্পিত চালকশক্তি। এর সঙ্গে একটা কাব্যিক আত্মীয় সম্পর্ক কল্পনা করে বেশ কিছু স্বগত উক্তি করা যেতে পারে। 'চিত্রা' কাব্যের পর্যায়ে খুব সংগত কারণেই কবি এই জীবনদেবতার কল্পনায় বিমুগ্ধ অন্তরের স্ফূর্তি প্রকাশ করেছেন, এবং এর পর ততোধিক সংগত কারণেই জীবনদেবতার কল্পনা ক্ষীণ হয়ে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। এরকম নানা ক্ষেত্রে গোটা একটা অর্থ অনুধাবন না করে তৃপ্তি পাওয়া যায়নি বলেই রবীন্দ্রকাব্যে মনগড়া অর্থের প্রসার ঘটেছে, বিশুদ্ধ কাব্যরসের ক্ষেত্রে উপনিষদকে আহ্বান করে নিয়ে এসে উচ্চাসন দেওয়া হয়েছে।

সাধারণের কাছে 'বলাকা' কাব্যের দুর্বোধ্যতা এর কবিত্বে কিংবা ভাব-কল্পনায় সে-পরিমাণে নয়, যে-পরিমাণে এর কাব্যরীতিতে। কবির অনুভব পাঠকের মনের সহযাত্রী হতে পারছে না, যেহেতু কবির আত্মপ্রকাশের এই রীতি তার কাছে অপরিচিত। নতুবা 'বসুন্ধরা'র সঙ্গে জন্মান্তরীণ সৌহৃদ্য, অন্তর্লোক ও বহির্লোক-সঞ্চারিণী সৌন্দর্যমূর্তি, নিসর্গাশ্রিত অরূপ-ব্যাকুলতা প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে পাঠক কবির অজানার যাত্রাকে বরণ করতে পারলে না, এ হতে পারে না। আসলে 'বলাকা'য় রবীন্দ্রনাথের ভাষাভঙ্গি নতুন অবয়ব গ্রহণ করেছে, নতুন পরিচ্ছদ পরিধান করেছে। উত্তম গদ্যের ভাষাই পদ্যের ভিত্তি, আর গদ্যরীতিতে আশ্চর্য সফলতা অর্জন করে কবি 'বালাকা'য় সে-গদ্যের চরম প্রকাশশক্তি দেখিয়েছেন। বাক্য হয়েছে শাণিত, উজ্জ্বল আর তীক্ষ্ণ—আঘাতের পর আঘাতে বন্ধন ছেদন করে শূন্যলোকে উধাও হবার চেষ্টা করছে। এর যুক্তাক্ষরবহুল শব্দের সুসমঞ্জস ব্যবহার, রূপকালংকার ও প্রতীকধর্মিতার অবাধ স্ফূর্তি একে এমন একটি অনন্যতা দিয়েছে যাতে করে 'চিত্রা', 'সোনার তরী', 'চৈতালি' প্রভৃতি থেকে এর বিলক্ষণ

'বালাকা'-র বিশিষ্ট কাব্যরীতি

পার্থক্য দাঁড়িয়ে গেছে। ভাষার মধ্যে নিগূঢ় সাংকেতিকতা-রক্ষার ধারাটি রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'-পর্যায় থেকেই অর্জন করেছেন এবং উত্তরোত্তর তাকে বাড়িয়ে তুলেছেন। 'বলাকা'র অসাধারণ গতি-অনুভবে আর 'মহুয়া'র অসাধারণ প্রেমে আর ঋতুপর্যায়ের নাট্যগীতে ভাষার সাংকেতিকতা রবীন্দ্র-অনুভবের বাহন হয়েছে। তা ছাড়া, পূর্বতন ছন্দোভঙ্গির সংস্কারসাধনও কবিবাণীকে মুক্ত প্রকাশের প্রচুর অবসর দিয়েছে। 'বলাকা'য় ঠিক নতুন ছন্দ কিছু নেই, মধুসূদনের "অমিত্রাক্ষর' ছন্দের ওপর মিল যোজনা করে রবীন্দ্রনাথ যে-বৈচিত্র্য বহুপূর্ব থেকেই দেখিয়ে আসছিলেন, মূলত তাকে ভিত্তি করেই 'বলাকা'র গতির উপযোগী ছন্দ নির্মাণ করলেন। এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য চরণবিন্যাসে। আট, দশ ও ছয় মাত্রার যে-কোনো দুটি পর্ব, একটি পর্ব অথবা পর্বাঙ্গ নিয়েই একটি চরণবিন্যাস করা হয়েছে। এইরকম দীর্ঘ পর্বের চরণের সঙ্গে হ্রস্ব পর্ব বা পর্বাঙ্গের চরণের সামঞ্জস্য রক্ষা করে কবি তাঁর গতিঅনুভবকে যথাসম্ভব মুক্তি দিতে চেয়েছেন।

'বলাকা'র ভাষাভঙ্গিতে ব্যঞ্জনাধর্ম অতিশয় স্পষ্ট এবং তা সূক্ষ্মও বটে। সাংকেতিকতা আধুনিক সাহিত্যের ধর্ম। কবিতায় ও নাটকে সাংকেতিকতা আশ্রয় করে রসনির্মাতা তাঁর নিগূঢ় অনুভবকে পাঠকের মানসগোচর করবার প্রয়াস পেয়ে থাকেন। এরকম ব্যঞ্জনাধর্মের আশ্রয় বস্তুনির্দেশকল্পেও নেওয়া হয়েছে, আর চিত্রনির্মাণেও এর প্রয়োগ উপেক্ষিত হয়নি। নিচের পঙ্‌ক্তিগুলিতে পিছনে-ফেলে-আসা সুখ ও আরাম এবং অভ্যর্থিত সংগ্রামের মধ্যকার মানসিক দ্বন্দ্বটি পরিস্ফুট করা হয়েছে :

'বলাকা-র প্রেক্ষণীয় ভাষাভঙ্গি

আরতিদীপ এই কি জ্বালা ?
এই কি আমার সন্ধ্যা ?
গাঁথব রক্তজবার মালা ?
হায় রজনীগন্ধা !

দুর্গম জীবনপথে নিয়ে যাবে কল্পিত নাবিক, তার ব্যঞ্জনাময় রূপ ও পরিবেশচিত্রণ হয়েছে অসাধারণ :

রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিক্তপলক আঁখি,
ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তার বাতাস চলে হাঁকি,
দীপের আলো বাদলবায়ে কাঁপছে থাকি থাকি
ছায়াতে ঘর ছেয়ে।

'বলাকা'র নানা কবিতায় প্রায়শই কবিকে বিরোধমূলক বাক্যের মধ্য দিয়ে ভাব প্রকাশ করতে হয়েছে। ঘনসন্নিবিষ্ট ভাবসমূহ এইরূপে সংক্ষিপ্ত বাক্যে ধরা দিয়েছে, যেমন—'নয়নসম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই', 'সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী, মরণের বাজায়ে কিঙ্কিনী', 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ', 'যে-মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে-মুহূর্তে কিছু তব নাই', ইত্যাদি। 'বলাকা'য় কবির ভাষাভঙ্গির সংস্কারসাধনের কথা পূর্বে বলেছি। সংগীতের ভাষাকে উত্তম গদ্যের শ্রেণীতে উন্নত করে রবীন্দ্রনাথ ভাষাকে অদ্ভুত প্রকাশক্ষমতা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এ প্রচেষ্টায় সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেন মধুসূদন, এবং মধুসূদন বাংলা কাব্যকে কী পরিমাণ অগ্রসর করে দিয়েছিলেন তা বাঙালী রসিকের অজানা নয়। তদ্ভবশব্দবহুল বাংলা ভাষা অত্যন্ত কমনীয় ভাষা, এতে বৈষ্ণবপদাবলীর করুণ-কোমল যদিও সাজে ভালো, জীবনসংঘাতের কড়ি ও কোমলের মিশ্রণ এতে বাজে না। সংস্কৃত ভাষায় যে-গুণসমাবেশ স্বাভাবিক, তদ্ভব বাংলায় তা সহজ নয়। সুতরাং এবিষয়ে সার্থক বাঙালী কবিদের গুণপনা স্বীকার করতেই হয়। 'বলাকা'র বাণীবিন্যাসে উপযুক্ত যুক্তাক্ষরের ব্যবহার ও ব্যঞ্জনবর্ণ-সংঘাতের চরম রূপটি নানা স্থানে আত্মপ্রকাশ করেছে। কাব্যের প্রয়োজনেই কবির সচেতন কবি-আত্মা উপযুক্ত বাণীদেহ নির্মাণ করে। এই নির্মিতির মাধুর্যের দিকটি 'কল্পনা' কাব্যে, আর ওজোগুণের দিকটি 'বলাকা'য় লক্ষ্য করা যায়। 'আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে', 'তরঙ্গচুম্বিত তীরে মর্মরিত পল্লববীজনে', 'গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়, সূর্যাস্তের প্রলয়লিখায়'—এরকম বাক্য 'বলাকা'য় প্রচুর পাওয়া যাবে।

॥ দুই ॥

'বলাকা'র রূপরীতির কথা হল। এর কাব্যবস্তু কী? কোন্ বিশেষ অনুভূতি কবিকে 'বলাকা'-রচনায় প্রেরণা দিয়েছে? রবীন্দ্রনাথ স্থানে স্থানে তাঁর কাব্যের পালাবদলের কথা ইঙ্গিত করেছেন। একদিক থেকে এ অতি সংগত কথা। কারণ, 'চিত্রা'-'চৈতালি'-'কল্পনা' থেকে 'বলাকা'র সুরস্পর্শ অত্যন্ত ভিন্ন। অন্যদিক থেকে এ কথা অতিশয়োক্তি-মাত্র, কারণ, 'চৈতালি' থেকে 'বলাকা' অত্যন্ত দূরবর্তী হলেও, 'গীতাঞ্জলি'-'গীতালি' থেকে নয়। আবার, 'বলাকা'র জীবনদর্শন পরবর্তী 'মহুয়া' কাব্যেরও ভূমিকা। সুতরাং বলা যায়, রবীন্দ্রকাব্যে কবির অনুভবের বিকাশ আছে, মুহুর্মুহু পরিবর্তন নেই। 'বলাকা' কাব্যের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো কথা, কবি জীবন-অনুভবে এসে পৌঁছেছেন, কল্পনায় প্রাচীন

'বলাকা' কাব্যে কবির নতুন উপলব্ধি

ভারতের সৌন্দর্যরাজ্য পরিভ্রমণ কিংবা বিশুদ্ধ নিসর্গপ্রেরণা থেকে জাত শান্তরসের আস্বাদন এখানে নেই। তার পরিবর্তে আছে দুঃখদৈন্যবিক্ষুব্ধ সংগ্রাম, পথচলা এবং অনির্দেশ্য অজানায় ধাবমান হাওয়ার অনুভব। 'আমি যে অজানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ'—এই আনন্দের শিহরণ 'যাত্রী', 'বলাকা' প্রভৃতি কবিতাগুলিকে ঘিরে রয়েছে। অন্তহীন জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষ শুধু পদক্ষেপ করে চলেছে, গন্তব্যস্থান তার দৃষ্টির বাইরে, ভবিষ্যৎ একেবারেই অজ্ঞাত, শুধু অতিক্রান্ত পথের ক্ষীণ স্মৃতি তার সম্বল। এই অবিরাম যাত্রা বন্ধ করার শক্তি মানুষের নেই, এ যেন অপর কোনো নিগূঢ় শক্তির নির্দেশে তার উদ্দেশ্যহীন চলা। বস্তুত, মানুষ যে-নিয়মের অধীন, বিশ্বও সেই নিয়মের অধীন। বিশ্ব এবং যাবতীয় সৃষ্টি গতির ছন্দে স্পন্দিত, উধাও হয়ে অন্তহীন পথে ছুটেছে। সৃষ্টির পূর্ণতা এবং চলমানতার বিরতি কল্পনা করা যায় না। অপূর্ণতা এবং গতিই সত্য। পূর্ণতা আর পরিণাম বলে কোনো বস্তু আছে কিনা তা বোঝবার উপায় মানুষের নেই।

'বলাকা'য় মানুষের যাত্রা ও দুঃখবরণ সম্বন্ধে লেখা কতকগুলি কবিতা, যেমন—সর্বনেশে, আহ্বান, শঙ্খ, পাড়ি প্রভৃতি—'গীতালির' গানগুলির বিস্তৃত প্রকাশমাত্র। এদের ভাব হল, বাধাবিপত্তিকে তুচ্ছ করে, দুঃখময় বাস্তব জীবনকে সহজ স্বীকৃতি জানিয়ে, এগিয়ে চলতে হবে। যেমন, 'শঙ্খ' কবিতার 'ব্যাঘাত আসুক নব নব, আঘাত খেয়ে অচল রব' প্রভৃতি, অথবা 'আহ্বান' কবিতার 'ছিঁড়ব বাধা রক্ত পায়ে, চলব ছুটে রৌদ্র-ছায়ে' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতে এই ভাবের প্রকাশ অতিশয় স্পষ্ট। অচেনাকে বরণ, তরীতে যাত্রা, মৃত্যুকে অস্বীকার প্রভৃতি 'গীতালি' ও 'বলাকা' দুইয়েরই কবি-অভিপ্রায়। এরই সঙ্গে 'বলাকা'য় বিশ্বের গতি বা অজানা পথে যাত্রাসূচক কয়েকটি কবিতা একত্র স্থানলাভ করেছে। নিখিল বিশ্ব উৎক্ষিপ্ত গতিপ্রবাহের মধ্য দিয়ে অবিরাম ছুটে চলেছে, এর মাঝখানে কোনো ছেদ নেই, এর কোনো পরিণামও নেই। গতির বেগ কোনো সময়ে যদি স্তব্ধ হয়ে পড়ত তা হলে চেতন বিশ্ব জড়বস্তুতে পরিণত হত :

কবির যাত্রী-মনোভাব, দুঃখবরণের সংকল্প ও মৃত্যুকে অস্বীকার

> যদি তুমি মুহূর্তের তরে
> ক্লান্তিভরে
> দাঁড়াও থমকি,
> তখন চমকি
> উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে ;

পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে।

জীবজগতে জন্ম ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সৃষ্টির অবিরাম প্রবাহ চলেছে, এই প্রবাহ রক্ষা করার জন্যে জন্মের মতো মৃত্যুরও অনিবার্য প্রয়োজন রয়েছে। 'বলাকা' নাম-কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অসামান্য চাতুর্যপূর্ণ প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে এই গতির অনুভব আমাদের চিত্তগোচর করেছেন:

তৃণদল
মাটির আকাশ-'পরে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির আঁধারনিচে, কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।

বিশ্বের এই গতি-অনুভবের গৌরব 'বলাকা'কে অতিমাত্রায় বিশিষ্ট কাব্য করে তুলেছে, এবং ঠিক এই অনুভব রবীন্দ্রকাব্যে অন্যত্র এমন স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়নি। নিখিল সৃষ্টির নিরুদ্দেশ গতি সম্পর্কে অনুভব ভিন্ন ধরণের কয়েকটি কবিতাকেও অনুরঞ্জিত করে তাদের অসামান্যতা দিয়েছে। 'শ্রেষ্ঠ উপহার' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি বলছেন, তাঁর শ্রেষ্ঠ উপহার হল পথে চলার মুহূর্তগুলির ক্ষণিকের সৌন্দর্যপ্রেরণা, স্থূল কোনো বস্তু নয়। জীর্ণ জীবনের চেয়ে মৃত্যু কবির কাছে বরণীয় হয়েছে, কারণ, মৃত্যুর দ্বারাই যৌবনকে ফিরে ফিরে পাওয়া যায়। এই সময়কার লেখা 'ফাল্গুনী'-নাটকেও কবি যৌবনকে চিরন্তন সত্যহিসেবে গ্রহণ করেছেন, দেখতে পাওয়া যায়। 'বলাকা'য় বার্ধক্যের ওপর যৌবনের জয়ী হওয়ার বিষয়টি কবি নিম্নলিখিত অনবদ্য ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন:

বিশ্বের গতি-অনুভবে 'বলাকা' অতিমাত্রায় বিশিষ্ট

ফেলে এসো ক্লান্ত পুষ্পহার।
ঝরে পড়ে ফোটা ফুল, খসে পড়ে জীর্ণ পত্রভার,
স্বপ্ন যায় টুটে,
ছিন্ন আশা ধূলিতলে পড়ে লুটে।

শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার।
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারংবার
জীবনের এপার ওপার।

জীবনে স্থিতির আয়োজন, যাবতীয় সঞ্চয়, যাত্রার আদর্শে তিরস্কৃত হয়েছে। বস্তুভার চলার পথে বাধাস্বরূপ। তাই কবি যৌবনের প্রতি আগ্রহশীল হয়ে বার্ধক্যের পুঞ্জিত বস্তুভার ফেলে দিতে চান :

ফেলে দিব আর-সব ভার,
বার্ধক্যের স্তূপাকার আয়োজন।

জাতীয় জীবনের নানা গ্লানির দিকে কবির দৃষ্টিক্ষেপ

'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় কবি একটি জাতি বা মানুষজাতিকেই পুরাতন ত্যাগ করে নতুনকে বরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কবিতাটি জাতীয় জীবনের কুসংস্কার ও নানা গ্লানির ওপর ভিত্তি করে লেখা, আর জীর্ণ-সংস্কারত্যাগের নির্দেশ কবি ঋষিদের মতোই উদাত্ত কণ্ঠে দিয়েছেন। কবিতাটির শেষে কিন্তু কবি একটা পরিণামের উপলব্ধি বিবৃত না করে পারেননি। মনে হয়, অশ্রান্ত গতি কবির বিশেষ উপলব্ধি হলেও, যেই তিনি বাঙালীর জাতীয় জীবনের গ্লানিবিষয়ে সচেতন হয়েছেন, সেই পরিণাম-কল্পনা এবং প্রথমে গভীর দুঃখ, পরে আশা ও আশ্বাস প্রকাশ করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হয়েছে :

নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা,
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

'বলাকা' কাব্যে ফরাসী দার্শনিক বের্গস-র চিন্তাধারার প্রভাবপ্রসঙ্গে

'বলাকা' কাব্যের এই গতি-অনুভবের পেছনে কোনো কোনো প্রাচীন সমালোচক ফরাসী দার্শনিক বের্গ্‌সঁ-র প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। তাঁদের মতে, উক্ত দার্শনিকের গ্রন্থ পড়ে রবীন্দ্রনাথ এই নিরুদ্দেশ গতির ধারণায় এসেছেন এবং তা-ই 'বলাকা'কাব্যে ব্যক্ত করেছেন। এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল এই যে, 'বলাকা'য় নিছক গতি সম্বন্ধে লেখা কবিতাগুলি রচনার আগে রবীন্দ্রনাথ বের্গসঁ-র 'Creative Evolution'-নামক কেবলা গতির সত্যতা-প্রতিপাদক বিখ্যাত গ্রন্থ পাঠ করে থাকতে পারেন। কারণ, 'বলাকা' রচনার চারপাঁচ বছর আগে বইখানা ফরাসী থেকে ইংরেজিতে অনূদিত হয়। আর, তা ছাড়া

'Creative Evolution' গ্রন্থের বর্ণনাভঙ্গিও 'বলাকা'য় বিধৃত কয়েকটি কবিতায় স্থানে স্থানে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে কবি যে 'Creative Evolution'-এর গতিতত্ত্বকেই আশ্চর্য কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন, এমন ধারণা সংগত হবে না। কারণ, বিশ্বগতিতত্ত্বের দিকটি ছাড়া, মানুষের অজানা পথে যাত্রা, মৃত্যুবরণ প্রভৃতি আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি রবীন্দ্রকাব্যে পূর্ব থেকেই নানাভাবে প্রকাশলাভ করেছে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস-লিখিত 'রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়' গ্রন্থে যে-বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে তা থেকে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে :

"কবির প্রথম-কাব্যজীবনের বিভিন্ন উপলব্ধির মধ্যে বের্গস॑-র সঙ্গে বিস্ময়কর মিল দেখা যায় কবির 'জীবনদেবতা' বা 'অন্তর্যামী'-নামক স্বীয় ব্যক্তিত্বের বা আত্মশক্তির [বের্গস॑-র Self বা Creative Personality-র] ধারণা-বিষয়ে। বের্গস॑ তাঁর 'Creative Evolution' ছাড়া 'Matter & Memory', 'Introduction to Metaphysics' প্রভৃতি আলোচনাতেও ব্যক্তিমানুষের অন্তর্বর্তী একক শক্তির পরিবর্তনমূলক বিকাশলীলার কথা বলেছেন এবং একমাত্র প্রজ্ঞাগোচর শক্তি বলে একে উল্লেখ করেছেন।...এইভাবে বের্গস॑-র সঙ্গে কবির বিশ্বদর্শনের প্রকার ও ধারার প্রায় আন্তন্ত সংগতি দেখানো যায়। অথচ বলা যায়, যে-বিষয়ে কবির উপলব্ধির সঙ্গে বের্গস॑-র একটু তারতম্য রয়েছে সে-বিষয়ে বের্গস॑ই আমাদের প্রশ্নের পাত্র হয়েছেন।...রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় স্বকীয় উপলব্ধিবলে পরিণামের আশ্রয়, গতির গতি ধ্রুবসত্তার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, পরিবর্তন-প্রহেলিকার চরম মূল্য দেননি। এইখানে বের্গস॑-র সঙ্গে কবির মৌলিক পার্থক্য। কিন্তু অন্যসব বিষয়ে বের্গস॑-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য মিল দেখে এই পার্থক্যটুকুকে একটি সূক্ষ্ম আবরণের পার্থক্য বলেই মনে হবে। পূর্বে যে-কথা বলেছি, বের্গস॑-র যে-উপলব্ধি আর-একপদ অগ্রসর হওয়ার অপেক্ষা রাখে, তা রবীন্দ্রনাথেই ঘটেছে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট অরূপ-কল্পনায় সেই শূন্য পূর্ণ হয়েছে। বের্গস॑ 'এত প্রেম এত আশা এত ভালোবাসা'র মধ্য দিয়ে যে-দুর্জ্ঞেয় জীবনবেগকে দেখতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ তা লীলাময়ের প্রকাশ বলেই অনুভব করেছেন। ঐ সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু বাদ দিলে, কবির সঙ্গে দার্শনিকের সর্বাবয়বগত যে-সাদৃশ্য দেখা যায় তাকে প্রভাবমূলক সুতরাং সহসা-উদিত বলে মনে করলে ভুল করা হবে। মোট কথা, বের্গস॑-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল কেবলমাত্র পরিবর্তনতত্ত্বেই আবদ্ধ নয়। সৃষ্টির প্রকার, প্রণালী, মানুষের মহিমা, জীবনের সঙ্গে অধ্যাত্মের যোগ, ব্যক্তিগত জীবনের গতিশীল বিকাশ প্রভৃতির মধ্য

দিয়ে উভয়ের ব্যাপক সাদৃশ্য রয়েছে; এবং কবির 'বলাকা'-পর্যায়েই শুধু নয়, তাঁর পূর্ব-পূর্ব পর্যায়ের বিভিন্ন উপলব্ধিগুলির মধ্যেও দার্শনিকের সঙ্গে সাদৃশ্য সবিশেষ লক্ষণীয়।

সেইজন্যে আমরা কবির পরিবর্তনবাদের বিষয়টি বের্গসঁ-র প্রভাবজাত বলে মেনে নিতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় উপলব্ধির মূলেই ধীরে ধীরে এই জীবনদর্শনে এসে পৌঁছেছেন—এই সমীচীন ধারণাই পোষণ করেছি। বের্গসঁ ও রবীন্দ্রনাথ স্থূল বস্তুগত পার্থিব প্রয়োজনের জীবনের প্রাপ্যমূল্য দিয়ে জীবনাতীতের সঙ্গে জীবনকে যুক্ত করে দেখেছেন। রবীন্দ্রপ্রতিভার বিকাশ ও পরিণাম যে-ঐক্যসূত্র অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে তার মধ্যে কবির জন্মান্তরের অনুভূতি, নিরুদ্দেশ সুদূরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, বসুন্ধরার তাবৎ বস্তুতে জীবনচাঞ্চল্যের অনুভব, সৌন্দর্য বা আর্টের তথা অনির্বচনীয় অরূপের মধ্যে মুক্তির অনুসন্ধান, দুর্যোগময় প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অরূপানুভূতি, সংঘাতক্ষুব্ধ বন্ধুর পথে মানব-জীবনের জয়যাত্রা প্রভৃতি কীভাবে একত্র যুক্ত হয়ে একটি বিশিষ্ট কবিস্বভাব ও একটি বিস্ময়কর সমগ্রতা অভিব্যক্ত করেছে তা এতাবৎ আলোচনার মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এর মধ্যে কেবল 'বলাকা'তেই বের্গসঁ-র প্রভাব নির্দেশ করলে যেমন কবিপ্রতিভার অনন্যপরতন্ত্র ঐক্যমূলক বিকাশের ধারণায় কুঠার-আঘাত করা হয়, তেমনি উভয়ের জীবনদর্শনের গভীরতর ঐক্যের উপলব্ধি থেকেও বঞ্চিত হতে হয়।

এই কারণে আমরা মনে করি যে, উভয় দার্শনিকই স্বীয় বিশিষ্ট উপলব্ধির মধ্য দিয়ে প্রায় এক ধারণায় এসে পৌঁছেছেন। একজন প্রজ্ঞাময় মননের দ্বারা, আর-একজন ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে আনন্দচৈতন্যময় লোকে উত্তীর্ণ হয়ে। 'বলাকা'র কয়েকটি কবিতায় 'Creative Evolution'-এর বিশিষ্ট কয়েকটি ধারণার ও ভাষার যে-মিল রয়েছে তা থেকে শুধু এই মনে হয় যে, ঐ গ্রন্থ কবি পাঠ করেছিলেন এবং ওর প্রতিপাদ্য রহস্যময় জীবনবেগের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওর মধ্যে তিনি নিজেকেই খুঁজে পেয়েছিলেন। ফলে সেই আত্মদর্শনের কৃতজ্ঞতা-স্বরূপেই যেন ঐ পুস্তকের কয়েকটি প্রবল উক্তি অলংকাররূপে 'বলাকা'র কয়েকটি কবিতায় গ্রহণ করেছেন।"

'বলাকা'য় পরিস্ফুট বাস্তব-জীবনদর্শন পূর্বেকার কাব্যগ্রন্থ থেকে একে পৃথক করেছে। অরূপচেতনা থেকে ধীরে ধীরে বাস্তব জীবনে নিষ্ক্রমণের মূলে আমাদের বিভিন্ন সামাজিক গ্লানি, যেমন,—কুসংস্কার, ভীরুতা, জড়ত্ব প্রভৃতি, এবং সেকালের প্রবল স্বাধীনতা-আন্দোলন নিঃসন্দেহে সচেতন কবিমানসে সক্রিয়

রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সমাজমুখী কবি ছিলেন না—একথা যাঁরা বলে থাকেন তাঁরা কবির প্রতি সুবিচার করেন না। 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' কাব্যের যুগের কবির মানবীয়তা এবং বিশেষে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতা, 'মালিনী' নাটিকা ও 'বর্ষশেষ' প্রভৃতির বাস্তব-জীবনবোধ কবির এই সমাজনিষ্ঠ মানসের কথা ব্যক্ত করে। 'খেয়া'-'শারদোৎসব'-'গীতাঞ্জলি'-পর্যায়ে কবি যদিও রূপলোক থেকে অরূপলোকে সঞ্চরণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য-সংগ্রামের দিকটি সম্বন্ধেও পূর্ণভাবে সচেতন রয়েছেন। 'গীতালি'-'ফাল্গুনী'-'বলাকা'য় এসে অরূপের সঙ্গে জীবনকে মিশিয়ে বা জীবনের মধ্যেই অরূপের অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে চূড়ান্ত জীবনবাদিতার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রপরবর্তীকালে 'বলাকা'র জীবনসংগ্রামের দিকটি নজরুল ইসলামকে বিশেষভাবে প্রেরণা দিয়েছিল। কবি রবীন্দ্রের এই জীবনমুখিতার প্রস্ফুট উজ্জ্বল পরিচয় 'ঝড়ের খেয়া'-নামক সাঁইত্রিশ সংখ্যক কবিতায় রূপ নিয়েছে। জীবনের প্রতি এ জাতির অত্যধিক মমত্ব, বিষয়সুখের প্রতি একান্ত আগ্রহ লক্ষ্য করে কবি নির্দেশ দিচ্ছেন—'পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা, আর চলিবে না'। আমাদের জাতীয় জীবনের দীনতা লক্ষ্য করে বলছেন :

'বলাকা'য় কবির বাস্তবজীবনদর্শন

ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান—"

এই কবিতার একাংশে কবি স্পষ্টভাবেই বলছেন যে, তিনি জীবনের অপর পৃষ্ঠা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ রয়েছেন—'দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে'। আর, নিচের পঙ্‌ক্তিগুলিতে সেকালের যুবকদের গোপন স্বদেশী করার ছবিই নিঃসংশয়ে ফুটে উঠেছে :

বাহিরিয়া এল কারা ? মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জনমাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে ;
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল ;

'যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল'
উঠেছে আদেশ—
বন্দরের কাল হল শেষ।'

'বলাকা'র একরাশ উত্তম কবিতার মধ্যে কোন্ কবিতাটি সবচেয়ে ভালো? প্রথমে দেখতে হবে, 'বলাকা'য় নিছক গতির সুর বা অবিরল পরিবর্তনের ভাবের বাহক কবিতা ছাড়াও অন্যশ্রেণীর কবিতাও রয়েছে—যেমন, নিসর্গ-আনন্দরসের বা সাধারণ মানবীয় প্রীতিসম্পর্কের কবিতা, যদিও এরা সংখ্যায় কম। গতি, পরিবর্তন ও সংগ্রামমুখর জীবনের প্রতি আগ্রহের সুরই 'বলাকা'য় সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়। এর মধ্যে 'শাজাহান' কবিতাটির কথা বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। 'শাজাহান' কবিতায় কবির বক্তব্য-উপস্থাপনের চমৎকারিত্ব অসাধারণ এবং পরিমিত শব্দালংকার, অর্থালংকার ও কবিপ্রৌঢ়োক্তির সমাবেশে কবিতাটি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ কবিদের উত্তম রচনার অঙ্গীভূত। কিন্তু আমাদের মনে হয়, 'বলাকা' নাম-কবিতাটির নিগূঢ় গতি-অনুভবের ব্যাকুলতাময় আর্তির স্বাদ ভারতীয় বৈরাগ্যের স্থায়ী মনোভাবটিকে আশ্চর্য চমৎকারিত্বের সঙ্গে প্রকাশ করেছে। 'শাজাহান' কবিতার দুই অংশের মধ্যে কল্পনাভঙ্গির যে-বৈষম্য রয়েছে তা ওই কবিতাটির কোনো ত্রুটি নয়। কারণ, প্রারম্ভে উপস্থাপিত প্রণয় ও স্থিতিময়তায় চিত্রটি দ্বিতীয়াংশের বৈরাগ্য ও চলমানতার পরিপূরক-হিসেবেই উপস্থাপিত হয়েছে—শাজাহান ও মমতাজের প্রণয়চিত্রটি একটু বেশি বিস্তারিত হয়েছে, এই মাত্র। প্রেমকে কবি দ্বিতীয়াংশে একেবারে অস্বীকার করেছেন বলেও এর মধ্যে কৃত্রিমতাদোষের কল্পনা করা যায় না। কারণ, জীবনের সঙ্গে যুক্ত প্রণয় গ্রহণীয়, এবং স্বার্থমগ্ন বিলাসী প্রণয় ত্যাজ্য [তুলনীয়, পরবর্তী 'মহুয়া' কাব্য]। এই জীবনমুখী কাব্যচেতনাতেই রবীন্দ্রনাথ শেষে স্থির হয়েছেন। আসলে শাজাহান-চরিত্রবর্ণনায় অপ্রত্যক্ষতার মধ্য দিয়ে আভাসে রবীন্দ্রনাথ যা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, 'বলাকা' নাম-কবিতাটিতে স্বানুভূতির প্রকাশে তা-ই সর্বোত্তম রূপ পরিগ্রহ করেছে। 'বলাকা' কবিতার তীক্ষ্ণ স্বানুভব ও গীতিময়তার তুলনা এবং সেই সঙ্গে অনায়াস প্রকাশচাতুর্যের তুলনা রবীন্দ্রকাব্যেও খুব বেশি নেই।

এই কাব্যের দুএকটি কবিতা সম্পর্কে

সুপরিচিত 'ছবি' কবিতাটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত যাত্রা-অনুভবের প্রাথমিক দিকটি আশ্চর্য কারুকার্যের সঙ্গে প্রতিফলিত করা হয়েছে। এর প্রথমাংশে ছবির স্থিতিশীলতা এবং বিশ্বের চলমানতার মধ্যে এর স্ববিরোধ সম্বন্ধে কবি প্রশ্ন করেছেন। জীবনের ও

নিসর্গের চঞ্চলতার মধ্যে এর স্থিরতা দেখে কবি প্রশ্ন করছেন—'কেন রাত্রিদিন, সকলের মাঝে থেকে সবা হতে আছ এত দূরে স্থিরতার চির অন্তঃপুরে? এ মূর্তি যা স্থির রেখার বন্ধনে আবদ্ধ তা তো একদিন কবিরই মতো চঞ্চলজীবন ছিল, আর জীবনপথে কবির ছিল প্রেরণাদাত্রী। আজ কি সেই চাঞ্চল্য ও চলমানতা স্তব্ধ হয়ে গেল চিরদিনের মতো? কবিতার দ্বিতীয়াংশে এই প্রশ্ন-ভূমিকার উত্তর-উপসংহার রচিত হয়েছে। এ বাহ্যত রেখার বন্ধনে বদ্ধ ছবি, অন্তরে প্রেরণাদাত্রী কবির সেই জীবন্ত প্রিয়তমা। কারণ, ওরই মধ্য দিয়ে কবি আজও অন্তরের গভীরে অনুক্ষণ তাঁর প্রিয়তমার কাব্যপ্রেরণা লাভ করে থাকেন। দেহান্তরিত হলেও কবির মর্মমূলনিবাসিনী তিনি। আর, সেই নিভৃতবিরাজিত প্রণয়িনী সম্পর্কে বাহ্যজগতের-কর্মসূত্রে-বিজড়িত বিব্রত কবিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ভার নিয়েছে যে সে তো ওই ছবি। ছবির মাধ্যমেই কবির সঙ্গে সেই অশরীরী সৌন্দর্যের—গোপনরঙ্গিনী রসতরঙ্গিনীর—যোগ রয়েছে, কাজেই ছবিও নিশ্চল নয়। কবি তাই ছবির ওপর প্রিয়তমা-স্মরণের দায়িত্ব অর্পণ করে বলছেন:

তোমার চিকন
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্মরমুখর ছায়া মাধবীবনের
হত স্বপনের।

অর্থাৎ, ছবি বাহ্যত জড়বস্তু হলেও, কবির নিভৃততম অন্তরে উদ্বোধনীর সঞ্চার যেহেতু সে করছে, সেইহেতু সেও চলমান নিখিলের সঙ্গে এক। [তর্কের দিক থেকে বের্গস"-র ধারণার সঙ্গে কবির অভিমতের একীকরণ সম্ভব নয়; কারণ, বের্গস" চেতনশীল ও জড়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করেন, কবি নিঃশেষে কবি বলেই এ-পার্থক্য রাখেন না।] 'বলাকা' কাব্যের 'ছবি' রবীন্দ্রনাথের গতি-অনুভব-আশ্রিত রসোদ্বেল একটি স্মরণীয় কবিতা।

সমালোচ্য কাব্যখানির আর-একটি বিখ্যাত ও উত্তম কবিতা 'চঞ্চলা' ['হে বিরাট নদী, অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল' ইত্যাদি]। এর কথা পূর্বে কিছুটা বলা হয়েছে। এটি 'বলাকা'র কেন্দ্রীয় কবিতাগুলোর অন্যতম। বিশ্বগতিতত্ত্বের চিত্তগ্রাহী এই কাব্যায়ন পাঠককে বিস্মিত করে। কবিতাটির এক কোটিতে

কালবিশ্বের আনন্দময় অবিরাম গতির কথা, অন্য কোটিতে চিরপথিক কবির আত্মগত উপলব্ধির অপূর্ব বর্ণনা—নিজের মর্মলোকে ওই কাল-রূপ চঞ্চল সত্তার নিঃশব্দ পদধ্বনির অনুরণনের অতি-লৌকিক অনুভূতির কথা। দুটি সত্তার 'অকারণ অবারণ চলা'র ঝংকার এখানে এক মহা-ঐকতান রাগিনীর সৃষ্টি করেছে। নিত্যপ্রবহমাণ নদীর উপমা আশ্রয় করে এই কবিতায় কবি একদিকে সৃষ্টির অন্তর্লীন প্রাণপ্রবাহের দুর্নিবার গতিকে সকলের উপলব্ধিগোচর করেছেন, অন্যদিকে ওই প্রাণবেগ হতে কী করে ইন্দ্রিয়সাক্ষী বস্তুবিশ্বের উদ্ভব হচ্ছে, তার চমৎকার চিত্র ফুটিয়েছেন। সৃষ্টি ও বিনাশ, জন্ম ও মৃত্যুর রূপান্তরের আসল রহস্য কবির চোখে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েচে,—এ এক অভিনব বিশ্বদর্শন। কবির উপলব্ধ ওই প্রাণশক্তির প্রবাহের বিরাম নেই। তার চলার পথে যেখানে বাধা আসছে সেখানে রূপ নিচ্ছে জড়বস্তুপুঞ্জ। এই ক্ষণিকের বাধা যদি অলঙ্ঘ্য হত, বিশ্বের গতিপ্রবাহের যদি সম্পূর্ণ বিরতি ঘটত তা হলে সৃষ্টি নিশ্চল হয়ে যেত, পুঞ্জপুঞ্জ বস্তুভারে সে পীড়িত হয়ে উঠত—এক প্রকাণ্ড অসামঞ্জস্যের অশান্তি দেখা দিয়ে জীবনকে করে তুলত অসহনীয়। আর, জড়বস্তু অশুচি, তার স্থবির স্থায়িত্ব ভয়ংকর, নতুন প্রাণের বিচিত্র প্রকাশকে সে নিরুদ্ধ করে। এহেন একটি অবস্থা কল্পনাতীত। সুতরাং পরিবর্তমানতাই চঞ্চল বিশ্বের ধর্ম, মৃত্যু রয়েছে বলেই জীবন শুচি ও সুন্দর। সৃষ্টির পরিবর্তনধর্মকে যে বরণ করে নিতে পারলে না, মৃত্যু যার কাছে সহজ স্বীকৃতি পেলনা, জগৎসংসারে তার বিড়ম্বনার শেষ নেই। কবিতাটি শুধু বিশ্বদর্শন নয়, চিরযাত্রী কবির আত্মদর্শনও বটে। এর মধ্যে যে-তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন তা কবির গভীর অনুভূতির স্পর্শে নিগূঢ় জীবনসত্যে রূপান্তরিত হয়েছে। অজানা অন্তহীন পথে বিশ্বের যাত্রার সঙ্গে কবি নিজ আত্মার যাত্রার ছন্দকে নিঃশেষে মিলিয়ে নিয়ে আনন্দস্পন্দিত যে-নির্মম নির্মল বৈরাগ্যের পরিচয় দিয়েছেন কাব্যসাহিত্যে কোথাও তার তুলনা মেলেনা। কবিতাটি পড়তে পড়তে কবির যাত্রীমনোভাব আমাদের চিত্তদেশকে মুহূর্তে আবিষ্ট করে। 'চঞ্চলা' রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য এক কবিকৃতি।

তারপর সাঁইত্রিশ সংখ্যক ['দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন' ইত্যাদি] কবিতাটি। এর সম্পর্কেও দুচারটি কথা পূর্বে আমরা বলেছি। এরকম উৎকৃষ্ট কবিতা 'বলাকা' গ্রন্থেও খুব কম চোখে পড়ে। কবিতাটিতে বাস্তবজীবনবোধে প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথ সংগ্রামী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন—যুদ্ধঘোষণা করেছেন মানুষের উদ্ধত অন্যায়, বর্বর স্বার্থান্ধতা, নিষ্ঠুর লোভ, দুর্বিষহ অত্যাচার, নির্লজ্জ হিংস্রতা আর মানবের কুশ্রী দীনতা-ভীরুতা-কাপুরুষতার বিরুদ্ধে। অত্যাচারিতের

নিদারুণ মর্মযন্ত্রণা এই কবিতার অদ্ভুত ছন্দোস্পন্দের মধ্য দিয়ে সুতীব্র হাহাকারে যেন ফেটে পড়েছে। মানবতার অপমান কবিকে বিপ্লবী-মনোভাবাপন্ন করে তুলেছে। তাই গ্লানির পঙ্কশয্যা হতে পরিত্রাণলাভের জন্যে মানুষকে তিনি আহবান করেছেন মৃত্যুমুখী সংগ্রামক্ষেত্রে, তাদের শুনিয়েছেন মানব-ইতিহাসের নিয়ন্তার সুকঠিন আদেশ : 'তুফানের মাঝখানে নূতন সমুদ্রতীরপানে দিতে হবে পাড়ি।' পুরানো যুগ ক্লেদাক্ত আবর্জনার পূতিগন্ধে আবিল হয়ে উঠেছে, এর অবসান ঘটুক ; প্রলয়-অন্ধকার ভেদ করে সংগ্রামপরায়ণ মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে সেইদিকে, যেদিকে খোলা রয়েছে 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার'। এর জন্যে তাকে অজস্র দুঃখ বরণ করতে হবে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন জানাতে হবে—তবেই তো মিলবে অমৃতের সন্ধান। এ কবিতা প্রবল আশ্বাসে-বিশ্বাসে ভরা বিসর্জনের সংগীত, মাভৈঃ বাণীর সমুদাত্ত ঘোষণা। 'ক্রন্দনের কলরোল, লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল', ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘের অন্ধকার, উন্মত্ত ঝটিকার ভৈরব গর্জন, 'বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ' কবিতাটির প্রতিটি ছত্রে প্রচণ্ড আবেগে থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠছে। তার মধ্য হতে গম্ভীর নির্ঘোষে আমাদের কানে এসে পৌঁছাচ্ছে :

'বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না'—

—নির্মম কাণ্ডারীর এই প্রেরণাময়ী বাণী। এই কবিতা অতুলনীয়। পঁয়তাল্লিশ সংখ্যক ['পুরাতন বৎসরের জীর্ণ-ক্লান্ত রাত্রি' ইত্যাদি] কবিতাটি এর পরিপূরক-হিসেবে পঠনীয়।

আমাদের বর্তমান আলোচনা সমাপ্তির মুখে। কাব্যখানির মূল সুরের পরিচয় খুব সংক্ষেপে আমরা বাণীবদ্ধ করেছি, এবং এর আশেপাশে যে-সমুদয় সঞ্চারী ভাব দেখা দিয়েছে, তার প্রতিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। তা ছাড়া, এই গ্রন্থের রূপরীতির কথাও স্বল্পপরিসরের মধ্যে আলোচিত হয়েছে।

উপসংহার

'বলাকা'-কাব্যপরিক্রমা করে আমরা নিঃসংশয়িত একটি ধারণায় উপস্থিত হয়েছি ; তা হল—রবীন্দ্র-কাব্যধারায় এই গ্রন্থখানির স্থান অতিশয় উচ্চে। কেউ যদি একে কবিগুরুর সর্বোত্তম কবিকৃতি বলে আখ্যাত করতে চান তাহলে তার প্রতিবাদ করাটা খুব সহজ হবে না। কেননা, শ্রেষ্ঠকাব্যের বহুবিধ গুণে 'বলাকা' সমুদ্ভাসিত। কবি-রবীন্দ্রের অপূর্ব উপলব্ধি, বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রগাঢ় বাস্তবজীবনবোধ, বিশ্বের রহস্য-উন্মোচনের আশ্চর্য শক্তি, নিবিড় আধ্যাত্মিক অনুভূতি, প্রদীপ্ত প্রজ্ঞাদৃষ্টি,

দূরযানী কল্পনা, বলিষ্ঠ জীবনদর্শন—'বলাকা'য় এ সমস্তকিছুর একত্র সমাবেশ আমরা দেখতে পাই। এখানে কবির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন দার্শনিক, তাই বিশ্বের এমন বিস্ময়াবহ স্বরূপদর্শন সম্ভব হয়েছে।

রবীন্দ্রকাব্যে আমরা প্রায়শই 'রিয়াল' ও 'আইডিয়াল'-এর দ্বন্দ্ব দেখেছি, কিন্তু সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে কবি সর্বদ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়ে একটা পূর্ণ সামঞ্জস্যতত্ত্বে এসে পৌঁছেছেন। আসক্তি ও বৈরাগ্য, আদর্শ ও বাস্তব, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কর্ম ও সন্ন্যাসের এমন অপূর্ব সমন্বয় রবীন্দ্র-রচনায় ইতঃপূর্বে কিংবা এর পরে কুত্রাপি আমাদের চোখে পড়েনি। 'বলাকা'-র কবি রবীন্দ্রনাথ নিগূঢ় জীবনবোধের এক পরমাশ্চর্য বিশালতায় আমাদিগকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। তাঁর যৌবনবন্দনা বা প্রাণবন্দনা, তাঁর উচ্চারিত চিরযাত্রী মানবাত্মার অশ্রান্ত চলার সংগীত পাঠক-চিত্তকে উদ্দীপ্ত উজ্জীবিত করে। দুঃখ-বিপদ-মৃত্যু-বিষয়ে ভ্রূক্ষেপহীন তাঁর অমৃতসাধনা, মানবজীবনের চরম সার্থকতার দিকে তাঁর অভ্রান্ত অঙ্গুলিসংকেত, জড়ত্ব-জীর্ণতা আর মোহের জটিল জাল ছিন্ন করার অটল অঙ্গীকার পঙ্গুকেও গিরিলঙ্ঘনের শক্তি জোগায়। লৌকিক সংসারের উর্ধচারী এক গূঢ় সত্তার সঙ্গে মানবসত্তার অচ্ছেদ্য যোগের কথা উদাত্ত কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করেছেন 'বলাকা'-র কবিতাগুলির মাধ্যমে—এই অধ্যাত্ম-উপলব্ধির তাৎপর্য সীমাহীন। দুরন্ত, প্রমত্ত, প্রচণ্ড, অশান্ত যৌবনের সংবাদ তিনি আমাদের দিয়েছেন, আর এই যৌবনসাধনাই আমাদের বন্ধমোচন করবে, তা-ও জানিয়েছেন। 'বলাকা'-কাব্যপাঠের চরম ফলশ্রুতি মুক্তির আস্বাদন—রবীন্দ্রনাথের সাধনালব্ধ জীবন্মুক্তি।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অপূর্ব কলাবিধি—গতিবেগস্পন্দিত মুক্তবন্ধ ছন্দ, দীপ্ততম বাগ্‌বিভূতি, ভাষার বিদ্যুৎ-ঝলসন, আবেগের তীব্রতা, ভাবের গভীরতা, কল্পনার নিঃসীম বিস্তার। এতগুলি বস্তু মিলে 'বলাকা'র শ্রেষ্ঠতা। কবিকুলচক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'-ভূমি দেবরাজ ইন্দ্রের অমরাবতী নয়; এ যেন মর্তলোকচারী এক রাজর্ষির হোমাগ্নিশিখা-বিভাসিত প্রশান্ত-গম্ভীর তপোবন। আর, এই তপোবনের উদ্গীত সামমন্ত্র হল: 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে'—যার একমাত্র তুলনা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'চরৈবেতি' 'চরৈবেতি'—এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো—মন্ত্রোচ্চার।

উচ্চতর বাংলা রচনা

* দ্বিতীয় খণ্ড *

অনুবাদ

[বি. এ. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হইতে সংকলিত]

[এক]

Bankimchandra took Bengali readers by surprise by revealing to them the romance of life and the hidden treasures of emotional joy with which, it is said, they had not previously been familiar. The classical poem of Bengal being mostly translations from Sanskrit, and written in the stereotyped form approved by the canons of Sanskrit Poetics, often lack in freshness and animation, Bankim drew his romantic ideals from the British Lake-Poets and other western writers. It cannot, however, be said that such romance was altogether unknown in Bengal before his time. The Vaisnava poem had an exuberance of it in the sixteenth and seventeenth centuries, though they were often mystical and their beauty was concealed from lay readers in the symbols of allegory.

জীবনের যে-রোম্যান্স বা রহস্যময়তা এবং হৃদয়াবেগের যে-গোপন আনন্দ-ঐশ্বর্যের সংগে বাঙালী পাঠকসমাজের কোনো পূর্বপরিচয় ছিল না, উহা উদ্ঘাটিত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার পাঠকসাধারণকে বিস্ময়সচকিত করিয়া তুলিলেন। যুগোত্তীর্ণ বাংলা-কাব্যকবিতাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ, এবং ঐ সব গ্রন্থ সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের নিয়মানুমোদিত চিরাচরিত পন্থায় বিরচিত বলিয়া উহাদের মধ্যে সজীবতা ও প্রাণচাঞ্চল্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ইংলণ্ডের 'লেক্-কবি' এবং পাশ্চাত্ত্য জগতের অন্যান্য লেখকদের নিকট হইতে বঙ্কিম রোম্যান্টিক ভাবধারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে এমন কথা বলা চলে না যে, তাঁহার পূর্বেকার বাংলা সাহিত্য এই রোম্যান্সের সংগে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব-সাহিত্যে রোম্যান্টিক ভাবধারার প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু ইহার মধ্যে ছিল অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্যোতনা, এবং রূপক ও সংকেতধর্মিতাহেতু সাধারণ পাঠকের নিকট এইসব কবিতার সৌন্দর্য অনুদ্ঘাটিত থাকিয়া যাইত।

[দুই]

It is impossible to describe the beauty of the Taj in words. It has been called 'a dream in marble' and 'a tear-drop on the cheeks of time'; but the fairest phrases fail to do justice to the surpassing creation of art. The Taj is best seen by moonlight when the dazzling white of the marble is mellowed into a dreamy softness. The most charming view, perhaps, is obtained from the palace on the opposite bank of the river when the plinth is not visible and the building looks a fairy castle in the air, hung among the cloud.

তাজমহলের সৌন্দর্য অনির্বচনীয়। কেহ কেহ ইহাকে মর্মরে রচিত স্বপ্ন এবং কেহ-বা ইহাকে মহাকালের কপোলদেশে একবিন্দু অশ্রু বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু মানবের সুন্দরতম ভাষাবিন্যাসেও এই অতুলনীয় শিল্পসৃষ্টির প্রতি সুবিচার করা হয় না। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রিতে পাষাণপুঞ্জের অত্যুজ্জ্বল শুভ্র বর্ণ যখন একটা স্বপ্নালু কোমলতার রূপপরিগ্রহ করে, তখনই তাজমহলকে দেখিতে হইবে। নদীর অপরতীরবর্তী প্রাসাদ হইতেই সম্ভবত তাজের সর্বাপেক্ষা নয়নমুগ্ধকর দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। সেইস্থান হইতে তাজমহলের ভিত্তিমূলকে দেখা যায় না বলিয়া এই মর্মরপ্রাসাদটিকে মেঘলোক-বিলম্বিত নভোশায়ী একটি পরীর দুর্গের মতোই দেখায়।

[তিন]

It must be recognised that a prejudiced view of India had grown up in England, so that young men came out to India ignorant, and sometimes contemptuous, of the civilization of the country. To some extent this prejudice must be attributed to the zeal of missionaries and philanthropists, who in their eagerness for reform overstressed the darker shadows of Indian life. Suttee had prevailed until 1830; slavery was still legal in 1842; some tribes were accustomed to kill their female children, etc. These and other ugly facts were grave blots on Indian civilization, but over-insistence on them produced a distorted picture.

ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংলণ্ডবাসীদের মনে ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটা

কুসংস্কারপূর্ণ ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছে। সেহেতু ভারতবর্ষের সভ্যতা সম্বন্ধে অজ্ঞতা আর ঘৃণাপূর্ণ মনোভাব লইয়াই সে-দেশের তরুণদল এদেশে আগমন করিত। যে-সব ইওরোপীয় ধর্মপ্রচারক ও মানবপ্রেমিক সংস্কারসাধনের ব্যগ্রতাবশত ভারতবাসীর জীবনের অন্ধকার দিকটার উপর অধিক জোর দিয়াছে, এই সংস্কারপূর্ণ মনোভাবের জন্য তাহারাই কিয়দংশে দায়ী। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত এদেশে সতীদাহপ্রথা প্রচলিত ছিল, ১৮৪২ সাল অবধি দাসপ্রথা আইন-অনুমোদিত ছিল, কোনো কোনো জাতি তাহাদের কন্যাসন্তানকে হত্যা করিতে অভ্যস্ত ছিল—এই রকমের কয়েকটি কুৎসিত ঘটনা ভারতীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে গুরুতর কলংকের বিষয়। কিন্তু ইহাদের সম্পর্কে নির্বন্ধাতিশয্য ভারতীয় সভ্যতার ছবিটিকে বিকৃত করিয়াই তোলে।

[চার]

The world seems to be unhinged now-a-days. The principles which, like strong pillars, supported our society in the past—the virtues of forbearance, sympathy and brotherhood, are showing symptoms of crumbling down. The political leader of the present day declares that the virtues on which our ancestors prided themselves are not fit for the struggle which men have to face in this age of competition and international trade relations ; they have an innate weakness which does not guarantee success in the hour of national peril. The qualities of truth and mercy and the sanctity of pledges were given undue precedence by the ancients. On the other hand, tactics and adaptation of policy to the exigencies of the situation may help in a far greater degree to override the present danger.

বর্তমানে পৃথিবীতে একটা বিপর্যয়ের ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সহিষ্ণুতা, সমবেদনা, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি যে-সব নীতি সুদৃঢ় স্তম্ভের মতো অতীত দিনে আমাদের সমাজকে ধারণ করিয়া ছিল, বর্তমানে উহারা যেন ধুলায় অবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছে। আধুনিক যুগের রাষ্ট্রনেতারা বলিতেছেন, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে-সকল গুণের জন্য গর্ববোধ করিতেন, সেগুলি বর্তমানের প্রতিযোগিতা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসম্পর্কের ক্ষেত্রে উপযোগী নহে। এইগুলির মধ্যে স্বভাবজ একটা দুর্বলতা রহিয়াছে বলিয়া উহারা জাতীয় জীবনের চরম সংকটমুহূর্তে বিপন্মুক্তির কোনো সহায়তা করে না। প্রাচীন-

কালের মানুষ সত্য, ক্ষমা, প্রতিশ্রুতির পবিত্রতা প্রভৃতি গুণকে অত্যধিক প্রাধান্য দিয়াছিল। পক্ষান্তরে, কতকগুলি কৌশল ও পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুযায়ী অবলম্বিত নীতিই বর্তমানের সংকট হইতে পরিত্রাণের ক্ষেত্রে আমাদিগকে অধিকতর সহায়তা করিতে পারে।

[পাঁচ]

With half a million of soldiers Napoleon crossed the Niemen, and through fearful difficulties prosecuted his perilous enterprise even to Moscow, but found arrayed against him the destructive agencies of fire, famine and frost. He commenced his retreat over the wasted route by which he had advanced, and before he again reached Poland, his army perished. The sufferings of the men during the retreat were frightful. Through the immense plains covered with snow, an endless column of wretches, nearly all without arms, marched in disorder, falling at every step on the ice, near carcasses of their companions.

পাঁচলক্ষ সৈন্যসমভিব্যাহারে নেপোলিয়ন নীমেন [Niemen] অতিক্রম করিলেন, এবং ভয়াবহ বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া মস্কোনগরী পর্যন্ত বিপদসংকুল অভিযান করিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন, অগ্নি, দুর্ভিক্ষ ও তুষারের ধ্বংসমুখী শক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। যেই পথ দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই বিধ্বস্ত পথেই তিনি পিছু হটিতে লাগিলেন এবং পুনরায় পোল্যাণ্ডে পৌঁছিবার পূর্বেই তাঁহার সেনাবাহিনী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। পশ্চাদ্ধাবনের সময়ে লোকজনের দুঃখলাঞ্ছনা ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল। অসংখ্য সৈনিকদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই অস্ত্রহীন অবস্থায় তুষারপরিকীর্ণ দূরপ্রসারী প্রান্তরের উপর দিয়া বিশৃংখলভাবে অগ্রসর হইতেছিল, এবং প্রতি-পদক্ষেপে তাহারা বরফের উপর তাহাদের সহযাত্রীর মৃতদেহের পার্শ্বে ভূলুণ্ঠিত হইতেছিল।

[ছয়]

A thunderous, stunning boom like that of a thousand guns rang out and sounded the death-knell of smiling Monghyr.

That deafening terrifying boom was followed by utter pitch-darkness caused by the cloud of dust rising from the collapsing town. In the twinkling of an eye the entire town with its huts and palaces collapsed like a house of cards, burying alive or killing some ten thousand of its inhabitants. The situation was made ten times worse by the splitting of the earth everywhere and jets of boiling water or sand shooting out of these holes.

সহস্র কামানগর্জনের মতো একটি হৃতচেতনকারী বজ্রগম্ভীর শব্দ অকস্মাৎ ধ্বনিত হইয়া মুংগেরের মৃত্যুঘণ্টা নিনাদিত করিল। সেই শ্রবণবিদারক ভয়ংকর শব্দের সংগে সংগে পতনোন্মুখ নগর হইতে উত্থিত ধূলির মেঘপুঞ্জের দ্বারা একটা ঘনঘোর অন্ধকারের সৃষ্টি হইল। চক্ষুর নিমেষে কুটীর ও প্রাসাদসহ সমগ্র নগরী তাসের ঘরের মতো ভাঙিয়া পড়িয়া ইহার প্রায় দশ সহস্র অধিবাসীকে জীবন্ত সমাধিস্থ অথবা নিহত করিল। ভূমিভাগ সর্বত্র বিদীর্ণ হওয়াতে তাহার ছিদ্রপথ দিয়া উষ্ণ জলস্রোত ও বালুকারাশি সবেগে প্রবাহিত হইল এবং তদ্দ্বারা নগরের অবস্থা আরও দশগুণ শোচনীয় হইয়া উঠিল।

[সাত]

But as Cædmon could neither sing nor play, he used to slip away from the feast, ashamed, when the merriment began. On one of these occasions he had, as usual, left the hall, and went to the cattleshed. He lay down amid the friendly beasts, porbably sad and lonely at heart because, as he thought, he had no music in his soul. He fell asleep, and as he slept he dreamt that someone stood by him and said : 'Cædmon, sing to me.' Cædmon replied : 'I cannot sing, that is why I left the feast.' 'Nevertheless, you must sing to me' was the answer. 'What is it that I must sing ?' said Cædmon. 'About the beginning of creation'—was the reply.

গান গাহিতে কিংবা বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে অসমর্থ ছিলেন বলিয়া, ভোজের উৎসবে যখন আনন্দস্ফূর্তি আরম্ভ হইত, ক্যাডমন তখন সলজ্জভাবেই সে স্থান হইতে

পলায়ন করিতেন। একবার এইরূপ একটি উৎসবের সময়ে তিনি পূর্বের মতোই ভোজগৃহ পরিত্যাগ করিয়া গবাদি পশুর একটি আবাসগৃহে প্রবেশ করিলেন। বন্ধুত্বভাবাপন্ন পশুদলের মধ্যে তিনি বসিয়া পড়িলেন। সেই সময় সম্ভবত তিনি আপন হৃদয়মধ্যে বেদনা ও নিঃসংগতা অনুভব করিতেছিলেন। কেননা, তিনি মনে ভাবিতেছিলেন, তাঁহার আত্মার রাজ্যে সংগীতের কোনো অনুভূতি নাই। তিনি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যে, কে যেন তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন : 'ক্যাড্‌মন, সংগীত উচ্চারণ কর।' উত্তরে ক্যাড্‌মন বলিলেন, 'গান গাহিতে অসমর্থ বলিয়াই আমি উৎসবগৃহ পরিত্যাগ করিয়াছি।' প্রত্যুত্তর আসিল, 'তথাপি তোমাকে গান করিতে হইবে।' তখন ক্যাড্‌মন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন্ বিষয়ে আমি গান করিব?' প্রত্যুত্তর আসিল, 'সৃষ্টির প্রারম্ভবিষয়েই সংগীত রচনা কর।'

[আট]

When a country turns from being largely agricultural to largely industrial, there is apt to be a great deal of upset, for individuals and for whole class of people. Workers no longer made things in their own homes, or small workshops, but were brought together into one large building called a mill or factory. These buildings were first put up on the banks of streams, where water-power could be got ; but with the coming of steam-power it was more convenient to mass them into towns. Big new towns, therefore, grew up, without proper precautions for looking after the health of the workers. These workers, often women and children, were too often badly underpaid and treated worse than slaves. However, since the twenties of the last century many kind-hearted men and women worked to improve these conditions and the workers themselves joined in 'Trade Unions' to better their lot.

যখন কোনো দেশ কৃষিপ্রধান অবস্থা হইতে অত্যধিক পরিমাণে শিল্পকেন্দ্রিক হইয়া উঠে, তখন ব্যষ্টিজীবনে ও সমষ্টিজীবনে একটা বড়ো রকমের বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়। শ্রমিকদল তখন আর তাহাদের ঘরবাড়ীতে কিংবা ছোট ছোট কারখানায়

পণ্য প্রস্তুত করে না—কলে অথবা কারখানা নামে অভিহিত একটি বৃহৎ ভবনে তাহাদিগকে আনিয়া সমবেত করা হয়। জলশক্তি পাওয়া যাইতে পারে, এই রকম স্রোতস্বিনীর তীরেই এই বৃহৎ ভবনগুলি প্রথমে স্থাপিত হইত। কিন্তু বাষ্পশক্তি আবিষ্কৃত হইলে ইহাদিগকে শহর-এলাকায় সন্নিবিষ্ট করাই অধিকতর সুবিধাজনক মনে হইল। সুতরাং শ্রমিকগণের স্বাস্থ্যরক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই নূতন নূতন বড়ো শহর গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই শ্রমিকবৃন্দকে—বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে—প্রায়ই খুব অল্প বেতন দেওয়া হইত, এবং তাহাদের প্রতি ক্রীতদাসের চেয়েও খারাপ ব্যবহার করা হইত। যাহা হোক, গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে বহু সহৃদয় নরনারী ইহাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে কাজ করিতে লাগিলেন, এবং শ্রমিকদলও নিজেদের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য 'শ্রমিকসংঘ'-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিল।

[নয়]

When the daylight was fading and the evening-breeze stirred the great trees of the forest, Gautama seated himself and preached his first sermon. As the words flowed from his lips a thrill of joy ran through all Nature—the flowers gave forth their sweetest scents, rivers murmured soft music, the stars shone with unusual brightness and there was a rushing sound in the air as the Devas came in thousands to hear the message of salvation. And the five disciples of Gautama bowed themselves before him and acknowledged him to be the Holy one—the Buddha. Long did the great teacher continue speaking in the stillness of that Indian night, and the words he uttered have ever since been treasured up in the hearts of those whom he has led into the way of peace.

দিনের আলো যখন নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল, যখন দিনশেষের বাতাস বনভূমির বিশাল বৃক্ষগুলিকে আন্দোলিত করিতেছিল, তখন গৌতম সমাসীন হইয়া তাঁহার প্রথম ধর্মোপদেশ প্রচার করিলেন। তাঁহার মুখ হইতে যখন বাণী নিঃসৃত হইতেছিল, তখন সমস্ত প্রকৃতির মধ্য দিয়া একটি আনন্দশিহরণ খেলিয়া গেল—পুষ্পদল মধুরতম সৌরভ বিকীর্ণ করিল, নদীমালা মৃদু সংগীত উচ্চারণ করিল, নক্ষত্ররাজি অসাধারণ

দীপ্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল, এবং মুক্তির বাণী শ্রবণ করিবার জন্য দেবতারা হাজারে হাজারে উপস্থিত হইতে থাকিলে বায়ুমণ্ডলে একটা প্রবল শব্দ ধ্বনিত হইল। গৌতমের পাঁচজন শিষ্য তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইয়া তাঁহাকে 'শুদ্ধ বুদ্ধ' বলিয়া স্বীকৃতি জানাইলেন। সেই ভারতীয় নিশীথিনীর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে মহান আচার্যের মুখ হইতে বহুক্ষণ ধরিয়া বাণী নির্গলিত হইল। যাহাদিগকে তিনি শান্তির পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাহাদের অন্তরে তাঁহার উচ্চারিত সেই বাণী তখন হইতে চিরন্তন কালের জন্য সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে।

[দশ]

Burmese places of worship are called pagodas. All over the country there are thousands of them, some new, some in ruins, and some gradually falling down. As soon as a Burman makes money and becomes rich he builds a pagoda ; but no one ever seems to think of repairing the old ones. Burmese girls have their ears bored. It is an important ceremony, though painful to the girls. Music is played while the ears are being pierced, in order to drown the girl's screams. Day after day the holes are made bigger and bigger by putting in them thicker and thicker reeds. When they are large enough, a tube of an inch long and three-quarters of an inch wide is put in them.

ব্রহ্মদেশীয় পূজামন্দিরগুলি 'প্যাগোডা' নামে পরিচিত। সমগ্র দেশের মধ্যে এগুলি হাজারে হাজারে বিদ্যমান—ইহাদের কতকগুলি নূতন, কতকগুলি ভগ্নজীর্ণ, এবং কতকগুলি পতনোন্মুখ। যখন কোনো বর্মী অর্থসঞ্চয় করিয়া বিত্তশালী হইয়া উঠে তখনই সে প্যাগোডা নির্মাণ করে। কিন্তু পুরাতন প্যাগোডাগুলির সংস্কারসাধনের কথা কাহারো মনে উদিত হয় না। বর্মী মেয়েরা কর্ণ বিদ্ধ করিয়া থাকে। যদিও মেয়েদের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক, তবু ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব-অনুষ্ঠান। মেয়েদের যন্ত্রণাসূচক কণ্ঠস্বর চাপা দিবার জন্য কর্ণবেধ করিবার সময়ে গীতবাদ্য ধ্বনিত হয়। দিনের পর দিন কর্ণের বিদ্ধস্থানে স্থূল হইতে স্থূলতর শর গুঁজিয়া দিয়া রন্ধ্রগুলিকে ক্রমশই বড়ো করা হয়। ঐগুলি যখন বেশ বড়ো হইয়া উঠে তখন লম্বায় এক ইঞ্চি ও প্রস্থে তিন-চতুর্থাংশ ইঞ্চি একটি নল উহাদের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়।

ইণ্টার বাংলার প্রশ্নপত্র হইতে সংকলিত

[এক]

In almost every village, disputes are settled by the 'panchayet' or court of arbitration. Without involving themselves in any serious costs the village folk have settled disputes of all kinds for centuries at these courts. There are two kinds of 'panchayets'. One relates to social and caste-affairs, in which men of a particular caste only participate. The other court of arbitration is the village 'panchayet,' and consists of five members only. The members of this court are elected by the villagers themselves, and they may belong to any class save the lowest order. They receive no payment whatever from the villagers. They are generally men of position who enjoy the confidence of the village people. The 'panchayets' decide suits of all kinds, such as land-disputes, petty quarrels, divorce, division of property, debts, and disputes over payment.

প্রায় প্রতিটি পল্লীগ্রামেই পঞ্চায়েৎ বা সালিশী-আদালত দ্বারা বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। গ্রামবাসীগণ নিজেদের কোনো গুরুতর খরচপত্রের মধ্যে না জড়াইয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই সমস্ত আদালতে বিরোধের মীমাংসা করিয়া লইয়াছে। পঞ্চায়েৎ দুই শ্রেণীর—একটি সামাজিক ও বিভিন্ন বর্ণের [জাতি বা শ্রেণীর] কার্যসম্পর্কিত—ইহাতে একটি বিশেষ বর্ণের লোকেরা অংশ গ্রহণ করে। অপর সালিশী-আদালত হইতেছে পল্লীপঞ্চায়েৎ, ইহা কেবলমাত্র পাঁচজন সদস্য লইয়া গঠিত। এই আদালতের সদস্যগণ পল্লাবাসীদের দ্বারাই নির্বাচিত, এবং সমাজের নিম্নতম শ্রেণী ছাড়া অন্য যে-কোনো শ্রেণীর লোক ইহার সভ্য হইতে পারেন। ইঁহারা গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কোনো প্রকারের অর্থ গ্রহণ করেন না। সাধারণত ইঁহারা গ্রামবাসীদের আস্থাভাজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। জমিজমা-সম্পর্কিত বিবাদ, ছোটখাট কলহ, বিবাহবিচ্ছেদ, সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা, ধারকর্জ, লেনদেন-সম্পর্কিত বিরোধ—সমস্ত রকমের মামলা-মোকদ্দমাই এই পঞ্চায়েৎ নিষ্পত্তি করিয়া থাকে।

[দুই]

If we would profit by our reading, we must be careful not only to select proper books but also to peruse them aright. The same book will affect its readers differently according to the purpose with which they read it. The butterfly flits over the flower-bed, gathering nothing ; the spider collects poison from it ; but the bee finds and stores up honey ; and so the object for which you go to a book will determine the kind of fruit it will yield you. The child takes off the lid of a tea-kettle for sport, the house-wife for use—but James Watt for science, which resulted in the improvement of the steam-engine.

অধ্যয়নের দ্বারা যদি আমরা লাভবান হইতে চাহি, তাহা হইলে কেবল গ্রন্থনির্বাচন-বিষয়ে অবহিত হইলে চলিবে না, যথাযথ অধ্যয়ন সম্পর্কেও আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে। পাঠক যে-উদ্দেশ্য লইয়া পাঠ করে, তদনুসারে একই গ্রন্থ তাহাদের উপর ভিন্নতর প্রভাব বিস্তার করে। প্রজাপতি পুষ্পস্তবকের উপর উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু কিছুই আহরণ করে না ; মাকড়সা ইহা হইতে বিষ সংগ্রহ করে—কিন্তু মৌমাছি মধু-র সন্ধান পায় এবং তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখে। সুতরাং অধ্যয়নের উদ্দেশ্য দ্বারাই তোমার অধ্যয়নের ফলসিদ্ধি নির্ধারিত হইবে। শিশু কেত্‌লীর ঢাক্‌না উন্মোচন করে খেলার উদ্দেশ্যে, গৃহকর্ত্রী ঐরূপ করেন প্রয়োজনবশত, কিন্তু জেমস্‌ ওয়াট্‌ করিয়াছিলেন বিজ্ঞানচর্চার জন্য, এবং তাহারই ফলে বাষ্পচালিত যন্ত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

[তিন]

The great bulk of our town-dwellers are poor—terribly poor. They live huddled together in dismal, dark and smelly slums, sleeping four and five or even ten in a small dark smoky room, eating of the barest, their children denied education beyond what are called 'the three R's,' which once they leave school, they soon forget. The lot of our common people is dreadful. The workers in the mills and factories of our towns, whom we—because we live in towns—are accustomed to think of as the poorest people, earn anything from fifteen to fifty rupees a month

with which to maintain a whole family. But the worker's wage is almost princely compared with the earnings of those crores and crores of our countrymen who live in villages and cultivate the land, producing food for us to eat and the cotton from which is made the cloth we wear.

আমাদের শহরবাসীদের অধিকাংশই গরীব—ভয়ানক রকমের গরীব। নিরানন্দ, অন্ধকার, পূতিগন্ধময় কদর্য বস্তিতে তাহারা একত্রে ঠাসাঠাসিভাবে বাস করে। আলোকবর্জিত, ধূমাচ্ছন্ন ছোট ছোট কামরায় চার-পাঁচজন, এমন কি, দশজন পর্যন্ত নিদ্রা যায় এবং তাহারা যৎসামান্য আহার করে। যাহাকে ইংরজীতে বলা হয় 'দি থ্রি আর্-স্' অর্থাৎ সামান্য কিছু লেখাপড়া ও অংক—তাহাদের ছেলেমেয়েরা তাহার অধিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত—তাহাও আবার বিদ্যালয়পরিত্যাগের সংগে সংগে তাহারা অচিরাৎ ভুলিয়া যায়। আমাদের সাধারণ লোকদের ভাগ্য ভয়াবহ। শহরে বাস করি বলিয়া, শহরের কলকারখানার যে-সকল শ্রমিককে আমরা দরিদ্রতম লোক বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত, তাহারা মাসে পনর হইতে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত রোজগার করে, এবং ইহার সহায়তায় তাহারা গোটা পরিবার প্রতিপালন করে। কিন্তু আমাদের দেশের অসংখ্য অগণিত লোক, যাহারা পল্লীগ্রামে বসবাস করিয়া চাষ-আবাদ করে, আমাদের আহারের জন্য খাদ্য ও পরিধেয় বস্ত্রের জন্য তুলা উৎপাদন করে, তাহাদের আয়ের তুলনায় মজুরদিগের রোজগার অনেকটা রাজোচিতই, বলিতে হইবে।

[চার]

The crowning glory of the reign of Shahjahan is the Taj Mahal at Agra. It is looked upon as one of the seven wonders of the world. Everyone who has looked at it, whether in day-time or on a moonlit night when its beauty is enhanced, has marvelled at it. One cannot but be struck with the vision of the man who conceived it, the taste of the man who provided the material and the skill of the workmen who built it. It combines delicacy with beauty, grandeur with nobility, and its white marble, its fine domes and minarets, its screen and inlay work,—all fill one with wonder. It moves the heart, delights the eye, stirs up the imagination, and fills the soul with peace.

আগ্রার তাজমহল শাজাহানের রাজত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ইহা পৃথিবীর সপ্ত-আশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্য বস্তু বলিয়া পরিগণিত হয়। দিবাভাগেই হোক, অথবা জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে যখন ইহার শোভাসৌন্দর্য বর্ধিত হয়, তখনই হোক, যে-কেহ ইহার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াছে, সে-ই অভিভূত হইয়াছে। যে-মানুষটি ইহার পরিকল্পনা করিয়াছে তাহার স্বপ্নদৃষ্টি, যে-যে মানুষ ইহার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে, তাহাদের রুচিবোধ, এবং যে-সকল শ্রমিক ইহা নির্মাণ করিয়াছে, তাহাদের দক্ষতায় কেহ বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। ইহা সৌন্দর্যের সহিত সূক্ষ্ম সৌকুমার্যের, মহত্ত্বের সহিত ঐশ্বর্য-উদাত্ততার সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছে, এবং ইহার শ্বেতমর্মর, ইহার সুদৃশ্য গম্বুজ ও মিনার, জাফ্‌রি ও খোদাই-কারুকার্য—সমস্তকিছু মানুষের মনকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া তোলে। ইহা চিত্তকে আন্দোলিত করে, চক্ষুকে আনন্দ দেয়, কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে এবং অন্তরাত্মাকে প্রশান্তিতে ভরিয়া তোলে।

[পাঁচ]

Descending from the tree I hastily collected what remained of my provisions and set off as fast as I could towards it. As I drew near, it seemed to me to be a white ball of immense size and height, and when I could touch it, I found it marvellously smooth and soft. As it was impossible to climb it—for it presented no foothold—I walked round about it. I counted that it was at best fifty paces round. By this time the sun was near setting, but quite suddenly it fell dark, something like a black cloud came swiftly over me, and I saw with amazement that it was a bird of extraordinary size which was hovering near.

বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া আমার সঞ্চিত খাদ্যের যাহা অবশিষ্ট ছিল, সত্বর সংগ্রহ করিলাম এবং যথাসাধ্য দ্রুত গতিতে বস্তুটির দিকে ধাবিত হইলাম। নিকটে পৌঁছিলে ইহাকে একটি বৃহদায়তন সুউন্নত বর্তুল বলিয়া মনে হইল। যখন স্পর্শ করিলাম, দেখিলাম, ইহা আশ্চর্য রকমের মসৃণ ও কোমল। ইহার গায়ে পা রাখিবার কোনো সুযোগ না থাকায়, ইহাতে আরোহণ করা সম্ভব নয় বুঝিতে পারিয়া, ইহাকে পরিক্রমণ করিলাম। গণনা করিয়া দেখিলাম, ইহার পরিধি অন্ততঃপক্ষে পঞ্চাশ পদক্ষেপের কম হইবে না। ইতোমধ্যে সূর্য অস্তগমনোন্মুখ হইয়া আসিতেছিল, অকস্মাৎ চারিদিক অন্ধকারসমাচ্ছন্ন হইল, কালো মেঘের মতো কী একটা বস্তু অতিক্রত আমার উপর

আসিয়া পড়িল। আমি পরম বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলাম, একটা অসামান্য আয়তনের পাখী নিকটে উড়িয়া বেড়াইতেছে।

[ছয়]

William Tell was instantly seized and taken before the Governor who determined to take cruel revenge. Turning to the captive, he said, 'I have heard that you are a famous archer, you can prove your skill.' Placing an apple upon the head of Tell's little son, he ordered the father to shoot the apple. Tell turned pale with fear, but the lad himself called out, 'Shoot, father! I am not afraid, for I know you will not miss.' The child's brave words gave Tell confidence. He took an arrow, fitted it to his bow, carefull raised his bow, and shot, and the arrow, flying straight and true to its mark, cut the apple into two.

উইলিয়ম টেল অবিলম্বে ধৃত হইলেন, এবং নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাগ্রহণে দৃঢ়সংকল্প শাসনকর্তার সম্মুখে তাঁহাকে হাজির করা হইল। বন্দীর দিকে ফিরিয়া তিনি [শাসনকর্তা] বলিলেন: 'আমি শুনিয়াছি, তুমি একজন বিখ্যাত তীরন্দাজ,—এখন তুমি তোমার নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতে পার।' টেলের ছোটছেলের মস্তকোপরি একটি আপেল স্থাপন করিয়া উহাকে তীরবিদ্ধ করিবার জন্য তিনি [উইলিয়ম টেলকে] আদেশ করিলেন। ভয়ে টেলের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু বালকটি উচ্চৈঃস্বরে বলিল: 'পিতা, আপনি তীর নিক্ষেপ করুন, আমি ভয় পাইতেছি না—কারণ, আমি জানি, আপনি ব্যর্থ হইবেন না।' বালকের সাহসিকতাপূর্ণ বাণী টেলকে আশ্বস্ত করিল। ধনুকে একটি শর সংযোজিত করিয়া, অতি সতর্কতার সংগে ধনুকটি উঠাইয়া লইয়া তিনি তীর নিক্ষেপ করিলেন, এবং তীরটি সোজাসুজি ইহার যথার্থ লক্ষ্যস্থলে ধাবিত হইয়া আপেলটি দ্বিখণ্ডিত করিল।

[সাত]

When Mahatma Gandhi became a world-figure, Rabindranath Tagore spoke of him in the following words: 'The secret of Gandhi's success lies in his dynamic spiritual strength and

incessant self-sacrifice. He covets no power, no position, no wealth, no name and no fame. Offer him the throne of all India, he will refuse to sit on it, but will sell the jewels and distribute the money among the needy. He is a liberated soul. If Gandhi was strangled, I am sure he would not cry. He may laugh at his strangler ; and if he has to die, he will die smiling. His simplicity of life is childlike, his adherence to truth unflinching, his love for mankind is positive and aggressive.'

মহাত্মা গান্ধী যখন বিশ্ববিশ্রুত হইয়া উঠিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি বলিয়াছিলেন : গান্ধীজীর কৃতকার্যতার গোপন রহস্য নিহিত রহিয়াছে তাঁহার সক্রিয় আধ্যাত্মিক শক্তি ও অবিরল আত্মোৎসর্জনের মধ্যে। কোনো রকমের ক্ষমতা, পদগৌরব, বিত্ত-ঐশ্বর্য, নাম-যশ কিছুর জন্যই তাঁহার লিপ্সা নাই। নিখিল ভারতবর্ষের রাজসিংহাসন তাঁহাকে দান করা হোক, উহাতে উপবেশন করিতে তিনি স্বীকৃত হইবেন না ; উপরন্তু উহার মণিরত্ন বিক্রয় করিয়া দিয়া লব্ধ অর্থ বিতরণ করিবেন দারিদ্র্যগ্রস্ত জনগণের মধ্যে। তিনি একজন মুক্ত-আত্মা মানব। একথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে, কণ্ঠরোধ করিয়া তাঁহাকে যদি হত্যা করা হয়, তথাপি তিনি একটি শব্দ উচ্চারণ করিবেন না ; তিনি তাঁহার শ্বাসরোধকারীর দিকে তাকাইয়া উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করিবেন, এবং তাঁহাকে যদি মরিতে হয় তাহা হইলে তিনি হাসিমুখেই মৃত্যুবরণ করিবেন। তাঁহার জীবনের সরলতা শিশুসুলভ, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা অদম্য—তাঁহার মানবপ্রীতি ধ্রুব ও আত্মপ্রসারণশীল।

[আট]

The inmates of the house get up very early in the morning. The male members of the family go for their morning ablutions, and while they are away the female members sprinkle cow-dung over the outer and inner yards, and occupy themselves in sweeping the house, and cleaning the cooking and eating vessels. In their turn they then march to the watering places, where they bathe themselves, and wash their clothes, and bring water for family use. When they have returned from the tank or river or well, they attend to the work of feeding the men and preparing

for noon tide meal. About eight o'clock in the morning the farmer and his brothers come in for their morning meal, which is generally some cold rice and some pickle or chutney.

গৃহের বাসিন্দারা অতি প্রত্যুষে উঠে, পরিবারের পুরুষলোকেরা তাহাদের প্রাতঃস্নানাদির জন্য গমন করে। তাহাদের অনুপস্থিতির অবকাশে স্ত্রীলোকেরা বাহির ও ভিতরের আঙিনায় গোবরজল ছিটাইয়া দেয়, এবং ঘর ঝাঁট দিবার কাজ ও রান্নার এবং খাইবার বাসনপত্রাদি মাজিবার কাজে আত্মনিয়োগ করে। অতঃপর যথাসময়ে তাহারা পুকুরাদিতে যায়, সেখানে তাহারা স্নান করে, কাপড়চোপড় কাচে. এবং গৃহে ব্যবহারের জন্য জল লইয়া আসে। পুষ্করিণী, নদী অথবা কুয়া হইতে ফিরিবার পর তাহারা পুরুষগণকে খাওয়ানো এবং দুপুরবেলার আহার্যপ্রস্তুতির কাজে মনঃসংযোগ করে। সকালে প্রায় আটটার সময় কৃষক ও তাহার ভ্রাতৃগণ প্রাতঃকালীন আহারের জন্য আসে, এবং সেই আহার্যসামগ্রী হইতেছে সাধারণত কিছু ঠাণ্ডা ভাত এবং কিছু আচার বা কাসুন্দি অথবা কিছু চাটনী।

[নয়]

The problem of keeping people healthy is usually considered from two aspects : how the individual can keep healthy, and how the community keep healthy. It may be healthy for the individual to drink plenty of water, but in a town at least it is the duty of the rulers to provide pure water. The individual can keep himself fit and try to avoid getting dangerous germs into his system ; but the rulers should see that there are not too many dangerous germs about. The citizens should eat only good food ; the rulers should see that bad food is not allowed to be sold. And so on with every problem.

জনসাধারণকে সুস্থসবল রাখিবার সমস্যাটি সাধারণত দুইটি দিক হইতে বিবেচিত হইয়া থাকে—কিরূপে ব্যক্তিমানুষ স্বাস্থ্যবান থাকিতে পারে এবং কিরূপে সমষ্টিমানুষ [গোটা সমাজ] স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। প্রচুর পরিমাণে জলপান করা ব্যক্তির পক্ষে স্বাস্থ্যবিধায়ক হইতে পারে, কিন্তু অন্তত শহর-এলাকায় বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করা কর্তৃপক্ষের কর্তব্য। ব্যক্তিমানুষ নিজেকে সবলসুস্থ রাখিতে পারে এবং দেহের অভ্যন্তরে যাহাতে কোনো মারাত্মক জীবাণু প্রবেশ করিতে না পারে, সে বিষয়েও

সচেষ্ট থাকিতে পারে ; কিন্তু কর্তৃপক্ষকে দেখিতে হইবে, চারিদিকে মারাত্মক জীবাণু যেন অত্যধিক আত্মপ্রকাশ না করে। নাগরিকগণের কর্তব্য হইতেছে উত্তম খাদ্য গ্রহণ করা, কিন্তু শাসকবর্গকে সতর্ক থাকিতে হইবে যে, কোনরূপ দূষিত খাদ্য যেন বিক্রীত না হয়। প্রতিটি সমস্যা সম্পর্কেই এই একই কথা প্রযোজ্য।

[দশ]

The advances in the science of nutrition within recent years have been comparable in importance to the earlier discoveries in bacteriology which opened the way to control many deadly or handicapping diseases. Chemistry and Physiology have given us a vast account of new knowledge regarding the relation of food to human well-being. We know that certain diseases, which affect immense numbers of people are caused solely by failure to get the right kind of food. We know what foods the human body needs not only to prevent diseases but to build resistance to many others, lengthen the span of life, favour the birth of healthy children, and raise the power of many individuals to do physical and mental work formerly thought to be beyond their innate capacity.

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে পুষ্টিবিজ্ঞানের যে-উন্নতিসাধন হইয়াছে, গুরুত্বের দিক দিয়া তাহা জীবাণুতত্ত্ব-সম্পর্কিত প্রথম দিকের আবিষ্কারগুলির সহিত তুলনীয়। জীবাণুতত্ত্ব-বিষয়ক এই আবিষ্কারের ফলে বহু মারাত্মক ও দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিদমনের পথ খুলিয়া গিয়াছিল। রসায়নবিদ্যা ও শারীর বিজ্ঞান হইতে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সহিত খাদ্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা প্রভূত নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমরা জানি, এমন কতকগুলি ব্যাধি আছে যাহা বহু লোককে আক্রমণ করে—উপযুক্ত খাদ্যের অভাববশতই এইগুলির উদ্ভব হইয়া থাকে। কেবল রোগনিবারণের জন্য নয়, আরো বহুপ্রকার ব্যাধির প্রতিরোধক শক্তি জন্মাইবার জন্য, দীর্ঘজীবন লাভ করিবার জন্য, সুস্থসবল শিশুর আবির্ভাবকে সহায়তা করিবার জন্য, এবং পূর্বে যে-কায়িক ও মানসিক শ্রমসাধ্য কার্য অনেকেরই স্বাভাবিক শক্তির অতীত বলিয়া মনে হইত, উহা সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাহাদের ক্ষমতা বাড়াইয়া তুলিবার জন্য মানুষের দেহের পক্ষে কীরূপ খাদ্যের প্রয়োজন, তাহাও আমরা জানিতে পারিয়াছি।

অনুশীলনী

—ইণ্টার বাংলা পরীক্ষার্থীর জন্য—

[১]

While Scott was merely telling stories, and Wordsworth reforming poetry or upholding the moral law, and Shelley advocating impossible reforms and Byron voicing his own egoism and the political discontent of the times, Keats lived apart from men and from all political measures, worshipping beauty like a devotee, perfectly content to write what was in his own heart, or to reflect some splendour of the natural world as he saw or dreamed it to be. He had, moreover, the novel idea that poetry exists for its own sake, and suffers loss by being devoted to philosophy or politics or, indeed, to any cause, however, great or small.

[২]

All the great religious teachers of mankind have insisted on this : that men ought not to live for themselves alone. We ought not, they have said, to spend all our time and energy in getting just what we want for ourselves, power and money and importance in the world : we ought to serve something greater than ourselves, whether a god or a cause or our fellowmen. It is by serving this something greater that men will forget themselves and so achieve happiness. This or something like it is what the great religions have taught, and it is one of the most important of the things that civilization means. It is also the hardest to learn and practise ; in fact most people have found it much too hard.

[৩]

Only a prisoner who has been confined for long behind high walls can appreciate the extraordinary charm of the occasional

outside walks and open views afforded to him. I loved these outings, and I did not give them up even during the monsoon, when the rain came down for days in torrents and I had to walk in ankle-deep water. I would have welcomed the outing in any place, but the sight of the towering Himalayas near by was an added joy which went a long way to removing the weariness of prison. It was my good fortune that during the long period when I had no interviews, and when for many months I was quite alone, I could gaze at those mountains that I loved. I could not see the mountain from my cell, but my mind was full of them and I was ever conscious of their nearness, and a secret intimacy seemed to grow between us.

[8]

To-morrow, as yesterday, the fittest will survive in the struggle for existence. But whereas in the past selfishness was the measure of fitness, in the future survival value will be determined by breadth and depth of love. Modern science is teaching, as it never was taught before, that no one lives to himself alone. Co-operation between individuals, and then between families, was essential to the life of man when he competed with the brutes of fields and forests. Still greater co-operation between clans and nations is now essential to his continued life on the earth. Now, as always, individuals and peoples who are not in line with the great forward movements in the evolutionary trend are doomed to die.

[৫]

It is useful to know that in India we have all those elements which make for a high-grade civilization. The economic life of the people in the fields of industry and agriculture is capable of development. The political elements of civilization

are all here. Nor are the moral elements lacking. The ideal of marriage is very high, the relations between man and woman are well regulated, the standard of morality that is aimed at is elevating, and there is a deep religious feeling everywhere. The love of letters and science and the devotion to art have always distinguished our country. All these things fill us with hope for the future as they fill us with pride in the past.

[৬]

The story of our world is a story that is still very imperfectly known. A couple of hundred years ago men possessed the history of little more than the last 3000 years. What had happened before that time was a matter of legend and speculation. Over a large part of the civilized world it was believed and taught that the world had been created suddenly in 4004 B. C., though the authorities differed as to whether this had occurred in the spring or autumn of that year. This fantastically precise misconception was based upon a too literal interpretation of the Hebrew Bible, and upon rather arbitrary theological assumptions connected therewith.

[৭]

The Balinese have the same hereditary idea of caste system as the Hindus have in India. They show the same reverence to their versions of the Mahabharat. They perform all the ceremonies and sacraments as of old. Their mode of dress is perhaps the same as was prevalent in the time of Mahabharat. Their concepton of heaven and hell is based on the doctrine of Karma. Their attitude regarding the life beyond death is inspired by the teachings of the Upanishads. The poorest Padauda or priest still receives the homage of the richest prince.

[৮]

In nearly all large towns, and especially in the capital cities of civilized nations, there are collections of statues, pictures and books. Even in the streets we see the forms of men and women, wrought in marble or cast in bronze, placed high upon pedestals to meet the gaze of every one who may pass by them. In nearly every house there are pictures upon the walls, and vases or other ornaments arranged upon shelves and books lying on the table. The mere existence of these objects shows us that Art is an element in the life of civilized man.

[৯]

Extreme sufferings are evidenced among the cultivators, labourers, and general middle-class people of this country as a result of the excessive rise in the price of cloth. This complicated situation is a direct outcome of the fall in the supply of cloth in various ways in the country and also of the readiness of the cloth-merchants of the country who took advantage of the situation in demanding higher prices for the cloth. The Government have been approached for a long time to relieve the countrymen in general by taking timely and effective measures to counteract the situation, but so long the Government paid no heed to the matter.

[১০]

I have faith in my country and specially in the youth of my country. The youth of Bengal have the greatest of all tasks that have ever been placed on the shoulders of young men. I have travelled for the last ten years or so over the whole of India and my conviction is that from this youth of Bengal will come those that will march from one corner of the earth to the other preaching and teaching the eternal spiritual truths of our

forefathers ; from them will come the power that will raise India once more to her proper place. Be not afraid of anything. It is fear that is the cause of our misery and it is fearlessness that brings heaven in a moment.

[১১]

The true gentleman carefully avoids whatever may cause a jar or jolt in the minds of those with whom he associates ; all clashing of opinion or collision of feeling, all restraint or suspicion or gloom or resentment ; his great concern being to make everyone at his ease and at home. He has his eyes on all his company ; he is tender towards the bashful, gentle towards the distant and merciful towards the absured ; he can recollect to whom he is speaking, he guards against unreasonable allusions or topics which may irritate ; he is seldom prominent in conversation, and never wearisome. He makes light of favours while he does them and seems to be receiving when he is conferring. He has no ears for slander or gossip, is unwilling to impute motives to those who interfere with him, and interprets everything for the best.

[১২]

Everything in nature, except man acts as it does because it is its nature so to act. It is therefore, pointless to argue whether it is right to act as it does ; pointless to exhort it to act differently. We do not say of a stone that it ought to go uphill, or blame a tiger for tearing its prey. When, however, we consider a human being, we can say not only 'this is what he is like', but also, 'that is what he ought to be like.' Man, in other words, and man alone, can be judged morally. What is the reason for this distinction between man and nature ? It is to be found in the

fact that man has a sense of right and wrong, so that, whatever he may in fact do, we recognize that he ought to do what is right and eschew what is wrong ; we recognize also that whatever he may in fact do, he is *free* to do what is right and eschew what is wrong. Man is thus set apart from everything else in nature by virtue of the fact that he is a free moral agent.

[১৩]

There are some people who speak slightingly of hobbies as if they were something childish and frivolous. But a man without a hobby is like a ship without a rudder. Life is such a tumultuous and confused affair that most of us get lost in its intricacies and get to the end of the journey without having ever found a path and a sense of direction. But a hobby hits the path at once. It may be ever so trivial a thing but it supplies what the mind needs, a disinterested enthusiasm outside the mere routine of work and play. You cannot tell where it will lead. You may begin with stamps, and find you are thinking in continents. You may collect coins, and find that the history of man is written on them. You may begin with bees, and end with the science of life. Ruskin began with pictures and found they led to economics and everything else. For as every road was said to lead to Rome, so every hobby leads out into the universe, and supplies us with a compass for the adventure of life.

[১৪]

Equality has been proclaimed again and again in history as the necessary foundation of a democratic society. Yet in most senses no one at all supposes that all men are equal. Men differ obviously and profoundly in almost every respect beyond the mere quality of being human beings. They are radically unlike

in strength and physical powers, in mental ability and creative quality, in both capacity and willingness to serve the community, and perhaps most radically of all in power of imagination. Of course, many of the existing inequalities between men are themselves the outcome of inequality—in early nurture, in educational and cultural opportunity, and in sheer provision for physical needs.

[১৫]

The family, like the house in which we live, needs to be kept in repair, lest some little rift in the walls should appear and let in the wind and rain. The happiness of a family depends very much on attention to little things. Order, comfort, regularity, cheerfulness, good taste, pleasant conversation—these are the ornaments of daily life, deprived of which it degenerates into a wearisome routine. There must be light in the dwelling, and brightness and pure spirits and cheerful smile. Home is not usually the place of toil, but the place to which we return, and rest from our labours, in which parents and children meet together and pass a careless and joyful hour. To have nothing to say to others at such times, in any rank of life, is a very unfortunate temper of mind, and may perhaps be regarded as a serious fault; at any rate it makes the house vacant and joyless.

[১৬]

At first astronomy, like other sciences, was studied mainly for utilitarian interests. It provided measures, and enabled mankind to keep a tally on the flight of the seasons; it taught him to find his way across the trackless desert, and later across the trackless ocean. In the guise of astrology, it held out hopes of telling him its future. There was nothing intrinsically absurd in this, for even to-day the astronomer is largely occupied with

telling the future movements of the heavenly bodies, although not of human affairs. Where the astrologers went wrong was in supposing that terrestrial empires, kings and individuals formed such important items in the scheme of the universe that the motion of the heavenly bodies could be intimately bound up with their fates. As soon as man began to realise, even faintly, his own significance in the universe, astrology died a natural and inevitable death.

[১৭]

The first thing that men learned, as soon as they began to study nature carefully, was that some events take place in regular order and that the same causes always give rise to the same effects. The sun always rises on one side and sets on the other side of the sky ; the changes of the moon follow one another in the same order and at similar intervals ; water always flows down-hill ; fire always burns. Thus the notion of an order of nature and of a fixity in the relation of cause and effect between things gradually entered the minds of men. So far as such order prevailed, it was felt the things were explained ; while the things that could not be explained were said to happen by accident.

[১৮

For waging war on the scale and with the intensity demanded in these days the first requirement of economic policy is to make the fullest possible use of the productive resources of the nation, in man-power, equipment and command over materials. This in itself is problem enough, especially in view of the absorption of men into the armed forces, theu navoidable impairment of equipment, and the physical difficulty of keeping up the necessary inflow of materials. It is scarcely less necessary,

however, to ensure that the goods and services produced shall be of the kinds most urgently required. So great are the demands direct, imposed by modern war that little margin is left for producing the ordinary luxuries of peaceful times or for accumulating assets which make for rising level of social welfare.

[১৯]

In village India this is a time of expectancy. Will the monsoon keep its appointment on the normal date ? Will it bring plentiful rain properly spread over the season ? How will rivers behave ? These are questions momentous for the country-side and any one gifted with the eye of imagination can see thirsty fields with the heavens for the answer. The last fortnight before monsoon is a testing time for living creatures. The ploughman goes more slowly to the field, the village artificer prolongs his midday rest taken on the floor of his place of work or under a V-shaped roof of straw. Tanks have dwindled, wells gave water reluctantly, crops look pitifully at their possessors, and there is in village lanes a fiercer glare from the sunshine and a heat that strikes harder, while sounds, even birds' songs seem harshly metallic. It is not the nicest time of the year, but it holds the promise of a season.

[২০]

While India has been spared the material destruction that has befallen many other countries, she has suffered in full measure, and in some directions in greater measures than others, the economic consequences of war. Her industrial equipment has been worked to the very edge of a breakdown and there is a large backlog of maintenance and replacement of her ecocomic consequences of war. Her industrial equipment to be made

good ; more than that the development of her economy and even her reconstruction are being delayed through her inability to obtain the necessary capital equipment owing to destruction and unsatisfied demands in the supplying countries.

—বি. এ. বাংলা পরীক্ষার্থীর জন্য—

[১]

Some countries, like Babylonia and Egypt, are what their rivers make them. India, physically and intellectually, is the creation of her Himalaya. Never was wall of separation more towering, more impassable, raised by nature. Scarcely an opening along the immense extent of this—the most compact and highest range in the world—yields a passage to either the rude winds, or to ruder peoples of the North. Travellers agree that no mountain scenery in the whole world is remotely comparable in splendour and sublimity to what the Himalayas offers in any of its valleys. In addition to the grandeur of the physical surroundings, there are memories and associations which make the Himalayas the greatest mountain in the world.

[২]

The sorrow for the dead is the only sorrow from which we refuse to be divorced. Every other wound we seek to heal, every other affliction to forget ; but this wound we consider it a duty to keep open—this affliction we cherish and brood over in solitude. Where is the mother who would willingly forget the infant that perished like a blossom from her arms, though every recollection is a pang ? Where is the child that would willingly forget the most tender of parents though to remember is but to lament ? Who, even in the hour of agony, would forget the friend over whom he mourns ?

[৩]

Educate, or govern, they are one and the same word. Education does not mean teaching people to know what they do not know. It means teaching them to behave as they do not behave. And the true 'compulsory education' which the people now ask of you is not catechism, but drill. It is not teaching the youth of the country the shapes of letters and the tricks of numbers; and then leaving to turn their arithmetic to roguery, and their literature to lust. It is, on the contrary, training them into the perfect exercise and kingly continence of their bodies and souls. It is a painful, continual, and difficult work; to be done by kindness, by watching, by warning, by precept, and by praise, and above all, by example. Compulsory! Yes, by all means! 'Go ye out into the high-ways and hedges, and *compel* them to come in.' Compulsory! Yes, and gratis also.

[৪]

This city of Calcutta, which offered its shelter to thousands upon thousands of men, had become like a steel trap. He could see no way out. The whole body of people was conspiring to surround and hold him captive—this most insignificant of men, whom no one knew. Nobody had any special grudge against him, yet everybody was his enemy. The crowd passed by, brushing against him; clerks from different offices ate their lunch on the roadside out of plates made of leaves: a tired wayfarer on the *maidan* was lying under the shade of a tree, with one hand beneath his head, and one leg crossed over the other: upcountry women, crowded into hackney carriages, were on their way to the temple; a *chuprassi* came up with a letter and asked him to read the address on the envelope,—so the afternoon went by, till one by one the offices began to close.

Carriages started off in all directions, carrying people back to their homes.

[৫]

If we have to decide which of the two temperaments is nobler—the contemplative or the energetic, there is little question but that the preference must be given to the more vigorous temperament. This I shall prove by three examples, two logical and one zoological. It is open to the strong poet to resign himself to contemplation in his intervals of rest, but it is not so easy for the contemplative poet to jack himself up to a course of continuous energy. If you peep through the bedroom window of the poets who are envied thrice far their blessed serenity, you will find them in the evening of their days, sighing for their unhappy indolence.

[৬]

The chief business of war is to destroy human life, to batter down and burn cities, to turn fruitful fields into deserts, to scourge nations with famine, to multiply widows and orphans. Are these honourable deeds? Grant that a necessity for them may exist, it is a dreadful necessity, such as a good man must recoil from ; and though it may exempt them from guilt, it cannot turn them into glory. We have thought that it was honourable to heal, to mitigate pain, to snatch the sick from the jaws of death. We have placed among the revered benefactors of the human race the discoverers of arts which alleviate human sufferings, which prolong comfort, adorn and cheer human life ; and if these arts be honourable, where is the glory of multiplying and aggravating tortures and death.

[৭]

It is by failures as well as by successes that the true ideal of the man of science is reached. The task allotted to him in life is one of the noblest that can be undertaken. It is his to penetrate into the secrets of Nature, to push back the circumference of darkness that surrounds us, to disclose ever more and more of the limitless beauty, harmonious order and imperious law that extend throughout the universe. And while he thus enlarges our knowledge he shows us also how Nature may be made to minister in an ever-increasing multiplicity of ways to the service of humanity. It is to him and his conquests that the material progress of our race is mainly due. If he were content merely to look back over the realms which he has subdued, he might well indulge in jubilant feelings, for his peaceful victories have done more for the enlightenment and progress of mankind than were ever achieved by the triumphs of war.

[৮]

Addressing a students' meeting, Sri Nehru deprecated the tendency of the students to pass resolutions without taking thought whether those resolutions could be implemented and the manner in which they could be implemented, without taking an integrated view of the problems facing the country. They had also developed the unfortunate habit, he told them, of advising others how to get about their task, but never bothered about acting upon that advice themselves. They never even seem to realise that their primary business was to learn, to prepare themselves for the business of life. And they were a little too fond of shouting and raising slogans, [as if shouting and the raising of slogans would by themselves solve their problems.

[৯]

Emotion is not poetry, but the cause of poetry ; and emotional expression is only poetry when it takes a beautiful form. To exist as poetry, emotion must be translated into music and visual images, clear and beautiful ; they may be terrible or saddening but still beautiful ; for it has been said that the greatest mystery of poetry is its power to invest the saddest things with beauty. When emotion takes an inartistic form, the result is not poetry, but a sort of echo of poetry, sometimes so like the real thing that only a cultivated taste can distinguish between them.

[১০]

We can read such books with another aim—not to throw light on literature, not to become familiar with famous people, but to refresh and exercise our own creative powers. Is there not an open window on the right hand of the book-case ? How delightful to stop reading and look-out ! How stimulating the scene is, in its unconsciousness, its irrelevance, its perpetual movement—the colts galloping round the field, the woman filling her pail at the well, the donkey throwing back his head and emitting his long, acrid moan. The greater part of any library is nothing but the record of such fleeting moments in the lives of men, women and donkeys.

[১১]

The opposition to science in the past was by no means surprising. Men of science affirmed things that were contrary to what everybody had believed ; they upset preconceived ideas and were thought to be destitute of reverence. It was only the power over natural forces conferred by science that led bit by bit to a toleration of scientists, and even this was a very slow process, because their powers were at first attributed to magic.

It would not be surprising if, in the peresent day a powerful anti-scientific movement were to arise as a result of the dangers to human life that are threatened by atom bombs and from bacteriological warfare. But whatever people may feel about these horrors, they dare not turn against the men of science so long as war is at all probable, because if one side were equipped with scientists and the other not, the scientific side would almost certainly win.

[১২]

A blind reverence for the past is bad and so also is a contempt for it, for no future can be founded on either of these. The present and the future inevitably grow out of the past and bear its stamp, and to forget this is to build without foundations and to cut off the roots of national growth. It is to ignore one of the most powerful forces that influence people. Nationalism is essentially a group memory of past achievements, traditions and experiences, and nationalism is stronger to-day than it has ever been. Many people thought that nationalism had its day and must inevitably give place to the evergrowing international tendencies of the modern world. Socialism with its proletarian background derided national culture as something tied up with a decaying middle class.

[১৩]

There are certain elements of mental outlook and character which participation in large mechanised industries is calculated to promote, such as alterness, application, decision and resourcefulness. Agriculture, to the extent that it depends so largely on the forces of nature, tends to produce a passive outlook and the long periods of seasonal unemployment incidental to it create an

attitude of general lethargy. There are undoubtedly valuable traits of character which an agricultural environment helps to produce and much of what is often described as the spiritual heritage of our people is to be traced to the agricultural environment in which we live and work. But in the workaday world in which we are placed, this needs to be supplemented and corrected by habits associated more directly with an industrial environment.

[১৪]

Even in peace time the State plays an extremely important part in modern idustrial life. By its laws it maintains that security of life and fulfilment of contract without which no business could be undertaken. Most modern states educate their citizens providing free elementary schools and subsidising higher education. Insurance schemes and public assistance preserve the sick, old and unemployed from absolute starvation and thus assist in maintaining markets for goods and keep in existence if not full health and vigour, a reserve of labour. By legislation or by the influence of the scale of wages paid by the State a minimum standard of living is secured for workers. Factory laws, currency regulations, exchange restrictions and many other forms of State interference limit or assist the activities of manufacturers and merchants. In time of war, State intervention is naturally greatly increased.

[১৫]

Since insolvency means a disagreement between assets and liabilities, often leaning heavily on the side of the latter, nothing can be done until the real financial position of the debtor has been accurately gauged. And this cannot be accomplished until a proper financial statement has been prepared. The law

compels the debtor to make a statement of his affairs and his failure to do so renders him liable to be severely dealt with. As soon as possible after the statement of affairs has been drawn up, the creditors are called together and the position of matters is explained to them.

ভাবার্থলেখন, মর্মার্থপ্রকাশন ও ভাবসম্প্রসারণ

[ইন্টার বাংলা প্রশ্নপত্র হইতে সংকলিত]

[১] নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি-দুইটির মধ্যে একটির ভাবার্থ সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত কর :

(ক) দুঃখী বলে,—'বিধি নাই, নাহিক বিধাতা ;
চক্রসম অন্ধ ধরা চলে।'
সুখী বলে,—'কোথা দুঃখ, অদৃষ্ট কোথায় ?
ধরণী নরের পদতলে।'
জ্ঞানী বলে,—'কার্য আছে, কারণ দুর্জ্ঞেয় ;
এ জীবন প্রতীক্ষাকাতর।'
ভক্ত বলে,—'ধরণীর মহারসে সদা
ক্রীড়ামত্ত রসিকশেখর।'
ঋষি বলে,—'ধ্রুব তুমি, বরেণ্য ভূমান্ !'
কবি বলে,—'তুমি শোভাময়।'
গৃহী আমি, জীবযুদ্ধে ডাকি হে কাতরে,—
'দয়াময়, হও হে সদয় !'

মানুষ বহুবিচিত্র, এবং জগৎ ও জগদীশ্বর সম্পর্কে মানুষী ধ্যানধারণাও বিচিত্র। জাগতিক দুঃখকষ্টের পীড়নে যে উৎপীড়িত তার মনে জাগে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয়। আবার, পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী যে, সে ঈশ্বরকে অস্বীকার করে ভাবে ধরিত্রী মনুষ্যপদানত। আবার, জ্ঞানীর নিকট ঈশ্বর দুর্জ্ঞেয়, ভক্তের নিকট তিনি মহাপ্রেমিক, ঋষির নিকট তিনি ধ্রুবপুরুষ। কবির দৃষ্টিতে তিনি পরম-

সুন্দর। আর, সাংসারিক চক্রাবর্তনে আবর্তিত, জীবনরণাঙ্গনের সৈনিক যে গৃহী, তাহার অন্তরের প্রার্থনা দয়াময় ভগবানের অহেতুক অনন্ত করুণার পানে উৎসারিত হয়।

(খ) "একদল লোক আছেন যাঁরা বলেন, 'আর্ট করে কি পেট ভরবে?" এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। ভাষাচর্চার যেমন দুটো দিক্ আছে—একটা আনন্দ ও জ্ঞানের দিক্, আর-একটা অর্থলাভের দিক্, তেমনি শিল্পচর্চারও দুটো দিক্ আছে—একটা আনন্দ দেয়, আর-একটা অর্থ দেয়। এই দুটি ভাগের নাম চারুশিল্প ও কারুশিল্প। চারুশিল্পের চর্চা আমাদের দৈনন্দিন দুঃখদ্বন্দ্বে সংকুচিত মনকে আনন্দলোকে মুক্তি দেয়, আর কারুশিল্প আমাদের নিত্যপ্রয়োজনের জিনিসগুলিতে সৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে কেবল যে আমাদের জীবনযাত্রার পথকে সুন্দর করে তোলে তাই নয়, অর্থাগমের পথ করে দেয়।

শিল্পশিক্ষার অভাব যে শুধু আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রা অসুন্দর করে তুলেছে তাই নয়, আমাদের অতীত যুগের রসস্রষ্টাদের সৃষ্ট সম্পদ থেকেও আমাদের বঞ্চিত করেছে। আমাদের চোখ তৈরী হয়নি, তাই দেশের অতীত গৌরব যে চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য, তা এতদিন আমাদের কাছে অবোধ্য ও অবজ্ঞাত ছিল; বিদেশ থেকে সমঝদার আসবার প্রয়োজন হল সেগুলি আবার আমাদের বুঝিয়ে দিতে।"

শিল্পচর্চার দুটি বিভিন্ন পথ: একটি আনন্দমুক্তির, অপরটি অর্থাগমের। এই দুটি বিভাগের নাম যথাক্রমে চারুশিল্প ও কারুশিল্প।

বর্তমানে যথেষ্ট পরিমাণে শিল্পচর্চার অভাবে আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রাও যেমন কুশ্রীতায় ভরে উঠছে, তেমনই আমরা আমাদের সুমহান শিল্প-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারও হারাতে বসেছি। যথার্থ শিল্পরসবোধের অভাবহেতু আমরা নিজেদের প্রাচীন স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলার মনোমদ নিদর্শনগুলির সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারিনি, এগুলির সত্যমূল্যনির্ধারণে সক্ষম হইনি; এবং ঐতিহ্যগত এ সব শিল্পকৃতির সম্যক্ উপলব্ধির জন্য বৈদেশিক শিল্পরসজ্ঞের মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয়েছিল, একথা জাতির পক্ষে গভীর লজ্জার হলেও, ঐতিহাসিক সত্য। জাতির ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা না থাকলে, এবং বর্তমানে শিল্পশিক্ষার ব্যাপক প্রসার না ঘটলে, আমাদের বিভিন্ন শিল্পসম্পদের শ্রেষ্ঠত্ব অচিরেই লুপ্ত হবে।

[২] নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি-দুইটির মধ্যে একটির ভাবার্থ সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত কর:

(ক) "শত সহস্র বৎসরের মহারণ্য অনায়াসে শ্যামল হয়ে থাকে, যুগযুগান্তরের প্রাচীন হিমালয়ের ললাটে তুষাররত্নমুকুট সহজেই অম্লান হয়ে বিরাজ

করে, কিন্তু মানুষের রাজপ্রাসাদ দেখতে দেখতে জীর্ণ হয়ে যায় এবং লজ্জিত ভগ্নাবশেষ একদিন প্রকৃতির অঞ্চলের মধ্যেই আপনাকে প্রচ্ছন্ন করে ফেলতে চেষ্টা করে। মানুষের আপন জগৎটিও মানুষেয় সেই রাজপ্রাসাদের মতো। চরিদিকে জগৎ নূতন থাকে আর মানুষের জগৎ তার মধ্যে পুরাতন হয়ে পড়তে থাকে। তার কারণ, বৃহৎ জগতের মধ্যে সে আপনার একটি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করে তুলেছে। এই স্বাতন্ত্র্য ক্রমে ক্রমে আপন ঔদ্ধত্যের বেগে চারিদিকের বিরাট প্রকৃতি থেকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতে থাকলেই ক্রমশ বিকৃতিতে পরিপূর্ণ হয়। এমনি করে মানুষই এক চিরনবীন বিশ্বজগতের মধ্যে জরাজীর্ণ হয়ে বাস করে। যে-পৃথিবীর ক্রোড়ে মানুষের জন্ম সেই পৃথিবীর চেয়ে মানুষ প্রাচীন—সে আপনাকে আপনি ঘিরে রাখে বলেই বৃদ্ধ হয়ে উঠে। এই বেষ্টনের মধ্যে তার বহুকালের আবর্জনা সঞ্চিত থাকে—অবশেষে সেই স্তূপের ভিতর থেকে নবীন আলোকে বাহির হয়ে আসা মানুষের পক্ষে প্রাণান্তিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। অসীম জগতে চারিদিকে সমস্তই সহজ, কেবল সেই মানুষই সহজ নয়।"

স্বীয় স্বাতন্ত্র্যগর্ব মানুষকে বিপুল বিশ্বজগতের মধ্যে সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ করে রাখে—সেই সীমিত গণ্ডীর মধ্যেই জন্ম নেয় বিকৃতির কদর্যতা। বিশালব্যাপ্ত নিসর্গপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যের সূত্রে বিধৃত বলেই যুগযুগান্তরের প্রাচীন হিমালয় অথবা আদিমকালের বিশাল মহারণ্য চিরন্তন সজীবতার মহিমায় সমুজ্জ্বল। আর, নিজেদের অহংসৃষ্ট ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে আবদ্ধ বলেই, বহির্লোকের সজীব প্রাণপ্রাচুর্য ও অমেয় যৌবনের থেকে বিচ্ছিন্ন বলেই মানুষের স্বতন্ত্র জগৎটি হয়ে ওঠে জীর্ণতার কূপ। এই জীর্ণতার কূপে সঞ্চিত হয় রাশি রাশি আবর্জনা। সেই পুঞ্জীভূত আবর্জনার স্তূপ থেকে মুক্ত হয়ে বাহির-বিশ্বের সহজ জীবনানন্দে প্রত্যাবর্তন করাই হয়ে পড়ে দুরূহ। তাই বিশ্বের সর্বব্যাপ্ত সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষই হয়ে পড়ে সবচেয়ে জটিল। অহংবোধের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বাত্মীয়তায় উদ্বুদ্ধ হলেই মানুষ চিরনবীন হয়ে উঠবে।

(খ) "সভ্যজগতের এ জ্ঞান জন্মেছে যে, মানুষের মনোজগৎ কেউ আর একহাতে গড়েনি, এর ভিতর নানা যুগের নানা দেশের হাত আছে। সে কারণ, বিদেশি ভাষা ও বিদেশি সাহিত্যের চর্চা ছেড়ে দিলে মানুষকে মনোরাজ্যে একঘরে এবং কুণো হয়ে পড়তে হয়। একমাত্র জাতীয় সাহিত্যের চর্চায় মানুষের মন জাতীয় ভাবের গণ্ডীর মধ্যেই থেকে যায়, এবং এ বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই যে, মনোরাজ্যে কূপমণ্ডুক হওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়—সে কূপের পরিসর যতই প্রশস্ত ও তার গভীরতা যতই অগাধ হোক না কেন। এবং এ কথাও অস্বীকার করবার জো নেই যে, যে-জাতি মনে যতই বড় হোক না কেন তার মনের একটা বিশেষরকম সংকীর্ণতা আছে, এবং

তার মনের ঘরের দেয়াল ভাঙ্‌বার জন্যে বিদেশি মনের ধাক্কা চাই। বিদেশির প্রতি অবজ্ঞা বিদেশি মনের অবজ্ঞা থেকেই জন্মলাভ করে এবং সেই সূত্রে জাতির প্রতি জাতির দ্বেষহিংসাও প্রশ্রয় পায়। সুতরাং বিদেশি সাহিত্যের চর্চায়, শুধু আমাদের মন নয়, হৃদয়ও উদারতা লাভ করে ; আমরা শুধু মানসিক নয়, নৈতিক উন্নতিও লাভ করি। অতএব মনোজগতে যথার্থ মুক্তিলাভ করতে হলে আমাদের পক্ষে বিশ্বমানবের মনের সংস্পর্শে আসা দরকার। মনোজগতে বৈচিত্র্য থাকলেও কোনো দেশভেদ নেই। আমরা আমাদের মনগড়া বেড়া দিয়ে তার মনগড়া ভাগবাঁটোয়ারা করি, সত্যের আলোকে এসব অলীক প্রচার কুয়াশার মতো মিলিয়ে যায়।"

বৈদেশিক জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পসাহিত্য ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে অজ্ঞতাজনিত যে উন্নাসিকতা তা মানুষকে তার মানসজগতে কূপমণ্ডুক করেই তোলে। জাতিগত বিশিষ্ট মনোভঙ্গির সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় বৈদেশিক মানসিকতার সংস্পর্শে আসা। বিদেশ সম্পর্কে অবজ্ঞার মূল অজ্ঞানতায়, আর তারই ফলশ্রুতি সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ ও পরজাতিবিদ্বেষ। বৈদেশিক শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে সুনিবিড় পরিচয়ের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে বিশ্বমানবের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা, তাতেই ঘটে হৃদয়মনের প্রসার—নৈতিক উন্নতি। মনোজগতে বৈচিত্র্য থাকলেও বাধার প্রাচীর নেই ; দেশগত, জাতিগত সমস্ত কাল্পনিক ব্যবধান প্রকৃত সত্যের আলোকে অপসারিত হয় ; বিশ্বমানবের মানসসমুদ্রে নির্বিবাদে অবগাহন করে মানুষ তখন ধন্য হতে পারে।

[৩] নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি-দুইটির মধ্যে একটির ভাবার্থ বিবৃত কর :

(ক) "একটা বরফের পিণ্ড এবং ঝর্ণার মধ্যে তফাত কোন্‌খানে। না, বরফের পিণ্ডের নিজের মধ্যে গতিতত্ত্ব নেই। তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে তবেই সে চলে। সুতরাং চলাটাই তার বন্ধনের পরিচয়। এইজন্য বাইরে থেকে তাকে ঠেলা দিয়ে চালনা করে নিয়ে গেলে প্রত্যেক আঘাতেই সে ভেঙে যায়, তার ক্ষয় হতে থাকে—এইজন্য চলা ও আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা।

কিন্তু ঝর্ণার যে গতি সে তার নিজের গতি। সেইজন্যে এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, মুক্তি, তার সৌন্দর্য। এইজন্য গতিপথে সে যত আঘাত পায় ততই তাকে বৈচিত্র্য দান করে। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই।

মানুষের মধ্যেও যখন রসের আবির্ভাব না থাকে, তখনই সে জড়পিণ্ড। তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভয়-ভাবনাই তাকে ঠেলে ঠেলে কাজ করায়, সে-কাজে পদে পদেই ভার —ক্লান্তি। সেই নীরস অবস্থাতেই মানুষ অন্তরের নিশ্চলতা থেকে বাহিরেও কেবলি

নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে। তখনি তার যত খুঁটিনাটি, যত আচারবিচার, যত শাস্ত্রশাসন। তখনি মানুষের মন গতিহীন বলেই বাহিরেও সে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ।"

বিশ্বসৃষ্টির অভ্যন্তরে দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তির লীলা চলেছে—একদিকে জড়ত্ব ও স্থিতি, অপরদিকে চলিষ্ণুতা ও গতি। একটা বরফের পিণ্ড জড়ত্বের প্রতিমূর্তি, আর একটি চঞ্চল ঝর্ণার স্রোতে গতি-উল্লাসের উদার অভিব্যক্তি। কোনো বহিঃশক্তির তাড়নায় বরফপিণ্ড যদি সচলও হয়, তাহলেও তার ক্ষয় ও ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু চলার আন্তরিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বলেই সচল ঝর্ণা এত সুন্দর, এত মুক্ত—তার গতিপথে নব নব ব্যাঘাতই তার গতিচ্ছন্দকে আরো বৈচিত্র্যময়, আরো লীলায়িত করে তোলে।

মানুষের জীবনে এই অন্তরপ্রেরণার নামই হোল রস। এই রসের অভাবই মানুষকে জড়ধর্মী করে তোলে—তখনই মানুষ হারায় তার প্রাণস্ফূর্তি, তার মুক্ত জীবনোল্লাস, তার সজীব চলিষ্ণুতা। নীরসতাই আনে নিশ্চলতা, জড়ত্ব। আর তখনই: 'বাহিরে মুক্তিরে ব্যর্থ খুঁজি অন্তরে বন্ধন করি পুঁজি।'

(খ) শক্তি-দম্ভ স্বার্থ-লোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে আজি ঘিরিছে ভুবন!
দেহ হতে দেহান্তরে স্পর্শবিষ তার
শান্তিময় পল্লী যত করে ছারখার।
যে-প্রশান্ত সরলতা জ্ঞানে সমুজ্জ্বল,
স্নেহে যাহা রসসিক্ত, সন্তোষে শীতল,
ছিল তাহা ভারতের তপোবনতলে।
বস্তুভারহীন মন সর্ব জলেস্থলে
পরিব্যাপ্ত করি দিত উদার কল্যাণ,
জড়ে জীবে সর্বভূতে অবারিত ধ্যান
পশিত আত্মীয়রূপে। আজি তাহা নাশি,
চিত্ত যেথা ছিল সেথা এল দ্রব্যরাশি,
তৃপ্তি যেথা ছিল সেথা এল আড়ম্বর,
শান্তি যেথা ছিল সেথা স্বার্থের সমর।

অন্তরের অনাবিল সরলতা, প্রাণের অকুণ্ঠ প্রকাশ, আত্মার সুমহান শুভবুদ্ধি আজ নীচ স্বার্থবোধ, অক্ষমের আত্মদর্প ও ভোগপঙ্কিল লোলুপতার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। 'শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি' আজ শান্তিবিহীন—স্নেহশূন্য। প্রাচীন ভারতের তপস্যারণ্যের পূত পরিবেশ থেকে যে সহজ, সরল ও শ্রেয়ান্বেষী জীবনাদর্শ জন্ম নিয়েছিল, আজ তার স্থান অধিকার করেছে শক্তি-লোভ-স্বার্থ-দম্ভবিজড়িত

বস্তুসর্বস্ব জীবনাদর্শ। ব্যবহারিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে স্বল্পায়োজনের মধ্যেই যে-মানসিক পরিতৃপ্তি ছিল সুলভ, বর্তমানে তার আসন অধিকার করেছে আড়ম্বরের ব্যর্থবিস্তার! ঐতিহ্যচেতন কবিমানসের অকৃত্রিম বেদনাবোধের স্বাক্ষর কাব্যাংশটিতে মুদ্রিত।

[৪] নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি-দুইটির মধ্যে একটির ভাবার্থ বিবৃত কর ঃ

(ক) "দেশে প্রকৃত প্রস্তাবে শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে প্রচলিত শাসনতন্ত্রের বিরোধ ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিরোধ প্রয়োজন। এইরূপ প্রতিরোধের অভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগে শান্তি ও সুশাসন দুর্লভ ছিল। এই প্রতিরোধকে কার্যকর করিতে গেলে, ধীরভাবে সংযতভাবে চালাইতে গেলে, স্থায়ী করিতে গেলে, প্রতিরোধ যাহারা করিবে তাহাদের দলবদ্ধ হওয়া চাই। দল না থাকিলে বহু সুচিন্তিত বিধান বিধিবদ্ধ হইতে পারিত না, সদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি বৈষম্যপূর্ণ থাকিয়া যাইত, অতি-প্রয়োজনীয় পরিবর্তনও সম্ভব হইত না, স্বাধীন রাজ্যের নীতির কোনও স্বাধীনতা থাকিত না—সমাজ চপলমতির ক্রীড়নক হইয়া দাঁড়াইত। বিশেষত, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নির্ভর করে ইচ্ছামত কর্ম করিবার শক্তির উপর। সে-শক্তি অর্জন করিতে হইলে জনগণের মধ্যে সমবায়ের ক্ষমতা অনেক পরিমাণে থাকা চাই; নতুবা ভ্রান্ত, উন্মত্ত, অত্যাচারী স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ করিতে থাকিবে, তখন বিরোধী দলের সৃষ্টি না হইলে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে কে?"

দেশের প্রচলিত শাসনতন্ত্রে বিপক্ষদলের কার্যকলাপ মূলত জনসাধারণের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিকে উদ্দেশ্য করেই পরিচালিত হওয়া উচিত। প্রতিরোধের ও প্রতিবাদের অভাব ঘটলেই দেশের শাসনব্যবস্থায় আসবে স্বেচ্ছাচার ও অন্যায়। ঐতিহাসিক বিচারে প্রাচীন ও মধ্যযুগের শাসনব্যবস্থার অজস্র ত্রুটি এই সত্যকেই সপ্রমাণ করে। বিরোধীপক্ষকে কেবলমাত্র ভাঙনমূলক মনোভাবের পূজারী হলেই চলবে না—দলবদ্ধভাবে সংহত শক্তির দ্বারা অন্যায় ও অবিচারকে রুদ্ধ করার সুমহান দায়িত্ব তাদের। কুশাসনের প্রবল প্রতিপক্ষরূপে এরূপ দলবদ্ধ শক্তির একান্ত প্রয়োজন; আর, এরূপ দলগত শক্তির অভাব দেশের ও সমাজের ভাবী অমঙ্গলেরই সূচনা করে। যখন ভ্রান্ত মত-পথের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শাসকমণ্ডলী দেশকে অকল্যাণের পথে চালিত করে, তখন শক্তিমান বিরোধীপক্ষের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যস্বীকার্য।

[শরৎঋতুর বর্ণনা]

(খ) আমার কবির চিত্ত দেখেছে তোমার সত্য ছবি,—
তোমার হৃদয়ে, সখা, নাই দৈন্য, নাই কোনো ব্যথা,
লভিয়াছে আপনাতে আপনার পূর্ণ সার্থকতা,
হে শরৎ, হে কিশোর কবি!

মনের মাধুরী তব স্নিগ্ধতর করেছে জ্যোৎস্না,
স্বর্ণাভ করেছে রৌদ্র দীপ্ত তব গোপন বাসনা,
মরমের গভীরতা একান্ত যা তোমারি আপনা,—
সে-ই তো করেছে এই নীল নভ সুনীল গভীর,
প্রাণের তারুণ্যে তব শ্যামতর করেছে রচনা,
শ্যামাঞ্চল এই পৃথিবীর।

শারদীয় রূপবর্ণনায় কবি শরৎকালের আন্তর রূপের মধ্যে এক কবিসত্তার পরিচয় লাভ করেছেন। মানসিক অতৃপ্তি বা আত্মার দৈন্য নয়—পরিপূর্ণতার পরম প্রশান্তিই শরতের সৌন্দর্য। কিশোরকালের কল্পনাপ্রবণ মনের কাছে বিশ্বজগতের সমস্তকিছুতেই যেমন 'মনের মাধুরী' মিশ্রিত থাকে, তেমনই শরৎপ্রকৃতির রূপরেখায় যেন শরৎকবিরই মানসকল্পনা প্রতিবিম্বিত। বর্ষণক্লান্ত নির্মল নিশীথাকাশে শারদীয়া চাঁদের পবিত্র কিরণ শরৎকবির স্নিগ্ধ কোমল মনের স্পর্শ বহন করে আনে। দিবসের সূর্যালোক, 'শুভব্রতা বনলক্ষী'র অপরূপ শ্যামলিমা, উদাস গগনের নীলাভ মায়া শরৎ-কবির অপরূপ সৃজনশীল কবিমনেরই পরিচয়বাহী। 'চিরশিশু, চিরকিশোর' এই শরৎকবির প্রাণতারুণ্যের অকৃত্রিম স্পর্শেই ধরণী স্নিগ্ধশ্যামকান্তি ধারণ করেছে।

[৫] নিম্নে লিখিত ভাবটি সম্প্রসারিত কর, দেড় শতের অধিক শব্দ প্রয়োগ করিও না ঃ

(ক) "মানুষের পক্ষে কিছু ত্যাগ করা, যথা উপাধি কিংবা ওকালতি, শুনতে মহা কঠিন। কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি কঠিন, কিছু করা অর্থাৎ কৃতী হওয়া। জীবনের কাছ থেকে পালানো সহজ, তার সঙ্গে লড়ে জয়ী হওয়াই কঠিন। কেন না, এ লড়াই চিরজীবনব্যাপী, এক মুহূর্ত তার বিরাম নেই।"

মানুষ বহুবিচিত্র, এবং বিভিন্ন মানুষের জীবনাদর্শও বিভিন্নধর্মী। জীবনের একদিকে আছে ভোগ, অপরদিকে ত্যাগ; একদিকে গ্রহণ, অপরদিকে বর্জন; একদিকে জীবনরসিকতা, অপরদিকে জীবনবৈরাগ্য। ত্যাগাশ্রয়ী জীবনাদর্শ হয়তো মহনীয়, এবং ত্যাগের মাহাত্ম্যও অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু সে-ত্যাগের অর্থ জীবনকে পরিত্যাগ নয়, জীবনে স্বার্থবুদ্ধির ক্ষুদ্র তাকে পরিহার। ত্যাগ কথাটি যতই মহত্ত্বব্যঞ্জক হোক না কেন, অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, ত্যাগ আপাতমনোহর হলেও আসলে তা জীবনের সংগ্রামক্ষেত্র থেকে ভীরু পলায়নেরই নামান্তর। কাপুরুষতাই সেখানে ত্যাগের ছদ্মবেশ পরিধান করে আপনার মহত্ত্ব জাহির করতে চায়। জীবনকে যথাস্থিতরূপে পরিপূর্ণ গ্রহণ করে তাকে সার্থকতার পথে পরিচালিত করার মধ্যে শক্তিরই প্রকাশ; আর, সংসারের রণাঙ্গন থেকে পরাজিত সৈনিকের মনোভাব

নিয়ে পলায়নের মধ্যে পৌরুষহীন অক্ষমতারই অভিব্যক্তি। সংসারের শত বাধা-বিপত্তির মুখে জীবনের সার্থকতার পথ চিনে নেওয়ার মধ্যে যে-অনমনীয় দৃঢ়তা, যে-প্রাণদীপ্ত পৌরুষবীর্যের পরিচয় আছে, তা মানুষের মনুষ্যত্বকেই মহিমময় করে তোলে। জীবনসংগ্রামে অক্লান্ত যোদ্ধার যে মহিমা, তা জীবনবিমুখ মানুষের ত্যাগমহিমার চেয়ে উজ্জ্বলতর। জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার ফলে যে-পলায়নী মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয়, সেটাই যদি কোনো ত্যাগের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সে-ত্যাগ যথার্থ গৌরবের অধিকারী হওয়ার অনুপযুক্ত ; কারণ, ওই ত্যাগের মধ্যে শক্তির প্রকাশ নেই। কিন্তু বিরামহীন জীবনসংগ্রামের মধ্যে কেউ যদি উজ্জ্বল কৃতিত্বের অধিকারী নয়, তাহলে তার শক্তি ও পৌরুষ অবশ্যই প্রশংসনীয়। জীবনকে পরিবর্জন করা নয়, তাকে গ্রহণ করা ও সার্থকতার পথে পরিচালিত করাই যথার্থ জীবনরসরসিকতার পরিচায়ক—সেখানেই মনুষ্যত্বের অভ্রভেদী মহিমা।

অথবা,

"আমরা লোকহিতের জন্য যখন মাতি তখন অনেক স্থলে সেই মত্ততার মূলে একটি আত্মাভিমানের মদ থাকে। আমরা লোকসাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়ো, এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার জন্যই উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমন স্থলে উহাদেরও অহিত করি, নিজেদেরও হিত করি না।"

লোকহিতকামনা নিঃসন্দেহে মানবহৃদয়ের মহত্ত্বের অভিব্যক্তি, যদি তার প্রেরণা হয় আন্তরিক, স্বার্থলেশশূন্য এবং অহংবোধবিমুক্ত। মানুষ যখনই তার স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধি ও প্রয়োজনের সীমিত গণ্ডীর ঊর্ধ্বে উদার মুক্তির সন্ধান পায়, যখনই তার চিত্তের প্রসারতা বাড়ে, তখনই সে লোককল্যাণকামনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। মানুষের 'বড়ো-আমি' বা মহত্তর সত্তাই মানুষকে এই কল্যাণী প্রেরণা দান করে।

কিন্তু 'মন' নামক যে-বস্তুটি মানুষের সর্বকার্যের শক্তিমান পরিচালক, তার রহস্য দুরধিগম্য। এই মনের একটি অংশ জুড়ে আছে যে অহং [ego], তার স্বভাবই হোল ছদ্মবেশ পরানো এবং তারই মধ্যে পরিতৃপ্তি খোঁজা। তাই অনেক সময়েই দেখা যায়, লোকহিতসাধনের শুভবুদ্ধি হয়তো আত্মাভিমান চরিতার্থ করবারই একটা ছদ্মরূপমাত্র।

অপরের সঙ্গে তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি ও উপভোগ করার মধ্যে যে আত্মতৃপ্তি, তারই নাম আত্মগরিমা—সেটা অহংপরিতৃপ্ত। লোকহিতপ্রচেষ্টা যদি অহংপরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষাসম্ভূত হয়, তাহলে সত্যকার লোককল্যাণও সাধিত হয় না, উপরন্তু আত্মমুগ্ধ মদমত্ততাকেই প্রশ্রয় দিয়ে আত্মার ক্ষতিসাধন করা হয়।

লোককল্যাণপ্রচেষ্টা যদি 'নিষ্কাম' অর্থাৎ অহংস্পর্শশূন্য না হয়, তাহলে তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। সাধারণের অপেক্ষা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব উপভোগের যে রাজসিক মোহ, তার প্রভাবমুক্ত হতে না পারলে সত্যকার কল্যাণব্রতের সাধনা অসম্ভব। উপকারী ও উপকৃতের মধ্যে যেখানে সমুদ্রদুস্তর ব্যবধান, যেখানে যথার্থ হৃদয়সান্নিধ্যের একান্ত অভাব, কল্যাণপ্রচেষ্টা যেখানে কৃপার দাক্ষিণ্য, সেখানে সেবাব্রতের আদর্শই ভ্রষ্ট—কোনো পক্ষেরই সেখানে যথার্থ মঙ্গল হয় না, হওয়া অসম্ভব বলেই।

অথবা,

[৬] নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশটির ভাবতাৎপর্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর :

আমি চলে গেলে ফেলে রেখে যাব পিছু
চিরকাল মনে রাখিবে, এমন কিছু,
মূঢ়তা করা তা নিয়ে মিথ্যে ভেবে।
ধূলোর খাজনা শোধ করে নেবে ধূলো,
চুকে গিয়ে তবু বাকি রবে যতগুলো,
গরজ যাদের তারাই তা খুঁজে নেবে।
আমি শুধু ভাবি, নিজেরে কেমনে ক্ষমি,
পুঞ্জ পুঞ্জ বকুনি উঠেছে জমি,
কোন্ সৎকারে করি তার সদ্গতি।
কবির গর্ব নেই মোর হেন নয়,
কবির লজ্জা পাশাপাশি তারি রয়,
ভারতীর আছে এই দয়া মোর প্রতি।
লিখিতে লিখিতে কেবলি গিয়েছি ছেপে
সময় রাখিনি ওজন দেখিতে মেপে
কীর্তি এবং কুকীর্তি গেছে মিশে।
ছাপার কালিতে অস্থায়ী হয় স্থায়ী
এ অপরাধের জন্মে যে-জন দায়ী
তার বোঝা আজ লঘু করা যায় কিসে।

কবির একান্ত ব্যক্তিগত একটি মনোভাবই কবিতাংশটিতে ব্যক্ত হয়েছে। কবির জীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনার ফলে যা-কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তার সামগ্রিক মূল্যায়নকালে কবিমনের যে দ্বিধাসংশয়, যে গর্ব ও লজ্জা, তারই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি এই কবিতাংশটিতে। সাহিত্যসৃষ্টি-মাত্রেই চিরন্তনত্বের দাবী রাখে না, মহাকালের

অমোঘ বিচারে অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতির ঔজ্জ্বল্যও ম্লান হয়ে আসে। কালের বিধানের ঊর্ধ্বে উঠে যে-সব সাহিত্যসৃষ্টি শাশ্বত মহিমা লাভ করে, সেগুলো 'সারস্বত মুহূর্তের কালাতীত স্তম্ভিত লীলা'। কবির মৃত্যুর পর তাঁর কাব্যসৃষ্টির মধ্যে এমনই কোনো চিরন্তন সঞ্চয় থাকবে কিনা, যাকে আশ্রয় করে অমরত্ব লাভ করতে পারবেন, সে কথা নিয়ে মিথ্যা ভাবনার জাল বোনা মূঢ়তা মাত্র। কারণ, কবির সমগ্র সাহিত্যকৃতির মধ্যে যেগুলো ক্ষণিকের সেগুলো সহজেই কালপ্রভাবে লয়প্রাপ্ত হবে। আর, যেগুলোতে নিত্যকালের স্পর্শ আছে সেগুলোকে চিনে নেবে ভবিষ্যদিনের আগ্রহী, উৎসুক সাহিত্যরসিকসম্প্রদায়।

কিন্তু কবিকে সুদীর্ঘ কবিজীবনে সাহিত্যসৃষ্টি ব্যতীত আরো বহুতর কর্তব্যপালন করতে হয়েছে! আর, তারই ফলে সত্যকার কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অজস্র অ-কাব্য বা কবির ভাষায় 'বকুনি' জমা হয়েছে। যে-গুলো কবির যথার্থ সাহিত্যসৃষ্টি, সেগুলো কবিহিসাবে তাঁর গর্বের বস্তু, সেগুলোতে তাঁর অম্লান কীর্তির স্বাক্ষর মুদ্রিত। আর, যেগুলোকে কবি নিজেই তাঁর সাহিত্যকৃতির নিদর্শনরূপে গ্রহণ করতে সংকুচিত, যে-গুলো তাঁর নিজের বিচারে সাহিত্যিক 'সৃষ্টি' নয়, সাহিত্যিক 'বকুনি' মাত্র—সেগুলো সম্পর্কেই কবির গভীর লজ্জা। তিনি যে কবি, এবং সেই পরিচয়ই যে তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়—এ গর্ব কবির হয়তো আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে কবিসুলভ লজ্জাসংকোচও তাঁর বর্তমান। সাহিত্যজীবনে যথার্থ কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে যে-সব অতিরিক্ত 'বকুনি' ছাপার অক্ষরে স্থায়িত্ব লাভ করেছে—আসলে সেগুলো ক্ষণকালের। লেখার উৎসাহে যা-কিছু লেখনী জন্ম দেয়, তার সবগুলিই তো যথার্থ সাহিত্যসৃষ্টি-হিসাবে গণ্য করা চলে না। একারণে কবির মনে আজ সন্দেহসংশয়, লজ্জা ও অপরাধবোধ তাঁর কাবগর্বের সঙ্গে পাশাপাশি বিরাজমান; এবং সেই অপরাধের বোঝাকে লঘু করার বাসনার প্রতি কবিচিত্ত উন্মুখ!

[৭] নিম্নলিখিত ভাবটি তোমার ভাষায়, এবং দেড়শতের অধিক শব্দ প্রয়োগ না করিয়া, সম্প্রসারিত কর :

"মানুষ যেমন জানবার জিনিস ভাষা দিয়ে জানায়, তেমনি তাকে জানাতে হয় সুখদুঃখ, ভালোলাগা-মন্দলাগা, নিন্দাপ্রশংসার সংবাদ। ভাবে-ভঙ্গীতে, ভাষাহীন আওয়াজে, চাহনিতে-হাসিতে, চোখের জলে এইসব অনুভূতির অনেকখানি বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু, সুখদুঃখ ভালোবাসার বোধ অনেক সূক্ষ্মে যায়। তখন তাকে ইশারায় আনা যায় না, কেবল ভাষার নৈপুণ্যে যতদূর সম্ভব নানা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে।"

সভ্যতার আদিলগ্নে মানব তার মনোভাব প্রকাশ করবার জন্যে আশ্রয় নিয়েছিল কত ইঙ্গিত, কত ইশারা-সংকেতের! কিন্তু মানবহৃদয়ের বিভিন্ন অনুভূতি, তার সুখদুঃখ, হাসিকান্না, ভালোমন্দের বোধ, তার আকাঙ্ক্ষা-আকূতি-প্রকাশের ব্যাকুলতায় যখন উদ্বেল হয়ে উঠল তখন গড়ে উঠল মানুষের ব্যঞ্জনাঢ্য ভাষা—সাহিত্য-সংগীত প্রভৃতি। মানবের সহজাত প্রেরণা হোল আত্মপ্রকাশ করা—নিজেকে জানানো ও পরকে জানা। সাংকেতিকতা অর্থাৎ সংকেতব্যবহার মানুষের মনের একটি স্বাভাবিক ধর্ম, আদিমকাল থেকে মানুষ তার মনোভাব ব্যক্ত করে আসছে বিচিত্র ইশারা-ইঙ্গিতের সাহায্যে। এবং মানুষের যে প্রাত্যহিক ভাষা তা হোল শব্দসমষ্টি—আবার, শব্দগুলি বিশেষ বিশেষ সংকেত মাত্র।

মানবপ্রাণের অনেক আবেগ, মানবমনের অনেক চিন্তা ও অনুভূতিকে হয়তো ওই ইঙ্গিত-সংকেতের সাহায্যে বোধগম্য করা যায়। কিন্তু অন্তরতর হৃদয়ের ভাবানুভূতিকে পরিপূর্ণ রূপদান করতে হলে প্রসাধনকলামণ্ডিত ভাষার ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ভাষার সাহায্যেই মানবমন তার চিন্তাকল্পনা, ভাব ও ভাবনা, আবেগ ও অনুভূতির সুন্দর ও সুসম্পূর্ণ রূপাবয়ব নির্মাণ করতে পারে। স্থূল অনুভূতিকে কিছুটা ইশারা-ইঙ্গিতে বোধগম্য করে তোলা চলে; কিন্তু হৃদয়ের সূক্ষ্মতর সুকুমার অনুভূতিনিচয়কে সুপরিস্ফুট করে তোলার জন্য বিশেষ ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ভাষার অব্যর্থ প্রয়োগে এবং সুকৌশল সজ্জায় মনোভাবকে যথাযথ রূপ দিতে পারা যায়—কেবলমাত্র সংকেত বা ইঙ্গিতের সাহায্যে তা অসম্ভব। স্থূল ক্ষুধার অনুভূতিকে আমাদের পরিচিত কয়েকটি ইশারা-ইঙ্গিতের মাধ্যমে ব্যক্ত করা চলে অনায়াসেই, কিন্তু রহস্যঘন প্রেমের অনুভূতির অনন্ত বৈচিত্র্যকে কেবলমাত্র ওইগুলির সাহায্যে যথাযথ পরিস্ফুট করা যায় না—সেখানেই প্রয়োজন কলাচাতুর্যপূর্ণ ভাষার।

অথবা,

"বক্তা ও লেখক একজাতীয় জীব নন। ইহাদের পরস্পরের প্রস্তুতিও ভিন্ন, রীতিও ভিন্ন। বক্তা চাহেন, তিনি শ্রোতার মন জবরদখল করেন; অপর পক্ষে লেখক পাঠকের মনের ভিতর অলক্ষিতে এবং ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে চাহেন। বক্তা শ্রোতার মনকে বিশ্রাম দেন না, লেখক পাঠকের অবসরের সাথী।"

বক্তা ও লেখক আপাতদৃষ্টিতে সমধর্মী হলেও প্রকৃতপক্ষে দু'জনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিভিন্ন। বক্তা ও লেখকের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে, উভয়েই কিছু বলতে চান। বক্তার যেমন প্রয়োজন শ্রোতৃমণ্ডলী, লেখকের তেমনি প্রয়োজন পাঠকসমাজ। কিন্তু সাদৃশ্য যাই হোক, উভয়ের প্রকৃতিগত বৈপরীত্য সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ধরা পড়ে। উভয়েরই উদ্দিষ্ট অবশ্য শ্রোতা বা পাঠকের মনকে অধিকার করা, কিন্তু উভয়ের

পদ্ধতিতে পার্থক্য আছে। বক্তা ও লেখকের প্রকৃতিগত বিভিন্নতাই তাঁদের রীতিপদ্ধতির পার্থক্যের কারণ। বক্তার ভাষণের আবেদন যত প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত হবে শ্রোতার চিত্তে, ততই তার সার্থকতা—সেখানেই বক্তার সাফল্য। অর্থাৎ, শ্রোতার মনকে অবিলম্বে আকর্ষণ ও অধিকার করাই বক্তার প্রধান লক্ষ্য। তাঁর অনর্গল বাক্যস্রোতের প্লাবনে শ্রোতার মন ভেসে চলে, ক্ষণেকের জন্যও বিরামের মাটিতে দাঁড়াবার অবকাশ পায় না। বক্তার সামগ্রিক আচরণেই কেমন যেন একটা অতিরিক্ত ব্যস্ততার ভাব জড়ানো থাকে।

কিন্তু লেখকের প্রকৃতি একেবারে বিপরীতধর্মী। পাঠকের মনকে অতি মৃদুস্পর্শের সাহায্যে ধীরে ধীরে অথচ অভ্রান্তগতিতে অধিকার করাই লেখকের ধর্ম। জোর করে দখল করা নয়—অলক্ষিতে অভিভূত করাই লেখকের প্রকৃতি। রচনাপাঠরত পাঠকের চেতনার উপরে লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তারলাভ করে অলক্ষিতে, ধীরে। পাঠকের সঙ্গে লেখকের যে-সহমর্মিতার বন্ধন, বস্তুত সেটা উপভোগ্য অবসরক্ষণেই রচিত হয়। তাই লেখকমাত্রেই পাঠকের অবসরকালের সাথী। এসব দিক হতে দেখলে বক্তা ও লেখকের প্রকৃতিগত বিভিন্নতা স্পষ্টরেখ।

[৮] নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশটির ভাবতাৎপর্য বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর :

সেই কথা স্মরি বার বার আজ
লাগে ধিক্কার প্রাণে—
অজানা জনের পরম মূল্য
নাই কি গো কোনোখানে।
এ অবহেলার বেদনা বোঝাতে
কোথা হতে খুঁজে আনি
ছুরির আঘাত যেমন সহজ
তেমন সহজ বাণী।
কারো কবিত্ব কারো বীরত্ব
কারো অর্থের খ্যাতি,
কেহ বা প্রজার সুহৃদ্ সহায়
কেহবা রাজার জ্ঞাতি,
তুমি আপনার বন্ধুজনেরে
মাধুর্যে দিতে সাড়া,
ফুরাতে ফুরাতে র'বে তবু তাহা
সকল খ্যাতির বাড়া।

কবি এখানে সাধারণ্যে অপরিচিত তাঁর এক পরম বন্ধুজনের কথা স্মরণ করছেন। বন্ধুটি আজ লোকান্তরিত—প্রত্যক্ষগম্য এই দৃশ্যমান সংসারে কোথাও তাঁর লৌকিক অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে-মানুষটি নানা কাজের অবকাশে এসে কবিকে নিবিড় সঙ্গ দান করতেন, সদাপ্রফুল্ল মুখের সামান্য দু'একটি কথায় কবির হৃদয়দেশটি আনন্দে ভরে তুলতেন, আজ বাইরে কোথাও তাঁর নিকট-সান্নিধ্যের মধুময় স্পর্শ মিলবে না ভেবে কবি অন্তরে বিরাট শূন্যতার বেদনা অনুভব করছেন।

আর-দশজনের কাছে এই অখ্যাতনামা মানুষটির মূল্য হয়তো অকিঞ্চিৎকর; কারণ, জনসাধারণের চিত্তলোকে স্থায়ী প্রভাবচিহ্ন মুদ্রিত করতে পারে এমন কোনো কর্মকৃতি তিনি পিছনে রেখে যাননি। কবিশক্তির অধিকারী ছিলেন না তিনি—'অন্তর হতে আহরি বচন আনন্দলোক করি বিরচন'—এরূপ সামর্থ্য তাঁর ছিল না; সাধারণ মানুষ বীরপুরুষ বলে জেনে যাঁদের অশেষ মর্যাদায় ভূষিত করে, তিনি ওই জাতীয় বীরপুরুষদের সগোত্রও ছিলেন না; বর্তমানের ধনতান্ত্রিক সমাজে ধনীর একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে, এরূপ একজন বিত্তশালী ব্যক্তিও তিনি নন; জনকল্যাণমূলক কোনো কার্যেও তিনি আত্মনিয়োগ করেননি; রাজদরবারে তাঁর বিপুল খ্যাতিপ্রতিপত্তিও ছিল না। সুতরাং লোকস্মৃতিতে এহেন মানুষের নিত্যকালের ঠাঁই হবার কথা নয়। কোনো বড়ো কাজ সম্পাদন করে না গেলে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে নিঃশেষে মুছে যায়—মানবের স্মৃতি চিরোজ্জ্বল থাকে মহতী কীর্তি আশ্রয় করে।

কিন্তু কবির জিজ্ঞাস্য, বাইরের খ্যাতিতেই কি মানুষের একমাত্র মূল্য? যিনি কোনো বড়ো কীর্তি স্থাপন করে যেতে পারলেন না, তাঁর জাগতিক অস্তিত্ব কি একেবারেই মিথ্যা? একথা কবি স্বীকার করেন না। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে অপর একজন মানুষের চরিত্রসৌন্দর্য, হৃদয়মাধুর্যেরও অশেষ মূল্য রয়েছে। প্রিয়জনের একঝলক মুখের হাসি, একটুকরো ক্ষুদ্রতুচ্ছ কথা, প্রেমপ্রীতির স্নিগ্ধ স্পর্শ অনেক সময় অনেক কীর্তিমানের মহৎ জীবনকর্মকেও নিষ্প্রভ করে দেয়। অমেয় মাধুর্যদানে যে আমাদের জীবনপাত্রকে কানায় কানায় ভরে তুললো, বৃহত্তর সমাজে সে অজানা অচেনা হলেও, তার মূল্য আমাদের কাছে অশেষ। তাকে হারালে সমস্ত অন্তরসত্তা সুতীব্র বেদনায় হাহাকার করে ওঠে, এহেন প্রিয়জনের উপেক্ষা-অবহেলা অসহনীয় মনে হয়। চোখের সামনে সহস্র খ্যাতিপ্রতিষ্ঠ মানুষ ঘুরে বেড়ালেও তাঁদের কেউ মনের মানুষের অভাব পূর্ণ করতে পারেন না। মালতীফুলের অস্তিত্ব একান্ত ক্ষণকালের। আষাঢ়ের দিনে ফুটে উঠে চতুর্দিকে সুরভি ছড়িয়ে দিয়ে ফুলটি অচিরে ধূলায় লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু তার পার্থিব অস্তিত্ব মুছে গেলেও আকাশে-বাতাসে তার মনোমদ সৌরভ অনুক্ষণ ঢেউ তুলে বেড়ায়। তেমনি, প্রিয়জন হারিয়ে গেলেও

তাদের বিরহ আমাদের মনের আঙিনায় নিরন্তর প্রাণদ মাধুর্যসৌরভ ছড়াতে থাকে—অজানা জনের পরম মূল্য তো এখানেই।

[৯] অন্তর্নিহিত ভাবটি সম্প্রসারিত কর :

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোটফুল অতিশয় দীন।
ধিক্ ধিক্ বলে তারে কাননে সবাই,
সূর্য উঠি বলে তারে, 'ভাল আছ, ভাই?'

যিনি উদারচেতা তাঁহার নিকট উচ্চনীচ ভেদ নাই। ঐশ্বর্য, রূপ বা আভিজাত্য বিচার করিয়া তিনি মানুষের মূল্য নির্ধারণ করেন না, অকৃপণ প্রীতির প্রকাশেই তিনি কীর্তিমান। সংস্কৃত-সাহিত্যে সর্বজনপরিচিত একটি কথা আছে : 'উদার চরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।'

উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিনিচয়ে রূপকচ্ছলে এই সত্যই প্রকাশ করা হইয়াছে। পুষ্পকাননের প্রাকারে ক্ষুদ্র একটি বনফুল ফুটিয়াছে, উদ্যানের অভিজাত পুষ্পগুলির মতো তাহার রূপ-বর্ণ-গন্ধ কিছুই নাই। তাই স্বজাতি হওয়া সত্ত্বেও অপরাপর বর্ণ-গন্ধসমৃদ্ধ ফুলগুলি তাহার সহিত আত্মীয়তা স্বীকার করিতে লজ্জাবোধ করিতেছে, তাহার দীনতাকে ধিক্কার দিতেছে। কিন্তু সমদর্শী প্রভাতসূর্য যখন আকাশে দেখা দিলেন, তখন এই ক্ষুদ্র কুসুমটিকে তিনি অবজ্ঞা করিলেন না; নিজে বরং উহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিলেন—ভাই, ভালো আছ তো?

ইহাই মহতের রীতি। ক্ষুদ্রমনা ব্যক্তিই নিজের ঐশ্বর্য ও প্রতিষ্ঠার মানদণ্ডে সকলকে বিচার করিতে চায়। আত্মীয় যদি দরিদ্র হয় তবে তাহার সহিত সম্পর্ক স্বীকার করিতে সে সংকোচ বোধ করে, তাহার দীনতাকে ধিক্কার দিতে তাহার বাধে না। কিন্তু মহৎ জনের উদার হৃদয়ে এরূপ ক্ষুদ্রতা স্থান পায় না। তাঁহার প্রীতি ও উদারতা প্রসন্ন সূর্যকিরণের মতো সর্বমানবের উপর সমভাবে বর্ষিত হয়। বনফুলটি যতই নগণ্য ও রূপৈশ্বর্যহীন হোক, তাহার শুচিশুভ্রতাকে সূর্য যেমন করুণাকোমল আলোকবর্ষণে চরিতার্থ করে, সেইরূপ উদার ব্যক্তি মানবতার মাপকাঠিতেই মানুষকে বিচার করেন—রূপ, অর্থ অথবা খ্যাতির দ্বারা নহে। উদারহৃদয় ব্যক্তি এজন্যই মহৎ, এইজন্যই তাঁহারা জগতের নমস্য এবং বরণীয়।

[১০] অন্তর্নিহিত ভাবসত্য বিশদভাবে পরিস্ফুট কর :

কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে,
'আমরা কুটুম্ব দোঁহে ভুলে গেলি কিরে?'
থলি বলে, 'কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে
আমার যা আছে গেলে তোমার থলিতে।'

নির্মম দারিদ্র্যের দ্বারা যে-মানুষ বিড়ম্বিত, অর্থবান আত্মীয়ের সম্পর্কে তাহার ক্ষোভের অন্ত নাই। প্রতিমুহূর্তেই সে এই বলিয়া অনুযোগ জানায় যে, বিত্তবান চিরকাল বিত্তহীনকে তাচ্ছিল্য করে, অস্বীকার করে। অর্থশালীর সহিত তাহার যে একটা রক্তের সম্পর্ক রহিয়াছে, সেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কথাটি সে সর্বক্ষণ অর্থশালীকে স্মরণ করাইয়া দিতে চায়, এবং তাহার দ্বারস্থ হইয়া কিছু না পাইলে তাহাকে স্বার্থপর বলিয়া ধিক্কার দিতে থাকে।

কিন্তু ইহাও সত্য যে, কুটিল সংসারের ধর্মই এই। স্বার্থপরতা প্রত্যেকেরই আছে, তবে তাহা সময় এবং সুযোগসাপেক্ষ। যাহার কিছুই নাই তাহার স্বার্থপর হইবার সুযোগও নাই, সেইজন্যই সে অন্যকে নিন্দা করিবার অবকাশ পায়। কিন্তু ঐ নিঃস্বার্থ নিঃসম্বল ব্যক্তিটি যদি কখনো প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিপতি হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, মুহূর্তে তাহার চরিত্রেও আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সে-ও সমভাবেই স্বার্থলিপ্সু হইয়া উঠিবে, তখন দরিদ্র আত্মীয়ের কথা তাহারও আর মনে থাকিবে না। ভিক্ষার শূন্য ঝুলি আজ টাকায়-পূর্ণ থলিকে পূর্বের আত্মীয়তা ভুলিবার জন্য নিন্দা করিতেছে; কিন্তু ঐ টাকার থলি শূন্য হইয়া যদি কখনো ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হইয়া উঠে, তখন হয়তো ইহার বিপরীতটাই চোখে পড়িবে, অর্থাৎ ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিকে আর চিনিতেই পারিবে না। সংসারে প্রায় প্রত্যেকেই স্বার্থান্বেষী, এবং স্বার্থসিদ্ধি যাহার হইয়াছে সে স্বার্থপর হইতে বাধ্য—গরীব আত্মীয়কে চিনিতে না-পারা তখন তাহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়।

প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে, ইহা অবশ্য সার্বজনীন রীতি নহে। যদি একমাত্র অর্থ-বিত্ত-স্বার্থই মানুষের আত্মীয়তাবিচারের মানদণ্ড হইত, তাহা হইলে বহুকাল পূর্বেই এই পৃথিবী ভয়ংকর শ্মশানে পরিণত হইত, মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইয়া উঠিত।

[১১] ভাবসম্প্রসারণ কর:

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে
ধ্বনিকাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।

সংসারে এক জাতীয় হীনচেতা অকৃতজ্ঞ মানুষ আছে, যাহারা সবসময়েই উপকারীর ঋণ অস্বীকার করিতে সচেষ্ট থাকে। তাহারা মনে করে, অপরের নিকট ঋণস্বীকার করিলে তাহাদের অগৌরব ঘটিবে, জনসমাজে তাহাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে। এই কারণে তাহারা একটি অভিনব পন্থা বাছিয়া লইয়া আত্মরক্ষার প্রয়াস পায়।

এইসব কৃতজ্ঞতাবোধহীন মানুষের প্রধান কাজই হইল উপকারীকে সদাসর্বদা সর্বজনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা—তাহার নিন্দাবাদ করা, তাহাকে ব্যঙ্গ করা। হয় তো যে-মহদাশয় ব্যক্তির আশ্রয়েই সে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, যিনি তাহাকে যথাশক্তি প্রতিপালন করিয়া বড়ো করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাকে অসম্মানিত করিয়া, পরিহাস

করিয়াই সে নিজেকে ঘোষণা করিতে চায়। পাছে কেহ ঐ উপকারকের উল্লেখ করিয়া তাহার পরাশ্রিত নগণ্য অতীতকে স্মরণ করাইয়া দেয়, এই আশঙ্কায় সে উক্ত মহৎ ব্যক্তিকে যথাসাধ্য নিন্দা ও পরিহাস করিয়া বেড়ায়। এ প্রসঙ্গে বিশ্রুত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি কাহিনী উপভোগ্য। কোনো এক ব্যক্তি তাঁহার নিন্দা রটনা করিতেছে শুনিয়া বিস্মিত বিদ্যাসাগর মন্তব্য করিয়াছিলেন : 'কই, আমি তো কোনদিন তাহার কোনো উপকার করি নাই!'

প্রতিধ্বনির কাজ ধ্বনিকে ব্যঙ্গ করা, কৃতঘ্নের কাজ হইল কৃতজ্ঞতাভাজনকে অসম্মান করা ও অস্বীকৃতি জানান।

[১২] মর্মসত্য ব্যাখ্যা কর :

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

যাঁহারা মহৎহৃদয় ও চরিত্রবান, তাঁহারা নিখিল বিশ্বকে আপনার সহিত একাত্ম করিয়া লইতে জানেন। তাঁহাদের হৃদয়দেশ বিস্তীর্ণ, বিচার সংকীর্ণতামুক্ত। তাই ইতর-ভদ্র, শ্রেষ্ঠ-অধম সকলের সহিত নির্বিচারে তাঁহারা যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাঁহারা জানেন, হীনচরিত্রের সংস্রবে বসবাস করিলেও কোনো মালিন্য ও অশুচিতা তাঁহাদের স্পর্শ করিতে পারিবে না। তাঁহাদের শুচিতা রক্ষাকবচের মতোই সঙ্গে থাকিবে, অধম-জনের সান্নিধ্যে তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। এই কারণে সর্বজনের সহিত তাঁহারা নিঃসংকোচ চিত্তে সম্পর্ক রচনা করেন—আত্মবিশ্বাস ও চারিত্রিক পবিত্রতার দ্বারা তাঁহারা মানবসমাজের সর্বস্তরে বিচরণ করিতে পারেন।

কিন্তু আত্মপ্রত্যয় ও পবিত্রতার উপরে যাঁহারা নির্ভর করিতে পারেন না, তাঁহাদের এই মানসিক শক্তি নাই। উত্তম ও অধম শ্রেণীর মধ্যে যে-সংযোগ অনায়াসে সাধিত হয়, এই মধ্যমদের পক্ষে তাহা অসম্ভব। তাঁহারা প্রতিমুহূর্তে নিজেদের বাঁচাইয়া চলেন, ইতরের স্পর্শ হইতে সদাসর্বদা দূরে থাকিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। ফলে তাঁহাদের মন শুচিবায়ুগ্রস্ত হইয়া পড়ে, বিচারবোধ সংকীর্ণ হইয়া আসে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইঁহারা আলাদা হইয়া চলেন। উত্তমের সহিত মিলিত হইবার মতো মানসিক শক্তি ইঁহাদের নাই। অপর পক্ষে, অধমের সান্নিধ্যও তাঁহাদের নিকট ভীতিকর। এই অতি-সতর্কতার জন্য চিরকাল তাঁহারা 'মাঝারি' হইয়া থাকেন, জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তাঁহারা পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না।

[১৩] অন্তর্নিহিত ভাবটি বিশদ কর :

আলো বলে, অন্ধকার, তুই বড় কালো,
অন্ধকার বলে, ভাই, তাই তুমি আলো।

অবিমিশ্র সুখ, আনন্দ বা সৌন্দর্য সংসারের রীতি নহে। ইহাদের পাশাপাশি রহিয়াছে দুঃখ, আছে বেদনা, আছে মলিন কুশ্রীতা। বিচিত্রের অপূর্ব সমাবেশেই জীবন এবং জগৎ গড়িয়া উঠিয়াছে।

আমরা সকলেই সুখের সন্ধানী। কিন্তু এই সুখ চাহিতে গিয়া যখন দুঃখের কণ্টক আমাদের বক্ষে আসিয়া বিদ্ধ হয়, তখন যন্ত্রণায় আমরা আর্তনাদ করিয়া উঠি। আনন্দের পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্যে যখন বেদনার কৃষ্ণছায়া নামিয়া আসে, তখন মর্মান্তিক ব্যথায় আমরা বিশ্বস্রষ্টাকে অভিশাপ দিই, তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করি।

কিন্তু একথা আমরা কেন ভুলিয়া যাই যে, দুঃখ আছে বলিয়াই সুখ আমাদের এত বাঞ্ছনীয়? কেন আমরা মনে রাখি না যে, আঘাতই সান্ত্বনাকে মধুরতর করিয়া তোলে, বঞ্চনাই প্রেমকে স্বর্গীয় সুধা দান করে? যদি এমন হইতে যে, পৃথিবীতে কখনো সূর্য অস্ত যাইত না, অহোরাত্র সূর্যালোকে চারিদিক প্লাবিত থাকিত, তাহা হইলে তাহার কি কোনো মূল্য থাকিত? অন্ধকার আসিয়া দিবালোক গ্রাস করে বলিয়াই পরদিন প্রভাতে সোনালী অরুণোদয় এমন করিয়া আমাদের সকলের চিত্ত হরণ করে,—আঁধার আছে বলিয়াই দিনের আলো বৈচিত্র্যহীন, বৈশিষ্ট্যহীন হইয়া পড়ে না। যদি অভাব-বোধ না থাকিত তবে মানবপ্রগতি বহুকাল আগেই থামিয়া যাইত, অতৃপ্তি না থাকিলে জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎকর্ষ ঘটিত না, মহৎ বেদনা না থাকিলে মহৎ কাব্য কোনদিনই সৃষ্টি হইতে পারিত না। যদি মৃত্যু না থাকিত তাহা হইলে মানুষ এমন করিয়া একে অন্যকে স্নেহ-প্রীতি-মমতার বন্ধনে বাঁধিতে চাহিত না।

তাই আলোকের রূপসৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিতে অন্ধকার যেরূপ অপরিহার্য, সেইরূপ দুঃখবেদনা আছে বলিয়াই জীবনের সুখ-সান্ত্বনা-আনন্দ আমাদের নিকট এত কাম্য। অসুন্দর আছে বলিয়াই আমরা পরম-সুন্দরের সাধক, অভাব-অতৃপ্তি আছে বলিয়াই শিল্পবিজ্ঞানের রসায়নে আমাদের জীবনপাত্র এমন করিয়া রূপে-রসে-গানে পূর্ণ ও উচ্ছল হইয়া উঠিতেছে। আসল কথা, জগতে বৈচিত্র্য যদি না থাকিত, বিভিন্ন গুণের মধ্যে তুলনার সুযোগ মানুষ যদি লাভ না করিত তাহা হইলে কোনো অনুভূতির অস্তিত্বই সম্ভব হইত না। অনুভূতির স্বাদ জানায় বিশ্বের বিচিত্রতা—অন্ধকারের প্রেক্ষাপটেই আলোক সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

[১৪] কবির বক্তব্যটি বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া দাও :

যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

কতকগুলি অচ্ছেদ্য নীতিশৃঙ্খলার দ্বারাই সমগ্র জগৎ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই নিয়মগুলির কোনো ব্যতিক্রম কখনো হইতে পারে না। আমাদের প্রত্যেকটি কাজের

একটি অনিবার্য পরিণামফল আছে—ভালই হোক বা মন্দই হোক, সে ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে।

ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার সামাজিক বিধিবিধানের মধ্য দিয়া কতকগুলি মানুষকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে। অস্পৃশ্য বলিয়া তাহাদের দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে, শিক্ষাদীক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে মূঢ়তার অন্ধকারে ঠেলিয়া দিয়াছে—শূদ্র বেদপাঠ করিলে তাহাদের জিহ্বাকর্তনের নির্দেশ দিতে আমাদের শাস্ত্রকারদের বাধে নাই।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম উচ্চতর মানবধর্মকে আঘাত করার ফলে ভারতবর্ষের উপর আজ প্রকৃতির নির্মম প্রতিশোধ নামিয়া আসিয়াছে। আজ জাতি যতই বড়ো হইবার চেষ্টা করুক, দেশের এই অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলি পদে পদে তাহার চলার গতি ব্যাহত করিতেছে। এখন ভারতের রাষ্ট্রিক আন্দোলনে তাহারা সহায়তা করে না, আজ যে-কোনো মহৎ চেষ্টার পথে তাহারা অতিপ্রবল প্রতিবন্ধক। ভারতবর্ষ একদিন স্বেচ্ছায় নিজের জন্য যে-বন্ধন রচনা করিয়াছে, সেই বন্ধনে আজ সে নিজেই জর্জরিত।

এই নিষ্ঠুর সত্য হইতে আমাদের সকলেরই শিক্ষালাভ করা উচিত। আমাদের মনে রাখা কর্তব্য, কাহাকেও ছোট করিয়া আমরা কোনদিন বড়ো হইতে পারিব না—সকলকে বড়ো করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেই মহৎ হইবার অধিকার আমরা অর্জন করিব। ঘৃণার দ্বারা মানুষকে দূরে সরাইয়া না দিয়া প্রীতির দ্বারা তাহাকে যদি কাছে টানিয়া আনিতে পারি, তবে তাহাই আমাদিগকে শক্তি দিবে—আমরা বিনাবাধায় বিজয়পথে অগ্রসর হইতে পারিব।

দেহের এক অংশ অপরাপর অংশগুলিকে বাদ দিয়া নিজের অস্তিত্ব যখন অধিক প্রমাণিত করিতে চায়, তখনই মানবদেহে রুগ্নতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তেমনি সমাজ-দেহের প্রতি-অংশের মধ্যে নিরন্তর যদি একটা একতান সুর বাজিয়া না উঠে, তবে উহার সামঞ্জস্য বিনষ্ট হইতে বাধ্য। মানুষে মানুষে নিবিড় যোগাযোগ থাকিলেই জাতি সম্মুখে আগাইয়া চলিতে পারে। কিন্তু সমাজের বৃহত্তর অংশকে নীচে কিংবা পিছনে ফেলিয়া রাখিলে, ঐ পিছনের মানুষ সম্মুখবর্তীর পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়, তখন অগ্রগতির সকল শক্তি ব্যাহত হয়। সুতরাং আমাদের সকলকেই পণ করিতে হইবে, আমরা কোনো মানুষকে ঘৃণা করিয়া দূরে ঠেলিয়া দিব না, মানবতার অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিব না—প্রেম-প্রীতি-ভালবাসাই হইবে আমাদের নবজীবনের মন্ত্র।

[১৫] কবিতাটির মর্মার্থ ব্যাখ্যা কর ঃ

তব কাছে এই মোর শেষ নিবেদন,—
সকল দীনতা মোর করহ ছেদন

দৃঢ়বলে, অন্তরের অন্তর হইতে,
প্রভু মোর! বীর্য দেহ সুখেরে সহিতে,
সুখেরে কঠিন করি, বীর্য দেহ দুখে,
যাহে দুঃখ আপনারে শান্তস্মিত মুখে
পারে উপেক্ষিতে। ভকতিরে বীর্য দেহ,
কর্মে যাহে হয় সে সফল; প্রীতিস্নেহ
পুণ্যে উঠে ফুটি, বীর্য দেহ ক্ষুদ্র জনে
না করিতে হীনজ্ঞান,—বলের চরণে
না লুটিতে, বীর্য দেহ চিত্তেরে একাকী
প্রত্যহের তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দিতে রাখি।
বীর্য দেহ তোমার চরণে পাতি শির
অহর্নিশি আপনারে রাখিবারে স্থির।

বিশ্ববিধাতার কাছে মানুষের যাহা কাম্য তাহা সুখও নয়, শান্তিও নয়। ঈশ্বরের কাছে সংকীর্ণ সুখ প্রার্থনা করিতে করিতে তাহার হৃদয় দীন হইয়া যায়, প্রতিদিনের কাঙালবৃত্তির দ্বারা সে তিলে তিলে নিজের মনুষ্যত্বকেই খর্ব করিতে থাকে।

ভগবানের কাছ হইতে শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদস্বরূপ যাহা আমরা মাগিয়া লইব, তাহা পৌরুষ, তাহা বীর্য, তাহা শক্তি। এই শক্তি অন্যকে আঘাত করিবার জন্য নয়, ইহার সাহায্যে আমরা আমাদের অন্তরের ক্ষুদ্রতাকে বিনাশ করিব, নিজেদের গ্লানি অপনোদন করিব। সুখভোগের মধ্যে এই শক্তি আমাদের সংযম দিবে। দুঃখের আঘাত আসিলে এই শক্তির সাহায্যেই আমরা অবলীলাক্রমে তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিব, দুর্বলের ন্যায় ভাঙিয়া পড়িব না।

এই বীর্যের দ্বারাই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আন্তর অনুরাগকে আমরা মানবসেবায় নিয়োজিত করিতে পারিব। সংসারবিরাগী না হইয়া সাংসারিক মানুষের কল্যাণব্রতে আমরা আত্মসমর্পণ করিব—ইহার দ্বারাই আমাদের স্নেহভালবাসা স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া নির্মল ও পবিত্র হইয়া উঠিবে। এই শক্তির দ্বারাই আমরা দুর্গত দুঃখী মানুষকে ভালোবাসিতে পারিব। দাম্ভিকের পায়ে কখনো মাথা লুটাইব না—সংসারের বহুবিধ ঘাতপ্রতিঘাতে যে-ক্ষুদ্রতা নিরন্তর তরঙ্গিত হইয়া উঠে, যে-গ্লানি সতত আত্মপ্রকাশ করে, তাহার অশুচিতা হইতে দূরে থাকিতে পারিব, এবং সর্বোপরি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখিয়া স্থির শান্তচিত্তে কর্তব্য কর্মে অগ্রসর হইব।

বস্তুত, মানুষ হইতে হইলে বিশ্বদেবতার নিকট হইতে এই শক্তিই আমাদের প্রার্থনা করিয়া লইতে হইবে। পশুর ন্যায় গ্রাসাচ্ছাদন ও দেহধারণের জন্যই আমাদের জন্ম হয় নাই, আমরা মনুষ্যত্বের অধিকার লইয়া জন্মিয়াছি। পৃথিবীর যাহা কিছু পাপ,

গ্লানি ও অসত্য তাহা দূর করিবার ব্রতই আমরা পালন করিয়া যাইব—বিশ্বস্রষ্টা প্রতিনিয়ত আমাদের অন্তরে তাঁহার অনির্বাণ শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিবেন।

[১৬] মর্মার্থ বিশদ কর :

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

ক্ষমাশীলতা মানুষের একটি মহৎ গুণ, সন্দেহ নাই। অপরাধ মার্জনা করার মধ্যে যে-ঔদার্য আছে, যে-সহনশক্তি আছে তাহা মহৎহৃদয় শ্রেষ্ঠজনের চরিত্রের বিশেষত্ব। কিন্তু ক্ষমারও একটা সীমা আছে। অন্যায়কারী ও উৎপীড়ককে নির্বিচারে ক্ষমা করিয়া চলার মধ্যে কোনো মহত্ত্ব নাই—আছে দুর্বলতা, আছে ভীরুতা। অন্যায় করিয়া কেহ যদি অবিরত মার্জনাই লাভ করিতে থাকে, তবে তাহার অপরাধপ্রবণতা দিনের পর দিন প্রবল হইয়া উঠে, বাধা না-পাইয়া না-পাইয়া ক্রমশ সে সমস্ত সমাজ-মানুষের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

এই অত্যাচারীরা অপরাধী। কিন্তু ইহাদের যাহারা ক্রমাগত ক্ষমার প্রশ্রয় দিয়া চলে তাহাদের অপরাধও নগণ্য নহে। তাহারা ইহাদের অন্যায়কে বাধা না দিয়া ক্রমশ তাহাকে বাড়িতে দেয়, ফলে পরোক্ষে তাহারাও সমাজের শত্রুতাসাধন করিতে থাকে। সুতরাং এই জাতীয় সমাজশত্রুদের সম্পর্কে ক্ষমার দুর্বলতা আমাদের সংযত করিতে হইবে, তাহাদের অপরাধের দণ্ড দিবার জন্য তৎপর হইতে হইবে। এই মহান ব্রত পালন করিতে যে পরাঙ্মুখ হয়, ভগবান তাহাকেও ক্ষমা করিবেন না। তাঁহার বিচারের রুদ্ররোষানলে অন্যায়কারীর মতো অন্যায়ক্ষমাকারীও মুহূর্তে বিশুষ্ক তৃণপর্ণের মত ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

[১৭] ভাবসম্প্রসারণ কর :

কেরোসিনশিখা বলে মাটির প্রদীপে,
'ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে।'
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরোসিন বলি উঠে, 'এসো মোর দাদা।'

পৃথিবীর সাধারণ মানুষের চরিত্রের একটা দিক এই-কয়টি ছত্রের মধ্যে অতি-সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কেন জানি না, সামাজিক পদমর্যাদা ও আভি-জাত্যের প্রতি মানুষের একটা দুর্বলতামিশ্রিত মোহ রহিয়াছে। তাই আত্মজন যদি দরিদ্র হয়, তাহা হইলে এক শ্রেণীর আত্মম্ভরী মানুষ সেই হতভাগ্যের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধস্বীকারে আন্তরিক কুণ্ঠা অনুভব করে—দারিদ্র্যগ্রস্ত আত্মীয়কে সে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় ও তাহার সামাজিক মর্যাদার ক্ষতিকারক বলিয়া মনে করে। এই কারণে

দরিদ্রের আত্মীয়তাকে সে যথাসাধ্য ঢাকিয়া রাখিবার প্রয়াস পায়। এমন কি, কোনো মুহূর্তে তাহা প্রকাশ পাইয়া যায়, এই আশঙ্কায় উক্ত আত্মীয়কে সে ভীতি প্রদর্শন করিতেও দ্বিধাবোধ করে না।

কিন্তু যে-ব্যক্তি তাহার অপেক্ষা অধিকতর গৌরব ও মর্যাদার অধিকারী, এই আত্মম্ভরী মানুষটি অকুণ্ঠ চিত্তে তাহার চাটুকারিতা ও পদলেহন করিতে সতত প্রস্তুত। যতই দূরত্ব ও ব্যবধান থাকুক না কেন, তাঁহার সহিত একটা কাল্পনিক সম্পর্ক সে গড়িয়া লয় এবং তারস্বরে তাহা ঘোষণা করিতে থাকে। সে বিশ্বাস করে, ইহাতে তাহারও পদমর্যাদা এবং সম্ভ্রম বাড়িবে, সে-ও উক্ত শ্রদ্ধেয় জনের ন্যায় জনসমাদর লাভ করিবে। আমাদের সামাজিক জীবনে এরূপ ঘটনা আমরা প্রতিনিয়ত দেখিতে পাই। ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে কোনো উৎসবের সময়ে কিংবা শুভকর্মে যখন কোনো প্রতিপত্তিশালী অনাত্মীয়কে সাদরে আহ্বান করিয়া ষোড়শোপচারে পরিতুষ্ট করা হয়, হয়তো সেই মুহূর্তেই তাহার সহোদর ভ্রাতা দারিদ্র্যের অপরাধে গৃহদ্বার হইতে বিতাড়িত হইয়া ব্যথিত হৃদয়ে চলিয়া যায়। মিথ্যা-সম্মানবোধের প্রবল মোহ মানুষকে যে মূঢ়তায় অন্ধ করিয়া তোলে এবং এরূপ মনোবৃত্তি যে একান্ত অশ্রদ্ধেয়. কেরোসিন-শিখার চরিত্রের মধ্য দিয়া রূপকচ্ছলে এই মর্মান্তিক সত্যটিই উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

[১৮] ভাবসত্য বিশদরূপে পরিস্ফুট কর ঃ

যার খুসি রুদ্ধ চক্ষে করো বসি ধ্যান,
বিশ্ব সত্য কিংবা মিথ্যা লভো সেই জ্ঞান।
আমি ততক্ষণ বসি নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে।

পৃথিবীতে এমন একদল তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও দার্শনিকের সন্ধান মিলে, যাহারা পরিপূর্ণ-ভাবেই জীবনবিমুখ। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শভরা এই আনন্দনিকেতন বিশ্বসংসারকে তাহারা নিতান্তই মায়াপ্রপঞ্চ বলিয়া মনে করে—সংসারিক মানুষের হাসি-আনন্দ-প্রেমকে একান্ত ক্ষণস্থায়ী মরীচিকা বলিয়া তাহাদের বোধ হয়। তাই বিশ্বস্রষ্টার নানা-বর্ণ-গন্ধ-ভরা এই অপরূপ বিশ্বরচনাকে তাহারা চোখ মেলিয়া দেখিতে চায় না, মানুষের প্রীতিপ্রেমে অভিষিক্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইতে তাহারা পারে না। বাস্তব বিশ্বকে মায়া জানিয়া এইসব মানুষ অবাস্তব বিশ্বতত্ত্বের সন্ধান করে, জগৎকে মিথ্যা মনে করিয়া দুর্বোধ্য শূন্যতার সাধনায় নিজেদের বিড়ম্বিত করে—তাই আনন্দ ও সুন্দরের অর্ঘ্য তাহাদের নিকট হইতে নিরন্তর প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া যায়।

কিন্তু যিনি জীবনপ্রেমিক, তিনি জানেন, জগৎস্রষ্টা কেবল অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মস্বরূপমাত্রই নহেন। বিশ্বদেবতা নিখিল প্রকৃতির দিকে দিকে আপন লীলাবিভূতি বিকীর্ণ করিয়া

দিয়াছেন, তাঁহার আশ্চর্যসুন্দর রূপের দ্যুতিতেই পৃথিবী নানাবর্ণে দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে, তাঁহার প্রেম এবং শুভকামনার স্পর্শেই জীবসংসার মধুর মাঙ্গল্যে শুচিস্মিত হইতেছে। তাই যথার্থ জীবনরসিক এই জগৎকে মায়ার ছলনা মনে করিয়া কখনো আত্মবঞ্চনা করেন না। তিনি দুই চোখ ভরিয়া জগৎটাকে দেখিতে চান, জাগতিক সৌন্দর্যবিকাশের মধ্যেই রূপরসময় বিশ্বস্রষ্টার নিগূঢ় সত্তাটিকে অনুভব ও আস্বাদন করেন। সংসারের স্নেহপ্রীতি তাঁহার জীবনসাধনাকে চরিতার্থ করে, মানুষ এবং মর্ত্যের মৃত্তিকাকে যথার্থ ভালবাসিয়া তিনি ধন্য হন।

[১৯] কবিতাটির মর্মার্থ প্রকাশ কর :

এ কি রঙ্গ! অফুরন্ত জন্মমৃত্যুখেলা,
তরুবল্লী-পশুপক্ষী-পতঙ্গের মেলা!
মুক্ত দ্বার, অবারিত প্রাণের ভাণ্ডার—
অকস্মাৎ যবনিকা মাঝখানে তার!
কবে বল, কোথা কোন্ নেপথ্যআড়ালে,
কোন্ রজনীর প্রান্তে দীপ্ত চক্রবালে
ফুরাইবে এ বিরহ? পারাবারশেষে
চুম্বিব অনন্ত বেলা তোমারি উদ্দেশে!

আমাদের এই মাটির পৃথিবী কত সুন্দর! সৃষ্টির আদিযুগ হইতে এই সংসার-রঙ্গভূমিতে চলিয়াছে প্রাণের অন্তহীন লীলাখেলা। তৃণতরুলতা, পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ আর লক্ষ কোটি মানবহৃদয় অবারিত প্রাণতরঙ্গে সতত স্পন্দিত। সকলেই জীবনের অফুরন্ত স্রোতে ভাসমান।

কিন্তু এই যে অনন্ত প্রাণীপর্যায়ের পরমসুন্দর মিলনোৎসব, অকস্মাৎ একদিন ইহাকে স্পর্শ করে মহামৃত্যুর কালোছায়া। তাই জীবের প্রাণলীলা মৃত্যুর দ্বারা মধ্যপথে খণ্ডিত মনে হয়, তাহাদের অবারিত স্বাধীনতার মধ্যে এক অলক্ষ্য বাধার ছেদ পড়ে। কেমন করিয়া এই ব্যবধানের অবসান ঘটিবে, সেই চিন্তায় মানবমন সর্বদা ব্যাকুল। শোনা যায়, সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া নাবিকেরা বেলাভূমির মৃত্তিকা চুম্বন করে। সুদীর্ঘ মরণরাত্রির অবসানের পর আদিম প্রাণউৎসের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য মানুষেরও আকুল আগ্রহের অন্ত নাই।

[২০] নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটির ভাবার্থ লেখ :

"সমস্ত সৌরজগৎ যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতেছে, তেমনি অন্তদিক দিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন মানবজীবনকে কেন্দ্র করিয়া সমস্ত বিশ্বচরাচর দিবারাত্র ঘুরিতেছে। এই যে বিপুল বিশ্বব্যাপী নিগূঢ় আকর্ষণ, ইহাকে এক হিসাবে বিশাল

বিশ্বের কেন্দ্রগামিনী শক্তি বলা যাইতে পারে। সংসারের মানব এই বহুধা বিভিন্ন শক্তিসঙ্ঘের অবিরাম ঘাতপ্রতিঘাতে সর্বদা স্পন্দিত, জাগ্রৎ ও প্রবুদ্ধ। এই যে এক অচেনা, অজানা, বিপুল ব্রহ্মাণ্ডশক্তিনিচয়ের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া মানব ধীরে ধীরে আপনার শক্তিসঞ্চয়পূর্বক অন্যসকল শক্তিকে অভিভূত করিবার নিয়ত চেষ্টায় কখনও উঠিতেছে, কখনও-বা পড়িতেছে—ইহাই মানবের সংসার, ইহাই মানবের ভাগ্য। সুখ এবং দুঃখ এই ভাগ্যেরই অবস্থাবিপর্যয়। কখনও সুখরবির খর কিরণে সে-ভাগ্য প্রসন্ন, নির্মল, জাজ্জ্বল্যমান ; আবার, কখনও সে-সুখ কেন্দ্রীয় ঊষার ন্যায় ক্ষণিক ম্লান আলোকে দুঃখের তমিস্রা কথঞ্চিৎ অবসান করিয়া দেয়।"

এই বিপুল বিশ্বের রহস্যময় শক্তির প্রভাবে থাকিয়া পৃথিবীর মানুষ আপন আপন শক্তির স্ফুরণ ঘটায়, উহার অনুশীলন করে। জগতের বিচিত্র শক্তির সহিত প্রতিনিয়ত সংঘর্ষই আত্মপ্রবুদ্ধ মানবের প্রেরণার ক্ষেত্র। লক্ষ কোটি মানুষের উত্থানপতন, সুখদুঃখ, তাহাদের সকল ভাগ্য এই সংঘাতের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই সংঘর্ষের জন্যই নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও সাফল্য মানবের ভাগ্যে ঘটে না—সুখের তারতম্য ইহারই অনিবার্য ফল।

[২১] নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটির মর্মার্থ প্রকাশ কর :

বিশ্বকর্মা, দয়া করে দাও না কিছু কাজ কর্মশালায় তব,
বড়ো কাজে দিলেই হাত পাব দারুণ লাজ, ছোট কাজেই রব।
চন্দ্র যেথা নির্ঘোষে তার কানে লাগায় তালা,
উত্তাপে যার রুদ্ধশ্বাস—গাত্রে ধরে জ্বালা—
সহ্য আমার হয় কি না-হয় আজ।
সইতে শিখি দিনে দিনে একটু দূরে থেকে,
করতে শিখি কর্মী যারা তাদের দেখে দেখে,
পরতে শিখি শক্ত কাজের যোগ্য যেই সাজ,
চর্ম বর্ম নব—
বিশ্বকর্মা, দয়া করে দাও না কিছু কাজ
কর্মশালায় তব।

আমাদের এই বিশাল বিশ্বপৃথিবী এক বিপুল কর্মক্ষেত্র। কর্মপ্রবাহে সমস্ত জগৎ অবিশ্রাম ছুটিয়া চলিয়াছে। এই কর্মস্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দেওয়াতেই মানুষের অশেষ আনন্দ। কিন্তু মানুষ বড়ো কাজ একদিনেই প্রথমে সম্পাদন করিতে পারে না। নিজ নিজ শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই তাহাকে বড়ো কাজের যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। প্রথমে বড়ো কাজে হাত দিয়া ব্যর্থকাম

হওয়া অপেক্ষা ছোট কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া সফলতা অর্জন করাই কর্মীর পক্ষে গৌরবজনক। বৃহৎ কর্মসম্পাদনের জন্য বিপুল শক্তি অর্জন করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

[২২] নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশটির ভাবার্থ তোমার নিজের ভাষায় খুব সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ বর :

নব নব ক্ষুধা, নূতন তৃষ্ণা, নিত্য নূতন কর্মনিষ্ঠা,
জীবনগ্রন্থে, নূতন পৃষ্ঠা উলটিয়া যাব ত্বরিতে।
জটিল-কুটিল চলেছে পন্থ, নাহি তার আদি নাহিক অন্ত—
উদ্দাম বেগে ধাই তুরন্ত সিন্ধু-শৈল-সরিতে।
শুধু সম্মুখে চলেছি লক্ষ্য, আমি নীড়হারা নিশার পক্ষী,
তুমিও চলেছ চপলা লক্ষ্মী আলেয়াহাস্যে ধাঁধিয়া।
পূজা দিয়ে পদ করি না ভিক্ষা, বসিয়া করি না তব প্রতীক্ষা,
কে কারে জিনিবে হবে পরীক্ষা, আনিব তোমারে বাঁধিয়া।

আপনার ভাগ্যলক্ষ্মীকে করায়ত্ত করিবার জন্য পৃথিবীর মানুষের প্রচেষ্টার অন্ত নাই। মানুষ তাহার হৃদয়বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য কত বিচিত্র কর্মস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে। তাহার কর্মসাধনার পথ মসৃণ নয়—উহা অতি দুর্গম, অন্তহীন। সে-পথের শেষ কোথায়, মানুষ তাহা জানে না। কর্মচঞ্চল মানুষকে সৌভাগ্যলক্ষ্মী কেবল ইসারায় সম্মুখের পথে আহ্বান করিতেছে। লক্ষ্মী চিরচঞ্চলা, মানুষের গতিও দুর্নিবার। যে-মানুষ জীবনে যথার্থ সফলতা অর্জন করিয়া মানব-নামের যোগ্য হইতে চায়, তাহারা কখনো ভাগ্যের কৃপাভিক্ষা করে না। লক্ষ্মীকে জয় করিয়া তাহারা আপন আপন ভাগ্যরচনা করে, তাহারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যবিধাতা। সফল-কাম মানুষের জীবন ভাগ্যকে জয় করিবার সংগ্রামক্ষেত্র ছাড়া অন্য কিছু নয়।

[২৩] নিম্নোদ্ধৃত কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবটি পরিস্ফুট কর :

বড়ো ভালবাসি আমি ভ্রমিতে এ স্থলে—
তত্ত্বশিক্ষাদায়ী স্থল জ্ঞানের নয়নে।
নীরবে আসীন হেথা দেখি ভস্মাসনে
মৃত্যু—তেজোহীন আঁখি, হাড়মালা গলে,
বিকট অধরে হাসি, যেন ঠাট ছলে,
অর্থের গৌরব বৃথা হেথা—এ সদনে ;
রূপের প্রফুল্ল ফুল শুষ্ক হুতাশনে ;
বিদ্যা-বুদ্ধি-বল-মান বিফল সকলে।

কি সুন্দর অট্টালিকা, কি কুটীরবাসী,
কি রাজা, কি প্রজা—হেথা উভয়ের গতি—
জীবনের স্রোত পড়ে এ সাগরে আসি।
গহন কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি
পত্রপুঞ্জে—আয়ুকুঞ্জে কাল, জীবরাশি
উড়ায়ে, এ নদপারে তাড়ায় তেমতি।

এই পৃথিবীতে অর্থ, ঐশ্বর্য, বিদ্যা, শক্তি, সম্মান, রূপ, সম্পদ প্রভৃতি অনিত্য বস্তু লইয়া অজ্ঞান মানুষের প্রমত্ততার অন্ত নাই। কিন্তু এইসব জাগতিক বস্তু যে কত মিথ্যা, কতখানি ক্ষণভঙ্গুর, সংসারের ভোগাসক্ত মানুষ তাহা সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না—পার্থিব তুচ্ছতায় তাহাদের দৃষ্টি সমাচ্ছন্ন। কিন্তু শ্মশানে আসিয়া মহামৃত্যুকে যখন মানুষ একান্ত নগ্নভাবে সাক্ষাৎ করে, তখন পৃথিবীর নশ্বরতার রূপ তাহার দুইচোখে ভাসিয়া উঠে। জীবনের সকল স্রোত মরণের সমুদ্রে আসিয়া বিলীন ও স্তব্ধ হইয়া যায়, এইখানেই মানবের সমস্ত-কিছুরই অবসান ঘটে। জগতের মধ্যে মানুষের তত্ত্বশিক্ষা ও সত্যজ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ স্থল হইতেছে মহাশ্মশান।

[২৪] তোমার নিজের ভাষায় নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটির মর্মার্থ প্রকাশ কর ঃ

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর—
লহ যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর,
হে নবসভ্যতা, হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন, পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবারধান্যের মুষ্টি, বল্কলবসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি ; পাষাণপিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব—
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,
পরাণে স্পর্শিতে চাই—ছিঁড়িয়া বন্ধন—
অনন্ত এ জগতের হৃদয়স্পন্দন।

বর্তমানের পাশ্চাত্য নাগরিক সভ্যতা একান্তভাবে বস্তুতান্ত্রিক, নিষ্প্রাণ। অমৃত-পিপাসু মানবাত্মাকে ইহা নিয়ত পীড়ন করে। এই সভ্যতার বুকে পুঞ্জীভূত বস্তু ও

ভোগের ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু ইহা শাশ্বত অমৃতলোক হইতে আমাদিগকে চিরকালের জন্য নির্বাসিত করিয়াছে। প্রাচীন ভারতের আরণ্য সভ্যতার আনন্দময় সত্তার স্পর্শ ইহাতে কোথায়! স্নিগ্ধপবিত্র বনপ্রকৃতির আবেষ্টনীতে থাকিয়া একদিন আমরা জগৎ ও জীবনের রহস্যময় সুমহান তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলাম। তখন আমাদের জীবনে গ্লানিহীন শান্তি ছিল, ছিল আত্মার নির্বিরোধ স্বাধীনতা। বিশ্বের অফুরন্ত প্রাণপ্রবাহ হইতে আমরা আজ দূরে সরিয়া আসিয়াছি। যে-নিগূঢ় শক্তির বলে আমরা নিখিলের আনন্দধারা পান করিয়াছিলাম, সেই শক্তি আবার আমরা ফিরিয়া চাই। সেইজন্য আমাদিগকে ফিরিয়া পাইতে হইবে তপোবন-প্রকৃতিকে, আরণ্য সভ্যতাকে।

[২৫] নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটির সারমর্ম প্রকাশ কর :

"একদিক হইতে দৃষ্টিপাত করিলে ধর্ম অনেক স্থলে জ্ঞানের অন্তরায় ও নীতির অন্তরায়স্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া মনুষ্যের উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট বিঘ্নসাধন করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তথাপি কত সহস্র বৎসর ধরিয়া মানবসভ্যতার প্রভাতাগম অবধি বিংশ শতাব্দীর উন্নতির কোলাহলমধ্যেও সহস্র দেবমন্দির, গির্জাঘর ও মসজিদের উন্নত চূড়ার নিম্নদেশে কোটি কোটি নরনারী হৃদয়ের আন্তরিক ব্যাকুলতা ও শ্রদ্ধার সহিত অতিপ্রাকৃতের উদ্দেশে যে-সকল অনুষ্ঠান সম্পাদন করিয়া আসিতেছে, তাহার উদ্দেশ্যের অপলাপ করিলে ঐতিহাসিক সত্যের নিকট অপরাধী হইতে হয়। মানবেতিহাসের বিস্তীর্ণ কাহিনী হইতে তাড়িতযন্ত্র ও বাষ্পীয় যান, আরিষ্টটল ও নিউটনকে বর্জন করা যাইতে পারে; কিন্তু এই মসজিদ ও মন্দিরগুলির বিবরণ বর্জন করিলে ইতিহাস জীর্ণ শীর্ণ ও বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে। ধর্মানুষ্ঠানের মূলে যুক্তি থাক আর নাই থাক, ইহার মতো সত্য ঘটনা মনুষ্যের ইতিহাসে অস্তিত্বহীন। মনুষ্যের ইতিহাসে বোধহয় এমন দিন ছিল, যখন নীতির শাসনের উদ্ভব হয় নাই, যখন রাজশাসনের স্ফূর্তি ছিল না—ধর্মানুষ্ঠানই তখন মনুষ্যসমাজকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। এখনও পৃথিবীতে যে-সকল অসভ্য সমাজ বর্তমান আছে, তাহাদের পর্যালোচনা হইতে এইরূপ অনুমানই সংগত বোধ হয়।"

পৃথিবীতে মানবসভ্যতার প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের হৃদয়ে ধর্মভাবের স্ফুরণ ঘটে। এই ধর্মভাবের সঙ্গে জ্ঞান ও নীতিবোধের হয়তো কোনো কোনো স্থলে বিরোধ আছে, হয়তো ইহা মানুষের উন্নতিকে ব্যাহত করিয়াছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দর্শনবিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগেও ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই। বস্তুত ধর্মকে বাদ দিলে মানবসভ্যতার ইতিহাস অপূর্ণই থাকিয়া যায়। যখন রাষ্ট্রশাসন এবং সমাজনীতির

জন্ম হয় নাই, তখন ধর্মই ছিল মনুষ্যসমাজের শৃঙ্খলাবন্ধনের একমাত্র ভিত্তি। আধুনিক যুগের তথাকথিত অসভ্য সমাজ এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে।

[২৬] নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটির সারমর্ম প্রকাশ কর ঃ

"ঈশ্বরকে আর কাহারও হাত দিয়া আমরা পাইব না। তাঁহার কাছে নিজে যাইতে হইবে, তাঁহাকে নিজে পাইতে হইবে—দুঃসাধ্য হয় সেও ভাল, বিলম্ব হয় তাহাতে ক্ষতি নাই। অন্যের মুখে শুনিয়া, উপদেশ পাইয়া, অনুষ্ঠান পালন করিয়া আমরা মনে করি, যেন আমরা চরিতার্থতা লাভ করিলাম। কিন্তু সে তো ঘটির জল, সে তো উৎস নহে। তাহা মলিন হয়, তাহা ফুরাইয়া যায়, তাহাতে আমাদের সমস্ত জীবন অভিষিক্ত হয় না, এবং তাহা লইয়া আমরা বিষয়ী লোকের মতোই অহংকার ও দলাদলি করিতে থাকি। এমন ঘটির জলে আমাদের চলিবে না—সেই উৎসের কাছে আমাদের প্রত্যেককেই যাইতে হইবে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের নিজের একান্ত সম্বন্ধ তাঁহার সম্মুখে গিয়া আমাদিগকে নিজে স্বীকার করিতে হইবে। সম্রাট যখন আমাকে দরবারে ডাকেন তখন প্রতিনিধি পাঠাইয়া কি কাজ সারিতে পারি? ঈশ্বর যে আমাদের প্রত্যেককে ডাক দিয়াছেন, সেই ডাকে সাড়া দিয়া একেবারে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলে কোনমতেই আমাদের সার্থকতা নাই।"

সম্পূর্ণভাবে নিজের আত্মাকে সমর্পিত করিয়া দেওয়া ছাড়া ঈশ্বরকে লাভ করিবার অন্য কোনো উপায় নাই। শাস্ত্রীয় উপদেশ, ধর্মীয় আচারবিধি আমাদের আত্মার পিপাসা কখনও নিবৃত্ত করিতে পারে না। ইহারা কেবল মানুষের অহংকার বাড়ায়, মানুষে মানুষে বিভেদের সৃষ্টি করে। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের আত্মার প্রত্যক্ষ সংযোগ-সাধন করিতে না পারিলে তাঁহাকে পাওয়া কখনো সম্পূর্ণ হইতে পারে না। হৃদয়কে একেবারে অনর্গলিত করিয়া দিয়া তাঁহার আহ্বানবাণীকে আমাদের জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে হইবে—তবেই আমরা ভগবানের যথার্থ সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিব।

[২৭] নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটির মর্মসত্য পরিস্ফুট কর ঃ

অমৃতপিপাসা ও অমৃতসন্ধানের পথে ঐশ্বর্য একটি প্রধান অন্তরায়। সামান্য সোনার প্রাচীর উচ্চ হইয়া উঠিয়া আমাদের দৃষ্টি হইতে অনন্ত আকাশের অমৃতআলোক রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতে পারে। ধনসম্পদের মধ্যেই দীন হৃদয় আপনার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে থাকে। সে বলে, 'এই তো আমি কৃতার্থ হইয়াছি, দেশ আমার স্তব করিতেছে, দেশে আমার প্রতাপ বিকীর্ণ হইতেছে, বাহিরে আমার আড়ম্বর অভ্র ভেদ করিতেছে, ঘরে আমার আরামশয়ন প্রতিদিন স্তরে স্তরে রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে, আমার আর কী চাই!' হায় রে দরিদ্র, নিখিল-মানবের অন্তরাত্মা যখন ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছে,

'যাহাতে আমি অমর না হইব, তাহা লইয়া আমি কী করিব—যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্'—সপ্তলোক যখন অন্তরীক্ষে উর্ধ্ব কররাজি প্রসারিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছে, 'আমাকে সত্য দাও, আলোক দাও, অমৃত দাও—অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়'—তখন তুমি বলিতেছ, 'আমার ধন আছে, আমার মান আছে, আমার আরাম আছে, আমি প্রভু, আমি অধিপতি, আমার আর কী চাই !' ঐশ্বর্যের ইহাই বিড়ম্বনা—দীনাত্মার কাছে ঐশ্বর্যই চরম রূপ ধারণ করে।"

সম্পদ মানুষের আত্মাকে দীন দরিদ্র করিয়া রাখে, তাহাকে অমৃতের আনন্দলোক হইতে চিরকালের জন্য নির্বাসিত করে। ঐশ্বর্য মানবের অন্তরে অহংকারের প্রমত্ততাকে স্ফীত করিয়া তোলে, পার্থিব অনিত্যতাকেই মানুষের চরম প্রাপ্তি ও সার্থকতা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মায়। যে মানুষ অমৃতত্বের পিয়াসী, তাহার তৃষ্ণার্ত আত্মা চায় সত্য আর জ্ঞানের আলো। কিন্তু অহংসর্বস্ব দীন-আত্মা ধনী চায় নিত্য আরাম, বিলাস, প্রতাপ—ইহাই ঐশ্বর্যের চরম অভিশাপ। সম্পদের প্রাচুর্য মানবকে মনুষ্যধর্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া আত্মার ক্ষেত্রে একান্ত দরিদ্র করিয়া তোলে।

[২৮] নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটির ভাবার্থ প্রকাশ কর :

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস, ঋষি দ্বৈপায়ন
ঢালি সংস্কৃতহ্রদে রাখিলা তেমতি,—
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন!
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নরকুলধন।)
সগরবংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রতা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন;
সেইরূপে ভাষাপথ খননি স্ববলে
ভারত-রসের স্রোত আনিয়াছ তুমি,
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে।
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃতসমান,
হে কাশি! কবীশদলে তুমি পুণ্যবান।

মহর্ষি বেদব্যাস জনসাধারণের অবোধ্য দুরূহ সংস্কৃত-ভাষায় মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। ফলে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বাংলার জনগণ ভারত-মহাকাব্যের রসধারা আস্বাদন করিতে না পারিয়া অসীম দুঃখবোধ করিত। কাশীরাম দাস বঙ্গবাসীর

রসপিপাসা নিবৃত্ত করিবার জন্য সংস্কৃত-মহাভারত বাংলা ভাষায় অনূদিত করিলেন। কাব্যপিপাসু বাঙালী জাতি এইজন্য কাশীরাম দাসের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। কাব্যসংসারে কবি কাশীরাম দাস সত্যই পুণ্যাত্মা।

[২৯] ভাবসম্প্রসারণ কর :

দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটাকে রুখি,
সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি।

একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, যাহা অভ্রান্ত তাহাই সত্য। কিন্তু ইহাও সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, এই সত্যবস্তুটি সহজলভ্য নয়—ইহা দুষ্প্রাপনীয়। আলোর সঙ্গে অন্ধকার, পূর্ণিমার সঙ্গে অমাবস্যা যেমন জড়িত, তেমনি সত্যও নানা ভুলভ্রান্তি, নানা মিথ্যার দ্বারা আবৃত। জীবনে বাস্তব অভিজ্ঞতার দুর্গম পথে চলিতে চলিতে এই ভুলভ্রান্তি-মিথ্যাকে অপসারিত করিয়া দিয়াই মানুষকে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াইতে হয়। আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়, সকল হৃদয়মনকে অবারিত রাখিয়া সত্যের পথে অগ্রসর হইতে হইবে—অজস্র ভুলভ্রান্তি অতিক্রম করিলেই তবে যথার্থ সত্যের সন্ধান মিলে। যাহারা ভ্রান্তি এড়াইয়াই সত্যকে লাভ করিতে চায় তাহারা সত্যের সন্ধান কখনো পায় না। অকৃতকার্যতা যেমন চরম সফলতার প্রতিবন্ধক নয়, তেমনি ভুলত্রুটিও সত্যের প্রতিকূল নয়। বরংচ ভুল করিতে করিতেই মানুষ সত্যের অন্দরমহলে প্রবেশ করিবার সিংহদ্বারটি খুঁজিয়া পায়। যে-মানুষ কোনদিন ভুল করিল না, সত্যকেও সে পাইল না—ভ্রমপ্রমাদ দ্বারা আকীর্ণ বলিয়াই সত্য-পদার্থটি জগতে এমন দুর্লভ।

[৩০] ভাবসম্প্রসারণ কর :

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
'ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।'
নদীর এপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
কহে, 'যাহাকিছু সুখ সকলি ওপারে।'

যে-বস্তুটি সম্পূর্ণ করায়ত্ত, তাহা লইয়া মানুষের সুখ নাই, পরিতৃপ্তি নাই। প্রাপ্ত-বস্তুকে লইয়া মানুষ কোনদিনই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাই অপ্রাপনীয়কে লাভ করিবার জন্য তাহার অন্তরতর হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে। নাগালের বাইরের জিনিস তাহাকে বারবার হাতছানি দিয়া ডাকে—একটা চিরন্তন অতৃপ্তি সৃষ্টির আদিম লগ্ন হইতেই তাহাকে ঘরছাড়া পথের পথিক করিয়াছে। সুখশান্তি, চিরতৃপ্তি, আদর্শলোক প্রভৃতি মানবের কাম্যবস্তু যেন মায়ামৃগ। মানুষ যতই এই মায়ামৃগের পিছনে অন্ধভাবে ধাবিত হইতেছে, ততই সে দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া যাইতেছে। অ-ধরাকে,

অপ্রাপনীয়কে মানুষ ধরিবে কেমন করিয়া ? মানুষ যাহা পায় তাহা চায় না, যাহা চায় তাহা পায় না। 'আমি যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না'— জীবজগতে কেবল মানুষের মুখেই এমন একটি অদ্ভুত কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

উপরি-উদ্ধৃত কবিতায় নদীর এপার-ওপার বাস্তব সংসারে আপন আপন অবস্থায় অপরিতৃপ্ত অশান্তচিত্ত মানুষেরই রূপক। এপারের তটভূমি ভাবে, সুখ-সৌন্দর্য-মাধুর্য সকলই বুঝি ওপারে,—আর ওপারও ঠিক একই ভাবনায় পীড়িত। আসল কথা হইল, সুখ-শান্তি-আনন্দ-সৌন্দর্য বলিয়া যদি কিছু থাকে, তবে তাহা সর্বত্রই আছে। না থাকিলে, কোথাও নাই। যাহা মানসকল্পিত, বাস্তবে কিছুতেই তাহাকে পাওয়া যাইবে না। অথচ দূরের প্রতি, অপরিচিতের প্রতি, আপন মনের সৃষ্টির প্রতি মানুষের একটা দুর্বার মোহ আছে। সেই মোহজড়িত দৃষ্টিতে দূরের কাল্পনিক সুখসৌন্দর্যের দিকে তাকাইয়া মানুষ প্রতিমুহূর্তে সকরুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এই দুর্বলতা মানুষের চিরকালের।

[৩১] ভাবসম্প্রসারণ কর :

তপন-উদয়ে হবে মহিমার ক্ষয়,
তবু প্রভাতের চাঁদ শান্তমুখে কয়—
অপেক্ষা করিয়া আছি অস্তসিন্ধুতীরে,
প্রণাম করিয়া যাব উদিত রবিরে।

অহংবোধ মানুষের চিত্তদেশ যখন অধিকার করিয়া বসে, তখন সে হইয়া উঠে গর্বিত, সংকীর্ণমনা, তখন তাহার চরিত্রধর্মে প্রকাশ পায় নানারকমের দুর্বলতা—ঈর্ষা আর দম্ভ। এই সংকীর্ণদৃষ্টি অহংবুদ্ধির জন্যই মানুষ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব-মহত্ত্বকে সহজ স্বীকৃতি জানাইতে কুণ্ঠা বোধ করে। কিন্তু যাঁহাদের দৃষ্টি উদার, সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে যাঁহাদের স্থিতি, তাঁহারা গুণীর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন নতিস্বীকারের মধ্য দিয়া। যিনি সত্যই গৌরবমর্যাদার অধিকারী, তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া আমরা আমাদের নিজকেই সম্মানিত করি। প্রকৃত গুণীকে স্বীকার করিয়া লইবার মধ্যে মানুষের অগৌরবের কিছুই নাই। কিন্তু এই সহজ সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারি না বলিয়াই ঈর্ষা, অহংকার, দাম্ভিকতা, চিত্তের ক্ষুদ্রতা আমাদের মনুষ্যত্বধর্মকে সতত পীড়িত করিতেছে—ইহাতে মানবের সত্যধর্ম হইতে আমরা ভ্রষ্ট হইয়া পড়ি। প্রভাতের চাঁদ অস্তগমনমুহূর্তে উদিত রবিকে প্রণাম জানাইয়া কেবল সূর্যদেবতাকেই যে সম্মানিত করিল তাহা নয়, গুণীর মর্যাদার অকৃপণ স্বীকৃতি তাহার আপন চরিত্রগৌরবকেও উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

[৩২] ভাবসম্প্রসারণ কর :

শৈবাল দীঘিরে বলে উচ্চ করি শির,
লিখে রেখো, একফোঁটা দিলেম শিশির।

উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তি-দুইটির ভিতর দিয়া কবি এই বাস্তব-সংসারের সংকীর্ণচিত্ত, কৃতজ্ঞতা-বোধহীন মানবগোষ্ঠির চরিত্রস্বরূপটি চমৎকার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। এ জগতে এমন মানুষের অভাব নাই, যাহারা সামান্য উপকার করিয়া উপকৃত ব্যক্তির কাছে সেই উপকারের কথাটি সদম্ভে প্রচার করিতে এতটুকু সংকোচ কিংবা কুণ্ঠাবোধ করে না। যৎসামান্য দানের গর্বে এইসব সংকীর্ণচেতার দল অহংকৃত হইয়া উঠে—আত্মপ্রচার দ্বারা সেই দানের, সেই উপকারের মূল্য যদি না পাইল, তাহারা ভাবে, তাহা হইলে আপনার কৃত উপকার বুঝি ব্যর্থ হইয়া গেল। সেজন্য আপন দানকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য তাহাদের হাস্যকর প্রয়াসের অন্ত নাই।

কিন্তু যে-মানুষ উদারপ্রাণ, প্রকৃতই মহৎ, সে কখনো উপকার করিয়া দম্ভ প্রকাশ করে না। মনুষ্যত্ববোধের প্রেরণাতেই সে পরের অভাব-দুঃখ-মোচনের চেষ্টা করে, মানুষের কল্যাণসাধনের প্রয়াস পায়। আপন দানের স্বীকৃতির কাঙাল সে নয়, তাহার অন্তরে কৃতজ্ঞতালাভের আকাংক্ষা এতটুকুও স্থান পায় না। যে-দানধর্ম সংকীর্ণহৃদয় মানুষের নিকট পরের উপকার বলিয়াই প্রতিভাত, মহৎপ্রাণ ব্যক্তির কাছে তাহা সেবাব্রতের পুণ্যকর্ম মাত্র। মানুষ হইয়া যদি মানুষের দুঃখদৈন্য কিছুটা বিদূরিত করিতে না পারিলাম, তবে মনুষ্যজন্মই যে ব্যর্থ হইয়া গেল। মহাপ্রাণ ব্যক্তি দান করিয়া যান নিঃশব্দে, অকাতরে—এখানেই তো ক্ষুদ্র এবং মহতের বিরাট পার্থক্য।

দীঘির জলেই শৈবালের স্থিতি, দীঘি না হইলে শৈবালের অস্তিত্বই থাকিত না। এহেন পরাশ্রয়ী, পরমুখাপেক্ষী শৈবালদামের উপর জমিয়াছে দুই ফোঁটা রাতের শিশির—তাহা গড়াইয়া পড়ে দীঘির অগাধ জলে। এই অতিতুচ্ছ ঘটনাটিকেই শৈবাল মনে করে দীঘির প্রতি তাহার মহৎ দান। অথচ বিরাট দীঘির কাছে দু' ফোঁটা শিশির-কণা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর, অতিশয় তুচ্ছ জিনিস। তবু ইহা স্মরণ করিয়া শৈবালের দাম্ভিকতার অন্ত নাই, উচ্চকণ্ঠে ইহাকে তাহার ঘোষণা করিতেই হইবে। উদারচরিত মহাপ্রাণ ব্যক্তি কিন্তু কোনো দানের হিসাব লিখিয়া রাখে না—মনুষ্যত্ব, সেবাধর্মরূপ কর্তব্য তাহাকে নিরহংকার করিয়া তোলে, তাহার মধ্যে আনে পরিপূর্ণ অহংবিস্মৃতি।

[৩৩] ভাবসম্প্রসারণ কর :

মৃত্যু কহে পুত্র নিব, চোর কহে ধন,
ভাগ্য কহে, সব নিব যা তোর আপন।

নিন্দুক কহিল, লব তোর যশোভার,
কবি কহে, কে লইবে আনন্দ আমার ?

চতুর্দিকে কেবল হারাইবার সহস্র বেদনায় পৃথিবীর মানুষের চিত্ত সতত পীড়িত, শংকিত, ব্যথিত। কত রকমের ক্ষয়ক্ষতি মানুষকে বিমর্ষ করে, ব্যাথাবিজড়িত ভাগ্য-বিপর্যয় আর মৃত্যুর কুটিল ভ্রূকুটি তাহাকে প্রতিনিয়ত ভয়ার্ত করিয়া তোলে। জগতের সর্বত্রই দেখি, পরের নিকট হইতে সকলেই কেবল যথাসাধ্য গ্রহণ করিতে চায়, কোনোকিছু পরকে দিতে কেহই চায় না। কিন্তু প্রেম-সৌন্দর্য-আনন্দের উপাসক কবি-মানুষটি সত্যই ইহার ব্যতিক্রম। কবির ব্যক্তিগত জীবনে হয়তো অভাব-দুঃখ-দৈন্যের অন্ত নাই। কিন্তু তাঁহার আসল কাজ, মনোরম বাণীমূর্তি রচনা করিয়া নিখিল মানুষের হৃদয়ভূমিতে আপনার অন্তরতর প্রাণের আনন্দধারাকে প্রবাহিত করিয়া দেওয়া। মহৎ দুঃখবেদনা হইতেই মহৎ কাব্যের সৃষ্টি—ধূপ আপনি দগ্ধ হইয়া জগৎকে গন্ধ বিতরণ করে। কবিও তেমনি বাস্তব জীবনের ব্যাথাবেদনাকে নীলকণ্ঠের মতো আত্মসাৎ করিয়া মানুষকে বিলায় অমেয় সৌন্দর্য ও আনন্দ। জগৎ এবং জীবনকে ভালোবাসিয়া তিনি অশেষ আনন্দ অনুভব করেন, সেই আনন্দের প্রেরণাতেই রচিত হয় কাব্যের মধুচক্র—ইহাকে মানুষের কছে তুলিয়া ধরিয়া কবি নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। ব্যাথাজর্জর মানবজীবনে কবিই তো বহাইয়া দেন আনন্দের নিত্যবহমান ঝর্ণাধারা।

[৩৪] ভাবসম্প্রসারণ কর :

রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহাধুমধাম।
ভক্তরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি,
মূর্তি ভাবে আমি দেব—হাসে অন্তর্যামী।

যিনি জগন্নাথ, যিনি বিশ্বলোকেশ্বর, সেই অরূপসুন্দর ভগবানের সত্যকার অধিষ্ঠান সীমিত বিগ্রহের মধ্যে নয়, সামাজিক মানুষের ধর্মীয় আচারঅনুষ্ঠান, বিধি-বিধানের মধ্যেও নয়—মানবের ভক্তিস্নাত হৃদয়মন্দিরই তাঁহার যথার্থ অধিষ্ঠানভূমি—তিনি ধ্যানলভ্য, তাঁহার অস্তিত্ব অনুভববেদ্য। কিন্তু কেবল ধ্যানের মধ্যে অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী ঈশ্বরকে ধারণা করিয়া ভক্তহৃদয়ের পরিতৃপ্তি হয় না, সে দেখিতে চায় ধ্যানধৃত দেবতাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্তির মধ্যে। ভক্তের চিত্তব্যাকুলতাই অরূপকে রূপের সীমায় বাঁধিতে চাহিয়াছে—দেববিগ্রহ ভক্তিব্যাকুল মানুষের মানসকল্পিত ঈশ্বরের প্রতীক মাত্র। যেদিন দেবতা সীমার মধ্যে রূপায়িত হইলেন, সেদিন সৃষ্টি হইল বিচিত্র আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব-অনুষ্ঠানের, বহুতর পূজাপদ্ধতি ও মন্ত্রতন্ত্রের, পূজারী-পুরোহিতের।

ভক্ত রূপাশ্রিত দেবতাকে অন্তরের যে-শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করে, যে-প্রণাম জানায়, সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রণাম গ্রহণ করেন অরূপসুন্দর ভগবান।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, জাঁকজমক আর পুরোহিত-ব্রাহ্মণ কালে কালে অন্তর্যামী ঈশ্বরকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া তাঁহার স্থানটি অধিকার করিয়া বসে—বহিরঙ্গ আড়ম্বরের কৃত্রিমতার স্তূপতলে বিশ্বলোকেশ্বর চাপা পড়িয়া যান। তাই জগন্নাথের রথযাত্রার উৎসবদিনে ভক্ত যখন ভগবানকে প্রণাম জানায়, তখন পথ-রথ-মূর্তি প্রত্যেকেই ভাবে, ভক্তের এই প্রণতি তাহারই উদ্দেশে। ইহাতে অন্তর্যামী ঈশ্বর লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া নিশ্চয়ই কৌতুক অনুভব করেন। কারণ, তিনি তো জানেন, ভক্তহৃদয়ের এই আকুলতা কাহার জন্য, কাহার উদ্দেশে ভক্ত করিতেছে আত্মনিবেদন। মানুষের ভক্তি-অভিষিক্ত অন্তরলোক ছাড়া জগদীশ্বরের অস্তিত্ব অন্য কোথাও নাই। কিন্তু সাধারণ মানুষ এমন অন্ধদৃষ্টি যে, এই পরম সত্যটি কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারে না।

[৩৫] ভাবসম্প্রসারণ কর :

হাউই কহিল, মোর কী সাহস ভাই,
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই।
কবি কহে, তার গায়ে লাগেনাক কিছু,
সে-ছাই ফিরিয়া আসে তোর পিছু পিছু।

ক্ষুদ্রচেতা নীচাশয়ের স্পর্ধা আর ধৃষ্টতার সীমাপরিসীমা নাই। চিরভাস্বর মহা-কীর্তির শাশ্বত স্বর্গলোকে যে-সকল মহৎ মানবের অধিষ্ঠান, এইসব হীনচেতারা তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার দুরাশা অন্তরে পোষণ করে। শুধু তাহা নয়, এই মহামূর্খের দল মহতের কর্মকৃতির উপর নিন্দার কালিমা লেপন করিতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করে না, এবং এহেন ধৃষ্টতা ও দুষ্কর্মকেই গৌরবময় সাহসিকতার কাজ বলিয়া জগৎসমক্ষে তাহারা সদম্ভে প্রচার করিতে থাকে। কিন্তু দীনচিত্তের এই ধিক্কারজনক আত্মঘোষণা, ধৃষ্টজনের এই অমার্জনীয় স্পর্ধা মহৎ ব্যক্তির কীর্তিকলাপকে কখনো পঙ্কিলতায় ম্লান করিতে পারে না। শ্লথপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা শক্তিমানের কোনোই ক্ষতিসাধন করে না—স্পর্ধিতের ধৃষ্টতা আপনার হীনপ্রবৃত্তির কালিমাকেই অনপনেয় করিয়া তুলে মাত্র। মহতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া তাহারা যে-দুষ্কর্ম ও দুঃসাহসের আশ্রয় লয় তাহা সত্যই আত্মঘাতী। ইহা তাহাদের হীনতার পরিচয়টিকে লোকচক্ষুর সম্মুখে স্পষ্টরূপে তুলিয়া ধরে, এবং এইরূপেই ঘটে এইসব ক্ষুদ্রচেতার শোচনীয় পরাভব।

নিন্দুক কহিল, লব তোর যশোভার,
কবি কহে, কে লইবে আনন্দ আমার?

চতুর্দিকে কেবল হারাইবার সহস্র বেদনায় পৃথিবীর মানুষের চিত্ত সতত পীড়িত, শংকিত, ব্যথিত। কত রকমের ক্ষয়ক্ষতি মানুষকে বিমর্ষ করে, ব্যথাবিজড়িত ভাগ্য-বিপর্যয় আর মৃত্যুর কুটিল ভ্রূকুটি তাহাকে প্রতিনিয়ত ভয়ার্ত করিয়া তোলে। জগতের সর্বত্রই দেখি, পরের নিকট হইতে সকলেই কেবল যথাসাধ্য গ্রহণ করিতে চায়, কোনোকিছু পরকে দিতে কেহই চায় না। কিন্তু প্রেম-সৌন্দর্য-আনন্দের উপাসক কবি-মানুষটি সত্যই ইহার ব্যতিক্রম। কবির ব্যক্তিগত জীবনে হয়তো অভাব-দুঃখ-দৈন্যের অন্ত নাই। কিন্তু তাঁহার আসল কাজ, মনোরম বাণীমূর্তি রচনা করিয়া নিখিল মানুষের হৃদয়ভূমিতে আপনার অন্তরতর প্রাণের আনন্দধারাকে প্রবাহিত করিয়া দেওয়া। মহৎ দুঃখবেদনা হইতেই মহৎ কাব্যের সৃষ্টি—ধূপ আপনি দগ্ধ হইয়া জগৎকে গন্ধ বিতরণ করে। কবিও তেমনি বাস্তব জীবনের ব্যথাবেদনাকে নীলকণ্ঠের মতো আত্মসাৎ করিয়া মানুষকে বিলায় অমেয় সৌন্দর্য ও আনন্দ। জগৎ এবং জীবনকে ভালোবাসিয়া তিনি অশেষ আনন্দ অনুভব করেন, সেই আনন্দের প্রেরণাতেই রচিত হয় কাব্যের মধুচক্র—ইহাকে মানুষের কছে তুলিয়া ধরিয়া কবি নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন। ব্যথাজর্জর মানবজীবনে কবিই তো বহাইয়া দেন আনন্দের নিত্যবহমান ঝর্ণাধারা।

[৩৪] ভাবসম্প্রসারণ কর :

রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহাধুমধাম।
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি,
মূর্তি ভাবে আমি দেব—হাসে অন্তর্যামী।

যিনি জগন্নাথ, যিনি বিশ্বলোকেশ্বর, সেই অরূপসুন্দর ভগবানের সত্যকার অধিষ্ঠান সীমিত বিগ্রহের মধ্যে নয়, সামাজিক মানুষের ধর্মীয় আচারঅনুষ্ঠান, বিধি-বিধানের মধ্যেও নয়—মানবের ভক্তিস্নাত হৃদয়মন্দিরই তাঁহার যথার্থ অধিষ্ঠানভূমি—তিনি ধ্যানলভ্য, তাঁহার অস্তিত্ব অনুভববেদ্য। কিন্তু কেবল ধ্যানের মধ্যে অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী ঈশ্বরকে ধারণা করিয়া ভক্তহৃদয়ের পরিতৃপ্তি হয় না, সে দেখিতে চায় ধ্যানধৃত দেবতাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্তির মধ্যে। ভক্তের চিত্তব্যাকুলতাই অরূপকে রূপের সীমায় বাঁধিতে চাহিয়াছে—দেববিগ্রহ ভক্তিব্যাকুল মানুষের মানসকল্পিত ঈশ্বরের প্রতীক মাত্র। যেদিন দেবতা সীমার মধ্যে রূপায়িত হইলেন, সেদিন সৃষ্টি হইল বিচিত্র আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব-অনুষ্ঠানের, বহুতর পূজাপদ্ধতি ও মন্ত্রতন্ত্রের, পূজারী-পুরোহিতের।

ভক্ত রূপাশ্রিত দেবতাকে অন্তরের যে-শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করে, যে-প্রণাম জানায়, সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রণাম গ্রহণ করেন অরূপসুন্দর ভগবান।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, জাঁকজমক আর পুরোহিত-ব্রাহ্মণ কালে কালে অন্তর্যামী ঈশ্বরকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া তাঁহার স্থানটি অধিকার করিয়া বসে—বহিরঙ্গ আড়ম্বরের কৃত্রিমতার স্তূপতলে বিশ্বলোকেশ্বর চাপা পড়িয়া যান। তাই জগন্নাথের রথযাত্রার উৎসবদিনে ভক্ত যখন ভগবানকে প্রণাম জানায়, তখন পথ-রথ-মূর্তি প্রত্যেকেই ভাবে, ভক্তের এই প্রণতি তাহারই উদ্দেশে। ইহাতে অন্তর্যামী ঈশ্বর লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া নিশ্চয়ই কৌতুক অনুভব করেন। কারণ, তিনি তো জানেন, ভক্তহৃদয়ের এই আকুলতা কাহার জন্য, কাহার উদ্দেশে ভক্ত করিতেছে আত্মনিবেদন। মানুষের ভক্তি-অভিষিক্ত অন্তরলোক ছাড়া জগদীশ্বরের অস্তিত্ব অন্য কোথাও নাই। কিন্তু সাধারণ মানুষ এমন অন্ধদৃষ্টি যে, এই পরম সত্যটি কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারে না।

[৩৫] ভাবসম্প্রসারণ কর ঃ

হাউই কহিল, মোর কী সাহস ভাই,
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই।
কবি কহে, তার গায়ে লাগেনাক কিছু,
সে-ছাই ফিরিয়া আসে তোর পিছু পিছু।

ক্ষুদ্রচেতা নীচাশয়ের স্পর্ধা আর ধৃষ্টতার সীমাপরিসীমা নাই। চিরভাস্বর মহা-কীর্তির শাশ্বত স্বর্গলোকে যে-সকল মহৎ মানবের অধিষ্ঠান, এইসব হীনচেতারা তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার দুরাশা অন্তরে পোষণ করে। শুধু তাহা নয়, এই মহামূর্খের দল মহতের কর্মকৃতির উপর নিন্দার কালিমা লেপন করিতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করে না, এবং এহেন ধৃষ্টতা ও দুষ্কর্মকেই গৌরবময় সাহসিকতার কাজ বলিয়া জগৎসমক্ষে তাহারা সদম্ভে প্রচার করিতে থাকে। কিন্তু দীনচিত্তের এই ধিক্কারজনক আত্মঘোষণা, ধৃষ্টজনের এই অমার্জনীয় স্পর্ধা মহৎ ব্যক্তির কীর্তিকলাপকে কখনো পঙ্কিলতায় ম্লান করিতে পারে না। শ্লথপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা শক্তিমানের কোনোই ক্ষতিসাধন করে না—স্পর্ধিতের ধৃষ্টতা আপনার হীনপ্রবৃত্তির কালিমাকেই অনপনেয় করিয়া তুলে মাত্র। মহতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গিয়া তাহারা যে-দুষ্কর্ম ও দুঃসাহসের আশ্রয় লয় তাহা সত্যই আত্মঘাতী। ইহা তাহাদের হীনতার পরিচয়টিকে লোকচক্ষুর সম্মুখে স্পষ্টরূপে তুলিয়া ধরে, এবং এইরূপেই ঘটে এইসব ক্ষুদ্রচেতার শোচনীয় পরাভব।

মহাশূন্যের দূরদূরান্তে ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছে জ্যোতির্ময় নক্ষত্রমণ্ডল—মাটির ধূলির কত ঊর্ধ্বে তাহাদের অবস্থান। আর, ক্ষীণ বহ্নিকণা বুকে ধারণ করিয়া হাউই না কি ঐ প্রদীপ্ত তারকারাজির দিকে ধাবিত হয় উহাদের মুখে ভস্মলেপন করিয়া দিবার দুঃসাহসে! কিন্তু এই ঘৃণ্য স্পর্ধার পরিণাম কি? যাহাদের মুখে ছাই ঢালিয়া দিবার জন্য হাউই-এর এই স্পর্ধিত অভিযান, তাহারা রহিয়া গেল তাহার নাগালের লক্ষ যোজন দূরে; পক্ষান্তরে নিজের আস্ফালনে ক্ষীণ শিখা উদ্গীরণ করিয়া মুহূর্তমধ্যে সে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। তারকার উদ্দেশে যে-ছাই নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহাই নিমেষে ফিরিয়া আসে তাহারই অভিমুখে। শক্তিমান মহতের কাছে আত্মম্ভর দুর্বলের পরাভব সুনিশ্চিত।

[৩৬] ভাবসম্প্রসারণ কর :

কাণা কড়ি পিঠ তুলি কহে টাকাটিকে—
তুমি ষোল আনা মাত্র, নহ পাঁচসিকে।
টাকা কয়, আমি তাই মূল্য মোর যথা,
তোমার যা মূল্য তার ঢের বেশী কথা।

জগতে চিরকালই এমন এক জাতের মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল পরের ছিদ্রান্বেষণ করিয়াই যাহাদের দিন কাটে—কর্মী আর গুণীজনের নিন্দা প্রচার করিয়া বেড়ানোই ইহাদের একমাত্র কাজ। মানবসংসারে বস্তুত এ জাতের মানুষের কোনোই মূল্য নাই, ইহারা নিষ্কর্মা অপদার্থের দল। অথচ ইহারা অন্যের ছিদ্রানুসন্ধানে সুপটু, ইহাদের ব্যর্থ বিড়ম্বিত জীবনের পুঁজি হইতেছে অহংকৃত বাক্‌সর্বস্বতা। এইসব অপদার্থের দল নিজেদের মূল্যহীনতা সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয়। সেজন্য তারস্বরে গুণীর নিন্দাপ্রচারে ইহাদের এতটুকু লজ্জাবোধ নাই—পরনিন্দা-পরচর্চা-দ্বারা আপনার অজ্ঞাতসারে সমাজে ইহারা নিজেদেরকেই উপহাসাস্পদ করিয়া তোলে। যথার্থ কর্মী যে, যে-মানুষ যথার্থ গুণী, সে কখনো শূন্যগর্ভ বাক্যের মধ্য দিয়া আত্মঘোষণা করে না, নীরবে শুধু কাজই করিয়া যায়। নিজের কর্মকৃতির মধ্য দিয়াই গুণী, কর্মী সমাজ-মানুষের নিকট আপনার সত্যমূল্য প্রমাণিত করে। কাণা কড়ির কথাগুলি শুনিয়া একটি ইংরেজী প্রবাদবাক্য সকলেরই মনে পড়িবে : 'Empty vessel sounds much'।

[৩৭] ভাবসম্প্রসারণ কর :

দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে—
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

সামাজিক মানুষের ব্যক্তিগত অধিকাররক্ষণ এবং নাগরিকের ধনপ্রাণের নিরাপত্তাবিধানের দিকে প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু সভ্যতার প্রসার সত্ত্বেও অদ্যাবধি মানুষ সম্পূর্ণভাবে তাহার পশুপ্রকৃতির ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই, নীচ প্রবৃত্তিকে পরিপূর্ণরূপে জয় করিতে সমর্থ হয় নাই। তাই সমাজসংসারে মানুষের অপরাধপ্রবণতা প্রতিদিনই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহাতে সমাজ-অন্তর্গত মানুষের সুখশান্তি ও জীবনের নিরাপত্তা সদাসর্বদা বিঘ্নিত হইতেছে। এই অন্যায়, দুষ্কৃতি, দুর্নীতি আর অপরাধপ্রবণতাকে প্রতিরোধ করিবার জন্যই সমাজ ও রাষ্ট্র অপরাধীকে দণ্ডদানের ব্যবস্থা করিয়াছে। এইদিক দিয়া বিচার করিলে দণ্ড যতই নির্মম হোক না কেন, ইহার যে প্রয়োজন আছে, সে কথা অবশ্যস্বীকার্য। শাস্তিদান দণ্ডদাতা বা বিচারকের অত্যাচার নয়—ইহা অন্যায়-অনাচার-অবিচারের হাত হইতে সামাজিক মানুষকে রক্ষা করিবার একটি উপায় মাত্র।

কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে, যে-শাস্তি নিষ্ঠুর নির্যাতনের বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া মানবের সমাজবিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করিতে চায়, সে-শাস্তি কখনো আদর্শ দণ্ড হইতে পারে না। দুষ্কৃতিকারীর কলঙ্কিত চরিত্রের সংশোধন, মনুষ্যত্বের উদ্বোধনই দণ্ডদানের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শাস্তির ভয়াল রূপ মানুষের দুষ্প্রবৃত্তিকে ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ করে বটে, কিন্তু উহা সমূলে উচ্ছেদ করিতে পারে না। প্রীতি, মমত্ববোধ, সমবেদনা প্রভৃতির স্পর্শলাভ করিলে নীচপ্রকৃতির মানুষও তাহার নিদ্রিত মনুষ্যত্বকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিবার সুযোগ পায়।

পাপকে সমাজ হইতে বিদূরিত করিতে হইলে দণ্ডদাতাকে একদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি, অন্যদিকে তিনি তাকাইবেন হতভাগ্য অপরাধীর প্রতি। অপরাধীকে দণ্ডদানকালে তাঁহার হৃদয় যদি সমবেদনায় কাতর হইয়া উঠে, ব্যথায় ক্রন্দন করিতে থাকে, তাহা হইলে দণ্ডদাতার সংবেদনশীল হৃদয়ের কারুণ্য স্পর্শ করিবে অপরাধীর অন্তর। ফলে সে ফিরিয়া পাইবে তাহার হারানো বিবেকবুদ্ধি, মর্মের গভীরে অনুভব করিবে অনুতাপ-অনুশোচনার তীব্র দহন। এই নবজাগ্রৎ বিবেক-দংশন অপরাধীকে নিশ্চয়ই আবার মনুষ্যত্বের পথে ফিরাইয়া আনিবে।

বিচারক ঘৃণা করিবেন পাপকে, পাপীকে নয়—'hate the sin, not the sinner'। যে-বিচারে মানুষের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শিত হয়, যে-দণ্ডদান সহমর্মিতার স্পর্শ-বিরহিত তাহা যথার্থ ই অত্যাচার—প্রতিশোধগ্রহণ ও নির্যাতনের নামান্তর মাত্র, এবং সেরূপ বিচার ও দণ্ডের ফল সুচিরস্থায়ী হয় না। সে-দণ্ডই অব্যর্থ, যাহার আদর্শের মূলে রহিয়াছে মানবের অশুভ বুদ্ধির প্রতি ঘৃণা, অথচ মানুষের প্রতি—সে যতই বিকৃত হোক, পতিত হোক—অপরিসীম সমবেদনাবোধ। প্রতিশোধস্পৃহা অপরাধপ্রবণতাকে কিছু সময়ের জন্য নিষ্ক্রিয় করে সত্য, কিন্তু অপরাধীর বিবেকবুদ্ধি জাগ্রৎ করে না।

সুতরাং দণ্ডদানকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে বিচারককে অপরাধীর বিষয়ে সমবেদনাকাতর হইতে হইবে—পাপীকে দেখিতে হইবে পাপ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া।

[৩৮] নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটির ভাবার্থ লেখ :

কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী,
'গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি—
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে?'
দেবতা কহিলা : 'আমি'। শুনিল না কানে।
সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল : 'কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা?'
দেবতা কহিলা : 'আমি'। কেহ শুনিল না।
ডাকিল শয়ন ছাড়ি : 'তুমি কোথা, প্রভু?'
দেবতা কহিল : 'হেথা'। শুনিল না তবু।
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি;
দেবতা কহিলা : 'ফির'। শুনিল না বাণী।
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন : 'হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়!'

পৃথিবীতে একদল ঈশ্বরসন্ধানী মানুষ আছে, যাহারা মানবের স্নেহ-প্রীতি-প্রেম-ভালোবাসাকে মনে করে মায়াপ্রপঞ্চ, মিথ্যার ছলনা। চিত্তের মূঢ়তাবশত এইসব মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে না যে, এই চিরানন্দময় জগৎ এবং জীবনই বিশ্বলোকেশ্বরের নিত্যকালের লীলানিকেতন। বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য আর মানবসংসারের নর-নারীর বিবিধ সম্পর্কের মধ্য দিয়াই তো ঈশ্বর আপনাকে প্রতিনিয়ত প্রকাশ করিতেছেন। জগৎ এবং জীবনকে ভালোবাসারই নামান্তর হইল ঈশ্বরের পূজা। বিশ্বসংসারকে অস্বীকার করিয়া বৈরাগ্যের পথে যাহারা ভগবানকে সন্ধান করিয়া ফিরে, তাহারা পরিণামে লাভ করে বিরাট শূন্যতা। যিনি জীবনপ্রেমিক তিনিই আনন্দময় ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসক।

[৩৯] নিম্নলিখিত কবিতাটির মর্মার্থ প্রকাশ কর :

তোমার কে মা বুঝবে লীলে?
তুমি কী নিলে, কী ফিরিয়ে দিলে?

তুমি দিয়ে নিচ্ছ তুমি, বাছ রাখ না সাঁঝসকালে।
তোমার অসীম কার্য অনিবার্য
মাপাও যেমন যার কপালে।
তোমার অভিসন্ধি পদে-বন্দী ভোলানাথই যাচ্ছে ভুলে।
তুমি যেমন দেখাও তেমনি দেখি,
জলেই তুমি ভাসাও শিলে!
তোমার জারিজুরি আমার কাছে
খাটবে না মা কোনোকালে।
ওসব ইন্দ্রজালে যন্ত্র জানে—রামপ্রসাদ যে তোমার ছেলে।

বিশ্বজননী মহাকালীর লীলা যেমন বিচিত্র, তেমনি পরম রহস্যময়। এই মহামায়ার ইঙ্গিতেই ঘটিতেছে জীবন ও মৃত্যু, সৃষ্টি ও বিনাশ। তিনি মানবভাগ্যের নিয়ন্ত্রীশক্তি, বিধান তাঁহার অমোঘ—তাঁহার ইচ্ছার স্বরূপ ত্রিকালদর্শী শিবশংকরেরও বুদ্ধির অগম্য। বিশ্বলীলা রহস্যমণ্ডিত বটে, কিন্তু মহামায়ার ভক্তসন্তানের কাছে বিশ্বের রহস্য-নিকেতনের দ্বার চিরউন্মুক্ত। ইঁহাদের অধ্যাত্মদৃষ্টি মুহূর্তেই সৃষ্টির সকল রহস্য উদ্ভিন্ন করে। বিশ্বমাতা মহামায়ার এমন একজন ভক্তছেলে সাধককবি রামপ্রসাদ—তাঁহার কাছে কালীমাতার কোনো ছলনাই টিকিবে না।

[৪০] নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটির সারাংশ লেখ:

ধন্য আশা-কুহকিনি! তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন।
দুর্বল মানবমনোমন্দিরে তোমায়
যদি না সৃজিত বিধি, হায়, অনুক্ষণ
নাহি বিরাজিতে তুমি যদি সে মন্দিরে—
শোক-দুঃখ-ভয়-ত্রাস-নিরাশ প্রণয়,
চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র নাশিত অচিরে
সে মনোমন্দিরশোভা! পলাত নিশ্চয়
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদেবী ছাড়িয়া আবাস,
উন্মত্ততা ব্যাঘ্ররূপে করিত নিবাস।

আশা সত্যই ছলনাময়ী। বিচিত্র আশা বক্ষে ধারণ করিয়াই পৃথিবীর নরনারী দুঃখবেদনাকণ্টকিত এই সংসারপথে বিচরণ করিতেছে। এই পৃথিবীতে মানুষের ক্ষয়-ক্ষতি, শোকতাপের অন্ত নাই, কিন্তু মায়াবিনী আশা তাহার সম্মুখে কুহকজাল রচনা করে বলিয়াই তো সংসারের মানুষ সম্ভাবনায়ভরা প্রোজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে দেখিতে পায়।

হৃদয়ে আশা যদি পোষণ না করিত, তাহা হইলে মানুষ চতুর্দিকের সীমাহীন হতাশার মধ্যে আবার নূতন প্রেরণায় প্রাত্যহিক কর্মপথে অগ্রসর হইতে পারিত না আশার অবর্তমানে নরনারী আঘাতবেদনায় জর্জরিত হইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিত, সমস্ত সংসার হইয়া উঠিত একটি ভয়াবহ স্থান—মনুষ্যবাসের অযোগ্য।

[৪১] নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটির সারমর্ম লিখ :

"অনুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোট জিনিসকে বড়ো করিয়া দেখায়। বড়ো জিনিসকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত কোনো যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড়ো জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড়ো বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন, এবং এই যে বাঙালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণকলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবলগিরির ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান—কাহারো সাধ্য নাই যে, সেই উচ্চচূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।"

স্বনামধন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমুন্নত চরিত্রের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি, তখন বাঙালীসমাজের তথাকথিত খ্যাতিমান অনেক বড়লোকের জীবনই একান্ত নগণ্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। তাঁহার মহিমাভাস্বর জীবনে বাঙালীত্বের বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটিয়াছিল। অত্যাশ্চর্য চারিত্রিক সমুন্নতি, অনন্যসাধারণ মহত্ত্বগৌরব লইয়া বিদ্যাসাগর আমাদের মধ্যে এমন উন্নতমস্তকে দাঁড়াইয়া আছেন যে, চরিত্রগৌরবে তাঁহাকে অতিক্রম করা তো দূরের কথা—তাঁহার কাছাকাছি যাইবার প্রচেষ্টাকেও স্পর্ধা বলিয়াই মনে হইবে।

[৪২] নিম্নলিখিত কবিতাটির ভাবার্থ প্রকাশ কর :

বিদায়, সিন্ধু! আসি,
প্রবাসবন্ধু, লীলাছন্দের নীলানন্দের রাশি।
ফুরালো জীবনে নয়নোৎসব লহরীপুঞ্জ গোণা,
সন্ধ্যাপ্রভাতে তোমার নান্দী-বন্দনাগান শোনা।
তোমার কেশর ছুঁয়ে ভয়ে ভয়ে ফুরাইল ছেলেখেলা,
ফুরালো বালুকামন্দির গড়া আনমনে সারাবেলা।
হেরিব না হায় তোমার ফণায় নিশীথে মণির দ্যুতি।
মহানীলিমায় ইন্দ্রিয়াতীত লভিব না অনুভূতি।

হেরিব না আর পুলিনমাতার স্নেহের অঙ্ক-'পরে
ঊর্মিমালার ফেনিল মূর্চ্ছা শ্রান্তিহরণ তরে।
লভিব না আর প্রীতির শঙ্খশুক্তির উপহার,
ফুরালো অবাধ প্রাণের প্রসার মুক্তির অধিকার।

ঊর্মিমুখর সমুদ্র প্রবাসী কবির বন্ধু হইয়া উঠিয়াছিল। সমুদ্রের অপূর্ব তরঙ্গভঙ্গি ও কল্লোলসংগীত, তাহার বিচিত্র রূপসৌন্দর্য, সমুদ্রসৈকতে বালুকা লইয়া খেলা, কবির নয়নমনে অজস্র আনন্দের স্পর্শ বুলাইয়া দিত। সাগরবেলায় শুক্তিশঙ্খ কুড়াইয়া দূর-বিস্তার সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া কবি উদার মুক্তির আস্বাদ লাভ করিতেন। আজ এই সমুদ্রের কাছ হইতে কবিকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইতেছে—চিত্তের অবারিত প্রসারের সঙ্গে বুঝি তাঁহার চিরকালের বিচ্ছেদ ঘটিল। প্রবাসজীবনের এই বন্ধুটিকে পিছনে ফেলিয়া আসিতে কবি আপন হৃদয়ে কী গভীর বেদনা অনুভব করিতেছেন!

[৪৩] নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটির ভাবার্থ লেখ :

"বুদ্ধদেবের সময়ে যদি সিনেমাওয়ালা এবং খবরের কাগজের রিপোর্টারের চলন থাকত তাহলে তাঁর খুব একটা সাধারণ ছবি পাওয়া যেত। তাঁর চেহারা, চালচলন, তাঁর মেজাজ, তাঁর ছোটখাট ব্যক্তিগত অভ্যাস, তাঁর রোগ-তাপ-ক্লান্তি-ভ্রান্তি সব নিয়ে আমাদের অনেকের সঙ্গে মিল দেখতুম। কিন্তু বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এই সাধারণ প্রমাণটাকেই যদি প্রামাণিক বলে গণ্য করা যায়, তাহলে একটা মস্ত ভুল করি। সে ভুল হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিতের—ইংরাজীতে যাকে বলে পারস্পেক্টিভ। যে-জনতাকে আমরা সর্বসাধারণ বলি, সে কেবল ক্ষণকালের জন্য মানুষের মনে ছায়া ফেলে মুহূর্তে মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। অথচ এমন সব মানুষ আছেন যাঁরা শত শত শতাব্দী ধরে মানুষের চিত্তকে অধিকার করে থাকেন। যে-গুণে অধিকার করেন সেই গুণটাকে ক্ষণকালের জাল দিয়ে ধরাই যায় না। ক্ষণকালের জাল দিয়ে যেটা ধরা পড়ে, সেই হল সাধারণ মানুষ। তাকে ডাঙায় তুলে মাছকোটার মতো কুটে বৈজ্ঞানিক যখন তার সাধারণত্ব প্রমাণ করে আনন্দ করতে থাকেন, তখন দামী জিনিসের বিশেষ দামটা থেকেই তাঁরা মানুষকে বঞ্চিত করতে চান। সুদীর্ঘ কাল ধরে মানুষ অসামান্য মানুষকে এই বিশেষ দামটা দিয়ে এসেছে। সাধারণ সত্য মত্ত হস্তীর মতো এসে এই বিশেষ সত্যের পদ্মবনটাকে দখল করলে সেটা কি সহ্য করা যাবে?"

জগতে দুই জাতের মানুষ আছে—সামান্য বা সাধারণ, অসামান্য বা অসাধারণ। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এই দুই জাতের মানুষের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে না। কিন্তু মানুষের প্রতিদিনের দৈনন্দিন জীবন ছাড়াও আরো একটি মহত্তর জীবন আছে, ইহাকে ভাবজীবন বলিতে পারা যায়। মানবের প্রাকৃত

জীবন ক্ষণকালের, তাহার ভাবজীবন চিরকালের। এই উচ্চতর জীবনটিকে প্রত্যহের খুঁটিনাটি কার্যকলাপের মধ্যে ধরিতে পারা যায় না। মহাপুরুষদের চরিত্রমহত্ত্ব ও ব্যক্তিত্বমাহাত্ম্যকে খুঁজিতে হইবে তাঁহাদের অনুস্যূত-সমুন্নত জীবনদর্শন ও জীবনাদর্শের মধ্যে। এইখানেই তাঁহারা যথার্থ মহৎ, অসাধারণ—এইখানেই তাঁহারা মৃত্যুঞ্জয়তার আসনে অধিষ্ঠিত।

[৪৪] নিম্নলিখিত কবিতাটির মর্মসত্য প্রকাশ কর ঃ

ঝর্ণার গান

পাহাড়, ওগো পাহাড়, তোমার বুকের নীড়ে,
বৃথাই তুমি চাইছো মোরে রাখতে ঘিরে।
বাইরে যে-জন বেরিয়েছে সে ফিরবে নাক,
অচল তুমি, পথ-চলা-সুখ পাওনিক, তাই দাঁড়িয়ে থাক।
দৃষ্টি করার আনন্দ কী বিপুলতরা—
উষর মাটি শষ্পে ভরা।
অরণ্য গো, অরণ্য, হায়, ডাকছো মোরে,
লক্ষ শাখার ব্যাকুল বাহু প্রসার করে।
বিপুল তোমার ছায়া আমার পড়ছে বুকে,
মর্মরিয়া দীন মিনতি গুঞ্জরিছে অ-বোল মুখে।
থামার সময় নেইক আমার,—তোমার দেহে
রাঙিয়ে গেলাম সবুজ স্নেহে।

সংকীর্ণ জীবনের গণ্ডী ভাঙিয়া অনিশ্চিত দিগন্তের আহ্বানে অগ্রসর হইয়া চলাই মুক্ত প্রাণধর্মের নীতি। পর্বতের মতো স্থির স্তব্ধতাকে লইয়া জড়ের শান্তি লাভ করা যায়, কিন্তু জগতের বৃহত্তর পরিচয় লাভ করিতে হইলে অজানিতের পথে নির্ভাবনায় ঝাঁপ দিতে হইবে। সম্মুখে নিরন্তর অগ্রসর হইয়া চলার উল্লাসটিকে বাধা দিবার জন্য আসে সংসারের কত প্রলোভন, কত বহুবিচিত্র আকর্ষণ! কিন্তু যে-মানুষ লাভ করিয়াছে বন্ধনমুক্তির স্বাদ, পিছনের বেদনাবিধুর হাতছানি তাহাকে ক্ষুদ্রপরিসর জীবনের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না—নিত্যপথের পথিককে কে অর্গলরুদ্ধ করিবে? বস্তুত, নিরাসক্ত মুক্ত প্রাণের ছন্দ বাঁধনহারা ঝর্ণাধারার মতোই সতত অবারিত।

[৪৫] নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদের মর্মার্থ লেখ ঃ

"ধনীর যথার্থ পরীক্ষা দানে। যাহার প্রাণ আছে, তাহার যথার্থ পরীক্ষা প্রাণ দিবার শক্তিতে। যাহার প্রাণ নাই বলিলেই হয়, সে-ই মরিতে কৃপণতা করে। যে

মরিতে জানে, সুখের অধিকার তাহারই। যে জয় করে, ভোগ করা তাহাকেই সাজে। যে-লোক জীবনের সঙ্গে সুখকে, বিলাসকে দুই হাতে আঁকড়িয়া থাকে, সুখ তাহার সেই ঘৃণিত ক্রীতদাসের নিকট নিজের সমস্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দেয় না, তাহাকে উচ্ছিষ্ট মাত্র দিয়া দ্বারে ফেলিয়া রাখে। আর, মৃত্যুর আহ্বান শুনিবামাত্র যাহারা তুড়ি মারিয়া চলিয়া যায়, চির-আদৃত সুখের দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকায় না, সুখ তাহাদিগকে চায়, সুখ তাহারাই জানে। যাহারা সবলে ত্যাগ করিতে পারে, তাহারাই প্রবলভাবে ভোগ করিতে পারে। যাহারা মরিতে জানে না, তাহাদের ভোগবিলাসের দীনতা-কৃশতা-ঘৃণ্যতা গাড়িজুড়ি এবং তকমা-চাপরাসের দ্বারা ঢাকা পড়ে না। ত্যাগের বিলাসবিরল কঠোরতার মধ্যে পৌরুষ আছে—যদি স্বেচ্ছায় তাহা বরণ করি, তবে নিজেকে লজ্জা হইতে বাঁচাইতে পারিব।"

সুখ, আনন্দ, বৃহত্তর জীবনের যথার্থ উপলব্ধি জগৎসংসারে মোটেই সুলভ বস্তু নয়। একমাত্র সুকঠিন ত্যাগ ও দুঃখের তপস্যার মহামূল্য দ্বারাই ইহাদিগকে আমাদের অর্জন করিতে হইবে। পরের কৃপার দান মানুষের সুখবস্তুটিকে কলঙ্কিত করে। যে মানুষ দুঃখভীরু, সুখের কাঙাল, সুখ আর আনন্দের জগৎ হইতে সে চিরকালের জন্য নির্বাসিত। ভোগকে জীবনে যথার্থ সত্য করিয়া তুলিতে হইলে ক্ষুদ্রতুচ্ছ বিলাস-আরামের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, এমন কি, মৃত্যুর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, কঠোর ত্যাগের পথে পাদচারণ করিতে হইবে। প্রকৃত সুখার্থীর জীবনমন্ত্র হইতেছে: 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'।

[৪৬] নিম্নলিখিত বাক্যটির ভাবসত্য ব্যাখ্যা কর:

"সভ্যতার সহিত কবিত্বের কতকটা খাদ্যখাদক বা অহিনকুল সম্বন্ধ রহিয়াছে।"

কোনো-এক সমালোচক সভ্যতার সঙ্গে কাব্যসৃষ্টির বিরোধ কল্পনা করিয়াছেন। তিনি এরূপ ধারণা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, দর্শনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ যতই অগ্রসর হইয়া যাইবে, মানুষের জ্ঞানদৃষ্টি ও বুদ্ধিবৃত্তির সম্মুখে বিশ্বজগতের গোপন রহস্যদ্বার ধীরে ধীরে যতই উন্মোচিত হইবে, ততই ঘটিতে থাকিবে কাব্যকবিতার অবনতি। উক্ত সমালোচক মনে করেন, ক্ষুরধার জ্ঞান ও বুদ্ধির বিশ্লেষণীশক্তির স্পর্শে কবিকল্পনার পক্ষচ্ছেদ অনিবার্য। দর্শনবিজ্ঞানের প্রখর আলোকসম্পাতে বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য-অন্ধকার প্রতিনিয়ত বিদূরিত হইতেছে। ফলে অপরিচিতা প্রকৃতিসুন্দরীর সম্পর্কে মানুষের অপার বিস্ময়বোধ কমিয়া আসিতেছে। সুতরাং জ্ঞানবিজ্ঞানসমৃদ্ধ মানবের সর্বগ্রাসী এই অভিযানের মুখে জগৎ ও জীবনের অতলান্ত রহস্যের পূজারী কবির স্বপ্ন-কল্পনা টিকিয়া থাকিবে কেমন করিয়া?

যে-দর্শনবিজ্ঞানের জয়যাত্রা মানবসভ্যতার পরিধিকে নব নব আবিষ্কারে ও নূতন নূতন সত্যের উপলব্ধিতে প্রতিদিন প্রশস্ততর করিয়া তুলিতেছে, তাহা প্রকৃতই কাব্যসাধনার পরিপন্থী কিনা, ইহাই বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের বিচার্য। যাঁহারা বলেন, সভ্যতার সঙ্গে কবিত্বের খাদ্যখাদক সম্পর্ক বিদ্যমান, তাঁহাদিগকে আঠারো-উনিশ শতকের য়ুরোপীয় কাব্যসাহিত্যের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিতে বলি। এই দুই শতাব্দীতে য়ুরোপের বিজ্ঞানসাধনায় বিস্ময়কর অভ্যুন্নতি ঘটিয়াছে—এই সময়ে কত বিজ্ঞানী জগৎরহস্যের বিস্তৃত ক্ষেত্রে অভিযান চালাইয়া জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। অথচ এই আঠারো-উনিশ শতকেই য়ুরোপের নানা দেশে যুগোত্তীর্ণ কাব্যসাহিত্য রচিত হইয়াছে—এই যুগেই ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জার্মানীতে অমর কবিদলের আবির্ভাব। বিজ্ঞানের এহেন বিস্ময়াবহ সমুন্নতি কাব্যকবিতার সৃষ্টিধারাকে কি ব্যাহত করিতে পারিয়াছে? পারে নাই।

কেন পারে নাই, এই প্রশ্নটির উত্তর লিপিবদ্ধ করিতেছি। বিজ্ঞানদর্শনের কারবার বুদ্ধি-যুক্তি, সূক্ষ্মবিচার ইত্যাদিকে লইয়া। প্রধানত বুদ্ধি [intellect]-দীপ্ত মনঃশক্তির সাহায্যে দার্শনিক-বিজ্ঞানী জগৎ ও জীবনের তথ্য আর সত্যকে উদ্ভিন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন—তাঁহাদের বিশ্লেষণক্ষমতার সহায়তায় বিশ্বপ্রকৃতির অনেক অজানা রহস্য প্রতিদিন আবিষ্কৃত হইতেছে। কিন্তু যে-হৃদয়বৃত্তির [emotion] উপর কাব্যকবিতার চিরন্তনী প্রতিষ্ঠা, দার্শনিক-বিজ্ঞানীর বিজয়অভিযান সেই রাজ্য হইতে মানুষকে কখনো উৎখাত করিতে পারে নাই, এবং কোনদিনও পারিবে না।

আসল কথা, জগৎ ও জীবনের প্রতি বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের যে-দৃষ্টি, কবির দৃষ্টি তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দার্শনিক-বিজ্ঞানী বিশ্বের যে-সত্যকে আবিষ্কার করিতে চায় তাহা বুদ্ধিগত, তত্ত্বগত, তথ্যগত, বস্তুগত। আর যে-সত্যের প্রতি কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ তাহা ভাবগত, হৃদয়গত, অনুভূতিগত। বস্তুজগৎকে বিজ্ঞানী তন্ন তন্ন করিয়া যতই বিশ্লেষণ করুক না কেন, তাহাতে এই বিচিত্ররূপা বিশ্বপ্রকৃতির অপার সৌন্দর্য সম্বন্ধে কবিমানুষের ভাবানুভূতির কোনো ক্ষয়বৃদ্ধি হইবে না। বিশ্বজগতের সঙ্গে মানুষের কেবল জ্ঞানের সম্বন্ধ নয়, ভাবের সম্পর্কও রহিয়াছে। জগতের বিচিত্র প্রকাশকে যেমন আমরা জানি জ্ঞানে, তেমনি তাহাকে আবার উপলব্ধি করি ভাবে—একদিকে বিচারবুদ্ধি ও যুক্তি, অন্যদিকে সৌন্দর্যানুভূতি, হৃদয়বৃত্তি ও বিশ্বপ্রকৃতির কাছে নির্বিচারে আত্মসমর্পণ।

তাইতো আমরা দেখি, মানুষ একদিকে প্রকৃতিকে তাহার সেবাদাসী করিয়া তুলিয়াছে, অন্যদিকে বিশ্বসৌন্দর্যলক্ষ্মীর মালঞ্চের মালাকর হইবার বাসনা জ্ঞাপন করিয়াছে। একদিকে আবিষ্কৃত হইতেছে কত কত বিস্ময়কর যন্ত্র, অপরদিকে রচিত হইতেছে চিরকালের আনন্দসৌন্দর্যের আধার কাব্যকবিতার মধুচক্র। মানুষের জ্ঞান-

মুখী সাধনা দর্শনবিজ্ঞানের পথ প্রশস্ত করিতেছে, আর তাহার ভাবমুখী সাধনা কাব্য-শিল্পের এলাকাটিকে যুগে যুগে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিতেছে। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সৌন্দর্যবোধ ও রসপিপাসা কমিয়া আসিতেছে, এমন একটি অবিশ্বাস্য উদ্ভট কথা নিশ্চয়ই কেহ উচ্চারণ করিবেন না। আমাদের হৃদয়-নামক অতিসত্য বস্তুটি যতদিন সমূলে উৎপাটিত না হইবে, ততদিন কাব্যকবিতারও অসদ্ভাব দেখা যাইবে না। দার্শনিক-বিজ্ঞানী আমাদের দিবে জগতের তত্ত্বগত বস্তুগত রহস্যের সন্ধান, কবি দিবে ভাবগত সত্যের। সুতরাং জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা তথা কাব্যসাধনার কোনোদিনও বিরাম ঘটিবে না। অতএব সভ্যতার সঙ্গে কবিত্বের অহিনকুল সম্পর্ক কল্পনা করা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

[৪৭] ভাবসম্প্রসারণ কর :

অদৃষ্টেরে শুধালেম, 'চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে?'
সে কহিল, 'ফিরে দেখো'! দেখিলাম থামি—
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি॥

মানুষ অনেক সময় মনে করে, তাহার জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে বুঝি কোনো একটা অদৃশ্য দৈবশক্তি বা ভবিতব্য। ইহাকেই সাধারণ লোক অন্ধনিয়তি বলিয়া জানে। কিন্তু মানুষের জীবন ও সমগ্র জগদ্ব্যাপারকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টতই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহারা অন্তহীন কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত—অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ একই সূত্রে গ্রথিত। বিশ্বজগতের সকল ঘটনার উদ্ভিন্নমানতার মধ্যে যেমন রহিয়াছে কার্যকারণের সুকঠোর নিয়মশৃঙ্খলা, তেমনি মানুষের জীবনপরিণতির পিছনেও রহিয়াছে তাহার স্বকৃত কর্মপ্রবাহের ধারাগতি। অতীতের কর্মধারাই বর্তমানকে গড়িয়া তুলিতেছে, আর বর্তমানের উপরই অদৃশ্যভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে আমাদের অনাগত ভবিষ্যৎ। সুতরাং কোনো দৈবশক্তি নয়, অমোঘ নিয়তিও নয়, মানুষ নিজেই তাহার জীবনের নিয়ন্তা। পিছনের ঢেউ যেমন করিয়া সম্মুখের ঢেউকে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, তেমনি মানুষের অতীতের কৃত কর্ম তাহার বর্তমান জীবনকে সুনির্দিষ্ট রূপদান করিতেছে।

[৪৮] ভাবসম্প্রসারণ কর :

হে সমুদ্র, 'চিরকাল কী তোমার ভাষা?'
সমুদ্র কহিল, 'মোর অনন্ত জিজ্ঞাসা।'
'কিসের স্তব্ধতা তব, ওগো গিরিবর?'
হিমাদ্রি কহিল, 'মোর চির-নিরুত্তর।'

এই বিচিত্ররূপা বিশ্বসৃষ্টি সীমাহীন রহস্যে সমাবৃত। বিশ্বপ্রকৃতির নিত্যউদ্ভিন্নমান রূপপ্রকাশকে জানিবার জন্য, বুঝিবার জন্য যুগে যুগে কৌতূহলী মানুষের মনে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার অন্ত নাই। কল্লোলমুখর মহাসমুদ্র বুঝি মানুষের এই প্রশ্নকাতরতাকেই আপনার অশান্ত বক্ষোদেশে ধারণ করিয়া আছে, তাই বুঝি নীলাম্বুধির অনন্ত জিজ্ঞাসা। কিন্তু বিশ্বসৃষ্টিরহস্য দুরবগাহ। কত দার্শনিক, কত বিজ্ঞানী জগৎ ও জীবনের রহস্যসমুদ্রে আত্মনিমজ্জন করিল, কিন্তু বিশ্বের রহস্যাবরণ আজো কি সম্পূর্ণ উন্মোচিত হইয়াছে? ছলনাময়ী প্রকৃতিসুন্দরীর মুখোমুখী দাঁড়াইলে জিজ্ঞাসু মানবের সর্বপ্রকার উদ্ধত মুখরতা স্তম্ভিত হইয়া যায়। যুগযুগান্তের মানুষের সেই অনন্ত জিজ্ঞাসাই বুঝি নির্বাক হইয়া রহিয়াছে চিরনিস্তব্ধ হিমাদ্রির বক্ষোদেশে—তাইতো সে এমন নিরুত্তর। বিক্ষুব্ধ সমুদ্র মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসার প্রতীক, আর নিঃশব্দ হিমাচল অগাধ বিশ্বরহস্যের দুরধিগম্যতার বাস্তবমূর্তি।

[৪৯] ভাবসম্প্রসারণ কর ঃ

যথাসাধ্য-ভালো বলে ঃ 'ওগো আরো-ভালো,
কোন্ স্বর্গপুরী তুমি করে থাকো আলো?'
আরো-ভালো কেঁদে কহে ঃ 'আমি থাকি, হায়,
অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষায়।'

যথার্থ কর্মী যে, সে যখন কোনো কার্যে আত্মনিয়োগ করে, তখন ঐ কাজটি সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য তাহার প্রয়াসের অন্ত থাকে না। এরূপ কাজের ফলসিদ্ধিকেই আমরা 'যথাসাধ্য-ভালো' বলিয়া থাকি। যাহার যতখানি শক্তি বা সাধ্য রহিয়াছে, তাহার কার্যও হইবে সেই পরিমাণ শক্তির অনুরূপ, এবং এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এক জাতের মানুষ আছে, কোনো কার্যসম্পাদনের এতটুকু শক্তি তাহাদের নাই—ইহারা অক্ষম, অকর্মণ্য, অপদার্থের দল। শক্তিমান মানুষের সম্পাদিত কর্মের প্রতি বক্রদৃষ্টিপাত করিয়া ঈর্ষাবশত তাহারা 'আরো-ভালো'র দাবী জানায়। ভাবটি এই, 'আরো-ভালো' করিবার শক্তি যেন তাহাদের নিজেদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই রহিয়াছে—ঐ কাজটি যদি তাহারা করিত তবে তাহা 'যথাসাধ্য-ভালো' না হইয়া 'আরো-ভালো' হইয়া উঠিত। পক্ষান্তরে প্রকৃত কর্মী কখনো নিজের শক্তিসামর্থ্যের দম্ভ প্রকাশ করে না। কেবল, যাহারা অকর্মণ্য দাম্ভিক তাহারাই সাধ্যাতীতের গর্ব-অহংকার করিয়া বেড়ায়।

[৫০] ভাবসম্প্রসারণ কর ঃ

আগা বলে ঃ 'আমি বড়, তুমি ছোটলোক।'
গোড়া হেসে বলে ঃ 'ভাই, ভালো, তাই হোক।

তুমি উচ্চে আছ বলে গর্বে আছ ভোর,
তোমারে করেছি উচ্চ এই গর্ব মোর।'

বাস্তব সংসারে এমন কতকগুলি পরাশ্রয়ী মানুষ সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা আত্মদম্ভের বশবর্তী হইয়া মানুষের বড়ো সম্পদ কৃতজ্ঞতা-নামক বস্তুটিকে জলাঞ্জলি দিতেও এতটুকু লজ্জা অনুভব করে না। যে-উদার ব্যক্তির অকৃপণ দানে এই অকৃতজ্ঞ নীচাশয় মানুষটি সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাঁহাকেই সর্বপ্রকারে অস্বীকার করা তাহার স্বভাবধর্ম হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু মহৎহৃদয় ব্যক্তি পরনির্ভরশীল অকৃতজ্ঞের দাম্ভিক আস্ফালনে কর্ণপাত করেন না—তাঁহার আনন্দ, ঐ পরাশ্রয়ী দাম্ভিকটিকে উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মহতের অবিচল চিত্তপ্রসন্নতার প্রেক্ষাপটে উক্ত অকৃতজ্ঞের মহামূর্খতা ও জঘন্য নীচতা আরো প্রকট হইয়া উঠে। যাঁহার অকুণ্ঠ ত্যাগের উপর আমার আত্মপ্রতিষ্ঠা, তাঁহাকে ছোট করার মনোবৃত্তির মধ্যে রহিয়াছে আমার চারিত্রিক দীনতারই কলঙ্কলিপ্ত স্বাক্ষর। পরের দানকে স্বীকৃতি জানানোর মধ্যে অগৌরবের কিছুই নাই, বরংচ ঋণীর কাছে ঋণ স্বীকার করাই মহত্ত্বের পরিচায়ক।

[৫১] ভাবসম্প্রসারণ কর :

টিকি মুণ্ডে চড়ি উঠি কহে ডগা নাড়ি :
'হাত-পা প্রত্যেক কাজে ভুল করে ভারি।'
হাত-পা কহিল হাসি : 'হে অভ্রান্ত চুল,
কাজ করি আমরা যে, তাই করি ভুল।'

পরছিদ্রান্বেষী অলস নিষ্কর্মার চরিত্রস্বরূপটিকে কবি স্বল্পকথায় কেমন চমৎকার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন! কোনো কাজই সে করিবে না, কিন্তু পরের কৃতকর্মের দোষত্রুটি খুঁজিয়া বেড়াইতে সে বেশ পটু। পরনিন্দা, পরচর্চা, গুণীর বিরূপ সমালোচনায় এই অকর্মণ্য নিন্দকের দল একেবারে পঞ্চমুখ। কাজ করিতে গেলেই ভুলপ্রমাদ ঘটিবে—যে কাজ করে, সে-ই ভুল করে। যাহার কোনোকিছুই করিবার নাই, তাহার ভুল করিবারও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মজার ব্যাপার এই, নিষ্কর্মা অলস অপদার্থেরাই কর্মী মানুষের কাজের বিরূপ সমালোচনা করিয়া সময় কাটাইয়া দেয়। কিন্তু প্রকৃত কর্মী ঐ সব নিন্দকের কটাক্ষপাতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, নিরলসভাবে আপন আপন কর্মসম্পাদনেই ব্যাপৃত থাকে। ভুলত্রুটি তাহারা করে, তথাপি সমাজে তাহারা আদরণীয়। আর, নিষ্কর্মা নিন্দকের দল সামাজিক মানুষের কাছে চিরকালই ঘৃণ্য—অন্তঃসারশূন্যতা তাহাদের জন্য বহন করিয়া আনে শুধু অজস্র ধিক্কার।

[৫২] নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটির ভাবার্থ লিখ :

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়।
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার
এই চির পেষণযন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অপমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারংবার
মনুষ্য-মর্যাদা-গর্ব চির-পরিহার—
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি দূর কর। মঙ্গল-প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোকমাঝে উন্মুক্ত বাতাসে

মাতৃভূমির সহস্র রকমের দুঃখ-গ্লানি-লজ্জা, দেশবাসীর ভীতিবিহ্বলতা ও চারিত্রিক দুর্বলতা, পরাধীনতার বেদনা এবং প্রতি মুহূর্তের আত্মঅবমাননা স্বদেশপ্রাণ কবির চিত্তকে পীড়িত করিতেছে। কবি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাইতেছেন, তাঁহার করুণাস্পর্শে যেন দেশের মানুষ মনুষ্যত্ব অর্জন করিয়া মাতৃভূমির গৌরবমর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

[৫৩] ভাবার্থ লেখ :

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা, হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন, পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবার ধান্যের মুষ্টি, বল্কল-বসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণপিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব।

চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার—
পরাণে স্পর্শিতে চাই—ছিঁড়িয়া বন্ধন,
অনন্ত এ জগতের হৃদয়স্পন্দন।

আধুনিক যুগের বস্তুতান্ত্রিক নাগরিক সভ্যতার মধ্যে থাকিয়া কবি নিজেকে রুদ্ধশ্বাস মনে করিতেছেন। মানুষের আত্মা আজ চতুর্দিকের পাষাণকারায় অবরুদ্ধ হইয়াছে—ইহাতে ঘটিতেছে মানবের আত্মিক মৃত্যু। প্রকৃতির স্নেহস্পর্শবিজড়িত প্রাচীন ভারতের সেই আরণ্য সভ্যতাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য কবির প্রাণসত্তা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানের বস্তুতান্ত্রিক জীবনের ভোগপঙ্কিলতা হইতে কবি মুক্তি কামনা করেন। প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির সহায়তায় বিশ্বপ্রাণকে উপলব্ধি করিতে না পারিলে দুর্লভ মানবজীবনের সার্থকতা কোথায়? নাগরিক সভ্যতার ভগ্নস্তূপের উপর আমাদিগকে আরণ্য সভ্যতার ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে হইবে।

[৫৪] নিম্নোদ্ধৃত কবিতার সারাংশ লেখ :

দেবতামন্দির মাঝে ভকত প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাখা দেহে
বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে।
কহিল কাতর কণ্ঠে : 'গৃহ মোর নাই,
একপাশে দয়া করে দেহ মোরে ঠাঁই।'
সসংকোচে ভক্তবর কহিলেন তারে :
'আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যারে।'
সে কহিল : 'চলিলাম'; চক্ষের নিমেষে
ভিখারী ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে : 'প্রভু, মোরে কি ছল ছলিলে!'
দেবতা কহিল : 'মোরে দূর করি দিলে;
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়াতরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।'

জগৎসংসারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া রুদ্ধদ্বার দেবালয়ে কেবল ভগবানের নামোচ্চারণ করিলেই ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করা যায় না। মানুষের ভগবান মানুষের মধ্যেই নিত্যবিরাজমান, জগতের দুঃখী-দরিদ্র-কাঙালের ভিতর দিয়াই

ঈশ্বর ছদ্মবেশে প্রতিনিয়ত আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। যে-মানুষ এই আর্তজনের সেবা করে, সে-ই যথার্থ ঈশ্বরপ্রেমিক।

[৫৫] নিম্নোদ্ধৃত কবিতার ভাবার্থ প্রকাশ কর :

পরের মুখে-শেখা বুলি পাখীর মত কেন বলিস্ ?
পরের ভঙ্গি নকল করে নটের মত কেন চলিস্ ?
তোর নিজস্ব সর্বাঙ্গে তোর দিলেন ধাতা আপন হাতে,
মুছে সেটুকু বাজে হলি, গৌরব কি বাড়ল তাতে ?
আপনারে যে ভেঙেচুরে গড়তে চায় পরের ছাঁচে,
অলীক, ফাঁকি, মেকি সে জন, নামটা তার কদিন বাঁচে ?
পরের চুরি ছেড়ে দিয়ে আপন মাঝে ডুবে যারে,
খাঁটি ধন যা সেথায় পাবি, আর কোথাও পাবি না রে।

অন্ধ-পরানুকরণ সর্বৈব বর্জনীয়—ইহ মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে, তাহার ব্যক্তিগত বিশেষ প্রতিভাকে বিনষ্ট করিয়া দেয়। নিজত্বের বিকাশ এবং প্রকাশেই মানুষের সত্যকার প্রতিষ্ঠা, নকলকে কেহ চিরকালীন মর্যাদা দেয় না। আপনার ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত করিয়া তোলার মধ্যেই মানুষের পরম সার্থকতা—পরানুকরণকে পরমার্থ জানিলে জীবনে চরম ব্যর্থতা অনিবার্য।

[৫৬] নিম্নলিখিত কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবসত্য ব্যাখ্যা কর :

তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা,
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব আঘাত খেয়ে অচল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয়ডঙ্ক,
দেবো সকল শক্তি, লবো অভয় তব শঙ্খ।

নির্বিরোধ শান্তি, কেবল ভোগ-বিলাস-আরাম মানুষকে তাহার উচ্চতর মানবসত্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও প্রকাশের পথ হইতে স্খলিত করে—এগুলি মানবচিত্তকে জড়ত্বে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। যে-মানুষ তাহার 'ছোট-আমি'র সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, সে-ই চায় শুধু নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বাচ্ছন্দ্য, সংঘাতহীন আরাম-সম্ভোগের জীবন। কিন্তু ইহাতে মানুষের 'বড়ো-আমি'র জ্যোতির্ময় অভিব্যক্তির বৃহৎ আনন্দ কোথায় ? আঘাতব্যাঘাতহীন জীবন লইয়া, ক্ষুদ্র সুখের কাঙাল হইয়া, দুঃখভীরুতা প্রদর্শন করিয়া তো বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের আস্বাদ লাভ করা যায় না। বড়ো আনন্দের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়—সহস্র দুঃখবেদনার কাঁটার পথেই ঘটে ভূমানন্দের সহিত মানুষের সাক্ষাৎকার। পরিপূর্ণ জীবনের সত্য উপলব্ধি করিতে

হইলে দুঃখভীরু হইলে চলিবে না, তাহার জন্য বরণ করিয়া লইতে হইবে কঠিন আঘাতকে, চলিতে হইবে সুকঠোর কর্মের পথে, স্বীকৃতি জানাইতে হইবে ঈশ্বরের রুদ্র-আবির্ভাবকে। সকল শক্তি দিয়া আঘাতসংঘাত, ব্যথাবেদনা, বাধাবিপত্তিকে যদি আমরা জয় করিতে পারি, তবেই আমরা লাভ করিব বড়ো জীবনের অক্ষয় আনন্দ। সুখের কাঙাল যাহারা, আপনার ঘৃণিত দাস মনে করিয়া সুখ তাহাদিগকে একান্ত উপেক্ষাভরে নিজের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখে। অশান্তিকে, দুঃখকে এড়াইয়া নয়—উহাদের অতিক্রম করিয়াই আমাদিগকে সুখ-শান্তি-আনন্দের সহিত গভীরতর পরিচয়সাধন করিতে হইবে।

** বি. এ. বাংলার প্রশ্নপত্র হইতে সংকলিত **

[১] নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ-দুইটির মধ্যে একটির ভাবার্থ সংক্ষেপে নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর :

(ক) "বিশ্বের সহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই যে মানুষের গৌরব তাহা নহে। মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই আছে বলিয়া মানুষ বড়। মানুষ জড়ের সহিত জড়, তরুলতার সঙ্গে তরুলতা, মৃগপক্ষীর সঙ্গে মৃগপক্ষী। প্রকৃতির রাজবাড়ীর নানা মহলের নানা দরজাই তাহার কাছে খোলা। কিন্তু খোলা থাকিলে কী হইবে? এক-এক ঋতুতে এক-এক মহল হইতে যখন উৎসবের নিমন্ত্রণ আসে, তখন মানুষ যদি গ্রাহ্য না করিয়া আপন আড়তের গদিতে পড়িয়া থাকে, তবে এমন বৃহৎ অধিকার সে কেন পাইল? পুরা মানুষ হইতে হইলে তাহাকে সবই হইতে হইবে, এ-কথা না মনে করিয়া মানুষ মনুষ্যত্বকে বিশ্ববিদ্রোহের একটি সংকীর্ণ ধ্বজাস্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে কেন? কেন সে দম্ভ করিয়া বার বার এ-কথা বলিতেছে, আমি জড় নহি, উদ্ভিদ্ নহি, পশু নহি, আমি মানুষ—আমি কেবল কাজ করি ও সমালোচনা করি, শাসন করি ও বিদ্রোহ করি। কেন সে এ-কথা বলে না—আমি সমস্তই, সকলের সঙ্গেই আমার অবারিত যোগ আছে—স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা আমার নহে।

হায় রে, সমাজদাঁড়ের পাখি! আকাশের নীল আজ বিরহিণীর চোখদুটির মতো স্বপ্নাবিষ্ট, পাতার সবুজ আজ তরুণীর কপোলের মতো নবীন, বসন্তের বাতাস আজ মিলনের আগ্রহের মতো চঞ্চল। তবু তোর পাখাদুটো আজ বন্ধ, তবু তোর পায়ে আজ কর্মের শিকল ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিতেছে—এই কি মানবজন্ম!"

ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট বা স্বতন্ত্র হলেও মানুষ বিশ্বসৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অবারিত যোগেই তার সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ও অস্তিত্বের

সার্থকতা। বিপুল সৃষ্টিধারার সঙ্গে একটা নিগূঢ় আত্মীয়তার সম্পর্ক রচনা করতে পারে বলেই বিশ্বসংসারে একমাত্র মানুষেরই এতখানি প্রদীপ্ত মহিমা। কিন্তু মানুষ আপনার এই অতুলনীয় মর্যাদার কথা সব সময় মনে রাখে না, নিজের শুষ্ক স্বাতন্ত্র্যের আত্মঘাতী ঔদ্ধত্যে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি জগতের অধিবাসী বলে ভাবতে থাকে। এভাবে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে যায়। তখন প্রকৃতির সৌন্দর্য ও আনন্দের আহ্বানে মানবাত্মা আর সাড়া দেয় না, সুন্দরের দেবতা তার অন্তরের রুদ্ধদ্বারে বৃথা করাঘাত করে ফিরে যায়। হৃদয় আর প্রাণের এই যে নিস্পন্দ অবস্থা, এরই নাম মানুষের আত্মিক অপমৃত্যু। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে, নিজেকে নিষ্প্রাণ কর্মজালে জড়িয়ে যে-মানুষ স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে থাকতে চায়, তার মনুষ্যজীবন ব্যর্থ—বিড়ম্বিত।

(খ) জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে-ক্ষণে
এ আশ্চর্য সংসারের মহানিকেতনে,
সে-ক্ষণ অজ্ঞাত মোর। কোন্ শক্তি মোরে
ফুটাইল এ বিপুল রহস্যের ক্রোড়ে
অর্ধরাত্রে মহারণ্যে মুকুলের মতো।
তবু তো প্রভাতে শির করিয়া উন্নত
যখনি নয়ন মেলি নিরখিনু ধরা
কনক-কিরণ-গাঁথা নীলাম্বর-পরা,
নিরখিনু সুখে দুঃখে খচিত সংসার,
তখনি অজ্ঞাত এই রহস্য অপার
নিমেষেই মনে হল মাতৃবক্ষসম
নিতান্তই পরিচিত একান্তই মম।
রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি
ধরেছে আমার কাছে জননীমূরতি॥

বিশ্বসংসারের কত কত রহস্য মানুষ আবিষ্কার করেছে, কিন্তু এ পৃথিবীতে জন্মের রহস্য মানুষের কাছে আজো অনাবিষ্কৃত রয়ে গিয়েছে—সত্তার আবির্ভাব-সম্পর্কিত সকল প্রশ্ন চিরনিরুত্তর। সে কোন্ অজ্ঞাত শক্তি অজানার নিতল সমুদ্র হতে জীবনের কূলে আমাদের তুলে ধরল, কিছুই আমরা বুঝতে পারিনে। তবু তো এ ধরিত্রীকে অপরিচিতা বলে মনে হয় না, ধরিত্রীর কোলে নিজেদের আমরা অসহায় বোধ করি না। চারিদিকে জীবনের অজস্র সমারোহ, আনন্দ-সৌন্দর্যের উদ্বেল তরঙ্গলীলা; তখন ধীরে ধীরে অনুভব করতে থাকি—'মধুময় পৃথিবীর ধূলি'—তখন প্রত্যক্ষ করি বসুন্ধরার স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি।

এ অনুভূতির মধ্য দিয়েই কবি ওই জীবনপ্রসবিনী অজ্ঞাত শক্তির সঙ্গে জননী আর সন্তানের সম্পর্ক রচনা করেন, জননীর বক্ষোলগ্ন শিশুর মতো মাতৃ-নির্ভরতার পরমা শান্তির মধ্যে আশ্রয় লন।

[২] নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি-দুইটির মধ্যে একটির ভাবসম্প্রসারণ কর :

(ক) "ক্রোধের আবেগ তপস্যাকে বিশ্বাসই করে না ; তাহাকে নিশ্চেষ্টতা বলিয়া মনে করে, তাহাকে নিজ আশুউদ্দেশ্যসিদ্ধির অন্তরায় বলিয়া ঘৃণা করে ; উৎপাতের দ্বারা সেই তপঃসাধনাকে চঞ্চল সুতরাং নিষ্ফল করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া প্রবৃত্ত হয়। ফলকে পাকিতে দেওয়াকেই সে ঔদাসীন্য বলিয়া জ্ঞান করে, টান দিয়া ফলকে ছিঁড়িয়া লওয়াকেই সে একমাত্র পৌরুষ বলিয়া জানে। সে মনে করে যে, যে-মালী প্রতিদিন গাছের তলায় জলসেচন করিতেছে, গাছের ডালে উঠিবার সাহস নাই বলিয়াই তাহার এই দীনতা।"

জীবনে মহৎ প্রাপ্তির জন্যে অভীষ্ট ফলসিদ্ধির জন্যে সংযম, তপস্যা, চিত্তস্থৈর্য, প্রতীক্ষা ইত্যাদি যে কতখানি আবশ্যক, রিপুতাড়িত মানুষের পক্ষে তা বুঝে ওঠা সত্যই কঠিন। রিপুর দ্বারা আক্রান্ত হলে মানুষ তার স্বচ্ছদৃষ্টি হারিয়ে ফেলে, স্বধর্ম ও মঙ্গলবোধ থেকে বিচ্যুত হয়, স্বাভাবিক পথে আর বিচরণ করতে পারে না,—তখন উচ্ছৃঙ্খলতা-বিশৃঙ্খলতাকেই সে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুলাভের একমাত্র উপায় বলে মনে করে। বড়ো কিছু পেতে হলে, মহৎ কিছু আয়ত্ত করতে হলে, তার জন্যে যে যথোচিত প্রস্তুতি ও দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রয়োজন, এরূপ বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি তা কিছুতেই বুঝতে চায় না। তার ধারণা, বলপ্রয়োগের দ্বারা সবকিছুই লভ্য। তাই চিত্তের উন্মত্ততাকে সে শক্তির প্রকাশ বলে ভুল করে, যথার্থ শক্তিমানের সংযম-তপস্যা আর প্রতীক্ষমানতাকে দুর্বলের নিষ্ক্রিয়তা ভেবে স্পর্ধাভরে তার প্রতি ঘৃণা আর উপেক্ষা প্রদর্শন করতে সে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। মাঠে লাঙল চালিয়ে, কোদাল চালিয়ে, জল সেচন করে, বীজ ছড়িয়ে, অনেককাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেই তবে চাষী যথাসময়ে ক্ষেতের পাকা ফসল ঘরে নিয়ে আসে। এর জন্যে তার কত দুঃখচর্যা, কত সহনশীলতা, কত-না প্রশান্ত প্রতীক্ষমানতা! ধৈর্যের পথ থেকে এতটুকু বিচলিত যদি হয় তবে তার ঘরে ফসল আর উঠবে না। কিন্তু রিপুআক্রান্ত, বিকারগ্রস্ত, চিত্তের ধৈর্যস্থৈর্যহীন ব্যক্তির কাছে এর কোনো মূল্যই নেই। কোনরূপ সাধনা-ব্যতিরেকেই ফলকে সে অবিলম্বে করায়ত্ত করতে চায়—পরিণতির জন্যে প্রতীক্ষাকে সে বলে বসে বীর্যহীনতা। বলাবাহুল্য, শক্তির এহেন উচ্ছৃঙ্খল অপচয় অভীষ্টকে দূরেই সরিয়ে রাখে, ফলসিদ্ধির যথার্থ পথ এ নয়, এপথে মহতী বিনষ্টিই অবশ্যম্ভাবী। অতএব,

স্পর্ধিত শক্তিবশে আমরা যেন বীর্যবানের অতন্দ্র সাধনাকে উপেক্ষা না করি, যেন বুঝতে শিখি—ধৈর্য-তপস্যা-সংযমই মহৎ প্রাপ্তির নিশ্চিত সোপান।

(খ) দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি,
সত্য বলে—তবে আমি কোথা দিয়ে ঢুকি?
উভয়-সংকটে পড়ি' দ্বার রাখি খুলি,
ঘরের ভিতরে বেধে গেল চুলোচুলি।

মানবমনে সত্যসন্ধিৎসা চিরজাগরূক রয়েছে, কিন্তু সত্যকে আয়ত্ত করা সহজ নয়। আলোর সঙ্গে অন্ধকার যেমন জড়িত, সত্যবস্তুটিও তেমনি বহু ভুলভ্রান্তি, নানা মিথ্যার দ্বারা আকীর্ণ। সত্যদর্শনের জন্য এগুলিকে সর্বাগ্রে অপসারিত করা প্রয়োজন। ভুলভ্রান্তিকে মানুষ কী ভাবে দূর করতে পারে? এর উত্তরে বলবো—বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোকে। সত্যের অন্দরমহলে প্রবেশ করবার চাবিকাঠি তারাই খুঁজে পায় যারা নিজ জীবনে কঠোর বাস্তব অভিজ্ঞতার পথে পদচারণ করতে কুণ্ঠিত ও শঙ্কিত হয় না। নানামুখী অভিজ্ঞতাই মানুষের সকল জ্ঞানের ভিত্তি, আর এই জ্ঞানই চতুষ্পার্শ্বের ভ্রমপ্রমাদকে সরিয়ে সরিয়ে দিশারীর মতো মানুষকে সত্যের মুখোমুখী এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। বহুবিচিত্র পথে অভিজ্ঞতার পদসঞ্চার, সেজন্য মনের সকল জানালা খুলে রাখাই কর্তব্য। ভুলের অনুপ্রবেশের ভয়ে কেউ যদি মনের বাতায়ন রুদ্ধ করে দেয় তবে সত্যেরই প্রবেশে সে বাধা দেবে। কবির ভাষায়—'জগৎটা বাণীময় রে'—তার সকল দিকের জানালা দিয়েই আলোক আর বাণী প্রবেশ করে। এদের দূরে সরিয়ে রাখলে সত্যের সাক্ষাৎ কদাপি মিলবে না। সংঘাতের মধ্য দিয়েই মানুষ সত্যকে পায়, একথাটি ভুললে চলবে না। মনের দুয়ার খুলে রাখলে ভ্রম ও সত্য উভয়েই একসঙ্গে প্রবেশ করবে, তাতে সৃষ্টি হবে পরস্পরের দারুণ দ্বন্দ্ব, এবং এই দ্বন্দ্বে সত্যের জয় সুনিশ্চিত।

তাহলে বুঝা যাচ্ছে, সংঘাতকে যে এড়াতে চাইবে, সত্যও তাকে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। আমাদের উপনিষৎ বলেছেন—'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়'। এখানে 'গময়' কথাটি লক্ষ্য করবার মতো। সংসারে কোনোকিছুকে এড়িয়ে নয়, সমস্ত অভিজ্ঞতাকে মাড়িয়ে গিয়েই তবে সত্যের জগতে, আলোর জগতে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। সুতরাং বলা যেতে পারে, যে-মানুষ ভুল কোনোদিন করল না, সত্যকেও সে পেল না। খনি থেকে সোনা আহরণ করতে হলে যেমন অনেক মূল্যহীন পদার্থকে হাতে তুলে নিতে হয় এবং তারপর ওইসব বস্তুর মধ্য হতে সোনা কুড়োতে হয়, ঠিক তদ্রূপ বহু মিথ্যার, বহু ভুলপ্রমাদের সম্মুখীন হলেই তবে সত্যের দর্শন মেলে। এইজন্যই বলা হয়েছে সত্যবস্তুটি অতিশয় দুর্লভ।

[৩] যে-কোনো একটির ভাব সম্প্রসারিত কর :

(ক) "রাখালকে কেউ ভুলেও রাজসিংহাসনে আমন্ত্রণ করে না, এইজন্যেই বটতলায় সে বাঁশি বাজাবার সময় পায়। কিন্তু যদি দৈবাৎ কেউ করে বসে, তাহলে পাঁচনিকে রাজদণ্ডের কাজে লাগাতে গিয়ে রাখালি এবং রাজত্ব দুয়েরই বিঘ্ন ঘটে।"

'যার যেথা স্থান'—এ কথাটির মধ্যে মানবজীবনের একটি গভীর সত্য লুকিয়ে রয়েছে। প্রত্যেক মানুষের বিচরণক্ষেত্র স্বতন্ত্র এবং সীমাবদ্ধ, যেহেতু তার অন্তর্নিহিত শক্তি একটি বিশেষ সীমার দ্বারা চিহ্নিত; যেহেতু তার রুচি, তার প্রবৃত্তি, তার মানসপ্রবণতার গতি একটি বিশেষ দিকে পরিচালিত। সব মানুষ, ইচ্ছা করলেই, সবকিছু হতে পারে না কিংবা করতে পারে না,—এই ধ্রুব সত্যটি মেনে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য নিজের শক্তি-সামর্থ্যের সীমাটিকে চিনে নেওয়া, আমার মধ্য দিয়ে বিধাতা তাঁর কোন্ গোপন উদ্দেশ্যটি সাধন করতে চান, তা সঠিক উপলব্ধি করা। এ যদি করতে পারি, স্বধর্মটি যদি চিনে নিতে পারি, তাহলে সমাজ বহু অনর্থ-উৎপাত থেকে রক্ষা পায়, শক্তির অপচয় আর ঘটে না। এ করতে না পারলেই সমূহ বিপদ। এরূপ অবস্থায় বিজ্ঞানী হতে চাইবেন কবি, কবি হতে চাইবেন রাষ্ট্রশাসক, পর্যটক হতে চাইবেন তত্ত্বদ্রষ্টা, মেষপালকের মনে ইচ্ছে জাগবে দেশের নেতৃত্বভার হাতে তুলে নিতে। তাহলে বুঝুন, এতে করে গোটা সমাজের অবস্থাটা কী হয়ে দাঁড়াবে। এহেন একটি পরিস্থিতিতে কোথায় থাকবে শৃঙ্খলা, কোথায় থাকবে শান্তি, কোথায় থাকবে সামাজিক নিরাপত্তা! আদার ব্যাপারীর পক্ষে জাহাজের খবর নেওয়াটা কি বাঞ্ছনীয়?

আপনি কি একজন রাখাল-বালককে তার যথার্থ বিচরণভূমি গোচারণের মাঠ থেকে ডেকে নিয়ে এসে তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিতে চাইবেন? বুদ্ধিমান যদি হন, নিশ্চয়ই চাইবেন না। যদি বুদ্ধিভ্রংশ-হওয়া-বশত চান তাহলে একাজের কী পরিণাম দাঁড়াবে একবার দেখুন। পরিণামটি অত্যন্ত শোচনীয়। এতে রাখাল-বালকটি তার স্বধর্ম অর্থাৎ রাখালিয়ানার ধর্ম থেকে চ্যুত হবে, এবং নিজ ধর্মটি হারিয়ে অন্যের ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে চাইবে। সেটি হবে অবাঞ্ছিত উৎপাত। বালকটির আসল কাজ মাঠে-বাটে গোচারণ, আর, তার ফাঁকে ফাঁকে উন্মুক্ত প্রান্তরে উদার আকাশের নীচে বটের নিভৃত নিরালায় বসে আপন মনে বাঁশি বাজানো। ওই বাঁশির সুরের ভেতর দিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠবে লীলাময়ী প্রকৃতির প্রাণের সুরটি। ঋতুরঙ্গনাট্যশালায় তার উপর ভার রয়েছে বংশীবাদনের। নীলাকাশের আলোর গানের সঙ্গে, ঝির্‌ঝিরে বাতাসের কাঁপনের সঙ্গে, গাভীদলের 'হাম্বা'-রবের সঙ্গে আপনার ঘরছাড়া প্রাণের সুর মিলাতে না

বিজ্ঞানীর অনন্ত কৌতূহল। কেবল খণ্ডবিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষগম্যতার মধ্যে তাঁর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ নয়, শুধু চোখে দেখে, কানে শুনে তিনি তৃপ্ত থাকতে পারেন না। তিনি নিজের দূরযানী দৃষ্টিকে প্রসারিত করে ধরেন এমন একটা রহস্যময় লোকে যেখানে চক্ষুরিন্দ্রিয় কিংবা শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তি পৌঁছায় না ; যে-স্বর তাঁর কানে বাজে তা সাধারণের শ্রুতিগম্য নয়, যে-আলোর কাঁপন তাঁর সন্ধানী চোখের সম্মুখে ধরা পড়ে তা সাধারণ মানুষের স্থূলদৃষ্টির অগম্য। শুধু তাই নয়। সাধারণ মানুষ এই বস্তুবিশ্বে কোনো নিয়মশৃঙ্খলা দেখতে পায় না, জগৎসংসারকে তারা অনিয়মের রাজত্ব বলেই মনে করে। বিজ্ঞানী কিন্তু সমস্ত খণ্ড-বিচ্ছিন্নতার অন্তরালে এক-এর নিয়মকে দেখতে পান, বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন অখণ্ড ঐক্যকে—চতুষ্পার্শ্বের বিশৃঙ্খলতার মধ্যে নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠাই হল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। বিরাট বিশ্বযন্ত্রের অন্তরালবর্তী অপরিজ্ঞাত রহস্যের আবরণ-উন্মোচনই বিজ্ঞানসাধকের আসল কাজ ; প্রকাশের রাজ্য থেকে অব্যক্তের সুদূর সীমান্ত পর্যন্ত তাঁর অবাধ আনাগোনা, মাটির ধূলিকণা থেকে আকাশের সৌরমণ্ডল অবধি তাঁর নির্বাধ বিচরণক্ষেত্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুর সত্যকে—ভিন্নতর ভাষায় বস্তুসত্তাকে—করতলে আমলকবৎ আয়ত্ত করবেন, ইহাই বিজ্ঞানী র বাসনা।

বিজ্ঞানসাধকের মতো কবিত্বসাধকও বিশ্বভুবনের সত্যকে আমাদের নয়ন-সমক্ষে তুলে ধরেন। কবির সুরময় বাণীসৃষ্টির গভীরতম তাৎপর্য যে গুহায়িত এক মহাসত্যের দিকে অঙ্গুলিসংকেত করে, তাতে সংশয় প্রকাশের অবকাশ নেই। সমালোচক ব্র্যাড্‌লি কাব্যের মূল্যনিরূপণপ্রসঙ্গে বলেছেন : "About the best poetry, and not only the best, there floats an atmosphere of infinite suggestion. Its meaning seems to beckon away beyond itself, or rather to expand into something boundless which is only focussed in it ; something also, which we feel would satisfy not only the imagination but also the whole of us···Poetry has in this suggestion, this meaning, a great part of its value." এই যে 'infinite suggestion' বা মহাসত্যের প্রতি ইঙ্গিত, এ সত্যটি কিন্তু জগৎ-ব্যাপারে কোনো সার্বিক নিয়মের সত্য নয়, অথবা পরম কোনো তত্ত্ব-ও নয়, একে বলা যেতে পারে—ভাবের সত্য, রসোপলব্ধির সত্য। জগৎ ও জীবনের অন্তর্নিহিত ভাবগত সত্যকেই কবিশিল্পী রসের মূর্তিতে প্রকাশ করেন। বস্তুসংসারকে আশ্রয় করে কবি ভাবলোকে উত্তীর্ণ হন। এই ভাবলোকে পৌঁছে তাঁর চিত্ত রসতন্ময় হয়ে ওঠে ; এই রসতন্ময় মুহূর্তে তিনি যে স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি বা বোধিদৃষ্টির অধিকারী হন, তার দিব্য আলোয় চাক্ষুষ করেন বিশ্বরঙ্গমঞ্চের নেপথ্যচারী রহস্যময় সুন্দর-সত্তাকে।

এরই অপর নাম বিশ্বসত্তা—দার্শনিকের ভাষায় পারমার্থিক সত্তা, আর বিজ্ঞানীর ভাষায় বস্তুসত্তা—'Reality in its transcendental and phenomenal aspect'। বহুবিচিত্রের মধ্যে অরূপসুন্দর পরম-এক-এর রূপসুন্দর লীলা প্রত্যক্ষ করেই কবি আনন্দিত। সত্যের আনন্দময় প্রকাশের নির্ঝরিণীতে অবগাহন করে তিনি ধন্য।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞানীর ন্যায় কবিও সত্যের পূজারী। কিন্তু উভয়ের সাধন-পন্থা কত পৃথক! একজন সুধী সমালোচক এ পার্থক্যটি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন: "বৈজ্ঞানিক সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন নিজের ব্যক্তিপুরুষকে, নিজের ভাবনাবেদনা, ভালোলাগা-মন্দলাগাকে তাঁর সত্যান্বেষণ থেকে সরিয়ে রাখতে; তিনি সন্ধান করেন এমন বস্তুসত্তা যা বিষয়ধর্মী, সুতরাং বিষয়ীর অনুভবসাপেক্ষ নয়—অভিজ্ঞেয় কিন্তু অভিজ্ঞতানির্ভর নয়। পক্ষান্তরে, শিল্পীর জগৎ তাঁর হৃদয়ানুরঞ্জিত, তাঁর আনন্দ-বেদনা, আশাআকাঙ্ক্ষার স্পর্শে পরিস্পন্দিত; তাঁর অন্তর্লোকের সঙ্গে তাঁর বহির্বিশ্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—দ্বৈতাদ্বৈত। কবির ভাষায় বলবো, 'মানুষ সমস্ত জগৎকে হৃদয়-রসের যোগে আপন মানবিকতায় অধিকার করেছে, তার সাহিত্য ঘটেছে সর্বত্রই। মানুষেরা সর্বমেবাবিশন্তি।'···বিজ্ঞানের সত্য সার্বিক, নিরপেক্ষ, এবং সেই কারণে নির্বস্তুক [abstract]; শিল্পীর সত্য ততটা সার্বজনীনতার দাবী রাখে না, কিন্তু অধিকতর বাস্তবিক, কারণ তা অধিকতর মানবিক।" অতএব, সত্যকে পাওয়া উভয়েরই লক্ষ্য হলেও, দুজনের সাধনার মার্গ বিলক্ষণ স্বতন্ত্র।

(খ) 'হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে'—

কালপ্রবাহ অনন্ত—তার গতি উদ্দাম, তার চলা অবারণ। অনন্ত বিশ্বে কাল-পুরুষের পথপরিক্রমাও অনন্ত। কালের এই যে নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ, সাধারণ মানুষ কিন্তু এ-কে তার অখণ্ডতায়-সমগ্রতায় উপলব্ধি করতে পারে না; সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ও দৃষ্টি দিয়ে খণ্ডিত করেই দেখে; যা অবিচ্ছিন্ন তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বলে—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান। সুতরাং লৌকিক ধারণায় কালস্রোত ত্রিধা-বিভক্ত। মানুষের একদিকে অতীত, অন্যদিকে সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ, আর তার মাঝখানটিতে সংকীর্ণ-পরিসর বর্তমান। চক্ষের নিমেষে বর্তমান অতীতের অন্ধকার জঠরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, আবার বিপরীত দিক থেকে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ এসে বর্তমানের স্থানটি দখল করে বসছে। যুগযুগান্ত ধরে কত কত ঘটনা ঘটছে, কবির ভাষায় তারা—'ফুটে আর টুটে পলকে'। যারা টুটল, অতীতের গর্ভে হারিয়ে গোপন হয়ে গেল, তাদের সংবাদ বড় একটা কেউ রাখে না। তাই লৌকিক দৃষ্টিতে বিগত দিনের ঘটনা চির-অবলুপ্ত, সম্পূর্ণ মৃত—কোনো রূপে, কোনো ভাবে আর সেগুলি পরিব্যক্ত হবে না।

এই লৌকিক ধারণার সঙ্গে কবির ধারণা কিন্তু মেলে না। তাঁর বক্তব্য, যা অতীতে আত্মগোপন করল তা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল না, স্থূলদৃষ্টির আড়ালে প্রচ্ছন্ন হয়ে রইল মাত্র। চারদিকে অনন্তবিস্তার সমুদ্র, মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপ। এই যে দ্বীপটি আমাদের চোখে পড়ছে, এটা কি তার নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ? কখনো নয়। চোখে না পড়লেও, আমরা সকলেই তো জানি, এ দ্বীপের ভিত্তিভূমি জলের গভীরেই নিহিত রয়েছে। তাকে পাদপীঠস্বরূপ না পেলে দ্বীপটির অস্তিত্বরক্ষাই সম্ভবপর হত না। তেমনি বর্তমান কালটিও আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়—অতীত-ভবিষ্যতের মধ্যখানে সে একটি 'হাইফেন'-মাত্র। নতুন কালের সঙ্গে অতীত কাল ও ভাবী-কালের যোগ অনবিচ্ছিন্ন, অতীতকে আশ্রয় করেই বর্তমান কাল বা নতুন কালের আত্মপ্রকাশ; আবার, এই বর্তমানও বহন করছে ভবিষ্যতের সংকেত। সুতরাং কালস্রোত অখণ্ড, অবিচ্ছিন্ন—তার সত্যরূপ তার সমগ্রতায়।

এ ভাবে যদি দেখি তাহলে অদৃশ্য অতীতকে কিছুতেই মৃত বা নিষ্ক্রিয় বলা যায় না, সে গোপনে গোপনে জগৎসংসারে নিজের কাজটি করেই যাচ্ছে। অতীতের এই সক্রিয়তাকে আমরা অনুভব করি আমাদের চিন্তায়, আমাদের ভাবনায়, আমাদের ধ্যানে, আমাদের ধারণায়। মানুষের সভ্যতায়-সংস্কৃতিতে-ঐতিহ্যে আপাতলুপ্ত অতীত তার উত্তরাধিকার রেখে গেছে। আমাদের মনের নিভৃত গোপন স্তরে অতীতের পলিমৃত্তিকা যদি সঞ্চিত হয়ে না থাকতো, তাহলে বর্তমান কালের মানুষের মনোভূমি কি এতখানি উর্বর হয়ে উঠতে পারতো? মানুষের সাধনা অখণ্ড অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকে জুড়ে, এ সাধনা কালের সমগ্রতাকে উপেক্ষা করতে পারে না। এক-যুগের স্বপ্ন তার চরম সফলতার জন্য অন্য যুগের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে, এক-জীবনের তপস্যা অন্য জীবনে চরিতার্থ হয়ে উঠেছে। শুধু দেশ ও কাল অবিচ্ছিন্ন নয়, মানবসত্তাও অবিচ্ছিন্ন। তাই তার মানসযোগের ব্যাপ্তিও নিরবধি, বিশাল—অতীতের সঙ্গে ঐক্যবোধেই সে সত্য। আমার বর্তমানের 'আমি'র মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বিস্মৃত অতীতের এক 'বিরাট-আমি'। সুতরাং দেশকালের সীমায় আবদ্ধ হলেও আমার লৌকিক সত্তা একহিসাবে লোকোত্তর—কালোত্তীর্ণ। ব্যক্তিজীবনের পক্ষে যে-কথা সত্য, সমষ্টিজীবনের পক্ষেও তা-ই সত্য। পূর্ববর্তীদের জীবনসাধনার প্রভাবই বর্তমানের সাধনার সৌধ গড়ে তুলছে। এই সত্যটিকে উপলব্ধি করেই কবি বলেছেন:

'সেই ভালো প্রতিযুগ আনে না আপন অবসান
সম্পূর্ণ করে না তার গান;
অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস রেখে দিয়ে যায় সে বাতাসে।

তাই যবে পরযুগে বাঁশির উচ্ছ্বাসে
বেজে ওঠে গানখানি
তার মাঝে সুদূরের বাণী
কোথায় লুকায়ে থাকে, কী বলে সে, বুঝিতে কে পারে।'

একটু ভাবলেই বুঝতে পারা যায়, অতীতে যা হারিয়ে গেলো, সে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায় না, বর্তমানের বুকে ভিন্নমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে ; যা ছিল স্থূল তা সূক্ষ্ম ভাবময়, মনোময় হয়ে ওঠে। এ কারণে কবি অতীতকে অস্বীকার করতে পারেন না। তাকে স্বীকৃতি জানিয়েই তাঁর প্রতিভা লোকোত্তর হয়ে ওঠে। এই স্বীকৃতি না পেলে বিশ্বজীবনের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগ রক্ষিত হত না, যুগযুগান্তের মানবজাতি সমুদ্রবক্ষে এক-একটি দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তো। কবির নিকট অতীত জীবন্ত, অতীত সক্রিয়, অতীত দৃষ্টির অগম্য হলেও শক্তিমান। নীরব অতীতকে মুখরতা দান না করে তিনি ক্ষান্ত থাকবেন না। তার গোপনসঞ্চারিণী শক্তি তাঁকে বিস্মিত করে। তাই তো কবিকে বলতে শুনি :

'কথা কও, কথা কও।
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী, অচেতন তুমি নও,
কথা কেন নাহি কও।
তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয় রেখে যাও মোর প্রাণে।
হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে
কাজ করে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা-মাঝে স্থির হয়ে তুমি রও।
হে অতীত, তুমি গোপন হৃদয়ে কথা কও কথা কও ॥'

[৫] ভাবসম্প্রসারণ কর :

পেঁচা রাষ্ট্র করে দেয় পেলে কোনো ছুতা :
জান না আমার সঙ্গে সূর্যের শত্রুতা ?

যে ক্ষুদ্র এবং নীচমনা, মহতের প্রতি তাহার ঈর্ষার অন্ত নাই। শ্রেষ্ঠকে নিন্দা করিয়াই সে নিজের নিকৃষ্টতাকে আবৃত করিয়া রাখিতে চায়। যাহার নিকটে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার মতো শক্তি তাহার নাই, সেই শ্রদ্ধেয় শক্তিমানকে নিজের শত্রু বলিয়া রটনা করিয়াই সে আত্মপ্রসাদ আকাঙ্ক্ষা করে। হীনচেতা ভীরু এই বলিয়াই আত্মমর্যাদা বাড়াইতে চেষ্টা করে যে, শক্তিমান মহতের অপেক্ষা সে কোনো অংশে হীন নয়—নিছক শত্রুতাবশতই সে উক্ত শক্তিমানকে এড়াইয়া চলে, তাহার ভয়ে কখনই সে

ভীত হয় না। অর্থাৎ, রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপনকারী পেচক যেমন সূর্যের সহিত কল্পিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ঘোষণা করিয়া স্বগৌরব বাড়াইতে প্রয়াস পায়, এই জাতীয় নীচাশয়দের মনোবৃত্তিও ঠিক সেইরূপ।

[৬ ভাবসম্প্রসারণ কর :

বাবুই-পাখীরে ডাকি কহিছে চড়াই :
'কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই।
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা-'পরে
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে।'
বাবুই হাসিয়া কহে : 'সন্দেহ কি তায়,
কষ্ট পাই তবু থাকি নিজের বাসায়।
পাকা হোক, তবু ভাই পরের ও বাসা,
নিজ হাতে গড়া মোর কুঁড়ে ঘর খাসা।'

যিনি স্বাবলম্বী এবং স্বাধীন, সংসারে তাঁহার অপেক্ষা সুখী আর কেহই নাই। তাঁহার অভাব থাকিতে পারে, দুঃখদারিদ্র্য থাকিতে পারে, সংসারের নানা ঝড়-ঝাপটায় তাঁহাকে বিব্রত ও বিপন্ন থাকিতে হইতে পারে। তথাপি স্বাধীনতার গৌরবে তিনি গৌরবান্বিত, সহস্র দুঃখবেদনার মধ্যেও স্বহস্তনির্মিত পর্ণকুটীরখানিকেই তাঁহার স্বর্গের অমরাবতী বলিয়া মনে হইতে থাকে।

অপরপক্ষে, যে দুর্বলমতি, সে নিত্য-পরাশ্রয়ী হইয়া থাকিতেই ভালোবাসে। তাহার নিজের কিছুমাত্র যোগ্যতা নাই, পরের উপরে ভর করিয়াই নিশ্চিন্ত বিলাসে দিনগুলি সে কাটাইয়া যাইতে চায়। কিন্তু এই সত্যটি তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় না যে, আপাতত যত সুখেই সে কাল কাটাক, বস্তুত পরের অনুগ্রহের উপরেই তাহার স্থিতি। স্বাবলম্বী দরিদ্র বাবুইকে ব্যঙ্গ করিবার সুযোগ পরজীবী চড়ুই গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা চড়ুইয়ের স্মরণ থাকে না যে, পরের গৃহ হইতে যেদিন সে বিতাড়িত হইবে, সেদিন কোথাও সামান্য আশ্রয় পর্যন্ত তাহার জুটিবে না। অপরপক্ষে, নিজের রচিত দরিদ্র নীড়ে বাবুই নিশ্চিন্তে তাহার দিনযাপন করিয়া যাইবে।

[৭] ভাবসম্প্রসারণ কর :

'কে লইবে মোর কার্য ?' কহে সন্ধ্যারবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটীর প্রদীপ ছিল, সে কহিল : 'স্বামী!
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।'

অবস্থার দীনতা মনুষ্যত্ব ও প্রতিভার প্রতিবন্ধক নয়। আপাতদৃষ্টিতে যে ক্ষুদ্র তাহার অন্তরেও বহুক্ষেত্রে মহৎ শক্তির অগ্নিশিখা নিহিত থাকে। ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনো একটি বিশিষ্ট দায়িত্ব পালনের ভার অনেক বিরাট শক্তিমানও লইতে পারেন না, অপরপক্ষে অত্যন্ত সামান্যের দ্বারা তাহা সম্ভব হইয়া উঠে। উল্লিখিত প্রসঙ্গে এই সত্যটিই চিত্রিত হইয়াছে।

দিনকর সূর্য যখন সন্ধ্যায় বিদায় গ্রহণ করিতেছে, তখন তমসাবৃত পৃথিবীতে আলোক বিতরণ করিবার দায়িত্ব কেহই লইতেছে না। উচ্চচূড় পর্বত, দুর্গম অরণ্য বা গর্জনমুখর সমুদ্র—কাহারও কণামাত্র কিরণদান করিবার সামর্থ্য নাই, সকলেই লজ্জায় ম্লান হইয়া আছে। অথচ ঠিক সেই মুহূর্তেই নগণ্য দীপশিখা এই কর্তব্য গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। লোকসেবার দুরূহ ব্রত লইবার ক্ষমতা যখন সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও লইতে পারিতেছেন না, তখন দীনাতিদীন একজন মানুষ আসিয়া সেই পুণ্যকর্মে আত্মনিয়োগ করিতেছে—এরূপ ঘটনা সংসারে একান্ত বিরল নয়।

[৮] ভাবসম্প্রসারণ কর ঃ

বোল্‌তা কহিল এসে ঃ 'ক্ষুদ্র মউচাক,
এরি তরে মধুকর এত কর জাঁক?'
মধুকর কহে তারে ঃ 'তুমি এস ভাই,
আরো ক্ষুদ্র মউচাক রচ, দেখি তাই।'

এক-ধরণের মানুষ এই সংসারে প্রতিনিয়তই চোখে পড়ে—যাহারা অন্যের সমালোচনা করিতেই তৎপর, অথচ নিজেদের কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই। তাহারা কটুভাষী, বাক্যযন্ত্রণায় অন্যকে জর্জরিত করিতেই মাত্র তাহারা অভ্যস্ত। নিজেরা কিছুই করিতে প্রস্তুত নয়, অন্যে যথাশক্তি কিছু গড়িয়া তুলিলে তাহাকেও তাহারা ব্যঙ্গবিদ্রূপের আঘাত হানিতে থাকিবে। বোল্‌তা ও মৌমাছির উপমা এই সত্যটি ফুটাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে।

বস্তুত বোল্‌তাকে তুলনা করা যাইতে পারে দুর্মুখ সমালোচকের সঙ্গে। তাহার কোনো সৃষ্টিক্ষমতা নাই, অথচ যে-সাহিত্যিক নিজের শিল্পপ্রতিভাবলে রসের মধুচক্র নির্মাণ করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকে অসম্মান করাই তাহার একমাত্র কাজ। অকর্মা বিশ্বনিন্দকের তাহা ছাড়া আর কী-ই বা করণীয় থাকিতে পারে। যাহাদের নিন্দা সে প্রতিমুহূর্তে করিয়া বেড়ায়, তাহাদের কীর্তিতে সে অক্ষম ঈর্ষায় দগ্ধ হয় বলিয়াই এই ভাবে বোল্‌তার মতো হুল ফুটাইয়া চলে। কারণ, শিল্পী-মৌমাছির মতো মধুচক্রের একটি খণ্ডাংশ রচনা করিবার মতো ক্ষমতাও তাহার নাই।

[৯] ভাবসম্প্রসারণ কর :

বিপদ মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।

সংকটমুহূর্তে আত্মত্রাণের জন্য যে ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা জানায়, ভগবান কখনই তাহাকে রক্ষা করেন না। কারণ, বিঘ্নবিপদের সহিত অকুতোভয়ে সংগ্রাম করাই মানুষের মনুষ্যত্ব, ভয়কে জয় করিতে পারাই তাহার জীবনের সার্থকতা। সংসারে জন্মলাভ করিলেই প্রাকৃতিক নিয়মের অপরিহার্যতায় মানুষকে রাশীকৃত দুঃখ-বেদনার সম্মুখীন হইতে হইবে—নির্ভীক বক্ষোপটে আঘাতের পর আঘাত বরণ করিয়া লইয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে স্বকার্যসাধনের পুণ্যব্রতে। দুঃখ হইবে তাহার কণ্ঠের মণিহার, আঘাত হইবে তাহার মাথার মুকুট, সংগ্রাম হইবে তাহার জয়যাত্রা।

যে-ভীরু ও মূঢ় এই সংগ্রামকে ভয় করে, সে মনুষ্যত্বের মহৎ অধিকার হইতে বঞ্চিত। ভগবান এই ভীরুকে কদাপি মার্জনা করেন না। অতএব, যিনি যথার্থ মানুষ তিনি শ্লথপ্রাণ দুর্বলের মতো ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া স্বীয় মানবতার অবমাননা করিতে প্রস্তুত নন—তিনি আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া জীবনসংগ্রামে বীরের ন্যায় অগ্রসর হন। দুঃখবিপদকে জয় করিয়া তিনি রক্ষা করেন মনুষ্যত্বের মর্যাদা, এবং তাঁহার সেই সংগ্রামী শক্তির উপর অকৃপণ ভাবে বর্ষিত হয় বিশ্বস্রষ্টার অমৃতময় আশীর্বাদ।

[১০] ভাবসম্প্রসারণ কর :

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন,
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে,
সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,
প্রণাম অমার কোনখানে যায় থামি—
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে—
সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে।

লাঞ্ছিত ও দুর্গত জনগণের হৃদয়েই বিশ্বনিয়ন্তা ভগবান বাস করেন। সমাজের কোটি কোটি অপমানিত ও দারিদ্র্যগ্রস্ত মানুষ যেখানে দুঃসহ দুঃখে কালাতিপাত করিতেছে, সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন গণদেবতা নারায়ণ। কারণ, তিনি আর্তের বন্ধু।

আজ লোভের বর্বর বিকার সমষ্টিকে মুষ্টিমেয়ের শোষণসামগ্রীতে পরিণত করিয়াছে, আজ সমাজের শীর্ষস্থ ধনাভিমানীর দল অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার প্রতীক মাত্র। তাই দেবতা ধনীর রত্নমন্দির ছাড়িয়া দরিদ্রের জীর্ণ গৃহেই খুঁজিয়া পাইয়াছেন যথাস্থান। সুতরাং এই দুঃখী ও লাঞ্ছিত জনগণের সেবা করিলেই ভগবানের সেবা করা হইবে, ইহাদের পূজাতেই জনগণের দেবতা পূজিত হইবেন। এই ভাগ্যহত ও সমাজ-বিড়ম্বিতদের মুক্তি দিলেই মুক্তি পাইবে আগামী দিনের প্রাণজাহ্নবী।

স্বামী বিবেকানন্দ নররূপী নারায়ণকে বন্দনা জানাইয়া বলিয়াছেন: 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর!'—উক্তিটি বর্ণে বর্ণে সত্য। প্রতিনিয়ত চোখের সামনে এই নরনারায়ণকে দেখিয়াও আমরা দেখিতে পাই না—'মানুষের নারায়ণে তবুও করি না নমস্কার!' আমাদের অহমিকা ও দৃষ্টির অস্বচ্ছতাহেতু আমরা সত্য হইতে দূরে সরিয়া থাকি—দীনের মধ্যেই দীননাথ আছেন, একথা জানিয়াও উপযুক্ত বিনয় ও শ্রদ্ধাসহকারে তাহাকে বরণ করিয়া লইবার শক্তি আমাদের নাই। ইহারই অনিবার্য পরিণাম হইল, আমরা জাতিগতভাবে অবক্ষয়ের পথে অগ্রসর হইতেছি। গণদেবতাকে পূজামন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে তবেই আমরা আজ এ বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইব।

[১১] ভাবসম্প্রসারণ কর:

অয়ি ধূলি, অয়ি তুচ্ছ, অয়ি দীনহীনা,
সকলের নিম্নে থাক—নীচতম জনে
বক্ষে বাঁধিবার তরে; সহি সব ঘৃণা
কারে নাহি কর ঘৃণা। অয়ি বিমলিনা,
সৌন্দর্য বিকশি তোল বিশ্বের নয়নে;
বিস্তারিছ কোমলতা হে শুষ্ক কঠিনা,
হে দরিদ্রা, পূর্ণা তুমি রত্নে ধান্যে ধনে।
হে আত্মবিস্মৃতা, বিশ্বচরণবিলীনা,
বিস্মৃতেরে ঢেকে রাখ অঞ্চলবসনে।
নূতনেরে নির্বিচারে কোলে লহ তুলি,
পুরাতনে বক্ষে ধর, হে জননী ধূলি!

পৃথিবীর ধূলিকে বিশ্বমাতৃকারূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। জননী যেমন তাঁহার ভালোমন্দ সমস্ত সন্তানসন্ততিকেই নির্বিচারে হৃদয়ে ধারণ করেন, কাহারও প্রতি যেমন তাঁহার পক্ষপাত নাই; যেমন করিয়া নিজ সন্তানকে অপরিসীম সেবায় যত্নে তিনি লালনপালন করেন,—সংসারে বহাইয়া দেন স্নেহের অমৃতধারা; গৃহকর্মের নিভৃতিতে

নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়া সকলকে সুখী করিতে প্রয়াস পান, ক্লান্ত সন্তানকে নিজের বক্ষে সস্নেহে ঘুম পাড়াইয়া রাখেন—পৃথিবীর ধূলাও যেন সেই মাতৃত্বেরই প্রতীক। নেপথ্যচারিণী সেবাময়ী জননীর মতো সর্বজনের পদতলে পড়িয়া থাকিয়াও এই ধূলি-মাতা কোটি কোটি মর্ত্যসন্তানকে স্বীয় অঙ্কে ধারণ করিয়া আছেন। জননী গৃহকর্মের প্রয়োজনে মলিনবসনাবৃতা হইয়া থাকিলেও তাঁহার সমৃদ্ধ সংসারের গৌরবে তিনি রাজেন্দ্রাণী, পৃথিবীর ম্লান ধূলিও সেইরূপ শোভায়-সৌন্দর্যে, ফুলে ফলে মহীয়সী, ধনে-ধান্যে তাঁহার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। ব্যথিত ক্লান্ত প্রাণীদের নিজ অঙ্কে লইয়া তিনি বিশ্রাম দেন, পরক্ষণেই নবজাতকের আনন্দকাকলিতে তাঁহার মৃৎসংসার মুখর হইয়া উঠে। বৃহৎ আনন্দময় সংসারের কর্মচঞ্চল গৃহিণীকে মলিনবসনা দেখিয়াই যেমন তাঁহাকে দীনা বলিয়া অভিহিত করা যায় না, তেমনি পৃথিবীর ধূলিও নিছক মালিন্যই নয়, তাহা ঐশ্বর্যস্বরূপিণী বিশ্বধাত্রীর বহিরাবরণ-মাত্র।

[১২] নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদের অন্তর্নিহিত ভাবটি সম্প্রসারিত কর :

"বাংলার ইতিহাস চাই—নহিলে বাঙালী কখনো মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখনো মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখনো মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ববৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে-বাঙালীরা মনে জানে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষদিগের কখনো গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্বল, অসার, গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থাপ্রাপ্তির ভরসা করে না—চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।"

প্রত্যেক জাতির ইতিহাসই তাহার নৈতিক ভিত্তি। এই বিশেষ ভিত্তিটি আশ্রয় করিয়াই তাহার সুবিশাল সমাজসৌধ গড়িয়া ওঠে, রচিত হয় তাহার উন্নতির স্বর্ণচূড়-স্তম্ভ। কিন্তু যে-জাতির ইতিহাস নাই, সে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবে কিসের সহায়তায়? বিদেশীর রচিত ইতিহাসে আমরা এতকাল আত্মনিন্দাই শুনিয়া আসিয়াছি, শুনিয়া আসিয়াছি—আমরা ভীরু, দুর্বল ও বর্বর; আমরা সতীদাহ করিয়াছি, প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতায় অন্ধকূপহত্যার অনুষ্ঠান করিয়াছি, কাপুরুষের মতো রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া বারে বারে পরাজয় বরণ করিয়াছি। এই মিথ্যা ইতিহাস পড়িয়া, বিজেতাদের নিকট ক্রমাগত এই অসত্য ভাষণ শুনিয়া শুনিয়া, নিজেদের সম্পর্কে সমস্ত শ্রদ্ধাই আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি।

তাই দেশের অতীত গৌরব এবং ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের আস্থা নাই, আমরা নিজস্ব সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়া পরপদলেহী হইতেছি—শিক্ষাদীক্ষা হইতে শুরু করিয়া, অশনবসন পর্যন্ত পরদ্বারে আনতজানু হইয়া আমরা ভিক্ষা করিতেছি। আজ

শোচনীয় জাতিগত অধঃপতনের ইহাই প্রধানতম কারণ। যদি আমাদের পূর্বগৌরবে ফিরিয়া যাইতে হয়, বিনষ্ট মহিমার পুনরুদ্ধার করিতে হয় এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে নূতন করিয়া আমাদের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে। মৌলিক চিন্তা, গবেষণা ও শ্রমের সাহায্যে আমাদের অতীত গৌরবের কাহিনী, আমাদের শৌর্যবীর্য, শিক্ষাদীক্ষার ইতিবৃত্ত প্রচার করিতে হইবে। একমাত্র ইহার দ্বারাই জাতি হারানো আত্মশক্তিকে ফিরিয়া পাইবে, ইহাতেই তাহার উন্নতির সুদৃঢ় ভিত্তি গড়িয়া উঠিবে।

[১৩] নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদে যে-বিতর্ক [Controversy] রহিয়াছে তাহা কী, বুঝাইয়া বল ঃ

"প্রাচীনের বিরুদ্ধে আধুনিকের অভিযোগ এই যে, তাঁহারা প্রধানত কেবল আকাশকুসুমই রচিয়া গিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাদের সৃষ্টি সুন্দর অর্থাৎ নয়নাভিরাম হইতে পারে, কিন্তু ঠিক এইজন্যই তাহা চিত্তের অন্তরঙ্গ বস্তু হইতে পারে না।··· একালের শিল্পী বলিতেছেন, সত্য যেমন আছে তেমনটি করিয়া দেখাও—তাহা সুন্দর হইল কিনা সেদিকে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন নাই। জগতে অসুন্দর শ্রীহীন জিনিসের অভাব নাই, সৃষ্টিরহস্যের অনেকখানিই তাহারা জুড়িয়া আছে। সেগুলি বাদ দিয়া ফল কী, বা রাখিয়া-ঢাকিয়া দেখাইবার চেষ্টাতেই বা লাভ কী? 'মা বিরাজেন সর্বঘটে'—সুতরাং দেখাও তাঁর সত্যকার মূর্তি। সত্যের কোনো অলংকার, কোনো প্রসাধনে প্রয়োজন নাই। শিশুর মতো সত্যেরও উলঙ্গ মূর্তিই স্বাভাবিক ও সুন্দর। সত্যকে সত্য হিসাবে দেখাও, তাহাতেই সত্যের সৌন্দর্য।"

সাহিত্যবিচার ও সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে বর্তমানে দুইটি ভিন্নমুখী মতবাদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ। এই দুইটি মতবাদকে ইংরেজীতে বলা হয় 'Idealism' ও 'Realism'। সাহিত্যে যাঁহারা বাস্তববাদী বা রিয়ালিষ্ট, তাঁহারা প্রাচীনপন্থী আদর্শবাদী সাহিত্যস্রষ্টা ও সমালোচকদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। আদর্শবাদী সাহিত্যের বিরুদ্ধে বস্তুতন্ত্রবাদিদের প্রধান অভিযোগ এই যে, আদর্শবাদপ্রণোদিত সাহিত্য অবাস্তব। ইহা সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু বাস্তব জীবনের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক নিবিড় এবং গভীর নয়। বর্তমান যুগে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া যে-কুটিল কুশ্রীতা প্রতিনিয়ত আবর্তিত বিবর্তিত হইতেছে আদর্শবাদী সাহিত্যে তাহার কোনো রূপায়ণ নাই। বস্তুতন্ত্রবাদিদের মতে এই শ্রেণীর সাহিত্য জীবনসত্যবিমুখ। ইহা শুধু সত্যের নয়নাভিরাম রূপটি দেখিতে পাইয়াছে; সত্যের বিরূপ দিকটি, নগ্ন বীভৎস মূর্তিটি ইহার দৃষ্টির বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং জগৎ এবং জীবনসত্যের সামগ্রিক রূপটি আদর্শবাদী সাহিত্যে ধরা

পড়ে নাই। ধরা পড়ে নাই বলিয়াই উহা আমাদের হৃদয় তেমন আকর্ষণ করিতে পারে না। রিয়ালিস্টদের কাছে আইডিয়ালিস্ট সাহিত্যস্রষ্টা পলায়নীমনোবৃত্তি বা Escapism-এর অপরাধে অপরাধী।

আদর্শবাদী সাহিত্যিক বলেন, কুশ্রীতা, নগ্নতা, বীভৎসতা জীবনে সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই সত্যটিকে উলঙ্গভাবে সাহিত্যে প্রচার করিতেই যে হইবে, এমন কোনো কথা নাই। কেননা, সাহিত্যশিল্প জগৎ এবং জীবনের প্রতিচ্ছবি বা অন্ধ-অনুকরণমাত্র নয়। মানুষের জীবনে অনেক-কিছু ঘটে। তাই বলিয়া সাহিত্যেও যে ইহার সবকিছুকেই যথাযথ প্রতিফলিত করিয়া তুলিতে হইবে, তাহা তো নয়। সাহিত্য সৃষ্টি, জীবনের ফটোগ্রাফি নয়—জীবধর্ম ও জীবনসত্য এবং সাহিত্যধর্ম ও সাহিত্যসত্য ভিন্নতর জিনিস। সাহিত্য যেহেতু একটা শিল্প, সেহেতু তাহার আবরণ চাই, আভরণ চাই। ইহার জন্য প্রয়োজন কবিকল্পনার, সুরের, রঙের, আভাস ও ইঙ্গিতের—ইহাদের বাদ দিয়া শিল্পসৃষ্টি অসম্ভব।

কিন্তু বাস্তববাদী সাহিত্যিক 'আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক্'-এর পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন, সাহিত্যে শুধু মানবজীবনের উচ্চতম শাখার ফুলকেই দেখাইলে চলিবে না—যতই কুশ্রী হোক, উহার সঙ্গে রক্তমুখী অজস্র কাঁটাকেও দেখাইতে হইবে, নতুবা সাহিত্য বৃহত্তর জীবনসত্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে বাধ্য। সুতরাং সত্যের মূর্তিটিকে সাহিত্যে উলঙ্গভাবেই প্রদর্শন করিতে হইবে।

সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে মোটামুটি ইহাই হইতেছে আইডিয়ালিজম ও রিয়ালিজমের দ্বন্দ্ব। একদল স্রষ্টা সুন্দর এবং শিব-আদর্শের উপাসক, অন্যদল রূঢ় বাস্তবের পক্ষপাতী। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে, কেবল উচ্চ-আদর্শের প্রচার কিংবা বাস্তব উপাদানের প্রাচুর্য থাকিলেই সাহিত্য যে প্রথমশ্রেণীর সৃষ্টি হইয়া উঠিবে, এমন কোনো কথা নাই। রচয়িতার যথার্থ সৃজনীপ্রতিভাই আদর্শ ও বাস্তবকে রসমণ্ডিত রূপমূর্তি দান করে। সাহিত্য রূপ-রস-বিলসিত বাণীবিগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়। এই হিসাবে সত্যকার আদর্শবাদী সাহিত্যও যেমন সাহিত্য, তেমনি রসোত্তীর্ণ বাস্তববাদী সাহিত্যও সাহিত্য—ইহাদের মধ্যে যে-পার্থক্য, তাহা কেবল দৃষ্টিভঙ্গির। 'বস্তুতন্ত্র ও ভাবতন্ত্র রসসৃষ্টির দুই ভিন্ন কৌশল। এই দুই কৌশলের সৃষ্ট রসের মধ্যে আস্বাদের প্রভেদ আছে, কিন্তু রসত্বের প্রভেদ নাই।'

[১৪] নিম্নোদ্ধৃত অংশের অন্তর্নিহিত ভাবটি পরিস্ফুট কর :

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে; যেন রসনায় মম

সত্য বাক্য ঝলি উঠে খর খড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজ স্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

ভীরুতার অপেক্ষা অপরাধ মানুষের আর কিছুই নাই। এই ভীরুতার গ্লানি আচ্ছাদন করার জন্য অনেক সময়েই আমরা ইহাকে ক্ষমার ছদ্মবেশ পরাই— উদারতার আবরণে আবৃত করি আমাদের কাপুরুষতাকে। এহেন মিথ্যাচারের দ্বারা আমাদের বিবেক কলুষিত হয়, মনুষ্যত্ব অপমানিত হয়। বিশ্বস্রষ্টার স্নেহ সীমাহীন, অপার করুণায় এই সংসারকে তিনি লালন করিয়া থাকেন।

কিন্তু শাসন স্নেহেরই অপরিহার্য একটি অঙ্গ। তাই প্রয়োজন-বিশেষে ঈশ্বর রুদ্র-ভয়ংকরের প্রলয়মূর্তি ধারণ করেন,—অন্যায়, পাপ ও মিথ্যাকে বিচূর্ণ করিয়া 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'-কে স্বমহিমায় পুনঃ সংস্থাপিত করেন। বিশ্ববিধাতার এই নির্দেশ আমাদের গ্রহণীয়। অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে আমাদের ক্রোধ যেন বজ্রগর্জনে ভাঙিয়া পড়ে, মিথ্যাকে যেন আমরা কোনদিন মার্জনা না করি। এই ব্রত হইতে যদি আমরা ভ্রষ্ট হই, যদি ক্ষমার মুখোস পরিয়া আমাদের ভীরুতাকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে প্রয়াস পাই, তাহা হইলে আমরা বিশ্বনিয়ন্তার শাশ্বত বিধিকে লঙ্ঘন করিব, এবং তাহার ফলে রুদ্রের রোষাগ্নিতে শুষ্ক তৃণপর্ণের মতো ভস্ম হইয়া যাইব।

অন্যায়কারী যে অপরাধী, ইহা যেমন সত্য,—অন্যায়কে যে সহ্য করিয়া চলে তাহার অপরাধও অনুরূপ। কারণ, অন্যায়কে দণ্ডিত না করার অর্থই তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া, এবং এই প্রশ্রয়নীতির অনিবার্য পরিণাম হইতেছে সংসারে-সমাজে শোচনীয় বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি।

[১৫] নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটির ভাবসত্য তোমার নিজের ভাষায় প্রকাশ কর :

[ক] "পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত গতিবিজ্ঞানে একটা সিদ্ধান্ত আছে যে, সময়মতো থাকিয়া থাকিয়া একটু একটু ধাক্কা দিলে হিমাচলের মতো প্রকাণ্ড পদার্থটাকেও কাঁপাইতে বা ধরাশায়ী করা যাইতে পারে। কৈলাসপর্বত তুলিবার জন্য রাবণের এবং গন্ধমাদন উত্তোলনের জন্য হনুমানের মতো মহাবীরের দরকার হইয়াছিল। কিন্তু পদার্থবিদ্যার পেণ্ডুলমতত্ত্ব অবগত থাকিলে পঞ্চবর্ষবয়স্ক বালকেও এই প্রকাণ্ড ব্যাপারটা সহজেই সম্পন্ন করিয়া ফেলিতে পারিত। মনস্তত্ত্ববিদের ভ্রূকুটিভয় সত্ত্বেও আমি মনুষ্যের চিত্তটাকে একটা সুবৃহৎ মস্কোনগরের ঘণ্টার মতো পদার্থ বলিতে চাহি। অর্থাৎ,

অনেক সময়ে বাহুশক্তি প্রভূত পরিমাণে বলপ্রয়োগ করিয়াও মানুষের অন্তঃকরণকে স্থানভ্রষ্ট ও বিচলিত করিতে পারে না। আবার, অতি মৃদুপবনহিল্লোল যদি সময় মতো আসিয়া আস্তে আস্তে ছোট ধাক্কা দেয়, তাহা হইলে ঘণ্টাটা বেগে আন্দোলিত হইয়া দিগন্ত নিনাদিত করিয়া তুলিতে পারে। কোনো কোনো মহাকায় অর্ণবযান বড় বড় ঝটিকার বেগ অতিক্রম করিয়া সামান্য হাওয়ায় জলমগ্ন হয়। আবার, উত্তাল তরঙ্গমালার উপর সের-কতক কেরোসিন ঢালিয়াও তাহাদের ক্ষোভ প্রশমিত হইতে দেখা যায়। মানুষের মনও কতকটা সেইরূপ।"

অনুকূল ক্ষেত্র ও সময় বুঝিয়া হস্তক্ষেপ করিলে বহু দুরূহ কাজও অতিশয় সরল হইয়া দাঁড়ায়। আবার, স্থানকালপাত্র সম্পর্কে সুবিবেচনার অভাবে অত্যন্ত সহজ বস্তুটিও জটিলতম সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করে। মানুষের মনোজগৎ সম্পর্কে এই সত্যটি সর্বাপেক্ষা প্রযোজ্য। মানবহৃদয় অতিশয় রহস্যময় সামগ্রী। নিছক বাহুবল বা অন্য যে-কোনো প্রকার শক্তির প্রয়োগ করিলেই ইহাকে বশীভূত করা সুসাধ্য হয় না। ইহার কতগুলি নিজস্ব পদ্ধতি আছে, বিচিত্র গতিপথ আছে। সহস্র ভীতিপ্রদর্শন ও প্রলোভন যেখানে ব্যর্থ হয়, হয়তো একটি স্নেহগর্ভ বাক্য অথবা একবিন্দু-মাত্র অশ্রু সেখানে ঈপ্সিত ফল দান করে। এই সত্যটি না জানিয়াই সংসারে বহু ভুলভ্রান্তি ও মনোবেদনার সৃষ্টি হইয়া থাকে। হৃদয়কে আয়ত্ত করিবার উপায় নিজের শক্তির প্রচণ্ড ও সদম্ভ ঘোষণা নহে—তাহা মানবমন সম্পর্কে উপযুক্ত অভিজ্ঞতা এবং তদনুযায়ী বিবেচনা ও স্থিরচিত্ততার সহিত অগ্রসর হইতে পারার উপরে নির্ভরশীল।

[১৬] নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্যটি লেখ :

"বর্ণবিজ্ঞান জগতের রঙ্মহলে যাহা দেখে না, চিত্রকর তাহা দেখেন। শব্দবিজ্ঞান আকাশের শব্দভাণ্ডারে যাহা শুনিতে পায় না, গায়ক এবং সংগীতজ্ঞ তাহা শোনেন। দেহবিজ্ঞান বা অস্থিবিজ্ঞান জীবদেহের মধ্যে যে-বস্তুর কোনও সন্ধান পায় না, চিত্রকর ও ভাস্কর তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতেই মজিয়া যান। জ্যোতির্বিদ্ গ্রহনক্ষত্রখচিত, শতরঞ্জিত গগনপটে যে-ছবি দেখেন না, কবি তাহা দেখিয়া বিভোর ও বিহ্বল হইয়া যান। এইরূপভাবে, এ সকল ক্ষেত্রে চিত্রকর, গায়ক, ভাস্কর ও কবিঅন্তরের প্রস্ফুট-রঞ্জিনীবৃত্তি বর্ণের, স্বরের, জীবদেহের কিংবা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যাহা কেবল বাহ্য ও বাহিরের পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহাকে আপনার রসের রঙে রঞ্জিত করিয়া তাহার অদ্ভুত রূপান্তর ঘটাইয়া থাকেন। এই বস্তুকেই সাহিত্যের রূপান্তর বলিতে পারা যায়।"

সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকের মূল পার্থক্য তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। বিজ্ঞানী তাঁহার পঞ্চেন্দ্রিয়মূলক প্রত্যক্ষগম্য জ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বের সমস্তকিছুকে বুঝিতে চান ও বুঝাইতে চান। কিন্তু শিল্পী ও সাহিত্যিকের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। তাঁহাদের উদ্দেশ্য বস্তু-

সত্যকে তত্ত্বের দ্বারা প্রমাণ করা নয়, রসের দ্বারা মানসলোকে সঞ্চারিত করা। তাই বৈজ্ঞানিক যেখানে বস্তুর রূপকে নিতান্তই ব্যবহারিক পদার্থতত্ত্ব বা রসায়নবিদ্যার দ্বারা উপলব্ধি করেন, সেখানে সাহিত্যিক ও শিল্পী তাঁহাদের ধ্যানদৃষ্টির সাহায্যে তাহাকে ভাবের আনন্দরসে রসায়িত করেন। জগতের প্রতিটি সামগ্রী শিল্পীর এই মানস-রসায়নে নবরূপ লইয়া 'সাহিত্য' হইয়া উঠে। বস্তুবিশ্বের সামান্য একটি পদার্থকে কবি-সাহিত্যিক রসের পরিপূর্ণতায় অপরূপ ও স্বর্গীয় করিয়া তুলিতে পারেন।

[১৭] নিম্নলিখিত উদ্ধৃতির ভাবার্থ লেখ :

অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
জয়হীন চেষ্টার সংগীত, আশাহীন
কর্মের উদ্যম—হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম। যে পক্ষের পরাজয়,
সে-পক্ষ ত্যজিতে মোরে করো না আহ্বান।
জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডবসন্তান,
আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে।
জন্মমাত্র ফেলে গেছ মোরে ধরাতলে
নামহীন গৃহহীন। আজিও তেমনি
আমারে নির্মম চিত্তে তেয়াগ জননী,
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব-'পরে।

যে-মানুষ প্রকৃত বীরাচারধর্মী, আসন্ন পরাজয়ের মুখে ধাবিত হইয়াও কর্তব্যের পথ হইতে, কৃতজ্ঞতাবোধ হইতে কখনো সে ভ্রষ্ট হয় না। প্রকৃত বীরের জীবনে দুর্বলতম মুহূর্তেও কর্তব্যচ্যুতি কিংবা মানবধর্মবিরোধী অকৃতজ্ঞতাপ্রকাশের অবকাশ নাই। স্বার্থসিদ্ধির সুলভ প্রলোভন, প্রিয়জনের সকরুণ মিনতি মানুষের চিত্তে দুর্বলতা ডাকিয়া আনে, মানুষকে কঠোর কর্তব্যের ক্ষেত্রে বিচলিত করিয়া তুলিতে চায়। কিন্তু যে যথার্থই বীর, প্রকৃত মনুষ্যত্বধর্মে দীক্ষিত, বীরধর্ম এবং মানবতাধর্মের অন্তঃপ্রেরণা-শক্তির বলেই চিত্তের সকল দুর্বলতাকে নির্জিত করিয়া সে শৌর্যের পথে অগ্রসর হইয়া চলে। যাহারা কাপুরুষ, তাহারাই হৃদয়দৌর্বল্যের পারবশ্য স্বীকার করে।

[১৮] নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটির ভাবার্থ লেখ :

"কলা সম্বন্ধে রাস্কিনের মত খুব প্রশস্ত এবং উদার। তাহাতে কোনোরূপ সংকীর্ণতা নাই—কলাসম্ভোগ হইতে তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করিতে চাহেন না। ধনীনির্ধন সকলেই তাহাতে আমন্ত্রিত। কেবল তাহাই নহে। পরম ভক্ত ভাগবতকার

যেমন বলেন, ধর্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি ভগবানে ভক্তি উৎপাদন না করে তবে তাহা 'শ্রম এবহি কেবলম্।' রাস্কিনও সেইরূপ বলেন, 'যে-জীবনে পরিশ্রম নাই, সে-জীবন যেন একটি গুরুতর অপরাধ; এবং যে-পরিশ্রমে কলার আনন্দ নাই, তাহা পশুত্ব।' তাঁহার সমুদয় শিক্ষার মধ্যে এই একটি কথা নিরন্তর প্রতিধ্বনিত—মানব-চরিত্রের উন্নতিসাধনে কলাবিদ্যা শ্রেষ্ঠ সহায়। কারণ, এই জগতে যাহাকিছু আছে—অসীম বাহ্যপ্রকৃতির বিরাট ব্যাপার হইতে সূক্ষ্মতম পরমাণু পর্যন্ত, এবং অনন্ত দুরবগাহ মানবহৃদয়ের সুখদুঃখের গভীর আলোড়ন হইতে সামান্য সাধটি পর্যন্ত, সকলই কলাবিদ্যার বিষয়ীভূত হইতে পারে।"

মহামতি রাস্কিন শিল্পকে সর্বমানবের উপভোগ্য বস্তুরূপে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তাই তিনি প্রয়াস পাইয়াছিলেন মানুষের সকল কর্মোদ্যমকে শিল্পাভিমুখী করিয়া তুলিতে। শিল্পবোধহীন মনুষ্যজীবনকে রাস্কিন পশুত্বের নামান্তর বলিয়াই মনে করিতেন। তাঁহার মতে একমাত্র কলাবিদ্যাই মানুষকে উচ্চতর আনন্দ দান করিতে সমর্থ। তিনি বুঝিয়াছিলেন, শিল্পবোধ এবং শিল্পানুভূতিই মানবচরিত্রের সম্যক্ বিকাশের পথে সর্বপ্রধান সহায়। কেন-না, শিল্পসৃষ্টির মধ্যেই বিশ্বপ্রকৃতির সীমাহীন রহস্য এবং অতলান্ত মানবহৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি নিরন্তর স্পন্দিত। সুতরাং শিল্পকে বাদ দিলে মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ স্ফুরণ বাধাগ্রস্ত হইতে বাধ্য।

[১৯] নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশের ভাবার্থ নিজের ভাষায় সংক্ষেপে প্রকাশ কর :

"যাহাকে আমরা ভালবাসি, কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা,—প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে, প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য আপনার স্বার্থ বিসর্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন এইসমস্ত পরম প্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত, লোকাতীত ঐশ্বর্য অনুভব করিয়াছে।"

প্রেমের উদ্বোধনে মানুষ তাহার হৃদয়ের গোপন অন্তঃপুরে আনন্দের যে সীমাহীন ব্যাপ্তি ও অতল গভীরতা উপলব্ধি করে তাহাই বহন করিতেছে প্রেমময়

ঈশ্বরের জীবন্ত স্বাক্ষর। প্রকৃতির বুকে সীমাহীন সৌন্দর্যের যে অজস্র সমারোহ তাহার মধ্যেও রহিয়াছে 'সুন্দরম্' ঈশ্বরের রূপময় আত্মপ্রকাশের গভীরতম ব্যঞ্জনা মানবীয় সীমিত প্রেমের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করাই বৈষ্ণবধর্মের গোড়ার কথা। বাৎসল্যভাবের মধ্যে মাতৃহৃদয়ের অফুরন্ত স্নেহের উৎসরণে, দাস্যভাবের মধ্যে আত্ম-উৎসর্জনে, সখ্যভাবের মধ্যে স্বার্থপ্রবর্তনাকে অস্বীকার করার অশেষ শক্তিতে, কান্তাপ্রেমের মধ্যে নরনারীর আত্মসমর্পণের উৎকণ্ঠিত আবেগমাধুর্যে প্রেমসুন্দর ঈশ্বরেরই ঘটিতেছে অনির্বচনীয় আত্মপ্রকাশ। ঈশ্বর যে প্রেমস্বরূপ ও চিরসুন্দর।

[২০] নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশের ভাবার্থ তোমার নিজের ভাষায় সংক্ষেপে পরিস্ফুট কর ঃ

ধরণীর শ্যাম করপুটখানি ভরি দিব আমি সেই গীত আনি,
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী মধুর অর্থভরা।
নবীন আষাঢ়ে রচি নব মায়া এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
করে দিয়ে যাব বসন্তকায়া বাসন্তী বাস-পরা।
ধরণীর তলে, গগনের গায় সাগরের জলে, অরণ্যছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায় রঙিন্ করিয়া দিব।
সংসারমাঝে কয়েকটি সুর রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দুয়েকটি কাঁটা করি দিব দূর, তারপর ছুটি নিব।
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল, সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল আরো আপনার হবে।
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে,
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ-'পরে শিশিরের মতো রবে।
না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে, মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে, মাগিছে তেমনি সুর।
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা, কিছু ঘুচাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে, দু'চারিটি কথা রেখে যাব সুমধুর।

কবির কাজ হইতেছে সৌন্দর্যসৃষ্টি, আনন্দলোকবিরচন—বিশ্বপ্রকৃতির মর্মলোক হইতে আনন্দসৌন্দর্য আহরণ করিয়া কবি রচনা করেন গীতময় বাণীমূর্তি। এই বিচিত্রসুন্দর পৃথিবী মানুষের মনে জাগায় পরম বিস্ময়বোধ, অশেষ ভাবানুভূতি। কবির কাব্য এই বিস্ময়বোধ, মানবহৃদয়ের এই অন্তহীন ভাবাবেগেরই ছন্দিত রূপায়ণ। মানুষের চিরদিবসের সহজ পরিচয়ের মৌনী প্রাঙ্গণতল ভরিয়া উঠে কবির রচিত সংগীতের মোহময় সুরে। বিচিত্ররূপা প্রকৃতির সৌন্দর্যসুষমা, মানুষের সুখদুঃখ,

আনন্দবেদনা গভীর অর্থভরা হইয়া উঠে কবির সৃষ্টিতে। বিশ্বপ্রকৃতি আর মানবজীবনের নিকটসান্নিধ্যে আসিয়া মানুষের অন্তরতর হৃদয়ে যে সহস্র ভাবানুভূতির উদ্বোধন ঘটে, তাহাকে প্রকাশ করিবার জন্য মানুষ কত-না ব্যাকুল! পৃথিবীর মানুষের সেই প্রকাশব্যাকুলতাই কবির বাণীরচনার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া একটা অনির্বচনীয় মহিমায় স্পন্দিত হইতে থাকে।

[২১] নিম্নোদ্ধৃত গদ্যাংশের ভাবার্থ খুব সংক্ষেপে নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর :

"মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ—সকলেরই এক-একটি বহ্নি আছে। সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে। কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। আবার সংসার কাচময়—কাচ না থাকিলে সংসার এতদিনে পুড়িয়া যাইত। যদি সকল ধর্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম মানসপ্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয়জন বাঁচিত? অনেকে জ্ঞানবহ্নির আবরণকাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়; সক্রেতিস্ গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল। রূপবহ্নি, ধর্মবহ্নি, মানবহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে, আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয় তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতের মানবহ্নি সৃজন করিয়া দুর্যোধন-পতঙ্গকে পোড়াইলেন—জগতে অতুল কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞানবহ্নিজাত দাহের গীত প্যারাডাইস্ লস্ট্। ধর্মবহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেন্ট পল। ভোগবহ্নির পতঙ্গ এণ্টনি-ক্লিওপেট্রা। রূপবহ্নির রোমিও-জুলিয়েত, ঈর্ষাবহ্নির ওথেলো। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহবহ্নিতে সীতা-পতঙ্গের দাহ-জন্য রামায়ণের সৃষ্টি। বহ্নি কী, আমরা জানি না। তবু সেই অলৌকিক অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না তো কী?"

সংসারের মানুষ পতঙ্গের মতো। পতঙ্গ ছুটিয়া চলে বহ্নিশিখার দিকে; মানুষ প্রধাবিত হয় তাহার বিচিত্র কামনাবাসনা, আশাআকাঙ্ক্ষার অভিমুখে। মানুষের চিত্তের প্রবৃত্তির চরিতার্থতার পথে অনেক বাধা। যাহারা এই বাধা অতিক্রম করিতে পারে তাহাদের কাছে আকাঙ্ক্ষাসিদ্ধিই হয় সর্বসাধ্যসার, সংসার তখন তাহাদের নিকট মিথ্যা হইয়া যায়। বাসনাসিদ্ধির পথে বাধা না থাকিলে এ পৃথিবী নানা রকমের উন্মত্ততায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। মানুষের বহুতর বাসনার বাঙ্ময় রূপায়ণ হইল কাব্য-সাহিত্য। রূপোন্মাদনা, ধর্মএষণা, জ্ঞানপ্রেরণা, ভোগলালসা, ইন্দ্রিয়াসক্তি, স্নেহ-প্রীতি-প্রেমকে কেন্দ্র করিয়াই জগতের অতুলনীয় কাব্য-নাটকগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিচিত্ররূপা প্রবৃত্তির সত্যস্বরূপ কী, মানুষ তাহা এখনো জানে না। কিন্তু তবু মানবজাতি তাহার আকর্ষণ এড়াইতে পারে না।

[২২] নিম্নোদ্ধৃত কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবটি তোমার নিজের ভাষায় প্রকাশ কর :

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারংবার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা-বর্ণ-গন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দিরমাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যা-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে,
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

আমাদের দেশে একশ্রেণীর মুক্তিপিপাসী ঈশ্বরসাধক আছেন, যাঁহারা মনে করেন, এই বিচিত্রসুন্দর বিশ্বসংসার ও মানবজীবন মিথ্যা মরীচিকামাত্র—সুতরাং ভগবৎপ্রাপ্তির অন্তরায়। সকল চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া বৈরাগ্যের পথে তাঁহারা ব্রহ্মের সন্ধানে ফিরেন। কিন্তু সুন্দরের পূজারী কবির মুক্তিসাধনা কখনো বৈরাগ্যমুখী হইতে পারে না। তাঁহার দৃষ্টিতে অনন্তসৌন্দর্যের আধার এই পৃথিবী এবং বিচিত্র সম্বন্ধের দ্বারা বিধৃত এই মানবজীবন পরম রমণীয়, মায়া ইহারা নহে। জগতের প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টিক্রিয়াশীল ঈশ্বরের অস্তিত্বমহিমা প্রকাশ করিতেছে—বিশ্বসৌন্দর্যের অনুভূতি ও প্রেমের উপলব্ধিই আধ্যাত্মিক প্রাপ্তির সোপান। সুতরাং মুক্তিলাভের জন্য বিশ্ববিমুখ হইবার প্রয়োজন নাই; সংসারে থাকিয়াই, আপন কর্তব্য পালন করিয়াই, প্রেমসুন্দর ভগবানকে লাভ করা যায়।

* অনুশীলনী *

[নিম্নের উদ্ধৃতিগুলির অধিকাংশ ইণ্টার বাংলা (মাতৃভাষা ও ঐচ্ছিক) ও বি. এ. বাংলার (মাতৃভাষা ও অনার্স) প্রশ্নপত্র হইতে সংকলিত]

[১] মর্মসত্য ব্যাখ্যা কর ঃ

তবে কি সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোককে শিক্ষা দেওয়া—অবশ্য নয়। কেননা, কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত। স্কুল বন্ধ না হলে যে খেলার সময় আসে না, এ তো সকলেরই জানা কথা। কিন্তু সাহিত্যরচনা যে আত্মার লীলা, এ কথা শিক্ষকেরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। সুতরাং শিক্ষা ও সাহিত্যের ধর্মকর্ম যে এক নয়, এ সত্যটি একটু স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ, শিক্ষা হচ্ছে সেই বস্তু যা লোকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়; অপরপক্ষে কাব্যরস লোকে শুধু স্বেচ্ছায় নয়, সানন্দে পান করে; কেননা, শাস্ত্রমতে সে-রস অমৃত। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানানো, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো; কাব্য যে সংবাদপত্র নয় এ কথা সকলেই জানেন। তৃতীয়তঃ, অপরের মনের অভাব পূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই শিক্ষকের হস্তে শিক্ষা জন্মলাভ করেছে, কিন্তু কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা, শিক্ষাদান করা নয়।

[২] ভাবার্থ পরিস্ফুট কর ঃ

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি;
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—

পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম-চিন্তা-আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

[৩] নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটির ভাবার্থ [১৫ ছত্রের মধ্যে] বিবৃত কর :

য়ুরোপে যে-সকল দেশ অতীতের আঁচলধরা, তারা মানসিক-আধ্যাত্মিক-রাষ্ট্রিক সকল ব্যাপারেই অন্যদেশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে। স্পেনদেশের ঐশ্বর্য ও প্রতাপ একসময় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল, কিন্তু আজ কেন সে অন্য য়ুরোপীয় দেশের তুলনায় সেই পূর্বগৌরব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে? তার কারণ হচ্ছে যে, স্পেনের চিত্ত ধর্মে কর্মে প্রাচীন বিশ্বাস ও আচারপদ্ধতিতে অবরুদ্ধ, তাই তার চিত্তসম্পদের উন্মেষ হয় নি। যারা এমনিভাবে ভাবী কালকে অবজ্ঞা করে, বর্তমানকে প্রহসনের বিষয় বলে, সকল পরিবর্তনকে হাস্যকর দুঃখকর লজ্জাকর বলে মনে করে, তারা জীবন্মৃত জাতি। তাই বলে অতীতকে অবজ্ঞা করাও কোনো জাতির পক্ষে কল্যাণাকর নয়, কারণ অতীতের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা আছে। কিন্তু মানুষকে জানতে হবে যে, অতীতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ভাবী কালের পথেই তাকে অগ্রসর করার জন্যে। আমাদের চলার সময় যে-পা পিছিয়ে থাকে সেও সামনের পা'কে এগিয়ে দিতে চায়। সে যদি সামনের পা'কে পিছনে টেনে রাখত তা হলে তার চেয়ে খোঁড়া পা শ্রেয় হত তাই সকল দেশের মহাপুরুষেরা অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে মিলনসেতু নির্মাণ করে দিয়ে মানুষের চলার পথকে সহজ করে দিয়েছেন।

[৪] অথবা, নিম্নলিখিত কবিতাংশের ভাবার্থ [২০ ছত্রের মধ্যে] সম্প্রসারিত করিয়া লেখ :

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাবো কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

[৫] নিম্নলিখিত কবিতাটীর ভাবার্থ [২০ ছত্রের মধ্যে] সম্প্রসারিত কর :

যা রাখি আমার তরে মিছে তারে রাখি,
আমিও রবনা যবে সেও হবে ফাঁকি।

যা রাখি সবার তরে সেই শুধু রবে—
মোর সাথে ডোবে না সে, রাখে তারে সবে।

[৬] অথবা, নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদটির মর্মার্থ [১৫ ছত্রের মধ্যে] প্রকাশ কর :

ভূগর্ভের নিম্নস্তরে যেমন বহিরুপদ্রব হইতে নিরালায় বহু পূর্বতন যুগের কঙ্কালাবশেষ পাষাণ হইয়া থাকে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মবিপ্লব সেইরূপ বহিঃশত্রুর নিরন্তর আক্রমণ হইতে দূরে উড়িষ্যার উপকূলে পাষাণখোদিত হইয়া কথঞ্চিৎ বহিয়া গিয়াছে। সিন্ধুপার হইতে মুসলমান-আক্রমণের বন্যা এত দূর প্রান্ত অবধি আসিয়া পঁহুছিত না, এবং কাঠজুড়ি ও মহানদীর তীর হইতে মুসলমানসেনাকে দুই চারিবার এমন বিফলমনোরথ হইয়াও ফিরিতে হইয়াছে। অবশেষে উড়িষ্যা যদিও মুসলমান সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, তথাপি এই নদী-পাহাড়-বন-জঙ্গল-সমাকীর্ণ ভূখণ্ডের সর্বত্র তাহার স্থায়ী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মন্দিরে মন্দিরে দেবতাগণ মধ্যে মধ্যে লাঞ্ছিত হইয়াছেন এবং প্রাচীন কীর্তিও দু'একটা বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত দেবমন্দিরের পাষাণে মসৃজিদের প্রাচীর নির্মাণ করিবার অবসর ঘটিয়া উঠে নাই। সেই জন্যই উড়িষ্যা এখনও মন্দিরের দেশ। রাজধর্ম যখন যাহা প্রবল হইয়াছে, আপনার উন্নত মহিমা প্রচার করিতে অভ্রভেদী পাষাণশির উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছে, এবং এইরূপে ভারতবর্ষের বিলুপ্তপ্রায় ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন দেবতার চরণতলে উৎসৃষ্ট হইয়া পুরাতন দিনের জীবনগৌরব রক্ষা করিতেছে।

[৭] সারমর্ম প্রকাশ কর :

আঘাত-সংঘাত-মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ-কুণ্ডল-কণ্ঠি অলংকাররাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহো
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
করো মোরে সম্মানিত নববীরবেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর

ক্ষতচিহ্ন-অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন,
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

[৮] অল্প কথায় মর্মার্থ ব্যাখ্যা কর :

মধুসূদন কবি, সত্যকার কবি, বলিয়া সৃষ্টিরহস্যের অমোঘ নিয়মের বশবর্তী হইয়া যাহা রচনা করিলেন তাহা মহাকাব্যের আকারে বাঙালীজীবনের গীতিকাব্য। দূর দিগন্তের সাগরোর্মি তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল, তিনি তাহারই আহ্বানে দেহমনের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া কাব্যতরণী চালনা করিলেন। সমুদ্রবক্ষে তরী ভাসিল ; ছন্দে, ভাষায় ও বর্ণনাচিত্রে নীলাম্বুপ্রসার জলকল্লোল জাগিয়া উঠিল, কিন্তু কর্ণধারের মনশ্চক্ষু অর্ধনিমীলিত কেন ? সাগরবক্ষে উত্তাল তরঙ্গরাজির মধ্যেও এ কার কুলুকুলু-ধ্বনি ? এ যে কপোতাক্ষ ! তীরে ভগ্ন শিবমন্দিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, জলে নূতন গগনে যেন নব তারাবলী, এবং গ্রাম হইতে সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। সমুদ্র গর্জন করুক, ফেনিল জলরাশি তরণীতটে আছাড়িয়া পড়ুক—তথাপি এ স্বপ্ন মধুর। সমুদ্রতলে কপোতাক্ষের অন্তঃস্রোত তাঁহার কাব্যতরণীর গতি নির্দেশ করিল, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া আর হইল না। তরী যখন তীরে আসিয়া লাগিল তখন দেখা গেল—'সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী'।

[৯] নিম্নোদ্ধৃত পদ্যাংশের সারমর্ম লেখ, এবং ছন্দ ভাবানুগামী হইয়াছে কিনা, সে সম্বন্ধে তোমার অভিমত প্রকাশ কর :

জন্মদিন মৃত্যুদিন, মাঝে তারি ভরি প্রাণভূমি
কে গো তুমি ?
কোথা আছে তোমার ঠিকানা,
কার কাছে তুমি আছ অন্তরঙ্গ সত্য করে জানা ?
আছো আর নাই মিলে অসম্পূর্ণ তব সত্তাখানি
আপন গদ্গদ বাণী
পারে না করিতে ব্যক্ত, অশক্তির নিষ্ঠুর বিদ্রোহে
বাধা পায় প্রকাশ-আগ্রহে,
মাঝখানে থেমে যায় মৃত্যুর শাসনে।
তোমার যে-সম্ভাষণে

জানাইতে চেয়েছিলে নিখিলেরে নিজ পরিচয়,
হঠাৎ কি তাহার বিলয় ?
কোথাও কি নাহি তার সার্থকতা,
তবে কেন পঙ্গু দৃষ্টি, খণ্ডিত এ অস্তিত্বের ব্যথা ?
অপূর্ণতা আপনার বেদনায়
পূর্ণের আশ্বাস যদি নাহি পায়,
তবে রাত্রিদিন হেন
আপনার সাথে তার এত দ্বন্দ্ব কেন ?
ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকার সাথে যুঝি
অঙ্কুরি উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মুক্তি খুঁজি।
সে মুক্তি না যদি সত্য হয়,
অন্ধ মূক দুঃখে তার হবে কি অনন্ত পরাজয় ?

[১০] নিম্নোদ্ধৃত অংশের ভাবার্থ বিশদভাবে প্রকাশ কর :

কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কী ? অনেকে উত্তর দিবেন, নীতিশিক্ষা। যদি তাহা সত্য হয়, তবে 'হিতোপদেশ' 'রঘুবংশ' হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। সেই হিসাবে 'কথামালা' হইতে 'শকুন্তলা' কাব্যাংশে অপকৃষ্ট। কিন্তু কেহই এ সকল কথা স্বীকার করিবেন না। যদি তাহা না করিলেন, তবে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কী ? কী জন্য শতরঞ্চখেলা ফেলিয়া 'শকুন্তলা' পড়িব ? কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে-উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মানুষের চিত্তোৎকর্ষসাধন—চিত্তশুদ্ধিজনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা, কিন্তু নীতিনির্বাচনের দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না, তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধিবিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।

[১১] কবিতাটির ভাবসত্য খুব সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও :

স্তব্ধ রাতে একদিন নিদ্রাহীন আবেগের আন্দোলনে তুমি
বলেছিলে নতশিরে অশ্রুনীরে ধীরে মোর করতল চুমি :
"তুমি দূরে যাও যদি, নিরবধি শূন্যতার সীমাশূন্য ভারে
সমস্ত ভুবন মম মরুসম রুক্ষ হয়ে যাবে একেবারে।
আকাশবিস্তীর্ণ ক্লান্তি সব শান্তি চিত্ত হতে করিবে হরণ—
নিরানন্দ নিরালোক স্তব্ধ শোক মরণের অধিক মরণ ॥"

শুনে, তোর মুখখানি বক্ষে আনি বলেছিনু তোরে কানে কানে :
"তুই যদি যাস্ দূরে তোরি সুরে বেদনা-বিদ্যুৎ গানে গানে
ঝলিয়া উঠিবে নিত্য, মোর চিত্ত সচকিবে আলোকে আলোকে,
বিরহ বিচিত্র খেলা সারাবেলা পাতিবে আমার বক্ষে চোখে।
তুমি খুঁজে পাবে প্রিয়ে, দূরে গিয়ে মর্মের নিকটতম দ্বার, —
আমার ভুবনে তবে পূর্ণ হবে তোমার চরম অধিকার ॥"

দুজনের সেই বাণী কানাকানি, শুনেছিল সপ্তর্ষির তারা,
রজনীগন্ধার বনে ক্ষণে ক্ষণে বহে গেল সে-বাণীর ধারা
তারপর চুপে চুপে মৃত্যুরূপে মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার;
দেখা শুনা হলো সারা, স্পর্শহারা সে-অনন্তে বাক্য নাহি আর।
তবু শূন্য শূন্য নয়, ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে-গগন,
একা একা সে-অগ্নিতে দীপ্ত গীতে সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন ॥

[১২] মর্মসত্য পরিস্ফুট কর :

আমি যেন বলি, আর তুমি যেন শোনো
জীবনে জীবন তার শেষ নেই কোনো।
দিনের কাহিনী কত, রাতে চন্দ্রাবলী
মেঘ হয়, আলো হয়, কথা যায় বলি।
ঘাস ফোটে, ধান ওঠে, তারা জ্বলে রাতে,
গ্রাম থেকে পাড়ি ভাঙে নদীর আঘাতে।
দুঃখের আবর্তে নৌকো ডোবে, ঝড় নামে,
নূতন প্রাণের বার্তা জাগে গ্রামে গ্রামে—
নীলান্ত আকাশে শেষ পাইনি কখনো
আমি যেন বলি, আর, তুমি যেন শোনো।

তুমি যেন বলো, আর, আমি যেন শুনি
প্রহরে প্রহর যায় কল্পজাল বুনি।
কুমুদকহ্লার ভাসে থৈ থৈ জলে,
কোথা মাঠ ফেটে যায় মারীর অনলে।
আঙিনায় শিশু খেলে, ফুলে ধরে মৌ,
তুলসীতলায় দীপ জ্বালে মেজো-বৌ।

সানাই-বাজানো রাতে হঠাৎ জনতা
বিয়ে ভেঙে মালা ছিঁড়ে ছড়ায় মত্ততা।
মানুষের প্রাণে তবু নিরন্ত ফাল্গুনী—
তুমি যেন বলো, আর, আমি যেন শুনি ॥

[১৩] নিম্নলিখিত গদ্যাংশের মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা কর :

য়ুরোপের বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যগুলি পরস্পরকে লঙ্ঘন করিয়া যাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। এ অবস্থায় এমন কথা কাহারো মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে না যে, বরংচ পিছাইয়া প্রথম শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িব, তবু অন্যায় করিব না। এমন কথাও কাহারো মনে আসে না যে, বরংচ জলেস্থলে সৈন্যসজ্জা কম করিয়া রাজকীয় ক্ষমতায় প্রেতিবেশীর কাছে লাঘব স্বীকার করিব, কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে সুখসন্তোষ ও জ্ঞানধর্মের বিস্তার করিতে হইবে। প্রতিযোগিতার আকর্ষণে যে-বেগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে উদ্দামভাবে চালাইয়া লইয়া যায়। দুর্দান্ত গতিতে চলাকেই য়ুরোপ উন্নতি কহে, আমরাও তাহাকেই উন্নতি বলিতে শিখিয়াছি। কিন্তু যে-চলা পদে পদে থামার দ্বারা নিয়মিত নহে, তাহাকে উন্নতি বলা যায় না। যে-ছন্দে যতি নাই, তাহা ছন্দই নহে।

[১৪] সারমর্ম লেখ, এবং ছন্দ ভাবানুযায়ী হইয়াছে কিনা, বল :

আকাশে কৃশানু, বাতাসে অশনি, মর্তে অগ্নি-বৈশ্বানর—
মহা-অরণ্য-দাহন-মূর্তি স্মরি গো তোমায় ভয়ংকর।
শতগবীযুত পুঙ্গব যেন বাহিরাও তুমি বনের পথে,
অম্বরে ধায় ধূমকদম্ব—কেতু সে তোমার মরুৎরথে!
চৌদিকে উড়ে উল্কার মালা, গ্রাস করে যত তৃণের রাশি,
পাখীরা শাখায় ভয়ে মূরছায়, পশুরা পলায় সহসা ত্রাসি।
তব ক্ষুরধার দ্রংষ্টা শিখায়, মেদিনীমুণ্ডে জটার ভার
ঘুচাও নিমেষে, শ্মশ্রু যেমন ঘুচায় নিপুণ ক্ষৌরকার।
সিন্ধুসমান গর্জন কর, সিংহের মতো হুহুংকার!
ওগো জ্বালাকেশ! কৃষ্ণবর্ত্ম! প্রণমি তোমারে বারংবার।

[১৫] ভাবার্থ লেখ :

আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে, তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌছলো।

তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদিভাষা, তার ইসারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে ; হাজার হাজার বৎসরের ভুলেযাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়। মনের মধ্যে যে-সাড়া ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষায়,—তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগযুগান্তর গুনগুনিয়ে ওঠে।

ঐ গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে।

বুদ্ধদেব যে-বোধিদ্রুমের তলায় মুক্তিতত্ত্ব পেয়েছিলেন, তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রুমের বাণীও শুনি, যেন,—দুইএ মিশে আছে। আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী। তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন,—প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে? সেই প্রৈতি—সেই বেগ—থামতে চায় না, রূপের ঝর্না অহরহ ঝর্তে লাগলো। তার কত রেখা, কত ভঙ্গি, কত ভাষা, কত বেদনা! সেই প্রথম প্রাণপ্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির প্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে?

[১৬] ভাবসত্য ব্যাখ্যা কর :

হে যক্ষ, সেদিন প্রেম তোমাদের
বদ্ধ ছিল আপনাতেই
পদ্মকুঁড়ির মতো,
সেদিন সঙ্কীর্ণ সংসারে
একান্তে ছিল তোমার প্রেয়সী
যুগলের নির্জন উৎসবে,
সে ঢাকা ছিল তোমার আপনাকে দিয়ে—
শ্রাবণের মেঘমালা
যেমন হারিয়ে ফেলে চাঁদকে
আপনারি আলিঙ্গনের
আচ্ছাদনে।
এমন সময়ে প্রভুর শাপ এল
বর হয়ে,
কাছে থাকার বেড়াজাল গেল ছিঁড়ে।

খুলে গেল প্রেমের আপনাতে-বাঁধা
পাপড়িগুলি,
সে-প্রেম নিজের পূর্ণ রূপের দেখা পেল
বিশ্বের মাঝখানে।
বৃষ্টির জলে ভিজে সন্ধ্যাবেলাকার জুঁই
তাকে দিল গন্ধের অঞ্জলি।
....
সেদিন অশ্রুধৌত সৌম্য বিষাদের
দীক্ষা পেলে তুমি ;
নিজের অন্তর-আঙিনায়
গড়ে তুললে অপূর্ব মূর্তিখানি
স্বর্গীয় গরিমায় কান্তিমতী।
যে ছিল নিভৃত ঘরের সঙ্গিনী
তার রসরূপটিকে আসন দিলে
অন্তরের আনন্দমন্দিরে
ছন্দের শঙ্খ বাজিয়ে।

[১৭] নিম্নলিখিত অংশটির মর্মার্থ পরিস্ফুট কর :

সাহিত্যে মানুষের চারিত্রিক আদর্শের ভালোমন্দ দেখা দেয় ঐতিহাসিক নানা অবস্থাভেদে। কখনো কখনো নানা কারণে ক্লান্ত হয় তার শুভবুদ্ধি, কলুষিত প্রবৃত্তির স্পর্ধায় তার রুচি বিকৃত হয়, শৃঙ্খলিত পশুর শৃঙ্খল যায় খুলে। অথচ মৃত্যুর ছোঁয়াচ লেগে তার মধ্যে কখনো কখনো দেখা দেয় শিল্পকলার আশ্চর্য নৈপুণ্য। শুক্তির মধ্যে মুক্তো দেখা দেয় তার ব্যাধিরূপে। শীতের দেশে শরৎকালের বনভূমিতে যখন মৃত্যুর হাওয়া লাগে তখন পাতায় পাতায় রঙিনতার বিকাশ বিচিত্র হয়ে ওঠে, সে তাদের বিনাশের উপক্রমণিকা। সেইরকম কোনো জাতির চরিত্রকে যখন আত্মঘাতী রিপুর দুর্বলতায় জড়িয়ে ধরে, তখন তার সাহিত্যে তার শিল্পে কখনো মোহনীয়তা দেখা দিতে পারে। তারই প্রতি বিশেষ লক্ষ্য নির্দেশ করে যে-রস-বিলাসীরা অহংকার করে, তারা মানুষের শত্রু। মানুষ যে কেবল ভোগরসের সমজদার হয়ে আত্মশ্লাঘা করে বেড়াবে তা নয় ; তাকে পরিপূর্ণ করে বাঁচতে হবে, অপ্রমত্ত পৌরুষে বীর্যবান্ হয়ে সকলপ্রকার অমঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। স্বজাতির সমাধির উপরে ফুলবাগান না হয় নাই তৈরি হল।

[১৮] নিম্নলিখিত অংশটির ভাবসম্প্রসারণ কর :

বুদ্ধির জায়গায় বিধি এবং আত্মশক্তির জায়গায় ভগবান্‌কে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যারা আত্মাবমাননা করে তারাই দুঃখ পায়, মনের জড়ত্ববশতই সে-কথা তারা বোঝে না। বুদ্ধিকে না মেনে অবুদ্ধিকে আর শাস্ত্রকে মানাই যাদের ধর্ম, রাজাসনে বসেও তারা স্বাধীন হয় না। তারা কর্মের মধ্যাহ্নকালকেও সুপ্তির নিশীথরাত্রি বানিয়ে তোলে।

[১৯] সারমর্ম উদ্‌ঘাটিত কর, এবং ছন্দ কতখানি ভাবানুগামী হইয়াছে, বুঝাইয়া দাও :

প্রতিদিন যে-প্রভাতে পৃথিবী
প্রথম-সৃষ্টির অক্লান্ত নির্মল দেববেশে দেয় দেখা,
আমি তার উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ করে
অন্বেষণ করি আপন অন্তরলোক।
অসংখ্য দণ্ডপল নিমেষের জটিল মলিন জালে বিজড়িত—
দেহটাকে সরিয়ে ফেলি মনের থেকে,—
যেখানে সরে যায় অন্ধকার রাতের
নানা ব্যর্থ ভাবনার অত্যুক্তি,
যার বিস্মৃত দিনের অনবধানে পুঞ্জিত লেখন যত,—
সেইসব নিমন্ত্রণলিপি নীরব যার আহ্বান,
নিঃশেষিত যার প্রত্যুত্তর।
তখন মনে পড়ে, সবিতা,
তোমার কাছে ঋষিকবির প্রার্থনামন্ত্র,—
যে-মন্ত্রে বলেছিলেন : হে পূষণ,
তোমার হিরণ্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন,
উন্মুক্ত করো সেই আবরণ।

[২০] সারমর্ম ব্যাখ্যা কর :

সত্য ওজনদরে বা গজের মাপে বিক্রয় হয় না, তাহা ছোট হইলেও বড়। পর্বত-পরিমাণ খড়বিচালি স্ফুলিঙ্গপরিমাণ আগুনের চেয়ে দেখিতেই বড়, কিন্তু আসলে বড় নহে। সমস্ত সেজের মধ্যে যেখানে সলিতার সূচ্যগ্রপরিমাণ মুখটিতে আলো জ্বলিতেছে,

সেইখানেই সমস্ত সেজটার সার্থকতা। তেলের নিম্নভাগে অনেকখানি জল আছে, তাহার পরিমাণ যতই হোক, সেইটিকেই আসল জিনিস বলিবার কোনো হেতু নাই। সকল সমাজেই সমস্ত সমাজপ্রদীপের আলোটুকু যাহারা জ্বালাইয়া আছেন তাঁহারা সংখ্যাহিসাবে নহে, সত্যহিসাবে সে-সমাজে অগ্রগণ্য—তাঁহারা দগ্ধ হইতেছেন। আপনাকে তাঁহারা নিমেষে নিমেষে ত্যাগই করিতেছেন, তবু তাঁহাদের শিখা সমাজে সকলের চেয়ে উচ্চে—সমাজে তাঁহারাই সজীব, তাঁহারাই দীপ্যমান।

[২১] কবিতাটির মর্মার্থ পরিস্ফুট কর, এবং রচনাটি তুমি কেমন উপভোগ করিলে, বল :

সেইসব হারানো পথ আমাকে টানে :
কেরমানের নোনা মরুর উপর দিয়ে,
খোরাশান থেকে বাদকশান,
পামিরের তুষারপৃষ্ঠ ডিঙিয়ে, ইয়ারকন্দ থেকে খোটান।
শ্রান্ত উটের পায়ে পায়ে যেখানে উড়েছে মরুর বালি,
চামরীর খুরে লেগেছে বরফগলা কাদা।
বাদকশানের চুনি আর খোটানের নীলার নিষ্ঠুর ঝিলিক-দেওয়া,
ভেঙে-পড়া ক্যারাভানের কঙ্কালে আকীর্ণ,
লুব্ধ বণিক আর দুরন্ত দুঃসাহসীর পথ—
লাদকের কস্তুরীর গন্ধ যেখানে আজো লেগে পুরোনো স্মৃতির মতো।

সেইসব মধুর পথের কথা ভাবি :
আকাশের প্রচণ্ড সূর্যকে আড়াল-করা
দু'ধারের দীর্ঘ দেওয়ালের
শ্যাওলাগন্ধ ছায়ায়-ছায়ায় সংকীর্ণ সর্পিল পথ,
সাপের মতো ঠাণ্ডা পাথরে বাঁধানো।
ভাঙা ধাপ দিয়ে উঠে-যাওয়া,
ঝিল্‌মিল-দেওয়া বাতায়নের নীচে থম্‌কে-থাকা,
ধূপের গন্ধে সুরভি, দেবায়তনের দ্বারে ভূমিষ্ঠ-হওয়া পথ।

ভয়ে ভয়ে স্মরণ করি সে-পথ :
ঘন ঘাসের বনে, শিকার ও শ্বাপদের নিঃশব্দ সঞ্চরণের 'ঠৌরি' ;
যুগযুগান্ত ধরে দুর্বল ও ভীত, হিংস্র ও নির্মম পায়ে মাড়ানো।

যে-পথে তৃষ্ণার টানে চলে ভয়চকিত মৃগ ;
অন্ধকারে শোণিত চোখ চমকায়।

যে-পথ কুরুবর্ষ থেকে বেরিয়ে এল রক্তাক্ত,
দুর্বার তাতারবাহিনীর অশ্বক্ষুরবিক্ষত ;
করোটিকঠিন যে-পথে
তৈমুরের খোড়া পায়ের দাগ।
স্বপ্ন দেখি সে-পথের,
অস্তাচল উত্তীর্ণ হয়ে আগামী কালের পানে—
স্বপ্ন যেখানে নির্ভীক,
বৃদ্ধের চোখে শিশুর বিস্ময়,
পৃথিবীতে উদ্দাম দুরন্ত শান্তি ॥

[২২] মর্ম ব্যাখ্যা কর :

ভারতবর্ষে বিশ্বমানবের একটি প্রকাণ্ড সমস্যার মীমাংসা হইবে। সে সমস্যা এই যে, পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে, স্বভাবে, আচরণে বিচিত্র—নরদেবতা এই বৈচিত্র্যকে লইয়াই বিরাট ; সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একাংশ করিয়া দেখিব। পার্থক্যকে নির্বাসিত বা বিলুপ্ত করিয়া নহে—কিন্তু সর্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধির দ্বারা, মানবের প্রতি সর্বসহিষ্ণু প্রেমের দ্বারা, উচ্চ-নীচ-আত্মীয়-পর সকলের সেবাতেই ভগবানের সেবা স্বীকার করিয়া। আর-কিছু নহে, শুভ চেষ্টার দ্বারা দেশকে জয় করিয়া লও। যাহারা তোমাকে সন্দেহ করে তাহাদের সন্দেহকে জয় কর, যাহারা তোমার প্রতি বিদ্বেষ করে তাহাদের বিদ্বেষকে পরাস্ত কর। রুদ্ধ দ্বারে আঘাত কর, বারংবার আঘাত কর ; কোনো নৈরাশ্য, কোনো আত্মাভিমানের ক্ষুন্নতায় ফিরিয়া যাইও না—মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়কে চিরদিন কখনই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।

[২৩] ভাব সম্প্রসারিত কর :

শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য,
স্রষ্টা আছে বা নাই।

[২৪] ভাব সম্প্রসারিত কর :

লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রী লাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথা হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে।

[২৫] নিম্নোদ্ধৃত পদ্যাংশের ভাবার্থ তোমার নিজের ভাষায় সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর:

মঞ্জীর খুলিয়া রাখ, অয়ি ভাষা ছন্দ-বিলাসিনী !
কত কাল নৃত্য করি ভুলাইবে মধুমত্ত জনে—
দোলাইয়া ফুলতনু, ভুরুধনু বাঁকায়ে সঘনে,
চপল-চরণ-ভঙ্গে মজাইবে, মুকুতাহাসিনী ?
আনো বীণা সপ্তস্বরা—স্বর্ণতন্ত্রী, তন্দ্রাবিনাশিনী,
উদার উদাত্ত গীতি গাও বসি হৃদ্‌পদ্মাসনে—
যে-বাণী আকাশে উঠে, শিখা যার হোমহুতাশনে,
পশে পুন রসাতলে—মানুষের মর্মনিবাসিনী !
করি উচ্চ শঙ্খধ্বনি এনেছিল শ্রীমধুসূদন
পয়ারের মুক্তধারা এ বঙ্গের কপিল-আশ্রমে ;
বলাকার মুক্তপক্ষ গতিভঙ্গি ধরিয়া নূতন
পশিল সে মহাহর্ষে সংগীতের সাগরসঙ্গমে !
এখনো শুনিব শুধু নির্ঝরের নূপুরনিক্বণ ?
কোথায় জাহ্নবীধারা ? কূলে যার দেবতারা ভ্রমে !

[২৬] **সারার্থ প্রকাশ কর :**

তুচ্ছ ও মহতের, ভালো ও মন্দের, কাঁকর ও পদ্মের ভেদ অসীমের মধ্যে নেই,—অতএব সাহিত্যেই বা কেন থাকবে, এমন একটা প্রশ্ন পরম্পরায় কানে উঠল। এমন কথারও কি উত্তর দেওয়ার দরকার আছে ? যাঁরা তুরীয় অবস্থায় উঠেছেন তাঁদের কাছে সাহিত্যও নেই, আর্টও নেই, তাঁদের কথা ছেড়েই দেওয়া যায়। কিন্তু কিছুর সঙ্গে কিছুর মূল্যভেদ যদি সাহিত্যেও না থাকে তাহলে পৃথিবীতে সকল লেখাই তো সমান দামের হয়ে ওঠে। কেন-না, অসীমের মধ্যে নিঃসন্দেহেই তাদের সকলেরই এক অবস্থা—খণ্ড দেশকালপাত্রের মধ্যেই তাদের মূল্যভেদ। আম এবং মাকাল অসীমের মধ্যে একই, কিন্তু আমরা খেতে গেলেই দেখি, তাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ। এইজন্যে অতিবড় তত্ত্বজ্ঞানী অধ্যাপকদেরও যখন ভোজে নিমন্ত্রণ করি তখন তাঁদের পাতে আমের অকুলান হলে মাকাল দিতে পারিনে। তত্ত্বজ্ঞানের দোহাই পেড়ে মাকাল যদি দিতে পারতুম, এবং দিয়ে যদি বাহাবা পাওয়া যেত, তা হোলে সস্তায় ব্রাহ্মণভোজন করানো যেত। কিন্তু পুণ্য খতিয়ে দেখবার চিত্রগুপ্ত নিশ্চয়ই পাতঞ্জলদর্শনের মতে হিসেব করতেন না। পণ্যলাভ করতে শক্তির দরকার—সাহিত্যেও একটা পুণ্যের খাতা খোলা আছে।

[২৭] মর্মার্থ পরিস্ফুট কর, এবং এই রচনার উপভোগ্যতাবিষয়ে তোমার মতামত লেখ :

নির্জন প্রান্তরে ঘুরে হঠাৎ কখন,
হয়তো পেতেও পারি পাখিদের মন।
আর শুধু মাটি নয়, শস্য নয়,
নয় শুধু ভার ;
আর এক বিদ্রোহী ধিক্কার—
পৃথিবী-পরাস্ত-করা উজ্জ্বল উৎক্ষেপ।
আজো এরা মাঠে মাঠে মাটি খুঁটে খায়,
মেনে নেয় সবকিছু দায় ;
তবু এক সুনীল শপথ
তাদের বুকের রক্ত তপ্ত করে রাখে।
জীবনের বাঁকে বাঁকে, যত গ্লানি যত কোলাহল
ব্যাধের গুলির মতো বুকে বিঁধে রয়,
সে-উত্তাপে গলে গিয়ে হয়ে যায় ক্ষয়।
শুধু দুটি তীব্র তীক্ষ্ণ দুঃসাহসী ডানা,
আকাশের মানে না সীমানা।
কোনোদিন এ হৃদয় হয় যদি একান্ত নির্জন,
হয়তো পেতেও পারি পাখিদের মন—
আর এক সূর্য সচেতন ॥

অথবা,

জীবন্ত ফুলের ঘ্রাণে
দুপুরের মিহি স্বপ্ন ছিঁড়েখুড়ে গেল :
জেগে দেখি আমি,
এসেছে আমার ঘরে ছোট্ট এক বুনো মৌমাছি—
ডানায় ডানায় যার অরণ্যফুলের কাঁচা ঘ্রাণ,
পাঁশুটে শরীরে যার সোঁদা গন্ধ অজানা বনের।
কেমন সুন্দর ওই উড়ন্ত মৌমাছি !
অশ্রান্ত করুণ ওর গুন্‌গুণানিতে
কেঁপে ওঠে মাটির মসৃণতম গান,
আর দূর পাহাড়ের বন্ধুর বিষণ্ণ প্রতিধ্বনি !

যেন আজ বাহিরের সমস্ত পৃথিবী আর সমস্ত আকাশ
আমার ঘরের মাঝে তুলে নিয়ে এল
কোথাকার ছোট্ট এক বুনো মৌমাছি ॥

[২৮] বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর :

এই পশ্চিমের কোণে রক্তরাগরেখা
নহে কভু সৌম্যরশ্মি অরুণের লেখা
তব নব প্রভাতের। এ শুধু দারুণ
সন্ধ্যার প্রলয়দীপ্তি। চিতার আগুন
পশ্চিম-সমুদ্রতটে করিছে উদ্গার
বিস্ফুলিঙ্গ—স্বার্থদীপ্ত লুব্ধ সভ্যতার
মশাল হইতে লয়ে শেষ অগ্নিকণা।

[২৯] নিম্নলিখিত উদ্ধৃতির ভাবসম্প্রসারণ কর :

কবি যে-ভাষায় কবিত্ব প্রকাশ করিতে চায়, সে-ভাষা তো তাহার নিজের সৃষ্টি নহে। কবি জন্মিবার বহুকাল পূর্বেই সে-ভাষা আপনার একটা স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কবি যে-ভাবটি যেমন করিয়া ব্যক্ত করিতে চায়, ভাষা ঠিক তেমনটি করিয়া রাশ মানে না। তখন কবির ভাবের স্বাতন্ত্র্য এবং ভাবপ্রকাশের উপায়ের স্বাতন্ত্র্যে একটা দ্বন্দ্ব হয়। যে-কবি ভাবের স্বাতন্ত্র্য এবং ভাষার স্বাতন্ত্র্যের অনিবার্য দ্বন্দ্বকে ছাপাইয়া সৌন্দর্য রক্ষা করিতে পারেন, তিনি ধন্য হন। ভাবের যেটুকু ক্ষতি হইয়াছে, সৌন্দর্য তাহার চেয়ে অনেক বেশি পূরণ করিয়া দেয়।

[৩০] সারমর্ম লেখ :

যুগে যুগে মরি কত নির্মোক আমরা সবাই এসেছি ছাড়ি ;
জড়তার জাড়ে থেকেছি অসাড়ে, উঠেছি আবার অঙ্গ ঝাড়ি।
কুলদেবতার গৃহদেবতার গ্রামদেবতার বাহিয়া সিঁড়ি
জগৎসবিতা বিশ্বপিতার চরণে পরাণ যেতেছে ভিড়ি।
পরিবর্তন চলে তিলে তিলে চলে পলে পলে এমনি করে,
মহাভুজঙ্গ খোলস খুলিছে হাজার হাজার বছর ধরে।
আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন চারি মহাদেশ মিলিবে যবে,
যেইদিন মহামানবধর্মে মানুষের ধর্ম বিলীন হবে।

ভোর হয়ে এল, আর দেরী নাই, ভাঁটা শুরু হল তিমিরস্তরে,
জগতের যত তূর্যকণ্ঠ মিলিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে।
মহান যুদ্ধ মহান শান্তি করিছে সূচনা হৃদয়ে গণি,
রক্তপঙ্কে পঙ্কজবীজ স্থাপিছেন চুপে পদ্মযোনি।

[৩১] মর্ম ব্যাখ্যা কর :

বস্তুবাদীরা মনে করে অবকাশটাই নিশ্চল, কিন্তু যাহারা অবকাশরসের রসিক তাহারা জানে বস্তুটাই নিশ্চল—অবকাশই তাহাকে গতি দেয়। রণক্ষেত্রে সৈন্যের অবকাশ নেই। তাহারা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ব্যূহরচনা করিয়া চলিয়াছে, তাহারা মনে ভাবে, আমরাই যুদ্ধ করিতেছি। কিন্তু যে-সেনাপতি অবকাশে নিমগ্ন হইয়া দূরে স্তব্ধভাবে দেখিতেছে, সৈন্যদের সমস্ত চলা তাহারই মধ্যে। নিশ্চলের যে ভয়ংকর চলা তাহার রুদ্রবেগ যদি দেখিতে চাও, তবে দেখ ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীর আবর্তনে, দেখ যুগ-যুগান্তরের তাণ্ডবনৃত্যে। যে নাচিতেছে না, তাহারই নাচ এই সকল চঞ্চলতায়।

[৩২] সারাংশ লিখ :

বহুদিন গত চৈতি-গাজন, মেঘে-মাঠে আজ অম্বুবাচন,
থামাও তোমার পাগুলে নাচন, বেঁধে নাও জটাজুট ;
হাতের ত্রিশূল হাঁটুতে ভাঙিয়া প্রলয়শালায় পিটিয়া রাঙিয়া
গড়ে নাও ফাল, হয়েছে সকাল ধরো লাঙলের মুঠ।
আমাদেরি সাথে চল গো ঠাকুর
ওই নাচে-পোড়া মাঠে,
দুই হাতে চেপে চালাও লাঙল
পাথরও যেন গো কাটে।
শংকর হও সংকর্ষণ, মাটিছোঁয়া মেঘে নামে বর্ষণ,
শস্যে শ্যামল করো ধরাতল বাঁচুক অন্নপূর্ণা।

[৩৩] নিম্নোদ্ধৃত পদ্যাংশের ভাবার্থ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর :

নিভাও নিভাও শীঘ্র, এত কী আমোদ ?
জ্বালিছ সাঁঝের দীপ হয়ে কুতূহলী !
দেখিছ না ? এখনো যে একছাদ রোদ !
উচিত এ উদ্বোধন আইলে গোধূলি !
দুপুরে কি বাজে, সখি, ঝিল্লীর নূপুর ?

তুমি কি ভেবেছ ওই বৈকালী যূথিকা
ফুটিয়াছে ? হায় হায়, ক্রূর পিপীলিকা
কুসুমের মর্মে পশি করেছে আতুর !
কল্পনার শিল্পশালা-নিরালায় বসি
মধ্যাহ্নে ধরেছ কেন পূরবী রাগিণী ?
থাম থাম, চিত্রগুলি পড়ে খসি খসি !
কোথায় চিত্রিব আমি অনঙ্গমোহিনী,
হৃদে দেখ, চিত্রিয়াছি শংকরগৃহিণী !

[৩৪] নিম্নোদ্ধৃত পদ্যাংশের ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া নিজের ভাষায় সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর :

চলে মন্থন, চলে মন্থন, মিলায় অট্টহাসি,
অনন্ত চুম্বনে টানে হর অনন্ত বিষরাশি।
কোথা উর্বশী, কোথা সুধাশশী, হায় রে দুঃস্বপন,
মরণঞ্জয় মরণ পিয়ে রে আকণ্ঠ আমরণ !
অনন্ত ব্যোমকণ্ঠে জ্বলিছে নীলকূট নিশিদিন,
বিষাচ্ছন্ন চেতন শম্ভু বিষচুম্বনলীন !
চলে বিষপান, চলে বিষদান, চলে চিরমন্থন,
অনন্তনাগবন্ধনে ঘোরে অনন্ত ক্রন্দন।
দেবতার সুধা দেবতা হরিয়া অদৃশ্য কোন্‌খানে,—
বিশ্বনাথের কণ্ঠে বিশ্ব নীল হল বিষপানে !
তবু মন্থন, চলে মন্থন অযাচিত অকারণ,
জীবসাথে শিব বিষনির্জীব, কেবা করে নিবারণ !

[৩৫] নিম্নলিখিত উদ্ধৃতির ভাবসম্প্রসারণ কর :

স্বাধীনতা-অধীনতা নিয়ে আমরা কথার খেলা করি। অধীনতাও যে স্বাধীনতার সঙ্গেই এক-আসনে বসে রাজত্ব করে, একথা আমরা ভুলে যাই। স্বাধীনতাই যে আমরা চাই তা নয়, অধীনতাও আমরা চাই। যে-চাওয়াতে আমাদের ভিতরকার দুই চাওয়ারই সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়, সে-ই হচ্ছে প্রেমের চাওয়া। বন্ধনকে স্বীকার করে বন্ধনকে অতিক্রম করব, এই হচ্ছে প্রেমের কাজ। প্রেম যেমন স্বাধীন এমন স্বাধীন আর দ্বিতীয় কেউ নেই। আবার, প্রেমের যে অধীনতা এতবড়ো অধীনতাই-বা জগতে কোথায় আছে।

[৩৬] নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলির ভাবসম্প্রসারণ কর :

[ক] অনেক লোকে জন্তুকে শুধু শুধু কষ্ট দিতে পীড়া বোধ করে। কিন্তু কষ্ট দেওয়ার একটা নাম যদি দেওয়া যায় 'শিকার', তবে সে-ব্যক্তি আনন্দের সহিত হত-আহত নিরীহ পাখীর তালিকা বৃদ্ধি করিয়া গৌরব বোধ করে। নিশ্চয়ই বিনা-উপলক্ষ্যে যে-ব্যক্তি পাখীর ডানা ভাঙিয়া দেয়, সে-ব্যক্তি শিকারির চেয়ে নিষ্ঠুর, কিন্তু পাখীর তাহাতে বিশেষ সান্ত্বনা নাই। বরংচ অসহায় পক্ষিকুলের পক্ষে স্বভাব-নিষ্ঠুরের চেয়ে শিকারির দল অনেক বেশি নিদারুণ।

[খ] ভিতরে একটা গভীর অভাব বা পীড়া থাকিলে যখন তাহাকে ভালো করিয়া ধরিতে বা তাহার ভালোরূপ প্রতিকার করিতে না পারি, তখন তাহা নানা অকারণ বিরক্তির আকার ধারণ করিতে থাকে। শিশু অনেক সময় বিনাহেতুতেই রাগ করিয়া তাহার মাকে মারে। তখন বুঝিতে হইবে সে-রাগ বাহ্যত তাঁহার মাতার প্রতি, কিন্তু বস্তুত তাহা শিশুর একটা কোনো অনির্দেশ্য অস্বাস্থ্য। সুস্থ শিশু যখন আনন্দে থাকে তখন বিরক্তির কারণ ঘটিলেও সেটাকে সে অনায়াসে ভুলিয়া যায়।

[৩৭] সংক্ষেপে কবিতাটির মর্মার্থ লেখ :

প্যাঁচ কিছু জানা আছে কুস্তির ?
ঝুলে কি থাকতে পারো সুস্থির ?
নইলে
রইলে
ট্রাম না চড়ে—
ভ্যাবাচাকা রাস্তায় পড়ে বেঘোরে।

প্রাকটিস্ করেছো কি দৌড়ে ?
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আর ভোঁ-উড়ে ?
নইলে
রইলে
লরিতে চাপা,
তাড়া করে বাড়ি থেকে বাড়িয়ো না পা।

দাঁত আছে মজবুত সব বেশ ?
পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস ?

নইলে
রইলে
ভাত না খেয়ে,
চালে ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।

স্থির করে পা-দুটো ও মনটা,
দাঁড়াতে পারো তো বারো ঘণ্টা ?
নইলে
রইলে
না কিনে ধুতি—
যতোই দোকানে গিয়ে করো কাকুতি।

[৩৮] কবিতাটির অন্তর্নিহিত ভাবসত্য পরিস্ফুট কর :

আমি যদি হই ফুল, হই ঝুঁটি বুলবুল্, হাঁস—
মৌমাছি হই একরাশ,
তবে আমি উড়ে যাই, বাড়ি ছেড়ে দূরে যাই,
ছেড়ে যাই ধারাপাত, দুপুরের ভূগোলের ক্লাস।
তবে আমি টুপ্‌টুপ নীল হ্রদে দিই ডুব রোজ,
পায় না আমার কেউ খোঁজ।
তবে আমি উড়ে উড়ে ফুলেদের পাড়া ঘুরে
মধু এনে দিই এক ভোজ।
হোক আমার এলোচুল, তবু আমি হই ফুল লাল—
ভরে দিই ডালিমের ডাল।
ঘড়িতে দুপুর বাজে, বাবা ডুবে যান কাজে,
তবু আর ফুরোয় না আমার সকাল।

[৩৯] মর্মার্থ পরিস্ফুট কর :

এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন্ দেশে, কোন্ সমুদ্রপারে তোমার প্রভাত হল। অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো ; কোন্‌খানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা।

জাগল কে। নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায়-জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সেঁউতি-ফুলের মালা।

এখানে একে একে দরজার আগল পড়ল ; সেখানে জানলা গেল খুলে। এখানে নৌকা ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে ; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।

ওরা পান্থশালা থেকে বেরিয়ে পড়েছে, পূবের দিকে মুখ করে চলেছে। ওদের কপালে লেগেছে সকালের আলো, ওদের পারানির কড়ি এখনো ফুরায় নি। ওদের জন্যে পথের ধারের জানলায় জানালায় কালো চোখের করুণ কামনা অনিমেষে চেয়ে আছে। রাস্তা ওদের সামনে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খুলে ধরলে, বললে—'তোমাদের জন্যে সব প্রস্তুত।' ওদের হৃৎপিণ্ডের রক্তের তালে তালে জয়ভেরী বেজে উঠলো।

এখানে সবাই ধূসর আলোয় দিনের শেষে খেয়া পার হলো।

পান্থশালার আঙিনায় এরা কাঁথা বিছিয়েছে। কেউ-বা একলা, কারো-বা সঙ্গী ক্লান্ত ; সামনের পথে কী আছে অন্ধকারে দেখা গেল না, পিছনের পথে কী ছিল, কানে কানে বলাবলি করছে ; বলতে বলতে কথা বেধে যায়, তারপরে চুপ করে থাকে ; তার পরে আঙিনা থেকে উপরে চেয়ে দেখে, আকাশে উঠেছে সপ্তর্ষি।

সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত—এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক।

[৪০] নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটির মর্মসত্য প্রকাশ কর ঃ

আবার জাগিনু আমি। রাত্রি হোলো ক্ষয়।
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব। এই তো বিস্ময়
অন্তহীন।
ডুবে গেছে কত মহাদেশ,
নিবে গেছে কত তারা, হয়েছে নিঃশেষ
কত যুগযুগান্তের। বিশ্বজয়ী বীর
নিজেরে বিলুপ্ত করি শুধু কাহিনীর
বাক্যপ্রান্তে আছে ছায়াপ্রায়। কত জাতি
কীর্তিস্তম্ভ রক্তপঙ্কে তুলেছিল গাঁথি
মিটাতে ধূলির মহাক্ষুধা। সে-বিরাট
ধ্বংসধারামাঝে আজি আমার ললাট
পেল অরুণের টিকা আরো একদিন
নিদ্রাশেষে, এই তো বিস্ময় অন্তহীন।

আজ আমি নিখিলের জ্যোতিষ্কসভাতে
রয়েচি দাঁড়ায়ে। আছি হিমাদ্রির সাথে,

আছি সপ্তর্ষির সাথে, আছি যেথা সমুদ্রের
তরঙ্গে ভাঙিয়া উঠে উন্মত্ত রুদ্রের
অট্টহাস্যে নাট্যলীলা। এ বনস্পতির
বল্কলে স্বাক্ষর আছে বহুশতাব্দীর,
কত রাজমুকুটেরে দেখিল খসিতে।
তারি ছায়াতলে আমি পেয়েছি বসিতে
আরো একদিন—
জানি এ দিনের মাঝে
কালের অদৃশ্য চক্র শব্দহীন বাজে।

[৪১] ভাবার্থ লেখ :

আমাদের বিশ্বাস—সমুদয় বেদ, দর্শন, পুরাণ ও তন্ত্ররাশির ভিতর কোথাও একথা নেই যে, আত্মাতে লিঙ্গ, ধর্ম বা জাতিভেদ আছে। এই হেতু যাঁরা বলেন, ধর্মের সহিত সমাজসংস্কারের কোনো সম্বন্ধ নাই, তাঁদের সহিত আমরা একমত। কিন্তু তাঁদিগকে আবার আমাদের একথা মানতে হবে যে, তাহলে ধর্মেরও কোনরূপ সামাজিক বিধান দিবার বা সকল জীবের মধ্যে বৈষম্যবাদ প্রচার করবার কোনো অধিকার নেই—যখন ধর্মের লক্ষ্যই হচ্ছে এই কাল্পনিক ও ভয়ানক বৈষম্যকে একেবারে নাশ করে ফেলা। যদি একথা বলা হয়, এই বৈষম্যের ভিতর দিয়ে গিয়েই আমরা চরমে সমত্ব ও একত্বভাব লাভ করবো—তাতে আমাদের উত্তর এই, তাঁরা যে-ধর্মের দোহাই দিয়ে পূর্বোক্ত কথাগুলি বলছেন, সেই ধর্মেই পুনঃপুনঃ বলছে, পাঁক দিয়ে পাঁক ধোয়া যায় না। বৈষম্যের ভিতর দিয়ে সমত্বে যাওয়া কী রকম, না, যেন অসৎকার্য করে সৎ হওয়া।

সুতরাং সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সামাজিক বিধানগুলি সমাজের নানাপ্রকার অবস্থসংঘাত হতে উৎপন্ন—ধর্মের অনুমোদনে। ধর্মের ভয়ানক ভ্রম হয়েছে যে, সামাজিক ব্যাপারে ধর্ম হাত দিলেন। কিন্তু এখন আবার ভণ্ডামি করে বলছেন, সমাজসংস্কারের সঙ্গে ধর্মের কী সম্বন্ধ! একথা বলায় ধর্ম নিজের আচরণ নিজেই খণ্ডন কচ্ছেন। সত্য, এখন দরকার হচ্ছে, যেন ধর্ম সমাজসংস্কারে না দাঁড়ান ; কিন্তু আমরা সেজন্যই একথাও বলি, ধর্ম যেন সমাজের বিধানদাতা না হন—অন্তত বর্তমান কালে।

[৪২] কবির ব্যক্তব্যটি বিশদ কর :

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে।

তারা বলে গেল : 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল—'ভালবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো।'
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহিরদ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে :
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো!

[৪৩] খুব সংক্ষেপে সারমর্ম উদ্ধার কর :

কর্তব্যজ্ঞানের চরম বিকাশ ত্যাগ। সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে শিক্ষাদীক্ষা ও ভাবুকতার প্রভাবে মানুষের অন্তর্জীবন যতই সুদূরপ্রসারিত হইতে লাগিল ততই তাহার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সত্তা সমষ্টিগত বৃহত্তর সত্তায় মগ্ন হইয়া যাইতে লাগিল, তখন নিজের চিন্তা ভুলিয়া পরের চিন্তাই মানুষের মনে জাগিতে লাগিল। এই ত্যাগপ্রবৃত্তি জাগ্রৎ না হইলে পুরুষ কখনো প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া স্ত্রীপুত্রের আহার উপার্জন করিত না, স্ত্রী কখনো নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া স্বামীসন্তানের মুখে আহার দিত না ; জাতির কল্যাণের জন্য মানুষ কখনো নিজেকে কাঙাল করিয়া তাহার সর্বস্ব বিসর্জন দিত না ; দেশকে রক্ষা করিবার জন্য—জাতিকে স্বাধীন করিবার জন্য—মানুষ কখনো হাসিমুখে কামানের মুখে ছুটিয়া যাইতে পারিত না। সৃষ্টির প্রথম যুগে যে-আত্মপরতা মানুষের অন্তরে একান্ত প্রবল ছিল—এই ত্যাগপ্রবৃত্তির যাদুদণ্ডস্পর্শে তাহা ধীরে ধীরে বিদূরিত হইয়া তাহার স্থানে পরার্থপরতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইহাই মানুষের চরম বিকাশ।

[৪৪] নিম্নের উদ্ধৃতিগুলির ভাবসত্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর :

[ক] সাঁতার যতক্ষণ না শিখি ততক্ষণ এলোমেলো হাত-পা-ছোঁড়া চলে। ভালো সাঁতার যেমনি শিখি অমনি আমাদের চেষ্টা সীমাবদ্ধ হইয়া আসে এবং তাহা সুন্দর হইয়া প্রকাশ পায়। পাখী যখন ওড়ে তখন সুন্দর দেখিতে হয়, কারণ তাহার ওড়ার মধ্যে দ্বিধা নাই, তাহা সুনিয়ত অর্থাৎ তাহা আপনার নিশ্চিত সীমাকে পাইয়াছে। এই সীমাকে পাওয়াই সৃষ্টি অর্থাৎ সত্য; এবং সীমার দ্বারা অসীমকে পাওয়াই সৌন্দর্য অর্থাৎ আনন্দ। সীমা হইতে ভ্রষ্ট হওয়াই কদর্যতা,—তাহাই নিরানন্দ, তাহাই বিনাশ।

[খ] আমার এ জন্মদিনমাঝে আমি হারা—
আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যান জীবনের চরম প্রসাদ
নিয়ে যান মানুষের শেষ আশীর্বাদ।
শূন্য ঝুলি আজিকে আমার,—
দিয়েছি উজাড় করি
যাহাকিছু আছিল দিবার।
প্রতিদানে যদি কিছু পাই—
কিছু স্নেহ কিছু ক্ষমা—
তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই
পারের খেয়ায় যাব যবে
ভাষাহীন শেষের উৎসবে।

[গ] আমোদ বল, শিক্ষা বল, হিতকর্ম বল, সকলকেই একান্ত জটিল ও দুঃসাধ্য করিয়া তুলিলে কর্মের আয়োজন ও উত্তেজনা এতই বৃহৎ হইয়া উঠে যে, মানুষ আচ্ছন্ন হইয়া যায়। প্রতিযোগিতার নিষ্ঠুর তাড়নায় কর্মজীবীরা যন্ত্রের অধম হয়। বাহির হইতে সভ্যতার বৃহৎ আয়োজন দেখিয়া স্তম্ভিত হই—তাহার তলদেশে যে নিদারুণ নরমেধযজ্ঞ অহোরাত্র অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা গোপনে থাকে। কিন্তু বিধাতার কাছে তাহা গোপন নহে, মাঝে মাঝে সামাজিক ভূমিকম্পে তাহার পরিণামের সংবাদ পাওয়া যায়। য়ুরোপে বড়ো দল ছোটো দলকে পিষিয়া ফেলে, বড়ো টাকা ছোটো টাকাকে উপবাসে ক্ষীণ করিয়া আনিয়া শেষকালে বটিকার মতো চোখ বুজিয়া গ্রাস করিয়া ফেলে।

[৪৫] মর্মসত্য ব্যাখ্যা কর :

[ক] মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে। তার যে-সত্তা জীবসীমার মধ্যে সেখানে যেটুকু আবশ্যক সেইটুকুতেই তার সুখ। কিন্তু অন্তরে অন্তরে জীবমানব বিশ্বমানবে প্রসারিত। সেইদিকে সে সুখ চায় না, সে সুখের বেশী চায়—সে ভূমাকে চায়। তাই সকল জীবের মধ্যে মানুষই কেবল অমিতাচারী। তাকে পেতে হবে অমিত, তাকে দিতে হবে অমিত। কেননা, তার মধ্যে আছে অমিতমানব। সেই অমিতমানব সুখের কাঙাল নয়, দুঃখভীরু নয়। সেই অমিতমানব আরামের দ্বার ভেঙে কেবলি মানুষকে বের করে নিয়ে চলেছে কঠোর অধ্যবসায়ে। আমাদের ভিতরকার ছোট-মানুষটি তা নিয়ে বিদ্রূপ করে থাকে, বলে—ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। উপায় নেই। বিশ্বের মানুষটি ঘরের মানুষকে পাঠিয়ে দেন বুনো মোষটাকে দাবিয়ে রাখতে—এমন কি, ঘরের খাওয়া যথেষ্ট না জুটলেও।

উপনিষদে ভগবান সম্বন্ধে একটি প্রশ্নোত্তর আছে। 'স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ' —সেই ভগবান কোথায় প্রতিষ্ঠিত? এই প্রশ্নের উত্তর—'স্বে মহিম্নি'—নিজের মহিমায়। সেই মহিমাই তাঁর স্বভাব। সেই স্বভাবেই তিনি আনন্দিত। মানুষেরও আনন্দ মহিমায়। তাই বলা হয়েছে 'ভূমৈব সুখং'। কিন্তু যে-স্বভাবে তার মহিমা সেই স্বভাবকে সে পায় বিরোধের ভিতর দিয়ে, পরম সুখকে পায় পরম দুঃখে, মানুষের সহজ অবস্থা ও স্বভাবের মধ্যে নিত্য দ্বন্দ্ব। তাই ধর্মের পথকে অর্থাৎ মানুষের পরম স্বভাবের পথকে 'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'।

[খ] মাঝে মাঝে, সন্ধ্যার জলস্রোতে
অলস সূর্য দেয় এঁকে
গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ,
আর আগুন লাগে জলের অন্ধকারে ধূসর ফেনায়।
সেই উজ্জ্বল স্তব্ধতায়
ধোঁয়ার বঙ্কিম নিশ্বাস ঘুরে ফিরে ঘরে আসে
শীতের দুঃস্বপ্নের মতো।
অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘমদির মহুয়ার দেশ,
সমস্ত ক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।

আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়াফুল—
নামুক মহুয়ার গন্ধ।

এখানে অসহ্য, নিবিড় অন্ধকারে
মাঝে মাঝে শুনি—
মহুয়াবনের ধারে কয়লার খনির
গভীর, বিশাল শব্দ,
আর শিশিরে-ভেজা সবুজ সকালে
অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি ধুলোর কলঙ্ক,
ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয়
কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন।

[গ] গান জিনিসটা নিছক সৃষ্টিলীলা। ইন্দ্রধনু যেমন তার বৃষ্টি আর রৌদ্রের জাদু, আকাশের দুটো খামখেয়ালি মেজাজ দিয়ে গড়া তোরণ, একটি অপূর্ব মুহূর্তকাল সেই তোরণের নিচে দিয়ে জয়যাত্রা করবে। হয়ে গেল এই খেলা, মুহূর্তটি তার রঙীন উত্তরীয় উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল—তার বেশি আর কিছু নয়। মেজাজের এই রঙিন খেলাই হচ্ছে গীতিকাব্য। ঐ ইন্দ্রধনুর কবিটিকে পাকড়াও করে যদি জিজ্ঞাসা করা যেত, 'এটার মানে কী হল', সাফ জবাব পাওয়া যেত—'কিছুই না'। 'তবে'? 'আমার খুশি'। রূপেতেই খুশি—সৃষ্টির সব প্রশ্নের এই হল শেষ উত্তর।

এই খুশির খেলাঘরে রূপের খেলা দেখে আমাদের মন ছুটি পায় বস্তুর মোহ থেকে; একেবারে পৌঁছয় আনন্দে, এমন কিছুতে যার ভার নেই, যার মাপ নেই, যা অনির্বচনীয়।

[ঘ] আমরা সিঁড়ি
তোমরা আমাদের মাড়িয়ে
প্রতিদিন অনেক উঁচুতে উঠে যাও,
তারপর ফিরেও তাকাও না পিছনের দিকে।
তোমাদের পদধূলিধন্য আমাদের বুক
পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় প্রতিদিন।
তোমরাও তা জানো,
তাই কার্পেটে মুড়ে রাখতে চাও আমাদের বুকের ক্ষত—

ঢেকে রাখতে চাও তোমাদের অত্যাচারের চিহ্নকে,
আর চেপে রাখতে চাও পৃথিবীর কাছে
তোমাদের গর্বোদ্ধত অত্যাচারী পদধ্বনি।

তবু আমরা জানি,
চিরকাল আর পৃথিবীর কাছে
চাপা থাকবে না
আমাদের দেহে তোমাদের এই পদাঘাত।
আর সম্রাট হুমায়ুনের মতো
একদিন তোমাদেরও হতে পারে পদস্খলন॥

[৪৬] ভাবার্থ লেখ :

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী,
শেষ নমস্কার অবনত দিনাবসানের বেদিতলে॥
মহাবীর্যবতী, তুমি বীরভোগ্যা,
বিপরীত তুমি ললিতে-কঠোরে,
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে-নারীতে;
মানুষের জীবন দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে!...

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
একদিকে আপক্বধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র—
সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে;
অস্তগামী সূর্য শ্যামশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী—
'আমি আনন্দিত'।
অন্যদিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।

বৈশাখে দেখেছি, বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এলো
কালো শ্যেনপাখির মতো তোমার ঝড় ;
সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠলো যেন কেশরফোলা সিংহ ;
তার লেজের ঝাপটে ডালপালা আলুথালু করে
হতাশ বনস্পতি ধূলায় পড়ল উবুড় হয়ে ;
হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুড়ের চাল
শিকলছেঁড়া কয়েদি-ডাকাতের মতো।···

স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্যনবীনা,
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞহুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংখ্যাগণনার-অতীত প্রত্যূষে ;
তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ
শত শত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ ;
বিনা-বেদনায় বিছিয়ে এসেছ তোমার বর্জিত সৃষ্টি
অগণ্য বিস্মৃতির স্তরে স্তরে ॥

[৪৭] ভাবার্থ পরিস্ফুট কর :

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন-না-একদিন ইংরেজকে এই ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে! জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর, আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয় হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদেরা এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে ; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে সে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব-দিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট, সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পর বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর, একদিন অপরাজিত

মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

[৪৮] ভাবার্থ লেখ :

যেদিন চৈতন্য মোর মুক্তি পেল লুপ্তিগুহা হতে,
নিয়ে এল দুঃসহ বিস্ময়ঝড়ে দারুণ দুর্যোগে
কোন্ নরকাগ্নিগিরিগহ্বরের তটে ; তপ্ত ধূমে
গর্জি উঠি ফুঁসিছে সে মানুষের তীব্র অপমান,
অমঙ্গলধ্বনি তার কম্পান্বিত করে ধরাতল,
কালিমা মাখায় বায়ুস্তরে।
দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। একদিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুঙ্কার ; অন্যদিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ, বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরি
কৃপণের সতর্ক সম্বল, সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো
ক্ষণিক গর্জন-অন্তে ক্ষীণস্বরে তখনি জানায়
নিরাপদ নীরব নম্রতা। রাষ্ট্রপতি যত আছে
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ-নির্দেশ
রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ ওষ্ঠ-অধরের চাপে
সংশয়ে সংকোচে। এদিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণীনদীপার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুঙ্কারিয়া নরমাংসস্পর্ধিত শকুনি,
আকাশেরে করিল অশুচি।
মহাকালসিংহাসনে-
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নরঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা-'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন—
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।

[৪৯] মর্মার্থ প্রকাশ কর :

দোতালার জানলায় দাঁড়িয়ে সেদিন দেখছিলুম, সামনের আকাশে নববর্ষার জল-ভারনত মেঘ, নীচে ছেলেগুলো নতুন জলধারার ডাক শুনে মেতে উঠেচে, তাদের মধ্যে দিয়ে প্রাণের তরঙ্গিত কল্লোল। আমার মন সহসা আপন খোলা দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে সুদূরে। অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমার অন্তরে একটা অনুভূতি এল, সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী সর্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড লীলা। নিজের জীবনে যা বোধ করচি, যা ভোগ করচি, চারিদিকে ঘরে ঘরে জনে জনে মুহূর্তে মুহূর্তে যা-কিছু উপলব্ধি চলেছে, সমস্ত এক হয়েছে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে। অভিনয় চলেছে নানা নটকে নিয়ে, সুখদুঃখের নানা খণ্ডপ্রকাশ চলছে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবনযাত্রায়, কিন্তু সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ পাচ্ছে এক পরমদ্রষ্টার মধ্যে যিনি সর্ব্বানুভূঃ। এতকাল নিজের জীবনে সুখদুঃখের যে-সব অনুভূতি একান্তভাবে আমাকে বিচলিত করেছে, তাকে দেখতে পেলুম দ্রষ্টারূপে এক নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে।

এমনি করে আপনা থেকে বিবিক্ত হয়ে সমগ্রের মধ্যে খণ্ডকে স্থাপন করবামাত্র নিজের অস্তিত্বের ভার লাঘব হয়ে গেল। তখন জীবনলীলাকে রসরূপে দেখা গেল কোনো রসিকের সঙ্গে এক হয়ে। আমার সেদিনকার এই বোধটি নিজের কাছে গভীরভাবে আশ্চর্য হয়ে ঠেকল। একটা মুক্তির আনন্দ পেলুম।

[৫০] অন্তর্নিহিত ভাবসত্যটি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও :

সেইদিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি—
এই নদী নক্ষত্রের তলে
সেদিনো দেখিবে স্বপ্ন—
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!
আমি চলে যাব বলে
চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে?
লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে?
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!

চারিদিকে শান্ত রাতি—ভিজে গন্ধ—মৃদু কলরব ;
খেয়ানৌকোগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে ;
পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল ;—
এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে।

[৫১] মূল বক্তব্য পরিস্ফুট কর :

জল পড়ে, পাতা নড়ে, এই নিয়ে পদ্য
লিখে ফেলে ভাবলাম হল অনবদ্য।

ছাদ ছিলো ফুটো তা তো পারিনিকো জানতে,
জেগে উঠে বসে আছি বিছানার প্রান্তে।

চোখে আর ঘুম নেই শুধু শুনি ভন্‌ভন্‌
মশা ওড়ে, আর চলে চিন্তার পল্টন।
গাছে-গাছে পাতা নড়ে চালে শুধু পাতা নেই,
কাঁকর-মেশানো চাল মেলে শুধু 'রেশনে'-ই।
ডিমডিম ঢেঁড়া শুনি, আসে দুর্ভিক্ষ,
এসে তবে বাকি ক'টা করে দূর দিক-গো।

জল পড়ে দুনিয়ার জ্বালা-করা চক্ষে,
পাতা নড়ে প্রলয়ের ঝড়ে কি অলক্ষ্যে !

[৫২] ভাবসত্য বিশদ কর :

[ক] প্রাত্যহিক মানুষ তার নানা জোড়া-তোড়া-লাগা আবরণে, নানা বিকারে কৃত্রিম। সে চিরকালের পরিপূর্ণতার আসন পেয়েছে সাহিত্যের তপোবনে—ধ্যানের সম্পদে।

[খ] তথ্য খণ্ডিত, স্বতন্ত্র—সত্যের মধ্যে সে আপন বৃহৎ ঐক্যকে প্রকাশ করে। আমি ব্যক্তিগত আমি এই তথ্যটুকুর মধ্যে—আমি মানুষ—এই সত্যটিকে যখন আমি প্রকাশ করি, তখন বিরাট একের আলোকে আমি নিত্যতায় উদ্ভাসিত হই। তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্চে প্রকাশ।

ব্যাকরণ-বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বাঙালী জনসমাজ যে-বিশেষ ধ্বনিসমষ্টির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করে, তাহাই বাংলা ভাষা। এই বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাসটি অতি-সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রতিটি যুগে ভাষার যেমন ক্রমবিকাশ দেখা যায়, তেমনি রহিয়াছে ইহার একটি আদিম উৎস—এই হিসাবে ভাষার সঙ্গে প্রবহমানা নদীর তুলনা করা যাইতে পারে। বাংলাভাষার মূল উৎস হইতেছে বৈদিক সংস্কৃত, যাহার প্রাচীনতম রূপ মুদ্রিত রহিয়াছে ঋগ্বেদ-সংহিতায়। এই ঋগ্বেদের ভাষাই বর্তমান ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক আর্যভাষাগুলির আদিজননী। বৈদিক সংস্কৃত আর্যজাতিরই ভাষা। আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষে দুইটি বড়ো অনার্যজাতির ভাষা প্রচলিত ছিল—দ্রাবিড় আর কোল।

ইতিহাসের সাক্ষ্যপ্রমাণ হইতে বুঝিতে পারা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব পনেরো শতকের পূর্বেই কোনো সময়ে পূর্ব-পারশ্যের [ঈরাণ] মধ্য দিয়া আর্যজাতি ভারতবর্ষে আগমন করে। ইহাদের একটি শাখা রহিয়া গেল ঈরাণে, আর ভারতে যাহারা প্রবেশ করিল তাহারাই ভারতীয় আর্য [Indo-Aryan]-নামে পরিচিত হইল। ভারতীয় আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্যের নাম বৈদিক সাহিত্য ও ভাষার নাম বৈদিক সংস্কৃত বা ছান্দস্। বৈদিক সংস্কৃতই বহুযুগের পরিবর্তনের মধ্য দিয়া কালক্রমে বাংলাভাষার বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে।

প্রাচীন আর্যজাতি বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন দলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। একই জাতির অন্তর্ভুক্ত হইলেও আর্যদের বিভিন্ন উপজাতি যে-কথ্যভাষা ব্যবহার করিত, তাহার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই সকল মৌখিক বা কথ্যভাষার উর্ধ্বে আর্যজাতির মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্য একটি সাহিত্যের ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং এই সাহিত্যিক ভাষাটিরই নিদর্শন আমরা পাইতেছি ঋগ্বেদ-সংহিতায়। ঋগ্বেদ দেবতাদের আরাধনাবিষয়ক স্তোত্রের একটি সংকলনগ্রন্থ—বিভিন্ন কবিদের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে এই স্তোত্র বা সূক্তগুলি রচিত হইয়াছিল। এই স্তোত্রগুলি একসময় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। পরে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতকে এইগুলি একখানি গ্রন্থে সংগৃহীত হয়, এবং ওই গ্রন্থেরই নাম ঋগ্বেদ। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ঋগ্বেদের ভাষা ভারতের আর্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। এই প্রাথমিক যুগের ভারতীয় অর্যভাষাটিকে বলা হয় প্রাচীন বা আদিভারতীয় আর্যভাষা—ইংরেজীতে Old Indo-Aryan। ব্রাহ্মণ, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থও এই ভাষাতেই রচিত।

ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পর আর্যরা উত্তর-পাঞ্জাবেই প্রথমে বসতি স্থাপন করে। তারপর ভারতের পূর্বদিকে আর্যজাতি ও তাহার ভাষার প্রসার ঘটিতে থাকে। আর্যভাষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দ্রাবিড় ও কোলভাষা দেশের অধিবাসীগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইতে লাগিল। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের মধ্যে আর্যভাষা পাঞ্জাব হইতে উত্তর-বিহার পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। ভারতবর্ষের একটা সুবিস্তৃত অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িবার ফলে এবং দেশের অনার্যভাষাগুলির প্রভাবহেতু, ভাষার পরিবর্তনধর্মের নিয়ম অনুসারে আর্যভাষা আর অবিকৃত রহিল না, ধীরে ধীরে রূপান্তর লাভ করিতেছিল। ইহারই ফলে আদিভারতীয় আর্য বা বৈদিক ভাষা রূপান্তরিত হইয়া একটা নূতন অবস্থায় পড়িল। তখন ইহার নাম হইল মধ্যভারতীয় আর্য বা প্রাকৃত ভাষা—ইংরেজীতে Middle Indo-Aryan। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম হইতে ষষ্ঠ শতকের দিকে—বুদ্ধদেবের সময়ের পূর্বে—প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক হইতে খ্রীষ্টীয় দশম শতক পর্যন্ত মধ্যকালীন ভারতীয় আর্যভাষার যুগ।

প্রদেশভেদে প্রাকৃত ভাষার মধ্যে নানারকমের রূপভেদ দেখা যায়। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের দিকে ভারতবর্ষে মুখ্যত তিনপ্রকারের প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল : [এক] উদীচ্য প্রাকৃত—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত আর পাঞ্জাবে প্রচলিত ; [দুই] মধ্যদেশীয় প্রাকৃত—কুরুপাঞ্চাল দেশে প্রচলিত ; [তিন] প্রাচ্য প্রাকৃত —কোশল, কাশী, মগধ, বিদেহ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত। প্রাচ্য অঞ্চলের প্রাকৃত ভাষার দুইটি বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায় ; একটির নাম পশ্চিমা প্রাচ্য, অপরটির নাম পূর্বী প্রাচ্য। মগধ-অঞ্চলে পূর্বী প্রাচ্য ভাষা বলা হইত বলিয়া ইহা মাগধী প্রাকৃত নামে পরিচিত। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকে, মৌর্যদের সময়ে, এই পূর্বী প্রাচ্য বাংলাদেশে প্রবেশ করিতে থাকে, আর খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যেই বাংলা দেশে ইহার ব্যাপক প্রসার ঘটে। সংস্কৃত নাটকে, বররুচির প্রাকৃত ব্যাকরণে মাগধী প্রাকৃতের নিদর্শন মিলে। তারপর প্রায় ছয়-সাত শ' বছর ধরিয়া ক্রমপরিবর্তনের ফলে মাগধী প্রাকৃত বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হয়। একহাজার খ্রীষ্টাব্দের দিকে মাগধী প্রাকৃত মাগধী অপভ্রংশ ভাষার ভিতর দিয়া একটা নূতন অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করার ফলেই বাংলাভাষার উদ্ভব। ভারতীয় আর্যভাষার এই আধুনিক যুগটিকেই বলা হয় নব্যভারতীয় আর্যযুগ বা New Indo-Aryan।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর দিকে মাগধী অপভ্রংশের রূপপরিবর্তনের ফলে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়। এই নবসৃষ্ট বাংলা ভাষাকে আবার তিনটি যুগবিভাগে বিভক্ত করা যায় : [এক] আদি বা প্রাচীন যুগ ; [দুই] মধ্যযুগ ; [তিন] নবীন বা আধুনিক যুগ। আদিযুগের [আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী] বাংলা ভাষার নিদর্শন মিলে 'বৌদ্ধ গান ও ও দোহা'-নামক গ্রন্থের

অন্তর্ভুক্ত চর্যাপদগুলিতে। এই যুগের অন্যকোনো সাহিত্যিক নিদর্শন আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বাংলা ভাষার মধ্যযুগের স্থায়িত্বকাল হইতেছে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এই যুগের ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নানা রকমের মঙ্গলকাব্য, গোপীচাঁদের গীতিকা, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ, বৈষ্ণবপদাবলী ও শাক্তপদাবলী, জীবনীসাহিত্য প্রভৃতি এই যুগেরই সৃষ্টি। পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদে অর্থাৎ বাংলা ভাষার মধ্যযুগে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে এদেশে একটা বিপুল সাহিত্য গড়িয়া উঠে—ইহার নাম বৈষ্ণব-সাহিত্য। আধুনিক যুগের [খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতক হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত] বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। বাংলা গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব ঘটে এই যুগেই। মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের ধারাপথটি অনুসরণ করা সহজ হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যশিল্পীর অনন্যসাধারণ প্রতিভা আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অসামান্য গৌরবমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

উপরে যে আলোচনা করা হইল তাহা হইতে বাংলা ভাষার যে-বংশপীঠিকা তৈরী করা যায়, তাহা এইরূপ : বৈদিক কথিত ভাষার বিভিন্ন রূপভেদ > প্রাচ্য অঞ্চলের কথিত ভাষা > কথিত মাগধী প্রাকৃত > মাগধী অপভ্রংশ > প্রাচীন বাংলা > মধ্যযুগের বাংলা > আধুনিক বাংলা। অর্থাৎ, মাগধী প্রাকৃত বাংলা ভাষার জননী এবং বৈদিক কথিত সংস্কৃত ইহার মাতামহীস্থানীয়া।

ভারতীয় আর্যভাষার বিভিন্ন যুগের ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য :

বৈদিক কথিত ভাষা বিভিন্ন যুগের ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়া বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে। এই বিভিন্ন যুগগুলির ভাষাগত বিশিষ্টতার সামান্য পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য বা বৈদিক ভাষার জটিলতা সহজেই লক্ষণীয়। বিচিত্র সংযুক্ত-ব্যঞ্জনধ্বনি ও স্বরধ্বনি ইহাকে বিশেষ গাম্ভীর্য দান করিয়াছে। জটিল শব্দরূপ ও ধাতুরূপ বৈদিক ভাষার একটা প্রধান বিশেষত্ব। এই ভাষার প্রচীনতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইল ঋগ্বেদ-সংহিতা। আদিভারতীয় আর্যভাষা যখন মধ্যভারতীয় আর্য-যুগে অর্থাৎ প্রাকৃত যুগে প্রবেশ করিল, তখন অনার্যপ্রভাবে ইহা আর অবিকৃত রহিল না, ধীরে ধীরে ইহার মধ্যে নানাপ্রকার পরিবর্তন দেখা দিল। বৈদিক সংস্কৃতের যুক্তব্যঞ্জনধ্বনি প্রাকৃত যুগে বহুল পরিমাণে সরল হইয়া আসে, বৈদিকের যুক্তব্যঞ্জন প্রাকৃতে দ্বিত্বব্যঞ্জনে পরিণত হয়। যেমন, ধর্ম > ধম্ম, কার্য > কজ্জ,

হস্ত>হত্থ, পুত্র>পুত্ত, ইত্যাদি। শব্দরূপ আর ধাতুরূপের জটিলতাও অনেকখানি কমিয়া আসিল। বৈদিকের কতকগুলি স্বরধ্বনি প্রাকৃত যুগে বিলুপ্ত হইল; যেমন, ঐ, ঔ, ঋ, ৯ প্রভৃতি স্বরের উচ্চারণ প্রাকৃতে দৃষ্ট হয় না। কতকগুলি বিশেষ শব্দপ্রয়োগের সহায়তায় এই যুগে বিভক্তির কাজ সম্পাদিত হইতে লাগিল; যেমন, কের, কর, ইত্যাদি।

অপভ্রংশ যুগে ভাষা আরো সরল হইয়া আসিল, ইহার মধ্যে দেখা দিল আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার নবজন্মের সম্ভাবনা। এই সময় কারক-বিভক্তির জটিলতা খুবই কমিয়া আসিল, শব্দের অন্ত্য দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বরে পরিণত হইল, এবং কারক-বিভক্তির কাজসম্পাদনের জন্য কতকগুলি অনুপদের [post-position] সহায়তা গ্রহণ করা হইল। মধ্যভারতীয় আর্যভাষা যখন নবীন ভারতীয় আর্যভাষার স্তরে উপনীত হইল, তখন উহা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করিল। এই যুগে প্রাকৃত বা অপভ্রংশের দ্বিত্ব-ব্যঞ্জন একটিমাত্র ব্যঞ্জনে পরিণত হইল, এবং এই ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হইয়া গেল। যেমন, সর্প>সপ্প>সাপ; হস্ত> হত্থ>হাত; মৃত্তিকা>মট্টিআ>মাটি; সন্ধ্যা>সঞ্ঝা>সাঁঝ; কার্য>কজ্জ>কাজ, ইত্যাদি। শব্দের নানারকমের ধ্বনি-পরিবর্তন, বিভক্তিসূচক শব্দের প্রয়োগ, যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার, নূতন শব্দের প্রয়োগে বহুবচনের পদগঠন, বিদেশী শব্দের বহুল আমদানী, ধাতুরূপাদির নূতন রূপ-গ্রহণ এই যুগের লক্ষণীয় বিশেষত্ব।

বাংলা ভাষার উপাদান বা শব্দভাণ্ডার

বাংলা ভাষার উপাদান বলিতে আমরা ইহার শব্দসম্ভারকেই বুঝিয়া থাকি। যে-সকল শব্দ লইয়া এই ভাষার সৃষ্টি, তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণী বা পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পাঁচ প্রকারের শব্দ লইয়া বাংলা ভাষা গঠিত হইয়াছে: তদ্ভব, তৎসম, অর্ধ-তৎসম, দেশী ও বিদেশী। নিম্নে ইহাদের স্বরূপপ্রকৃতির পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি।

[ক] **তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দ:** এই 'তদ্ভব' শব্দগুলিকে লইয়াই মুখ্যত বাংলা ভাষার সৃষ্টি—এইগুলিই বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দ বা খাঁটি উপাদান। অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্যজাতি যে-ভাষায় কথা বলিত, তাহার নাম বৈদিক সংস্কৃত। বিজয়ী আর্যের ভাষা বিজিত অনার্যজাতি কর্তৃক গৃহীত হইবার ফলে এবং ভাষার সাধারণ পরিবর্তনধর্ম-অনুসারে, বংশপরম্পরাক্রমে জনগণের মুখে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইতে থাকে। এই বিকৃত বা পরিবর্তিত বৈদিক সংস্কৃতেরই নাম হইল 'প্রাকৃত' অর্থাৎ দেশের সর্বসাধারণের ভাষা। এই প্রাকৃত ভাষাও আবার কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়া 'অপভ্রংশ'-এর রূপ গ্রহণ করিল, এবং অপভ্রংশের আরো বিকৃতির ফলেই বাংলা

ভাষার উদ্ভব। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে-সকল বৈদিক সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃত ও অপভ্রংশস্তরের মধ্য দিয়া ক্রমশ রূপান্তরিত হইয়া বাংলা শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়াছে, উহারাই বাংলা তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দ। 'তৎ' অর্থাৎ বৈদিক কথিত সংস্কৃত, তাহা হইতে 'ভব' অর্থাৎ উৎপত্তি যাহার, এই অর্থে 'তদ্ভব'। এই শ্রেণীর শব্দগুলি প্রাচীন আর্যভাষার নিকট হইতে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বলিয়া ইহাদিগকে প্রাকৃতজ শব্দও বলা হইয়া থাকে। যেমন, সংস্কৃত 'কৃষ্ণ' শব্দটি প্রাকৃতে 'কণ্‌হ'-রূপে পরিবর্তিত হইল ; তাহা হইতে আরো পরিবর্তনের ফলে বাংলা কান, কানু, কানাই [কান+আদরার্থে 'উ' কিংবা 'আই' প্রত্যয়যোগে কানু অথবা কানাই] শব্দের উদ্ভব। এইরূপে সংস্কৃত চন্দ্র>বাংলা চাঁদ। তদ্রূপ, হস্ত>হত্থ>হাত ; সন্ধ্যা> সঞ্‌ঝা>সাঁঝ ; মধ্য>মজ্‌ঝ>মাঝ ; সর্প>সপ্‌প>সাপ ; মৃত্তিকা>মট্টিআ>মাটি ; নৃত্য>নচ্‌চ>নাচ ; অস্মে>অম্‌হে>অম্‌হি>আমি; শৃণোতি>সুণদি, সুণই>শুনে ; অষ্টাদশ>অট্‌ঠারহ>আঠারো ; গ্রাম>গাঁব>গাঁও, গাঁ ইত্যাদি। এইগুলিই খাঁটি বা মৌলিক বাংলা শব্দ। প্রাকৃত হইতে যে-সকল 'দেশী' ও 'বিদেশী' শব্দ বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে, এক হিসাবে তাহাদিগকেও 'তদ্ভব' বা 'প্রাকৃতজ' বলিতে পারা যায়।

[খ] **তৎসম শব্দ :** বাংলা ভাষা তাহার উৎপত্তিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত আবশ্যকমতো যে-সকল শব্দ সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার হইতে গ্রহণ করিয়াছে, এবং উচ্চারণে যাহাদের কোনরূপ বিকৃতি ঘটে নাই—এইরূপ শব্দগুলিই 'তৎসম' নামে পরিচিত। 'তৎসম' অর্থে সংস্কৃতসম শব্দ। [**'সংস্কৃত'** আদি-আর্যভাষা বৈদিকেরই একটি অর্বাচীনতর রূপভেদ-মাত্র। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে সাহিত্যিক ভাষারূপে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঋগ্বেদের ভাষা যখন পুরাতন হইয়া আসিতেছিল, সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য হইয়া উঠিতেছিল, এবং লোকমুখে ইহার দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তখন ভাষার গতিরোধ করা অসম্ভব দেখিয়া সে-যুগের পণ্ডিতজন 'মৌখিক ভাষাকে ত্যাগ করিয়া প্রাচীন সাহিত্যের ভাষার চর্চায় ও তাহার রক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন, তাহার ব্যাকরণ লিখিলেন। এই শিষ্ট ও সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃত নামে খ্যাত হইল।' প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনি ইহাকে 'লৌকিক' নামে চিহ্নিত করিয়াছেন এবং পরে ইহা 'দেবভাষা' নামেও অভিহিত হইতে থাকে। সংস্কৃত ভাষা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষের মানসিক সংস্কৃতির বাহন হইয়া উঠে।]

আদি-আর্যভাষার যে-সকল শব্দ নানাযুগের রূপান্তরের মধ্য দিয়া বিকৃত অবস্থায় বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের অবিকৃত মূল রূপ মিলে সংস্কৃতে। সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডার বিপুল—যখনই প্রয়োজন বোধ করিয়াছে, বাংলা ভা[illegible] সংস্কৃত হইতে শব্দরাজি ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। তদ্ভব শব্দের সঙ্গে তৎসম শব্দের পার্থক্য এই যে,

তদ্ভব শব্দগুলি বৈদিক শব্দ হইতে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়া বিকৃত অবস্থায় বাংলায় আসিয়াছে। কিন্তু তৎসম শব্দগুলি বিভিন্ন যুগের রূপপরিবর্তনের ধারাপথে বাংলায় আসে নাই, লৌকিক সংস্কৃত ভাষা হইতে সরাসরি ইহারা বাংলা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। তৎসম শব্দ ভাষায় ঋণস্বরূপ গৃহীত, তদ্ভব শব্দগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত—উভয়ের উৎপত্তির ইতিহাস ভিন্নতর। কতকগুলি তৎসম শব্দের উদাহরণ: কৃষ্ণ, চন্দ্র, হস্ত, মস্তক, মৃত্তিকা, রাত্রি, সন্ধ্যা, মধ্য, ধর্ম, কর্ম, কার্য, বৃদ্ধ, বৃন্ত, বৃক্ষ, পিতা, মাতা, ইত্যাদি।

[গ] **অর্ধ-তৎসম শব্দ**: যে-সকল সংস্কৃত শব্দ ভাষায় ঋণস্বরূপ গৃহীত হইবার পর লোকমুখে উচ্চারণে বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মূল রূপ বিশুদ্ধ রাখিতে পারে নাই, এরূপ বিকৃত সংস্কৃত শব্দকেই বলা হয় অর্ধ-তৎসম। তৎসম শব্দের বিকারেই অর্ধ-তৎসম শব্দের সৃষ্টি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এইরূপ শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রাম্য উচ্চারণে এবং কবিতার ভাষায় অর্ধ-তৎসম শব্দের ব্যবহার খুব বেশী। উদাহরণ: সংস্কৃত 'কৃষ্ণ' শব্দটি বাংলায় তৎসম, ইহা হইতে প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়া রূপপরিবর্তনের ফলে আমরা পাইতেছি 'কান, কানু বা কানাই' শব্দ—বাংলা শব্দভাণ্ডারে যাহার নাম তদ্ভব বা প্রাকৃতজ। কিন্তু সংস্কৃত শব্দ 'কৃষ্ণ' বাংলায় গৃহীত হইবার পর লোকমুখে তাহার বিকৃতি ঘটিবার ফলে একটি নূতন রূপ দাঁড়াইয়াছে 'কেষ্ট'—এই শব্দটি বাংলায় অর্ধ-তৎসম। তদ্রূপ, সংস্কৃত 'গৃহিণী' হইতে তদ্ভব 'ঘরণী', কিন্তু অর্ধ-তৎসম হইল গিন্নি বা গিন্নী। এইভাবে নিমন্ত্রণ > নেমন্তন্ন; শ্রদ্ধা > ছেদ্দা; বৈষ্ণব > বোষ্টম; মিত্র > মিত্তির; চন্দ্র > চন্দর; মহোৎসব > মোচ্ছব; গ্রাম > গেরাম; প্রণাম > পেন্নাম, ইত্যাদি অর্ধ-তৎসম শব্দের উদ্ভব হইয়াছে।

[ঘ] **দেশী শব্দ**: বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের মূল প্রতিরূপ সংস্কৃতে মিলে না। এই জাতের শব্দগুলি দ্রাবিড় এবং কোলভাষা হইতেই বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে—ইহাদিগকেই বলা হয় 'দেশী' শব্দ। ভারতের সর্বত্র গৃহীত শিষ্টজনের ভাষায় এইসকল শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না—বাংলা দেশের প্রাচীন অধিবাসী দ্রাবিড় ও অষ্ট্রিক-জাতির ভাষার নিকট-সম্পর্কে আসার ফলেই এই অনার্য শব্দগুলি আর্যভাষা বাংলায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে। এইগুলি বাংলা ভাষার **মৌলিক** শব্দ নয়, ইহারা **আগন্তুক** শব্দ। **বিদেশী** শব্দগুলিও এই 'আগন্তুক' পর্যায়ে পড়ে। বাংলা ভাষায় যে-সব শব্দ ভারতীয় আর্যভাষা হইতে উদ্ভূত নয়, অনার্য কিংবা ভারতের বাহিরে প্রচলিত ইন্দোয়ুরোপীয় কিংবা সেমীয় ভাষা হইতে গৃহীত, সে-সকল শব্দই বাংলায় 'আগন্তুক' নামে অভিহিত। তদ্ভব, তৎসম এবং অর্ধ-তৎসম শব্দগুলিই বাংলা ভাষার যথার্থ মৌলিক উপাদান।

অবশ্য অনেকগুলি 'দেশী' শব্দ প্রাকৃতের মধ্য দিয়াই বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু ভাষার মূল বিচার করিয়া শব্দের শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে এই জাতীয় শব্দকে প্রাকৃতজ বা তদ্ভব না বলিয়া 'দেশী'ই বলিতে হইবে। কারণ, এগুলি মূলত আর্যশব্দ নয়। কিন্তু একজন ভাষাতাত্ত্বিক বলিতেছেন [অধ্যাপক সুকুমার সেন], যে-সব অনার্য শব্দ সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হইবার পর প্রাকৃত স্তরের ভিতর দিয়া বাংলায় আসিয়াছে, সেগুলিকে 'দেশী' না বলিয়া 'তদ্ভব' বা 'প্রাকৃতজ'-ই বলিতে হইবে। বাংলা ভাষার সৃষ্টির পর যে-সব আর্যশব্দ বাংলায় গৃহীত হইয়াছে, উক্ত ভাষাতাত্ত্বিকের মতে সেগুলিই যথার্থ 'দেশী'-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। কতকগুলি 'দেশী' শব্দের উদাহরণ : গাড়ী, ঘুড়ী, ঝাড়, ঝাউ, ঢিল, ঝাণ্ডা, ঝান্থ, ঝোপ, টোপর, ছাল, পেট, কামড়, ডাগর, ঢেউ, ডাব, ডিঙা, ঝাঁটা, ঝোল, ঝিঙা, ডাহা, ডাঁসা, কদলী, কলা, তামলী, ইত্যাদি।

[ঙ] **বিদেশী শব্দ :** বাংলা ভাষার উৎপত্তির পর নানা বিদেশী জাতির ভাষা হইতে যে-সকল শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে সেগুলিই বাংলার বিদেশী উপাদান। বহু প্রাচীনকাল হইতেই কয়েকটি বিদেশী শব্দ ভারতীয় আর্যভাষা সংস্কৃতে স্থানলাভ করিয়াছে, এবং ইহাদেরই কয়েকটি প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাংলায় আসিয়াছে। এইরকম শব্দগুলিকে, 'বিদেশী' হইলেও, 'আগন্তুক' আখ্যা না দিয়া 'প্রাকৃতজ' বা 'তদ্ভব' বলাই ভালো। যেমন গ্রীক 'দ্রাখ্‌মে' হইতে সংস্কৃতে 'দ্রম্য', তাহা হইতে প্রাকৃতে 'দম্ম', তাহা হইতে বাংলায় 'দাম'। প্রাচীন পারসীক 'মোচক'>প্রাকৃত মোচিঅ>বাংলা মুচি ; পহ্‌লবী 'পোস্ত' [লিখিবার চামড়া]>সংস্কৃত পুস্তিকা>প্রাকৃত পোথিআ>বাংলা পুঁথি, পুথি ; গ্রীক 'সুরিংকস্'>সংস্কৃত সুড়ঙ্গ>বাংলা সুড়ঙ্গ, সুড়ঙ্ ; গ্রীক 'গোনস্' [gonos]>সংস্কৃত কোণ>বাংলা কোণ ; গ্রীক্ 'কেন্ট্রণ্' [Kentron]>সংস্কৃত কেন্দ্র>বাংলা কেন্দ্র [তৎসম], ইত্যাদি।

মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর হইতেই বাংলা ভাষায় অধিক পরিমাণে বিদেশী শব্দের আমদানী হইতে থাকে। পাঁচ শ' বছরেরও অধিককাল ধরিয়া মুসলমানেরা এদেশ শাসন করে, এবং মুসলমান-আমলে ফার্সী রাজভাষা ছিল বলিয়া, বাংলা ভাষার উপর তাহার কম প্রভাব পড়ে নাই। বাংলা ভাষার প্রায় আড়াই হাজার শব্দ হইল ফার্সী। এই ফার্সীর মারফতে কয়েকটি আরবী এবং তুর্কী শব্দও ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে। বাংলায় কয়েকটি **ফার্সী** শব্দের নমুনা : আমীর, ওমরা, উজীর, মালিক, হুজুর, জখম, তাঁবু, তোপ, বন্দুক, খাজনা, দারোগা, দপ্তর, বীমা, হিসাব, গ্রেপ্তার, মোকদ্দমা, নালিশ, দরখাস্ত, দলিল, আল্লা, কবর, কাফের, নমাজ, মস্‌জিদ, মক্তব, গজল, সরম, ইজ্জৎ, আয়না, আতর, কাগজ, কুলুপ, কোর্মা, খাতা, চশমা,

চাবুক, ছবি, জামা, মলম, মিছরি, রুমাল, শরবৎ, লাগাম, শিশি, হালুয়া, হুঁকা, ইত্যাদি।

খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীতে পোর্তুগীসরা বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে আসে। ইহার ফলে প্রায় শতাধিক **পোর্তুগীস** শব্দ বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে। যেমন, আনারস, তামাক, চাবি, বাল্‌তী, ইস্ত্রী, কামরা, গুদাম, নীলাম, ক্রুশ, যীশু, পেয়ারা, পেঁপে, কপি, বোতল, বোতাম, ইত্যাদি। তাসখেলার বিষয়ে কয়েকটি শব্দ **ওলন্দাজ** ভাষা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। যেমন, হরতন, রুইতন, ইস্কাবন [কিন্তু 'চিরিতন' ভারতীয় শব্দ], তুরুপ। আর-একটি ওলন্দাজ শব্দ হইতেছে 'ইসক্রুপ'। কার্তুজ, কুপন, রেস্তোঁরা কথাগুলি **ফরাসী**। আঠারো শতকের মধ্যভাগ হইতে বাংলাদেশ ইংরেজজাতির বশ্যতা স্বীকার করিল। ফলে য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বাঙালীর উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। বাংলা ভাষার উপর ইংরেজীর প্রভাব কতখানি বিস্তৃত, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। এখানে সামান্য কয়েকটি **ইংরেজী** শব্দের নমুনা দিতেছি : আপিস, ইস্কুল, বেঞ্চি, ডাক্তার, লাট, পুলিশ, গেলাস, লণ্ঠন, গারদ, সান্ত্রী, কৌঁশলী, জঁাদরেল, লজঞ্জুস, বাক্‌স, ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন ইংরেজীর মধ্য দিয়া এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি নানা দেশের ভাষার কতকগুলি শব্দ বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে। ইহা ছাড়া, বাংলা ভাষায় আরো এক জাতের শব্দ আছে, যাহা '**মিশ্রশব্দ**' [Hybrids] নামে পরিচিত। সাধারণত বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দের সংযোগে অথবা একশ্রেণীর শব্দের সহিত অন্যশ্রেণীর প্রত্যয়াদির মিশ্রণে ইহাদের সৃষ্টি। যেমন,—রাজাউজীর, হাটবাজার, হেডপণ্ডিত, পুলিশসাহেব, বেটাইম, ডেপুটিগিরি, ইত্যাদি।

একহাজার বছরের অধিক কাল হইল প্রাকৃতের পরিবর্তনের ফলে বাংলা ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। তদ্ভব, তৎসম ও অর্ধতৎসম ইহার মৌলিক উপাদান। তদুপরি বাংলা ভাষা অনার্য কোল, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষা হইতে বিদেশী ফার্‌সী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজী হইতে অনেক শব্দ গ্রহণ করিয়াছে—এইগুলি তাহার আগন্তুক উপাদান। মৌলিক ও আগন্তুক শব্দের সমবায়ে বাংলা ভাষার ভাণ্ডার অনেকখানি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। এ ভাষার অবস্থা এখন বেশ বাড়বাড়ন্ত—বাঙালীর ভাষা তাহার যথার্থই গৌরবের বস্তু।

বাংলা উচ্চারণ ও ধ্বনিপরিবর্তনের কতকগুলি বিশিষ্ট রীতি :

[ক] স্বরসংগতি : Vowel Harmony

বাংলায়, বিশেষ করিয়া বাংলার মৌখিক বা চলিত ভাষায়, পূর্বের অথবা পরের স্বরধ্বনির প্রভাবে পদস্থিত অন্য অক্ষরের স্বরধ্বনির উচ্চারণস্থানের মধ্যে একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। বাংলা ভাষার উচ্চারণগত এই বৈশিষ্ট্যকেই বলা হয় 'স্বর-সংগতি'। এরূপ পরিবর্তনের মূল কথা হইল, পদস্থিত স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটা আকর্ষণের ভাব। এই আকর্ষণের ফলে শব্দের অভ্যন্তরস্থিত বিভিন্ন প্রকৃতির স্বরধ্বনিগুলি একটা সংগতি বা সামঞ্জস্যের সূত্রে গ্রথিত হয়। যেমন, 'দেশী' >'দিশি'—এই দৃষ্টান্তে দেখা যাইতেছে, পরবর্তী অক্ষরের ঈ-কারের প্রভাবে পূর্বাবস্থিত অক্ষরের এ-কার ই-কারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তদ্রূপ, বিলাতি> বিলেতি>বিলিতি ; উড়ানী>উড়ুনী ; ইচ্ছা>ইচ্ছে ; বিনা>বিনে>বিনি ; পূজা> পুজো ; মূলা>মূলো ; তিনটা>তিনটে ; শুনা>শোনা ; কুড়াল>কুড়ুল, ইত্যাদি।

কিন্তু এই স্বরধ্বনির পরিবর্তনবিষয়ে একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে। "যেখানে শব্দের আদিতে 'না'-অর্থে 'অ' বা 'অন্', এবং 'সহিত'-অর্থে অথবা 'সম্পূর্ণ'-অর্থে 'স' বা 'সম্' বসে, সেখানে অ-কার ও-কারে পরিবর্তিত হয় না", অর্থাৎ স্বরসংগতিজনিত ধ্বনির কোনো পরিবর্তন ঘটে না। যেমন, 'অতি'-র উচ্চারণ 'ওতি,' 'অমুক'-এর উচ্চারণ 'ওমুক', 'চলুন'-এর উচ্চারণ 'চোলুন' ; কিন্তু অধীর, অসুখ, অনিশ্চিত, অনিয়ম, সসীম, সবিনয় প্রভৃতি শব্দগুলি ওধীর, ওসুখ, ওনিশ্চিত, ওনিয়ম, সোসীম, সোবিনয়-রূপে উচ্চারিত হয় না। এই ধ্বনিপরিবর্তনের বিশিষ্টতার মূল কথা হইতেছে, 'উঁচু [স্বর] নীচুকে [নীচু স্বরকে] উঁচুতে টানে, নীচু উঁচুকে নীচে নামাইয়া লয়।' স্বরধ্বনির এরূপ আকর্ষণের প্রভাবেই শব্দগুলির রূপান্তর ঘটে। [বাংলা স্বরধ্বনিগুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়– উঁচু, মধ্য ও নীচু। ই এবং উ উচ্চস্বর ; এ, ও এবং অ মধ্যস্বর ; অ্যা এবং আ নিম্নস্বর]।

[খ] অপিনিহিতি : Epenthesis

শব্দের মধ্যস্থিত কিংবা অন্তস্থিত ই-কার অথবা উ-কার স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া কিংবা স্বস্থানে থাকিয়াও যদি অব্যবহিত পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের পূর্বে আসিয়া যায়, তবে তাহাকে 'অপিনিহিতি' বলে। বাংলা ভাষার উচ্চারণের একটি বিশিষ্টতা হইল শব্দের মধ্যস্থিত বা অন্তস্থিত ই-কার কিংবা উ-কারকে পূর্ব হইতেই উচ্চারণ করিয়া

কেলিবার প্রবণতা। যেমন, আজি>আইজ ; কালি>কাইল ; রাখিয়া>রাইখ্যা ; রাতি>রাইত ; করিয়া>কইর‍্যা ; সাথুআ>সাউথুআ>সাইথুআ>সেথো ; জলুয়া> জউলুয়া>জইলুয়া>জলো ; মাছুয়া>মাউছুয়া>মাইছুয়া>মেছো ; সত্য>সইত্ত ; কাব্য>কাইব্‌ব্, ইত্যাদি। শব্দের এই বিশিষ্ট উচ্চারণরীতিকে 'পূর্বাভাসাত্মক ধ্বনিবিপর্যয়' বলা যাইতে পারে—'the transference of a semi-vowel to the syllable preceding that in which it originally occurred—পূর্বস্থিত অক্ষরে অন্তঃস্থ-বর্ণের আনয়ন।' দেখা যাইতেছে, অপিনিহিতি শুধু ধ্বনি-বিপর্যয় নয়, আরো বেশী কিছু—পূর্বাভাসহেতুক আগমও ইহার মধ্যে রহিয়াছে। যেমন, মাছুয়া>মাউছুয়া ; এখানে ছু-এর 'উ' স্বস্থানে রহিয়া গেল, আবার 'ছ'-এর পূর্বেও পূর্বাভাসহেতুক উ-কারের আগম ঘটিল। তদ্রূপ, সাথুয়া>সাউথুয়া ; করিয়া> কইর‍্যা, প্রভৃতি। বর্তমানে কেবল পূর্ববঙ্গে এইরূপ উচ্চারণরীতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু একসময় পশ্চিমবঙ্গেও ইহা প্রচলিত ছিল। মনে রাখিতে হইবে, য-ফলার মধ্যে ই-ধ্বনি রহিয়াছে বলিয়াই সত্য, কাব্য প্রভৃতি শব্দ অপিনিহিতির ফলে 'সইত্ত্য', 'কাইব্‌ব্'-রূপে পরিবর্তিত হইয়াছে।

[গ] অভিশ্রুতি : Umlaut বা Vowel Mutation

অপিনিহিতিজাত ই-কার বা উ-কার পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া যখন তাহার রূপ পরিবর্তিত করিয়া দেয়, তাহাকেই 'অভিশ্রুতি' বলে। যেমন, করিয়া> কইর‍্যা>ক'রে>কোরে ; মাছুয়া>মাউছুয়া>মাইছুয়া>মেছো ; জলুয়া>জউলুআ> জইলুআ>জলো=জোলো ; মারিয়া>মেরে ; করিতে>কইরতে>কোর্‌তে। এইসব দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, অভিশ্রুতি অপিনিহিতির উপরই নির্ভরশীল—দ্বিতীয় প্রকারের স্বরধ্বনির পরিবর্তন অর্থাৎ অপিনিহিতি ভিন্ন প্রথম প্রকারের স্বরধ্বনির রূপান্তর অর্থাৎ অভিশ্রুতি সম্ভব নয়। উপরিলিখিত উদাহরণে রাখিয়া>রাইখিয়া> রাইখ্যা [অপিনিহিতি]>রেখে [অভিশ্রুতি]। এখানে আ+ই+আ-স্বরধ্বনির এ+এ-তে রূপান্তর সম্ভব হইয়াছে অপিনিহিত ই-এর প্রভাবে, এবং পূর্বস্থিত স্বরের এই নবরূপধারণকেই 'অভিশ্রুতি' বলা হইয়া থাকে। অপিনিহিতির প্রসারের ফলেই অভিশ্রুতির আত্মপ্রকাশ।

পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষায় এবং পশ্চিমবঙ্গের সুদূর প্রান্তের ভাষায় অভিশ্রুতিজনিত স্বরের পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না। পূর্ববঙ্গের ভাষায় অপিনিহিতির ই-স্বরধ্বনি এখনো উচ্চারিত হয়। 'বাংলা চলিত ভাষার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই অভিশ্রুতি। এই রীতি অনুসারে সৃষ্ট বহু শব্দ ও পদ চলিত ভাষা হইতে এখন অল্পে-অল্পে সাধুভাষাতেও গৃহীত হইতেছে। যথা—সাধুভাষার অনুমোদিত রূপ থাকিয়া, চাহিয়া, মাইয়া, ছাইলা ইত্যাদি স্থলে থেকে, চেয়ে, মেয়ে, ছেলে ইত্যাদি।'

[ঘ] অপশ্রুতি : Ablaut বা Vowel Alterance

শব্দের মধ্যে ধাতুর মূল স্বরধ্বনির যদি অপগমন অর্থাৎ বিকার ঘটে, তবে তাহাকে 'অপশ্রুতি' বলে। যেমন, 'চল্' ধাতু—চলে, ণিজন্ত 'চালে' [চালায়, চলায়] ; 'পড়' ধাতু পতনে—'পড়ে', কিন্তু ণিজন্ত 'পাড়ে'। এরূপ পরিবর্তন আত্মপ্রকাশ করে ধাতুর মূল স্বরকে অবলম্বন করিয়া। ধাতুর মূল স্বরধ্বনির অবস্থাগতিকে এই স্বত-পরিবর্তন-ধারাটি ভারতের আদিআর্যভাষা সংস্কৃত হইতে প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাংলায় আসিয়া গিয়াছে। সুতরাং অপশ্রুতির আদিম উৎস হইতেছে সংস্কৃতভাষায় ধাতুর স্বরের গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণাত্মক পরিবর্তন। নিম্নের একটি দৃষ্টান্ত হইতেই সংস্কৃতে গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রত্যয় ও ধাতুর স্বরধ্বনির পরিবর্তনটি সহজে বুঝা যাইবে। মূল ধাতু 'বদ্'>বদ্—যেমন, বদতি, বশংবদ [গুণ] ; বাদ্—যেমন, অনুবাদ [বৃদ্ধি]; উদ্—যেমন, অনুদিত [সম্প্রসারণ]। এই গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণের ব্যাপক নামকরণ হইয়াছে 'অপশ্রুতি'। বাংলার চল্>চাল ; পড়্>পাড় ; মরে>মারে ইত্যাদিতে স্বরবৈচিত্র্য অপশ্রুতিরই ফল। ধাতুর মূল স্বরধ্বনির এরূপ পরিবর্তন বাংলায় মিলে না—ইহার জন্য সংস্কৃতের দ্বারস্থ হইতে হইবে। যেমন, বাংলা 'চলে' কথাটি সংস্কৃত 'চলতি' কথারই পরিবর্তনে উদ্ভূত—চলতি>চলদি>চলই>চলে ; ঠিক তেমনি, 'চালে' কথাটি—সংস্কৃত চালয়তি>চালেতি>চালেদি>চালেই>চালে। 'চলে' এবং 'চালে', এই উভয় শব্দের মূল ধাতু হইতেছে 'চল্' ; কিন্তু অবস্থাগতিকে 'চল্' হইতে 'চলে' এবং 'চালে'র উৎপত্তি।

[ঙ] য়-শ্রুতি ও [অন্তঃস্থ] ব-শ্রুতিধ্বনি : Euphonic Glides

বাংলায় পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি স্বরধ্বনির দ্রুত উচ্চারণকালে উহাদের মধ্যে য়-ধ্বনি [y] অথবা ব-ধ্বনির [w=বাংলায় ওয়, ও] আগম হয়। জিহ্বা অসতর্ক-ভাবে এই যে দুইটি ধ্বনি উচ্চারণ করে উহারাই 'শ্রুতিধ্বনি' নামে পরিচিত। উচ্চারণের সুবিধা এবং শ্রুতিমাধুর্যের জন্যই এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনি-দুইটির আগম ঘটে। যেমন √যা+আ-প্রত্যয়যোগে যাআ>যাওয়া ; এখানে অন্তঃস্থ ব-শ্রুতি-ধ্বনির আগম ঘটিয়াছে। তদ্রূপ √খা+আ=খাআ>খাওয়া। বাংলায় ও-কার দ্বারা ব-শ্রুতিধ্বনি নির্দেশিত হইয়া থাকে। এইভাবেই কেতক>কেঅঅ>কেআ>কেয়া ; মোদক>মোঅঅ>মোআ>মোয়া ; কেঅড়া>কেওড়া ; ধোআ>ধোওয়া ; পিআনো [piano]>পিয়ানো ; নাহা>নাআ>নাওয়া। অনেক সময় য়-শ্রুতি এবং ব-শ্রুতির মধ্যে অদলবদলও দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, দেয়াল—দেওয়াল ; ছাআ—ছায়া, ছাওয়া, ইত্যাদি।

[চ] বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি : Anaptyxis বা Vowel Insertion

উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত-ব্যঞ্জনের ভিতরে স্বরধ্বনির আনয়ন ব্যাপারকে বলা হয় 'বিপ্রকর্ষ' বা 'স্বরভক্তি'। শব্দগুলিকে খুব সহজে উচ্চারণ করার দিকে বাংলা ভাষার একটা প্রবণতা সবিশেষ লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় বিপ্রকর্ষরীতির বহুল প্রচার দৃষ্ট হয়। প্রাকৃত যুগেও এই রীতিটি প্রচলিত ছিল। ছন্দের প্রয়োজনে ও শ্রুতিমধুরতার জন্য বাংলা কবিতার ভাষায় বিপ্রকর্ষ বা স্বর-ভক্তির প্রাচুর্য দেখা যায়—গ্রাম্য উচ্চারণেও এই রীতি বিশেষ প্রবল। বিপ্রকর্ষে নানাপ্রকার স্বরের আগম হয়। যেমন, কর্ম>করম ; মর্ম>মরম ; ধর্ম>ধরম ; জন্ম> জনম ; ভক্তি>ভকতি ; মুক্তি>মুকতি ; মূর্তি>মূরতি [অ-কারের আগম]। প্রীতি> পিরীতি ; মিত্র>মিত্তির ; শ্রী>ছিরি [ই-কারের আগম]। রাজপুত্র>রাজপুত্তুর ; শুক্রবার>শুকুরবার ; দুর্জন>দুরুজন [উ-কারের আগম]। গ্রাম>গেরাম ; শ্রাদ্ধ> ছেরাদ্দ [এ-কারের আগম]। শ্লোক>শোলোক [ও-কারের আগম]।

[ছ] বর্ণবিপর্যয় : Metathesis

শব্দস্থিত বর্ণের স্থানপরিবর্তনকেই বলা হয় বর্ণবিপর্যয়। যেমন, বাক্স>বাস্ক ; রিক্সা>রিস্কা ; নেত্র>নেত্ত>নেতা>তেনা [ছেঁড়া কাপড় অর্থে] ; হ্রদ>হদ>দহ ; লাফ>ফাল [পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত] ইত্যাদি।

[জ] বর্ণসমীকরণ বা সমীভবন : Assimilation

বিভিন্ন বর্গের ব্যঞ্জনধ্বনি পাশাপাশি অবস্থিত থাকিলে, উচ্চারণের সুবিধার জন্য ধ্বনি-দুইটিকে একই বর্গের ধ্বনিতে রূপান্তরিত করা হয় ; অর্থাৎ সংযুক্তব্যঞ্জন [conjunct consonant] দ্বিত্বব্যঞ্জনে [double consonant] পরিণত হইয়া সমতা প্রাপ্ত হয়—ইহারই নাম 'সমীকরণ' বা 'বর্ণসমীভবন'। যেমন, ধর্ম>ধম্ম ; কর্ম>কম্ম ; মূর্খ>মুখ্‌খু ; ধ'রতে>ধ'ত্তে ; কর্তা>কত্তা, ইত্যাদি। যেখানে পূর্বের ধ্বনি পরের ধ্বনিকে পরিবর্তিত করে তাহাকে বলে 'প্রগত' সমীভবন ; যেখানে পরের ধ্বনি পূর্বের ধ্বনিকে পরিবর্তিত করে তাহাকে বলে 'পরাগত' সমীভবন, আর যেখানে দুইটি ধ্বনিই পরস্পরের প্রভাবে পড়িয়া রূপান্তরিত হয়, তাহাকে বলে 'অন্যোন্য' সমীভবন।

[ঝ] শব্দস্থিত স্বরধ্বনিলোপ ও বর্ণবিলোপ

অনেক সময় দেখা যায়, শ্বাসাঘাতের অভাব ঘটিলে বা একই বর্ণের পাশাপাশি সমাবেশ ঘটিলে অক্ষরস্থিত স্বরধ্বনির কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণের বিলোপ ঘটে—ইহাকেই বলা

হয় বর্ণবিলোপ অথবা স্বরধ্বনিলোপ। যেমন, সংস্কৃত অলাবু>বাংলা লাউ ; অভ্যন্তর >ভিতর ; উদ্ধার>ধার ; এরণ্ড>রেড়ী ; অতসী>তিসি ; নাতিনী>নাত্‌নী ; নারিকেল>নারকেল ; বড়দাদা>বড়দা' ; ছোটদিদি>ছোড়দি' ; অতিথি>অতিথ্‌ ; ইত্যাদি। আদিস্বরধ্বনি, মধ্যস্বরধ্বনি ও দুইটি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে একটির লোপকে ইংরেজীতে যথাক্রমে বলা হয়—Aphesis, Syncope এবং Haplology।

[ঞ] স্বরাগম : Prothesis

উচ্চারণের সৌকর্যার্থে শব্দের আদিতে স্বরবর্ণের আগম ঘটিলে তাহাকে স্বরাগম বলা হয়। এই স্বরাগমের প্রভাবে কয়েকটি ইংরেজী শব্দ বাংলায় বিকৃত রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রাকৃত ভাষাতেও স্বরাগমরীতি মিলে, এবং বাংলার অঞ্চল বিশেষের ভাষায় মাঝে মাঝে ইহা পরিদৃষ্ট হয়। যেমন, স্কুল>ইস্কুল ; স্টীমার>ইস্টিমার ; স্টেশন>ইস্টিশন ; স্ত্রী>ইস্তিরি ; স্পর্ধা>আস্পদ্ধা, ইত্যাদি।

[ট] লোকব্যুৎপত্তিজাত শব্দ : Folk-etymology

ধ্বনির সমতাহেতু কোনো শব্দ বিকৃত হইয়া ভিন্নতর রূপ গ্রহণ করিলে তাহাকে 'লোকব্যুৎপত্তি' বলে। মূল শব্দের সঙ্গে সুস্পষ্ট পরিচয়ের অভাবেই লোকমুখে শব্দের এইরূপ বিকৃতি ঘটে। যেমন, ইংরেজী 'আর্ম চেয়ার' হইতে বাংলা 'আরাম চেয়ার' ; ইংরেজী 'হস্‌পিটাল' হইতে বাংলা 'হাসপাতাল', ইত্যাদি।

[ঠ] বিষমীভবন : Dissimilation

বিষমীভবন বর্ণসমীকরণেরই ঠিক বিপরীত ব্যাপার—ইহাতে শব্দস্থিত দুইটি সম-ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে একটির রূপান্তর ঘটে। যেমন, লাল>নাল ; লাঙ্গল>নাঙ্গল ; পোর্তুগীজ 'আর্মারিও'>বাংলা 'আলমারি', ইত্যাদি।

বাংলা সাধুভাষা ও চলিত ভাষার রূপ

বাংলা ভাষার অবস্থা আজ বেশ বাড়বাড়ন্ত, বাংলা সাহিত্য বর্তমান কালে বিশ্বের সাহিত্যদরবারে তাহার আসনটি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রায় এক সহস্র বৎসর হইল বাংলা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বাংলা গদ্যের উদ্ভব হয় উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। ইহার পূর্বে বাংলা গদ্যের প্রচলন যে ছিল না তাহা নয়। কিন্তু তাহার অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ ছিল দলিলদস্তাবেজে, চিঠিপত্রে, ব্যবহারিক

জীবনের ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমগ্র বাংলা সাহিত্য রচিত হইয়াছে পদ্যের ভাষায়—বাংলা গদ্যের আয়ুষ্কাল দেড়শত বছরের বেশী নয়। চার-পাঁচশত বৎসর পূর্বে বাংলা গদ্যের রূপ কী রকম ছিল, তদানীন্তন কালের কাব্যের ভাষা হইতে তাহার মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি উন্নত ভাষারই বিভিন্ন রূপপ্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষার সাহিত্যিক রূপ এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সামাজিক মানুষের কথোপকথনের রূপের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য বিদ্যমান। সাহিত্যিক ও মৌখিক-ভেদে বাংলা ভাষারও রূপ বিভিন্ন। যে-ভাষায় কথাবার্তা বলা হয় তাহার নাম মৌখিক বা কথ্যভাষা। ইহার অপর একটি নাম চলিত ভাষা। আর, যে-ভাষায় সাধারণত গদ্যসাহিত্য লিখিত হইয়া থাকে তাহা সাহিত্যিক ভাষা বা লৈখিক ভাষা—ইহা সাধুভাষা-নামেই সকলের কাছে পরিচিত।

বাংলা দেশের নানাঅঞ্চলভেদে মৌখিক বা কথ্যভাষার রূপ ভিন্নতর। ইহাদের মধ্যে ভাষার প্রকৃতিগত ঐক্য থাকিলেও শব্দের রূপগত পার্থক্য ও ধ্বনিগত বৈষম্য কম নয়। বাংলার দুইটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের [যেমন, একদিকে চট্টগ্রাম ও অন্যদিকে বাঁকুড়া-বীরভূম] অধিবাসীগণের কথাবার্তা তুলনা করিলেই এই বৈষম্য যে কতখানি তাহা সহজেই অনুভূত হইবে। লৈখিক ভাষার আকৃতি ও প্রকৃতি সর্বজনবোধ্য—বাংলা ভাষার মৌলিক সার্বজনীন রূপটিই লৈখিক বা সাধুভাষার ভিত্তি। কিন্তু অঞ্চলবিশেষে প্রচলিত ভাষাগুলির—যে-ভাষাকে উপভাষা [dialect] বলা হয়—রূপ ভিন্নতর বলিয়া উহারা সমগ্র বাঙালী-জনসাধারণের সহজবোধ্য নয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বাংলা সাহিত্যিক বা সাধুভাষার পাশাপাশি নানা অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষা বা উপভাষা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু এইগুলির মধ্যে কলিকাতা-অঞ্চলের, ভাগীরথীনদীর তীরবর্তী স্থানের, ভদ্রসমাজে ব্যবহৃত মৌখিক ভাষাই সমগ্র বঙ্গদেশের শিক্ষিত জনগণ কর্তৃক পারস্পরিক ভাববিনিময়ের ও কথোপ-কথনের প্রধান বাহনরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙালী এই ভাষাটির মাধ্যমে পরস্পরের সহিত কথাবার্তা বলিবার চেষ্টা করেন। এই বিশেষ মৌখিক ভাষাকেই বলা হয় চলিত ভাষা। বাংলা সাধুভাষাকে ইংরেজীতে আমরা বলি 'Standard Literary Bengali'; আর, এই চলিত ভাষাটিকে বলি 'Standard Colloquial Bengali'।

কলিকাতা-অঞ্চলের মৌখিক ভাষাটি, যাহাকে আমরা বিশেষভাবে 'চলিত ভাষা' নামে চিহ্নিত করিয়াছি, বর্তমান সময়ে বাংলা গদ্যসাহিত্যে সাধুভাষার পার্শ্বেই নিজের একটি বিশিষ্ট স্থান করিয়া লইয়াছে। শুধু তাহা নয়, অধুনা ইহা গদ্যসাহিত্যে বাংলা সাধুভাষার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের বহু খ্যাতনামা লেখক এই ভাষাতেই সাহিত্য সৃষ্টি

করিয়াছেন এবং করিতেছেন। 'অতএব, আজকালকার সাহিত্যে ব্যবহৃত বাংলা ভাষার দুইটি রূপ : [এক] সাধুভাষা—Standard Literary, এবং [দুই] চলিত ভাষা—Standard Colloquial। আধুনিক বাংলার মুদ্রিত পুস্তকপত্রিকাদি, গদ্য ও পদ্য পড়িয়া বুঝিতে হইলে এই দুইপ্রকার ভাষা সম্বন্ধেই জ্ঞান থাকা আবশ্যক।' সাধুভাষার যেমন নানা বিশিষ্ট নিয়মরীতি রহিয়াছে, তেমনি চলিত ভাষারও লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ও নিয়ম আছে।

কতকগুলি কারণে কোনো একটি বিশেষ অঞ্চলনিবদ্ধ মৌখিক ভাষা [অর্থাৎ উপভাষা বা dialect] সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হয়। 'বাংলা দেশের রাজধানী কলিকাতা সমগ্র বাঙালীজাতির প্রধান শিক্ষাক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্র হওয়ায়, এবং সাহিত্যিক, রাজনীতিক প্রভৃতি সকল বিষয়ের কেন্দ্র হওয়ায়, কলিকাতা-অঞ্চলে ব্যবহৃত মৌখিক ভাষা গত দেড়শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া বাংলা দেশের সকল শ্রেণীর অধিবাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। এতদ্ভিন্ন, বিগত তিন-চারিশত বৎসর ধরিয়া ভাগীরথীনদীর তীরে অবস্থিত নবদ্বীপও বাংলার আধ্যাত্মিক ও আধিমানসিক জীবনকে প্রভাবান্বিত করিয়া আসিয়াছে। সাহিত্যবিষয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতেই পশ্চিমবঙ্গের এই অঞ্চলের একটা প্রাধান্য সমগ্র বঙ্গদেশে স্বীকৃত। কলিকাতার মৌখিক ভাষা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং সমস্ত বিষয়ে এই প্রাধান্যের অধিকারী।' ঠিক এইভাবেই পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা সাহিত্যের ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাংলা সাধুভাষা প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন কথিত ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও বাংলার অপরাপর প্রাদেশিক ভাষার [অর্থাৎ উপভাষার] প্রভাবেও ইহা প্রভাবিত।

সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে যে-পার্থক্য সর্বাগ্রে চোখে পড়ে তাহা প্রধানত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রূপঘটিত। আধুনিক সাধুভাষায় যে-সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয় তাহা চলিত ভাষায় প্রযুক্ত রূপসমূহ হইতে পূর্ণতর, অর্থাৎ চলিত ভাষায় ঐগুলি কতক পরিমাণে সংকুচিত হইয়া আসিয়াছে। যেমন, সাধুভাষায় আমরা ব্যবহার করি—আসিতেছি, শুনিতেছি, করিলাম, চলিলাম ; চলিত ভাষায় এইগুলি কিছুটা সংকুচিত হইয়া—আসছি, শুনছি, করলাম, চললাম—ইত্যাদি রূপ গ্রহণ করিয়াছে। সর্বনামের ক্ষেত্রে সাধুভাষায় ব্যবহৃত হয় 'তাহারা', 'ইহাকে', 'ইহাতে' প্রভৃতি পদ—চলিত ভাষায় ইহাদের রূপ হইল 'তারা', 'একে', 'এতে' ইত্যাদি। আবার, ইহাও লক্ষণীয় যে, বর্তমানে সাধুভাষার উপর চলিত ভাষায় ব্যবহৃত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের প্রভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে। যেমন, 'হরি তো রামকে **চেনে না, সে-ও** একটা কথা বটে।' বিশুদ্ধ সাধুভাষায় 'চেনে না' ও 'সে-ও' পদের পরিবর্তে 'চিনে না', 'তাহা-ও' প্রযুক্ত হওয়া উচিত। সাধুভাষা অপেক্ষা চলিত ভাষাতেই

স্বরসংগতি ও অভিশ্রুতিজনিত স্বরধ্বনির পরিবর্তন বেশী দেখা যায়। তৎসম শব্দের প্রয়োগ সাধুভাষায় যত অধিক, চলিত ভাষায় তত নয়। চলিত ও সাধু, উভয় ভাষাতেই বিদেশী শব্দের ব্যবহার আছে। তবে চলিত ভাষায় ইহার প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অধিক। সাধুভাষাকে কিছুটা কৃত্রিম মনে হইলেও ইহার সুষমামণ্ডিত গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য অবশ্যস্বীকার্য। চলিত ভাষা অপেক্ষাকৃত জীবন্ত, ইহার গতি লঘু এবং প্রতিদিনের মৌখিক ভাষার সঙ্গে ইহার যোগাযোগ নিবিড়। উভয়েই নিজ নিজ বিশেষ নিয়ম মানিয়া চলে, সুতরাং রচনায় এই দুই ভাষার মিশ্রণ সর্বৈব বর্জনীয়। নিম্নে সাধুভাষা ও চলিত ভাষার দুইটি নমুনা উদ্ধার করিতেছি :

সাধুভাষা : 'সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকবে। চারিদিকে যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া—হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র, মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহু-যোজনবিস্তৃত পীতাম্বরী শাটী। তাহার উপর মাতার অলংকারস্বরূপ তালবৃক্ষশ্রেণী—সহস্র সহস্র, তারপর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ, সরল, সুপত্র, শোভাময়! মধ্যে নীলসলীলা বিরূপা, নীল-পীত-পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্রমধ্য দিয়া বহিতেছে—সুকোমল গালিচার উপর কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে। চারিপাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্তি।'

চলিত ভাষা : 'আমি একবার একটা ছাপার কল অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম। যন্ত্রটা একসঙ্গে অনেকগুলো মানুষের কাজ একা করছে, মানুষের চেয়ে সুচারু ও দ্রুতভাবে। এতে করে ভারি একটা আনন্দ হল। কিন্তু একটি পাখীকে উড়তে দেখে যে আনন্দ, তার সঙ্গে সেদিনের আনন্দের তফাৎ ছিল। পাখীর ডানার মধ্যে নানা কলবল কী ভাবে কাজ করছে তার খোঁজই নেই; ওড়ার সুন্দর ছন্দই সেখানে দেখা দিয়ে মনকে উড়িয়ে নিয়ে গেল কোন্ দেশে, তার ঠিক নেই।'

শব্দের অর্থমূলক শ্রেণীবিভাগ

কোনো ভাষার শব্দকে নানাদিক দিয়া বিচার করা যায়। ব্যুৎপত্তি অনুসারে শব্দের একরকম শ্রেণীবিভাগ, আবার অর্থের বিভিন্নতা অনুসারে আর-একরকম শ্রেণীবিভাগ। অর্থের দিক দিয়া বিচার করিলে বাংলা শব্দকে তিনটি শ্রেণীতে ফেলা যায় : [এক] যৌগিক শব্দ—Words of derivative sense, [দুই] রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ—Derived words of specialised sense, [তিন] যোগরূঢ় শব্দ—Compound words of specialised sense।

[ক] একাধিক মৌলিক শব্দের যোগে অথবা মূলশব্দ বা ধাতুর সহিত প্রত্যয়ের যোগে কতকগুলি শব্দের সৃষ্টি হয়। এইরূপ সমাসবদ্ধ বা সাধিত শব্দের অর্থ নির্ভর করে

তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান অর্থাৎ অংশের উপর—এই জাতীয় শব্দকেই **যৌগিক** শব্দ বলে। শব্দের যে-অর্থ হওয়া উচিত, যৌগিক শব্দ তাহাই প্রকাশ করে। যেমন, অণ্ডজ = অণ্ড—জন্ + ড [ডিম হইতে যে-জীবের উৎপত্তি]; 'অণ্ড' [ডিম] এই নামপ্রকৃতির, এবং 'জন্' এই ধাতুপ্রকৃতির সহিত 'ড'-প্রত্যয়যোগে যে-শব্দটি [অর্থাৎ 'অণ্ডজ'] গঠিত হইল, তাহা হইতে শব্দটির যে-অর্থ দ্যোতিত হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছে। যৌগিক শব্দগুলিতে শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অংশের অর্থযোগে সম্পূর্ণ শব্দের অর্থ উপলব্ধি হইয়া থাকে। কতকগুলি দৃষ্টান্ত : দা + তৃচ্ = দাতা [যিনি দান করেন]; রাজার পুত্র = রাজপুত্র [রাজার ছেলে]; পড় + উয়া = পড়ুয়া [অধ্যয়নশীল]; গা + ইয়া = গাইয়া > গাইয়ে [যে গান করে]; চালাক + ই = চালাকি [চালাকের ভাব], ইত্যাদি। [মূলশব্দ বা ধাতুকে 'প্রকৃতি' বলে]।

[খ] যে-সকল প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ তাহাদের উপাদানস্বরূপ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থ দ্যোতিত না করিয়া অন্যকিছু বিশেষ পদার্থ বা কার্যাদি বুঝাইয়া থাকে, তাহাদিগকেই **রূঢ়** বা **রূঢ়ি** শব্দ বলে। [মৌলিক শব্দ বা ধাতুর সাধারণ নাম 'প্রকৃতি']। যেমন, 'হস্তী' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয়গত অর্থ হইতেছে 'হস্ত আছে যাহার'; কিন্তু ইহার রূঢ়ি অর্থ হইল 'হাতী'। 'সন্দেশ' শব্দের মূল অর্থ হইল 'সংবাদ'; পরে পরে ইহার রূঢ়ি বা বিশেষ অর্থ দাঁড়াইল, 'তত্ত্ব' বা সংবাদ লইবার উপলক্ষে প্রেরিত 'মিষ্টান্ন'-বিশেষ। 'কুশল' শব্দের ধাতুপ্রত্যয়গত অর্থ হইল, 'যে কুশ তুলিতে পারে', কিন্তু প্রচলিত বিশেষ অর্থ হইল 'দক্ষ'। 'অন্ন' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'আহার্য', 'খাদ্যদ্রব্য'—বিশেষ অর্থ 'চাউলসিদ্ধ' বা 'ভাত'। 'দারুণ' শব্দের মূল অর্থ 'দারু বা কাষ্ঠনির্মিত', বর্তমানে ইহার প্রচলিত অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'কঠিন'। একটি বিশেষ অর্থদ্যোতক এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দই 'রূঢ়ি' নামে পরিচিত।

[গ] সমাসবদ্ধ অথবা একাধিক শব্দ বা ধাতুর দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দ যখন কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, তাহাদিগকে বলা হয় **যোগরূঢ়** শব্দ। ইহারা অপেক্ষিত অর্থ দ্যোতিত না করিয়া বিশেষ একটি অর্থ জ্ঞাপিত করে ['যেমন, সমগ্র জাতিকে না বুঝাইয়া, সেই জাতির অন্তর্গত কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায়']। দৃষ্টান্ত : 'সরোজ' [সরঃ—জন্ + ড], ইহার অপেক্ষিত অর্থ হইল 'সরোবরে জন্মায়' এমন পদার্থ; কিন্তু যোগরূঢ় অর্থ হইতেছে 'পদ্ম'; 'রাজপুত' শব্দের অপেক্ষিত অর্থ 'রাজার ছেলে', কিন্তু যোগরূঢ় অর্থ 'জাতিবিশেষ'; 'জলদ' [জল—দা + ক] শব্দের অপেক্ষিত অর্থ 'যে জলদান করে', কিন্তু বিশেষ অর্থ 'মেঘ'; তদ্রূপ 'দণ্ডবৎ'—মূল অর্থ 'দণ্ডের ন্যায়', বিশেষ অর্থ 'প্রণাম'; 'বৈবাহিক'—মূল অর্থ 'বিবাহের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত', কিন্তু বিশেষ অর্থ, 'পুত্র বা কন্যার শ্বশুর'।

শব্দের অর্থপরিবর্তন

কোনো ভাষার অন্তর্গত কতকগুলি শব্দের নানাভাবে অর্থপরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনধারাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়ঃ

[ক] **অর্থের সংকোচ**ঃ যখন কোনো শব্দ ইহার ব্যাপক অর্থটি দ্যোতিত না করিয়া সংকীর্ণ একটি অর্থ সংকেতিত করিতেছে তখন বুঝিতে হইবে, শব্দটির অর্থ-সংকোচ ঘটিয়াছে। যেমন, 'অন্ন' শব্দের মূল অর্থ 'আহার্য সামগ্রী', কিন্তু প্রচলিত অর্থ 'ভাত'; 'করী' শব্দের মূল অর্থ 'কর আছে যাহার', কিন্তু প্রচলিত অর্থ 'হাতী'; 'সম্বন্ধী'-র মূল অর্থ 'যাহার সহিত সম্বন্ধ আছে', কিন্তু প্রচলিত অর্থ 'শ্যালক'—এইসব দৃষ্টান্তে শব্দের অর্থসংকোচ ঘটিয়াছে।

[খ] **অর্থের বিস্তার বা প্রসার**ঃ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো একটি শব্দ প্রথমে একটি বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু পরে পরে তাহার একটি সাধারণ অর্থ দাঁড়াইয়া যাইবার দৃষ্টান্ত মিলে—বুঝিতে হইবে, সেখানে অর্থের প্রসার ঘটিয়াছে। যেমন, 'কালি' শব্দটির আদিম অর্থ 'কালো রঙ্', কিন্তু এখন কালি বলিতে যে-কোনো রঙের কালি বুঝায়—লাল কালি, নীল কালি, সবুজ কালি ইত্যাদি। 'তৈল' শব্দের আদিম অর্থ 'তিলের নির্যাস'; কিন্তু বর্তমানে 'তৈল' বলিতে আমরা শুধু তিল তৈল বুঝি না—নারিকেল তৈল, সরিষার তৈল ইত্যাদি নানাপ্রকার তৈলকেই বুঝি। 'গঙ্গা' শব্দ হইতে 'গাঙ্' কথার উৎপত্তি; কিন্তু 'গাঙ্' বলিতে এখন কেবল গঙ্গা-নদীকে বুঝায় না, যে-কোনো নদী অর্থে 'গাঙ' কথাটির প্রয়োগ হইয়া থাকে। এইসব ক্ষেত্রে শব্দের অর্থ বিস্তারলাভ করিয়াছে।

[গ] **নূতন অর্থের আগম**ঃ অনেক সময় দেখা যায়, শব্দের মূল অর্থ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে এবং একটি নূতন অর্থের আবির্ভাব ঘটিয়াছে—ইহাই নূতন অর্থের আগম। যেমন, সংস্কৃতে 'ঘর্ম' শব্দের মূল অর্থ ছিল 'গরম', কিন্তু বাংলায় ইহার অর্থ হইতেছে 'স্বেদ' বা 'ঘাম'। 'পাষণ্ড' শব্দের মৌলিক অর্থ 'ধর্মসম্প্রদায়', কিন্তু বাংলায় ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'ধর্মজ্ঞানহীন', 'অত্যাচারী', 'নিষ্ঠুরহৃদয়' ব্যক্তি; 'কৃপণ' কথাটির মূল অর্থ 'কৃপার পাত্র', কিন্তু বাংলায় 'ব্যয়কুণ্ঠ ব্যক্তি'; 'কেচ্ছা' [আরবী 'কিস্‌সা' শব্দ হইতে] শব্দের মৌলিক অর্থ 'কাহিনী' বা 'গল্প', বাংলায় ইহার অর্থ 'কুৎসা'।

[ঘ] **অর্থের উন্নতি**ঃ সাধারণ অর্থের পরিবর্তে কোনো শব্দ উচ্চ একটি ভাব দ্যোতিত করিলে বুঝিতে হইবে, সেই শব্দটির অর্থের উন্নতি ঘটিয়াছে। যেমন, 'সম্ভ্রম' শব্দের মৌলিক অর্থ 'ভয় করা', প্রচলিত অর্থ 'সম্মান'; 'মন্দির' শব্দের সাধারণ অর্থ 'গৃহ', কিন্তু প্রচলিত অর্থ 'দেবালয়'।

[ঙ] **অর্থের অবনতি :** অর্থাৎ, পূর্বে সাধারণ বা উচ্চভাবব্যঞ্জক ছিল, এখন অর্থের অবনতি ঘটিয়াছে। যেমন, 'ইতর' শব্দের মৌলিক অর্থ 'অন্যলোক', কিন্তু বর্তমানে চলিত অর্থ হইতেছে 'ছোটলোক' ; 'মহাজন' কথাটির মৌলিক অর্থ হইল 'মহান্ ব্যক্তি', কিন্তু বাংলায় ইহার প্রচলিত অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'যে টাকা ধার দেয়'। তদ্রূপ, 'ঠাকুর' [গুরুজন বা দেবতা] > 'ঠাকুর' পাচক-ব্রাহ্মণ ; 'দুহিতা' [মূল অর্থ 'কন্যা] > 'ঝি' = চাকরাণী।

শব্দার্থ : শব্দের অর্থদ্যোতনশক্তি

বাক্যে প্রযুক্ত অর্থযুক্ত শব্দগুলির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের অন্তর্নিহিত একটি ভাবগত অর্থ আমাদের মনে জাগিয়া উঠে। সংস্কৃত-আলংকারিকদের মতে এইসব সার্থক শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ তিনপ্রকার– **বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ** ও **ব্যঙ্গ্যার্থ**।

শব্দের সাধারণ অর্থকে **বাচ্যার্থ** বা **মুখ্যার্থ** বলে। ব্যাকরণ, অভিধান, আপ্ত বাক্য প্রভৃতি হইতে শব্দের যে মুখ্য অর্থের প্রতীতি জন্মে, তাহাই 'বাচ্যার্থ'। যেমন— মানুষ, জল, হাত, মাথা, ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করা মাত্রই ইহাদের সুবিদিত প্রচলিত অর্থবোধ হইয়া থাকে। যাহাদের ব্যাকরণজ্ঞান আছে তাহারা সহজেই বুঝিতে পারে, 'জল + ঈয়' প্রত্যয়যোগে 'জলীয়' শব্দটির উদ্ভব—সুতরাং ইহার অর্থ হইল 'জল-সম্বন্ধীয়'। অভিধানেও শব্দের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ লিপিবদ্ধ থাকে। শব্দের যে-শক্তির দ্বারা বাচ্যার্থের বোধ হয়, তাহাকে **অভিধা** বলে।

যেখানে বাক্যে প্রযুক্ত শব্দের মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থের পরিবর্তে তৎসংশ্লিষ্ট ভিন্নতর একটি অর্থ বক্তার বা লেখকের অভিপ্রেত হয় তাহাকেই শব্দের **লক্ষ্যার্থ** বলে। যেমন, 'গান্ধীজীর মৃত্যুতে সমস্ত ভারতবর্ষ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল'– এই বাক্যটিতে 'ভারতবর্ষ' বলিতে আমরা ভৌগোলিক ভারতভূমিকে [দেশকে] বুঝিতেছি না, বুঝিতেছি ভারতের অধিবাসীবৃন্দকে। এস্থলে 'ভারতবর্ষ' কথাটির এই যে বিশেষ অর্থ, ইহাই হইল লক্ষ্যার্থ। শব্দের যে-শক্তির দ্বারা লক্ষ্যার্থের বোধ হয় তাহার নাম **লক্ষণা**।

যেখানে বাক্যস্থিত শব্দের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থকে অতিক্রম করিয়া কোনো একটি গূঢ়তর অর্থের ইঙ্গিতময়তা [Suggestiveness] প্রকাশ পায়, তাহাকে **ব্যঙ্গ্যার্থ** বলে। যেমন, 'তুমি দেখছি একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠলে'—এই বাক্যে 'ডুমুরের ফুল' কথার অর্থ হইলে 'অদৃশ্য বস্তু'। এখানে 'ডুমুরের ফুল' কথাটির ব্যঙ্গ্যার্থটি গ্রহণ করিতে হইবে। তদ্রূপ, 'অরণ্যে রোদন', 'লোকটির খুব মাথা' 'কৃষ্ণপ্রাপ্তি' [মৃত্যু] প্রভৃতি কথা ব্যঙ্গ্যার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শব্দের যে-শক্তির দ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থের প্রতীতি জন্মে তাহাকে **ব্যঞ্জনা** বলে।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ

কতকগুলি অর্থহীন ধ্বনির সমবায়ে বাংলাভাষায় অসংখ্য অর্থপূর্ণ শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। বিশেষ রকমের ধ্বনিই এইসকল শব্দের প্রাণ বলিয়া, শব্দগুলিকে 'ধ্বন্যাত্মক' শব্দ বলা হইয়া থাকে। এইসকল শব্দের সাহায্যে বিচিত্র রকমের ভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করা যায়। বাংলা ভাষার বর্ণনশক্তি ইহাদের দ্বারা অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দের দৃষ্টান্ত : কন্‌কনে, কর্‌করে, খট্‌খটে, খিট্‌খিটে, কচ্‌মচ্, কল্‌কল্, কুচ্‌কুচ্, খল্‌খল্, খিল্‌খিল্, খুক্‌খুক্, কচ্‌কচ্, খ্যাঁচ্‌খ্যাঁচ্, কচাৎ কচাৎ, শোঁশোঁ, সাঁসাঁ, শন্‌শন্, বন্‌বন্, ঝির্‌ঝির্, দুরুদুরু, ধড়াস্‌ধড়াস্, পত্‌পত্, ছম্‌ছম্, তুল্‌তুলে, ঢল্‌ঢলে, ধব্‌ধবে, লিক্‌লিকে, ড্যাব্‌ডেবে, তড়াক্, ধক্, ফট্, চট্, টংটং, খ্যাঁক্, পট, ফোঁস্, তিড়িং, ঢক্, ভোঁস্, হুস্, ঘ্যাঁচ, টকাস্, ইত্যাদি। ধ্বনির অনুসরণেই প্রথমে এইসকল শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু এমন-সব ধ্বন্যাত্মক শব্দ পরে পরে সৃষ্ট হইয়াছে, ধ্বনির সহিত উহাদের দ্বারা দ্যোতিত ভাবের কোনো কোনো সম্পর্কই নাই। যেমন, খাঁখাঁ, ছম্‌ছম্, ধুধু ইত্যাদি।

শব্দদ্বৈত

বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম প্রভৃতি পদের দ্বিত্বরূপে অবস্থান বাংলা ভাষার একটি লক্ষণীয় বিশিষ্টতা—শব্দের এই দ্বিত্বরূপে অবস্থানকেই [reduplication of words] 'শব্দদ্বৈত' বলা হয়। বাংলা শব্দদ্বৈতের বিধিবিধান বিচিত্র। একই শব্দের পুনরাবৃত্তি, একটি শব্দের সঙ্গে সমার্থক বা অনুরূপ অর্থযুক্ত আর-একটি শব্দের সংযোগ, কিংবা অনুকার অথবা বিকারজাত শব্দযোগে শব্দদ্বৈত হইয়া থাকে। যেমন, তলে-তলে মানে-মানে, চোখে-চোখে, ভালোয়-ভালোয়, উপরে-উপরে; খাওয়াদাওয়া, কাপড়চোপড়, হাঁড়ি-কুঁড়ি; জল-টল, আঁট-সাঁট, অলি-গলি, বকা-ঝকা, ইত্যাদি। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে শব্দদ্বৈতের অর্থাৎ দ্বিরুক্ত শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। পৌনঃপুনিকতা বা পুনরাবৃত্তি বুঝাইতে : দিনে-দিনে, পাতায়-পাতায়, ঘরে-ঘরে, পথে-পথে, ইত্যাদি। সাদৃশ্য বা ঈষদ্ভাব বুঝাইতে : জ্বর-জ্বর, হাসি-হাসি, শীত-শীত, ইত্যাদি। ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় নাই বুঝাইতে : হেসে-হেসে, নেচে-নেচে, চলতে-চলতে, যেতে-যেতে, ইত্যাদি। অনুকার-বিকারময় শব্দদ্বৈতে মূল শব্দের স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন ঘটিতে দেখা যায়। যেমন, টুপুর-টাপুর, টুপ-টাপ, দুড়-দাড়্, জল-টল্, ঘোড়া-টোড়া, বইটই, ইত্যাদি।

যুগ্মশব্দ

বাংলা ভাষায় যুগ্মশব্দ বা জোড়াশব্দের বহুল প্রচলন দেখা যায়। এই যুগ্মশব্দ তিন প্রকারের : [১] সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক, [২] বিপরীতার্থক, এবং [৩] বিভিন্নার্থক।

[১] **সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক যুগ্মশব্দ :** হাসিখুসি, ভুলভ্রান্তি, আদরযত্ন, আলাপপরিচয়, চালাকচতুর, কাজকর্ম, আপদবিপদ, পাহাড়পর্বত, কূলকিনারা, সুখশান্তি, দয়াদাক্ষিণ্য, ছেলেছোক্‌রা, ঠাট্টাতামাসা, রীতিনীতি, ইত্যাদি।

[২] **বিপরীতার্থক যুগ্মশব্দ :** আকাশপাতাল, দোষগুণ, ভালোমন্দ, সুখ-দুঃখ, আগাগোড়া, মানঅপমান, ইতরভদ্র, পাপপুণ্য কেনাবেচা, মরণবাঁচন, দেনা-পাওনা, হাসিকান্না, ইত্যাদি।

[৩] **বিভিন্নার্থক যুগ্মশব্দ :** কালিকলম, টেবিলচেয়ার, ঘরদোর, আইন-আদালত, জামাকাপড়, অন্নবস্ত্র, ডালভাত, আয়নাচিরুণী, জলবায়ু, ইত্যাদি।

কৃৎপ্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়

ধাতুর সহিত যে-সকল প্রত্যয় যোগ করিয়া নূতন শব্দ গঠিত হয়, সেগুলিরই নাম 'কৃৎপ্রত্যয়'। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি 'কৃদন্ত' নামে পরিচিত। বাংলা ভাষার কৃৎপ্রত্যয়গুলি সাধারণত প্রাকৃতের প্রত্যয় বা শব্দ হইতে উদ্ভূত। তবে কয়েকটি খাঁটি সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়ও বাংলা ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া থাকে। কৃদন্ত শব্দগুলি বিশেষ্য কিংবা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

[ক] বাংলা কৃৎপ্রত্যয়-দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দ :

অ-প্রত্যয় [উচ্চারণে 'ও' কিংবা 'উ'-এর মতো শোনায়] ; যেমন, কাঁদ্+অ—কাঁদ্+অ=কাঁদ-কাঁদ, মর্+অ—মর্+অ=মর-মর, ডুব্+অ—ডুব্+অ=ডুব-ডুব, নিব্+অ—নিব্+অ=নিব-নিব, ইত্যাদি। আ—শুন্+আ=শুনা>শোনা, দেখ্+আ=দেখা, ধর্+আ=ধরা, লেখ্+আ=লেখা, ঝুল্+আ=ঝুলা>ঝোলা, ইত্যাদি। ই—চুষ্+ই=চুষি, ঝুল্+ই=ঝুলি, মার্+ই=মারি, ইত্যাদি। উ—ডুব+উ=ডুবু, চুম্+উ=চুমু, ঝুর্+উ=ঝুরু, ইত্যাদি। অন্—চল্+অন্=চলন্, বল্+অন্=বলন, বাজ্+অন্=বাজন্, মাজ+অন্=মাজন্, ভাঙ্+অন্=ভাঙন্, ঢাক্

+ অন্ = ঢাকন্, ইত্যাদি। **অন্ + আ = অনা (ওনা); অন্ + ই, ঈ = অনি, অনী :** বাজ্ + অন্ + আ = বাজনা, দে + অন্ + আ = দেনা, পা + অন্ + আ = পাওনা, ঢাক্ + অন্ + ই = ঢাকনি, ঝাড়্ + অন্ + ঈ = ঝাড়নী, ইত্যাদি। **আনি**— জ্বাল্ + আনি = জ্বালানি, ঝাঁক্ + আনি = ঝাঁকানি, শুন্ + আনি = শুনানী, ভাঙ্ + আনি = ভাঙানী, ভাঙানি, ইত্যাদি। **আন্**—চাল্ + আন্ = চালান্, মান্ + আন্ = মানান্, যোগ + আন্ = যোগান্। **আনো**—চাল্ + আনো = চালানো, জুত্ + আনো = জুতানো, জাগ্ + আনো = জাগানো, বেড়্ + আনো = বেড়ানো, ইত্যাদি। **উনি (নি, নী)**—কাঁদ + উনি = কাঁদুনী, কাঁদুনি ; বক্ + উনি = বকুনি, নাচ্ + উনি = নাচুনি, রাঁধ + উনি = রাঁধুনি, ইত্যাদি। **আই**—যাচ্ + আই = যাচাই, লড়্ + আই = লড়াই, বাছ্ + আই = বাছাই, খোদ্ + আই = খোদাই, ইত্যাদি। **আও**— চড়্ + আও = চড়াও, ঘের্ + আও = ঘেরাও, ইত্যাদি।

অন্ত—ঘুম্ + অন্ত = ঘুমন্ত, বাড়্ + অন্ত = বাড়ন্ত, ভাস্ + অন্ত = ভাসন্ত, ফুট্ + অন্ত = ফুটন্ত, ইত্যাদি। **তি**—উঠ্ + তি = উঠ্‌তি, পড় + তি = পড়তি, কম্ + তি = কমতি, ইত্যাদি। **না**—বাজ্ + না = বাজ্‌না, বাট্ + না = বাট্‌না, রাঁধ + না = রান্না ইত্যাদি। **উক**—পেট্ + উক = পেটুক, মিশ্ + উক = মিশুক, ইত্যাদি। **ইয়ে**— নাচ্ + ইয়ে = নাচিয়ে, গা + ইয়ে = গাইয়ে, লিখ্ + ইয়ে = লিখিয়ে, বল্ + ইয়ে = বলিয়ে, ইত্যাদি। **উয়া**—পড়্ + উয়া = পড়ুয়া, ধার্ + উয়া = ধারুয়া, ইত্যাদি। **আরু, আরী, উরী, ওয়াড়**—সাঁত্ + আরু = সাঁতারু, ধুন্ + আরী = ধুনারী > ধুনুরী, ডুব্ + উরী = ডুবুরী, খেল্ + ওয়াড় = খেলোয়াড়, ইত্যাদি।

[খ] সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়-দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দ :

ক্ত [ত]—গম্ + ক্ত = গত, নম্ + ক্ত = নত, সৃজ্ + ক্ত = সৃষ্ট, মৃ + ক্ত = মৃত, কৃ + ক্ত = কৃত, জ্ঞা + ক্ত = জ্ঞাত, ইত্যাদি। **ক্তি [তি]**—গম্ + ক্তি = গতি, দৃশ + ক্তি = দৃষ্টি, বচ্ + ক্তি = উক্তি, শ্রম্ + ক্তি = শ্রান্তি, খ্যা + ক্তি = খ্যাতি, ইত্যাদি। **তৃচ্**—কৃ + তৃচ্ = কর্তা, শ্রু + তৃচ্ = শ্রোতা, ক্রী + তৃচ্ = ক্রেতা, গ্রহ্ + তৃচ্ = গ্রহীতা, নী + তৃচ্ = নেতা, হন্ + তৃচ্ = হন্তা, ইত্যাদি। **অক**—গৈ + অক = গায়ক, নৈ + অক = নায়ক, স্মৃ + অক = স্মারক, শাস্ + অক = শাসক, পচ্ + অক = পাচক, ইত্যাদি। **ঘঞ্**—পচ্ + ঘঞ্ = পাক, ভুজ্ + ঘঞ্ = ভোগ, লভ্ + ঘঞ্ = লাভ, শুচ্ + ঘঞ্ = শোক, ভূ + ঘঞ্ = ভাব, আ-চর্ + ঘঞ্ = আচার, প্র-হৃ + ঘঞ্ = প্রহার, বি-সদ্ + ঘঞ্ = বিষাদ, ইত্যাদি। **অনট্**—শ্রু + অনট্ = শ্রবণ, পত্ + অনট্ = পতন, গৈ + অনট্ = গান, শী + অনট্ = শয়ন, ভুজ্ + অনট্ = ভোজন, দৃশ্ + অনট্

=দর্শন, গম্ + অনট্ = গমন, হৃ + অনট্ = হরণ, দা + অনট্ = দান, ইত্যাদি। **তব্য**—গম্ + তব্য = গন্তব্য, দৃশ্ + তব্য = দ্রষ্টব্য, কৃ + তব্য = কর্তব্য, বচ্ + তব্য = বক্তব্য, স্মৃ + তব্য = স্মর্তব্য, ইত্যাদি। **অনীয়**—দৃশ্ + অনীয় = দর্শনীয়, গ্রহ্ + অনীয় = গ্রহণীয়, গম্ + অনীয় = গমনীয়, বচ + অনীয় = বচনীয়, কৃ + অনীয় = করণীয়, ইত্যাদি। **ণক**—কৃ + ণক = কারক, দৃশ্ + ণক = দর্শক, হন্ + ণক = ঘাতক। **ণ্যৎ**—ত্যজ্ + ণ্যৎ = ত্যাজ্য, কৃ + ণ্যৎ = কার্য, বচ্ + ণ্যৎ = বাচ্য। **যৎ [য]**—গ্রহ + যৎ = গ্রাহ্য, দা + যৎ = দেয়, পা + যৎ = পেয়। **ইন্**—আ-গম্ + ইন্ = আগামী, অপ্-রাধ্ + ইন্ = অপরাধী। **ঘিনুণ**—ভুজ্ + ঘিনুণ্ = ভোগী, ত্যজ্ + ঘিনুণ = ত্যাগী, ইত্যাদি।

তদ্ধিতান্ত শব্দ

শব্দ বা নামপ্রকৃতির সহিত ভিন্ন ভিন্ন অর্থে কতকগুলি প্রত্যয় যোগ করিয়া নূতন শব্দ গঠিত হয়, তাহাদিগকে 'তদ্ধিত প্রত্যয়' বলে। তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন শব্দগুলি তদ্ধিতান্ত শব্দ নামে অভিহিত। কৃৎ প্রত্যয়ের ন্যায় তদ্ধিত প্রত্যয়ও দুই প্রকারের—**সংস্কৃত** ও **বাংলা**।

[ক] বাংলা তদ্ধিতান্ত শব্দ :

আ—জল + আ = জলা, লুন (লবণ) + আ = লোণা, বাঘ + আ = বাঘা, চীন + আ = চীনা, পশ্চিম + আ = পশ্চিমা। **আই**—চোর + আই = চোরাই, কান (কৃষ্ণ) + আই = কানাই, মিঠা + আই = মিঠাই, বড় + আই = বড়াই, পাটনা + আই = পাটনাই, ননদ + আই = ননদাই, মোগল + আই = মোগলাই। **আমি, আমো, মি**—ইতর + আমি = ইতরামি, বাঁদর + আমি = বাঁদরামি, দুষ্ট + আমি = দুষ্টামি, পাকা + আমো = পাকামো, বুড়া + মি = বুড়ামি, ছেলে + মি = ছেলেমি। **আর, আরী**—শাঁখ + আরী = শাঁখারী, ভিখ্ + আরী = ভিখারী, চাম + আর = চামার, জুয়া + আরী = জুয়ারী। **আরু, রু**—বোম + আরু = বোমারু, গো + রু = গোরু, শজা + রু = শজারু। **আলী, আলি**—ঠাকুর + আলি = ঠাকুরালি, মিতা + আলি = মিতালি, চতুর + আলি—চতুরালি, ঘটক + আলি = ঘটকালি, চৈত + আলি = চৈতালি, সোনা + আলি = সোনালি। **আল [আল্, আলো]**—ঝাঁঝ + আল = ঝাঁঝাল, ধার + আল = ধারাল, রস + আল = রসাল, দুধ + আল = দুধাল, জোর + আল = জোরাল। **ই, ঈ**—দাম + ঈ = দামী, দরদ + ঈ = দরদী, ভাব + ঈ = ভাবী, গোলাপ + ঈ = গোলাপী, রাখাল + ই = রাখালি, নবাব + ই = নবাবি, চাকর + ই = চাকরি, দোকান + ঈ =

দোকানী, ঢাক + ঈ = ঢাকী, শান্তিপুর + ঈ = শান্তিপুরী, দেশ + ঈ = দেশী, পশম + ঈ = পশমী, রেশম + ঈ = রেশমী। **ইয়া** [এ]—শহর + ইয়া = শহরিয়া > শহরে, জাল + ইয়া = জালিয়া > জেলে, মুট + ইয়া = মুটিয়া > মুটে, উত্তর + ইয়া = উত্তরিয়া > উত্তুরে, পাথর + ইয়া = পাথরিয়া > পাথুরে। **উয়া** [ও]—মাছ + উয়া = মাছুয়া > মেছো, জল + উয়া = জলুয়া > জলো, মাঠ + উয়া = মাঠুয়া > মেঠো, টাক + উয়া = টাকুয়া > টেকো। **উ, উক**—কান (কৃষ্ণ) + উ = কানু, ফুল + উ = ফুলু, দুষ্ট + উ = দুষ্টু, পেট + উক = পেটুক, লাজ + উক = লাজুক, মিথ্যা + উক = মিথ্যুক। **তা, তী**—নাম + তা = নামতা, রাঙ্ + তা = রাঙ্তা, চাক + তি = চাকতি। **ল, লা, লী**—হাত + ল = হাতল, আদ + ল = আদল, মেঘ + লা = মেঘলা, আধ + লা = আধলা। **ওয়ালা, ওয়ালী**—বাড়ীওয়ালা, বাড়ীওয়ালী, ফেরিওয়ালা, ফেরিওয়ালী, বাসনওয়ালা, বাসনওয়ালী, গাড়ীওয়ালা, কাপড়ওয়ালা। **অট** [**ট**], **অটা** [**টা**], **আটিয়া** [**আটে, টে**]—সাপ + অট = সাপট, দাপ + অট = দাপট, ঝাপ + অট = ঝাপট, জমা + ট = জমাট, ভরা + ট = ভরাট, চেপ + অটা = চেপটা, নেহ + টা = নেহটা, এক + টা = একটা, ভাড়া + আটিয়া = ভাড়াটিয়া, ঘোলা + টে = ঘোলাটে। **সই, পিছু**—মানানসই, চলনসই, মাথাপিছু, জনপিছু, টাকাপিছু।

[খ] বাংলায় ব্যবহৃত বিদেশী তদ্ধিত ঃ

আন, ওয়ান—দারোয়ান, গাড়োয়ান, কোচওয়ান, বাগান। **আনা, আনী**—বাবুয়ানা, হিঁদুয়ানা, মুন্সিয়ানা, হিঁদুয়ানী, বাবুয়ানী। **খানা, খোর**—ছাপাখানা, বৈঠকখানা, সুদখোর, মদখোর, ঘুষখোর। **গর, গিরি**—সওদাগর, কারিগর, বাবুগিরি, মুটেগিরি। **চা, চি, চী**—বাগিচা, নলিচা, ধুনাচি, ধামাচি, বেডাচি, খাজাঞ্চী, বাবুর্চী। **দান, দানী**—আতরদান, কলমদান, পিকদানী। **দার**—দোকানদার, বুটিদার, মজাদার, জোতদার, তালুকদার, অংশীদার, জমাদার, জমিদার, খবরদার। **বাজ**—ফন্দিবাজ, ধাপ্পাবাজ, মামলাবাজ। **সহি, সই**—মানানসহি, মানানসই, চলনসহি, চলনসই, টেঁকসই।

[গ] বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত তদ্ধিত ঃ

ষ্ণ—ভরত + ষ্ণ = ভারত, রঘু + ষ্ণ = রাঘব, পাণ্ডু + ষ্ণ = পাণ্ডব, পুত্র + ষ্ণ = পৌত্র, দুহিতা + ষ্ণ = দৌহিত্র, শিশু + ষ্ণ = শৈশব, বস্তু + ষ্ণ = বাস্তব, মনু + ষ্ণ = মানব, নিশা + ষ্ণ = নৈশ। **ষ্ণ্য**—দিতি + ষ্ণ্য = দৈত্য, অদিতি + ষ্ণ্য = আদিত্য, চণক + ষ্ণ্য = চাণক্য, গ্রাম + ষ্ণ্য = গ্রাম্য, সুন্দর + ষ্ণ্য = সৌন্দর্য, সুজন + ষ্ণ্য = সৌজন্য, সুহৃদ + ষ্ণ্য

= সৌহার্দ্য। **ষ্ণি**—রাবণ + ষ্ণি = রাবণি, দশরথ + ষ্ণি = দাশরথি, সুমিত্রা + ষ্ণি = সৌমিত্রি, অরুণ + ষ্ণি = আরুণি। **ষ্ণেয়**—গঙ্গা + ষ্ণেয় = গাঙ্গেয়, ভগিনী + ষ্ণেয় = ভাগিনেয়, বিমাতৃ + ষ্ণেয় = বৈমাত্রেয়, নিকষা + ষ্ণেয় = নৈকষেয়, কুন্তী + ষ্ণেয় = কৌন্তেয়। **ষ্ণিক [ইক]**—বেদ + ষ্ণিক = বৈদিক, নীতি + ষ্ণিক = নৈতিক, গিরি + ষ্ণিক = গৈরিক, বিষয় + ষ্ণিক = বৈষয়িক, ধর্ম + ষ্ণিক = ধার্মিক। **আলু**—নিদ্রালু, দয়ালু, তন্দ্রালু, ভাবালু। **ল**—শ্যামল, মাংসল, শ্রীল, বহুল, মঞ্জুল, বঞ্জুল, শীতল। **ইল**—ফেনিল, জটিল (জটা + ইল), পঙ্কিল, শঙ্কিল। **ইন্**—ধন্ + ইন্ = ধনী, সুখ + ইন্ = সুখী, মানী, জ্ঞানী ; কুল + ইন্ = কুলীন, বিশ্বজন + ঈন্ = বিশ্বজনীন, সর্বজন + ঈন্—সর্বজনীন। **বিন্**—যশস্ + বিন্ = যশস্বী, মেধা + বিন্ = মেধাবী, তেজস্ + বিন্ = তেজস্বী। **বতুপ**—জ্ঞান + বতুপ = জ্ঞানবান, গুণবান্, রূপবান, লক্ষ্মীবান্। **মতুপ**—শ্রীমান্, বুদ্ধিমান্, আয়ুষ্মান্ (আয়ুঃ + মতুপ)। **ময়ট্** [ময়]—জলময়, বাঙ্ময়, মৃন্ময়, মহিমময় (মহিমা + ময়ট্), স্বর্ণময়, হিরণ্ময়, চিন্ময়। **ইত**—পুষ্পিত, ফলিত, দুঃখিত। **তা**—সাধুতা, ক্ষুদ্রতা, নীচতা, মৌলিকতা, গভীরতা। **ত্ব**—মহত্ত্ব, প্রভুত্ব, দাসত্ব, লঘুত্ব, সাধুত্ব। **নীয় > ঈয়**—জাতি + ঈয় = জাতীয়, জলীয়, স্বর্গীয়, বঙ্গীয়। **ক**—মানব + ক = মানবক, পঞ্চ + ক = পঞ্চক, মশ + ক = মশক। **র**—মধুর, ঊষর, ধূসর, মেদুর। **চ্বি > ঈ**—বশ-চ্বি + ভূত = বশীভূত, ভস্মীভূত, নবীভূত, পুঞ্জীভূত। **তর**—গুরুতর, মহত্তর, বৃহত্তর, প্রিয়তর, দীর্ঘতর। **তম**—প্রিয়তম, দীর্ঘতম, মহত্তম, বৃহত্তম, শততম। **ইষ্ঠ**—গুরু + ইষ্ঠ = গরিষ্ঠ, শ্রেয়স্ + ইষ্ঠ = শ্রেষ্ঠ। **ঈয়সু**—গুরু + ঈয়সু = গরীয়ান্, মহৎ + ঈয়সু = মহীয়ান্। **ঈয়**—তৎ + ঈয় = তদীয়, অস্মৎ + ঈয় = অস্মদীয়, ভবৎ + ঈয় = ভবদীয়, যুষ্মৎ + ঈয় = ত্বদীয়।

ণত্ববিধি

[এক] **ঋ, র, ষ**-এর পরবর্তী দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন, তৃণ, মসৃণ, পূর্ণ, বর্ণ, তীক্ষ্ণ, ইত্যাদি।

[দুই] **ঋ, র, ষ**-এর পর যদি **স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য, ব, হ** অথবা **অনুস্বার** থাকে, তখনও দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হইবে। যেমন, পাষাণ, হরিণ, দর্পণ, প্রণালী, ব্রাহ্মণ, গৃহিণী, ইত্যাদি। কিন্তু পদের অন্তস্থিত দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হইবে না। যেমন মহাত্মন্, ব্রহ্মন্, ইত্যাদি।

[তিন] **ট-বর্গের পূর্বে** দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হইয়া যায়। যেমন, ভাণ্ডার, চণ্ডিকা, কণ্ঠ, বণ্টন, লুণ্ঠন, ইত্যাদি।

[চার] **অহন্** ও **অয়ন** শব্দের এবং **প্র, পরা, পরি, নির্** এই চারি

উপসর্গের পরবর্তী দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হইবে। যেমন, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, নারায়ণ, প্রণিপাত, প্রণাম, পরিণাম, ইত্যাদি।

ষত্ববিধি

[এক] **ঋ-কারের** পর 'ষ' হয়। যেমন, ঋষি, কৃষ্ণ, বৃষ, ইত্যাদি।

[দুই] **অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ** এবং ক ও **র-বর্গের পর** প্রত্যয়ের দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমন, শ্রীচরণকমলেষু, কল্যাণীয়েষু, দেবেষু, আকর্ষণ, ভীষণ, ভবিষ্যৎ, ইত্যাদি।

[তিন] **ই-কারান্ত, উ-কারান্ত উপসর্গের পরবর্তী** কতকগুলি **ধাতুর** দন্ত্য 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হয়। যেমন, নিষিক্ত, বিষাদ, বিষণ্ণ, অনুষ্ঠান, ইত্যাদি।

[চার] **সমাসযুক্ত** দুইটি পদ **এক-শব্দে** পরিণত হইলে এবং প্রথম পদের শেষে **ই**, উ, **ঋ** থাকিলে **পরবর্তী পদের আদিস্থিত দন্ত্য 'স'** মূর্ধন্য **'ষ'**-তে পরিণত হয়। যেমন, যুধিষ্ঠির, মাতৃষ্বসা, অগ্নিষ্টোম, সু + সমা = সুষমা, গো + স্থ = গোষ্ঠ, ইত্যাদি।

[পাঁচ] কতকগুলি শব্দে স্বভাবত মূর্ধন্য 'ষ'-এর প্রয়োগ হয়। যেমন, কৃষক, কর্ষণ, পোষণ, ভূষণ, আষাঢ়, পাষাণ, কষায়, ভাষা, দোষ, বিষয়, ইত্যাদি।

সন্ধিপ্রকরণ [স্বরসন্ধি]

[ক] **অ-কার** কিংবা **আ-কারের** পর **অ-কার** অথবা **আ-কার** থাকিলে উভয়ে মিলিয়া **আ-কার** হয়। নর + অধম = নরাধম, দেব + আলয় = দেবালয়, কুশ + আসন = কুশাসন, মহা + আশয় = মহাশয়।

[খ] **ই-কার** কিংবা **ঈ-কারের** পর **ই-কার** অথবা **ঈ-কার** থাকিলে উভয়ে মিলিয়া **ঈ-কার** হয়। যেমন, মুনি + ইন্দ্র = মুনীন্দ্র, ক্ষিতি + ঈশ = ক্ষিতীশ, শচী + ইন্দ্র = শচীন্দ্র, মহী + ঈশ = মহীশ।

[গ] **উ-কার** কিংবা **ঊ-কারের** পর **উ-কার** অথবা **ঊ-কার** থাকিলে উভয়ে মিলিয়া **ঊ-কার** হয়। যেমন, কটু + উক্তি = কটূক্তি, লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি, বধূ + উচিত = বধূচিত, ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব।

[ঘ] **অ-কার** কিংবা **আ-কারের** পর **ই-কার** কিংবা **ঈ-কার** থাকিলে উভয়ে মিলিয়া **এ-কার** হয়—এ-কার পূর্ববর্ণে মিলিয়া যায়। যেমন, দেব + ইন্দ্র = দেবেন্দ্র, দেব + ঈশ = দেবেশ, যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট, রমা + ঈশ = রমেশ।

[ঙ] **অ-কার** কিংবা **আ-কারের** পর **উ-কার** কিংবা **ঊ-কার** থাকিলে

উভয়ে মিলিয়া **ও-কার** হয়—ও-কার পূর্ববর্ণে মিলিয়া যায়। যেমন, হিত+উপদেশ =হিতোপদেশ, নব+ঊঢ়া=নবোঢ়া [নববিবাহিতা], মহা+উৎসব=মহোৎসব, গঙ্গা+ঊর্মি=গঙ্গোর্মি।

[চ] **অ-কার** কিংবা **আ-কারের** পর **ঋ-কার** থাকিলে উভয়ে মিলিয়া 'অর্' হয় ; অর্-এর অ-কার পূর্ববর্ণে মিলিত হয় এবং 'র্' রেফ্' হইয়া পরবর্ণের মস্তকে যায়। যেমন, দেব+ঋষি=দেবর্ষি, মহা+ঋষি=মহর্ষি। **কিন্তু মনে রাখিতে হইবে,** অ-কার কিংবা আ-কারের পরবর্তী **'ঋত'**-শব্দের **ঋ**-স্থানে 'আর্' হয়। যেমন, দুঃখ+ঋত [দুঃখের দ্বারা কাতর]=দুঃখার্ত, শীত+ঋত=শীতার্ত, ক্ষুধা+ঋত =ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণা+ঋত=তৃষ্ণার্ত।

[ছ] **অ-কার** কিংবা **আ-কারের** পর **এ-কার** অথবা **ঐ-কার** থাকিলে উভয়ে মিলিয়া **ঐ-কার** হয়—ঐ-কার পূর্ববর্ণে মিলিত হয়। যেমন, জন+এক=জনৈক, হিত+ঐষী=হিতৈষী, তথা+এব=তথৈব, মহা+ঐশ্বর্য=মহৈশ্বর্য।

[জ] **অ-কার** কিংবা **আ-কারের** পর **ও-কার** অথবা **ঔ-কার** থাকিলে উভয়ে মিলিয়া **ঔ-কার** হয়—ঔ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হইয়া যায়। দিব্য+ওষধি=দিব্যৌষধি, উত্তম+ঔষধি=উত্তমৌষধি, মহা+ওষধি=মহৌষধি, মহা+ঔষধ=মহৌষধ।

[ঝ] **ই-কার** কিংবা **ঈ-কারের** পর **ই** এবং **ঈ ভিন্ন** স্বরবর্ণ থাকিলে **ই-ঈ** স্থানে **'য্'** হয় ; **'য্'** য-ফলারূপে পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন, অতি+অন্ত=অত্যন্ত, অতি+আচার=অত্যাচার, আদি+অন্ত=আদ্যন্ত।

[ঞ] **উ-কার** কিংবা **ঊ-কারের** পর **উ** এবং **ঊ ভিন্ন** স্বরবর্ণ পরে থাকিলে **উ-কার** কিংবা **ঊ-কারের** স্থানে **'ব্'** হয় এবং **'ব্'** পূর্ববর্ণে মিলিত হইয়া যায়। যেমন, অনু+এষণ=অন্বেষণ, সু+অল্প=স্বল্প, সু+আগত=স্বাগত, অনু+ইত= অন্বিত, পশু+অধম=পশ্বধম।

[ট] **এ-কার** ও **ঐ-কারের** পর স্বরবর্ণ থাকিলে **এ-কারের** স্থানে 'অয়' হয় এবং **ঐ-কারের** স্থানে **'আয়'** হয়। যেমন, নে+অক=নায়ক, শে+অন= শয়ন ; গৈ+অক=গায়ক, নৈ+অক=নায়ক।

[ঠ] স্বরবর্ণ পরে থাকিলে **ও-কারের** স্থানে **'অব্'**, **ঔ-কারের** স্থানে **'আব্'** হয়। যেমন, ভো+অন=ভবন, গো+এষণা,=গবেষণা, পো+অন=পবন ; নৌ+ইক=নাবিক, পৌ+অক=পাবক।

[ড] **'ঋ' ভিন্ন** স্বরবর্ণ পরে থাকিলে 'ঋ' স্থানে 'র্' হয় এবং 'র্' পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়, পরের স্বর র্-কারের সহিত যুক্ত হয়। যেমন, পিতৃ+আলয়=পিত্রালয়, মাতৃ+ আলয়=মাত্রালয়।

[**দ্রষ্টব্য**] নিম্নলিখিত সন্ধিগুলি **নিপাতনে সিদ্ধ :**

কূল + অটা = কূলটা, গো + অক্ষ = গবাক্ষ, অক্ষ + উহিনী = অক্ষৌহিণী, বিম্ব + ওষ্ঠ = বিম্বোষ্ঠ, প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ়, সীমন্ + অন্ত = সীমন্ত, ইত্যাদি।

ব্যঞ্জন-সন্ধি

[ক] **চ** কিংবা **ছ** পরে থাকিলে **ত্** ও **দ্**-স্থানে **চ** হয়। যেমন, শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র, উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।

[খ] স্বরবর্ণের পর **ছ** থাকিলে **ছ**-স্থানে **চ্ছ** হয়। যেমন, বি + ছেদ = বিচ্ছেদ, তরু + ছায়া = তরুচ্ছায়া, পরি + ছদ = পরিচ্ছদ, অব + ছেদ = অবচ্ছেদ।

[গ] **জ** কিংবা **ঝ** পরে থাকিলে **ত** ও **দ**-স্থানে জ হয়। যেমন, যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন, জগৎ + জন = জগজ্জন, উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল।

[ঘ] **ল** পরে থাকিলে **ত** ও **দ**-স্থানে **ল** হয়। যেমন, উৎ + লেখ = উল্লেখ, বিদ্যুৎ + লেখা = বিদ্যুল্লেখা।

[ঙ] বর্গের **প্রথম বর্ণের** পরে যদি **স্বরবর্ণ** থাকে, তাহা হইলে **ক-চ-ট-ত-প**-স্থানে যথাক্রমে **গ-জ-ড-দ-ব** হয়। যেমন, বাক্ > ঈশ্বরী = বাগীশ্বরী, দিক্ + অন্ত = দিগন্ত, ণিচ্ + অন্ত = ণিজন্ত, বাক্ + আড়ম্বর = বাগাড়ম্বর, ষট্ + আনন = ষড়ানন, জগৎ + ঈশ = জগদীশ, জগৎ + ইন্দ্র = জগদীন্দ্র, সুপ + অন্ত = সুবন্ত।

[চ] বর্গের **তৃতীয়-চতুর্থ** বর্ণ এবং **য-র-ল-ব-হ** পরে থাকিলে বর্গের **প্রথম বর্ণের স্থানে সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ** হয়। যেমন, ষট + দর্শন = ষড়দর্শন, প্রাক্ + জ্যোতিষ = প্রাগ্‌জ্যোতিষ, অপ্ + জ = অব্জ [পদ্ম], জগৎ + বাসী = জগদ্বাসী।

[ছ] পদের অন্তস্থিত **ত্**-কার কিংবা **দ্-কারের** পর **হ** থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া **দ্ধ** হয়। যেমন, উৎ + হত = উদ্ধত, উৎ + হৃত = উদ্ধৃত, তৎ + হিত = তদ্ধিত, জগৎ + হিত = জগদ্ধিত।

[জ] যদি **ত-কার** অথবা **দ্-কারের** পর তালব্য **শ** থাকে, তাহা হইলে **ত** ও **দ্** স্থানে **চ** এবং তালব্য **শ**-স্থানে **ছ** হয়। যেমন, উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল, উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস, চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি।

[ঝ] **য-র-ল-ব-হ-শ-ষ-স-এর পূর্ববর্তী ম্ স্থানে অনুস্বার হয়।** যেমন, সম্ + বাদ = সংবাদ, সম্ + লগ্ন = সংলগ্ন, বশম্ + বদ = বশংবদ। কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। যেমন, 'রাজ' [রাট্] শব্দের 'র' পরে থাকিলে **ম** স্থানে অনুস্বার হয় না। যেমন, সম্ + রাজ্ [রাট্] = সম্রাজ [সম্রাট]।

[ঞ] **ন** কিম্বা **ম** পরে থাকিলে বর্গের **প্রথম বর্ণের** স্থানে সেই বর্গের **পঞ্চম বর্ণ** হয়। যেমন, জগৎ + নাথ = জগন্নাথ, বাক্ + ময় = বাঙ্ময়, চিৎ + ময় = চিন্ময়, মৃৎ + ময়ী = মৃন্ময়ী।

[ট] **স্পর্শবর্ণ** পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত **ম্**-স্থানে **অনুস্বার** হয়, অথবা **যে-বর্গের বর্ণ** পরে থাকে, **সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ** হয়। যেমন, সম্ + কলন = সংকলন অথবা সঙ্কলন, সম্ + গীত = সংগীত অথবা সঙ্গীত, সম্ + চয় = সংচয় অথবা সঞ্চয়, শাম্ + ত = শান্ত, গম্ + তব্য = গন্তব্য।

[ঠ] যদি বর্গের **তৃতীয়** অথবা **চতুর্থ** বর্ণের পরে বর্গের **প্রথম** অথবা **দ্বিতীয়** বর্ণ থাকে, কিংবা **শ, ষ, স** থাকে, তাহা হইলে **তৃতীয়** অথবা **চতুর্থ** বর্ণের স্থানে সেই বর্গের **প্রথম** বর্ণ হয়। যেমন, হৃদ্ + কমল = হৃৎকমল, ক্ষুধ্ + পীড়িত = ক্ষুৎপীড়িত।

[ড] **'উৎ'** উপসর্গের পর **'স্থা'** ধাতুর **স-কারের লোপ** হয়। যেমন, উৎ + স্থান = উত্থান, উৎ + স্থিত = উত্থিত।

[ঢ] **'সম্'** উপসর্গের পর 'কার', 'কৃত' শব্দ থাকিলে উক্ত উপসর্গের **ম্**-স্থানে অনুস্বার হয়, এবং এই অনুস্বারের পর একটি 'স'-এর আগম হয়। যেমন, সম্ + কৃত = সংস্কৃত, সম্ + কার = সংস্কার।

[ণ] **'পরি'** উপসর্গের পর 'কার', 'কৃত' প্রভৃতি শব্দ থাকিলে, একটি **স**-এর আগম হয়, এবং এই দন্ত্য **স** মূর্ধন্য **ষ**-তে পরিবর্তিত হইয়া যায়। যেমন, পরি + কার = পরিষ্কার। পরি + কৃত = পরিষ্কৃত।

[ত] **ষ**-এর পরবর্তী **ত** এবং **থ**-স্থানে যথাক্রমে **ট** এবং **ঠ** হয়। যেমন, কৃষ্ + তি = কৃষ্টি, ষষ্ + থ = ষষ্ঠ।

[থ] **উষ্মবর্ণ** পরে থাকিলে পদমধ্যস্থিত **ন্**-স্থানে অনুস্বার হয়। যেমন, সিন্ + হ = সিংহ, হিন্ + সা = হিংসা, দন্ + শন্ = দংশন, ইত্যাদি।

বিসর্গ-সন্ধি

[ক] **চ** অথবা **ছ** পরে থাকিলে **বিসর্গ**-স্থানে **শ** হয়, **ট** অথবা **ঠ** পরে থাকিলে **বিসর্গ-স্থানে ষ** হয়, এবং **ত** অথবা **থ** পরে থাকিলে **বিসর্গ**-স্থানে **স** হয়। যেমন, নিঃ + চয় = নিশ্চয়, নিঃ + চল = নিশ্চল, শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ ; ধনুঃ + টংকার = ধনুষ্টংকার, নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর ; ইতঃ + ততঃ = ইতস্ততঃ, মনঃ + তাপ = মনস্তাপ।

[খ] **স্বরবর্ণ**, বর্গের তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম বর্ণ অথবা য-র-ল-ব-হ পরে থাকিলে বিসর্গ-স্থানে **'র্'** হয়, এই র্ রেফ্ হইয়া পরবর্ণের মস্তকে যায়। যেমন, পুনঃ + জন্ম = পুনর্জন্ম, অন্তঃ + যামী = অন্তর্যামী, অন্তঃ + হিত = অন্তর্হিত।

[গ] **র** পরে থাকিলে **ই-কার ও উ-কারের** পরবর্তী **বিসর্গের লোপ হয়**

এবং উহার **পূর্বস্বর দীর্ঘ** হয়। যেমন, নিঃ+রোগ=নীরোগ, নিঃ+রস=নীরস, নিঃ+রব=নীরব।

[ঘ] **অ, আ ভিন্ন** স্বরবর্ণের পরবর্তী বিসর্গের পরে যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম বর্ণ এবং য-র-ল-ব-হ থাকে, তাহা হইলে **বিসর্গ**-স্থানে 'র্' হয়; র্ রেফ্ হইয়া পরবর্ণের মস্তকে যায়। যেমন, দুঃ+দম=দুর্দম, আশীঃ+বাদ= আশীর্বাদ, নিঃ+ঝর=নির্ঝর, মুহুঃ+মুহু=মুহুর্মুহু।

[ঙ] বর্গের তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম বর্ণ, অথবা য-র-ল-ব-হ পরে থাকিলে **অ-কারের পরস্থিত বিসর্গ** 'ও' হয় এবং ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন, মনঃ +যোগ=মনোযোগ, পুরঃ+হিত=পুরোহিত, সরঃ+বর=সরোবর, সদ্যঃ+জাত= সদ্যোজাত, তপঃ+বল=তপোবল, মনঃ+গত=মনোগত, মনঃ+জ=মনোজ, তপঃ +বন=তপোবন, মনঃ+রম=মনোরম, ইত্যাদি। **মনে রাখিতে হইবে** যে, বর্গের **প্রথম ও দ্বিতীয়** বর্ণ এবং **শ, ষ, স** পরে থাকিলে এই **নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে**। যেমন, মনঃ+কষ্ট=মনঃকষ্ট, পয়ঃ+প্রণালী=পয়ঃপ্রণালী, শিরঃ+পীড়া=শিরঃপীড়া, ইত্যাদি।

[চ] ক্, খ্, প্, ফ্ পরে থাকিলে অ-কার বা আ-কারের পরস্থিত **বিসর্গ**-স্থানে 'স্' হয়। যেমন, নমঃ+কার=নমস্কার, শ্রেয়ঃ+কর শ্রেয়স্কর, পুরঃ+কার =পুরস্কার, ভাঃ+কর=ভাস্কর, তিরঃ+কার=তিরস্কার। কিন্তু **মনে রাখিতে হইবে, অ, আ ভিন্ন** স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গ 'ষ' হয়। যেমন, নিঃ+ফল=নিষ্ফল, আবিঃ+কার=আবিষ্কার, বহিঃ+কার=বহিষ্কার, ভ্রাতুঃ+পুত্র=ভ্রাতুষ্পুত্র, ইত্যাদি।

[ছ] **অ-কারের** পরবর্তী **র-জাত** বিসর্গের পরে যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম বর্ণ, অথবা য-র-ল-ব-হ থাকে, তাহা হইলে উক্ত **বিসর্গ**-স্থানে 'র্' হয়। যেমন, প্রাতঃ+আশ=প্রাতরাশ, অন্তঃ+গত=অন্তর্গত, অহঃ+নিশা=অহর্নিশ, অহঃ+অহ=অহরহ। কিন্তু **'রাত্রি'** শব্দ পরে থাকিলে **'অহন্'** শব্দের র-জাত বিসর্গ-স্থানে 'র্' হয় না। সুতরাং **অহঃ+রাত্র=অহোরাত্র**।

[**দ্রষ্টব্য**] নিম্নলিখিত শব্দগুলি **নিপাতনে সিদ্ধ**:

তৎ+কর=তস্কর, আ+চর্য=আশ্চর্য, বৃহৎ+পতি=বৃহস্পতি, বন+পতি= বনস্পতি, গো+পদ=গোষ্পদ, ষট্+দশ=ষোড়শ, দিব্+লোক=দ্যুলোক, হরি+ চন্দ্র=হরিশ্চন্দ্র, ইত্যাদি।

সমাস

পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদ মিলিত হইয়া একপদে পরিণত হইলে তাহাকে **সমাস** বলে। যে-কয়টি পদ লইয়া সমাস করা হয়, তাহাদের নাম

সমস্যমান পদ, এবং সমাসবদ্ধ পদটিকে বলা হয় **সমস্ত-পদ**। যে-বাক্য সমস্যমান পদগুলির পরস্পর সম্পর্ক নিরূপণ করে, তাহার নাম **ব্যাসবাক্য**, **বিগ্রহবাক্য** বা **সমাসবাক্য**। সমাসবদ্ধ পদের প্রথমটির নাম **পূর্বপদ** এবং শেষেরটির নাম **উত্তর-পদ**। যেমন, 'শোকাকুল' একটি সমস্তপদ ; 'শোকের দ্বারা আকুল' হইতেছে ব্যাস, বিগ্রহ বা সমাসবাক্য ; 'শোক' ও 'আকুল' পদ দুইটি সমস্যমান পদ ; 'শোক' পূর্বপদ এবং 'আকুল' উত্তরপদ। সমাস সাধারণত ছয় প্রকারের : **দ্বন্দ্ব**, **দ্বিগু**, **কর্মধারয়**, **তৎপুরুষ**, **অব্যয়ীভাব** ও **বহুব্রীহি**।

[এক] **দ্বন্দ্ব সমাস** : যে সমাসে সমস্যমান পদের প্রত্যেকটির অর্থপ্রাধান্য থাকে এবং পূর্বপদ ও উত্তরপদ সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা যুক্ত থাকে, তাহার নাম দ্বন্দ্ব সমাস। যেমন, হাট ও বাজার = হাটবাজার ; রাধা ও শ্যাম = রাধাশ্যাম ; কৃষ্ণ ও অর্জুন = কৃষ্ণার্জুন। তদ্রূপ, দেবাসুর, শোকতাপ, হিতাহিত, হাটবাজার, বনজঙ্গল, গানবাজনা, ভূতপেত্নী, মুখচোখ, চালাকচতুর, দেনাপাওনা, সোনারূপা, কোলেপিঠে, দুধেভাতে, মায়েঝিয়ে, বাপবেটিতে, ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব সমাসকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—যেমন, সমাহার দ্বন্দ্ব, অলুক দ্বন্দ্ব, সমার্থক দ্বন্দ্ব। দুই বা ততোধিক পদের একসঙ্গে অবস্থান [সমাহার] বুঝাইলে সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস হয়। যেমন, অহি ও নকুল = অহিনকুল, ধনু ও শর = ধনুঃশর, ইত্যাদি। যে দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না, তাহাকেই বলে অলুক দ্বন্দ্ব। যেমন, মায়েঝিয়ে, বনেবাদাড়ে, বুকেপিঠে, ইত্যাদি। যে দ্বন্দ্ব সমাসে বিভিন্ন বস্তুর সংযোগ না বুঝাইয়া অনুরূপ বস্তুর সংযোগ বুঝায়, তাহারই নাম সমার্থক দ্বন্দ্ব। যেমন, কাগজপত্র, ভাগবাঁটোয়ারা, রাজরাজড়া, ইত্যাদি।

[দুই] **দ্বিগু সমাস** : যে সমাসে পূর্বপদটি সংখ্যাবাচক এবং পদটির দ্বারা সমাহার বা সমষ্টি বুঝায়, তাহাকে বলা হয় দ্বিগু সমাস। যেমন, পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবটী, শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী, পঞ্চ নদীর সমাহার = পঞ্চনদ, চারিটি রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা, তিন মাথার সমাহার = তেমাথা, পাঁচ সেরের সমাহার = পাঁচসেরা, সপ্ত অহন্-এর সমাহার = সপ্তাহ, তিনটি পায়ের সমাহার = তেপায়া। তদ্রূপ, ত্রিভুবন, সাতসমুদ্র, অষ্টপ্রহর, দশচক্র, নবরত্ন, অষ্টবজ্র, ত্রিপদী, ইত্যাদি।

[তিন] **কর্মধারয়** : যেখানে সাধারণত বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে সমাস হয় এবং যে-সমাসে বিশেষণ পদ বা উত্তর-পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, উহারই নাম কর্মধারয় সমাস। মনে রাখিতে হইবে, এই সমাস যে শুধু বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে হয় তাহা নহে—বিশেষণ-বিশেষ্য, বিশেষণ-বিশেষণ, বিশেষ্য-বিশেষ্য পদেও হয়। যেমন, মহান্ যে ঋষি = মহর্ষি, নীল যে উৎপল = নীলোৎপল, পূর্ণ যে চন্দ্র = পূর্ণচন্দ্র, রাজা অথচ ঋষি = রাজর্ষি, পুণ্য এমন অহন্ (দিন) = পুণ্যাহ, অগ্রে সুপ্ত পরে উত্থিত =

সুপ্তোত্থিত, পণ্ডিত হইয়াও মূর্খ=পণ্ডিতমূর্খ, বীর যে পুরুষ=বীরপুরুষ, দেব যিনি ঋষি তিনিই=দেবর্ষি, মহৎ যে জন=মহাজন, নতুন এমন বউ=নতুনবৌ, কাঁচা অথচ মিঠা=কাঁচামিঠা, আধ এমন পাকা=আধপাকা, মিঠা অথচ কড়া=মিঠাকড়া, ইত্যাদি।

কর্মধারয় সমাসকে নানা ভাগে ভাগ করা যায়—মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, রূপক কর্মধারয়, উপমান কর্মধারয় ও উপমিত কর্মধারয়।

যে কর্মধারয় সমাসের ব্যাসবাক্যে বিশ্লেষণমূলক মধ্যপদের লোপ হয়, তাহাকে বলে **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়**। যেমন, সিংহচিহ্নিত আসন=সিংহাসন, ভিক্ষালব্ধ অন্ন=ভিক্ষান্ন, বট নামক বৃক্ষ=বটবৃক্ষ, ফুল নির্মিত মালা=ফুলমালা, পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন=পলান্ন, ঘরে পালিত জামাই=ঘরজামাই, তেল মাখিবার ধুতি=তেলধুতি, হাতে পরিবার ঘড়ি=হাতঘড়ি, ইত্যাদি।

যে কর্মধারয় সমাসে উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে সাদৃশ্যবশত অভেদ কল্পনা থাকে, তাহাকে **রূপক কর্মধারয়** সমাস বলে। এই সমাসে উপমেয় পূর্বপদ ও উপমান উত্তরপদ হয়। ['উপমা' অলংকারে দুইটি বস্তুর মধ্যে তুলনা করা হয় ; যে বস্তুকে তুলনা করা হয় তাহার নাম **উপমেয়**, এবং যে-বস্তুর সহিত তুলনা করা হয়, তাহার নাম **উপমান**। যেমন, 'শোকাগ্নি'—এখানে শোক-কে অগ্নির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। 'শোক' কথাটি হইতেছে উপমেয়, আর 'অগ্নি' কথাটি হইতেছে উপমান।]

রূপক কর্মধারয় সমাসের দৃষ্টান্ত : শোকরূপ অনল=শোকানল, রোষরূপ বহ্নি=রোষবহ্নি, মুখরূপ চন্দ্র=মুখচন্দ্র, বিষাদরূপ সিন্ধু=বিষাদসিন্ধু, আঁখিরূপ পাখী=আঁখিপাখী, কীর্তিরূপ মেখলা=কীর্তিমেখলা, জ্ঞানরূপ আলোক—জ্ঞানালোক, মনরূপ মাঝি=মনমাঝি। তদ্রূপ, প্রেমডোর, কীর্তিধ্বজা, সুখসাগর, সভ্যতানাগিনী, চরণকমল, ইত্যাদি।

যে কর্মধারয় সমাসের পূর্বপদটি উপমান এবং সাধারণ ধর্মটি উত্তরপদ, উহাকেই বলে **উপমান কর্মধারয় সমাস**। যেমন, তুষারের মত শীতল=তুষারশীতল, সিঁদুরের মত রাঙা=সিঁদুররাঙা, কুসুমের মত পেলব=কুসুমপেলব, চন্দ্রের মত কান্ত=চন্দ্রকান্ত, ফুটির মত ফাটা=ফুটিফাটা, শৈলের মত উন্নত=শৈলোন্নত, বজ্রের মত কঠিন=বজ্রকঠিন, মিশির মত কাল=মিশকালো, ইত্যাদি।

যেখানে উপমান ও উপমেয়ের সমাস হয়, কিন্তু সাধারণ গুণবাচক শব্দের উল্লেখ থাকে না, সেখানে **উপমিত কর্মধারয় সমাস** হয়। এখানে উপমান উত্তর-পদ ও উপমেয় পূর্বপদ ; যেমন, পুরুষ সিংহের ন্যায়=পুরুষসিংহ, চরণ কমলের ন্যায়=চরণকমল, মুখ চন্দ্রের ন্যায়=মুখচন্দ্র, বাহু বল্লরীর ন্যায়=বাহুবল্লরী, ইত্যাদি।

দ্রষ্টব্য : **উপমান ও উপমিত কর্মধারয়** এবং **উপমিত ও রূপক কর্মধারয়** সমাসের পার্থক্যটি ভালো করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের যোগেই উপমান কর্মধারয় সমাস হইয়া থাকে, এবং ইহাতে সমস্ত-পদটি বিশেষণ। যেমন, কুসুমের [বিশেষ্য] মতো কোমল [বিশেষণ]=কুসুমকোমল। এখানে 'কুসুমকোমল' কথাটি বিশেষণ। উপমিত সমাস হয় দুইটি বিশেষ্য পদ লইয়া এবং ইহাতে সমস্ত-পদটি বিশেষ্য। যেমন, চরণ (বিশেষ্য) কমলের (বিশেষ্য) ন্যায় = 'চরণকমল'। এখানে 'চরণকমল' বিশেষ্য পদ। উপমিত কর্মধারয় সমাসে উপমেয়ের প্রাধান্য থাকে, কিন্তু রূপক কর্মধারয় সমাসে উপমানের প্রাধান্যই অধিক লক্ষিত হয়। তদুপরি উপমিত কর্মধারয়ে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে একটা স্পষ্ট ভেদের প্রতীতি বর্তমান থাকে, কিন্তু রূপক কর্মধারয়ে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে কোনোপ্রকার ভেদের প্রতীতি থাকে না।

[চার] **তৎপুরুষ সমাস :** যে সমাসে পূর্বপদের দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির লোপ হয় এবং উত্তরপদের অর্থই প্রাধান্য লাভ করে, তাহাকে **তৎপুরুষ সমাস** বলে। সমাসে সাধারণত পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হইয়া থাকে। পূর্বপদের যে বিভক্তির বিলোপ ঘটে তাহারই নামানুসারে 'তৎপুরুষ' সমাস নাম গ্রহণ করে। তৎপুরুষ সমাস ছয় প্রকার : দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ, চতুর্থী তৎপুরুষ, পঞ্চমী তৎপুরুষ, ষষ্ঠী তৎপুরুষ, সপ্তমী তৎপুরুষ।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ : দেবকে আশ্রিত = দেবাশ্রিত, দুঃখকে অতীত = দুঃখাতীত, ভাতকে রাঁধা = ভাতরাঁধা, গঙ্গাকে প্রাপ্ত = গঙ্গাপ্রাপ্ত, বিস্ময়কে আপন্ন = বিস্ময়াপন্ন, চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী = চিরসুখী [ব্যাপ্তার্থে দ্বিতীয়া], চিরকাল ধরিয়া শত্রু = চিরশত্রু। তদ্রূপ, কাপড়কাচা, জলতোলা, বাসনমাজা, রথদেখা, কলাবেচা, ইত্যাদি।

তৃতীয়া তৎপুরুষ : শোকদ্বারা আকুল = শোকাকুল, মেঘদ্বারা আবৃত = মেঘাবৃত, কণ্টক দ্বারা আকীর্ণ = কণ্টকাকীর্ণ, বিস্ময় দ্বারা বিহ্বল = বিস্ময়বিহ্বল, বাদুড়ের দ্বারা চোষা – বাদুড়চোষা, তেল দ্বারা চিটে = তেলচিটে, চেষ্টা দ্বারা লব্ধ = চেষ্টালব্ধ, বাক্ দ্বারা দত্তা = বাগদত্তা, শোক দ্বারা আর্ত = শোকার্ত, ইত্যাদি।

চতুর্থী তৎপুরুষ : ধর্মাচরণের নিমিত্ত পত্নী = ধর্মপত্নী [নিমিত্তার্থে চতুর্থী], বিয়ের জন্য পাগলা = বিয়েপাগলা, ডাকের জন্য মাশুল = ডাকমাশুল, মেয়েদের জন্য স্কুল = মেয়েস্কুল, চুষিবার জন্য কাঠি = চুষিকাঠি, চোষের জন্য কাগজ = চোষকাগজ, পাগলদের নিমিত্ত গারদ = পাগলাগারদ, ধানের জন্য জমি = ধানজমি, মালের জন্য গুদাম = মালগুদাম, ব্রাহ্মণকে দত্ত, = ব্রহ্মদত্ত, শিবকে প্রদত্ত মন্দির = শিবমন্দির, ইত্যাদি।

পঞ্চমী তৎপুরুষ : সিংহাসন হইতে চ্যুত=সিংহাসনচ্যুত, বিদেশ হইতে আগত=বিদেশাগত, শাপ হইতে মুক্ত=শাপমুক্ত, দুগ্ধ হইতে জাত=দুগ্ধজাত, সত্য হইতে ভ্রষ্ট=সত্যভ্রষ্ট, লোক হইতে ভয়=লোকভয়, দল হইতে ছাড়া=দলছাড়া, বোঁটা হইতে খসা=বোঁটাখসা, বিলাত হইতে ফেরত=বিলাতফেরত, জন্ম অবধি অন্ধ=জন্মান্ধ, পাঁচ হইতে সাত=পাঁচ-সাত, যুদ্ধ হইতে উত্তর=যুদ্ধোত্তর, ইত্যাদি।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ : বনের পতি=বনস্পতি, কবিদলের গুরু=কবিগুরু, রাজার পুত্র=রাজপুত্র, ছাগীর দুগ্ধ=ছাগদুগ্ধ, পাটের ক্ষেত=পাটক্ষেত, ঠাকুরের ঝি=ঠাকুর-ঝি, টেকের ঘড়ি=টেকঘড়ি, পথের রাজা=রাজপথ, হংসের রাজা=রাজহংস, জাহান (জগতের) পনা (আশ্রয়)=জাহাঁপনা, দরিয়ার মাঝ=মাঝদরিয়া, পথের মাঝ=মাঝপথ, ইত্যাদি।

সপ্তমী তৎপুরুষ : বৃক্ষে পক্ব=বৃক্ষপক্ব, বনে জাত=বনজাত, দুষ্ক্রিয়ায় আসক্ত=দুষ্ক্রিয়াসক্ত, গাছে পাকা=গাছপাকা, গায়ে হলুদ=গায়েহলুদ [অলুক], ছাঁচে ঢালা=ছাঁচেঢালা [অলুক], বাটায় ভরা=বাটাভরা, থালায় ভর্তি=থালা-ভর্তি, যুধি (যুদ্ধে) স্থির=যুধিষ্ঠির [অলুক]। যে তৎপুরুষ সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না তাহাকে **অলুক তৎপুরুষ** সমাস বলে। যেমন, ঘিয়ে ভাজা =ঘিয়েভাজা, ঘোড়ার ডিম=ঘোড়ার ডিম [ষষ্ঠী], ভ্রাতুঃ পুত্র=ভ্রাতুষ্পুত্র [ষষ্ঠী], বাচঃ পতি=বাচস্পতি [ষষ্ঠী], পরাৎ পর=পরাৎপর [পঞ্চমী], সারাৎ সার=সারাৎসার [পঞ্চমী]।

নঞ্ তৎপুরুষ সমাস : 'নঞ্' একটি সংস্কৃত অব্যয় ; ইহার অর্থ হইল 'না' বা 'নাই'। এই নঞ্-অর্থবোধক অব্যয়ের সহিত পরপদের যে সমাস হয়, তাহার নাম নঞ্ তৎপুরুষ সমাস। বাংলায় নঞ্-এর স্থানে না, অনা, অ, বে, গর্ হয়। যেমন, ন জানা=অজানা, ন অভ্যস্ত=অনভ্যস্ত, ন কেজো=অকেজো, ন অতিদীর্ঘ=নাতিদীর্ঘ, মিল নাই=অমিল কিংবা গরমিল, ন সরকারী=বেসরকারী, নাই খরচা=নিখরচা, মঞ্জুর নয়=না-মঞ্জুর ইত্যাদি।

উপপদ তৎপুরুষ : উপপদের (সংস্কৃত কৃৎ-প্রত্যয়যুক্ত পদের পূর্বে উপসর্গ বসে, এবং অন্য শব্দও বসে। উপসর্গ ভিন্ন শব্দকে উপপদ বলে।) সহিত কৃদন্ত পদের যে সমাস হয় তাহার নাম উপপদ তৎপুরুষ সমাস। আরো সহজ কথায়, বিশেষ্যের সহিত কৃদন্ত পদের সমাসই উপপদ তৎপুরুষ সমাস। যেমন, জল দান করে যে=জলদ, ব্রহ্ম জানে যে=ব্রহ্মজ্ঞ, পা দিয়া পান করে যে=পাদপ, ধনকে জয় করিয়াছে যে=ধনঞ্জয়, ছেলেক ভুলায় যাহা=ছেলেভুলান, হালুয়া করে যে=

হালুইকর, বাজি করে যে বাজিকর, ভূ-তে চরে যে=ভূচর, উভ-তে চরে যে=উভচর, ইত্যাদি।

প্রাদি তৎপুরুষ : 'প্র' প্রভৃতি উপসর্গ ও কৃদন্ত পদ এবং অব্যয় ও নামপদের যে সমাস, তাহার নাম প্রাদি তৎপুরুষ সমাস। যেমন, প্র (প্রকৃষ্ট) ভাত (জ্যোতিঃ) =প্রভাত, অভিগত মুখ=অভিমুখ, কু (কুৎসিত) পুরুষ=কাপুরুষ, মানবকে অতিক্রম করিয়া=অতিমানব, উৎগত বেলা=উদ্বেল, উৎক্রান্ত শৃঙ্খল=উচ্ছৃঙ্খল, উৎগত নিদ্রা=উন্নিদ্রা, ইন্দ্রিয়কে অতিক্রান্ত=অতীন্দ্রিয়, কেন্দ্রকে উৎক্রান্ত=উৎকেন্দ্র, ইত্যাদি।

[পাঁচ] অব্যয়ীভাব সমাস

যে সমাসে অব্যয়পদ পূর্বে থাকে এবং পূর্বপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহার নাম **অব্যয়ীভাব সমাস**। ইহাতে সমস্ত-পদটি অব্যয় হইয়া যায় এবং উহা ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন, কূলের সমীপে=উপকূল, কণ্ঠের সমীপে=উপকণ্ঠ (সামীপ্য অর্থে), বনের সদৃশ=উপবন, দ্বীপের সদৃশ=উপদ্বীপ (সাদৃশ্য অর্থে), ভিক্ষার অভাব=দুর্ভিক্ষ, ঝঞ্ঝাটের অভাব=নির্ঝঞ্ঝাট (অভাব অর্থে), শক্তিকে অতিক্রম না করিয়া=যথাশক্তি, সাধ্যকে অতিক্রম না করিয়া যথাসাধ্য (অতিক্রম অর্থে), দিনে দিনে=প্রতিদিন, ঘরে ঘরে=প্রতিঘর, (বীপ্সার্থে), পদ হইতে মস্তক পর্যন্ত=আপাদমস্তক, সমুদ্র হইতে হিমাচল পর্যন্ত=আসমুদ্রহিমাচল (পর্যন্ত অর্থে), গমনের পশ্চাৎ=অনুগমন, উত্তরের উত্তর=প্রত্যুত্তর, কথার সদৃশ=উপকথা, জীবন পর্যন্ত=আজীবন, কণ্ঠ পর্যন্ত=আকণ্ঠ, রূপের যোগ্য=অনুরূপ, অক্ষির সমীপে=প্রত্যক্ষ, ইত্যাদি।

[ছয়] বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে পূর্ব বা উত্তরপদের কোনো প্রাধান্য থাকে না, এবং সমাসনিষ্পন্ন পদটি (সমস্ত-পদটি) অন্য একটি পদের প্রাধান্য সূচিত করে, উহাকে **বহুব্রীহি সমাস** বলে। যেমন, শূল পাণিতে যাহার=শূলপাণি (মহাদেব), বজ্র পাণিতে যাহার=বজ্রপাণি (ইন্দ্র), পীত অম্বর যাহার=পীতাম্বর (কৃষ্ণ), অহংকার নাই যাহার=নিরহংকার, মৎস্যের ন্যায় গন্ধ যাহার=মৎস্যগন্ধা, উর্ণা নাভিতে যাহার=উর্ণনাভ, কেশে কেশে যুদ্ধ=কেশাকেশি, লাঠিতে লাঠিতে যুদ্ধ=লাঠালাঠি, কানে কানে যে কথা=কানাকানি, আটহাত পরিমাণ যার=আটহাতি, মৃগের মতন নয়ন যাহার=মৃগনয়না, গায়ে হলুদ হয় যে উৎসবে=গায়েহলুদ, হায়া (লজ্জা) নাই যাহার=বেহায়া, নাই তার যার=বেতার, চার হইয়াছে চির (খণ্ড) যাহার=চৌচির, ছা পোষে যে=ছাপোষা, সমান তীর্থ (গুরু) যাহার=সতীর্থ, পুণ্য

শ্লোক (কীর্তি) যাহার = পুণ্যশ্লোক, নাই পুত্র যাহার = অপুত্রক, চারু (মধুর) বাক্ যাহার = চার্বাক, আশীতে বিষ যাহার = আশীবিষ, নদী মাতা যাহার = নদীমাতৃক, আন (অন্য বিষয়ে) মন যাহার = আনমনা, সমান পতি যাহার = সপত্নী, ছন্ন মতি যাহার = মতিচ্ছন্ন, মহান আশয় যাহার = মহাশয়, তিন পায়া যাহার = তেপায়া, চারি রাস্তার মিলন যেখানে = চৌরাস্তা, চার চাল যার = চৌচালা, মা মরিয়াছে যাহার = মা-মরা, ভাত নাই যাহার = হাভাতে, বাজ পড়িয়াছে যাহাতে = বাজপড়া, প্রত্যাশা নাই যাহার = হাপিত্যেশ, ঘর নাই যাহার = হাঘরে, নিমক খাইয়া হারামি করে যে = নিমকহারাম, বদ্ (খারাপ) মাশ (জীবিকা) যাহার = বদমাশ, ইত্যাদি।

বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদ লক্ষণীয় : সমানাধিকরণ, ব্যধিকরণ, ব্যতিহার, উপমানগর্ভ, মধ্যপদলোপী, নিষেধার্থক, সহার্থক ও অলুক। 'সমান' (অর্থাৎ প্রথমা) বিভক্তিযুক্ত দুইটি বিশেষ্য অথবা একটি বিশেষণ ও একটি বিশেষ্য মিলিয়া যে সমাস হয় তাহার নাম **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি**।' যেমন, তপঃ ধন যাহার = তপোধন, পুণ্য আত্মা যাহার = পুণ্যাত্মা। যাহাদের বিভক্তি সমান নহে (অর্থাৎ একটিতে প্রথমা, অপরটিতে প্রায়ই সপ্তমী), এমন দুইটি বিশেষ্য পদে যে-বহুব্রীহি সমাস হয়, তাহার নাম **ব্যধিকরণ বহুব্রীহি**। যেমন, ঘরে মুখ যাহার = ঘরমুখো, পাপে মতি যাহার = পাপমতি। 'যে বহুব্রীহি সমাসে দুইটি একরূপ বিশেষ্য পদ থাকিয়া পরস্পরের কোনো কাজ করা বুঝায়, তাহার নাম **ব্যতিহার বহুব্রীহি**।' যেমন, কানে কানে যে কথা = কানাকানি, কেশে কেশে ধরিয়া যে যুদ্ধ = কেশাকেশি।

'যে বহুব্রীহি সমাসে একটি উপমান পদ থাকিয়া তুলনা বুঝায়, তাহার নাম **উপমানগর্ভ বহুব্রীহি**। যেমন, চাঁদের মত মুখ যাহার = চাঁদমুখ, কমলের ন্যায় অক্ষি (চোখ) যাহার = কমলাক্ষ। যে বহুব্রীহি সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত একটি বিশিষ্ট শব্দ লোপ পায়, তাহার নাম **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি**। যেমন, দুই মণ ওজন যাহার = দুমণি (বস্তা), পাঁচ গজ পরিমাণ যাহার = পাঁচগজী (কাপড়)। যে বহুব্রীহি সমাসের পূর্বে একটি নিষেধবাচক পদ থাকে, তাহার নাম **নিষেধার্থক বহুব্রীহি**। যেমন, নাই বোধ যাহার = অবোধ, নাই পার যাহার = অপার, নাই বুঝ যাহার = অবুঝ। যে-বহুব্রীহি-সমাসে সহিত অর্থে 'স' প্রভৃতি শব্দ পূর্বে থাকে, তাহার নাম **সহার্থক** বহুব্রীহি। যেমন, জলের সহিত = সজল, বিনয়ের সহিত = সবিনয়, আদরের সহিত = সাদর। যে-বহুব্রীহি সমাসে বিভক্তি লোপ হয় না, তাহার নাম **অলুক বহুব্রীহি**।' যেমন, হাতে খড়ি যে অনুষ্ঠানে = হাতেখড়ি। তদ্রূপ, মুখে-ভাত, গায়ে-হলুদ, কোঁচা-হাতে ইত্যাদি।

নিত্য সমাস : যে সমাসের পূর্বপদ ও উত্তরপদ নিত্য সমাসবদ্ধভাবে থাকে এবং ব্যাসবাক্যস্থলে কেবল অর্থমাত্র প্রকাশ করা হয়, তাহার নাম নিত্যসমাস। এক

প্রকারের নিত্য সমাস আছে যাহার ব্যাসবাক্য হয় না। যেমন, 'কৃষ্ণসর্প' অর্থে কৃষ্ণবর্ণের সর্প নয়, যে সর্পের দংশন মারাত্মক, উহাদিগকে বুঝায়। আর-এক প্রকার নিত্য সমাসে সমস্যমান পদগুলির অর্থবাচক শব্দ দ্বারাই অর্থ প্রকাশ করা হয়। যেমন, অন্য গ্রাম—গ্রামান্তর, অন্য দেশ=দেশান্তর, কেবল দর্শন=দর্শনমাত্র, সমস্ত গ্রাম=গ্রামশুদ্ধ, কেবল জল=জলমাত্র, ইত্যাদি।

একদেশী সমাস : একদেশবাচক (অর্থাৎ অংশবাচক) শব্দের সহিত কাল-বাচক শব্দের যে সমাস হয়, তাহাকে একদেশী সমাস বলে। ইহাতে একদেশ অর্থাৎ অংশবাচক শব্দটি পূর্বে বসে। এই সমাসে 'অহন্' শব্দের স্থানে 'অহ্ন' এবং 'রাত্রি'র স্থানে 'রাত্র' হয়। যেমন, অহন্-এর মধ্যভাগ=মধ্যাহ্ন, অহন্-এর পূর্বভাগ=পূর্বাহ্ণ, রাত্রির মধ্যভাগ=মধ্যরাত্র।

সহসুপা : সুবন্ত পদের (সুপ্ + অন্ত=সুবন্ত অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত পদ) সহিত সুবন্ত পদের সমাসের নাম সহসুপা বা সুপ্‌সুপা সমাস। যেমন, পূর্বে ভূত=ভূতপূর্ব, কায়ের পূর্ব=পূর্বকায়, অতি দূরে নয়=নাতিদূরে, ইত্যাদি।

কারক ও বিভক্তি

কোনো বাক্যে ক্রিয়াপদের সহিত যাহার অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকে, তাহাকে **কারক** বলে। বাংলায় কারক ছয় প্রকার : কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ। ক্রিয়ার সহিত কোনো সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া **সম্বন্ধ** বা **সম্বোধন**-কে কারক বলা হয় না—**ইহাদের নাম পদ**। যে-বিশেষ্য পদের সাহায্যে কাহাকেও আহ্বান করা হয়, তাহাকে বলে সম্বোধন।

[ক] কর্তৃকারক বা কর্তা-কারক :

যাহার দ্বারা কোনো ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, সে কর্তা। কর্তৃকারকে সাধারণত প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। মেঘ হইতে **বৃষ্টি** পড়িতেছে। প্রথমা ছাড়াও কর্তৃকারকে স্থলবিশেষে নানা বিভক্তি প্রযুক্ত হয়। যেমন, **রামকে** আজ কলিকাতায় যাইতে হইবে (দ্বিতীয়া বিভক্তি)। **তাহাকে দিয়া** এই কাজটি চলিবে না (তৃতীয়া বিভক্তি)। তাড়াতাড়ি বাহির হইতে হইল বলিয়া **সুনীলের** আজ ভাত খাওয়াই হইল না (ষষ্ঠী বিভক্তি)। **দশে** মিলি করি

কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ (সপ্তমী বিভক্তি)। **পাগলে** কী না বলে, **ছাগলে** কী না খায় (সপ্তমী বিভক্তি) ?

[খ] **কর্মকারক :**

কর্তা যাহা করে অথবা যাহা দ্বারা ক্রিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করে, অর্থাৎ যে-বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ক্রিয়ার কর্ম হয়, তাহাই কর্ম। কর্মকারকে সাধারণত দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন, শিক্ষকমহাশয় **ছাত্রদিগকে** ব্যাকরণ শিখাইতেছেন। কর্মকারকে প্রথমা, সপ্তমী বিভক্তিরও প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, মাতা শিশুকে **চাঁদ** দেখাইতেছেন (প্রথমা)। শিশুকর্তৃক **চন্দ্র** দৃষ্ট হইতেছে (প্রথমা)। **অন্ধজনে** দয়া করিবে (সপ্তমী)।

কতকগুলি অবস্থাবাচক ক্রিয়ার কোনো কার্য থাকে না—ইহাদের নাম **অকর্মক ক্রিয়া**। যেমন, থাকা, লাগা, হাঁটা, বাঁচা, মরা, ইত্যাদি। কয়েকটি অকর্মক ক্রিয়ার **সমধাতুজ কর্ম** হইয়া থাকে, এবং এই কর্মগুলির পূর্বে অনেক সময় বিশেষণ পদ ব্যবহৃত হয়। যেমন, বড় **বাঁচা** বাঁচিলাম। দৌড়ের প্রতিযোগিতায় সে কী **দৌড়টাই** না দৌড়াইল। সকর্মক ক্রিয়ার কোনো কোনো স্থলে দুইটি কর্ম থাকে ; ইহাদের একটির নাম মুখ্য (প্রধান), অপরটির নাম গৌণ (অপ্রধান) কর্ম। এই কর্মদুইটির মধ্যে যেটিতে দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন থাকে সেইটি **গৌণকর্ম**, এবং যেটিতে বিভক্তির চিহ্ন থাকে না, সেইটি **মুখ্যকর্ম**। যেমন, মাতা **শিশুকে** (গৌণ) চাঁদ (মুখ্য) দেখাইতেছেন। "কখনো কখনো সমার্থক ক্রিয়ার দুইটি কর্ম থাকে—উহাদের মধ্যে একটিকে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য করিয়া অপরটির দ্বারা কিছু বলা হয়, অথবা অপরটিকে প্রথমটির উপর আরোপ করা হয়। যথা, হিন্দুরা **বুদ্ধদেবকে** পরমেশ্বরের **অবতার** বলিয়া সম্মান করে। **পিতামাতাকে** সাক্ষাৎ **দেবতা** জানিয়া পূজা করিবে। এই দুইটি বাক্যে 'বুদ্ধদেব' ও 'পিতামাতা'-কে উদ্দেশ্য করিয়া অন্য শব্দগুলি প্রযুক্ত হইয়াছে ; এইরূপ কর্মপদকে **উদ্দেশ্য কর্ম** বলে, এবং আরোপিত অন্য কর্মকে ('অবতার' ও 'দেবতা') **বিধেয় কর্ম** বলে।" উদ্দেশ্য-কর্ম বিভক্তিযুক্ত হইয়া থাকে, বিধেয়-কর্ম তদ্রূপ হয় না।

(গ) **করণ কারক :**

যাহার সাহায্যে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহাকে করণ কারক বলে। করণ কারকে সাধারণত তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন, **ছুরি দিয়া** পেন্সিলটি কাটিয়া দাও। ইহা ছাড়া, অন্যান্য বিভক্তিযোগেও করণ কারক হইয়া থাকে। যেমন, তাহারা **তাস** খেলিতেছে [প্রথমা]। **আমা হতে** এই কার্য হবে না সাধন (পঞ্চমী)। এমন **ইট-পাথরের** বাড়ী শক্ত তো হবেই (ষষ্ঠী)। **কলমের খোঁচা** দিও না, ওর

চোখে লাগবে (ষষ্ঠী)। এ কাজটা **নিজ হাতে** তুমি করো, অন্য কারো উপর ভার দিও না যেন (সপ্তমী)। ফুটফুটে **জ্যোৎস্নাতে** সমস্ত আকাশ একেবারে ভরে গিয়েছে। (সপ্তমী)।

[ঘ] **সম্প্রদান কারক :**

যাহার উদ্দেশ্যে কিছু করা হয় কিংবা যাহাকে কোনো কিছু দান করা হয়, তাহাকে সম্প্রদান কারক বলে। সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তির (দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্নই বাংলায় চতুর্থী বিভক্তির চিহ্ন-হিসাবে ব্যবহৃত হয়) প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন, **দরিদ্রকে** ধন দান করিলে, **তৃষ্ণার্তকে** জলদান করিলে, **ক্ষুধার্তকে** অন্নদান করিলে পুণ্য হয় (দ্বিতীয়া বিভক্তিযোগে সম্প্রদান কারক)। সম্প্রদান কারকে ষষ্ঠী, সপ্তমী বিভক্তিরও প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন, '**দেবতার** ধন, কে যায় ফিরায়ে লয়ে, এই বেলা শোন' (ষষ্ঠী বিভক্তি)। **শিবের** মন্দিরে পূজা দিতে যাইতে হইবে (ষষ্ঠী বিভক্তি)। সকল কার্যফল **ভগবানে** সমর্পণ করিবে (সপ্তমী বিভক্তি)। 'দেবতার ধন' ও 'শিবের মন্দির' কথাগুলির মধ্যে সম্প্রদান-সম্বন্ধ রহিয়াছে।

[ঙ] **অপাদান কারক :**

যাহা হইতে কোনো ঘটনা বা কার্যের উৎপত্তি হয়, বা যাহা হইতে কোনো বস্তু বা ব্যক্তির চলন, পতন, উত্থান, গ্রহণ, নির্গমন, ইত্যাদি সংঘটিত হয়—এক কথায়, যাহা হইতে ক্রিয়ার কার্য সম্পাদিত হয়, তাহাকে অপাদান কারক বলে। অপাদান কারকে সাধারণত পঞ্চমী বিভক্তিই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু যেহেতু বাংলায় পঞ্চমী বিভক্তির কোনো চিহ্ন নাই, সেহেতু কর্মপ্রবচনীয়—হইতে, অপেক্ষা, অবধি, পর্যন্ত, চেয়ে, থেকে—প্রভৃতির যোগে অপাদান কারক গঠিত হয়। যেমন, **বৃক্ষ হইতে** অবতরণ-কালে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। গতকল্য **বৈকাল হইতে** তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। **মাতাপিতার চেয়ে** আর বড়ো দেবতা নাই। **তোমার কাছ থেকে** আমি আজ পাঁচ টাকা ধার নেবো। অপাদান কারকে তৃতীয়া, ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তিরও যোগ হয়। যেমন, চোরকে এত মার মেরেছে, তার **মুখ দিয়ে** অজস্র রক্ত বেরুচ্ছে (তৃতীয়া)। 'যেখানে **বাঘের** ভয়, সেখানেই সন্ধ্যে হয়' (ষষ্ঠী)। কত **ধানে** কত চাল হয়, তা আমি বেশ জানি (সপ্তমী)। **খনিতে** সোনা পাওয়া যায় (সপ্তমী)।

[চ] **অধিকরণ কারক :**

ক্রিয়ার আধারকেই অধিকরণ বলে ; অর্থাৎ যে-স্থান, কাল, বিষয় কিংবা অবস্থাকে আশ্রয় বা অবলম্বন করিয়া কোনো ঘটনা ঘটে, অথবা কোনাকিছু বিদ্যমান থাকে,

তাহাকে অধিকরণ কারক বলা হয়। অধিকরণ কারকে সাধারণত সপ্তমী বিভক্তিরই প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, সন্ধ্যার পূর্বেই **গৃহে** ফিরিয়া আসিবে। অধিকরণ কারকে প্রথমা, তৃতীয়া, সপ্তমী, বিভক্তির চিহ্নও ব্যবহৃত হয়। যেমন, অনাবৃষ্টিতে **এ বৎসর** ভালো ফসল জন্মায় নাই (প্রথমা)। কাল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম ; কিন্তু গিয়ে দেখলাম তিনি **বাড়ী** নেই (প্রথমা)। তোমার গ্রামের **পাশ দিয়াই** তো নদীটি বহিয়া গিয়াছে (তৃতীয়া)। রাস্তার শোভাযাত্রাটি **ছাদ থেকেই** দেখতে পাবে (পঞ্চমী)। অধিকরণ তিনপ্রকার : (ক) **আধারাধিকরণ**, (খ) **কালাধিকরণ** ও (গ) **ভাবাধিকরণ**।

(ক) এই **পুকুরে** অনেক মাছ আছে (আধারাধিকরণ)। **বাংলাদেশে** হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বাস (আধারাধিকরণ)। (খ) গ্রামের পথঘাট **বর্ষাকালে** কাদায় ভরিয়া যায় (কালাধিকরণ)। তাঁহার অসুস্থতার সময় আমাকে **তিন রাত্রি** জাগিতে হইয়াছিল (কালাধিকরণ)। (গ) এত **দুঃখকষ্টে** পতিত হইয়াছেন, তথাপি তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই (ভাবাধিকরণ)। শকুন্তলা যখন **পতিচিন্তায়** মগ্ন, তখন দুর্বাসা কণ্বের তপোবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন (ভাবাধিকরণ)।

ক্রিয়ার কালভেদ

ক্রিয়ার সময়কেই বলা হয় **'কাল'**। এই কাল প্রধানত তিনপ্রকার : **বর্তমান, অতীত** ও **ভবিষ্যৎ**। এই তিনপ্রকারের কালকে আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। **বর্তমান কালের** তিন বিভাগ : (ক) সাধারণ বা নিত্য, (খ) ঘটমান, (গ) পুরাঘটিত। **অতীত কালের** চার বিভাগ : (ক) সাধারণ বা নিত্য ; (খ) নিত্যবৃত্ত, (গ) ঘটমান, এবং (ঘ) পুরাঘটিত। **ভবিষ্যৎ কালের** তিন বিভাগ : (ক) সাধারণ, (খ) ঘটমান, এবং (গ) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ।

(১) **সাধারণ বা নিত্য-বর্তমান** : সাধারণভাবে অর্থাৎ সচরাচর যখন কোনো ক্রিয়ার ব্যাপার ঘটে, তখন তাহাকে সাধারণ বা নিত্য-বর্তমান কাল বলা হয়। যেমন, বাড়ীর পাশের মাঠটিতেই আমরা **খেলি**। সে প্রতি রবিবারে কলিকাতা হইতে গ্রামের বাড়ীতে **যায়**। কোনো ঐতিহাসিক-ঘটনার বিবৃতির ক্ষেত্রেও নিত্য-বর্তমান কাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন, মানবজাতির দুঃখনিবৃত্তির জন্যই বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ **করেন**। মুসলমানদের মধ্যে তুর্কীরাই সর্বপ্রথম বঙ্গদেশ জয় **করে**। অনুজ্ঞা অর্থেও উত্তম পুরুষে নিত্য-বর্তমানের প্রয়োগ হয়। যেমন, এবার চল, মাঠে খেলা করিতে **যাই**।

(২) **ঘটমান বর্তমান বা ভূতাসন্ন বর্তমান** : যে ক্রিয়ার কার্য ঘটিতেছে,

এখনো শেষ হয় নাই, তাহাকে ঘটমান বর্তমান কাল বলে। যেমন, আজ সকাল হইতেই টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি **পড়িতেছে**। তিনি প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা **করিতেছেন**।

(৩) **পুরাঘটিত বর্তমান** : কিছুকাল পূর্বে যে-কার্য ঘটিয়াছে, অথচ যাহার ফল বা প্রভাব এখনো বর্তমান, তাহাকেই পুরাঘটিত বর্তমান কাল বলা হয়। যেমন, এইবার গাছে অজস্র ফল **ধরিয়াছে**। বর্ধমান হইতে গতকাল সন্ধ্যায় আমি কলিকাতায় **আসিয়াছি**। পুজার সংখ্যার কাগজে প্রকাশের জন্যই আমি কবিতাটি **লিখিয়াছি**।

(৪) **সাধারণ অতীত বা নিত্য-অতীত বা অদ্যতনী** : যে-ক্রিয়া কোনো অনির্দিষ্ট অতীত সময়ে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা বুঝাইতে সাধারণ অতীত বা নিত্য-অতীত কালের প্রয়োগ হয়। যেমন, লক্ষ্মণের প্রতি সরোষে ধাবিত হইয়া মেঘনাদ অস্ত্র নিক্ষেপ **করিলেন**। পিতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া মণিকারা দেশে **ফিরিল**।

(৫) **নিত্যবৃত্ত অতীত** : অতীত কালে কোনো কাজ সর্বদা বা কিছুকাল ধরিয়া নিয়মিতভাবেই ঘটিত, এই অর্থেই নিত্যবৃত্ত অতীতের প্রয়োগ হয়। যেমন, গ্রামে থাকিতে আমি প্রতিদিনই নদীতীরে বেড়াইতে **যাইতাম**। বালকটিকে তিনি সকাল-বিকাল দুই বেলাই **পড়াইতেন**।

(৬) **ঘটমান অতীত** : অতীত কালের অসম্পন্ন ক্রিয়ার ভাব বুঝাইতে ঘটমান অতীত-এর প্রয়োগ হয়। যেমন, গৃহের বাসিন্দারা রাত্রিতে যখন অঘোরে **ঘুমাইতেছিল**, তখনই ঘরে চোর প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি যখন নিবিষ্টচিত্তে **লিখিতেছিলেন**, তখন একজন লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল।

(৭) **পুরাঘটিত অতীত** : অতীতকালে সংঘটিত কোনো ক্রিয়ার পূর্বে ঘটিত ক্রিয়া বুঝাইতে পুরাঘটিত অতীত ব্যবহৃত হয়। যেমন, গেলো বৎসর আমি উপন্যাসটি লিখি, তার আগের বৎসরই **লিখিয়াছিলাম** কবিতার বইটি। বহুপূর্বে ঘটিয়া গিয়াছে, এমন ঘটনা বুঝাইতেও পুরাঘটিত অতীত কালের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন, 'অতি শিশুকালে আমি একবার খাট হইতে **পড়িয়া গিয়াছিলাম**।'

(৮) **সাধারণ বা সামান্য ভবিষ্যৎ** : যে কাজ এখনো হয় নাই, যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহাকে সাধারণ বা সামান্য ভবিষ্যৎ বলে। যেমন, আগামী কাল আমি দিল্লী রওনা **হইব**। আবার তিনি আমাদের মধ্যে ফিরিয়া **আসিবেন**।

(৯) **ঘটমান ভবিষ্যৎ** : যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে ঘটিতে থাকিবে, তাহা ঘটমান ভবিষ্যৎ দ্বারা দ্যোতিত হয়। যেমন, যে-রকম আবহাওয়া দেখিতেছি তাহাতে মনে হয়, সামনের কয়দিন ধরিয়া সমানে বৃষ্টি **হইতে থাকিবে**। আগামী কাল এমন সময়ে আমি ষ্টীমারে পদ্মানদী পার **হইতে থাকিব**।

(১০) **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ঃ** অতীতকালে হয়তো কোনো ক্রিয়া ঘটিয়াছিল বা ঘটিয়া থাকিতে পারে, এই অর্থে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োগ হয়। যেমন, আমার স্মরণ হইতেছে না, হয়তো এ কথা তোমায় আমি **বলিয়া থাকিব**। হয়তো এই কাহিনী কাহারো কাছে যদুবাবুই বিবৃত **করিয়া থাকিবেন**।

[উপরে ক্রিয়ার কালভেদের যে-পরিচয় দেওয়া হইল, রূপ ও অর্থের দিক দিয়া উহাদিগকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ (ক) সরল বা **মৌলিক কাল**, (খ) মিশ্র বা **যৌগিক কাল**। নিত্য-বর্তমান, নিত্য-অতীত, নিত্যবৃত্ত অতীত এবং সাধারণ ভবিষ্যৎ মৌলিক কাল-এর অন্তর্গত ; আর ঘটমান বর্তমান, ঘটমান অতীত, ঘটমান ভবিষ্যৎ, পুরাঘটিত বর্তমান, পুরাঘটিত অতীত এবং পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ যৌগিক কাল-এর অন্তর্ভুক্ত।]

বাচ্যের রূপভেদ

বাচ্য চারিপ্রকার ঃ কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য ও কর্মকর্তৃবাচ্য। **কর্তৃবাচ্যে** কর্তাই বাক্যের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে, এবং ক্রিয়াপদটি কর্তার অনুগামী হইয়া থাকে। কর্তৃবাচ্যে কর্তায় প্রথমা হয়, এবং ক্রিয়া সকর্মক হইলে কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যেমন, মাতা শিশুকে চাঁদ দেখাইতেছেন। রামচন্দ্র রক্ষোরাজ রাবণকে নিহত করিয়াছিলেন।

কর্মবাচ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে কর্মপদটি, এবং ক্রিয়াপদটি কর্মপদের অনুগামী হয়, অর্থাৎ এখানে কর্মপদই প্রধানভাবে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত। কর্মবাচ্যে সাধারণত কর্তায় তৃতীয়া ও কর্মে প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন, রামচন্দ্র কর্তৃক রক্ষোরাজ রাবণ নিহত হইয়াছিলেন।

ভাববাচ্যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম থাকে না এবং ক্রিয়াটিই বাক্যের মধ্যে প্রধান বলিয়া প্রতীত হয়। এই বাচ্যে কর্তা ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয় না। ভাববাচ্যে ক্রিয়াপদ প্রথম পুরুষের হয় এবং কর্তায় দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, ষষ্ঠী বা সপ্তমী বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন, আমাকে কাল দেশে যাইতে হইবে। তোমার কবে কলিকাতা আসা হইল? তোমায় পড়িতে হইবে না। দিনে ঘুমাইতে নাই। ভয়ানক বিপদে পড়া গেল।

কর্মকর্তৃবাচ্যে কর্মপদ কর্তৃপদের স্থানটি অধিকার করে এবং এখানে ক্রিয়াপদের অন্বয় বা সম্পর্ক কর্মপদের সহিত। তা ছাড়া, এই বাচ্যে ক্রিয়াপদে কর্তৃবাচ্যের রূপ থাকে। কর্মকর্তৃবাচ্যের লক্ষণীয় বিশিষ্টতা এই যে, ইহাতে কর্মই যেন নিজে কাজটি সম্পন্ন করিতেছে বলিয়া প্রতীতি জন্মায়। যেমন, কাপড়টা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। তাঁর বই বাজারে খুব কাটে। ঐ শোন, মন্দিরে শঙ্খ বাজে।

অব্যয়

লিঙ্গ, বচন বা বিভক্তিভেদে যে-সকল পদের কোনোই রূপান্তর ঘটে না, তাহাদিগকে 'অব্যয়' বলে। বাক্যের মধ্যে প্রয়োগ ও অর্থভেদে অব্যয় নানা প্রকারের। যেমন :

সংযোজক অব্যয় : এবং, ও, অতএব, সুতরাং, আর, অথবা, তবু, তথাপি, বরং, অথচ, ইত্যাদি। **বিয়োজক অব্যয়** : অথবা, নতুবা, কিংবা, বা, নচেৎ, ইত্যাদি। **পদান্বয়ী অব্যয়** : নিমিত্ত, জন্য, সহ, সহিত, মতন, মত, সঙ্গে ইত্যাদি। **বিস্ময়সূচক অব্যয়** : ও, ও-বাবা, বাপ্ রে, ইস্, আহা, বাহবা, মরি-মরি, অ্যাঁ, ইত্যাদি। **সম্বোধনসূচক অব্যয়** : ওহে, ওগো, ওরে, হে, অরে, হ্যাঁগো, ইত্যাদি। **করুণাবাচক অব্যয়** : হায়-হায়, আহা, আহা রে, আহা-হা, ইত্যাদি। **ঘৃণাবাচক অব্যয়** : ছিঃ, ছি-ছি, রামরাম, দূর্‌দূর্, ইত্যাদি। **প্রশংসা-বাচক অব্যয়** : বেশ, বা, সাবাস্, ধন্যধন্য, ইত্যাদি। **উপমাবাচক অব্যয়** : ন্যায়, মতন, মত, পারা, পানা, ইত্যাদি। **প্রশ্নবোধক অব্যয়** : কেন, কি, নাকি, তো, ইত্যাদি। **বাক্যালংকার অব্যয়** : (যে সকল অব্যয়-পদের স্বতন্ত্র কোনো অর্থ নাই, অথচ যাহারা বাক্যের সৌন্দর্যবর্ধন করে) : না, তো, বটে, যে, ইত্যাদি। **ধ্বন্যাত্মক বা অনুকার অব্যয়** : শন্‌শন্, ঝন্‌ঝন্, বোঁবোঁ, শোঁশোঁ, বম্‌বম্, টন্‌টন্, ইত্যাদি। **পদান্বয়ী বা বিভক্তিসূচক অব্যয়** : দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, হইতে, বিনা, পর্যন্ত, অবধি, ইত্যাদি। **সম্মতিসূচক অব্যয়** : হাঁ, আজ্ঞে-হাঁ, তা-বইকি, ইত্যাদি। **অসম্মতিবাচক অব্যয়** : না, না তো, কখনো না, আদৌ না, ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া আরো কতকগুলি অব্যয়পদ আছে। এইগুলির অধিকাংশই বিশেষণ-রূপে এবং কতকগুলি বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন,—নানা, হেন, বৃথা, কিঞ্চিৎ, ঈষৎ, ইত্যাদি (বিশেষণরূপী অব্যয়); অবশ্য, সহসা, সর্বদা, পুনরায়, ইত্যাদি (ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত অব্যয়); আজকাল, তো, না, ইত্যাদি (বিশেষ্যরূপী অব্যয়) ; যত, তত, এত, আর, ইত্যাদি (সর্বনামরূপে ব্যবহৃত অব্যয়)। কোনো কোনো অব্যয় বিচিত্র অর্থে বাক্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। নিম্নের উদাহরণ-গুলিতে 'না' অব্যয়টির বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দেখানো হইতেছে :

(১) তুমি **না** আমায় বইটি দেবে বলেছিলে ? (প্রশ্ন) ; (২) সেই **না** কন্যার মাথায় ছিল মেঘবরণ চুল (পাদপূরণ) ; (৩) আমাকে একটি টাকা দাও **না** (অনুরোধ) ; (৪) আজ থিয়েটারে যেও না (নিষেধ) ; (৫) কাজটা করো না ; **না**, এ কাজটা আমাকে করতেই হবে (হাঁ) ; (৬) আমি তোমার নিকট হইতে আজ **না** শুনিব না (অসম্মতি) ; (৭) আমাকে তুমি সে কথাটি বলবে, **না**,

বলবে না? (অথবা); (৮) মানুষের ধর্ম কি? **না**, পরের আত্মার মধ্যে নিজেকে দেখা, নিজের আত্মার মধ্যে পরকে দেখা। অবধারণ অর্থে)।

উপসর্গ

কতকগুলি অব্যয় (প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ) ধাতুর পূর্বে বসিয়া উহার অর্থের নানারূপ পরিবর্তন ঘটায়—এই অব্যয়গুলিকে 'উপসর্গ' বলে। নিম্নে **উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থপরিবর্তন**-এর উদাহরণ:

'**হৃ**' ধাতুর অর্থ 'হরণ করা'। কিন্তু আ, প্র, বি, সম্, পরি, উপ, উৎ, প্রভৃতি উপসর্গযোগে উহার নানারকম অর্থ হয়। যেমন—আহার, প্রহার, বিহার, সংহার, পরিহার, উপহার, উদ্ধার, ইত্যাদি। '**কৃ**' ধাতুর অর্থ 'করা'। কিন্তু বিভিন্ন উপসর্গযোগে ইহার অর্থপরিবর্তন ঘটে। যেমন,—উপকার, অপকার, বিকার, আকার, সংস্কার, আবিষ্কার, ইত্যাদি। '**গম্**' ধাতুর অর্থ 'যাওয়া'। উপসর্গযোগে ইহার কত রকম অর্থ হয়; যেমন,—আগমন, নির্গমন, প্রত্যাগমন, অনুগমন, সংগম, ইত্যাদি। '**যুজ্**' ধাতুর অর্থ হইল 'যোগ করা'। কিন্তু বিচিত্র উপসর্গযোগে ইহার অর্থ হয়: নিয়োগ, বিয়োগ, প্রয়োগ, অভিযোগ, অনুযোগ, উদ্‌যোগ, ইত্যাদি।

বাংলা উপসর্গ

কতকগুলি অব্যয় বা অব্যয়জাতীয় শব্দ বাংলার নামপদের পূর্বে বসিয়া উপসর্গের মতো কাজ করে। ঠিক উপসর্গ বলিতে যাহা বুঝায়, খাঁটি বাংলায় তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। বাংলায় উপসর্গ বলিয়া যাহা পরিচিত, তাহাদের অনেকগুলিই শব্দের পূর্বে অবস্থিত তদ্ধিত-প্রত্যয় ছাড়া অন্যকিছু নয়। বাংলা উপসর্গের দ্বারা গঠিত কয়েকটি শব্দের উদাহরণ: অপয়া, আগাছা, আলুনি, নিখোঁজ, বিভুঁই, বিজোড়, সুজন, হাভাত, হাঘর, পাতিকাক, পাতিনেবু, পাতিহাঁস, ইত্যাদি।

বিদেশী উপসর্গযোগে নিষ্পন্ন শব্দ: গরমিল, গরহাজির, নাবালক, না-হক, ফি-বছর, বেনামী, হররোজ, ফুলবাবু, হাফ্‌মোজা, হেড্‌পণ্ডিত, সব্‌জজ, সবডেপুটি, ইত্যাদি।

পদপরিবর্তন

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অগ্নি	আগ্নেয়	অবসাদ	অবসন্ন
অবধান	অবহিত	ইচ্ছা	ইষ্ট
অধ্যয়ন	অধীত	ইতিহাস	ঐতিহাসিক
অণু	আণবিক	উৎসর্গ	উৎসৃষ্ট
আসন	আসীন	উপনিবেশ	ঔপনিবেশিক
আমরা (অস্মদ্)	অস্মদীয়	উদীচী	উদীচ্য
আমি (মৎ)	মদীয়	কায়	কায়িক
আপনি (ভবদ্)	ভবদীয়	ঋষি	আর্ষ
অন্ত	অন্ত্য	গো	গব্য
অভ্যাস	অভ্যস্ত	গ্রাম	গ্রাম্য, গ্রামীণ
আদি	আদ্য	গ্রাস	গ্রস্ত
আহ্বান	আহূত	চুরি	চৌর্য
আরোহণ	আরূঢ়	চন্দ্র	চান্দ্র
আশ্বাস	আশ্বস্ত	চোর	চোরাই
অনুভব	অনুভূত	জটা	জটিল
অরণ্য	আরণ্য	জন্তু	জান্তব
অভিধান	আভিধানিক	জল	জলীয়
অকস্মাৎ	আকস্মিক	জ্ঞান	জ্ঞেয়
অধুনা	আধুনিক	দর্শন	দৃষ্ট,
আঘাত	আহত	দেব	দৈব
অনুপ্রবেশ	অনুপ্রবিষ্ট	পুর	পৌর
আদর	আদৃত	বিধান	বিহিত
অনুগমন	অনুগত	প্রমাণ	প্রামাণ্য, প্রামাণিক
অভিধা	অভিহিত	প্রতীচী	প্রতীচ্য
প্রাচী	প্রাচ্য	স্পর্শ	স্পৃষ্ট
বধ	হত	প্রতিষ্ঠা	প্রতিষ্ঠিত
আকর্ষণ	আকৃষ্ট	স্মৃতি	স্মার্ত

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
বিশ্রাম	বিশ্রম্ভ	উপদ্রব	উপদ্রুত
পশ্চাৎ	পাশ্চাত্ত্য	সূর	সৌর
বস্তু	বাস্তব	শ্রম	শ্রান্ত
প্রশ্ন	পৃষ্ট, প্রষ্টব্য	সূর্য	সৌর্য
বরণ	বৃত	ভ্রম	ভ্রান্ত
হর্ষ	হৃষ্ট	স্নেহ	স্নিগ্ধ
ব্যাঘাত	ব্যাহত	স্ত্রী	স্ত্রৈণ
বিকিরণ	বিকীর্ণ	হৃদয়	হৃদ্য
বিধি	বৈধ	হরণ	হৃত
আস্তরণ	আস্তৃত, আস্তীর্ণ	হাস	হাস্য
বিষাদ	বিষণ্ণ	হর্ষ	হৃষ্ট
বপন	উপ্ত	সভা	সভ্য
বিপদ	বিপন্ন	মাংস	মাংসল
বচন	উক্ত	ফল	ফলিত
বিষ্ণু	বৈষ্ণব	দেব	দৈব
ভেদ	ভিন্ন	শক্তি	শাক্ত
বিমান	বৈমানিক	ব্রহ্ম	ব্রাহ্ম
ভঙ্গ	ভগ্ন	তালু	তালব্য
মদ	মত্ত	কণ্ঠ	কণ্ঠ্য
ক্ষয়	ক্ষীণ	ইহ	ঐহিক
মন	মানস, মানসিক	শ্রদ্ধা	শ্রদ্ধেয়
খেদ	খিন্ন	তর্ক	তার্কিক
মোহ	মুগ্ধ, মূঢ়	অবসান	অবসিত
জয়	জেয়	ভ্রংশ	ভ্রষ্ট
শোক	শোচ্য, শোচনীয়	ধ্যান	ধ্যেয়
ক্ষোভ	ক্ষুব্ধ	মজ্জন	মজ্জিত
সন্ধ্যা	সান্ধ্য	স্মরণ	স্মৃত, স্মরণীয়
প্রজ্ঞা	প্রাজ্ঞ	প্রসাদ	প্রসন্ন
মৌন	মৌনী	পরাভব	পরাভূত
পাক	পক্ক	চক্ষু	চাক্ষুষ

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
স্মৃতি	স্মার্ত	ধর্ম	ধর্মীয়, ধার্মিক
পরিবার	পারিবারিক	কর্ম	কর্মী
যুক্তি	যুক্ত	ভূত	ভৌতিক
জন্ম	জাত	ব্যবহার	ব্যবহারিক
মধু	মধুর	বিপ্লব	বিপ্লুত
মূল	মূলীয়	পুষ্প	পুষ্পিত

বিশেষণ হইতে বিশেষ্য

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
অভিজাত	আভিজাত্য	সম	সাম্য
উদ্ধত	ঔদ্ধত্য	অনুগত	আনুগত্য
উচিত	ঔচিত্য	ঋজু	ঋজুতা,
গুরু	গৌরব,		আর্জব
	গরিমা	এক	ঐক্য
লঘু	লাঘব,	কিশোর	কৈশোর
	লঘুত্ব, লঘিমা	চেতন	চৈতন্য
বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমত্তা	ধীর	ধৈর্য
নীল	নীলিমা	উৎকৃষ্ট	উৎকর্ষ
অতিশয়	আতিশয্য	বীর	বীর্য
অনুকূল	আনুকূল্য	স্বাদু	স্বাদ
দুরাত্মা	দৌরাত্ম্য	শূর	শৌর্য
সহায়	সাহায্য	পাকা	পাকামি
বিচিত্র	বৈচিত্র্য	সুষ্ঠু	সৌষ্ঠব
বিদগ্ধ	বৈদগ্ধ্য	সৎ	সত্তা
কুশল	কুশলতা	দুষ্ট	দুষ্টামি
সুকুমার	সৌকুমার্য	ক্ষেপা	ক্ষেপামি
পাগল	পাগলামি	ইতর	ইতরামি
দুরন্ত	দুরন্তপনা	গরীব	গরীবপনা
বেহায়া	বেহায়াপনা	মেজাজী	মেজাজ

বাংলা চলিত কথার উদাহরণ

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
গাছ	গেছো	মাছ	মেছো
ধার	ধারাল	পেট	পেটুক
বন	বুনো	পাটনা	পাটনাই
তেজ	তেজী	আদর	আদুরে
ভাত	ভেতো	সাহেব	সাহেবী
শহর	শহুরে	ঢাকা	ঢাকাই
মেয়ে	মেয়েলি	হিংসা	হিংসুটে
মাটি	মেটে	ঝগড়া	ঝগড়াটে
রেশম	রেশমি	গোলাপ	গোলাপী
আলাপ	আলাপী	সূতা	সূতী
দাঁত	দাঁতালো	কাজ	কেজো
	রংদার	ঝড়	ঝড়ো

লিঙ্গপরিবর্ত্তন

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ (পত্নী বুঝাইতে)	স্ত্রীলিঙ্গ (স্ত্রীজাতি বুঝাইতে)
কৃশ		কৃশা
প্রথম		প্রথমা
অশ্ব		অশ্বা
স্বর্গত		স্বর্গতা
মধ্যম		মধ্যমা
অধ্যাপক		অধ্যাপিকা
তাদৃশ		তাদৃশী
নদ		নদী
চাতক		চাতকী
ক্রেতা		ক্রেত্রী

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ (পত্নী বুঝাইতে)	স্ত্রীলিঙ্গ (স্ত্রীজাতি বুঝাইতে)
কর্তা		কর্ত্রী
হোতা		হোত্রী
মন্ত্রী		মন্ত্রিণী
মেধাবী		মেধাবিনী
প্রণেতা		প্রণেত্রী
অভিনেতা		অভিনেত্রী
ভব	ভবানী	ভবানী
ব্রহ্ম		ব্রহ্মাণী
মৎস্য		মৎস্যী
মনুষ্য		মনুষী
মানুষ		মানুষী
প্রথিতনামা		প্রথিতনাম্নী
সূর্য		সূর্যা, সূরী (কুন্তী)
ভাই	ভাজ	বোন
জামাই	মেয়ে	
দেওর, ভাসুর	জা	ননদ
দাদা	বৌদিদি	দিদি
জেঠা	জেঠাই	
কাণা		কাণী
খোঁড়া		খুঁড়ী
শিব	শিবানী	শিবা
সুকেশ		সুকেশী
বসু	বসুজায়া	বসুজা
ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়ী	ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী
শূদ্র	শূদ্রী	শূদ্রাণী, শূদ্রা
ইন্দ্র	ইন্দ্রাণী	
বৈশ্য	বৈশ্যানী	বৈশ্যা
আচার্য	আচার্যানী	আচার্যা
উপাধ্যায়	উপাধ্যায়ানী	উপাধ্যায়া
	উপাধ্যায়ী (উভয় অর্থে)	(শিক্ষয়িত্রী)

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ (পত্নী বুঝাইতে)	স্ত্রীলিঙ্গ (স্ত্রীজাতি বুঝাইতে)
সভাপতি		সভানেত্রী
রাষ্ট্রপতি		রাষ্ট্রনেত্রী
রুদ্র	রুদ্রাণী	
প্রেত		প্রেত্নী (পেত্নী)
জোলা	জুলনী	
সুদন্ত		সুদন্তী
অরণ্য (ক্লীবলিঙ্গ)		অরণ্যানী
হিম		হিমানী
সাধু		সাধ্বী
গুরু		গুর্বী
ছাত্র	ছাত্রী (শিক্ষার্থিনী ছাত্রবধূ, কিন্তু বাংলায় অর্থ 'মেয়ে-ছাত্র')	
স্বামী	স্ত্রী	স্বামিনী
বাদশাহ	বেগম, বিবি	বেগম, বিবি
শাহজাদা	বেগম	শাহজাদি
খানসামা		আয়া
ঘোড়া		ঘুড়ী
রাজা (রাজন্)		রাজ্ঞী
সাহেব		বিবি
গো		গবী
হয়		হয়ী
চৌধুরী		চৌধুরাণী
জমিদার		জমিদারণী
ধাতা		ধাত্রী
গরীয়ান্		গরীয়সী
আয়ুষ্মান্		আয়ুষ্মতী
চণ্ড		চণ্ডী (দেবী), চণ্ডা (উগ্র)
আহ্লাদে		আহ্লাদী
ভূত		পেত্নী
শালা	শালাজ	শালী
কবি		মহিলাকবি

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ (পত্নী বুঝাইতে)	স্ত্রীলিঙ্গ (স্ত্রীজাতি বুঝাইতে)
হিংসুটে		হিংসুটি
যুবরাজ	যুবরাজপত্নী	যুবরাজী
বিদ্বান		বিদুষী
নিয়ন্তা		নিয়ন্ত্রী
সয়া		সই
ঘট		ঘটী
বীর		বীরাঙ্গনা
অগ্নি		অগ্নায়ী
মনু		মনায়ী, মনাবী

প্রায়-সমোচ্চারিত শব্দের অর্থের পার্থক্য

অনু—পশ্চাৎ	অণু—ক্ষুদ্রতম অংশ
অংশ—ভাগ	অংস—স্কন্ধ
অর্ঘ—মূল্য	অর্ঘ্য—পূজার দ্রব্য
আর্তি—পীড়া	অর্থী—ইচ্ছুক
অশক্ত—অসমর্থ	অসক্ত—আসক্তিহীন
অনিল—বায়ু	অনীল—যাহা নীল নয়
অসিত—কৃষ্ণ	অশিত—ভক্ষিত
অশ্ব—ঘোড়া	অশ্ম—প্রস্তর
অশন—ভোজন	অসন—ক্ষেপণ
অবদ্য—নিন্দনীয়	অবধ্য—বধের অযোগ্য
অবদান—সৎকর্ম	অবধান—মনোযোগ
আপন—নিজ	আপণ—দোকান
অবিরাম—অনবরত	অভিরাম—সুন্দর
আদি—প্রথম	আধি—মনঃপীড়া
অপচয়—ক্ষতি	অবচয়—চয়ণ
অবিহিত—অন্যায়	অভিহিত—কথিত
অসিলতা—তরবারি	অশীলতা—কুব্যবহার

আসার—ধারাসম্পাত	আষাঢ়—মাসবিশেষ
অন্নপুষ্ট—খাদ্যদ্রব্যপুষ্ট	অন্যপুষ্ট—কোকিল
উপাদান—উপকরণ	উপাধান—বালিশ
উদ্যত—প্রবৃত্ত	উদ্ধত—অবিনীত
আহুতি—হোম	আহূতি—আহ্বান
ওষধি—একবার ফল ধরিয়া যে বৃক্ষ মরিয়া যায়	ঔষধি—ভেষজ উদ্ভিদ
কুল—বংশ	কূল—নদীতীর
কুট—পর্বত	কূট—জটিল
কুজন—কুব্যক্তি	কূজন—কলরব
কৃত্তিবাস—পশুচর্ম যিনি পরিধান করেন ; মহাদেব	কীতিবাস—যশস্বী
কপাল—মাথার খুলি	কপোল—গণ্ডদেশ
গিরিশ—মহাদেব (গিরিতে শয়ন করেন যিনি)	গিরীশ—পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়
গোলক—বর্তুল	গোলোক—বিষ্ণুপুরী
চির—দীর্ঘকাল	চীর—ছিন্নবস্ত্র
চুত—আম্র	চ্যুত—স্খলিত
তত্ত্ব—গূঢ়ার্থ, সত্য	তথ্য—বিষয়
তদীয়—তাহার	ত্বদীয়—তোমার
দার—পত্নী	দ্বার—দরজা
দূত—চর	দ্যূত—পাশা
দুকুল—রেশমী বস্ত্র	দুকূল—দুই কূল
দীপ—প্রদীপ	দ্বীপ—জলবেষ্টিত স্থল
ধাতৃ—বিধাতা	ধাত্রী—পৃথিবী, ধাই-মা
নিবার—নিষেধ	নীবার—ধান্যবিশেষ
নিশিত—শাণিত	নিশীথ—অর্ধরাত্র
নীর—জল	নীড়—পাখীর বাসা
নিরশন—অনাহার	নিরসন—দূরীকরণ
নির্জর—দেবতা	নির্ঝর—ঝর্ণা
পরস্ব—পরের ধন	পরশ্ব—আগামী দিন
প্রসাদ—অনুগ্রহ	প্রাসাদ—অট্টালিকা
প্রকার—রকম	প্রাকার—প্রাচীর
পরিচ্ছদ—পোষাক	পরিচ্ছেদ—অধ্যায়
প্রকৃত—যথার্থ	প্রাকৃত—স্বাভাবিক, নীচবংশজাত

পুৎ—পুৎ-নামক নরক	পূত—পবিত্র
বিজন—জনহীন	বীজন—পাখা
বলি—উৎসর্গ করিবার দ্রব্য	বলী—বলবান
বান—বন্যা	বাণ—শর
বিষ—গরল	বিস—মৃণাল
মূক—বাক্যহীন	মুখ—বদন
রিক্ত—শূন্য	রিকৃথ—সম্পদ, বিত্ত
নিধান—আধার	নিদান—অন্তিম
শীল—চরিত্র	শিল—নুড়ি
শম—শান্তি	সম—সমান
শংকর—মহাদেব	সংকর—মিশ্রজাতি
শীকর—জলকণা	শিকড়—মূল
শ্রবণ—কর্ণ	স্রবণ—ক্ষরণ
শূর—বীর	সুর—দেবতা
শ্মশ্রু—দাড়ি	শ্বশ্রু—শ্বশুর
শারদা—দুর্গা	সারদা—সরস্বতী
সুত—পুত্র	সূত—সারথি
সত্ত্ব—গুণ বিশেষ	স্বত্ব—অধিকার
সর্গ—অধ্যায়	স্বর্গ—দেবলোক
সাক্ষর—অক্ষরজ্ঞানযুক্ত	স্বাক্ষর—সহি
সুগন্ধ—যাহা অন্য বস্তুর সৌরভে সুবাসিত	সুগন্ধি—যাহার নিজের ভালো গন্ধ আছে
পক্ষ—পনর দিন	পক্ষ্ম—নেত্রলোম
পরভৃৎ—কাক	পরভৃত—কোকিল
অজগর—সর্পবিশেষ	অজাগর—অনিদ্রা
আস্তিক—ঈশ্বরে বিশ্বাসী	আস্তীক—একজন মুনির নাম
পৃষ্ট—জিজ্ঞাসিত	পৃষ্ঠ—পশ্চাদ্‌ভাগ
সমীর—বাতাস	শমীর—বৃক্ষ বিশেষ
নিরাশ—আশাশূন্য	নিরাস—দূরীকরণ
স্বার্থ—নিজপ্রয়োজন	সার্থ—ধনবান বণিকদল, সমূহ
সবিত্রী—জন্মদাত্রী	সবিতৃ—সূর্য
কৃতি—কার্য	কৃতী—যশস্বী
স্কন্দ—কার্তিকেয়	স্কন্ধ—কাঁধ

মেদ - মজ্জা	মেধ—যজ্ঞ
সপ্ত—সাত	শপ্ত—অভিশাপগ্রস্ত
কৃত—যাহা করা হইয়াছে	ক্রীত—যাহা ক্রয় করা হইয়াছে
আভাষ—ভূমিকা, মুখবন্ধ	আভাস—ইঙ্গিত, দীপ্তি

বিপরীতার্থক শব্দ

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
সংক্ষেপ	বাহুল্য	বহিঃ	অন্তর
আবাহন	বিসর্জন	অনুজ	অগ্রজ
আলস্য	শ্রম	প্রশস্ত	সংকীর্ণ
সঞ্চয়	ব্যয়, অপচয়	দুষ্কর	সুকর
আকর্ষণ	বিকর্ষণ	আদিষ্ট	নিষিদ্ধ
সমষ্টি	ব্যষ্টি	সুশীল	দুঃশীল
তাপ	শৈত্য	সূক্ষ্ম	স্থূল
আচার	অনাচার	গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ
আকুঞ্চন	প্রসারণ	প্রভু	ভৃত্য
সংযোগ	বিয়োগ	তিরস্কার	পুরস্কার
অনন্ত	সান্ত	স্থাবর	জঙ্গম
আবির্ভূত	তিরোহিত	অনুগ্রহ	নিগ্রহ
উগ্র	সৌম্য	বিধি	নিষেধ
উত্তমর্ণ	অধমর্ণ	উন্মীলন	নিমীলন
ঋজু	বক্র	অনুলোম	প্রতিলোম
ঐহিক	পারত্রিক	বিপদ, আপদ	সম্পদ
কৃতঘ্ন	কৃতজ্ঞ	প্রকৃতি	বিকৃতি
কৃশ	স্থূল	বরখাস্ত	বহাল
দুরন্ত	শান্ত	চেতন	জড়
নিরত	বিরত	হৃদ্য	ঘৃণ্য
গৃহী	সন্ন্যাসী	সহযোগী	প্রতিযোগী
নৈসর্গিক	কৃত্রিম	ভূত	ভবিষ্যৎ

মূলশব্দ	বিপরীত শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
অর্বাচীন	প্রবীণ	প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
বন্ধুর	মসৃণ	সন্ধি	বিগ্রহ
বন্য	পালিত	প্রসন্ন	বিষণ্ণ
বর্ধমান	ক্ষীয়মান	কুৎসা	প্রশংসা
বিনীত	উদ্ধত	সিক্ত	শুষ্ক
প্রাচীন	অর্বাচীন	অধঃ	ঊর্ধ্ব
চড়াই	উৎরাই	জড়	চেতন
দ্যুলোক	ভূলোক	নরম	শক্ত

এক কথায় প্রকাশ কর

অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা— অনুসন্ধিৎসা পান করিবার ইচ্ছা— পিপাসা। অপকার করিবার ইচ্ছা— অপচিকীর্ষা। ভোজন করিবার ইচ্ছা— বুভুক্ষা। উপকার করিবার ইচ্ছা — উপচিকীর্ষা। আকাশে চরে যে— খেচর। কী করিবে যে বুঝিতে পারে না— কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একই গুরুর শিষ্য—সতীর্থ। জয় করিবার ইচ্ছা— জিগীষা। হনন করিবার ইচ্ছা— জিঘাংসা। লাভ করিবার ইচ্ছা— লিপ্সা। জানিবার ইচ্ছা—জিজ্ঞাসা। কোথাও নত কোথাও উন্নত— বন্ধুর। বমন-ইচ্ছা— বিবমিষা। পূর্বজন্মের কথা যাহার মনে আছে— জাতিস্মর। যে শুনিতে চায়— শুশ্রূষু। জলে ও স্থলে চরে যে— উভচর। দুইয়ের মধ্যে একটি— অন্যতর। পুরাকালের বিষয় জানে যে— পুরাতাত্ত্বিক। যিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত— বৈয়াকরণ। যিনি ন্যায়শাস্ত্রে অভিজ্ঞ— নৈয়ায়িক। বেদান্ত জানেন যিনি— বৈদান্তিক। বেদশাস্ত্রে যিনি অভিজ্ঞ— বেদজ্ঞ। প্রিয়বাক্য বলে যে— প্রিয়বাদী, প্রিয়ংবদ। পঙ্‌ক্তিতে বসিবার অনুপযুক্ত—অপাঙ্‌ক্তেয়। এক বিষয়ে নিবিষ্ট যাহার চিত্ত— একাগ্রচিত্ত। এক হইতে আরম্ভ করিয়া— একাদিক্রমে। উপকার স্বীকার করে না যে— অকৃতজ্ঞ। ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে যে— জিতেন্দ্রিয়। যাহা চাটিয়া খাইতে হয়— লেহ্য। যে স্ত্রীর সন্তান হয় না— বন্ধ্যা। যে ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন— নাস্তিক। যাহা দেখা যাইতেছে— দৃশ্যমান। যাহা বিলুপ্ত হইতেছে — বিলীয়মান। যাহা ধূম উদ্গীরণ করিতেছে— ধূমায়মান। যাহা পুনঃ পুনঃ জ্বলিতেছে —জাজ্বল্যমান। যাহা পুনঃ পুনঃ দীপ্তি পাইতেছে— দেদীপ্যমান। নিজেকে যে কৃতার্থ

মনে করে—কৃতার্থম্মন্য। যাহাকে শাসন করা কঠিন—দুঃশাসন। সর্বজন সম্বন্ধীয়—সর্বজনীন। বিশ্বজন সম্বন্ধীয়—বিশ্বজনীন। হৃদয়ের প্রীতিকর—হৃদ্য। পদ-প্রক্ষালনের জন্য জল—পাদ্য। ঋষির দ্বারা উক্ত—আর্ষ। বরণ করিবার যোগ্য—বরেণ্য। মায়া যাহার জানা আছে—মায়াবী। খেয়া পার করে যে—পাটনী। যাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে—আস্তিক। যাহা চিবাইয়া খাই—চর্ব্য। ফল পাকিলে যে-গাছ মরিয়া যায়—ওষধি। পূর্বে যাহা শোনা যায় নাই—অশ্রুত-পূর্ব। পূর্বে যাহা দেখা যায় নাই—অদৃষ্টপূর্ব। যাহা পূর্বে কখনো হয় নাই—অভূত-পূর্ব। যাহা পূর্বে ছিল এখন নাই—ভূতপূর্ব। যাহা দুঃখে লাভ করা যায়—দুর্লভ। যাহা মর্মকে আঘাত করে—মর্মন্তুদ। এ পর্যন্ত যাহার শত্রু জন্মে নাই—অজাতশত্রু। একই মায়ের পুত্র—সহোদর। একই সময়ে বর্তমান—সম-সাময়িক। উপস্থিত বুদ্ধি যাহার আছে—প্রত্যুৎপন্নমতি। যাহার অন্যদিকে দৃষ্টি নাই—অনন্যদৃষ্টি। যিনি অনেক দেখিয়াছেন—বহুদর্শী। কষ্টে নিবারণ করা যায় যাহা—দুর্নিবার। যে সকল বস্তু ভক্ষণ করে—সর্বভুক্। যে আপনাকে হত্যা করে—আত্মঘাতী। যাহা বাক্য ও মনের অতীত—অবাঙ্মনসগোচর। যুদ্ধে যিনি স্থির থাকেন—যুধিষ্ঠির। যে ভূমিতে ফসল জন্মায় না—অনুর্বর। যে আপনাকে পণ্ডিত মনে করে - পণ্ডিতম্মন্য। কোনো বিষয়ে যে শ্রদ্ধা হারাইয়াছে—বীতশ্রদ্ধ। যাহার অন্যকোনো সহায় নাই—অনন্যসহায়। যাহা সহজে ভাঙিয়া যায়—ভঙ্গুর। যাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে—মৃতদার, বিপত্নীক। যাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না—অনির্বচনীয়। প্রথমে মধুর কিন্তু পরিণামে নয়—আপাতমধুর। যাহা অনুকরণের অসাধ্য—অননুকরণীয়। যাহা কখনো ভাবা যায় না—অভাবনীয়। অপনয়ন করা কষ্টসাধ্য—দুরপনেয়। যাহা অপনয়ন করা যায় না—অনপনেয়। যাহা পূর্বে আস্বাদন করা হয় নাই—অনাস্বাদিতপূর্ব। যাহার কুলশীল জানা নাই—অজ্ঞাত-কুলশীল। আপনার রং যে লুকায়—বর্ণচোরা। পরের অন্নে যে জীবনধারণ করে—পরান্নজীবী। যাহার তলদেশ স্পর্শ করা যায় না—অতলস্পর্শ। যেখানে মৃত জীবজন্তু ফেলিয়া দেওয়া হয়—উপশল্য। অশ্ব-রথ-হস্তী ও পদাতিক সৈন্যের সমাহার—চতুরঙ্গ। গাছের উপর যে-গাছ জন্মে—পরগাছা। আটমাসে জন্মিয়াছে যে—আটাসে। সমুদ্র পর্যন্ত—আসমুদ্র। কণ্ঠ পর্যন্ত—আকণ্ঠ। জানুপর্যন্ত লম্বিত—আজানুলম্বিত। কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত—আকর্ণবিস্তৃত। খুব শীতও নয় খুব গরমও নয়—নাতিশীতোষ্ণ। পূর্বে যাহা চিন্তা করা হয় নাই—অচিন্তিতপূর্ব। যাহা পূর্বে ভস্ম ছিল না এখন ভস্ম হইয়াছে—ভস্মীভূত। যাহা চিরকাল মনে রাখার যোগ্য—চিরস্মরণীয়। যাহা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না—অনন্যসাধারণ। যাহা লাফাইয়া চলে—প্লবগ, প্লবঙ্গ। যাহা মুষ্টির দ্বারা পরিমাপ করা যায়—মুষ্টিমেয়। মরমর হইয়াছে যে—মুমূর্ষু। শক্তি অতিক্রম না

করিয়া—যথাশক্তি। যাহা পড়িয়া যাইবার মত হইয়াছে—পতনোন্মুখ। যাহার কোথাও ভয় নাই—অকুতোভয়। শিক্ষা করিতেছে যে—শিক্ষানবীস। সম্মুখে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা—প্রত্যুদ্গমন। পূর্বকাল সম্বন্ধীয়—প্রাক্তন। যে সব সহ্য করে—সর্বংসহ। কেহ জানিতে না পারে এমন ভাবে—অজ্ঞাতসারে। আয় অনুসারে যিনি ব্যয় করেন—মিতব্যয়ী। শত্রুকে পীড়া দেয় যে—অরিন্দম, পরন্তপ। যে-নারী কখনো সূর্য দেখে নাই—অসূর্যম্পশ্যা। সাক্ষাৎ দ্রষ্টা—সাক্ষী। যে-নারীর বিবাহ হয় নাই—অনূঢ়া। যে-স্ত্রীর স্বামী বিদেশে—প্রোষিতভর্তৃকা। বিদেশে থাকে যে—প্রবাসী। যিনি দারপরিগ্রহ করিয়াছেন—কৃতদার। আতপ হইতে ত্রাণ করে যাহা—আতপত্র। পাপ দূর করে যে—পাপঘ্ন। মজলিস করিতে যে দক্ষ—মজলিসী। যাহা বিনাযত্নে উৎপন্ন হয়—অযত্নসম্ভূত। যাহার আহারে সংযম আছে—মিতাহারী। যে বাঁচিয়া থাকিয়াও এক-প্রকার মরিয়া আছে—জীবন্মৃত। যে-ব্যক্তি গুণীর আদর করে—গুণগ্রাহী। যে-নারীর অসূয়া নাই—অনসূয়া। যে নারী প্রিয়বাক্য বলে—প্রিয়ংবদা। যাহা বলা হয় নাই—অনুক্ত। একদিকে দৃষ্টি যাহার—একাগ্রদৃষ্টি। যে-কথার দুইটি অর্থ—দ্ব্যর্থ। যাহা সহজে পরিপাক হয় না—দুষ্পাচ্য। লোক সম্বন্ধীয়—লৌকিক। দুইয়ের মধ্যে একটি—অন্যতর। পাঁচ রকমের জিনিস মিশাল আছে যাহাতে—পাঁচমিশালী। যাহা উচ্চারণ করা কঠিন—দুরুচ্চার্য। ভক্ত যাহা বাঞ্ছা করে তাহাই যিনি দেন—ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু। মুক্তি পাইতে ইচ্ছুক—মুমুক্ষু। স্ত্রীর বশীভূত—স্ত্রৈণ। দ্বারে থাকে যে—দৌবারিক। তীর ছুঁড়ে যে—তীরন্দাজ। সহজে যাহা পরিপাক হয় না—দুষ্পরিপাচ্য। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে না যে—অবিমৃষ্যকারী। পতিপুত্রহীনা নারী—অবীরা। চক্ষুর সম্মুখে—প্রত্যক্ষ। হইবে যাহা—ভাবী। হইবে না যাহা—অসম্ভব। অবশ্যই যাহা হইবে—অবশ্যম্ভাবী। নদী মাতা যাহার—নদীমাতৃক। সমান পতি যাহার—সপত্নী। দশরথের পুত্র—দাশরথি। রাবণের পুত্র—রাবণি। জমদগ্নির পুত্র—জামদগ্ন্য। পৃথার পুত্র—পার্থ। সুমিত্রার পুত্র—সৌমিত্রি। কুন্তীর পুত্র—কৌন্তেয়। রঘুর বংশে যাহার জন্ম—রাঘব। দ্রুপদের কন্যা—দ্রৌপদী। জনকের কন্যা—জানকী। কুরুর পুত্র—কৌরব। পাণ্ডুর পুত্র—পাণ্ডব। গঙ্গার অপত্য—গাঙ্গেয়। ভগিনীর পুত্র—ভাগিনেয়। দিতির পুত্র—দৈত্য। শক্তির উপাসক—শাক্ত। বিষ্ণুর উপাসক—বৈষ্ণব। বুদ্ধের উপাসক—বৌদ্ধ। পর্বতের কন্যা—পার্বতী। পুনঃ পুনঃ রোদন করিতেছে যে—রোরুদ্যমান। যাহারা সর্বদা স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে—যাযাবর। অনুকরণ করিবার ইচ্ছা—অনুচিকীর্ষা। যাহা লোকে বিদিত নহে—অলৌকিক। ভাবিয়া চিন্তিয়া যে কাজ করে না—অবিমৃষ্যকারী। যাহা অস্ত যাইতেছে—অস্তায়মান। যাহা বিচার দ্বারা ঠিক করা যায় না—অপ্রতর্ক্য। যাহা প্রমাণ করা যায় না—অপ্রমেয়। যে-বস্তু পাইতে ইচ্ছা করা যায়—অভীপ্সিত। যাহা মাটি ভেদ করিয়া

উঠে—উদ্ভিদ। যাহা হাতের বাহিরে—বে-হাত। যাহার সর্বস্ব চুরি গিয়াছে—হৃতসর্বস্ব। যাহার অন্যকোনো কর্ম নাই—অনন্যকর্মা। যাহার ভাতের অভাব আছে—হাভাতে। যাহার অনুরাগ দূর হইয়াছে—বীতরাগ। যাহার কিছুই নাই—অকিঞ্চন, নিঃস্ব। যাহার নয়ন হইতে অশ্রু বিগলিত হইতেছে—গলদশ্রু। যাহার প্রাতবিধান। করা যায় না—অপ্রতিবিধেয়। যাহার এখনো বালকত্ব কাটে নাই—নাবালক। যে পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—অনুজ। যে সুপথ হইতে বিচলিত হইয়াছে—উন্মার্গগামী। যে-নারীর সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে—নবোঢ়া। যে-নারীর হাস্য শুচি—শুচিস্মিতা। যে-জমিতে দুইবার ফসল হয়—দোফসলী। যে-বৃক্ষের ফুল হয় না, ফল হয়—বনস্পতি। যাহা পুনঃ পুনঃ দুলিতেছে—দোদুল্যমান। যাহা বিনাকষ্টে লাভ করা যায়—অনায়াসলভ্য। যাহা আকাশে উড়িয়া বেড়ায়—খেচর। যাহার বসন আলগা—অসংবৃত। যে অপরের আশ্রয় ব্যতীত অধিষ্ঠান করে—নিরালম্ব।

বিশিষ্টার্থক শব্দ ও বাক্যাংশের প্রয়োগ

অর্ধচন্দ্র : [গলাধাক্কা] আর বেশী গোলমাল করিবে তো অর্ধচন্দ্র দিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিব। **আক্কেল গুড়ুম :** [ঠকিয়া উপযুক্ত শিক্ষালাভ করা] লোকটার এহেন আচরণ দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়েছে। **আক্কেল সেলামী :** [নির্বুদ্ধিতার দণ্ড] বোকার মত কাজ করতে গিয়ে শেষে পুলিশকে এতগুলি টাকা আক্কেল সেলামী দিতে হল। **অনেক জলের মাছ :** [কূটনীতিজ্ঞ] হরিবাবুর স্বরূপ চেনা দুঃসাধ্য ব্যাপার, তিনি অনেক জলের মাছ। **অকালকুষ্মাণ্ড :** [অপদার্থ, অকর্মা] নিতাই একটি অকালকুষ্মাণ্ড, তাকে তুমি এত বড়ো একটা কাজের ভার দিলে? **আদায়-কাঁচকলায়** অথবা **অহিনকুল সম্পর্ক :** [অর্থাৎ গুরুতর-শত্রুভাবাপন্ন] জিতেন আর সুভাষ একসময় ছিল হরিহরাত্মা, এখন তাদের অবস্থা দেখছি আদায়-কাঁচকলায়। ভুবনবাবু এখন যদুবাবুর মুখ পর্যন্ত দেখেন না, তাঁদের পরস্পর সম্পর্কটা এখন অহিনকুলের। **আপন কোলে ঝোল টানা :** [অতিরিক্ত স্বার্থপরতা] যুদ্ধের সময় চোরাকারবারীরা আপন কোলে ঝোল টানতে গিয়েই লক্ষ লক্ষ মানুষের এমন সর্বনাশ করল। **আমড়া কাঠের ঢেঁকি :** [অপদার্থ] এত পড়ালাম, এত শেখালাম, তবুও ছেলেটা পরীক্ষায় পাশের নম্বর পেল না—ছেলেটা দেখছি একেবারে আমড়া কাঠের ঢেঁকি। **আষাঢ়ে-গল্প :** [অবিশ্বাস্য ঘটনা] লাঠির ঘায়ে তুমি বাঘ মেরেছ, এ রকম আষাঢ়ে-গল্প বলার জায়গা এটা নয়। **উলুবনে মুক্তা ছড়ান :** [অস্থানে মূল্যবান বস্তু ছড়ান] ক-অক্ষরের সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই, তাদের বুঝাচ্ছ তুমি সাহিত্যতত্ত্ব—তুমি কেন এমন করে উলুবনে মুক্তো ছড়াচ্ছ? **উড়ো খই গোবিন্দায়**

নমঃ : [আয়ত্ত বস্তু হস্তচ্যুত হইলে তাহার সম্বন্ধে বিরক্তিপ্রদর্শন করা] রামকে বিশ্বাস করে এতগুলি টাকা দিলাম, টাকাগুলি সে আর ফেরৎ দিলে না ; যাক্‌, টাকাটা ওকে দান করেই দিলাম—উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ। **একাদশ বৃহস্পতি** : [খুব ভালো সময়] পরীক্ষায় ভালো পাশ করলে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভালো চাকরিও পেলে—এবার তোমার দেখছি একাদশ বৃহস্পতি। **একচোখো** : [পক্ষপাতিত্বদুষ্ট] বড়লোক আসামী, সুতরাং হাকিমের বিচার যে একচোখো হবে, তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে ? **একমাঘে শীত যায় না** : [বিপদের সম্ভাবনা থাকা] নিজের কাজটা হাসিল করে তুমি আমায় ফাঁকি দিলে—মনে রেখো, একমাঘে শীত যায় না। **কলুর বলদ** : [স্বাধীনভাবে কাজ করার শক্তি যাহার নাই] 'মা আমায় আর ঘুরাবি কত, কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মত।'—[রামপ্রসাদ] **কাঁচা পয়সা** : [নগদ টাকা] বড়লোক-বাপের কাঁচা পয়সা হাতে পেয়ে ছেলেটা দুহাতে উড়াচ্ছে। **কান ভারি করা** : [কিছু বলে অপরের সম্পর্কে অবিশ্বাস সৃষ্টি করা] না-হক কথা বলে ওর বিরুদ্ধে তুমি তার কান ভারি করছ কেন ? **কাঁঠালের আমসত্ব** : [অবাস্তব জিনিষ] দুর্ভিক্ষের দেশ—তুমি বলছ, এক টাকায় পাঁচ সের চাল কিনেছ, এ দেখছি কাঁঠালের আমসত্ব। **পাকা ধানে মই** : [বড়ো রকমের অনিষ্ট করা] অই ঘুঘু-লোকটার পিছনে লেগেছ, সে এবার তোমার পাকা ধানে মই দেবে, দেখো। **রগ-চটা** : [যে সামান্য কারণে রেগে ওঠে] তার মতো রগচটা মানুষের সঙ্গে কথা বলাই মুস্কিল। **বিদুরের খুদ** : [শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রদত্ত সামান্য আহার্য] লোকটি বড়ো গরীব ; তার মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণে লোককে বেশী কিছু খাওয়াতে পারেনি বটে, কিন্তু তার আদর-আপ্যায়নে সেই বিদুরের খুদ সকলেই খুশী মনে গ্রহণ করল। **কেঁচে গণ্ডুষ** : [নূতন করিয়া আরম্ভ করা] অঙ্কটা আগাগোড়া ভুল করেছ, এখন কেঁচে গণ্ডুষ ছাড়া উপায় নেই। **কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুনো** : [সামান্য জিনিষ গুরুতর হওয়া] দু'পয়সার মুড়ির জন্যে কথা-কাটাকাটি শেষে গিয়ে দাঁড়াল লাঠালাঠিতে, ঘটনাটা কোর্ট পর্যন্ত গড়াল—দেখছি, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুলো। **কনের ঘরের মাসী, বরের ঘরের পিসী** : [যে দু'দিকেই কথা বলে, অর্থাৎ দু'মুখো সাপ] নিতাই বৈরাগী সাংঘাতিক লোক ; সে চোরকে বলে চুরি কর, আর গৃহস্থকে বলে সজাগ থাক—এই কনের ঘরের মাসী, বরের পিসীকে তোমরা চিনে রেখো। **কেষ্টবিষ্টু** : [গণ্যমান্য ব্যক্তি] তুমি কোন্ কেষ্টবিষ্টু হলে যে, তোমায় মাথায় তুলে ফুলচন্দন দিয়ে পূজো করতে হবে ? **কেউকেটা** : [সামান্য লোক] সাজপোষাকে আড়ম্বর নেই বলে তাকে কেউকেটা লোক ভেবোনা। **খয়ের খাঁ** : [খোসামোদকারী] ব্রিটিশ-আমলে সরকারের খয়ের-খাঁ-জাতীয় লোকের জন্যই দেশের কত ক্ষতি হয়েছে। **গোবরে পদ্মফুল** : [অপকৃষ্ট স্থানে ভালো জিনিষ] সাত জন্মে তাদের বাড়ীতে কেউ লেখাপড়া করেনি ; কিন্তু শুনছি, তাদেরই বাড়ীর ছেলে এবার

প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে পাশ করেছে—মনে হচ্ছে, গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে। **গোবর গণেশ** : [মূর্খ] এই গোবর গণেশটাকে তুমি কত কী শেখাচ্ছ, সাত জন্মেও তা'র চোখ খুলবে না। **গোকুলের ষাঁড়** : [নিষ্কর্মা অপদার্থ লোক] সকালে বিকালে দু'পেট খাওয়া, আর দুপুরে নাকে তেল দিয়ে ঘুমানো তার কাজ, গোকুলের এই ষাঁড়টাকে নিয়ে কী যে হবে তাই ভাবছি। **গুড়ে বালি** : [নিরাশ হওয়া] মনে করেছিলাম, বড়ো ছেলেটাও অন্তত মানুষ হয়ে দু'পয়সা আনবে—কিন্তু আমার সে গুড়েও বালি পড়ল। **ঘরের ঢেঁকি কুমীর** : [বিশ্বাসঘাতক লোক] স্বদেশী-আমলে দেশের লোকের শত্রুতার জন্যই কত লোক জেলে-ফাঁসীতে গেল—ঘরের ঢেঁকি কুমীর হলে আর কি রক্ষা থাকে ! **টাকার গরম** : [ধনীর অর্থপ্রাচুর্যের অহংকার] সম্প্রতি বেণীবাবু যুদ্ধের দৌলতে চোরাকারবার করে বহুটাকা রোজগার করেছেন, তাঁর এখন টাকার বড়ো গরম—দেমাকে মাটিতে আর পা পড়ে না। **ডুবে ডুবে জল খাওয়া** : [লোকের অজানিতে কার্যসিদ্ধি করা] বাইরে তিনি ভালোমানুষ সেজে বেড়ান, কিন্তু তিনি ডুবে ডুবে যে জল খান, একথা জানতে কারো বাকী নেই। **তালকানা** : [কাণ্ডজ্ঞানহীন] যতই ভালো শিক্ষকের হাতে পড়ুক না কেন, তার মতো তালকানা ছেলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার কোনো আশাই নেই। **তিলকে তাল করা** : [অতিরঞ্জিত করা] ঘটনাটা আমার জানা আছে, তা নিয়ে তুমি তিলকে তাল কোরো না —কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না। **তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠা** : [অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়া] ছাত্রটির অভদ্র আচরণ দেখে বৃদ্ধ হেডপণ্ডিত-মশায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। **ডান হাতের কাজ** : [ভোজনক্রিয়া] ডান হাতের কাজটা আগে সেরে নিই, তারপর তোমার সঙ্গে বেরিয়ে অনেক দূর ঘুরে আসবো। **ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া** : [সামান্য আঘাত-কষ্ট সহ্য করতে না পারা] আধক্রোশ পথ হেঁটে এসে বলছো আর চলতে পারছ না ; দেখছি, তুমি ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাবে—এমন ননীর পুতুলটি সেজে বসলে কখন থেকে ? **ঘরে ছুঁচোর কীর্তন বাইরে কোঁচার পত্তন** : [অর্থাৎ ঘরে অন্নের সংস্থান নেই অথচ বাইরে বড়লোকের চাল দেখানো] হাঁড়িতে তোমার ভাত চড়ে না, আর বাইরে তুমি ফুলবাবুটি সেজে বেড়াও—একেই বলে ঘরে ছুঁচোর কীর্তন বাইরে কোঁচার পত্তন। **ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে** : [যে-দুর্দশা সকলের হতে পারে, তা দেখে আনন্দ প্রকাশ করা] যদুবাবু হঠাৎ নিঃসম্বল হয়ে পড়াতে মেয়েকে ভালো বিয়ে দিতে পারলেন না বলে পাড়ার লোক এ নিয়ে কত হাসিঠাট্টা করল—মনে হল, ঘুঁটেকে পুড়তে দেখে গোবর হাসছে। **চক্ষুদান করা** : [চুরি করা] হাতঘড়িটা কাল ঘর থেকে উধাও হয়ে গেল ; মনে হচ্ছে, পাশের বাড়ীর বখাটে ছেলেটা চক্ষুদান করেছে। **ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো** : [কোনো একজনকে দিয়ে বারবার নানা কাজ করানো] নিমন্ত্রণে কত খাওয়াদাওয়া হল,

তখন রমেশের ডাক পড়ল না ; কিন্তু এঁটো কুড়োবার বেলায় রমেশকে না হলে চলে না —সে যে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। **ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা ঃ** [সামান্য লাভের জন্য দুর্নাম কেনা] বীরেন বিপ্লবী যতীনকে বললে, ডিটেক্‌টিভটা বড়ো পিছু লেগেছে, পিস্তলটা দাও, একেবারে শেষ করে দিই। যতীন বল্‌লে, ওই ছুঁচোটাকে মেরে হাত গন্ধ করে কী লাভ ? **টইটম্বুর ঃ** [কানায়-কানায় পূর্ণ] ছেলেকে বিদায় দিয়ে মায়ের চোখ অশ্রুতে টইটম্বুর হয়ে উঠল। **ঠোঁটকাটা ঃ** [স্পষ্টবাদী] সে বড়ো ঠোঁটকাটা লোক, তার মুখে প্রিয়-অপ্রিয় কিছুই আটকায় না। **ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় কিংবা লোম বাছতে কম্বল উদ্‌লা ঃ** [সকলেই অসৎপ্রকৃতির] পুলিশের লোক চোরাকারবারী ধরতে এসেছে, কিন্তু কা'কে ধরবে—ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। **ধান ভানতে শিবের গীত ঃ** [অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ] মাষ্টারমশায় পড়াচ্ছিলেন সাহিত্য, মাঝখানে একটি ছেলে বলে উঠলো—স্যর, আজকাল এত ধর্মঘট কেন হচ্ছে ? উত্তরে তিনি বললেন, ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ো না। **ভস্মে ঘি ঢালা ঃ** [অযোগ্য পাত্রে দান] ছেলেটি একেবারেই গোল্লায় গেছে, অথচ তাকে প্রতিমাসে তুমি পড়াশুনার জন্য এতগুলি করে টাকা পাঠাচ্ছো—ভস্মে ঘি আর ঢেলো না। **ভূতের বেগার ঃ** [বৃথা খেটে মরা] এ ব্যবসায়ে তোমার একটি পয়সাও লাভ হবে না, অথচ দিনরাত পরিশ্রম করছো—ভূতের বেগার আর খেটো না। **মাছি-মারা কেরাণী ঃ** [যে-লোক অন্ধের মতো লিখিয়া চলে] মাছিমারা একজন কেরাণীকে দিয়ে তুমি চিঠিখানা নকল করিয়েছো, তাই অজস্র ভুল এতে দেখা যাচ্ছে। **হাড়ে বাতাস লাগা ঃ** [স্বস্তি পাওয়া] ছেলের দেওয়া দুঃখকষ্ট আর সহ্য করতে না পেরে মা রেগে বল্লেন, 'তোর মরণ হয় না কেন—তবে আমার হাড়ে বাতাস লাগে।' **নয়-ছয় ঃ** [নষ্ট করা] দুদিনেই এতগুলো টাকা এমন করে নয়ছয় করে ফেল্‌লে, ভবিষ্যতে চল্‌বে কী করে ? **পায়াভারী ঃ** [অহংকারী] এই সামান্য মাইনের চাকরী পেয়েই দেখছি তোমার পায়াভারী হয়েছে, কাউকেই চোখে দেখতে পাও না। **পাথরে পাঁচ কিল ঃ** [যে প্রবল, কেহই সহজে তাহার ক্ষতি করিতে পারে না] তাঁর মতো বিত্তবান মানুষকে জব্দ করার চেষ্টা বৃথা—তাঁর তো এখন পাথরে পাঁচকিল। **বাঁ হাতের ব্যাপার ঃ** [ঘুষ্‌] যুদ্ধের বাজারে বাঁ হাতের ব্যাপারই তো হরেনকে রাতারাতি বড়লোক করে দিল। **ভাঁড়ে মা ভবানী ঃ** [ভাণ্ডার শূন্য] যে-বাড়ীতে একদিন বার মাসে তের পার্বণ লেগে ছিল, মাতাল ছেলেটির দোষেই সে বাড়ীতে আজ হাঁড়িতে ভাত চড়ে না—এখন ভাঁড়ে মা ভবানী অবস্থা। **ভাগের মা গঙ্গা পায় না** কিংবা **অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট ঃ** বৃদ্ধ ভদ্র-লোকটি মরবার সময় তাঁর পাঁচটি ছেলেকেই বলে গেলেন, আশ্রিত লোকটি যেন দুমুঠো খেতে পায়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর কোনো ছেলেই হতভাগ্য লোকটাকে খেতে দিলে না

—ভাগের মা যে গঙ্গা পায় না, এ কথা কে না জানে? **মাছের মা :** [নিষ্ঠুরপ্রাণ] তিন-তিনটি ছেলে পরপর মারা গেল, মেয়েলোকটি এতটুকু কাঁদলে না—মাছের মা যে, তার আবার শোক! **দুধের মাছি :** [ভোগবিলাসে লালিতপালিত] সে তো দুধের মাছি, এত দুঃখকষ্ট সইতে পারবে কি? **হাতটান :** [চুরিবিদ্যার অভ্যাস] অই ছেলেটাকে ঘরে একলা রেখে যেও না, ওর হাতটান আছে। **জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ :** [উভয়সংকট] যুদ্ধের সময় তার অবস্থা সংকটাপন্ন হয়েছিল; কলকাতায় থাকলে বোমা খেয়ে মরবার ভয়, আর দেশে গেলে নিশ্চিত উপোস করা—কোন্ দিকে যাবে, জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ। **হাড়-হাভাতে :** [হাড়-জ্বালানো] মা বল্লেন, এমন হাড়-হাভাতে ছেলে যার, তার কপালে কি সুখ আছে? **হ-য-ব-র ল :** [বিশৃঙ্খল] একটি কাজও সে ভালো করে করতে পারে না—তার সব কিছুই হ-য-ব-র-ল। **নেই-আঁকড়া :** [নাছোড়বান্দা] যা চাইবে তা-ই দিতে হবে; না দিলে রক্ষা নেই —এমন নেই-অাঁকড়ে ছেলে খুব কম দেখেছি। **ননীর পুতুল :** [শ্রমকাতর মানুষ] সামান্য কাজ করেই হাঁপিয়ে পড়—এমন ননীর পুতুল হলে সংসারে চলবে কী করে? **লম্বা দেওয়া :** [পলায়ন করা] সে চোরাই মাল বিক্রয় করেই বেড়ায়; সেদিন যেই দেখেছে পুলিশ আস্‌ছে, অমনি লম্বা দিলে। **চশমখোর :** [চক্ষুলজ্জাহীন] কত টাকা তার কাছে আমি পাই, কিন্তু সেদিন সামান্য দু'সের চাল দিয়ে আমার কাছ থেকে সে সঙ্গে সঙ্গে দাম আদায় করে নিলে—এমন চশমখোর লোক আর দেখিনি। **কানপাতলা :** [পরের কথা শুনে যে কাজ করে] যার-তার কথা শুনেই তুমি বিচলিত হয়ে পড়, এমন কান্‌পাতলা হলে কিছুই করতে পারবে না। **ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া :** [দরিদ্রের রুচিজ্ঞানপ্রদর্শনের সুযোগ নাই] রেশনের খাবার নিয়ে আন্দোলন করছ; সরকার যে দয়া করে দুমুঠো খেতে দিচ্ছে, সে-ই ভাগ্য—ভিক্ষার চাল আবার কাঁড়া আর আকাঁড়া! **বুনো ওল বাঘা তেঁতুল :** [উভয়েই তুল্যরূপ তীব্র] ব্রিটীশরা ভারত ছাড়বার পর একটি দেশীয় রাজ্য গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে একেবারে মারমুখো হয়ে উঠল; আর ভারতসরকার যেই গোলাবারুদ নিয়ে এগিয়ে গেলেন, তখন, তার দাপট থেমে গেল—বুনো ওলের জন্য বাঘা তেঁতুলের প্রয়োজন। **রাঘব বোয়াল :** [সর্বগ্রাসী] সরকার চোরাকারবারীদের মধ্যে শাস্তি দিচ্ছে কেবল চুনোপুঁটিদের, যারা রাঘব বোয়াল তারা গা ঢাকা দিয়েই রয়েছে। **গোঁফখেজুরে :** [অতিশয় অলস] একটু নড়ে বসতে বললেও রাগ কর,—এমন গোঁফখেজুরে লোক কখনো দেখিনি। **খাল কেটে কুমীর আনা :** [নিজের হাতে সর্বনাশ ডাকিয়া আনা] অত্যন্ত অসৎপ্রকৃতির লোক সে,—তাকে ঘরে স্থান দিয়ে তুমি সত্য সত্যই খাল কেটে কুমীর এনেছো। **চোখের চামড়া :** [লজ্জাবোধ] গুরুজনদের সামনে সে এমন অশ্লীল কথাটি কী করে উচ্চারণ করলে ভেবে পাইনে—দেখছি, তার

চোখের চামড়া নেই। **টনক নড়া :** [চৈতন্য হওয়া] নির্বিচারে প্রশ্রয় দিয়ে মা-ই ছেলেটির মাথা খেয়েছে ; কিন্তু ছেলের হাতে পুলিশের হাতকড়া যখন পড়ল, তখন মায়ের টনক নড়ল। **ঠুঁটো-জগন্নাথ :** [অপদার্থ, অকর্মণ্য] আজ পর্যন্ত কোনো একটি কাজ তাকে দিয়ে হলো না—সে পারে ঠুঁটো জগন্নাথের মতোই কেবল বসে থাকতে। **উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে :** [একজনের দোষ অপরের উপর আরোপ করা] চুরি করল নবীন, কিন্তু অতিবুদ্ধিমান পুলিশ যতীনকে পাঠাল জেলে—উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল।

কয়েকটি বিশিষ্টার্থক পদসমষ্টি

সাতসতেরো—খুঁটিনাটি ব্যাপার। **দিনে ডাকাতি**—প্রকাশ্যে সর্বনাশ। **ধরাকে সরা জ্ঞান**—অহংকারে সকলকে তুচ্ছজ্ঞান করা। **ননীর পুতুল**—শ্রমকাতর। **আলালের ঘরের দুলাল**—অত্যধিক আদর ও প্রশ্রয়ে নষ্টচরিত্র ছেলে। **অগস্ত্য যাত্রা**—যাত্রা করে আর ফিরে না আসা। **কাঁচা হাত**—অপরিপক্ব। **মুখ চূণ করা**—বিমর্ষ বা অপ্রতিভ হওয়া। **একচোখো**—পক্ষপাতদুষ্ট। **পোয়া বারো**—খুব ভালো সময় ; বিশেষ লাভ। **কথার কথা**—বাজে কথা। **জল করে দেওয়া**—ক্রোধ শান্ত করে দেওয়া। **রাশভারি**—গম্ভীর-প্রকৃতির। **হালে পানি না পাওয়া**—ক্ষমতার অসাধ্য। **মুখ রাখা**—মানরক্ষা করা। **ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ**—বাজে কাজে অর্থব্যয় করা। **গা করা**—মনোযোগ দেওয়া। **মাথায় হাত বুলানো**—ছলনাচাতুরী দ্বারা কিংবা পরকে ফাঁকি দিয়া কার্যসিদ্ধি করা। **কান ভারী করা**—কাহারো বিরুদ্ধে গোপন পরামর্শ দেওয়া। **তাল সামলানো**—বিপদ রোধ করা। **নবমীর পাঁঠা**—আসন্ন বিপদে ভীত। **চোখে সর্ষে ফুল দেখা**—অত্যধিক বিপন্ন হয়ে কী করবে বুঝে উঠতে না পারা। **অক্কা পাওয়া**—মারা যাওয়া। **অন্ধকারে ঢিল মারা**—আন্দাজে কাজ করা। **আকাশ থেকে পড়া**—আশ্চর্য হওয়ার ভাব দেখানো।

আঙুল ফুলে কলাগাছ—হঠাৎ বড়লোক হওয়া। **আঁতে ঘা দেওয়া**—মনে বড়ো রকমের আঘাত দেওয়া। **এক হাত লওয়া**—সুযোগ মতো প্রতিশোধ গ্রহণ করা। **কাজির বিচার**—খেয়ালখুশী বিচার। **কানের পোকা বার করা**—উচ্চৈঃস্বরে চীৎকারে উত্যক্ত করা। **ক-অক্ষর গোমাংস**—অক্ষরজ্ঞানবর্জিত। **এঁচোড়ে পাকা**—অকালপক্ব। **গদাই লস্করী চাল**—মন্থর গতি। **পিপুফিশু**—অতিশয় সরলচিত্ত। **গরীবের ঘোড়ারোগ**—দরিদ্রের বড়লোকী চালচলন। **গৌরচন্দ্রিকা করা**—ভূমিকা করা। **ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া**—বিপদমুক্তিজনিত

স্বস্তি অনুভব করা। **চোখ খোলা**—জ্ঞান হওয়া। **চোখ টাটানো**—হিংসা করা। **ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো**—একজনকে দিয়ে বারবার নানা কাজ করানো। **রাবণের চিতা**—মর্মঘাতী চিরদুঃখবেদনা। **জিলিপির প্যাঁচ**—কুটিলবুদ্ধি লোক। **জলে ফেলা**—বৃথা নষ্ট করা। **ঝাঁকের কই**—একদলের লোক।

ডাকাবুকো—খুব সাহসী। **তালপাতার সেপাই**—অত্যন্ত রুগ্ন। **দুষ্টা সরস্বতী**—দুষ্টবুদ্ধি। **দাঁও মারা**—প্রচুর লাভ করা। **দক্ষযজ্ঞ**—লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। **দু'কান-কাটা**—নির্লজ্জ। **ধামাধরা**—খোসামুদে। **ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির**—ভালো মানুষী ভাব দেখানো। **পটল তোলা**—মরিয়া যাওয়া। **পারের কড়ি**—পরকালের পাথেয়। **পুঁটি মাছের প্রাণ**—ক্ষীণপ্রাণ। **বড়মুখ**—বেশী আশা করা। **বাড়া ভাতে ছাই**—বড়ো রকমের অনিষ্ট। **ভরাডুবি**—সর্বনাশ। **ভিটেয় ঘুঘু চরানো**—সর্বনাশসাধন করা। **হারমাম্ভার [মগের] মুল্লুক**—অরাজক দেশ। **মান্ধাতার আমল**—অতিপ্রাচীন কাল। **ম্যাও ধরা**—ঝুঁকি বহন করা। **মাথা কাটা যাওয়া**—অপমানিত হওয়া। **মুখ তুলে চাওয়া**—প্রসন্ন হওয়া। **শকুনি মামা**—কুপরামর্শদাতা। **শিবরাত্রির সল্‌তে**—একমাত্র বংশধর। **সোনার পাথর বাটি**—অসম্ভব বস্তু। **সাত রাজার ধন**—বহুমূল্য সম্পত্তি। **হাটে হাঁড়ি ভাঙা**—গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া।

কতকগুলি ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট প্রয়োগ

[করা]

গা করা—এ কাজে মোটেই তুমি গা করছ না [গরজ করা, উদ্যম দেখানো], সেইজন্যই তো কাজটি শেষ হচ্ছে না। **হাত করা**—পুলিশকে সে হাত করেছে [বশে আনা], সুতরাং অপরাধ করেও তার শাস্তি পাওয়ার ভয় নেই। **মানুষ করা**—যতই আদরে মানুষ কর-না কেন [লালনপালন করা], পরের ছেলে কখনো আপন হয় না। **গাড়ী করা**—এত দূরের পথ হেঁটে যেও না, গাড়ী করেই [গাড়ীতে চড়ে, গাড়ী ভাড়া করে] যেও। **মাথায় করা**—তুমি দোষ করেছ, বকবো না তো কি মাথায় করে [খুব আদর দেখানো] নাচবো। **মুখ করা**—এই ছেলেটা ভারি অভদ্র, কথায় কথায় সকলকে মুখ করে [গালাগালি করা]।

[কাটা]

মাথা কাটা—তোমার চালচলন অতি কুৎসিত হয়ে উঠেছে, এমন করে আর আমাদের মাথা কেটো না [অপমান ডাকিয়া আনা]। **জিভ কাটা**—লোকটা জিভ কেটে [লজ্জিত হওয়া] বললে, আরে রাম রাম, ওকি কথা বলছেন। **আঁচড় কাটা**—

তুমি যতই কাঁদনা কেন, ও কান্নায় তাদের মনে এতটুকু আঁচড় কাটবে না [গভীর রেখাপাত করা]। **ছড়া কাটা**—লোকটি বেশ ছড়া কাটতে জানে [ছড়া আবৃত্তি করা]। **বই কাটা**—বাজার এখন খুব মন্দা, বইটি একেবারেই কাটছে না [বিক্রী হওয়া]। **নাককান কাটা**—ওই বজ্জাত লোকটার নাককান কেটেনিলেই ঠিক হয় [জব্দ করা, খুব বেশী লজ্জা দেওয়া]।

[ধরা]

মনে ধরা—জিনিষটি আমাদের বেশ মনে ধরেছে [পছন্দ হওয়া]। **দর ধরা**—একটু সস্তা করে এগুলির একটা দর ধরে দিন [মূল্যস্থির করা], তাহলে সবগুলিই কিনে নেবো। **হাতধরা**—এমন হাতধরা [বাধ্য] ছেলেটিও শেষকালে বাপমায়ের অবাধ্য হয়ে উঠলো। **মদ ধরা**—যেদিন শুনলাম যে, সে মদ ধরেছে, [মদ্যপান অভ্যাস করা] সেদিনই বুঝলাম তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। **মাথা ধরা**—আমার আজ খুব বেশী মাথা ধরেছে [শিরঃপীড়া হওয়া], এ কাজটা এখন শেষ করতে পারব না। **ভুল ধরা**—কথায় কথায় এমন ভুল ধরলে [দোষ দেখানো] কী করে সে এ কাজটি সম্পাদন করবে ?

[লাগা]

মনে লাগা—তার কথাগুলি আমার বেশ মনে লেগেছে [পছন্দ হওয়া]। **চমক লাগা**—সে এমনভাবে কথা বললে, সবারই চমক লেগে গেল [আশ্চর্যান্বিত হওয়া]। **আগুন লাগা**—মাঝরাতে তার ঘরে আগুন লাগল [সংযুক্ত হওয়া]। **দাগ লাগা**—কাপড়খানাতে কী সব দাগ লেগেছে [ময়লা স্পর্শ করা], ওটা পরোনা। **চোখ লাগা**—এত লোকের চোখ লাগলে [নজর পড়া] কি আর জিনিস ভালো থাকে! **বিষম লাগা**—ভাত খাওয়ার সময় তার বিষম লাগলো [খাওয়ার সময় খাদ্যদ্রব্য গলায় লাগা], আর খাওয়াই হলো না।

[মারা]

পাখীটাকে এমন করে **ঢিল মেরো না** [নিক্ষেপ করা], মরে যাবে যে! এমন করে **চাল মেরে** [চালাকি করে] কি সারাটি জীবনই কাটিয়ে দেবে? তোমাকে হাতে নয়, **ভাতেই মারবো**—[কষ্ট দেওয়া]। **পকেট মেরেছে** [চুরি করা] বলেই, পুলিশ লোকটিকে ধরে নিয়ে গেল। রমেন গ্রাম থেকে সেই যে **ডুব মারলো** [আত্মগোপন করা], বহুদিন তার আর কোনো খোঁজখবর পাওয়া গেল না।

[তোলা]

ছেলেটা ভারি দুষ্ট, সব সময় **হাত তোলে** [প্রহার করা]। যে-রোগে ধরেছে, এবার সে **পটল তুলবে** [মারা যাওয়া]। এত টাকা সে খরচ করলে, কিন্তু গ্রামের

লোক তবু তাকে **জাতে তুললে** না [সমাজভুক্ত করিয়া লওয়া]। এত **হাই তুলছ** কেন [হাই ছাড়া, আলস্য প্রকাশ করা], ঘুম পেয়েছে নাকি ? জুয়া খেলে সব টাকা খুইয়েছে, এবার তার **দোকানপাট তুলতে** হবে [ব্যবসায় গুটানো]।

[উঠা]

এত সাধছি, এত করছি, তবু কিছুতেই তার **মন উঠছে না** [সন্তুষ্ট হওয়া]। তুমি যা যা বলেছ, সব কথাই আমার **কানে উঠেছে** [কর্ণগোচর হওয়া]। জিনিস-পত্রের **দাম ক্রমেই উঠছে** দেখছি [বৃদ্ধি পাওয়া]। টাকা খরচ করে **জাতে ওঠার** [সামাজিক মর্যাদালাভ করা] প্রবৃত্তি আমার নেই। কদিন ধরে জিতেন খুব কষ্ট পাচ্ছে, তার **চোখ উঠেছে** [চোখের একপ্রকার অসুখ]। লাভের কথা দূরে থাক, **খরচই যে** উঠছে না [আদায় হওয়া]।

কতকগুলি বিশেষ্য পদের বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ

[কান]

তার মতো **কানকাটা** [নির্লজ্জ] লোকের পক্ষে সবকিছু করাই সম্ভব। তুমি বেসুরা গান করছো, বড্ড **কানে লাগছে** [শ্রুতিকটু বোধ হওয়া]। কথাটা আমার **কানে উঠেছে** [শ্রুতিগোচর হওয়া]। বাজে লোকের কথায় **কান দিও না** [গ্রাহ্য করা]। **কথাটা কানে গেল** কী [শুনিতে পাওয়া] ? তিনি বড়ো **কান-পাতলা** [তীক্ষ্ণ-শ্রবণশক্তিসম্পন্ন] লোক, খুব সাবধানে কথা বলবে।

[চোখ]

এতদিনে তার **চোখ ফুটলো** [বুঝিতে পারা]—বুঝলে, 'যম-জামাই-ভাগ্না এ তিন নয় আপনা।' লোকটার উপর **চোখ রেখো** [সাবধান হওয়া], তার চুরির অভ্যাস আছে। ছেলেটাকে **চোখে চোখে রাখবে** [সতর্ক দৃষ্টি রাখা], কখন যে কী বিপদ ঘটাবে তার ঠিক নেই। এমন করে পা'টা মাড়িয়ে দিলে, **চোখের মাথা খেয়েছ** [অন্ধ হাওয়া] নাকি ? **চোখ উঠেছে** [চোখের একপ্রকার ব্যাধি] বলে এ কয়দিন পড়াশুনা মোটেই করতে পারিনি।

[মাথা]

আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটার **মাথা খেয়েছে** [নষ্ট করা]। **মাথা খাও** [দিব্য দেওয়া], কলকাতায় পৌঁছামাত্রই একখানা চিঠি লিখো। যদুবাবু আমাদের **গ্রামের মাথা** [শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি]। পড়াশুনায় ছেলেটির বেশ **মাথা আছে** [মেধাবী

অর্থে]। সব বিষয়েই তুমি **মাথা ঘামাও** কেন [চিন্তা করা] বল দেখি ? সবকিছুই পারবো কিন্তু তার কাছে কিছুতেই **মাথা বিক্রী করতে** পারব না [বশ্যতাস্বীকার করা।]

[**হাত**]

সকলের কাছে **হাত পাতা** [ভিক্ষা করা] তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। ছেলেটার একটু **হাতটান** [চুরিস্বভাব] আছে, সাবধানে থেকো। এ দুর্দিনে **হাত না গুটালে** [খরচ কমানো] সংসার চালানো তোমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। শরীরের অসুস্থতার জন্যে এ কয়দিন কোনো কাজেই **হাত দিতে** পারিনি [আরম্ভ করা]। আমার কাছে এসেছো, কিন্তু এ বিষয়ে আমার কোনো **হাত নেই** [প্রভাব অর্থে]। কত কাজ পড়ে আছে—একটু **হাত চালাও** [দ্রুত কাজ করা], নতুবা খুব অসুবিধেয় পড়তে হবে।

[**মুখ**]

এমন জঘন্য কাজ করে **মুখ দেখাতে** [সমাজে চলা] তোমার লজ্জাবোধ হয় না? কারও **মুখ চেয়ে** কথা বলা [খাতির করা] রামবাবুর স্বভাব নয়। বউটি তাদের ছেলেটাকে **'মুখপোড়া'** বলে গাল দিলে। গোপাল সেদিন যে-কাজটা করলে তার জন্যে বাপমায়ের **মুখে কালি** [দুর্নাম হওয়া] পড়লো। লেখাপড়া করে মানুষ হও, যেন আমাদের **মুখ রাখতে** [মর্যাদারক্ষা করা] পার। একদিন তাদের দুজনার মধ্যে কত-না ভাব ছিল, কিন্তু আজ পরস্পরের **মুখ-দেখা** [সাক্ষাৎকার] পর্যন্ত বন্ধ হয়েছে।

[**বুক**]

মায়ের **বুকফাটা** [করুণ] কান্না শুনে সবারই চোখে জল এলো। সাহসে **বুক বেঁধে** [দৃঢ়চিত্ত হওয়া] একাজে নেমে পড়ো, নিশ্চয়ই তুমি সফল হবে। ছেলের গৌরবকথা শুনে মায়ের **বুক উঁচু** [গর্ব অনুভব করা] হয়ে উঠলো। তাকে আমি **বুকে করে** [পরম আদরযত্নে] মানুষ করেছি। যতই প্রতিবাদ কর-না-কেন, একথা আমি **বুক ঠুকে** [সৎসাহস প্রকাশ করিয়া] বলবই বলব।

[**গা**]

দেখছি, আমার কথাটি তুমি **গায়েই মাখছো** না [গ্রাহ্য করা]। আর ক'দিন **গা-ঢাকা দিয়ে** থাকবে [আত্মগোপন করা] ? **গা করছ না** [গরজ করা] বলেই এ কাজটি শেষ হতে এত দেরী লাগছে। এইটুকু ছোটছেলের **গায়ে হাত তুলতে** [প্রহার করা] তোমার লজ্জাবোধ হয় না? তাকে এত বকেও তোমার **গায়ের ঝাল মিটল** না [আক্রোশ মিটান] ?

কতকগুলি বিশেষণ পদের বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ

পাকা : পাকা [ত্রুটিহীন] কাজ, পাকা বাড়ী (দালান], পাকা কথা [চূড়ান্ত কথা], পাকা [ওস্তাদ] চোর, পাকা [বাঁধান] রাস্তা, পাকা [বিচক্ষণ] লোক, ইত্যাদি।

কাঁচা : কাঁচা [অনিপুণ] লেখা, কাঁচা [ত্রুটিপূর্ণ] কাজ, কাঁচা [নগদ] পয়সা; কাঁচা [অপরিণতবুদ্ধি] লোক, কাঁচা [অপূর্ণ] ঘুম, কাঁচা [অদগ্ধ] ইট, ইত্যাদি।

ছোট : ছোট [তুচ্ছ] কথা, ছোট [ক্ষুদ্র] মন, ছোট [আভিজাত্যহীন] ঘর, ছোট [অন্ত্যজ] লোক, ছোট [নিকৃষ্ট] নজর, ইত্যাদি।

দৃষ্টান্তযোগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ কর

[ক] সমধাতুজ বা ধাত্বর্থক কর্ম ; [খ] প্রযোজক বা ণিজন্ত ক্রিয়া ; [গ] প্রযোজক কর্তা ; [ঘ] বিধেয় বিশেষণ ; [ঙ] নামধাতু ; [চ] সকর্মক ধাতুর অকর্মকত্ব ; [ছ] অকর্মক ধাতুর সকর্মকত্ব ; [জ] ব্যতিহার কর্তা ; [ঝ] সাপেক্ষ সর্বনাম ; [ঞ] কর্মপ্রবচনীয় বা অনুসর্গ ; [ট] গতি ; [ঠ] প্রাতিপদিক ; [ড] ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া ; [ঢ] নিত্যসম্বন্ধীয় অব্যয় ; [ণ] পদান্বয়ী অব্যয় ; [ত] সমুচ্চয়ী অব্যয় ; [থ] অনন্বয়ী অব্যয় ; [দ] সনন্তজাত ও যঙন্তজাত শব্দ ; [ধ] নিপাতনে সন্ধি।

[ক] **সমধাতুজ বা ধাত্বর্থক কর্ম :** ক্রিয়াপদ ও কর্মপদ একার্থক হইলে অকর্মক ধাতু সকর্মক হইয়া যায়। এইরূপ ক্রিয়ার কর্মকে সমধাতুজ কর্ম বা **ধাত্বর্থক কর্ম** [**Cognate Object**] বলে। যেমন, তুমি আজ কী **ঘুম** ঘুমালে। আর **মায়াকান্না** কাঁদতে হবে না, ইত্যাদি।

[খ] **প্রযোজক বা ণিজন্ত ক্রিয়া :** প্রযোজন, প্রবর্তন বা প্রেরণ করা অর্থে অর্থাৎ কোনো-একটি কার্য অপর-একজন দ্বারা সম্পাদন করা অর্থে, সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর 'ণিচ্' হয় এবং এই ণিচ্-প্রত্যয়যুক্ত ধাতুকে বলে **ণিজন্ত ধাতু**। বাংলাতেও প্রযোজন বা প্রেরণ অর্থে ণিজন্তজাতীয় প্রত্যয়যোগে ক্রিয়ার কিছুটা রূপান্তর হয়। বাংলায় মূলধাতুর উত্তর 'আ' কিংবা 'ওয়া'-প্রত্যয় করিয়া ণিজন্ত ধাতু বা প্রযোজক ক্রিয়া গঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং 'আ' কিংবা 'ওয়া'-প্রত্যয়ান্ত ধাতু হইতে ধাতু-বিভক্তি-যোগে যে-সমস্ত ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, সেগুলিরই নাম **প্রযোজক ক্রিয়া বা ণিজন্ত ক্রিয়া**। যে-ব্যক্তি অপরকে দিয়া কোনো কাজ করায় তাহাকে **প্রযোজক কর্তা,** এবং

যাহাকে দিয়া কাজটি করায় তাহাকে **প্রযোজ্য কর্তা** বলে। যেমন, শিক্ষকমহাশয় ছাত্রটিকে পড়াইতেছেন—এই বাক্যে 'শিক্ষকমহাশয়' প্রযোজক [কর্তা], 'ছাত্রটি' প্রযোজ্য [কর্তা] এবং 'পড়াইতেছেন' ('পড়' ধাতু + 'আ' প্রত্যয়) প্রযোজক বা ণিজন্ত ক্রিয়া।

[গ] **বিধেয় বিশেষণ** : বাক্যের দুইটি অংশ—উদ্দেশ্য-অংশ ও বিধেয়-অংশ। যাহাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলা হয় তাহা **উদ্দেশ্য,** এবং ঐ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা পরিব্যক্ত হয়, তাহা **বিধেয়**। বাক্যের বিধেয়-অংশে উদ্দেশ্যের যে-বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাকেই **বিধেয় বিশষেণ** বলে। যেমন, সন্ধ্যাপ্রকৃতির এই দৃশ্যটি **মনোরম**—এখানে 'মনোরম' পদটি বিধেয় বিশেষণ। বিশেষণ পদ সাধারণত বিশেষ্যের পূর্বেই বসে, কিন্তু বিধেয় বিশেষণ উদ্দেশ্য পদের [বিশেষ্য] পরেই বসিয়া থাকে। বিধেয় বিশেষণ পদের কাজ হইল উদ্দেশ্য পদের গুণ, ধর্ম বা অবস্থা প্রভৃতি বুঝানো।

[ঘ] **নামধাতু** : নাম-শব্দ অর্থাৎ বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয় প্রভৃতি শব্দ কখনো প্রত্যয়যোগে, কখনো প্রত্যয়ের সহিত যুক্ত না হইয়া ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়—এই সকল ক্রিয়ার ধাতুকেই **নামধাতু** বলে। যেমন, জুতা>জুতানো, পিছল>পিছলানো, প্রভাত>প্রভাতিল, নাদ>নাদিল, মুকুল>মুকুলিল, মড়মড়>মড়মড়াইয়া, ইত্যাদি।

[ঙ] **সকর্মক ধাতুর অকর্মত্ব** : যে-ক্রিয়ার কর্ম আছে, তাহাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। কখনো কখনো সকর্মক ধাতু অকর্মকের মতো ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন, ভগবান চোখ দিয়াছেন, তাই **দেখি** ; কান দিয়াছেন, তাই **শুনি** ; মুখ দিয়াছেন, তাই **খাই**।

[চ] **অকর্মক ধাতুর সকর্মকত্ব** : ক্রিয়া ও কর্ম একই অর্থ দ্যোতিত করিলে অকর্মক ধাতু সকর্মক হয়। যেমন, আমাকে দেখে তুমি বুঝি বিদ্রূপের হাসি হাসলে? এই বাক্যে 'বিদ্রূপের হাসি' 'সমধাতুক কর্ম'। আবার, কতকগুলি ধাতু কখনো অকর্মক, কখনো সকর্মকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমি কিছুই ভাবছি না, তুমি কী ভাবছো, বল। এখানে 'ভাবছো' ক্রিয়াপদটি সকর্মক।

[ছ] **ব্যতিহার কর্তা** : দুইটি কর্তার মধ্যে যখন ক্রিয়াবিনিময় বুঝায়, তখন ঐ দুইটি কর্তাকে ব্যতিহার কর্তা বলে। যেমন, **রাজায়-রাজায়** যুদ্ধ বাধে আর প্রজাদের হয় সর্বনাশ। **বাপ-বেটাতে** এমন ঝগড়া হতে কখনো দেখিনি!

[জ] **সাপেক্ষ সর্বনাম** : বাক্যে কোনো একটি সর্বনাম-পদ ব্যবহার করিলে যখন তদ্রূপ অন্য একটি সর্বনাম-পদ প্রয়োগ করিতে হয়, নতুবা বাক্যটির অর্থ সম্পূর্ণ হয় না, তাহাই **সাপেক্ষ সর্বনাম**। যেমন, তুমি **যাহা** চাহিয়াছিলে **তাহা** তোমাকে দিয়াছি, এখন তোমার কোনো অনুযোগের কারণ থাকিতে পারে না।

[ঝ] **কর্মপ্রবচনীয় বা অনুসর্গ** : বাংলাভাষায় কতকগুলি পদ আছে,

ইহারা বাক্যে স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। আবার, ইহারা বিভক্তিরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে, অর্থাৎ এই পদগুলি কোনো বিশেষ্যের পরে বসিয়া ঐ বিশেষ্যকে কোনো একটা বিশেষ কারকত্ব প্রদান করিতে পারে ; এই পদগুলিকেই বলা হয় **কর্ম-প্রবচনীয়** বা **অনুসর্গ** বা **পরসর্গ**। যেমন, দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক [করণ কারকে] ; লাগিয়া, জন্য, তরে [সম্প্রদান কারকে] ; থাকিয়া, হইতে [অপাদান কারকে] ; মধ্যে, নিকট, [অধিকরণ কারকে]।

[ঞ] **গতি :** উপসর্গ ভিন্ন যে-সমুদয় অব্যয় ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া সমাসবদ্ধ পদ সৃষ্টি করে, তাহাদিগকে **গতি** বলে। আবিঃ, পুরঃ, প্রাদুঃ, বহিঃ, তিরঃ, অলং, সাক্ষাৎ, এই অব্যয়গুলিই গতি-নামে পরিচিত। ইহাদের যোগে সমাসবদ্ধ পদগঠনের উদাহরণ : আবির্ভাব, আবিষ্কার, পুরোহিত, পুরস্কার, প্রাদুর্ভাব, বহিষ্কার, তিরোধান, অলংকার, সাক্ষাৎকার, ইত্যাদি।

[ট] **প্রাতিপদিক :** বিভক্তিহীন নাম-প্রকৃতি [মৌলিক শব্দকে 'প্রকৃতি' বলে] অথবা সাধিত শব্দকে **প্রাতিপদিক** বলে। ক্রিয়াপদের বিশিষ্ট প্রত্যয়যুক্ত কিন্তু বিভক্তিহীন ধাতু-প্রকৃতি বা ধাতুও প্রাতিপদিক-নামে অভিহিত হয়। সুতরাং প্রাতিপদিক দুই প্রকারের—নাম-প্রাতিপদিক ও ক্রিয়া-প্রাতিপদিক। সহজ কথায় বলা যায়, 'প্রকৃতি'-র সহিত প্রত্যয়ের যোগে যে-শব্দ বা ধাতু গঠিত হয়, তাহাদেরই নাম প্রাতিপদিক। যেমন, মাঠ + উয়া = মাঠুয়া > মেঠো ; চল্ + তি = চল্‌তি, হাস্ + আ = হাসা, ইত্যাদি।

[ঠ] **ধ্বন্যাত্মক ক্রিয়া :** অনুকার-অব্যয়ের সহিত 'কর্'-ধাতু যোগ করিয়া যে-ক্রিয়া গঠিত হয় তাহার নাম **ধ্বন্যাত্মক** ক্রিয়া। যেমন, ধপ্‌ধপ্ করা, মড়্‌মড়্ করা, বোঁ-বোঁ করা, শন্‌শনিয়ে, বন্‌বনিয়ে, ইত্যাদি।

[ড] **নিত্য-সম্বন্ধীয় অব্যয় :** কোনো বাক্যে দুইটি অব্যয়কে যখন একসঙ্গেই প্রয়োগ করিতে হয়, ইহাদের একটি ছাড়া অপরটী প্রায়ই এককভাবে ব্যবহৃত হয় না, বাক্যে প্রযুক্ত এইরূপ দুইটি অব্যয়কে **নিত্য-সম্বন্ধীয় অব্যয়** বলা হইয়া থাকে। যথা : যদি—তবে ; বটে—কিন্তু ; বরং—তবু, ইত্যাদি।

[ঢ] **পদান্বয়ী অব্যয় :** কতকগুলি অব্যয়ের সাহায্যে শব্দের পর বিশেষ বিশেষ বিভক্তি বসানো হইয়া থাকে। ঐ সকল বিভক্তিযুক্ত পদের সহিত ঐ অব্যয়গুলির অন্বয় হয় – ইহাদিগকে **পদান্বয়ী অব্যয়** বলে। যথা, রামের **চেয়ে** শ্যাম বুদ্ধিমান। পদান্বয়ী অব্যয়ের উদাহরণ : নিমিত্ত, জন্য, সহ, সহিত, সঙ্গে, মত, বিনা, দারুণ, ধিক্, ইত্যাদি।

[ণ] **সমুচ্চয়ী অব্যয় :** যে-সকল অব্যয় দুইটি বাক্য বা পদের সংযোজক বা বিয়োজক-কাজ সমাধা করে তাহাদিগকে **সমুচ্চয়ী অব্যয়** বলা হয়। যেমন,

রামবাবু হৃদয়বান **এবং** বুদ্ধিমান। বিনয় **অথবা** সুধীরকে দিয়াই এই কাজটি করাইতে হইবে।

[ত] **অনন্বয়ী অব্যয়** : বাক্যস্থিত পদের সহিত যে-সব অব্যয়ের ব্যাকরণ-গত কোনো সম্বন্ধ থাকে না, উহারাই **অনন্বয়ী অব্যয়**। যেমন, **ইঃ** কী ভয়ানক গরম পড়েছে আজ! **ছিঃ**, ভদ্রসন্তান হয়ে তুমি এমন কাজটি করতে পারলে!

[থ] **সনন্তজাত ও যঙন্তজাত শব্দ :**

সনন্ত ও যঙ্‌ন্ত ধাতুর প্রয়োগ বাংলা ব্যাকরণে দৃষ্ট হয় না—সংস্কৃত সনন্ত ও যঙ্‌ন্ত ধাতুজাত বিশেষ্য বা বিশেষণ পদগুলিই বাংলায় সাধারণত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংস্কৃতে 'ইচ্ছা' অর্থে ধাতুর উত্তর 'সন্'-প্রত্যয় হয়, এবং কয়েকটি বিশেষ ধাতুর উত্তর পৌনঃপুন্য ও অতিশয় অর্থে যঙ্' প্রত্যয় হয়। এই সনন্ত ও যঙ্‌ন্ত ধাতু হইতে উৎপন্ন পদগুলির **সনন্তজাত ও যঙন্তজাত শব্দ**-নামে পরিচিত। যেমন :

মূলধাতু	সনন্তধাতু	প্রত্যয়	সিদ্ধপদ	অর্থ
পা	পিপাস্	আ	পিপাসা	পান করিবার ইচ্ছা
দৃশ্	দিদৃক্ষ্	উ	দিদৃক্ষু	দেখিতে ইচ্ছুক
হন্	জিঘাংস্	আ	জিঘাংসা	হননের ইচ্ছা
জ্ঞা	জিজ্ঞাস্	আ	জিজ্ঞাসা	জানিবার ইচ্ছা
জি	জিগীষ্	আ	জিগীষ	জয় করিবার ইচ্ছা
ভুজ্	বুভুক্ষ্	আ	বুভুক্ষা	ভোজন করিবার ইচ্ছা
দীপ্	{ দেদীপ্য	শানচ [মান]	দেদীপ্যমান	অতিশয় দীপ্ত
রুদ্	{ রোদ্	শানচ [মান]	রোরুদ্যমান	অতিশয় রোদনশীল
দুল্	{ দোদুল	শানচ [মান]	দোদুল্যমান	যাহা পুনঃ পুনঃ দুলিতেছে

[বন্ধনীর মধ্যস্থিত তিনটি ধাতু যঙ্‌ন্ত]

[দ] **নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি** : ব্যাকরণে স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি, বিসর্গসন্ধিবিষয়ে নানা বিধিবিধান লিপিবদ্ধ আছে। কতকগুলি শব্দ সন্ধিবিষয়ক ব্যাকরণের উক্ত নিয়ম অনুসারে সিদ্ধ নয়, উহারা ঐ নিয়মের বহির্ভূত। এই নিয়মবহির্ভূত সন্ধিকেই বলা হয় নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি। যেমন :

কুল + অটা = কুলটা ['কুলাটা' নয়], গো + অক্ষ = গবাক্ষ ['গবক্ষ' নয়] ; প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ় ['প্রোঢ়' নয়] ; অক্ষ + ঊহিণী = অক্ষৌহিণী ['অক্ষোহিণী' নয়]। তদ্রূপ্ বৃহস্পতি, বনস্পতি, হরিশ্চন্দ্র, গোষ্পদ, পতঞ্জলি, ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পর্কিত কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের পরিচয়

[ক] ক-বর্গ, **চ**-বর্গ, **ট**-বর্গ, **ত**-বর্গ ও **প**-বর্গের অন্তর্ভুক্ত বর্ণগুলিকে অর্থাৎ **ক্** হইতে **ম্ পর্যন্ত** পঁচিশটি বর্ণকে **স্পর্শবর্ণ** বা **বর্গীয় বর্ণ** বলা হয়। **য্, র্, ল্, ব্** —এই চারিটির নাম হইল **অন্তঃস্থ বর্ণ**। **শ্, ষ, স্, হ**— এই চারিটির নাম **উষ্ম বর্ণ**। বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণকে বলে **অল্পপ্রাণ-বর্ণ** এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে বলে **মহাপ্রাণ-বর্ণ**। আবার, বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণকে বলা হয় **অঘোষ বর্ণ**; আর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবং য্-র্-ল্-ব্-হ-কে বলা হয় **ঘোষবর্ণ** বা **নাদবর্ণ**।

অশুদ্ধি-সংশোধন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অহোরাত্রি	অহোরাত্র	জ্ঞাতার্থে	জ্ঞানার্থে
অধীনস্থ	অধীন	দিবারাত্র	দিবারাত্রি
অজাগর [সর্প অর্থে]	অজগর	দারিদ্র্যতা	দারিদ্র্য
অদ্যাপিও	অদ্যাপি		দরিদ্রতা
উপরোক্ত	উপরি-উক্ত, উপর্যুক্ত	সখ্যতা	সখ্য
		নিরোগী	নীরোগ
উদ্বেলিত	উদ্বেল	নিরস	নীরস
একত্রিত	একত্র	ভূম্যাধিকারী	ভূম্যধিকারী
ঐক্যতান	ঐকতান	সন্মুখ	সম্মুখ
জরাগ্রস্থ	জরাগ্রস্ত	মনমোহন	মনোমোহন
অহর্নিশি	অহর্নিশ	পশ্বাধম	পশ্বধম
আয়ত্ব	আয়ত্ত	পৈত্রিক	পৈতৃক
আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা	পরিত্যজ্য	পরিত্যাজ্য
আহ্নিক	আহ্নিক	পুরষ্কার	পুরস্কার

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আবশ্যকীয়	আবশ্যক	দোষণীয়	দূষণীয়
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত	নিরাপদেষু	নিরাপৎস্থ
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ	বারম্বার	বারংবার
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	বিদ্যান	বিদ্বান
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে	বিদ্যুতালোক	বিদ্যুদালোক
কিম্বদন্তী	কিংবদন্তী	বিদ্বানগণ	বিদ্বদ্গণ
নির্দোষী	নির্দোষ	বাহুল্যতা	বহুলতা / বাহুল্য
নিরপরাধী	নিরপরাধ		
দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট	নির্ধনী	নির্ধন
চিরজীবেষু	চিরজীবিষু	ব্যাকুলিত	ব্যাকুল
মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট	বিবিধপ্রকার	বিবিধ
চক্ষুদ্বয়	চক্ষুর্দ্বয়	ব্যবসা	ব্যবসায়
বয়োপ্রাপ্ত	বয়ঃপ্রাপ্ত	সেবিকা	সেবকা
বনষ্পতি	বনস্পতি	পথমধ্যে	পথিমধ্যে
বৃহষ্পতি	বৃহস্পতি	অপ্সরী	অপ্সরা
মহদুপকার	মহোপকার	তদ্দৃষ্টে	তদ্দর্শনে
মৃণ্ময়	মৃন্ময়	সশঙ্কিত	শঙ্কিত / সশঙ্ক
মধ্যাহ্ণ	মধ্যাহ্ন		
পূর্বাহ্ন	পূর্বাহ্ণ	মহারথী	মহারথ
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ	যুবাগণ	যুবগণ
মাতৃস্বসা	মাতৃষ্বসা	সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা
সবিনয়পূর্বক	সবিনয় / বিনয়পূর্বক	সম্বরণ	সংবরণ
		হৃদকম্প	হৃৎকম্প
শিরোশোভা	শিরঃশোভা	আহরিত	আহৃত
সাহার্য	সাহায্য	সৃজন	সর্জন, সৃষ্টি
সৌজন্যতা	সৌজন্য	সম্ভব	সম্ভবপর
মান্যনীয়	মান্য, মাননীয়	প্রফুল্লিত	প্রফুল্ল
বিহঙ্গিনী	বিহঙ্গী	মৌন [বিশেষণে]	মৌনী
ভ্রাতাগণ	ভ্রাতৃগণ	অদ্ভূত	অদ্ভুত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সম্মিলন	সম্মেলন	নুপুর	নূপুর
সত্বা	সত্তা	কৌতুহল	কৌতূহল
মনমুগ্ধকর	মনমোহকর	বিকীরণ	বিকিরণ
মহারাজা	মহারাজ	মুমুর্ষু	মুমূর্ষু
সক্ষম	ক্ষম, সমর্থ	দুর্বিসহ	দুর্বিষহ
লজ্জাষ্কর	লজ্জাকর	সন্নাসী	সন্ন্যাসী
শশীভূষণ	শশিভূষণ	স্বয়ম্বর	স্বয়ংবর
সুকেশিনী	সুকেশী	চাতকিনী	চাতকী
ননদিনী	ননদী	অজানিত	অজ্ঞাত
ভুজঙ্গিনী	ভুজঙ্গী	নিশীথ রাত্রি	নিশীথ বা মধ্যরাত্র
নিন্দুক	নিন্দক	কথিতব্য	কথয়িতব্য
সদ্যজাত	সদ্যোজাত	স্বত্বাধিকার	স্বত্ব বা অধিকার
উচ্ছন্ন	উৎসন্ন	সমতুল্য	সম বা তুল্য
দিগেন্দ্র	দিগিন্দ্র	পরমাসুন্দরী	পরমসুন্দরী
অজ্ঞানী	অজ্ঞান	নিজস্ব ধন	নিজস্ব বা নিজধন
বিধর্মী	বিধর্মা		
নির্দোষী	নির্দোষ	সুন্দরী স্ত্রীলোক	সুন্দরী স্ত্রী

ব্যাকরণের প্রশ্নোত্তর

—ইন্টার বাংলার প্রশ্নপত্র হইতে সংকলিত—

[১] নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে-কোনো পাঁচটির বিপরীতার্থক শব্দ লেখ ও সেই শব্দগুলি লইয়া এক-একটি বাক্য রচনা কর :

রাগ, জয়, আরোহণ, অগ্রজ, প্রসারণ, আবির্ভাব, শিক্ষক, ওস্তাদ, মরণ, হ্রাস, আপদ, তামসিক, ক্ষয়িষ্ণু, তন্বী, সাধু।

রাগ : **বিরাগ** : সংসারের প্রতি প্রবল বিরাগভাবহেতু অবশেষে তিনি সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিলেন। জয় : **পরাজয়** : ক্লাইভের নিকট নবাব সিরাজদ্দৌলার পরাজয় যেমন শোচনীয়, তেমনি মর্মান্তিক। আরোহণ : **অবরোহণ** অথবা **অবতরণ** : বৃক্ষ হইতে অবতরণকালে তিনি সাংঘাতিকভাবে আহত হইলেন। অগ্রজ : **অনুজ** : রামানুজ লক্ষ্মণের মত ভ্রাতৃবৎসল মানব বর্তমান জগতে সত্যই দুর্লভ। প্রসারণ : **সংকোচন** : প্রশ্নপত্রের বাক্যসংকোচন-অংশটির উত্তর করা খুবই সহজ। আবির্ভাব : **তিরোভাব** অথবা **তিরোধান** : গান্ধীজির তিরোভাবে সমগ্র ভারত শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। শিক্ষক : **শিক্ষার্থী** অথবা **ছাত্র** : সক্রিয় রাজনীতিতে ছাত্র-সম্প্রদায়ের যোগদান করার ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্পর্কে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। ওস্তাদ : **আনাড়ি** : তুমি যে এতখানি আনাড়ি তাহা যদি পূর্বে জানিতাম, তবে তোমাকে কখনো সঙ্গে আনিতাম না। মরণ : **বাঁচন** কিংবা **জীবন** অথবা **জনম** : যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে স্বল্পবিত্ত বাঙালী আজ জীবনমরণ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। হ্রাস : **বৃদ্ধি** : যেভাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে,তাহাতে সংসারযাত্রানির্বাহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। আপদ : **সম্পদ** : সম্পদের প্রাচুর্যের দিনে বন্ধুর অভাব হয় না, অভাব ঘটে কেবল আপদবিপদের মুহূর্তে। তামসিক : **সাত্ত্বিক** অথবা **রাজসিক** : তিনি ছিলেন নিরাসক্ত মানুষ, তাঁহার অন্তর ছিল সাত্ত্বিক ভাবে পরিপূর্ণ। ক্ষয়িষ্ণু : **বর্ধিষ্ণু** : নন্দীপুর একসময়ে বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল, কিন্তু বর্তমানে উহা ক্ষয়িষ্ণুতার মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। তন্বী : **স্থূলাঙ্গী** : তন্বী নারীর সৌন্দর্য স্থূলাঙ্গী রমণীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধু : **চোর** অথবা **ভণ্ড** : ধনিকসম্প্রদায়ের কোনো অভাব নাই, সুতরাং তাঁহারা সাধু; কিন্তু দরিদ্র ক্ষুধার জ্বালায় দ্রব্য অপহরণ করিলে সমাজে তাহাকে চোরের দণ্ড পাইতে হয়।

[২] নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে যে-কোনো পাঁচটির প্রতিশব্দ লেখ :

সেনার চালনা যিনি করেন ; যাহা অস্ত যাইতেছে ; যে মমতা জানে না ; যাহা পূর্বে শোনা যায় নাই ; যাহার দুই হাত চলে ; ঈশ্বরে যাহার আস্থা নাই ; যে সাপ

খেলাইয়া জীবিকা অর্জন করে; হরিণের চামড়া; হস্তীর চীৎকার; বৃহৎ অরণ্য; উপকারের ইচ্ছা; ধ্যানের যোগ্য।

সেনার চালনা যিনি করেন: **সেনানী, সেনানায়ক, সেনাপতি**। যাহা অস্ত যাইতেছে: **অস্তায়মান, অস্তগামী, অস্তোন্মুখ**। যে মমতা জানে না: **নির্মম**। যাহা পূর্বে শোনা যায় নাই: **অশ্রুতপূর্ব**। যাহার দুই হাত চলে: **সব্যসাচী**। ঈশ্বরে যাহার আস্থা নাই: **নাস্তিক**। যে সাপ খেলাইয়া জীবিকা অর্জন করে: **সাপুড়িয়া**। হরিণের চামড়া: **অজিন**। হস্তীর চীৎকার: **বৃংহণ, বৃংহিত**। বৃহৎ অরণ্য: **অরণ্যানী**। উপকারের ইচ্ছা: **উপচিকীর্ষা**। ধ্যানের যোগ্য: **ধ্যেয়**।

[৩] **নিম্নোদ্ধৃত বিশেষ্য পদগুলিকে বিশেষণ পদে পরিণত করিয়া উহাদের প্রত্যেকটির দ্বারা এক-একটি বাক্য রচনা কর:**

যশঃ, বাক্, পুরুষ, মৃত, অধ্যয়ন, প্রার্থনা, পান, কামনা, উপলব্ধি, আঘাত, সাহিত্য, পরিচয়, বায়ু, শ্রম, আরোহণ, বিদ্যুৎ, গান, কৌতূহল।

যশঃ—**যশস্বী**: যশস্বী ব্যক্তিরা মৃত্যুকে বরণ করিয়াও মৃত্যুঞ্জয়। বাক্—**বাগ্মী**: স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ছিলেন। পুরুষ—**পৌরুষেয়**: আর্যভারতের হিন্দুর বেদগ্রন্থ পৌরুষেয় [মনুষ্যরচিত] শাস্ত্র নহে। মৃৎ—**মৃন্ময়**: বাংলার শিল্পীরা মৃন্ময়মূর্তিনির্মাণে সুদক্ষ। অধ্যয়ন—**অধীত**: অধীত বিদ্যা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে না পারিলে উহা বস্তুতই মূল্যহীন। প্রার্থনা—**প্রার্থিত**: প্রার্থিত বস্তু লাভ করিবার জন্য তাহাকে পরিশ্রমস্বীকার করিতে হয় নাই। পান—**পানীয়**: পানীয় জল যাহাতে দূষিত না হয় সেদিকে সকলের সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। কামনা—**কাম্য**: শত চেষ্টা করিয়াও কাম্যবস্তুলাভে সে আজ পর্যন্ত সফলকাম হইল না। উপলব্ধি—**উপলব্ধ**: বুদ্ধদেব তাঁহার উপলব্ধ সত্যই জগতে উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আঘাত—**আহত**: যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হইয়া সহস্র সহস্র বীর সৈনিক অবশেষে প্রাণত্যাগ করিল। সাহিত্য—**সাহিত্যিক**: বিভিন্ন সাহিত্যিক-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরিচয়—**পরিচিত**: বহুদিন পর সেই পরিচিত স্থানটি দেখিয়া গভীর আনন্দ লাভ করিলাম। বায়ু—**বায়বীয়**: বায়বীয় পদার্থকে চোখে দেখা যায় না। শ্রম—**শ্রান্ত**: তিনি এত দুর্বল, সামান্য পরিশ্রমেই শ্রান্ত হইয়া পড়েন। আরোহণ—**আরূঢ়**: অশ্বে আরূঢ় হইয়া তিনি ভ্রমণে বাহির হইলেন। বিদ্যুৎ—**বৈদ্যুতিক**: বর্তমানে বিবিধ যন্ত্র বৈদ্যুতিক শক্তির সহায়তায় চালিত হইয়া থাকে। গান—**গীত**: আজিকার সভায় তাঁহার রচিত একটি সংগীত গীত হইল। কৌতূহল—**কৌতূহলী**: সহস্র জনের কৌতূহলী দৃষ্টি এড়াইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

[৪] নিম্নোদ্ধৃত বিশেষণ পদগুলিকে বিশেষ্য পদে রূপান্তরিত করিয়া উহাদের সাহায্যে এক-একটি বাক্য রচনা কর :

বাবু, প্রণীত, নিষ্কর্মা, মধুর, প্রপীড়িত, আহৃত, সুগন্ধ, অনাদৃত, দক্ষ, বিপ্রলব্ধ, পরাক্রান্ত, অনভ্যস্ত।

বাবু—**বাবুয়ানা** : গরীবের ছেলের পক্ষে বাবুয়ানা করা অমার্জনীয় অপরাধই বলিতে হইবে। প্রণীত—**প্রণয়ন** : তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। নিষ্কর্মা—**নৈষ্কর্ম** : আমাদের গীতার মতে নৈষ্কর্ম অর্থে কর্মত্যাগ নহে, সকল প্রকারের কর্মফলত্যাগ। মধুর—**মাধুর্য** : স্বভাবের মাধুর্যগুণেই তিনি সকলের চিত্ত হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রপীড়িত—**প্রপীড়ন** : দুঃখবেদনার শত সহস্র প্রপীড়ন বিদ্যাসাগরের প্রতিভাকে মলিন করিতে পারে নাই। আহৃত—**আহরণ** : ডুবুরীরা সমুদ্রের অতল জলে নিমজ্জিত হইয়া মহামূল্য মণিমুক্তা আহরণ করে। সুগন্ধ—**সৌগন্ধ্য** : ফুলের সৌগন্ধ্যই মৌমাছিকে প্রলুব্ধ করে। অনাদৃত—**অনাদর** : সমাজের অনাদর-উপেক্ষা-লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া তোমাকে এই মহৎকার্যসম্পাদনে অবশ্যই অগ্রসর হইতে হইবে। দক্ষ—**দক্ষতা** : কার্যবিভাগপ্রণালী [Division of Labour] যে কর্মদক্ষতা বাড়ায়, সে-কথা অবশ্যস্বীকার্য। বিপ্রলব্ধ—**বিপ্রলম্ভ** : বৈষ্ণবসাহিত্যে বিপ্রলম্ভ [বিরহ]-পর্যায়ের পদগুলি করুণ মাধুর্যে সত্যই অতুলনীয়। পরাক্রান্ত—**পরাক্রম** : অমিত পরাক্রমের অধিকারী বলিয়াই সিংহকে পশুরাজ বলা হয়। অনভ্যস্ত—**অনভ্যাস** : অনভ্যাসবশত এ কার্য সম্পাদন করা আমার পক্ষে এখন দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

[৫] নিম্নোদ্ধৃত পদগুলিকে প্রয়োজন মতো বিশেষ্য কিংবা বিশেষণে রূপান্তরিত করিয়া উহাদের প্রত্যেকের সাহায্যে এক-একটি বাক্য রচনা কর :

উচিত, আরূঢ়, সংখ্যা, বস্তু, সূর্য, বিহিত, প্রসন্ন, সংক্ষুব্ধ, ধ্যান, বায়ু, আসন, ফেন, মুখ, অবসন্ন, ব্যাহত, বিধান, ইষ্ট, বৈধ।

উচিত—**ঔচিত্য** : শব্দপ্রয়োগে কবির ঔচিত্যবোধ না থাকিলে কাব্যসৃষ্টি কখনো রসোত্তীর্ণ হয় না। আরূঢ়—**আরোহণ** : হিমালয়ের সর্বোচ্চ দেশে সর্বপ্রথম আরোহণ করিলেন এডমণ্ড হিলারি ও তেনজিং। সংখ্যা—**সাংখ্য** : বাঙ্লার জন-মৃত্যুর সাংখ্যমান দেখিয়া মনে হয়, বাঙালী আজ দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। বস্তু—**বাস্তব** : রূঢ় বাস্তবের সংস্পর্শে আসিলে মানুষের জগৎ ও জীবন-সম্পর্কিত স্বপ্ন-বিলাস দু'দিনেই মুছিয়া যায়। সূর্য—**সৌর** : সৌরমণ্ডলের জ্যোতিষ্কগুলি অবিরত সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতেছে। বিহিত—**বিধান** : 'ন্যায়ের বিধান দিল

রঘুমণি চণ্ডীদাস গাহিল গান।' প্রসন্ন—**প্রসাদ**ঃ মীরজাফর ছিলেন ক্লাইভের প্রসাদপুষ্ট জীব। সংক্ষুব্ধ—**সংক্ষোভ**ঃ দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রে ঝঞ্ঝাবাত্যার প্রভাবে ভয়ংকর তরঙ্গসংক্ষোভ আরম্ভ হইল। ধ্যান—**ধ্যানী**ঃ সমাধির চরম অবস্থায় ধ্যাত বস্তু আর ধ্যানী যোগীর মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকে না। বায়ু—**বায়বীয়**ঃ পদার্থের তিনটি অবস্থা—কঠিন, তরল ও বায়বীয়। আসন—**আসীন**ঃ রাজসভায় প্রবেশ করিলে পর দেখা গেল, রাজা স্বর্ণসিংহাসনে আসীন রহিয়াছেন। ফেন—**ফেনিল**ঃ সমুদ্রের ফেনিল জলে সূর্যের লোহিতাভ কিরণমালা প্রতিফলিত হওয়ায় অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। মুখ—**মৌখিক**ঃ পরীক্ষায় জিতেন মৌখিক প্রশ্নগুলির তেমন ভালো উত্তর করিতে পারে নাই। অবসন্ন—**অবসাদ**ঃ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর তাহার দেহে-মনে গভীর অবসাদ নামিয়া আসিল। ব্যাহত—**ব্যাঘাত**ঃ 'ব্যাঘাত আসুক নব নব, আঘাত খেয়ে অটল রব।' বিধান—**বিহিত**ঃ অতঃপর ঋষি বেদবিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। ইষ্ট—**ইচ্ছা**ঃ সমস্ত কর্মপ্রেরণার মূলে ইচ্ছাই প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে। বৈধ—**বিধি**ঃ আইনের বিধি লঙ্ঘন করিলে রাষ্ট্রের নিকট হইতে তোমাকে সমুচিত শাস্তি পাইতে হইবে।

[৬] নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীত অর্থবোধক শব্দ-দ্বারা বাক্য রচনা কর ঃ

হর্ষ, বিরত, বর্ধমান, ঐহিক, সন্ধি, সমষ্টি, শ্রম, প্রফুল্ল, বিস্তৃত, সংকোচ, সুকৃতি, স্থাবর, স্থির, শূন্য, ব্যর্থ, উপকার, আসল, সৃষ্টি, নীরস, চঞ্চল, সাকার, মান, মধুর, বাহির, ইতর, শোক, গুপ্ত, কুটিল, গৌণ, গরল।

হর্ষ—**বিষাদ**ঃ এই ভয়ংকর দুঃসংবাদে তাহার হৃদয় বিষাদে মুহূর্তেই ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বিরত—**রত**ঃ সাহিত্যসেবায় রত থাকিলেও দেশের কল্যাণের প্রতি তিনি কখনো উদাসীন ছিলেন না। বর্ধমান—**ক্ষীয়মান**ঃ কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকলার ন্যায় তাঁহার অপরিসীম শৌর্যবীর্য এখন ক্ষীয়মান। ঐহিক—**পারত্রিক**ঃ পারমার্থিক এবং পারত্রিক কল্যাণচিন্তাতেই তিনি সমগ্র জীবন কাটাইয়া দিলেন। সন্ধি—**বিগ্রহ**ঃ বিভিন্ন জাতির উগ্র স্বার্থকামনাই বর্তমান কালের যুদ্ধবিগ্রহের প্রধান কারণ। সমষ্টি—**ব্যষ্টি**ঃ সমষ্টির স্বার্থের জন্য অনেক সময় ব্যষ্টিস্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়, নতুবা সমাজ-কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। শ্রম—**বিশ্রাম**ঃ হৃতস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ডাক্তার তাঁহাকে এক মাসের পূর্ণ বিশ্রাম লইতে উপদেশ দিয়াছেন। প্রফুল্ল—**ম্লান**ঃ সকালের প্রস্ফুটিত কুসুম সন্ধ্যায় ম্লান হইয়া উঠিল। বিস্তৃত—**সংকীর্ণ**ঃ এই সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে এতখানি বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। সংকোচ—**বিস্তার**ঃ আকবর হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সুকৃতি—**দুষ্কৃতি**ঃ

এই লজ্জাকর দুষ্কৃতির জন্যই তাহাকে বিশেষ শাস্তিভোগ করিতে হইয়াছিল। স্থাবর—**জঙ্গম** : সর্বভূতাত্ম ভগবান পৃথিবীর স্থাবরজঙ্গম সকল পদার্থের মধ্যেই সতত বিরাজমান। স্থির—**চঞ্চল** : নবফাল্গুনের লীলাচঞ্চল বাতাসে সদ্যোদ্ভিন্ন বনলতিকাগুলি আন্দোলিত হইতে লাগিল। শূন্য—**পূর্ণ** : পূর্ণচন্দ্রের আলোয় সমস্ত পৃথিবী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ব্যর্থ—**সফল** : তোমার মনোবাসনা সফল হইয়া উঠুক। উপকার—**অপকার** : পরের অপকারচিন্তাকে কখনো মনে স্থান দিও না। আসল—**নকল** : 'নকল মুক্তা' নামে ফরাসী গল্পকার মোপাসা-র একটি বিখ্যাত গল্প আছে। সৃষ্টি—**ধ্বংস** : বিগত মহাযুদ্ধে অবিশ্রান্ত বোমাবর্ষণের ফলে কয়েকটি বড়ো শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। নীরস—**সরস** : যাঁহারা যথার্থ রসিক ব্যক্তি তাঁহারা নীরস চিত্তকেও সরস করিয়া তুলিতে পারেন। চঞ্চল—**স্থির** : ধৈর্য হারাইলে চলিবে না, স্থির মস্তিষ্কে এই জটিল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। সাকার—**নিরাকার** : দার্শনিকদের মতে ঈশ্বর সাকার নহে, নিরাকার। মান—**অপমান** : 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছো অপমান—'। মধুর—**তিক্ত** : মাকাল ফল দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু ইহার আস্বাদ হইতেছে অতিশয় তিক্ত। বাহির—**ভিতর** : ভিতরবাড়ীতে তাহার সেই নিত্যআনাগোনা চিরকালের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। ইতর—**ভদ্র** : ভদ্রলোক হইয়া তুমি যে এমন ইতরের মত আচরণ করিবে তাহা আমি ভাবিতে পারি নাই। শোক—**আনন্দ** : উপনিষদ বলিয়াছেন, নিখিল বিশ্বের মর্মমূলে অফুরন্ত আনন্দস্রোত প্রবহমাণ। গুপ্ত—**ব্যক্ত** : পুত্রশোকের গভীর বেদনা ব্যক্ত করিবার ভাষা পর্যন্ত জননী হারাইয়া ফেলিয়াছেন। কুটিল—**সরল** : সহজ-সরল প্রকাশভঙ্গিই তাঁহার রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। গৌণ—**মুখ্য** : কোনো কোনো বাক্যে দুইটি কর্ম থাকে—একটি মুখ্য, অপরটির নাম গৌণ। গরল—**অমৃত** : দেবাসুরের দ্বিতীয়বারের সমুদ্রমন্থনে সেই অমৃতের পরিবর্তে সুতীব্র গরল উঠিয়াছিল।

[৭] নিম্নোদ্ধৃত শব্দগুচ্ছের প্রত্যেকটিকে এক-একটি কথায় প্রকাশ কর :

[এক] বাঘের চামড়া, [দুই] পরিব্রাজকের ভিক্ষা, [তিন] গভীর রাত্রি, [চার] নূপুরের ধ্বনি, [পাঁচ] পিষ্ট দ্রব্যের গন্ধ, [ছয়] হস্তীর চীৎকার, [সাত] অশ্বের ধ্বনি, [আট] ময়ূরের স্বর, [নয়] পক্ষীর কলরব, [দশ] ভূষণাদির শব্দ।

[এক] বাঘছাল, ব্যাঘ্রকৃত্তি [মৃগাদি পশুর চর্মমাত্রকেই 'কৃত্তি' বলে, সুতরাং বাঘের চামড়াকে শুধু কৃত্তি না বলিয়া ব্যাঘ্রকৃত্তি বলাই সমীচীন।] [দুই] মাধুকরী, [তিন] নিশীথ, [চার] নিক্বণ, [পাঁচ] সৌরভ, পরিমল, [ছয়] বৃংহণ, বৃংহিত, [সাত] হ্রেষা, [আট] কেকা, [নয়] কূজন, কাকলি, [দশ] শিঞ্জিত, শিঞ্জন।

[৮] নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলিকে শুদ্ধ করিয়া লেখ এবং সংশোধনের হেতু নির্ণয় কর :

মৃদু মলয়ানিল-সমীরণে বনকুসুম আন্দোলিত হইতেছিল। শাখার উপর পক্ষীর নীরগুলি দুলিতেছিল। আমরা সামান্য পরিচ্ছেদ পরিয়া বেড়াতে গিয়াছিলাম ; সুতরাং আমরা যে রাজপ্রসাদে বাস করি তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই।

মৃদু **মলয়সমীরণে** বনকুসুম আন্দোলিত হইতেছিল। শাখার উপর পাখীর **নীড়গুলি** দুলিতেছিল। আমরা সামান্য **পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বেড়াইতে** গিয়াছিলাম। সুতরাং আমরা যে রাজ**প্রাসাদে** বাস করি তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই।

পরিবর্তনের কারণ : [এক] 'অনিল' এবং 'সমীরণ' দুইটি শব্দেরই অর্থ বাতাস। সমার্থক দুইটি শব্দের একত্র প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন নাই। [দুই] 'নীর' শব্দের অর্থ জল—এখানে পাখীর বাসা বুঝাইতে 'নীড়' শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে। [তিন] 'পরিচ্ছেদ' কথাটির অর্থ পুস্তকের অন্তর্গত অধ্যায়। এখানে পরিধান করিবার সামগ্রী অর্থে 'পরিচ্ছদ' শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে। [চার] 'পরিচ্ছদ' শব্দের সঙ্গে সংগতি রক্ষার জন্য 'পরিধান করিয়া' লেখাই সমীচীন—লেখ্য এবং কথিত ভাষার সংমিশ্রণ হওয়া উচিত নয়। [পাঁচ] ঠিক একই কারণে লেখ্য ভাষার ক্রিয়াপদ 'বেড়াইতে' শব্দ ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। [ছয়] 'প্রসাদ' শব্দের অর্থ অনুগ্রহ—এখানে রাজার ভবন বুঝাইতেছে, সেজন্য 'প্রাসাদ' লিখিতে হইবে।

[৯] নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলির যোগে এমন কতকগুলি শব্দ তৈয়ারী কর, যাহা ব্যক্তি কিংবা জাতির অর্থ দ্যোতিত করে :

—দার, —ওয়ালা, —কর, —ঈ

দার : দোকানদার, খরিদ্দার, দেনাদার, জমিদার, ইত্যাদি। **ওয়ালা :** বাড়ীওয়ালা, চুড়িওয়ালা, ফেরিওয়ালা, ইত্যাদি। **কর :** শালকর, বাজিকর, হালুইকর, কারিকর, ইত্যাদি। **ঈ :** ঢাকী, দরদী, মরমী, পাঞ্জাবী, বাঙালী, দোকানী, ইত্যাদি।

[১০] নিম্নলিখিত শব্দগুলি কেন অশুদ্ধ, তাহা দেখাইয়া উহাদের শুদ্ধ রূপ লেখ :

পুরষ্কার, কল্যানীয়েষু, শুট্‌কেশ, উজ্জল, অধ্যায়ণ, বিদ্বান, দুরাদৃষ্ট, শাঁপ, পৌরহিত্য, অজাগর, তেজেন্দ্র, জ্যোতিন্দ্র, সক্ষম, প্রাণীগণ, কটুক্তি, সায়াহ্ন।

পুরস্কার : অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং ক্ ও র্ বর্ণের পর প্রত্যয়ের দন্ত্য 'স্' মূর্ধন্য 'ষ' হয়। কিন্তু পুরঃ + কার = **পুরস্কার** হওয়ার উক্তরূপ কোনো কারণ এখানে নাই।

সুতরাং 'ষ' হইতে পারে না, 'স' হইবে, অতএব **পুরস্কার**। **কল্যানীয়েসু** : অ, আ, ভিন্ন স্বরবর্ণের পরবর্তী প্রত্যয়ের 'স' মূর্ধন্য 'ষ' হইয়া যায়। ষত্ব-বিধানের এই নিয়ম-অনুসারে এখানে 'স' থাকিতে পারে না, সুতরাং **কল্যাণীয়েষু** লিখিতে হইবে। [দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হইবে, কারণ শব্দটি 'কল্যাণ'—'কল্যান' নহে]। **শুট্কেশ** : কথাটি ইংরেজী 'Suitcase' শব্দের বর্ণান্তরিত রূপ, ইংরেজী শব্দের উচ্চারণ হইতেছে **'সুটকেস'**। সুতরাং তালব্য শ-এর স্থানে 'স' লেখাই সমীচীন। তবে 'শুটকেশ' লিখিলেও যে উচ্চারণের দিক দিয়া বিশেষ কোনো ক্ষতি আছে, তাহা মনে হয় না। কেন-না, উচ্চারণ করিবার সময় আমরা বাঙালীরা 'সুটকেস্'-ই বলি, 'শুট্কেশ' নয়। শ, ষ, স-এর সংস্কৃতানুযায়ী উচ্চারণ বাংলাভাষায় নাই বলিলেই চলে। **উজ্জল** : উৎ + জ্বল = **উজ্জ্বল**। জ্বল্ ধাতুর যোগে শব্দটা নিষ্পন্ন বলিয়া 'উজ্জ্বল' হইবে, 'উজ্জল' নয়। **অধ্যায়ণ** : অধি + অয়ন = **অধ্যয়ন**। সন্ধির অতি সাধারণ সূত্রানুসারেই 'ই' 'য' হইয়া গিয়াছে এবং পরের স্বর 'অ' য-কারের সহিত যুক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহার পর আবার আ-কার আসিতে পারে না। তা ছাড়া মূর্ধন্য 'ণ' হইবারও কোনো কারণ নাই, দন্ত্য 'ন' হইবে। **বিদ্যান্** : মূল শব্দটি হইতেছে 'বিদ্বস্'। অতএব ইহার প্রথমার একবচনে **'বিদ্বান'** হইবে, 'বিদ্যান' নয়। **দুরাদৃষ্ট** : দুঃ [মন্দ] + অদৃষ্ট = **দুরদৃষ্ট**। সন্ধির সূত্র-অনুযায়ী বিসর্গ 'র' হইয়া গিয়াছে, তারপর আ-কার আসিবার কোনো সংগত কারণ নাই। **শাঁপ** : শপ্ [অভিশাপ দেওয়া] + ঘঞ্ = **শাপ**। সুতরাং শব্দটিতে চন্দ্রবিন্দু থাকার কোনো হেতু নাই। **পৌরহিত্য** : পুরঃ + হিত = পুরোহিত [যিনি সর্বাগ্রে হিত চিন্তা করেন] পুরোহিত + ষ্যঞ্ = **পৌরোহিত্য** অর্থাৎ পুরোহিতের কাজ। সুতরাং শব্দটিতে ও-কার আসিতে বাধ্য। **অজাগর** : 'সাপ' অর্থে যদি কথাটি ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে 'অজাগর' রূপটি অশুদ্ধ, ইহার শুদ্ধ রূপ হইবে **'অজগর'**। অজগর একপ্রকার বৃহৎ সাপ, ইহারা একটা ছাগল আস্ত গিলিতে পারে। গৄ + অচ্ = গর ; অজের 'গর' [গ্রাসকারী] = অজগর, ষষ্ঠী তৎপুরুষ ; অথবা অজ [নিত্য] গর [বিষ] যাহার, বহুব্রীহি। অন্য একটি অর্থে কিন্তু 'অজাগর' শব্দটি ভুল নয়। √'জাগৃ' হইতে 'জাগর' ; ন + জাগর [যাহার জাগরণ নাই] = অজাগর। সুতরাং জাগরণহীনতা অর্থে 'অজাগর' কথাটিকে শুদ্ধই বলিতে হইবে। **তেজেন্দ্র** : তেজস্ + ইন্দ্র = **তেজইন্দ্র**। সন্ধির সূত্রানুসারে কোনো বর্ণের লোপ ঘটিলে আর সন্ধি হয় না—'সন্ধিলোপে ন সন্ধিঃ'। আবার, কেহ কেহ তেজ + ইন্দ্র = 'তেজেন্দ্র' কথাটিকে অশুদ্ধ বলিতে রাজী নহেন। সে যাহা হোক, নাম অর্থে 'তেজেন্দ্র' কথাটি ব্যবহার করিতে আপত্তি কী ? **জ্যোতিন্দ্র** : জ্যোতিঃ [জ্যোতিস্] + ইন্দ্র = **জ্যোতিরিন্দ্র**। যদি অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পর বিসর্গ থাকে, আর যদি স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ

কিংবা য্ র্ ল্ ব্ হ্ পরে থাকে তাহা হইলে উক্ত বিসর্গের স্থানে র্ হয়; যেমন গতিঃ + ইয়ম্ = গতিরিয়ম্। সুতরাং 'জ্যোতিন্দ্র' শব্দটি ভুল। **সক্ষম**ঃ ক্ষমতা যাহার আছে = **ক্ষম**। সুতরাং ক্ষমতার সহিত বিদ্যমান = 'সক্ষম' এরূপ প্রয়োগ সংস্কৃতানুসারে ভুল বলিতে হইবে। যেখানে একবার কোনো প্রত্যয় বা সমাস করার জন্য অস্তি অর্থাৎ আছে এরূপ অর্থের প্রতীতি জন্মিয়াছে, সে-ক্ষেত্রে পুনরায় অস্ত্যর্থবোধক প্রত্যয় বা সমাস করা যুক্তিসংগত নহে। কিন্তু '**ক্ষম**' শব্দটির প্রয়োগ বাংলায় দেখা যায় না। তাই অনেকে সক্ষম কথাটির পরিবর্তে '**সমর্থ**' শব্দ ব্যবহার করেন। অথচ ইহা সম্পূর্ণ একটি পৃথক্ শব্দ। আরও একটি কথা। যাঁহার 'ক্ষমা'-গুণ আছে তাঁহাকে '**সক্ষম**' বলিতে কোনো বাধা নাই। সুতরাং এই অর্থে '**সক্ষম**' শব্দটি নির্ভুল বলা চলে। **প্রাণীগণ**ঃ প্রাণ যাহাদের আছে, এই অর্থে প্রাণ + ইন্ = প্রাণিন্। সংস্কৃতে ইন্-ভাগান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে রূপ হয় ঈ-কারান্ত। যেমন, গুণিন্ হইতে 'গুণী' প্রাণিন্ হইতে 'প্রাণী'। কিন্তু সমাসের ক্ষেত্রে মূলরূপ প্রাণিন্-এর 'ন্' লোপ পাইয়া 'প্রাণি'—রূপটি থাকিয়া যায়। সেইজন্য '**প্রাণিগণ**' হইতেছে শুদ্ধ রূপ। আধুনিক বাংলাভাষাতে 'প্রাণী' শব্দটিকে যদি মূলরূপ ধরিয়া লওয়া হয়, তবে 'প্রাণীগণ' অশুদ্ধ নহে। আমাদের মতে, বাংলা ব্যাকরণকে সংস্কৃতের প্রভাব হইতে কিছুটা মুক্ত হইতে দেওয়াই ভাল। **কটূক্তি**—কটু + উক্তি = **কটূক্তি**। সন্ধির সূত্রানুসারে উ-কারের পর উ-কার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঊ-কার হয়। সুতরাং শুদ্ধরূপ হইবে 'কটূক্তি'। **সায়াহ্ন**—ইহাতে কোনো ভুল দেখিতেছি না। এখানে দন্ত্য-'ন' ঠিকই আছে। তদ্রূপ 'মধ্যাহ্ন'। কিন্তু 'পূর্বাহ্ণ' ও 'অপরাহ্ণ' শব্দ মূর্ধন্য-ণ দিয়াই লিখিতে হইবে।

[১১] নিম্নলিখিত বাক্যটির অন্তর্নিহিত ভাবটিকে আটটি বাক্যের সহায়তায় আটভাবে প্রকাশ কর ঃ

'তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।'

[এক] তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। [দুই] তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। [তিন] তাঁহার তিরোধান ঘটিয়াছে। [চার] তিনি স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। [পাঁচ] তিনি মারা গিয়াছেন। [ছয়] তিনি মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। [সাত] তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হইয়াছে। [আট] তিনি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

[১২ ঃ ক] নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলির শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

[/০] কোনো নদী যে গ্রামের——দিয়া বরাবর——আসিয়াছে, সে যদি

একদিন অন্যত্র তাহার——পথ লইয়া যায়, তবে সে গ্রামের জল, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য—— হয়, তাহার বাগান——হইয়া পড়ে।

মধ্য ; চলিয়া কিংবা **বহিয়া ; গতি ; বিনষ্ট ; মরুভূমিবৎ।**

[৵৹] লোকটা সত্যই—মত ধূর্ত এবং—মত খল। মহিলার গায়ের রঙ—মত ফর্সা, চুল——মত কালো এবং চোখ—মত সুন্দর।

শৃগালের ; সর্পের ; দুধের ; মেঘের ; হরিণের [চোখের]।

[৶৹] বড়োসাহেবের সহিত আমার——নাই, সুতরাং তোমার জন্য তাঁহার——সুপারিস করিতে পারিব না। তুমি নিজেই গিয়া——কর। যদি তোমার কথাবার্তায় তিনি——হন, তবে হয়তো তোমাকেই——দিতে পারেন।

ঘনিষ্ঠতা ; নিকট ; দেখা ; সন্তুষ্ট ; চাকুরীটা।

[।৹] তিনি ঈর্ষানলে——হইতেছিলেন, অত্যন্ত ক্রোধে তাঁহার মুখ রক্তিম—ধারণ করিল এবং তাঁহার——কাঁপিতে লাগিল। তথাপি তিনি ধৈর্য——না করিয়া——ন্যায় নিশ্চল রহিলেন।

দগ্ধ ; বর্ণ ; ওষ্ঠদ্বয় ; ত্যাগ ; স্থাণুর।

[১২ : খ] নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলির অর্থ ঠিক রাখিয়া উহাদিগকে প্রয়োজন মত নিশ্চয়ার্থক [Affirmative] কিংবা নিষেধবাচক [Negative] বাক্যে রূপান্তরিত কর :

"মাতাপিতার প্রতি তাহার ভক্তির সীমা ছিল না। তাহাকে পরাস্ত না করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইব না। দরিদ্রসেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ইহা অপেক্ষা সুন্দর বস্তু আর নাই। তাঁহারা দুইজনেই সমান বলশালী। তাঁহার ন্যায় কর্মবীর অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই কার্যের পরিণাম অতি ভয়াবহ। গৃহকার্যে তাহার মন নাই।"

মাতাপিতার প্রতি তাহার অসীম ভক্তি ছিল। তাহাকে পরাস্ত করিয়া তবেই আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। দরিদ্রসেবা অপেক্ষা আর কোনো বড়ো ধর্ম নাই। ইহা সুন্দরতম কিংবা সর্বাপেক্ষা সুন্দর বস্তু। তাহাদের দুইজনের মধ্যে কেহ কাহারও অপেক্ষা বলের দিক দিয়া কম নহে। তাঁহার ন্যায় কর্মবীর খুব বেশী জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই কার্যের পরিণাম আদৌ শুভ নহে। গৃহকার্যে সে উদাসীন।

[১৩] নিম্নলিখিত শব্দগুলির যে-কোনো একটিকে দ্বিতীয় উপাদান হিসাবে গ্রহণ করিয়া পাঁচটি যৌগিক শব্দ তৈয়ারী কর, এবং উহাদের সাহায্যে পাঁচটি বাক্য রচনা কর :

অন্তর, আলয়, পরায়ণ, ভ্রষ্ট, লোক।

অন্তর ঃ তাঁহার সঙ্গে আমার **মতান্তর** ঘটিলেও **মনান্তর** ঘটে নাই। **আলয়** ঃ তিনি একটি নূতন **দেবালয়** প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। **পরায়ণ** ঃ তাঁহার ন্যায় **ধর্মপরায়ণ** এবং **সেবাপরায়ণ** লোক খুব কমই দৃষ্ট হয়। **ভ্রষ্ট** ঃ খ্রীষ্টানধর্ম অবলম্বন করিয়া তিনি **জাতিভ্রষ্ট** হইলেন। **লোক** ঃ দুইদিন হইল রামবাবু **পরলোক** গমন করিয়াছেন। [এই রকম ভাবে বাক্যরচনা কঠিন নহে বলিয়া আর বেশী উদাহরণ দিলাম না।]

[১৪] নিম্নলিখিত বাক্যগুলির প্রয়োগে একটি সরল বাক্য তৈয়ারী কর ঃ

[ক] অন্ধকার, দুরারোহ, ঘনীভূত, সুদূরপরাহত, মহীধর। [খ] নীলাম্বুরাশি, উর্মিমালা, সৈকত, আহত, অগণিত, নক্ষত্ররাজি, ফেনকণা।

[ক] রাত্রির **অন্ধকার ঘনীভূত** হইয়া আসিলে **দুরারোহ মহীধরে** আরোহণ করা **সুদূরপরাহত** হইয়া উঠিল। [খ] **উর্মিমালা সৈকতোপরি আহত** হওয়ায় **নীলাম্বুরাশির ফেনকণা অগণিত নক্ষত্ররাজির** ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

[১৫] নিম্নোদ্ধৃত বিচ্ছিন্ন বাক্যাবলীকে সংযোজিত কর ঃ

[ক] "নাবিকেরা নৌকা সামলাইতে পারিল না, প্রবল জলপ্রবাহবেগে তরণী রসুলপুর-নদীর মধ্যে যাইতে লাগিল। একজন আরোহী কহিল, 'নবকুমার রহিল যে।' তখন একজন নাবিক কহিল, 'আঃ, তোর নবকুমার কি আছে? তাকে শিয়ালে খাইয়াছে।' "

নাবিকেরা নৌকা সামলাইতে না পারায় প্রবল জলপ্রবাহবে.. তরণী যখন রসুলপুরনদীর মধ্যে যাইতে লাগিল, তখন একজন আরোহীর 'নবকুমার রহিল যে' কথার উত্তরে অপর একজন নাবিক কহিল, 'আঃ, তোর নবকুমার কি আছে? তাহাকে শিয়ালে খাইয়াছে।'

[খ] "তখন সেইরূপ আর-একটা ছায়া প্রথম ছায়ার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর একটা আসিল, তারপর একটা আসিল, কত আসিল—ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই গৃহ নিশীথশ্মশানের মত ভয়ংকর হইয়া উঠিল।"

প্রথম ছায়ার পাশে তখন সেইরূপ একটি ছায়া, তারপর আর-একটা, তারপর আরও কত আসিয়া ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তাহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে থাকায় সেই গৃহ নিশীথশ্মশানের মত ভয়ংকর হইয়া উঠিল।

[গ] "আজিকালি অনেকে জনসাধারণের হীন অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়াছেন। যাহাতে জনসাধারণের হীন অবস্থার উন্নতি হয় তৎপক্ষে দৃষ্টি পড়িয়াছে, জনসাধারণের শিক্ষা দিবার কথাবার্তা উঠিয়াছে—বড় আহ্লাদের কথা।"

আজিকালি অনেকে জনসাধারণের হীন অবস্থা দেখিয়া ভীত হওয়ার ফলে, যাহাতে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হয়, তৎপক্ষে যে দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং জনসাধারণের যে শিক্ষা দিবার কথাবার্তা উঠিয়াছে, তাহা বড় আহ্লাদের কথা।

[১৬] নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলিকে বিশুদ্ধ সরল বাংলায় রূপান্তরিত কর:

[ক] 'একদা মধুমাসের সমাগমে কমলবন বিকসিত হইলে, চূতকলিকা অঙ্কুরিত হইলে, মলয়মারুতের মন্দ মন্দ হিল্লোলে আহ্লাদিত হইয়া কোকিল সহকার-শাখায় উপবেশনপূর্বক সুস্বরে কুহুরব করিলে; অশোক-কিংশুক প্রস্ফুটিত, বনমুকুল উদ্গত এবং ভ্রমরের ঝংকারে চতুর্দিক প্রতিশব্দিত হইলে, আমি মাতার সহিত এই অচ্ছোদসরোবরে স্নান করিতে আসিয়াছিলাম।"

একদা বসন্তকালে আমি মাতার সহিত এই অচ্ছোদসরোবরে স্নান করিতে আসিয়াছিলাম। তখন অজস্র পদ্মফুল ফুটিয়াছিল, আমের মুকুল দেখা দিয়াছিল, বসন্তের মৃদু বাতাসে আনন্দিত হইয়া কোকিল আমের শাখায় বসিয়া মধুর স্বরে গান করিতেছিল; অশোক-পলাশ প্রভৃতি ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং ভ্রমরের গুন্ গুন্ শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

[খ] "দিব্যলাবণ্য-পরিশোভিত পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান হইয়া কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্বচনীয় সুধাময় কিরণবিকিরণপূর্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ বিস্তার করিতেছিলেন।"

তখন স্বর্গের সৌন্দর্যমাখা পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছিল। চাঁদের আলোয় সেই মধুময় সৌন্দর্যকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সেই আলো ছড়াইয়া চাঁদ কখনও পৃথিবীকে যেন সুধায় ভরিয়া তুলিতেছিল, আবার কখনও-বা সামান্য মেঘে ঢাকা পড়িয়া আপনার ক্ষীণ আলো ছড়াইতেছিল।

[গ] "আমরা যাদৃশ বন্ধুলাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হই যদিও তাদৃশ বন্ধু ধরণীমণ্ডলে নিতান্ত দুর্লভ তথাচ বন্ধুব্যতিরেকে জীবিত থাকা দুঃসহ ক্লেশের বিষয়।"

আমরা যেরূপ বন্ধু পাইবার জন্য ব্যাকুল সেইরূপ বন্ধু পৃথিবীতে খুব কমই মিলে; কিন্তু তবু বন্ধু ছাড়া বাঁচিয়া থাকা কষ্টকর।

[১৭] নিম্নোদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলিকে সাহিত্যিক ভাষায় রূপান্তরিত কর:

[ক] "সেবার মাহেশে রথ দেখতে গিয়ে এমন ফ্যাসাদে পড়া গিছলো যে, সে আর কহতব্য নয়। এক বাবু তাঁর তিন ইয়ার নিয়ে মোদের নায়ে চড়লেন, আর

নাওখানি সেই মোটাসোটা বাবুদের ভীষণ চাপে ডুব্‌তে ডুব্‌তে রয়ে গেল। তাই-না দেখে সেই ভদ্রবেশী বাবুর দল হিহি করে হাসতে সুরু করে দিলেন।"

সেইবার মাহেশে রথ দেখিতে যাইয়া এমন বিপদে পড়িলাম যে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এক বিলাসী ভদ্রলোক তাঁহার তিনজন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া আমাদের নৌকায় আরোহণ করিলেন। তখন নৌকাখানি সেই স্থূলকায় ভদ্রলোকদের গুরুভারে ডুবিতে ডুবিতে কোনোপ্রকারে রক্ষা পাইল। ইহা দেখিয়া সেই ভদ্রবেশী বাবুর দল উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে আরম্ভ করিলেন।

[খ] "আজ কী কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে আছ? কারু মানা শুনবে না, যেখানে যত হতভাগ্য আছে দেখলেই তার দিকে কোমর বেঁধে দাঁড়াবে। আজ বৌঠান আমাকে না-হক্ দশটা কথা শুনিয়ে দিলেন।"

আজ অনর্থক কী বিপদ বাধাইয়া বসিয়াছ? কাহারও নিষেধ শুনিবে না, যেখানে যত হতভাগ্য রহিয়াছে দেখিবামাত্রই দৃঢ়পণে তাহাদের পক্ষসমর্থন করিবে। বধূঠাকুরাণী আজ মিথ্যা আমাকে অজস্র কটুকথা শুনাইয়া দিলেন।

[গ] "ছেলেটি দলে পড়ে একেবারে বিগরে গেছে। নাই দিয়ে মাথায় তুলে এখন গোল্লায় গেল বলে বুক চাপড়ালে চলবে কেন?"

বালকটি সঙ্গদোষে একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে। অন্যায় প্রশ্রয় দিয়াছ, এখন বিপথগামী হইল বলিয়া হাহাকার করিলে কী লাভ হইবে?

[১৮] নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রত্যেকটিকে বিশেষ্য এবং বিশেষণ-রূপে প্রয়োগ করিয়া বাক্য রচনা কর ঃ

পাপ, পুণ্য, গুরু।

পাপ-- বিশেষ্য ঃ এই ভয়ংকর পাপ-এর শাস্তি তোমাকে একদিন নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। বিশেষণ ঃ তাহাকে আমি এই জঘন্য পাপকার্য হইতে বিরত হইতে বলিয়াছিলাম। **পুণ্য**—বিশেষ্য ঃ প্রত্যেক মানুষ বিশ্বাস করে যে, সৎকার্য করিলে, পুণ্য করিলে স্বর্গলাভ হয়। বিশেষণ ঃ 'হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে।' **গুরু**—বিশেষ্য ঃ পিতা ও মাতার মতো শ্রেষ্ঠ গুরু আর নাই। বিশেষণ ঃ গুরু পাপে লঘু দণ্ড হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

[১৯] নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে দুইটি বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করিয়া বাক্য রচনা কর ঃ

কড়া, কড়ি, কথা, ডাক, দণ্ড, ছাপা, গজ, পাশ, গান, বারণ, বোঝা, হার, পর, কর।

কড়াঃ কঠোরঃ বিনা অপরাধে হীরেনবাবুকে বড়সাহেব সেইদিন কয়টি কড়া কথা শুনাইয়া দিলেন। **কড়াঃ** শিকলঃ পুলিশ হাতকড়া লাগাইয়া আসামীটিকে তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী থানায় লইয়া গেল। **কড়িঃ** কপর্দকঃ 'কাণাকড়ি পিঠ তুলি কহে টাকাটিকে'। **কড়িঃ** আড়কাঠঃ এই বাড়িটি নির্মাণের জন্য অনেক টাকার মালমশলা ও কড়িবড়গার প্রয়োজন। **কথাঃ** প্রতিশ্রুতিঃ কথা দিয়া কথা না রাখা ভালো দেখায় না। **কথাঃ** বলার বিষয়ঃ তাড়াতাড়িতে কথাটি তাহাকে বলাই হইল না। **ডাকঃ** আহ্বানঃ যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—'। **ডাকঃ** গর্জনঃ মেঘের ডাকে ময়ূর নৃত্য করে। **অঙ্কঃ** ক্রোড়ঃ শিশুটি মাতৃ-অঙ্কে শুইয়া আছে। **অঙ্কঃ** চিহ্নঃ চাঁদের গায়ে শশকের চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে বলিয়া ইহার এক নাম শশাঙ্ক। **দণ্ডঃ** মুহূর্তঃ এখানে আমার একদণ্ড থাকিবার ইচ্ছা নাই। **দণ্ডঃ** শাস্তিঃ এই জঘন্য অপরাধের জন্য তাহাকে সমুচিত দণ্ড অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে **ছাপাঃ** মুদ্রণঃ পুস্তকটির ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার। **ছাপাঃ** উচ্ছলনঃ নদীর স্রোত কূল ছাপাইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। **গজঃ** দুইহস্ত পরিমাণঃ সতর শ' ষাট গজে এক মাইল। **গজঃ** হস্তীঃ ধীরে ধীরে চলাকেই কবিরা বলেন গজগমন। **পাশঃ** পার্শ্বদেশঃ লোকটি তাহার পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। **পাশঃ** ফাঁদঃ সিংহটি ব্যাধপাশে আবদ্ধ হইয়া গর্জন করিতে লাগিল। **পানঃ** প্রাপ্ত হনঃ আজ যদি চিঠিটা পান তাহার হাতে দিয়া দিবেন। **পানঃ** তাম্বুলঃ পান তামাক প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বর্জনীয়। **বারণঃ** নিষেধঃ 'যদি বারণ কর তবে গাহিব না—' **বারণঃ** হস্তীঃ মদমত্ত বারণ-এর গতি অতীব ভয়ংকর। **বোঝাঃ** উপলব্ধি করাঃ এই জটিল অঙ্কটি তাহার মত বালকের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। **বোঝাঃ** ভার এই বিপুল ঋণের বোঝা সে কেমন করিয়া বহন করিবে। **হারঃ** পরাজয়ঃ 'তোমার কাছে যে হার মানি এই তো মোর জয়—'। **হারঃ** অলংকারঃ অশ্রুমালার নিকট মণিমুক্তার হারও তুচ্ছ। **পরঃ** অনাত্মীয়ঃ 'পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর'। **পরঃ** পরিধান করঃ যে-কাপড়টি কাল কিনিয়াছ, উহাই আজ পর। **করঃ** খাজনাঃ সরকারের এই নূতন করনীতি অনুমোদন করা যায় না। **করঃ** হস্তঃ তোমার করকমলে এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করিলাম।

[২০] **নিম্নলিখিত পদগুলির সমাসনির্ণয়পূর্বক ব্যাসবাক্য লেখ ঃ**

মনোরথ, অভূতপূর্ব, অলক্ষুণে, মতিচ্ছন্ন, আনাড়ী, রাজহংস, বাগদত্তা, আজানুলম্বিত, গাছপাকা, আগাগোড়া।

মনোরথঃ মনরূপ রথ [রূপক কর্মধারয়] অথবা মনের রথ [ষষ্ঠী তৎপুরুষ]। **অভূতপূর্বঃ** পূর্বে ভূত যাহা=ভূতপূর্ব [বহুব্রীহি], নয় ভূতপূর্ব=অভূতপূর্ব

[নঞ্ তৎপুরুষ]। **অলক্ষুণে** : নয় [শুভ] লক্ষুণে=অলক্ষুণে [নঞ্ তৎপুরুষ]। **মতিচ্ছন্ন** : ছন্ন মতি যাহার [বহুব্রীহি]। **আনাড়ী** : নাই নাড়ীজ্ঞান যাহার [বহুব্রীহি]। কথাটি কিন্তু সংস্কৃত 'অজ্ঞানী' শব্দের রূপবিকারে উৎপন্ন হইয়াছে। **রাজহংস** : হংসের রাজা [ষষ্ঠী তৎপুরুষ], অথবা, হংসতুল্য রাজা [উপমিত কর্মধারয়]। **বাগদত্তা** : বাক্দ্বারা দত্তা [তৃতীয়া তৎপুরুষ], অথবা বাক্ দত্ত হইয়াছে যাহার সম্বন্ধে, এরূপ যে-কন্যা (বহুব্রীহি)। **আজানুলম্বিত** : জানু পর্যন্ত =আজানু [অব্যয়ীভাব], আজানু লম্বিত যাহা=আজানুলম্বিত [বহুব্রীহি]। **গাছপাকা** : গাছে পাকা [সপ্তমী তৎপুরুষ]। **আগাগোড়া** : আগা হইতে গোড়া [পঞ্চমী তৎপুরুষ]।

[২১] নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলিকে বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ করিয়া প্রত্যেকটির সহায়তায় এক-একটি বাক্য রচনা কর :

চিনির বলদ : [খেটে মরা, ফল না পাওয়া, যে ভার বহে অথচ ভোগ করিতে পায় না] তিনি চিরটি কাল সংসারের বোঝা টানিয়া গেলেন, অথচ এতটুকু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পাইলেন না—চিনির বলদের মতো জীবনটা কাটাইয়া দিলেন। **কূপমণ্ডুক** : [বহির্জগতের অভিজ্ঞতাহীন, সংকীর্ণমনা] সারাটা জীবন গ্রামের চতুঃসীমার মধ্যে কাটালে—এ রকম কূপমণ্ডুক হয়ে থাকলে কি মনের সংকীর্ণতা ঘুচবে ? **বকধার্মিক** : [ভণ্ড প্রকৃতির লোক] কপালে তিলক কেটে আর গেরুয়া কাপড় পরে বেড়ালে কী হবে, সুদ আদায়ের বেলা নিতাই হাজরা গরীবের বুকের রক্ত চুষে খায়—লোকটি বকধার্মিকই বটে। **ডুমুরের ফুল** : [অদৃশ্য বস্তু, দুষ্প্রাপ্য জিনিষ] কী হে, দু'মাস ধরে তোমার টিকিটির পর্যন্ত সন্ধান মিলছে না—একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেলে দেখছি। **পুকুরচুরি** : [অসম্ভব রকমের চুরি বা বঞ্চনা] যুদ্ধের সময়কার কন্ট্রাক্টরী তো কন্ট্রাক্টরী নয়, সে যে পুকুরচুরি—সরকারকে এমন ভাবে ঠকিয়ে বড়লোক হতে দুদিন সময় লাগে। **মণিকাঞ্চনযোগ** : [যোগ্যতমের সহিত যোগ্যতমের মিলন] চিত্তরঞ্জনের সহিত সুভাষচন্দ্রের মিলন মনিকাঞ্চনযোগ বলিয়াই ধরিতে হইবে। **সাপে-নেউলে** : [গুরুতর শত্রুভাবাপন্ন] মেকলে-সাহেব বলিয়াছেন, সভ্যতার সঙ্গে কবিতার যে-সম্পর্ক তাহা সাপে-নেউলের—সভ্যতার আওতায় কবিতার লতা নাকি বাড়িতে পায় না। **অরণ্যে রোদন** : [নিষ্ফল আবেদন বা প্রয়াস] অশোকের শিলালিপি কতদিন অরণ্যে রোদন করিয়াছে, কেউ উহার নিঃশব্দ আহ্বানে সাড়া দেয় নাই। **বিড়ালতপস্বী** : [ভণ্ড ; বাহিরে সাধু কিন্তু মনে মনে স্বার্থপরায়ণ] সাধুতার ভান করিলে কী হইবে, তাহার পশুপ্রকৃতি কাহারও অগোচর নাই—সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে, সে একজন বিড়ালতপস্বী। **তাসের ঘর** : [ক্ষণস্থায়ী,

ভঙ্গুর] দেখিতে দেখিতে তাহার সকল বিত্ত-ঐশ্বর্য তাসের ঘরের মত কোথায় উড়িয়া গেল। **উত্তমমধ্যম :** [প্রহার] সেকালে আইনের এত সূক্ষ্ম জটিলতা ছিল না—চোর ধরা পড়িলেই গ্রামবাসীরা সকলে মিলিয়া কিছুটা উত্তমমধ্যম দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিত। **অন্ধের যষ্টি :** [একমাত্র অবলম্বন] বিধবার একটিমাত্র সন্তান—তাও সে সেইদিন মারা গেল—ভগবান অন্ধের যষ্টিটি কাড়িয়া নিলেন। **সোনায় সোহাগা :** [দুইটি ভালো গুণ বা বস্তুর সংযোগ] মেয়েটির যেমন রূপ তেমনি গুণ—যেন সোনায় সোহাগা। **হাতের পাঁচ :** [নিশ্চিত অবলম্বন] জিতেন বড়ো ব্যবসায়ীর ছেলে, আবার পরীক্ষায় ভালো পাশও করিয়াছে। চাকুরি জুটে তো ভালো—তাহা যদি না হয় তবে হাতের পাঁচ ব্যবসায়ই তো রহিয়াছে। **শাঁখের করাত :** [উভয়সংকট] যুদ্ধের সময় সুজিত লিখিয়াছিল, রেঙ্গুন না ছাড়িলে বোমার আঘাতে প্রাণ যাওয়ার সম্ভাবনা, আর ছাড়িলে চাকুরি হারাইবার সম্ভাবনা—পরিস্থিতিটি ছিল শাঁখের করাত-এর মত। **মিছরির ছুরি :** [মুখে মিষ্টি অন্তরে গরল] মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া সুধীরবাবু বন্ধুটির সর্বনাশসাধন করিল—সে যে এমনভাবে মিছরির ছুরি চালাইবে তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। **আকাশ-কুসুম :** [অসম্ভব বস্তু, অবাস্তব জিনিস] বড়লোক হয়ে কলকাতায় তুমি বাড়ী করবে, গাড়ী করবে, কতই স্বপ্ন দেখছো ; কিন্তু মনে রেখো, এ তোমার আকাশ-কুসুম রচনামাত্র। **ব্যাঙের আধুলি :** [তুচ্ছ সামান্য বস্তুকে লইয়া গর্ব করা] দু'শটি মাত্র টাকা, এই নিয়েই এত গর্ব-অহংকার ! এ তো ব্যাঙের আধুলি। **রাজযোটক :** [শুভ কিংবা অশুভ সংযোগ] সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর সঙ্গে সমরবাদী জাপানের মিলনে যেন রাজযোটক ঘটিয়াছিল। **শিরে সংক্রান্তি :** [আসন্ন বিপদ] মা, বাবা, ভাই সকলেরই সাংঘাতিক অসুখ, আমার এখন শিরে সংক্রান্তি—চাকরির জন্য এসময় আমায় উদ্ব্যস্ত করো না। **বিসমিল্লায় গলদ :** [গোড়ায় গলদ] বিসমিল্লায় গলদ যেখানে, সেখানে প্রথম হইতে আরম্ভ না করিলে তুমি এ বিষয়ে কিছুই শিখিতে পারিবে না। **তীর্থের কাক :** [পরপ্রত্যাশী বা পরমুখাপেক্ষী] দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধার্তের দল বাহিরে তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করিতেছে, অথচ নঙ্গরখানার দ্বার এখনও খোলা হইল না। **গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল :** [প্রাপ্তির পূর্বেই কোনো বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়া থাকা] পরীক্ষায় পাশ করার পূর্বেই তুমি কোন্ চাকরিতে ঢুকিবে তাহার চিন্তা করিতেছ—এ যে গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। **আঠারো মাসে বছর :** [অত্যন্ত আলস্যপরায়ণ] যে-মানুষ আঠার মাসে বছর গোণে তার উপরই তুমি জরুরী কাজটার ভার দিয়েছ, বেশ লোক দেখছি। **দশচক্রে ভগবান ভূত :** [সমষ্টির বিরুদ্ধশক্তির প্রভাবে অতি শক্তিশালী মানুষও কখনো কখনো হেয় প্রতিপন্ন হয়] রামবাবুর মতো পরার্থপর দেশহিতৈষী মানুষটিকেও কয়েক-জন হীনলোকের চক্রান্তে পড়িয়া সমাজের কাছে চোর সাজিতে হইল—সত্যই দশচক্রে

ভগবান ভূত হইলেন। **সাপের পাঁচ পা :** [বেশী রকমের বাড়াবাড়ি করা অথবা, অস্বাভাবিক আচরণ] বিবেকবুদ্ধির সীমা লঙ্ঘন করে যা-খুশী-তাই করে যাচ্ছ, সাপের পাঁচ পা দেখলে নাকি? **কালনেমির লঙ্কাভাগ :** [কাজের আগেই ফলভোগের চেষ্টা] যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই যুধ্যমান জাতিগুলির মধ্যে বিজিত রাজ্যগুলি-সম্পর্কে কালনেমির লঙ্কাভাগ শুরু হইল। **বোঝার উপর শাকের আঁটি :** [যাহাকে অনেক বেশী কাজ করিতে হয়, সেই সঙ্গে একটি ছোট কাজ সারিয়া লইতে তাহার তেমন কষ্ট হয় না] রাম কারখানায় দুই 'সিফটে' দৈনিক প্রায় বার ঘণ্টা কাজ করে; সেদিন সাহেব তাহাকে ডাকিয়া বলিল, নির্দিষ্ট কাজের পর আরো কিছুক্ষণ খাটিয়া সে যেন নূতন 'অর্ডার'-টির কাজে হাত দেয়। ইহাতে রাম উত্তর করিল, 'করবো স্যর, বোঝার উপর শাকের আঁটিকে ভয় করিনে'। **সুখের পায়রা :** [সুসময়ের বন্ধু] সুদিন যখন ছিল তখন সুধাকরের বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না, কিন্তু চাকরিটি হারাইবার পর বন্ধুরা সব সুখের পায়রার মতো কোথায় উধাও হইয়া গেল। **বিনামেঘে জল :** [অপ্রত্যাশিত বস্তুলাভ] অসহায় বিধবাটির ঘোরতর দুর্দিনে বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের অযাচিত সাহায্যলাভ তাহার নিকট বিনামেঘে জলের মতোই প্রতিভাত হইল। **বালির বাঁধ :** [নিষ্ফল চেষ্টা ; সামান্য আঘাতেই যাহা বিনষ্ট হয়] 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ'। **অমাবস্যার চাঁদ :** [অসম্ভব ঘটনা, দুষ্প্রাপ্য বস্তু] বিবাহিত জীবনের সুদীর্ঘ সতর বৎসর পর নবজাত পুত্রের মুখ দেখিয়া পিতামাতার মনে হইল তাঁহারা যেন অমাবস্যার চাঁদ দেখিলেন। **তুলসী বনের বাঘ :** [বাহিরে নিষ্ঠাবান অথচ অন্তরে পশুভাবাপন্ন] সহৃদয়তার ভান করিয়া একাদশী বৈরাগী গরীব লোকটার এই সামান্য সম্পত্তিও অকস্মাৎ আত্মসাৎ করিয়া লইল—তাহাকে তুলসী-বনের বাঘ না বলিয়া কী বলিব?

[২২] নিম্নলিখিত অপপ্রয়োগগুলিকে শুদ্ধ করিয়া লেখ :

অত্যন্ত অত্যাচার, অসম্ভব শীত, অসাধ্য রোগ, পঞ্চম বর্ষীয় শিশু, ভীষণ বিভীষিকা, বিশিষ্ট শিষ্ট, বিশ্রী গন্ধ, যথেষ্ট ক্ষতি, সমূহ সমস্যা, সুবর্ণসুযোগ, স্বল্পাল্প ঔষধ, সাংঘাতিক লোক।

অত্যন্ত অত্যাচার—বিষম অত্যাচার। ['অত্যন্ত' কথাটি বিশেষণের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয় ; সুতরাং শব্দটিকে বিশেষ্যের (অত্যাচার) বিশেষণরূপে প্রয়োগ করা ঠিক নয়।] **অসম্ভব শীত**—দারুণ শীত। শীততাপের ক্ষেত্রে অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই, কিন্তু অস্বাভাবিক অর্থে 'অসম্ভব' শব্দের প্রয়োগ সমর্থনীয়। **অসাধ্য রোগ**—দুরারোগ্য রোগ। ['অসাধ্য রোগ' কথাটিকে সমর্থন করা যায়। বৈদ্যক শাস্ত্রে সুসাধ্য, দুঃসাধ্য এবং অসাধ্য এই তিন রকমের রোগের উল্লেখ পাওয়া যায়।

'অসাধ্য' অর্থাৎ যে-রোগ সারান মানুষের সাধ্যাতীত]। **পঞ্চম বর্ষীয় শিশু**—পঞ্চ বর্ষীয় শিশু। **ভীষণ বিভীষিকা**—দারুণ বিভীষিকা। ['ভীষণ' ও 'বিভীষিকা' শব্দদুইটি প্রায়-সমার্থক, সুতরাং এরূপ শব্দ প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নয়।] **বিশিষ্ট শিষ্ট**—অতীব শিষ্ট। **বিশ্রী গন্ধ**—দুর্গন্ধ [ইহার প্রয়োগ সমর্থনীয়]। **যথেষ্ট ক্ষতি**—অনেক ক্ষতি। ['ক্ষতি' কাহারও কামনার বস্তু (ইষ্ট) নয় বলিয়া, মনে হইবে বুঝি 'যথেষ্ট' কথার প্রয়োগ সুষ্ঠু হয় নাই। কিন্তু 'প্রভূত' অর্থে 'যথেষ্ট' শব্দের প্রয়োগ আছে।] **সমূহ সমস্যা**—জটিল সমস্যা। ['সমূহ বিপদ' কথার অনুকরণে উক্তরূপ প্রয়োগ]। **স্বর্ণসুযোগ**—অনেকে হয়তো বলিবেন, কথাটি ইংরেজী Golden opportunity কথার অনুবাদ হইলেও কথাটি বাংলায় স্থায়ী আসন পায় নাই। সুতরাং 'উত্তম সুযোগ' বলাই ভালো। কিন্তু কথাটি কি অলংকারশাস্ত্রসম্মত প্রয়োগ নয়? 'সোনার মুহূর্ত' যদি চলে, তাহা হইলে 'স্বর্ণসুযোগ' চলিবে না কেন? **স্বপ্নাদ্য ঔষধ**—স্বপ্নলব্ধ ঔষধ ['স্বপ্নাদ্য মাদুলী' কথাটির অনুকরণে]। **সাংঘাতিক লোক**—ভয়ানক লোক।

[২৩] **'বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ, এমন কি অব্যয়কেও একই বিশেষণ শব্দ বিশেষিত করিতে পারে।'—এই বিধি অনুসারে 'কত' [বিশেষণ] শব্দের সাহায্যে যে-কোনো চারিটি প্রয়োগের উদাহরণ দিয়া এক-একটি বাক্য গঠন কর :**

[১] সেখানে **কত লোক** জড় হইয়াছিল। [২] সে যে **কত বড়ো** মিথ্যাবাদী তাহা তুমি জান না। [৩] কালের স্রোত দুর্নিবার—উহার প্রবাহে **কত তুমি কত আমি** ভাসিয়া যাইব। [৪] মাতৃহারা শিশুটি সমস্ত রাত ধরিয়া **কত কাঁদিল**। [৫] **কত সাবধানে** এ কাজ করিতে হয় তাহা তোমার ধারণার অতীত। [৬] লোকটা যে **কত কী** বলিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

[২৪] **নিম্নলিখিত শব্দযুগলসমূহের মধ্যে চারিটির প্রয়োগ ও অর্থের পার্থক্য দেখাইয়া বাক্য রচনা কর :**

দ্রুত, উপদ্রুত ; উদ্ধার, উদ্ধৃতি ; প্রহার, প্রহরণ ; অবধান, ব্যবধান ; নিবন্ধ, নির্বন্ধ ; অসার, আসার ; লক্ষ্য, উপলক্ষ্য ; অবশ্য, অ-বশ্য।

দ্রুত : দ্রুতগতিতে পথ হাঁটিয়া আসার জন্য তিনি অতীব ক্লান্তি অনুভব করিতেছেন। **উপদ্রুত :** নোয়াখালির দাঙ্গার পর মহাত্মা গান্ধী উপদ্রুত অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। **উদ্ধার :** সাম্প্রদায়িক বিরোধের সময় যে-সকল নারী অপহৃতা হইয়াছে তাহাদের উদ্ধার করা আমাদের সকলেরই কর্তব্য। **উদ্ধৃতি :** প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতিসহ আলোচ্য প্রশ্নটির উত্তর দাও। **প্রহার :** পাঠশালার গুরু-

মহাশয়রা ছাত্রদিগকে মাঝে মাঝে নির্মমভাবে প্রহার করিয়া থাকেন, কিন্তু এ রীতি সর্বৈব বর্জনীয়। **প্রহরণ** : দশপ্রহরণধারিণী দেবী দুর্গাকে প্রণতি জানাইলাম। **অবধান** : মহারাজ, দূতবাক্য অবধান করুন। **ব্যবধান** : 'অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে, তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।' **নিবন্ধ** : তাঁহার রচিত এই নিবন্ধটি সত্যই সুন্দর হইয়াছে। **নির্বন্ধ** : মহর্ষি বরতন্তু শিষ্য কৌৎসের গুরুদক্ষিণাদানের নির্বন্ধাতিশয্যদর্শনে বিরক্ত হইয়া চতুর্দশকোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করিলেন। **অসার** : মায়াবাদী শংকরাচার্য এই বিচিত্রসুন্দর সংসারকে অসার বলিয়াই জানিয়াছিলেন। **আসার** : 'অশ্রুবারিধারা আসার [বৃষ্টি, ধারা-সম্পাত], জীমূতমন্দ্র হাহাকার-রব'। **লক্ষ্য** : সাহিত্যের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর। **উপলক্ষ্য** : গঙ্গাস্নান উপলক্ষ্যে এই মেলায় অজস্র যাত্রীর সমাগম হয়। **অবশ্য** : পিতামাতার সুচিন্তিত উপদেশ সন্তানদের অবশ্যপালনীয়। **অ-বশ্য** : অ-বশ্য ইন্দ্রিয়গ্রামকে যিনি বশে আনিতে পারেন তিনিই জিতেন্দ্রিয়।

[২৫] **যে-কোনো চারিটি প্রশ্নের নির্দেশমত উত্তর দাও :**

[ক] 'শিরঃপীড়া' ও 'পুরস্কার'—সন্ধির নিয়মের বিভিন্নতা বিচার কর। [খ] কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়রূপে 'আ'-র প্রয়োগের উদাহরণ দাও। [গ] 'তিনি উন্মাদ হইয়াছেন'; 'শুভকার্য নির্বাহ হইয়াছে'—সংস্কৃত বাক্যগঠনের আদর্শে এই দুইটি বাক্যের শুদ্ধতা বিচার কর। [ঘ] বিদেশী ও বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের এক হইয়া যাওয়ার দুইটি দৃষ্টান্ত দাও। [ঙ] 'বিজোড়' ও 'বিষম'—এই দুইটি দৃষ্টান্তে 'বি' উপসর্গের পার্থক্য দেখাও। [চ] সমার্থক দ্বন্দ্বের দুইটি উদাহরণ দাও। [ছ] অলুক সমাসের অনুরূপ প্রয়োগের দুইটি দৃষ্টান্ত বাংলায় দেখাও।

[ক] শিরঃপীড়া ও পুরস্কার : পুরঃ+কার=পুরস্কার। ক, প, বা ফ পরে থাকিলে সাধারণত অ-কার বা আ-কারের পরস্থিত বিসর্গস্থানে 'স' হয়, কিন্তু 'শিরঃপীড়া' স্থানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। এখানে বিসর্গ স্থানে 'স' হয় নাই। [খ] কৃৎ প্রত্যয়রূপে 'আ'-র প্রয়োগ : চল্+আ=চলা ; যেমন, চলা-পথ। কাচ্+আ=কাচা ; যেমন, কাচা-কাপড়। তদ্ধিত প্রত্যয়রূপে 'আ'-র প্রয়োগ : বাঘ+আ=বাঘা ; যেমন, বাঘা তেঁতুল ; হাত+আ=হাতা [সদৃশ অর্থে] ; তদ্রূপ—কেষ্টা, বামনা, গোপলা, ইত্যাদি [অনাদরে]। [গ] সংস্কৃত বাক্যগঠনের আদর্শে 'তিনি উন্মাদ হইয়াছেন' বাক্যটির শুদ্ধরূপ হইবে 'তিনি উন্মত্ত হইয়াছেন' কিংবা 'তিনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন'। কারণ, 'উন্মাদ' কথাটি বিশেষ্যপদ, একটি রোগের নাম। ইহাকে বিশেষণে পরিণত না করিলে 'তিনি' এই পদের বিশেষণ হইতে পারে না। 'শুভকার্য নির্বাহ হইয়াছে' না লিখিয়া 'শুভকার্য নির্বাহিত হইয়াছে' লেখাই সমীচীন। এখানেও পূর্বোক্ত কারণ প্রযোজ্য। [ঘ] দারোয়ান, গাড়োয়ান—এখানে বাংলা 'বান্' ও বিদেশী 'ওয়ান'

প্রত্যয় এক হইয়া গিয়াছে। [ঙ] বিজোড়—'বি' উপসর্গটি বিপরীতার্থক : 'বিষম' —এখানে 'বি' উপসর্গটি নঞর্থক। [চ] রাজারাজড়া, রাজাবাদশা, আমীরওমরাহ ইত্যাদি। [ছ] ঘিয়ে-ভাজা, গায়ে-হলুদ ইত্যাদি। [সমাসের আলোচনা দ্রষ্টব্য]।

[২৬] নিম্নলিখিত শব্দযুগলসমূহের মধ্যে চারিটির প্রয়োগ ও অর্থের পার্থক্য দেখাইয়া বাক্য রচনা কর :

পরন্তু, উপরন্তু; অতএব, অর্থাৎ; উদ্বৃত্ত, উদ্ধৃত; যাপন, উদ্‌যাপন; টপ্‌টপ্, টিপ্‌টিপ্; অন্বয়, সমন্বয়; পরুষ, পৌরুষ; সংস্কার, সংস্করণ; ভাতটাত, ভাতফাত।

পরন্তু : তুমি কাজটি করিলে তিনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না, পরন্তু নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবেন। **উপরন্তু :** হাজি মহম্মদ মহসীনের গৃহে চোর প্রবেশ করিয়া ধৃত হইল; মহসীন চোরকে কোনো শাস্তি দিলেন না, উপরন্তু তাহাকে এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। **অতএব :** আমি তাঁহার কাছে নানাভাবে ঋণী, অতএব তাঁহার কথার বিরুদ্ধাচরণ করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। **অর্থাৎ :** তোমাকে যে-দুইশত টাকা দিলাম উহাতেই এই মাসের ব্যয়নির্বাহ করিতে হইবে; অর্থাৎ উহার বেশী খরচ করিলে তোমার ধার করা ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। **উদ্বৃত্ত :** তোমাকে ধার দিবার মতো উদ্বৃত্ত অর্থ আমার হাতে নাই। **উদ্ধৃত :** এই কয়েকটি পঙ্‌ক্তি রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত কবিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। **যাপন :** পুত্রের মৃত্যুর পর অসহায় পিতামাতা অতীব মনোবেদনায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন। **উদ্‌যাপন :** এই পুণ্যব্রত উদ্‌যাপন করা আমাদের সকলেরই কর্তব্য। **টপ্‌টপ্ :** মাধবীর রূঢ় আচরণে মাতা এত কষ্ট পাইলেন, তাঁহার দুটি চোখ হইতে টপ্‌টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। **টিপ্‌টিপ্ :** কাল সারাদিন ধরিয়া টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি পড়িয়াছে। **অন্বয় :** মধুসূদনের রচনায় মাঝে মাঝে দূরান্বয়দোষ পরিলক্ষিত হয় [পদের পরস্পর-সম্বন্ধ অর্থে]। **সমন্বয় :** ভাবের গভীরতা ও প্রকাশসৌন্দর্যের সমন্বয় ঘটিয়াছে বলিয়াই এই কবিতাটি এতখানি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। **পরুষ :** তাঁহার পরুষ [নিষ্ঠুর] আচরণে সকলেই ব্যথিত হইলেন। **পৌরুষ :** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মধ্যে এমন একটি বলিষ্ঠ পৌরুষ [পুরুষোচিত উদ্যম, সাহস, পরাক্রম] ছিল, যাহা হীনবীর্য বাঙালীচরিত্রে বিরলদৃষ্ট। **সংস্কার :** সতীদাহপ্রথা রদ করিয়া রামমোহন হিন্দুর সমাজসংস্কার-এর ক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। **সংস্করণ :** পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের অনেক অংশ পরিবর্জিত হইয়াছে। **ভাতটাত :** ভাতটাত ফেলে রাম একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসলে। **ভাতফাত :** আমার মন আজ একেবারেই ভালো নেই, ভাতফাত কিছুই আমি খাবো না।

[২৭] যে-কোনো চারিটি প্রশ্নের নির্দেশমত উত্তর দাও :

[ক] 'বিরক্ত' ও 'নিরীহ' এই দুইটি পদের বাংলাভাষায় প্রয়োগে সংস্কৃত হইতে অর্থবিভেদ ঘটিয়াছে, তাহা দেখাও। [খ] 'নিরপরাধী ব্যক্তিকে প্রহার অত্যন্ত অযৌক্তিক'—এই বাক্যের সমস্ত অশুদ্ধির সংশোধন কর। [গ] সে **তাস** খেলে ; সে **লাঠি** খেলে—এখানে 'তাস' ও 'লাঠি' কি একই কারক, না বিভিন্ন কারক হইবে, এ বিষয়ে যুক্তিসহ তোমার মত ব্যক্ত কর। [ঘ] 'বিলক্ষণ' শব্দটিকে বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ ও অব্যয়রূপে প্রয়োগ করিয়া এক-একটি বাক্য রচনা কর। [ঙ] বহুপদগঠিত বিশেষণের দুইটি উদাহরণসম্বলিত বাক্য রচনা কর। [চ] 'আমি এই কথা বলিয়া থাকিব' ও 'তাহার চিঠি সময়মত পাইলে আমি যাইতাম'—এই দুইটি বাক্যে ক্রিয়ার কাল নির্ণয় কর।

[ক] সংস্কৃতে **বিরক্ত** কথাটির অর্থ হইতেছে অনাসক্ত, উদাসীন, বিগতস্পৃহ। বি—রন্‌জ+ক্ত=বিরক্ত। কিন্তু বাংলায় শব্দটির প্রয়োগ হয় ঈষৎ ক্রুদ্ধ হওয়া অর্থে। **নিরীহ** : নির্ (নাই) ঈহা [স্পৃহা বা উদ্যম] যাহার=নিরীহ অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট। কিন্তু বাংলায় শব্দটি 'ভালো মানুষ', 'বেচারা' অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। [খ] নিরপরাধ ব্যক্তিকে প্রহার করা অযৌক্তিক। [গ] 'সে তাস খেলে'—সে তাস দ্বারা খেলে ; এখানে 'তাস' কথাটি করণকারক। ক্রিয়াসম্পাদনের যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় তাহাই করণ। এখানে 'তাস' ব্যতীত 'খেলা'-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না, এইজন্য 'তাস' করণকারক। 'সে লাঠি খেলে'—সে লাঠিকে ঘোরায়, অতএব 'লাঠি' কর্মকারক। এখানে 'খেলে' ক্রিয়াটির প্রকৃত অর্থ খেলা করা নয়, ঘোরানো বা নৈপুণ্য প্রদর্শন করা। 'লাঠি' 'খেলে' ক্রিয়ার কর্ম। [ঘ] তাহার এই আচরণ হইতে আমি বিলক্ষণ শিক্ষা লাভ করিয়াছি [বিশেষণ]। সে বিলক্ষণ ভালো ছেলে, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই [বিশেষণের বিশেষণ]। তুমি আমাকে বিলক্ষণ প্রতারিত করিয়াছ [ক্রিয়াবিশেষণ]। তুমি আমার কথা ভুলো না যেন। বিলক্ষণ, তোমার কথা কি কখনো ভোলা যায় ? [অব্যয়]। (ঙ) পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলেটি একদিন পথেই হারাইয়া গেল। একমাত্র ছেলেটিকে মা আদর করিয়া বলেন—'আমার খোকন সাত-রাজার-ধন-মানিক'। [চ] 'বলিয়া থাকিব'—পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ; 'যাইতাম'—নিত্যবৃত্ত [সাপেক্ষ নিত্যবৃত্ত] অতীত।

[২৮] নিম্নলিখিত শব্দযুগলের [Pair of Words] মধ্যে পাঁচটির অর্থের পার্থক্য দেখাইয়া বাক্য গঠন কর :

নিপাত, নিপাতন ; অভিনিবেশ, উপনিবেশ ; প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠান ; পালন, প্রতি-পালন ; আরাম, বিরাম ; আদর, আহব ; কৌতুক, কৌতূহল ; যাচক, উপযাচক।

নিপাত : এই শত্রুর যদি নিপাত না ঘটে তাহা হইলে সকলেরই সর্বনাশ অনিবার্য। **নিপাতন :** অস্ত্রনিপাতনে [প্রক্ষেপণ] তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। **অভিনিবেশ :** তাঁহার উপদেশগুলি অভিনিবেশ [মনোযোগ]-সহকারে শ্রবণ কর, ইহাতে ভবিষ্যতে তোমার মঙ্গল হইবে। **উপনিবেশ :** উপনিবেশ [বিদেশস্থ আবাসভূমি— colony] স্থাপন করিতে না পারিলে সাম্রাজ্যবাদ কখনো প্রসারলাভ করিতে পারে না। **প্রতিষ্ঠা :** শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহপ্রতিষ্ঠাকল্পেই এই মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছে। **প্রতিষ্ঠান :** আমাদের দেশের শ্রমিকসংঘপ্রতিষ্ঠানগুলি আজ পর্যন্ত তেমন উন্নত হইতে পারে নাই। **পালন :** তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞাপালনে দৃঢ়সংকল্প। **প্রতিপালন :** পরের সন্তান হইলেও তাহাকে তিনি আপন সন্তানের মতো প্রতিপালন করিতে কোনোদিন কুণ্ঠাপ্রকাশ করেন নাই। **আরাম :** কেবল ভোগ-বিলাস-আরাম মানুষকে কর্মবিমুখ করিয়া তোলে। **বিরাম :** বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, অক্লান্তভাবেই তিনি এই কাজটা করিয়া যাইতেছেন। **আসব :** আসব [মদ্য] পান করিলে যে মত্ততা জন্মায়, একথা কে না জানে? **আহব :** 'সংগ্রামসাধ অবশ্য মিটাব মহাহবে [যুদ্ধে] আমি তব।' **কৌতুক :** কৌতুকহাস্য-সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি সত্যই চমৎকার। **কৌতূহল :** বিজ্ঞানের সৃষ্টিমূলে রহিয়াছে মানুষের কৌতূহলবৃত্তি। **যাচক :** শোনা যায়, কর্ণ এতবড়ো দানশীল ছিলেন, কোনো যাচক [প্রার্থী] কোনোদিন তাঁহার দ্বার হইতে শূন্যহস্তে ফিরিয়া যায় নাই। **উপযাচক :** চিকাগো-ধর্মসভায় বিবেকানন্দ আহূত হন নাই, কিন্তু উপযাচক [বিনা-আহ্বানে যে কিছু বলিতে চায়] হইয়া তিনি যে-বক্তৃতা দিলেন, তাহাতে শ্রোতৃমণ্ডলী মুহূর্তেই বিস্ময়-সচকিত হইয়া উঠিল।

[২৯] **নিম্নোদ্ধৃত বাগ্‌ধারা ও প্রবচনগুলির [Idioms and Proverbs] মধ্যে পাঁচটির অর্থ বুঝাইয়া অর্থদ্যোতক এক-একটি বাক্য গঠন কর :**

অঠারো মাসে বছর ; একে মা মনসা তাতে ধুনার গন্ধ ; গাছেরও খায় তলারও কুড়ায় ; গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া ; ছুঁচ হয়ে ঢোকে ফাল হয়ে বেরোয় ; পাথরে পাঁচ কিল ; যত গর্জে তত বর্ষে না ; লক্ষীর মা ভিক্ষা মাগে ; কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা ; সোনা বাহির আঁচলে গেরো।

আঠার মাসে বছর : [দীর্ঘসূত্রতা] তার মতো আরামপ্রিয় মানুষকে কাজটি করবার ভার দিয়েছ—সে তো আঠার মাসে বছর গোণে ; দেখো, কাজটি শেষ হতে কতদিন লাগে। **একে মা মনসা তাতে ধুনার গন্ধ :** [যে যাহা অপছন্দ করে তাহাই করা] ভট্টাচার্য-মহাশয়ের মতো নীতিবাগীশ লোক আর দ্বিতীয়টি নেই, তাঁর কাছে গিয়েছে ছেলেরা থিয়েটারের চাঁদা চাইতে—একে মা মনসা তাতে ধুনার গন্ধ।

গাছেরও খায় তলারও কুড়ায়ঃ [দুই তরফা লাভ] রমেশবাবু মোটাবেতনে দীর্ঘকাল সরকারী চাকরি করলেন ; তারপর পেন্সন নিয়ে যখন বেরিয়ে এলেন তখন নিজের বড়ো ছেলেটিকে তাঁর শূন্য আসনে বসিয়ে এলেন, অথচ ওই পদের জন্য যোগ্যতর প্রার্থীর অভাব ছিল না। রমেশবাবু সেই জাতেরই লোক যাঁরা গাছেরও খান তলারও কুড়ান। **গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়াঃ** [প্রথমে অবহেলা প্রদর্শন করিয়া পরে যত্ন লওয়া] প্রথমে ছেলেটার সুশিক্ষার দিকে একেবারেই নজর দাওনি, এখন কুসঙ্গে পড়ে ছেলেটা গোল্লায় গেল বলে বুক চাপড়াচ্ছ, আর তার চরিত্রসংশোধনের জন্য প্রাণপাত করছ—কিন্তু গোড়া কেটে আগায় জল দিয়ে কী লাভ হবে ? **ছুঁচ হয়ে ঢোকে ফাল হয়ে বেরোয়ঃ** [সামান্য সুযোগসুবিধাকে আশ্রয় করিয়া কালক্রমে সর্বগ্রাসী আধিপত্য বিস্তার করা ; অথবা, প্রথমে মৌখিক বন্ধুত্বে লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া সেই সুযোগে অনিষ্টসাধন করা] তার মতো সাংঘাতিক চরিত্রের লোক খুব কমই আছে, ওকে বাড়ীতে স্থান দিও না—সবই ও করতে পারে, ছুঁচ হয়ে ঢুকবে ফাল হয়ে বেরুবে। **পাথরে পাঁচ কিলঃ** [পাথরে কিল মারিলে তাহাতে পাথরের কিছুই হয় না, সেইরূপ যে প্রবল কেহই সহজে তাহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে না] তার সঙ্গে লড়তে যেওনা—তারতো এখন পাথরে পাঁচ কিল-অবস্থা। **যত গর্জে তত বর্ষে নাঃ** [অনেক সময় দেখা যায়, কোনো কিছুতে যেখানে বেশী আড়ম্বর তা মোটেই সুসম্পন্ন হয় না বা সাফল্যলাভ করে না] হরিবাবু খুব তর্জনগর্জন করে বলে গেলেন, লোকটাকে একবার দেখে নেবেন ; কিন্তু আসলে লোকটার সামনে গিয়ে দুটি কথা বলবার শক্তিসামর্থ্যও তাঁর নেই—মনে রেখো, যত গর্জে তত বর্ষে না। **লক্ষ্মীর মা ভিক্ষা মাগেঃ** [অগাধ ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও কোনো খেয়ালবশে দরিদ্রজীবনযাপন করা] বাঁড়ুজ্যেমশায় টাকার উপর শুয়ে আছেন, অথচ নিজের ছোট মেয়েটির বিয়ের সময় চাঁদার খাতা নিয়ে পরের দুয়ারে তিনি ঘুরে বেড়ালেন—তাঁকে দেখে মনে হলো, লক্ষ্মীর মা ভিক্ষা মাগছে। **কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলাঃ** [একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে দিয়ে আর-একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তির শত্রুতাসাধন করা] জার্মানী আর রাশিয়া উভয়েই ব্রিটেনের শত্রু, কিন্তু গেল যুদ্ধের সময় কেমন কৌশলে রাশিয়াকে দিয়ে ব্রিটেন জার্মানীর সর্বনাশ ঘটাল—একেই বলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। **সোনা বাহির আঁচলে গেরোঃ** [বহুমূল্য দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সামান্য জিনিসের জন্য অত্যধিক সতর্ক মনোভাব প্রদর্শন করা] তাঁর দেশের যত সম্পত্তি সাত ভূতে লুটে নিচ্ছে, সেদিকে যদুবাবুর খেয়াল নেই ; কিন্তু কলকাতার সামান্য দু'কাঠা জায়গার জন্য তিনি মামলা চালাচ্ছেন হাইকোর্ট পর্যন্ত—এ দেখছি, সোনা বাহির আঁচলে গেরো দেওয়ার মতো ব্যাপার।

[৩০] নিম্নলিখিত যুগ্মশব্দগুলির [Pair of Words] মধ্যে চারিটির অর্থগত পার্থক্য দেখাইয়া বাক্য রচনা কর :

অবতরণ, অবতারণা ; অর্ধাসন, অর্ধাশন ; অনুনাসিক, উন্নাসিক ; প্রেরণ, প্রেরণা ; প্রশস্ত, প্রশস্তি ; প্রয়োজন, প্রযোজনা ; প্রবাদ, পরিবাদ।

অবতরণ : [অবরোহণ, নামা] বৃক্ষ হইতে অবতরণকালে হঠাৎ তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। **অবতারণা** : [প্রস্তাবনা, ভূমিকা] বিশেষ কোনোকিছুর অবতারণা না করিয়াই তিনি তাঁহার মূল বক্তব্যটি সরাসরি পাঠকের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছেন। **অর্ধাসন** : [অর্ধেক আসন] পার্বতী উপস্থিত হইয়া মহেশ্বরের পার্শ্বে অর্ধাসনে উপবিষ্টা হইলেন। **অর্ধাশন** : [আধপেটা খাওয়া] এই দরিদ্র বাংলাদেশে অধিকাংশ লোকই অর্ধাশন-অনশনে দিনাতিপাত করে। **অনুনাসিক** : [নাকী] নাসিকার সাহায্যে উচ্চার্য বর্ণগুলিকেই অনুনাসিক বর্ণ বলা হইয়া থাকে। **উন্নাসিক** : [নাক সিটকান যাহার অভ্যাস] কোনো লেখাই স্বরেশের পছন্দ হয় না, তার মতো উন্নাসিক-মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকের মনস্তুষ্টিসাধন একরূপ অসম্ভব। **প্রেরণ** : [পাঠানো] তোমার কাছে যে-চিঠিখানা আজ প্রেরণ করা হইল, সহসা তাহার জবাব লিখিতে ভুলিও না। **প্রেরণা** : [প্রবৃত্তি-শক্তি] তাঁহার এই কবিতাটির রচনামূলে রহিয়াছে গভীর অধ্যাত্ম-অনুভূতির প্রেরণা। **প্রশস্ত** : [উদার, চওড়া, বিস্তৃত] বিদ্যাসাগরের মতো প্রশস্তহৃদয় ব্যক্তি সর্বদেশেই বিরলদৃষ্ট। **প্রশস্তি** : [প্রশংসা] 'উর্বশী' কবিতাটির মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের প্রশস্তিসংগীত উচ্চারণ করিয়াছেন। **প্রয়োজন** : [দরকার] এই গৃহটির মেরামতকার্য-সম্পাদন করিতে হইলে অনেক টাকার প্রয়োজন। **প্রযোজনা** : [কোনো কাজ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সম্পাদন করা অর্থে] তিনি রঙ্গমঞ্চে এই নাটকটির প্রযোজনা করিয়াছেন। **প্রবাদ** : [চলিত কথা, জনশ্রুতি, কিংবদন্তী] প্রবাদ আছে, এই দীঘিটা নন্দীপুরের জমিদার খনন করাইয়াছিলেন। **পরিবাদ** : [অপবাদ, নিন্দা] 'সই, লোকে বলে কালা-পরিবাদ, কালার ভরমে হাম জলদ না হেরি গো, ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ।'

[৩১ : ক] 'বিত্ত' শব্দের যোগে গঠিত, বাংলাভাষায় সচরাচর প্রচলিত, একটি শব্দের উল্লেখ ও অর্থনির্দেশ কর।

বাংলা 'মধ্যবিত্ত' কথাটি 'বিত্ত' শব্দের যোগে গঠিত হইয়াছে। সমাজে যাহারা ঐশ্বর্যবান ধনীও নয়, আবার একেবারে নিঃস্ব দরিদ্রও নয়, এমন যে সম্প্রদায়, তাহাদিগকেই বলা হয় 'মধ্যবিত্ত'। ইহারা সাধারণত বুদ্ধিজীবী, এবং প্রধানত চাকুরীই ইহাদের জীবিকাসংস্থানের প্রধান সম্বল।

[৩১ : খ] 'তুমি এ বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করিও না'—এই বাক্যটিতে 'উচ্চবাচ্য' কথাটির মূলগত অর্থের সহিত ব্যবহারগত অর্থের কী সম্বন্ধ, তাহা বুঝাইয়া বল।

'উচ্চবাচ্য' শব্দটির মূলগত অর্থ হইতেছে উঁচু কথা বলা, চড়া কথা বলা। কিন্তু তাহার ব্যবহারগত অর্থ হইল, টু-শব্দ না করা, একেবারে চুপ করিয়া থাকা।

[৩২] নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে-কোনো দুইটির বৈয়াকরণিক বিশুদ্ধি ও প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্যের বিচার কর :

নিশ্চুপ, নির্দোষী, সকৃতজ্ঞ, প্রতিযোগীতা, নিরতিশয়, দৈবাৎ।

নিশ্চুপ : 'নিঃ' সংস্কৃত উপসর্গ, আর 'চুপ' শব্দটি অসংস্কৃত কথা ; সুতরাং এরূপ সমাস সংস্কৃতভাষার নিয়মবিরুদ্ধ। তবে বাংলায় কথাটি প্রয়োগসিদ্ধ। তাহাতেও শব্দটিতে 'ভাব-প্রত্যয়ে'র লোপ হইয়াছে বলিতে হইবে, অর্থাৎ 'নিশ্চুপত্ব' অর্থেই 'নিশ্চুপ'। **নির্দোষী :** নিঃ [নাই] দোষ যাহার, এইভাবে বহুব্রীহি সমাস করিয়া 'নির্দোষ' পদটি হয়। তাহার উপর আবার 'ইন্'-প্রত্যয় করা নিষ্প্রয়োজন ও ইহাতে দ্বিরুক্তিদোষ ঘটে। এই সম্পর্কে সংস্কৃত বিধিটি এইরূপ : 'ন কর্মধারয়ান্মত্বর্থীয়ো বহুব্রীহিশ্চেদ্ অর্থপ্রতিকর।' **সকৃতজ্ঞ :** এখানে 'কৃতজ্ঞ' কথাটাই প্রয়োজনীয় অর্থ দ্যোতিত করে ; সুতরাং আবার 'সহ' [স]-এর সঙ্গে সমাস নিষ্প্রয়োজন। ইহা 'অকৃতজ্ঞ' কথাটির বিপরীত বিধায় প্রয়োগ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রয়োগটি অশুদ্ধ। **প্রতিযোগীতা :** প্রতিযোগিন্ [মূল কথাটি]+তা [প্রত্যয়] ['ন্' কারের লোপে] প্রতিযোগিতা। সুতরাং 'প্রতিযোগীতা' অশুদ্ধই বলিতে হইবে। **নিরতিশয় :** প্রয়োগটি শুদ্ধ। সংস্কৃতে 'অতিশয়' কথাটি বিশেষ্য, যদিও বাংলায় বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। তাই নিঃ [নাই] অতিশয় যাহা হইতে, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে 'নিরতিশয়' [বিশেষণ] পদটি সিদ্ধ হয়। **দৈবাৎ :** দৈবাৎ কথাটির আসল অর্থ হইতেছে 'দৈবের ইচ্ছায়', অর্থাৎ যেখানে মানুষের কোনো হাত নাই। কিন্তু সাধারণ প্রয়োগে অব্যয় শব্দরূপে 'অকস্মাৎ' বা কারণ না থাকিলেও যে কার্য হয় হয়, সেই অর্থেই ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কথাটি শুদ্ধ।

[৩৩] নিম্নলিখিত যুগ্মবাক্যাংশগুলির মধ্যে তিনটির প্রয়োগের অর্থগত পার্থক্য বুঝাইয়া দাও :

[১] **দিনে দিনে** রোগ বাড়িতে লাগিল ; **দিনে দিনে** পৌঁছান চাই। [২] আমি **মরতে** এখানে এসেছি ; আমি **মরতে মরতে** এখানে এসেছি। [৩] তোমাকে সব জিনিস **হাতে হাতে** দেওয়া চাই ; **হাতে হাতে** ফল পাবে। [৪] আমি তাকে **চোখে চোখে** রাখি ; **চোখে চোখে** ইসারা চলছে।

[১] 'দিনে দিনে রোগ বাড়িতে লাগিল'—এখানে 'দিনে দিনে' বাক্যাংশের অর্থ হইল—একটির পর একটি, যতই দিন যায়। 'দিনে দিনে পৌঁছান চাই'—এখানে 'দিনে দিনে'র অর্থ সন্ধ্যা নামিবার পূর্বেই, বেলা থাকিতে থাকিতে।

[২] 'আমি মরতে মরতে এখানে এসেছি'—এখানে 'মরতে মরতে' বাক্যাংশের অর্থ—আসার পথে নানারকমের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে ; পথে এত বিপদ দেখা দিয়াছে যে, প্রতিমুহূর্তেই মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল। 'আমি মরতে এখানে এসেছি'—এস্থলে 'মরতে' কথার অর্থ মরণযন্ত্রণা ভোগ করিতে, সুতরাং এখানে না-আসাই ভালো ছিল।

[৩] 'তোমাকে সব জিনিস হাতে হাতে দেওয়া চাই'—এখানে 'হাতে হাতে' বাক্যাংশের অর্থ জিনিসটি উঠিয়া লইবার কষ্টটুকু পর্যন্ত না দিয়া ; আরো সহজ কথায়, তুমি এত অলস যে, একটু নড়িয়াচড়িয়া বসিতেও তোমার কষ্ট হয়, সেজন্যই জিনিসটি একেবারে হাতের উপর তুলিয়া দেওয়া। 'হাতে হাতে ফল পাবে'—এখানে 'হাতে হাতে' কথার অর্থ অনতিবিলম্বে, কাজটা সম্পাদন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই।

[৪] 'আমি তাকে চোখে চোখে রাখি'—এখানে 'চোখে চোখে' বাক্যাংশের অর্থ হইল, তাহার সম্বন্ধে আমি এত সাবধান যে, তাহাকে এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়ালে যাইতে দিই না—পাছে তাহাকে হারাই, তাহার কোনো অনিষ্ট হয়, এই আশঙ্কায়। 'চোখে চোখে ইসারা চলছে'—এখানে 'চোখে চোখে' কথার অর্থ চোখের ইংগিতময় নিঃশব্দ ভাষার মাধ্যমে, দৃষ্টির প্রচ্ছন্ন সংকেতের সহায়তায়। চোখের দৃষ্টির সাহায্যেও মানুষ ভাবের আদানপ্রদান করিতে পারে।

[৩৪] নিম্নলিখিত বাগ্‌ধারাগুলির [idioms] মধ্যে চারিটির অর্থ বুঝাইয়া এক-একটি বাক্য রচনা কর :

ডালভাঙা ক্রোশ ; কলুর বলদ ; চিনির বলদ ; বাঘের দুধ ; যখের ধন ; বিদুরের ক্ষুদ ; রাবণের চিতা।

ডালভাঙা ক্রোশ : [অর্থ : খুব দূরের পথ বুঝাইতে এই বাগ্‌ধারাটির প্রয়োগ হয়] শুনা যায়, খুব আগে নাকি লোক সবুজ পাতাসমেত একটি গাছের ডাল হাতে লইয়া পথ চলিতে চলিতে ওই ডাল এবং ডালটির পাতা যেখানে একেবারে শুকাইয়া যাইত, সেখান পর্যন্ত পথের দূরত্বের পরিমাণ ধরা হইত এক ক্রোশ অর্থাৎ দুই মাইল। বলা বাহুল্য, দুই মাইল পথ অতিক্রম করিলে পাতাসহ ডালটি শুকাইয়া কাঠ হইয়া যায় না—ইহার জন্য বহুদূর পথ অতিক্রমণের প্রয়োজন। বাক্য রচনা : তারা হাঁটছে তো হাঁটছেই, পথ আর ফুরোয় না ; সেজন্য তাদের মধ্যে একজন বিরক্ত হয়ে বল্‌লে, এ দেখছি ডালভাঙা ক্রোশ, অন্ত পাওয়া যায় না। **কলুর বলদ :**

[অর্থ : পরাধীনভাবে, অক্লান্ত পরিশ্রমে, কেবল কাজ করিয়া যাওয়া—যেমন করিয়া কলুর বলদ চোখে ঠুলিবাঁধা অবস্থায় কলুর স্বার্থেই দিনরাত ঘানি টানিয়া চলে] বাক্য রচনা : 'মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখঢাকা বলদের মত।' **চিনির বলদ** : [অর্থ : নিজেকে বঞ্চিত করিয়া পরের স্বার্থে যে শুধু খাটিয়া মরে তাহাকেই বলা হয় চিনির বলদ ; বলদের পিঠে চিনির বস্তা চাপাইয়া দেওয়া হয়, সে উহা বহন করে, কিন্তু চিনির স্বাদ হইতে বলদ একেবারেই বঞ্চিত] বাক্য রচনা : রামবাবু ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার, সকাল হতে সন্ধ্যে পর্যন্ত কত টাকা নাড়াচাড়া করছেন ; অথচ অতি সামান্য তাঁর বেতন, ওতে মাসের পনেরো দিনও তাঁর চলে না—রামবাবুর ভাগ্য চিনির বলদের মতোই বটে ! **বাঘের দুধ** : [খুব দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী বুঝাইতে এই কথাটির প্রয়োগ হয়—বাঘের দুধ পাওয়া সহজ কথা নয়] বাক্য রচনা : টাকা থাকলে কী না হয় - এ দিয়ে দুষ্প্রাপ্য বাঘের দুধও সহজপ্রাপ্য হয়ে ওঠে। **যখের ধন** [অতিশয় কৃপণ তথা হৃদয়হীন ব্যক্তির সম্পদ বুঝাইতে এই বাগ্‌ধারাটি প্রযুক্ত হয়।] যদু মুখুজ্জ্যে তেজারতি-ব্যবসায়ে কত টাকা রোজগার করলেন, অথচ তাঁর বড়ো ছেলেটি দু'মাস ধরে রোগে ভুগে বিনা-ওষুধে মারা গেল ; বাপ হয়ে যদু মুখুজ্জ্যে একটি পয়সাও ছেলের জন্যে খরচ করলেন না। এ ভাবে যখের মতো ধন আটকিয়ে রেখে কী লাভ—সদ্ব্যয়েই তো টাকার সার্থকতা। **বিদুরের ক্ষুদ** : [শ্রদ্ধাসহকারে সামান্য দানকেই বলা হয় বিদুরের ক্ষুদ।] বাক্য রচনা : দয়া করে গরীবের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, সামান্য আমার আয়োজন—বিদুরের ক্ষুদ গ্রহণ করলেই আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো। **রাবণের চিতা** : [অনির্বাণ দুঃসহ শোক বুঝাইতে এই কথাটির প্রয়োগ হয়] বাক্য রচনা : বিধবার একমাত্র সন্তানটি মারা গেলে পাড়াপড়শীরা তাঁকে সান্ত্বনা দিতে এলেন ; তখন পুত্রশোকাতুর মাতা বললেন, 'বুকে রাবণের চিতা জ্বলছে, এ আগুন নিভবার নয়—আমায় তোমরা আর সান্ত্বনা দিও না।'

[৩৫] নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে-কোনো পাঁচটিতে সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক শব্দের পুনরাবৃত্তির বিশেষ অর্থ বুঝাইয়া দাও :

তুলতুলে ; কাঁদকাঁদ ; রাজারাজড়া ; খাঁ-খাঁ ; পূজাআচ্চা ; টাকাটাকা [করিয়া পাগল হইয়াছে] ; শীতশীত [করিতেছে] ; গরম-গরম [খাওয়া উচিত] ; সকাল-সকাল [শুইবে] ; শুয়ে-শুয়ে [বাতে ধরা]।

তুল্‌তুলে : 'তুল্‌তুলে'—এই ধ্বন্যাত্মক শব্দটি [অধ্বনিবাচক বিকৃত দ্বিত্ব] হৃষ্ট-পুষ্টতা তথা কোমলতার (তুলার মতো) ভাব দ্যোতিত করিতেছে। যেমন, শিশুটির হাতপাগুলি কেমন নরম তুল্‌তুলে ! **কাঁদকাঁদ** : যেমন, ছেলেটি আসিয়া 'কাঁদকাঁদ' গলায় বলিল—এখানে ঠিক ক্রন্দন বুঝাইতেছে না, কিন্তু কান্নার ভাব আছে, এখনই

হয়তো চোখের জল ঝরিয়া পড়িবে। **খাঁ-খাঁ** : এই ধ্বন্যাত্মক দ্বিরুক্ত শব্দটির দ্বারা বিরাট শূন্যতার ভাব বুঝাইতেছে। যেমন, লোকজন কেউ নেই, বড়ো বাড়ীটা একেবারে খাঁ-খাঁ করছে। **পূজাআচ্চা** : যেমন, 'পূজাআচ্চা' সেরে তবে তিনি খেতে যাবেন —এখানে এই ভিন্ন শব্দের যুগ্মপ্রয়োগের দ্বারা মূল শব্দ 'পূজা' ব্যাপকতা ও পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। 'পূজাআচ্চা' বলিতে পূজা ও ইহার আনুষঙ্গিক উপাসনা ইত্যাদি কর্ম বুঝায়। **টাকাটাকা** : যেমন, লোকটা 'টাকাটাকা' করিয়া পাগল হইয়া গেল ; এখানে 'টাকা' কথাটির পুনরাবৃত্তি তীব্র আকাঙ্ক্ষা দ্যোতিত করিতেছে। **শীত-শীত** : যেমন, আমার গা কেমন 'শীত-শীত' করছে—এখানে 'শীত-শীত' কথার অর্থ ঈষৎ শীতের ভাব। **গরম-গরম**: যেমন, 'গরম-গরম' ভাত খাওয়া ভালো—এখানে গরম বলিতে খুব গরম বুঝাইতেছে না, যতটুকু গরম থাকিলে আরামে খাওয়া যায়—ততটুকু গরম বুঝাইতেছে। **সকাল-সকাল** : যেমন, আজ তোমার শরীর ভালো নেই, 'সকাল-সকাল' শুয়ে পড়বে—এখানে 'সকাল-সকাল' কথার অর্থ বেশী রাত না করিয়া, তাড়াতাড়ি। **শুয়ে-শুয়ে** : অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্ব প্রয়োগের দ্বারা শোয়া-কার্যটির অনবচ্ছিন্নতার ভাব বুঝাইতেছে ; শুধু 'শোয়া' কথাটির মধ্যে উক্ত একটানা-ভাব নাই।

[৩৬] -টি, -টা ; -খানি, -খানা ; -টুকু, -টুকুন ; -গাছি, গাছা ; প্রভৃতি নির্দেশাত্মক বা খণ্ডসূচক অব্যয়ের প্রয়োগের বিভিন্ন অর্থ ও উপলক্ষ্য উদাহরণসাহায্যে পরিস্ফুট কর।

-টি, -টা, -টুকু, -টুকুন নির্দেশাত্মক প্রত্যয়। এগুলি সাধারণত বিশেষ্য এবং কোনো কোনো স্থলে বিশেষণ ও সর্বনামের সহিত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাদের প্রয়োগের দ্বারা বস্তু, বস্তুর সংখ্যা বা পরিমাণ সুনির্দিষ্ট হয়। ইহারা পদের সহিত যুক্ত হইয়া বস্তুর রূপ, গুণ প্রভৃতি বা উহার সম্বন্ধে বক্তার মনোভাবের ইংগিত দেয়। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এইসব প্রত্যয়ের [এবং শব্দ ও শব্দাংশের] নাম দিয়াছেন 'পদাশ্রিত নির্দেশক'। '-টি' সাধারণত স্নেহের ভাব, ভালো ধারণার ব্যঞ্জনা বহন করে। যেমন, **ছেলেটি** যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি অতিশয় ভদ্র। কিন্তু, **ছেলেটা** ভারি পাজী। **লোকটি** বড়ো শান্তশিষ্ট। কিন্তু, **লোকটাকে** দেখলে আমার গা জ্বলে যায়, তার **ঢঙ্‌টা** দেখ না কেমন! বালিকার গায়ের **রঙ্‌টি** চাঁপাফুলের মতো। অবশ্য '-টা' প্রত্যয় যে সব সময় মন্দের ভাব বা অবজ্ঞার ভাব দ্যোতিত করে তাহা নয়, ইহার প্রয়োগে স্নেহের ভাবও ব্যঞ্জিত হইতে পারে। যেমন, **ছেলেটার** জন্য আমার মন কেমন করে। '-টি' ও '-টা' কখনো কখনো সংখ্যা বা পরিমাণ-বাচক বিশেষণের সহিতও প্রযুক্ত হয়। যেমন, একাজ একজনের নয়, এর জন্যে

তিনটি অথবা **তিনটা** লোকের দরকার। কোনো কোনো স্থলে ইহাদের বিশেষণীয় বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণের ন্যায় প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন, তাকে **যতটা** বুদ্ধিমান মনে কর, **ততটা** বুদ্ধিমান সে নয়।

'টুকু' ও **'-টুকুন'** পরিমাণ বুঝাইবার জন্য বিশেষ্যের সহিত অথবা পরিমাণ-বাচক বিশেষণের সহিত প্রযুক্ত হয়। যেমন, **এইটুকু** তো পথ, হেঁটে যেতে কতক্ষণই-বা লাগবে? শীগগির **ত্বধটুকু** খেয়ে নাও। সে এত অসুস্থ, **এইটুকুন** জল পর্যন্ত গিলতে পারছে না। **ত্বধটুকুন** খেয়ে নাও তো বাবা, তা না হলে সারাটা দিন থাকবে কেমন করে? '-টুকু' এবং '-টুকুন'-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। তবে সাধারণভাবে বলা যায় '-টুকুন' কোমলতার বা স্নেহের ভাব ব্যঞ্জিত করে। যেমন, এইটুকুন ত্বধও যদি খেতে না চাও তবে অসুখ ভালো হবে কী করে?

সরু ও লম্বা জিনিসের নির্দেশের ক্ষেত্রে যে-জিনিস একটু **ছোট** তাহার সম্পর্কে 'গাছি', এবং যে-জিনিস একটু **বড়ো** তাহার সম্পর্কে **'গাছা'** প্রয়োগ করা হয়। যেমন, **লাঠিগাছা** কোথায় গেল? **ছড়িগাছি** কোথায় ফেললে? **একগাছি** চুল; **একগাছি** মালা; 'ফুলের **মালাগাছি** বিকাতে আসিয়াছি'। 'গাছি'র প্রয়োগে ভাবের কোমলতা বা মৃত্বতাও দ্যোতিত হয়; 'গাছা'র প্রয়োগের মধ্যে অনেক সময় বিরক্তির ব্যঞ্জনা থাকে। যেমন, তোমার যেমন কাণ্ড, **একগাছি** নয়, একেবারে **ছয়গাছা** চুড়ি কিনে বসেছ!

'খানি' ও 'খানা' অংশ বা খণ্ডবাচক প্রত্যয়। যেমন, 'কৃষ্ণপক্ষে **আধখানা চাঁদ** উঠলো অনেক রাতে।' বোমা পড়ে বাড়ীটি একবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, ইটের **একখানি** টুক্‌রোও পাওয়া গেল না। এ ত্বইটি দৃষ্টান্তে 'আধখানা' এবং 'একখানি' অংশকে বুঝাইতেছে। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে এ ত্বটি প্রত্যয় **সমগ্র** জিনিসটিকেই বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হয়। যেমন, **'একখানি** ছোট ক্ষেত আমি একেলা'। "শুনি রাজা কহে, 'বাপু, জান তো হে, করেছি **বাগানখানা'**।" এই প্রত্যয়গুলি ঠিক কী অর্থে প্রযুক্ত হয়, তাহা সুনির্দিষ্টভাবে বুঝাইয়া বলা সহজ নয়। কোনো কোনো স্থলে স্থূল পদার্থ নয়, অনুভবযোগ্য বস্তু বুঝাইতে 'খানি'র প্রয়োগ হয়। যেমন, 'সকলি করেছি দান, কেবল **সরমখানি** রেখেছি।' সুনীতিকুমার বলেন: টা, টি, টুকু, টুকুন, খানা, খানি প্রভৃতির দ্বারা বস্তুর আকার বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ইংগিত থাকে। টি, খানি, গাছি প্রভৃতির দ্বারা বস্তুর হ্রস্বভাব এবং ইহার প্রতি বক্তার আদর জ্ঞাপন করা হইয়া থাকে।

[৩৭] নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে যে-কোনো চারিটিকে পরীক্ষা করিয়া, তাহাদের ভিতরে ভাষাপ্রয়োগের বিশিষ্ট রীতিগত [idiom] কোনো ত্রুটি লক্ষ্য করিলে, তাহার সংশোধন কর:

(৵০) দেখে শুনে মনে করেছিলুম লোকটা খুবই ধার্মিক, এখন দেখছি একটি বাঁশবনের বাঘ।

(৶০) কত দেশ, কত তীর্থ ঘুরিলেন,—কিন্তু কই হৃদয়ের মানুষ তো পাইলাম না।

(৶৹) তুমি যে একেবারে ঘিয়ের পুতুল হে, এইটুকু রোদের তাপেই অস্থির!

(I০) দেখলেই বেশ বোঝা যায়, এ অতি অপক্ব হাতের কাজ।

(I৵০) প্রেমগঙ্গা আজ এমন করিয়া উদ্বেল হইল কেন?

(I৶০) এই সামান্য ব্যাপারটাকে তিনি অদ্ভুতভাবে বাড়িয়ে তুলেছেন, একেবারে যেন এইটুকু সরষেকে তাল করে তোলা।

(I৶৹) তাঁর সব ছেলেই কৃতী; একছেলে সাহিত্যিক, একছেলে বড়ো চাকুরে, একছেলে বৈজ্ঞানিক—আকাশে যেন সূর্যের মেলা বসে গেছে।

(৵০) দেখে শুনে মনে করেছিলুম···একটি **তুলসীবনের বাঘ**।

(৶০) কত দেশ, কত তীর্থ···কই **মনের মানুষ**···না।

(৶৹) তুমি যে···**ননীর পুতুল**...অস্থির।

(I০) দেখলেই বেশ বোঝা যায়, এ অতি **কাঁচা হাতের** কাজ।

(I৵০) **প্রেমযমুনা** আজ এমন করিয়া উদ্বেল হইল কেন?

(I৶০) এই সামান্য ব্যাপারটাকে...এইটুকু **তিলকে তাল ক'রে তোলা**।

(I৶৹) তাঁর সব ছেলই কৃতী···যেন **চাঁদের মেলা [হাট]** বসে গেছে।

[৩৮] নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে-কোনো তিন যুগলের অন্তর্গত প্রায়-সমোচ্চারিত শব্দদ্বয়ের অর্থের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও ঃ

শঙ্কর, সঙ্কর ; শক্ত, সক্ত ; শারদা, সারদা ; সর্গ, স্বর্গ ; চ্যুত, চূত ; আহুত, আহূত।

শঙ্কর—মহাদেব ; সঙ্কর—মিশ্রণ। শক্ত—সমর্থ ; সক্ত—অনুরক্ত। শারদা—দুর্গা ; সারদা—সরস্বতী। সর্গ—মহাকাব্যের অধ্যায় ; স্বর্গ—দেবলোক। চ্যুত—ভ্রষ্ট, চূত—আম্র। আহুত—যাহা [অগ্নিতে] আহুতি দেওয়া হইয়াছে ; উৎসর্গীকৃত ; আহূত—আমন্ত্রিত।

[৩৯] নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে যে-কোনো পাঁচটির বিপরীতার্থক শব্দ লেখ ও তাহা দিয়া বাক্য রচনা কর :

জঙ্গম, তন্বী, বন্য, আরোহণ, সুধা, সহযোগী, গৌরব।

জঙ্গম——**স্থাবর** ঃ প্রাচ্য সমাজ **স্থাবর**, পাশ্চাত্ত্য সমাজ জঙ্গম

তন্বী—**স্থূলা ; স্থূলাঙ্গী : স্থূলা** [স্থূলাঙ্গী] মহিলাটি দীর্ঘ ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।

বন্য– **গৃহপালিত ; সভ্য : গৃহপালিত** পশু বন্যপশু অপেক্ষা দুর্বল। আজকাল অনেক বন্যজাতি **সভ্য** হইতেছে।

আরোহণ—**অবরোহণ :** পর্বত হইতে **অবরোহণ** করা অতিশয় ক্লেশকর।

সুধা—**বিষ :** মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি নিজেদের অজ্ঞাতসারে প্রত্যহ **বিষ** পান করে।

সহযোগী—**প্রতিযোগী :** সেই পরীক্ষায় রাম আমার **প্রতিযোগী** ছিল।

গৌরব—**লাঘব ; অগৌরব :** দুঃখীর দুঃখভার যিনি **লাঘব** করেন তিনি মহানুভব। স্বহস্তে হলকর্ষণে কোনো **অগৌরব** নাই।

[**দ্রষ্টব্য :** 'অস্থাবর', 'অগৌরব' প্রভৃতি নঞ্‌ তৎপুরুষ-সমাসনিষ্পন্ন পদগুলি বিপরীতার্থক শব্দ হইলেও পরীক্ষায় এই প্রকার বিপরীতার্থক শব্দ না লেখাই বাঞ্ছনীয়।]

[৪০] দেখা, শোনা, পড়া, বহা, ফলা, চলা, দেওয়া—ইহাদের যে-কোনো পাঁচটি হইতে প্রযোজক ধাতু নিষ্পন্ন কর, এবং তাহা দিয়া এক-একটি বাক্য রচনা কর।

দেখা—**দেখান :** লোকটি ছবি **দেখায়**।

শোনা—**শোনান :** তিনি প্রত্যহ ভাগবত পাঠ করিয়া **শোনান**।

পড়া—**পড়ান :** রামবাবু আমাদের ইতিহাস **পড়ান**।

বহা—**বহান :** লোকটা একেবারে রক্তগঙ্গা **বহাইয়া** দিল।

ফলা—**ফলান :** ভালো চাষী ক্ষেতে প্রচুর ফসল **ফলায়**।

চলা—**চলান ; চালান :** মা খোকাকে হাতে ধরিয়া **চালাইতেছেন**। মোটরচালক দ্রুতবেগে মোটর **চালাইতেছে**।

দেওয়া—**দেওয়ান :** মা খোকার হাত দিয়া অসহায় ভিক্ষুকটিকে ভিক্ষা **দেওয়াইতেছেন**।

[৪১] থানাপুলিস, দুধেভাতে, ঘরপালানো, বাটাভরা, ঘরপিছু, অতিমানব, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভুক্তাবশেষ—ইহাদের মধ্য হইতে যে-কোনো পাঁচটি সমস্তপদের ব্যাসবাক্য বল এবং উহাদের লইয়া বাক্য রচনা কর।

থানাপুলিশ—থানা ও পুলিশ : পাড়াপড়শীর সঙ্গে মারামারি করে এ বয়সে **থানাপুলিশ** করতে পারব না।

দুধেভাতে—দুধে ও ভাতে : 'আমার সন্তান যেন থাকে **দুধেভাতে**।'

ঘরপালানো—ঘর থেকে পালানো : **ঘরপালানো** ছেলেকে ঘরমুখো করা সোজা নয়।

বাটাভরা—বাটায় ভরা : '**বাটাভরা** পান দেব, গাল পূরে খেও।'

ঘরপিছু—ঘরে ঘরে : এবার পূজায় **ঘরপিছু** পাঁচ টাকা করে চাঁদা পড়েছে।

অতিমানব—মানবকে অতিক্রান্ত : এই ভারতে কত মহামানব, কত **অতিমানব**, কত দেবমানব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

ভ্রাতুষ্পুত্র—ভ্রাতুঃ পুত্রঃ : **ভ্রাতুষ্পুত্রকে** তিনি নিজ সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিতেছেন।

ভুক্তাবশেষ—ভুক্ত হইতে অবশেষ : দরিদ্রগণ কি চিরকালই ধনীর **ভুক্তাবশেষ** গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিবে?

[৪২] সাক্ষর, স্বাক্ষর ; সার্থ, স্বার্থ ; সন্ত, সদ্ম ; সম্প্রতি, সম্প্রীতি ; বিষ, বিস ; অবদান, অবধান ; অবিরাম, অভিরাম—ইহাদের যে-কোনো পাঁচটি শব্দযুগ্মের পার্থক্য দেখাইয়া বাক্য রচনা কর।

সাক্ষর—অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন : ভারতবর্ষে শতকরা দশজন মাত্র **সাক্ষর**, বাকি সকলেই নিরক্ষর।

স্বাক্ষর—সহি ; দস্তখত : দলিলে তাহার নাম-**স্বাক্ষর** হয় নাই।

সার্থ—সমূহ : প্রয়োজন হইলে কবি**সার্থ** দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

স্বার্থ—আত্মপ্রয়োজন : আজকাল বিনা**স্বার্থে** কেহ কাহারো উপকার করে না।

সন্ত—তখনি : অধর্মের ফল **সন্তই** ফলে।

সদ্ম—গৃহ : নবনির্মিত রাজ**সদ্মে** তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

সম্প্রতি—অধুনা : **সম্প্রতি** রাজা স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন।

সম্প্রীতি—সম্যক্ প্রীতি বা প্রণয় : তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিশেষ **সম্প্রীতি** বিদ্যমান।

বিষ—গরল : 'কী যাতনা **বিষে** বুঝিবে সে কিসে?

বিস—মৃণাল : শকুন্তলার হস্ত হইতে **বিস**-বলয় স্খলিত হইল।

অবদান—সৎকর্ম : মহারাজ, ইন্দ্র আপনার **অবদান**-পরম্পরায় বিস্মিত হইয়াছেন।

অবধান—মনোযোগ : রাজন্, এই দীনের বাক্য **অবধান** করুন।

অবিরাম—অবিশ্রান্ত : 'নৃত্য ও গীত চলে **অবিরাম**'।

অভিরাম—সুন্দর ; মনোহর : 'নয়নের অভিরাম বালকের রূপ'।

[৪৩] নিম্নের যে-কোনো পাঁচটি শব্দ কী করিয়া গঠিত হইল তাহা বল : ফেনিল, মহত্ত্ব, বাড়ন্ত, রোরুদ্যমান, বর্তমান, সর্বথা, পাশ্চাত্ত্য ও বৈমাত্রেয়।

ফেনিল—(ফেন আছে যাহার) ফেন + ইল্ (ইলচ্)।

মহত্ত্ব—(মহতের ভাব) মহৎ + ত্ব।

বাড়ন্ত—(বাড়িতেছে যাহা) বাড়্ + অন্ত।

রোরুদ্যমান—(অত্যন্ত বা পুনঃপুনঃ রোদন করিতেছে) রুদ্ + যঙ্ + শানচ্ (শান, মান)।

বর্তমান—(যাহা আছে) বৃৎ + শানচ (শান, মান), অথবা, বর্ত + মান।

সর্বথা—(সর্ব প্রকারে) সর্ব + থা (থাল্)

পাশ্চাত্ত্য—(পশ্চাৎ ভব বা জাত) পশ্চাৎ + ত্যক্।

বৈমাত্রেয়—(বিমাতার পুত্র) বিমাতৃ + ঢক্ (ঢেয়, এয়)।

[৪৪] কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের পার্থক্য কী? তিনটি কৃৎ প্রত্যয়ের নাম কর ও কৃদন্ত শব্দ প্রয়োগ করিয়া বাক্য রচনা কর।

ধাতুর উত্তর যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাহার নাম **কৃৎ**, এবং শব্দের উত্তর যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাহার নাম **তদ্ধিত**।

তিনটি (সংস্কৃত কৃৎ) প্রত্যয় : ক্ত, অনট্, ঘঞ্।

গম্ + ক্ত = গত। 'একে কৃষ্ণপক্ষ নিশি প্রহরেক **গত**'।

দৃশ্ + অনট্ = দর্শন। আপনার **দর্শন**লাভে ধন্য হইলাম।

পঠ্ + ঘঞ্ = পাঠ। বালকটির **পাঠে** অনুরাগদর্শনে প্রীত হইলাম।

অথবা,

তিনটি (বাংলা) কৃৎ প্রত্যয় : অন্ত, অন, আই।

চল্ + অন্ত = চলন্ত। **চলন্ত** ট্রামগাড়ী হইতে কদাপি নামিবার চেষ্টা করিও না।

নাচ্ + অন = নাচন। 'ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, খোকার **নাচন** দেখে যা।'

লড়্ + আই = লড়াই। এবার জোর **লড়াই** বেধেছে।

[৪৫] নিম্নের যে-কোনো পাঁচটি শব্দে কী সমাস হইয়াছে তাহা লেখ এবং শব্দগুলি দিয়া এক-একটি বাক্য রচনা কর :

জারিজুরি, ভাগবাঁটোয়ারা, যুদ্ধোত্তর, কোপবহ্নি, কানাকানি, জনগণ-মন-অধিনায়ক, শোকাকুল, স্বর্ণাক্ষর।

জারিজুরি—জারি ও জুরি (বিকার শব্দের সহিত দ্বন্দ্ব সমাস)। আমার কাছে তোমার কোনো **জারিজুরি** খাটবে না।

ভাগবাঁটোয়ারা—ভাগ ও বাঁটোয়ারা (সমার্থক দ্বন্দ্ব)। আমাদের বিষয়সম্পত্তির **ভাগবাঁটোয়ারা** এখনও হয় নাই।

যুদ্ধোত্তর—যুদ্ধ হইতে উত্তর (পঞ্চমীতৎপুরুষ)। **যুদ্ধোত্তর** পৃথিবীতে অন্ন-সমস্যাই প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কোপবহ্নি—কোপরূপ বহ্নি (রূপক কর্মধারয়)। দ্রৌপদীর অপমানে ভীমের **কোপবহ্নি** প্রজ্বলিত হইল।

কানাকানি—কানে কানে যে কথা (ব্যতিহার বহুব্রীহি)। পরীক্ষাগৃহে বসিয়াও ছেলেরা **কানাকানি** করিতেছে।

জনগণ-মন-অধিনায়ক—জনের গণ = জনগণ (৬ষ্ঠীতৎ), জনগণের মন = জনগণমন (৬ষ্ঠীতৎ), তাহার অধিনায়ক (৬ষ্ঠীতৎ) = জনগণ-মন-অধিনায়ক। '**জনগণ-মন-অধিনায়ক**, জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা।'

শোকাকুল—শোকের দ্বারা আকুল (তৃতীয়া তৎপুরুষ)। **শোকাকুল** পিতা করুণ স্বরে বিলাপ করিতেছেন।

স্বর্ণাক্ষর—স্বর্ণময় অক্ষর (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁহার নাম **স্বর্ণাক্ষরে** লিখিত থাকিবে।

[৪৬] চৈনিক, সার্বজনীন, শ্রীমন্ত, বিবিয়ানা, এমনতর, চালবাজী, নকলনবিশ, রোমশ—ইহাদের মধ্য হইতে যে-কোনো পাঁচটি শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কর।

চৈনিক—(চীন সম্বন্ধীয়) চীন + ষ্ণিক।
সার্বজনীন—(সর্বজনে সাধু) সর্বজন + ঘঞ্ (ঈন)।
শ্রীমন্ত—(শ্রী আছে যার) শ্রী + মন্ত।
বিবিয়ানা—(বিবির অভ্যাস বা শীল) বিবি + আনা।
এমনতর—(প্রকার অর্থে) এমন+তর।
চালবাজী—(প্রসারে, বা 'শীল' অর্থে) চাল + বাজী।
নকলনবিশ—('লেখক' অর্থে) নকল + নবিশ।
রোমশ—(অস্ত্যর্থে) রোম + শ

[১] নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলিকে একটি বাক্যে পরিণত কর :

[ক] "সেই রজনী শুভ্রজ্যোৎস্নাপ্লাবিত ছিল। উহা রজনীগন্ধা, চম্পক, পারুল এবং কুন্দকুসুমে ভূষিত ছিল। উহা বহুসুহৃৎসমাগমে মুখরিত ছিল। সেই রজনী আমাদের স্মৃতিপথে চিরদিন বিরাজিত থাকার যোগ্য।"

সেই শুভ্রজ্যোৎস্নাপ্লাবিত, কুন্দ-চম্পক-পারুল-রজনীগন্ধা-কুসুমভূষিত, সুহৃৎ-সমাগমমুখরিত রজনী আমাদের চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

[খ] "সে ছেলেটি বেশী কথা বলে না। দিবারাত্র অপর ছেলেরা তাহাকে বিরক্ত করিত। এজন্য আমার বড়ো কষ্ট হইত।"

অপর ছেলেরা দিবারাত্র সেই মিতভাষী ছেলেটিকে বিরক্ত করিত বলিয়া আমার বড়ো কষ্ট হইত।

[২] নিম্নোদ্ধৃত অংশটিকে শুদ্ধ করিয়া লেখ :

[ক] "সে ক্রমাগত লিখিয়া যাইতেছে, পত্রে পত্রে শত শত বর্ণ শুদ্ধি ঘটিতেছে ; তথাপিও সে এত অসাবধান যে, তৎপ্রতি তাহার দৃষ্টি নাই। তাহার মাতা নিতান্ত দুরাবস্থা ও অনাটনের মধ্যে পুত্রদের ব্যয়নির্বাহ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দুরাদৃষ্টবশত এতগুলি পুত্রদের মধ্যে একটিও মানুষ হইল না। এই অবস্থায় তাঁহার সমস্ত আশাভরসা আকাশকুসুমের মতো নিবিয়া গেল।"

সে ক্রমাগত লিখিয়া যাইতেছে, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় [ছত্রে ছত্রে লিখিলেও চলিতে পারে] শত বর্ণাশুদ্ধি ঘটিতেছে ; তথাপি সে এত অসাবধান যে, তাহার প্রতি তাহার দৃষ্টি নাই। তাহাদের মাতা নিতান্ত দুরবস্থা ও অনটনের মধ্যে পুত্রদের প্রতিপালনের ব্যয়নির্বাহ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দুরদৃষ্টবশত এতগুলি পুত্রের মধ্যে একটিও মানুষ হইল না। এই অবস্থায় তাঁহার সমস্ত আশাভরসা আকাশকুসুমের মতো [শূন্যে] বিলীন হইয়া গেল।

[খ] "একদা অমাবস্যারাত্রে বহু দস্যুগণ ভাগীরথীতীরে যাইয়া এক ধনী ব্যক্তির নৌকা প্রদর্শন করিল। তাহারা ছোট একখানি ডিঙিতে চড়িয়া ধীর কুঞ্জরের দ্রুত গতিতে সেই নৌকাটার উপরে আসিয়া পড়িল। নৌকাস্বামী সশংকিত হইয়া সানুনয়পূর্বক বলিলেন : 'তোমরা যদি কিছু অর্থ লইয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও, তবে আমি দিতে প্রস্তুত আছি।' দস্যু পরিস্কার ভাবে বলিল : 'আমরা ছাড়িব না, নৌকা লুণ্ঠন করিব'।"

এক অমাবস্যারাত্রে দস্যুগণ [অথবা বহু দস্যু] ভাগীরথীতীরে যাইয়া এক ধনীব্যক্তির নৌকা দর্শন করিল [অথবা দেখিতে পাইল]। তাহারা ছোট একখানা ডিঙিতে চড়িয়া বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুতগতিতে সেই নৌকাটির উপর গিয়া পড়িল। নৌকাস্বামী শঙ্কিত [অথবা সশঙ্ক] হইয়া অনুনয়পূর্বক [অথবা সানুনয়ে] বলিলেন : 'তোমরা যদি কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও, তবে আমি দিতে প্রস্তুত আছি।' দস্যু স্পষ্টভাবে বলিল : 'আমরা ছাড়িব না, নৌকা লুঠ [লুণ্ঠন] করিব।'

[গ] "উর্দ্ধমুখে পথ চলিলে পতন অবশ্যম্ভাবি। সাতিশয় ব্যয় করিয়াই উৎসবাদি করা এখনকার অর্থশংকটের দিনে যুক্তিযুক্ত নহে। বরঞ্চ সৌজন্যতার দ্বারা লোকের সহিত সৌহার্দ্রস্থাপন করা ভাল।"

উর্দ্ধ [অথবা ঊর্ধ্ব]-মুখে [নেত্রে] পথ চলিলে পতন অবশ্যম্ভাবী। এখন এই অর্থসংকটের দিনে অতিশয় ব্যয় করিয়া উৎসবাদি [অনুষ্ঠান] করা যুক্তিযুক্ত নহে। বরং সৌজন্যের [সুজনতার] দ্বারা লোকের সহিত সৌহার্দস্থাপন করা ভাল।

[ঘ] "কর না কেন তুমি যত পরিশ্রম, থাকুক না কেন তোমার যত বিদ্যাবুদ্ধি, পারিবে না তুমি পরীক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে কিছুতেই সুরেশের সঙ্গে।"

তুমি যতই পরিশ্রম কর-না কেন, আর তোমার যতই বিদ্যাবুদ্ধি থাকুক-না কেন, তুমি পরীক্ষায় কিছুতেই সুরেশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা [-য় জয়লাভ] করিতে পারিবে না।

[ঙ] "আমি দারুণ মনকষ্টে ন্যায়শিরমনির কাছে যাইয়া আমার সদ্যজাত মেয়েটির মৃত্যুসংবাদ জানাইয়া অশৌচের ব্যবস্থা চাহিলাম।"

আমি নিদারুণ মনঃকষ্টে ন্যায়শিরোমণির নিকট যাইয়া আমার সদ্যোমৃতা ['সদ্যোজাতা' কথাটিও এখানে প্রয়োগ করা যায়] মেয়েটির মৃত্যুসংবাদ জানাইয়া অশৌচের ব্যবস্থা জানিতে চাহিলাম।

[চ] "তাহার যখন বয়ঃক্রম পনের বৎসর তখন তাহার একটি ভাই জন্মে। সেই সদ্যজাত শিশুর বাঁচিবার আশা ছিল না, এজন্য তাহার মাতা অত্যন্ত মনকষ্টে থাকিতেন। তোমাদের ব্যবহার অত্যন্ত লজ্জাস্কর, আমি তোমার অনেক দোষ ক্ষমা করিয়াছি, কিন্তু এখন তাহার এত আতিশয্যতা হইয়াছে যে, আমি সহ্য করিতে পারি না। সংসারের শান্তিরক্ষা করিতে হইলে ঐক্যতারক্ষার দরকার। অত্র পত্র বাড়ীর ঠিকানায় পাঠাইলাম।"

যখন তাহার বয়ঃক্রম পনর বৎসর তখন তাহার একটি ভাই জন্মে। সেই সদ্যোজাত শিশুটির বাঁচিবার আশা ছিল না। সেজন্য তাহার মাতা মনঃকষ্টে থাকিতেন। তোমাদের ব্যবহার অত্যন্ত লজ্জাকর। আমি তোমার অনেক অপরাধ ক্ষমা করিয়াছি [দোষ উপেক্ষা করিয়াছি], কিন্তু এখন তাহার এত আতিশয্য হইয়াছে যে, আমি

আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। সংসারের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ঐক্য [একতা] থাকা দরকার। এই পত্র বাড়ীর ঠিকানায় পাঠাইলাম।

[ছ] "মেয়েটির বয়ক্রম ষোল। তাহার সদ্যজাত ভাইটিকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার উপরে ছিল। পিতামাতার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, সুতরাং তাহাকে সর্বদা মনোকষ্টে থাকিতে হইত। কিম্বদন্তী আছে, এক সময়ে তাহাদের অবস্থা খুবই ভালো ছিল। কোনো বিপদে পড়িয়া কন্যাটির পিতামহই সর্বস্বান্ত হন, তদবধি দারিদ্রের পীড়নে তাহারা অস্থিরতা হইয়া থাকিত। সে কুত্রাপিও বাড়ী ছাড়িয়া যাইত না। অন্য পরিবারের কোনো কথাবার্তায় সে থাকিত না।"

মেয়েটির বয়ঃক্রম ষোল বৎসর। তাহার সদ্যোজাত ভাইটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল তাহার উপর। পিতামাতার [মাতাপিতার] অবস্থা সচ্ছল ছিল না বলিয়া তাহাকে সর্বদা মনঃকষ্টে থাকিতে হইত। কিংবদন্তী আছে, এক সময়ে তাহাদের অবস্থা খুবই ভালো ছিল। কোনো বিপদে পড়িয়া মেয়েটির পিতামহের সর্বস্বান্ত হয় [পিতামহ সর্বস্বান্ত হন], তদবধি দারিদ্র্যের পীড়নে তাহারা অস্থির হইয়া থাকিত। সে কদাচ বাড়ী ছাড়িয়া যাইত না, [অথবা বাড়ী ছাড়িয়া কুত্রাপি কোথাও যাইত না]। অন্য পরিবারের কোনো কথাবার্তায় সে থাকিত না।

[জ] "পরস্পর যুদ্ধমান জাতির মধ্যে বিজিগীষা এত প্রবল যে, শান্তির সম্ভাবনা অতি অল্প। যাঁহার পৌরহিত্যে শান্তিসমিতির অনুষ্ঠান হইবে তিনি একজন অপক্ক-শ্বশ্রূধারী সাংবাদিক। তাঁহার মনবৃত্তি কাহারও অবিদিত নাই।"

পরস্পর যুধ্যমান জাতির মধ্যে বিজিগীষা এত প্রবল যে, শান্তির সম্ভাবনা অতি অল্প। যাঁহার পৌরোহিত্যে শান্তিসমিতির অধিবেশন হইবে তিনি একজন অপক্ক-শ্মশ্রুধারী সাংবাদিক। তাঁহার মনোবৃত্তি কাহারও অবিদিত নহে।

[ঝ] "মুমূর্ষুর শুশ্রূষা করাই পরম ধর্ম। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের পরিনীতা স্ত্রী। যাহারা পরান্নভোজী, তাহারা সকলের অধম। যাহার সঙ্গে তোমার সখ্যতা হইয়াছে তাহার সঙ্গে মিশিলে তুমি উচ্ছন্ন যাইবে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হইয়াছিল।"

মুমূর্ষুর [আর্তের বা পীড়িতের হইলে ভালো হয়] শুশ্রূষা করাই পরম ধর্ম। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের পরিণীতা স্ত্রী। যাহারা পরান্নভোজী তাহারা সকলের চেয়ে অধম। যাহার সঙ্গে তোমার সখ্য হইয়াছে, তাহার সঙ্গে মিশিলে তুমি উৎসন্নে যাইবে [অথবা উৎসন্ন হইয়া যাইবে]। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হইয়াছিল [অথবা চাঁদের উদয় হইয়াছিল]।

[ঞ] "ব্যাধিগ্রস্থ লোকের সংস্পর্শ বর্জন করিবে। তাহার নির্দোষ প্রমাণ করিতে সকলেই উদগ্রিব। কৌতুহলের বশবর্তী হইয়া তাহার বুদ্ধিভ্রংস ঘটিল। প্রজ্জলিত হুতাশনে কে হস্তার্পণ করিবে?

ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সংস্পর্শ বর্জন করিবে। তাহাকে নির্দোষ প্রমাণ করিতে [অথবা তাহার নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে] সকলেই উদগ্রীব। কৌতূহলের বশবর্তী হওয়াতে তাহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিল। প্রজ্বলিত হুতাশনে কে হস্তার্পণ করিবে ?

[৩] এমন দুইটি সংস্কৃত শব্দের উদাহরণ দাও, বাংলাভাষায় যাহাদের অর্থবিচ্যুতি ঘটিয়াছে।

[ক] প্রীতি=প্রেম>পিরীতি [অবৈধ প্রণয়]। [খ] সন্দেশ=বার্তা> সন্দেশ [মিষ্টান্ন]। [গ] তত্ত্ব=খোঁজখবর>তত্ত্ব [উপহারের সামগ্রী, যাহা সামাজিকতার ক্ষেত্রে অবশ্য দেয়]। [ঙ] ধনুর্ধর=বড়ো যোদ্ধা>ধনুর্ধর [অসৎ কর্মে নিপুণ]।

[৪] নিম্নোদ্ধৃত অংশটির শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

অন্যকার—যিনি সভাপতির—গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার—না জানে, এমন—বিরল। দেশের জন্য তিনি অম্লান বদনে—বরণ করিয়াছেন। অন্যায়ের—যুদ্ধঘোষণা করিয়া তিনি যে পরিমাণ লাভ করিয়াছেন তাহা ইতিহাসের—স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে।

অধিবেশনে কিংবা সভায় ; আসন ; নাম ; লোক ; দুঃখ ; বিরুদ্ধে ; খ্যাতি বা সাফল্য ; পৃষ্ঠায়।

[৫] নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে এক-এক কথায় প্রকাশ কর :

[ক] যিনি পরিণাম দেখিয়া কার্য করেন না। [খ] যিনি পরের মুখ চাহিয়া কাজ করেন। [গ] যে অন্যকে পোষণ করে।

অপরিণামদর্শী ; পরমুখাপেক্ষী ; অন্যভৃৎ বা পরভৃৎ।

[৬] নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রয়োগে অর্থোপযোগী এক-একটি বাক্য গঠন কর : ক্ষণভঙ্গুর ; অপৌরুষেয় ; সর্বভুক ; গায়েপড়া ; মনগড়া।

ক্ষণভঙ্গুর : পার্থিব জগতে সুখসম্পদ কাচের মতোই ক্ষণভঙ্গুর। **অপৌরুষেয় :** আস্তিক্যবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, বেদগ্রন্থ ঈশ্বররচিত অতএব অপৌরুষেয়। **সর্বভুক :** সর্বগ্রাসী বলিয়া অগ্নিকে বলা হয় সর্বভুক। **গায়ে-পড়া :** সে যদি তোমার সঙ্গে কথা বলিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তবে তুমি গায়ে পড়িয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে গেলে কেন ? **মনগড়া :** দেখ, কতকগুলি মনগড়া কথা বলিয়া আমাকে বিভ্রান্ত করিও না ; ঠিক যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই আমাকে বল।

[৭] 'লাগা' ক্রিয়াটিকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করিয়া পাঁচটি বাক্য রচনা কর।

[ক] তাহার কথাটি আমার বেশ ভালো লাগিয়াছে [পছন্দ হওয়া]। [খ] তুমি এমন করিয়া অনবরত তাহার পিছু লাগিতেছ কেন? [বিপক্ষতাচরণ করা] [গ] ঘরটিতে আগুন লাগিয়াছে [সংযুক্ত হওয়া বা স্পর্শ করা]। [ঘ] ঘটনাটিকে যেভাবে সে বিবৃত করিল তাহাতে সকলের তাক লাগিয়া গেল [আশ্চর্যান্বিত হওয়া]। [ঙ] দুই-দশ টাকা গরীবকে দান করিলে আপনার মতো বিত্তশালী লোকের গায়েই লাগিবে না [অসুবিধা না হওয়া অর্থে]।

[৮] প্র, পরি, বি এবং অভি উপসর্গযোগে 'নী' ধাতুর অর্থ নির্ণয় কর।

প্র+নী=প্রণয়, প্রীতি : তাহার সঙ্গে আমার বিশেষ প্রণয়ভাব নাই। পরি+নী=বিবাহ : রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতার পরিণয় হইয়াছিল। বি+নী=নম্রতা : যথার্থ বিদ্যা মানুষকে বিনয় দান করে। অভি+নী=রূপকানুকরণ : কলেজের ছাত্রবৃন্দ আজ 'গৈরিক পতাকা' অভিনয় করিবে।

[৯] ব্যাসবাক্যসহ নিম্নলিখিত পদগুলির সমাস নির্ণয় কর :

চৌমাথা; দুর্ভিক্ষ; বাগদত্তা; তেলেবেগুনে; বিয়েপাগলা; মনগড়া; অহোরাত্র; যুদ্ধোত্তর; ডাকমাশুল; শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনী।

চৌমাথা : চারিটি [রাস্তার] মাথার সমাহার [সমাহার দ্বিগু]। **দুর্ভিক্ষ** : ভিক্ষার অভাব [অব্যয়ীভাব]। **বাগদত্তা** : বাক্যের দ্বারা দত্তা [তৃতীয়া তৎপুরুষ]; অথবা বাক্য দত্ত হইয়াছে যে-নারীর জন্য তিনি [বহুব্রীহি]। **তেলেবেগুনে** : তেলে এবং বেগুনে [অলুক]। **বিয়েপাগলা** : বিয়ের জন্য পাগলা [চতুর্থী তৎপুরুষ]। **মনগড়া** : মনে গড়া [সপ্তমী তৎপুরুষ], মনের দ্বারা গড়া [তৃতীয়া তৎপুরুষ], মনের মধ্যে গড়া [মধ্যপদলোপী কর্মধারয়], মন থেকে গড়া [পঞ্চমী তৎপুরুষ]। **অহোরাত্র** : অহঃ এবং রাত্রি [দ্বন্দ্ব]। **যুদ্ধোত্তর** : যুদ্ধের উত্তর =পর [ষষ্ঠী তৎপুরুষ]; যুদ্ধের পর [অস্বপদবিগ্রহ নিত্যসমাস]। **ডাকমাশুল** : ডাকের [জন্য দেয়] মাশুল [ষষ্ঠী তৎপুরুষ]; ডাকের জন্য মাশুল [চতুর্থী তৎপুরুষ]। **শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনী** : শুভ্র এমন যে জ্যোৎস্না [কর্মধারয়], শুভ্র জ্যোৎস্না দ্বারা পুলকিত [তৃতীয়া তৎপুরুষ], শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত এমন যামিনী [কর্মধারয়]।

[১০] নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরিত কর :

বিদ্বান্, আয়ুষ্মান্, অশ্ব, সুকণ্ঠ।

বিদ্বান্—**বিদুষী**। আয়ুষ্মান—**আয়ুষ্মতী**। অশ্ব—**অশ্বা**। সুকণ্ঠ—**সুকণ্ঠী, সুকণ্ঠা** [বাংলাভাষায় তেমন চলিত নয়]।

[১১] নিম্নলিখিত প্রয়োগসমূহের মধ্যে যে-কোনো পাঁচটির উদাহরণ দাও ঃ

[ক] উপসর্গপ্রয়োগে অর্থান্তরসংঘটন [খ] অতীত বুঝাইতে বর্তমানের ক্রিয়া প্রয়োগ [গ] 'তে' প্রত্যয়যোগে কর্তৃকারক নির্দেশ [ঘ] কর্মকর্তৃবাচ্যের প্রয়োগ [ঙ] অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্রিয়াবিশেষণরূপে প্রয়োগ [চ] বিশেষণের দ্বিত্বের দ্বারা বিশেষ্যের বহুবচননির্দেশ [ছ] তীব্র আকাঙ্ক্ষা বুঝাইতে বিশেষ্যের দ্বিত্ব।

[ক] হৃ=হরণ করা>হার [হরণকার্য, গ্রীবালংকার বিশেষ] ১। প্র+হার=প্রহার [আঘাত করা] ২। আ+হার=আহার [ভোজন করা] ৩। বি+হার=বিহার [বিচরণ করা, আনন্দ উপভোগ করা] ৪। সম+হার=সংহার [নিধন করা] ৫। পরি+হার=পরিহার [বর্জন করা] [খ] হুমায়ুন বসিয়া আছেন,এমন সময়ে একজন দরবেশ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। [গ] গরুতে ঘাস খায়। [ঘ] মধু খাইতে মিষ্ট। [ঙ] পথটায় আজ তুমি গান গাহিতে গাহিতে চল। [চ] এইবার কলিকাতা হইতে ফিরিবার সময় তোমার জন্য ভালো ভালো বই আনিব। [ছ] টাকা-টাকা করিয়াই লোকটা পাগল হইয়া গেল।

[১২] নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলির প্রয়োগে বাক্য রচনা কর ঃ

সোনায়-সোহাগা ; সুদূরপরাহত ; বিন্দুবিসর্গ ; কড়ায়-গণ্ডায় ; সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে ; বজ্র আঁটুনী ফস্কা গেরো ; এক মাঘে শীত যায় না ; আক্কেল-সেলামী ; আদায়-কাঁচকলায় ; মুখরক্ষা ; হাতে মাথা কাটা ; মুখ চূণ ; মুখে কালি ; চোখের বালি ; ঢলাঢলি ; চোখ ফোটা ; একচোখো ; লোকপরম্পরা।

সোনায়-সোহাগা ঃ মেয়েটি দেখিতে যেমন অপরূপ সুন্দরী, গুণেও তেমনি অতুলনীয়া—একেবারে সোনায়-সোহাগা। **সুদূরপরাহত ঃ** বর্তমানে সরকারী অর্থ-কৃচ্ছ্রতার দিনে ভারতসরকার যে ব্যয়সাধ্য কোনো শিক্ষাপরিকল্পনায় হাত দিবেন, সে আশা সুদূরপরাহত। **বিন্দুবিসর্গ ঃ** এত যে কাণ্ড ঘটিয়া গেল, তার বিন্দুবিসর্গও আমি জানি না। **কড়ায়-গণ্ডায় ঃ** মহাজনের প্রাপ্য কড়ায়-গণ্ডায় চুকাইয়া দেওয়াতে সে এখন সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত হইয়াছে। **সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে ঃ** দেখ, এমনভাবে কাজটি করতে হবে, যাতে আমাদেরও কার্যসিদ্ধি হয়, আর সে-ও যেন জব্দ হয়—অর্থাৎ, সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। **বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো ঃ** তোমার সব কাজেতেই বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো—দারুণ তোড়জোড় করে নামো, কিন্তু গোড়ায় এমন গলদ রাখো যে, কাজটাই শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায়। **এক মাঘে শীত যায় না ঃ** আজ আমায় তুমি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছ, কিন্তু মনে রেখো, এক মাঘে শীত যায় না—একদিন আমার কাছে তোমাকে আসতেই হবে। **আক্কেল-সেলামী ঃ**

কোনো কাজই হল না, মাঝখান থেকে শুধু পাঁচ-পাঁচটি টাকা আক্কেল-সেলামী গেল। **আদায়-কাঁচকলায়** : অমরের সঙ্গে বিনয়ের সম্পর্ক একেবারে আদায়-কাঁচকলায়—কেউ কারো মুখ পর্যন্ত দেখে না। **মুখরক্ষা** : গচ্ছিত হারটি হারাইয়া গিয়াছিল, উহা খুঁজিয়া পাইয়া যদুবাবু বলিলেন, 'ভগবান এবার মুখ-রক্ষা করেছেন ; নইলে আমাকে খামোকা চোর বন্‌তে হত। **হাতে মাথা কাটা** : পানুবাবুর মতো অহংকারী লোক যদি প্রধানমন্ত্রীর পদ পেতেন, তাহলে তো হাতে মাথা কাটতেন। **মুখ চুণ** : কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না শুনে সেই গরীব ছেলেটি মুখ চুণ করে সেখান থেকে চলে গেল। **মুখে কালি** : এরূপ দুষ্কর্ম করিয়া সে যে আত্মীয়স্বজন সকলের মুখে এমনভাবে কালি দেবে তাহা কেহ ভাবিতে পারে নাই। **চোখের বালি** : সপত্নী-পুত্রটি হইল গৃহিণীর চোখের বালি, তিনি তাহাকে দুচক্ষে দেখিতে পারেন না। **ঢলাঢলি** : নতুন জামাইটি মাতাল-অবস্থায় শ্বশুরবাড়ী আসিয়া যে ঢলাঢলি কাণ্ডটা করিল, সেজন্য তাহার গ্রামে মুখ দেখানো ভার হইয়া পড়িয়াছে। **চোখ ফোটা** : এতদিনে মাতুলের চোখ ফুটিল ; স্পষ্টই তিনি বুঝিলেন যে, যম-জামাই-ভাগনা, এ তিন নয় আপনা। **একচোখো** : কল্যাণীর শাশুড়ী বড়ো একচোখো ; কল্যাণীর জায়ের কোনো দোষ তিনি দেখেন না, আর বেচারা কল্যাণীর বেলায় পান থেকে চুণ খসলেই সর্বনাশ। **লোকপরম্পরা** : লোকপরম্পরায় শুনিলাম যে, তুমি নাকি চাকরিটা ছাড়িয়া দিয়াছ—কথাটা কি সত্যি ?

[১৩] নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলির মধ্যে পাঁচটির অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া অর্থোপযোগী এক-একটি বাক্য গঠন কর :

কেঁচে গণ্ডুষ করা : অর্থাৎ একেবারে গোড়া হইতে পুনরায় আরম্ভ করা। একই কার্যের অসাফল্যজনিত পুনরাবৃত্তি করাই হইল এই বাক্যাংশের অর্থ। উদাহরণ : এতদিন ধরে যে কাজটা শিখলাম, দেখলাম তাতে কোনো ফল হয়নি ; নতুন কার-খানায় ঢুকে আবার কেঁচে গণ্ডুষ করতে হল। **খুড়িয়ে বড়ো হওয়া** : হীন অবস্থার লোক উচ্চাবস্থ লোকের সমকক্ষতা লাভ করিবার প্রচেষ্টা পাইলে এই বাক্যাংশটি ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ : নরেন জমিদারের ছেলে, নবাবি করা তাহাকে সাজে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খুড়িয়ে বড়ো হতে যাওয়া তোমার মতো কেরাণীর ছেলের পক্ষে একেবারেই সাজে না। **নিজের কোলে ঝোল টানা** : বিবেকহীন স্বার্থপরতা বুঝাইতে এই বাক্যাংশটি ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ : সিরাজদ্দৌলার পাত্রমিত্রসভাসদ্ সকলেই তখন নিজের কোলে ঝোল টানিতে ব্যস্ত ছিল, দেশের বৃহত্তর কল্যাণের প্রতি কাহারও তখন দৃষ্টি ছিল না। **শিয়ালের যুক্তি** : ইহার অর্থ নিষ্ক্রিয় বা অসার পরামর্শ। উদাহরণ : তোমাদের তো রোজই শিয়ালের যুক্তি হচ্ছে—এই যুক্তিপরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলে সবকিছুই পণ্ড হয়ে যাবে। **বৌকে মেরে ঝিকে শেখানো** : কথাটি

কিন্তু আসলে 'ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো'। বিশেষ কোনো ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কাহাকেও কোনো বিদ্রূপ বা সমালোচনা করা অর্থেই বাক্যাংশটি প্রযুক্ত হয়। উদাহরণ : এটা যে তিনি ঝিকে মেরে বৌকে শেখালেন, তা আমি বুঝি—তিরস্কারটা তিনি মধুকে করেননি, মধুকে উপলক্ষ্য করে আমাকেই করলেন। **সাপ হয়ে কামড়ানো রোজা হয়ে ঝাড়া :** অত্যন্ত ধড়িবাজির সহিত শত্রুতাসাধন করা, এবং একই সঙ্গে মিত্রতার ভান করা। 'Cf. Hunting with the hounds and running with the hare'। উদাহরণ : উকিলের মুহুরিটি একটি সাংঘাতিক ধড়িবাজ লোক ; একদিকে তিনি সাপ হয়ে কামড়াবেন, অন্যদিকে আবার রোজা হয়ে ঝাড়বেন—মামলাটা বাধিয়ে দিয়ে এখন আবার আপোষে মেটাতে এসেছেন। **সাপের ছুঁচো গেলা :** কোনো কাজ ঠিকমতো সম্পন্ন করিতে না পারা, আবার ছেড়ে দিতেও অপারগ হওয়া। উদাহরণ : এ হয়েছে আমার সাপের ছুঁচো গেলা—না পারি ছাড়তে না পারি বেড়তে। **ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা :** বিপদের প্রতিকার না করিয়া কেবল মাত্র কোলাহল করা। উদাহরণ : সামান্য একটা সাপ দেখে তোমরা ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগিয়েছ দেখছি—সাপটিকে কেউ মারতেও পারনি, শুধুই চীৎকার করছো।

[১৪] উদাহরণসহ যে-কোনো দুইটির ব্যাখ্যা কর :

ব্যাজস্তুতি, উৎপ্রেক্ষা, শ্লেষ, রূপক।

ব্যাজস্তুতি : নিন্দাচ্ছলে স্তুতি কিংবা স্তুতিচ্ছলে যখন নিন্দা করা হয়, তাহাকেই বলে ব্যাজস্তুতি অলংকার। যেমন :

'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।'

'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের এই পঙ্‌ক্তিগুলি নিন্দাচ্ছলে স্তুতি। দেবী অন্নপূর্ণা ঈশ্বরী-পাটনীকে মহাদেবের পরিচয় দিতে যাইয়া বলিতেছেন, তাঁহার স্বামী বার্ধক্যের প্রান্তদেশে আসিয়া পৌছিয়াছেন, তিনি গাঁজা-ভাং-সিদ্ধি প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবনে অতিশয় পটু, কোনো গুণই তাঁহার নাই—এরূপ স্বামীর মরণ হইলেই ভালো। কিন্তু ইহার আসল অর্থ হইতেছে, অন্নপূর্ণার স্বামী শিব হইলেন দেবাদিদেব, যোগিরাজ বলিয়া তাঁহার পরিপূর্ণ যোগসিদ্ধি ঘটিয়াছে, তিনি সকল গুণের আধার, তাঁহার ললাটে একটি নেত্র রহিয়াছে—ইহাই মহাদেবের যথার্থ পরিচয়।

প্রশংসার ছলে নিন্দার চমৎকার নিদর্শন হইতেছে রাবণের এই কথাগুলি :

'কী সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ!' —মেঘনাদবধকাব্য

রামচন্দ্র সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করিয়াছেন, বন্ধনহীন সমুদ্র সেতুর শৃঙ্খলে আজ শৃঙ্খলিত হইয়াছে। এখানে সেতুকে 'সুন্দর মালা' বলাতে স্তুতি ব্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার ব্যঞ্জনায় রহিয়াছে মহাসমুদ্রের বন্ধনদশার প্রতি নিন্দা। 'প্রচেত' কথাটির অর্থ হইতেছে 'সমুদ্র'।

উৎপ্রেক্ষা : উপমেয়কে উপমান বলিয়া যদি সংশয় জন্মে [অত্যধিক সাদৃশ্য-বশত] তবে সেখানে উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়। উৎপ্রেক্ষা জ্ঞাপন করিতে সাধারণত 'যেন', 'বুঝি' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেখানে এই দুইটি শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে তাহাকে বলা হয় 'বাচ্যোৎপ্রেক্ষা', এবং যেখানে এই জাতীয় শব্দের কোনো উল্লেখ থাকে না, অথচ এই ভাবের প্রতীতি জন্মে, তাহাকে বলা হয় 'প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা'। উদাহরণ :

'ধরণী এগিয়ে এসে দেয় উপহার,
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার।'

এখানে ধরণীকে [উপমেয়] কবির দুলালী মেয়ে [উপমান] বলিয়াই মনে হইতেছে।

শ্লেষ : যে স্থলে একটিমাত্র শব্দ দুই বা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেখানে শ্লেষালংকার হইয়া থাকে। উদাহরণ :

'কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত চরাচর,
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর'।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত এই ছত্রগুলির মধ্য দিয়া দুইটি উদ্দেশ্য প্রকাশ করিতেছেন। প্রথম, ঈশ্বর অর্থে ভগবান। ভগবান বিশ্বব্যাপী, তাঁহার দীপ্তিতেই তো সূর্যচন্দ্র প্রভৃতি সকল বস্তু প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এখন খুব প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। 'প্রভাকর' পত্রিকায় তাঁহার প্রতিভার দীপ্তি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইতেছে। প্রভাকর=এক অর্থে সূর্য, অন্যঅর্থে কবি ঈশ্বর গুপ্ত-সম্পাদিত পত্রিকার নাম।

রূপক : উপমেয় এবং উপমানকে যেখানে অভিন্ন কল্পনা করা হয়, সেখানে রূপক অলংকার হইয়া থাকে। [উপমেয়=যাহার তুলনা দেওয়া হয় ; উপমান=যাহার সহিত তুলনা করা হয়]। এই অলংকারে সাধারণত 'রূপ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো উহা লুপ্ত থাকে। উদাহরণ : 'যখন হৃদয়-আকাশ বিষম বিপত্তিরূপ মেঘ দ্বারা ঘোরতর আচ্ছন্ন হয়, তখন কেবল আশাবায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহাকে পরিষ্কৃত রাখে।'

[১৫] নিম্নলিখিত প্রয়োগসমূহের মধ্যে পাঁচটির উদাহরণ দাও :

[১] বিশেষ্য বা বিশেষণের দ্বিত্বসম্পাদন করিয়া উহার ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহার [২] পুরা বাক্য বা বাক্যাংশের পরিবর্তে সর্বনামের প্রয়োগ [৩] বিশেষ্যের

বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহার [৪] অব্যয়ের নিরপেক্ষ [বাক্যের অন্য অংশের উপর নির্ভরশীল নয়] প্রয়োগ [৫] ভবিষ্যৎ বুঝাইতে বর্তমানের ক্রিয়ারূপ প্রয়োগ [৬] অনুজ্ঞা বুঝাইতে ভবিষ্যতের প্রয়োগ [৭] বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত বিশেষণের বহুবচনগ্রহণ [৮] বিপরীতার্থক ভাব বুঝাইতে প্রশ্নাত্মক বাক্যের প্রয়োগ।

[১] বায়ু **মন্দ মন্দ** বহিতেছে। **কালে কালে** আরও কত দেখব। **দিনে দিনে** হোল কি ? [২] রামের সঙ্গে শ্যামের যে ব্যবহার **তাহা** আমি কোনোরূপে মানিয়া লইতে পারি না। যদু শ্যামের নিকট কাল একটা ঘটনা বিবৃত করিয়াছে, **উহা** কিন্তু আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। [৩] লজ্জায় তাহার মুখটা যেন **জবাফুল** হইয়া গেল [ক্রিয়াবিশেষণ]। গভীর রাত্রিতে ডাকাত একখানি **রাম**-দা দিয়া গৃহস্বামীকে হত্যা করিল [বিশেষণ]। [৪] **আহা**, তুমি এত রাগ করছ কেন ? তুমি **না** এই কথাটা তাকে বলেছিলে ? [৫] শ্যামল, তুমি আজকের গাড়ীতেই বাড়ী চলে যাও, আমি কাল **যাচ্ছি**। [৬] মাধব, তুমি এ কাজটা নিশ্চয় **করবে**। [৭] **ধনীর** কথা আর বলবেন না, **গরীবের** প্রতি তারা মোটেই সহানুভূতিশীল নয়। [৮] 'ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে ?'—অর্থাৎ ফোটে না।

[১৬] নিম্নলিখিত বাক্যসমূহের মধ্যে মোটা-হরফে-মুদ্রিত পাঁচটি পদের ব্যাকরণঘটিত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ ও আলোচনা কর :

আমার **অবর্তমানে** ছেলেদের কী হইবে ? হে পথিকবর ! জন্ম যদি তব বঙ্গে, **তিষ্ঠ** ক্ষণকাল। **কাঁদিয়া কাঁদিয়া** চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। [এখানে অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্বের অর্থ কী ?] এ চিত্রের ওষ্ঠাধরে **যদি** ভাষা থাকিত ! তীর্থস্থানে পাপ প্রায়শ্চিত্তেও **খণ্ডায়** না। **চাতকিনী কুতুকিনী** মেঘদরশনে। **তাহাকে** সন্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। [কারক নির্ণয় কর]। **প্রসাদে** যেন বঞ্চিত না হই। [কারক নির্ণয় কর]। গুরু **বলিয়া** কেহ আজকাল ভক্তি করে না।

অবর্তমানে : এখানে 'আমি বর্তমান না থাকিলে' এই অর্থ বুঝাইতে 'অবর্তমানে' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। এস্থলে অধিকরণ কারকটি বাক্যাংশরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সংস্কৃতে যেখানে 'ভাবে সপ্তমী' হয়, এবং ইংরেজীতে Nominative Absolute হয়, এখানেও সেইরকম ব্যবহার হইয়াছে। **তিষ্ঠ** : শব্দটি বাংলা নয়। ইহা সংস্কৃতে 'স্থা' ধাতুর [স্থা+লোট্ হি] মধ্যমপুরুষ এক বচনে অনুজ্ঞা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। এখানে বাংলাতেও সেই অর্থে ইহার ব্যবহার হইয়াছে। **কাঁদিয়া কাঁদিয়া** : পুনঃ পুনঃ কাঁদা বা অত্যধিক কাঁদা অর্থে অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্বপ্রয়োগ হইয়াছে। **যদি** : অব্যয়—Optative Mood—

সম্ভাবনা-অর্থে ইচ্ছাসূচক অব্যয়রূপে ব্যবহৃত। **খণ্ডায়ঃ** নামধাতু, অর্থাৎ খণ্ডিত হয়। 'খণ্ড' এই নামপদটিকে নামধাতুরূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে। **চাতকিনী কুতুকিনী**ঃ চাতকী ও কুতুকী হওয়া উচিত। 'ইনী' প্রত্যয়যুক্ত কয়েকটি শব্দের সাদৃশ্যে 'চাতকী' এবং 'কুতুকী' না হইয়া 'চাতকিনী'-কুতুকিনী' হইয়াছে। তুলনীয়ঃ নাপিত-স্থানে নাপিতানী, রজক-স্থলে রজকিনী, গোপী-স্থলে গোপিনী, ইত্যাদি। **তাহাকেঃ** সম্প্রদান কারক। বাংলায় চতুর্থীর জন্য কোনো পৃথক শব্দবিভক্তি নাই। এই জন্য দ্বিতীয়ার বিভক্তিই চতুর্থীর স্থলে প্রযুক্ত হয়। **প্রসাদেঃ** অপাদান কারক। সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ। তুলনীয়ঃ বিনামেঘে বজ্রপাত হইল। খনিতে সোনা পাওয়া যায়। **বলিয়াঃ** অসমাপিকা ক্রিয়ার অব্যয়রূপে প্রয়োগ।

[১৭] নিম্নলিখিত শব্দগুলির যে-কোনো চারিটির অর্থ-প্রকাশ-পূর্বক এক-একটি বাক্য রচনা করঃ

যাযাবর, উপচিকীর্ষা, পরিপন্থী, বেপথু, ভঙ্গুর, বহিত্র, পুষ্পধন্বা।

যাযাবরঃ [যাহাদিগের নিয়মিত বাসস্থান নাই, তাহারা; সদাভ্রমণকারী] যাযাবর-মনোবৃত্তির জন্যই বাংলাদেশের শিল্পশ্রমিকরা কোনো একটা কারখানায় বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। **উপচিকীর্ষাঃ** [উপকার করিবার ইচ্ছা] তিনি ছিলেন একান্ত উদারহৃদয় মানুষ—দানশীলতা এবং উপচিকীর্ষাবৃত্তি চিরদিনই তাঁহার চিত্তে প্রবল ছিল। **পরিপন্থীঃ** [প্রতিকূল] আলস্য এবং মানসিক জড়তার ভাব মানবজীবনের সর্বপ্রকার উন্নতিরই পরিপন্থী। **বেপথুঃ** [কম্প, কম্পন] 'একদিকে বসন্তপুষ্পাভরা শিরীষপেলবা বেপথুমতী উমা, অন্যদিকে যোগাসীন মহাদেবের অগাধস্তম্ভিত সমুদ্রবিশাল হৃদয়—লোকালয়ের নিয়মপ্রাচীরের মধ্যে বিশ্বজয়ী প্রেমের এমন মহান সুযোগ মিলিত কোথায়?' **ভঙ্গুরঃ** [ভঙ্গপ্রবণ, নশ্বর] যাঁহারা মায়াবাদী তাঁহারা বলেন, ক্ষণভঙ্গুর জীবনের প্রতি আসক্তিই মানবের সকল দুঃখবেদনার আকর। **বহিত্রঃ** [নৌকা] বাঙালী একদিন নৌশিল্প এবং বহিত্রচালনায় আশ্চর্যরকমের পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিল। **পুষ্পধন্বাঃ** [পুষ্প ধনু যাঁহার = মদন, কন্দর্প] বসন্তরাগরঞ্জিত বনস্থলীতে বেপথুমানা উমা পুষ্পধন্বাকে সহচর করিয়া যোগসমাহিত মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

[১৮] নিম্নলিখিত ব্যাকরণের বিধিগুলির মধ্যে যে-কোনো তিনটির প্রয়োগের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাওঃ

[ক] বহুত্বের আভাস বুঝাইতে কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তি [খ] ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় নাই, ইহা বুঝাইতে অসমাপিকা ক্রিয়াপদের দ্বিত্ব [গ] উদ্দেশ্যবাচক চতুর্থী-তৎপুরুষ [ঘ] বিশেষণ-সম্বন্ধ বুঝাইতে ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগ [ঙ] পরস্পর-

সাপেক্ষ [Correlative] শব্দযোগে গঠিত ক্রিয়াবিশেষণ [চ] পুরাঘটিত বর্তমান [ছ] প্রতিষেধক অব্যয়।

[ক] **লোকে** বলে, এই মস্তবড়ো দীঘিটা নন্দীগ্রামের এক বিশ্রুত জমিদারের কীর্তি। [খ] **'রহিয়া রহিয়া** ঝরে বরিষার ধারা।' [গ] পূর্বপদে চতুর্থীর বিভক্তিচিহ্ন লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহাকে চতুর্থীতৎপুরুষ সমাস বলে। উদ্দেশ্যবাচক চতুর্থী-তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ : দেবকে দত্ত—**দেবদত্ত**, ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত **ব্রাহ্মণপ্রদত্ত**। [ঘ] **সোনার** বোতাম, **সবুজের** সমারোহ ইত্যাদি। [ঙ] তাহার বাড়ীতে তুমি **যখন-তখন** যাইও না, সে ইহাতে বিরক্তি-বোধ করে। [চ] তুমি যে এখন কলকতায় আছ, সে-খবর আমি আজ তাহাকে পত্রযোগে **জানাইয়াছি**। [ছ] গল্পটি খুবই ক্ষুদ্রকায় **অথচ** শিল্পসৌন্দর্যে অনবদ্য।

[১৯] নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলির যে-কোনো চারিটিকে সমাসবদ্ধ পদে পরিণত করিয়া স্বচরিত বাক্যে প্রয়োগ দেখাও :

[ক] শুনিবামাত্র যাহার মুখস্থ হইয়া যায় ; [খ] পূর্বজন্মের কথা যে স্মরণ করিতে পারে ; [গ] বিধি অতিক্রম না করিয়া ; [ঘ] যাহার সহিত গোত্র সমান ; [ঙ] বর্ণমালার ক্রম বা পরম্পরা রক্ষা করিয়া ; [চ] কিছুই যাহার নাই ; [ছ] নদীই মাতা যাহার [যে দেশের] ; [জ] কোথাও হইতে যাহার ভয় নাই।

[ক] শুনিবামাত্র যাহার মুখস্থ হইয়া যায় = **শ্রুতিধর**। বিবেকানন্দ অদ্বিতীয় শ্রুতিধর-ব্যক্তি ছিলেন ; যাহাই তিনি শুনিতেন কিংবা পড়িতেন তাহা তিনি কদাপি বিস্মৃত হইতেন না। [খ] পূর্বজন্মের কথা যে স্মরণ করিতে পারে = **জাতিস্মর**। মহাশ্বেতার অভিসম্পাতে শুকপক্ষীতে পরিণত হইয়াও বৈশম্পায়ন তাঁহার পূর্বজীবনের কথা স্মরণ করিতে পারিতেন ; শুকযোনিপ্রাপ্ত জাতিস্মর বৈশম্পায়নকে রাজা শূদ্রক একদিন তাহার বিগত জীবনের ঘটনা বলিতে আদেশ করিলেন। [গ] বিধি অতিক্রম না করিয়া = **যথাবিধি**। বীরবাহুর শোকে কাতর রক্ষোরাজ রাবণ নানা আক্ষেপোক্তির পর বীরপুত্র মেঘনাদের সৈনাপত্যে অভিষেকক্রিয়া যথাবিধি সম্পন্ন করিলেন। [ঘ] যাহার সহিত গোত্র সমান = **সগোত্র**। কয়লা এবং হীরক, উভয়েরই জন্ম খনিতে ; এই হিসাবে কয়লা হীরকের সগোত্র বটে, কিন্তু সবর্ণ নয়। [ঙ] বর্ণমালার ক্রম বা পরম্পরারক্ষা করিয়া = **বর্ণক্রমানুসারে**। অভিধানে শব্দগুলি বর্ণক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ থাকে বলিয়া উহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে কোনোই অসুবিধা হয় না। [চ] কিছুই যাহার নাই = **অকিঞ্চন**। তিনি প্রকৃতই ধনী ; কিন্তু চারিত্রিক বিনয়বশত সর্বদাই বলিতেন যে, তাঁহার মতো নিঃস্ব অকিঞ্চন আর কেহ নহে। [ছ] নদীই মাতা যাহার [যে দেশের] **নদীমাতৃক**। বঙ্গভূমি নদী-

মাতৃক দেশ বলিয়াই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা। [জ] কোথাও হইতে যাহার ভয় নাই = **অকুতোভয়**। গান্ধীজী চিরজীবন মৈত্রীর বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাই তিনি ছিলেন শত্রুহীন—সুতরাং অকুতোভয়।

[২০] নিম্নলিখিত ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয় সংজ্ঞা ও বিধিগুলির যে-কোনো তিনটির দৃষ্টান্তসহিত বিশদ পরিচয় দাও:

[ক] উপমাত্মক বহুব্রীহি, [খ] নিপাতনে সন্ধি, [গ] ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ, [ঘ] বিশেষণপদ হইতে গঠিত নামধাতুর পদ, [ঙ] সর্বনাম হইতে গঠিত তদ্ধিত পদ, [চ] সমীকরণ।

[ক] যে সমাসে সমস্যমান পদগুলি কেবল নিজ অর্থ না বুঝাইয়া অন্য একটি পদের অর্থ প্রকাশ করে, তাহাকে **বহুব্রীহি সমাস** বলে—'অন্য পদার্থপ্রধানো বহুব্রীহি'। এই সমাসে ব্যাসবাক্যের শেষে যে, যাহার, যাহাতে, যদ্বারা প্রভৃতি পদ ব্যবহার করিতে হয়। যেমন, পীত অম্বর যাহার = পীতাম্বর; এই 'পীতাম্বর' শব্দ 'পীত'-কে বুঝাইতেছে না, কিংবা 'অম্বর'-কেও [বস্ত্র] বুঝাইতেছে না; ইহা দ্বারা অন্য একটি পদ, অর্থাৎ পীতবস্ত্রপরিধানকারী 'কৃষ্ণ'-র অর্থই প্রধানভাবে দ্যোতিত হইতেছে। বহুব্রীহি সমাসের প্রকারভেদ আছে, তন্মধ্যে উপমাত্মক অর্থাৎ উপমানগর্ভ বহুব্রীহি একটি। যে বহুব্রীহি সমাসে একটি উপমান পদ থাকিয়া তুলনা বুঝায়, তাহার নাম **উপমাত্মক বহুব্রীহি**। যেমন, চাঁদের মত মুখ যাহার = চাঁদমুখ; কমলের ন্যায় অক্ষি [চোখ] যাহার = কমলাক্ষ, ইত্যাদি।

[খ] পরস্পর অতি-নিকটবর্তী দুইট বর্ণের মিলনের নামই **সন্ধি**। 'সন্ধি শব্দের প্রকৃত অর্থ সন্ধান বা মিলন। কিন্তু ব্যাকরণের সন্ধি বলিতে বুঝায় বর্ণের বিকার অর্থাৎ পরিবর্তিত রূপ। পাশাপাশি দুইটি বর্ণের দ্রুত উচ্চারণের ফলেই সন্ধির উৎপত্তি।' ব্যাকরণে স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধির বিচিত্র বিধি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কতকগুলি বিশেষ বিধি, নিয়ম বা সূত্রানুসারেই সন্ধি হয়। কিন্তু কয়েকটি স্থলে সন্ধির সাধারণ নিয়ম খাটে না। এরূপ স্থলে যে সন্ধি, তাহাই **'নিপাতনে সন্ধি'** বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। 'নিপাতন' কথাটির অর্থ হইতেছে [ব্যাকরণে] সূত্রোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম। যেমন, সন্ধির সূত্রানুসারে অ + অ = 'আ' হওয়া উচিত; যথা, দিন + অন্ত = দিনান্ত; সূর্য + অস্ত = সূর্যাস্ত। কিন্তু কুল + অটা = 'কুলাটা' নয়, 'কুলটা'। তেমনি, মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড, 'মার্তাণ্ড' নয়। তদ্রূপ স্বৈরিণী, অক্ষৌহিণী, প্রৌঢ়, প্রেষণ, শুদ্ধোদন প্রভৃতি শব্দ 'নিপাতনে সন্ধি'-র উদাহরণ।

[গ] যে সকল শব্দের ধ্বনির ভিতর দিয়া উহাদের অন্তর্নিহিত ভাবটি সুস্পষ্ট-রূপে দ্যোতিত হয়, তাহাদিগকেই বলা হয় **ধ্বন্যাত্মক শব্দ**। এই শব্দগুলির মধ্যে

বাস্তব-ধ্বনির অনুকৃতিও দেখা যায়। যে সব ধ্বন্যাত্মক পদ বাক্যে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়, ওইগুলিই **ধ্বন্যাত্মক বিশেষণ**। যেমন, মেঘের 'গুরুগুরু' গর্জন, নদীর 'কুলুকুলু' ধ্বনি ; 'দুপ্‌দাপ্‌' শব্দ। 'কতকগুলি ধ্বন্যাত্মক শব্দ আবার ধ্বনির ভাব ব্যতীত, অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাবেরও প্রকাশ করিয়া থাকে ; যেমন, ব্যথায় 'টন্‌টন্‌' করে ; লাল 'টুক্‌টুক্‌' করছে ; 'টক্‌টকে লাল'। কতকগুলি ধ্বন্যাত্মক বিশেষণের দ্বারা বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়, যে-গুণ বস্তুতে বহুক্ষণ ব্যাপিয়া থাকে।' যেমন 'ধূ-ধূ' মাঠ, 'খাঁ-খাঁ' রোদ্দুর, ইত্যাদি।

[ঘ] ক্রিয়াপদের মূল অংশ, অর্থাৎ যাহা হইতে প্রত্যয় বা বিভক্তিযোগে ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয়, তাহার নাম **ধাতু**। 'নাম' অর্থাৎ বিশেষ্য [কখনো কখনো বিশেষণ, অব্যয় প্রভৃতিও] সময়-বিশেষে ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—ইহাদিগকে বলা হয় **'নামধাতু'**। যেমন, নীরব [বিশেষণ] ≫নীরবিলা ; প্রফুল্ল>প্রফুল্লিল, ইত্যাদি। মধুসূদনের কাব্যে এইরূপ নামধাতুর প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়।

[ঙ] শব্দের পর যে-সকল প্রত্যয় যুক্ত হইয়া অন্য শব্দ গঠিত করে, তাহার নাম **তদ্ধিত**। তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দের নাম তদ্ধিতান্ত শব্দ, এবং উহাতে বিভক্তি যুক্ত হইলে বলা হয় **তদ্ধিতান্ত পদ**। সর্বনাম হইতে তদ্ধিত পদগঠনের উদাহরণ ঃ মৎ + ঈয় = মদীয় ; অস্মৎ + ঈয় = অস্মদীয় ; যুষ্মৎ + ঈয় = যুষ্মদীয় ; ভবৎ + ঈয় = ভবদীয়।

[চ] কোনো শব্দ উচ্চারণকালে দুইটি বিভিন্ন বর্গের ব্যঞ্জনধ্বনি পরস্পর অথবা একে অন্যের প্রভাবে পড়িয়া যখন একই বর্গের ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়, কিংবা অল্পবিস্তর সমতা লাভ করে, তাহাকেই বলা হয় **বর্ণসমীকরণ** বা **সমীভবন**—ইংরেজীতে 'assimilation'। যেমন কর্তা>কত্তা ; মূর্খ>মুখ্‌খু ; ধর্‌তে>ধত্তে, ইত্যাদি।

[২১] নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্য হইতে ছয়টি শব্দ নির্বাচন করিয়া উহাদের দ্বারা তিনটি 'সমস্ত'-পদ রচনা কর ঃ

পদ্ম, মাতা, পুষ্প, সমাজ, পতি, জায়া, গন্ধ, নদী, ধনু, বিদ্বান্‌।

পদ্ম + গন্ধ = **পদ্মগন্ধী**। জায়া + পতি = **দম্পতি, জায়াপতি**, [**'জম্পতি'** কথাটি কিন্তু বাংলায় চলে না]। পুষ্প + ধনুঃ = **পুষ্পধন্বা, পুষ্পধনুঃ** [কামদেবতা মদনের এক নাম]। নদী + মাতা = **নদীমাতৃক** [বহুব্রীহি সমাস]। বিদ্বান + সমাজ = **বিদ্বৎসমাজ**।

[২২] মোটা-হরফে-মুদ্রিত পদগুলির মধ্যে যে-কোনো তিনটির প্রয়োগ ব্যাকরণসম্মত কিনা, তদ্বিষয়ে বিচার কর ঃ

[১] আইল গো **কালভুজঙ্গিনীরূপে** দংশিতে আমারে। [২] বসন্তে যেমতি **কুহরে বসন্তসখা**। [৩] কী কাজে তুষিব তোমায় **ভর্ত্রিণী**, শুভে। [৪]

দেবদত্ত অস্ত্রপুঞ্জ শোভে **পিঠোপরি**। [৫] সে **রক্ষেন্দ্রে,** রাঘবেন্দ্র রাখে পদতলে। [৬] কৃষ্ণহয়ারূঢ়া ধনী, ধ্বজদণ্ড করে **হৈমময়**।

ভুজঙ্গিনীঃ শুদ্ধ পদ হইল **ভুজঙ্গী**; কিন্তু বাংলায় 'ভুজঙ্গিনী' অশুদ্ধ-প্রচলিত। কথাটা 'ভুজঙ্গ' শব্দেরই স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ'-প্রত্যয় করিয়া—'ভুজঙ্গিন্' শব্দের নয়। **কুহরে**ঃ 'কুহর' শব্দের অর্থ গর্ত, তাহা হইতে কানের বিবর বা গর্ত; তাহা হইতেই নামধাতু গঠিত হইয়াছে 'কুহরে'—অর্থ হইল 'শব্দ করা'। কাজেই পদটি ব্যাকরণসম্মত; অর্থ—শব্দ করে, কূজন করে। **বসন্তসখা**ঃ সংস্কৃত-ব্যাকরণের বিধি অনুসারে 'বসন্তসখ' হওয়া উচিত [বসন্তের সখা, এই ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিয়া।] কিন্তু 'বসন্ত সখা যাহার' এই বহুব্রীহি সমাস করিলে পদটি শুদ্ধ। তবে, যেহেতু কবি এস্থলে কথাটি 'কোকিল' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, সেহেতু বহুব্রীহি সমাস চলিবে না,—তৎপুরুষ সমাসে 'বসন্তসখ' হইবে। 'বসন্তসখা' বাংলায় অশুদ্ধ-প্রচলিত। **ভর্ত্রিণী**ঃ ভর্তা [ভর্তৃ]+স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ'=**ভর্ত্রী**। সুতরাং সংস্কৃতব্যাকরণ অনুসারে 'ভর্ত্রিণী' পদটি ভুল। ছন্দোস্পন্দ সৃষ্টির জন্যই মধুসূদন এইরূপ পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। **'পিঠোপরি'**ঃ 'পিঠ' বাংলা তদ্ভব শব্দ, 'উপরি' কথাটি সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ। কাজেই এই দুই জাতীয় শব্দের সমাস ব্যাকরণবিরুদ্ধ—শুদ্ধ পদ হইল **'পৃষ্ঠোপরি'**। এখানেও ছন্দের বিশেষ একটি প্রয়োজনেই কবি উক্ত রূপটি প্রয়োগ করিয়াছেন। **রক্ষেন্দ্রে**ঃ মূল শব্দটি 'রক্ষঃ' [রক্ষস্]; সুতরাং রক্ষঃ+ইন্দ্র=**রক্ষইন্দ্র** হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এরূপ প্রয়োগ বাংলায় চলে না বলিয়া মধুসূদন 'রক্ষেন্দ্র' পদটি প্রয়োগ করিয়াছেন। তবে এইরূপ প্রয়োগকে অশুদ্ধ-প্রচলিত বলিতে হইবে। **'হৈমময়'**—হেম+অণ্ [ষ্ণ] প্রত্যয় করিয়া 'হৈম'—অর্থ হইল স্বর্ণ-নির্মিত। সুতরাং আবার 'ময়ট'-প্রত্যয় [বিকার অর্থে] করিলে দ্বিরুক্তিদোষ ঘটে। তাই পদটি অশুদ্ধ—ইহা **'হৈম'** বা **'হেমময়'** হওয়া উচিত।

[২৩] দৃষ্টান্ত-বাক্যের দ্বারা 'কি' ও 'কী'-এর পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

অব্যয় অর্থে সাধারণত 'কি' এবং বিশেষ্য বা বিশেষণ অর্থে সাধারণত 'কী' প্রয়োগ করা হয়। সে কি এসেছে? [অব্যয়]; সে কী করছে? [বিশেষ্য]; কী কাজ কচ্ছিলে? [বিশেষণ]। কখনো ভাবের আতিশয্য বুঝাইতে অব্যয় অর্থে 'কী' প্রযুক্ত হয়। যেমন—কী, এত বড়ো স্পর্ধা!

[২৪] নিম্নলিখিত ব্যাকরণ-সম্বন্ধীয় সংজ্ঞা ও বিধিগুলির যে-কোনো পাঁচটির দৃষ্টান্তসহ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ

পূরণবাচক বিশেষণ, বিধেয় কর্ম, একদেশী সমাস, ব্যতিহার বহুব্রীহি, ভগ্নতৎসম শব্দ, বিপ্রকর্ষ, শীলার্থে তদ্ধিত, বীপ্সা।

পূরণবাচক বিশেষণ : যে বিশেষণ অন্য শব্দের ক্রম প্রকাশ করে, তাহার নাম ক্রমবাচক বা পূরণবাচক বিশেষণ। সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর 'তীয়', 'ম' ইত্যাদি প্রত্যয় করিয়া পূরণবাচক বিশেষণ হয়। যেমন, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম, নবম, ইত্যাদি। **বিধেয় কর্ম :** "কোনো কোনো স্থলে সমার্থক ক্রিয়ার দুইটি কর্ম থাকে ; উহাদের মধ্যে একটিকে উদ্দেশ্য করিয়া অপরটির দ্বারা কিছু বলা হয়, অথবা অপরটিকে প্রথমটির উপর আরোপ করা হয়। এইরূপ স্থলে প্রথম কর্মটিকে 'উদ্দেশ্য কর্ম' এবং আরোপিত অপরটিকে 'বিধেয় কর্ম' বলা হয়। যথা, মাতাপিতাকে সাক্ষাৎ 'দেবতা' ভাবিয়া পূজা করিবে। এখানে 'দেবতা' কথাটি বিধেয় কর্ম।" **একদেশী সমাস :** একদেশবাচক শব্দের সহিত কালবাচক শব্দের যে সমাস হয়, তাহাকে একদেশী সমাস বলে। যেমন, অহন্-এর মধ্যভাগ=মধ্যাহ্ন, অহন্-এর পূর্বভাগ=পূর্বাহ্ণ, ইত্যাদি। **ব্যতিহার বহুব্রীহি :** 'পরস্পরসাপেক্ষ ক্রিয়া বুঝাইলে একই শব্দের পুনরুক্তি দ্বারা যে-বহুব্রীহি হয়, তাহাকে ব্যতিহার বহুব্রীহি বলে।' যথা, দণ্ডাদণ্ডি [=দণ্ডে দণ্ডে যুদ্ধ যেখানে] ; লাঠালাঠি [=লাঠিতে লাঠিতে যুদ্ধ যেখানে] ; কানাকানি [কানে কানে কথা যেখানে] ; তদ্রূপ, নখানখি, ঝাঁকাঝাঁকি, ইত্যাদি। **শীলার্থে তদ্ধিত :** নিষ্পন্ন। [অ-ক্রিয়া] পদের উত্তর যে-প্রত্যয় হয় তাহাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। স্বভাব বুঝাইতে যে-প্রত্যয় হয় তাহাই 'শীলার্থে তদ্ধিত'। যেমন, ত্যাগ+ইনি=ত্যাগী ; ভোগ+ইনি=ভোগী, ইত্যাদি। **বীপ্সা :** 'বীপ্সা' কথাটির অর্থ হইল পৌনঃপুন্য, কোনোকিছু বারবার করা বা হওয়া। যেমন, দিনে দিনে= প্রতিদিন ; ইহা বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব সমাসের দৃষ্টান্ত। আবার, কখনো কখনো দ্বিত্ব করিয়া বীপ্সা বা পৌনঃপুন্য অর্থ প্রকাশিত হয় ; যথা, পিছুপিছু, চলিতে চলিতে, দেখিতে দেখিতে, ঘর-ঘর ইত্যাদি। **ভগ্নতৎসম :** সংস্কৃতভাষা হইতে গৃহীত যে সকল শব্দ বাংলা উচ্চারণে বিকৃত হইয়া একটা নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে উহারাই ভগ্নতৎসম বা অর্ধতৎসম নামে পরিচিত। যেমন, কৃষ্ণ>কেষ্ট, প্রণাম>পেন্নাম, নিমন্ত্রণ>নেমন্তন্ন, ইত্যাদি। **বিপ্রকর্ষ :** উচ্চারণের সুবিধার জন্য কিংবা ছন্দের অনুরোধে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্বরধ্বনির আনয়নকে বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি বলা হয়। যেমন, প্রীতি>পিরীতি ; গ্রাম>গেরাম ; ভক্তি>ভকতি ; মর্ম>মরম ; মুক্তা >মুকুতা, ইত্যাদি।

[২৫] নিম্নলিখিত বাক্যগুলির প্রয়োগের বিশুদ্ধি বিচার কর :

(।০) তিনি মস্তকের ঘর্ম চরণে পাতিত করিয়া জীবিকা অর্জন করেন।

(৵০) পল্লীগ্রামে ঝির্‌ঝিরে মাঠের হাওয়া খুবই উপভোগ্য।

(৶০) তরুণসম্প্রদায় দেশের মুখোজ্বল করিবে।
(।০) দরিদ্র আত্মীয়ের প্রতি হতশ্রদ্ধা দেখান অকর্তব্য।
(।/০) ধ্বংসপ্রায় সমাজের পুনর্গঠন প্রয়োজন।

(/০) তিনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা অর্জন করেন। 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলা' একটি বাংলা বাগ্ধারা [idiom]; সাধুভাষায় পরিবর্তিত করিলে ইহার ভাবব্যঞ্জনা অনেকখানি ক্ষুণ্ণ হয়, এই কারণে ইহাকে রূপান্তরিত করা সমর্থনযোগ্য নয়।

(৵০) পল্লীগ্রামে মাঠের ঝির্ঝিরে হাওয়া খুবই উপভোগ্য। 'ঝিরঝিরে' বিশেষণটি 'হাওয়া'-র আগেই বসান উচিত।

(৶০) তরুণসম্প্রদায় দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। 'উজ্জ্বল' কথাটি 'উৎ' উপসর্গ ও 'জ্বল্' ধাতু হইতে উৎপন্ন; অতএব উৎ+জ্বল = **'উজ্জ্বল'** হইবে, **'উজ্বল'** নয়। 'মুখোজ্জ্বল' কথাটির সমাসে ব্যাকরণঘটিত দোষ আছে।

(।০) দরিদ্র আত্মীয়ের প্রতি 'অশ্রদ্ধা' বা 'হতশ্রদ্ধভাব' দেখানো অকর্তব্য।

(।/০) ধ্বস্তপ্রায় বা ধ্বংসোন্মুখ সমাজের পুনর্গঠন প্রয়োজন।

[২৬] যে-কোনো পাঁচটির অর্থ ও প্রয়োগ বুঝাইয়া বাক্য গঠন কর :

(/০) ভবিষ্যৎ বুঝাইতে বর্তমানের প্রয়োগ; (৵০) সংস্কৃত বিধিলিঙ্-নির্দেশক বাংলা বিভক্তি; (৶০) পঙ্গু ক্রিয়া; (।০) বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণ-রূপে 'ইতে'-র ব্যবহার; (।/০) 'আবার'-এর বিভিন্ন পদরূপে প্রয়োগ; (।৵০) 'আরি'-র তদ্ধিত ও কৃদন্তরূপে প্রয়োগ; (।৶০) 'ইলে'-র দ্বারা ক্রিয়ার পূর্ববর্তিতা-দ্যোতনা।

(/০) আমি কাল বাড়ী **যাচ্ছি** ['যাব' অর্থে]।

(৵০) সংস্কৃত বিধিলিঙ্ বুঝাইবার জন্য সাধারণত ভবিষ্যৎ বা অনুরোধাত্মক অনুজ্ঞা হয়। উদাহরণ : সদা সত্য কথা **বলিও** [বলিবে]। চুরি **করিও** [করিবে] না।

(৶০) কতকগুলি ধাতুর সম্পূর্ণ রূপ পাওয়া যায় না, এগুলিকে অন্য ধাতুর রূপ দ্বারা নিজ অভাব বা অপূর্ণতা পূর্ণ করিতে হয়—এই জাতীয় ধাতুকে অসম্পূর্ণ বা পঙ্গু ধাতু বলে। এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ক্রিয়াকে পঙ্গু ক্রিয়া বলা যায়। 'যা', 'আছ', 'বট' প্রভৃতি পঙ্গু ধাতু। 'যা' ধাতু [বর্তমানে]—যাই, যাচ্ছি; কিন্তু [অতীত কালে]—গেলুম, গেছলুম।

(।০) ঘর **থাকিতে** বাবুই ভিজে—বিশেষণরূপে 'ইতে'-র ব্যবহার। সে **নাচিতে নাচিতে** আসিল—ক্রিয়াবিশেষণরূপে 'ইতে'-র ব্যবহার।

(।৴০) ছেলেটা **আবার** এসেছে [ক্রিয়াবিশেষণ]। রাম ভালো ছেলে, **আবার** সে পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে [সংযোজক অব্যয়]। **আবার, আবার** সেই কামানগর্জন [বিস্ময়সূচক অব্যয়]। **আবার** আগমন কিসের জন্য [বিশেষণ)। তুমি মন দিয়ে পড়াশুনা করতে পার, আমি **আবার** বই ছুঁতে পারিনে [প্রতিষেধক বা প্রতিপক্ষিক অব্যয়]।

(।৵০) কাঁসা + আরি = **কাঁসারি**—কাঁসা লইয়া যাহার ব্যবসায় [তদ্ধিতরূপে প্রয়োগ]। ডুব্ + আরি = **ডুবারি**—যে ডুবে, কর্তৃবাচ্যে [কৃৎরূপে প্রয়োগ]।

(।৶০) আমি ফিরিয়া **আসিলে** তুমি যাইবে।

[২৭] **নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে পাঁচটির সঙ্গে সমার্থক শব্দ যোজনা করিয়া উহাদের সম্পূর্ণ দ্বৈতরূপটি উদ্ধার কর ও এই যুগ্মশব্দসমূহের প্রয়োগ বুঝাইবার জন্য পাঁচটি বাক্য রচনা কর ঃ**

দর—; বন—; কুটুম্ব—; লোক—; সৈন্য—; আদর—; লোহা—বিবাদ—; রাত—; ছল—।

দরদাম—জিনিস কিনতে হলে পাঁচ জায়গায় দরদাম করতে হয়।
বনজঙ্গল—ছেলেটা সারাদিন বনজঙ্গল চুঁড়ে বেড়াচ্ছে।
কুটুম্বস্বজন—বিয়েবাড়ীতে অনেক কুটুম্বস্বজন এসেছেন।
লোকজন—লোকজন কারখানার কাজ শেষ করে চলে গেছে।
সৈন্যসামন্ত—রাজকুমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে শিকারে বেরিয়েছেন।
আদরসোহাগ—বেশি আদরসোহাগ দিয়েই ছেলেটার মাথা খেয়েছ।
লোহালক্কড়—লোহালক্কড়ের দাম প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে।
বিবাদবিসংবাদ—তার সঙ্গে তো আমার কোনো বিবাদবিসংবাদ নেই।
রাতদিন—ছেলেটা রাতদিন টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
ছলচাতুরী—তুমি তো দেখছি এই বয়সেই বেশ ছলচাতুরী শিখে ফেলেছ।

[২৮] **'টা', 'টি', 'খানা', 'খানি', 'গাছা', 'গাছি' প্রভৃতি নির্দেশ বা পরিমাণসূচক প্রত্যয়গুলির বিভিন্নরূপ প্রয়োগ উদাহরণসহযোগে বুঝাইয়া দাও।**

টা—সাধারণত তুচ্ছার্থে বা অবজ্ঞার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, ছেলে**টা** ভারি পাজি। ওই মোটা লোক**টা** যেন একটা হাতী।

টি—একটু আদর বা কোমলতাদ্যোতক। রাম-ছেলে**টি** খুব ভালো।

খানা—ঈষৎ অবজ্ঞার্থে, কখনো-বা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বস্তু বুঝাইবার জন্য। যেমন, বাড়ী**খানা** একেবারে খাঁখাঁ করছে।

খানি—একটু স্নেহ বা আদর বুঝাইতে। যেমন, আহা, মুখ**খানি** কেমন শুকিয়ে গেছে!

টুকু—সাধারণত অল্পতা বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, জল**টুকু** খেয়ে ফেল।

টুকুন—অত্যল্পতা বুঝাইতে। যেমন, দুধ**টুকুন** খেয়ে নাও। এখানে অত্যল্পতার সঙ্গে একটা আদরের ভাবও যেন মিশ্রিত রহিয়াছে।

গাছা—সাধারণত আকারে বড়ো জিনিস বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত। যেমন, লাঠি**গাছা** বাগিয়ে ধর।

গাছি--সাধারণত আকারে ছোট জিনিস বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, ছড়ি**গাছি** তুলে রাখ।

[২৯] তিনকড়ি [মানুষের নাম] ; বিড়ালচোখী ; ঘনশ্যাম ; চুলোচুলি ; তেমোহানী ; অম্লমধুর ; গাছপাকা ; ঢেকিছাঁটা ; বিয়েপাগলা ; পুষ্পধন্বা—ইহাদের যে-কোনো পাঁচটির ব্যাসবাক্যসহ সমাস লেখ।

তিনকড়ি : তিনটি কড়ির বিনিময়ে ক্রীত [যমের নিকট হইতে]—তদ্ধিতার্থে দ্বিগু।

বিড়ালচোখী : বিড়ালের চোখের মতো চোখ যে-স্ত্রীলোকের—মধ্যপদ-লোপী বহুব্রীহি।

ঘনশ্যাম : ঘন-এর মতো শ্যাম—উপমান কর্মধারয়।

চুলোচুলি : চুলে চুলে টানিয়া যে-লড়াই—ব্যতিহার বহুব্রীহি।

তেমোহানী : তে [তিন] মোহানার সমাহার—সমাহারদ্বিগু।

অম্লমধুর : যাহা অম্ল তাহাই মধুর—কর্মধারয়।

গাছপাকা : গাছে পাকা—সপ্তমী তৎপুরুষ।

বিয়েপাগলা : বিয়ের জন্য পাগলা—চতুর্থী তৎপুরুষ।

পুষ্পধন্বা : পুষ্প ধনু যাহার—বহুব্রীহি। এখানে দুই বিশেষ্য পদের সমানাধিকরণ বহুব্রীহি হইয়াছে।

[৩০] অপাদানে সপ্তমী ; অব্যয়যোগে প্রথমা ; বিশেষণ সম্বন্ধে ষষ্ঠী ; অভেদে ষষ্ঠী ; ক্রিয়ার বিশেষণরূপে অসমাপিকা ক্রিয়া ; নামধাতু ; সমধাতুজ কর্ম—ইহাদের যে-কোনো পাঁচটির উদাহরণ দাও।

অপাদানে সপ্তমী—মেঘে বৃষ্টি হয়।

অব্যয়যোগে প্রথমা—**রাম-নামে** [বলিয়া] একটি বালক ছিল।
বিশেষণ সম্বন্ধে ষষ্ঠী—**দুধের** ছেলে। **সোনার** বোতাম।
অভেদে ষষ্ঠী—**জ্ঞানের** আলো। **শোকের** সাগর।
ক্রিয়ার বিশেষণরূপে অসমাপিকা ক্রিয়া—বিছানাটিকে **কষিয়া** বাঁধ। ছেলেটিকে **চাপিয়া** ধর।
নামধাতু—'**জুতিয়ে, ঘুষিয়ে, চড়িয়ে, ঠেঙিয়ে** লোকটার হাড় গুঁড়িয়ে ফেললে রে!' এখানে জুতান, ঘুষান, চড়ান, ইত্যাদি নামধাতু।
সমধাতুজ কর্ম—আমি খুব **ঘুম** ঘুমিয়েছি। শিশুটি কেমন মিষ্ট **হাসি** হাসছে!

[৩১] (/০) তদ্ধিত ও কৃদন্তের, অথবা সন্ধি ও সমাসের উদাহরণ-সহ পার্থক্য দেখাও। (৵০) 'পাইলটে কালি ধরে বেশি, শেফারে লেখা হয় ভালো'—এই বাক্যে 'পাইলটে' ও 'শেফারে' কী কারক? (৶০) পটল-ভাজা, হরিণনয়না, চুলোচুলি—যে-কোনো দুইটির ব্যাসবাক্যসহ সমাস লেখ। (।০) এমন একটি বাক্য রচনা কর যাহাতে 'বিধেয়'-অংশটি 'উদ্দেশ্য'-অংশের পরে থাকিবে। (।/০) সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মক, অথবা অকর্মক ক্রিয়ার সকর্মক প্রয়োগ দেখাইয়া একটি বাক্য রচনা কর।

(/০) শব্দের উত্তর যে প্রত্যয় হয় তাহাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। এই প্রত্যয়যোগে যে-শব্দ গঠিত হয় তাহার নাম তদ্ধিতান্ত শব্দ। দৃষ্টান্ত : দিতি+ষ্ণ্য= দৈত্য [দিতির অপত্য]।

ধাতুর উত্তর যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাহাকে কৃৎপ্রত্যয় বলে। এই প্রত্যয়যোগে যে-শব্দ গঠিত হয় তাহার নাম কৃদন্ত শব্দ। দৃষ্টান্ত—গম্+অনট্=গমন ; পঠ্+ঘঞ্=পাঠ।

পরস্পর সন্নিহিত দুই বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে। দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণতির নাম সমাস।

সন্ধি—হিম+আলয়=হিমালয়।
(অ+আ)=(আ)
রমা+ঈশ=রমেশ।
(আ+ঈ)= (এ)

সমাস—গঙ্গার জল=গঙ্গাজল।
শাখা হইতে চ্যুত=শাখাচ্যুত।

(৵০) 'পাইলটে'—কর্তৃকারক [কর্তায় সপ্তমী]।
'শেফারে'—করণকারক [করণে সপ্তমী]।

(৶০) পটলভাজা—ভাজা যে পটল [কর্মধারয়]। এখানে বিশেষণের পরনিপাত হইয়াছে।

হরিণনয়না—হরিণের নয়নের মতো নয়ন যাহার—(যে স্ত্রীলোকের) —[মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি]।

চুলোচুলি—চুলে চুলে টানিয়া যে লড়াই [ব্যতিহার বহুব্রীহি]।

(।০) কী সুন্দর এই ফুলটি! বেশ ভালো কথা বলেছ তো তুমি। প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যটিতে 'কী সুন্দর' ও 'বেশ ভালো কথা বলেছ' 'বিধেয়'-অংশ, এবং 'এই ফুলটি' ও 'তুমি' 'উদ্দেশ্য'-অংশ। এই দুই বাক্যেই বিধেয় পূর্বে আর উদ্দেশ্য পরে রহিয়াছে।

(।৴০) আমরা কান দিয়া **শুনি**, চোখ দিয়া **দেখি**—সকর্মক ক্রিয়ার অকর্মক প্রয়োগ।

সে আমাকে দেখিয়া উচ্চহাসি **হাসিল**—অকর্মক ক্রিয়ার সকর্মক প্রয়োগ [সমধাতুজ বা ধাত্বর্থক কর্মযোগে]।

[৩২] 'মাথা' শব্দটির পাঁচরকম অর্থ বুঝাইতে পাঁচটি বাক্য রচনা কর। অথবা—ব্যষ্টি, হ্রাস, সুকৃতি, জঙ্গম, সরল—ইহাদের প্রত্যেকটির বিপরীতার্থক শব্দ প্রয়োগ করিয়া বাক্য নির্মাণ কর।

['**মাথা**' শব্দের বিভিন্নার্থে প্রয়োগ]

(১) মাথা খাওয়া [নষ্ট করা] আদর দিয়ে বাপ ছেলেটার মাথা খেয়েছে।

(২) মাথা হেঁট হওয়া [লজ্জায় মাথা তুলতে না পারা] তোমার আচরণে আমার মাথা হেঁট হয়েছে।

(৩) মাথায় ঢোকা [বোধগম্য হওয়া] সোজা কথাটা কিছুতেই তোমার মাথায় ঢুকছে না।

(৪) মাথায় ওঠা [প্রশ্রয় পাওয়া] গোমূর্খকে নাই দিলে মাথায় উঠে।

(৫) 'মাথা' [শ্রেষ্ঠ] রামবাবু হলেন্ এই গ্রামের মাথা।

ব্যষ্টি—**সমষ্টি** : ব্যষ্টিকে লইয়াই **সমষ্টি**।

হ্রাস—**বৃদ্ধি** : কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রকলার হ্রাস ও শুক্লপক্ষে **বৃদ্ধি** হয়।

সুকৃতি—**দুষ্কৃতি** : সুকৃতি ও **দুষ্কৃতি** উভয়েরই ফল মানবকে ভোগ করিতে হয়।

জঙ্গম—**স্থাবর** : **স্থাবর**-জঙ্গম সকল পদার্থেরই বিনাশ একদিন অনিবার্য।

সরল—**কুটিল** : সরল পথ ছাড়িয়া **কুটিল** পথে গেলে অবশ্যই বিপদে পড়িবে।

বাংলা কবিতার ছন্দ

ছন্দ বলিতে কী বুঝায় :

ভাবাবেগস্পন্দিত ছন্দে বিধৃত বাণীরচনাকে **কবিতা** বলা যাইতে পারে। কবিতার প্রাণসত্তার সঙ্গে ছন্দের একটা নিগূঢ় সম্পর্ক বা যোগাযোগ রহিয়াছে। মানুষের হৃদয় যখন প্রকৃতির সংসার ও মানবসংসারের সান্নিধ্যে আসিয়া রসাভিষিক্ত হইয়া উঠে, তখন প্রতিদিনের সাধারণ গদ্যের ভাষায় তাহার সেই রসসিক্ত অনুভূতির প্রকাশ সম্ভবপর হয় না—ইহার জন্য চাই একটা বিশেষ রকমের ভাষা, একটা বিশেষ বাণীবিন্যাসকৌশল, অর্থাৎ চাই পদ্য বা কবিতার ভাষা। **কবিতার ভাষা ছন্দিত,** সুষমাসুন্দর, ধ্বনিতরঙ্গে স্পন্দিত, গতিমাধুর্যে বিলসিত, শ্রুতিমধুর তালভঙ্গীতে নিয়ন্ত্রিত। **ছন্দ** কথাটির ব্যাপক অর্থ হইতেছে 'গতিসৌন্দর্য'; আর, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাহার সংকীর্ণ অর্থ হইল 'ভাষাগত ধ্বনিসৌন্দর্য'—'একটি পূর্ণ ধ্বনিপ্রবাহের সুসমঞ্জস ও তরঙ্গায়িত ভঙ্গি'। সহজ কথায়, ছন্দ হইল পরিমিত পদবিন্যাস, যাহার গুণে বাক্যের সঙ্গে বাক্যের বন্ধন সংগীতমধুর ও তরঙ্গঝংকৃত হইয়া উঠে। কাব্যশিল্পীর এই বিশেষ পদবিন্যাসকৌশলেই ভাষার মধ্যে একটা তরঙ্গভঙ্গি বা ধ্বনিস্পন্দনের সৃষ্টি হয়—যাহার নাম **ছন্দোস্পন্দ** বা Rhythm, এবং এই ধ্বনিগত স্পন্দনটিই ছন্দের প্রাণবস্তু।

মনে রাখিতে হইবে, 'ছন্দোস্পন্দ' [rhythm] আর 'ছন্দ' [metre] এক কথা নয়। " 'Metre' বা পদ্যের ছন্দ 'rhythm' অর্থাৎ সাধারণ ছন্দোস্পন্দের একটি বিশেষ ক্ষেত্র প্রকাশ মাত্র।" ছন্দোস্পন্দ যখন বাক্যের অন্তর্গত পরিমিত পদবিন্যাসের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে তখনই উহা ছন্দ হইয়া উঠে। গদ্যের সঙ্গে ছন্দের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য নয়—গদ্যে ছন্দ থাকিতেও পারে, না-ও থাকিতে পারে। কিন্তু পদ্যের সঙ্গে ছন্দ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, পদ্যে ছন্দ থাকিবেই। এই ক্ষেত্রটিতেই প্রতিদিনের ভাববিনিময়ের বাহন গদ্যের সঙ্গে রসানুভূতির প্রকাশক পদ্য বা কবিতার বড়ো পার্থক্য। বর্তমান আলোচনায় 'ছন্দ' বলিতে আমরা 'metre' বা পদ্যচ্ছন্দকেই বুঝিব।

কোনো বিশেষ ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণপদ্ধতিকে অবিকৃত রাখিয়া **বিভিন্ন বাক্যাংশ** যদি কোনো বিশেষ **রূপকল্প** বা আদর্শ [pattern]-অনুসারে বিন্যস্ত হয়, তবেই বাক্যে ছন্দের আত্মপ্রকাশ ঘটে। একটি সুস্পষ্ট রূপকল্পের পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পৌনঃপুনিকতা ছন্দসৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য। কেন না, এই 'আদর্শের পৌনঃপুনিকতা হইতেই ছন্দের উপকরণগুলির মধ্যে একপ্রকার ঐক্য অনুভূত হয়, এবং সেজন্য তাহাদের ছন্দোবদ্ধ বলা হয়—এই ঐক্যবোধ ছন্দোবোধের ভিত্তিস্থানীয়। বাংলা পদ্যে পরিমিত কালানন্তরে সমধর্মী বাক্যাংশের যোজনা হইতেই ছন্দবোধ জন্মে।'

ছন্দ তার তরঙ্গিত ধ্বনিস্পন্দনের সহায়তায় কবিতার পাঠক বা শ্রোতার অন্তরে একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন অনুভূতি বা আবেশের সৃষ্টি করে। এইজন্য সংস্কৃতে বলা হইয়াছে 'ছাদ্যতে ইতি ছন্দঃ'—'যাহাতে পূর্বে অসুরগণ আচ্ছন্ন [মন্ত্রমুগ্ধ ও অভিভূত] হইয়াছিল' তাহাই ছন্দ।

প্রত্যেক সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্যের প্রকাশ দ্বিবিধ—আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত। 'আকৃতিসৌন্দর্যের লক্ষণ হইতেছে [এক] অঙ্গবহুত্ব, [দুই] অঙ্গসংহতি এবং [তিন] অঙ্গসংগতি কিংবা সম্মিতি।' পূর্বে আমরা বলিয়াছি, ছন্দের তাৎপর্য হইল ভাষাগত ধ্বনিসৌন্দর্য। এই 'সৌন্দর্যলক্ষণের দিক দিয়া, ধ্বনিসৌন্দর্যের অঙ্গবহুত্ব হইতেছে —ধ্বনিপ্রবাহের অন্তর্গত তরঙ্গের একাধিকতা; ঐক্য বা অঙ্গসংহতি হইতেছে ধ্বনিপ্রবাহের নির্দিষ্ট দৈর্ঘ; এবং অঙ্গসঙ্গতি হইতেছে ধ্বনিতরঙ্গসমূহের পরস্পরের দৈর্ঘসামঞ্জস্য।' যে-কোনো কবিতার ছন্দসৌন্দর্য বিশ্লেষ করিলে দেখা যাইবে, **চরণ**কে আশ্রয় করিয়া একটি পূর্ণ ধ্বনিপ্রবাহ আত্মপ্রকাশ করে। এই ধ্বনি-প্রবাহকে তরঙ্গায়িত করিয়া তোলে কয়েকটি **'পর্ব'**, এবং এই পর্বগুলির সামঞ্জস্য-বিধায়ক হইতেছে নির্দিষ্ট পরিমাণের **মাত্রা**। পরিমিত মাত্রার পর্বসমন্বিত চরণই বাংলা ছন্দের একটি বড়ো আশ্রয়। এইগুলিকে লইয়াই পদ্যছন্দের গতি ও স্থিতি, বৈচিত্র্য ও ঐক্য—উভয়ের মিলনেই ছন্দের সৌন্দর্য। ছন্দের আলোচনা মুখ্যত কবিতার চরণ-অন্তর্গত বিভিন্ন বাক্যাংশের ঐক্যসূত্রেরই আলোচনা। কী কৌশলে কবি কাব্যের ছন্দে বৈচিত্র্যসম্পাদন করিবেন, সে-সম্বন্ধে বাঁধাধরা কোনো নিয়ম লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

আমরা বলিয়াছি গদ্যেও ছন্দ থাকিতে পারে; কিন্তু তথাপি গদ্য ও পদ্যের ছন্দের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য আছে। পদ্যে নির্দিষ্ট দৈর্ঘের পদের অর্থাৎ পর্বের যেরূপ বারংবার আবর্তন ঘটে, গদ্যে সেরূপ ঘটে না। গদ্যে পর্ববহুত্ব আছে, পর্বসংহতি আছে, পর্বসংগতিও আছে—এগুলি পদ্যছন্দেরও স্বরূপগত লক্ষণ। কিন্তু **পর্বের যে-মাত্রাসমকত্ব** বাংলা কবিতার ছন্দের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য, গদ্যের অন্তর্গত পর্বে তাহা ততখানি সুনির্দিষ্ট নয়।

ছন্দ-সম্পর্কিত কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের পরিচয়

বাংলা ছন্দের বিভিন্ন রূপপ্রকাশ এবং স্বরূপলক্ষণকে বুঝিয়া লইতে হইলে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের সঙ্গে মোটামুটি একটা পরিচিতির প্রয়োজন। নিম্নে অতিসংক্ষেপে ইহাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতেছি ঃ

[১] **অক্ষর : Syllable :** বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে-ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম অক্ষর। অক্ষর হইতেছে 'উচ্চারণসাধ্য হ্রস্বতম ধ্বনি'। স্বল্পতম প্রয়াসে যে-ধ্বনি উচ্চারিত হয়, আসলে তাহা এক-একটি স্বরধ্বনি। যেমন, অ, আ, ই, উ, ইত্যাদি। স্বরের চেয়ে হ্রস্বতম উচ্চার্য ধ্বনি আর-কিছু হয় না। ব্যঞ্জনধ্বনিও ধ্বনি বটে, কিন্তু স্বরধ্বনির সহায়তা ভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ সম্ভবপর নয়। সুতরাং স্বরহীন ব্যঞ্জনধ্বনিকে 'অক্ষর' বলিতে পারা যায় না। কিন্তু ব্যঞ্জনযুক্ত হোক বা না হোক, সকল স্বরধ্বনিই 'অক্ষর'। এখানে 'অক্ষর' বলিতে আমরা ইংরেজী 'Syllable'-কেই বুঝিতেছি, 'বর্ণ' বা 'হরফ'কে নয়। যেমন, 'টাক্-ডু-মা-ডুম্' কথাগুলি—ইহার প্রতিটি ধ্বনিই 'অক্ষর'—ইহাতে প্রত্যেকটি ধ্বনি ব্যঞ্জনযুক্ত। আবার, ই, ও, উ—ইহারাও 'অক্ষর', অথচ ইহাদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি নাই। 'অক্ষর' এবং 'বর্ণ' বা 'হরফ' যে পৃথক বস্তু, একটি উদাহরণ দিলেই তাহা সহজে বুঝা যাইবে। যেমন, সা, গা, রে—এখানে প্রতিটি ধ্বনিতে বর্ণও [letter] একটি, অক্ষরও [syllable] একটি। কিন্তু উপরের 'টাক্-ডু-মা-ডুম্' কথাগুলির মধ্যে 'টাক্' ও 'ডুম্' শব্দে বর্ণ আছে দুইটি করিয়া—অথচ 'টাক্' এক 'অক্ষর', 'ডুম্'-ও এক 'অক্ষর'। 'কাকলী' শব্দে বর্ণ তিনটি—কা + ক + লী এবং অক্ষরও তিনটি; কিন্তু 'কূজন' শব্দে বর্ণ তিনটি—কূ + জ + ন্, অথচ অক্ষর দুইটি—কূ + জন্।

অক্ষর দুই প্রকারের : **স্বরান্ত ও হলন্ত**। স্বরান্ত অক্ষরকে বলা হয় 'বিবৃত' অক্ষর বা Open Syllable, আর হলন্ত অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরকে বলা হয় 'সংবৃত' অক্ষর বা Closed Syllable। পা, গা, যা, না, সে, কে প্রভৃতি অক্ষর স্বরান্ত; আজ, কাল্, জল্, ফুল, প্রভৃতি অক্ষর হলন্ত।

[২] **মাত্রা : Mora বা Instant :** 'মাত্রা কথাটির মূল তাৎপর্য হইতেছে কালপরিমাণ অর্থাৎ 'duration'। এক-একটি অক্ষর [syllable] উচ্চারণ করিতে কিছুপরিমাণ সময় লাগে—এই সময় বা কালপরিমাণ অনুসারেই প্রতিটি অক্ষরের মাত্রা স্থির করা হয়। সাধারণত একটি হ্রস্ব স্বর বা হ্রস্বস্বরান্ত অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে-সময়টুকু লাগে, তাহাকে **এক মাত্রা** বলে। হলন্ত ও যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরকে কখনো এক মাত্রার, কখনো **দুই মাত্রার** ধরা হয়। সংস্কৃত, গ্রীক, আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষায় কোন্ অক্ষর কত মাত্রার হইবে, সে-সম্বন্ধে পূর্বনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। কিন্তু বাংলা উচ্চারণে কোন্ অক্ষরে কত মাত্রা হইবে, সে সম্পর্কে পূর্বনির্দিষ্ট কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। **বাংলা কবিতায় ছন্দের প্রকৃতি বা 'ঢঙ্' অনুসারেই শেষ পর্যন্ত অক্ষরের মাত্রা স্থির করিতে হয়।** পর্বের মাত্রাবিচারের জন্য বাংলা অক্ষরকে নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণীবিন্যস্ত করা যায় :

- অক্ষর [Syllable]
  - স্বরান্ত [open]
    - যৌগিক স্বরান্ত
    - মৌলিক স্বরান্ত
      - মৌলিক হ্রস্বস্বরান্ত
      - মৌলিক দীর্ঘস্বরান্ত
  - হলন্ত [closed]

অ, আ, ই, উ, ইত্যাদি **মৌলিক স্বরান্ত** অক্ষর ; ঐ, ঔ, ইত্যাদি **যৌগিক স্বরান্ত** অক্ষর। বাংলা উচ্চারণে সমস্ত মৌলিক স্বরই হ্রস্ব বলিয়া পরিগণিত, সুতরাং বাংলা কবিতার ছন্দে মৌলিক স্বরান্ত অক্ষরকে এক মাত্রার ধরা হয়। যেমন, 'ঝিকিমিকি করে পাতা ঝিলিমিলি আলো'—এই চরণের অন্তর্গত প্রতিটি অক্ষর মৌলিক স্বরান্ত এবং প্রত্যেকটি **এক মাত্রার**। 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে'—এই চরণের অন্তর্গত ঐ' এবং 'ভৈ' অক্ষর দুইটি **যৌগিক স্বরান্ত** এবং ইহারা **দ্বিমাত্রিক**। কিন্তু ছন্দের প্রকৃতিভেদে **মৌলিক স্বরান্ত অক্ষর** যেমন **দীর্ঘ** অর্থাৎ দুই মাত্রার হইতে পারে, তেমনি আবার **যৌগিক স্বরান্ত অক্ষরও** [পূর্বোক্ত 'ঐ আসে ঐ' চরণটির দৃষ্টান্তে যাহা দীর্ঘ অর্থাৎ দুই মাত্রার] **হ্রস্ব** অর্থাৎ এক মাত্রার হইতে পারে। যেমন, '**আ**সিল যত | **বী**রবৃন্দ | **আ**সন তব | **ঘে**রি'—এই চরণে 'আ', 'বী', 'ঘে', প্রভৃতি অক্ষর মৌলিক স্বরান্ত, কিন্তু ইহারা প্রত্যেকেই দ্বিমাত্রিক। পক্ষান্তরে, 'ফেরে দূরে, মত্ত সবে | উৎসব-**কৌ**তুকে'—এই দৃষ্টান্তে '**কৌ**' যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর, কিন্তু 'কৌ' এখানে এক মাত্রার।

হলন্ত অর্থাৎ **ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর** শব্দের **শেষে** থাকিলে **দুইমাত্রার**, শব্দের **মধ্যে** থাকিলে **এক মাত্রার** ধরা হয়। যেমন 'গুঞ্জন্' শব্দটি = গুন্ + জন্ (১ + ২ মাত্রা) = তিন মাত্রার। **যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্তী অক্ষরকে** সাধারণত দুই মাত্রার ধরা হয়। যেমন, **গন্ধ, ছন্দ, রক্ত, চন্দ্র** শব্দগুলির গ, ছ, র, চ অক্ষরকে দুইমাত্রার ধরিতে হইবে। কিন্তু এই নিয়মটিও সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ; কেন-না, তানপ্রধান বা পয়ারজাতীয় ছন্দে এইসব অক্ষরকে এক মাত্রারই ধরা হইয়া থাকে। আবার, স্বরাঘাতপ্রধান বা স্বরবৃত্ত ছন্দে **শব্দের শেষের হলন্ত অক্ষর** [যাহা সাধারণত দুই মাত্রার] **এক মাত্রায়** পর্যবসিত হইতে পারে। এইজন্যই আমরা বলিয়াছি, বাংলা কবিতার ছন্দে মাত্রার ক্ষেত্রে পূর্বনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নাই—প্রয়োজনমতো দীর্ঘ অক্ষরকে হ্রস্ব অক্ষর এবং হ্রস্ব অক্ষরকে দীর্ঘ অক্ষররূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে—এই ব্যাপারকে বলা হয় অক্ষরের **হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণ**।

কিন্তু এই হ্রস্বীকরণপদ্ধতি সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। যদি কোনো পর্বে পরপর তিনটি হলন্ত অক্ষর থাকে তাহা হইলে ইহাদের মধ্যে দুইটিকে হ্রস্ব ধরিয়া **একটিকে দুই মাত্রার ধরিতেই হইবে**। যেমন, 'চঞ্চল মন' = চন + চল্ + মন্ = ১ + ১ + ২ = চার মাত্রার। বাংলা কবিতার ছন্দে মাত্রার হিসাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, বাংলা কবিতার চরণ-অন্তর্গত পর্বগুলি নির্দিষ্ট মাত্রার উপাদানেই গঠিত। পরিমিত মাত্রা দিয়া পর্বগঠিত না হইলে ছন্দপতন অনিবার্য। যেমন, 'সাগর জলে | সিনান করি | সজল এলো | চুলে'—এই চরণের প্রথম তিনটি পর্ব পঞ্চমাত্রিক; প্রথম পর্বটির 'সাগর' কথার পরিবর্তে যদি 'সমুদ্র' কথাটি বসানো হয়, তাহা হইলে অমনি ছন্দপতন ঘটিবে। কেননা, 'সাগর-জলে' পাঁচ মাত্রার, কিন্তু 'সমুদ্র-জলে' ছয় মাত্রার।

[৩] যতি ও ছেদ : Metrical Pause ও Sense Pause

যতি বা ছেদ কথার অর্থ হইল, উচ্চারণবিরতি। কোনো বাক্য বা চরণ পাঠ করিবার কালে ঐ বাক্য বা চরণস্থিত কথাগুলিকে অর্থাৎ ধ্বনিপ্রবাহকে আমরা অনর্গল উচ্চারণ করিয়া যাইতে পারি না। বাক্য বা চরণের অন্তর্নিহিত অর্থটিকে সুবোধ্য ও সুচারুরূপে প্রকাশ করিবার জন্য এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রয়োজনে মাঝে-মাঝে থামিবার আবশ্যকতা দেখা দেয়। কথোপকথনে কিংবা গ্রন্থপাঠকালে এই যে মাঝে মাঝে থামিয়া যাওয়া অর্থাৎ উচ্চারণের বিরতি, ইহাকেই বলে **ছেদ** বা **অর্থ-যতি** বা **ভাব-যতি**—ইংরেজীতে বলে Sense-Pause। অল্প কথায়, 'ধ্বনিগত সমগ্র অংশ বা অর্থাংশ প্রকাশের প্রয়োজনে ধ্বনিপ্রবাহে যে-উচ্চারণবিরতি আবশ্যক হয়, তাহার নাম অর্থযতি—ইহার প্রচলিত নাম **ছেদ**।' কবিতার চরণে ছেদ পড়ে অর্থপ্রকাশের আবশ্যকতাবোধে; এইরূপ উচ্চারণবিরতিহেতু কবিতার চরণ অর্থানুযায়ী কতকগুলি বিশ্লিষ্ট বাক্যাংশে বিভক্ত হইয়া যায়। যেমন :

> 'ঝিকিমিকি করে পাতা, * | ঝিলিমিলি আলো, ||**
> আমি ভাবিতেছি কার | আঁখি দুটি কালো।' ||**

ছেদ দুই প্রকারের : **পূর্ণচ্ছেদ** ও **উপচ্ছেদ**। উপরি-উদ্ধৃত চরণে একটি তারকা [*] উপচ্ছেদ ও দুইটি তারকা [**] পূর্ণচ্ছেদের চিহ্নস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। কবিতার চরণে যেখানে বিশিষ্ট অর্থবাচক শব্দসমষ্টি অর্থাৎ **বাক্যাংশের শেষ** হয়, সেখানে স্বল্পক্ষণের জন্য উচ্চারণের বিরতি ঘটে—এরূপ বিরামস্থলকেই বলে **উপচ্ছেদ**; আর, **বাক্যের শেষে** বসে পূর্ণচ্ছেদ। পূর্ণচ্ছেদের সময় উচ্চারণের বিরতি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর। ছেদের অবস্থাননির্দেশের জন্য কবিতার চরণে কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি ইত্যাদি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। নিম্নোদ্ধৃত চরণগুলির দিকে তাকাইলে উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদের অবস্থান সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে :

'এই কথা শুনি * আমি | আইনু পূজিতে ||
পা দুখানি** | আনিয়াছি | কৌটায় ভরিয়া ||
সিন্দূর ।** করিলে আজ্ঞা,* | সুন্দর ললাটে ||
দিব ফোঁটা**......

ছেদ যেমন বিরামস্থল, যতিও তেমনি বিরামস্থল। কিন্তু বিশেষভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, **ছেদ ও যতি কথা-দুইটি সমার্থক নয়**। কবিতার চরণে ছেদ পড়ে অর্থানুযায়ী, কিন্তু যতি পড়ে এক-একবারের ঝোঁকে [impulse] চরণের যতখানি অংশ উচ্চারিত হয়, তদনুযায়ী। কবিতার অন্তর্গত বাক্যের অর্থপ্রকাশের সঙ্গে যতির তেমন নিগূঢ় কোনো সম্পর্ক নাই। কবিতার ধ্বনিপ্রবাহ এক-একবারের ঝোঁকে কিছুটা উচ্চারিত হয়, তারপর জিহ্বার ক্ষণিক বিরামগ্রহণ আবশ্যক; আবার, আর-এক ঝোঁকে ওই ধ্বনিপ্রবাহের আর-কিছুটা অংশ উচ্চারিত হয়—এইভাবেই কবিতার আবৃত্তি চলে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, একঝোঁকে কতকগুলি ধ্বনি উচ্চারণ করিলে যেখানে সেই ঝোঁকের শেষ হয় ও জিহ্বা ক্ষণকালের জন্য বিরামগ্রহণ করে, **সেই বিরামস্থানের নামই যতি**। একটা দৃষ্টান্ত দিলে উপরের কথাগুলির অর্থ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে:

'শুধু অকারণ | পুলকে
নদীজলে-পড়া | আলোর মতন | ছুটে যা ঝলকে | ঝলকে |
ধরণীর পরে | শিথিল-বাঁধন
ঝলমল প্রাণ | করিস্ যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দুলে | শিশির যেমন | শিরীষ-ফুলের | অলকে,
মর্মর তানে | ভরে ওঠ্ গানে | শুধু অকারণ | পুলকে।

উপরের চরণগুলিতে লম্বা দাঁড়ি [|]-চিহ্নগুলি যতির অবস্থান নির্দেশ করিতেছে। নির্দিষ্ট একটি কালের পর কবিতার চরণে ছন্দের কোনো-একটি বিশেষ পরিপাটি [pattern] অনুসারে যতি নিশ্চয়ই পড়িবে, এবং বাংলা ছন্দে ঐক্যবোধ জন্মে এই যতির অবস্থান হইতে। বাংলা ছন্দের পর্ববিভাগ যতির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। কেননা, যতির অবস্থানের জন্যই কবিতার চরণগুলি কয়েকটি পর্বে বিভক্ত হইয়া যায়, এবং পরিমিত মাত্রার পর্বই বাংলা ছন্দের ভিত্তি। প্রতিটি পর্বে ব্যবহৃত মাত্রার হিসাবটিও এই যতির অবস্থান হইতে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারা যায়।

ছেদের মতো যতিও দ্বিবিধ—অর্ধযতি এবং পূর্ণযতি। কতকগুলি ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণের পর ঝোঁকের অবসানহেতু **চরণের মধ্যে** জিহ্বার যে বিরামস্থান, তাহার নাম **অর্ধযতি** বা হ্রস্বযতি; আর প্রতিটি **চরণের শেষে** উচ্চারণের এইরূপ বিরতি-

স্থলের নাম **পূর্ণ-যতি**। যেখানে পূর্ণযতির অবস্থান, সেখানে জিহ্বার ক্রিয়ার পূর্ণ বিরতি ঘটে। দৃষ্টান্ত দিতেছি ঃ

'চঞ্চল | মৌমাছি | গুঞ্জরি | গায় ||
বেণুবনে | মর্মরে | দক্ষিণ | বায়।'||

—এই দুইটি চরণে এক দাঁড়ি [|] অর্ধযতির, আর দুই দাঁড়ি [||] পূর্ণযতির নির্দেশ করিতেছে।

[8] পর্ব ও পর্বাঙ্গ ঃ Bar ও Beat

কবিতার চরণে অর্ধযতি বা হ্রস্বযতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ধ্বনিসমষ্টির নাম **পর্ব**। কেহ কেহ **পদ** [Caesuric Foot] অর্থেও 'পর্ব' কথাটির ব্যবহার করিয়া থাকেন। যতির দ্বারা কবিতার চরণ কতকগুলি ধ্বনিসমষ্টিতে বিভক্ত হইয়া যায়, এই **খণ্ডিত ধ্বনিপ্রবাহই পর্ব**। অর্থাৎ 'এক যতি [অর্ধযতি] হইতে [কিংবা চরণের প্রারম্ভ হইতে] পরবর্তী যতি পর্যন্ত চরণাংশকে বলা হয় পর্ব।' আরো সহজ কথায়, কবিতা পাঠকালে এক-একবারের ঝোঁকে, অর্থাৎ এক নিশ্বাসে আমরা চরণের যতটুকু অংশ উচ্চারণ করি, উহাই পর্ব। নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্ত হইতে চরণের পর্ববিভাগ সহজে বুঝিতে পারা যাইবে ঃ

'মকরচূড় | মুকুটখানি | কবরী তব | ঘিরে ||
পরায়ে দিনু | শিরে, ||
জ্বালায়ে বাতি | মাতিল সখী- | দল, ||
তোমার দেহে | রতন-সাজ | করিল ঝল- | মল।' ||

এই উদাহরণে প্রথম চরণে চারিটি, দ্বিতীয় চরণে দুইটি, তৃতীয় চরণে তিনটি ও চতুর্থ চরণে চারিটি পর্ব রহিয়াছে। 'পর্বই বাংলা ছন্দের উপকরণ। ফুলের মালা বা তোড়া আমরা নানাভাবে, নানা কায়দায়, নানা pattern বা নক্সা অনুসারে রচনা করিতে পারি—কিন্তু মূল উপকরণ এক-একটি ফুল। তেমনি, নানা কায়দায়, নানা নক্সায় আমরা পর্বের সহিত সাজাইয়া বিচিত্র চরণ ও স্তবক বা কলি [stanza] রচনা করিতে পারি—কিন্তু ইমারতের মধ্যে ইটের মতো উপকরণ-হিসাবে থাকিবে এক-একটি পর্ব। ছন্দের মূল ভিত্তি একটা ঐক্য, সেই ঐক্যের পরিচয় আমরা পাই পর্বের ব্যবহারে।'

এক-একটি পর্বের সংগঠনে ক্ষুদ্রতর যে-কয়েকটি অঙ্গ উপাদানরূপে বিরাজমান থাকে, তাহাদেরই নাম **পর্বাঙ্গ**। একটি পর্বকে যদি একটি ফুলের সহিত তুলনা দেওয়া যায়, তাহা হইলে পর্বাঙ্গকে বলিতে পারা যায় ঐ ফুলের এক-একটি পাপড়ি।

প্রতিটি পর্ব কয়েকটি পর্বাঙ্গের সমষ্টি। পর্বাঙ্গের উচ্চারণে ধ্বনিগাম্ভীর্যের হ্রাসবৃদ্ধি-হেতুই পর্বগুলি ধ্বনিতরঙ্গময় হইয়া উঠে। এই যে ধ্বনিতরঙ্গ বা স্পন্দন, ইহাই কবিতার ছন্দের প্রাণবস্তুস্বরূপ। দৃষ্টান্ত :

'বর্ষণ : গীত | হলো : মুখ : রিত | মেঘ : মন্ : দ্রিত | ছন্দে,
কদম্ব : বন | গভীর : মগন | আনন্দ : ঘন | গন্ধে ;
নন্দিত : তব | উৎসব : মন্ | দির্—
হে গম্ভীর !'

এই উদাহরণে [:] চিহ্ন দ্বারাই পর্বগুলি যে-কয়েকটি পর্বাঙ্গে খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, তাহা দেখানো হইয়াছে। প্রত্যেক পূর্ণ পর্বে দুই বা ততোধিক পর্বাঙ্গ বর্তমান থাকে, নতুবা ধ্বনিতরঙ্গের স্পন্দনটুকু সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। এক-একটি পর্বাঙ্গের মাত্রাসংখ্যা সাধারণত দুই, তিন কিংবা চার। যেমন :

'কোন্ হা : টে তুই | বিকো : তে চাস্ | ওরে : আমার | গান'

এখানে প্রতিটি পর্বাঙ্গ দুই মাত্রার। বাংলা ছন্দে অবশ্য একমাত্রার পর্বাঙ্গও মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়। পর্বের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে, বাংলায় **চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট ও দশ** মাত্রার পর্ব পাওয়া যায়। আরো একটি লক্ষণীয় বস্তু হইতেছে, বাংলা ছন্দে **চার মাত্রা** অপেক্ষা ছোট ও **দশ মাত্রা** অপেক্ষা বড়ো পর্বের ব্যবহার নাই। দৃষ্টান্ত :

[ক] 'র্াত পোহালো | ফর্সা হোলো | ফু্টল কত | ফুল' [চার মাত্রার]
[খ] 'সকাল বেলা | কাটিয়া গেল | বিকাল নাহি | যায়' [পাঁচ মাত্রার]
[গ] 'শুধু বিঘে দুই | ছিল মোর ভুঁই | আর সবি গেছে। ঋণে' [ছয় মাত্রার]
[ঘ] 'মিলন-স্থলগনে | কেন বল্
নয়ন করে তোর | ছলছল্ ?' } [সাত মাত্রার]
[ঙ] 'গগনে গরজে মেঘ | ঘন বরষা,
কূলে একা বসে আছি | নাহি ভরসা।' } [আট মাত্রার]
[চ] 'পর্বত চাহিল হতে | বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।' [দশ মাত্রার]

কতকগুলি মূল শব্দ লইয়া বাংলা ছন্দে পর্ব গঠিত হয়, এবং প্রত্যেকটি শব্দকে সচরাচর অখণ্ডিতভাবেই পর্বের মধ্যে সন্নিবেশিত করিবার চেষ্টা করা হয় ; তবে মাঝে মাঝে ইহারও ব্যতিক্রম ঘটে। যেমন :

'ঘুম্ : যাবে সে | দুধের : ফেনা | নর্নীর : বিছা | -নায়'

এখানে 'বিছানায়' শব্দটিকে ভাঙিয়া দুইটি পর্বে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

[৫] চরণ ঃ Metrical line বা Verse

কবিতায় পূর্ণযতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পূর্ণ-ধ্বনিপ্রবাহের বা ছন্দোবিভাগের নাম **চরণ**। কয়েকটি পর্বের সমবায়েই 'চরণ' গড়িয়া ওঠে। কবিতার প্রত্যেকটি চরণকে সাধারণত এক-একটি ভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে [line] সাজানো হয় ; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, চরণ ও পঙ্‌ক্তি সব সময় এক নয়। অনেক সময়, একটি চরণকে [Metrical line] ভাঙিয়া দুইটি পঙ্‌ক্তিতে [line] সাজানো হইয়া থাকে—যেমন, ত্রিপদী ছন্দে ঃ

'আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে | তাহে ভালবাসা দিয়ে |
গড়ে তুলি মানসীপ্রতিমা।'||

এই দৃষ্টান্তে 'আশা দিয়ে……মানসী প্রতিমা' পর্যন্ত সমগ্র ধ্বনিপ্রবাহই 'চরণ', কিন্তু ইহাকে সাজানো হইয়াছে দুইটি ভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে। চৌপদী ছন্দেও একটি চরণকে দুইটি [এমন কি, চারি] পঙ্‌ক্তিতে ভাঙিয়া সাজাইতে পারা যায়।

সাধারণত চরণের মধ্যে অনুপ্রাসের অবস্থান নির্দেশ করিবার জন্যই চরণকে ভাঙিয়া বিভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। চরণের মধ্যে দুই বা ততোধিক পর্ব থাকে, এবং এই পর্ব বা ছন্দোবিভাগগুলি যতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কবিতার চরণ-গুলিকে পরস্পর সমান হইতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই ; কেন না, চরণের দৈর্ঘ বাংলা ছন্দের মূল ভিত্তি নয়, মূল ভিত্তি হইল পরিমিত মাত্রায় গঠিত পর্ব। অসম পর্বে গঠিত চরণের দৃষ্টান্ত ঃ

'হেরিনু রাতে, | উতল উৎ | -সবে ||
তরল কল- | রবে ||
আলোর নাচ | নাচায় চাঁদ | সাগরজলে | যবে, ||
নীরব তব | নম্র নত | মুখে ||
আমারি আঁকা | পত্রলেখা, | আমারি মালা | বুকে ||

বাংলা কবিতায় সাধারণত দ্বিপর্বিক, ত্রিপর্বিক, চতুষ্পর্বিক এবং কদাচিৎ পঞ্চপর্বিক চরণ দেখা যায়। যেমন ঃ

[ক] 'আমাদের ছোটনদী | চলে বাঁকে বাঁকে'—[দ্বিপর্বিক]
[খ] 'ললাটে জয়টীকা | প্রসূনহার গলে | চলে রে বীর চলে'—[ত্রিপর্বিক]
[গ] 'ভূদেব রমেশ | দীনবন্ধুর | অর্ঘ্যে পদার- | বিন্দে দীপ্তি'—[চতুষ্পর্বিক]
[ঘ] 'জীর্ণ জরা | ঝরিয়ে দিয়ে | প্রাণ অফুরান | ছড়িয়ে দেদার | দিবি।'—
—[পঞ্চপর্বিক]

[৬] স্তবক : Stanza

দুই বা দুইয়ের অধিক চরণ সুশৃঙ্খলভাবে একত্র সন্নিবিষ্ট হইলে তাহাকে স্তবক বলা হয়। স্তবকের অর্থ হইল—'চরণগুচ্ছ'। অনেকেরই ধারণা, দুই চরণে স্তবক গঠিত হয় না, কিন্তু এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রাচীন পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের কবিতায় পরস্পর সমান **দুই চরণের মিত্রাক্ষর স্তবকই** দৃষ্ট হইবে। আধুনিক কালের কবিতাতেও দুই চরণের স্তবক অজস্র দেখিতে পাওয়া যাইবে। যাহাকে অধুনা আমরা দুই চরণের স্তবক বলি, প্রাচীন কালের কবিতায় তাহা **শ্লোক** [Distich বা Couplet] নামেই পরিচিত ছিল। স্তবকের অন্তর্ভুক্ত চরণগুলির মধ্যে সংশ্লেষ নির্দেশ করে ঐ সব চরণের অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল। নিম্নের দৃষ্টান্ত হইতে স্তবক-গঠনের রীতিটি বুঝা যাইবে :

[ক] 'রাখাল গরুর পাল | নিয়ে যায় মাঠে,
শিশুগণ দেয় মন | নিজ নিজ পাঠে।'

[পয়ার : **দুই** চরণের স্তবক]

[খ] 'বিদায় চাহিতে | নয়নে নয়ন | রাখি
ছলছলি এলো | আঁখি,
সকলি ভুলিলে | নাকি ?'

[**তিন** চরণের স্তবক]

[গ] 'প্রেম এসেছিল | চলে গেল সে যে | খুলি দ্বার,
আর কভু আসি- | বে না ;
বাকি আছে শুধু | আরেক অতিথি | আসিবার,
তার সাথে শেষ | চেনা।'

[**চার** চরণের স্তবক]

[ঘ] 'পবনে পবনে | সাগরে আজিকে | কী কল্লোল,
দে দোল্ দোল্! |
পশ্চাত হতে—হাহা করে হাসি,
মত্ত ঝটিকা | ঠেলা দেয় আসি,
যেন এ লক্ষ | যক্ষশিশুর | অট্টরোল।'

[**পাঁচ** চরণের স্তবক]

[ঙ] 'তাল গাছ | এক পায়ে | দাঁড়িয়ে
সব গাছ | ছাড়িয়ে
উঁকি মারে | আকাশে।

মনে সাধ, | কালো মেঘ | ফুঁড়ে যায়,
একেবারে | উড়ে যায়—
কোথা পাবে | পাখা সে ?'
[**ছয়** চরণের স্তবক]

ইহা ছাড়া, সাত-আট-নয়-দশ চরণের স্তবকও বাংলা কবিতায় দৃষ্ট হইবে। একই মূলপর্বের ব্যবহার এবং চরণে মিত্রাক্ষর-সংযোজনের বৈচিত্র্য দ্বারা নানা ছাঁচের স্তবক গঠন করিতে পারা যায়।

[৭] বল বা স্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাত : Stress বা Accent

বাক্য উচ্চারণকালে মাঝে মাঝে শব্দের ধ্বনিবিশেষের উপর জোর পড়ে। এই জোরকে বা আকস্মিক স্বরপ্রকর্ষকেই বলা হয় **ঝোঁক** বা **বল** বা **প্রস্বর** বা **স্বরাঘাত** অথবা **শ্বাসাঘাত**। অক্ষর জোর দিয়া উচ্চারণ করিবার কালে সেই শ্বাসাহত স্বরের গাম্ভীর্য পর্বের অন্যান্য অক্ষর অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করে। স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হইলে শব্দের প্রথম অক্ষরে এই শ্বাসাঘাত পড়ে ; আর, বাক্য যদি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয় অর্থাৎ পর্বে বিভক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে পর্বের প্রথম অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাত পড়ে। বাংলা ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি এই ঝোঁক বা শ্বাসাঘাতের দ্বারা প্রভাবিত হয়। পূর্বে আমরা বলিয়াছি, হলন্ত অক্ষরকে [যেমন, জল, হাত, মন] দীর্ঘ বা দুই মাত্রার ধরাই সাধারণ রীতি। কিন্তু স্বরাঘাত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে প্রতিটি পর্বের প্রথম অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাত পড়ে বলিয়া ঐ পর্বের অন্তর্গত হলন্ত অক্ষরগুলি হ্রস্ব হইয়া যায়, অর্থাৎ দুই মাত্রা এক মাত্রায় পর্যবসিত হয়। যেমন, 'দুয়োরাণীর' [দু + য়ো + রা + নীর্] কথাটি পাঁচ মাত্রার ; কিন্তু কবিতার চরণে এই কথাগুলি যখন পর্বহিসাবে ব্যবহৃত হয়, তখন অবস্থাভেদে ইহারা চার মাত্রার হইয়া যায়। দৃষ্টান্ত :

'ম´নে পড়ে | সু´য়োরাণী | দু´য়োরাণীর | ক´থা'

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, শ্বাসাঘাতের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে অনেক সময় পর্বস্থিত অক্ষরের মাত্রার যথাযথ হিসাবটি মিলিবে না।

[৮] মিত্রাক্ষর : Rime

দুইটি চরণের বা ছন্দোপঙ্‌ক্তির, অথবা পঙ্‌ক্তিবিভাগের শেষাংশে [শেষ অক্ষরে] স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির সাম্য বা মিল দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমধ্বনিযুক্ত অক্ষর-যুগলকেই **মিত্রাক্ষর** বলা হয়। অক্ষরের এইরূপ মিত্রতা অন্ত্যানুপ্রাস কিংবা মধ্যানুপ্রাস [Alliteration] ছাড়া আর-কিছু নয়। মিল শুধু চরণের শেষেই থাকিবে,

এমন কোনো কথা নাই, উহা চরণের অন্তর্গত পর্বের শেষেও দেখা যায়। ত্রিপদী ছন্দে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের শেষে অক্ষরের ধ্বনিসাম্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। স্তবক-গঠনের ক্ষেত্রে মিত্রাক্ষর যে কতখানি প্রয়োজন তাহা পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি। ইহা ছাড়া, অনুরূপ ধ্বনির পুনরাবৃত্তি বাক্যকে শ্রুতিমধুর করিয়া তোলে। মিত্রাক্ষর বা মিল সম্পর্কে বড়ো কথা এই যে, কেবল স্বর কিংবা ব্যঞ্জনের ধ্বনিসাম্যকে মিল বলে না; প্রকৃত মিত্রাক্ষর বা মিলসৃষ্টি করিতে হইলে চরণের অন্তস্থিত কিংবা মধ্যস্থিত পর্বের শেষে যুগ্মধ্বনির শেষ ব্যঞ্জন ও তাহার পূর্ববর্তী স্বরকে অনুরূপ হইতে হইবে; দ্বিতীয়ত, শেষ অযুগ্মধ্বনি ও তাহার পূর্ববর্তী স্বর অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। যেমন:

'হে ভুবন,
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু **ভালো,**
ততক্ষণ তব **আলো**
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব **ধন**।'

এই দৃষ্টান্তে 'বন্' 'ক্ষণ্' ও 'ধন্' তিনটিই যুগ্মধ্বনি, এবং 'ভালো' ও 'আলো' অযুগ্ম-ধ্বনি। যুগ্মধ্বনিগুলির ক্ষেত্রে শেষ ব্যঞ্জন ও তৎপূর্ববর্তী স্বরের মধ্যে ধ্বনিসাম্য রহিয়াছে; অযুগ্মধ্বনিগুলির ক্ষেত্রে শেষ দুইটি স্বরের মধ্যে ধ্বনিসাম্য রহিয়াছে—তাই তাহাদের মধ্যে মিল বা অক্ষরের মিত্রতা গড়িয়া উঠিয়াছে।

বাংলা কবিতার ছন্দে নানা প্রকারের মিল বা অন্ত্যানুপ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণত পর পর দুইটি পঙ্‌ক্তির শেষে মিল বা মিত্রাক্ষর গড়িয়া উঠে; আবার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রথম ও তৃতীয় চরণে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে কিংবা প্রথম ও চতুর্থ চরণে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে মিলসৃষ্টির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের স্তবক গড়িয়া ওঠে। এই রকমের যে মিল, তাহাকে যথাক্রমে বলা হয়, **পর্যায়সম** [ক-খ-ক-খ] ও **মধ্যসম** [ক-খ-খ-ক] মিত্রাক্ষর। দৃষ্টান্ত:

[১] 'নূতন-জাগা | কুঞ্জবনে | কুহরি উঠে | **পিক,**
বসন্তের | চুম্বনেতে | বিবশ দশ | **দিক**।'

—**পর পর দুইটি** ছন্দোপঙ্‌ক্তির শেষে মিল

[২] 'হে মোর ভৈরব | ভীষণ **সুন্দর,** [ক]
তোমার কম্বুর | নিনাদ **গম্ভীর** [খ]
ডুবাক বিশ্বের | হৃদয়-**কন্দর,** [ক]
কাঁপাক অন্তর | নিদয় **দম্ভীর**।' [খ]

—**পর্যায়সম** মিল

[৩] স্বপনে ভ্রমিনু আমি | গহন **কাননে** [ক]
একাকী। দেখিনু দূরে | যুবা **একজন,** [খ]
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে | প্রাচীন **ব্রাহ্মণ,** [খ]
দ্রোণ যেন ভয়শূন্য | কুরুক্ষেত্র- **রণে**। [ক]

—**মধ্যসম** মিল

[৯] অমিত্রাক্ষর ছন্দ : Blank Verse

'যে **পয়ার** বা মহাপয়ারের চরণে চরণান্তিক ছন্দোযতির [অর্থাৎ **পূর্ণযতির**] সহিত অর্থগত ছেদের [অর্থাৎ **ভাবযতির**] মিত্রতা বা একত্র অবস্থান অবশ্যম্ভাবী নহে, সেই পয়ার বা মহাপয়ারের বিশেষ নাম—**অমিত্র ছন্দ**। অন্যকোনো ছন্দে চরণান্তিক যতি ও ছেদের অমিত্রতা ঘটিলেও তাহাকে অমিত্র ছন্দ বলা চলিবে না।' বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবন ছন্দোশিল্পী মধুসূদনের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। প্রাক্-মধুসূদন-যুগের বাঙালী কবিকে কাব্যরচনার ক্ষেত্রে ছন্দের বাহ্য বন্ধনের নিকট দাসত্ব করিতে হইয়াছে। প্রাচীন পয়ার, ত্রিপদী [লাচাড়ি] প্রভৃতি প্রচলিত ছন্দে কবির হৃদয়ভাবের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ প্রকাশের তেমন প্রচুর অবকাশ ছিল না; কেন-না, চরণের মধ্যমিল ও অন্ত্যমিল এবং একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষরের [Syllable] গণ্ডীর মধ্যে কবির ভাবকে নিবদ্ধ রাখিতে হইত। সেকালের অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, কিংবা স্বরবৃত্ত ছন্দকে বিশ্লেষ করিলেই বাংলা ছন্দের এই কৃত্রিম বন্ধনটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

প্রাচীন অক্ষরবৃত্ত বা সাধারণের সুপরিচিত 'পয়ার' ছন্দটির কথাই ধরা যাক। পয়ারের প্রতিটি চরণে মাত্রাসংখ্যা চতুর্দশ, ইহাতে প্রথম চরণের শেষের ধ্বনি দ্বিতীয় চরণের শেষের ধ্বনিরই অনুরূপ। পয়ারে পরপর দুইটি চরণের শেষের ধ্বনির মধ্যে পরস্পর একটা মিত্রতা গড়িয়া উঠে—এই অন্ত্যমিল বা অন্ত্যানুপ্রাসের জন্যই পয়ার ছন্দকে মিত্রাক্ষর বলা হয়। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

'ঝিকিমিকি করে পাতা, ঝিলিমিলি আলো,
আমি ভাবিতেছি কার আঁখিদুটি কালো।'

এই উদ্ধৃত দুইটি চরণের শেষে 'আলো'-র সঙ্গে 'কালো'-র মিল রহিয়াছে, সুতরাং উহারা পরস্পর মিত্রাক্ষর। কিন্তু অক্ষরের মিত্রতা অর্থাৎ মিলটিই প্রাচীন পয়ার ছন্দের একমাত্র লক্ষণীয় বিশিষ্টতা নয়—ইহার স্বরূপপ্রকৃতির মধ্যেও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। পয়ারের প্রতি-চরণের চৌদ্দটি মাত্রাকে দুইটি ছন্দোবিভাগে বিশ্লিষ্ট করা হয়, এই বিশ্লেষের ফলে পয়ারের ছন্দোপঙ্ক্তি **দুইটি পর্বে** বিভক্ত হইয়া যায়। প্রথম

পর্বের মাত্রাসংখ্যা **আট** এবং দ্বিতীয় পর্বের মাত্রার পরিমাণ **ছয়**। আবার, প্রথম আট মাত্রা একঝোঁকে উচ্চারণের পর স্বল্প বিরাম, এবং শেষের ছয় মাত্রা উচ্চারণের পর জিহ্বার পূর্ণ বিরামগ্রহণ। অর্থাৎ, প্রথম পর্বের পর বসে অর্ধযতি এবং দ্বিতীয় পর্বের পর বসে পূর্ণযতি। উপরি-উদ্ধৃত চরণ-দুইটির ছন্দোলিপি [Scansion] করিলে পয়ার ছন্দের চালটি বুঝা যাইবে :

'ঝিকিমিকি : করে পাতা | ঝিলিমিলি : আলো, ‖
আমি ভাবি : তেছি কার | আঁখি দুটি : কালো।' ‖

—দুইটি ছন্দোপঙ্‌ক্তিরই মাত্রাসংখ্যা [প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের মাত্রাসংখ্যা একত্রে মিলিয়া] ৮+৬=১৪। উদ্ধৃত দুইটি চরণকে আরো সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষ করিলে দেখা যাইবে, প্রত্যেক চরণের শেষে আসিয়া কবির উদ্দিষ্ট একটি হৃদয়ভাবের প্রকাশ সমাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ চরণটি একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য হইয়া উঠিয়াছে ও একটি সুস্পষ্ট অর্থ বহন করিতেছে। এখানে বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, প্রথম চরণের ভাবটি দ্বিতীয় চরণের মধ্যে আসিয়া প্রবাহিত হয় নাই ; দুইটি চরণই অর্থদ্যোতনার দিক দিয়া আত্ম-সম্পূর্ণ—কেউ কাহারো উপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং ফল দাঁড়াইতেছে এই, পয়ার ছন্দে প্রতি চরণের চৌদ্দটি অক্ষরের মধ্যেই কবিকে অর্থপূর্ণ একটি ভাবকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহাকে টানিয়া আনিয়া দ্বিতীয় চরণে প্রসৃত করা চলিবে না। পদ্য বা কবিতা রচনার ক্ষেত্রে ছন্দের এরূপ কৃত্রিম বন্ধন কবির চিত্তভাবকে বাণীরূপ দান করিবার পক্ষে সত্যই একটি বড়ো প্রতিবন্ধক। পয়ার ছন্দের এই বন্ধনের জন্য কবি ভাবের সুবিস্তৃত নভোঅঙ্গনে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো স্বেচ্ছায় উড়িবার অবকাশ পাইতেন না, প্রতিপদে তাঁহাকে স্থিরনির্দিষ্ট চতুর্দশ অক্ষরের সীমিত গণ্ডীর দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিতে হইত।

বাংলা কাব্যসাহিত্যে মধুসূদন ছিলেন নানাদিকে একজন বিপ্লবী কবি—পয়ারের চরণের এই নিগড়টিকে ছিন্ন করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন, ফলে মধুসূদনের অসামান্য কবিপ্রতিভা আবিষ্কার করিল যুগান্তকারী অমিত্রচ্ছন্দটি!

মধুপ্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের **নিগূঢ় প্রকৃতিটি** বুঝিয়া লইতে হইবে। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হইবে, পরপর দুইটি চরণের শেষে অক্ষরধ্বনির মিত্রতার অভাবই বুঝি অমিত্রচ্ছন্দের প্রধান ও একমাত্র বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাহা নয়—চরণে চরণে অন্ত্যমিলের অভাবটুকু এই ছন্দটির খুব বড়ো কথা নয়। কেন-না, ছন্দোরসিক ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রাচীন পয়ারের চরণান্তিক মিল তুলিয়া দিলেও উহা যেমন অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইবে না, আবার তেমনি অমিত্রচ্ছন্দে মিলসংযোজন করিলেও উহা পুরানো পয়ারে রূপান্তরিত হইবে না। ইহার কারণ হইতেছে, প্রাচীন পয়ার ছন্দ ও অমিত্রচ্ছন্দের প্রকৃতিটিই ভিন্ন। অমিত্রচ্ছন্দে চরণান্তর্গত যতি ও ছেদের

ব্যাপারটি বুঝিতে পারিলেই পয়ারের প্রকৃতির সঙ্গে ইহার স্বরূপগত পার্থক্যটি ধরা পড়িবে।

যতির দিক দিয়া পয়ার ও অমিত্রচ্ছন্দের মধ্যে কোনো ভিন্নতা নাই। উভয় ছন্দের চাল আট ও ছয় মাত্রার যোগে—উভয় ছন্দেরই প্রতি-চরণে মাত্রাসংখ্যা চৌদ্দ এবং অর্ধযতি ও পূর্ণযতির অবস্থান একরূপ। অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :

'একাকিনী : শোকাকুলা | অশোক- : কাননে ||
কাঁদেন : রাঘব- : বাঞ্ছা,* | আঁধার : কুটীরে, ||*
নীরবে !** | : দুরন্ত : চেড়ি | সীতারে : ছাড়িয়া ||
ফেরে দূরে,* : মত্ত সবে | উৎসব : -কৌতুকে।' **||

যতির দিকে লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, অমিত্রচ্ছন্দের কাঠামো [structure] প্রাচীন পয়ারের কাঠামোর সঙ্গে অভিন্ন। পয়ারের একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক :

'মহাভার : তের কথা | অমৃত : -সমান, ||**
কাশীরাম : দাস কহে* | শুনে : পুণ্য : -বান' ||**

কিন্তু এই দৃষ্টান্তে ছেদের দিকে তাকাইলে [একটি দাঁড়ি ও দুইটি দাঁড়ি যথাক্রমে অর্ধযতি ও পূর্ণযতির চিহ্ন এবং একটি তারকা ও দুইটি তারকা যথাক্রমে উপচ্ছেদ ও পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন] দুইটি ছন্দের অন্তরঙ্গ প্রকৃতি কত বিভিন্ন তাহা বুঝা যাইবে। যতি পড়ে একঝোঁকে যতখানি চরণাংশ উচ্চারণ করা যায় তদনুসারে, আর ছেদ পড়ে বাক্যের অর্থানুসারে। পয়ারে যতি ও ছেদ একজায়গায় পড়ে, কিন্তু অমিত্রচ্ছন্দে যতি ও ছেদ সবসময় এক জায়গায় পড়ে না। মধুসূদন **ছেদকে যতি হইতে বিযুক্ত করিয়া দিয়াই** ভাবের বাঙ্ময় প্রকাশকে ছন্দের কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। উপরি-উদ্ধৃত অমিত্রচ্ছন্দের দৃষ্টান্তটিতে পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়াছে একেবারে তৃতীয় পঙ্‌ক্তির 'নীরবে' কথাটির পরে। পুরাণো পয়ার ছন্দে বাক্যকে এমন করিয়া দুইটি চরণের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিয়া আনিয়া তৃতীয় চরণে সমাপ্তিদান করা কোনোমতেই সম্ভব ছিল না।

যতি হইতে ছেদকে বিমুক্ত করিয়া লইয়া মধুসূদন পয়ার ছন্দকে **প্রবহমাণ** করিয়া তুলিলেন,—পয়ারের **ঐক্যের সঙ্গে নবতন বৈচিত্র্যকেও** যুক্ত করিয়া দিলেন—এইবার বাংলা ছন্দ একটা নূতন রূপমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল। 'বাংলা কবিতার প্রথম ছন্দোমুক্তিসাধক—মাইকেল মধুসূদন। তাঁহার ছন্দোমুক্তির চেষ্টার ফলেই অমিত্রছন্দের জন্ম। তিনি ছন্দকে ভাঙিতে না পারিলেও চরণান্তিক অনুপ্রাস ও ছেদের বিপর্যয় ঘটাইয়া কবিতার অর্থকে স্বাধীনতা দিয়াছেন ও কবিতাকে করিয়াছেন অপেক্ষাকৃত জীবনোপযোগী।' এই অমিত্রছন্দটি মহাকবি শ্রীমধুসূদনের অসামান্য

সৃজনীপ্রতিভার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। ছান্দসিক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় অমিত্রচ্ছন্দের একটি নূতন নামকরণ করিয়াছেন—**অমিতাক্ষর**। ইহাতে অক্ষর বা মাত্রাসংখ্যা ছেদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নয় [অর্থাৎ অমিত] বলিয়াই বোধ হয় অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ নামের পক্ষপাতী। কিন্তু কবিসমালোচক মোহিতলাল মজুমদার অমিত্রাক্ষর ছন্দের 'অমিতাক্ষর'-নামকরণবিষয়ে সুতীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। 'অমিতাক্ষর' কথাটি অমিত্রাক্ষরের পরিবর্তে চলিতে পারে কিনা, সে-সম্পর্কে এখানে সূক্ষ্ম আলোচনার অবকাশ নাই।

মধুসূদন অমিত্রচ্ছন্দে চরণান্তিক মিল তুলিয়া দিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে বাক্যের শ্রুতিমাধুর্যের যে-ক্ষতি হইল, তাহা পূরণ করিলেন চরণের মধ্যে হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের সমবায়ে বিচিত্র ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া। সংস্কৃতকাব্যের ছন্দে অন্ত্যানুপ্রাস নাই, কিন্তু যুক্তাক্ষরধ্বনির সুনিপুণ সমাবেশে সেখানে অদ্ভুত ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে—সেজন্য অন্ত্যমিলের অভাবটুকু উপলব্ধিই করা যায় না। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, ছন্দোশিল্পী মধুসূদন কেন তাঁহার প্রবর্তিত ছন্দে এত প্রচুর ধ্বনিবহুল তৎসম শব্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন। চরণের অন্ত্যমিল অনুপ্রাসেরই নামান্তর মাত্র। এই অন্ত্যমিল অমিত্রচ্ছন্দে নাই বটে, কিন্তু মহাকবি মধুসূদন অপূর্ব কৌশলে প্রচ্ছন্নভাবে চরণের মধ্যেই অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়া চরণান্তিক মিলের অভাবটুকু পূরণ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত : 'গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী' ; 'কিংবা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে' ; 'হেরি সপ্তশূরে শূর তপ্ত লৌহাকৃতি রোষে'—ইত্যাদি।

মধুসূদনের প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দটিকে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র তাঁহাদের কাব্য-রচনায় প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদনের প্রযুক্ত অমিত্রচ্ছন্দে যে-অদ্ভুত ধ্বনিকল্লোল, হ্রস্বদীর্ঘস্বরের সংমিশ্রণজনিত যে-সংগীতময় তরঙ্গধ্বনি, বাঙ্ময় চিত্তভাবের যে-উচ্ছল প্রবহমাণতা ও যে-গাম্ভীর্য বর্তমান, তাহা হেম-নবীনের ব্যবহৃত অমিত্রাক্ষরে মোটেই দৃষ্ট হয় না। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' কাব্য কিংবা নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস'-এর অমিত্রচ্ছন্দ সুপ্রাচীন পয়ারেরই ঈষৎ রূপান্তর মাত্র—ইহাকে একপ্রকার মিলহীন পয়ার বলা যাইতে পারে। বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে একমাত্র মধুসূদন ব্যতীত অন্যকোনো কবি যথার্থ অমিত্রচ্ছন্দের প্রয়োগ করিতে পারেন নাই—মধুসূদনের হাতেই ইহার উৎপত্তি, তাঁহার হাতেই ইহার চরম উৎকর্ষ ও পরিণতি।

মধুসূদনের প্রযুক্ত অমিত্রচ্ছন্দের সঙ্গে হেম-নবীনের প্রযুক্ত ঐ ছন্দটির পার্থক্যটি নিম্নের দৃষ্টান্তগুলি হইতে পরিস্ফুট হইবে :

[ক] চাহিয়া সহর্ষচিত্তে | পুত্রের বদনে, ||*
কহিলা দনুজেশ্বর | বৃত্রাসুর হাসি, ||*
'রুদ্রপীড় !* তব চিত্তে | যত অভিলাষ ||
পূর্ণ কর * যশোরশ্মি | বাঁধিয়া কিরীটে ; ||*

বাসনা আমার নাই | করিতে হরণ ||
তোমার সে যশঃপ্রভা,* | পুত্র,* যশোধর ! ||**
[হেমচন্দ্র : 'বৃত্রাসুর ও রুদ্রপীড়']

[খ] কানন কাকলীপূর্ণ ; * | বিহঙ্গ-নিচয় ||
গাইতেছে বৃক্ষে বৃক্ষে ; * | পালে পালে পালে ||
গো-দল মহিষদল | ফিরিছে আলয় ||**
তাহাদের হাম্বারব. * | গলঘণ্টাধ্বনি, ||*
রাখালের উচ্চ বংশী- | রবে সম্ভাষণ, ||*
ইন্ধনবাহিনী ইন্দু- | মুখীর সংগীত, ||*
হলবাহী অন্যমনা | কৃষকের গীত ||*
দূরবাহী শৈলানিলে | মধুর হইয়া ||
করিতেছে গিরিশৃঙ্গে | অমৃত বর্ষণ। ||**
[নবীনচন্দ্র : 'পূর্বস্মৃতি']

[গ] সম্মুখ-সমরে পড়ি | বীরচূড়ামণি ||
বীরবাহু চলি যবে | গেলা যমপুরে ||*
অকালে,**কহ,*হে দেবি, * | অমৃতভাষিণি ! ||*
কোন্ বীরবরে বরি | সেনাপতিপদে ||
পাঠাইলা রণে পুনঃ | রক্ষঃকুলনিধি ||*
রাঘবারি ?**কি কৌশলে | রাক্ষসভরসা ||
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে, * | অজেয় জগতে, ||*
ঊর্মিলাবিলাসী নাশি | ইন্দ্রে নিশঙ্কিলা ? ||**
[মধুসূদন : 'বীরবাহুর পতনে']

ছন্দযতি ও অর্থযতির অমিত্রতা, পর্বমধ্যে যুগ্মমাত্রিক ও অযুগ্মমাত্রিক যে-কোনো দৈর্ঘের পর ছেদের ব্যবহার, লঘুগুরু অক্ষরের সংঘাতজনিত ধ্বনিপ্রবাহের বিচিত্র স্পন্দন, চরণমধ্যে শ্বাসাঘাতের আধিক্য এবং আরো কয়েকটি বস্তু মধুপ্রবর্তিত অমিত্র-ছন্দটিকে হেম-নবীনের ব্যবহৃত অমিত্রচ্ছন্দ হইতে একটা লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। এইজন্য আমরা বলিয়াছি, বাংলা কাব্যসাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দের ক্ষেত্রে মহাকবি মধুসূদন একক এবং অনন্য।

অমিত্রছন্দ দুই প্রকারের—**অমিল** ও **সমিল**। মধুসূদন চিরাচরিত পয়ারের যতি হইতে কেবল ছেদকেই যে বিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহা নয়, তিনি চরণান্তিক অক্ষরধ্বনির মিত্রতাকেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু **রবীন্দ্রনাথ** যে-অমিত্রচ্ছন্দ ব্যবহার করিলেন, তাহাতে **অক্ষরের মিত্রতাকে** আবার ফিরাইয়া আনিলেন। আরো লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মধুসূদন পর্বমধ্যে **যুগ্মমাত্রিক ও**

অযুগ্মমাত্রিক যে-কোনো দৈর্ঘের শব্দের পর ছেদ ব্যবহার করিয়াছেন ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সাধারণত ছেদ বসাইয়াছেন **যুগ্মমাত্রিক শব্দের পর**। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের স-মিল অমিত্রচ্ছন্দে **পর্বের মধ্যে পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার** প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। পর্ববিন্যাসের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ বহু জায়গায় **অন্ত্য পর্বটিকে** [অর্থাৎ পয়ারের ছয়মাত্রাবিশিষ্ট শেষের পর্বটিকে] **মুখ্য পর্বের** [আট মাত্রার প্রথম পর্বের] **পূর্বে** সংস্থাপিত করিয়া লক্ষণীয় বৈচিত্র্যসম্পাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন। মধুসূদনের ছন্দে **পর্বোত্থিত ধ্বনিতরঙ্গ** প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের ঐ ছন্দটিতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে চরণান্তিক অক্ষরের মিত্রতাজনিত **গীতিধর্মী সুর**। মধুসূদনের অ-মিল অমিত্রচ্ছন্দের **উদাত্ত গাম্ভীর্যটিও** রবীন্দ্রনাথের সমিল অমিত্রচ্ছন্দে তেমন পরিদৃষ্ট হইবে না। রবীন্দ্রীয় সমিল অমিত্রচ্ছন্দের দৃষ্টান্ত ঃ

'অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে ||
বসুন্ধরা, দিবসের | কর্ম-অবসানে ||
দিনান্তের বেড়াটি ধ- | রিয়া আছে চাহি ||
দিগন্তের পানে।**ধীরে | যেতেছে প্রবাহি ||
সম্মুখে আলোকস্রোত | অনন্ত অম্বরে ||*
নিঃশব্দ চরণে।**আকা | -শের দূরান্তরে ||
একে একে অন্ধকারে | হতেছে বাহির ||
একেকটি দীপ্ত তারা, * | সুদূর পল্লীর ||
প্রদীপের মতো।'**......

অষ্টাদশ অক্ষরযুক্ত [৮+১০ মাত্রার] মহাপয়ারেও রবীন্দ্রনাথ সমিল অমিত্রচ্ছন্দ রচনা করিয়াছেন ঃ

'এবার ফিরাও মোরে,* | লয়ে যাও সংসারের তীরে ||*
হে কল্পনে,* রঙ্গময়ী।** | দুলায়ো না সমীরে সমীরে, ||*
তরঙ্গে তরঙ্গে আর,* | ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়, ||*
বিজন বিষাদ -ঘন | অন্তরের নিকুঞ্জ ছায়ায় ||
রেখোনা বসায়ে আর।** | দিন যায়,*সন্ধ্যা হয়ে আসে। ||**
অন্ধকারে ঢাকে দিশি,* | নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে ||
নিশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে | বন।'**......

রবীন্দ্রনাথের এই সমিল অমিত্র পয়ারকে অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় **মিত্রাক্ষর-অমিতাক্ষর** নামে চিহ্নিত করিয়াছেন। কবিগুরুর 'বলাকা'-কাব্যের ছন্দটিও সমিল অমিত্র পয়ারের উপর প্রতিষ্ঠিত। মিত্রাক্ষরের অবস্থান নির্দেশ করিবার জন্য পয়ারের চরণের [মহাপয়ারেরও] পর্বগুলিকে ভাঙিয়া তিনি বিভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে

বিন্যস্ত করিয়াছেন। এইজন্য **'বলাকা'**-র **ছন্দকে** আপাতদৃষ্টিতে একান্ত অভিনব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ঐ ছন্দের প্রকৃতি নির্ধারণ করা মোটেই দুরূহ নয়। দৃষ্টান্ত :

যদি তুমি মুহূর্তের তরে।
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি, ||
তখনি চমকি ||
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব। পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে ; ||
পঙ্গু মূক | কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা ||
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে | দাঁড়াইবে পথে ;[১] ||

বলাই বাহুল্য যে, পয়ার কিংবা মহাপয়ারের নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রাযোগে চরণ-গঠনের রীতিটি 'বলাকা'-র ছন্দে সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই ; এই ছন্দের চরণগুলি তাই প্রায়শই অপূর্ণপদী। কেহ কেহ বলাকা-কাব্যের নূতন ছন্দটিকে **'মুক্তক'** ছন্দ নামে চিহ্নিত করিয়াছেন।

প্রখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের প্রযুক্ত ছন্দটিও অমিত্রাক্ষর নামে পরিচিত। বাংলা কবিতাকে গিরিশ যে কিছুটা মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন, সে-কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এবং ইহারই ফলে বাংলা কবিতা অনেকখানি নাটকীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। অবশ্য এখানে 'নাটক' বলিতে আমরা সুরপ্রধান পৌরাণিক নাটকই বুঝিতেছি—বর্তমানের সামাজিক নাটক নয়। গিরিশচন্দ্রের প্রবর্তিত ছন্দটি অধুনা **গৈরিশ ছন্দ** নামেই পরিচিত। গিরিশচন্দ্র ছন্দের বন্ধনকে একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই ; কেন-না, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নিয়মগুলি তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণ উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে, এমন কথা কেউ বলিতে পারিবেন না। ছেদ ও যতিস্থাপনবিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম না মানিলেও, গিরিশচন্দ্র [তথা রবীন্দ্রনাথ] তাঁহার প্রযুক্ত ছন্দে **পদ্যের পর্বকেই** সহজ-স্বীকৃতি জানাইয়াছেন। তবে অমিত্র পয়ারের চরণ-সম্মিতিকে তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ফলে হ্রস্ব ও দীর্ঘ পর্বের ব্যবহার এবং মুখ্য পর্ব ও অন্ত্য পর্বের স্থানপরিবর্তন কিছুটা নিরঙ্কুশ হইয়াছে। গৈরিশ ছন্দের চরণগুলিকে দুইটি পর্বে বিশ্লিষ্ট করা যায় :

ব্রহ্ম সনাতন |
রাজীব লোচন |
ধ্যানে জ্ঞানে | হেরিছেন মোরে।
জীবমাত্রে | বহে দেহভার
এ সংসারে | মৃত্যুর অধীন সবে ;
কিন্তু হেন মৃত্যু | কে কবে লভেছে ভূমণ্ডলে ?

অমিত্রচ্ছন্দের উদ্ভাবন করিয়া মহাকবি মধুসূদন বাংলা কবিতার সম্ভাবনাকে কতখানি যে বিপুল করিয়া তুলিয়াছেন, ছন্দের সঙ্গে সামান্য পরিচয় যাঁহাদের আছে, এই সত্যটি সহজেই তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

[১০] ছন্দোবন্ধ : Metrical Structure

'ছন্দোবন্ধ' কথাটির অর্থ হইল কবিতার ছন্দোপঙ্‌ক্তিতে পর্ব বা পদসমাবেশ-রীতি। আমরা দেখিয়াছি, পর্বই বাংলা ছন্দের উপকরণ—বিভিন্ন দৈর্ঘের পর্বের সমাবেশেই এক-একটি চরণ ও কয়েকটি চরণের সমবায়ে এক-একটি স্তবক গড়িয়া উঠে। যে ছন্দোবন্ধের প্রতি চরণে **দুইটি পর্ব** বা পদ থাকে তাহার নাম **দ্বিপদী**। এইরূপ, প্রতি চরণে **তিনটি পর্ব** থাকিলে তাহাকে **ত্রিপদী**, এবং **চারিটি পর্ব** থাকিলে তাহাকে **চৌপদী** বা চতুষ্পদী বলা হইয়া থাকে। প্রতি পর্বে মাত্রাসংখ্যার তারতম্য অনুসারে ইহাদিগকে **লঘু** ও **দীর্ঘ**, এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। বাংলা কবিতার বিভিন্ন ছন্দোবন্ধের পরিচয় আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি :

[ক] লঘু দ্বিপদী বা পয়ার

বাংলা কবিতায় যে-ছন্দটি 'লঘু পয়ার' বা শুধু 'পয়ার' নামে পরিচিত, উহাই 'লঘু দ্বিপদী'। পয়ারের প্রতি-চরণে **দুইটি পর্ব** থাকে—প্রথম পর্বটি **আট** মাত্রার, দ্বিতীয়টি **ছয়** মাত্রার—মাত্রাসংখ্যা সর্বসমেত **চৌদ্দ**। প্রাচীন এবং আধুনিক বাংলা কাব্যে পয়ার একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সাধারণত পয়ারের দুইটি চরণের অন্তে মিত্রাক্ষর থাকে, এবং ইহার লয় বা গতি ধীর। দৃষ্টান্ত :

'এনেছিলে সাথে করে | মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি | করে গেলে দান।'

[খ] তরল পয়ার

লঘু পয়ারের একটি রূপভেদ হইতেছে 'তরল পয়ার'। লঘু পয়ারে কেবল চরণের শেষেই মিল থাকে, কিন্তু তরল পয়ারে **চতুর্থ** ও **অষ্টম** অক্ষরে অতিরিক্ত মিল সংযোজিত হইয়া থাকে। 'তরল পয়ার' প্রাচীন বাংলা ছন্দের একটি পারিভাষিক নাম—এই নামটি বর্তমানে কিন্তু অপ্রচলিত। দৃষ্টান্ত :

'দেখ দ্বিজ মনসিজ | জিনিয়া মূরতি
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র | পরশয়ে শ্রুতি।
অনুপম তনু শ্যাম | নীলোৎপল-আভা,
মুখরুচি কত শুচি | করিয়াছে শোভা।'

[গ] মালঝাঁপ পয়ার

লঘু পয়ারের আর-একটি রূপভেদ হইল 'মালঝাঁপ' পয়ার। তরল পয়ারে চরণান্তিক মিল ছাড়াও চতুর্থ এবং অষ্টম অক্ষরে মিল থাকে ; মালঝাঁপ পয়ারে ইহারও **অতিরিক্ত মিল দ্বাদশ অক্ষরে**। দৃষ্টান্ত :

'কি রূপসী, অঙ্গে বসি, | অঙ্গ খসি পড়ে,
প্রাণ দহে কত সহে, | নাহি রহে ধড়ে।
মধ্য ক্ষীণ, কুচ পীন, | শশীহীন শশী,
আস্তবর, হাস্তবর | বিম্বাধর, রাশি'

লঘু পয়ার **সমিল** এবং **অমিল,** উভয় প্রকারেরই হইতে পারে। মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্যের চতুর্দশ-অক্ষর-সম্বলিত অমিত্রচ্ছন্দে চরণের অন্ত্য মিল নাই। আর, উপরি-উদ্ধৃত পঙক্তিগুলি সমিল লঘু পয়ারেরই দৃষ্টান্ত।

[ঘ] দীর্ঘ দ্বিপদী বা দীর্ঘপয়ার বা মহাপয়ার

যে ছন্দোবন্ধে প্রতিটি চরণে দুইটি পর্ব বা পদ থাকে এবং ঐ দুইটি পর্বের মাত্রা-সংখ্যা যথাক্রমে **আট** ও **দশ**—মোট মাত্রাসংখ্যা **আঠার,** উহাকেই বলা হয় 'দীর্ঘ দ্বিপদী' বা 'দীর্ঘ পয়ার' বা 'মহাপয়ার'। দৃষ্টান্ত :

'তাই আজি ধরাতলে | বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের | দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে,
পূর্ণিমানিশীথে যবে | দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি,
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি।'

অমিল মহাপয়ারের দৃষ্টান্ত :

—'ধন্য এ জীবন মোর,
এই বাণী গাব আমি | প্রভাতে প্রথমজাগা পাখী
যে-স্বর ঘোষণা করে | আপনাতে আনন্দ আপন,
দুঃখ দেখা দিয়েছিল, | খেলায়েছি দুঃখনাগিনীরে
ব্যথার বাঁশীর সুরে ; | ...'

[ঙ] প্রবহমাণ পয়ার

যে-পয়ারে **অর্থযতি** ও **ছন্দযতি** পরস্পর মিলিয়া যায় না, অর্থাৎ অর্থযতি **ছেদ** বা **ছন্দযতিকে** [তথাকথিত **যতিকে**] লঙ্ঘন করিয়া যাওয়ার ফলে ছেদ ও যতির মধ্যে বিপর্যয় ঘটে, তাহাকেই বলে **প্রবহমাণ পয়ার**। প্রাচীন পয়ারে ছেদ

ও যতি উভয়েই চরণের শেষে একসঙ্গে স্থাপিত হইত, ছন্দোবিপ্লবী মধুসূদনই সর্বপ্রথম যতি ও ছেদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইলেন। ইহারই ফলে কবি তাঁহার বাক্যকে বিভিন্ন চরণের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইবার সুযোগ লাভ করিলেন, এবং প্রতি চরণের শেষে বাক্যকে সমাপ্ত করিবার দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইলেন। বর্তমানে কবিদের প্রযুক্ত পয়ার ছন্দ প্রায়শই প্রবহমাণ। দৃষ্টান্ত :

'ম্লান হয়ে এলো কণ্ঠে । মন্দারমালিকা, ||*
হে মহেন্দ্র,*নির্বাপিত | জ্যোতির্ময় টিকা ||
মলিন ললাটে। **পুণ্য | -বল হল ক্ষীণ, ||*
আজি মোর স্বর্গ হতে | বিদায়ের দিন, ||*
হে দেব,* হে দেবীগণ। ** | বর্ষ লক্ষশত ||
যাপন করেছি হর্ষে * | দেবতার মতো ||*
দেবলোকে ||'**

এই প্রবহমাণ পয়ার **লঘু** হইতে পারে, **দীর্ঘ** হইতে পারে,—**সমিল** হইতে পারে, **অমিল**ও হইতে পারে। উপরের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই ইহার অন্তরঙ্গ পরিচয়টি মিলিবে।

[চ] লঘু ত্রিপদী : লঘু ত্রিপদীর **প্রতি চরণে পর্ব** বা পদসংখ্যা **তিনটি**। কিন্তু প্রথম দুইটি পর্বের শেষে যে-অনুপ্রাস অর্থাৎ মিত্রাক্ষর থাকে, তাহার অবস্থান সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করিবার জন্য **একটি চরণকে** ভাঙিয়া **দুই পঙ্‌ক্তিতে** সাজানো হয়। ইহার **মাত্রাসংকেত** যথাক্রমে **ছয়+ছয়+আট**=কুড়ি। দৃষ্টান্ত :

'কানু সে জীবন | জাতি-প্রাণ-ধন |
এ দুটি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক | হিয়ার পুতলী |
নিমিখে নিমিখ হারা।'

[ছ] দীর্ঘ ত্রিপদী : প্রকৃতির দিক দিয়া লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ত্রিপদীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই—ইহাদের ভিন্নতা শুধু মাত্রার ক্ষেত্রে। দীর্ঘ ত্রিপদীর পর্বগুলির মাত্রাসংকেত হইল যথাক্রমে **আট+আট+দশ**=ছাব্বিশ। দৃষ্টান্ত :

'যশোর নগর ধাম | প্রতাপ-আদিত্য নাম |
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায়, | কেহ নাহি আঁটে তায়, |
ভয়ে যত নৃপতি তটস্থ ||'

[জ] লঘু চৌপদী : লঘু চৌপদী ছন্দে একটি চরণে চারিটি পর্ব বা পদ থাকে এবং পর্বগুলির **মাত্রাসংকেত** যথাক্রমে **ছয়+ছয়+ছয়+পাঁচ** = তেইশ। দৃষ্টান্ত :

'কি মেরুশিখর, | কিবা বিধুবর, |
বিবেচনা কর, | কি তরুতলে।
শিখরী অচল, | এ দেখি সচল |
শশাঙ্ক সমল, | সকলে বলে ॥'

[ঝ] দীর্ঘ চৌপদী : দীর্ঘ চৌপদীর প্রকৃতি লঘু চৌপদীর মতোই—উভয় ক্ষেত্রেই একটি চরণকে ভাঙিয়া দুইটি পঙ্‌ক্তিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে দীর্ঘ চৌপদীর মাত্রাসংখ্যা অধিক—ইহার মাত্রাসংকেত হইল : **আট+আট+আট+ছয়** কিংবা **সাত** কিংবা **দশ**। দৃষ্টান্ত :

'ছিঁড়িয়াছি ফুলমালা, | জুড়াতে মনের জ্বালা, |
চন্দনচর্চিত দেহে | ভস্মের লেপন।

অথবা :

'ভরদ্বাজ-অবতংশ | ভূপতি রায়ের বংশ |
সদা ভাবে হত-কংস | ভুরশুটে বসতি।'

অথবা :

'দুর্জয়ের জয়মালা | পূর্ণ করে মোর ডালা |
উদ্দামের উতরোল | বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।'

[ঞ] একাবলী : পয়ার ও ত্রিপদীর মতো 'একাবলী'রও দুইটি মিত্রাক্ষর চরণ এবং প্রতি চরণে দুইটি করিয়া পর্ব। **প্রথম পর্বের** মাত্রাসংখ্যা **ছয়**, দ্বিতীয় পর্বের মাত্রাসংখ্যা **পাঁচ—মোট এগার মাত্রা**। দৃষ্টান্ত :

'বড়র পিরীতি | বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি, | ক্ষণেকে চাঁদ ॥'

[ট] দীর্ঘ একাবলী : দীর্ঘ একাবলীও দ্বিপদী ছন্দ, অর্থাৎ ইহার প্রতি চরণে দুইটি পর্ব এবং পর্বদুইটির মাত্রাসংকেত **ছয়+ছয়** = বার। ইহাতেও দুইটি চরণের শেষ অক্ষরে মিল থাকে। দৃষ্টান্ত :

'কনকে রতনে | রজতে জড়িত
আভরণ সেথা | ছিল কত মত'—

[ঠ] চতুর্দশপদী কবিতা : Sonnet

পয়ার বা মহাপয়ারের চৌদ্দটি মাত্র চরণে ['চরণ' কথাটি 'পদ' অর্থেও ব্যবহৃত হয়] রচিত কবিতার নাম **চতুর্দশপদী**। কোনো কবিতায় শুধু চতুর্দশ চরণ থাকিলেই চলিবে না, ঐ চরণগুলিকে পয়ারের ভিত্তিতেই রচনা করিতে হইবে—নতুবা তাহাকে চতুর্দশপদী নামে চিহ্নিত করা যাইবে না। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম প্রবর্তন করেন কবি শ্রীমধুসূদন। ইহার ইংরেজি নাম 'সনেট'। সনেটের আদি-জন্মভূমি হইতেছে ইতালী। ইতালীয় কবি পেত্রার্ক [১৩০৬—১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দ] সনেট রচনা করিয়া অবিস্মরণীয় কীর্তি অর্জন করিয়াছেন। ইতালী দেশ হইতে চতুর্দশপদী ক্রমে সমগ্র য়ুরোপে ছড়াইয়া পড়ে। পেত্রার্ক অবশ্য সনেটের আদিস্রষ্টা নহেন, তাঁহার পূর্বে বিশ্রুত কবি দান্তে সনেট রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজি সাহিত্যে সনেটের প্রথম প্রবর্তন করেন কবি ওয়াট এবং স্যরে [ষোড়শ শতাব্দী]। তাঁহাদের পরবর্তীকালে সেক্সপিয়র, মিলটন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, এলিজাবেথ ব্যারেট্ ব্রাউনিং প্রমুখ ইংরাজ কবি সনেট রচনা করিয়া খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

কেবল চতুর্দশ কিংবা অষ্টাদশ-অক্ষর-সংবলিত চতুর্দশ চরণের সমাবেশ থাকিলেই সনেট হয় না। ইহার ছন্দোবন্ধের মধ্যে একটি লক্ষণীয় বিশিষ্টতা আছে—এই বৈশিষ্ট্য অন্ত্যানুপ্রাসগত ও স্তবকবন্ধনগত। সনেটের কায়াটি ঘনপিনদ্ধ। ইহার চৌদ্দটি চরণ অষ্টপদী ও ষট্‌পদী—এই দুইটি স্তবকে বিভক্ত। এইরূপ স্তবকদ্বয়কে ইংরেজিতে যথাক্রমে বলা হয় 'Octave' ও 'Sestet'। ষট্‌পদী স্তবক অষ্টপদী স্তবকের অনুবর্তন করে, এবং উভয় স্তবক মিলিয়া একটি অখণ্ড হৃদয়ভাবকে দ্যোতিত করে। বিশেষ একটা বন্ধনের সূত্র মানিয়া না চলিলে সনেট রচনা সার্থক হইয়া উঠিতে পারে না। সনেটের মধ্যে একটা আশ্চর্য বাক্‌সংযম ও ভাবের সংহতি পরিদৃষ্ট হয়। যে-কবি স্বল্পভাষণে নিপুণ, একমাত্র তিনিই সনেট রচনার যথার্থ অধিকারী। চতুর্দশপদী কবিতার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ নানাপ্রকার বন্ধনের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই একজন বাঙালী কবি বলিয়াছেন :

'ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে—অপরে ক্রন্দন।'

মিত্রাক্ষরস্থাপনের কৌশল সনেটের লক্ষণীয় বিশিষ্টতা। ইহাতে মিত্রাক্ষর-যোজনার পদ্ধতি **সাধারণত** এইরূপ : **ক-খ-খ-ক + ক-খ-খ-ক + গ-ঘ-ঙ + গ-ঘ-ঙ**; অথবা, **ক-খ-ক-খ + ক-খ-ক-খ + গ-ঘ-গ + ঘ-গ-ঘ**, কিংবা **গ-ঘ-ঙ + ঘ-গ-ঙ**। মিত্রাক্ষর-যোজনা-বিষয়ে মধুসূদন মোটামুটি পেত্রার্কীয় রীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। চতুর্দশপদী রচনায় মধুসূদনের পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন,

প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত প্রমুখ কবি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সনেট রচনার বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ততখানি সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। কবি মোহিতলালের একটি সনেট নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

'এ নহে সে দ্রাক্ষারস, আসব শীতল— [ক]
যৌবন-যামিনীযোগে দোঁহে মুগ্ধপ্রাণ [খ]
পিয়েছিনু এক-সুখে, একটি সে গান [খ]
গুঞ্জরি স্খলিত-ভাষে, দুরাশা চপল! [ক]
একদিন আছিল যা সফেন তরল, [ক]
আজ সে যে নিরুচ্ছ্বাস! যে মধুর ঘ্রাণ [খ]
আছে কিনা দেখ দেখি? পাত্র-শেষ পান—[খ]
তবু কি সহিবে কণ্ঠে এ স্মরগরল? [ক]
গরল?—এ গ্লানি মিথ্যা জানি, তবু তারে [গ]
ঐ নামে আজো হায় বাসি সে মধুর! [ঘ]
পিপাসার জ্বালা যত, বারি সে প্রচুর [ঘ]
অধর সরস করে নয়ন-আসারে! [গ]
সেই জ্বালা নিবে আসে দেহদীপাধারে, [ঘ]
আমি গাই, তুমি শোন তারি শেষ সুর! [গ]

বাংলা ছন্দের তিনটি প্রকারভেদ

বাংলাভাষার সঙ্গে পরম ঐশ্বর্যশালিনী সংস্কৃতভাষার একটা নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া, বাংলা ছন্দের আলোচনাকালে সংস্কৃত-ছন্দের কথা মনে ওঠা স্বাভাবিক। সেজন্য সংস্কৃতছন্দ সম্পর্কে দু-একটি কথা বলিতেছি। ছন্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃতে দুইটি বিভাগ বা প্রকারভেদ দেখিতে পাওয়া যায়—**'বৃত্ত'** ও **'জাতি'**—'পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা'। বৃত্তচ্ছন্দ **অক্ষরসংখ্যা** দ্বারা নিরূপিত, আর জাতিচ্ছন্দ **মাত্রাসংখ্যা** দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ, যে-ছন্দে প্রতিটি চরণে অক্ষর বা বর্ণই প্রধান বিবেচ্য বস্তু, তাহার নাম 'বৃত্ত', এবং যে-ছন্দ মাত্রাসংখ্যার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল, তাহার নাম 'জাতি'—'বৃত্তম্ অক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ'। বৃত্তচ্ছন্দে অক্ষরবিচার বড়ো কথা, জাতিচ্ছন্দ হইতেছে মাত্রাসর্বস্ব। বৃত্তচ্ছন্দের আর-একটি নাম **অক্ষরবৃত্ত** বা **বর্ণবৃত্ত**, এবং মাত্রাচ্ছন্দের অপর একটি নাম **মাত্রাবৃত্ত**। তোটক, স্রগ্বিণী, তূণক, রুচিরা, মালিনী, পঞ্চচামর, মন্দাক্রান্তা, ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রভৃতি বৃত্তচ্ছন্দের অন্তর্গত; এবং **পজ্ঝটিকা**, আর্যা, ইত্যাদি জাতিচ্ছন্দের

অন্তর্গত। এখানে মনে রাখিতে হইবে, সংস্কৃত-ছন্দের সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে বাংলা ছন্দের **সাদৃশ্য** থাকিলেও, সংস্কৃত ও বাংলা ছন্দের **প্রকৃতি** লক্ষণীয়ভাবে **স্বতন্ত্র**। এই স্বতন্ত্রতার মূল কারণ হইল উভয় ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতি ও উচ্চারণরীতির পার্থক্য।

বাংলা ছন্দোজিজ্ঞাসায় ছন্দের তিনটি প্রকারভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। তবে এই তিনপ্রকার ছন্দের নামকরণবিষয়ে ছন্দোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা যায়। যে-তিনপ্রকারের বাংলা ছন্দের কথা বলা হইল, সেগুলি এই : [এক] **তানপ্রধান ছন্দ**; [দুই] **ধ্বনিপ্রধান ছন্দ**, এবং [তিন] **স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ**। তানপ্রধান ছন্দ 'মিশ্রপ্রকৃতিক', 'যৌগিক', 'সংকোচপ্রধান', 'অক্ষরবৃত্ত', 'অক্ষরমাত্রিক' ইত্যাদি নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাই বাংলা কাব্যের অতিপ্রচলিত **পয়ার**-জাতীয় ছন্দ—ইংরাজিতে ইহাকে বলা হয় Mixed বা Composite Metre। ধ্বনিপ্রধান ছন্দ 'বিস্তারপ্রধান', 'মাত্রাবৃত্ত', 'ধ্বনিমাত্রিক' নামেও পরিচিত—ইহাকে ইংরাজিতে বলা হয় Moric Metre। স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দকে কেউ কেউ 'বলপ্রধান', 'শ্বাসাঘাতপ্রধান', 'স্বরবৃত্ত', 'স্বরমাত্রিক' ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ইহাই তথাকথিত অতি-পরিচিত বাংলা ছড়ার ছন্দ—ইংরাজিতে যাহার নাম Stressed বা Syllabic Metre। এই তিনপ্রকার ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

[এক] তানপ্রধান ছন্দ : লয়—'ধীর'

এই ছন্দটি সুপ্রাচীন পয়ারজাতীয় ছন্দের আধারেই রচিত। তানপ্রধান ছন্দে স্বরের হ্রস্বদীর্ঘ বিচার করা হয় না, ইহাতে প্রতিটি অক্ষরকে [Syllable] এক মাত্রার ধরা হয়। কেবল কোনো শব্দের শেষে হলন্ত বা ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর থাকিলে তাহাকে দুই মাত্রার ধরাই সাধারণ রীতি। মাত্রাপদ্ধতির এই সাধারণ নিয়মটি ছাড়া, যতই যুক্তব্যঞ্জন, যৌগিক স্বর কিংবা যুগ্মধ্বনি ইহার প্রতিটি পর্বে সন্নিবেশিত হোক না কেন, উহাদের স্বরধ্বনিমূল্য সর্বত্রই হ্রস্ব, অর্থাৎ অক্ষরগুলি একমাত্রিক।

তানপ্রধান ছন্দের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ইহাতে অক্ষরধ্বনি মোটেই বড়ো কথা নয়—অক্ষরধ্বনিকে আচ্ছন্ন করিয়া একটা **টান বা তান** বা সুরের প্রবাহ ইহার চরণগুলির মধ্যে বিচিত্রভাবে খেলা করে। সুতরাং হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের কিংবা যুগ্মধ্বনির প্রসারণ-সংকোচন এই রীতির ছন্দে সহজেই ঘটিতে পারে। অক্ষরের এতখানি স্থিতিস্থাপকতা অন্যকোনো রীতির ছন্দে পরিদৃষ্ট হয় না। মৌলিক হোক, যৌগিক হোক, সকলপ্রকার অক্ষরেরই হ্রস্বতা কিংবা দীর্ঘতা ইহাতে সমগ্র পর্ব ও চরণের টান বা তানের সর্বগ্রাসী প্রভাবে বিশেষরূপে প্রভাবিত। তাই যুক্তব্যঞ্জনের গুরুভার বহনের শক্তি ইহার বিস্ময়কর। এহেতু পয়ারের চৌদ্দ বা আঠার মাত্রাকে ঠিক রাখিয়াই

তানপ্রধান ছন্দে যুক্তাক্ষরহীন একটি চরণকে অতি সহজেই যুক্তাক্ষরবহুল করিয়া তুলিতে পারা যায়। মহাপয়ারের অর্থাৎ আঠার-মাত্রা-সংবলিত পয়ারের দুইটি চরণ দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার দিকে তাকাইলে তানপ্রধান ছন্দের এই বৈশিষ্ট্যটুকু সুস্পষ্ট উপলব্ধি করা যাইবে :

[ক] 'আঁধার পাথারতলে | কার ঘরে বসিয়া একেলা
মাণিক-মুকুতা লয়ে | করেছিলে শৈশবের খেলা ?'
—দুইটি চরণেরই মাত্রাসংখ্যা আট + দশ = আঠার

অন্যদিকে :

[খ] 'উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব | পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে'।

—'খ'-চিহ্নিত চরণের মাত্রাসংখ্যাও আঠার এবং চরণের দুইটি পর্বই যুক্তাক্ষরবহুল, অথচ 'ক' উদাহরণের চরণগুলিতে একটিও যুক্তাক্ষর নাই। এইভাবে যুক্তাক্ষরহীন পর্বকে যুক্তাক্ষরবহুল করিয়া তুলিলেও যে ছন্দপতন ঘটে না কিংবা মাত্রাসংখ্যার তারতম্য হয় না, তাহার কারণ হইল, এই জাতীয় ছন্দের আবৃত্তিকালে চরণের মধ্যে একটা তানপ্রবাহের সৃষ্টি হয় ; তাহারই ফলে লঘুগুরু অক্ষরের একটা সামঞ্জস্য হইয়া যায়। তানের প্রভাবহেতু যুগ্মধ্বনি অথবা যুক্তাক্ষরের এই একমাত্রায় সংকোচন-ক্রিয়াকেই রবীন্দ্রনাথ **পয়ারের** বিস্ময়কর **'শোষণশক্তি'** বলিয়াছেন।

টান বা তানের প্রবাহ এবং দীর্ঘ পর্বের ব্যবহার ছন্দটির গতিকে মন্থর ও ধ্বনিকে গম্ভীর করিয়া তোলে—তানপ্রধান ছন্দ গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাবের সর্বোৎকৃষ্ট বাহন। এতদ্ভিন্ন ইহাতে পর্বের মধ্যে যে-কোনো মাত্রার পর ছেদ বসানো যাইতে পারে এবং ইহাতে ছেদকে যতির [অর্ধযতির কিংবা পূর্ণযতির] পারবশ্য হইতে সহজেই মুক্ত করা যায়। এইজন্য যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করিতে হইলে তানপ্রধান ছন্দেরই আশ্রয় লইতে হইবে। বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ উচ্চশ্রেণীর কবিতা ধীর-লয়-সংবলিত আভিজাত্যপূর্ণ এই তানপ্রধান ছন্দেই রচিত।

[দুই] ধ্বনিপ্রধান ছন্দ : লয়—'বিলম্বিত'

বাংলা কাব্যে ধ্বনিপ্রধান ছন্দটি সাধারণত 'মাত্রাবৃত্ত' বা 'ধ্বনিমাত্রিক' ছন্দ নামে পরিচিত—ইহার 'লয়' হইতেছে 'বিলম্বিত'। এই ছন্দে সমস্ত যৌগিক অক্ষরকেই দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক ধরা হয় এবং অপর-সব অক্ষর [Syllable] হ্রস্ব বা এক-মাত্রার বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু মাত্রা-সম্পর্কিত এই নিয়মের যে কোনো ব্যতিক্রম হইতে পারে না, তাহা নয়। কেন-না, অনেক সময় ইহাতে মৌলিক স্বরেরও [যাহা সাধারণত হ্রস্ব অর্থাৎ এক-মাত্রার] দীর্ঘীকরণ হইয়া থাকে। ধ্বনিপ্রধান অর্থাৎ 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দ সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো কথা হইল, ইহাতে চরণের অন্তর্গত পর্বগুলিতে

প্রতিটি অক্ষরধ্বনিই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং এইপ্রকার ছন্দে প্রত্যেকটি অক্ষরের উচ্চারিত ধ্বনিপরিমাণের দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হয়। স্পষ্টোচ্চারিত ধ্বনিগুলি হইতেই মাত্রার পরিমাণ ঠিক করিতে হয় বলিয়া এই ছন্দটিকে বলে ধ্বনি-প্রধান বা ধ্বনিমাত্রিক ছন্দ। বাংলা মাত্রাবৃত্ত-রীতির ছন্দে মাত্রার হিসাব মোটামুটি এইরূপ: একই শব্দের অন্তর্গত যুক্তব্যঞ্জনের পূর্বস্বর দীর্ঘ, হলন্ত বা ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের স্বর দীর্ঘ, অনুস্বার ও বিসর্গের পূর্বস্বর দীর্ঘ এবং ঐ ঔ স্বর-দুইটি দীর্ঘ—বাকী স্বরগুলি হ্রস্ব অর্থাৎ এক-মাত্রিক।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে: তানপ্রধান ছন্দেও প্রতিটি পর্বে মাত্রার পরিমাণটি ঠিক রাখিতে হয়, উভয়েই তো মাত্রসমক-জাতীয়—তাহা হইলে, তানপ্রধান ছন্দের সঙ্গে ধ্বনিপ্রধান ছন্দের পার্থক্য কোথায়? উত্তরে বলিতে হইবে, **প্রথমত,** মাত্রাবৃত্তে সমস্ত যুগ্মধ্বনিই দীর্ঘ, কিন্তু 'অক্ষরবৃত্ত' বা তানপ্রধান ছন্দে যুগ্ম-ধ্বনি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হ্রস্ব এবং ওইগুলিকে একমাত্রার ধরা হয়। যেমন, 'একি **কৌ**তুক | নিত্য নতুন | ওগো **কৌ**তুক- | ময়ী'—এই চরণে প্রথম ও তৃতীয় পর্বের '**কৌ**'-ধ্বনি দীর্ঘ বা দ্বিমাত্রিক; অন্যদিকে 'ফেরে দূরে, মত্ত সবে / উৎসব-**কৌ**তুকে'—এই চরণে দ্বিতীয় পর্বের '**কৌ**'-ধ্ব নি হ্রস্ব বা এক-মাত্রিক। উদ্ধৃত প্রথম চরণটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ও দ্বিতীয় চরণটি অক্ষরবৃত্ত অর্থাৎ পয়ারজাতীয় ছন্দে রচিত।

দ্বিতীয়ত, মাত্রাবৃত্তে প্রাধান্য লাভ করে প্রতিটি স্পষ্ট-উচ্চারিত অক্ষরের ধ্বনি-পরিমাণ। কিন্তু অক্ষরবৃত্তে [অর্থাৎ তানপ্রধান ছন্দে] অক্ষরের **ধ্বনিকে** আচ্ছন্ন করিয়া টান বা তানের একটি প্রবাহ সমগ্র চরণের মধ্যে প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। **এই তানপ্রবাহটি মাত্রাবৃত্তে থাকে না**, সেজন্য এই ছন্দে পয়ারের পূর্ব-কথিত সেই **শোষণশক্তি নাই**। অক্ষরের **দীর্ঘীকরণের** দিকে **ঝোঁকটি** তুলনায় মাত্রাবৃত্তে বেশী। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অনেক ক্ষেত্রেই মৌলিক স্বরকে [যাহা স্বভাবতই হ্রস্ব] টানিয়া দীর্ঘরূপে উচ্চারণ না করিলে ছন্দপতন যে অনিবার্য, নিম্নের উদাহরণগুলি হইতেই তাহার সত্যতা উপলব্ধ হইবে:

[ক] দেশ দেশ | নন্দিত করি | মন্দ্রিত তব | ভেরী,
আসিল যত | বীরবৃন্দ | আসন তব | ঘেরি।

[খ] পতন-অভ্যুদয় | -বন্ধুর পন্থা | যুগ যুগ **ধা**বিত | **যা**ত্রী,
হে চির **সা**রথী | তব রথচক্রে | মুখরিত পথ দিন | **রা**ত্রি।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, অক্ষরবৃত্তের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে **তানের বিস্তার,** আর মাত্রাবৃত্তের বিশিষ্টতা হইতেছে **ধ্বনির বিস্তার** বা প্রসারণ, অর্থাৎ

স্বরধ্বনিগুলিকে আবশ্যকমতো **সুদীর্ঘ করিয়া** টানিয়া টানিয়া আবৃত্তি করা। এই দিক হইতে মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে আমরা **বিস্তারপ্রধান ছন্দ** নামেও অভিহিত করিতে পারি। তানপ্রধান ছন্দে অধিক মাত্রাসংবলিত যতখানি দীর্ঘ পর্ব সন্নিবেশিত করা যায়, ধ্বনিপ্রধান ছন্দে তত দীর্ঘ পর্বের ব্যবহার করিতে পারা যায় না, এবং ইহাতে লয় [Cadence]-পরিবর্তনও বেশী চলে না। তানপ্রধান ছন্দ স্বভাবতই উদাত্ত-গম্ভীর, ধ্বনিপ্রধান ছন্দ প্রায়শই ললিত-মধুর—এইজন্য উচ্ছল গীতিস্পন্দিত কবিতা রচনা করিতে হইলে বাঙালী কবিরা ধ্বনিপ্রধান ছন্দটিকেই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। গীতি-কবিতার যাদুকর রবীন্দ্রনাথের হাতে ধ্বনিপ্রধান ছন্দটি বিস্ময়কর সংগীতস্পন্দনে ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে।

[তিন] স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ : লয়—'দ্রুত'

আপাতদৃষ্টিতে স্বরধ্বনির পরিমিত সংখ্যার উপর যে-ছন্দের পর্বগুলি নির্ভরশীল এবং প্রতিটি পর্বের স্বরধ্বনি গণনা করিলে মাত্রাবিষয়ে যাহার মোটামুটি একটা হিসাব পাওয়া যায়, বাংলার প্রচলিত ছন্দোশাস্ত্রে তাহাই 'স্বরমাত্রিক' ছন্দ নামে পরিচিত। কিন্তু আধুনিক দু'একজন ছন্দোবিজ্ঞানী ইহাকে 'স্বরাঘাতপ্রধান' ছন্দ নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমাদের গ্রাম্যছড়া ও অধিকাংশ লৌকিক কাব্য-সাহিত্য এই ছন্দটিতেই রচিত বলিয়া ইহাকে 'ছড়ার ছন্দ' এবং 'লৌকিক ছন্দ'-ও বলা হয়।

প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে, স্বরধ্বনির প্রাধান্যই এই রীতির ছন্দের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়—এমন কি, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে, প্রধান বৈশিষ্ট্যও নয়। কেন-না, অনেক সময় স্বর গণনা করিয়া ইহাতে অপেক্ষিত মাত্রার হিসাবটি মিলে না। তা ছাড়া, তানপ্রধান ছন্দেও স্বরধ্বনির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইবে। আবার, অক্ষরের হ্রস্বীকরণ বা দীর্ঘীকরণ-বিষয়েও এই জাতীয় ছন্দের সঙ্গে তানপ্রধান কিংবা ধ্বনিপ্রধান ছন্দের খুব বড়ো রকমের কোনো পার্থক্য নাই। তাহা হইলে স্বরমাত্রিক ছন্দের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কী? ইহার বিশিষ্টতা হইতেছে, ইহাতে প্রতি চরণের প্রত্যেকটি পর্বের প্রথমে একটি **প্রবল শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাত পড়ে**। এই শ্বাসাঘাতের [Stress] ফলে পর্বস্থিত শব্দের হলন্ত অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর সংকুচিত বা হ্রস্ব হইয়া উচ্চারিত হয়। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দে হলন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরাই রীতি। শ্বাসাঘাত বা প্রস্বরের এই বিশেষ শক্তিই স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দকে একটা লক্ষণীয় বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। মাত্রাবৃত্ত কিংবা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পর্বগুলি যে একেবারে শ্বাসাঘাতহীন, এমন কথা অবশ্য নিশ্চয়ই কেহ বলিবেন না; তবে স্বরবৃত্ত ছন্দে শ্বাসাঘাতের **প্রাবল্য** তুলনায় অনেক বেশী। এইজন্য ইহার পর্বগুলিকে 'syllabic' না বলিয়া 'stressed' বলাই সমীচীন।

আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে যে, এই ছন্দে সাধারণত প্রতি পর্বে চারি মাত্রা ও দুইটি পর্বাঙ্গ থাকে, এবং প্রতি চরণে প্রায়শই চারিটি করিয়া পর্ব থাকে ও শেষের পর্বটি সাধারণত অপূর্ণ হয়। যেমন ঃ

[ক] 'মৃত্যুকে যে | এড়িয়ে চলে | মৃত্যু তারেই | টানে,
মৃত্যু যারা | বুক পেতে লয় | বাঁচতে তাঁরাই | জানে।'

[খ] 'বাপ্ শুনে কয় | বুক ফুলিয়ে. | গর্ব করি | -নেকো,
কিন্তু তবু | আমার মেয়ে | সেটা স্মরণ | রেখো।'

[গ] 'ওই সিন্দুর টিপ্ | সিংহল দ্বীপ | কাঞ্চনময় | দেশ।
ওই চন্দন যার | অঙ্গের বাস | তাম্বুল বন | কেশ।
যার উত্তাল তাল | কুঞ্জের বায় | মন্থর নিঃ | শ্বাস!
আর উজ্জ্বল যার | অম্বর আর | উচ্ছল যার | হাস!'

ছন্দের ঐন্দ্রজালিক রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'পলাতকা'-কাব্যে দুই হইতে পাঁচটি [এমন কি, ছয়টি] পর্যন্ত পর্ব এক-একটি চরণে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং ঐ কাব্যেই স্বরাঘাত-প্রধান ছন্দের অন্তর্নিহিত শক্তির চরম প্রকাশ হইয়াছে। বাংলাভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণরীতি এই ছন্দেই বেশী বজায় থাকে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রতিটি পর্বের প্রথমে শ্বাসাঘাতের পুনরাবৃত্তি হয় বলিয়া ইহার বৈচিত্র্য অধিক নয়। বেশী মাত্রার পর্ব ইহাতে মোটেই চলে না, এবং দীর্ঘস্বরের প্রতি ইহার একটা বিমুখতার ভাব আছে। স্বরধ্বনিকে ছাপাইয়া অতিরিক্ত যে-একটি স্বরের টান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে আত্মপ্রকাশ করে, স্বরবৃত্ত ছন্দে তাহা নাই।

বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান

রবীন্দ্রনাথের অত্যাশ্চর্য সৃজনীপ্রতিভা বাংলা কাব্যসাহিত্যকে সহস্র বছরের পরমায়ু দান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কেবল কবিশিল্পী নহেন, তিনি একাধারে কবি এবং শিল্পী—বাংলা ছন্দোশিল্পে তাঁহাকে অতুলনীয়ই বলিতে হইবে। কবিগুরুর কাব্যসরস্বতী সহস্রদল ছন্দকমলের উপরেই নিত্য বিরাজমানা। বাণীর রূপমূর্তি-

রচনের ক্ষেত্রে এত বড়ো প্রতিভা জগতের সাহিত্যে সত্যই বিরলদৃষ্ট। বাংলা ছন্দের ধ্বনিগৌরব, সংগীতমাধুর্য, স্বরপ্রবাহ ও ব্যঞ্জনাশক্তি কতখানি বিপুলব্যাপ্ত, নিজের রচিত কাব্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ তাহার উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। বাংলা ভাষায় শব্দধ্বনির স্বরূপপ্রকৃতির নিবিড়তম পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই কবি-গুরু এমন করিয়া ছন্দের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের কাব্য-ছন্দে তিনি যুগান্তর আনিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার পূর্বেও বাংলা কাব্যে দুইজন বড়ো ছন্দো-শিল্পীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল—ইহাদের একজন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, অন্যজন মহাকবি শ্রীমধুসূদন। কিন্তু তাঁহাদের কাহারো প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের মতো নবনব-উন্মেষশালিনী ছিল না—তাঁহাদের প্রতিভার প্রকাশ ঘটিয়াছিল ছন্দের এক-একটি বিশেষ ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রপ্রতিভার অজস্র দানে বাংলা ছন্দের ভাণ্ডার বিচিত্র ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

অবিসংবাদিতভাবে না হইলেও, বর্তমানে বাংলা ছন্দে তিনটি প্রকারভেদ স্বীকৃত হইয়াছে—**অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত**। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর সংগীত-রচন-প্রতিভা ছন্দের এই ব্যাপক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাবিচরণ করিয়াছে। অক্ষরবৃত্ত বাংলাকাব্যে বহুকাল-প্রচলিত একটি বনিয়াদি ছন্দ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী সময়ে **অক্ষরবৃত্ত-জাতীয় ছন্দগুলি** অভ্রান্ত ধ্বনিপরিমাণের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া উঠে নাই—ইহাদের মধ্যে তখন পর্যন্ত পরিপাটি গঠনসৌষ্ঠব ছিল না। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে, এই ছন্দটিতে যুক্তাক্ষর ব্যবহারের ক্ষেত্রে সে-যুগের কবিদলের দ্বিধাসংশয়। 'মানসী'-র যুগ হইতেই কবিগুরু বাংলা যুক্তাক্ষরের ধ্বনিপ্রকৃতিটি আবিষ্কার করিলেন এবং যুক্তাক্ষরের নিপুণ প্রয়োগে তাঁহার হাতেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দ সুষমামণ্ডিত হইয়া সর্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতা লাভ করিল। পরবর্তীকালে ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ তানপ্রধান ছন্দে [অক্ষরবৃত্ত ছন্দে] যে-সমস্ত কবিতা রচনা করিয়াছেন, সুরে-সংগীতে ও ধ্বনিসৌষম্যে তাহা অতুলনীয়।

বাংলা **মাত্রাবৃত্ত** [ধ্বনিপ্রধান] ছন্দেও রবীন্দ্রনাথের দানের তুলনা নাই। ছন্দতত্ত্ব ধ্বনিতত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীনকালের বাঙালী কবিরা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অজস্র কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই জাতীয় ছন্দে যুগ্মধ্বনি কিংবা হলন্ত অক্ষরের মাত্রাপরিমাণ সম্পর্কে তাঁহাদের কোনো সুনিশ্চিত ধারণা ছিল না। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম **অযুগ্মধ্বনিকে একমাত্রিক এবং যুক্তবর্ণ ও হলন্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরিয়া** ছন্দ-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন—'মাত্রিক পর্ব' বা 'quantitative measure'-এর প্রবর্তন করিয়া তিনি বাংলা ছন্দে একটি নূতন ধারার সূত্রপাত করিলেন।

কবিগুরুর ধ্বনিবোধ ছিল আশ্চর্যরকমে প্রখর—বাংলা অক্ষরধ্বনির মূল প্রকৃতির মর্মস্থলে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করিলেন যে, সংস্কৃত ছন্দের মাত্রাপদ্ধতি অনুসারে বাংলা ছন্দের মাত্রানিরূপণ করা যাইবে না। কেন-না, দুইটি ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতিই বিভিন্ন—সংস্কৃত অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের যথাযথ উচ্চারণ বাংলাভাষার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। বাংলাভাষায় দীর্ঘধ্বনির অভাবটি রবীন্দ্রনাথ মোচন করিলেন যুক্তবর্ণ তথা যুগ্মধ্বনির সুনিপুণ ব্যবহারে। যুক্তবর্ণের পর্যাপ্ত প্রয়োগে ছন্দ ধ্বনিতরঙ্গে কতখানি যে স্পন্দিত হইয়া উঠে, রবীন্দ্রনাথের মাত্রাবৃত্তজাতীয় ছন্দে রচিত ['মানসী' কাব্যের সময় হইতে] কবিতাগুলি হইতেই তাহার সাক্ষ্যপ্রমাণ মিলিবে। বাংলাকাব্যের নিজস্ব রীতির মাত্রাবৃত্ত ছন্দটি রবীন্দ্রনাথেরই আবিষ্কার।

বর্তমানে বাংলা কবিতায় যে-ছন্দটি 'স্বরবৃত্ত' [শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ] নামে পরিচিত, তাহার একটি প্রচলিত নাম 'ছড়ার ছন্দ'। পূর্বে পল্লীসংগীতে, গ্রাম্য ছড়াতে ও লোকসাহিত্যে হাল্‌কা ভাবের রচনায় এই ছন্দটি প্রায়শ প্রযুক্ত হইত। উচ্চভাবের রচনায় এই ছন্দ কতখানি ব্যবহারযোগ্য, এ বিষয়ে প্রাচীন যুগের কবিরা সংশয়মুক্ত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের ছন্দোনির্মাণশক্তির ঐন্দ্রজালিক প্রভাবেই প্রাকৃত বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণরীতি ও ঝোঁক-এর [Stress বা Respiratory Accent] উপর প্রতিষ্ঠিত 'ছড়ার ছন্দ'টি বর্তমান বাংলা কাব্যসাহিত্যে একটা অভাবনীয় আভিজাত্য অর্জন করিয়াছে। স্বরবৃত্ত ছন্দে পর্বঘটিত অপূর্ব বৈচিত্র্যও আনিলেন রবীন্দ্রনাথ। পূর্বে এই ছন্দে কেবল অপূর্ণ চতুষ্পর্বিক বা দ্বিপর্বিক চরণেরই প্রয়োগ হইত। কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলির দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে, অজস্র ক্ষেত্রে উহাদের মধ্যে পূর্ণ ও অপূর্ণ দ্বিপর্বিক, ত্রিপর্বিক, চতুষ্পর্বিক ও পঞ্চপর্বিক চরণ রহিয়াছে। সুতরাং **শ্বাসাঘাত বা স্বরাঘাতপ্রধান [অর্থাৎ স্বরবৃত্ত] ছন্দের ক্ষেত্রেও** রবীন্দ্রনাথের দান অসামান্য। কবির 'পলাতকা'র ছন্দের সঙ্গে প্রত্যেক বাঙালী কাব্যপাঠকই বিশেষভাবে পরিচিত।

রবি-কবি **নবতন পরিপাটীর** [pattern] **পর্ব, চরণ ও স্তবকগঠনে অসাধারণ ছন্দোশক্তির পরিচয় দিয়াছেন**। প্রাচীন বাংলা কবিতা পয়ার-জাতীয় দ্বিপদী ও লাচাড়িজাতীয় ত্রিপদী ছন্দোবন্ধের [Metrical Structure] সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, এবং সে-যুগের কবিতায় পর্ববন্ধ [চরণগঠন] ও পদবন্ধের [স্তবকগঠন] ক্ষেত্রে তেমন কোনো বৈচিত্র্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়কর বিচিত্র কৌশলে ছন্দে যতিস্থাপন করিয়া কত রকমের যে পর্বগঠন করিয়াছেন এবং কবিতার চরণে উহা সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহার সীমাপরিসীমা

নাই। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ভিত্তি করিয়া তিনি **সমিল প্রবহমাণ পয়ার** সৃষ্টি করিলেন। তাছাড়া, সমিল ও অমিল মহাপয়ারের [আঠার-মাত্রা-সম্বলিত পয়ারের] স্রষ্টাও রবীন্দ্রনাথ। 'বলাকা'-কাব্যগ্রন্থে প্রযুক্ত 'মুক্তক' ছন্দের আবিষ্কার রবীন্দ্রনাথের এক অবিস্মরণীয় ছন্দ-কীর্তি। **গদ্যের পর্ব বা পদ লইয়া পদ্যের গঠনরীতির নবতন আদর্শে ছন্দোবন্ধসৃষ্টির কৌশলটিও** সর্বপ্রথম দেখাইলেন রবীন্দ্রনাথ—তাঁহার 'লিপিকা' গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ স্বকৃত 'পুনশ্চ', 'শেষ সপ্তক' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে 'মুক্তবন্ধ' ছন্দের আদর্শে যে-কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যেই **'গদ্যকবিতা'**-র যথার্থ স্বরূপপরিচয়টি মিলিবে।

এককথায়, বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-রচন-প্রতিভা অতুলনীয়। আমাদের সাহিত্যে তিনি কেবল কাব্যগুরু নহেন, তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছন্দোগুরুও বটেন। বর্তমান আলোচনার সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে তাঁহার অসামান্য ছন্দোপ্রতিভার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। এখানে আমরা কেবল-মাত্র তাঁহার প্রবর্তিত ছন্দের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সামান্য পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বাংলা কবিতার ছন্দ কী অপূর্ব ধ্বনিতরঙ্গে [Rhythm] স্পন্দিত এবং কী বিস্ময়কর সুরমাধুর্যে [Melody] বিলসিত, রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'-র পরবর্তী যে-কোনো কাব্যগ্রন্থের পাতা খুলিলেই ছন্দরসিক পাঠক তাহার সম্যক পরিচয় পাইবেন।*

[* বাংলা কবিতার ছন্দ-সম্পর্কিত এই অধ্যায়টি রচনাকালে আমি যে-কয়েকটি গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি, ঐগুলির নাম: 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র', 'ছন্দোবিজ্ঞান', 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ', 'বাংলা কবিতার ছন্দ'—এইসব গ্রন্থের লেখকের নাম সর্বজনপরিচিত।]

অলংকার-প্রকরণ

সাহিত্যস্রষ্টার যে-রচনকৌশল কাব্যের শব্দধ্বনিকে শ্রুতিমধুর এবং অর্থধ্বনিকে রসাপ্লুত ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তোলে, তাহাকেই বলা হয় অলংকার। এখানে মনে রাখিতে হইবে, কাব্য বলিতে শুধু ছন্দে গ্রথিত বিশেষ একপ্রকারের রচনাকেই বুঝিবার কোনো কারণ নাই—গদ্যরচনাও কাব্যের ব্যাপক অর্থের অন্তর্গত। বিবিধ ভূষণ যেমন রমণীদেহের সৌন্দর্যবর্ধক, তেমনি শব্দালংকার এবং অর্থালংকারও কাব্যের সৌন্দর্যবর্ধনকারী। "সংস্কৃতে 'অলম্' শব্দের এক অর্থ ভূষণ; অতএব অলম্ বা-ভূষণ করা হয় যাহা দ্বারা, তাহাই অলংকার। অলংকার-শব্দের ব্যাপক অর্থ তাই সৌন্দর্য, সংকীর্ণ অর্থ—অনুপ্রাস-উপমা প্রভৃতি বিশিষ্ট অলংকার-বস্তু। সংস্কৃতে 'অলম্' শব্দের অন্য প্রসিদ্ধ অর্থ হইতেছে 'পর্যাপ্তি'—প্রাচুর্য বা পরিপূর্ণতা। অলম্ অর্থাৎ পর্যাপ্তি বা পরিপূর্ণতা করা হয় যাহা দ্বারা [অলম্—কৃ+ঘঞ্—করণ বাচ্য] তাহাই অলংকার। বস্তুর পর্যাপ্তি বা পূর্ণতা সিদ্ধ হয় যাহা দ্বারা, যাহাতে তাহার স্বরূপ প্রকাশ বা আত্ম-ধর্মের পরিপুষ্টি, তাহাই তাহার অলংকার।"

রমণীদেহের ক্ষেত্রে অলংকার বাইরের জিনিস, কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে অলংকার সম্পর্কে সে-কথা বলা চলে না—কাব্যের আন্তর সত্তার সঙ্গে ইহার যোগ অবিচ্ছিন্ন। ভাষায় অলংকারপ্রয়োগের ক্ষেত্রে উত্তম কবিকে আলাদা করিয়া কোনো শ্রমস্বীকার করিতে হয় না, কবির কাব্যের ভাবকল্পনার সঙ্গে ইহার ভাষা এবং অলংকার এক-প্রযত্নেই সিদ্ধ হয়। অলংকারপ্রয়োগের জন্য কবিকে কিংবা সাহিত্যস্রষ্টাকে যদি স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিতে হইত, তাহা হইলে জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকবৃন্দ এত অজস্র সাহিত্য কখনও সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেন না।

'আত্মভূত বা অঙ্গভূত সৌন্দর্যই প্রকৃত অলংকার। কাব্যে উহা যেখানে থাকে সেখানে কাব্যের আত্মা বা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়াই থাকে—খেয়ালখুশিমতো তাহার হরণপূরণ অথবা যোগবিয়োগ করা চলে না। ইহা যেখানে সজ্জা বা equipment মাত্র, সেখানে কাব্যদেহের পক্ষে অত্যাবশ্যক বা essential হইয়াই দেখা দেয়।……রস নিজেকে মূর্ত করিতে যাইয়া রূপসৃষ্টির পথে অলংকারকে আকর্ষণ করে, এবং অলংকার যেন রসের রূপে-পরিণতির পথে স্বয়ং স্ফূর্ত হয়। অতএব, রস ও অলংকার মহাকবির এক-প্রযত্ন দ্বারাই সিদ্ধ হয়। অলংকার, কাব্য রচনার পর কবির ভিন্ন প্রযত্ন দ্বারা কাব্যদেহে আরোপিত হয় না—অতএব বলয়কুণ্ডলের ন্যায় উহা সৌন্দর্য-উৎকর্ষ-হেতু বহির্ভূষণ-মাত্র নহে।' যথার্থ অলংকার কবিভাষা—কাব্যের ভাষা ছাড়া অন্যকিছু নয়।

কাব্য শব্দার্থময়, এই হেতু অলংকারও দ্বিবিধ—শব্দালংকার এবং অর্থালংকার। কাব্যের যে-গুণ শব্দের বৈচিত্র্যসম্পাদন করে, উহাকে বলে শব্দালংকার। আর, যে-গুণ অর্থকে মনোরম এবং রসমধুর করিয়া তুলিবার সহায়তা করে, উহাকে বলে অর্থালংকার। বস্তুত সুপ্রযুক্ত অর্থালংকারই প্রথমশ্রেণীর কবির চিত্তহারী কল্পনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টিকে বিশ্লেষ করিলেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। সার্থক অলংকারসৃষ্টির জন্য কবিকে বিশ্বসৃষ্টিশালার বিচিত্র রূপমঞ্চের দিকে প্রতিনিয়ত আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হয়। তাই কবিকল্পনার পাখায় ভর করিয়া কবির সঙ্গে পাঠকের চিত্তও বিশ্বভ্রমণে বাহির হইয়া পড়ে। অলংকারশাস্ত্রে নানাবিধ অলংকারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা মাত্র সামান্য কয়েকটি অলংকারের আলোচনা করিব।

শব্দালংকার

শব্দের বহিরঙ্গ ধ্বনিকে আশ্রয় করিয়া শব্দালংকার আত্মপ্রকাশ করে—ইহা বাক্যের অর্থের উপর নির্ভরশীল নহে। যেহেতু শব্দের বিশিষ্ট ধ্বনিরূপই শব্দালংকারের প্রাণবস্তু, সেহেতু শব্দের পরিবর্তনে ইহার বিশেষ সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। শুধু তাহা নয়, এই শব্দগত-বৈচিত্র্যহীনতার জন্য অলংকারও সম্ভব হয় না। প্রধান শব্দালংকার হইতেছে পাঁচটি : [১] ধ্বন্যুক্তি বা ধ্বনিবৃত্তি, [২] অনুপ্রাস, [৩] যমক, [৪] শ্লেষ, [৫] বক্রোক্তি।

[১] **ধ্বন্যুক্তি বা ধ্বনিবৃত্তি :** 'বর্ণ বা শব্দ বা বাক্যের ধ্বনিরূপ দিয়া অর্থের উক্তি অর্থাৎ আভাসে প্রকাশ হইলে, সেই বিশিষ্ট সৌন্দর্যের নাম ধ্বন্যুক্তি অলংকার। ইহাতে ভাবানুকারী যে-কোনো প্রকার উৎকৃষ্ট বর্ণের প্রয়োগ হইলেই চলে—**বর্ণের পুনরাবৃত্তি একান্ত আবশ্যক নহে**। শব্দ বা বাক্য শুনিলেই কানের তৃপ্তির সহিত যখন চিত্তে অর্থের ব্যঞ্জনা হয়, স্পষ্ট অর্থোপলব্ধি হয়তো পরে আসে, তখনই এই অলংকারের সৃষ্টি।' ইহাতে ভাবকে দ্যোতিত করে ধ্বনি—'sound echoing the sense', এবং রচনার এই বিশিষ্ট কৌশলের দ্বারা যে-অলংকারের সৃষ্টি হয়, ইংরেজিতে তাহাকে বলে 'Onomatopoeia'। শব্দের ধ্বনি ভাবের কতখানি অনুকারী হইতে পারে, নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণ হইতে তাহার প্রমাণ মিলিবে :

[ক] 'চর্‌কার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর ঘর।
ঘর ঘর ক্ষীর-সর—আপনার নির্ভর!'

—দুইটি মাত্র চরণের মধ্য দিয়া চর্‌কার ঘর্ঘরধ্বনির তালটি কী চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে!

[খ] 'গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে
ধূসরের ঊষরের কর তুমি অন্ত।'
—হরিণী ও ঝর্ণার লাস্যময় গতির আভাস দিতেছে।

[গ] 'নদীর জল অবিরল চল চল, চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসেতে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্তে ডাকিতেছে।'

[ঘ] 'তেপান্তরে লাগ্‌ল আগুন—ছুব্‌লে আকাশ খুব্‌লে নিলে আঁখি,
সৃষ্টিখানার ঝুঁটি ধরে কোন্ সে দানো দিচ্ছে কোথা ঝাঁকি।'
আবার কোথায় রোদ উঁকি দেয় পাতার চিকের ফাঁকে,
কাঠবেড়ালীর চমক লাগে বনশালিকের ডাকে।'

[ঙ] 'দে দোল্ দোল্, দে দোল্ দোল্,
এ মহাসাগরে তুফান তোল।
উড়ে কুন্তল উড়ে অঞ্চল, উড়ে বনমালা বায়ুচঞ্চল,
বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিণী মত্ত বোল,
দে দোল্ দোল্।'

[২] **অনুপ্রাস** : একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পুনঃপুনঃ বিন্যাসের দ্বারা বাক্যে সৌন্দর্যসম্পাদিত হইলে অনুপ্রাস অলঙ্কার হয়। বাক্যে বিন্যস্ত শব্দের ধ্বনিসাম্য [similarity of sound] এবং উহাদের অদূরে অবস্থান অনুপ্রাসের বিশিষ্টতা। অনুপ্রাসকে ইংরেজিতে বলা হয় 'Alliteration'। উদাহরণ :

[ক] 'গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে
গরজে গগনে।'

[খ] 'রজনীগন্ধা বাস বিলালো, সজনী সন্ধ্যা আস্‌বি না লো ?'

[গ] 'নন্দপুরচন্দ্রবিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।'

[ঘ] 'অশোক রোমাঞ্চিত মঞ্জরিয়া দিল তার সঞ্চয় অঞ্জলিয়া।
মধুকরগুঞ্জিত কিশলয়পুঞ্জিত উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া।'

[ঙ] 'কেতকীকেশরে কেশপাশ কর স্বরভি।'

[চ] 'ঝর্ণা! ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা চন্দনবর্ণা!'

এই শেষের উদাহরণটিকে 'ধ্বন্যুক্তি' অলংকারের দৃষ্টান্তহিসাবেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে কি 'অনুপ্রাস' আর 'ধ্বন্যুক্তি'-র মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নাই ? নিশ্চয়ই আছে। এই পার্থক্য হইতেছে, 'ধ্বন্যুক্তিতে অনুপ্রাসাদি শব্দালংকার থাকিতে পারে এবং সাধারণত থাকে। কিন্তু অনুপ্রাসের সৌন্দর্য **বিভিন্ন শব্দাংশের ধ্বনিসাম্যে,** আর ধ্বন্যুক্তির সৌন্দর্য **বাক্যের সমগ্র ধ্বনিদ্বারা মূল অর্থের দ্যোতনায়।** তা ছাড়া, রসানুকূল যে-কোনো প্রকার উৎকৃষ্ট বর্ণপ্রয়োগেই ধ্বন্যুক্তি

হইতে পারে, কিন্তু অনুপ্রাস হইবার জন্য বিভিন্ন শব্দের বর্ণসাম্য চাই।' এই কথাগুলি মনে রাখিলেই দুইটি অলংকারের মধ্যে পার্থক্যটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

[৩] **যমক** : একই শব্দ [সমোচ্চার্য শব্দও হইতে পারে] বাক্যমধ্যে **দুই** বা ততোধিকবার ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইলে 'যমক' অলংকার হয়। উদাহরণ :

[ক] 'ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে।'—ঘন = নিবিড় ; ঘন = মেঘ।

[খ] 'কাজ কি বাসে ? কাজ কি বাসে ?
কাজ কেবল সেই পীতবাসে,
সেথা যার হৃদয় বাসে
সে কি বাসে বাস করে ?'

এই উদাহরণে 'বাস' কথাটি তিনটি ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে : গৃহ, বস্ত্র এবং বাস করা।

[গ] 'নামজাদা লেখকদেরও বই বাজারে কাটে কম, কাটে বেশী পোকায়।' —এখানে প্রথম 'কাটে'-র অর্থ বিক্রী হয়, দ্বিতীয় 'কাটে'-র অর্থ নষ্ট করিয়া ফেলে।

[ঘ] 'প্রভাকর-প্রভাতে প্রভাতে মনোলোভা।'

—প্রভাতে = জ্যোতিতে ; প্রভাতে = প্রভাতবেলায় : 'প্রভাকর' কথাটির অর্থ হইল সূর্য ; মনোলোভা = চিত্তচমৎকার।

[ঙ] 'কোথা হা হন্ত, চির-বসন্ত, আমি বসন্তে মরি।'
— বসন্ত = বসন্তঋতু ; বসন্ত = বসন্তরোগ।

[চ] 'আনা-দরে আনা যায় কত আনারস।'
—আনা-দরে = চারি পয়সা মূল্যে ; আনা = কেনা।

[ছ] 'কাজ কি গোকুল ? কাজ কি গো কুল ?
ব্রজকুল সব হোক প্রতিকূল—'

[৪] **শ্লেষ** : কোনো শব্দ বাক্যমধ্যে **একবার-মাত্র প্রযুক্ত হইয়া** বিভিন্ন অর্থ দ্যোতিত করিলে 'শ্লেষ' অলংকার হয়। এখানে শব্দ একটি, উহার প্রয়োগ একবার, কিন্তু দুইটি অর্থ বাচ্য। সুতরাং এই অলংকারে শব্দটির পরিবর্তন সম্ভবপর নয়, ইহাতে শব্দের ধ্বনিরূপই প্রধান। উদাহরণ :

[ক] 'কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর,
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।'

এখানে 'ঈশ্বর', 'গুপ্ত', 'প্রভাকর' কথাগুলি লক্ষণীয়, ইহাদের সুনিপুণ প্রয়োগেই শ্লেষ-এর সৃষ্টি হইয়াছে। চরণ-দুইটির **প্রথম অর্থ** হইল : 'যাঁহার প্রভায় [জ্যোতিতে] প্রভাকর [সূর্য] আলোকিত, সেই ঈশ্বর অর্থাৎ ভগবানকে গুপ্ত কে বলিবে!' **দ্বিতীয় অর্থ** হইল : 'যাঁহার প্রভায় [প্রতিভায়] 'প্রভাকর' [কবি ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদিত পত্রিকার নাম] প্রকাশিত হইয়াছে, সেই ঈশ্বর [ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত]-কে গুপ্ত [অখ্যাতনামা] কে বলে ?'

[খ] 'পূজাশেষে কুমারী বললে : ঠাকুর, আমাকে একটি মনের মতো বর দাও।' —এখানে 'বর' কথাটির এক অর্থ 'স্বামী', অপর অর্থ 'আশীর্বাদ'।'

[গ] 'আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে,
এনেছে তোমার স্বামী বাঁধি নিজগুণে।'

—সুন্দরী যুবতীর রূপধারিণী দেবী চণ্ডী আত্মপরিচয় দিতে যাইয়া কালকেতু-ব্যাধের পত্নী ফুল্লরাকে বলিতেছেন যে, ফুল্লরার স্বামী নিজ 'গুণে' অর্থাৎ আপন স্বভাবের চমৎকারিত্বেই তাঁহাকে [চণ্ডীকে] গৃহে লইয়া আসিয়াছেন। ইহার **অন্য-একটি অর্থ** আছে, তাহা এই : বনে শিকার করিতে যাইয়া সোনার গোসাপের রূপধারিণী চণ্ডীকে কালকেতু-ব্যাধ নিজের ধনুকের ছিলায় [গুণে] বাঁধিয়াই বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। তৎপর সুযোগ বুঝিয়া স্বর্ণগোসাপরূপিণী চণ্ডী সুন্দরী যুবতীনারীর মূর্তি ধারণ করেন।

যমক ও শ্লেষের মধ্যে পার্থক্য হইল, যমকে একটি শব্দ **ভিন্নার্থে দুইবার** বা দুইয়ের অধিকবার ব্যবহৃত হয়, আর শ্লেষে একই শব্দ **বিভিন্ন অর্থে একবার**-মাত্র প্রযুক্ত হয়।

[৫] **বক্রোক্তি :** 'রচনার সৌন্দর্যপ্রকাশের উদ্দেশ্যে বক্রতা বা মনোহর ভঙ্গির দ্বারা উক্তি সম্পন্ন হইলে বক্রোক্তি অলংকার হয়।' অথবা বলা যায়, 'কোনো কথার যে অর্থটি বক্তার অভিপ্রেত, সে-অর্থটি না ধরে শ্রোতা যদি তার অন্য অর্থ গ্রহণ করে, তবে বক্রোক্তি অলংকার হয়।' বক্রোক্তি দুই প্রকার [১] শ্লেষ-বক্রোক্তি, [২] কাকু-বক্রোক্তি।

শ্লেষকে আশ্রয় করিয়া যে-বক্রোক্তি হয়, তাহাই **শ্লেষ-বক্রোক্তি**। ইহা শব্দের অর্থগত বৈচিত্র্যের উপর নির্ভরশীল। ইহাতে বক্তা ও প্রতিবক্তা—দুইজনের প্রয়োজন। এই জাতীয় বক্রোক্তিতে বক্তা যে-অর্থে কোনো শব্দ প্রয়োগ করে, শ্রোতা তাহা অন্য একটি অর্থে গ্রহণ করে। যেমন :

[ক] সভাকবি—'ওঁদের শব্দ আছে বিস্তর, কিন্তু মহারাজ, অর্থের বড়ো টানাটানি।'

নটরাজ—'নইলে রাজদ্বারে আসবো কোন্ দুঃখে।'

এখানে 'তাৎপর্য' অর্থেই সভাকবি 'অর্থ' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন ; কিন্তু এই 'অর্থ' কথাটিকেই নটরাজ 'টাকাকড়ি' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

[খ] রাজা—'তোমাদের অক্ষরের ছাঁদটা সুন্দর, কিন্তু বোঝা শক্ত। একি চীনা-অক্ষরে লেখা নাকি ?'

নটরাজ—'বলতে পারেন অ-চিনা অক্ষরে।'

এই উদাহরণে 'চীনা' ও 'চিনা' কথার উচ্চারণ একরকম ; 'চীনা অক্ষর'-এর অর্থ হইল 'চীনদেশের লিপি' ; 'অ-চিনা অক্ষর'-এর অর্থ 'অচেনা, অজানা অক্ষর'।

'যে-উক্তিতে প্রশ্নবোধক কাকু বা কণ্ঠস্বর দ্বারা [অর্থাৎ স্বরভঙ্গির দ্বারা] বক্তার অভিপ্রেত অর্থের দৃঢ়স্থাপন হয়, অথবা পরম বিস্ময় প্রকাশিত হয়, তাহার নাম **কাকু-বক্রোক্তি**।' যেমন :

[ক] 'কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ?' ইহার অর্থ হইল, 'কেউ ছিঁড়ে না।' আভরণহীনা সীতাকে সরমা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পর্ণ বা পাপড়িই হইল পদ্মের প্রাণবস্তু ও সৌন্দর্য। সৌন্দর্যপিপাসু এমন কোনো মানুষ নাই, যে পদ্মকে উহার পাপড়ি হইতে বঞ্চিত করিবে।

[খ]
'দণ্ডে দণ্ডে
ক্ষীণ শিশুটিরে স্তন্য দিয়ে বাঁচাইয়ে
তোলে মাতা, সে কি তার রক্তপানলোভে?'

[গ] 'দানবনন্দিনী আমি, রক্ষঃকুলবধূ ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?'

শ্লেষ-বক্রোক্তি এবং **শ্লেষ** অলংকারের মধ্যে **পার্থক্য** আছে ; শ্লেষ-বক্রোক্তিতে বক্তা ও প্রতিবক্তার প্রয়োজন, কিন্তু শ্লেষে এরূপ দুই ব্যক্তির কোনো প্রয়োজন হয় না। **কাকু-বক্রোক্তির** লক্ষণীয় বিশিষ্টতা হইল, ইহাতে 'কণ্ঠধ্বনির বিশেষ ভঙ্গির ফলে নিষেধ [Negation] বিধি [Affirmation]-তে এবং বিধি নিষেধে পর্যবসিত হয়ে শ্রোতার দ্বারা গৃহীত হয়।' শ্লেষ-বক্রোক্তির সঙ্গে ইংরেজি 'Pun'-এর এবং কাকু-বক্রোক্তির সঙ্গে ইংরেজি 'Interrogation' বা 'Erotesis'-এর অনেকটা মিল আছে।

অর্থালংকার

অর্থালংকারের সৌন্দর্য শব্দের অর্থের উপর নির্ভরশীল, ধ্বনির উপর নয় শব্দালংকারে শব্দের পরিবর্তন করা চলে না, কিন্তু অর্থালংকারে বাক্যে ব্যবহৃত কোনো শব্দকে পরিবর্তিত করিলেও ইহার সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ হয় না। শব্দালংকারের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় কাব্যের সংগীতধর্ম, আর অর্থালংকারের দ্বারা প্রকাশ পায় চিত্রধর্ম। অর্থালংকারের সংখ্যা বহু—আমরা এখানে কেবল কয়েকটি প্রধান অর্থালংকারের আলোচনা করিব।

এই আলোচনার পূর্বে **অর্থালংকারগুলির শ্রেণীবিভাগ** করা প্রয়োজন। "অর্থালংকার বহুসংখ্যক হলেও তাদের শ্রেণীগত বিচার করলে মোটামুটি **পাঁচটি শ্রেণী** পাওয়া যায়। এমনি এক-একটি শ্রেণীর মধ্যে অনেকগুলি করে অলংকার থাকে। শ্রেণীবিভাগের মূলসূত্র কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ। উক্ত পাঁচটি শ্রেণীর নাম :

[ক] সাদৃশ্য, [খ] বিরোধ, [গ] শৃঙ্খলা, [ঘ] ন্যায়, [ঙ] গূঢ়ার্থপ্রতীতি।

এইবার এদের প্রত্যেকের অন্তর্ভুক্ত অলংকারগুলির নামের একটা তালিকা দিচ্ছি :

(ক) **সাদৃশ্য**—উপমা, রূপক, উল্লেখ, সন্দেহ, উৎপ্রেক্ষা, ভ্রান্তিমান, অপহ্নুতি, নিশ্চয়, প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি, ব্যতিরেক।

(খ) **বিরোধ**—বিরোধাভাস, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, অসংগতি, বিষম।

(গ) **শৃঙ্খলা**—কারণমালা, একাবলী, সার।

(ঘ) **ন্যায় [তর্ক]**—অর্থান্তরন্যাস, কাব্যলিঙ্গ, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, আক্ষেপ, প্রতীপ, অর্থাপত্তি।

(ঙ) **গূঢ়ার্থপ্রতীতি**—ব্যাজস্তুতি, স্বভাবোক্তি।

উপরি-উক্ত অলংকার ছাড়া কতকগুলি গৌণ অলংকারও রহিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে সেগুলির আলোচনা আমরা করিব না।

[১] **উপমা :** সমান ধর্ম বা গুণবিশিষ্ট দুইটি ভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য-প্রদর্শন অর্থাৎ তুলনা করা হইলে 'উপমা' অলংকার হয়। উপমার চারিটি অঙ্গ : উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম [গুণ বা ক্রিয়া], সাদৃশ্যবাচক অর্থাৎ তুলনাবোধক শব্দ। যাহাকে তুলনা করা হয়, তাহার নাম **উপমেয়** ; যাহার সহিত তুলনা দেওয়া হয়, তাহার নাম **উপমান** ; উপমেয় ও উপমানের মধ্যে যে-সাধারণ গুণ বা ক্রিয়ার জন্য তুলনা সম্ভব হইয়াছে, তাহাকে বলে **সাধারণ ধর্ম** ; এবং **তুলনাবাচক** শব্দ হইল 'মতো', 'ন্যায়', 'সদৃশ', 'পারা', 'প্রায়', 'হেন', ইত্যাদি। যেমন, 'মুখখানি চাঁদের মতো সুন্দর'—এখানে 'মুখ' হইল উপমেয়, 'চাঁদ' উপমান, সৌন্দর্য ['সুন্দর'] সাধারণ ধর্ম, 'মতো' তুলনাবাচক শব্দ। চাঁদ ও মুখ ভিন্ন জাতীয় বস্তু হইলেও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে উভয়ের সাধর্ম্য রহিয়াছে, নতুবা চাঁদের সঙ্গে মুখের তুলনা করা সম্ভবপর হইত না। মনে রাখিতে হইবে, একই জাতীয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যকথন **উপমা নহে, তুলনা** ; অর্থাৎ 'Simile' নয়, 'Comparison'। 'শোভার মুখখানি আভার মুখের মতোই সুন্দর'—এই বাক্যে 'উপমা'-অলংকার নাই, কেবল তুলনা আছে।

উপমা প্রধানত তিন প্রকারের : **পূর্ণোপমা** [ইহাতে উপমার চারিটি অঙ্গই বিদ্যমান থাকে] **লুপ্তোপমা** [ইহাতে উপমার চারিটি অঙ্গের মধ্যে একটি কি দুইটি লুপ্ত থাকে], **মালোপমা** [এই প্রকারের উপমায় একটি উপমেয়ের একাধিক উপমান থাকে]। উপমার আর-একটি রূপভেদ হইল **মহোপমা :** 'যে উপমায় উপমানের শক্তি ও সৌন্দর্য বিশদরূপে বিবৃত হওয়ার ফলে তাহা একটি প্রায়-স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ চিত্রের আকার ধারণ করে—উপমার মহত্ত্ব ও মহাকাব্যের উপযোগিত্বহেতু তাহার নাম মহোপমা।'

পূর্ণোপমার উদাহরণ :

(ক) 'বুদ্ধের করুণ আঁখি-দুটি সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি।' (খ) 'সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে এক কথা কয়!' (গ) 'আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত প্রভাতরশ্মি সম।'

(ঘ) 'এ-ও যে রক্তের মতো রাঙা দুটি জবাফুল।'

(ঙ) ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল :
'ডালিমফুলের মতো ঠোঁট যার, পাকা আপেলের মতো
লাল যার গাল,
চুল যার শাঙনের মেঘ, আর আঁখি যার গোধূলির মতো
গোলাপি রঙিন্,
তারে আমি দেখিয়াছি প্রতিরাত্রে—
স্বপ্নে কতদিন!'

লুপ্তোপমার উদাহরণ :

(ক) 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।'—এখানে 'যেমন' শব্দটি লুপ্ত।

(খ) 'তিলেক না দেখি ও চাঁদবদন মরমে মরিয়া থাকি।' এখানে চাঁদের '**মতো সুন্দর**' [বদন] কথাগুলি লুপ্ত।

(গ) "বলেছে সে : 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখীর নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।"
—পাখীর নীড়ের মতো '**শান্ত**' চোখ তুলে।

(ঘ) 'তড়িতবরণী হরিণনয়নী দেখিনু আঙিনা-মাঝে।'—এখানে 'তড়িত-বরণী'=তড়িতের বর্ণের মতন উজ্জ্বল বর্ণ যার; 'হরিণ-নয়নী'=হরিণের নয়নের মতো চঞ্চল নয়ন যার, অর্থাৎ শ্রীরাধিকা। এই উদাহরণে শুধু উপমেয় আছে—উপমান নাই, সাধারণ ধর্ম নাই, তুলনাবাচক শব্দ নাই, তিনটিই লুপ্ত।

মালোপমার উদাহরণ :

(ক) 'সুন্দর আনন তব স্ফুট পদ্মসম,
কিংবা যথা পূর্ণচন্দ্র শারদ গগনে—'

—এখানে উপমেয় 'আনন'; উপমান 'পদ্ম' ও 'চন্দ্র'। একটি উপমেয়ের দুইটি উপমান, সুতরাং অলংকার হইল 'মালোপমা'।

(খ) 'মলিনবদনা দেবী, হায় রে, যেমতি,
খনির তিমির গর্ভে.................
.........................সূর্যকান্ত মণি,
কিংবা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে।'

—এখানে অশোককাননে বন্দিনী সীতাকে তুলনা করা হইয়াছে খনিগর্ভস্থিত সূর্যকান্তমণি ও সমুদ্রতলবাসিনী লক্ষ্মীদেবীর সহিত। 'দেবী' উপমেয়—উপমান হইতেছে 'সূর্যকান্তমণি' এবং 'রমা'।

(গ) 'সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া!
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে, গলিল!
গ্রাসিল মিহিরে রাহু সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল!
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে।'

অকস্মাৎ শঙ্কিতচিত্ত মেঘনাদের অপূর্বসুন্দর বর্ণনা; এখানে 'ভয়শূন্য হিয়া' [মেঘনাদের] উপমেয়; উপমান উত্তাপে গলিত লৌহ-'পিণ্ড', রাহুগ্রস্ত 'মিহির', নিদাঘশুষ্ক 'অম্বুনাথ' [সমুদ্র], কলি-অধিকৃত 'নলের শরীর'—চারিটি পঙ্‌ক্তিতে চারিটি লুপ্তোপমা রহিয়াছে, এবং উহা দ্বারাই উপমার মালা রচিত হইয়াছে।

মহোপমার উদাহরণ ঃ

[ক] —'বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শার্দূলী-অবর্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ, পবনবেগে ধায় ঊর্ধ্বশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা,
হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে।
কিংবা যেথা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রথী,
মারি সুপ্ত পঞ্চশিশু পাণ্ডবশিবিরে
নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতি,
হরষে তরাসে ব্যগ্র, দুর্যোধন যথা,
ভগ্ন-ঊরু, কুরুরাজ, কুরুক্ষেত্ররণে।'

এখানে দুইটি মহোপমার মালা—ইংরেজীতে এই জাতীয় উপমাকে বলা হয় 'Homeric Simile'; ইহার আর-এক নাম 'Epic Simile'। এই রকমের উপমায় কবি 'উপমেয়কে ত্যাগ করিয়া উপমানকে এরূপ সাজাইতে থাকেন, তৎসম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত বর্ণনা করেন যে, তাহা স্বয়ং একটি সৌন্দর্যের নন্দনকানন হইয়া দাঁড়ায়,—পাঠক সে-মুহূর্তে উপমেয়কে ভুলিয়া গিয়া উপমানের প্রতি বিস্মিত মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকে।'

[খ] 'দুঃসহ উত্তাপে যথা স্থির গতিহীন
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু, জাগে ঝঞ্ঝাঝড়ে
অকস্মাৎ, আপনার জড়ত্বের পরে
করে আক্রমণ, অন্ধ বৃশ্চিকের মতো

ভীমপুচ্ছে আত্মশিরে হানে অবিরত
দীপ্ত বজ্রশূল,—সেই মতো কাল যবে
জাগে, তারে সভয়ে অকাল কহে সবে।'

[২] উৎপ্রেক্ষা :

প্রবল সাদৃশ্যহেতু উপমেয়কে উপমান বলিয়া উৎকট সংশয় জন্মিলে 'উৎপ্রেক্ষা' অলংকার হয়। উৎপ্রেক্ষার প্রাণবস্তু হইল সংশয়, এবং এই সংশয়ে উপমানপক্ষই প্রবলতা লাভ করে। উৎপ্রেক্ষা শব্দের অর্থ হইতেছে বিতর্ক বা সংশয়। যেমন, 'মুখ যেন চাঁদ'—এই বাক্যে 'মুখ' উপমেয়, 'চাঁদ' উপমান—এখানে অতিরিক্ত সাদৃশ্যবশত মুখকে চাঁদ বলিয়া সংশয় জন্মিতেছে। এই সংশয় মুখ এবং চাঁদের অভেদ-সম্পর্ক-বিষয়ে। সুতরাং উৎপ্রেক্ষায় সংশয়ের অর্থ হইতেছে, অভেদসংশয়। মনে রাখিতে হইবে, সংশয় যদি একপক্ষে না হইয়া উভয় পক্ষে হয়, তাহা হইলে সেই অলংকার **'উৎপ্রেক্ষা' না হইয়া 'সন্দেহ' হইবে**। যেমন, 'কি আশ্চর্যসুন্দর তার মুখটি—একি মুখ ? না চাঁদ ?' এখানে উপমেয় [মুখ] এবং উপমান [চাঁদ] **উভয় পক্ষে** সংশয় রহিয়াছে বলিয়া অলংকারটি 'উৎপ্রেক্ষা' নয়, 'সন্দেহ'। উৎপ্রেক্ষাবাচক শব্দ হইতেছে 'যেন', 'বুঝি', 'মনে হয়', 'জনু', ইত্যাদি এবং এই শব্দগুলির দ্বারাই সংশয় প্রকাশ পায়।

উৎপ্রেক্ষা দুই প্রকারের : **বাচ্যোৎপ্রেক্ষা** ও **প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা**। যেখানে সম্ভাবনাসূচক যেন, বুঝি, প্রায়, ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ থাকে, সেখানে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হয় ; আর, যেখানে এই জাতীয় শব্দের কোনো উল্লেখ থাকে না, সেখানে হয় প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা। **বাচ্যোৎপ্রেক্ষার উদাহরণ :**

[ক] 'সীতা-বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী।'

[খ] '—বসিলা যুবতী
পদতলে, আহা মরি, সুবর্ণদেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল।'

রক্ষোরাজবংশের বধূ রূপসী সরমা ['যুবতী'] আসিয়া অশোকবনে বন্দিনী সীতার 'পদতলে' বসিলেন ; পূতচরিত্রা সীতার চরণতলে সুন্দরী সরমাকে উপবিষ্টা দেখিয়া কবির মনে হইল তুলসীর মূলে যেন একটি সুবর্ণপ্রদীপ [সুবর্ণদেউটি] দীপ্তি পাইতেছে।

[গ] 'ধরণী এগিয়ে এসে দেয় উপহার,
ও যেন কনিষ্ঠা মেয়ে দুলালী আমার !'

[ঘ] 'তুমি যেন ওই আকাশ উদার আমি যেন এই অকূল পাথার—
আকুল করেছে মাঝখানে তার আনন্দপূর্ণিমা।'

[ঙ] 'রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুতলে, যেন তরু তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ! দূরে প্রবাহিণী
উচ্চবীচিরবে কাঁদি চলিছে সাগরে
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখকাহিনী।'

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষার উদাহরণ :

[ক] '—অন্তপাশে বিশাল শিমূল
সবটুকু বক্ষোরক্ত নিঙারিয়া ফুটাইয়া ফুল
অর্ঘ্য দেয় দিবাকরে।'

—'অর্ঘ্য দেয়' কথাগুলির পূর্বে 'যেন' শব্দটি উল্লিখিত হয় নাই।

[খ] 'লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে।'

এখানে যেন-র ভাবটি প্রতীয়মান [Implied] হইতেছে; সুন্দরী তরুণী কটিদেশের মেখলাখানি শিলাতলে খুলিয়া রাখিয়া স্নানের জন্য সরসীতে নামিয়াছেন, শিলার উপরে সেই মেখলাখানি নিঃশব্দে পড়িয়া আছে। কবি মেখলার এরূপ মৌনী-ভাবের কারণ কল্পনা করিয়া বলিতেছেন, সুন্দরীর কটিতট হইতে বিচ্যুত হইয়াছে বলিয়াই মেখলা বুঝি অপমানবোধহেতু মৌনী হইয়া রহিয়াছে। মেখলা কটিদেশের অলংকার-বিশেষ, উহার পক্ষে অপমানবোধ করা সম্ভব নয়—তাই '[যেন] মৌন অপমানে।'

[৩] রূপক :

উপমেয় ও উপমানের অভেদরূপে কল্পনা হইলে 'রূপক' অলংকার হয়। এই অলংকারে উপমেয়ের উপর উপমানকে আরোপ করা হইয়া থাকে, এবং ইহারই ফলে দুইটি বিজাতীয় বস্তু অভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। 'স্বরূপে অর্থাৎ বস্তুগত ভাবে উপমেয়-উপমান হলেও, তাদের অতিসাম্য দেখাবার জন্যই কাল্পনিক অভেদারোপের নাম রূপক।' এখানে বুঝিয়া লইতে হইবে, উপমেয়ের উপর উপমানকে আরোপ করা হইলেও, উপমেয়কে অস্বীকার করা হয় না; উপমেয়কে উপমান আচ্ছন্ন করে বটে, কিন্তু একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলে না; 'রূপক **অভেদপ্রধান** অলংকার, ঠিক **অভেদসর্বস্ব** নয়।'

একটি দৃষ্টান্তের সাহায্য লইলে কথাগুলির তাৎপর্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। যেমন, 'দেখিবারে আঁখিপাখী ধায়'; এখানে 'আঁখি' [উপমেয়]-র উপর 'পাখী' [উপমান]-কে আরোপ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু 'আঁখি'-কে অস্বীকার করা হয় নাই। যদি আঁখিকে অস্বীকার করা হইত [যেমন, 'আঁখি নয়, পাখী' কথাগুলিতে] তাহা হইলে 'রূপক' অলংকার হইত না, হইত 'অপহ্নুতি' অলংকার। রূপকে উপমানের প্রাধান্য

সূচিত হয় বলিয়া ক্রিয়াপদটি উপমানেরই অনুগামী হইয়া থাকে, অর্থাৎ ক্রিয়াপদ উপমানের গুণধর্মই প্রকাশ করে। উপরের দৃষ্টান্তে 'ধায়' ক্রিয়াটি 'পাখী' অর্থাৎ উপমানেরই অনুগামী। 'রূপক'-এর একদিকে 'উপমা' বা 'উৎপ্রেক্ষা', অন্যদিকে 'অতিশয়োক্তি' অলংকার ; অর্থাৎ উপমা উৎপ্রেক্ষা ও রূপকের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অতিশয়োক্তিতে পর্যবসিত হয়। 'উপমায় উপমেয়-প্রাধান্য, রূপকে উপমান-প্রাধান্য ; উৎপ্রেক্ষা সন্দেহ সংশয়-মূলক, রূপক আরোপ-মূলক।'

রূপের আরোপের প্রকারভেদে 'রূপক' অলংকার নানা প্রকারের—**নিরঙ্গ, সাঙ্গ** ও **পরম্পরিত**।

সাধারণ রূপকই **'নিরঙ্গ রূপক'** নামে পরিচিত। যেখানে শুধু একটি উপমেয় ও একটি উপমানে অভেদ কল্পিত হয়, তাহাকে বলে নিরঙ্গ রূপক। 'এখানে উপমেয়-উপমানের অঙ্গগুলির কোনো উল্লেখ থাকে না—কাজেই তাহাদের আশ্রয়ে নূতন রূপকসৃষ্টির কোনো প্রশ্ন উঠে না। আবার, রূপকটিব কার্য বা কারণ-স্বরূপ অন্য কোনো রূপকের আবির্ভাবও হয় না।' এককথায়, যেখানে অঙ্গে রূপক হয় না, তাহাই নিরঙ্গ রূপক। যেমন,

(ক) 'সুশীতল ছায়ারূপ ধরি
তপনতাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে।'

(খ) 'বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।'

—অর্থাৎ কবিদল উপমারূপ সূত্রে কাব্যকবিতারূপ বসন বুনিতেছে।

(গ) 'বিকসিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার।'

—বাসনার অরবিন্দ = বাসনারূপ অরবিন্দ [পদ্ম]।

(ঘ) 'শোকের ঝড় বহিল সভাতে।'

(ঙ) 'মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা, লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।'

—বীজরূপী বলাকা অঙ্কুররূপ পাখা মেলিতেছে। এই সকল উদাহরণে একটি উপমেয় আর একটি-মাত্র উপমান রহিয়াছে—তাই নিরঙ্গ রূপক অলংকার।

নিরঙ্গ রূপকের একটি প্রকারভেদ হইল **'মালারূপক'**। মালারূপকে একটি উপমেয়ের উপর বহু উপমানের আরোপ হইয়া থাকে। যেমন,

(ক) 'শীতের ওঢ়ণী পিয়া গিরীষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।'

এখানে উপমেয় 'পিয়া' [প্রিয়া] ; উপমান 'ওঢ়ণী' [গাত্রাবরণ]', 'বা' [বাতাস], 'ছত্র' [ছাতা] এবং 'না' [নৌকা] ; **বহু উপমানের** আরোপ দ্বারা রূপকের **মালা** রচনা করা হইয়াছে।

[খ] 'আমার করের মুকুর তুমি, মোর করবীর ফুল,
অাঁখির কাজল, আমার ঠোঁটের টকটকে তাম্বুল,
আমার বুকের মৃগমদ, আমার গলার হার,
দেহের আমার সকল তুমি, গেহের তুমি সার।'

এই কতিপয় ছত্র মৈথিল কবি বিদ্যাপতির বিখ্যাত 'হাথক দরপণ মাথক ফুল' কবিতাটির অনুবাদ—অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী কর্তৃক বাংলায় অনূদিত।

[গ] 'ছোট্ট নেবুর ফুল—
সন্ধ্যামুখের সৌরভী ভাষা, বন্ধ্যাবুকের গৌরবী আশা,
গুপ্তপ্রেমের সুপ্ত পিয়াসা, বিরহের বুল্‌বুল।'

[ঘ] 'তবু ওরাই আশার খনি,—
সবার আগে ওদের গণি,
পদ্মকোষের বজ্রমণি, ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল।
আলাদীনের মায়ার প্রদীপ ওই আমাদের
ছেলের দল।'

'মূল উপমেয়ে উপমানের অভেদনির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহাদের অঙ্গগুলিরও যথাযথভাবে অভেদনির্দেশ হয়, তাহা হইলে সমগ্র অলংকারটিকে **সাঙ্গরূপক** অলংকার বলা হয়। এই রূপক পরস্পর-সম্বদ্ধ অনেক রূপকের মালা—সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী।' সাঙ্গ অর্থ, অঙ্গের সহিত বর্তমান। যেমন :

[ক] 'কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে
আকাশের নীল গাঙে,
হাবুডুবু খায় তারা-বুদ্‌বুদ্।'

এখানে "মূল রূপক হইয়াছে উপমেয় 'আকাশ' ও উপমান 'নীল গাঙ্'-এর অভেদকল্পনায়। আকাশের অঙ্গ কোদালে মেঘ, তারা; নীল গাঙের অঙ্গ মউজ [ঢেউ], বুদ্‌বুদ্। কোদালে মেঘকে উপমেয় ধরিয়া উপমান মউজ-এর অভেদকল্পনা এবং তারাকে উপমেয় ধরিয়া উপমান বুদ্‌বুদ্-এর অভেদকল্পনা। প্রধান রূপকের অঙ্গগুলিতেও রূপক হওয়ায় অলংকার সাঙ্গরূপক।"

[খ] 'শঙ্খধবল আকাশগাঙে শুভ্রমেঘের পালটি মেলে
জ্যোৎস্নাতরী বেয়ে তুমি ধরার ঘাটে কে আজ এলে?'

এখানে মূল উপমেয় 'আকাশ,' মূল উপমান 'গাঙ্' [নদী]; সুতরাং ইহারা দুইটি অঙ্গী। আকাশের অঙ্গ হইতেছে মেঘ, জ্যোৎস্না; অপরপক্ষে, গাঙ-এর অঙ্গ হইল 'তরী'; আবার, তরীর একটি অংশ 'পাল'; 'আকাশ' [উপমেয়]-এর প্রত্যেকটি

অঙ্গের সঙ্গে 'গাঙ্' [উপমান]-এর প্রত্যেকটি অঙ্গের যথাক্রমে অভেদকল্পনা হইয়াছে। সুতরাং অলংকারটি এখানে 'সাঙ্গরূপক'। তদ্রূপ :

[গ] '—শোকের ঝড় বহিল সভাতে
শোভিল চৌদিকে সুরসুন্দরীর রূপে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন
নিশ্বাস প্রবলবায়ু ; অশ্রুবারিধারা
আসার ; জীমূতমন্দ্র হাহাকার-রব !'

—শোকের সঙ্গে ঝড়ের রূপক ; সুরসুন্দরী = বিদ্যুৎ, বামাকুল = [সুন্দরী] নারীবৃন্দ, আসার = বর্ষণ, জীমূতমন্দ্র = মেঘগর্জন।

'যদি একটি উপমেয়ে উপমানের আরোপ অন্য উপমেয়ে তার উপমানের আরোপের কারণ হয়, তবেই হয় **পরম্পরিত রূপক**। এ অলংকারে রূপকে-রূপকে কার্যকারণভাবের পরম্পরা অর্থাৎ ধারা থাকে বলে এর নাম পরম্পরিত। সাঙ্গরূপকের মতো অঙ্গের বা অঙ্গীর প্রশ্ন এতে উঠেই না।' যেমন :

[ক] 'চেতনার নাটমঞ্চে নিদ্রা যবে ফেলে যবনিকা,
অচেতন-নেপথ্যের অভিনয় কর প্রযোজন।'

এখানে চেতনাকে নাটমঞ্চ বলাতে নিদ্রায় যবনিকা এবং 'অচেতন'-এ নেপথ্যের আরোপ হইয়াছে।

[খ] 'যখন হৃদয়াকাশ বিষম বিপত্তিরূপ মেঘদ্বারা ঘোরতর আচ্ছন্ন হয়, তখন কেবল আশাবায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহাকে পরিষ্কৃত করিতে থাকে।'

—এই দৃষ্টান্তে হৃদয়কে আকাশ বলিয়া রূপক করাতে বিপত্তিতে মেঘ এবং আশাতে বায়ুর আরোপ করা হইয়াছে।

আর-এক রকমের রূপক-অলংকার আছে, তাহার নাম **অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য**। উপমানে কোনো অবাস্তব গুণধর্মকল্পনা করিয়া তাহা যদি উপমেয়ে আরোপিত হয় তাহা হইলে অধিকারূঢ়-বৈশিষ্ট্য রূপক হয়। যেমন :

[ক] 'থীর বিজুরি বরণ গৌরী পেখলুঁ ঘাটের কূলে।'

—এখানে 'বিজুরি' অর্থাৎ বিদ্যুৎকে [উপমান] স্থির [থীর] কল্পনা করিয়া উহাকে রাধায় [উপমেয়] আরোপ করা হইয়াছে। তদ্রূপ :

[খ] 'নাহি কালদেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি—
তুমি অচপল দামিনী।'

—'দামিনী' অর্থাৎ বিদ্যুৎ চিরচঞ্চল, অথচ এখানে উহাকে 'অচপল' কল্পনা করা হইয়াছে।

[৪] অতিশয়োক্তি :

অভেদসিদ্ধান্তহেতু উপমান প্রবল হইয়া উপমেয়কে যদি একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলে, অর্থাৎ উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দেশ করা হয়, তাহা হইলে সেই অলংকারের নাম 'অতিশয়োক্তি'। অথবা, উপমেয় ও উপমানের মধ্যে সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে কবির কল্পনা যদি লৌকিক সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে, তবে 'অতিশয়োক্তি' অলংকার হয়। উদাহরণ ঃ

[ক] 'কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল পঞ্চবটী-বনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে।'

এখানে 'ভুজগ' বলিতে বুঝাইতেছে ভুজগসদৃশ রামচন্দ্রকে কিংবা লক্ষ্মণকে। ইহাতে রামচন্দ্র, অথবা লক্ষ্মণ উপমেয়, উপমান 'ভুজগ'। কিন্তু এই বর্ণনায় উপমান ভুজগকেই উপমেয়রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে—উপমেয়ের উল্লেখ একেবারেই করা হয় নাই।

[খ] 'দাসীর এ তৃষা তোষ সুধাবরিষণে।'

এই চরণটিতে 'তৃষা' [উপমান] ও 'সুধাবরিষণ' [উপমান কথা-দুইটি 'শুনিবার বাসনা' ও 'মুখনিঃসৃত সুমধুর বাণী' উপমেয়কে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

[গ] 'সকলে কাঁদি বলে—দারুণ রাহু এমন চাঁদেরেও হানে!'

কবিতার এই চরণটিতে 'রাহু' বলা হইয়াছে কাশীরাজকে, আর 'চাঁদ' বলা হইয়াছে কোশলনৃপতিকে। অভেদসিদ্ধান্তহেতু উপমেয়কে ['কাশীরাজ' এবং 'কোশল-নৃপতি' কথা-দুইটিকে] উপমান ['রাহু' এবং 'চাঁদ'] সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়া লইয়াছে, সুতরাং অতিশয়োক্তি অলংকার।

[ঘ] 'অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে
পদনখে রহিয়াছে দশরূপ হয়ে।'

এখানে 'পদনখ' উপমেয়, 'শশাঙ্ক' উপমান; সুন্দরীর পদনখ আশ্চর্যরকমের সুন্দর, উহাদের কোনো কলঙ্ক নাই—নিষ্কলঙ্ক। তাই বুঝি আকাশের চাঁদ অকলঙ্ক হইবার বাসনায় মাটীর পৃথিবীর এই রূপসীর পদনখে আশ্রয় লইয়াছে। আকাশে চন্দ্র একটি, কিন্তু পায়ের দশটি আঙুলে নখ দশটি—পদনখে একটি চন্দ্র দশটি [দশরূপ] হইয়া গিয়াছে।

[ঙ] 'বক্ষের নিচোলবাস যায় গড়াগড়ি,
ত্যজিয়া যুগলস্বর্গ কঠিন পাষাণে।'

—এখানে উপমেয় 'স্তনযুগল' উপমান 'যুগল-স্বর্গ' দ্বারা গ্রস্ত হইয়াছে।

[চ] 'যাঁহা যাঁহা নিকসই তনু তনুজ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণযুগ চলই।
তাঁহা তাঁহা থলকমলদল খলই॥
যাঁহা যাঁহা হেরিএ মধুরিম হাস।
তাঁহা তাঁহা কুন্দকুসুম পরকাশ।'

[ছ] 'হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব,
কো দূর করব পিপাসা॥
চন্দনতরু যব সৌরভ ছোড়ব,
শশধর বরখিব আগি।
চিন্তামণি যব নিজগুণ ছোড়ব,
কি মোর করম অভাগী।'

সাহিত্যের ক্ষেত্রে উক্তির আতিশয্য অনেক ক্ষেত্রে চমৎকার সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে—এই আতিশয্যপূর্ণ উক্তিই অতিশয়োক্তি, ইহা রূপক-অলংকারেরই স্বাভাবিক পরিণতি। 'উপমা-অলংকারে উপমেয় ও উপমানের কেবলমাত্র সাদৃশ্য; উৎপ্রেক্ষায় সাদৃশ্যের ফলে অভেদের সম্ভাবনা বা সংশয়যুক্ত কল্পনা; রূপকে অতি-প্রবল সাদৃশ্যের ফলে অভেদের আরোপ; অতিশয়োক্তিতে অভেদের সিদ্ধি, এবং তাহারই চূড়ান্ত ফল উপমেয়ের নিগরণ বা গিলিত ভাব এবং তাহার অনুল্লেখ।' এই অতিশয়োক্তির পরবর্তী অলংকার ব্যতিরেক। 'রূপকে অভেদের আরোপ, অতিশয়োক্তিতে অভেদের সিদ্ধি; ব্যতিরেকে পুনরায় ভেদ, এবং এই ভেদকথনই উপমেয়-বস্তুর সর্বাতিশায়ী সৌন্দর্য বা মহিমা ঘোষণা করে।' ব্যতিরেক-অলংকার আলোচনা করিলেই এই কথাগুলির সত্যতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

[৫] ব্যতিরেক :

উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ [কখনো কখনো অপকর্ষ] বর্ণিত হইলে 'ব্যতিরেক' অলংকার হয়। ব্যতিরেক কথাটির অর্থ হইতেছে পৃথককরণ বা ভেদ —ব্যতিরেক ভেদপ্রধান অলংকার। সাদৃশ্যবাচক শব্দের প্রয়োগ দ্বারা অর্থে এবং ব্যঞ্জনায় এই ব্যতিরেকের প্রতীতি হইয়া থাকে। ব্যতিরেক জ্ঞাপন করিবার জন্য সাধারণত 'জিনি', 'নিন্দি', 'ছার', 'গঞ্জি', 'নিন্দিত', 'বিনিন্দিত' প্রভৃতি কথার প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন,

[ক] 'কে বলে শারদ শশী সে-মুখের তুলা—
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা!'

—এখানে উপমান 'শারদশশী' অপেক্ষা উপমেয় 'মুখ'-এর উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে। ব্যতিরেকবাচক কোনো শব্দের প্রয়োগ ছাড়াই ব্যঞ্জনায় উৎকর্ষের ভাবটি দ্যোতিত হইয়াছে।

[খ] 'নবীন নবনীনিন্দিত করে দোহন করিছে দুগ্ধ।'

—উপমেয় 'কর' [হস্ত] উপমান 'নবনী'কে নিন্দা করে; সুতরাং এখানে উপমেয় 'কর'-এর উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে।

[গ] 'দেখ আসি সুখে
রোহিণীগঞ্জিনী বধূ; পুত্র, যার রূপে
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে।'

—বধূর রূপ রোহিণীকে গঞ্জনা করে, আর পুত্রের রূপের কাছে এমন সুন্দর শশাঙ্ক [চাঁদ]-ও নিজেকে কলঙ্কযুক্ত মনে করে; সুতরাং এখানে অলংকারটি ব্যতিরেক। তদ্রূপ:

[ঘ] 'গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ,
মোতিপাঁতি জিনিয়া দশন ॥
দুই চক্ষু জিনি নাটা ঘুরে যেন কড়ি ভাটা,
কানে শোভে স্ফটিককুণ্ডল।'

[ঙ] 'দিনে দিনে শশধর হয় বটে তনুতর,
পুন তার হয় উপচয়।
নরের নশ্বর তনু ক্রমশ হইলে তনু
আর ত নূতন নাহি হয়।'

এই কতিপয় পঙ্ক্তিতে উপমান 'শশধর' উপেক্ষা উপমেয় 'নরের তনু'-র **অপকর্ষ** বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং অলংকারটি ব্যতিরেক। এই জাতীয় ব্যতিরেক অলংকারের প্রয়োগ খুব বেশী দৃষ্ট হয় না, এবং ইহার সৌন্দর্যও কম।

[৬] সন্দেহ:

উপমেয় ও উপমান—এই উভয় পক্ষেই কবিকল্পনাসঞ্জাত সমান সংশয়হেতু চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হইলে 'সন্দেহ' অলংকার হয়। যেমন:

[ক] 'দুইধারে একি প্রাসাদের সারি? অথবা তরুর মূল?
অথবা এ শুধু আকাশ জুড়িয়া আমারি মনের ভুল?'

এখানে 'প্রাসাদের সারি' ও 'তরুর মূল' ইহাদের মধ্যে যে-কোনোটি হইবার সমান সম্ভাবনা—দুইপক্ষেই সমান সংশয়।

[খ] 'কুঞ্জের দ্বারে ঐ কে দাঁড়ায়ে, ও কি বারিধর কি গিরিধর?
ও কি নবীন মেঘের উদয় হল, না কি মদনমোহন ঘরে এলো?'
[বারিধর = মেঘ; গিরিধর = শ্রীকৃষ্ণ; মদনমোহন = শ্রীকৃষ্ণ]

[গ] 'চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র শিবিরবাহিরে,—
নিশীথে কি ঊষা আসি উতরিল হেথা ?'

[ঘ] 'সোনার হাতে সোনার চুড়ি কে কার অলংকার ?'

—মনে রাখিতে হইবে সংশয়টি কবিকল্পনাপ্রসূত না হইয়া বাস্তবিক হইলে 'সন্দেহ'-অলংকার হয় না। আরো একটি কথা—উৎপ্রেক্ষায় উপমান-বিষয়ে উৎকট সংশয় থাকে ; কিন্তু সন্দেহে উপমেয় এবং উপমান, উভয় পক্ষেই সংশয়।

[৭] **ভ্রান্তিমান :**

অত্যধিক সাদৃশ্যবশত উপমেয়ে উপমান-বস্তুর যদি ভ্রম হয়, এবং সেই ভ্রম যদি কবিকল্পিত হয় ও চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে তাহা হইলে 'ভ্রান্তিমান' অলংকার হয়। বাস্তবিক ভ্রম যেখানে, সেখানে কোনো অলংকার হয় না। রজ্জুকে রাত্রিবেলায় সাপ বলিয়া ভুল করিলে 'ভ্রান্তিমান' হইবে না ; কেন না এই ভ্রম সাধারণ। উদাহরণ :

[ক] 'শোভিল আকাশে
দেবযান ; সচকিতে জগৎ জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিলা ! ডাকিল ফিঙা, আর পাখী যত,
পূরিল নিকুঞ্জপুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে !
বাসরে কুসুমশয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ, গৃহকার্য উঠিলা সাধিতে।'

—এখানে দেবরাজ ইন্দ্রের জ্যোতির্ময় রথকে [দেবযান] সূর্য বলিয়া [সাদৃশ্য-হেতু] সকলেই ভুল করিতেছে, কোনো সংশয় নয়—প্রকৃতই ভুল। আর এই ভুল কবিকল্পিত, সুতরাং অলংকারটি 'ভ্রান্তিমান'। তৃতীয় পঙ্‌ক্তির 'বুঝি' শব্দটির প্রয়োগ সুষ্ঠু হয় নাই ; ইহার প্রয়োগহেতু অলংকারটিকে 'উৎপ্রেক্ষা' মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। ভ্রমের কার্য সর্বত্র পরিস্ফুট—সুতরাং ইহা উৎপ্রেক্ষা নয়, ভ্রান্তিমান।

[খ] 'নবদূর্বাদলশ্যাম রামে নিরখিয়া
ময়ূর নীরদভ্রমে উঠিল নাচিয়া।'

[গ] 'দেখ সখে, উৎপলাক্ষী সরোবরে নিজ অক্ষি,
প্রতিবিম্ব করি দরশন,
জলে কুবলয়ভ্রমে বার বার পরিশ্রমে
ধরিবারে করিছে যতন।'

[৮] **অপহ্নুতি :**

উপমেয়কে অস্বীকার বা গোপন করিয়া উপমানের প্রতিষ্ঠা করা হইলে 'অপহ্নুতি' অলংকার হয়। অপহ্নব কথার অর্থ হইতেছে নিষেধ বা অস্বীকার। এই অলংকারে

অস্বীকারের ভাবটিকে প্রকাশ করা হয়—'না', 'নয়', 'নহে' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা, অথবা 'ছলে', 'ব্যাজ', 'বুঝি' প্রভৃতি কয়েকটি কথার প্রয়োগে। উদাহরণ :

[ক] 'ষড়ঋতুছলে ষড়রিপু খেলে কাম হতে মাৎসর্য।'

[খ] 'বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা।'

এখানে 'বৃষ্টি'-র অপহ্নব করিয়া তাহার উপর আকাশের কান্নার ভাব আরোপ করা হইয়াছে।

[গ] 'এই সে প্রথম পত্র, বিজয়ার রাতে
আশীর্বাদছলে যাহা দিয়েছিলে হাতে
ত্রস্ত কবরীতে গুঁজে।' —[পত্র = প্রেমপত্র]

[ঘ] 'তারাই আজি নিঃস্ব দেশে কাঁদছে হয়ে অন্নহারা ;
দেশের যত নদীর ধারা জল না, ওরা অশ্রুধারা।'
—কবির বক্তব্য, নদীর জলধারা নয়, ও যে অশ্রুধারা।

[৯] প্রতিবস্তূপমা :

'যে অলংকারে উপমেয় এবং উপমান দুইটি পৃথক বাক্যে থাকে, উপমেয়-উপমান দুইটিতেই সাধারণ ধর্ম উল্লিখিত থাকে, কিন্তু সাধারণ ধর্ম একটি, তবে প্রকাশিত হয় বিভিন্ন অথচ একার্থক ভাষায়···এবং সম, তুল্য প্রভৃতি তুলনাবাচক শব্দের প্রয়োগ থাকে না, তার নাম প্রতিবস্তূপমা।' অথবা, 'পরস্পর-সন্নিহিত দুই বাক্যের সাদৃশ্য প্রতীয়মান হইলে, তাহাদের সাধারণ ধর্ম ফলিতার্থে এক হইয়াও যদি ভিন্নরূপে ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে প্রতিবস্তূপমা অলংকার হয়।' উদাহরণ :

[ক] 'একটি মেয়ে চলে গেছে জগৎ হতে নৈরাশে
একটি মুকুল শুকিয়ে গেছে সমাজশাপের নিশ্বাসে।'

—এখানে 'একটি মেয়ে' উপমেয়, 'একটি মুকুল' উপমান ; ইহারা দুইটি বাক্যে স্থান পাইয়াছে। ছোট্ট একটি মেয়ের সঙ্গে মুকুল-এর সাদৃশ্য আছে ; ভিন্ন ভাষায় বিন্যস্ত হইলেও 'চলে গেছে' এবং 'শুকিয়ে গেছে' কথাগুলির ফলিতার্থ এক ; তা ছাড়া, তুলনা-বাচক শব্দের কোনো উল্লেখ নাই—সুতরাং অলংকারটি প্রতিবস্তূপমা। তদ্রূপ :

[খ] 'গাভী যে তৃণটি খায়, করে জল পান,
তার সার দুগ্ধরূপে করে প্রতিদান।
পরদ্রব্য সাধু যদি করেন গ্রহণ,
জীবের মঙ্গলহেতু করেন অর্পণ।'

এখানে 'সাধু' উপমেয়, 'গাভী' উপমান [এই দৃষ্টান্তে উপমান-বাক্যটি পূর্বে বসিয়াছে] দুইটি ভিন্ন বাক্যে স্থাপিত হইয়াছে। পরদ্রব্য গ্রহণ করা ও জলপান করা এবং প্রতিদান করা ও অর্পণ করা ফলিতার্থে এক, তুলনাবাচক শব্দের প্রয়োগ নাই—সুতরাং প্রতিবস্তূপমা অলংকার।

[গ] 'চারিদিকে সখীদল যত
বিরসবদনা, মরি, সুন্দরীর শোকে !
কে না জানে ফুলকুল বিরসবদনা,
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী ?'

[মধুর = বসন্তঋতুর]

[১০] **দৃষ্টান্ত :**

যে অলংকারে উপমেয় ও উপমান পরস্পর-সন্নিহিত দুইটি বাক্যে অবস্থিত থাকে এবং তাহাদের সাধারণ ধর্ম বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তুলনার ভিত্তিতে দুইটির সাম্য বা সাদৃশ্য বোঝা যায় ও তুলনাবাচক কোনো শব্দের প্রয়োগ থাকে না, তাহার নাম দৃষ্টান্ত। যেমন :

[ক] 'ছোট শিশু যদি উঠিতে না পারে মায়ের কোলে,
নুয়ে পড়ে মাতা চুমা দিয়ে তারে বক্ষে তোলে।
সিন্ধু বা যদি কল্লোল তুলে ছুঁতে না পারে,
নামি দিগন্তে দেয় পরশন গগন তারে।'

এখানে শিশু ও মাতা উপমেয়, সিন্ধু ও গগন উহাদের উপমান। 'চুম্বন করা' এবং 'ছুঁইতে না পারা'-র ফলিতার্থ এক নয়, কিন্তু তবু দুইটি বাক্যের সাদৃশ্য প্রতীয়মান হইতেছে; অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি সুগভীর আকর্ষণের ভাবটি সহজেই বোঝা যাইতেছে। তা ছাড়া, 'যথা' প্রভৃতি সাদৃশ্যবাচক বা তুলনাবাচক শব্দের প্রয়োগ হয় নাই—সুতরাং অলংকারটি 'দৃষ্টান্ত'।

[খ] 'হে রক্ষোরথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি ? জনম তব কোন্ মহাকুলে ?
কেবা সে অধম রাম ? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজকাননে,
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম ? মৃগেন্দ্রকেশরী,
কবে, হে বীরকেশরী, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে ?'

এখানে তিনটি বাক্যের গুণক্রিয়ার মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে, কিন্তু এই সাদৃশ্য বুদ্ধি দ্বারা ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। একদিকে অধম রাম, শৈবালদলের ধাম ও শৃগাল; অন্যদিকে রক্ষোরথী ইন্দ্রজিৎ, রাজহংস ও মৃগেন্দ্রকেশরী। ইহাদের আচরণ এক নয়, অথচ প্রত্যেকের মধ্যে একটা সাম্যের বা সাদৃশ্যের ভাব প্রণিধানগম্য। তাই 'দৃষ্টান্ত' অলংকার হইয়াছে।

[১১] **নিদর্শনা :**

যে অলংকারে দুই বস্তুর সম্বন্ধ সম্ভব বা অসম্ভব হইয়া ব্যঞ্জনায় উপমান-উপমেয়ের ভাব প্রকাশ করে, তাহার নাম 'নিদর্শনা'। যেমন :

[ক] 'অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব-ভিখারী
বধিল সম্মুখরণে ? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী-তরুবরে ?'

এখানে দুইটি ভিন্ন বাক্যকে লইয়া নিদর্শনা অলংকার হইয়াছে। ভিখারী রাঘবের হাতে বীরশ্রেষ্ঠ বীরবাহুর মৃত্যু ঘটিয়াছে, এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটি ফুলদল দিয়া শাল্মলী-তরুবরের ছেদনের ন্যায়। কিন্তু যেহেতু ফুলদল দিয়া শাল্মলীতরুছেদন অসম্ভব, সেহেতু এই অসম্ভব-বস্তু-সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত অলংকারটি 'নিদর্শনা'—'দৃষ্টান্ত' নয়।

[খ] 'হাস্যমুখী সে যখন মৃদু মৃদু হাসে,
পদ্মরাগোপরি কত মুক্তা পরকাশে।'

[গ] 'আলোক যেখানে অধিক ফুটেছে সেখানে দুধের বান।'

এই দুইটি উদাহরণেও অসম্ভব-বস্তু-সম্বন্ধ [হাসির দ্বারা মুক্তার সৃষ্টি এবং আলোতে দুধের বান ডাকা] উপমান-উপমেয় ভাব প্রকাশ করিতেছে, তাই অলংকার নিদর্শনা। 'খ' দৃষ্টান্তের বাচ্য হইতেছে রমণীর মুখের হাসি মুক্তার মতো সুন্দর; 'গ' দৃষ্টান্তের বাচ্য হইল, জ্যোৎস্নার আলো অতীব উজ্জ্বল—দুধের মতো সাদা ধব্‌ধবে। তদ্রূপ :

[ঘ] 'যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনুজ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই॥'

সুন্দরী শ্রীরাধিকার অপূর্বসুন্দর দেহের জ্যোতি যেখানেই বিচ্ছুরিত হইতেছে, সেখানেই বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইতেছে, শ্রীরাধা যেখানে রক্তচরণ স্থাপিত করিতেছে, সেখানেই বিকশিত হইয়া উঠিতেছে স্থলকমল—আবার সেই অসম্ভব বস্তু-সম্বন্ধ।

[১২] **সমাসোক্তি :**

যে অলংকারে উপমানের কোনো উল্লেখ থাকে না, অথচ উপমানের ব্যবহার বা অবস্থা উপমেয়ে আরোপিত হয়, তাহার নাম 'সমাসোক্তি'। ইহাতে সমাসে অর্থাৎ সংক্ষেপে উপমেয় ও উপমান-বিষয়ে উক্তি থাকে বলিয়া ইহার এই নাম। যেমন :

[ক] 'নয়নে তব হে রাক্ষসপুরি,
অশ্রুবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;
ভূতলে পড়িয়া হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজ-সুন্দরী,
তোমার! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি!'

এখানে অচেতন লঙ্কাপুরীর উপর শোকাকুলা রাণীর ব্যবহার আরোপ করা হইয়াছে।

[খ] 'বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম-অবসানে.
দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি
দিগন্তের পানে।'

—অচেতন পৃথিবীর উপর পল্লীবধূর ব্যবহার আরোপ করা হইয়াছে।

[গ] 'ঠকা ঠাঁই ঠাঁই কাঁদিছে নেহাই, আগুন ঢুলিছে ঘুমে,
শ্রান্ত শাঁড়াসি ক্লান্ত ওষ্ঠে আলগোছে ছেনি চুমে;
দেখ গো হোথায় হাপর হাঁফায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি—'

—কামারের যন্ত্রগুলি ও আগুনের উপর শ্রান্ত-ক্লান্ত শ্রমিকের ব্যবহারের আরোপ করা হইয়াছে।

[১৩] স্বভাবোক্তি :

বস্তুস্বভাবের চমৎকার বর্ণনা দ্বারা যে-সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তাহার নাম 'স্বভাবোক্তি' অলংকার। বস্তু বা পদার্থের [বস্তু বলিতে নিসর্গ, মানুষ, পশু-পক্ষী-প্রাণী সবকিছুই বুঝাইতেছে] যে-কোনো বর্ণনামাত্রেই 'স্বভাবোক্তি' নয়—এই বর্ণনায় কবিকল্পনার সূক্ষ্মতা ও চমৎকারিত্ব থাকিতে হইবে, নতুবা অলংকার হইবে না। যে-বর্ণনা বস্তুস্বভাবকে উদ্ঘাটিত করিতে সমর্থ, উহাই স্বভাবোক্তি অলংকার। যেমন :

[ক] 'পায়ের তলায় নরম ঠেক্‌ল কি!
আস্তে একটু চল্ না, ঠাকুরঝি—
ওমা, এযে ঝরা-বকুল, নয়?
জ্যৈষ্ঠ আস্‌তে কদিন দেরী ভাই,
আমের গায়ে বরণ দেখা যায়?
অনেক দেরী? কেমন করে হবে!
কোকিল-ডাকা শুনেছি সেই কবে!
দখিন্-হওয়া বন্ধ কবে ভাই;
দীঘির ঘাটে নূতন সিঁড়ি জাগে
শেওলাপিছল এমনি, শঙ্কা লাগে
পা পিছ্‌লিয়ে তলিয়ে যদি যাই!'

—অন্ধবধূর অপূর্বসুন্দর সূক্ষ্ম বর্ণনা। যে-মানুষ চোখের দৃষ্টি হারাইয়াছে, সে কেমন করিয়া বস্তুজগৎকে অনুভব করে, এ বর্ণনা তাহারই চমৎকার দৃষ্টান্ত।

[খ] 'মনে মনে ভ্রমিয়াছি দূর সিন্ধুপারে
মহামেরুদেশে—যেথানে লয়েছে ধরা
অনন্ত-কুমারীব্রত, হিমবস্ত্রপরা,
নিঃসঙ্গ, নিঃস্পৃহ, সর্বআভরণহীন ;
যেথা দীর্ঘ রাত্রিশেষে ফিরে আসে দিন
শব্দশূন্য সংগীতবিহীন ! রাত্রি আসে
ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে
অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো।'

—কবিকল্পনায় মহামেরুদেশের রহস্যময় সৌন্দর্য কতখানি ধরা দিয়াছে !

[১৪] **অপ্রস্তুতপ্রশংসা :**

অপ্রাসঙ্গিক [অপ্রস্তুত বা অপ্রকৃত] বর্ণনা হইতে যদি প্রাসঙ্গিক [প্রস্তুত বা প্রকৃত] বর্ণনীয় বিষয়টি ব্যঞ্জনার দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তাহা হইলে 'অপ্রস্তুতপ্রশংসা' অলংকার হয়। এখানে 'প্রশংসা' কথাটির অর্থ হইতেছে বর্ণনা, ব্যঞ্জনার দ্বারা মূল বাচ্যের উপলব্ধি—স্তুতি বা গুণকথন নয়। যেমন :

[ক] 'পায়ের তলায় ধূলা—সেও, যদি কেউ পদাঘাত করে,
নিমেষে তাহার প্রতিশোধ লয় চড়ি তার শিরোপরে।'

এই দৃষ্টান্তে 'ধূলা'—আসল বর্ণনীয় বিষয় নয়—উহা 'অপ্রস্তুত' অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়। প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয় হইল, মানুষ ধূলি অপেক্ষা হীন নয়, সে কখনো অপমান সহ্য করিবে না। এখানে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় হইতে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রতীতি জন্মিতেছে ব্যঞ্জনার সহায়তায়। তদ্রূপ :

[খ] 'কুকুরের কাজ কুকুর করেছে, কামড় দিয়াছে পায়,
তাহলে কুকুরে কামড়ান কিরে মানুষের শোভা পায় ?'

যাহারা সত্যকারের মানুষ তাহারা কখনো অধমের আচরণে প্রবৃত্ত হয় না, এই প্রাসঙ্গিক বিষয়টিকে [প্রস্তুত] কুকুরের দংশনরূপ অপ্রাসঙ্গিক [অপ্রস্তুত] বর্ণনার দ্বারা বুঝানো হইয়াছে।

[গ] 'ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে,
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে।'

—এখানে 'চূড়া', 'বজ্রাঘাত', 'ভূধর' প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয় নহে ; কিন্তু তাহাদের বর্ণনা হইতে ব্যঞ্জনার দ্বারা 'বীরবাহু', 'রামচন্দ্র' ও 'রাবণ'-এর প্রতীতি জন্মিতেছে, তাই অপ্রস্তুতপ্রশংসা অলংকার।

[১৫] অর্থান্তরন্যাস :

সামান্য বিষয়ের বর্ণনা হইতে বিশেষ বিষয়ের, অথবা বিশেষ বিষয়ের বর্ণনা হইতে সামান্য বিষয়ের সমর্থন হইলে 'অর্থান্তরন্যাস' অলংকার হয়। 'সামান্য বিষয়'-এর অর্থ হইতেছে সাধারণ বিষয় অর্থাৎ general statement, 'বিশেষ' অর্থাৎ particular statement যাহার অন্তর্গত। উদাহরণ :

[ক] 'চিরসুখীজন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?'

এখানে বেদনা অনুভবরূপ 'সামান্য' বিষয়টি সমর্থিত হইয়াছে সর্প [আশীবিষ]-দংশনরূপ 'বিশেষ' বিষয়ের দ্বারা।

[খ] 'হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্বরতা কেন না শিখিবে?
গতি যার নীচসহ, নীচ সে দুর্মতি!'

নীচ বা অধমের সংসর্গে মানুষ নীচ হইয়া যায়—ইহাই জগতের সাধারণ রীতি। সুতরাং অধম রামের সংশ্রবে আসিয়া বিভীষণও যে অধম হইয়া উঠিবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। এখানে নীচ রামের সংসর্গে বিভীষণের অধম-আচরণ-রূপ 'বিশেষ' ঘটনাটি সমর্থিত হইতেছে অধমের সঙ্গে গতির ফলে উত্তমের নীচত্ব-লাভরূপ 'সাধারণ' বা 'সামান্য' বিষয়ের বর্ণনা দ্বারা।

[১৬] বিরোধাভাস বা বিরোধ :

দুইটি বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরুদ্ধভাবাপন্ন মনে হইয়া যদি চমৎকারিত্বের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে সেখানে 'বিরোধ' অলংকার হয়। এই অলংকারে তাৎপর্য-বিচারে আপাতদৃশ্যমান বিরোধের অবসান ঘটে। ইংরেজী 'Oxymoron' এবং 'Epigram'-এর সঙ্গে 'বিরোধ' অলংকারের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। উদাহরণ :

[ক] 'অচক্ষু সর্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্বত্র গতাগতি।'

চক্ষু-কর্ণ-পদের অভাবে দর্শন-শ্রবণ-গমন সম্ভব নয়; কিন্তু এখানে দেখিতেছি, যিনি অচক্ষু, অকর্ণ, অপদ তিনিই দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, গমনাগমন করিতেছেন। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে এখানে বিরোধ আছে বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু যেহেতু এই বিশেষণগুলি অলৌকিক শক্তির অধিকারী মহিমময় ভগবানের সম্পর্কে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেহেতু তাৎপর্যের দিক দিয়া এখানে কোনো বিরোধ নাই। তদ্রূপ :

[খ] 'ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।'

এই দুইটি চরণের সঙ্গে তুলনীয় : 'child is father of the man'—কথাগুলি।

[গ] 'পালিবে যে রাজধর্ম, জেনো তাহা মোর কর্ম—
রাজ্য লয়ে রহ রাজ্যহীন।'
[শিবাজীর প্রতি গুরু রামদাসের উপদেশ]

[ঘ] 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'
[দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের বাণী]

[ঙ] 'সবে বলে মোরে কানু-কলঙ্কিনী গরবে ভরল দে।'
[কৃষ্ণপ্রেমিকা রাধিকার উক্তি। দে = দেহ]

[১৭] বিষম ঃ

কারণ ও কার্যের গুণ বা ক্রিয়ার বৈষম্য বা বিরূপতা ঘটিলে, কিংবা কারণ হইতে আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ না হইয়া তৎপরিবর্তে অবাঞ্ছিত ফললাভ হইলে, কিংবা বিরুদ্ধ বস্তুদ্বয়ের একত্র সংঘটন ঘটিলে 'বিষম' অলংকার হয়। এককথায়, বিসদৃশ বস্তুদ্বয়ের বর্ণনা হইতে কাব্যসৌন্দর্যের সৃষ্টি যেখানে, সেখানেই 'বিষম' অলংকার। উদাহরণ ঃ

[ক] 'রূপ সে তিমির রাশি, অথচ তিমির নাশি
উজলিছে ত্রিভুবন, জিনি সৌদামিনী।'

অন্ধকারের কার্য হইল ত্রিভুবনকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া তোলা ; অথচ মহামায়া মহাকালীর তিমিরবরণ রূপ পৃথিবীকে অন্ধকারে আবৃত না করিয়া তাহাকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। এখানে কারণ ও কার্যের গুণের মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে—সুতরাং অলংকারটি 'বিষম'।

[খ] 'হেরিলে ফণী পলায় তরাসে,
যার দৃষ্টিপথে পড়ে কৃতান্তের দূত ;—
হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে
বাঁধিতে গলায় ?'

এখানে 'এ ফণী' অর্থে রূপসী রক্ষোরমণীর বেণী। হিংস্র ফণীকে দেখিলে দর্শকের শঙ্কাহেতু পলায়নকার্যই স্বাভাবিক। ফণীকে কেউ গলায় জড়ায় না ; কেন-না, এইরূপ ব্যাপার অস্বাভাবিক। অথচ এই দৃষ্টান্তে কার্যকারণের বৈষম্য দেখা যাইতেছে—তাই 'বিষম' অলংকার হইয়াছে।

[গ] 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।
সই, কি মোর কপালে লেখি,—
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ পেখি।'

শ্রীরাধিকার আকাঙ্ক্ষিত ফললাভের পরিবর্তে অবাঞ্ছিত বেদনাময় ফলাগমের বর্ণনাহেতু 'বিষম' অলংকার হইয়াছে।

[১৮] ব্যাজস্তুতি :

নিন্দা দ্বারা স্তুতি অথবা স্তুতি দ্বারা নিন্দার ভাব দ্যোতিত হইলে 'ব্যাজস্তুতি' অলংকার হয়। 'ব্যাজ' কথাটির অর্থ হইতেছে ছল, সুতরাং নিন্দাচ্ছলে প্রশংসা অথবা প্রশংসাচ্ছলে নিন্দাই ব্যাজস্তুতি। ইংরেজী 'Irony'-র সঙ্গে স্তুতিচ্ছলে নিন্দার কিছুটা সাদৃশ্য আছে। উদাহরণ :

[ক] 'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।'

ভারতচন্দ্রের অন্নদার আত্মপরিচয়বিষয়ক এই পঙ্‌ক্তিগুলি ব্যাজস্তুতির চমৎকার দৃষ্টান্ত। অন্নদা অর্থাৎ দেবী দুর্গা ঈশ্বর-পাটনীকে কৌশলে তাঁহার স্বামীর পরিচয় দিতেছেন। ইহার মধ্যে পাশাপাশি দুইটি অর্থ রহিয়াছে—এখানে অন্নদা নিন্দাচ্ছলে স্বামীর স্তুতিপাঠ করিতেছেন। প্রথম অর্থ হইল : তাঁহার স্বামী একেবারে বৃদ্ধ, তিনি গাঁজা-ভাঙ্ ইত্যাদি মাদকদ্রব্যসেবনে অতিশয় পটু ; তাঁহার কোনো ভালো গুণই নাই—এমন পোড়াকপালে স্বামীর মরণ হয় না কেন। দ্বিতীয় অর্থ, অর্থাৎ যাহা আসল অর্থ, তাহা এই : দেবাদিদেব শিব-শংকর দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি অনাদি [অতি বড় বৃদ্ধ] ; তিনি যোগসিদ্ধ অথবা মুক্তির অধীশ্বর দেবতা [সিদ্ধিতে নিপুণ] ; মহাদেব ত্রিগুণাতীত, তিনি নির্গুণ [কোন গুণ নাই] ; তিনি ত্রিলোচন, তাঁহার কপালে একটি তৃতীয়-চক্ষু আছে, যাহা তাঁহার জ্ঞানচক্ষু [কপালে আগুন] এবং এই ললাটনেত্রের বহ্নিজ্বালাতেই কামদেবতা মদন ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। নিন্দাচ্ছলে এই স্তুতিবন্দনাটিকে 'শ্লেষ' অলংকারের দৃষ্টান্তহিসাবেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কেন না, এখানে প্রত্যেকটি কথার দ্বিবিধ অর্থ রহিয়াছে এবং ওইগুলি কাব্যে একবার মাত্র প্রযুক্ত হইয়াছে।

[খ] 'কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!'

—উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিদ্বয় স্তুতিচ্ছলে নিন্দার চমৎকার দৃষ্টান্ত। পুত্রশোকাতুর রাবণ সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সিন্ধুর কণ্ঠে বিরাজিত যে-মালার সম্পর্কে ইঙ্গিত করিতেছে, তাহা আসলে মালা নয়, সেতুবন্ধ—রামচন্দ্র সমুদ্রের ওপারে যাইয়া লঙ্কাপুরীতে প্রবেশের জন্য সমুদ্রের উপর সেতুরচনা করিয়াছেন। সামান্য মানবের কাছে মহাশক্তিধর নীলাম্বুধি আজ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। ইহা প্রশংসার-ভাষায় কঠোর ভর্ৎসনা বা নিন্দা। প্রচেতঃ = সমুদ্র।*

[* অলংকার সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য অধ্যাপক সুধীরকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত 'কাব্যশ্রী' ও অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী-প্রণীত 'অলংকারচন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থদুইটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য]

12/12/79

THE trend of Indological
'sixties coincided with a revi
the German political spectr
winds of change sweepi
World led to a greater awar
existence and their conc
lems. As a country enjoyin
with India in the cultural, e
political spheres, and butt
historic ties, it was inevitabl
eral Republic of Germany's p
well as her attitudes toward
ing countries, notably I
significantly.

CLOSE STUD

The Federal structure of
ing left the question of de
tional changes to the State
the latter were faced with the
ing their orientation as als
closer attention to the study
lems of developing countrie
the State of Baden Wurttem
to create the South Asia I
University of Heidelberg,
search on the specific reg
Asia in its various settings. In
it was also hoped to draw fro
of Indological information al
teristic of German academic

Emphasizing fundamental
the ancient and contempora
of developing countries,
serves as a focal point betw
and the East for large scale
nary research in South Asi
from the conventional patte
lines established in Western
Situated in the picturesq
Heidelberg, amidst the gorg
hillsides and the quietly flo
the Institute has now estab
for major disciplines such
philosophy, Indology, histor
science, law, sociology and

With mounting evidence

A UNIQUE

ies in the
t phase in
when the
the Third
ss of their
ant prob-
lose links
omic and
ed by her
at the Fed-
pective as
e develop-
a, altered

many hav-
led educa-
vernments.
sk of revis-
to develop
f the prob-
In its turn,
erg decided
titute in its
focus re-
n of South
he process,
n the wealth
ady charac-
studies.
research on
y problems
ne Institute
en the West
nterdiscipli-
and differs
n of discip-
universities.
e town of
ous wooded
ing Neckar,
shed chairs
as religion,
art, political
rchaeology.
hat German
... primarily

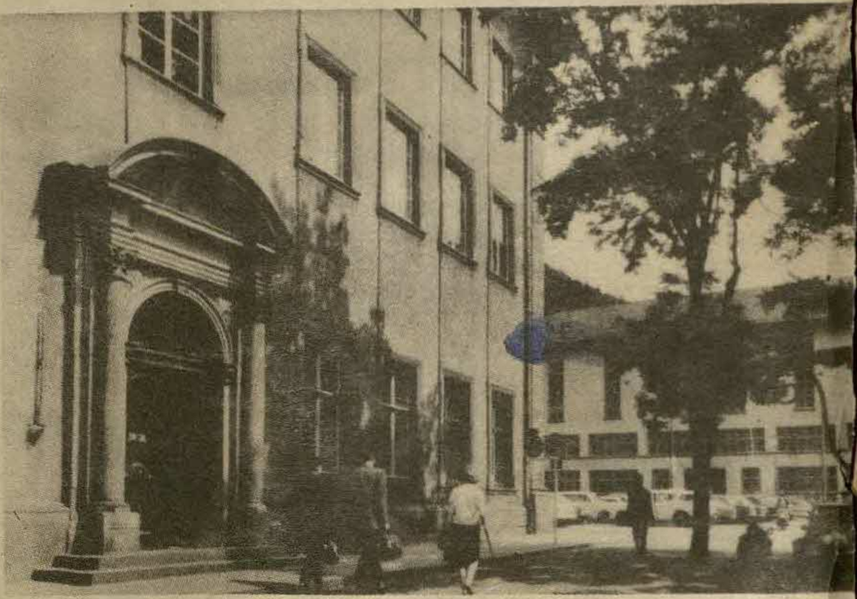

old and the new buildings in the university campus.

example is the department of modern Indian history with Prof. D. Rothermund at its head. Tackling the social and economic history of modern India since the 18th century, the department has made several studies of the history of Uttar Pradesh region in particular. Investigations into the nature of Hindu nationalism in U.P. and of the Muslims of the province with special reference to the Hindi-Urdu controversy in the 20th century are some of the mentionable studies as also one on the history of the Princely States of India during the last two hundred years.

MODERN TRENDS

Modern trends, both religious and secular receive equal treatment. A recent study has been in the field of Hindu thought and politics. Focusing on the Independence movement, it essays the early history of the Hindu Mahasabha and its theme of religion-based nationalism. A further examination of the influence of Shank-

ছিল।
যাইতে
কাব্যে

তুরা রাবণ
র সম্পর্কে
পারে যাইয়া
মান্য মানবের
হা প্রশংসার-

প্রণীত 'কাবারী'
ইবা]